অনুসন্ধান।

অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র।

সংখ্যা

পঞ্চম বর্ষ।

[১২৯৮ সালের শ্রাবণ হইতে ১২৯৯ সালের আষাঢ় পর্য্যন্ত।]

বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা।

শ্রীদুর্গাদাস লাহিড়ী।

অনুসন্ধানের কার্য্যাধ্যক্ষ।

৮নং টেমার্স লেন, ঠনঠনিয়া, কলিকাতা।

অনুসন্ধান।

—:০:—

পঞ্চম বর্ষ।

—:০:—

সূচীপত্র।

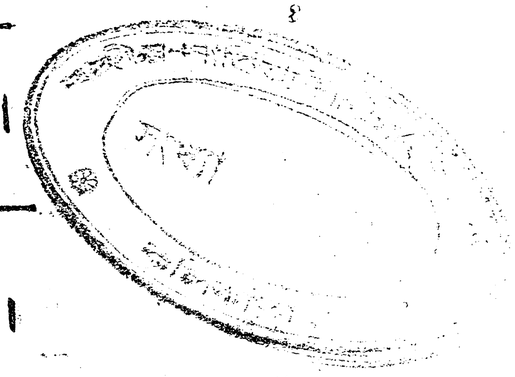

বিষয়।	লেখকগণের নাম।	পৃষ্ঠা।
১। অতীত গৌরব ও ভবিষ্য সম্মান	শ্রীযুক্ত বাবু নিখিলনাথ রায়, বি, এ, ...	১৭
২। অদৃষ্ট (সামাজিক উপন্যাস)	৺তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এম, বি, ...	৯, ৪১, ৮৪, ১০৯, ১৫৩, ১৭৭, ২০১, ২২৮, ২৪৯, ২৭৪, ৩০১, ৩২৫, ৩৫২, ৩৮৬, ৩৯৯, ৪৩৫, ৪৪৫, ৪৭৫, ৫০৬, ৫২০
৩। অদ্ভুত জামাই-ষষ্ঠী ...	শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র সরকার ...	৪৮৭
৪। অভাগিনীর আত্মকথা ...	" বিধুভূষণ ঘোষ ...	৪৩৬
৫। অমৃত-রেণু ...	" সচ্চিদানন্দ গীতরত্ন প্রভৃতি	৩১৮, ৪৪০
৬। অশ্রু-মাহাত্ম্য ...	" হারাণচন্দ্র রক্ষিত ...	৩৬৯
৭। আগমনী ...	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কীর্ত্তিচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ...	১২৫, ১৩৫
৮। আধ্যাত্মিক কৌতুক	রাজা শ্রীল শ্রীযুক্ত শশীশেখরেশ্বর রায় ('কর্ণধার')	৮১
৯। আমাদিগের অকাল-বার্দ্ধক্যের কারণ কি ?	ডাক্তার কামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	৩২৯
১০। আমাদিগের দুরবস্থা	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে ...	৪০৭
১১। আমাদিগের দুরবস্থা ও তাহা নিবারণের উপায়	ঐ ...	১৯১
১২। আমার বিবাহ ...	শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র দিবাকর ...	৩৪৫
১৩। আর কেন ? ...	" হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, এম, এ,	৭৮
১৪। আর বড়াই কাজ নাই। ...	" ঐ ...	১৮৬
১৫। ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌স্ ...	" শরচ্চন্দ্র দেব-কবিরত্ন ...	৫৪
১৬। ঈশ্বর বৈকুণ্ঠে ...	কবিবর শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ রায় ...	৩৭
১৭। কংগ্রেস-রহস্য ...	রাজা শ্রীল শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাকান্ত রায় ...	২৯৬

১৮।	কবিতা ও গান	...	কবিবর শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ রায়, শ্রীযুক্ত বাবু প্রফুল্লচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সুকবি শ্রীযুক্ত বাবু ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বাবু রসিকলাল দে, শ্রীযুক্ত বাবু চুনীলাল গুপ্ত, ডাক্তার শ্রীযুক্ত মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত বাবু সত্যপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত বাবু হরিচরণ রায়, শ্রীযুক্ত বাবু পাঁচকড়ি ঘোষ, শ্রীযুক্ত বাবু কুঞ্জবিহারী দত্ত, শ্রীযুক্ত বাবু দেবকিশোর মুখোপাধ্যায়, এম, এ, নবীন কবি শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র দাস, 'সদ্ভাবশতক' প্রভৃতি প্রণেতা প্রবীণ কবি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র সরকার, প্রাচীন কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস (পদাবলী), পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রোহিণীকান্ত বিদ্যাভূষণ ও সম্পাদক প্রভৃতি	১০২, ১৯৩, ৩৬৩, ৩৮৪, ৪১০, ৪৮৬, ৫০৫, ৫৩৩
১৯।	কর্ণগড়-রাজবংশ	...	শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ শর্ম্মা	৪৬৫
২০।	কাব্য ও কামিনী	...	" শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, বি,এ, বি,এল,	৮১
২১।	কালী-কীর্ত্তন		পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রোহিণীকান্ত বিদ্যাভূষণ	১০৭, ১৫৩, ১৭৭
২২।	কৃষ্ণ-কীর্ত্তন	...	ঐ ...	৩৬৯
২৩।	কেন? (প্রশ্নগল্প)	...	শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী ('ভারতী') ...	২১৯
২৪।	"কেন?"—তবে শোন!	...	শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাদাস লাহিড়ী ...	২৩৭
২৫।	গোলক-ধাঁদা	...	ঐ ...	৫৩৪
২৬।	চীনদিগের আচার ব্যবহার		" বিনোদবিহারি চক্রবর্ত্তী ...	৫২৪
২৭।	চীনদিগের বিবাহ-পদ্ধতি		ঐ ...	৫৪৬
২৮।	জালিয়াৎ যন্ত্র	...	" প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় (ডিটেক্‌টিভ্)	৫, ৪৫, ৯২, ১১৬, ১২৪
২৯।	জীবাত্মা ও কামনা	...	" সিদ্ধেশ্বর রায় ...	১১২
৩০।	তত্ত্ব-সঙ্গীত	...	" সচ্চিদানন্দ গীতরত্ন ...	২৭৩
৩১।	তত্ত্ব-সঙ্গীত		পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রোহিণীকান্ত বিদ্যাভূষণ ...	৫৩৯
৩২।	তত্রৈব রমতে হরি	...	" তারাকুমার কবিরত্ন ('নব্যভারত')	৩৪১
৩৩।	তিনখানি ছবি		কবিবর শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন ('মালঞ্চ') ...	৩১৬
৩৪।	তীর্থ-কালিমা	...	শ্রীযুক্ত বাবু পাঁচকড়ি ঘোষ ...	১৭২
৩৫।	তু বিনে তোহে জানিতে নাহি এক		" সচ্চিদানন্দ গীতরত্ন...	৩২১
৩৬।	দরিদ্রতা	...	" অমৃতলাল সরকার, বি, এ,	২৬৭
৩৭।	দাদাভাই নারোজি (সচিত্র)		পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি ...	৫৪৬
৩৮।	দুর্ভিক্ষের সূত্রপাত (সচিত্র)		শ্রীযুক্ত বাবু কালিদাস লাহিড়ী ...	১৬৯
৩৯।	ধর্ম্ম-আহ্বান	...	" রামদয়াল মজুমদার, এম, এ,	৫৪৮
৪০।	নমঃ শিবায়	...	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু তর্কবাগীশ ...	৩৯৩
৪১।	নাম গান	...	শ্রীযুক্ত বাবু নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ...	৫৭
৪২।	নাস্তিকের ঈশ্বর ভক্তি	...	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সদানন্দ তত্ত্বরত্ন	৩৯৩, ৪৪৩
৪৩।	পয়সা-কড়ি	...	শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র দিবাকর ...	৫০৯

৪৪।	পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (সচিত্র)		শ্রীযুক্ত বাবু বাণীনাথ নন্দী ...	২৫
৪৫।	পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর		পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কীর্ত্তিচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ...	৩৬
৪৬।	পাপের অধিষ্ঠান কি?	...	শ্রীযুক্ত বাবু কামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ...	৫৪০
৪৭।	পাপের প্রতিফল	...	শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র দেব ৩০৫, ৩৭৬, ৪০২, ৪২৩, ৪৫০,	৪৮২
৪৮।	পুরাতন ও নূতন বর্ষ	...	প্রবীণ কবি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ...	৪১৯
৪৯।	পুষ্কর-তীর্থ (সচিত্র)	...	শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র সরকার ...	২২৩
৫০।	পূজার পঞ্চরং (সচিত্র)	...	ঐ ...	১৪৯
৫১।	প্রতারণা-প্রবঞ্চনা	...	সম্পাদক ৩১, ৫৫, ৮০, ১০৪, ১২৭, ১৭৬, ২০০, ২২৪, ২৪৬, ২৭২, ২৯৬, ৩২০, ৩৪৪,	৩৮৮
৫২।	প্রাচীন কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার		শ্রীযুক্ত বাবু কালিদাস লাহিড়ী ...	৩৫৫
৫৩।	প্রাতঃস্মরণীয়	...	" হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, এম, এ,	২৮
৫৪।	প্রেমে ডগমগ ভক্তের উক্তি		কবিবর শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ রায় ...	১৫২
৫৫।	বনিল না কেন?	...	শ্রীযুক্ত বাবু হারাণচন্দ্র রক্ষিত ...	৯৪
৫৬।	বনিল না কেন?	...	— ...	১১৯
৫৭।	বঙ্গে মাতর্গঙ্গে	...	কবিবর শ্রীযুক্ত বাবু হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রচার)	২৮৭
৫৮।	বন্দনা-গীতি	...	প্রাচীন কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস (পদাবলী)	৩৫৯
৫৯।	বন্ধু বটে!	...	শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র সরকার ...	১৯৬
৬০।	বর্ণমালা-রহস্য	...	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এল,	৩০৯
৬১।	বর্ষ-শেষে	...	সুকবি শ্রীযুক্ত বাবু ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৩৪৪
৬২।	বসন্ত-বর্ণনা	...	শ্রীযুক্ত বাবু নিখিলনাথ রায়, বি, এ,...	৩২৩
৬৩।	বাঙ্গলার বর্ত্তমান	...	" হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, এম, এ,	১৭০
৬৪।	বাঙ্গালার বিবরণ	...	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি ...	৩০৭, ৩৭২, ৪০৫, ৪২৮, ৪৫৩, ৪৭৮, ৫৪২
৬৫।	বাঙ্গালা লেখা-পড়া	...	শ্রীযুক্ত বাবু সিদ্ধেশ্বর রায়	...৪৭১, ৪৯১
৬৬।	বাণলিঙ্গ বা বাণেশ্বর শিব		পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রোহিণীকান্ত বিদ্যাভূষণ ...	৪২০
৬৭।	বাল্মীকি ও হোমার		শ্রীযুক্ত বাবু দীনেশচরণ সেন, বি, এ,	...৫০০, ৫১৬
৬৮।	বিজয়া	...	" বাণীনাথ নন্দী ...	১৫৩
৬৯।	বিজয়ার পত্র	...	" পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ,	১৬৮
৭০।	বিদ্যাসাগরের বাল্যজীবন		" কালিদাস লাহিড়ী ...	৩৮
৭১।	বিবেক-বাণী	...	পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রোহিণীকান্ত বিদ্যাভূষণ ...	৪৪৩
৭২।	ব্যাধ ও সাধক	...	" " সদানন্দ তত্ত্বরত্ন ...	১
৭৩।	ভক্তি-সঙ্গীত	...	" " কীর্ত্তিচন্দ্র বেদান্তবাগীশ ...	২২৫
৭৪।	ভজনা-গীতি	...	প্রাচীন কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস (পদাবলী) ...	৫৩৯
৭৫।	ভক্তের গান	...	শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র সরকার ...	৪৮৭
৭৬।	মণিপুর কুরাইল (সচিত্র)		" শরচ্চন্দ্র দত্ত ...	৫৩, ৫৬
৭৭।	মণিপুর-যাত্রীর দিনলিপি		" পাঁচকড়ি ঘোষ ...	২৭০, ২৯৪, ৩৬৩, ৩৮০, ৪২৬, ৪৯৫

৭৮। মতামত ... সমালোচক ২৩, ১৭৫, ৪১২
৭৯। মাতি রহু তুয়া পরসঙ্গে ... প্রাচীন কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস (পদাবলী) ... ৫১৫
৮০। মা ব্রহ্মময়ী, আমায় কোলে লও শ্রীযুক্ত বাবু ব্যোমকেশ মুস্তোফী ... ৩৩৫
৮১। মিসনী-সম্প্রদায় ... " কামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ২৮৫
৮২। মৃত্যু-চিন্তা ... সম্পাদক ... ২৮৯
৮৩। মেয়ে ঠগ ... শ্রীযুক্ত বাবু হরিসাধন মুখোপাধ্যায়... ১৬৩
৮৪। মোহ-মুদ্গর ... " রাখালদাস অধিকারী ... ৩৩৩
৮৫। যোগ ও যোগানুষ্ঠান ... পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু তর্কবাগীশ ... ৮৯, ১০৭, ১৪২, ১৮৩, ২১৬, ২৩৪, ২৫৬
৮৬। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ... শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র দত্ত ... ২৭
৮৭। রামমোহন রায় বেদ জানিতেন কি না ? পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি ... ৫২৮
৮৮। রক্ষ রক্ষ ভগবান ... শ্রীযুক্ত বাবু কালিদাস লাহিড়ী ... ৩৩
৮৯। লয় ... শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ বসু, এম, এ, বি, এল, (সাহিত্য) ২৮৯
৯০। লিঙ্গায়িৎ বা বীর-শৈবসম্প্রদায় শ্রীযুক্ত বাবু সাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায় ... ৩৯৬
৯১। শঠে-শঠে (দুই রকম) ... শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় (ডিটেক্‌টীভ) ৯৭, ১৩৭
৯২। শক্তি-সঙ্গীত ... পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রোহিণীকান্ত বিদ্যাভূষণ .. ৪৬৭, ৪৯১
৯৩। শাওন-বিরহ ... কবিবর শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ রায় ... ১
৯৪। শারদীয়া পূজা (সচিত্র) ... শ্রীযুক্ত বাবু হরিচরণ রায় ... ১২৯
৯৫। সতীত্ব ... " অমৃতলাল সরকার, বি, এ, ৩৪৩
৯৬। সত্যের লক্ষণ কি ? ... " কামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৭৯
৯৭। সনাতনপুরের সিদ্ধেশ্বর ... শ্রীযুক্ত বাবু হরিচরণ রায় ... ৪৯, ৭৩
৯৮। সন্ন্যাসীর জীবনী ... " উমেশচন্দ্র গুপ্ত ১১৪, ১৩৩, ১৬০, ২১২, ২৫৬, ২৭৮
৯৯। সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় ... " মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য ৫২২
১০০। সর্ব্বনাশী (গল্প) ... " শরচ্চন্দ্র সরকার ... ৫৫৮
১০১। সভ্য ইউরোপীয় যোগ ... " হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, এম, এ, ১২১
১০২। সাধন-সঙ্গীত ... পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রোহিণীকান্ত বিদ্যাভূষণ ... ২৩১
১০৩। সাধন-সঙ্গীত ... শ্রীযুক্ত মনোমোহন বসু ('কর্ণধার') ২৯৭
১০৪। সাধক-সঙ্গীত ... পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু তর্কবাগীশ ... ২৪৯
১০৫। সাধক-সঙ্গীত ... শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র দত্ত ... ৩৪৫
১০৬। সাধু তুলসীদাস ... " সাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায় ২৩৯, ২৬২
১০৭। সাধু-বেশের অসীম মহিমা ... সম্পাদক ... ২৯৮
১০৮। সুখ ... শ্রীযুক্ত বাবু পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ, ৫৭
১০৯। সোনার পাথর-বাটী ... " সিদ্ধেশ্বর রায় ... ২০৮
১১০। স্বর্গীয় তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদক ... ১৪৭
১১১। স্বায়ত্ত-শাসনের সংস্কার আবশ্যক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ রায় বিদ্যানিধি ২৪৬
১১২। হতাশের প্রলাপ ... শ্রীযুক্ত বাবু পাঁচকড়ি ঘোষ ... ৩৩৭
১১৩। হাইকোর্টের জজ মহামান্য গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় — ... ২৬৯
১১৪। হাসিব না কাঁদিব ... শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাদাস লাহিড়ী ... ৪০
১১৫। হিন্দু-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু কামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৩২২
১১৬। হিন্দু-পরিবার ... শ্রীযুক্ত বাবু সিদ্ধেশ্বর রায় ... ৬৪
১১৭। হিন্দু-রমণীর কর্ত্তব্য ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু কামাখ্যাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ২২৫

অনুসন্ধান

অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র

৫ম খণ্ড] ১৫ই শ্রাবণ, ১২৯৮। [১ম সংখ্যা।

মঙ্গলময় শ্রীহরির শ্রীচরণ

স্মরণ করিয়া, নবোৎসাহে, নব-অনুরাগে, 'অনুসন্ধান' পঞ্চম বর্ষে পদার্পণ করিল। বয়সের সহিত উত্তরোত্তর ইহার শ্রীবৃদ্ধি হউক, এই এখন ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা।

শাওন-বিরহ।

সহিরে,
আওল শাওন, ঘন ঘন-গরজন,
ঝম ঝম বরিখন ঘন জলধারা;
কহ কব আওব কান্ত হামারা ?

গুড়ু গুড়ু দুড়ু দুড়ু, শবদ ক্ষুবধ করে,
হম সে অবোধা নারী পাগরী পারা;
কহ কব আওব কান্ত হামারা ?

বিজুরী অনলমুখী, ঘড়ি ঘড়ি চমকত,
চমকিত চিত বড়ি মোরা;
কহ কব আওব কান্ত হামারা ?

ভেক ভেকী মক মক, উড়ল নভসি বক,
জলদ গলহি সিতহারা;
কহ কব আওব কান্ত হামারা ?

পোখর নদ নদী, ভরল জলদজলে,
উতরল শৈল-নিঝোরা;
কহ কব আওব কান্ত হামারা ?

কেলি-কদম-ফুল, ফুটহি সমাকুল,
করতহি ভঁওরী ভঁওরা;
কহ কব আওব কান্ত হামারা ?

ডাহুক-ডাহুকী, ডাকত ডুকি ডুকি,
নাচত ময়ূরী ময়ূরা;
কহ কব আওব কান্ত হামারা ?

শাওন বাদর, লোর মোরি ঝর ঝর,
ঝরতহি শাওন-ধারা;
কহ কব আওব কান্ত হামারা ?

বারিদ-কোর মাঝ, গুপত তপন জনু,
বহি গেল কান্ত মথুরা;
শ্যাম শ্যাম বলি, কতহি ফুকারব,
অব রাধা বিরহ-বিধুরা।

ব্যাধ ও সাধক।

অস্পৃশ্য নীচজাতীয় ব্যাধের ঘরে জন্ম-পরিগ্রহ করিলেই যে বিফল-জন্ম হইল, এমন নহে। অথবা জন্মাবধিই সাধু-সন্ন্যাসীর বেশে বনে ব

পরিভ্রমণ করিয়া ফল-মূলাহারে জীবন-ধারণ করিতে পারিলেই যে সার্থক-জন্ম, এ বিশ্বাসও ধ্রুব সত্য নহে। জন্ম-বৈগুণ্যে কিম্বা আচার-নৈপুণ্যে কিবা-কি আসে যায়? ভগবানকে পাইতে হইলে—তাঁহার সেই অনন্ত কৃপাসিন্ধুর কণামাত্র প্রাপ্ত হইবার আশা করিলে, কেবলমাত্র তাঁহাতে একমন একপ্রাণ হইতে হয়। তদন্ত-প্রাণ, একান্ত-মনা, স্থির-দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ না হইতে পারিলে, কিছুতেই তাঁহার কৃপালাভ সম্ভবপর নহে; হাজারই বাহ্য-চাকচিক্য থাকুক, হাজারই জটা-জুট-সমন্বিত বা গৈরিক-বসন-পরিহিত হউক, কিছুতেই কিছু হয় না। আবার ছিন্নবস্ত্রে, রুক্ষদেহে থাকিয়াও, মনের সহিত তাঁহাকে ডাকিতে পারিলে, তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ হয়।

একটী ব্যাধ ও একটী সাধকের সুন্দর চরিত্রে পাঠকগণকে আজ আমরা সেই পরিচয় প্রদান করিব।

দূরবনে, মৃগশিশুর অনুসরণে, প্রাণান্ত-পণে, ব্যাধ ছুটিয়াছে। ব্যাধের শীর্ণদেহ, জীর্ণবস্ত্র, গাত্রের দুর্গন্ধ, ব্যাধোচিত তূণশর-সমন্বিত বেশ-ভূষা—শান্তিময় অরণ্যে সকলই অশান্তির হেতু-ভূত হইতেছে। আর, সেই অরণ্যের অপর এক প্রান্তে—স্থির, প্রশান্ত, রম্য, ফল-পুষ্প-সমন্বিত নিরীহ বৃক্ষরাজী-পরিবেষ্টিত, এক মনোরম অধি-ত্যকা-প্রদেশে, ক্ষুদ্র অথচ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন একটী পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া—তৎপার্শ্বে বসিয়া, এক কমনীয় কান্তি সাধু-সন্ন্যাসী ভগবানের ধ্যান-পূজায় নিমগ্ন আছেন। সেই গভীর অরণ্যের দুই দিকে এই দুই দৃশ্য। একদিকে ব্যাধ ও অপর দিকে সাধক। দুইটী বিপরীত দৃশ্যে সুন্দরী প্রকৃতিও এক নবসাজে সাজিয়াছেন।

কিন্তু কি দুর্দ্দৈব? এ পরিবর্ত্তনশীল প্রকৃতি-পটে কিছুই কি স্থির থাকিবার নহে? দেখিতে দেখিতে আসন্ন-প্রাণ সেই মৃগশিশুও সেই সন্ন্যাসীর আশ্রম-অভিমুখে ছুটিল। অনুসারী ব্যাধও অমনি তৎপশ্চাৎ ধাবমান হইল। সন্ন্যাসীর সেই শান্তিময় আশ্রমেও ক্রমে অশান্তি-কোলাহল উত্থিত হইল; বনদেশ প্রকম্পিত, আর আর বন্যপশুগণও প্রাণভয়ে পলাইতে লাগিল। একাগ্রচিত্ত ব্যাধেরও কিন্তু আর কোন দিকেই দৃষ্টি নাই—সে যেমনই অনুসরণ করিয়া ছিল, কিছুতেই কিছু ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, সেই মতই পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে লাগিল। এই সে হরিণ-শিশুর উপর শরনিক্ষেপ করে—এই সেই হরিণ-শিশুর প্রাণান্ত হয়, তখনকার তাহার এমনই ভাব!

এমন সময় ব্যাধ চমকিয়া উঠিল। হঠাৎ তাহার চলচ্ছক্তি রোধ হওয়ায়, সে আপনার পায়ের দিকে তাকাইয়া দেখিল। দেখিয়াই, তাহার শরীর শিহরিয়া উঠিল। সে দেখিল, দিব্যকান্তি, দীর্ঘ জটাজুট-সমন্বিত, ভস্ম-বিলেপিত অঙ্গ, এক সন্ন্যাসী তাহার পদতলে। সে একান্তমনে চলিয়া—নীচের দিকে আর না তাকাইয়া, এমনই অপকর্ম্ম করিয়া বসিয়াছে! ছুটিতে ছুটিতে তাহার চরণদ্বয় সেই ধ্যান-স্তিমিত-নেত্র সাধুর মস্তকোপরি পতিত হইয়াছে! দেখিয়া, ব্যাধের অন্তরাত্মা শুখাইয়া গেল। সন্ন্যাসীও যেমন, ক্রোধভরে উঠিয়া, তাহাকে ভর্ৎসনা করিতে যাইবেন, সেও অমনি তাঁহার চরণযুগল ধারণ করিয়া বলিল,—"ঠাকুর, আমি পাতকী, আমি নারকী—আপনি আমায় ক্ষমা করুন। আমি আর কখনও এমন কাজ করিব না।" এই বলিয়া সন্ন্যাসীর চরণ-প্রান্তে পড়িয়া ব্যাধ কাঁদিতে লাগিল।

তাহার সে ভাব দেখিয়া, সন্ন্যাসীর প্রাণেও দয়ার সঞ্চার হইল। তিনি, হাত ধরিয়া উঠাইয়া, ব্যাধকে বলিতে লাগিলেন,—"বৎস! আর তোমার কোন আশঙ্কা নাই। তুমি নিশঙ্ক-চিত্তে গৃহে প্রত্যাগমন কর।" আশ্বাস পাইয়া, বিশেষ এমন একটা গুরুতর অপরাধে এক কথায় অবহেলা করিয়া এমন সরল ভাব দেখানয়, কি জানি কেন, ব্যাধেরও মন ফিরিয়া গেল।

কাতর-প্রাণে সে তখন সেই সন্ন্যাসীর চরণ-যুগল ধারণ করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"ঠাকুর, আপনি কে? যদি অনুগ্রহ করিয়া আমায় দর্শন দিয়াছেন, তবে আপনার পরিচয় প্রদান করুন। প্রভো, আপনাকে দেখিয়া, আমার আর গৃহে ফিরিতে ইচ্ছা হই-তেছে না; মনে করিতেছি. এখানেই থাকিয়া, আমি আপনার চরণ-সেবা করিয়া, জীবন সার্থক করিব। আপনি আমায় আদেশ করুন—এই আমি আমার ধনুর্ব্বাণ ফেলিয়া দিলাম, এক্ষণে আমি আপনার চরণ সেবা করিয়া চরিতার্থ হই।" এই বলিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে, ব্যাধ তাঁহাকে একান্ত-প্রাণে ধরিয়া বসিল। তাঁহার সে অনুমতি না পাইলে, কিছুতেই তাঁহার পদদ্বয় পরিত্যাগ করিবে না, এমনই তাহার মনের ভাব!

সাধু-সন্ন্যাসী দেখিলেন, বিষম বিভ্রাট! তিনি সংসারের কোলাহল সহিতে না পারিয়া--সংসার-ত্যাগী হইয়া, এই দূর বনে ঈশ্বরারাধনা করিতে আসিয়াছেন; কিন্তু এখানেও তাঁহার সেই শঙ্কট! তিনি মনে মনে আপনাকে ধিক্কার দিতে দিতে ভাবিলেন,—"পাপ সঙ্গে সঙ্গেই আসে! যে ভয়ে আমি গৃহত্যাগ করিয়া নির্জ্জনে আসিয়া বনবাস-আশ্রয় করিলাম, এখানেও আমার সেই ভয়!" এই ভাবিয়াই, তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, —"এ যেরূপ নাছোড়বান্দা দেখিতেছি, তাহাতে স্পষ্ট কথায় ইহাকে তাড়ান সহজ নহে! আচ্ছা, তবে এক কৌশল করিয়া ইহাকে তাড়ান যাউক।" এইরূপ স্থির করিয়াই, তিনি প্রকাশ্যে বলিলেন,—"ব্যাধ, তোমাকে অনায়াসে আমি আমার এ আশ্রমে রাখিতে পারি; আমার শিষ্য-স্বরূপে তোমাকে ঈশ্বর-আরাধনায়ও দীক্ষিত করিতে পারি। কিন্তু বৎস, তৎপূর্ব্বে আমার একটী প্রতিজ্ঞার কথা তোমাকে বলিতে হই-তেছে। আমি যে জন্য আজ বনবাসী, যে রত্ন হারাইয়া আমি আজ উদাসী-সন্ন্যাসী, বৎস, আগে তাহা শ্রবণ কর। আমার অন্ধের যষ্টি, একমাত্র জলপিণ্ডের স্থল, একটী পুত্র ছিল। আমার সেই পুত্র বড়ই দুরন্ত; কিছুতেই কাহারও কথা সে শুনিতে পারিত না। একদিন কোন এক অপরাধ করায়, আমি তাহাকে বড়ই তিরস্কার করিয়াছিলাম। পুত্র আমার, সেই অভিমানে, তদবধি গৃহত্যাগী-বনবাসী হইয়াছে। এই গভীর অরণ্যের মধ্যে, ছুটিতে ছুটিতে, সে পলায়ন করিয়াছে। আমিও, বৎস, তাহারই অনুসরণে আসিয়া, এ পর্য্যন্তও তাহাকে খুঁজিয়া না পাইয়া, অবশেষে মনের ক্ষোভে এই সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া শান্তি-সুখে কাল কাটাইতেছি। আর, সেই সঙ্গে সঙ্গে আমার এক প্রতিজ্ঞা আছে যে, আমি আর কাহাকেও সহসা এ ধর্ম্মে দীক্ষিত করিব না। তবে এমন কাহাকেও আমার শিষ্য করিতে পারি, যে আমার সেই পুত্রকে ধরিয়া আনিয়া দিতে পারিবে। তদ্ভিন্ন, বৎস, দুঃখিত হইও না, আমার প্রতিজ্ঞা, আমি আর কাহা-কেও আমার শিষ্য-স্বরূপ গ্রহণ করিব না। এক্ষণে এই সমস্যা বুঝিয়া, ইচ্ছা হয়, তুমি আমার শিষ্যত্ব গ্রহণ কর—নয় গৃহে চলিয়া যাও। ফল কথা, আমার পুত্রকে যদি ধরিয়া আনিতে না পার, তবে আমি আর কিছুতেই তোমাকে শিষ্য-স্বরূপ গ্রহণ করিতে পারি না।"

সন্ন্যাসীর ঈদৃশ প্রতিজ্ঞা-বাক্য শ্রবণ করিয়া, সরল-প্রাণ ব্যাধও বিমর্ষচিত্তে উত্তর করিল,—"আচ্ছা দেব, আমি তাহাই করিব। আমিই আপনার পুত্রকে অন্বেষণ করিয়া আনিয়া দিব। এক্ষণে আপনি আমাকে বলিয়া দেন যে, আপ-নার সেই পুত্র কিরূপ, ও তাঁহার বয়সই বা কত, তিনি দেখিতেই বা কেমন?"

প্রজ্ঞাবুদ্ধি তাপসবর ব্যাধের এইরূপ আগ্রহ-বাক্য শ্রবণ করিয়া মনে মনে একটু হাসিলেন। হাসিয়াই ভাবিলেন,—"বেটা যেমন নির্ব্বোধ, উহাকে তেমনই তাহার প্রতিফল দেওয়া যাউক।" এই ভাবিয়াই, তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সেই পুরুষপ্রধান শ্রীকৃষ্ণের বাল্যরূপ বর্ণন

করিয়া, ব্যাধকে কহিলেন,—"ব্যাধ শুনিলে! আমার পুত্রের এমনই রূপ! সেই মস্তকে শিখিপুচ্ছধারী, সেই ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা, সেই মোহন বংশীধারী, সেই নূপুর-ধ্বনিত চরণ-যুগল, সেই বামেহেলা শ্রীমুরারী, বৎস, সেই-ই আমার পুত্র। এই বনে, এই দিকে সে আমার পলাইয়াছে। যদি তুমি তাহাকে ধরিয়া আনিতে পার, তবেই তুমি আসিও। নহিলে, জানিও, আর ফিরিলে—ফিরিয়া আমায় এরূপে বিরক্ত করিলে, তোমার আর অব্যাহতি নাই। নিশ্চিতই তোমার সর্ব্বনাশ হইবে।"

একান্ত-প্রাণ ব্যাধ তাহাতেই স্বীকৃত হইল। বলিল,—"যে আজ্ঞে প্রভু, আমি তাহাই করিব। যেরূপে পারি, যেখানে পাই, আমিই আপনার পুত্রকে ধরিয়া আনিব।" এই বলিয়াই, সেই তপস্বী-চরণে প্রণতি-পূর্ব্বক, ব্যাধ সেই গভীর অরণ্য-মধ্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু, কিছুদূর গমন করিয়াই, সে অনন্ত-রূপরাশি হৃদয়ে ধারণা করিতে না পারিয়া, ব্যাধ আবার তপস্বী-সমীপে ফিরিয়া আসিল। আসিয়া, নিবেদন করিল,—"দেবতা, আর একবার আপনি আপনার পুত্রের রূপরাশি আমায় শুনাইয়া দেন। সে রূপ আমি মনে রাখিতে পারিতেছি না।"

সন্ন্যাসীবর ইহাতে একটু হাসিলেন। হাসিয়া, আবারও একবার ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেই অনন্ত রূপরাশির যতদূর পারিলেন, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণন করিলেন। সেই প্রতি পদনখরে কোটি চন্দ্র-প্রভা, সেই অলক্তরঞ্জিত চরণ-শোভা, সেই পীত-ধড়া মোহন-চূড়া, সেই আকর্ণবিস্তৃত নয়নযুগল—একে একে তপস্বী সকলই শুনাইলেন; শেষ বলিলেন,—"যাও বৎস, যাও; তবে আর আমায় বিরক্ত করিও না।"

ব্যাধ চলিল। কিন্তু আবারও তাহার সেই ভ্রান্তি! সে কিছুতেই সে অপূর্ব্ব অনন্ত রূপরাশি হৃদয়ে ধারণা করিতে পারিল না। সুতরাং আবারও সে ফিরিয়া আসিয়া, আবারও তাঁহার চরণে প্রণতিপূর্ব্বক, সেই বর্ণনা শুনিতে চাহিল। ক্রোধে, তাচ্ছিল্যভাবে, তপস্বীও আবার তাহাকে সে রূপ শুনাইলেন। কিন্তু তাহাতেও নিস্তার নাই! একবার, দুইবার, তিনবার! তিনবার এইরূপে সন্ন্যাসীকে বিরক্ত করা হইলে, শেষবার তিনি আরও ক্রোধ-কম্পান্বিত স্বরে উত্তর করিলেন,—"বারবার তিনবার বলিলাম! আবারও যদি তুই আসিস, তবে আর তোর নিস্তার নাই। এবার আর আমার পুত্রকে না আনিতে পারিলে তুই কিছুতেই আসিস না।"

ব্যাধ আর কি করিবে? কাজেই তাহাকে ভগ্নমনে ভগ্নপ্রাণে ফিরিতে হইল। কিন্তু ব্যাধের একান্ত আশা, তখনও তপস্বীর পুত্রকে ধরিয়া আনিবে। একমনে একপ্রাণে তাই সে আবার সেই গভীর বনোদ্দেশে চলিল। দিন নাই, রাত্রি নাই, আহার নাই, বিশ্রাম নাই, ভয় নাই, ভাবনা নাই, ব্যাধ একই মনে চলিতে লাগিল। বনের পর বন, বৃক্ষের পর বৃক্ষ, পর্ব্বতশ্রেণীর পর পর্ব্বত-শ্রেণী কতই যে অতিক্রম করিল—কত হিংস্র জন্তু বন্যপশু, কত সর্প-সরীসৃপ, কত ভল্লুক-ব্যাঘ্র যে তাহার পথের বিঘ্ন-স্বরূপ দণ্ডায়মান ছিল, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। কিন্তু কিছুতেই ব্যাধের ভ্রূক্ষেপ নাই; সে কেবল একদৃষ্টে একমনে চলিতেছে। তাহার দৃষ্টি কেবল সেই একই দিকে—কোথায় সেই বংশীধারী শ্রীমুরারী—কোথায় সেই বামেহেলা পীত-ধড়া মোহন-চূড়া!

কিন্তু কি ভগবানের লীলা, সত্য সত্যই ব্যাধের আশা পূর্ণ হইল। সত্য সত্যই ব্যাধ সেই বনদেশের দূর-প্রান্তে, সেই তপস্বী-বর্ণিত রূপ-সমন্বিত একটী বালককে দেখিতে পাইল। দেখিয়া, তাহার নয়ন-যুগল পরিতৃপ্ত হইল, প্রাণে অপার আনন্দ-সমুদ্র উদ্বেলিত হইল। ব্যাধ অমনি তখন, আনন্দাশ্রু পরিত্যাগ করিতে করিতে, ভক্তিভরে বলিয়া উঠিল,—"এস, গুরু-পুত্র, এস—এস; আর কেন আমাদের কষ্ট দেও?" এই বলিতে বলিতে ব্যাধ তাঁহাকে ধরিতে গেল। ভক্তের ভগবান ভক্তিডোরে বাঁধা। ব্যাধ যখনই তাঁহার অনুসরণ করিয়াছে, তখনই তো তিনি তাহাকে ধরা দিয়াছেন! কাজেই, অনায়াসেই ব্যাধ তাঁহাকে ধরিতে পারিল। ধরিয়াই, কাঁদিতে কাঁদিতে ব্যাধ তাঁহাকে বলিতে লাগিল,—"কেন গুরুপুত্র, কেন আর আমাদের এত কষ্ট দিতেছ? তোমার পিতা—আহা তিনি তোমার অভাবে কতই কষ্ট পাইতেছেন! এস এখন; তোমায় তোমার পিতার নিকট লইয়া যাই।" ভক্তপ্রাণ ভগবান আর কি করিবেন? ভক্তের নিকট তাঁহার আর উপায় কি? কাজেই তিনি যাইতে স্বীকৃত হইলেন। ব্যাধ আনন্দে উৎফুল্ল হইল; ভগবানকে ক্রোড়ে পাইয়া জন্ম সার্থক করিল।

এইরূপে, ক্রমে ভগবানকে ক্রোড়ে লইয়া, ব্যাধ পুনরায় সেই তপস্বী-সমীপে উপনীত হইল। তাঁহাকে আহ্লাদ-সহকারে সম্বোধন করিয়া কহিল,—"গুরুদেব, এই লউন আপনার পুত্রকে।" ধ্যান-স্তিমিত-নেত্রে সন্ন্যাসী হঠাৎ ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া চমকিয়া উঠিলেন। নেত্র উন্মীলন করিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার সম্মুখেই আবার সেই ব্যাধ দণ্ডায়মান। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, ব্যাধের ক্রোড়স্থিত ভগবানের প্রতি আর তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইল না। অথচ ব্যাধ বারবার বলিতে লাগিল,—"এই লউন, গুরুদেব, আপনার পুত্র!"

তপস্বী তখনও কিছুই দেখিতে পাইলেন না। কিন্তু সকলই বুঝিলেন। বুঝিয়া, এক নিদারুণ দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন,—"বৎস ব্যাধ, তুমি একবার উহাকে জিজ্ঞাসা কর দেখি, ও কবে আমার প্রতি সদয় হবে?" ভগবান উত্তর করিলেন,—"শত জন্মে।"

তপস্বী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ব্যাধও আর কোন কথা কহিতে পারিল না; ভগবানকেও আর কিছু বলিতে হইল না। দেখিতে দেখিতে ক্ষণপরেই এক দিব্য রথে সেই ব্যাধ ও ভগবান একত্রে—একই আসনে উপবিষ্ট হইলেন। স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তাঁহারা উভয়েই সেই স্বর্গধামে উপনীত হইতে লাগিলেন। আর সেই তপস্বী-সন্ন্যাসী, এত আরাধনা-আবাহনে জীবন যাপন করিয়াও, অরণ্যে তৃণশয্যায় শায়িত রহিলেন। একমাত্র মনের ব্যত্যয়েই দুই জনের এই দুই অবস্থা সঙ্ঘটিত হইল।

DETECTIVE STORIES.

জালিয়াত যদু।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আমরা অদ্য যাঁহার বিষয় লিখিতে আরম্ভ করিতেছি, তিনি হুগলি-জেলা স্থিত একটী ক্ষুদ্র পল্লিতে দরিদ্রের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। যখন ইহাঁর নিতান্ত শৈশব, সেই সময়ে ইহাঁর পিতা পরলোক গমন করেন। ইহাঁর মাতা অনেক কষ্টে ইহাঁকে লালন-পালন করিয়া পরিশেষে সেই স্থানের একটী ইংরাজি-স্কুলে ইহাঁকে প্রবিষ্ট করিয়া দেন। তিনি সেই স্থানে অতি সামান্যরূপ শিক্ষালাভ করেন। লেখা-পড়া যাহাকে বলে, তাহার কিছুই ইনি শিক্ষা করেন নাই; তবে ইংরাজি লিখিতে উত্তমরূপ অভ্যাস করিয়াছিলেন। অতি সুন্দর ও পরিষ্কাররূপে বেশ দ্রুত ও নির্ভুল নকল করিতে পারিতেন। ইনি যদিও ভালরূপ লেখা-পড়া শিখেন নাই, কিন্তু ইহাঁর বুদ্ধি অতিশয় তীক্ষ্ণ ছিল; ছেলে বেলায় ইহাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দেখিয়া সময় সময় শিক্ষকগণ অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন, ও অশেষ প্রশংসা করিতেন। সংসারের নিতান্ত অনাটনের নিমিত্ত অতি অল্প দিবসের মধ্যেই ইনি স্কুল পরিত্যাগ করিয়া কোনপ্রকার চাকরির যোগাড় করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

আজকাল সহজে যে কোনপ্রকার চাকরি হয়, তাহার সম্ভাবনা নিতান্তই অল্প। আপনার আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতি কোন ব্যক্তি কোন আফিসের প্রধান কর্ম্মচারী না থাকিলে সে স্থানে সহজে কেহ যাইতেই পারেন না; কোন চাকরি খালি আছে কি না তাহার সংবাদও পাওয়া যায় না চাকরি পাওয়ত পরের কথা! তিনি একে গরিবের ছেলে, তাহাতে কোন আফিসের কাহারও সহিত পরিণয়-সম্বন্ধে তাঁহার কোন সম্বন্ধও নাই। সুতরাং তাঁহার চাকরি হইবে কি প্রকারে? বিশেষ ভালরূপ লেখা-পড়াও শিখেন নাই। ইউনিভারসিটির কোন পরোয়ানাও পান নাই; আফিসের কোন বড়-বাবুর সহিত কুটুম্বিতাও নাই। তথাপি কি করেন, সংসারের কষ্ট আর কোনরূপেই সহ্য করিতে না পারিয়া, কোনরূপে কিছু পাথেয় সংস্থান করিয়া—কলিকাতা-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেই সময় তাঁহার স্বদেশীয় একটী লোক কলিকাতায় সামান্য কর্ম্ম করিতেন। তাঁহার বাসার ঠিকানা গ্রামস্থ কাহারও অপরিজ্ঞাত ছিল না। তিনি কলিকাতায় আসিয়া তাঁহারই বাসায় উপস্থিত হইলেন, ও সেই স্থানেই থাকিয়া চাকরির উমেদারী করিতে লাগিলেন। সমস্ত দিবস আফিসে আফিসে ঘুরিয়া বেড়ান, কোন কোন আফিসের দুই এক জন বাবুর সহিত আলাপ-পরিচয় করেন, তাহাদের নিকট হইতে কোন স্থানে কোন চাকরি উপস্থত আছে কি না, তাহার সংবাদ লইতে চেষ্টা করেন। কিরূপ উপায় অবলম্বন করিলে একটী চাকরির সংস্থান করিতে পারিবেন, তাহার উপায় জিজ্ঞাসা করেন। কোন কোন আফিসের ভিতর প্রবেশ করিতেই পারেন না; দরজায় দরোয়ানের নিকট হইতে মিষ্ট কথা শুনিয়া ক্ষুণ্ণমনে আস্তে আস্তে সেই স্থান পরিত্যাগ করেন। এইরূপে ৫।৭ দিবস অতীত হইয়া গেল; কোনরূপ কর্ম্মের যোগাড় করিয়াই উঠিতে পারিলেন না। তাঁহার দেশস্থ ব্যক্তিও তাঁহার উপর কেমন কেমন বিরক্তিভাব প্রকা করিতে লাগিলেন। বোধ হইতে লাগিল, যে তিনি তাঁহাকে আর স্থান দিতে অপারক।

তখন অন্য উপায় না দেখিয়া, কি করিবে ভাবিতে ভাবিতে, পুনরায় আফিস-অঞ্চলের দিকে গমন করিলেন; এবং মনে মনে ভাবিলেন,—"যদি আজও কোনপ্রকার কর্ম্মের কিছুমাত্র যোগাড় না করিতে পারি, তাহা হইলে এ জগতে আর কাহাকেও আমার মুখ দেখাইব না; শে উপায় অবলম্বন করিয়া সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণা হইতে এড়াইব।" কিন্তু জগদীশ্বরের এমনি আশ্চর্য লীলা যে, আজ একটী বড়-আফিসের ভিত গমন করিবামাত্র সেই স্থানের একটী বাবু সহিত তাঁহার দেখা হইল। তাঁহার দুঃখে কথা সমস্ত শ্রবণ করিয়া যেন বাবুর দয়া হইয়াছে বোধ হইল। তিনি কি প্রকার ও কতদূর লেখা পড়া শিখিয়াছেন, বাবু তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু তাঁহার উত্তর শ্রবণে বাবুটী একটু মুখ বেঁকাইলেন, ও বলিলেন,—"এই সামান্য লেখা-পড়ায় তুমি কি চাকরি করিতে পারিবে?" তবে তাঁহার হাতের লেখা দেখিয়া বাবু অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, ও পরদিবস সেই স্থানে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিয়া দিয়া আপন কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। বাবুর এই কথা শ্রবণে তিনি মনে মনে অতিশয় আশ্বস্ত ও সন্তুষ্ট হইয়া সেদিবস আপন স্থানে চলিয়া গেলেন, ও তাঁহার গ্রামস্থ ব্যক্তির নিকট সমস্ত অবস্থা বলিলেন। তিনি ইহা শ্রবণে অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন, ও বলিলেন,—"বোধ হয়, সেই বাবুটীর তোমার উপর অতিশয় দয়া হইয়াছে। এখন কোন না কোন প্রকারে একটী চাকরির সংস্থান করিয়া দিলেও দিতে পারেন।"

আজ তাঁহার মনে যেন একটু সাহস হইল, হৃদয় সবল হইল। নানা-প্রকার আশার বশবর্ত্তী হইয়া রাত্রে শয়ন করিলেন। কিন্তু নিদ্রা আসিল না। নানা-প্রকার চিন্তা ও আশা আসিয়া

হৃদয় অধিকার করিল, ও কখন রাত্রি প্রভাত হইবে, তাহাই দেখিতে লাগিলেন; কখন যাইয়া সেই বাবুটীর আফিসে উপস্থিত হইতে পারিবেন, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাত্রি যেন আর কিছুতেই প্রভাত হইতে চাহিল না। অদ্য রাত্রি যে কতই বড় হইয়াছে, তাহা ভাবিয়াই স্থির হইল না। পরিশেষে, অনেক কষ্টে, রাত্রি প্রভাত হইল। তখন তিনি সকাল সকাল স্নান-আহার করিয়া, আফিস-অভিমুখে চলিলেন। যখন সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন আর কেহই আইসে নাই; তিনিই সকলের অগ্রে যাইয়া সেই স্থানে বসিয়া রহিলেন। ইহার প্রায় দুই ঘণ্টা পরে একখানি গাড়িতে সেই বাবু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বাবুকে দেখিবা-মাত্রই মস্তক অবনত ও হস্ত উত্থিত করিয়া তাঁহাকে বন্দনা করিলেন। বাবু গাড়ি হইতে নামিয়া আফিসের ভিতর প্রবেশ করিলেন, ও তাঁহাকে পশ্চাৎগামী হইতে হইতে বলিলেন। তিনিও বাবুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ আফিসের ভিতর প্রবেশ করিলে, তাঁহাকে এক স্থানে বসিতে বলিয়া নিজে আপন কার্য্যে ব্যস্ত হইলেন। বাবু তাঁহার নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিতে না বসিতেই এক এক করিয়া অনেকেই তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতে লাগিলেন। সকলেই তাঁহাকে নানা-প্রকারের কার্য্যের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। অদ্য কোন্ কোন্ দ্রব্য খরিদ হইবে, কোন্ কোন্ দ্রব্য কি পরিমাণে বাজারে আমদানি আছে, গত কল্য অপেক্ষা অদ্য কোন্ কোন্ দ্রব্যের দাম কম বা বেশী হইয়াছে, অদ্য কাহাকে কাহাকে টাকা দেওয়া যাইতে পারে, কত টাকা এখন ব্যাঙ্ক হইতে আনা আবশ্যক ইত্যাদি নানা বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে, তাহার উপস্থিত মত আদেশ দিতে দিতে, ও আবশ্যকীয় কাগজ-পত্রে স্বাক্ষর করিতে করিতে, প্রায় দুই ঘণ্টাকাল অতিবাহিত হইয়া গেল। চাকরি-প্রত্যাশী ব্যক্তি সেই স্থানে বসিয়া বসিয়াই দেখিতে লাগিলেন; ভাবিলেন,—"এত বড় প্রকাণ্ড আফিসের সমস্ত ভারই দেখিতেছি, ইহাঁর উপর। প্রকৃত প্রস্তাবে বলিতে গেলে এই প্রকাণ্ড আফিস ইহাঁরই। যখন ইনি আমার উপর প্রসন্ন হইয়াছেন, তখন আর ভাবনা কি? অদ্য নিশ্চয়ই আমি কোন না কোন একটা চাকরি পাইবই পাইব।" তিনি যখন এই প্রকার ভাবিতেছেন, তখন বাবু তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"যদু।"

পাঠকগণ আপনারা এখন তাঁহার নাম জানিতে পারিলেন। ভাবিয়াছিলাম, ইহাঁর নাম আমি আপনাদিগের নিকট গোপন রাখিয়া কেবল ইহাঁর কার্য্য-কলাপই প্রকাশ করিব; কিন্তু আফিসের বড়-বাবু ইহাঁর সহিত কথোপকথনে যখন ইহার নাম জানিতে পারিয়াছেন, ও আপনাদিগের নিকট হঠাৎ তাহার কতক অংশ প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন, তখন আর গোপন রাখিয়া লাভ কি? সমস্ত প্রকাশ করিয়া বলাই ভাল। এখন আপনারা সকলেই শুনিয়া লউন যে, ইহাঁর নাম, যদুনাথ নাগ।

বাবু কহিলেন,—"যদু, মাসিক কয়টী টাকার সংস্থান হইলে তোমার নিজের ও তোমার বৃদ্ধা মায়ের খরচ-পত্রের অনাটন হয় না?"

যদু কহিলেন,—"মহাশয়, এখন আমাদিগের যেরূপ কষ্ট হইয়াছে, তাহাতে এখন আমি যাহাই পাইব, তাহাতেই আমার বিশেষ সাহায্য হইবে! আপনি অনুগ্রহ-পূর্ব্বক আমার নিমিত্ত যে কোন উপায় স্থির করিবেন, তাহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট হইবেক।"

যদুর এই কথা শুনিয়া বাবু কহিলেন,—"এখন আমার এই আফিসের ভিতর কোন কর্ম্ম খালি দেখিতেছি না। তবে যখন তোমার উপযুক্ত কোন কর্ম্ম খালি হইবে, তখন আমি তোমার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা করিব। এখন আপাততঃ বাজারের একটী কর্ম্ম খালি আছে; একটী ওজন-সরকার প্রায় মাসাবধি হইল মরিয়া

গিয়াছে, সেই স্থানে আজ পর্য্যন্ত অন্য কোন লোক নিযুক্ত হয় নাই; তুমি এখন সেই কর্ম্মই কর। কিন্তু তাহার বেতন অতি অল্প, আট টাকা মাত্র। এখন অল্প দিবসের নিমিত্ত তুমি সেই কার্য্যেই প্রবৃত্ত হও, পরে আফিসের ভিতর কোন কর্ম্ম খালি হইলে তোমারই নিমিত্ত আমি সাহেবদিগকে বলিব।"

যদুনাথ তাহাতেই সম্মত হইলেন; তাঁহার সেই দুঃসময়ে এই আট টাকাকেই যথেষ্ট জ্ঞান করিলেন।

তখন বাবু অন্য আর একটী বাবুকে ডাকাইলেন। তিনি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাবু যদুকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—"দেখুন হেম বাবু, এই লোকটীর কষ্টের কথা শুনিয়া আমার অতিশয় কষ্ট বোধ হইয়াছে। আমার বিবেচনায় ইহাঁকে কোন-প্রকারে সাহায্য করিতে পারিলে বড় ভাল হয়।"

এই কথা শুনিয়া হেম বাবু কহিলেন,—"তাহার আর ভুল কি? ইঁহার কষ্টের লাঘব যাহাতে হয়, তাহা করা একান্ত কর্ত্তব্য।" বাবু তাহার প্রত্যুত্তরে কহিলেন,—"দেখুন হেম বাবু, ইনি অতি উত্তম লিখিতে পারেন। ইঁহার হাতের লেখা দেখিয়া আমার ইচ্ছা হইয়াছে যে, আমি ইঁহাকে আপিসের ভিতরেই কোন না কোন কার্য্যে রাখি। কিন্তু এখন কোন স্থানে কোনরূপ খালি দেখিতে পাইতেছি না বলিয়াই, আপনাকে ডাকাইয়াছি; আপনার নিকট যে একটি ওজন-সরকারের পদ খালি আছে, আপাততঃ এখন আপনি ইঁহাকে সেই কার্য্যই নিযুক্ত করিয়া লউন। পরে সুযোগ-মত আমি ইঁহাকে আপিসেই লইয়া আসিব।'

এই কথা শুনিয়া হেম বাবু কহিলেন,—"আমার অধীনে সেই ওজন-সরকারের কর্ম্মটি এত দিবস খালি ছিল; কিন্তু প্রায় এক ঘণ্টা হইল, বড়-সাহেব অন্য আর এক জন লোককে সেই কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া আমার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন। তিনি এখনও আমার ঘরে বসিয়া আছেন; আর একটু অগ্রে হইলে একার্য্য অনায়াসেই হইতে পারিত। কিন্তু এখন আর কি করা যাইতে পারে?"

বাবু কহিলেন,—"সে কি? সাহেব সেই কার্য্যে নিজেই লোক নিযুক্ত করিয়াছেন আর আমি ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিলাম না! যাহা হউক, সে বিষয় পরে দেখা যাইবে; এখন ইহাঁকে আপনি লইয়া যান, ও যেরূপ উপায়ে ইহাঁর কষ্টের কিছু লাঘব হয়, তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিন।"

হেম বাবু কহিলেন,—"আচ্ছা, তাহাই হইবে। কোনরূপে না কোনরূপে আমি ইহাঁর একপ্রকার যোগাড় করিয়া দিব।" এই বলিয়া তিনি যদুকে সঙ্গে লইয়া সেই ঘর হইতে বহির্গত হইলেন, ও আপনার ঘরে প্রবেশ করিলেন। যদু তাঁহার অদৃষ্টের অবস্থা ভাবিতে ভাবিতে হেম বাবুর ঘরের ভিতর গিয়া তাঁহার পার্শ্বদেশে দণ্ডায়মান রহিলেন।

হেম বাবু আর একটী লোককে ডাকাইলেন। তিনিও তৎক্ষণাৎ আসিয়া বাবুর নিকট উপস্থিত হইলেন। হেম বাবু যদুর প্রতি লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে কহিলেন,—"এই লোকটীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাউন, ইহাঁকে উত্তমরূপে কর্ম্মকার্য্য শিক্ষা দিউন। অন্যান্য ওজন-সরকারদিগকে বলিয়া দেন যে, যে দিবস যাহার হাতে ওজনের ভার থাকিবে, তিনি সেই দিবস ইহাঁকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবেন, এবং যে যে রূপ কর্ম্ম করিতে হয়, তাহা ইহাঁকে উত্তমরূপে শিখাইয়া দিবেন। আর যাহাতে ইহাঁর কোন-প্রকারে কিছুমাত্র কষ্ট না হয়, সেই বিষয়ে বিশেষ মনোযোগী থাকিবেন। কারণ, বড় বাবু ইহাঁর কষ্টের কোনরূপ কারণ জানিতে পারিলে আপনাদিগের তাহা মঙ্গলদায়ক হইবে না।" এই বলিয়া তিনি যদুনাথকেও সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"আপনার উপর বড়-বাবুর যেরূপ অনুগ্রহ হইয়াছে, তাহাতে আপনি যদি এই সময় হইতে বুঝিয়া চলিতে পারেন, তাহা হইলে আর আপনার কোন কষ্টই থাকিবে না; দিন দিন শ্রীবৃদ্ধিই হইতে থাকিবে। আর, যদি আপনি আপনার এই অবস্থা ভুলিয়া গিয়া, নানা প্রকার লোভ-সম্বরণ করিতে না পারিয়া, অন্য রাস্তা অবলম্বন করেন, তাহা হইলে আপনার বর্ত্তমান কষ্ট অপেক্ষাও শতগুণে কষ্টের বৃদ্ধি হইবে। আমি অধিক আর কিছু বলিতে চাহি না; বিশেষ বিবেচনা করিয়া সর্ব্বদা কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিবেন।"

অদৃষ্ট।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

আমার পুত্র-সন্তান।

মহামায়ার গহনা প্রস্তুত হইলে, আমি অতি কষ্টে ডাক্তার-সাহেবের নিকট হইতে ১৫ দিবসের ছুটী লইয়া গহনাগুলি সমভিব্যাহারে বাটী গমন করিলাম। ইতিপূর্ব্বে ওলাউঠায় কাজ করিবার সময় কতবার দু'চারি দিনের জন্য ছুটী লইয়া বাটী আসিতাম; কিন্তু এক্ষণে ১৫ দিবসের ছুটী দিবার জন্য ডাক্তার-সাহেবকে কলিকাতায় চিঠি লিখিতে হইল। ইহার কারণ তৎকালে সকলেই জানিতেন। বোধ হয় সে বিষয়ে কোন কথা অদ্যাপিও নির্ভয়ে প্রকাশ করা যায় না। সে যাহা হউক বাটী আসিলাম। আসিয়া মায়ের নিকট সমস্ত গহনাগুলি দিলাম। ইতিপূর্ব্বে মাতা আমাকে সর্ব্বদাই তিরস্কার করিতেন,—বৌকে গহনা দিই না কেন; আমি বরাবর বলিতাম,—"মা, আমার সঙ্গতি হইলে এ বিষয়ে আপনার ক্ষোভ রাখিব না।" আপাততঃ মাতা গহনাগুলি দেখিয়া যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইলেন, এবং আমার স্ত্রীর নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন। আমি শুনিয়া অবিলম্বে বাহির-বাটী যাইব ভান করিয়া, এক দরজা হইতে বাহির হইয়া অপর এক দরজা দিয়া, দরদালানে প্রবিষ্ট হইলাম। মাতা তৎকালে দরদালানের উত্তরে যে কুটুরি ছিল, সেই কুটুরিতে বসিয়াছিলেন। মহামায়া আসিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। কি কথা ও কি ঘটনা হয় না হয়, আমি একটা জানালার অন্তরালে থাকিয়া দেখিতেছিলাম। মহামায়া মাতার নিকট আসিলে, মা কহিলেন,—"বৌমা, এত দিনের পর আমার একটী ইচ্ছা সফল হইল। কিন্তু যতদিন তোমার কোলে একটী পুত্র-সন্তান না দেখিব, ততদিন আমার সমস্ত আশা পরিপূর্ণ হইবে না।" মহামায়া মাতার কথা শুনিয়া লজ্জায় জড় সড় হইয়া, তাঁহার নিকট বসিল। লজ্জার প্রধান কারণ এই, মহামায়া তখন ৪ মাস গর্ভবতী। অতঃপর মাতা গহনার বাক্সটী খুলিয়া যে স্থানে যে গহনা, তাহা মহামায়ার অঙ্গে সন্নিবেশিত করিয়া দিলেন। মহামায়া ইহাতে যে কিরূপ আহ্লাদিত হইল, তাহা কথায় বর্ণনা করা যায় না। সমস্ত অলঙ্কার পরান হইলে মহামায়া অঞ্চলের অগ্রভাগ গলায় দিয়া ভূমিষ্ট হইয়া মাতাকে প্রণাম করিল। মাতা কহিলেন,—"বাছা, চিরজীবী হইয়া থাক। আমি যেরূপ গহনা দিলাম, অম্নি তোমার একটী ছেলে আমার কোলে যদি দিতে পার, তাহা হইলে বুঝিব, তুমি আমার এ ঋণ পরিশোধ করিলে।" মহামায়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল,—"আপনি যে গহনা দিলেন, ইহাই কি বড় দান করা হইল? আপনি যে নিত্য নিত্য আমাদের কল্যাণে শিবপূজা না করিয়া ও আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ না করিয়া জলগ্রহণ করেন না, সে সমস্ত কি কিছু নয়? আমি তো কখনও অলঙ্কার চাহিনে, এবং চাইব এরূপ মনেও করি নাই। পরমেশ্বর আপনাকে অধিক দিন বাঁচাইয়া রাখুন যে, আপনার পদ-সেবা করিয়া আমি চরিতার্থ হই।" এই কথা শ্রবণ করিয়া মাতা কহিলেন,—"বাছা, দীর্ঘজীবী হইয়া থাক। এ সংসারে আমার আর কোন প্রার্থনীয় পদার্থ নাই; এক মাত্র এই চাই যে, তোমার কোলে একটী পুত্র-সন্তান দেখিয়া মরি।"

এরূপ কথোপকথনের পর মহামায়া যেমন উঠিয়া আসিবে অমনি মাতা টের পাইলেন যে, মহামায়া মাটিতে দুই হাত দিয়া সেই ভরে উঠিল। মাতা দেখিয়া অবিলম্বে কহিলেন,—"না, একটু বসো; এখনও অনেক বেলা আছে, সংসারের কার্জকর্ম্ম করিবার সময় বোয়ে যায় নাই।" মহামায়া এই কথা শুনিয়া বসিল। তাহার পর কি কথা হইবে তাহার আভাস পাইয়া, আমি জানালার অন্তরাল হইতে প্রস্থান করিলাম।

পর দিবস প্রাতে গাত্রোত্থান করিয়া দেখিলাম

মাতাই সমস্ত সংসারের কার্য্য করিতেছেন। অদ্য আমার উঠিতে কিঞ্চিৎ বেলা হইয়াছিল। কিন্তু যতই সকালে উঠি না কেন, মহামায়া চিরকালই আমার অগ্রে উঠিত। আমি মহামায়াকে কহিতাম,—"তুমি উঠিবার সময় আমাকে জাগাইয়া দেও না কেন?" মহামায়া কহিত,—"ব্রাহ্মণের নিদ্রাভঙ্গ করা বড় পাপ।" অদ্য আমি অন্যান্য দিন অপেক্ষা আরও অধিক বেলায় উঠিলাম। উঠিয়া যাহা দেখিলাম, তাহা বলিয়াছি; অর্থাৎ মাতা সমস্ত গৃহ,—কার্য্য করিতেছেন, মহামায়াকে কোন কাজে হস্তক্ষেপ করিতে দিতেছেন না। আমি কহিলাম,—"মা, আপনি এসব কার্য্য কেন করিতেছেন?" মাতা কহিলেন,—"রোজ রোজ একজনে এ সমস্ত কাজ কেমন করিয়া করিবে?" দ্বিতীয় দিবস মাতাকে ঠিক ঐরূপ কার্য্য করিতে দেখিলাম, সে দিবসও আমি কিছু কহিলাম না। কিন্তু তৃতীয় দিবসও মাতাকে ঐরূপ কার্য্য করিতে দেখিয়া আমি কহিলাম,—"মা, বিবাহ করিতে যাইবার সময় আপনার দাসী আনিতে যাইব বলিয়াছিলাম, কিন্তু এক্ষণে সে দাসীকে কাজ করিতে না দিয়া আপনি কেন এ সমস্ত কাজ করিতেছেন?" যেরূপ কখন কখন রৌদ্র ও বৃষ্টি এক সময়ই হইয়া থাকে, সেইরূপ মাতা কতক রাগ ও কতক আহ্লাদের সহিত কহিলেন,—"তোর সে কথায় কাজ কি! তোর তো সময়ে চারটি ভাত পেলেই হোলো! কে কি করে না করে, কে রাঁদে না রাঁদে, তাতে তোর দরকার কি?" আমি মাতার কথা শুনিয়া জানিতে পারিলাম যে, তিনি মহামায়ার অবস্থার কথা জানিতে পারিয়াছেন। মাতা ইতিপূর্ব্বে কখন আমাকে তুই বলিয়া কথা কহেন নাই; কিন্তু অদ্য তাঁহার মুখে তুই কথা শুনিয়া আমার যৎপরোনাস্তি আহ্লাদ ও লজ্জা হইল। ইহার কারণ পাঠকবর্গ অনায়াসে জানিতে পারিবেন। আমি মাতার কথা শুনিয়া বাহির্বাটি চলিয়া গেলাম। মনে করিলাম, আর কখন বাটীর ভিতরে যাই না। সকলেই অনুরোধ মানে, কিন্তু ক্ষুধা আহার ভিন্ন আর কিছুই মানে না। কি করি, একটা সময় বাটীর অভ্যন্তরে প্রবেশ-পূর্ব্বক আহার করিয়া আসিলাম।

যথাসময়ে মহামায়ার একটী পুত্র-সন্তান জন্মিল। তাহার নাম কি হইবে, এইজন্য প্রতিবাসিবর্গের মধ্যে তর্কবিতর্ক হইতে আরম্ভ হইল। কামিনিবল্লভ, সরোজিনীকান্ত, হৃদয়নাথ, মোহিনমোহন ইত্যাদি বহুতর নাম প্রস্তাবিত হইতে লাগিল। কিন্তু মাতা কহিলেন,—"আমি ও সব নাম রাখিতে চাহি না। ছেলেটী যখন বড় হইবে তখন কামিনি কামিনি বলিয়া ডাকিলে কি ভাল শুনাইবে? দেবতার নামের মতন নাম আর নাই। দেবতার নাম কখন বুড়ো হয় না। বিশেষ ও আমার পৌত্র, আমি উহার নাম রাখিব।" মাতা সেই অবধি পুত্রকে হরিপদ বলিয়া ডাকি লাগিলেন। সেই অবধি পুত্রের নাম হরিপদ হইয়া গেল।

ভূমিষ্ঠ হওয়া অবধি, হরিপদর পদ আর পৃথিবীতে সংলগ্ন হয় না; মাতা তাহাকে সমস্ত দিবস কোলে করিয়া রাখিতেন। রাত্রি হইলে নিজের বুকের উপর শয়ন করাইয়া রাখিতেন। ইতিপূর্ব্বে মাতার সংসারের উপর ঔদাস্য জন্মিয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে তাঁহার মনে আর সেরূপ ভাবের কোন চিহ্ন লক্ষিত হইত না। অগ্রে বলিতেন, বধূ মাতার কোলে একটী পুত্র-সন্তান দেখিয়া মরিতে পারিলে আমার জন্ম সার্থক হয়। এইক্ষণে কহিতে লাগিলেন, উহার আদ আদ কথা শুনিয়া আমার মরিতে ইচ্ছা হইতেছে না।

আমি যখন বাটীর ভিতর যাইতাম, যদি মাতার ক্রোড়ে ছেলেটীকে দেখিতাম, অমনি অবিলম্বে বাহির-বাটিতে ফিরিয়া আসিতাম। মাতাও জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার সম্মুখে আমার পুত্রকে দেখিলে আমি অত্যন্ত লজ্জিত হই। এক দিবস যে সময় আমাদিগের সচরাচর

আহার হইত, তাহার অনেক পূর্ব্বে মাতা আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। এস্থানে বলা উচিত যে, বালকের দুগ্ধের নিমিত্ত আমায় একটি গরু কিনিতে হইয়াছিল। সেই গরুর দুধ খাইয়াই পুত্রটি জীবিত ছিল। মাতা আহারের সময়ের পূর্ব্বে আমাকে কেন ডাকিলেন, আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। আমি নিকটে গেলে মাতা একখানি আসন দিয়া কহিলেন,—"বাপু, বসো।" এবং অবিলম্বে একখানি রিকিবিতে করিয়া একখানি দুধের শর ও একটু চিনি খাইতে দিলেন। কহিলেন,—"বাপু, এর চাইতে আর একখানি ভাল শর আছে, তাহাও তোমাকে দিতেছি।" এই বলিয়া নিকটবর্ত্তী এক কুটুরিতে গমন করিলেন ও পুত্রটি আনিয়া আমার কোলে দিলেন। কহিলেন,—"বাছা, এ শরের মতন পৃথিবীতে আর কোনই মিষ্টি জিনিষ নাই।" ছেলেটি কোলে রাখিলে তাহার মুখ দেখিয়া আমার চক্ষু হইতে এক বিন্দু জল পড়িল। তদ্দর্শনে মাতা, বালকটিকে কোলে লইয়া, একবার তাহার ও একবার আমার মুখ চুম্বন করিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

অশান্তির সূত্রপাত।

পূর্ব্বাধ্যায়ে ইতিহাস কিঞ্চিৎ অগ্রে গিয়া পড়িয়াছে। এক্ষণে যাহা বলিতে চলিলাম, তাহা মহামায়ার অলঙ্কার পাইবার কয়েক দিবস পরেই এবং হরিপদ জন্মিবার কয়েক মাস পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল।

অলঙ্কারগুলি পাওয়া অবধি মহামায়ার এক-বার পিত্রালয় যাইতে বড় ইচ্ছা হইল। বস্তুতঃ সেগুলি অতি সুন্দর হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন তাহার অনুরোধে আমি একটি রূপার গ্ল্যাশ ও একটি বাটি প্রস্তুত করাইয়াছিলাম। তাহার বড় ইচ্ছা হইল, একবার বাপের বাড়ী গিয়া আমার তথায় লইয়া যাইবে, ও ঐ গ্ল্যাশে জল ও ঐ বাটিতে তরকারি খাইতে দিবে। আমি কহিলাম,—"গত বার তোমার বাপের বাটি গিয়া যে ঘটনা হইয়াছিল, তাহা কি তোমার মনে নাই?" কিন্তু আমার কথায় কোন ফল দর্শিল না। শুনা যায়, মহাদেব নিমন্ত্রণোপলক্ষে আপন স্ত্রীকে পিত্রালয়ে যাইতে প্রথমতঃ নিষেধ করিয়াছিলেন; কিন্তু পরিশেষে তাঁহাকে স্ত্রীর মতে মত দিতে হইয়াছিল। কোথায় মহাদেব, আর কোথায় কীটানুকীট মনুষ্য; কিন্তু স্ত্রীলোকের চরিত্র সর্ব্বকালে ও সর্ব্বস্থানে সমান। সুতরাং আমাকে অবশেষে তাহার পিত্রালয় যাইবার অনুমতি দিতে হইল। জয়দুর্গা, মহামায়ার অপেক্ষা বয়সে ছোট হইলেও, গ্রামস্থ সকল স্ত্রীলোকে তাঁহাকে অধিক খাতির করিত। নিমন্ত্রণ খাইতে গেলে তাঁহার পাতে অধিক মৎস্য দিত, এবং সকলে আসিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিত। ইহার কারণ এই, তাঁহার যত অলঙ্কার ছিল, সে গ্রামে আর কাহারও তত ছিল না।

স্ত্রীলোকেরা পরস্পরকে গহনা দেখিয়া খাতির করে; সুতরাং জয়দুর্গাকেও সকলে খাতির করিত। মহামায়ার দেখিয়া শুনিয়া দুঃখ হইত; কিন্তু আমার অবস্থা ভাল নয় বলিয়া, কখনও আমার নিকট গহনা চাহে নাই। এক্ষণে একেবারে সমস্ত গহনা—বরং জয়দুর্গার অপেক্ষা দুই তিন খানি বেশী হওয়ায়, সে আর বাপের বাড়ী যাইবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না। বিশেষ গহনাগুলি সমস্ত নূতন ও ঝক্‌মক্ করিতেছে; পাছে ব্যবহার করিলে সেগুলির উজ্জ্বলতা কমিয়া যায়, সেইজন্য প্রথম দিন ব্যতীত গহনাগুলি আর বাটীতে পরিত না। পিত্রালয় যাইতে অত্যন্ত উৎসুক দেখিয়া, আমি পরিশেষে তথায় যাইতে অনুমতি দিলাম। সেই দিবস বৈকালেই মহামায়া পাড়ার একজন বৃদ্ধা কায়স্থের বিধবা স্ত্রীলোকের সহিত বাপের বাড়ী চলিয়া গেল। যাইবার সময় আমাকে কহিল,—"আমার মাথা খাও, খবর না পাইলে কোন স্থানে যাইও না। আমি কাল না পারি, পরশু দিন পত্র লিখিবই

লিখিব; এবং রামের মায়ের হাতে দিয়া পত্র পাঠাইয়া দিব।" রামের মা সেই কায়স্থের বিধবা স্ত্রীলোকটী।

আমার যদিও ছুটীর আর অধিক দিবস ছিল না, তথাপি মহামায়ার খাতিরে আমাকে বাটী থাকিতে হইল। আমি উপরে যাহা বলিয়াছি, মহামায়া পিত্রালয়ে গেলে, তাহাই ঠিক ঘটিল। এবার পাড়ার সমস্ত স্ত্রীলোক আসিয়া মহামায়া কাছেই বসা-ওঠা করিতে লাগিল, এবং তাহারি সহিত সমস্ত কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। জয়দুর্গার অলঙ্কারগুলি পুরাতন হওয়ায় রং খারাপ হইয়া গিয়াছিল। এক সময় সেগুলিও যে উজ্জ্বল ছিল, তাহা কেহই ভাবিয়া দেখিল না। অনেকে এ পর্য্যন্ত কহিল যে,—"জয়দুর্গার অলঙ্কার সমস্ত সোণার নহে। বড়মানুষের হাতে পিতলের গহনা থাকিলেও সকলে সোণা বলিবে। এজন্যই জয়গোপাল কতক পিতলের ও কতক সোণার দিয়াছে।" সে যাহা হউক, মহামায়ার এরূপ আদর বাড়িল যে, সকলেই তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতে লাগিল।

প্রথমতঃ মহামায়ার গহনা দর্শনে, দ্বিতীয়তঃ প্রতিবাসিবর্গের মধ্যে তাহার আদর-বৃদ্ধি হওয়ায়, জয়দুর্গার মনে মনে যৎপরোনাস্তি হিংসার উদ্রেক হইল। ভাবিতে লাগিল, কিরূপে মহামায়াকে অপদস্থ করিবে, কিরূপেই বা সকলের নিকটে তাহাকে ঘৃণার্হ পদার্থ বলিয়া বুঝাইয়া দিতে পারিবে। ভাবিয়া ভাবিয়া এক উপায় উদ্ভাবন করিল; সেটি এই;—

পল্লীগ্রামে গৃহস্থ-লোকের বাটীতে পাচক-পাচিকা থাকে না। বাটীর স্ত্রীলোকেরাই রন্ধনাদি করিয়া থাকে। কোন কারণ-বশতঃ বাটীর স্ত্রীলোকে রন্ধনাদি করিতে না পারিলে প্রতিবাসী বা আত্মীয়বর্গের মধ্য হইতে কাহাকে না কাহাকে ডাকিয়া আনে। এত দিবস জয়দুর্গা ও আমার শাশুড়ী এই দুই জনে রন্ধনাদি করিতেন; কিন্তু মহামায়া পিত্রালয়ে আসিলে এক দিবস সে ও এক দিবস জয়দুর্গা পর্য্যায়ক্রমে রন্ধনক্রিয়া করিতে লাগিল। যে দিবস জয়দুর্গা রাঁধিত, সে দিবস সকলেই আহার করিয়া সন্তুষ্ট হইত; কিন্তু যে দিবস মহামায়া রাঁধিত, সে দিবস কেহই আহার করিতে পারিত না। আহার করা দূরে থাকুক, লঙ্কা ও লবণের আধিক্য-প্রযুক্ত কেহই সে রান্না স্পর্শ করিতে পারিত না। মহামায়া প্রথম দিবস এরূপ দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইল; ভাবিল, ভ্রমক্রমে দু'বার লঙ্কা ও লবণ দিয়াছি। তাহার দ্বিতীয় পালার দিবসে অত্যন্ত যত্নপূর্ব্বক রন্ধন করিল; কিন্তু তথাপি সে দিবসও কেহ আহার করিতে পারিল না। তৃতীয় পালার দিবস তরকারিতে একেবারে লঙ্কা ও লবণ দিল না; কিন্তু তাহাতেও ফলের কোন ইতর-বিশেষ হইল না। সে দিবসও কেহ আহার করিতে পারিল না। তবে পূর্ব্বের দুই দিবসের ন্যায় একেবারে অস্পৃশ্য হয় নাই; যাহাদিগের ক্ষুধা প্রবল ছিল, তাহারা তেঁতুল মাখিয়া কথঞ্চিৎ খাইতে পারিল।

এত যত্ন করিয়া রন্ধনাদি করে, তথাপি কেন এরূপ অখাদ্য ও অস্পৃশ্য হয়, এই ভাবিয়া মহামায়া প্রায় পাগলের ন্যায় হইল। এক্ষণে চিন্তা করিয়া স্থির করিল, রন্ধনশালায় প্রাতঃকালে প্রবেশ করিয়া সকলের আহারাদি যতক্ষণ না হইবে, ততক্ষণ আর তথা হইতে বাহির হইবে না। যখন পুনরায় তাহার পালা পড়িল, তখন সেইরূপ করিল। রন্ধনাদি খারাপ হইল না। প্রথমতঃ সকলে আহার করিয়া কহিল,—"আজ বুঝি জয়দুর্গা রাঁধিয়াছে!" যখন শুনিল, তাহা নহে, মহামায়াই রন্ধন করিয়াছে; তখন তাহারা কহিল,—"মহামায়া আগেও ভাল রাঁধিত, এখনও যত্ন করিলে ভাল রাঁধিতে পারে; তবে যত্ন করে না বলিয়াই খারাপ হয়।" মহামায়া মনে স্থির করিয়াছিল, সে যখন রন্ধনাদি করিতে করিতে কোন কার্য্য-বশতঃ গৃহান্তরে যায়, সেই সময় জয়দুর্গা তরকারিতে লবণ ও লঙ্কা মিশাইয়া দেয়; অদ্যকার ঘটনায় তাহার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে,

ঠিক জয়দুর্গা সেইরূপই করে। তখন তাহার মাতাকে কহিল,—"মা, আমি রাঁধিলে কেন ভাল হয় না, তাহা এতদিনের পর টের পেয়েছি। আমি রাঁধিয়া যখন গা ধুইতে বা অন্যত্রে যাই, তখন জয়দুর্গা আসিয়া নুন ও লঙ্কা মিশাইয়া দেয়।" মহামায়ার কথা শুনিয়া আমার শাশুড়ী-ঠাকুরুণ কিঞ্চিৎ কুপিত হইয়া কহিলেন,—"তা কি কখন হতে পারে; আর কেউ কি এমন কাজ কর্ত্তে পারে!"

মহামায়া।—যদি তোমাকে দেখাইয়া দিতে পারি, তবে বিশ্বাস করবে কি না?

মাতা।—নিজের চোকে দেখলে কে না বিশ্বাস করে?

মহা।—তবে পরশু দিন আমার রাঁধিবার পালা, সেই দিনই দেখাইয়া দিব।

আমার শ্বশুরবাড়ীর রন্ধনশালার তিন দিকে ইটের প্রাচীর, সম্মুখে বাঁশের বেড়া; সুতরাং ঘরের অভ্যন্তরে যে সকল কথা হয়, সম্মুখের রোয়াকে দাঁড়াইয়া সমস্তই শুনা যায়। যখন মহামায়া তাহার মাতার সহিত উক্তরূপ কথাবার্ত্তা কহিতেছিল, তখন জয়দুর্গা রোয়াকে দাঁড়াইয়া সমস্তই শুনিয়াছিল। শুনিয়া, জয়দুর্গা মনে মনে স্থির করিল,—এ ফিকির আর খাটিবে না, অন্য এক ফিকির করিতে হইবে।

এইস্থানে, লুক্কাইত হইয়া অপরের কথা শ্রবণ করা সম্বন্ধে কিছু বলিতে ইচ্ছা হইতেছে। কথাটি এই;—লুক্কাইত হইয়া শুনিতে গেলে সমস্ত কথা শুনা যায় না; সচরাচর যেগুলি নিজের বিরুদ্ধে, সেইগুলিই স্পষ্ট শুনা যায়, ভালগুলি শুনা যায় না। লোকে বলে,—বধিরে গালি অনায়াসে শুনিতে পায়, কিন্তু প্রশংসা শুনিতে পায় না। লুক্কাইত হইয়া শোনা স্ত্রীলোকদিগের স্বভাবসিদ্ধ। অতএব আমি তাঁহাদিগকে বিনয়পূর্ব্বক বলিতেছি যে, যাঁহাদিগের লুক্কাইত থাকিয়া কথোপকথন শুনা রোগ বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে, তাঁহারা যেন সম্মুখে উপস্থিত হইয়াই সমস্ত শুনেন। তাঁহারা বলিতে পারেন যে, প্রকাশ্য হইয়া শুনিতে গেলে নিজ নিজ নিন্দার কথা শুনিতে পাইবেন না, কারণ উপস্থিত ব্যক্তিকে কেহ নিন্দা করে না। এ বিষয়ে অবলাদিগকে একটা প্রচলিত কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া উচিত যে, 'অসাক্ষাতে লোকে রাজার মাকেও ডাইন বলে।' যে স্থলে নিজের দোষ বলিয়া দিলে, সে দোষ সে সংশোধন করিবে এরূপ সম্ভাবনা থাকে, সেস্থলে তাহাকে বলিয়া দেওয়া উচিত। কিন্তু পুরুষের মধ্যেও এরূপ লোক বিরল; স্ত্রীলোকের মধ্যে একবারেই নাই। সুতরাং অপরের মুখে নিজের দোষ শ্রবণ করায় স্ত্রীলোকের পক্ষে কোন ফলদায়ক নহে। কেবল নিজের মন খারাপ হয়, ও যে নিন্দা করে, তাহার উপর বিদ্বেষ জন্মে।

* * * * *

জয়দুর্গা মহামায়ার রন্ধনে লবণ ও লঙ্কা দেওয়া বন্ধ করিল। এইরূপে ৫।৭ দিবস অতিবাহিত হইল। তখন উভয়েরি রন্ধন সমান হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণী মহামায়াকে কহিলেন,—"কৈ মহামায়া, আর তো তোমার রান্না খারাপ হয় না? জয়দুর্গাও তো বাড়ী আছে! যদি সেই লবণ ও লঙ্কা মিশাইয়া দিত, তবে এখন কেন দেয় না? আমি একথার বাষ্পমাত্রও জয়দুর্গাকে বলি নাই। তুমি বলিতে পারিবে না যে, আমার নিকট শুনিয়া সে লঙ্কা ও নুন দেওয়া বন্ধ করিয়াছে।" মহামায়া শুনিয়া কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইল; কিন্তু তাহার মনের সংস্কার দূর হইল না। বস্তুতঃ বাটীর সকলেই জয়দুর্গাকে উকিলের স্ত্রী বলিয়া অত্যন্ত খাতির করিত; সে যে কোন মন্দ কাজ করিবে, কাহারও মনে এ ধারণা হইত না।

মহামায়াকে অপদস্থ করিবার জন্য জয়দুর্গা যে নূতন উপায় উদ্ভাবন করিল, সে বড় ভয়ানক উপায়। আমার শ্বশুরবাটীর লোকের দুবেলা অনায়াসে সঙ্কুলান হইতে পারে, প্রত্যহ এইরূপ

পরিমাণে মৎস্য খরিদ করা হইত। জয়দুর্গা যে দিবস রন্ধনাদি করিত, সে দিবস কর্ত্তা ও গৃহিণীর পাতে যথেষ্ট মৎস্য দিত; আত্মবিস্মৃতও হইত না, অর্থাৎ নিজের জন্যও বিলক্ষণ রাখিত। মহামায়া কখন পাইত, কখন পাইত না; অপরাপর লোকে একটু ঝোল ও দু'এক টুক্‌রা আলু বা বেগুণ ভিন্ন আর কিছুই পাইত না। ইহা কর্ত্তা বা গৃহিণী দেখিতে আসিতেন না। তাঁহারা নিজে যথেষ্ট পাইতেন, সুতরাং মনে করিতেন সকলেই সেইরূপ পায়।

কিন্তু মহামায়া যে দিবস রন্ধন করিত, সে দিবস রন্ধনশালা হইতে এক মিনিটের তরেও স্থানান্তর গেলে, জয়দুর্গা তরকারি হইতে ও রাত্রিকালে যে মৎস্য রন্ধন হইবে তাহা হইতে, অধিকাংশ ফেলিয়া দিত; সুতরাং কর্ত্তা-গিন্নি প্রচুর মৎস্য পাইতেন না। অপর লোকের তো কিছুই পাইবার সম্ভাবনা ছিল না। দুই চারি দিবস এইরূপ হইলে জয়দুর্গা আপন মাতাকে কহিল যে, এ সমস্ত মাছ কোথায় যায়, তাহা সে বলিয়া দিবে। মহামায়া এক দিবস রন্ধন করিতেছে, জয়দুর্গা কেবল অবকাশ খুঁজিতেছে,—কখন তাহার দিদি রন্ধনশালা হইতে এক মুহূর্ত্তের তরেও স্থানান্তরে যাইবে। কিন্তু তরকারিতে লবণ ও লঙ্কা কেন অধিক হয়, যে দিবস মহামায়া তাহার কারণ বুঝিতে পারিয়াছিল; এবং তাহার পরে মৎস্য কেন তাহার রাঁধিবার দিন কম পড়ে ও জয়দুর্গার রাঁধিবার দিন বেশী হয়, তাহারও কারণ, যে দিবস মনে মনে ধারণা করিতে পারিল, সে দিবস আর সে রন্ধনশালা ত্যাগ করিল না। পরে সকলের আহার হইলে, জয়দুর্গা নিজে আহার করিলে, মহামায়া নিজের জন্য ভাত বাড়িয়া হস্ত-পদাদি ধৌত ও বস্ত্র পরিত্যাগ করিতে গেল। রন্ধন করিতে গেলে সমস্ত বস্ত্রাদি খারাপ হইয়া যায়, এজন্য মহামায়া রন্ধনাদি করিয়া বস্ত্রত্যাগ করিত, এবং বস্ত্রত্যাগ করিয়া নিজে চারিটী আহার করিত। অ
বাটীর সকলেরি আহার হইয়া গিয়াছে—চা
দাসী প্রভৃতি কাহারও আহার করিতে বা
নাই। সমস্ত লোকের আহার হইলে মহাম
যাই হস্ত-পদাদি ধৌত করিতে গিয়াছে, আম
জয়দুর্গা রন্ধনঘরে প্রবিষ্ট হইয়া চারি-পাঁচখা
ভাজা মাছ তাহার অন্নের অভ্যন্তরে প্র
করাইয়া আসিয়া তাহার মাতাকে ডাকিল; ক
—"মাছ কেন কম পড়ে, দেখে যাও।" এ
বলিয়া ভাতের অভ্যন্তরস্থ মৎস্য দেখাইয়া দি
মহামায়া আহার করিতে বসিবে, এমন স
দেখিল যে, ভাতগুলি যেরূপ বাড়িয়া রাখিয়াছি
এক্ষণে সেরূপ নাই; কিন্তু মনে করিল, ব্যস্ত
ক্রমে বোধ হয়, ভাল করিয়া রাখা হয় নাই
পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, আমার শ্বশুরবাটীর রন্ধন
শালার তিন দিকে ইটের প্রাচীর, সম্মুখে বাঁশে
বেড়া। আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণী ও জয়দুর্গ
এই বেড়ার বাহিরে দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলেন
মহামায়া অন্ন যেরূপ বাড়িয়া রাখিয়া গিয়াছি
সেরূপ অবস্থায় না দেখিয়া প্রথমতঃ খাইতে
সঙ্কুচিত হইল; কিন্তু পূর্ব্বে বলা হইয়াছে
তাহার ঠিক স্মরণ ছিল না, কিরূপ অবস্থায়
ভাতগুলি রাখিয়া গিয়াছিল। এইজন্য দু'এক
গ্রাস আহার করিয়াই যখন লুক্কায়িত মৎস্য
দেখিল, তখন অমনি গালের ভাত ফেলিয়া দিয়া
আহার ত্যাগ করিয়া উঠিল। সে মৎস্য কে
রাখিয়া গিয়াছে, সে কোন্ জাতি, তাহা জানিতে
পারিল না; সুতরাং তাহার আহারও বন্ধ হইল।
সে উঠিয়া বাহিরে যাইতেছে, এমন সময় তাহার
মাতাকে ও জয়দুর্গাকে দেখিতে পাইল।
জয়দুর্গা কহিল,—"কেন, রোজ রোজ এমনি
মাছ চুরী করিয়া খাও, আজ কেন চোরা
মাছে অরুচি হইল? বুঝি মাকে আর আমাকে
দেখেই এরূপ অরুচি হইয়াছে?" মহামায়া
আর কথা কহিতে পারিল না। চক্ষের জল
ফেলিতে ফেলিতে, দুই চারিটা কুল্লি করিবার

সময়, যাহা আহার করিয়াছিল, সমস্তই বমন করিয়া ফেলিল। অনন্তর কাহাকেও কিছু না কহিয়া আপন শয়নঘরে গিয়া শুইয়া রহিল। প্রাতঃকাল অবধি রন্ধনাদি ও পরিবেশন করিয়া তাহার শরীর কিঞ্চিৎ কাহিল হইয়াছিল, তাহার উপর আহারে বিঘ্ন ও বমন! এই তিন কারণে শয়ন করিবামাত্রই মহামায়া নিদ্রিত হইল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

অশান্তির আর এক স্তর।

আমার শাশুড়ীর নিকট জয়দুর্গা যাহা বলিত, শাশুড়ী ঠাকুরুণ তাহাই বেদের কথার ন্যায় মান্য করিয়া লইতেন। ইহার অনেক কারণ ছিল। প্রথমতঃ জয়দুর্গার স্বামী উকীল, আমা অপেক্ষা অধিক বিদ্বান্ ও অধিক ধনী; দ্বিতীয়তঃ জয়গোপাল সর্ব্বদাই তত্ত্ব করিত, আমি তাহা পারিতাম না; তৃতীয়তঃ সে জয়দুর্গাকে বিস্তর গহনা দিয়াছিল। এই কয়েক দফা ভিন্ন সে শ্বশুর মহাশয়ের মোকদ্দমা ইত্যাদি বিনা ব্যয়ে করিয়া দিত। সর্ব্বশেষ ও সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর কারণ, সে শ্বশুরবাড়ী আসিয়া শাশুড়ীকে প্রত্যেকবার একটী মোহর দিয়া প্রণাম করিত। যেস্থলে এত সুপারিস, সেস্থলে কোথায় মহামায়া—আর কোথায় বা আমি!

যে দিবস মহামায়া বমন করিয়া গিয়া নিজের ঘরে নিদ্রিত হইয়াছিল, সেই দিবস প্রাতে আমাকে শ্বশুরবাটী যাইবার জন্য একজন লোক দিয়া খবর পাঠাইয়াছিল। আমি তদনুসারে বেলা ৪টার সময় শ্বশুরবাটী গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, শ্বশুর-মহাশয় বৈঠকখানা ঘরে অর্থাৎ বাহিরের যে ঘরে তিনি সর্ব্বদা বসা-ওঠা করিতেন সেই ঘরে, বিমর্ষ-বদনে বসিয়া আছেন! আমি প্রণাম করিয়া পদধূলি লইতে গেলাম; শ্বশুর মহাশয় পা-দুখানি গুটাইয়া লইয়া কহিলেন,—"চিরজীবী হইয়া থাক, আর পায়ের ধূলা লইতে হইবে না।" তাঁহার কথা শুনিয়া আমার কিঞ্চিৎ আশ্চর্য্য-বোধ হইল; কিন্তু আমি কিছুই বলিলাম না। শ্বশুর মহাশয়ও আমাকে কিছুই কহিলেন না। ক্ষণকাল পরে তিনি নাসিকাধ্বনি করত নিদ্রিত হইলেন। তখন আমি ভাবিলাম, এস্থানে থাকিবার আর প্রয়োজন কি? অতএব একবার বাটীর ভিতরে যাই।

বাটীর ভিতর যাইবার সময় কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইল না। সুতরাং যদিও আমি জানিতাম, মহামায়া কোন্ ঘরে শুইয়া থাকে, তথাপি আমার সে ঘরে যাইতে সাহস হইল না। পুনরায় সেই বৈঠকখানা-ঘরে আসিয়া বসিলাম। যদি কেহ কোন যায়গায় যায় এবং তাহার সহিত যে বন্ধু থাকে, তাহাকে বলিয়া যায় যে, "একটু দাঁড়াও, আমি আসিতেছি"; তাহার প্রতীক্ষায় থাকা যে কত কষ্টকর, তাহা যাহারা এরূপ অবস্থায় না পড়িয়াছে, তাহারা কখন উপলব্ধি করিতে পারিবে না। বাস্তবিক যদি 'পলকে প্রলয় জ্ঞান' কখন ঘটনা হয়, তাহাহইলে এই সময়ই হইয়া থাকে। কতক্ষণে মহামায়ার সহিত সাক্ষাৎ হইবে, আমার অন্তঃকরণে এক্ষণে সেই ভাবনা প্রবল,—এক এক মিনিট এক এক দিনের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। কিরূপে সময় কাটাই, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না; এমন সময় শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়-কৃত একখণ্ড মহাভারত আমার শ্বশুরের শিয়রে পড়িয়া আছে—দেখিলাম। ভাবিলাম, এই পুস্তক পড়িয়াই সময় কাটাইয়া দিব। পুস্তকখানি খুলিয়া যেখানে পড়িতে আরম্ভ করিলাম, সেখানে দেখিলাম, ধনঞ্জয়ের একটী বাণ তিন খণ্ড হইয়া এক খণ্ডে কর্ণের রথধ্বজা কাটিল, এক খণ্ডে তাহার অশ্বকে কাটিল, এক খণ্ড কোথায় গেল, তাহার ঠিকানা হইল না। এইরূপ যত পড়িতে লাগিলাম, ততই বাণের কোন্ খণ্ড কোথায় গেল, তাহারই বর্ণনা দেখিতে পাইলাম; সুতরং আর সে পুস্তক পড়িতে ইচ্ছা হইল না। পুস্তকখানি বন্ধ করিয়া যেস্থানে ছিল, সেইখানে রাখিয়া দিলাম।

এদিকে সূর্য্যদেব ক্রমে ক্রমে অস্তাচলে যাইতে লাগিলেন। বিরক্ত হইয়া আমি নিজ-বাটীতে ফিরিয়া আসিব, এইরূপ উদ্যোগ করিতেছি, এমন সময় মেনকা দাসী আসিয়া আমাকে কহিল,—"জামাই বাবু! তোমাকে বাড়ীর ভিতর ডাক্‌ছেন।" এই কহিয়া সে চলিয়া গেল।

আমি তাহার বাক্যানুসারে বাটীর অভ্যন্তরে গমন করিয়া দেখিলাম, মহামায়া যে তক্তপোষে শয়ন করিয়াছিল, সেই তক্তপোষের উপরে বসিয়া, গালে হাত দিয়া, ঝর-ঝর করিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতেছে। আমি কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম; কিন্তু সে কোন উত্তর দিতে পারিল না। বস্তুতঃ তাহার মনে এত দুঃখ হইয়াছিল যে, বাক্য দ্বারা তাহা প্রকাশ হইবার নহে। আমি তাহার পার্শ্বে বসিলাম; কিন্তু আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলাম না। ক্ষণকাল পরে, শোকাবেগ সম্বরণ করিয়া, একটী দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া, মহামায়া কহিল,—"আজ কাজের চূড়ান্ত হইয়া গিয়াছে।" এই বলিয়া প্রাতঃকালের মৎস্য-সম্বন্ধীয় ঘটনার পরিচয় দিল; কহিল,—"গুরু লোকের কথা না শুনিলে এমনি ফলই হইয়া থাকে। আমি বড় সাধে বাপ-মাকে অলঙ্কার দেখাইতে আসিলাম; তুমি মন খুলিয়া আমাকে আসিবার অনুমতি দেও নাই, কিন্তু বাপের বাড়ী অতি নিকট বলিয়া তোমার সম্পূর্ণ অনুমতি না থাকাতেও আমি আসিয়াছিলাম। তোমার পা ছুঁইয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি, এরূপ কর্ম্ম আর কখনও করিব না। যখনই আমি তোমার অবাধ্য হইয়া যে কোন কাজ করিয়াছি, তাতেই পদে পদে অমঙ্গল ঘটিয়াছে। তুমি কখনও এক দিনের তরে আমাকে একটী উঁচু কথা কও নাই। আমি যখন যাহা চাহিয়াছি, তাহাই পাইয়াছি। যখন যে কাজ মনে করিয়াছি, তুমি তাহাই করিতে দিয়াছ। এবার বাপের বাড়ী আসিবার সময় তুমি মানা করিয়াছিলে; সে মানা আমি শুনিলাম না, তাহাতে আমার আরও কষ্ট বোধ হইতেছে। যদি রাগ করিয়া দুকথা কহিতে, তাহা হই[...] আমার এত ক্ষোভ হইত না; কিন্তু তুমি কাতরস্বরে আমাকে নিষেধ করিয়াছিলে; [...] আমি সে নিষেধ মানি নাই, এই দুঃখে আ[...] বুক ফাটিয়া যাইতেছে।" "আমরা হাজার [...] স্ত্রীলোক, তোমাদিগের মত বুদ্ধি আমাদের [...] হইতে পারে না। পদে পদে আমরা অপ[...] করিয়া থাকি। তোমরা যদি মার্জ্জনা না করি[...] তাহা হইলে আমাদের যে কি দুর্দ্দশা হই[...] তাহা বলা যায় না।"

মহামায়ার কথা শুনিয়া আমার অত্যন্ত দু[...] হইল। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলাম,—"এক্ষণে কি করা উচিত, বল? চল, আম[...] আজই বাড়ী চলিয়া যাই।" মহামায়া কহিল,—"একবার তোমার কথা লঙ্ঘন করিয়াছি, আ[...] একবার লঙ্ঘন করিব। যত দিনে আমি চো[...] ধরিয়া না দিতে পারিব, ঝাঁটা খাই, আর লা[...] খাই, এইখানেই পড়িয়া থাকিব; কিন্তু তু[...] চলিয়া যাও, তোমার এখানে থাকা উচিত নহে।" এই কথা শুনিয়া আমি চলিয়া আসিব, এম[...] সময় মহামায়া কহিল,—"শোন, শোন, আ[...] একটা কথা শোন। বাবা আজ তোমাকে [...] কিছু বোলেছেন? তাঁর ভাবভঙ্গি দেখে তোম[...] কেমন বোধ হলো!" আমি শ্বশুর মহাশয়ে[...] পদধূলি লইবার সময় তিনি যেরূপ পা গুটাই[...] লইয়াছিলেন, সে কথাগুলি মহামায়াকে কহি[...] লাম। মহামায়া হাসিয়া আমাকে কহিল, (কি[...] তখনও তাহার চক্ষু দিয়া জল ঝরিতেছে।) "যখ[...] মোহর দিয়া প্রণাম করিতে পারিবে, তখন[...] শ্বশুরবাড়ী আসিবে, অন্য সময় আসিবে না[...] কিন্তু আমি যখন ডাকিব, তখন পো[...] পাখীর মতন আমার কাছে আস্[...] হবেই হবে।"

ক্রমশঃ

অতীত-গৌরব ও ভবিষ্য-সম্মান।

বর্ত্তমান সময়ে অতীত জগতের গৌরব ও ভবিষ্য জগতের উন্নতির আশা লইয়া অত্যন্ত তর্ক-বিতর্ক চলিতেছে। এক পক্ষ বলিতেছেন, অতীত জগতে যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহা আর হইবারও নহে, হইতেও পারে না। অপর পক্ষ তাঁহাদিগকে উপহাস করিয়া বলিতেছেন, অতীত মনুষ্যেরা বালকের ক্রীড়ামাত্র করিয়াছিলেন, প্রকৃত মনুষ্যত্ব এখনও পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। প্রথম পক্ষ অতীতের কীর্ত্তিগাথা গান করিয়া অতীতের গৌরবকাহিনী স্মরণ করিয়া অতীতের উজ্জ্বল মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া ভবিষ্যৎকে ঘোর অন্ধকারময় বিবেচনা করিতেছেন; কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষ অতীতকে জগতের প্রভাতমাত্র বিবেচনা করিয়া ভবিষ্যৎকে মধ্যাহ্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। এক পক্ষ জগৎ কি ছিল বলিয়া ব্যথিত হইতেছেন, অপর পক্ষ জগৎ কি হইবে ভাবিয়া পুলকিত হইতেছেন। একদিকে স্মৃতি অতীত চিত্র আনিয়া হৃদয়ে মর্ম্মঘাতিনী বেদনা প্রদান করিতেছে, অপরদিকে আশা মধুর স্বরে কর্ণকুহর ধ্বনিত করিয়া প্রাণে আনন্দধারা ঢালিয়া দিতেছে। এক পক্ষ বিষাদ ও বিভীষিকায় অবসন্ন হইয়া পড়িতেছেন, দ্বিতীয় পক্ষ উৎসাহ ও আশ্বাসে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতেছেন। এক পক্ষকে ম্লানকান্তি শশধরের ন্যায় নিষ্প্রভ বোধ হইতেছে, দ্বিতীয় পক্ষকে উদীয়মান তপনের ন্যায় উজ্জ্বল অনুমান হইতেছে। ফলতঃ একদিকে অবসাদ, অন্যদিকে পুলক, একদিকে ভীতি, অন্যদিকে উৎসাহ, একদিকে নৈরাশ্য, অন্যদিকে আশা, আপন আপন অধিকার বিস্তারের চেষ্টা করিতেছে। এই দুই পক্ষের পরস্পরের বৈপরীত্যের কারণ কি, এক্ষণে আমরা তাহারই নির্দ্দেশ করিতে যথাসাধ্য যত্ন ও প্রয়াস পাইব।

জগতের ইতিহাসে যাহারা প্রাচীন জাতি বলিয়া উল্লিখিত, তাহারাই প্রথম পক্ষের লোক বলিয়া অভিহিত হইতে পারে; এবং আধুনিক সমস্ত জাতিকে দ্বিতীয় পক্ষের লোক বলিয়া স্থির করা যায়। প্রাচীন ভারত, গ্রীস্, রোম্ প্রভৃতি প্রথম পক্ষের, আর ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্ম্মানি প্রভৃতি দ্বিতীয় পক্ষের মধ্যে গণিত। এই সমস্ত জাতির ইতিহাস পাঠ করিলে অবগত হওয়া যায় যে, তাহাদের মনে এইরূপ ভাব হওয়ার বাস্তবিকই কারণ আছে। ভারতে, গ্রীসে, রোমে, যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহার সহিত উহাদিগের বর্ত্তমান অবস্থা তুলনা করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, তাহাদের ভবিষ্যৎ ঘোর অন্ধকারময়। আর, ইংলণ্ড, জর্ম্মনি প্রভৃতির অতীত ইতিহাসের সহিত তাহাদিগের বর্ত্তমান সময়ের তুলনা করিলে ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, তাহাদিগের ভবিষ্যৎ বাস্তবিক মধ্যাহ্ন দিবসের ন্যায় সমুজ্জ্বল। প্রাচীন ভারতে, প্রাচীন গ্রীসে, যে জ্ঞান-বিজ্ঞান ছিল, যে কাব্যদর্শন ছিল, যে ঋষি দার্শনিক ছিলেন, এখনকার ভারতে এখনকার গ্রীসে কি তাহার চিহ্নমাত্রও দেখিতে পাওয়া যায়? তাহাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় ব্যতীত আর কি হইতে পারে? আর যে ইংলণ্ড একদিন আমমাংসভোজী অর্দ্ধপশু ছিল, তাহার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিলে কে না স্বীকার করিবে, ইহার ভবিষ্যৎ আলোকময়? আজ ভারতবাসীগণ আপনাদিগের পূর্ব্ব-গৌরব হারাইয়া, আপনাদিগের দিগন্ত-প্রসারিণী কীর্ত্তি ভুলিয়া গিয়া, একেবারে নিস্তব্ধ হইয়া পড়িতেছেন; যে সম্মোহন দৃশ্য একদিন তাঁহাদের নয়ন-মনকে পুলকিত করিয়াছিল, যে অমরাবতী-সুলভ আনন্দ একদিন তাঁহাদিগকে উন্মত্ত করিয়াছিল, আজি তাহা কোথায়? তাহা কি এক্ষণে বিস্মৃতি-সাগরের অতল গর্ভে নিমগ্ন হয় নাই? আজ ভারতবাসী কোন্ প্রাণী বলিবে যে, জগতে ভবিষ্যতে স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইবে! যাহারা একদিন জগতের কেন্দ্রস্থল হইয়া সমস্ত বিশ্বে আপনাদিগের জ্ঞানমহিমা বিকীর্ণ করিয়াছিল,

আজ যখন তাহারা একটী নবোত্থিত জাতির করায়ত্ত, আজ যখন তাহারা জ্ঞানে, ধর্ম্মে, শিল্পে, বাণিজ্যে সর্ব্ববিষয়ে তাহাদের মুখাপেক্ষী, তখন কেমন করিয়া তাহারা ভবিষ্যতের উজ্জ্বল কান্তি চিন্তা করিতে পারে? জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতির সন্তান হইয়া, মহামূল্য জ্ঞানবিজ্ঞানাদি সম্পত্তির অধিকারী হইয়া, স্বর্ণ-প্রসবিনী ভারতভূমির অধিবাসী হইয়া, বিদ্যার জন্য, দুইটী উদারন্নের জন্য, যখন ইংরাজের পানে একদৃষ্টে চাহিয়া আছে, তখন কিরূপে বলিব, তাহাদের ভবিষ্যৎ মধ্যাহ্ন দিবসের ন্যায় সমুজ্জ্বল? প্রাচীন ভারতে যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহা কি আর হইবে? সেই ধর্ম্ম, সেই জ্ঞান, সেই ধন-সম্পত্তি, আর কি ফিরিয়া আসিবে? কাল যাহা নিজ-উদরসাৎ করিয়াছে, আর কি তাহা উদ্গীরণ করিবে? সে বশিষ্ঠ, সে বাল্মিকী, সে বেদব্যাস, সে শঙ্কর, সে চৈতন্য আর কি ফিরিয়া আসিবেন? সেই রাম, সেই লক্ষ্মণ, সেই ভীষ্ম, সেই যুধিষ্ঠির আর কি দেখা দিবেন? সেই ভীম, সেই অর্জ্জুন, সেই প্রতাপ, সেই শিবজী, কি আর আসিবেন? সেই ধ্রুব, সেই প্রহ্লাদ, সেই সীতা, সেই সাবিত্রী আর কি গৃহে গৃহে বিরাজ করিবেন? এখনকার দুর্নীতিগ্রস্ত, বিকৃত মস্তিষ্ক, কদাচার পাষণ্ডগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, কে সাহস করিয়া বলিতে পারে যে, আবার হিন্দুজাতির পুনরুত্থান হইবে? কে বলিবে যে, ভারত আবার উজ্জ্বল নক্ষত্রে সুশোভিত হইবে? যাঁহারা প্রাচীন হিন্দুর সহিত বর্ত্তমান হিন্দুর তুলনা করিবেন, তাঁহারা কিছুতেই ইহা স্বীকার করিতে পারেন না। মুসলমানের-ইংরাজের পদানত হইয়া, আপনাদিগের জাতীয়ত্ব বিসর্জ্জন দিয়া, হিন্দু কেমন করিয়া ভবিষ্যতকে উজ্জ্বল মনে করিতে পারে? সেইরূপ বহুকাল তুর্ক-পদানত থাকিয়া, বহুকষ্টে যৎকিঞ্চিৎ স্বাধীনতা লাভ করিয়া, গ্রীস্ কি কখন মনে করিতে পারে যে, আবার সক্রেটিস্, প্লেটো, আরিষ্টটলের জন্ম হইবে? আবার লিওনিদাস্,

মিল্টাইদিস্, আলেকজাণ্ডার জন্মগ্রহণ করিবে
তাই বলিতেছি, জগতের প্রাচীন জাতি-স
ভবিষ্যৎকে অন্ধকারময় ব্যতীত আর কিছুই
করিতে পারে না। তাহাদিগের মনে জগ
ধ্বংসাবস্থা ভিন্ন উন্নতির অবস্থা স্থান পাই
পারে না। তাহারা চিন্তা করিয়া থাকে যে, স
গ্রাসী কাল জগতকে বহুদিন হইতে গ্রাস কর
আরম্ভ করিয়াছে, দুই দশ দিনের মধ্যে অব
উদরসাৎ করিবে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ না

অন্যদিকে ইংলণ্ড সমুজ্জ্বল কেতুর ন্যায় অ
শ্রান্ত গতিতে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে
গতির বিরাম নাই, পথে বিঘ্ন-বাধা নাই, উৎসা
আশ্বাসে, বক্ষঃ বিস্ফারিত করিয়া, সাগর-ভূ
কম্পান্বিত করিয়া, বজ্র-বিদ্যুৎ আলিঙ্গন করি
ক্রমশঃ ছুটিতেছে; সম্মুখে যাহা পড়িতেছে
ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করিয়া চলিয়া যাইতেছে। উন্নতি
পর উন্নতি, তাহার পর উন্নতি, আবার উন্নতি
এইরূপে অনবরত তাহাদের মস্তকে উন্নতির
হইতেছে। আশা তাহাদিগের হৃদয়ের সম
মালিন্য বিধৌত করিয়া দিতেছে, উৎসাহ তাহ
দিগকে শক্তিশালী করিতেছে, প্রীতি তাহ
দিগকে দিব্যকান্তি প্রদান করিতেছে। ফলত
তাহারা অন্ধকারময় অতীত বহু পশ্চাতে নিক্ষে
করিয়া উজ্জ্বল আলোকপূর্ণ ভবিষ্যরাজ্যে প্রবে
করিতেছে। তাহারা ভাবিতেছে, আবার শ
শত আর্থার জন্মগ্রহণ করিবেন; শত শত ক্রম
ওয়েলে জগৎ পূর্ণ হইয়া যাইবে; বৎসর বৎসর
মাস মাস, দিন দিন, পার্লামেণ্টের অধিবেশ
হইবে; শত শত সেক্সপীয়ার, শত শত মিল্টন
শত শত ওয়ার্ডস্ওয়ার্থের জন্ম হইবে; সংখ্যা
তীত বেকন, লক্, মিল্ জগতে আপন আপন
মত বিস্তার করিতে থাকিবেন। ফ্রান্স ভাবি
তেছে, সমস্ত জগৎ এক সাধারণ-তন্ত্রে পরিণত
হইবে, নেপোলিয়ানের ন্যায় সহস্র সহস্র
প্রতিভাশালী ব্যক্তি তাহার রক্ষক হইবেন; সহস্র
সহস্র ভল্টেয়ার, রুশো, ডিডিরো জগতে আবি

র্ভূত হইবেন। সেইরূপ জর্ম্মনি, লক্ষ লক্ষ বিস্মার্ক, মল্টকি, লক্ষ লক্ষ ক্যাণ্ট, হেগেলের উদয়-চিন্তা করিতেছে। তাই তাহারা জগতের ভবিষ্যৎ আলোকময় ভাবিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইতেছে। বিরাম নাই, আলস্য নাই, ক্রমশঃ উন্নতির দিকে চলিয়াছে।

আমরা প্রাচীন ও আধুনিক জাতি-সমূহের মত-বিভিন্নতার কারণ দেখাইলাম। উক্ত জাতি-বর্গের শাস্ত্র ও সাহিত্য অধ্যয়ন করিলে এই সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রথমতঃ আমাদিগের পুরাণাদি ধর্ম্মশাস্ত্র ও অনেকানেক সাহিত্যে ভবিষ্যৎ জগতের অবনতির বিষয় স্পষ্টাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। কলিযুগে লোকে ধর্ম্মবিহীন হইবে, পাপে পশুসদৃশ হইবে, উদরান্নের জন্য কেবল ছুটাছুটি করিবে, নিত্য নিত্য দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইবে, শান্তি প্রস্থান করিবে, স্বার্থসাধন কেবলমাত্র উদ্দেশ্য থাকিবে, ফলতঃ সর্ব্বপ্রকার পাপ ও কদাচারে জগৎ ভরিয়া যাইবে। দর্শনশাস্ত্রও গুরু-গম্ভীরস্বরে বলিতেছে, যখন আত্মা পাপে মগ্ন থাকিবেন, তখন সংস্কার ও প্রবৃত্তি অনুসারে মনুষ্য পশু-পক্ষী প্রভৃতি তির্য্যগ্‌যোনি প্রাপ্ত হইবে। পুরাণ মনুষ্যের অবস্থা বর্ণন করিতেছে, দর্শন তাহার শেষ নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছে। অন্যদিকে ইংরাজদিগের কাব্যসাহিত্য অন্বেষণ করিলে ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব দৃষ্ট হইবে। ইংরাজ কবি শেলী, টেনিসন্ প্রভৃতি উন্নতি-পরিপূর্ণ ভবিষ্য-জগতের কথা গান করিতেছেন। ভবিষ্যতে জগতে স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইবে, ছোট-বড় ভেদ থাকিবে না, সকলেই সমান হইবে, নর-নারীর পার্থক্য রহিবে না, সাম্য, স্বাধীনতা, মৈত্রী কেবলমাত্র মনুষ্যের অবলম্বন হইবে, বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গিত হইয়া মনুষ্যগণ দিব্যকান্তি ধারণ করিবে, দুঃখ কষ্ট দূরে পলায়ন করিবে; কেবল অনন্ত আনন্দ বিরাজ করিতে থাকিবে। উন্নতির উচ্চশিখরে আরূঢ় হইবার জন্য নর-নারীগণ হাত ধরাধরি করিয়া অবিশ্রান্ত গতিতে ধাবিত হইবে। ইংরাজ দার্শনিক ডারুইন্, স্পেন্সার জীবের ক্রমোন্নতির প্রথা প্রচার করিতেছেন, জগতের ক্ষুদ্র জীব হইতে কিরূপে ক্রমশঃ উন্নতিপথে মনুষ্য আসিয়াছে, এই মনুষ্য আবার কিরূপে ক্রমে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে, ইহাই তাঁহারা দেখাইতে চেষ্টা করিতেছেন। সুতরাং উক্ত ভিন্ন ভিন্ন জাতির সাহিত্য-দর্শন অন্বেষণ করিলে, তাহাদের মত-পরিপোষণের অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। ত্রিকালজ্ঞ ভগবান কৃষ্ণ দ্বৈপায়ণ, সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরের পুণ্য-সম্ভারপূত বসুন্ধরাকে কলুষিত করিবার জন্য, কলির অচিরাগমন অবগত হইয়া, জগতের ভবিষ্যৎ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন; আবার অন্যদিকে ইংরাজ-কবি-দার্শনিকগণ আপনাদিগের ক্রমোন্নতি দেখিয়া ক্রমোন্নতির মত প্রচার করিতে চেষ্টা করিতেছেন। এই দুই মতের মধ্যে, কোন্‌টী জাতি-বিশেষে ও দেশবিশেষে আবদ্ধ না থাকিয়া সমস্ত জগতের পক্ষে প্রকৃত প্রস্তাবে প্রযোজ্য হইতে পারে, আমরা এক্ষণে তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব।

আধুনিক জাতি-সমূহের মত বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা একদেশদর্শী হইয়া অর্থাৎ সমস্ত জগতের ভবিষ্যৎ চিন্তা না করিয়া, আপন আপন জাতি ও দেশের অবস্থা দেখিয়া, কেবল ক্রমোন্নতির কথা প্রচার করিতেছেন মাত্র। যদিও তাঁহারা সমস্ত জগৎকে সভ্য করিতে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন কি না সন্দেহ। যে দুর্ব্বল জাতির মধ্যে তাঁহারা আপনাদিগের প্রবল মত প্রচার করিতে চেষ্টা করিতেছেন, তাহারাই একেবারে উৎসন্ন যাইতেছে। আজ ভারতে তাঁহারা আপনাদিগের মত প্রচার করিয়া ভাবিতেছেন, ভারতের বুঝি উন্নতি হইল। কিন্তু ভারত যে উৎসন্ন যাইতে বসিয়াছে, তাহা তাঁহারা কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছেন না। ভারতের সমাজ,

ভারতের প্রথা, ভারতের আচার, পাশ্চাত্য প্রথা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ; এই দুই বিভিন্ন মতের সংঘর্ষণে ভারতের ধ্বংস ব্যতীত উন্নতির আশা নাই। সুতরাং ভারতকে সভ্য করিতে গিয়া তাঁহারা ভারতের সর্ব্বনাশ ব্যতীত আর কিছুই করিতে পারিবেন না। যদিও ভারতের ধ্বংস না হয়, ধরিয়া লইলাম যে, ভা ত সভ্যতায় ইউরোপেরই সমকক্ষ হইল ; কিন্তু সেটী ভারতের পক্ষে প্রকৃত উন্নতি কি না, তাহাই দেখিতে হইবে। তাঁহারা যেরূপ জগতের উন্নতি নির্দ্দেশ করিতেছেন, তাহা প্রকৃত উন্নতি কি অবনতি—সেই এক ধর্ম্ম, এক জাতি, এক বর্ণ, নর-নারীর অপার্থক্য, প্রকৃত প্রস্তাবে উন্নতি কি না---ইহাই বিবেচ্য। হিন্দুগণ এইরূপ ভাবের উন্নতিকে চরম অবনতি বলিয়া থাকেন। যখনই জগতে এরূপ উন্নতি দেখা যাইবে, তখনই জগতের ধ্বংস আগমনোন্মুখ বুঝিতে হইবে। তাহার পর ইউরোপীয়গণ ভবিষ্যতে যে সাম্য ও মৈত্রীর একমাত্র রাজত্বের কথা উল্লেখ করিয়া থাকেন, তাহা কতদূর সম্ভবপর, এক্ষণে তাহাই দেখিতে হইবে। জগতে উত্তরোত্তর যতই মানবজাতির বৃদ্ধি হইতে থাকিবে, ততই জীবন-সংগ্রামে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রাদুর্ভাব হইবে। ততই দ্বেষ, হিংসা, ঈর্ষ্যা বাড়িতে থাকিবে ; তখন সাম্য, মৈত্রী কোথায় থাকিবে, বুঝিতে পারা যায় না। এই জন্য হিন্দুশাস্ত্রকারেরা সত্য অপেক্ষা কলির নিন্দা করিয়া গিয়াছেন ; সত্যযুগে লোকসংখ্যা অল্প থাকায় এবং মনুষ্য সাধারণতঃ ধর্ম্মপরায়ণ হওয়ায়, পরস্পরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার তত প্রাবল্য ছিল না। সেই জন্য দয়া-দাক্ষিণ্য প্রভৃতি সদ্গুণের বহুল পরিমাণে বিকাশ দেখিতে পাওয়া যাইত। এক্ষণে জাতি-সকল ও জগতের প্রত্যেক মনুষ্য যেরূপ পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পটু, তাহাতে কখন বিশ্বজনীন সাম্যের আশা করা যায় না। সভ্য জাতিগণের মধ্যে একটী বিশ্বাস আছে যে, কার্য্যক্ষেত্রে জাতি-সমূহ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরস্পরের

বিরোধী হইলেও, পরস্পরের অনিষ্ট-চেষ্টা ক
লেও, নৈতিক জগতে—আধ্যাত্মিক জগতে স
লেই এক। কিন্তু আমরা এইরূপ "গৃহে
কিন্তু সমাজে ভগ্নী" কথার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করি
পারি না। ইউরোপীয়গণ ইউরোপে পরস্প
বন্ধুভাবে ভ্রাতৃভাবে অবস্থিত, কেহ কাহারও দে
আক্রমণ করিবেন না ; কিন্তু এসিয়ায় তাঁহাদিগ
সমরে লিপ্ত হইলে কোনও দোষ নাই, এইর
গূঢ় নীতির তাৎপর্য্য বুঝিয়া উঠা যায় না
আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, এক্ষণেও বলিতেছি
জগতে উত্তরোত্তর যতই মনুষ্যজাতির বৃ
হইতে থাকিবে, ততই নানাপ্রকার বিপত্তি উপ
স্থিত হইবে। কোন সম্ভ্রান্ত বংশে বহু পরিবা
হইলে যেরূপ নিয়ত বিবাদ-বিসম্বাদ হইয়া থাকে
সেইরূপ সমস্ত জগতের পক্ষেও বুঝিতে হইবে
লোক-সংখ্যার বৃদ্ধি হওয়ায় কেবলই প্রতিদ্বন্দ্বি
তার প্রাবল্য হইতেছে, সঙ্গে সঙ্গে উদরান্নে
সংস্থান হইয়া উঠিতেছে না। উপনিবেশে জগ
ভরিয়া গেলেও, লোক সংখ্যার হ্রাস হইতেছে
না। প্রতিনিয়ত এত লোক বাড়িতে থাকিলে
উদরান্নের জন্য মনুষ্য কি না করিবে ? যদিও কেহ
কেহ চিন্তা করিয়া থাকেন যে, জীবন সংগ্রাম
উপস্থিত হইলে মনুষ্য জীবনোপায়ের ভিন্ন ভিন্ন
পথ আবিষ্কার করিবে ; কিন্তু তাহা কয় দিনের
জন্য ? পরিণামে কোনই উপায় থাকিবে না, ইহাই
নিশ্চিত ; তখন অশান্তি, অধর্ম্মের রাজত্ব ব্যতীত
আর কিছুই দেখিতে পাওয়া যাইবে না। ইহার
উপর ইউরোপীয় দার্শনিক কোম্‌ৎ প্রভৃতি, প্রচ-
লিত ধর্ম্মমত-সমূহের অনাদর করিয়া যেরূপ
মনুষ্যত্ব-উপাসনা (Worship of Humanity)
প্রভৃতি ধর্ম্মের প্রচার করিতেছেন, তাহাতে
আরও সর্ব্বনাশের উপায় হইতেছে। ঈশ্বর-
ভীতি থাকিলে মনুষ্য পাপপথে যাইতে সহজে
পারিয়া উঠে না। সেই সমস্ত লোক যখন
আপনাদিগকে স্বাধীন, স্বয়ম্ভূ বিবেচনা করিতে
থাকিবে, তখন জগতের পক্ষে অতীব ভয়ানক

সময় উপস্থিত হইবে। ঈশ্বর-ভীতিতেও যাহারা ধর্ম্মপথে আসিতে স্বীকার করে না, তাহাদিগকে কেবল গুণমাত্রের (Abstract idea) উপাসনা করিতে উপদেশ দেওয়া—আর তাহাদিগের সর্ব্বনাশের পথ দেখাইয়া দেওয়া, একই কথা। আজ কয়জন লোকে প্রকৃত মনুষ্যত্ব কি, তাহা বুঝিতে সক্ষম হয় ? হস্তপদবিশিষ্ট ঈশ্বরের উপাসনা সহজে লোকে পারিয়া উঠে না, তাহার উপর একটী নিরাকার গুণমাত্রের উপাসনা কিরূপ দুষ্কর, ইহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন। সাধারণ লোকের পক্ষে, এরূপ মত প্রশংসনীয় হইলেও যে ভয়াবহ, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই সব কারণে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, ইউরোপীয় কবি-দার্শনিকেরা আকাশকুসুমের উপর নির্ভর করিয়া, অন্ধকারে লোষ্ট্র-নিক্ষেপের ন্যায় আপনাদের মত প্রচারের চেষ্টা করিতেছেন ; কেবল আপনাদিগের মন, অথবা নিজ নিজ জাতির মধ্যে দুই চারি জন লোকের হৃদয়ভাব অবগত হইয়া, অপ্সরা-রাজ্যের ন্যায় ভবিষ্য জগতের কল্পনা করিতেছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে এরূপ মত জগতের ধ্বংসানয়নের একটী ব্যতিরেক উপায় মাত্র।

এক্ষণে বিশেষরূপে অনুধাবন করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে, আমাদিগের প্রাচীন মহর্ষিগণ জগতের যেরূপ অন্তিম নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই প্রকৃত প্রস্তাবে যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হইতেছে ; জগতের ভবিষ্যৎ যে ভয়াবহ, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। যে সমস্ত দেশ এক্ষণে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে, তাহাদের পক্ষেও প্রতিক্রিয়া হইতে আরম্ভ হইবে, এইরূপ অনুমান হয়। সকলেই স্ব স্ব প্রধান হইতে চেষ্টা করিবে, লোক-সংখ্যার বৃদ্ধি হইলে বহুল পরিমাণে উপনিবেশ স্থাপন করিতে হইবে, সেই উপনিবেশগুলিও আদিরাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চেষ্টা করিবে ; এইরূপে ক্রমে নানা-রূপে বিবাদ-বিসম্বাদ উপস্থিত হইলে, সাম্য-মৈত্রী কি করিবে বুঝিতে পারি না। আমাদিগের ভারতে যাঁহারা ইউরোপীয় মতে দেশ-সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, পাশ্চাত্য মতে রাজনৈতিক স্বত্ব-স্থাপনে ব্যগ্র, তাঁহারা যে তত্তৎ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইবেন, এরূপ আশা করা যায় না। প্রকৃত হিন্দু-চিত্ত কখনও ভারতের উন্নতি আশা করিতে পারে না। তাহার মনে কখনও ভবিষ্য ভারত অতীতকে উন্নতিতে পরাস্ত করিবে, এরূপ অযৌক্তিক কথা স্থান পাইতে পারে না। সহস্র কংগ্রেসের অবতারণা করিলেও, ভবিষ্য ভারত কখনও প্রাচীন ভারতের ছায়া পর্য্যন্তও প্রাপ্ত হইবে না। এক্ষণে একটী কথা বলিয়া রাখা উচিত, যখন ভবিষ্যতে উন্নতির আশা নাই, তখন হিন্দুগণ যে আলস্যের দাস হইয়া, তামস ভাগ্যের উপর সমস্ত নির্ভর করিয়া, নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকিবেন, এরূপ ব্যাপারের আমরা অনুমোদন করিতে পারি না। যাহা হইবার, তাহা হইবে, তবে তাহার বিরুদ্ধে চেষ্টা কেন ? সুতরাং নীরবে বসিয়া কাল-সাগরের তরঙ্গ গণনা করা যাউক, আমরা এরূপ ভাবের পক্ষপাতী নহি। জগতের ধ্বংস নিশ্চয় বলিয়া কাল-স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া দিলে চলিবে না। সেই পিশাচী অবনতিকে যত দূরে রাখা যায়, তাহারই চেষ্টা করিতে হইবে ; যতই তাহার আগমনের বিলম্ব হয়, তাহারই উপায় করা উচিত। সেইজন্য আমরা আধুনিক হিন্দুধর্ম্মের আন্দোলনের উপকারিতা স্বীকার করিয়া থাকি। হিন্দু যদিও মনে করিতে পারেন যে, জগতের অবনতি অনিবার্য্য ; কিন্তু যত শীঘ্র শীঘ্র সেই অবনতি আসিতে না পারে, যত শীঘ্র কলির শেষাবস্থা না হয়, হিন্দুর তাহাই মনে করা উচিত। তাই হিন্দুগণ, একবার পূজনীয় আর্য্যগণের চরণ চিন্তা করিয়া, যে পরিমাণে পূর্ব্বভাব রাখিতে পারেন, তাহারই চেষ্টা করিতে থাকিবেন। এবং তাঁহারা যতই উৎসাহ-সহকারে কার্য্য করিবেন, তাহা জগতের পক্ষে মঙ্গল। সুতরাং আধুনিক হিন্দুধর্ম্মান্দোলনের উপকারিতা

স্বীকার করিতেই হইবে। তাই আমরা "ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্ম-প্রচারিণী সভা," "ভারত ধর্ম্ম-মহামণ্ডল," ও "ধর্ম্মমণ্ডলীর" ন্যায় সমিতিকে সাদরে শ্রদ্ধা করিয়া থাকি, হৃদয়ের সহিত অভিবাদন করিয়া থাকি। এই সকল সমিতি যতই উদ্যম-সহকারে এই কদাচারপূর্ণ ভারতে কার্য্য করিতে থাকিবেন, ততই ভারতের পক্ষে মঙ্গল হইবে, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু অন্যান্য সংস্কারকেরা শীঘ্র শীঘ্র অবনতি আনয়ন করিতে যত্ন করিতেছেন। তাঁহারা উন্নতি ভাবিয়া অবনতির সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, সুধা-ভ্রমে গরল প্রদান করিতেছেন। পাশ্চাত্য মতে দেশ-সংস্কার করিতে গেলে জগতের ধ্বংস আপনিই আসিয়া উপস্থিত হইবে। কাহারও সাধ্য নাই যে, সে ধ্বংসস্রোতে বাধা প্রদান করে। কিন্তু নব্য সংস্কারকেরা অলক্ষিতভাবে যে কি ভয়ানক ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহা ভাবিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। সহস্র চেষ্টা করিলেও জগতের ধ্বংস অনিবার্য্য।

ধন্য আর্য্য মহর্ষিগণ, তোমরা জ্ঞাননেত্র বিস্ফারিত করিয়া ত্রিকালের অবস্থা দর্শনে জগৎকে যাহা জানাইয়াছ, কাহার সাধ্য তাহার বিরুদ্ধে একটীমাত্র বাক্য উচ্চারণ করিতে পারে? গভীর তত্ত্ব-সাগরে নিমগ্ন হইয়া যে সমস্ত মহামূল্য রত্নের আবিষ্কার করিয়া গিয়াছ, আর কি কেহ তাহা পারিবে? ধন্য আমরা, যে তোমাদের চরণ-পবিত্রীকৃত আর্য্যভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি; আর হতভাগ্য আমরা, যে তোমাদের উত্তরাধিকারী হইয়া সেই সমস্ত মহামূল্য রত্ন হারাইয়া ফেলিয়াছি। একবার তোমাদের সেই শান্ত, পবিত্র, উজ্জ্বল মূর্ত্তি আমাদিগকে দেখাও,—যে মূর্ত্তি কোটি সূর্য্যকে মলিন করিত, যে মূর্ত্তি মর্ত্ত্য-ধামে শত মন্দাকিনী ছুটাইয়া দিত, যে মূর্ত্তি পাপ পৃথিবীতে স্বর্গের ছায়া আনয়ন করিত, একবার সেই মূর্ত্তি, সেই প্রাণারাম মূর্ত্তি দেখাও; হৃদয় পবিত্র হউক, মনুষ্য জন্মের সার্থকতা লাভ হউক, সমস্ত পাপতাপ বিধৌত হইয়া যাউক। হিন্দুগণ, আর্য্যসন্তানগণ, ভীত হইও না; অনিবার্য্য কালস্রোতে ভাসিয়া যাইতে হইবে বলিয়া অবসন্ন হইও না। যদিও কলি গ্রাস করিতে বসিয়াছে, তথাপি, একবার স্বর্গীয় পিতৃগণের পবিত্র কান্তি স্মরণ কর; ঐ দেখ, নীলাকাশ উজ্জ্বল করিয়া, সমস্ত জগতে শান্তিচ্ছটা বিকীর্ণ করিয়া, তাঁহাদের পবিত্র আত্মা আমাদিগকে অভয়বাণী প্রদান করিতেছে,—"এখনও সময় আছে, কলির শেষাবস্থার অনেক বিলম্ব আছে; একবার সেই কোটিসূর্য্য-প্রভান্বিত, মন্দাকিনী-বিধৌত, পবিত্র হইতে পবিত্রতর, শান্ত, অথচ উজ্জ্বল কান্তি ধ্যান কর; হৃদয়ে বল পাইবে, প্রাণে শান্তি পাইবে, আত্মায় আনন্দ পাইবে। এখনও হতভাগ্য আমাদের জন্য তাঁহাদের অভয় হস্ত উত্তোলিত হইয়া থাকে; আইস, একবার তাঁহাদের পবিত্র নাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করি, নিশ্চয়ই তাঁহারা হতভাগ্যদিগকে ক্রোড়ে করিবেন। কলির গ্রাস হইতে নিস্তার লাভ করিবে। পবিত্রতায় হৃদয়-প্রাণ ভরিয়া যাইবে। প্রকৃত আর্য্য-সন্তান হইতে পারিবে। একবার হৃদয়ের কবাট খুলিয়া সেই আর্য্য মহাত্মগণের পবিত্রতাস্রাবী, প্রাণমন-স্নিগ্ধকর নাম কীর্ত্তন কর, নতুবা কালের গ্রাস হইতে নিস্তারের অন্য কোন উপায় নাই।

মতামত।

পুস্তক-সম্বন্ধে।

আমাদের জাতীয় ভাব।—শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত। বিজাতীয় অনুকরণই যে অধঃপতনের মূল, আর সেই অনুকরণ-চেষ্টাতেই যে আজ আমরা পর-পদানত ও পরমুখাপেক্ষী, এই ক্ষুদ্র পুস্তকে বিশদ অথচ প্রাঞ্জল ভাষায় তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। এই পুস্তকের কথাগুলি পত্রে-পত্রে ছত্রে-ছত্রে সকলেরই অনুশীলন করা কর্ত্তব্য, এবং সেই শিক্ষার

অনুসরণে কার্য্য করাই একান্ত সময়োচিত। কাঞ্চন ফেলিয়া কাচের বোঝা বহা, আর আমাদের দেশীয় আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, শিক্ষা-দীক্ষা ত্যাগ করিয়া বিজাতীয় ভাবে বিভোর হওয়া, একই ফলদায়ক। এইজন্যই—অনুকরণের শেষ দুর্দ্দৈব-সকলের বিষয় গ্রন্থকার আমাদের চক্ষে অঙ্গুলি প্রদান-পূর্ব্বক দেখাইয়া দিয়াছেন বলিয়াই, এ পুস্তকের আমরা সর্ব্বতোভাবে প্রচার-কামনা করি। বিশেষ, রজনীকান্তের আবেগময়ী ভাষায় পুস্তকখানি সকলেরই যে মনোরম হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ফলতঃ গ্রন্থকারের সহিত আমরাও একবাক্যে স্বীকার করিতেছি যে,—

"আমাদের জাতীয় ভাবের অবনতির প্রধান কারণ, অনুকরণ-প্রবণতা ও অনৈক্য। * * সাহেবেরা নিজে বলিয়া থাকেন, সাহেবী পোষাক কোনমতে এদেশের উপযুক্ত নয়; কিন্তু আমাদের দেশের কোনও কোনও ব্যক্তি ঐ পোষাক ব্যবহার করিতে সঙ্কুচিত হয়েন না।

"পরিচ্ছদ ও আচার-ব্যবহারের ন্যায়, সাহিত্যে, শিক্ষায় ও কথাবার্ত্তা প্রভৃতিতে জাতীয় ভাব পরিস্ফুট হইয়া থাকে। কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের মধ্যে নানারূপ বিড়ম্বনা দেখা যায়।

"বিজাতীয় ভাবের অনুকরণ করিলে যেরূপ জাতীয়ত্ব বিনষ্ট হয়, সেইরূপ বলবীর্য্যেরও হানি হইয়া থাকে। যাহা আমাদের প্রকৃতির সহিত সমঞ্জসীভূত, আমাদের তদনুসারেই চলা কর্ত্তব্য।"

এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থকারের সহিত আমরাও বলিতেছি যে,—

"আমরা যতদিন স্বদেশীয় দ্রব্যের আদর করিতে না শিখিব, ততদিন আমাদের মধ্যে জাতীয় ভাবের বিকাশ হইবে না। তাহাতে আমাদের শোচনীয় অধঃপতন অনিবার্য্য।"

ভক্তিতত্ত্ব।—শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। এই পুস্তকে ভক্তির মাহাত্ম্য, ভক্তির প্রয়োজনীয়তা, ভক্তির স্বরূপ, ভক্তির ভাব ও রস-নির্ণয়, ভক্তির উৎপত্তি, ভক্তির প্রকরণ প্রভৃতি বিষয় সুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টান্ত দ্বারাও বিষয়গুলিকে আরও পরিস্ফুট করা হইয়াছে। সেগুলি পড়িতে ও বুঝিতে আরও মনোরম। সে সকল ভক্তচরিত্র-পাঠে সকলের হৃদয়েই ভক্তিরসের সঞ্চার হয়। সেগুলি কিরূপ মনোহর, তাহার একটি নমুনা এই,—

"জগন্নাথ মাধবদাস।

জগন্নাথ মাধবদাস নীলাচলের কোন একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে বাস করিতেন। বাল্যকাল হইতেই জগন্নাথের সহিত তাঁহার সখ্যভাব উদয় হইয়াছিল। সেই সৌহার্দ্দ-ভাব ক্রমে এতদূর বৃদ্ধি হয় যে, পরে সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করতঃ তিনি জগন্নাথ-ক্ষেত্রে বাস করেন। তথায় তিনি প্রথমতঃ অযাচক বৃত্তি অবলম্বন করিয়া দিবসত্রয় অনাহারে পতিত থাকেন। কেহই কিছু দেয় নাই, কিন্তু ভক্তের দুঃখে চিরদুঃখী, ভক্তের জন্য বৈকুণ্ঠের বৈভব পরিত্যাগকারী, সেই দয়াল জগন্নাথ, সাধু মাধব দাসের অনাহার-কষ্টে প্রপীড়িত হইয়া, তৎক্ষণাৎ বিবিধ অন্ন-ব্যঞ্জন ও মিষ্টান্নাদি স্বর্ণ থালাতে সাজাইয়া, লক্ষ্মীকে বলিলেন,—"তুমি সত্বর ইহা মাধবদাসকে দিয়া আইস।" ত্রৈলোক্য-সুন্দরী জগৎমাতা লক্ষ্মীদেবী প্রভুর আদেশমাত্র প্রসাদ লইয়া, যথায় ভক্ত মাধব দাস অনাহারে অন্নকষ্টে দীনভাবে পতিত, তথায় উপস্থিত হইলেন, এবং প্রসাদ রাখিয়া বিদ্যুতের ন্যায় অন্তর্ধান করিলেন। ভগবানের লীলা বুঝিতে ভক্তের বড় অধিক দেরি হয় না; মাধব জানিলেন যে, এ সকল জগন্নাথের লীলা। তখন ভাবাবেশে বিহ্বল হইয়া প্রসাদ গ্রহণ করিলেন।

পরদিবস জগন্নাথের পাণ্ডাগণ স্বর্ণথালি দেখিতে না পাইয়া মহা গণ্ডগোল আরম্ভ করিল। চতুর্দ্দিকে লোকজন অনুসন্ধান করিতে লাগিল, কিন্তু কেহই ঠিক করিতে পারে না। পরে প্রকাশ হইল যে, স্বর্ণথালি মাধবদাসের নিকট আছে। পাণ্ডাগণ তখন মাধবদাসের নিকট

যাইয়া দেখে যে, সত্য সত্যই স্বর্ণথালি তথায় পতিত রহিয়াছে, তখন সকলেই স্থির করিল যে, মাধবদাস নিশ্চয়ই চুরী করিয়াছিল; নতুবা স্বর্ণথালি সেখানে কেন আসিবে? হা ভগবান্! তোমার লীলা কে বুঝিবে? তোমার ভক্তদিগকে যে তুমি বিপদে ফেল, সে কেবল তাহাদের মাহাত্ম্য দেখাইবার জন্য! মূঢ়মতি পাণ্ডাগণ মাধবদাসকে চৌর সাব্যস্থ করিয়া বেত্রাঘাত আরম্ভ করিল। চোরের মার কে না জানে! কেহ মারিতে ত্রুটি করিল না। কিন্তু দীন মাধবদাস অ নত মস্তকে তাহা সহ্য করিলেন; একবার জিজ্ঞাসাও করিলেন না যে, তাঁহারা কেন তাঁহাকে মারিতেছেন। মাধবদাসকে প্রহার করিয়া পাণ্ডাগণ ক্লান্ত হইয়া পড়িল; কিন্তু মাধব একবারও কষ্ট প্রকাশ করিলেন না—যেন কে কারে মারিতেছে! এদিকে দীনবৎসল জগন্নাথ ভক্তের উপর অন্যায় অত্যাচার দেখিয়া, সত্বর পাণ্ডাদিগকে আদেশ-বাণী দ্বারায় বলিলেন,—"নির্ব্বোধ! তোরা যে মাধবদাসকে স্বর্ণথালির জন্য এত প্রহার করিতেছিস্, সে থালি যে আমিই তাহাকে দিয়া আসিয়াছি; আর তোরা যে উহাকে এত প্রহার করিলি, সে প্রহার যে সকলি আমারই অঙ্গে লাগিয়াছে! এই দেখ, আমার অঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছে, অনবরত রুধিরধারা নির্গত হইতেছে, আমি আর সহ্য করিতে পারি না।" আদেশ-বাণী শুনিবামাত্র পাণ্ডাগণ স্তম্ভিত হইল, এবং তৎক্ষণাৎ শ্রীমন্দিরে যাইয়া দেখিল যে, জগন্নাথের শ্রীঅঙ্গ হইতে সত্য সত্যই অনবরত রুধিরধারা বিনির্গত হইতেছে, এবং শ্রীঅঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হইয়াছে। এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া পাণ্ডাগণ মূর্চ্ছিত হইল। পরে সকলেরই মনে হইল যে, হায়! হায়! মাধবদাসকে প্রহার করিয়া তাহারা কি ভয়ানক অপরাধই করিয়াছে। সকলেই তখন মাধবদাসের পদপ্রান্তে পতিত হইয়া বহু স্তব-স্তুতি দ্বারা ক্ষমা প্রার্থনা করিল।"

তবে দুঃখের বিষয় এই যে, পুস্তকখানির ছাপা সুন্দর নহে, এবং বর্ণিত বিষয়গুলিও সম্যক কাঠিন্য-বর্জ্জিত নহে। তদ্ভিন্ন, স্থানে লিপি-দোষও দৃষ্ট হয়। লেখকের ভাষা অতি ভ্রমপূর্ণ; এমন কি স্থানে স্থানে তজ্জন্য পড়িতেই পারা যায় না। উদ্ধৃত অংশেও সেইজন্য অনেক পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে।

ভূগোল-শিক্ষা।— শ্রীবিপিনবিহারী সেন সঙ্কলিত। নিম্নশ্রেণীর ছাত্রদের ভূগোল-শিক্ষার উপযোগী বিষয় ইহাতে আছে। এ পুস্তকের ছাপা ও কাগজ ভাল। ইহা পাঠ্য-স্বরূপ গৃহীত হইলে ভাল হয়।

কলিকাতা-পথ-প্রদর্শক।— শ্রীপ্যারীমোহন দাস সম্পাদিত। এই পুস্তকে একখানি মানচিত্রসহ কলিকাতার রাস্তা-সমূহের বিবরণী লিখিত আছে। কোন্ নম্বরে কাহার বাড়ী ইত্যাদি বিবরণ ইহাতে পাওয়া যায়। পুস্তকখানি অনেকের উপকারে লাগিতে পারে। কিন্তু পুরাতন ডাইরেক্টারী দেখিয়াই ইহা সংগৃহীত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়; এবং সেইজন্য অনেক নাম-ধামের বিসদৃশ্য দেখা গেল। তবে পুস্তকখানির মূল্যের অল্পতায় ইহা অনেকেরই গ্রহণোপযোগী হইয়াছে।

পরীক্ষিতের ব্রহ্মশাপ।—শ্রীমণিলাল দত্ত বিরচিত। লেখকের ইহাই প্রথম উদ্যম; কিন্তু প্রথম উদ্যম বলিয়া অপ্রশংসনীয় নহে। পরীক্ষিৎ, শৃঙ্গী, কৃশ, শমীক, প্রভৃতির অংশ অভিনয়ে তো সুন্দর হইবে বলিয়া অনুমিত হয়; পড়িতেও পাঠ্য-পদবাচ্য। ধীরে ধীরে পরীক্ষিতের চিত্র যেরূপ উচ্চভাবে পরিণত হইয়াছে, তদ্দৃষ্টে বোধ হয়, চেষ্টা থাকিলে, গ্রন্থকার ভবিষ্যতে এরূপ চিত্র অঙ্কনে আরও সফলকাম হইবেন। এক কথায় পুস্তকখানি মন্দ হয় নাই। আমরা গ্রন্থকারের উন্নতির আশা করি।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

"বিদ্যাসাগর নাই"—নববর্ষের প্রারম্ভেই 'অনুসন্ধানকে' আজ এই নিদারুণ শোকসংবাদ মুখে করিয়া বাহির হইতে হইল। গত পরশ্য, ১৩ই শ্রাবণ রাত্রি ২টা ২২মিনিটের সময়, মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র ঈশ্বরস্থানে প্রস্থান করিয়াছেন। বাঙ্গালীর শিক্ষাগুরু, বাঙ্গালাভাষার জন্মদাতা, কত অনাথ-অতুরের সহায়-সম্বল—জগৎকে কাঁদাইয়া, বাঙ্গালাকে শোকসাগরে ডুবাইয়া—আজ অনন্তধামে চলিয়া গেলেন। বাঙ্গালা একে একে সকল রত্নগুলি হারাইয়াছিল, কিন্তু এক বিদ্যাসাগর থাকায় বঙ্গোলার মুখ উজ্জ্বল ছিল; কিন্তু আজ তিনিও বাঙ্গালাকে কাঁদাইয়া চলিয়া গেলেন।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র ১৮২০ খৃষ্টাব্দে হুগলী-জেলার অন্তর্গত 'বীরসিং' গ্রামে জন্ম-পরিগ্রহ করেন। তাঁহার পিতার নাম, ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। বিদ্যাসাগরই তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র। ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় পল্লীগ্রামবাসী সাধারণ গৃহস্থগণের ন্যায় বড়ই দরিদ্র-অবস্থার লোক ছিলেন। পুত্রকে ভালরূপে লেখা-পড়া শিখা-

ইবার ক্ষমতা তাঁহার আদৌ ছিল না। কিন্তু গ্রাম্য পাঠশালা হইতেই ঈশ্বরচন্দ্রের বিদ্যানুরাগ দেখিয়া, গ্রামস্থ সকলের পরামর্শক্রমে, আপনাদের সাংসারিক কষ্ট সহ্য করিয়াও, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় পুত্রকে ভালরূপে লেখা-পড়া শিখাইবার জন্য উদ্যোগী হয়েন। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ১লা জুন বিদ্যাসাগর মহাশয় কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে প্রবিষ্ট হয়েন; এবং ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে তথাকার অধ্যয়ন শেষ করেন। উক্ত বৎসরেই মাসিক ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা বেতনে তিনি 'ফোর্ট-উইলিয়ম কলেজের' প্রধান পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হয়েন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের ব্যবহারার্থ তাঁহার 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' পুস্তক প্রকাশিত হয়; এবং তিনি সংস্কৃত কলেজের সহকারী তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হয়েন। কিন্তু উক্ত কার্য্য তাঁহার পক্ষে সুবিধাজনক না হওয়াতে, এক বৎসর পরেই, তিনি ঐ কর্ম্ম পরিত্যাগ করেন। ইহার পর, ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে, মাসিক ৮০৲ টাকা বেতনে, তিনি 'ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের' প্রধান কেরাণীর পদ প্রাপ্ত হয়েন; এবং তৎপর বৎসর ডিসেম্বর মাসে মাসিক ৯০৲ টাকা বেতনে তাঁহাকে সংস্কৃত কলেজের একজন অধ্যাপক নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু উত্তরোত্তর তাঁহার কার্য্যক্ষমতার পরিচয় পাইয়া, তৎপরে দুই বৎসরের মধ্যেই ১৫০৲ দেড় শত টাকা বেতনে তিনি উক্ত কলেজের পরিচালকত্ব প্রাপ্ত হয়েন। এই সময়েই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'উপক্রমণিকা ব্যাকরণ' ও 'কৌমুদী' ব্যাকরণের তিন ভাগ প্রকাশিত হয়; এবং শিক্ষার্থীদিগের উহা বড়ই উপকারে আসিতে থাকে। কয়েকখানি সংস্কৃত পুস্তকের অনুবাদ করিয়া, এই সময় তিনি আরও কয়েকখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে, 'বিধবা-বিবাহ' সম্বন্ধীয় পুস্তক-সকল প্রকাশ করিয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা-বিবাহের প্রচলন-জন্য চেষ্টা পান; এবং তাঁহারই সম্যক আন্দোলন-আলোচনায় এই সময় ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে 'বিধবা-বিবাহ বিষয়ক আইন' পাশ হয়। উক্ত বৎসর ৭ই ডিসেম্বর বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিজের বাসভবন কলিকাতা-সুকিয়াস্ট্রীটের বাড়ীতে, তাঁহারই সম্যক যত্নে, প্রথম বিধবা-বিবাহ সম্পাদিত হয়। এই যৌবনোচিত কার্য্যেই বিদ্যাসাগর মহাশয় দুরপনেয় কলঙ্কে কলঙ্কিত হয়েন; এবং হিন্দু-সমাজ হইতে তাঁহাকে পরিত্যাগ করা হয়। কিন্তু তাঁহার এমনই জিদ যে, তিনি কিছুতেই সে কার্য্যে প্রতিনিবৃত্ত হয়েন না; অনেক সময় দেনা-পত্র করিয়াও, তিনি বিধবা-বিবাহ দিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। ফলতঃ এমন যে সর্ব্বগুণান্বিত সর্ব্বপূজ্য বিদ্যাসাগর—এই একটী কার্য্যেই, চন্দ্রের কলঙ্কের ন্যায়, তাঁহাকে কলঙ্ক-কালিমায় কলুষিত করিয়াছিল।

এই সময়ের মধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পাণ্ডিত্যের বিষয় সকলেই অবগত হয়েন; এবং দেশে-বিদেশে তাঁহার নাম প্রচারিত হইতে থাকে। গভর্ণমেণ্টও এই সময় (১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে) তাঁহাকে, একেবারে মাসিক ৫০০৲ পাঁচশত টাকা বেতনে, হুগলী, বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও নদীয়া-বিভাগের বিদ্যালয়-সমূহের 'ইনেস্পেক্টরের' পদ প্রদান করেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয় এই পদও পরিত্যাগ করেন। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে তিনি তাৎকালিক পাঠশালার শিক্ষাপদ্ধতির অনেক পরিবর্ত্তন করেন; এবং অনেকগুলি স্কুল-পাঠ্য পুস্তকও প্রণয়ন করেন; ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে বাল্য-বিবাহের অপকারিতার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পতিত হয়; কিন্তু তাহার প্রতিকারার্থ গভর্ণমেণ্টের কোনরূপ সাহায্য না পাওয়ায়, তিনিও সে বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। বিদ্যাসাগর মহাশয় স্ত্রীশিক্ষার বড়ই পক্ষপাতী ছিলেন, এবং তজ্জন্য নানাস্থানে অনেকগুলি বালিকা-বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। জন্মভূমির প্রতি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সম্যক অনুরাগ ছিল, এবং তজ্জন্য নিজ-ব্যয়ে তিনি ঐ গ্রামে একটী ইংরাজী বিদ্যালয় ও একটী দাতব্য-ঔষধালয় স্থাপিত করেন। এইরূপে কত যে পিতৃমাতৃহীন বালকবালিকা ও অনাথ-অতুর, এবং বিধবা স্ত্রীলোক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বারা প্রতিপালিত হইতেন, তাহার আর ইয়ত্তা নাই।

বাঙ্গালা ভাষার সংগঠনই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রধান কীর্ত্তি। তাঁহার 'প্রথমভাগ' 'দ্বিতীয়-ভাগ' হইতে 'সীতার বনবাস' প্রভৃতি পুস্তকগুলিতে তাঁহার নাম চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে খোদিত থাকিবে। বিদ্যা-প্রচারের সহায়তার জন্য বিদ্যাসাগর মহাশয় যে পরিশ্রম ও ব্যয়স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, তাহা আর বলিবার নহে। তাঁহার 'মেট্রপলিটান-ইন্‌ষ্টিটিউসান' নামক বিদ্যালয়টী তাঁহার এক অক্ষয় কীর্ত্তি। বাঙ্গালীর তত্ত্বাবধানে সুশৃঙ্খলায় ও বিশেষ গৌরবের সহিত পরিচালিত ইংরাজী স্কুল এদেশে উহাই প্রথম। প্রথমে উহার নামই 'ট্রেনিং এ কাডেমি' ছিল।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সম্মান জগতের সর্ব্বত্রেই। কিন্তু তিনি নামের বা মানের জন্য কখনই লালায়িত ছিলেন না। বরং তাঁহাকে কোনরূপে অধিক সম্মান করিলে, তিনি বিরক্ত বই কখনই সন্তুষ্ট হইতেন না। অথচ চারিদিক হইতে সকলে আপনা-আপনিই তাঁহার সম্মান বাড়াইত। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী যে দিল্লী দরবার-উপলক্ষে মহারাণী ভারতেশ্বরী 'সম্রাজ্ঞী'-পদবী-বাচ্য হয়েন; সেই উপলক্ষে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর মহাশয়ও গভর্ণমেণ্ট হইতে 'সি, আই, ই,' এই সম্মানসূচক উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। লোকে চেষ্টা করিয়া যাহা প্রাপ্ত হয় না, বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাতেও গৌরব মনে করিতেন না। যখন দেশের প্রধান প্রধান পণ্ডিতদিগকে 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি প্রদান করা হয়, বিদ্যাসাগর মহাশয়কেও তাহা প্রদান করিবার প্রস্তাব হয়; কিন্তু তিনি তাহা গ্রহণই করেন নাই; 'নামে আর কাজ কি' বলিয়া সকলই প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন।

জীবনের শেষ অবস্থায় বিদ্যাসাগর মহাশয় সংসারের সকল কোলাহল হইতে নিলিপ্ত হন; কিন্তু বয়সের সহিত নিদারুণ কাল কিছুতেই তাঁহাকে আর পরিত্যাগ করিল না। এতদিনে বাঙ্গালা বিদ্যাসাগর-শূন্য হইল। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুতে অনাথ বাঙ্গালী আরও অনাথ হইল; গরিব-দুঃখীগণ—যাহারা তাঁহার নিভৃত-দানে জীবন ধারণ করিত—আজ তাহারা সকলেই অনাথ হইল! দেশের সকলেই বিদ্যাসাগরের মৃত্যুসংবাদে আজ কাঁদিতেছেন।

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে সঙ্গে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয়ও আমাদিগকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া গিয়াছেন। গত ২৬এ জুলাই রবিবার ৬৮ বৎসর বয়ঃক্রমে তিনিও ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মত বিদ্বান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি বাঙ্গালায় আর নাই, জন্মিবারও সম্ভাবনা অতি অল্প। বিদ্যাসাগর মহাশয় ও রাজেন্দ্রলাল এ দুজনের মৃত্যুতেই দেশের যে দুইটী রত্নের ধ্বংশ হইল, তাহার আর পূরণ হইবার নহে।

১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারী কলিকাতার সন্নিহিত শুঁড়া-পল্লীতে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ৺ জন্মেজয় মিত্র। নবাবী আমল হইতেই ইঁহাদের বংশের সম্যক খ্যাতি-প্রতিপত্তি ছিল। ইহাঁদের আদিপুরুষ স্বর্গীয় পীতাম্বর মিত্র দিল্লির দরবারে প্রথমতঃ অযোধ্যার নবাব উজীরদিগের উকীল নিযুক্ত ছিলেন; পরে রাজসম্মানে সম্মানিত হইয়া এক সময়ে তিনি দশ-সহস্র সৈন্যের নায়কত্ব-পদ প্রাপ্ত হন, এবং নবাবদিগের নিকট হইতে বহুসংখ্যক জায়গীর প্রাপ্ত হন। কিন্তু মহারাষ্ট্র-যুদ্ধের সময়ই তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি অপহৃত হয়। অবশেষে, ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে, বৈষ্ণব-ধর্ম্ম গ্রহণান্তর তিনি উক্ত শুঁড়া-পল্লীতে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করেন।

তদবধিই রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়দিগের শুঁড়ায় বাসের সূত্রপাত হয়।

'পঞ্চম বর্ষ বয়সের সময় হইতে রাজেন্দ্রলাল পাঠশালে প্রবিষ্ট হন, এবং প্রায় তিন বৎসরে পাঠশালার পাঠ সমাপনান্তে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে পাথুরিয়াঘাটার ক্ষেম বসুর বিদ্যালয়ে এবং তথা হইতে গোবিন্দ বসাকের স্কুলে অধ্যয়ন করেন। ইহার পর কিছুদিন রাজেন্দ্রলালকে বড়ই পীড়িত থাকিতে হইয়াছিল। তৎপরে ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে তিনি কলিকাতার মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারী শিক্ষার্থ প্রবিষ্ট হয়েন, এবং দুই বৎসরমাত্র তথায় অতিবাহিত করেন। কিন্তু এই সময় স্বর্গীয় দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি বিলাত যাইবার জন্য প্রস্তুত হওয়ায়, এবং রাজেন্দ্রলালও সেই সঙ্গে যাইবেন ইচ্ছা প্রকাশ করায়, তাঁহার পিতা তাঁহাকে 'মেডিক্যাল কলেজ' হইতে ছাড়াইয়া লয়েন। ইহার পর তিনি আইন-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েন। কিন্তু নানা বিঘ্ন-বিপত্তিতে সেকার্য্যে ব্রতী হয়েন নাই।

রাজেন্দ্রলাল পারশী, হিন্দী, উর্দ্দু, সংস্কৃত, বাঙ্গালা, গ্রিক, ল্যাটিন, ফ্রেঞ্চ এবং জার্ম্মাণি প্রভৃতি অনেকগুলি ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর মধ্যে এত ভাষা আর কেহই জানিতেন না। রাজেন্দ্রলাল একজন অদ্বিতীয় প্রত্নতত্ত্ববিৎ ছিলেন। তাঁহার 'উড়িষ্যার পুরাতত্ত্ব' ও 'বুদ্ধগয়া' প্রভৃতি ইংরাজী পুস্তকগুলি গভীর গবেষণার ফল। এতদ্ভিন্ন, ইংরাজী, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষায় রাজেন্দ্রলাল অন্যূন ৫৫ খানি পুস্তক লিখিয়াছিলেন।

একজন বিচক্ষণ পণ্ডিত বলিয়াই রাজেন্দ্রলালের প্রতিপত্তি ছিল; এবং সেইজন্য ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে তিনি 'এসিয়াটিক সোসাইটির' সেক্রেটারী ও লাইব্রেরীয়ানের পদ প্রাপ্ত হন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে রাজেন্দ্রলাল 'কোট অব্ ওয়ার্ডের' অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েন; এবং সেরূপ দুরূহ কার্য্যও অতি সুশৃঙ্খলায় সম্পন্ন করেন।

১৮৭৫ অব্দে তিনি 'ডি এল' উপাধি প্রাপ্ত হয়েন; ১৮৪৭ সালে 'রাজা' উপাধি প্রাপ্ত হন। এতদ্ভিন্ন মিউনিসিপ্যাল কমিশনার, ব্রিটিস্ ইণ্ডিয়ান সভার সভ্য প্রভৃতি কার্য্যেও রাজেন্দ্রলাল দেশের অনেকের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছিলেন।

রাজেন্দ্রলালের পাণ্ডিত্য-বিষয়ে জগৎ-বিখ্যাত খ্যাতি ছিল। ইংলণ্ড, আয়র্লণ্ড, জর্ম্মাণি, ইটালি, আমেরিকা প্রভৃতির প্রধান প্রধান সাহিত্য-সভা হইতে রাজেন্দ্রলালকে সম্মানিত করা হইয়াছিল। সকল স্থান হইতেই তাঁহাকে নানা সম্মানসূচক উপাধি প্রদত্ত হইয়াছিল। ফলতঃ রাজেন্দ্রলালের মত বহুভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তি অতি বিরল।

এহেন রাজেন্দ্রলালের মৃত্যুতে কে না আজ দুঃখিত? কেবল ভারতবর্ষে কেন, পৃথিবীর চারিদিকেই তাঁহার জন্য যে শোকধ্বনি উঠিবে, তাহা বলা বাহুল্য। *

প্রাতঃস্মরণীয়।

"অহং দেবো নচান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং
ন শোকভাক্।
"সচ্চিদানন্দ রূপোঽহং নিত্যমুক্ত স্বভাববান্॥"

উপরি উক্ত শ্লোকটী আর্য্যজাতির একটী প্রাতঃস্মরণীয় বিষয়। যখন সুষুপ্তির শান্তিময় ক্রোড় হইতে উত্থিত হইয়া যেন পুনর্জ্জীবন লাভ হইবে, শরীর ও মনে নূতন বলের আবির্ভাব হইবে, উষাদেবী নবীন অরুণ-কিরণে বিভাষিত হইয়া আনন্দ-লহরী উত্থাপিত করিবেন, সেই বার্ত্তা লইয়া বীর-সমীর মর মর ও সর সর শব্দে কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিবে, এবং পক্ষীকুল মধুর কূজনে চারিদিক আকুলিত করিবে, সেই পবিত্র

* বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং রাজেন্দ্রলালের সঙ্ক্ষিপ্ত জীবনী মাত্র এবার প্রকাশিত হইল, সুবিধামত পরে তাঁহাদের জীবনের আর আর ঘটনাবলীও প্রকাশের বাসনা রহিল।

সময়ে মানবের স্মরণীয় কি? আধ্যাত্মিক জগতে প্রতিষ্ঠালব্ধ প্রাচীন হিন্দুজাতির অন্তঃকরণে স্বভাবতঃই এ প্রশ্নের উদয় হইয়াছিল, এবং তাহার সুন্দর মীমাংসাও হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা দেব-দেবীর নাম, গুরু-ভাবনা, কর্ত্তব্য-মনন, আদর্শ মানব-চরিত্র স্মরণ প্রভৃতি বহুবিধ প্রাতঃস্মরণীয়ের কথা বলিয়া গিয়াছেন। সকলেরই উদ্দেশ্য এই যে, পবিত্র সময়ে সঙ্কীর্ণ বা পাশব চিন্তা যেন মনে উদিত হইতে না পায়।

প্রকৃত মনুষ্যত্বই দেবত্ব; সেই দেবত্বের অধিকারী হইবার নিমিত্তই প্রাচীন হিন্দুগণ ব্যাকুল ছিলেন। তাই তাঁহাদের সে উন্নতযুগে ঋষিকুল জন্ম পরিগ্রহ করিয়া—ভারতকে ধর্ম্ম-জগতের ও মনুষ্য-জগতের শীর্ষ-স্থানীয় করিয়া যাইতে পারিয়াছেন। যদি মনুষত্ব লইয়া বিচার হয় অর্থাৎ স্বার্থপরতা, জীষাংসা, পরস্বাপহরণ, অসন্তোষ, কৃতঘ্নতা, শার্দ্দুলবৃত্তি, শৃগালবৃত্তি প্রভৃতি অমানুষী প্রকৃতি-নিচয়কে মনুষ্যত্বের অন্তর্ভূত না করা হয়, তবে এই অবনতির দিনেও ভারতের হিন্দুসন্তান জগতের শীর্ষস্থানীয়। হিন্দুর শরীরে যে রুধিরধারা বহিতেছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে সহস্র সহস্র শতাব্দীর অভ্যস্ত পবিত্র ভাব নিহিত রহিয়াছে। প্রতি কার্য্যে হিন্দুকে স্মরণ করিতে হয় যে, পশুত্ব হইতে মনুষ্যত্বের বিস্তর পার্থক্য। অতীব নিম্ন-শ্রেণীস্থ হিন্দুও পশুত্ব হইতে দূরে থাকিবার জন্য লালায়িত। অতি প্রাচীনকাল হইতে হিন্দু বুঝিয়াছে,—

"নলিনীদলগত জলমতি তরলং।
তদ্বজ্জীবনমতিশয় চপলং।"

এ চপল জীবনে কর্ত্তব্য-পালন ও ধর্ম্ম-রক্ষাই মানবের সার। তাই হিন্দুর প্রতি বাক্যবিন্যাসে ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি। সর্ব্বদা দেব-দেবীর নাম করিতে পাইবে বলিয়া, হিন্দুর পুত্র-কন্যার নাম দেব-দেবীর নামে। হিন্দু ত্রিসন্ধ্যা, সুখে, দুঃখে, কর্ত্তব্য-স্মরণ ও ধর্ম্ম-মনন করিতে বাধ্য। ইচ্ছা না থাকিলেও তাহাকে সংস্কার-বশতঃ অনেক সময় সংসারের কথা ভুলিয়া সার কথায় থাকিতে হয়। তাহার কারণ, ধর্ম্মভাব হিন্দুসমাজের স্তরে স্তরে মজ্জায় মজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে; কাজেই তাহা প্রকৃতিগত হইয়া গিয়াছে। প্রাতে উঠিয়া আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, ধনী-দরিদ্র, ভদ্র-অভদ্র, সকল হিন্দুকেই সংসারের কথা ভুলিয়া পবিত্র কথা মুখে আনিতে হয়, ইহা তাহার স্বভাব। কিন্তু ঐ সকল কথা যখন প্রথমে গঠিত হইয়াছিল, তখন যে উচ্চভাব, যে কার্য্যকারিতা ও যে পবিত্রতা তাহাদিগের সহিত মাখামাখি ছিল, এখন বুঝি আর তাহা নাই! তাই কথায় কাজে হিন্দুর এত প্রভেদ দেখা যাইতেছে। যে প্রাতঃস্মরণীয়ের উল্লেখ করিয়া আমাদের প্রবন্ধ আরম্ভ হইয়াছে, তাহার ভাব কত উচ্চ, কত মহৎ! কিন্তু তাহার সহিত তুলনায় আজ আমাদের কি দুর্দ্দশা। যে জাতির প্রাতরাবৃত্তি "অহংদেবঃ" সে কি নিজের মহত্বের কথা ভুলিয়া গিয়া নীচ দাসত্বের জন্য লালায়িত হইতে পারে? যে জাতি দৃঢ় বিশ্বাসে দেবাৎ "নচান্যোঽস্মি" কহিয়া গিয়াছে এবং তাহাই পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে সমাজে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবার আদেশ দিয়াছে, সেই জাতি আজি কোন্ প্রাণে পরমুখাপেক্ষী কুপোষ্য? যে জাতি মনুষ্যজীবনের মহত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া "ব্রহ্মৈবাহং" বাক্যের ঘোষণা করিয়াছে, সে কিরূপে আজি আত্মবিক্রয়ী! যে জাতির জ্ঞানী লোকের নিকট পার্থিব দুঃখ-শোক কিছুই স্থান পায় নাই, যে জাতি গভীর আত্মতত্ত্বের মীমাংসা করিয়া—আমি "ন শোক ভাক্" শোকভাগী নহি বলিয়া স্থির করিয়াছে, সে আজি কিরূপে শোকে ও শোকের ভয়ে জড়ীভূত! যে জাতি আজিও প্রাতঃকালে "সচ্চিদানন্দ রূপোহং" এই কথা উচ্চারণ করে, সে কিরূপে মুহ্যমান! প্রাতঃকালে উঠিয়া সংসারের কোন কার্য্যে ব্যাপৃত হইবার পূর্ব্বে যে জাতিকে স্মরণ করিতে হয় যে, আমি "নিত্যমুক্ত স্বভাববান্," সে জাতি কিরূপে ভারবহ জীবনে চিরদাসত্ব স্বীকার করে?

পতিত জাতির পুনরুদ্ধারের জন্য তাহার পূর্ব্ব-মহত্বের স্মৃতির উদ্দীপনা চাই। জাতীয় অবনতির দিনে তাহার শুদ্ধ ঠাটখানা বজায় থাকে, ভিতরের পদার্থ সকলি অন্তর্হিত হয়। আমাদেরও এখন তাই—ঠাটখানা দেখিলে অন্তঃসারশূন্য বিষম দুর্দ্দশার বিষয় স্পষ্টীকৃত হয়। প্রাণে ধিক্কার জন্মে যে, এমন মহৎ সমাজের, এমন মহৎ জাতির অন্তর্ব্বল পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্যোগ আমাদের নাই। হিন্দুর পুনরুত্থানের জন্য এখন অসাধারণ তেজ ও সাহসের প্রয়োজন। এখন প্রত্যেকের সর্ব্বদাই মনে থাকা চাই যে, "আমার দ্বারা কোন মহদুদ্দেশ্য সাধনের জন্য ঈশ্বর মানব জন্ম দিয়াছেন।" এখন অসমর্থ বোধে নিরুৎসাহী হইবার দিন নহে। এখন ফলের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া কর্ত্তব্য-পালনের দিন। এখন প্রাণ সমর্পণ করিয়াও মানব-ধর্ম্ম পালন করিবার দিন। এখন মানবে দেবত্ব-লাভই একমাত্র লক্ষ্য করিবার দিন। মোহে আচ্ছন্ন থাকিয়া আলস্যে কালহরণ করিবার দিন আর নাই। নিজের ক্ষমতার উপর সন্দিহান হইয়া—মৃতপ্রায় জীবিত-ক্ষেপণের দিন আর নাই। "প্রাণ বড় ধন" বলিয়া উদ্দেশ্যহীন জড়বৎ প্রাণ রাখিবার দিন আর নাই। "যা শত্রু পরে পরে" বলিয়া শেয়ানা হইবার দিন আর নাই। স্বার্থপরতা, নিরুৎসাহ, অযথা লাভ, অযথা যশাকাঙ্ক্ষা, বৃথা মায়া, অতি লোভ, বচন-সর্ব্বস্বতা প্রভৃতি আপদগুলা মনে যাহাতে স্থান না পায়, সর্ব্বক্ষণ তাহারই চেষ্টা থাকা উচিত। ইহার উপায় সর্ব্বদা স্মরণ ও মনন— অহং দেবো নচান্যোঽস্মি"। এমন্ত্রে সিদ্ধ হইলে তাহার আর নীচত্বের ভয় থাকিবে না। যখনি কর্ত্তব্যের কথা উপস্থিত হইবে, তখনি মন্ত্রবলের পরীক্ষা হইবে। স্বার্থপরতা কাছে আসিলে দেখিবে, মনের স্তরে স্তরে লেখা আছে "অহং দেবো নচান্যোঽহং"; অমনি তাহাকে ভয়ে দূরীভূত হইতে হইবে। ভীরুতা সে মনের নিকট স্থান পাইবে না, নিরুদ্যম তাহাকে আক্রমণ করিতে পাইবে না। নির্জ্জীব হিন্দুজাতি ঐ স্মরণীয়ের কথা ভুলিয়াছে, অথবা মনে থাকিলেও উহা নামে মাত্র আছে; তাই হিন্দুর এমন দুর্দ্দশা। এই নিরাশার দিনে যখন হিন্দু রাজকটাক্ষে শশঙ্কিত, ভয়ে আত্মহারা, নিরুৎসাহে ম্রিয়মান, নিজ কার্য্য-ক্ষমতায় সন্দিহান দাসত্বে মহা উদ্যোগী, স্বজাতি-প্রিয়তায় পরাংমুখ, অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন, তখন তাহার প্রাণের ভিতর সেই নিত্য-মন্ত্রের উদ্বোধন করা আবশ্যক—যাহাতে সে এক দণ্ডের মতও না ভুলিতে পারে যে, "অহং দেবো নচান্যোঽহং", "অহং নিত্যমুক্ত স্বভাববান্।" আমি দেবতা, আমি ব্রহ্মস্বরূপ; আমি শুদ্ধ শরীর মাত্র নহি, শরীর নাশ হইলে আমার ধ্বংস হয় না, ইহজীবন লইয়াই আমার অস্তিত্ব বদ্ধ নহে, আমি বর্ত্তমান দেহ নাশ হইলেও মরিব না, শোকে অভিভূত হওয়া আমার অজ্ঞানমাত্র, আমি যে নশ্বর-দেহ ধারণ করিয়া আছি তাহাতেও আমার দেবভাব অন্তর্হিত হয় নাই। দেবোচিত কার্য্য না, করিলে আমার মন প্রশস্ত থাকিতে পারে না এবং আমার কর্ত্তব্যানুষ্ঠান হয় না। নীচত্বে স্থান দিলে আমার দেবভাবের অপলাপ হয়। এই ক্ষণভঙ্গুর দেহ-রক্ষার্থ ব্যাকুল হইতে হইলে "নিত্য মুক্ত স্বভাববান্" বলিয়া যে বিশ্বাস, তাহার অপলাপ করা হয়। আমি "নিত্য মুক্ত স্বভাববান্", অতএব অধীনতা স্বীকার আমার স্বভাবের বিরুদ্ধ। লৌকিক কষ্টে মুহ্যমান হইয়া পরমুখাপেক্ষী হইতে হইলে আমার অবনতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন হয়। সন্তোষ ও উদ্যম উভয়ই আমার প্রকৃতিগত। এই কথাগুলি কোন হিন্দু যেন বিস্মৃত না হয়। সকল হিন্দুর মনে যদি ওভাব জাগরূক থাকে, তবে হিন্দুর এ দুর্দ্দিন কোনরূপে স্থায়ী হইতে পারে না। তাই বলি, আমরা যেন না ভুলি,—

"অহং দেবো নচান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং নশোকভাক্।
সচ্চিদানন্দ-রূপোঽহং নিত্য মুক্ত স্বভাববান্।"

উক্ত শ্লোকটী মনের আড়াল যেন না হয়। নিদেন প্রাতঃকালেও যেন একবার আমরা ও গুলির আবৃত্তি, স্মরণ ও মনন করিয়া দিবসের কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই।

অনুসন্ধান-সমিতির বিবরণী।

প্রতারণা-প্রবঞ্চনা।

বিজ্ঞাপন দিয়া জুয়াচুরী,

আজকাল চলিতেছে, প্রধানতঃ এই তিন প্রকারে। এক পুস্তকের বাজারে, দ্বিতীয় ঔষধের বাজারে—প্যাটেণ্ট ঔষধে ও হোমিওপ্যাথিক ঔষধে, তৃতীয়তঃ কেমিকেল সোণার গহনায় এবং তাড়িৎ অঙ্গুরী, অনন্ত ও কবজের বিজ্ঞাপনে। বলা বাহুল্য, এই তিন রকমের বিজ্ঞাপনেই নানা-রকমের নানা লোভানী আছে; নানা উপহারের কথা, নানা দানের কথা—বড়মানুষ করিয়া দিবার কথা, এই সকল বিজ্ঞাপনেই বেশী। আর, গ্রাহকগণও সর্ব্বদাই ঠকেন, এই সকলে। এই সকল শ্রেণীর ব্যবসায়ীদের নাম করিয়া আর কাহারও বিরাগভাজন হইতে ইচ্ছা করি না; কিন্তু মোটামুটি সকলের জানা উচিত যে, বিজ্ঞাপন দিয়া এই সকল জিনিসের বাজারেই আজকাল অধিক জুয়াচুরী চলিতেছে। কিন্তু এসম্বন্ধে আমরা সর্ব্বাপেক্ষা দোষ দিই, গ্রাহকদের। গ্রাহকগণ কেন লোভে ভোলেন, এই তো দুঃখ! তাঁহারা যেখানে অধিক লোভানী—যেখানে অধিক বাক্যের ছটা, সেখানে যদি না যান, তবেই তো সকল গোল চুকিয়া যায়! কিন্তু বলিব কাহাকে কি? এক লোভেই যে সকল সর্ব্বনাশ করিয়াছে! যাইহোক্, এসম্বন্ধে আর কাহারও নিন্দা না করিয়া, আমরা কেবলমাত্র গ্রাহকগণকে বলিতেছি যে, কলিকাতায় সৎ ও অসৎ দুই শ্রেণীরই লোক আছে। তাঁহারা লোভে না ভুলিয়া উপযুক্ত লোকের নিকট অর্ডারাদি দেন, এই বাসনা। এই জন্য, তাঁহারা যাহাতে এখনও সতর্ক হইয়া অন্ততঃ কোন্ দোকানে না ঠকিতে হয়, তাহার পরিচয় লউন।—কলিকাতার পুস্তকের দোকানের মধ্যে বাঙ্গালী পল্লীতে 'সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটারী,' গুরুদাস বাবুর 'বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী,' এম. এম. মজুমদারের দোকান, এস. কে. লাহিড়ী এণ্ড কোম্পানীর দোকান, ক্যানিং লাইব্রেরী, বি. বানার্জ্জি কোম্পানীর দোকান, পাঁড়ে ব্রাদার্স, মনোমোহন লাইব্রেরী, মহেশ বাবুর দোকান, কলেজ লাইব্রেরী, জে কে শর্ম্মা এণ্ড কোংর দোকান প্রভৃতিই প্রসিদ্ধ। তদ্ভিন্ন, আরও দুই চারিখানি ভাল দোকানও অবশ্য আছে। এইরূপ হোমিওপ্যাথিক ঔষধের দোকানের মধ্যে বাঙ্গালীদের দ্বারা পরিচালিত, এল. ভি. মিত্র এণ্ড কোং, লাহিড়ী এণ্ড কোং, মৈত্র এণ্ড কোং, মুখার্জ্জি এণ্ড কোং প্রভৃতি কতকগুলিই আমাদের জানিত। তদ্ভিন্ন, আরও অনেকগুলি অবশ্য ভাল দোকান আছে। সে সকলের পরিচয়ও ক্রমে ক্রমে আমরা সাধারণকে প্রদান করিব। ফলতঃ এই সকল ভাল ভাল দোকান থাকিতে, লোভের কুহকে পড়িয়া, সাধারণে কেন প্রতারিত হয়েন, এই দুঃখ। এইরূপ অন্যান্য বিষয়েরও অনেক ভাল দোকান আছে। সে সকলেরও পরিচয় ক্রমশঃ দিব। তবে কেমিক্যাল ও তাড়িৎ প্রভৃতির আদৌ কোন মূল্য না থাকায়, ওসকলের কাহারও নাম আমরা করিতে ইচ্ছুক নহি। আমাদের বিশ্বাস, তাঁহাদের সকলেরই সমান। তবে ফল পাওয়া না পাওয়া সে স্বতন্ত্র কথা।

বাজারের জুয়াচুরী।

বিজ্ঞাপন দিয়া জুয়াচুরী ব্যতীত বাজারে আর যে সকল জুয়াচুরী হয়, তাহাও সাধারণের জানা উচিত। এক রকম জুয়াচুরী,—এরারুট বলিয়া খড়ির গুঁড়া বিক্রয় করা। পরিষ্কার লেবেল-আঁটা বাক্সে, ইংরাজী-বাঙ্গালা নানারূপের নামের ভড়ংওয়ালা টিনের মধ্যে, অনেক স্থলে এরা-

রুটের' বদলে চা-খড়ির গুঁড়া থাকে। কোন কোন স্থলে উপরে কতকটা এরারুট, এবং নীচেয় ঐরূপ খড়ি। রোগীর অথবা বালকের খাদ্য এরারুট, কিন্তু তাহাতেও এই কারসাজি! ক্রেতার এ সম্বন্ধে বিশেষ সাবধানতা প্রয়োজন। পথ্যের বদলে ইহার বিষগুণ আবার আরও ভয়ানক। আর এক রকম জুয়াচুরী,—কেরসিন তেলের টিনের মার্কা-নম্বর বদ্লান। বিদেশ হইতে যে কেরসিন তেল আসে, তাহার ১নং, ২নং প্রভৃতি নম্বর-ওয়ারী দাম থাকে। কিন্তু জুয়াচোরেরা এখানে সেই টিকিট বদলাইয়া, সেই ২নম্বরকে ১নম্বর করিয়া, সাধারণকে ভুলাইয়া থাকে! অনেক সময় তেলে ভেজাল মিশাল দিয়াও থাকে। আর এক রকম জুয়াচুরী,—ইহা কাগজ বিক্রেতারা করিয়া থাকে। এ জুয়াচুরী দুই তিন রকমেই হইয়া থাকে। প্রথমতঃ জুয়াচোর কোম্পানীরা টিকিট বদলায়, অর্থাৎ একটা কম ওজনের কাগজের রিমের উপর একটা বেশী ওজনের কাগজের টিকিট আঁটে, এবং তাহা বেশী ওজনের কাগজ বলিয়া বেশী দরে বিক্রয় করে। এইরূপ দেশী কাগজকে বিলাতী কাগজ বলিয়া, এক মার্কার কাগজকে অন্য মার্কার কাগজ বলিয়া, বিক্রয় করিয়া থাকে। এ জুয়াচুরীও আজকাল বাজারে বড়ই হইতেছে। বিশেষ যে সকল কাগজে হাতের লেখা নম্বর বা ওজন থাকে, তাহাতে তো কথাই নাই; একটা মুছিয়া আর একটা লেখা আর শক্ত কি? এভিন্ন, রিমের ভিতর কম কাগজও দেওয়া থাকে; অর্থাৎ মাঝ হইতে দুটা একটা করিয়া বাহির করিয়া লইয়া, কিছুতেই বুঝিতে দেয় না। এইরূপ আরও নানা জুয়াচুরী বাজারে হইয়া থাকে; অথচ সেগুলি সকলেরই জানা কর্ত্তব্য। আমরাও সময় সময় তাহা সাধারণকে জানাইব।

—

বিবিধ প্রসঙ্গ।

সম্মতি-আইনে আবার বিচার।

গত বারের 'অনুসন্ধানে' 'রেঙ্গুনের' একটী মকর্দ্দমার বিষয় প্রকটিত হইয়াছিল। এবার কৃষ্ণনগরে ঐরূপ এক মকর্দ্দমা! কামিল সেখ শান্তিপুরের একজন মুসলমান; সে তাহার ১০ বৎসর বয়স্কা বালিকা স্ত্রীর সহিত সহবাস করিয়াছে, এই বলিয়া অভিযুক্ত হয়। এ মকর্দ্দমাটায়ও অবশেষে ডাক্তার দ্বারায় বালিকাকে পরীক্ষা করান হইয়াছিল। কিন্তু ডাক্তার মহাশয় পরীক্ষা করিয়া, ভাগ্যে ভাগ্যে যেই বলিলেন যে, বালিকার বয়স ১২ বার বৎসরেরও উপর, সেই রক্ষা! নহিলে অভাগা কামিলের অদৃষ্টে যে কি ঘটিত, তাহা বলা যায় না। যাইহোক, এ মকর্দ্দমাও যে বিষম ষড়যন্ত্রের ফল, তাহা আর এখন কাহারও বুঝিতে বাকী নাই। মুসলমানদের স্ত্রীলোকেরা (অবশ্য নিম্ন-শ্রেণীর মধ্যে) দুই তিন বার বিবাহ করিতে পারে; এবং বিবাহে কন্যার অভিভাবকেরা টাকা-কড়িও পাইয়া থাকে। এ মকর্দ্দমায়ও তাই উদ্দেশ্য থাকে, পুরাতন স্বামীটাকে ঐ একটা অছিলায় দ্বীপান্তরে পাঠাইয়া দিয়া, কিছু বেশী টাকা লইয়া, অপর এক জনের সহিত কন্যার বিবাহ দেওয়া হইবে। এমনই ষড়যন্ত্রে এই মকর্দ্দমার সৃষ্টি! যাহা হউক, এ সকল দেখিয়াও, গভর্ণমেণ্ট এখনও ইহার উপায় করুন, এই বাসনা। হিন্দু-মুসলমান সকলেই যে আইনে ব্যথিত, তাহা আর বলিবার নহে। সুতরাং এখনও আইন রদ হউক।

মণিপুরের রাজবংশের

পক্ষ হইতে বড়লাট বাহাদুরের নিকট আবেদন-পত্র পাঠান হইয়াছে। কিন্তু যেরূপ গতিক দেখা যাইতেছে, তাহাতে কোন ফলোদয় হইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া বোধ হয় না।

—

অনুসন্ধান
অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র
৫ম খণ্ড] ৩২এ শ্রাবণ, ১২৯৮। [২য় সংখ্যা।

রক্ষ রক্ষ, ভগবান!

(১)

বিষাদ-তিমিরে গ্রাসে আশা-শশী।
যেদিকে তাকাই, শূন্য দশদিশি॥
আঁধার—আঁধার—আঁধার চৌদিকে।
দৃষ্টি চলে না, আঁধার জগৎ-গ্রাসী॥
যায় প্রাণ, রক্ষ রক্ষ, ভগবান॥

(২)

অহো কি ভীষণ, গরজিছে ঘন,
জ্বলন্ত বিদ্যুৎ চকিছে অম্বরে।
এই বুঝি হয়, অশনি-পতন,
এই বুঝি লয়, এ জীবন হরে।
ডাকি তাই, রক্ষ রক্ষ, ভগবান॥

(৩)

কে রাখিবে এবে, বিধি নিজে বাম!
বিধিই ধরেছে স্বকরে কৃপাণ!
বিধিই এবার বধিবে সবায়।
বিধির বিপাকে নাহি আর ত্রাণ।
মিছা ডাকি, রক্ষ রক্ষ, ভগবান॥

—

হিন্দু-পরিবার।

হিন্দু-পরিবার পূর্ব্বে যাহা ছিল, এক্ষণে তাহা নাই; বিংশতি বৎসর পূর্ব্বে ইহা যে প্রকার সুখের ও শান্তির বিহার-ভূমি ছিল, এক্ষণে তাহাও নাই—আছে কেবল ফলফুল-পত্রশাখা-শূন্য কাণ্ড মাত্র। শিক্ষা ও সভ্যতার স্রোতে পড়িয়া সমাজ বিস্তর পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সেই পরিবর্ত্তনে ভালমন্দ উভয়ই লক্ষিত হয়, সত্য; কিন্তু পাশ্চাত্য-শিক্ষা ও সভ্যতার তরঙ্গে পড়িয়া হিন্দু-পরিবার যে প্রকার ছিন্নভিন্ন এবং অসুখ ও অশান্তির আলয় হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে মর্ম্মে বড় আঘাত লাগে। হিন্দু-পরিবার বলিলে কি বুঝায় এবং তাহার অর্থ কি, বোধ হয়, তাহা নির্দ্দেশ করিবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই—যাঁহারা হিন্দু-পরিবার দেখিয়াছেন এবং তাহার অন্তর্গত ছিলেন, তাঁহাদিগের অবর্ত্তমানে যে বাঙ্গালা-অভিধানে একটি শব্দ যোগ করিতে হইবে, তাহাতে আর বড় সংশয় নাই। কালে হিন্দু-পরিবার অশ্ব-ডিম্বে পরিণত হইবে!

প্রকৃত পক্ষে, হিন্দু-পরিবার একটি ছোট খাট রাম-রাজ্য; রাজা, প্রজা, অমাত্য ইহাতে সকলই আছে—নাই কেবল অমর সিংহ! সংসারের যিনি "কর্ত্তা", তিনি এই ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজা; তাঁহার সহিত সম্বন্ধ-নৈকট্য ও বয়স-অনুসারে কেহ কেহ বা অমাত্য ও কর্ম্মচারী, এবং যাহারা কেবল উপার্জ্জন করে বা খাইয়া খেলিয়া বেড়ায় ও সংসার পরিচালনার সহিত অপর কোন সম্বন্ধ রাখে না, তাহারা প্রজা-শ্রেণী-ভুক্ত। পিতা, মাতা, ভার্য্যা, পুত্র, কন্যা, ভাই, ভগ্নী, বধূ, জামাতা, ভাগিনেয়, ভাগিনেয়ী,

শ্যালক, ভগ্নীপতি, ভ্রাতুষ্পুত্র ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রভৃতি যাঁহার সহিত কোনপ্রকার সম্বন্ধ আছে, তিনিই এই রাজ্যে বসবাস করিতে পারেন। পরিবার বা family বলিলে এক্ষণে যেমন কেবল স্ত্রী ও অবিবাহিত পুত্রকন্যাকে বুঝায়, পূর্ব্বে তেমন বুঝাইত না। সম্বন্ধ নিকট বা দূর হউক না, যাঁহার ইচ্ছা হইত তিনিই যে কোন সংসারে আসিয়া বাস করিতে পারিতেন, এবং কর্ত্তাও বিনা-বাক্যে বা অসন্তোষে তাঁহাকে আপন পরিবার-ভুক্ত করিতে বাধ্য ছিলেন—করিলে সুখ্যাতি ছিল না, না করিলে নিন্দা ছিল। সংসারে সুখদুঃখ গণনা না করিয়া পরিবারস্থ প্রত্যেকেই আপন আপন কার্য্য করিতেন, এবং সকলেই পরস্পর সমসুখী বা সমদুঃখী থাকিতেন—স্বতন্ত্র বাস করিবার কল্পনা পাপ-মধ্যে পরিগণিত ও অজানিত ছিল। কুক্ষণে ইংরাজী শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছে—এক্ষণে আর হিন্দু-পরিবার দেখা যায় না, পরের সুখ-দুঃখে আর কাঁহাকেও আপন সুখ-দুঃখ মিলাইতে দেখি না। সাম্য, মৈত্রী, সৌভ্রাত্ব কেবল কথার কথা!

পাশ্চাত্য-শিক্ষা দেশব্যাপী হইবার পূর্ব্বে লোকে বুঝিত যে, একত্রে বহু-ব্যক্তি বাস করাই প্রকৃত বল ও সুখ; এবং আপদ-বিপদে ও অভাব-দুঃখে পরস্পর সাহায্য ও সহানুভূতি করাই মনুষ্যত্ব। তৎকালে লোকে নিজের সুখ-দুঃখের প্রতি বিশেষ মনোযোগী ছিল না—আত্মীয়-বন্ধুর সুখ-দুঃখে আপন সুখ-দুঃখ মিলাইয়া দিয়া এক অনির্ব্বচনীয় স্বর্গীয় আনন্দ উপভোগ করিত। এক্ষণে স্বার্থই ভারতের মেরুদণ্ড—'আপ্ত রাখিয়া ধর্ম্ম' আমরা প্রতি কার্য্যে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। পাশ্চাত্য-শিক্ষার যতই গুণ থাকুক না, ইহা আমাদিগকে স্বার্থপরতা শিক্ষা দিয়া আমাদিগের যে অপকার করিয়াছে, তাহা যে আর কোনও কালে সংশোধিত হইবে, এমন আশা নাই। ক্রমে যতই দিন যাইতেছে, স্বার্থপরতার তরঙ্গে পড়িয়া আমরা ততই অবনত হইতেছি, এবং হৃদয়ের শিক্ষায় মহামূর্খে পরিণত হইয়া মস্তিষ্কের শিক্ষাকেই সার জ্ঞান করিতেছি। পূর্ব্বে হৃদয়ের শিক্ষা প্রবল ছিল, সুতরাং আপনার সুখ-দুঃখ চাপিয়া রাখিয়া, লোকে পরের অদৃষ্টের সহিত আপনার অদৃষ্ট মিলাইয়া দিয়া, পরম সুখ-শান্তির নিকেতন হিন্দু-পরিবার সৃষ্টি করিয়াছিল।

হিন্দু-পরিবারভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি বা প্রত্যেক শ্রেণীর কার্য্য স্বতন্ত্র। এই প্রস্তাবে আমরা কয়েক ব্যক্তির বা শ্রেণীর কার্য্য পৃথক্ পৃথক্ বর্ণন করিব। প্রথমে কর্ত্তা। তিনি সকলের বয়ঃজ্যেষ্ঠ এবং কার্য্যক্ষম। সংসার-মধ্যে কর্ত্তার অপেক্ষা বয়ঃজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি থাকিতে পারেন; কিন্তু, তিনি অশক্ত বা অপটু হইয়া, যিনি কর্ম্মঠ এবং বয়সে তাঁহার অব্যবহিত নিম্নে, তাঁহার হস্তে সংসারের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, এবং সংসারে লিপ্ত না থাকিয়া কেবল ধর্ম্মালোচনায় কালাতিপাত করেন। সংসারের আয়, ব্যয় ও সংসার-পরিচালনার ভার সমস্ত কর্ত্তার হস্তে। যিনি যাহা উপার্জ্জন করিবেন, সমস্তই কর্ত্তার নিকট জমা দিবেন, এবং যাঁহার যাহা প্রয়োজন হইবে, সমস্তই তাঁহার নিকট হইতে লইতে হইবে। বিষয়, ভূমি, বাগান, পুষ্করিণী সমস্ত কর্ত্তার তত্ত্বাবধানে; দান, ধ্যান, ক্রিয়া-কর্ম্ম সমস্তই তাঁহার ইচ্ছা ও কর্তৃত্বের অধীন। তাঁহার অনভিমতে পরিবারভুক্ত অপর কোনও ব্যক্তি কোন কার্য্য করিতে সাহস বা ইচ্ছা করে না। তাহার কারণ এই যে, কর্ত্তা যাহা সংসারের মঙ্গলদায়ক বুঝিবেন, তাহাই করিবেন—যাহাতে কুফল ফলিবার সম্ভাবনা, কর্ত্তা স্বতঃই তাহা হইতে নিবৃত্ত থাকিবেন; বিশেষতঃ তিনি সর্ব্বাপেক্ষা বয়ঃজ্যেষ্ঠ ও বিজ্ঞ বলিয়া সমস্তই তাঁহার বিবেচনাধীন। পরিবারের সকলেই কর্ত্তাকে ভয় ও সম্মান করিবে, এবং প্রত্যেক কার্য্যে তাঁহার আজ্ঞাধীন থাকিবে। ইংরাজ-রাজত্বে ও ইংরাজী-শিক্ষায় আমরা যে

প্রকার ভয় শিক্ষা করিয়াছি, কর্ত্তাকে সে প্রকার কেহই ভয় করিত না—সে ভয় ভক্তিমিশ্রিত, সে ভয় স্বর্গীয়, সে ভয় পাপস্রোত-প্রবাহিত জগতে ঈশ্বর-ভয়ের ছায়া। কুক্ষণে স্কুল-কলেজ স্থাপিত হইয়াছিল, কুক্ষণে ইংরাজী-শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছিল—সে প্রকার ভয় আর এক্ষণে নাই; পিতামাতা গুরুজনকে যে প্রকার ভয়, ভক্তি ও সম্মান করা কর্ত্তব্য, এক্ষণে তাহা লুপ্ত হইয়াছে। আমরা দেখিয়াছি যে, যে সকল ব্যক্তি বিজ্ঞমধ্যে বিশেষ বিজ্ঞ, সামাজিক অবস্থায় উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন, এবং দেশমধ্যে মান্য-গণ্য লোক, তাঁহারাও কর্ত্তার সম্মুখে অবনত-মস্তকে কথা-বার্ত্তা কহিতেন; এবং অনুগত ভৃত্য যেমন সদয় প্রভুর সহিত ব্যবহার করে, সেই প্রকার ব্যবহার করিতেন, কখনও আপনাকে অবমানিত জ্ঞান করেন নাই। কর্ত্তাও পরিবারস্থ প্রত্যেক ব্যক্তিকে সমান স্নেহ ও যত্ন করিতেন, এবং প্রত্যেক ব্যক্তির মঙ্গলের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেন। তাঁহার তত্ত্বাবধানে সমস্তই সুশৃঙ্খল ছিল, এবং সামান্য পালিত পশু-পক্ষীটি পর্য্যন্ত কখন কষ্ট পাইত না। আমরা কোন একটী পরিবারের কর্ত্তার দৈনন্দিন কার্য্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়া এ প্রবন্ধ শেষ করিব।

ইহা একটী কায়স্থ-পরিবার, কলিকাতার ৭ ক্রোশ দূরে বাস করিতেন। সংসারের মধ্যে যিনি বয়ঃজ্যেষ্ঠ, তিনি বিষয়-কর্ম্মের অনুরোধে কলিকাতায় থাকিতেন (মধ্যে মধ্যে বাটী যাইতেন, কখন বা বাটী হইতে প্রত্যহ কলিকাতা যাতায়াত করিতেন); সুতরাং প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাই সংসারের কর্ত্তা ছিলেন। পরিবারভুক্ত এতগুলি লোক ছিলেন যে, কাহার সহিত কি সম্বন্ধ, তাহা দুই চারি দিনে স্থির করা এক প্রকার দুঃসাধ্য। দুই ভ্রাতার পুত্র, অবিবাহিতা কন্যা, বধূ, পৌত্র, পৌত্রী, কোন কোন সস্ত্রীক জামাতা, বিধবা পিশী, মাসী, ভগ্নী, তাঁহাদিগের পুত্র-কন্যা এবং কাহারও বা পুত্র-বধূ, ভাগীনেয়দিগের কাহারও বা পিতৃমাতৃহীন পুত্র-কন্যা প্রভৃতি সর্ব্বসমেত ৮০।৮৫ জন ব্যক্তি এক সংসারে বাস করিতেন, এবং দাস-দাসীর সংখ্যাও ১০।১২ জন হইবে। কর্ত্তা অতি প্রত্যূষে শয্যা হইতে উঠিয়া মুখ-প্রক্ষালনাদি করিয়া গো-শালায় গিয়া তাহা দাস-দাসীর দ্বারা পরিষ্কৃত করাইতেন, এবং গো-সকলকে রীতিমত আহার দেওয়াইতেন। তৎপরে ভৃত্য সমভিব্যাহারে বাগানে গিয়া শাক-সবজী ও নানা প্রকার ফল-মূল আনিতেন; এবং কৃষকেরা কি প্রকার বাগানের কাজ করিতেছে, তাহা দেখিতেন ও তাহাদিগকে আবশ্যকমত উপদেশ দিয়া আসিতেন। তৎপরে গৃহিণীর সহিত (জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ভার্য্যার হস্তে গৃহিণীর কার্য্যভার ছিল) পরামর্শ করিয়া বাজার হইতে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি আনিবার বন্দোবস্ত করিতেন, এবং কোন কোন দিন বা স্বয়ংই ভৃত্য-সহিত বাজারে যাইতেন। ইহার পরে প্রায় ৩ ঘণ্টা-কাল স্নান ও পূজা-আহ্নিক করিয়া স্বয়ং অতিথি-সেবার বন্দোবস্ত করিতেন। যে দিবস বাটীতে অতিথি থাকিতেন, সেদিবস তাঁহাদিগের ভোজন সমাপন না হইলে, কর্ত্তা কখনই স্বয়ং ভোজন করিতেন না। আহারান্তে অল্পক্ষণ শয়ন করিতেন—নিদ্রা যাইতেন না। এই সময়ে কখন বা বাটীর ছোট গৃহিণী আসিয়া কর্ত্তার সেবা করিতেন, এবং প্রতিদিনই বাটীর ছোট ছোট বালক-বালিকারা কেহ বা পদ-সেবায়, কেহ বা পাখা লইয়া বাতাস করিতে, কেহ বা মস্তকের পক্ক কেশ উৎপাটন করিতে নিযুক্ত থাকিত। কর্ত্তা তাহাদিগের কাহাকে পয়সা, কাহাকে পুত্তলিকা, কাহাকে খেলেনা ইত্যাদি দিয়া আদর করিতেন। এই প্রকারে এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা কাটিয়া গেলে, কর্ত্তা বহির্ব্বাটীতে আসিয়া বসিতেন; এবং পুরোহিত মহাশয় ও পাড়ার কয়েক জন বৃদ্ধ ব্যক্তির সহিত মিলিত হইতেন। পুরোহিত মহাশয় গীতা, ভাগবত প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ সকল পাঠ করিতেন, সকলে

মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিতেন—কখন বা এক আধখানা বাঙ্গালা সংবাদপত্রও পঠিত হইত। সন্ধ্যাকালে পাঠ সমাপন করিয়া ঠাকুর-ঘরে গিয়া সন্ধ্যা-বন্দনা করিতেন, এবং শালগ্রামের আরতি দেখিতেন—এই সময়ে প্রায়ই বালক-বালিকাদিগের ঘড়ী-কাঁশর বাজাইবার ঝগড়া মিটাইতে হইত। অনন্তর গোমস্তাকে লইয়া (যৎ-সামান্য) জমীদারীর আদায়,উশূল, বন্দোবস্ত প্রভৃতি কার্য্যে এবং উপস্থিত প্রজাদিগের সহিত কথা-বার্ত্তায় নিযুক্ত থাকিতেন। ইহার পরে বাটীর ভিতরে আপন গৃহে গিয়া বসিতেন, এবং সংসারের জমা-খরচ, আয়ব্যয় প্রভৃতি দেখিতেন—পুত্র ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভৃতি যদি কাহারও কর্ত্তার সহিত কোন বিষয়ের পরামর্শ করিবার বা উপদেশ লইবার থাকিত কিম্বা কর্ত্তার কাহারও প্রতি কোন আজ্ঞা থাকিত, তাহা এই সময়ে দেওয়া হইত। অতঃপর আহারাদি করিয়া শয়ন করিতেন। এ সকল নিয়মিত কার্য্য; এতদ্ভিন্ন যখন যাহা উপস্থিত হইত, তাহা সমাধা করিতেন; এবং একা না পারিলে পরিবারস্থ অপর দুই এক বা তদধিক ব্যক্তির সাহায্য গ্রহণ করিতেন। বিষয়-আশয়-সম্বন্ধীয় সমস্ত কার্য্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নামে চলিত, এবং কর্ত্তাও সমস্ত তাঁহারই নামে করিতেন। এমন কি, কাগজপত্রে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম-স্বাক্ষরও করিতেন—এক্ষণে এ প্রকার ঘটনা হইলে জাল করা হয়।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

শোক-স্মৃতি।

বিদ্যাসাগর সাগরোপমমতে নিক্ষিপ্য শোকাম্বুধৌ
দীনাং ভারতভূমিকামতারণাং যাতঃ কুতো নির্ম্মমঃ।
পশ্চৈনাং বিবশাং সকৃদ্গুণনিধে হাহারবোল্লাপিনীং
কোবাস্তে ভবতা সদৃক্ কত যতঃ শান্তিং ব্রজেদ্ভূরিয়ম্॥
হন্তাদ্যায়মপূর্ব্ব বাড়বমহাবহ্নিঃ সমুদ্ভাসিতঃ
কস্মাৎ যেন শুশোষ সিন্দুরতুলো বিদ্যাদিরত্নাকরঃ।
কেনায়ং বিহিতঃ করালবদনো রাহুর্বিধাত্রা যতো
গাঢ়গ্রাসমতীব সম্প্রতি মহাংশ্চন্দ্রোঽগমস্তারতে॥
কেনাহারি সমুজ্জ্বলো মণিরসৌ সৌভাগ্যরূপো ভুব
শ্ছিন্নং কেন দুরাত্মনা বিকসিতং বঙ্গে হ্রদে পঙ্কজম্।
নীতং কেন বিদূরতঃ খলু মহৎ মন্দারপুষ্পং স্থিতঃ
একং ত্বাং হরতা বদস্ব বিধিনা কিং নো হৃতং নো মহন্॥
আবির্ভূয় ধরাতলে গুণনিধে কিং কিং ত্বয়া নো কৃতং
সচ্ছিক্ষা পদবী দয়া বিতরণং মৈত্রীজনে সাম্যধীঃ।
বিদ্যাগেহমতুল্যমস্য জগতো জ্ঞানায় সচ্ছাসনং
সর্ব্বং তৎ তব গৌরবং বিতনুতে ত্বং বর্ত্তসে কুত্র বা॥
কৃতান্ত সাধুং জগদেক গৌবরং হরন্ন সাধোবত লজ্জসে ন কিং।
পিশাচবৎ কার্য্যমতীব ভীষণং স্বভাবতো যৎ তত এব নো তথা॥

বিধে বিধেনৈব বিভেষি দারুণাৎ তনোতি বাষ্পানি যতোঽখিলো জনঃ।
জগৎপিতুস্তে বিধিরেষ নোদিতা যথা স্বপোতে জলজস্য চেষ্টিতম্॥
তড়িল্লতাবন্নিয়তিঃ সুচঞ্চলা প্রদর্শ্য সৌখ্যায় স্থিতিং ততোঽশনিং।
সুদারুণং নিক্ষিপতীতি ভীষণং বজ্রং বিনিক্ষিপ্তমদস্তয়াত্র হি॥
হে ভারত ত্বং পরমেশ নিগ্রহাৎ ভাগ্যৈঃ সমস্তৈঃ পরিবর্জ্জিতোঽভবঃ।
কিং বা রুদিত্বা করবাম দুর্ভগা নিদারুণো যান্ প্রতি দেব ঈশ্বরঃ॥

ঈশ্বর বৈকুণ্ঠে।

(১)

হা অবোধ কেন কাঁদ?—কেন বা নিশ্বাস?
শূন্য প্রাণে আকাশের পানে কেন চাও?
যেখানে বুকের ব্যথা,
হাত দিয়ে দেখ সেথা,
ব্যথার ভিতরে তিনি, যাঁরে নাহি পাও।
ব্যথার পৃথিবী এই,
ব্যথা ছাড়া কিছু নেই,
ব্যথার মনুষ্য ধরাময়;
যার বুকে যত ব্যথা,
তার বুকে তত সুখ,
ব্যথা ছাড়া কিছুই তো নয়।
ব্যথার ঈশ্বর যিনি,
ব্যথায় থাকেন তিনি,
তবে কেন ব্যথা তুমি ভুলিবারে চাও?
ব্যথারে আদর কর,
ব্যথারে জড়ায়ে ধর,
দুঃখ যাবে, সুখ পাবে; কাঁদা ভুলে যাও।

(২)

দারুণ মোহের বশে,
মোহিত হয়ো না আর,
ফুটন্ত ব্যথার এবে জীবন্ত উচ্ছ্বাস;
ব্যথার ঈশ্বর মোর,
বুকের ব্যথায় মিশে,
পূর্ণরূপে নিজরূপে হয়েছে প্রকাশ।
ব্যথা-ভরা বক্ষ মোর
সুখের বৈকুণ্ঠ-ধাম,
সে বৈকুণ্ঠ এতকাল শূন্য প'ড়েছিল;
এবে সে বৈকুণ্ঠ মাঝে
আমার ঈশ্বর সাজে,
হৃদয়ের প্রাণ মোর হৃদয়ে বসিল।
এত দিন ফাঁকে ফাঁকে
পারিনি ধরিতে তাঁরে,
ফাঁকা মনে—ফাঁকা প্রাণে—ফাঁকা বুকে ছিনু।
বুক-ভরা ধন মোর
বুকের ভিতরে এলো,
ঈশ্বরে হারায়েছিনু—আবার পাইনু।

(৩)

আমার ঈশ্বর প্রভু,
আমার প্রাণের প্রাণ,
আমার গুরুর গুরু, জ্ঞানের জ্ঞেয়ান;
অপার দয়ার সিন্ধু,
অসংখ্য দীনের বন্ধু,
ভাষার ভাস্কর ইন্দু, দেবতা মহান্।
বিধবার কাতরতা,
অনাথের প্রাণব্যথা,
ছাত্রের জীবন গুরু ঈশ্বর আমার;
বিদ্যার সাগর ধীর,
সত্যের তেজস্বী বীর,
অন্যায়ের মহাবৈরী, ন্যায়-অবতার।
গাম্ভীর্য্যের মহা মূর্ত্তি,
রহস্যের মহাস্ফূর্ত্তি,
শিষ্টের পালন প্রভু দুষ্টের দমন;
অমর ঈশ্বর মোর
অমরগণের সনে
হৃদয়-বৈকুণ্ঠে মোর বিরাজে কেমন।

(৪)

মোর মত শত শত
লক্ষ লক্ষ হৃদয়েতে
এতদিনে পূর্ণরূপে ঈশ্বর বিকাশ :
একটি বৈকুণ্ঠ নয়,
লক্ষ লক্ষ ততোঽধিক
হৃদয়-বৈকুণ্ঠ এবে ঈশ্বর-নিবাস।
কেন তবে কাঁদ সবে,
"জয়েশ্বর" উচ্চ রবে
তোলা সুর বহু দূর আকাশ ভেদিয়া ;
পৃথিবীর যে যেথায়,
শুনুক্ সে উচ্চ সুর,
কোটি কোটি চক্ষু মেলি দেখুক চাহিয়া—
বাঙালীর ঘরে ঘরে,
লক্ষ লক্ষ—ছয় কোটি
হৃদয়-বৈকুণ্ঠ মাঝে দয়ার সাগর
ঈশ্বর—ঈশ্বর—গুরু অমর ঈশ্বর।

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

বিদ্যাসাগরের বাল্য-জীবন। *

২০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত।

অন্নের ভিখারী, দরিদ্রের সন্তান, নিজের অধ্যবসায় ও যত্নের গুণে, কিরূপে মহতের উচ্চতম পদবীতে অধিষ্ঠিত হইতে পারেন, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনী তাহারই জীবন্ত দৃষ্টান্ত। গভীর দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্য হইতে যেরূপে তিনি আপনাকে বরণীয় করিয়া গিয়াছেন, তাহা অতীব চমকপ্রদ। প্রথমতঃ যে গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়, তাহা সামান্য পল্লীগ্রাম মাত্র। দুই চারি ঘর দরিদ্র ব্রাহ্মণ, কয়েক ঘর কৃষক এবং দুই এক ঘর মুচি-মাত্রই সে গ্রামের অধিবাসী। গ্রামে ছিল স্কুল, না ছিল তেমন পাঠশালা। সাধারণ কৃষকের বাসোপযোগী পল্লীগ্রাম যেরূপ হইয়া থাকে, তাহাও সেইরূপই ছিল। সেই গ্রাম (বর্ত্তমান মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত বীরসিংহ † গ্রামে) তেমনই এক ঘর দরিদ্র ব্রাহ্মণের গৃহে (১৮২০ খৃষ্টাব্দের ১২ই আশ্বিন মঙ্গলবার বেলা দুই প্রহরের সময়) বিদ্যাসাগর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ৺ ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং তাঁহার মাতার নাম ৺ ভগবতী দেবী। ৺ ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় একে দরিদ্র, তাহাতে লেখা-পড়াও তেমন জানিতেন না। সামান্য 'বাঙ্গালা'-মাত্র জানিতেন ; এবং তাহাতেই যোগেযাগে একটী গোমস্তাগিরি চাকরী সংগ্রহ করিয়া কোনরূপে কায়ক্লেশে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। এই উপলক্ষে তাঁহাকে সর্ব্বদাই কলিকাতায় মণিবের কাজকর্ম্ম করিতে হইত ; এবং তিনি তাঁহার মণিবের (কান্দী নিবাসী ৺ ভগবৎচরণ সিংহ ও তৎপুত্র ৺ জগদ্দুর্লভ সিংহই তাঁহার মণিব ‡ ছিলেন। কলিকাতাস্থ বড়বাজার-দরেহাটার বাড়ীতে (এই বাড়ী এক্ষণে কার্ত্তিক জহুরীর অধিকৃত) অবস্থিতি করিতেন। তাঁহার মাসিক বেতন ছিল, ১০৲ টাকা মাত্র। তাহা হইতেই তাঁহাকে পুত্র-পরিবারের জীবন বাঁচাইতে হইত।

বাল্যকাল হইতেই বিদ্যাসাগর মহাশয়

* বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্ক্ষিপ্ত জীবন-চরিত গত বারের 'অনুসন্ধানেও' কিঞ্চিৎ প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার সে মহৎ জীবনের শতাংশের একাংশও যে তাহাতে বলা হয় নাই, তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। তাই তাঁহার জীবনের স্থূল স্থূল আরও কএকটী ঘটনা ক্রমশঃ প্রকাশ করিবার বাসনা।

† বীরসিংহ পূর্ব্বে হুগলী-জেলার অন্তর্গত ছিল ; পরে মেদিনীপুর-জেলার সৃষ্টি হওয়ায় তদবধি উহা মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত হইয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেন, তখন যদিও উহা হুগলী-জেলার অন্তর্গত ছিল ; কিন্তু এক্ষণে উহা মেদিনীপুর-জেলার মধ্যে পরিগণিত।

‡ পত্রান্তর পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ৺ ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতায় যোড়াসাঁকো-নিবাসী রামসুন্দর মল্লিকের বাটীতে সামান্য সরকারীগিরি চাকরী করিতেন। রামসুন্দর জাতিতে তামলি ছিলেন।

অতিশয় তেজস্বী ও 'দুষ্ট বালকের' মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। তাঁহার নিজেরই মুখে শুনা গিয়াছে, তিনি বলিয়াছেন,—"ছেলে-বেলায় আমি বড়ই দুষ্ট ছিলাম। লোকের বাগান হইতে ফল পাড়িয়া খাইতাম ; কেহ সে কথা বলিতে আসিলে, তাহাকে আবার মারিতে যাইতাম। কেহ কাপড় শুকাইতে দিলে, তাহাতে বাহ্যে করিয়া আসিতাম। লোকে আমার জ্বালায় বিব্রত ছিল।"

বাল্য-জীবন এরূপে কাটাইতে কাটাইতেই, পাঁচ বৎসর বয়সের সময়, যথারীতি বিদ্যাসাগর মহাশয় গ্রাম্য-পাঠশালে প্রবিষ্ট হয়েন ; এবং ৺ হরিদাস ভট্টাচার্য্য নামক এক ব্যক্তির নিকট পাঠাভ্যাসে রত হয়েন। এই সময় হইতেই তাঁহার সম্যক বিদ্যানুরাগ প্রকাশিত হয়। এবং, তদ্দর্শনে, তাঁহার পিতার বন্ধু-বান্ধবগণ, তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া গিয়া, ভাল করিয়া লেখা-পড়া শিখাইতে বলেন। কিন্তু তাঁহার পিতার সে ক্ষমতার অভাব ; বিশেষ, অত অল্প বয়সে জননীকে ছাড়িয়া, কি করিয়াই বা তিনি কলিকাতায় থাকিতে পারিবেন? কাজেই, এইরূপ সাত-পাঁচ ভাবিয়া, প্রথমতঃ তাহাতে অমত করেন। কিন্তু পরে যখন দেখেন যে, বিদ্যাসাগর মহাশয়ও কলিকাতায় পড়িতে যাইতে সম্যক ইচ্ছুক এবং কলিকাতার বাসার ক্লেশ সহিতেও পরাঙ্মুখ নহেন ; তখন কাজেই, বন্ধু-বান্ধবগণের অনুরোধে, তিনিও পুত্রকে কলিকাতায় লইয়া যাইতে স্বীকৃত হয়েন। এইরূপে ৮ বৎসর বয়সের সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রথম কলিকাতায় আগমন করেন ; এবং একটী পাঠশালায় প্রবিষ্ট হয়েন। কিন্তু, ইহার ৩।৪ মাস পরেই, কলিকাতার তাৎকালিক জলবায়ু সহ্য না হওয়ায়, তিনি বড়ই পীড়িত হইয়া পড়েন ; এবং তাঁহার পিতা মহাশয় আবার তাঁহাকে বাড়ী লইয়া যান। বাড়ী যাইয়া, একটু সারিয়াই, বিদ্যাসাগর মহাশয় আবার কলিকাতায় পড়িতে আসিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। কাজেই, তাঁহার পিতাও, তাঁহাকে আবার কলিকাতায় লইয়া আসেন ; এবং এই সময় (১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ১লা জুন) বিদ্যাসাগর মহাশয় 'সংস্কৃত কলেজে' প্রথম প্রবিষ্ট হয়েন।

'সংস্কৃত কলেজে' প্রবিষ্ট হইয়া, বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বড়ই কষ্টের জীবন অতিবাহিত করিতে হয়। তাঁহার পিতা সর্ব্বদাই মণিবের কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন ; সুতরাং স্কুলে যাইবার সময় কে তাঁহাকে দু'টা ভাত দিবে? কাজেই, এই সময় বিদ্যাসাগর মহাশয়কে রন্ধন-কার্য্যেও নিযুক্ত হইতে হইয়াছিল। রন্ধন করিয়া আহার করিয়া তবে তাঁহাকে 'কলেজে' যাইতে হইত। কোন কোন দিন বা রাত্রে রাঁধিয়া রাখিয়া, প্রাতে তাহাই খাইয়া, কলেজে যাইতেন। এভিন্ন সময় সময় বাজার হইতে চাউল, ডাউল ও তরকারী প্রভৃতিও তাঁহাকে কিনিয়া আনিতে হইত। দারিদ্র্য-ক্লেশে তাঁহাকে কলেজেও অতি হীনবেশে যাইতে হইত ; সামান্য একখানি কাপড় পরিয়া ও সামান্য একখানি চাদর গায়ে দিয়াই তাঁহাকে কলেজে যাইতে হইত—তাঁহার পায়ে কখনও একজোড়া জুতাও জুটিত না। অধিকন্তু, সময় সময় ছেঁড়া চাদর ও কাপড় প্রভৃতি পরিয়াও স্কুলে যাইতে হইত। তদ্ভিন্ন, এ সময় তাঁহাকে আরও একটী ভয়ানক কষ্ট সহ্য করিতে হইত এই যে,—সময় সময় চাউল ও তরকারী প্রভৃতি আনিতে এবং সেই উপলক্ষে জননীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে তাঁহাকে বাড়ী যাইতে হইত। কিন্তু তাঁহার জন্মস্থান বীরসিংহ কলিকাতা হইতে প্রায় ২৫ ক্রোশ পথ। অথচ সেই পথটা সমস্তই তাঁহাকে হাঁটিয়া যাইতে হইত। তখন তাঁহার এমন সঙ্গতি ছিল না যে, তিনি নৌকা করিয়া বা অন্য কোনরূপ যান-যোগে বাড়ী যান। তাঁহার পিতাকেও অবশ্য এইরূপে হাঁটিয়া যাইতে হইত। অধিকন্তু, কলিকাতায় আসিবার সময়,

বাড়ী হইতে দ্রব্যাদি যাহা কিছু লইয়া আসিতেন, তাহাও নিজেকে বহিয়া আনিতে হইত। মুটের বা লোকের পয়সা কে দিবে? তাছাড়া, এরূপও শুনা গিয়াছে, বাড়ী হইতে আসিবার সময় অনেক সময় তাঁহার আর আহারাদিও হইত না। বাড়ী হইতে তাঁহার মাতা মুড়ি ও গুড় প্রভৃতি সঙ্গে যাহা কিছু দিয়া দিতেন, তাহাই খাইয়া অতটা পথ চলিয়া আসিতেন। ভাল খাওয়া ও ভাল পরার প্রতি তাঁহার ভ্রূক্ষেপও ছিল না, আর থাকিলেই বা তাহা পাইবেন কোথায়? এমনই কষ্টের উপর বিদ্যাসাগর মহাশয়কে পাঠ অভ্যাস করিতে হইত।

এত কষ্ট, অথচ তাঁহার তেজস্বিতা এক দিনের জন্যও কমে নাই। 'স্কুলের ছেলেরা আমার অপেক্ষা ভাল পড়া পারিবে, আর আমি তাহাদের নীচে বসিব, একি সহ্য হয়?' তাই তিনি স্কুলের পড়া মুখস্থ করিতে করিতে এক একদিন প্রায় সমস্ত রাত্রিই কাটাইয়া দিতেন। রাত্রিতে ভিন্ন প্রাতে তো আর তাঁহার অবসরই হইত না! কিন্তু, আশ্চর্য্যের বিষয়, এত সাংসারিক পরিশ্রম-ক্লেশের উপরও—এরূপভাবে স্কুলের পড়া প্রস্তুত করিয়াও, কলেজের যে শ্রেণীতে যখন পড়িতেন, বিদ্যাসাগর মহাশয় সেই শ্রেণীরই তখন প্রথম ছাত্র বলিয়া পরিগণিত ছিলেন।

হাসিব, না কাঁদিব?

('অনুসন্ধানের' নব-বর্ষারম্ভে)

এ নব বরষে, মনের হরষে,
দেখিব মোহন হাসি।
দেখিব কোথায়, প্রকৃতির গায়,
চ'কিছে আনন্দ-রাশি॥
তরু মুকুলিত, লতা সুশোভিত,
দেখিব তাহার গায়।
চাঁদের কোলেতে, তারকাগুলিতে,
কিবা সুন্দর সাজায়!।
ফুল্ল-ফুলকলি, ফুটাইত অ…
হরষে গাইত গুণ্ গুণ্।
ময়ূর-ময়ূরী, কেকা-রব ক…
নাচিয়া গাহিত বিভু-গুণ॥
দেখিব এমন! কিন্তু এ কেম…
দেখি, সব বিপরীত!
বিপরীত দৃশ্য, শোকাকুল …
শোক-বাস-পরিহিত॥
হাস্যমুখী চাঁদে, ঘেরিছে বিষা…
মলিন মুখ-কমল।
অবিরল ধারে, বরিষা-আসা…
ঝরিছে চোখের জল॥
কাঁদিছে প্রকৃতি, কাঁদে উষা-সু…
কাঁদে তরুলতাগণ।
কাঁদিতে কাঁদিতে, লুটিছে মাটিে…
কুসুম-সুন্দরীগণ॥
কুলা ভাঙ্গে ঝড়ে, শিশু-পাখী ম…
পিতা-মাতা কাঁদে তায়।
শব্দ শনৃশন্, উল্কাপাত …
ত্রাসে মেদিনী কাঁপায়॥
প্রকৃতি এমন! মানব-জীব…
এর চেয়ে প্রাণে-মরা!
দুর্ভিক্ষ-রাক্ষসি, গ্রাসে ওই আ…
কিবা মূর্ত্তি ভয়ঙ্করা!
শান্তি-সুখ-হরা, রোগ-শোক-জ…
অকাল-মরণ আর।
কত অত্যাচার, কত অবিচা…
(প্রাণে) ব্যথা দিতেছে অপার॥
এত দেখিতেছি, এত সহিতেছি…
আরও কত বা সহিব!
তবুও কি আর, আছে জিজ্ঞাসার,—
(আমি) হাসিব, না কাঁদিব?

অদৃষ্ট।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

'স্বভাব না যায় মলে।'

আরব্য উপন্যাসে আছে,—"কোন এক কৃষক পশুদিগের কথা বুঝিতে পারিত। সেই কৃষকের একটী গর্দ্দভ ছিল। বলদ প্রতিদিন লাঙ্গল চষিত, গর্দ্দভ প্রতি হাটবারে কৃষকের দ্রব্যাদি বহন করিয়া লইয়া হাটে যাইত। সুতরাং গর্দ্দভকে প্রতি সপ্তাহে দুই দিবসের অধিক কাজ করিতে হইত না। এক দিবস, বলদ হলাকর্ষণে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া বাটী আসিলে, গর্দ্দভ তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল, —'ভাই বলদ! তোমার ন্যায় অল্পবুদ্ধি লোক দেখিতে পাই না। তুমি প্রতিদিন এরূপ কষ্ট পাও কেন? দেখ, আমি তোমা অপেক্ষা কম আহার পাই না, তথাপি আমি সপ্তাহে দুই দিবসের অধিক কাজ করি না। আর তুমি রোজ রোজ কাজ করিয়া মারা পড়িতেছ। এরূপ পরিশ্রম করিলে তুমি আর ক'দিন বাঁচিবে?' বলদ উত্তর করিল,—'ভাই! আমি সাদ করিয়া ত প্রতিদিন কাজ করি না; কিন্তু আমার আর উপায়ান্তর নাই, কি করি! প্রত্যহই কাজ করিতে হয়।' গাধা কহিল,—'তুমি এক দিবস আহার করিও না, পর দিবস তোমাকে আর হলাকর্ষণ করিতে হইবে না।' বলদ গাধার উপদেশানুসারে সে রাত্রি কিছুমাত্র আহার না করিয়া শয়ন করিয়া রহিল। পর দিবস প্রাতে কৃষকের ভৃত্য আসিয়া কৃষকের নিকট কহিল,—'মহাশয়! বলদের পীড়া হইয়াছে। গত রাত্রে সে কিছুই খায় নাই, অদ্য সে হলাকর্ষণ করিতে পারিবে না।' পূর্ব্বদিবস গর্দ্দভে ও বলদে যে কথোপকথন হইয়াছিল, কৃষক তাহা সমস্তই শুনিয়াছিল। কহিল,—'আচ্ছা, আজ গাধাকে লইয়া গিয়া লাঙ্গলে জুড়িয়া দেও।' প্রভুর অনুমত্যানুসারে গর্দ্দভকে কেবল সে দিবস নহে, তদবধি প্রতিদিনই হলাকর্ষণ করিতে হইত। বলদ প্রতিদিনই পীড়িত-ভান করিয়া শয়ন করিয়া থাকিত। মহামায়ার রন্ধনে প্রতিদিন দোষ দেখাইয়া দেওয়ায় ও সে চুরি করিয়া খায় ইত্যাদি তাহার নামে দোষারোপ করায়, কর্ত্তা ও গৃহিণী উভয়েই স্থির করিলেন,—প্রতিদিন জয়দুর্গা সমস্ত ব্যঞ্জনাদি পাক করিবেন, মহামায়া কেবল ভাত রাঁধিবেন। সেই অবধি জয়দুর্গার পরিশ্রম বাড়িয়া গেল। তাহার ব্যঞ্জনাদি হইলে মহামায়া এক হাঁড়ি ভাত রাঁধিয়া দিয়াই অবসর পাইত। বস্তুতঃ জয়দুর্গা নিজের পায়ে নিজেই কুঠারাঘাত করিল। পরিত্রাণের উপায়ও আর নাই। এমন সময় দৈব আসিয়া জয়দুর্গার আনুকূল্য করিল। জয়দুর্গাকে শ্বশুরালয়ে যাইতে হইল। সুতরাং মহামায়ারও চোর ধরিয়া দিবার প্রতিজ্ঞা নিষ্ফল হইল দেখিয়া, সেও নিজবাটী (অর্থাৎ আমার বাটী) ফিরিয়া আসিল।

জয়গোপালের পিতা অত্যন্ত পীড়িত হইলেন। রক্ষা পাইবেন কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ হইল। এজন্য তিনি স্বজন-সকলকে দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তদনুসারে জয়দুর্গাকে লইয়া যাইবার জন্য জয়গোপাল পালকি-বেহারা পাঠাইয়াছিলেন। জয়দুর্গার শ্বশুরালয়ে যাইবার ইচ্ছা ছিল না। পূর্ব্বে একবার গিয়াছিলেন; কিন্তু, সেবার কাহারও সহিত বনি-বনাও না হওয়ায়, অতি অল্পদিনের মধ্যেই পিত্রালয়ে প্রত্যাগমন করেন। তদবধি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যতদিন জয়গোপাল পৃথক বাটী না করিতে পারিবেন, ততদিন আর শ্বশুরালয়ে যাইবেন না। কিন্তু আপাততঃ তথায় গমন করিলে রন্ধন-ভার লাঘব হইবে, এইজন্য তথায় যাইতে কোন আপত্তি উত্থাপন করিলেন না। 'অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্ব ন যায়তে।' যাহার যে স্বভাব, তাহা কখন পরিবর্ত্তন হয় না। কাকের বাসায় কোকিলের ছানা প্রতিপালিত হয়; কিন্তু রব

করিতে শিখিলে সে কুহু কুহু করে, কা কা করে না। মহামায়া ও জয়দুর্গা, উভয়েই বাল্যাবস্থায় সমান স্নেহে, সমান যত্নে ও সমান আদরে প্রতিপালিত হইয়াও, উভয়ের স্বভাব একরূপ না হওয়ায়, যৌবনকাল উপস্থিত হইলে, উভয়েই ভিন্ন ভিন্ন আচরণ আরম্ভ করিল। মহামায়ার স্বভাব কোমল। সে সকলেরই সহিত মিষ্ট আলাপ করিত, কাহাকেও উচ্চ কথা কহিত না; সর্ব্বদাই তাহার মুখে হাসি লাগিয়া ছিল; ছেলে-পিলে দেখিলেই, নিজেরই হউক আর পরেরই হউক, অমনি কোলে লইত। জয়দুর্গা স্বভাবতঃ কম কথা কহিত, কাহারও সহিত অধিক মিশিত না, কালে-ভদ্রে ভিন্ন হাসিত না; আর, কাপড় অপরিষ্কার হইবে বলিয়া, পরের ছেলে দূরে থাকুক, নিজের ছেলেকেও কোলে লইত না। উভয়ের স্বভাবের এই পার্থক্য প্রথমে প্রকাশিত হয় নাই। বিবাহের পর হইতে এসমস্ত লক্ষিত হইতে লাগিল। নদীর মিষ্ট জল যেরূপ সমুদ্রে পড়িলে লবণাক্ত হইয়া যায়, সেইরূপ বিবাহের পর স্ত্রীর স্বভাব স্বামীর স্বভাবের সহিত একত্রীভূত হয়। এতদ্ভিন্ন, এ দুই ভগ্নীর এরূপ পৃথক স্বভাব হইবার আর কোন কারণ দেখা যায় না। জয়গোপালের স্বভাব, এই কথাতেই বোধ হয়, সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন। জয়গোপালের দুইটি সহোদর ভ্রাতা ছিল; একটী তাঁহা অপেক্ষা বড় ও একটী ছোট। বড়টির নাম রামগোপাল ও ছোটটীর নাম কৃষ্ণগোপাল। এতদ্ভিন্ন, তাঁহার একটি ভগ্নী ছিল। ভগ্নীটী সর্ব্ব-কনিষ্ঠা, নাম সুখদা।

জয়গোপাল কখনও বড় ভ্রাতার সহিত আলাপ করিতেন না; বরং তাঁহাকে ঘৃণাই করিতেন। কারণ, তিনি ইংরাজী ভাষা জানিতেন না; বি, এ, বি, এল, হওয়া দূরে থাকুক। ছোট ভাইটী নিকটে আসিতে ভয় করিত, সর্ব্বদাই তাঁহা হইতে দূরে থাকিত, এবং ভাবিয়া পাইত না,—কি প্রকারে মানুষ বি, এ, বি, এল, হইতে পারে। জয়গোপালও তাহাকে নিকটে আসিতে দিতেন না। সে বেচারা আপনার দু'একখানি পুস্তক লইয়া বিরলে বসিয়া পাঠ করিত।

অনেকে বড় সহরকে বড় অরণ্যের সহিত তুলনা করিয়া গিয়াছেন। বড় সহরের লোকে বাটীর পার্শ্বের লোককে চিনে না; সে কিরূপ লোক, জানে না; তাহার থাকা না থাকা তাহার পক্ষে সমান; সে যদি পশু হয়, তাহাতে তাহার ক্ষতি নাই; যদি মনুষ্য হয়, তাহাতেও কোন লাভ নাই। অরণ্যেও সেইরূপ। তুমি যে বৃক্ষে বসিয়া আছ, তাহার নিকটবর্ত্তী বৃক্ষে যে কোন পশু থাকুক, তাহাতে তোমার ক্ষতি-বৃদ্ধি কিছুই নাই। সুতরাং অরণ্যে যে বাস করে, সে যেমন সর্ব্বদাই একাকী থাকে, সেইরূপ বড় সহরে যে বাস করে, সেও একাকী থাকে। জয়গোপাল অরণ্যেও বাস করিতেন না, বড় সহরেও নহে। তাঁহার নিজের বাটীতেই থাকিতেন। কিন্তু যতদিন তথায় থাকিতেন, ততদিন একাকী বাস করিতেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বড় ভ্রাতার সহিত আলাপ করিতেন না, ছোট ভ্রাতাকে নিকটে আসিতে দিতেন না। জয়দুর্গা বাটীতে না থাকিলে বাটীর অভ্যন্তরে যাইতেন না; অন্যান্য পরিজনের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ অতি সূক্ষ্ম-সূত্রগত। অত্যন্ত অনুরোধ-পরতন্ত্র না হইলে প্রতিবাসীবর্গ বা লোকের সহিত কথা কহিতেন না। পল্লীগ্রামে বি, এ, বি, এল, ডুমুর-ফুল সদৃশ, প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। যদি আর একজন বি, এ, বি, এল, পাওয়া যাইত, বোধ হয়, জয়গোপাল তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিতেন। কিন্তু সেরূপ পদার্থ না থাকায়, জয়গোপালকে চিরকাল একাকী বাস করিতে হইত।

জয়গোপালের পিতা পীড়িত হইলে, জয়দুর্গা আসিয়া নিজ-ভবনে উপস্থিত হইলেন। তিনি যাহাই দেখেন, তাহারই উপর কটাক্ষ প্রকাশ করেন। প্রথমতঃ বাটী দেখিয়াই কহিলেন,—"এ বাটীতে লোক কেমন করিয়া থাকে!" এইরূপ যাহাই দেখেন, তাহারই নিন্দা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে জয়গোপালের ভগ্নীকে দেখিয়া কহিলেন,—"ও কি? তুই বাড়ীর কাজ-কর্ম্ম না ক'রে, চুপ করে বসে আছিস কেন? দেখ দেখি, সব আঁস্তা-কুড়ের মত হ'য়ে আছে?" জয়গোপালের ভগ্নীর নাম সুখদা। জয়দুর্গা তাঁহাকে বিলক্ষণ জানেন, কিন্তু তথাপি তাঁহাকে চিনেন না ভান করিয়া দাসী বলিয়া সম্বোধন করিলেন। বস্তুতঃ সুখদা জয়দুর্গা অপেক্ষা কোন ক্রমেই দেখিতে শুনিতে শ্রেষ্ঠ ভিন্ন নিকৃষ্ট নহেন। তবে প্রভেদ, জয়দুর্গা বি, এ, বি, এলের স্ত্রী, আর সুখদা পল্লীগ্রামের একজন বৃত্তিভোগী ব্রাহ্মণের স্ত্রী! কিন্তু তাই বলিয়া সুখদার কোন কষ্ট-বোধ হইত না। যখন জয়দুর্গা আসিয়া সুখদাকে ঝি-সম্বোধন করিয়া কথা কহিলেন, সুখদা তখন আপনার পুত্রটিকে ঝিনুকে করিয়া দুগ্ধ খাওয়াইতেছিলেন। ঝি নামে অভিহিত হইয়া তিনি মুখ তুলিয়া চাহিলেন, এবং রাগত হইয়া কহিলেন,—"এ মাগী কে রে? বেরো আমার বাড়ী থেকে! তুই কোথাকার কে? কোথা থেকেই বা এলি?" মহামায়া সরলহৃদয়া, সরলস্বভাবা এবং সর্ব্ব-বিষয়েই সরল। লোকে গালি দিয়া গেলেও কোন কথা কহিতেন না। জয়দুর্গা ঠিক তাঁহার বিপরীত ছিলেন। মহামায়া পুনঃপুন জয়দুর্গার তিরস্কার খাইয়া থাকিতেন, কখনই উচিত উত্তর দিতেন না। এই কারণেই জয়দুর্গার ক্রমে ক্রমে প্রভুত্ব বাড়িয়া গিয়াছিল। অদ্য সমকক্ষ লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। সুখদা জানিতেন, জয়দুর্গা কে, এবং জয়দুর্গাও জানিতেন, সুখদা কে; সুতরাং জয়দুর্গাকে আসিবামাত্রেই চিনিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু জয়দুর্গা মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার স্বামী তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি ভাল বাসেন; সুতরাং তাঁহার ভগ্নীকে এককথা কহিলে তাঁহার স্বামী কখনই অসন্তুষ্ট হইবেন না।

এক্ষণে জয়দুর্গা সুখদার উত্তর শুনিয়া যেন তাঁহাকে পূর্ব্বে চিনিতে পারেন নাই ও তাঁহার কথা শুনিয়াই চিনিতে পারিলেন, এই ভান করিয়া কহিলেন,—"কে, ঠাকুর-ঝি নাকি? ভাই, আমার ঘাট হ'য়েছে, আমি তোমাকে প্রথমে চিনিতে পারি নাই। তা' তুমি যে ময়লা কাপড় পরে বসে আছ, তাতে চেনাই যে অসাধ্য!" সুখদা উত্তর করিলেন,—"ও বৌ, তুমি এসেছ? আমি মনে করেছিলাম যে, তোমার আসাতে আরও তিন ঘণ্টা দেরি হবে। ময়লা কাপড় দেখে ভাই অত ঠাট্টা কর্‌বার দরকার কি? তুমি বড়-মানুষের বৌ, বড়-মানুষের ঝি, তোমার কত চাকর-দাসী আছে, কাজেই তোমার কাপড় ময়লা হয় না। আমরা পাড়া-গেঁয়ে লোক, আমাদের চাকর-দাসী নাই, আমাদের সব কাজ নিজের হাতে কত্তে হয়; আমাদের কাপড় কেমন করে সাপ থাক্‌বে?"

জয়দুর্গা।—আমি ত ভাই ঘাট মেনেছি, তবে আর কেন কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দাও? 'ঘাট মানলে কুকুরেও ছোঁয় না!'

সুখদা।—তা'হতে পারে; কিন্তু কুকুরের সঙ্গে আমার আলাপ নাই। তাদের সঙ্গে ওঠা-বসাও করি নাই। তারা কি করে, না করে, তা কেমন করে জান্‌বো?

জয়দুর্গা।—কেন, তোমার দাদার সঙ্গে কি কখন কথা কওনি?

সুখদা।—দাদার সঙ্গে কথা কব না কেন? কিন্তু দাদা যে পশুর কথা বুঝ্‌তে পারেন, তা এতদিন জানতাম না; জান্‌লে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করিতাম। এ সব কথা শুন্‌তে কার না ইচ্ছা হয়?

এই কথা হইতে হইতে জয়দুর্গার দাসী ক্ষুদ্র একটী কাপড়ের গাঁটরি লইয়া যেখানে জয়দুর্গা ও সুখদা বসিয়াছিলেন, সেইখানে আসিয়া

গাঁটরিটী খুলিয়া এবং যতদূর মলিন হওয়ার সম্ভব, এইরূপ একখানি কাপড় বাহির করিয়া কহিল,—"আজ তুমি কোন্ খানা পোরবেন গো? দু'খানাই ত সমান সাফ।" দাসীর কথা শুনিয়া জয়দুর্গার কর্ণের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। সুখদা সুবিধা পাইয়াছেন, ছাড়িবেন কেন? কহিলেন,—"বৌ, তোমার বাপের বাড়ীর দেশের ধোপারা ত খুব পরিষ্কার কাপড় কাচে?" জয়দুর্গা শুনিয়া আর কোন কথা কহিলেন না। সুখদা নিজের পুত্রের পায় একটী টিপ দিলেন। পুত্রটী অমনি কাঁদিয়া উঠিল। তখন, 'চাঁদ নাচে, সোণা নাচে' এইরূপ আদর করিতে করিতে ও ছেলেটীকে ক্রোড়ে নাচাইতে নাচাইতে, তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

জয়দুর্গা ইতিপূর্ব্বে যে কয়েকবার শ্বশুরালয়ে অর্থাৎ নিজ-গৃহে আসিয়াছিলেন, দুই তিন দিবসের অধিক কখনই সেখানে থাকেন নাই। সুতরাং সুখদাকে চিনিতে পারেন নাই। সুখদা কালে-ভদ্রে পিত্রালয়ে আসিতেন। তাঁহার নিজের বাটী ছাড়িয়া পিত্রালয়ে আসিবার সুবিধা প্রায় পাইতেন না। তাঁহার পিতার অবস্থা পূর্ব্বে তাদৃশ ভাল ছিল না। তাঁহার ভ্রাতা উকীল হওয়া অবধি তাঁহার পিত্রালয়ের অবস্থা অনেক উন্নত হইল; কিন্তু তথাপি তাঁহার নিজের বাটীতে যে সমস্ত ক্রিয়া-কলাপ হইত, তাঁহার পিতার বাটীতে সে সমস্ত হইত না। দুর্গোৎসব, শ্যামাপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা, রাস ইত্যাদি সমস্ত পার্ব্বণই তাঁহার বাটীতে হইত। তাঁহার শাশুড়ী বয়োবৃদ্ধ-হেতু এ সমস্ত কার্য্যের উদ্যোগাদি নিজে করিয়া উঠিতে পারিতেন না; সুতরাং সুখদাকে সর্ব্বদাই নিজের বাটীতে থাকিতে হইত।

সুখদার ব্যঙ্গোক্তি শ্রবণ করিয়া, জয়দুর্গা মনে মনে যৎপরোনাস্তি কষ্ট পাইলেন। নিজের পিত্রালয়ে, স্বামী বি, এ, বি, এল, হওয়ার দরুণ এবং সর্ব্বদা তত্ত্ব করিবার দরুণ, সেখানে তাঁহার যৎপরোনাস্তি প্রভুত্ব হইয়াছিল। জয়গোপালের বাটীতে তাঁহার প্রভুত্ব খাটাইবার অত্যন্ত অসুবিধা হইল। যতদিন তিনি পিত্রালয়ে ছিলেন, তাঁহার স্বামী মধ্যে মধ্যে নিজে শ্বশুর-শাশুড়ীকে অর্থ দ্বারাও সাহায্য করিতেন; সুতরাং তাঁহার পিতা-মাতা জয়দুর্গাকে কিছু বলিতে পারিতেন না। শ্বশুরালয় আসিয়া আ সে আদর খাটিবে কেন? জয়গোপালের পিত মাতাকে সেবা-শুশ্রূষা ভিন্ন আর কি সাহায্য করিবেন? কিন্তু সেবা-শুশ্রূষা কাহাকে বলে তাহা তিনি এতকাল ভাল করিয়া শিখেন নাই কাজেই শ্বশুর-শাশুড়ীরও প্রিয় হইতে পারিলে না। সুখদার বাড়ী পাঁচটার বাড়ী। তাঁহা স্বামী, ধনী না হউন, পুরুষানুক্রমে বড় গৃহস্থ সুতরাং সুখদাকে পাঁচ জনকে যত্ন করিতে হইত সকলকে আহার না দিয়া নিজে আহার করিতে পারিতেন না। কাহাকে কখন কি কথা বলিতে হইবে, তাহা তিনি বিলক্ষণ জানিতেন; এ কাহাকে কিরূপ আদর-আপ্যায়িত করিতে হইবে তাহাও বুঝিতেন।

জয়দুর্গা টের পাইলেন, তাঁহার শ্বশুর শাশুড়ি তাঁহার পদানত হইবেন না। জয়গোপাল বরাবর পদানত ছিলেন, এবং এখন আছেন; কিন্তু তাহাতে ফল কি? তিনি কখনই স্ত্রীর কথা শুনিয়া নিজ পিতা-মাতার প্রতি কোন কর্কশ ব্যবহার করিবেন না। তবে এ মাত্র সুখদা বাকি! তা ভাবিলেন, সুখদার উপর আপনার আধিপত্য স্থাপন করিবেন। কারণ সুখদার স্বামী বি, এ, বি, এল, নয়। কিন্তু তিনি জানিতেন না যে, এ অবধি জেড পর্য্যন্ত উপাধি থাকিলেও, অর্থের সহিত সে উপাধির তুলনা হইতে পারে না। সুখদার স্বামীকে ইতিপূর্ব্বে পল্লীগ্রামের গৃহস্থ বলা হইয়াছে; কিন্তু গৃহস্থের অর্থ সাধারণ গৃহস্থ অপেক্ষা এক পৃথক। একজনে বিদ্যা-বুদ্ধির কৌশলে জমীদারী করিয়া যায়। তাহার তিন পুত্র থাকিলে সেই জমীদারী তিন ভাগে বিভক্ত হয়। এই তিন জনের এক এক জনের যদি আবার তিনটী করিয়া সন্তান জন্মে, তাহা হইলে তাহাদিগের আর জমীদার নাম থাকে না। প্রত্যেকেই এক এক জন গৃহস্থ হইয়া পড়ে। কিন্তু তথাপি সে ঘর বনিদি ঘর। সুখদার স্বামী এইরূপ একজন বনিদি গৃহস্থ। তাঁহার ভূমিসম্পত্তি যত প্রচুর, তাহার দশাংশের একাংশও জয়গোপাল অদ্যাপি খরিদ করিতে পারেন নাই। তাঁহার নগদ অর্থও প্রচুর ছিল, কিন্তু তিনি কখনই অর্থের অভিমান করিতেন না; সর্ব্বদাই বলিতেন,—"আমরা গৃহস্থ লোক, আমাদের কি টাকা আছে, না বিষয় আছে?" জয়দুর্গা এই শুনিয়াই মনে করিয়াছিলেন যে, সুখদার স্বামী দরিদ্র না হইতেও পারে; কিন্তু কোন মতেই জয়গোপালের ন্যায় ধনী নহে। মনে মনে এইরূপ করিয়াই সুখদার উপর আধিপত্য স্থাপন করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। (ক্রমশঃ)

DETECTIVE STORIES.

জালিয়াত যদু।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

যদুনাথ তখন তাঁহার সহিত ওজন সরকারের কার্য্য শিক্ষা করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন, ও মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—"আমার কি অদৃষ্ট! বিনা সহায়ে যদিও আমি একটী কার্য্যের যোগাড় করিলাম, কিন্তু ঈশ্বর তাহাতেও নির্দ্দয় হইলেন! এখন, এইরূপেই বা কত দিবস চলিবে? আর, কিরূপেই বা আমি কলিকাতার খরচ নির্ব্বাহ করিয়া বৃদ্ধ মাতাকে সাহায্য করিব?"

অতঃপর সেই প্রবীণ ওজন-সরকার তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া তাঁহাদিগের বসিবার স্থানে লইয়া গেলেন। সেই স্থানে আরও যে যে ব্যক্তি বসিয়া ছিলেন, তাঁহাদের সকলের নিকট তাঁহাকে পরিচিত করিয়া দিলেন, ও তাঁহার উপরিস্থিত কর্ম্মচারির আদেশ সকলকে শুনাইয়া দিলেন।

সেই দিবস যাঁহার হস্তে কাঁটা ছিল, তিনি তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া হাটখোলায় লইয়া গেলেন। সেই স্থানে একটী মহাজনের বাটীতে সমস্ত দিবস ধরিয়া ওজন হইল; গরুর গাড়ির গাড়োয়ান-সকল ঐ সকল দ্রব্য তাহাদের গাড়িতে বোঝাই দিয়া গুদাম অভিমুখে যাইতে লাগিল।

যতক্ষণ ওজন হইতে লাগিল, ততক্ষণ সরকার-মহাশয়ের খাতির দেখে কে? মুখের একটী পান শেষ হইতে না হইতেই আরও ৩।৪টী তাঁহার সম্মুখে আসিয়া পড়িতে লাগিল। হাতের হুঁকা রাখিতে না রাখিতে নূতন হুঁকা হাতে আসিয়া জুটিতে লাগিল। বৈকালিক জলযোগের সময় কত প্রকার ফল প্রভৃতির যোগাড় হইল। এই সকল আয়োজন সরকার মহাশয়ের নিমিত্ত হইল বলিয়া যদুনাথও বাকি থাকিলেন না। সরকার-মহাশয়ের খাতিরের কতক অংশ যদুনাথও উপভোগ করিলেন। এইরূপে সমস্ত দিন কাটিয়া গেল; কাঁটাও শেষ হইল। তখন তিনি যদুনাথকে বলিলেন,—"তুমি এই স্থানে একটু অপেক্ষা কর; আমি এখনই আসিতেছি।" এই বলিয়া তিনি কোথায় চলিয়া গেলেন। কিন্তু অতি অল্প ক্ষণের মধ্যেই ফিরিয়া আসিয়া যদুনাথকে একটী আধুলি প্রদান করিয়া বলিয়া দিলেন,—"অদ্য আপনি বাসায় গমন করুন; কল্য একটু সকালে সকালে আসিবেন।" এই বলিয়া তাঁহাকে রাস্তা দেখাইয়া দিলেন; যদুনাথ চলিয়া গেলেন। কিন্তু রাস্তায় মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—"এ ত মন্দ চাকরি নয়! বিনা ক্লেশেই অদ্য আমার আশাতীত অর্থ উপার্জ্জন হইয়াছে। আমার ৮৲ টাকার চাকরি অপেক্ষা দেখিতেছি, এ চাকরী মন্দ নহে।" তাঁহাকে যে কেন এই আট

আনা দেওয়া হইল, তাহা ভাবিয়া তিনি প্রথম দিবস কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। দ্বিতীয় দিবস পুনরায় কার্য্যে বাহির হইলেন। সে দিবস আর একজন সরকারের সহিত বাজারে গমন করিলেন। সে দিবসও কতকগুলি দ্রব্য ওজন হইল; এবং বাটী আসিবার কালীন বার আনা লইয়া আসিলেন। এইরূপে নিত্য নিত্য কর্ম্মে বাহির হন, কাহারও না কাহারও সহিত বাজারে গমন করেন, এবং কিছু না কিছু লইয়া আসেন! এইরূপে প্রায় একমাস কাটিয়া গেল। হিসাব করিয়া দেখিলেন যে, ঐ এক মাসে প্রায় ২৫৲ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছেন। এইরূপে কিছু দিবস অতীত হইয়া গেল। কলিকাতায় নিজের খরচ তো অনায়াসেই চলিতে লাগিল; তদ্ব্যতীত বৃদ্ধ মায়ের কষ্টও দূর হইল।

তিনি যে কোন ওজন-সরকারের সহিত বাজারে একবার গমন করিতেন, তাঁহারা কখন যদুনাথের উপর অসন্তুষ্ট হইতেন না। কারণ, কোন ক্রমেই যদু তাঁহার আদেশ লঙ্ঘন করিতেন না। তিনি যখন যদুকে যে কার্য্য করিতে বলিতেন, যদু তখন তাহাই সম্পন্ন করিতেন। ইহাতে তাঁহার বিশেষ সাহায্য হইত; পরিশ্রমেরও অনেক লাঘব হইত। কাজেই তাঁহারা অতিশয় সন্তুষ্ট হইতেন, ও কাহাকেও সন্তুষ্ট করিতে ভুলিতেন না।

এইরূপে ক্রমে ক্রমে ৬ মাস অতীত হইয়া গেল। যদুনাথ ওজন-সরকারদিগের কার্য্য উত্তমরূপ শিক্ষা করিলেন। দ্রব্যের ভালমন্দ বাছিয়া লইতে সমর্থ হইলেন; ওজনের প্রণালী শিক্ষা করিলেন; মহাজন, দালাল, কয়াল, চাঁপাদার, কাঁটাওয়ালি প্রভৃতি সকলের সহিত যে কিরূপে ব্যবহার করিতে হয়, তাহাও জানিলেন। চুটকিওয়ালাগণের সহিত তাঁহার আলাপ হইল; তাহাদিগের দোকানও তিনি চিনিয়া লইলেন। এক কথায় মনিবের ও নিজের হিতের নিমিত্ত ওজন-সরকারদিগের যে যে উপায়ে পয়সা উপার্জ্জন হইতে পারে, সঙ্গে সঙ্গে তাহা তিনি মনোযোগের সহিত শিক্ষা করিলেন।

যদুনাথ ওজন-সরকারদিগের সহিত নিত্য নি বাজারে বাজারে ঘুরিতেন সত্য, কিন্তু প্রত একবার বড়-বাবু ও হেম বাবুর সহিত সাক্ষ করিয়া ছেলাম করিতে ভুলিতেন না। এ সময়ে বাজারের কার্য্য কিছু আধক হওয়ায়, অ একটি ওজন-সরকারের পদ নূতন সৃষ্টি হইল এবং সেই পদে ৮৲টাকা বেতনে যদুনা নিয়োজিত হইলেন। তখন আর কাহারও সহি বাজারে যাইতে হইত না। একলাই কাঁ পাইতে লাগিলেন, ও স্বাধীনভাবে কা করিতে আরম্ভ করিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যদুনাথ উত্তমরূপে কার্য্য করিতে শিখিয়াছেন। বিশেষ, নিজে পয়সা উপার্জ্জনের রাস্তা আরও ভালরূপ দেখিয়াছেন। তবে এত দিবস যদিও অন সরকারদিগের মত তিনি পয়সা লইতে ত্রু করেন নাই, কিন্তু মনিবের কোনরূপ অনি করিবার ইচ্ছা তাঁহার মনে উদয় হয় নাই জলপানি প্রভৃতি ওজন-সরকারদিগের ন্যায্য গণ্ডা যাহা পাওনা, তাহাই লইতেন; এবং কখন কখন মহাজনের দ্রব্য হইতে নমুনা প্রভৃতির নাম করিয়া কিছু কিছু দ্রব্য চুটকি-ওয়ালাদিগের নিকট বিক্রয় করিতেন মাত্র। এখন, ক্রমে তাঁহার কলিকাতার খরচ বাড়িতে লাগিল; অন্যান্য ওজন-সরকারদিগের বাতাসও তাঁহার গায়ে লাগিল, এবং কাঁটাওয়ালিদিগের উপরও তাঁহার কিছু অনুগ্রহ বাড়িল। কাজেই পয়সারও কিছু অধিক আবশ্যক হইতে লাগিল। এখন কেবল মহাজনের অনিষ্ট করিয়াও আর চলে না, মনিবের দিকেও দৃষ্টি পড়িল"।

এত দিবস পর্য্যন্ত যদুনাথ যেরূপভাবে কার্য্য করিয়া আসিতেছিলেন, তাহাতে হেম বাবু বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন। যদুনাথের কর্ম্মের উপর তিনি কখন কোনপ্রকার অবিশ্বাস করি-

তেন না, ও সকলের নিকটই যদুনাথের প্রশংসা করিতেন; বড়-বাবুকেও সর্ব্বদাই বলিতেন যে, যদুনাথ বড় ভাল ছোকরা, কেবল মনিবের হিতের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া অতিশয় যত্নের সহিত তাঁহার কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।

এখন যদুনাথ ক্রমেই তাঁহার গুণ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। একদিবস হাটখোলায় একটী মহাজনের ঘরে কাঁটা হইতেছে; যদুনাথ দেখিয়া দেখিয়া নমুনার সহিত মিলাইয়া সেই দ্রব্য ওজন করিয়া লইতেছেন। এমন সময় নমুনার অপেক্ষা অপকৃষ্ট কতকগুলি দ্রব্য বাহির হইল। যদুনাথ অমনি কাঁটা বন্ধ করিয়া দিলেন। মহাজনের নিকট খবর পৌঁছিল; তখনই মহাজন সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, ও দেখিলেন যে, সে গুলি নমুনা অপেক্ষা প্রকৃতই অনেক অপকৃষ্ট। তখন, আর কোনরূপ উপায় না দেখিয়া, তিনি যদুনাথকে নিভৃতে লইয়া গেলেন, ও তাঁহার বাক্স হইতে ৫০৲টী টাকা বাহির করিয়া কহিলেন,—"দেখুন যদু বাবু, আপনি যদি এই দ্রব্যগুলি অদ্য চালাইয়া দিতে পারেন, তবে ইহা আপনারই। যাহা ভাল বিবেচনা হয়, করুন।" যদুনাথের পক্ষে একেবারে পঞ্চাশ টাকার লোভ সম্বরণ করা বড় সহজ নহে; তিনি উহা গ্রহণ করিলেন। সেই টাকা হইতে কিছু কিছু তাঁহার কয়াল ও চাঁপাদার প্রভৃতিকে দিয়া, একজনকে আফিসে পাঠাইয়া দিলেন, ও তাঁহাকে বলিয়া দিলেন,—"তুমি আস্তে আস্তে গুদামে গিয়া দেখিয়া আইস যে, আজ যেস্থান হইতে যে দ্রব্য আমদানী হইতেছে, তাহা কোথায় এবং কি প্রকারে রাখা হইতেছে; আর, আমার প্রেরিত দ্রব্যই বা কি প্রকারে কোথায় রাখা হইতেছে।"

একজন চাঁপাদার সেই কথা শ্রবণে তখনই চলিয়া গেল, ও শীঘ্রই প্রত্যাগমন করিয়া বলিল,—"আমাদিগের প্রেরিত তিসি ও অন্য যে যে স্থানে যে যে সকল তিসি ওজন হইতেছে, আজ তাহার সমস্তই গুদামের একস্থানে একত্রে ঢালিয়া রাখা হইতেছে।"

এই কথা শুনিয়া যদু বাবুর আর আহ্লাদের সীমা রহিল না। তাঁহার প্রেরিত তিসিই যে মন্দ যাইতেছে তাহা আর কাহারও ধরিবার উপায় নাই ভাবিয়া, হৃষ্টমনে তিনি ঐ অপকৃষ্ট দ্রব্য পুনরায় ওজন দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সমস্ত মাল চলিয়া গেল, তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। এই উপায়ে মহাজনেরও পঞ্চাশ টাকার পরিবর্ত্তে প্রায় দুইশত টাকার কাজ হইল; এবং যদুনাথের মনিবের এতগুলি টাকা লোক্‌সান হইবার উপায় হইয়া রহিল।

এইরূপ উপায়ে এখন যদুনাথ অনেক টাকা উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। এইরূপে নিত্য নিত্য মনিবের সর্ব্বনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাজনেরাও এইরূপ উপায়ে যদুনাথের সাহায্যে বিলক্ষণ লাভ করিতে আরম্ভ করিলেন। যদুনাথ অসদ্ উপায়ে যাহা উপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলেন, তাঁহার উপার্জ্জিত সমস্ত অর্থও সেইরূপ অসদ্-কার্য্যে ব্যয় হইতে লাগিল।

এইরূপে কিছু দিবস অতিবাহিত হইয়া গেল। যদুনাথের কার্য্য অতি উত্তমরূপেই চলিতে লাগিল। একদিবস যদুনাথ আদেশ পাইলেন যে,—"আজ যেসকল দ্রব্য ওজন হইবে, তাহা প্রত্যেক বস্তায় ঠিক দুই মন করিয়া দিয়া, উত্তমরূপে বস্তা সেলাই করিয়া দিয়া, একেবারে জাহাজে বোঝাই করিবার নিমিত্ত পাঠাইয়া দিতে হইবে; এবং উহা এখানে বিক্রয় না হইয়া একেবারে বিলাতে রওনা হইবে।" এই আদেশ প্রাপ্তে আজ যদুনাথের মনে আনন্দ ধরিল না। তিনি তখনই তাঁহার কয়াল ও চাঁপাদারদিগের সমভিব্যাহারে একটী বড়গোছের মহাজনের বাটীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে কাঁটা করিতে আরম্ভ করিলেন; এবং মহাজনকে কি বুঝাইয়া প্রত্যেক বস্তায় দুই মনের উপর অর্দ্ধ সের, তিন

পোয়া প্রভৃতি অধিক দিয়া, ঐ সকল বস্তা সেলাই করিয়া, তাহার উপর কেবল মাত্র দুই-মনের অঙ্কপাত করিয়া পাঠাইতে লাগিলেন। এইরূপে দুই তিন গাড়ি চলিয়া গেল।

সেই সময় তাঁহার মনিবের অন্য আর এক জন কর্ম্মচারী এবং হেম বাবু নিজে জাহাজে গমন-পূর্ব্বক, কোন্ সরকার কিরূপ ভাবে দ্রব্য-পাঠাইতেছে, দেখিবার নিমিত্ত, সকল সরকারের প্রেরিত বস্তা সেইস্থানে কতক কতক ওজন করিয়া দেখিতে লাগিলেন। কাহারও বস্তায় কিছু কিছু কম, কাহারও বস্তা সমান সমান পাইতে লাগিলেন। কেবল যদুনাথের প্রেরিত বস্তায় প্রায়ই অধিক হইতে লাগিল। হেম বাবু যদুনাথের কর্ম্মের প্রশংসা করিয়া ও অন্যান্য সকলকে সতর্ক করিয়া দিয়া চলিয়া আসিলেন।

যদুনাথ এই সংবাদ পাইলেন; এবং তাঁহার বস্তা ওজন করা যে নিষ্প্রয়োজন, ইহাও স্থিরীকৃত হইয়াছে, জানিতে পারিলেন। অধিকন্তু হেম বাবু প্রভৃতি ওজন বন্ধ করিয়া যে আফিসে চলিয়া গিয়াছেন, তাহাও তাঁহার জানিতে বাকি রহিল না। তখন তিনি আপন অভিসন্ধি পরিপূরণ করিতে লাগিলেন। প্রত্যেক বস্তায় একসের দুইসের করিয়া মহাজনের যোগে কম দিতে লাগিলেন। ক্রমে সমস্ত দ্রব্যের ওজন শেষ হইয়া গেল। সন্ধ্যার সময় মহাজনের সহিত হিসাব করিয়া দেখিলেন যে, প্রায় ৫০ মন দ্রব্য এইরূপে ওজনে কম দিয়াছেন। পরে মহাজনের সহিত বন্দোবস্ত অনুযায়ী তাহাকে ২৫ মোন ছাড়িয়া দিলেন, এবং বক্রী ২৫ মোনের দাম মহাজনের নিকট হইতে নগদ বুঝিয়া লইয়া চলিয়া গেলেন।

এইরূপে যত দিবস অতিবাহিত হইতে লাগিল, যদুনাথ তাঁহার মনিবের ততই সর্ব্ব-নাশ ও আপনার পাপ-স্রোত ততই প্রবাহিত করিতে লাগিলেন।

এই সময় এক দিবস মনিবের আদেশ অনু-যায়ী যদুনাথ হাটখোলার একজন প্রধান ম[...] জনের গদিতে কাঁটা করিতে গেলেন। [...] দিবস যত দ্রব্য লওয়া হইল; সমস্তই "হু[...] কাঁটায়" ওজন করা হইল; সুতরাং আজ [...] নাথের বাহার দেখে কে?

"হুমকা" এই শব্দটীর অর্থ কেবল মহা[...] মাত্রেই বুঝিয়া থাকেন; কিন্তু অনেক প[...] ইহা সহজে বুঝিতে পারিবেন না বলিয়া [...] অর্থ এই স্থানে অতি সংক্ষেপে বলিয়া দে[...] গেল। এক বস্তায় বিনা ওজনে যত দ্রব্য[...] তাহা সেই বস্তায় পুরিয়া, উত্তমরূপ সে[...] করিয়া, পরিশেষে বস্তাসামেত ওজন ক[...] লওয়াকে 'হুমকা' ওজন কহে।

আজ যদুনাথ 'হুমকা' ওজন পাইয়া মহাজ[...] সাহায্যে তাঁহার মনোভিষ্ট সিদ্ধ ও মনি[...] সর্ব্বনাশ করিতে লাগিলেন। যে বস্তায় দুই ম[...] পনের সের আছে, তাহা ওজন করিয়া তা[...] ওজনের কাগজে দুই মন পঁচিশ সের লি[...] লইলেন, এইরূপে প্রত্যেক বস্তায় দুই সের হ[...] আরম্ভ করিয়া ক্রমে দশ সের পর্য্যন্ত অধিক লি[...] লইতে লাগিলেন; এবং প্রত্যেক বস্তায় যত প[...] মাণ কম যাইতে লাগিল, তাহার হিসাব স্ব[...] কাগজে লিখিয়া লইতে লাগিলেন। ক্র[...] সমস্ত ওজন শেষ হইয়া গেল। তখন মহাজ[...] সহিত তাঁহার চোরাই দ্রব্যের হিসাব হ[...] লাগিল। পরে হিসাব-মত কত মন চুরি করি[...] ছেন স্থিরীকৃত হইলে, মহাজনের সহিত পূ[...] বন্দোবস্ত অনুযায়ী অর্দ্ধেক তাঁহাকে দিলেন[...] বক্রী অর্দ্ধেকের দাম তখনই নগত বুঝিয়া ল[...] আপন স্থানে প্রস্থান করিলেন।

এইরূপে কিছু দিবস অতীত হইল। যদু[...] অসদ্ উপায় অবলম্বন-পূর্ব্বক অনেক অর্থ উ[...] র্জ্জন করিলেন সত্য, কিন্তু এক পয়সাও সং[...] করিতে পারিলেন না; যেরূপ উপায়ের উ[...] র্জ্জিত অর্থ, সেইরূপ উপায়েই ব্যয় হইয়া গে[...]

যদুনাথ মনিবের এত সর্ব্বনাশ করিয়াছে[...]

কিন্তু আজ পর্য্যন্ত ইহার বিন্দু-বিসর্গও হেম বাবু বা বড় বাবু কিছুই অবগত হইতে পারেন নাই। যদুনাথের উপর তাঁহাদিগের বিশ্বাস ও ভালবাসা পূর্ব্বাপেক্ষা কিছুমাত্র হ্রাস না হইয়া দিনদিন ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

এই সময়, আফিসে একটী কেরাণীর পদ শূন্য হওয়ায়, বড় বাবু যদুনাথকে ডাকাইলেন, ও তাঁহাকে কহিলেন,—"যদুনাথ, তোমার বেতন কিছু বৃদ্ধি করিয়া দিবার ইচ্ছা অনেক দিবস হইতে আমার মনোমধ্যে ছিল; কিন্তু উপযুক্ত সুযোগ না পাওয়ায় এত দিবস আমি তাহা সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারি নাই। এখন, একটু সুযোগ হইয়াছে; এই আফিসে ৩০৲ টাকা বেতনের একটী কেরাণীর পদ শূন্য হইয়াছে। আমি অদ্য হইতে তোমাকে সেই কর্ম্মে নিযুক্ত করিলাম। যদি ভালরূপে কর্ম্ম করিতে সমর্থ হও, ক্রমেই তোমার উন্নতি হইতে পারিবে।"

যদুনাথ কি করেন? সম্পূর্ণ অনিচ্ছা-স্বত্ত্বেও তাঁহাকে সেই কর্ম্মে স্বীকৃত হইতে হইল। প্রকাশ্য দেখিতে যদিও তাঁহার বেতন ৮৲ টাকার স্থলে ৩০৲ টাকা হইল সত্য, কিন্তু তাঁহার সেই অসদ্ উপায়ে উপার্জ্জিত নূতন নূতন পয়সা আর নিত্য নিত্য কোথা হইতে আসিবে? তিনি এখন যেরূপভাবে খরচ-পত্র করিয়া আসিয়াছেন, তাহা এই ত্রিশ টাকায় দুই দিবসেরও সঙ্কুলান হইবে না। কিন্তু কি করেন, মনিবের আদেশ লঙ্ঘন করিবার ক্ষমতা কোন কর্ম্মচারিরই নাই। কাজেই তিনি তাহাতে সম্মত হইয়া কৃত্রিম আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

সনাতনপুরের সিদ্ধেশ্বর।

চুটকি গল্প।

(১)

প্রায় দুইশত বৎসর অতীত হইল, সনাতন-পুরের একটী ক্ষুদ্র জীর্ণ কুটীরে সর্ব্বেশ্বর মুখো-পাধ্যায় বাস করিতেন। সর্ব্বেশ্বর অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন; এমন কি, শুনা গিয়াছে, মাসের মধ্যে অনেক দিন তাঁহাদের একাহারে অথবা অনা-হারেই অতিবাহিত হইত। পরিবারের মধ্যে তাঁহার পত্নী, দুইটি শিশু পুত্র ও ততোধিক অপোগণ্ড একটী বালিকা।

একদা সৌভাগ্যদেবী লক্ষ্মী, তাঁহাদের দুরবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া, বড় দয়াদ্রা হইলেন। তিনি নারায়ণের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"প্রভো! অনুগ্রহ করিয়া এই ব্রাহ্মণের দারিদ্র্য-দুঃখ দূর করুন। আহা! দেখুন, ইহার পুত্র-কন্যাগণ আহারাভাবে কঙ্কালমাত্রাবশিষ্ট হই-য়াছে। এবং ঐ হলধর ঘোষের পুত্রকে মুড়ী-ভক্ষণ-পরায়ণ দেখিয়া, ক্ষুধায় কাতর হইয়া, বিষণ্ন বদনে দীননয়নে উহার ভোজনপটুতা দেখি-তেছে! দেখুন, অজ্ঞাতে ঐ পঞ্চমবর্ষীয় মধ্যম পুত্রটীর গণ্ডদেশ বহিয়া দুই বিন্দু উষ্ণ অশ্রু নিপতিত হইল! আহা! উহার দুই বৎসরের কনিষ্ঠা ভগিনী জানুসঞ্চালনে দাদার নিকটে গিয়া, ঐ দেখুন, হলধরের পুত্রের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া, আধ-আধ স্বরে রোদনোন্মুখ কণ্ঠে বলিতেছে, 'দাদা, হাম্ দেনা'! প্রভো! অচিরে আর ইহাদের এ কষ্ট দেখা যায় না।"

নারায়ণ বলিলেন,—"লক্ষ্মি, কল্যই তোমার অভিলাষ পূর্ণ হইবে। অদ্য আমি তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতেছি। যথার্থই ব্রাহ্মণ বড় দরিদ্র; আর, দরিদ্র হউক, এত কষ্টে ও দুঃখে কখন সৎপথ হইতে বিচ্যুত হয় নাই। চিরকাল একইভাবে ধর্ম্মাচরণ করিয়া আসিতেছে।"

(২)

সন্ধ্যার গাঢ় অন্ধকারে মেদিনী সমাবৃত হইলে, বিষ্ণুবাহন বিনতানন্দন গরুড়ের পক্ষ স্বন্ স্বন্ শব্দে সনাতনপুরের দিকে সঞ্চালিত হইল। মুহূর্ত্ত-মধ্যে গ্রামের প্রান্তভাগে—যেখানে কুমুদ-কহ্লার-কমল-পরিশোভিত বৃহৎ পদ্মাখ্য পুষ্করিণীতটে সুবিস্তৃত বটবৃক্ষ দিবাভাগেও প্রায়ান্ধ-কারময় করিয়া রাখিত, সেই স্থলে—আসিয়া

উপস্থিত হইল। সেই অন্ধকারে বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাওয়া যাইত, যেন একটী ক্ষুদ্র ইষ্টক-মন্দির বটশাখা ও সান্ধ্যতমসের সহিত মিশিয়া রহিয়াছে। বস্তুতঃ সেটী কোন মনুষ্যের বাসগৃহ নহে। তাহা সনাতনপুরের 'জাগ্রত দেবতা' গণপতির মন্দির।

সেই সর্ব্বার্থসিদ্ধিদাতা সর্ব্ববিঘ্নবিনাশন গজাননের মন্দিরে প্রতি শনি ও মঙ্গলবারের দিবাভাগে বহুতর লোকের সমাগম হইত। পুত্রার্থিণী পুত্র-কামনা করিয়া, অপত্যবৎসলা পুত্রকন্যার কুশল-কামনা করিয়া, বিপন্ন ব্যক্তি বিপৎপ্রতিকারের মানসে, রোগী আরোগ্যের অভিলাষে আসিয়া সমবেত হইত। আবার স্ব স্ব বিপদ হইতে মুক্ত হইলে অথবা ইহাঁর কৃপায় তাহাদের অভিলাষ পূর্ণ হইলে, উক্ত বারদ্বয়ের অন্যতরে এখানে আসিয়া, যাহার যেরূপ মানসিক, পূজা দিয়া যাইত। ফলতঃ প্রতি শনি ও মঙ্গলবারে প্রায় সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তথায় একটু ছোট খাট রকমের সমারোহ ও মেলা হইত। সেদিন, দেখিবে,—কেহ পূজা করিতেছে, কেহ পূজার আয়োজন করিতেছে, কেহ বক্ষঃস্থল চিরিয়া রক্ত দিতেছে, কেহ ধূনা পুড়াইতেছে; কোন স্নেহশীলা বা উপকরণাভিলাষী রোরুদ্যমান বালককে নানাপ্রকার ধর্ম্মভয় ও সান্ত্বনা প্রদান করিয়াও নিরস্ত করিতে না পারিয়া শেষে দণ্ডের দ্বারা তাহার সে বাসনা নিবারণ করিবার বৃথা প্রয়াস পাইতেছে; শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁসর প্রভৃতি বাদ্য অতিক্রম করিয়া বালকের সেই দ্বিগুণিত চীৎকার-শব্দ উত্থিত হইতেছে। একদিকে নানাপ্রকার সামগ্রীর বিপণি বসিয়াছে। বটবৃক্ষমূলে কত লোক ফলাহারে বসিয়াছে। ইত্যাদি।

পূজান্তে সকলে গণপতির চরণামৃতাদি ধারণ করিত। পরে—"ঠাকুর, আমার হরিশের মাহিনা শীঘ্র শীঘ্র বাড়াইয়া দাও, তোমায় পাঁচ সের চালের নৈবেদ্য দিয়া পূজা দিব,"—"বিপত্তারণ, বিঘ্নহর! আমার গোপালের পীলে-জ্বরটী ভাল ক'রে দাও; ঠাকুর, আমি দাঁতে কুটা করিয়া ভিক্ষা মাগিয়া তোমার পূজা দিয়া যাইব।"—"সর্ব্বসিদ্ধিদাতা সিদ্ধেশ্বর, আমার কামিনী যে ভালোয় ভালোয় প্রসব হয়ে উঠে, বাছার যে কোন কষ্ট না হয়; আমি তোমার ডাইনে বাঁয়ে চিনির নৈবিদ্যি দিয়ে পূজা দিব, ধূনা পুড়াইব,—বাছার যেন একটি পুত্রসন্তান হয়।"—ইত্যাদি ইত্যাদি যাহার যেরূপ কামনা, দেবতার নিকা জানাইয়া, অবস্থানুসারে পূজা মানিয়া, সকলে স্ব স্ব ভবনোদ্দেশে প্রস্থান করিত।

আবার এসকল স্থলে সচরাচর যাহা ঘটিয়া থাকে—এই গণেশের সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কথারও জনশ্রুতি ছিল। চাটুর্য্যেদের ভ তথায় দুই প্রহর রাত্রে শঙ্খ-ঘণ্টাদি বাজাই কে পূজা করে, শুনিয়াছিল। ঘোষেদের কাত্যায়নী (ওরফে 'কাতি') একদিন স্বচক্ষে দেখিয়াছিল, শুভ্র চন্দ্রালোকে শুভ্রবসন-পরিহিত হই নিশীথকালে সেই গণেশের মন্দিরে কে একজ পাদচরণ করিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে অকস্মা কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল! তবে শ্রীমা কাত্যায়নী তত রাত্রিতে সে নির্জ্জন প্রদেশে জন্য গিয়াছিলেন—তাহা প্রকাশ নাই)। ঘোষা দের রামশঙ্করও একদা রাত্রে সেই পথ দি আসিতে আসিতে বটমূলে এক স্ত্রী-মূর্ত্তি দেখি "কে সে?"—প্রশ্ন করায়, স্ত্রী-মূর্ত্তিটী কে বাক্য-ব্যয় না করিয়া এক সুদীর্ঘ পাদবিক্ষে করিয়া একবারে বটবৃক্ষে আরোহণ করিয়াছি তদ্দৃষ্টে রামশঙ্কর দৌড়িয়া নিকটবর্ত্তী এক কের দ্বারদেশে আসিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে এইরূপ অনেক বিস্ময়জনক ব্যাপার তথায় প্র ঘটিয়া থাকে—সনাতনপুরের লোকের বিশ্বা এবং এইরূপ কথার আন্দোলনও সময়ে সম গ্রাম-মধ্যে শুনিতে পাওয়া যাইত।

(৩)

সেই সিদ্ধেশ্বরের মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্ব দি একটী সঙ্কীর্ণ পথ গ্রামের মধ্যে গিয়াছে। কবি

দিবস সন্ধ্যার পর রতন দত্ত সেই পথ দিয়া গৃহে যাইতেছিল। মন্দিরের পার্শ্বে আসিবামাত্র, অকস্মাৎ তাহার সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল; পদদ্বয় যেন কোন অলৌকিক বলপ্রভাবে স্বকার্য্য সাধনে অক্ষম হইল। দিব্যসৌরভবাহী সমীরণ সুগন্ধে তাহার নাসারন্ধ্র ভরিয়া দিল। সম্মুখের অন্ধকার গাঢ়তর হইয়া জমিতে ও ঘুরিতে লাগিল। রতন দত্তের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি সে প্রগাঢ় অন্ধতমস্ ভেদ করিতে সমর্থ হইল না। কি একটা অস্বাভাবিক শঙ্কা তাহার হৃদয়ক্ষেত্র অধিকার করিয়া ফেলিল। সহসা কম্পিত, ভীতিবিহ্বল রতন ছিন্নমূল তরুর ন্যায় ধরাতলে পতিত হইয়া স্বীয় দেহ-পরিমাণ বিস্তার করিল।

* * * *

কিয়ৎক্ষণ পরে সংজ্ঞাশূন্য রতন যেন অকস্মাৎ দিব্যকর্ণ প্রাপ্ত হইয়া শুনিতে পাইল, মন্দিরমধ্যে কাহারা কথা কহিতেছে,—"গণদেব, কল্যই তুমি সনাতনপুরের এই সর্ব্বেশ্বর শর্ম্মাকে সহস্র মুদ্রা প্রদান করিও।"

উত্তর হইল,—"তাহাই হইবে। কল্যই তাহার দারিদ্র্য-দুঃখ দূর হইবে।"

এইরূপ কথোপকথনের পর রতন দত্ত আর কিছুই শুনিতে পাইল না। ক্রমে তাহার সংজ্ঞালাভ হইল। চক্ষু-কর্ণ, হস্ত-পদ আবার স্ব স্ব কর্ম্মক্ষম হইয়া উঠিল। ইত্যবসরে তথায় অপর দুই ব্যক্তি সমাগত হইল। তাহারা রতনের অনুচর। কথায়-বার্ত্তায় ও অন্য একটু আবশ্যকহেতু পিছাইয়া পড়িয়াছিল। এক্ষণে প্রভুকে ভূতলে প্রলম্বমান দেখিয়া ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিল।

রতন বলিল,—"কিছুই নহে। পদস্খলন হইয়া পড়িয়া গিয়াছি। বামপদে বড় আঘাত লাগিয়াছে। তোমাদের একজন ধরিয়া তোল, এবং আমাকে ধরিয়া লইয়া চল। স্ববলে, বোধ হয়, যাইতে পারিব না।"

ভৃত্য রতনকে ধরিয়া তুলিল, ও গাত্রের ধূলা ঝাড়িয়া দিল। রতনও তাহার স্কন্ধদেশে হস্ত স্থাপন করিয়া কিঞ্চিৎ কষ্ট দেখাইয়া চলিতে লাগিল।

বলা বাহুল্য, রতন সংজ্ঞাশূন্য অবস্থায় যাহা শুনিয়াছিল, তাহা বিস্মৃত হয় নাই। এবং আমরা বিশেষ সংবাদ রাখি, সে রাত্রি রতনের সুষুপ্তি হয় নাই।

(৪)

রতন দত্ত সনাতনপুরের একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি। প্রবাদ যে, রতনের পিতামহী এক যক্ষের নিকট মুদ্রাপূর্ণ একটী অক্ষয় ঘড়া পাইয়াছিল। তাহা হইতে যতই টাকা লও, একটী মাত্র তাহাতে থাকিলে, কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই ঘড়া পূর্ব্ববৎ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত। সেই যক্ষপ্রদত্ত ধনবলেই উহারা এত ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছে। "যকের টাকা" না পাইলে কি লোক বড়মানুষ হইতে পারে? সনাতনপুরের ছোট ছোট বালকবালিকারা তাহাদের পিতামহীর নিকট এইরূপ গল্প শুনিত। কিন্তু আমরা গোপনে জানিয়াছি,—রতনের পিতামহ মৃত্যুকালে কিছু অর্থ রাখিয়া যান। রতনের পিতা গোকুল দত্ত বড় ব্যয়কুণ্ঠ ছিলেন। তাঁহারই কৃপণতা-ফলে সেই অর্থের বিস্তর বৃদ্ধি ঘটিয়াছিল। এক্ষণে রতন সেই সমস্ত অর্থের উত্তরাধিকারী হইয়া স্বীয় বুদ্ধিকৌশলবলে তাহার আরও উন্নতি করিয়া ফেলিয়াছিল। এদিকে রতন দেশীয় 'শাইলক'-বিশেষ। লোককে টাকা কর্জ্জ দিয়া তাহার রক্ত-শোষণ করিয়া টাকা আদায় করিত। অপরের সর্ব্বনাশে ক্রূরাত্মা রতনের কিছুমাত্র দয়ার উদ্রেক হইত না। অন্যের দুরবস্থায় রতনকেও দুঃখবোধ করিতে হইবে, এরূপ কোন আইন আছে কি? সুতরাং তাহার যে চতুর্গুণ হারে সুদের কথা আছে, তাহা যে কোন উপায়ে হউক আদায় করিবার বাধা থাকিতে পারে না। আবার বিপদে পড়িয়া অর্থের প্রয়োজন হইলে অন্যত্র তাহা পাইবারও বড় সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং রত-

নেরই জয়জয়কার। এইজন্য সনাতনপুরের সমস্ত লোকই রতনের উপুর বড় ক্রুদ্ধ ছিল; অথচ সে কোপ কাহারও প্রকাশ করিবার ক্ষমতা ছিল না। বাপ রে! রতন জানিতে পারিলে আর কখন টাকা ধার দিবে না—বিপদে প্রাণ বাঁচান দায় হইবে।

সিদ্ধেশ্বরতলার পূর্ব্বোক্ত ঘটনার রাত্রিতে রতন নিদ্রা যাইতে পারিল না। সেই কথাই সে সমস্ত রাত্রি তোলাপাড়া করিয়াছে। "সর্ব্বেশ্বরকে সহস্র মুদ্রা দিবার জন্য কোন অলক্ষ্য দেবতা সিদ্ধেশ্বরকে আদেশ করিয়া গেলেন! সত্য সত্যই কি ব্রাহ্মণ এত টাকা পাইবেন? পাইবেন বই কি! এখানকার গণেশ জাগ্রত দেবতা! তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন, 'কল্য তাহার দুঃখ দূর হইবে—একেবারে সহস্র মুদ্রা পাইবে?' আমরা কত কষ্ট, কত কৌশল, কত বাক্যব্যয়, কত ছলনা করিয়াও একটী টাকা পাই না; আর, কোন কষ্ট না করিয়া, বসিয়া বসিয়া ব্রাহ্মণ এত টাকা পাইবে! দশ টাকা নয়, বিশ টাকা নয়,—একশও' নয়;—একেবারে হাজার!—দশ—শ—টাকা!!" লোভে, ঈর্ষায় রতনের অর্থগৃধ্নু অন্তর বিলোড়িত হইতে লাগিল। মানস-চক্ষে রতন যেন দেখিতে পাইল,—সর্ব্বেশ্বর রতনের চক্ষের উপর সেই রাশীকৃত অর্থ ঝন্‌ঝন্ শব্দে বাক্স পরিপূর্ণ করিতেছে! সে ঝনৎকার রতনের কর্ণে অসহ্য বোধ হইল। সেই উজ্জ্বল চাকৃচিক্যশালী স্তূপাকার অর্থ চক্ষের উপর অপরে তুলিতেছে দেখিয়া পরশ্রীকাতর রতনের চক্ষু যেন জ্বলিয়া গেল! সে দুই হস্ত দ্বারা চক্ষু চাপিয়া ধরিল। পাগল! এ কি বাহ্য দৃষ্টিতে দেখিতেছে যে, হস্ত দ্বারা চক্ষু মুদ্রিত করিলে আর তাহা তোমায় দেখিতে হইবে না! তখন রতন সে কণ্টক-শয্যা পরিত্যাগ করিয়া দারুণ মানসিক আবেগে বাহিরে আসিয়া, পদচারণ করিতে লাগিল।

নিস্তব্ধ নৈশ প্রকৃতি গম্ভীরভাবে ভীতি ও শান্তি বিস্তার করিতেছে। ঊর্দ্ধে আকাশে দূরস্থিত অন্ধকারময় উদ্যানের শুভ্র উজ্জ্বল কুন্দকুসুমসম নক্ষত্ররাজি ফুটিয়া রহিয়াছে। কোনটী কোনটী যেন পল্লবাগ্রে ফুটিয়া উজ্জ্বল জ্যোতিতে বন আলোকিত করিয়া রহিয়াছে; কোনটী যেন বা দূরত্ব-পত্রে লুক্কায়িত দেহ হইয়া কেবল মুখটি বাহির করিয়া ক্ষীণ জ্যোতি বিকীর্ণ করিতেছে। নিস্তব্ধ তরুরাজি সে পুষ্পোদ্যানের শোভা-সন্দর্শনে মুগ্ধ নহে। তাহারা সেরূপ সৌন্দর্য্যপ্রিয় আত্মবিস্মৃত প্রগল্‌ভ প্রণয়ী নহে; যেন ভীষণ গম্ভীরভাবে কোন রাজনৈতিক মীমাংসার চিন্তার গাঢ় সন্নিবিষ্ট। ঝিল্লিকুল, ছোট লোক,—দিবাভাগে স্ব স্ব কার্য্যে—বিষয়কর্ম্মে—ব্যাপৃত ছিল; এক্ষণে, শ্রমান্তে রাত্রিতে সকলে মিলিত হইয়া, অসম্মিলিত কণ্ঠে গান ধরিয়াছে,—"মনে কি পড়েছে তোমার দাসী বলে চিন্তামণি?"

রতনের এ সকলের কিছুতেই লক্ষ্য নাই। তাহার হৃদয়ে যে দারুণ ঈর্ষানল প্রজ্জ্বলিত হইয়াছে, সেই হুতাশনেই সে দগ্ধ হইতেছিল। সে নানাপ্রকার ভাবিয়া-চিন্তিয়া মনে মনে লক্ষ ভাগ করিয়া, স্থির করিল,—যে কোন উপায়ে হোক, অত টাকা কোন ক্রমেই ব্রাহ্মণকে লইতে দেওয়া হইবে না; অন্ততঃ উহা অর্দ্ধভাগও লইবে। তখন কি উপায়ে সে অর্দ্ধভাগ হস্তগত করা যায়, সেই চিন্তায় রতন আবার ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। শেষে একপ্রকার স্থির করিয়া রতন শয়নগৃহে পুনঃপ্রবেশ করিল। নিদ্রা যাইবার জন্য কি রতন শয়ন করিতে গেল? না, তাহা নহে; বিশ্রাম করিবার জন্যও নহে। রতন শুইতে গেল, কেবল প্রাতঃকালের প্রতীক্ষায় ও সঙ্গে সঙ্গে মনকে—পারে ত—একটু আশ্বস্ত করিবার জন্য।

(ক্রমশঃ)

—

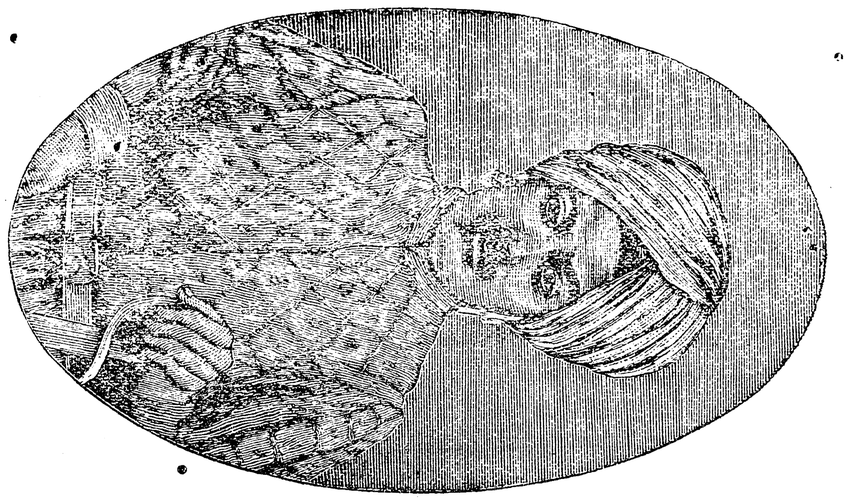

মণিপুর ফুরাইল।

(৫৬ পৃষ্ঠা দেখ।)

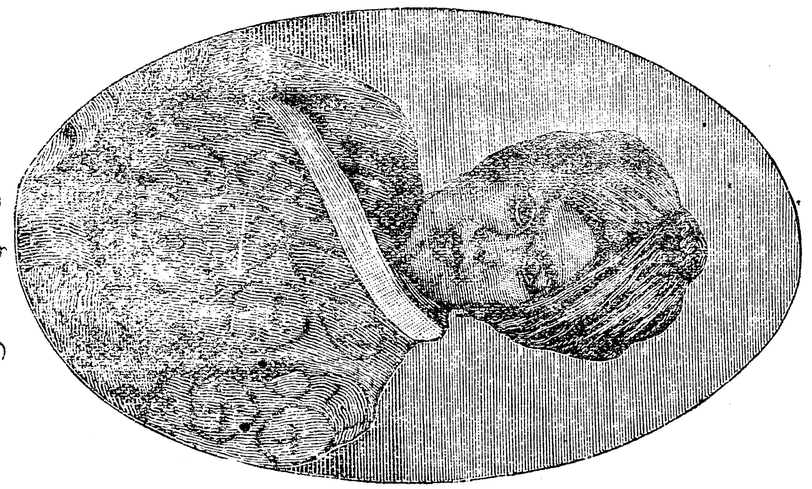

মহারাজ কুলাচন্দ্র।

সেনাপতি টিকেন্দ্রজিৎ।

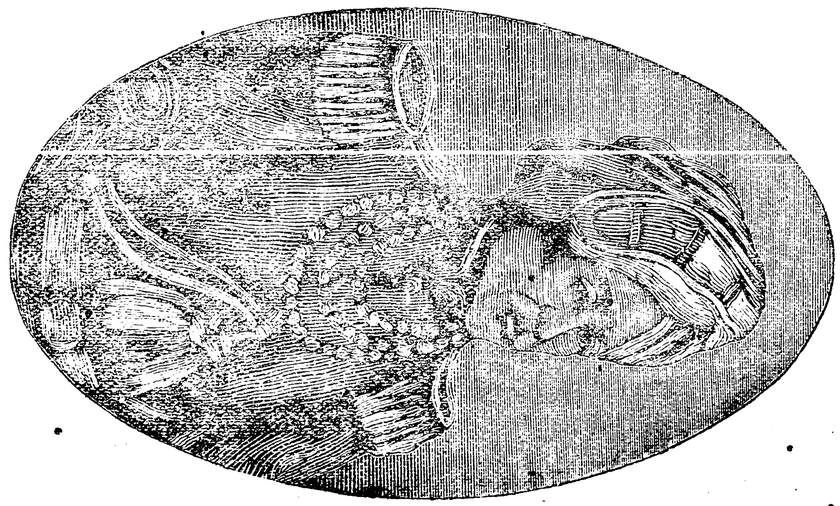

মন্ত্রী টঙ্গেল জেনারেল।

ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স।

আজ পৃথিবীর অপরদিগের কথা বলিব। যে দেশকে প্রাচীনকালে ভারতবাসীরা পাতাল বলিতেন, আজকাল যাহা আমেরিকা নামে বিশেষ প্রসিদ্ধ, যে দেশ ইউরোপীয়দিগের দ্বারা আবিষ্কৃত হইবার বহুপূর্ব্বে এসিয়া-বাসীদিগের অবিদিত ছিল না, আজ সেই দেশের একটি কথা বলিব।

কিন্তু একথা সে দেশের প্রাচীন কথা নহে। এসিয়া-বাসীরা যে বহুদিন পূর্ব্ব হইতে সে দেশ জানিতেন, তাহারও প্রমাণ-সম্বন্ধে আজ কিছু বলিব না—কেনই বা সেই দেশকে পাতাল বলিলাম, তাহাও বলিব না। সে সকল কথা আর একদিন ইচ্ছা হয় বলিব। আজিকার কথা স্বতন্ত্র।

আমেরিকায় প্রাচীনকালে যাহারা বাস করিত, তাহারা ইহার আধুনিক উন্নতির কারণ নহে। যে জাতীয় লোকদিগের হইতে আমেরিকার আজ এত নাম, সেই জাতীয় ব্যক্তিরা সকলেই ইউরোপীয়।

ব্রিটেন-বাসীরাই ইউনাইটেড্-ষ্টেটসে গিয়া বাস করেন। দেশের কষ্ট অসহ্য হওয়াই তাঁহাদের বিদেশ বাসের প্রধান কারণ। কিন্তু সে দেশে গিয়াও তাঁহারা প্রথমে ইংলণ্ডেরই অধীন ছিলেন। ইংলণ্ডের রাজাই তাঁহাদের শাসনকর্ত্তা নির্ব্বাচিত করিতেন; ইংলণ্ডের-মন্ত্রী-সভাই তাঁহাদের জন্য আইন-কানুন করিতেন। বিদেশবাসী ব্রিটনগণ প্রকৃত রাজভক্তের মত সে সমস্ত শিরোধার্য্য করিতেন।

কিন্তু ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে মিঃ গ্রেণবিল (Mr. Grenville) তাঁহাদের উপর 'ষ্ট্যাম্প ডিউটি' চাপাইবার ইচ্ছা করিলেন। ইহাই ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সের স্বতন্ত্র হইবার মূল।

ইতিপূর্ব্বে তাহারা ইংলণ্ডের সকল কথাই অম্লানবদনে শুনিত। কিন্তু এবার শুনিল ন… এবার বাধা দিল।

এই উপলক্ষে বিখ্যাত বক্তা পিটর সা… বলিয়াছিলেন,—"Sir, I rejoice that Am… has resisted. Three millions of pe… so dead to all the feelings of libe… as voluntarily to submit to be sla… would have been fit instruments… make slaves of all the rest. I co… not here armed at all points with l… cases and Acts of Parliament, w… statute book doubled down in d… ears to defend the cause of liberty… I had, * * * I would have cited th… to show that even under arbitr… reigns Parliament were ashamed… taxing a people without their cons… and allowed them representati… * * * I know the valour of your tro… I know the skill of your officers. I… good cause, on a sound bottom, … force of this country can crush Ame… to atoms. But in such a case as… your success would be hazardous."

মহাত্মা পিটের সেই ভবিষ্যৎ-বাক্য … হইয়াছিল। আমেরিকা হইতে ইংলণ্ড … বিষয়ে লাভবান হইতেন। নানা উ… ইংলণ্ডের রাজকোষে যে অর্থ আসিত, ত… আমেরিকা প্রতি বর্ষে প্রায় তিন কোটি টা… ব্রিটেন-জাত দ্রব্যাদি ক্রয় করিত। তা… যখন দেখিল, ইংলণ্ড তাহাদের অনভি… আইন চালাইতে উদ্যত—করভারে পী… করিতে প্রস্তুত, তখন তাহারা দৃঢ়-প্রতি… করিল,—"আর তাহারা ব্রিটেন-জাত কোন … ক্রয় করিবে না।"

এদিকে ইংলণ্ডে 'ষ্ট্যাম্প ডিউটি' চালা…

…তনিশ্চয়।—বোষ্টন নগরে প্রধান কার্য্যালয় …াপিত হইবে স্থির হইয়াছে, ওদিকে আমে…কা-বাসীরা কি করিল?—তাহারা জাহাজের …মস্ত নিশান মাস্তুলের মধ্যদেশে উঠাইয়া দিল; …কল গিরজায় মৃত্যুজ্ঞাপক ঘণ্টা-ধ্বনি হইতে …াগিল; এবং ষ্ট্যাম্প আইনটি (Stamp Act) …নমুদ্রিত ও বিক্রীত হইতে লাগিল; অধিকন্তু …াহার উপরে রাজকীয় চিহ্নের (Royal-arms) …রিবর্ত্তে মৃত্যুমুণ্ড অঙ্কিত ও আইনের নামের …রিবর্ত্তে "The folly of England and the …uin of America" এই নাম লিখিত।

…প্রতিনিধি-সভা (House of Representa…ives) হইতে ইংলণ্ডে প্রতিবাদ প্রেরিত হইতে …লাগিল। ওদিকে ইংলণ্ডে পিট, বর্ক, কামডেন প্রভৃতি বিজ্ঞ মহাত্মাগণ আইন যাহাতে উঠিয়া যায় তাহার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু, ফল কি হইল?—আইন উঠিল। আমেরিকাবাসীরা আপনাদের বল বুঝিল, কিন্তু ইংলণ্ড বুঝিলেন না।

১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে আবার নূতন ট্যাক্সের প্রস্তাব হইল। আবার আইন হইল। আবার আমেরিকা বাধা দিল। কিন্তু এবার ইংলণ্ড বল-প্রয়োগে উদ্যত—সংঘর্ষ উপস্থিত! এইরূপে ধবেস্থবে কয়েক বর্ষ থাকিয়া ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে ভয়ানক আগুণ জলিয়াছিল।

ইতিপূর্ব্বে চা-র উপর শুল্ক আদায়ের প্রস্তাব হয়। আমেরিকানেরা ইহা শ্রবণ করিয়া একেবারে চা-ব্যবহার পরিত্যাগ করিল; যত চা আমদানি হইতে লাগিল, সকলই গুদামে পচিতে লাগিল—কোন কোন জাহাজ আদৌ বন্দরে প্রবেশ করিতেই পাইল না—১৭৭৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনখানি জাহাজের সমস্ত মাল সমুদ্র-গর্ভে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল।

এইরূপে, বিজ্ঞগণের কথা না শুনিয়া, ইংলণ্ড যে মহান্ অনর্থ উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহার ফলে যে ভয়ঙ্কর অগ্নি জলিয়াছিল, তাহা আমেরিকার অধীনতাবন্ধন ভস্মাবশেষিত করিয়া "ইউনাইটেড্ ষ্টেটস্" প্রস্তুত করিয়াছিল। এবং জলন্ত অক্ষরে লিখিয়াছিল,—"E pluribus unum!"

———

অনুসন্ধান-সমিতির বিবরণী।

প্রতারণা-প্রবঞ্চনা।

পূজার বাজারের

বিজ্ঞাপন-জারি এখন হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। রঙ-বেরঙের ছোট বড় হ্যাণ্ডবিল-বিজ্ঞাপনও এখন হইতেই মফঃস্বলে বিলি হইতে আরম্ভ হইয়াছে। কাগজে বিজ্ঞাপন দিবারও সুরু হইতেছে। পুস্তক-পত্রাদির তো কথাই নাই; কেমিকেলের গহনা, জাল সোণার অঙ্গুরী-আংটি—এসকলও এখন, মহাধুমে বিজ্ঞাপনের বোলে, বাজারে বিক্রয় হইতেছে। পূজার বাজার কাছাকাছি বলিয়া সকল বিজ্ঞাপনেই কিছু না কিছু কড়ামিঠা বোল-চালের আধিক্য বাড়িতেছে, এই যা প্রভেদ! যাইহোক, আমরা কাহারও এখন আর নাম করিব না; গ্রাহকগণ সহজ জ্ঞানটুকুর সদ্ব্যয় করিলেও সকল রহস্য উদ্ঘাটন করিতে পারিবেন। আমাদের আর চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখান বাড়তির ভাগ—ইঙ্গিত-আভাসেই সকলে বুঝিয়া লউন।

বাজারের জুয়াচুরী।

১নং জুয়াচুরী,—নর্শরী-ওয়ালাদের। অবশ্য ভাল দোকান যাঁহাদের, তাঁহাদের নাম করিতেছি না। ছুট্‌লো-ছাট্‌লো দোকানেই গাছ-পালা ও কলম-বীজের বড়ই জুয়াচুরী হইয়া থাকে। হয় তো বিক্রেতাই কখনও 'নেংড়া' বা 'গোপালভোগ' আম্র বা তাহার গাছ চক্ষে দেখে নাই; কিন্তু যেই ক্রেতা তাহা কিনিতে যাইলেন, অমনি বলিল,—"এই লউন, আমার সব রকম আমের গাছই মজুত আছে।" ছোট

গাছ—চারা-মাত্র ; ফল হইবে তাহার, কে জানে কত দিনে! কাজেই ক্রেতারও আর সে গাছ চিনিবার উপায় কি? বিক্রেতার কথায় বিশ্বাস, বা তাহার আঁটা টিকিট ভিন্ন, সে গাছের আর কি পরিচয় হইতে পারে? ৮। ১০ বৎসর না যাইলে—গাছে ফল না ফলিলে, তো আর জানিবার উপায়ই নাই! তা' সেও অনেক দূরের কথা! কাজেই এই ব্যবসায়ে লোকে সর্ব্বদাই ঠকিয়া থাকেন। অথচ প্রতিকারের কোনই উপায় নাই। এইরূপ বীজ-সম্বন্ধেও নানা জুয়াচুরী হয়। বিলাতী বীজের কথা—সে তো চিনিবারই যো নাই! ২নং জুয়াচুরী,—নিলামের বাজারে। কলিকাতায় সচরাচর যে সকল নিলাম হয়, এবং যে সকল নিলামে সচরাচর লোকে লাভবান হইবার আশা করেন, তাহার প্রায় স্থলেই ঠকিতে হয়। তাহার কারণ এই যে, নিলামের দোকানের প্রতারকগণ নিজেদের দলের কতকগুলি লোককে সেই স্থলে খরিদদার-স্বরূপ দাঁড় করাইয়া রাখে ; এবং যতক্ষণ পর্য্যন্ত জিনিসটা বেচিয়া ন্যায্য দরের উপরও লাভ না হয়, ততক্ষণ সেই সকল লোকই তাহার দর বাড়াইয়া যায়। এইরূপে, দর বাড়াইয়া যাইবার সময়, ক্রেতারা কিছুতেই বুঝিতে পারে না যে, তাহারা সেই দলেরই লোক ; কাজেই লোভের কুহকে পড়িয়া, দর বাড়াইয়া দিয়া, তাহা তখন কিনিয়া থাকে ; এবং অবশেষে, বাড়ী আসিয়া, যাচাই করিয়া দেখে যে, কি ঠকাই ঠকিয়াছে! এইরূপ নিলামের ক্ষেত্রে আরও একরকম জুয়াচুরী হইয়া থাকে ; তাহা আরও ভয়ানক। সে জুয়াচুরী এই,—ক্রেতা জিনিসের দর শুনিয়া যায়, তিন আনা বা চারি আনা ; এবং ডাকিয়াও যায়, ঐরূপ। কিন্তু, শেষ যখন সে দ্রব্য বিক্রেতা তাঁহাকে গছাইয়া দেয়, তখন বলে,—'দেন বাবু, দু' টাকা তিন আনা।' ক্রেতা তো অবাক! তিনি ভাবিয়াছিলেন, তিন আনা বা চারি আনায় জিনিসটা পাইতেছেন ; কিন্তু শেষ হইল, তাহার সঙ্গে যোগ, দু'টাকা তিন আনা! এরূপই বাজারের ব্যাপার! ... স্থলে, দর করিয়া জিনিস না লইলে, বিক্রে... আবার ক্রেতাতে লইয়া টানাটানিও করিয়া থা... তাঁহার নিকট টাকাকড়ি পাইলে, কাড়ি... লয়। বলাবাহুল্য, এই সকল নিলাম-কারীদি... দলবলও সর্ব্বদা মজুত থাকে ; দাঙ্গা-হাঙ্গা... করিতেও তাহারা পশ্চাৎপদ হয় না।

মফঃস্বলের গ্রাহকগণ।

অর্ডার দিয়া, ভ্যালুপেয়েবেলে পাঠাই... বলিয়া, মাল গ্রহণ না করা বা সংবাদপত্র গ্র... করিয়া তাহার মূল্য না দেওয়া, আজকাল প্র... দেখিতে পাইয়া থাকি। সম্প্রতি প্রসিদ্ধ ড... হৌসী স্কোয়ারের 'এস. কে. দাস এণ্ড কোম্পা... মহাশয়গণ আমাদিগকে ঐরূপ কতকগুলি ক্রে... নাম প্রদান করিয়াছেন, এবং তাঁহারা ঐ সক... ক্রেতার নামে আমাদিগকে নালিশ রুজু করি... জন্য অনুযোগ করিয়াছেন। এইরূপ আ... কোন কোন ব্যবসায়ী আমাদিগকে সর্ব্বদা... অনুযোগ করিয়া থাকেন। যাইহোক, অ... ততঃ আমরা ঐ সকল গ্রাহকদিগের নাম সং... করিতেছি ; এবং তাঁহাদিগকে প্রথমতঃ এক... একটা তাগিদ-পত্র দিতেছি। পরে যেরূপ... হয়, সেরূপ করা হইবে। ফলতঃ এরূপ স... ব্যবহার বড়ই ক্ষোভের বিষয়। আর, ইহ... সদ্ব্যবসায়ীরাও যে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন, ত... বলা বাহুল্য। এরূপ গ্রাহকগণ এখনও সাবধা...

মণিপুর ফুরাইল।

এত কাঁদাকাটি আবেদনের পরও, বড়... বাহাদুর আদেশ দিয়াছেন যে,—মণিপু... সেনাপতি টিকেন্দ্রজিতের এবং টঙ্গেল জে... রেলের ফাঁসির হুকুমই বজায় রহিল ; ... মহারাজা কুলাচন্দ্র ও অঙ্গোসেনা ইহাঁদের... জনের যাবজ্জীবন দীপান্তর-বাস দণ্ড হই... কাজেই বলিতে হইতেছে,—মণিপুর ফুরাইল...

—

অনুসন্ধান

অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র

৫ম খণ্ড] ১৫ই ভাদ্র, ১২৯৮। [৩য় সংখ্যা।

আকুল-আহ্বান।

হরি ব'লে শুধুই ডাকি,
পাইনে হরি তোমার দেখা।
ভবের মাঝে আর কত কাল
এমন ক'রে কাট্‌বে একা॥
দিন কেটেছি মায়ার বশে,
কালের নিশি এগিয়ে আসে,
আকুল হ'য়ে ডাক্‌চি ত্রাসে,
দাও হে দেখা দীনের সখা॥

—

সুখ।

সুখ কি? "অনুকূলবেদনীয়ং সুখম্।" যে অবস্থায় অনুভব-শক্তিসকল অবাধে এবং অনর্গলিতভাবে প্রবাহিত হইতে থাকে, যখন ইন্দ্রিয়গণ অনুকূল কার্য্য করিতে থাকে, তখন—সেই অবস্থাকে সুখ বলিয়া বুঝিব। অনেক পণ্ডিতেই সুখের এই বিবরণ দিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের ধারণা এই যে, সুখ আত্মার অবস্থা-বিশেষ মাত্র ; অর্থাৎ সুখ আত্মার গুণ-বিশেষ নহে, কোন ঐন্দ্রিয়িক ক্রিয়া নহে, কোন গুপ্ত আত্মীয় শক্তির প্রস্ফুরণও নহে। উহাকে আত্মার সর্ব্বশক্তির, সর্ব্বক্রিয়ার সামঞ্জস্যের অবস্থা বলা যাইতে পারে। কেন না, একাধারে দুইটি বিভিন্ন, বিরুদ্ধ এবং বিপরীত শক্তির ক্রিয়া সমভাবে এবং একই সময়ে হইতে পারে না। শক্তি ক্রিয়াশীল হইলেই অন্যান্য শক্তিকে সম্যক্ পরাভূত করিয়া—চাপিয়া রাখিয়াছে বুঝিতে হইবে। যেমন, মনুষ্য-শরীরে যখন ক্রোধের প্রকাশ হয়, তখন কামাদি অন্যান্য রিপুগণ যে একেবারেই থাকে না, তাহা নহে; তাহারা কুঞ্চিত, মুদিত ও অপ্রস্ফুটিত ভাবে থাকে মাত্র। সুতরাং সুখ সেই অবস্থা—যখন আত্মার বৃত্তি-প্রবাহ অবিচ্ছিন্ন ও অবিচলিত থাকে, যখন আত্মার এমন কোন দুষ্ট শক্তি প্রকাশ পায় না যদ্দ্বারা এই অনুকূল-প্রবাহ অবরুদ্ধ বা সংহত হয়। অথবা বলিব কি, যে অবস্থায় স্থিতির—শান্তির পীযুষ-ধারায় আত্মার পিপাসিত কণ্ঠ পরিতৃপ্ত হয়, আনন্দের অচঞ্চল সৌদামিনী-প্রভায় আত্মা নিরুদ্বেগ, নিশ্চিন্ত্য, নির্দ্বন্দ্ব এবং নিরাময় হয়?

প্রথম বিবৃতি-অনুযায়ী সুখ দুঃখের বিপরীত অবস্থা। কেন না, বাধিত অবস্থাকে দুঃখ বলে। সুতরাং যাহা অবাধিত, অনর্গলিত এবং উচ্ছৃঙ্খল, তাহাই সুখের অবস্থা। কিন্তু মনুষ্যের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে সৃষ্টি-চাতুরী যতদূর বুঝা গিয়াছে, তাহাতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, বিশ্ব-সৃষ্টির মধ্যে কিছুই স্বাধীন এবং অবাধিত নহে। কত শক্তির কত প্রকার ক্রিয়া হইতেছে, কত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ব্যাপার সঙ্ঘটিত হইতেছে, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রহ-উপগ্রহ-পৃথিব্যাদি অনন্ত আকাশ-

পথে বিঘূর্ণিত ও বিলুণ্ঠিত হইতেছে, একটু অন্তর্দৃষ্টিতে এই সকল ব্যাপার দেখিলেই স্পষ্ট বোধ হইবে যে, এই বিশাল শক্তি-ক্রিয়া সংযত, সংবদ্ধ এবং নিয়মিতভাবে হইতেছে। এক শক্তি অন্য শক্তিকে রুদ্ধ করিতেছে, এক ক্রিয়া অন্য ক্রিয়াকে প্রণালীবদ্ধ করিতেছে। মনুষ্য-শরীরও এই বিশ্বব্যাপী নিয়মের অধীন। মনুষ্যের অসৎ প্রবৃত্তি সকল সৎপ্রবৃত্তির দ্বারা সংযত হইতেছে; কাম ক্রোধকে হীনবল করে, বিনয় ঔদ্ধত্যকে চাপিয়া রাখিয়াছে। প্রবৃত্তি তোমার কানে কানে চুপি চুপি যাহার জন্য তোমাকে মাতাইয়া দেয়, অসাধ্য-সাধন করিয়াও তুমি কি তাহা পাও? যাহা চাও, সকলগুলিই কি পাইয়া থাক? যাহা চাই, তাহা পাই না; সম্ভব-অসম্ভব সকল আবদার পূর্ণ হয় না; তাই সুখের অন্বেষণ করিয়া থাকি, তাই সুখী-জনের আনন্দমাখা মুখখানি দেখিবার জন্য পাগলের ন্যায় দেশ-বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াই; তাই শাস্ত্র-গ্রন্থের ও দর্শন-বিজ্ঞানের প্রত্যেক পত্র পড়িয়া দেখি; দেশী ও বিদেশী দার্শনিকগণের মতামত গ্রহণ করি। আশা,—যদি সুখের প্রকৃত লক্ষণ জানিতে পারি, যদি সুখের নিদর্শণ পাইয়া সুখের পথের পথিক হইতে পারি। অতএব বুঝিতে হইবে যে, দুঃখের ঠিক বিপরীত অবস্থা যাহা, তাহা স্বাভাবিক নিয়ম-বিরুদ্ধ, অসম্ভব ব্যাপার; সুতরাং জগতে উহার অস্তিত্ব নাই। যদি স্বীকার করা যায় যে, সুখ সংসারে আছে, তাহা হইলে দুঃখের বিপরীত অবস্থা সুখ নহে। কাযেই যাহা অবাধিত এবং স্বাধীন, তাহা সুখের অবস্থা নহে। কেন না, যাহা অবাধিত, অনর্গলিত এবং উচ্ছৃঙ্খল, তাহা প্রকৃতি-রাজ্যে নাই। এতদ্ব্যতীত এই বিবৃতি-অনুযায়ী যুক্তি-বিচার করিতে হইলে অন্যান্য অনেক দোষ ঘটিবে। আমরা অগ্রে সেইগুলিই দেখাইব।

সুখের প্রধান বাধা অতৃপ্তি। যে কোন প্রবৃত্তির তৃষ্ণা মিটাইতে যত কেন চেষ্টা কর না, পিপাসার শান্তি হইবে না, আশা পূরিবে না—সাধ মিটিবে না! যতই প্রবৃত্তির নেগ ছাড়িয়া দিবে, শতমুখী হইয়া—সর্ব্বব্যাপী হইয়া যতই বাসনার লোলজিহ্বা প্রসারিত হইতে থাকিবে, ততই তৃষ্ণার তীব্র যাতনা কোটীগুণে বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। সে বিষম বুভুক্ষা ব্রহ্মাণ্ড গ্রাস করিয়াও পরিতৃপ্ত হইবে না। জীব-সৃষ্টির এইটুকুই চাতুরী—এইটুকুই বাহাদুরী। কেন এমন হয়, তাহা ক্ষুদ্র মনুষ্য-বুদ্ধিতে কেমন করিয়া বুঝিব; তবে সৃষ্টিতত্ত্ব এবং দেহতত্ত্বের যেটুকু গূঢ় রহস্য আমরা জানিতে পারিয়াছি, তদ্দ্বারা ইহার কার্য্য-প্রণালী কিছু নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। পারমাণব জগতে আমরা প্রধানতঃ দুইটি শক্তির ক্রিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারি। একটি অপসারকতা (Expansion), দ্বিতীয় সংকর্ষণ (Adhesion)। তাপ-তেজের ক্রিয়া দ্বারা অণুপুঞ্জ (Molecules) ছড়াইয়া পড়ে—আপনা-আপনি পৃথক হইয়া যায়; এবং দ্বিতীয় শক্তির দ্বারা (শৈত্যবশতঃ) উহারা আবার একত্রিত ও সম্মিলিত হইয়া থাকে। জলবায়ুর এবং সূর্য্যের ক্রিয়া দ্বারা আকাশে কখনও অধিক পরিমাণে তাপের সৃষ্টি হয়, কখনও বা শীতলতা অধিক উৎপন্ন হয়। যখন তাপের আধিক্য থাকে, তখন পদার্থমাত্রেই একটু বিস্তৃত এবং প্রসারিত হয়; শীতের সময় উহারা সঙ্কর্ষিত ও কুঞ্চিত হইয়া পড়ে। এই দুই শক্তির সামঞ্জস্যতেই পদার্থের উৎপত্তি, এবং অবয়বের বা আকারের সৃষ্টি। তবে পদার্থমাত্রেই উষ্ণতা আকর্ষণ করিতে অধিক পটু। যে পদার্থ অন্যান্য পদার্থ হইতে অধিক উত্তাপযুক্ত, তাহার উত্তাপ হরণ করিবার জন্য শীতলতর সামগ্রী-সকল বিশেষ চেষ্টা করে; এবং পরিণামে সে উত্তাপ অপহৃত হইয়া যায়। জীবদেহ জড়পদার্থ হইতে অধিক উত্তাপযুক্ত। উষ্ণতা প্রাণীদেহের জীবনের এক প্রধান কারণ। তাই এই দেহের তাপ পারিপার্শ্বিক সকল সামগ্রী সর্ব্বদা

হরণ করিতেছে—আকর্ষণ করিয়া লইতেছে; এবং পলে পলে আমাদের শারীরিক (Tissue) পোষক ধাতু নষ্ট হইতেছে; দশ জনকে বিলাইতে বিলাইতে নিজের ভাণ্ডার খালি হইতেছে। এই অভাবের পূরণ করিবার জন্য আমাদের আহার আবশ্যক। পাকস্থলী আহার্য্য সামগ্রী লইয়া দিবারাত্রি পাক-কার্য্য করিতেছে; যে কারণে যখনই শরীরের ধাতুক্ষয় হইতেছে, তখনই তাহার অভাব মোচন হইতেছে। যতক্ষণ পাকস্থলীতে পরকীয় সামগ্রীর জীর্ণকার্য্য হইতে থাকে, ততক্ষণ আমাদের ক্ষুধা পায় না, শারীরিক দুর্ব্বলতা বোধ হয় না। কিন্তু যখনই নিজ-শরীরের মেদ-মজ্জা আসিয়া সর্ব্বভুক্ পাকাগ্নিতে পতিত হয়, তখনই আমরা ক্ষুধার জ্বালায় ছট্‌ফট্ করিতে থাকি। আমাদের শরীরে এই হরণ-পূরণ কার্য্য নিয়তই হয়; তবে যতদিন জীবিত থাকা যায়, ততদিন পূর্ত্তির ভাগই অধিক, আর মরণ-দশা হইলে সর্ব্বস্বই চুরি যায়—কোন মতেই তাহার বাধা দিতে পারি না।

তবেই বুঝা গেল যে, যতদিন আমরা জীবিত থাকিব, যতদিন শরীরী থাকিব, ততদিন কোন মতেই আমাদের আর শান্তি নাই। শরীরের ক্রিয়া দিবারাত্রিই হইতে থাকিবে; এবং যেখানেই গতি, যেখানেই ক্রিয়া, সেইখানেই তাপের বৃদ্ধি; সুতরাং শক্তি-সামঞ্জস্য নষ্ট হইলে ক্ষয়ও হইবে। এই ক্ষয়ের পরিপূরণের জন্য পোষণী-শক্তির চেষ্টা হইবে। এই পরিপূর্ত্তি-চেষ্টাই প্রবৃত্তির পিপাসা, বাসনার তৃষ্ণা। যাহা আমার ছিল তাহা নাই, অথবা আমার মনে হয় যে চেষ্টা করিলে পাইতে পারি, আর তাহাই পাইবার জন্য ইচ্ছা হয়—চেষ্টা হয়। এই চেষ্টার জন্য শরীরের মধ্যে একটা ক্রিয়ার সূচনা হয়, একটা উদ্বেগ হয়, তজ্জন্য শরীরে পারমাণব তাপের বৃদ্ধি হয়, সুতরাং পোষক ধাতুরও ক্ষয় অবশ্যম্ভাবী। চলিতে, ফিরিতে, উঠিতে—সকল চেষ্টাতেই, আমাদের লোকসান। এই লোকসান পরিপূরণের জন্য অন্য প্রকারের চেষ্টা ও উদ্যম হইবে, তাহাতেও ক্ষয় হইবে। কিন্তু এ সময়ে ক্ষয় হইতে প্রাপ্তি অধিক, তাই এ ক্ষতির অনুভূতি হয় না, এবং অতৃপ্তির ভাবটাও একেবারে বিনষ্ট হয় না। মনে করুন, আপনার আনারস খাইবার ইচ্ছা হইল। ইচ্ছা অথবা বাসনা হইলেই শারীরিক ক্ষয় হইবে, এবং এই ক্ষতি-পূর্ত্তির চেষ্টাই ক্ষুধা। আনারসের স্বাদ আপনি জানেন, কিম্বা লোকমুখে শুনিয়াছেন; এবং ইহাও জানেন যে, কোন বন্ধু কলিকাতায় যাইলে তাঁহাকে অনুরোধ করিলে আসিবার সময়ে তিনি আনারস আনিতে পারেন। সুতরাং আপনি বুঝিলেন যে, সামান্য চেষ্টা করিলে আনারসের বুভুক্ষা মিটিতে পারে। এই ক্ষুধা এবং চেষ্টা জন্য আপনার একটা অভাব বোধ হইল, শরীরের পোষক ধাতুও ক্ষীণ হইল। পাকস্থলী যাহা জীর্ণ করে, তাহাতে আপনার সংস্কার-অনুযায়ী আনারসের আস্বাদ পায় না; তাই যেন ব্যস্ত হইয়া সামগ্রীর পর সামগ্রী দগ্ধ করিতে থাকে, যদি কোনখানে আনারসের স্বাদ পায়। এই ব্যস্ততা-জন্য পাকস্থলীর দৌর্ব্বল্য হয়, মন ম্লান হইয়া পড়ে, পোষক ধাতুও অধিক ক্ষয় হয়; এবং দিন দিন আনারস খাইবার বাসনা তীব্রাতিতীব্র হইতে থাকে। তার পর, মনে করুন, এই সময়ে আপনার বন্ধু কলিকাতা হইতে দশটা আনারস আপনার জন্য আনিলেন। ক্ষুধার আতিশয্য-বশতঃ, বাসনার তীব্রতা জন্য, একটা-দুইটা করিয়া আপনি দশটাই উদরসাৎ করিলেন; আপনার পেট ভরিয়া গেল; কিন্তু সাধ মিটিল না। প্রথম আনারসটি খাইবার সময়ে পাকস্থলী বহুদিন-আকাঙ্ক্ষিত পদার্থ পাইয়া, যেন কত আহ্লাদের সহিত কত সত্বর আনারস-খণ্ড সকলকে জীর্ণ করিয়া আত্মসাৎ করিতে থাকে। পূর্ব্বে যে আনারস খাইবার জন্য একটা ক্ষুধা হইয়াছিল, একটা

অভাব বোধ হইয়াছিল, সেই ক্ষুধা মিটাইবার জন্য, যন্ত্রণা দূর করিবার জন্য, এত তাড়াতাড়ি। পরন্তু, এই তাড়াতাড়ি—এই বিষম আগ্রহই বাসনা-নিবৃত্তির পক্ষে প্রধান অন্তরায়। পরমাণু-পুঞ্জের মধ্যে একটা ত্বরান্বিত কার্য্য হইলে সেই কার্য্যের বা সেই গতির প্রতিগতি হইয়া থাকে—তাহার নিকাশ মরে না। শীঘ্র শীঘ্র ক্ষয়ের পর পূর্ত্তি হইলেই, ক্ষয়ের কার্য্য ঘন ঘন হইতে থাকিবে। যেমন নির্ব্বাণোন্মুখ অগ্নিতে ঘৃত দিলে একেবারে ক্ষণকালের জন্য হু হু জ্বলিয়া উঠে এবং তৎক্ষণাৎ ক্ষীণতেজ হয়; এবং আবার ঘৃত দেও, পুনর্ব্বার জ্বলিবে ও আবার নিভিবে; তেমনি ক্ষুধার্ত্ত—পিপাসিত, সুতরাং ক্ষীণ—অভাব-যুক্ত, প্রবৃত্তি-হুতাসনে নিবৃত্তির—তৃপ্তির সামগ্রী দিলে, তাহা যেন প্রফুল্ল বদনে শত জিহ্বা হইয়া প্রসারিত হইবে, এবং পরক্ষণেই ক্ষীণও হইয়া পড়িবে। ক্ষুধার মুখে আনারস যত দেও, তত খাইব; পেট ভরিয়া যাইবে, শেষে আর খাইতে পরিব না—একটা বিরক্তি জন্মিবে, ও একটা অসবাদ আসিয়া শরীরকে অবসন্ন করিবে। কিন্তু আস্বাদের ক্ষুধা মিটিবে না ত! দুইদিন পরে আবার আনারস দেখিলেই রসনা রসসিক্ত হইবে! তেমনি কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহাদি প্রবৃত্তির সকল ক্ষুধাই অনিবার্য্য। যাহা ক্ষয় হয়, ঠিক তেমন হইয়া তাহার পূরণ হয় না। যাহা যায়, ঠিক সেইটিই আবার ফেরত পাই না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, যখনই ক্রিয়া, তখনই তাপের উৎপত্তি, এবং তাপ হইলেই সঙ্গে সঙ্গে ক্ষয় হইবে। প্রথম বাসনা হইলেই ক্ষয়, তাহার পর সেই বাসনা পরিতৃপ্তির জন্য চেষ্টা-জনিত নূতন ক্ষয়ের উৎপত্তি। সাঁকের করাত যেদিকে যায়, সেইদিকেই লোকসান। শুধু তাও নয়, একটা প্রবৃত্তি লইয়া পুনঃ পুনঃ ক্রিয়া হওয়াতে উহার এক সংস্কার অঙ্কিত হইয়া যায়, মস্তিষ্কের স্মৃতিপটে একটা দৃঢ় ধারণা লিখিত হয়। এই ধারণা অথবা সংস্কার ক্ষুধাকে জাগাইয়া রাখে—বাসনার মুখ খুলিয়া রাখে। বাসনা পরিতৃপ্তি সময়ে ইন্দ্রিয়-প্রফুল্লতা-বশতঃ যে একটু আনন্দ যে একটু সুখবোধ হইয়াছিল, সেই ধারণ সেই ক্ষণকালিক আরামের স্মৃতি, সময়ে অসম্য পূর্ব্বানুরূপ বিষম তৃষ্ণার সৃষ্টি করে; যাহা একবা ভোগ করিয়াছিলাম, তাহাই পাইবার জন্য মনকে মাতাইয়া তোলে। আর, তাই বলিতেছিলাম সুখের বিষম অন্তরায় অতৃপ্তি। রক্তমাংসের শরী লইয়া তৃপ্ত হওয়া অসম্ভব। যদিও বা মুহূর্ত্তে জন্য সামান্য সুখ বোধ হয়, কিঞ্চিৎ তৃপ্তি লা করি, তাহাও পরিণামে এবং সেই সুখের সময়ে অসুখের—যন্ত্রণার কারণ হইয়া পড়ে।

অতএব বুঝিতে হইবে যে, প্রবৃত্তির অবাধি অনর্গলিত ও অনুকূল-প্রবাহ একপ্রকার অসম্ভ ব্যাপার। অনুকূল-প্রবাহ উদ্ভূত হই কিন্তু উৎপত্তিমাত্রেই বাধিত ও রুদ্ধ হইবে। তোমার কল্পনা-চক্ষে যে অপর সুন্দরীর লাবন্যচ্ছটা দেখিয়া মাতিয়া উ জড়জগতে সে নমুনার মত কয়টা কামি দেখিয়াছ? হৃদয়ের গুপ্ত গবাক্ষে বসিয় বিলাসের এবং ঐশ্বর্য্যের যে চিত্র অঙ্কিত ক এই জীবনে কয়বার ঠিক তেমন সুখের সাগ ভাসিয়াছ? ধনীগণের গাড়ী-জুড়ি দেখিয় পোষাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া, তাহাদিগকে য সুখী বলিয়া মনে কর, বলিতে পার, তাহাদে মধ্যে কেহ কি তত সুখী কখনও হইতে পারি য়াছে? ছিন্ন-কন্থায় শয়ন করিয়া, দুঃখের দংশন জ্বালা বিস্মৃত হইবার মানসে, বাসনার বেড়া দি ধন-দৌলতের পুষ্পবাগিচা নির্ম্মাণ করি শূন্যপথে ঝুলাইয়া রাখ; পরে যদি ভাগ্যগু সকল সাধই মিটে, তাহা হইলেও, যতটুকু সুখে সুখী হইবে মনে করিয়াছিলে, ঠিক ততটু সুখের ভাগী হও কি? কখনই নহে। জড়-শক্তি আত্ম-শক্তি কত পথে ও কত দিকে ছুটাছু করিয়া বেড়াইতেছে; তোমার প্রবৃত্তির অনুকূল প্রবাহ স্বাধীনভাবে প্রস্ফুরিত হইতে না হই

বাধিত, রুদ্ধ, ও ব্যথাগ্রস্ত হইবেই। পথের ভিখারী হইতে কোটীশ্বর হও, সার্ব্বভৌম সম্রাট হও, কল্পনার স্বপ্নেও যাহা কখনও দেখ নাই তেমন বিলাস-বিভ্রমের সামগ্রী পাও, তথাপি তোমার দুঃখের দুয়ার বন্ধ হইবে না—রাবণের চিতার ন্যায় তোমার দুঃখের চিতা অহরহ হু হু জ্বলিতে থাকিবে। জড়-জগতের নিয়মাধীন তুমি, তোমার শরীর-পথে যে শক্তিই স্বাধীন-ভাবে প্রধাবিত হইতে চেষ্টা করিবে, তাহাই বাধিত এবং রুদ্ধ হইবে। মানুষ যতদিন মানুষ থাকিবে, যতদিন রক্ত-মাংসের জবরদস্তি থাকিবে, ততদিন, তেত্রিশকোটী দেবতার কাছে মাথা কুটিলেও, এমন সুখের সুখী হইতে পারিবে না। তবে কি সংসারে সুখ নাই? তবে কি কেহ কখনও জগতে সুখী হইতে পারে নাই? সংসারে ঠিক খাটি সুখ না থাকিতে পারে; তোমার আমার ন্যায় দশজনের সমাজে ঠিক সুখী লোক না মিলিতে পারে; কিন্তু ভগবানের রাজ্যে নাই, এমন বস্তু নাই; সুখের অবস্থাও আছে, সুখী—সাধুজনও আছে; এবং "অনুকূলবেদ-নীয়ং সুখম্" তাহাও ঠিক! তবে এতক্ষণ যাহাকে 'অনুকূলবেদনা' বলিয়া বুঝিলাম, অথবা বুঝিতে চেষ্টা করিলাম, তাহা আত্মার অনুকূল-বেদনা নহে। ভগবান গীতায় বলিয়াছেন,—

"যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এবতে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ॥"

(২২—৫ম অধ্যায়)

"বাহ্য বিষয়ে সংসর্গজনিত এই যে সকল সুখ, তৎসমস্তই দুঃখ-বিমিশ্রিত, এবং ভবিষ্যৎ দুঃখের কারণ হইয়া থাকে। কেন না, ঐ সকল সুখ আদি এবং অন্তবন্ত, অর্থাৎ উৎপত্তি এবং বিনাশশালী। অতএব ঐ সুখের বিনাশ হইলে দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। এইজন্য, হে কৌন্তেয়, ঐ সকল সুখের দ্বারা পণ্ডিতগণ পরিতৃপ্ত হয়েন না।" সুতরাং বাহ্য বিষয় জন্য সুখ, ভোগ্য-ভোগী-সম্বন্ধ জন্য সুখ, দুঃখের কারণ; এবং এই সুখের উৎপাদন জন্য যে প্রবৃত্তির অনুকূল-বেদনা হয়, তাহা দুঃখসূচক।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, সামঞ্জস্য সুখ। সামঞ্জস্য, স্থিতি, শান্তি এই কয়টি শব্দ একই ভাব-প্রকাশক। সচরাচর আমরা যে সকল অচল, স্থির বস্তু দেখিতে পাই, তাহারা শক্তি-শূন্যতা-বশতঃ জড়বৎ, স্থাণুবৎ, চলৎশক্তি-শূন্য নহে। নানা প্রকার প্রতিরোধক শক্তির ঘাত-প্রাতঘাতে, গতিপ্রবাহ সংযত হইয়াছে মাত্র। একখানা চৌকি যেখানে রাখিবেন, সেইখানেই থাকিবে; কেন না, চৌকির উপর পৃথিবীর যে মাধ্যাকর্ষণ-শক্তি কার্য্য করিতেছে, তাহা চৌকীর পায়ার ধারণী-শক্তির দ্বারা সংযত এবং সামঞ্জসীকৃত হইয়াছে। এ জগতে সৃষ্টি এবং লয়-কার্য্য তোমার আমার দ্বারা সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব। যিনি এই ইন্দ্রজাল বিস্তার করিয়াছেন, যিনি সৃষ্টিকর্ত্তা বিধাতা, তিনিই রাখিতে পারেন, ও মারিতে পারেন। তোমার সাধ্য কি যে, এক সামান্য বালুকাকণাকে নষ্ট কর। তবে মানুষ পারে কেবল অবস্থান্তর করিতে। সুতরাং যাহা তোমার পথের কণ্টক, তাহাকে বিদূরিত করিতে হইলে, তাহাকে উৎপাটিত করা তোমার অসাধ্য, তুমি উহার অবস্থান্তর করিতে পার মাত্র; যাহাতে আর কণ্টকের বেদনা তোমার অনুভূতিগম্য না হয়, তাহাই করিতে পার। কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহাদি আমাদের চির-সুখের অন্তরায়। কিন্তু এ ইন্দ্রিয়-শক্তি সকলকে তুমি বিনষ্ট করিতে পার না, তবে এমন কোন নূতন শক্তির উদ্ভব করা তোমার সাধ্যায়ত্ত যদ্দ্বারা উহারা সংযত, সঙ্কুচিত এবং সামঞ্জসীকৃত হইতে পারে। সামঞ্জস্য হইলে গতিপ্রবাহ রুদ্ধ হইবে; সুতরাং ক্ষয় হইবে না, ক্ষুধা ও অভাব থাকিবে না। দুইজন মল্ল-যুদ্ধ করিতেছে, দুইজনে হাতাহাতি করিতে করিতে প্রাঙ্গনের একদেশে স্থির হইয়া দাঁড়াইল; ইহাতে কি বুঝিতে হইবে যে, প্রত্যেক মল্ল অপরকে পরাভূত করিবার জন্য শক্তি-যোজনা

করিতেছে না, জোর করিতেছে না? তাহা নহে। বরং বুঝিতে হইবে যে, উভয়ের শক্তি সমভাবে প্রযুক্ত হওয়াতে কেহ কাহাকেও হারাইতে পারিতেছে না। সুতরাং দুই জনের বল-সামঞ্জস্য (Equillibrium) হওয়াতে গতি-প্রবাহ সংহৃত হইয়াছে মাত্র। তেমনি যদি আমাদের ভক্তি-একনিষ্ঠা কাম-ক্রোধকে দাবিয়া রাখিতে পারে, বিনয়-সৌজন্য মদমাৎসর্য্যকে আর বাড়িতে না দেয়, তাহা হইলে শরীর-পথে উহাদের প্রকাশ না হইয়া আপনা-আপনি লড়া-লড়ি করিয়া আপনাতেই উহাদের দুষ্ট তেজ সংবৃত হয়। বিশেষতঃ শরীরের উপর কোন ইন্দ্রিয়-শক্তির গতি হইলেই দেহের ক্ষয় হইবে, প্রবাহ থাকিলেই প্রণালী হইবে, প্রবৃত্তির স্রোত ছাড়িয়া দিলেই তোমার বুকের উপর দিয়া উহা গভীর এবং বিস্তৃত খাদ কাটিয়া দিবে। যতদিন প্রবাহিনী দুকূল-প্লাবিনী, ততদিন তৃপ্তিবিধায়িনী ও তৃষ্ণা-নিবারিণী; যতদিন তোমার প্রবৃত্তি-প্রবাহিনী যৌবন-রসে রসময়ী, আবেগ-উচ্ছ্বাস-বিলাস-বিভ্রম-প্রদায়িনী, ততদিন উহা তৃষ্ণাহরা। পরন্তু বর্ষার ভরা গঙ্গা যেমন ধৌত-বিধৌত জাল-জঞ্জাল-মলিনা, সে জল পান করিলে তৃষ্ণা মিটে না, তৃপ্তি হয় না, ঘৃণা হয়, গা কেমন কেমন করে; তেমনি ভরা-যৌবনের প্রবৃত্তি-তটিনী কলুষ-কল্মষময়ী—উহাতে ঝাঁপ দিলে অঙ্গ শীতল হয় না, তৃপ্তি বোধ হয় না, আবর্জ্জনা-রাশিতে শরীর মলিন হইয়া পড়ে। তারপর, যখন নিদাঘ-সময়ের প্রখর রবিকর-সন্তাপে পৃথিবী শুকাইয়া উঠে, তখন যেমন কলনাদিনী লোকাপ্রহ্লাদিনী তটিনী বিশুষ্ক হইয়া বালুকাস্তূপে ডুবিয়া যায়; তেমনি যখন যৌবন-প্রবাহ চলিয়া যায়, জরার-তাপে শরীর জীর্ণ হইয়া পড়ে, তখন হৃদয়-মধ্যে শূন্যময় গভীর খাদ দেখিয়া তুমি নৈরাশ্য-শূন্যে ডুবিয়া যাও। যদি সুখ চাও, তবে প্রবৃত্তির অনর্গলিত প্রবাহকে সুখ বলিও না। সর্ব্বশক্তি-সামঞ্জস্যে, স্থিতি-শান্তি-অপরিবর্ত্তনে সুখ পাইবে। যেখানে এক রস নিত্য-বিদ্যমান, তথায় সুখ। পরিবর্ত্তনশীল জগতে নিত্য-বিদ্যমান কিছু নাই। সুতরাং জড়দেহের পরমাণু-শক্তি আ মোটা কথা ছাড়িতে হইবে—কিছু অপা সামগ্রীর বিশেষ অন্বেষণ আবশ্যক।

কাম-ক্রোধাদি ঋপুগণের প্রকাশ শ ব্যতীত হয় না। উহারা ফুটিয়া উঠিলে যেন শ ব্যাপিয়া পড়ে। পরন্তু ভক্তি-বৈরাগ্যাদি সৎপ্র সকল যেন শরীর ত্যাগ করিয়া কোন অন্তরকে গিয়া মিলিত হয়; তাই ইহাদের বৃদ্ধিতে ক্ষ আশঙ্কা নাই, সুতরাং অতৃপ্তি হয় না। কা অতিবৃদ্ধিতে রোগ, লোভের অতিবৃদ্ধিতে রো ক্রোধের অতিবৃদ্ধিতে রোগ, মোহ-মদ-মা সর্য্যের অতিবৃদ্ধিতে রোগ— উন্মত্ততা, এবং ই দের পরিণাম উৎকট যন্ত্রণাময় বিভীষিকা মৃত্যু। যেমন দাহ-জ্বরের সময়ে তৃষ্ণার যত জল-পান করিবে, জিহ্বা আরও শুষ্ক হই উঠিবে, তৃষ্ণা শতগুণে বর্দ্ধিত হইবে, তেম ইহাদেরও নিবৃত্তি নাই। পক্ষান্তরে ভক্তি-প্রী দয়াদি সৎপ্রবৃত্তি সকলের বৃদ্ধিতে সুখ—আন যতই বাড়াইবে, ততই সুখ—ততই আন ইহাদের পরিণাম বিরস নহে। কারণ, প্রবৃত্তির বৃদ্ধিতে অহঙ্কার পরিপুষ্ট হ তাহাতে কখনই সুখ নাই। পরন্তু ভক্তি-দয়া যতই বর্দ্ধিত হইবে, ততই অহঙ্কার-শূন্য হই হইবে, নিজকে তুচ্ছাতিতুচ্ছ কীটাণুকীট বলি মনে হইবে, নিজকে ভুলিয়া পরের জন্য পাগ হইতে হইবে। যেহেতু, নিজের পরমায়ু এ পরের সুখৈশ্বর্য্য কেহ কখনও কম মনে ক না। কাজেই তোমার দয়ার গুণে পরকে সু দেখিলে সে সুখ তোমার চক্ষে শতগুণে বর্দ্ধি মনে হইবে, এবং তোমার আনন্দের আর সীম থাকিবে না। পরন্তু, কামাদির বৃদ্ধিতে অহঙ্কারে অতিবৃদ্ধি হয়, স্বার্থান্ধ হইয়া লোকের দিক্‌বিদি জ্ঞান থাকে না। কাজেই যে কামুক, যে মদ্যপ সে চিররোগী, ও মহাদুঃখী; এবং যে দয়াবান

ভক্তিনিষ্ঠ, জীতেন্দ্রিয়, সে সুস্থদেহ, বলিষ্ঠ এবং সুখী। যেমন, যে নির্ঝরিণী প্রস্তরময় বন্ধুর ভূমির উপর দিয়া যাইতেছে, তাহা অতি নির্ম্মল এবং মিষ্ট-তোয়, তেমনি ভক্তি-দয়া-দাক্ষিণ্যাদি সদ্‌গুণ সকল বড়ই কষ্টসাধ্য। সুতরাং এতজ্জনিত ফল বড়ই শীতল—বড়ই পবিত্র—বড়ই মধুর।

সুতরাং যাহা আত্মার অনুকূল অর্থাৎ যে বৃত্তি-প্রবাহ আত্মানুগ, যাহাকে অবাধে প্রবাহিত হইতে দিলে আত্মদৃষ্টি হয়, আত্মস্থ হওয়া যায়, এবং অহঙ্কার নষ্ট হয়, দেহাত্মজ্ঞানশূন্য হয়, তাহাই সুখপ্রদ। জড়জগতে বাধাশূন্য প্রবাহ নাই, কিন্তু অন্তর্জ্যে একবার প্রবাহের মুখ খুলিয়া দিতে পারিলে অবাধে উহা আত্মসাগরে গিয়া মিশিবে। সুতরাং বিষয়ানুরাগ ত্যাগ করিয়া বাহিরের জাল গুটাইয়া ভিতরের পথে ছুটিতে পারিলে সুখের অনুভূতি হওয়া সম্ভব। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন;—

"বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥"

"যে ব্যক্তি পীড়াদি-নিবন্ধন অথবা আহার্য্য দ্রব্যের অভাবে নিরাহার হয়, তাহারও সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি শিথিল হইয়া বিলীন-প্রায় হয় বটে, কিন্তু তাহাতে বিষয়ানুরাগের কিছুমাত্র ক্ষয় হইতে পারে না। আর যাঁহারা আত্মাকে দেখিতে পান, তাঁহাদের অনুরাগের সহিতই ইন্দ্রিয়াদির প্রতিসংহার হয়। অতএব পীড়াদি-জনিত ইন্দ্রিয়-শৈথিল্য কোন কার্য্যের নহে, অনুরাগের সহিত যে ইন্দ্রিয়ের লয় হয়, তাহাই উন্নতির চিহ্ন।" ফলে যে বেদনা আত্মানুকূল, তাহাই সুখদায়ক। যিনি আত্মাকে একরকম নিত্য-বিদ্যমান সচ্চিদানন্দময় মনে না করেন, তাঁহার সহিত আমাদের বিচার নহে; তিনি কিঙ্কিষ্ক্যার লোক, পথ ভুলিয়া এদেশে আসিয়াছেন, সাগর-পারে যাইলে তাঁহার সন্দেহ নিরসিত হইতে পারে। আত্মা আনন্দময়, তাহার অনুকূল-বেদনা যাহা, তাহাই সুখ। কারণ, আনন্দের অনুকূল আনন্দ—সুখ বৈ আর কি হইতে পারে?

"নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য নচাযুক্তস্য ভাবনা।
নচাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্॥"

"চিত্তপ্রসাদ না থাকিলে আত্মা বা ব্রহ্ম-বিষয়ে জ্ঞান হইতে পারে না, এবং প্রসাদ-শূন্য ব্যক্তির আত্মজ্ঞানে অভিনিবেশিত হইতে পারে না। অভিনিবেশ না হইলে শান্তি আসিতে পায় না। ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের শান্তি বা বিরাম না হইলে আর সুখ হইবে কেন? অর্থাৎ বিষয়-তৃষ্ণাদিস্বরূপ দুঃখই থাকিবে।"

শান্তি অথবা সামঞ্জস্যের দ্বারাই যে সর্ব্ব-সুখ—সর্ব্বানন্দ প্রাপ্তি হয়, তাহা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তবে এ সামঞ্জস্য-প্রাপ্তির উপায় এতক্ষণ বলিলাম মাত্র। সৎপ্রবৃত্তির দ্বারা অসৎ-প্রবৃত্তির শক্তি-সংহার করিয়া যে প্রবাহ আত্মানুকূল বাহিয়া যায়, তাহাই সুখদ। ভগবান পূর্ব্ব শ্লোকে যাহা ব্যাখ্যা করিলেন, তদ্দ্বারা বুঝিলাম যে, চিত্ত প্রসাদ না হইলে ব্রহ্মজ্ঞান—আত্মজ্ঞান হয় না; এবং বিনাভিনিবেশে চিত্ত প্রসাদ অসম্ভব; এবং ইন্দ্রিয়বৃত্তি-প্রবাহ শান্ত না হইলে অভিনিবেশ হইবে কোথা হইতে? অর্থাৎ আমাদের ভাষায় বুঝিতে হইলে বলিতে হইবে যে, সৎ-প্রবৃত্তির দ্বারা অসৎপ্রবৃত্তি-প্রবাহ সংযত ও সামঞ্জসীকৃত না হইলে আত্মানুকূল বেদনা হইবে না; এবং ইহা না হইলে চিত্তপ্রসাদ হইবে না। অর্থাৎ চিত্তে স্থির, শান্ত ও সমাহিত ভাব আসিবে না; সুতরাং আনন্দ পাই কোথা হইতে?

"সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ।
অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি॥
যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎসুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্॥
বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্ যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎসুখং রাজসংস্মৃতম্॥
যদগ্রেচানুবন্ধেচ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্য প্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্॥"

"হে ভরতশ্রেষ্ঠ! এখন তিন প্রকার সুখের বিভাগ শ্রবণ কর। ক্রমিক অভ্যাস দ্বারা অনেক কষ্টে যে সুখের (সমাধি-সুখের) সম্ভোগ করা যায়, কিন্তু বিষয়-সুখের ন্যায় সদ্য সদ্য লাভ করা যায় না, যে সুখ লাভ করিতে পারিলে সমস্ত দুঃখের অবসান হইয়া যায়, কিন্তু বিষয়-সুখের ন্যায় উহার সঙ্গে কিম্বা অন্তে কোন প্রকার দুঃখের অপেক্ষা থাকে না, যাহা (বৈরাগ্য-সমাধির অনুষ্ঠানাদি) আয়াস-সাধ্য উপায়ের দ্বারা নিষ্পন্ন হয়, এজন্য অতি বিধেয়ের ন্যায় মনে হয়, কিন্তু পরিণামে অমৃতোপম হয়, যাহা আত্মতত্ত্ব-বিষয়িণী বুদ্ধির প্রসন্নতাবস্থায় বিকসিত হয়, সেই সুখকে সাত্ত্বিক সুখ বলে। (১) বিষয় এবং ইন্দ্রিয় সংযোগাধীন যে সুখ উৎপন্ন হয়, যাহা প্রথমতঃ অমৃতোপম মনে হয়, কিন্তু পরিণামে অতীব কষ্টদায়ক, তাহাকে রাজস সুখ বলে। (২) নিদ্রা, আলস্য এবং প্রমাদ দ্বারা যে সুখ উৎপন্ন হয়, যাহা এইক্ষণে এবং পরিণামেও আত্মার মোহ ব্যতীত আর কিছুই উৎপাদন করে না, তাহাকে তামস সুখ বলে। (৩)"

আমরা এতক্ষণ যে সুখের বিচার করিলাম, তাহা সাত্ত্বিক সুখ। রাজসিক এবং তামসিক সুখকে আমরা সুখ বলিয়া গণ্য করি না; কারণ, উহা অনায়াস-লভ্য এবং দুঃখবিমিশ্রিত। তবে না কি, সাধরণতঃ সংসারে ইহারাও সুখ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে, তাই ভগবান ইহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিলেন মাত্র। বিশেষতঃ সাত্ত্বিক সুখের যাহা লক্ষণ, উহার অনুভূতিতে যে হর্ষোৎপন্ন হয়, তাহার সামান্যাংশ অপর দুইটিতে আছে বলিয়াই রাজসিক এবং তামসিক সুখ বলিয়া উহারা কথিত হইয়াছে। পরন্তু সে সুখানুভূতি ক্ষণিক, এবং সঙ্গে সঙ্গেই দুঃখোৎপাদক। যে সুখ অনুকূল-বেদনীয়, তাহা রাজসিক ও তামসিক সুখ নহে; সাত্ত্বিক সুখকে লক্ষ্য করিয়াই এই সূত্র রচিত হইয়াছে।

তবে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, যাহা অনুভূতি-গম্য, তাহা সামঞ্জস্য-সম্ভূত হইবে কেমন করিয়া? অর্থাৎ শারীরিক এবং মানসিক গতি না হইলে অনুভূতি হয় না এবং গতি-সামঞ্জস্যের প্রধান বাধা যেখানে, গতি ও ক্রিয়ায় তথায় সামঞ্জস্য নাই। সুতরাং সুখ অনুভাব্য হইলে উহা সামঞ্জস্যের ফল নহে। কিন্তু আমরা সিদ্ধান্ত করিলাম যে সামঞ্জস্যের—শান্তির অন্য নাম সুখ। কাজে সুখকে অননুভূত বলা আবশ্যক। পক্ষান্তরে অনেকেই বোধ হয় জানেন যে, আমাদের শরীরে অনেকগুলি Reflex actions আছে। অত্যন্ত পরিশ্রমের পর বিশ্রামে যে সুখ, অনিদ্রার পর নিদ্রায় যে সুখ, তেমনি শান্তিতে নিবৃত্তিতেও সুখ। তবে উহা "মুকাস্বাদনবৎ" কেমন করিয়া বুঝাইব! যে সুখ যোগী প্রকাশ করিতে অসমর্থ, যাহা পাইলে কি কেমন ভাবে মন নাচিয়া উঠে, উহা বুঝিবার অনুভবের সামগ্রী। কথায় কি বলা যায়?

এত কথায় কাজ কি! সুখ চাও, আনন্দ চাও, শান্তি চাও, যাঁহার কুবের ভাণ্ডার, যিনি বিশ্বে আর পাইবার কিছু থাকে না, যিনি চিদানন্দময় তাঁহার দুয়ারে গিয়া ভিক্ষা করিলে সকল দুঃখ দূর হইবে।

হিন্দু-পরিবার।

(গৃহিণী।)

হিন্দু-পরিবারভুক্ত পুরুষের মধ্যে যেমন কর্ত্তা প্রধান, স্ত্রীলোকের মধ্যে তেমনই গৃহিণী প্রধানা। গৃহিণী বলিলে যেমন এখনকার জ্যাকেট-আঁটা, বার্ট-কাটা, জ্যাকেট-আঁটা, কলম-ধারিণী, চেয়ারবাসিনী, বিলাসিনী বুঝায়, পূর্ব্বে তেমন বুঝাইত না—এখনকার গৃহিণীর চিত্র হইতে চিত্রই স্বতন্ত্র। এখনকার গৃহিণী ক্ষীণা, পীড়িতা, দুর্ব্বলা—তখনকার গৃহিণী পুষ্ট, সুস্থ, সবল। এখনকার গৃহিণী শান্তিপুর-শোভিতা—তখনকার

গৃহিণী মুচেন-সাটী পরিহিতা; এখনকার গৃহিণী জ্যাকেট-আঁটা, ঘোমটা-তোলা—তখনকার গৃহিণী ঘোমটা-টানা, লজ্জাশীলা; এখনকার গৃহিণী সুবেশা, বিলাসিনী—তখনকার গৃহিণী কুবেশা, কাঙ্গালিনী; এখনকার গৃহিণী আলুলায়িতা মুক্তকেশা—তখনকার গৃহিণী পেটে-পাড়া যুক্তকেশী; এখনকার গৃহিণী চতুরা, চপলা—তখনকার গৃহিণী শান্ত, সুশীলা; এখনকার গৃহিণী প্রগল্‌ভা, প্রবলা—তখনকার গৃহিণী বাক্যহীনা, অবলা; এখনকার গৃহিণী স্বামীর মুনিব-ঠাকুরাণী—তখনকার গৃহিণী স্বামীর দাসী, চাকরাণী; এখনকার গৃহিণী অন্নপূর্ণা—তখনকার গৃহিণী অন্নপূর্ণা; এখনকার গৃহিণী আপ্তসুখে সুখী—তখনকার গৃহিণী পরের দুঃখে দুঃখী; এখনকার গৃহিণী সংসার-মরুর তপ্ত বালি—তখনকার গৃহিণী সংসার-কুঞ্জের বৃক্ষাবলী; সুতরাং এখনকার গৃহিণীর চিত্রের সহিত সাবেক হিন্দু-পরিবারের গৃহিণীর চিত্র কি প্রকারে সামঞ্জস্য করিব?

হিন্দু-পরিবারভুক্ত গৃহিণী কর্ত্তার সহিত বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ না হইলে তাঁহার সহিত সম্বন্ধ-নির্ণয় করা বড় কঠিন হইত; কারণ, তিনি স্নেহে জননী, সৌহার্দ্দে ভাই-ভগিনী, সেবায় পরিচারিকা, ভোজনে পাচিকা, বিপদে আশ্বাসদায়িনী, পীড়ায় চিকিৎসাকারিণী, সম্পদে আমোদিনী এবং ধর্ম্মে সহধর্ম্মিণী। শান্তিময় হিন্দুপরিবার মধ্যে গৃহিণী মূর্ত্তিমতি শান্তিদেবী, পরিবারভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির শুভদায়িনী ও প্রিয়কারিণী—ইংরাজীতে যাহাকে Guardian angel বলে, গৃহিণী তাহাই। আপদ-বিপদ-সঙ্কুল সংসার-সাগরে গৃহিণী তরণী—তাঁহার পবিত্র মুখ দেখিলে ভয়-ভাবনা দূরে যায়, হৃদয় প্রীতিতরঙ্গে নাচিয়া উঠে, সুখ-সমীরণে চিত্ত প্রফুল্ল হয়, এবং জনশূন্য সংসার-মরুতে "আমি একা" এপ্রকার ভাব মনে উদয় হয় না। হিন্দু-পরিবারের গৃহিণী বড় সাধের, বড় আদরের, বড় সুখের সামগ্রী; কিন্তু আমাদিগের দুরদৃষ্ট-বশতঃ এখন আর তাঁহার দর্শন ঘটে না—যাঁহার দর্শন ঘটে, তাঁহাকে দেখিলে মোহের উদয় হইলে হইতে পারে; কিন্তু পবিত্র প্রীতির উদয় হয় না। তখনকার গৃহিণী পাশ্চাত্য ছাঁচে-ঢালা নহে সত্য, লিখিতে পড়িতে কারপেট বুণিতে অজ্ঞ তাহাও সত্য; কিন্তু তিনি যে সকল গুণে গুণবতী, তাহা সংসারের পক্ষে বড়ই শুভদায়ক। এখন যে সকল কার্য্য দাসদাসীর দ্বারা হয় না, ডাক্তার-বৈদ্যেরা জানেন না, গুরু-পুরোহিত পারেন না, শিল্পী-ব্যবসায়ী জানেন না, তখন এক গৃহিণীর দ্বারা সে সকল কার্য্য অনায়াসে ও বিনাব্যয়ে সুসাধিত হইত। পাকা গৃহিণীর অভাবে আমাদিগের যে কি পরিমাণে ব্যয় ও ব্যাঘাত উপস্থিত হইয়াছে, তাহা তখনকার গৃহিণীর গুণের বিস্তারিত বিবরণ পাইলেই জানা যায়। হিন্দু-পরিবারের গৃহিণী সকল কর্ম্মই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দররূপে সম্পন্ন করিতে পারিতেন, এবং পরিশ্রমেও কখন কাতর হইতেন না। তাঁহার ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি এত প্রখর ছিল যে, সংসারে কখন কোন সামগ্রীর অভাব হইত না, এবং সঞ্চয়িণী শক্তি থাকাতে অর্থাভাবও বিশেষ কষ্টকর বোধ হইত না—প্রকৃত প্রস্তাবে তিনিই সংসারের লক্ষ্মী ছিলেন। তাঁহার গুণ যেমন, স্থানও তেমনই উচ্চ ছিল। গৃহিণীকে সকলেই ভয়, ভক্তি ও মান্য করিত; তাঁহার শাসনে বউ-ঝি কখন আলস্যপ্রিয়া, প্রগল্‌ভা ও লজ্জাহীনা হইতে পারিত না; তাঁহার পরামর্শে পরিবারভুক্ত স্ত্রী-পুরুষকে কখন কষ্টও পাইতে হইত না। তিনি সংসারের রাণী, মন্ত্রী, সেনাপতি, কোষাধ্যক্ষ, ভাণ্ডারী, সমস্তই তিনি; আবার ভিন্ন মূর্ত্তিতে তিনি দাসী, পাচিকা, ধাত্রী, শিক্ষয়িত্রী, চিকিৎসাকারিণী, সমস্তই তিনি। এত গুণ যাঁহার, তিনি যে গৃহের লক্ষ্মী, তাহাতে সন্দেহ কি? আমরা এক্ষণে তাঁহাকে হারাইয়া তাঁহার স্থানে যাঁহাকে বসাইয়াছি, তিনি কাঞ্চনের স্থানে

কাচ মাত্র। সেকালের গৃহিণীগণ পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তিকেই অপত্যনির্ব্বিশেষে পালন ও রক্ষণ করিতেন, সকলেরই মাঙ্গলাকাঙ্ক্ষিনী ছিলেন, কখন পরশ্রীকাতর হইতেন না, পরের জন্য সকল স্বার্থই ত্যাগ করিতে পারিতেন, এবং প্রতিবাসী-মণ্ডলীর ভরসার স্থল ছিলেন। দেবতা-ব্রাহ্মণে তাঁহাদিগের অচলা ভক্তি ছিল, অতিথি-সৎকারে তাঁহারা অকাতরা, দানে মুক্তহস্ত, ক্রিয়া-কর্ম্মে দৃঢ় নিরত, স্নেহ-যত্নের অনন্ত উৎস-রূপিণী, এবং পতিসেবায় অতুলনীয়া ছিলেন। এক্ষণে গৃহিণী যেমন স্বামীর চাবুক, সেকালে তেমন ছিল না—পতিই সাধ্বীর দেবতা ছিলেন, তিনিই রমণীর "সুখ-মোক্ষ-দাতা।"

সেকালের গৃহিণীর যতই গুণানুবাদ করা হইবে, একালের গৃহিণীগণের ততই দোষকীর্ত্তন করা হইবে; সুতরাং তাঁহাদিগের ভ্রুকুটীর ভয়ে এইস্থানেই নিরস্ত থাকা ভাল। একালের গৃহিণীর যে একেবারেই গুণ নাই, আমরা এমন কথা বলি না; কিন্তু হিন্দুপরিবারভুক্ত বিশেষতঃ সেকালের গৃহিণীর চিত্র অঙ্কিত করিতে বসিয়া একালের গৃহিণীর কথা পাড়িবার আবশ্যক নাই—তাঁহারা যাহা, তাহাই আছেন; সর্পের লাঙ্গুলে আঘাত করিয়া তাহাকে ক্রুদ্ধ করিবার প্রয়োজন কি? এতএব কোন একটী হিন্দু-পরিবারভুক্ত পুরাতন গৃহিণীর দৈনন্দিন কার্য্যের বিবরণ দিয়া এ প্রবন্ধ সংক্ষেপে শেষ করাই ভাল।

আমরা যে গৃহিণীর কথা বলিতেছি, তিনি সধবা, এবং সংসারের মধ্যে বয়ঃজ্যেষ্ঠা নহেন; তাঁহার অপেক্ষা বয়সে ও সম্পর্কে বড় আরও দুই তিন জন বিধবা সংসারে ছিলেন; কিন্তু তাঁহারা, মধ্যে মধ্যে অন্যত্র বাস করিতেন ও প্রায়ই তীর্থ-পর্য্যটনে এবং পূজা-আহ্নিক ও দেবসেবায় কালাতিপাত করিতেন বলিয়া, সংসারের গৃহিণীপনায় হস্তার্পণ করিতেন না। গৃহিণী কর্ত্তার সহিত এক গৃহে পৃথক শয্যায় কয়েকটী শিশু দৌহিত্র-পৌত্র লইয়া শয়ন করিতেন; সুতরাং অতি প্রত্যূষে, এমন কি প্রভাত হই- দুই ঘণ্টা পূর্ব্বে, নিদ্রোত্থিতা হইয়া (পাছে স্বা- নিদ্রাভঙ্গ হয়, এই আশঙ্কায়) অত্যন্ত অ- স্বরে কিছুক্ষণ দেবতাদিগের নাম-কীর্ত্তন- উদ্দেশে নমস্কার করিতেন। তৎপরে শয্যা- করিয়া স্বামীর চরণতলে গিয়া গললগ্ন-বস্ত্রে প্র- হইয়া, চোরের ন্যায় ধীরে ধীরে ও সাবধানে খুলিয়া নিষ্ক্রান্ত হইয়া, পুনরায় বন্ধ ক- দিতেন। তৎপরে মুখ-প্রক্ষালনাদি সমা- করিয়া বাটীর অপরাপর বৃদ্ধ ও প্রবীণাদি- জাগরিত করিতেন; এবং তাঁহারা যতক্ষণ প্রা- ক্রিয়া করিতেন, ততক্ষণ গৃহাদি পরিষ্কার ও গো- দিয়া পবিত্র করা প্রভৃতি কতকগুলা কাজ ক- লইতেন। এখনকার মত মধ্যবিদ্ গৃহ- বাটীতে তখন দাসদাসীর বড় আমদানী না—আমরা যে গৃহস্থের কথা বলিতেছি, তাঁ- দিগের দুই তিনটী দাস-দাসী ছিল বটে, তাহারা গো-সেবা, গঙ্গাজল-বহন, ধান- বাজার-হাট করা প্রভৃতি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকি- সাংসারিক কাজে তাহাদিগের বিশেষ সহায়- আবশ্যকও হইত না; কারণ, পরিবারস্থ (কলি- তার নব-বিবাহিতা রাঙ্গা বউ ব্যতীত) কে- অলসিনী বা বিলাসিনী ছিলেন না। সংসা- কতকগুলি কাজ সারিয়া বৃদ্ধাদিগের সহিত গৃ- গঙ্গাস্নানে যাইতেন; এবং পাছে (প্রায় পঞ্চ- বৎসরের) কুলবধূ পুরুষের সম্মুখে পড়েন, জন্য রীতিমত প্রভাত হইতে না হইতেই গৃ- প্রত্যাগতা হইতেন, এবং বাটী-সংলগ্ন ফুলবা- হইতে ফুল-বিল্বপত্র চয়ন করিয়া পূজা কার্- বসিতেন। পূজা সমাপন হইতে হইতে বাল- বালিকারা জাগরিত হইত; সুতরাং তাহাদি- বাল্য-ভোগের জন্য অতঃপর প্রস্তুত হই- তখন সন্দেশ-মতিচুরের বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছি- না; সুতরাং মুড়ী, মুড়কি, পাকা রম্ভা ও নারি- কেল নাড়ুই উপাদেয় সামগ্রী ছিল। বাল- বালিকাদিগকে (সংখ্যায় ২০। ২৫টী হইবে)

তাহাই বিতরণ করিতেন; তাহারা আনন্দের সহিত তাহা ভোজন করিত। গৃহিণীর সে পবিত্র অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি দেখিলে হৃদয়ে বড়ই আনন্দ হয়। সে দৃশ্য বড়ই সুন্দর, গার্হস্থ্য-সুখের সত্য ও সজীব চিত্র! অনন্তর পীড়িত বালক-বালিকাদিগের জন্য ঔষধ-পথ্যাদির ব্যবস্থা করিতেন—ডাক্তার ডাকিতে বা ঔষধালয়ে যাইতে হইত না; সামান্য সামান্য পীড়ার চিকিৎসা গৃহিণী স্বয়ং করিতেন। কাহাকেও বিল্বপত্রের রস, কাহাকেও তেলাকুচা পাতার রস ইত্যাদি ঔষধ ও কাহাকেও খই-বাতাসা, কাহাকেও বেলপোড়া ইত্যাদি পথ্যের ব্যবস্থা সমাপন হইলে, ঠাকুর-ঘরে গিয়া নৈবেদ্যাদির ব্যবস্থা করিতেন; এবং তৎপরে সাংসারিক কার্য্যে লিপ্ত থাকিতেন। প্রথমে ভাণ্ডার হইতে প্রয়োজনমত দ্রব্যাদি বাহির করিতেন; এবং যাহার অল্পতা দেখিতেন, তাহা সংগ্রহ করিবার জন্য কর্ত্তাকে সংবাদ পাঠাইতেন। তৎপরে কখন ছোট ছোট বউ-ঝিদিগের নিকটে গিয়া (কারণ, গৃহিণীর পরামর্শে কুটনা-কুটা তাহাদিগের জিম্মা ছিল) শীঘ্র-হস্তে কতকগুলা তরকারী কুটিয়া দিতেন; কখন কখন বা ঘড় ঘড় করিয়া কতকগুলা বাটনা বাটিতেন, কখন বা রন্ধনশালায় গিয়া সেদিনকার পাচিকাকে (পালা-অনুসারে সংসারের রন্ধন-কার্য্য সমাপন হইত) রন্ধন-সম্বন্ধে উপদেশ দিতেন, এবং স্বয়ংও দুই একখানা ব্যঞ্জন রন্ধন করিতেন। ইতিমধ্যে পাড়ার কোন দরিদ্র গৃহস্থ যৎকিঞ্চিৎ তৈল, লবণ, চাউল প্রভৃতি ধার করিতে আসিলে, 'আর ফিরাইয়া দিতে হইবে না' তাহাদিগকে এইপ্রকার আশ্বাস দিয়া, প্রচুর পরিমাণে দান করিতেন, এবং স্থল-বিশেষে তৎসহ দুই চারিটী পয়সাও দিতেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন স্কুলের সৃষ্টি হইয়াছে; সুতরাং যে সকল বালক স্কুলে যাইবে, প্রথমে তাহারা ভোজন করিতে বসিত, এবং অন্যান্য বালক-বালিকারাও সেই সঙ্গে ভোজন করিত—গৃহিণী তাহাদিগের কাহাকেও ভোজন করাইয়া দিতেন, কাহারও অন্নে দাইল মাখিয়া গ্রাস করাইয়া দিতেন, কোন দুষ্ট বালক ভোজনে পরাঙ্মুখ হইলে তাহাকে প্রলোভন দেখাইয়া বা ভয়-প্রদর্শন করিয়া বা কৌতুক-জনক-গল্প বলিয়া ভোজন করাইতেন। অতঃপর বউ-ঝিদিগকে জলখাবার (সেই মুড়ী-মুড়কী ইত্যাদি) দিয়া, হরিনামের মালা লইয়া জপ করিতে বসিতেন। মধ্যাহ্নকাল পর্য্যন্ত জপ করিয়া বাটীর পুরুষদিগকে অন্ন-ব্যঞ্জন পরিবেশন করিতেন। তাঁহাদিগের ভোজন সমাপন হইতে প্রায় একটা বাজিত; কারণ, এখনকার মত শীঘ্র-হস্তে ভোজন করিবার আবশ্যক ছিল না। স্ত্রীলোকদিগের ও তৎসঙ্গে দাস-দাসীদিগের আহার সমাপন হইতে প্রায় বেলা দুইটা বাজিত। অনন্তর সকলে মিলিয়া ঘাটে বাসন মাজিতেন, এবং নানাবিধ মনোহর গল্প করিতেন—পুষ্করিণীর ঘাট একটী ছোট-খাট পার্লিয়ামেণ্ট ছিল। গৃহিণী থাকাতে অন্যে মন খুলিয়া গল্প করিতে পারিত না, এইজন্য তিনি ত্বরায় গৃহে ফিরিয়া আসিতেন; এবং যৎকালে অন্যে শয়ন করিত, তৎকালে সংসারের কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। কখন কাঁথা-সেলাই করিতেন, কখন দাইল-কলাই রৌদ্রে দিতেন, কখন বা ঘর গুছাইতেন, কখন বা কোন সুপ্তোত্থিত শিশুকে দুগ্ধপান করাইতেন ইত্যাদি। এই সকল কার্য্য সমাধা হইতে হইতেই স্কুল হইতে বালকেরা আসিত; সুতরাং তাহাদিগকে এবং অন্যান্য বালক-বালিকাদিগকে যৎকিঞ্চিৎ জলখাবার দিতেন; তাহারা খাইয়া কেহ পড়িতে বসিত, কেহ খেলায় প্রবৃত্ত হইত। অনন্তর সন্ধ্যার পূর্ব্বে গৃহ ও অঙ্গনাদি পরিষ্কৃত করিয়া পুষ্করিণীতে গিয়া গাত্র ধৌত করিতেন; কোন কোন দিন বা ইহার পূর্ব্বে অবসর পাইলে নিকটস্থ প্রতিবাসীদিগের বাটীতে বেড়াইতে গিয়া তাহাদিগের সংসার-সম্বন্ধে পরামর্শ

দিতেন। তৎপরে বালক-বালিকাদিগের সায়াহ্ন আহারের পর্য্যবেক্ষণ করিতেন, এবং দুই-একটী শিশু-সন্তানকে ক্রোড়ে করিয়া হরিনামের মালা লইয়া বসিতেন। সন্ধ্যা হইলে ঠাকুর-ঘরে (বাটীর ভিতরের দিকে) বসিয়া জপ করিতেন, এবং আরতী সমাপন হইলে পুনরায় (সামান্য রকম, কেন না প্রায়ই মধ্যাহ্নকালের অন্ন-ব্যঞ্জনাদি থাকিত) আবশ্যকমত রন্ধনাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিতেন। তৎপরে ছোট ছোট বালক-বালিকা ও বউ-ঝিগণে পরিবৃত হইয়া কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম লইতেন—বিশ্রামের সময় তাহাদিগকে রামায়ণ, মহাভারত হইতে আখ্যায়িকা, কখন বা রূপকথা শুনাইতেন। অনন্তর বিধবাদিগের সেবায় ব্যাপৃত হইতেন—যাঁহারা সম্পর্কে গুরুজন, তাঁহাদিগের পদ-সেবা করা গৃহিণীর নিত্যকর্ম্ম ছিল। আহারাদি করিয়া শয়ন করা প্রায় রাত্রি ২ প্রহরের কমে ঘটিত না; তথাপি নিদ্রা যাইবার কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে স্বামীর পদসেবা ও দেবতাদিগের নাম-কীর্ত্তনে ব্যাপৃত থাকিতেন। গৃহিণীর দৈনন্দিন কার্য্য এত বিস্তৃত যে, তাহার সমস্ত বর্ণন করা দুঃসাধ্য, এবং পাঠ করিতেও পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি হওয়া সম্ভব; আমরা সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বলিলাম— অবশিষ্ট বলা হইল না। অবশেষে প্রার্থনা যে, এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া একালের গৃহিণীগণ যেন লেখকের উপর বিরক্ত হইয়া (সভ্যতার সহিতও) গালিবর্ষণ না করেন।

অদৃষ্ট।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

জয়গোপালের পিতার পীড়া।

ঈশ্বরের ইচ্ছায় জয়গোপালের পিতার পীড়া ক্রমে ক্রমে কম পড়িতে লাগিল। বস্তুতঃ জয়দুর্গার আগমন অবধিই তিনি আরোগ্য হইতে আরম্ভ করিলেন। জয়গোপালের মনে
মনে কষ্ট হইতে লাগিল,—"সেই ত পী[illegible]
আরোগ্য হইল, তবে দু'দিবস অগ্রে হই[illegible]
আর জয়দুর্গাকে নিজ-বাটী আনয়ন করি[illegible]
হইত না, তাঁহারও শ্বশুরালয় যাওয়া বন্ধ হ[illegible]
না।" এ দুঃখ তিনি মনে মনেই রাখিলেন, কা[illegible]
রও নিকট প্রকাশ করিলেন না।

জয়গোপালের পিতার পীড়া আরোগ্য হই[illegible]
কয়েক দিবস পরে চিকিৎসক মহাশয় কহিলে[illegible]
"এক্ষণে আপনার পিতার পীড়া আরোগ্য হ[illegible]
য়াছে, অন্ন-পথ্য করিয়াছেন, এবং চলি[illegible]
ফিরিয়াও বেড়াইতেছেন; এক্ষণে আমাকে বি[illegible]
করুন।" যে সময়ের কথা বলা যাইতে[illegible]
তখন বি. এ. বি. এলেরও ছড়াছড়ি ছিল [illegible]
ডাক্তারও যেখানে সেখানে পাওয়া যাইত [illegible]
জয়গোপালদিগের নিবাস পল্লিগ্রামে, সেখ[illegible]
ডাক্তার পাইবার সম্ভাবনা নাই। যিনি চিকি[illegible]
করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম কৃষ্ণচন্দ্র সে[illegible]
তিনি গৌরবর্ণ, দৃঢ়কায়, জাতিতে কায়স্থ। এ[illegible]
ঔষধের পুঁটুলি লইয়া বেড়াইতেন; আজক[illegible]
৫৲।৭৲ টাকায় যেরূপ গ্লোব পাওয়া যায়, সে[illegible]
তাহা অপেক্ষা কোন ক্রমে ক্ষুদ্র নহে। বস্ত[illegible]
পুঁটুলিটী একটী মুটিয়ার বোঝা বলিলেও হ[illegible]
চটি জুতা পায়ে দিয়া গিয়া জয়গোপালের ব[illegible]
উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—"তবে এক্ষ[illegible]
আমাকে বিদায় করুন।"

জয়গোপাল কবিরাজ মহাশয় আসিয়াছে[illegible]
শুনিয়া শয্যায় শয়ন করিলেন। এতদি[illegible]
তাঁহাকে এক পয়সাও দেন নাই, এক্ষণে তাঁহা[illegible]
কিঞ্চিৎ না দিলে কিরূপে চলে, এই মনে কর[illegible]
পীড়ার ভান করিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষ[illegible]
যে সময় কবিরাজ মহাশয় আসিয়া উপস্থি[illegible]
হইয়াছিলেন, ঠিক সেই সময়ে তাঁহার একজ[illegible]
মক্কেলও আসিয়াছিল; মক্কেল সে দিব[illegible]
তাঁহাকে ৪০৲ টাকা বায়না দিবে অঙ্গীকৃত ছিল[illegible]
মক্কেলের সহিত দেখা না করিলে না[illegible]
অথচ কবিরাজ মহাশয় তথায় আছেন। এ[illegible]

[illegible] সহিত দেখা করিতে হইলে উভয়েরই
সহিত দেখা করিতে হইবে। বিছানায় শয়ন
করিয়া ভাবিতেছেন, কি করা কর্ত্তব্য! এমন
সময় মক্কেল খবর পাঠাইল,—যদি তাঁহার সহিত
সে দিবস দেখা না হয়, আর যদি উকীল বাবুর
পীড়া হইয়া থাকে, তবে তাহাকে উপায়ান্তর
অবলম্বন করিতে হইবে। জয়গোপাল এই কথা
শুনিয়া ভীত হইয়া একগাছি ছড়ি হস্তে করিয়া
উঁ উঁ করিতে করিতে বৈঠকখানা-গৃহে আসিয়া
উপস্থিত হইলেন।

যখন লোকে পীড়িত থাকে, তখন কবিরাজ ঈশ্বর-সদৃশ। কবিরাজ কেবল পীড়িত ব্যক্তির চিকিৎসার জন্য আগমন করেন, এরূপ নহে। রোগীর বন্ধু-বান্ধবের জন্যও তাঁহার আগমন হয়। কে না জানে, যতক্ষণ চিকিৎসক গৃহে বসিয়া থাকেন, তখন সকলেরই মনে স্ফূর্ত্তি হয়। কে না জানে, যখন কবিরাজ মহাশয় চলিয়া যান, তখন পুনরায় সকলেই বিষণ্ণ হয়; কে না কবিরাজ মহাশয়কে আর পাঁচ মিনিট গৃহে রাখিবার জন্য বলিয়াছে,—"মহাশয়, আর একবার তামাক খাইয়া যান।" আমি এ কথা বিলক্ষণ জানি, এবং কবিরাজ মহাশয়কে আর পাঁচ মিনিটের তরে রাখিবার জন্য স্বহস্তে কত তামাক সাজিয়া দিয়াছি। এস্থলে আমি ৺ভগবানচন্দ্র সেনকে ধন্যবাদ করি। ভগবানচন্দ্র সেনের অনুগ্রহে আমি অদ্যাপি জীবিত আছি, এবং তাঁহারই কৃপায় এ পুস্তক লিখিতে পারিতেছি।

যৎকালে উকীল মহাশয়েরা নিদ্রায় অভিভূত, ঝুব ঝুব করিয়া বৃষ্টি হইতেছে, আকাশমণ্ডল ঘনঘটায় আচ্ছন্ন, মাঝে মাঝে কড়মড় করিয়া বজ্রনিনাদ হইতেছে, বিদ্যুৎ সঘনে ঘনঘটার সহিত আলিঙ্গন করিতেছে, রাস্তা জলে-কর্দ্দমে পরিপূর্ণ, দ্বিজামা যামিনীতে কেবলমাত্র উকীলেরা নন, সমস্ত লোকেই নিদ্রায় বিভোর, জলপ্রপাত-শব্দে প্রতিক্ষণে সেই নিদ্রা অধিকতর গাঢ় হইতেছে, কাহাকেও উঠান যায় না, এমন সময় এক ব্যক্তি আসিয়া কবিরাজ মহাশয়ের দ্বারে আঘাত করিল। কবিরাজ মহাশয় শয্যাত্যাগ করিলেন, পুত্রাদিকে ক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন, একটী ক্ষুদ্র আলোক অবলম্বন করিয়া রোগীকে দেখিতে গেলেন। সেই রোগী আরোগ্য হইল। কবিরাজ মহাশয় কিঞ্চিৎ পুরস্কার চাহিলেন। তখন তুমি লেপ গায়ে দিয়া শুইয়া রহিলে! রাস্তায় দেখা হইলে ছাতা আড়াল দিয়া চলিয়া গেলে? এই কি উচিত? ছি জয়গোপাল, তুমি কি করিতেছ? তোমার একটী পুত্র আছে। তাহার ভূমিষ্ঠ হইবার সময় তুমি কবিরাজ মহাশয়কে কিছু দাও নাই, তাহার অন্নপ্রাসনের সময়ও কিছু দাও নাই—তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলে বটে, সে কেবল এক টাকা যৌতুকের জন্য। সে টাকা কবিরাজ মহাশয় দিয়াছেন। তাহার উপনয়নের সময়ও নিমন্ত্রণ করিবে, আর এক টাকা পাইবার জন্য; তাহার বিবাহের সময় নিমন্ত্রণ করিবে, আইবড় ভাতের একখানি কাপড় ও একথালা সন্দেশের জন্য; কিন্তু তুমি ত সেই সেই সময় কবিরাজকে কিছু দাও নাই? এক্ষণে যদি সেই ছেলের পীড়া হয়, তাহা হইলে কবিরাজ মহাশয়কে না ডাকিলে আসিবেন না। ডাকিয়া আনিতে হইবে। তবে কেন পীড়া আরোগ্য হইলে বেচারাকে কিছু না দিবে?

জয়গোপাল কবিরাজ আসিয়াছেন শুনিয়া লেপে আবৃত হইয়া শয়ন করিলেন, একথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। অনন্তর তিনি বাম-হস্ত দ্বারা দক্ষিণ-বাহুর মণিবন্ধ-স্থান ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ বাহুটী এরূপ গরম করিলেন, যেন কবিরাজ মহাশয় স্পর্শ করিলেই জ্বর হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন; কিন্তু মক্কেল আসিয়াছে, তাহার নিকট জ্বরের পরিচয় দেওয়া সুবিধার বিষয় নহে। পাছে তিনি পীড়িত মনে করিয়া অপর একজন উকীলকে নিযুক্ত করেন। তিনি লাঠিতে ভর করিয়া

উঁ উঁ শব্দ-পূর্ব্বক বাহির-বাটীতে আগমন করিলেন। তখন তাঁহার মক্কেল জিজ্ঞাসা করিল,—তাঁহার পীড়া হইয়াছে কি না? উকীল বাবু উত্তর করিলেন,—"আমার পীড়া হইয়াছিল বটে; কিন্তু এক্ষণে সম্পূর্ণ আরোগ্য-লাভ করিয়াছি।" এই কথা শুনিয়া মক্কেল হর্ষোৎফুল্ল হইয়া নিজের পিরাণের জেব হইতে একখানি ২০৲ টাকার ও একখানি ১০৲ টাকার ও নগদ ১০৲ টাকা একুনে ৪০৲টী টাকা উকীল-বাবুর সম্মুখে সংস্থাপিত করিল। কহিল,—"মহাশয়, এই বায়না দিলাম। মোকদ্দমা অন্তে আপনার ফিজ দেব, আপনি বুঝিয়াই লইবেন। পরে যাহাতে আপনি সন্তুষ্ট হন, এরূপ কার্য্য করিতে কোন মতেই ত্রুটি করিব না।" কবিরাজ মহাশয় এতক্ষণ সেইখানেই বসিয়া আছেন। জয়গোপাল ভাবিলেন, কবিরাজ মহাশয় এ চল্লিশ টাকা বায়নার টাকা জানিতে পারিলে অবশ্যই তাহার কিয়দংশ নিজে প্রার্থনা করিবেন। এজন্য জয়গোপাল চক্ষু দ্বারা ইঙ্গিত করিয়া মক্কেলকে কহিলেন,—"এ তোমার ষ্ট্যাম্পের দাম না?" এই বলিয়া দক্ষিণ নয়নের দক্ষিণ অংশ কিঞ্চিৎ কুঞ্চিত করিলেন। কিন্তু মক্কেল বি. এ. বি. এল. নয়; সুতরাং বি. এ. বি. এল. দিগের ইসারা-ইঙ্গিত কিছুই বুঝিল না। সে কহিল,—"কেন মহাশয়, ষ্ট্যাম্পের মূল্য ত অগ্রেই দেওয়া হইয়াছে!" উকীল বাবু পুনরায় দক্ষিণ আঁখি কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন,—"হাঁ, হাঁ. তাই বটে; এ টাকা ষ্ট্যাম্পের যে দেনা বাকি আছে, সেই টাকা ও আমার মোহরেরদিগের পারিতোষিক-স্বরূপ দিতেছ।" এই বলিয়া পুনরায় দক্ষিণ-আঁখি কুঞ্চিত করিলেন। স্থূলবুদ্ধি অথবা অল্পবুদ্ধি মক্কেল তাঁহার ইসারা কিছুই বুঝিতে পারিল না। সে কহিল,—"মহাশয়, এরূপ আজ্ঞে করিতেছেন কেন? ষ্ট্যাম্পের দাম ও আপনার মোহরেরদিগের পারিতোষিক পূর্ব্বেই ত দিয়াছি!" তখন জয়গোপাল অগত্যা কহিলেন,—"হাঁ হাঁ, সমস্তই আমার মনে হইয়াছে; ষ্ট্যাম্পের দাম ও মো রেরদিগের পারিতোষিক তুমি পূর্ব্বেই দিয়াছ এ টাকা আর যে দুই জন উকীল করিয়া তাহাদিগের জন্যই দিতেছ।" মক্কেল কহিল, "তাহাও নহে, মহাশয়! আপনি কথা কেন এ ভুলিয়া যান? অন্য দুই জন উকীলকে আপনা কথা-মত ১০৲১০৲ টাকা করিয়া ইতিপূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে! আপনার এ সামান্য ক মনে নাই; আমার মোকদ্দমা আদালতে পে হইলে আপনি কি প্রকারে সমস্ত অবস্থা ব্য করিয়া বক্তৃতা করিবেন, তাহা আমি বুঝি উঠিতে পারিতেছি না।"

মক্কেলের কথা শুনিয় জয়গোপাল ব অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন। এদিকে কবিরা মহাশয় বামহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জ্জনি দ্বা নল প্রস্তুত করিয়া এবং সেই নল হুঁকার মু সংলগ্ন করিয়া বুজুর বুজুর করিয়া তামা টানিতেছেন; প্রতি টানে গলাটি ফুলিয়া উঠি তেছে, এবং কণ্ঠস্থিত তুলসীর মালা কাপে কাপে বসিয়া যাইতেছে। তদ্দর্শনে জয়গোপাল মনে করিতেছেন,—"এটা দমবন্ধ হইয়া মরিয়া যায় না কেন? মরিয়া গেলে, আমি এই ৪০৲ টাক নিষ্কণ্টকে ভোগ করিতে পারি। এটা দেখিতেছি উঠিবেও না; নিতান্ত আমাকে কিছু দণ্ড দিতে হইবে।" এরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময় মক্কেল গাত্রোত্থান করিয়া, "মহাশয়! অদ্যকার মত আসি", এই বলিয়া প্রস্থান করিল।

মক্কেল চলিয়া গেল বটে, কিন্তু জয়গোপাল কবিরাজ মহাশয়কে একাকী বহির্বাটীতে রাখিয়া কি প্রকারে চলিয়া যাইবেন? সুতরাং তাঁহাকে ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও ক্ষণকাল তথায় বসিয়া থাকিতে হইল। জয়গোপাল ৩।৪ মিনিট এইরূপ নীরবে বসিয়া থাকিলে কবিরাজ মহাশয় হুঁকা ত্যাগ করিলেন। অমনি তাঁহার বাম হস্ত হইতে ওষ্ঠাধর পর্য্যন্ত অবিমিশ্র রজতের তারের ন্যায় একটি লালার তার দৃষ্টিগোচর হইল।

কবিরাজ মহাশয়ের চক্ষু ইত্যগ্রে অর্দ্ধ-মুদ্রিত ছিল। জয়গোপাল তদ্দর্শনে মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন, কবিরাজ মহাশয় নিদ্রিত ছিলেন, এবং টাকার কথা সমস্ত শুনিতে পান নাই; কিন্তু এটি তাঁর ভুল, কবিরাজ মহাশয় অর্দ্ধ-নিদ্রিতের ভান করিয়া আদ্যোপান্ত সমস্তই বিলক্ষণ শ্রবণ করিয়াছেন। একবিন্দুও তাঁহার বাদ যায় নাই।

কবিরাজ মহাশয় কলিকাসহ হুঁকাটি দেয়ালের গায় সংস্থাপিত করিয়া যুগল হস্ত দ্বারা নয়ন-যুগল মার্জ্জনা করিলেন; কহিলেন,—'মহাশয়! আপনার পিতা ত সম্পূর্ণ আরোগ্য-লাভ করিয়াছেন, এক্ষণে আমায় বিদায় করুন!" জয়গোপাল দুইটী টাকা কবিরাজ মহাশয়ের সম্মুখে রাখিয়া কহিলেন,—"মহাশয়! আমার যে এ কি অসময়, তাহা আপনি ব্যতীত কে জানিবে! আপনি স্বচক্ষে দেখিতেছেন, সকলই জানিতেছেন। সুতরাং আপনাকে আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই; অতএব এই দুইটী টাকা লইয়াই সন্তুষ্ট হউন।"

কবিরাজ মহাশয় কহিলেন,—"হাঁ, আমি সমস্তই জানিতেছি, আরও আজ একটা নূতন জানিলাম; অসময় দেবার বেলা, নেবার বেলায় নয়।" কবিরাজ মহাশয় আর কিছু কহিতেন; কিন্তু এমন সময় হঠাৎ জয়গোপালের পুত্রটী আসিয়া আধ আধ বাক্যে পিতাকে স্নান করিবার অনুরোধ করিল। কবিরাজ মহাশয় সমাদরে পুত্রটীকে আহ্বান করিলেন। পুত্রটী নাচিতে নাচিতে তাঁহার ক্রোড়ে আসিল। তিনি তখন সেই দুইটী টাকা পুত্রটীর হস্তে দিয়া বলিলেন,—"যাও বাপু, মেঠাই কিনে খেও।" বালকটী টাকা ২৲টী পাইয়া আনন্দে নাচিতে নাচিতে তথা হইতে প্রস্থান করিল। জয়গোপাল কহিলেন,—"মহাশয়! করিলেন কি? ও ছেলে-মানুষ, এখুনই টাকা ২৲টী হারাইয়া ফেলিবে।" কবিরাজ মহাশয় কহিলেন,—"বেশ করিয়াছি।" জয়গোপাল বুঝিয়াও বুঝিলেন না যে, ২৲টী টাকায় কবিরাজ মহাশয়ের যত্নের ও পরিশ্রমের কোনরূপ প্রতিশোধ হয় নাই; পরন্তু পরমাত্মীয়ের ন্যায় ভান করিয়া কহিতে লাগিলেন,—"কবিরাজ মহাশয়! এই জন্যই ত আপনার দুরবস্থা ঘুচিল না! যেখানে যাহা পাইবেন, অবিলম্বে তাহাই খরচ করিবেন! এরূপ করিলে, কি প্রকারে চলিবে? আপনার খরচ বে-হিসাবি। এই দেখুন, আমার বাটীতে একজন চাকরে সমস্ত কাজকর্ম্ম করে; আপনার বাটীতে তিনজন আছে, তথাপি সুচারুরূপে সমস্ত কাজ সম্পন্ন হয় না।" কবিরাজ মহাশয় হাঁ-হুঁ করিয়া এই সুদীর্ঘ বক্তৃতার উত্তর করিলেন। পরে জয়গোপালের কথার একটু ফাঁক পাইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। কবিরাজ মহাশয় চলিয়া গেলে পর জয়গোপাল হর্ষোৎফুল্ল-নেত্রে নিজ-গৃহে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর পুত্রকে ডাকিয়া তাহার হস্তে একটী রসগোল্লা দিয়া টাকা ২৲টী নিজে গ্রহণ করিলেন।

সকলেরই জানা আছে যে, স্ত্রীলোকের পেটে কথা থাকে না। এ অধ্যায়ের বর্ণিত ঘটনাবলী জয়গোপাল নিজ স্ত্রী জয়দুর্গার নিকট সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবৃত করেন। জয়দুর্গাও পিত্রালয়ে আসিয়া উহা দুই চারি জন সমবয়স্কা স্ত্রীলোকের সহিত বলিয়াছিলেন। মহামায়াও এ সমস্ত শুনিতে পাইয়াছিল। আমি মহামায়ার মুখে শুনিয়া এ সমস্ত লিখিলাম। অবশ্য গল্পটী একের মুখ হইতে অন্যের মুখ দিয়া বাহির হইবার সময় অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে; কিন্তু মহামায়া কাল্পনিক গল্প করিবার লোক নহে। সে যাহা যাহা বলিয়াছে, তাহাই এ অধ্যায়ে সন্নিবেশিত করিয়াছি। অপর লোকে বাড়াইয়া কমাইয়া থাকিবেক; কিন্তু মহামায়া যাহা বলিয়াছে, তাহার প্রতি আমার কোনই সন্দেহ নাই; সুতরাং এ সমস্ত যে সত্য, তাহা আর বলিবার প্রয়োজন নাই।

বিংশ অধ্যায়।

আমার কথা।

আমি ডাক্তারখানা হইতে কুড়ি দিনের মাত্র ছুটি লইয়া আসিয়াছিলাম; কিন্তু নানা কারণ-বশতঃ আমাকে প্রায় মাসাবধি বাটী থাকিতে হইয়াছিল। প্রথমবার আমার ছুটি ফুরাইয়া গেলে, আমি আরও কুড়ি দিবস ছুটির জন্য ডাক্তার-সাহেবের নিকট আবেদন করিয়াছিলাম। সে আবেদন-পত্রের কোনও জবাব পাই নাই বটে; কিন্তু পরম্পর শুনিয়াছিলাম যে, আমার আবেদন-পত্রের প্রার্থনা মঞ্জুর হইয়াছে। অতএব আমি নির্ভাবনায় এক মাসকাল বাটী থাকিয়া ডাক্তারখানায় প্রত্যাগমন করিলাম। 'নীতিকথা' নামক বালকদিগের একখানি পাঠ্য-পুস্তকে আছে যে,—"এক হরিণ মনুষ্যের হাত হইতে পলাইয়া প্রাণরক্ষার্থে একটী সিংহের গর্ত্তে প্রবেশ করিয়াছিল। যে মনুষ্যের হাত হইতে পলাইয়াছিল, সে তাহাকে নিশ্চয় যে মারিবে, তাহার স্থিরতা ছিল না; তাহাকে পুষিলেও পুষিতে পারিত। কিন্তু সিংহের গর্ত্তে প্রবেশ-মাত্র, সিংহ তাহাকে খণ্ডবিখণ্ড করিয়া আপনার ক্ষুধা-নিবৃত্তি করিল। আমারও অবস্থা সেইরূপ হইল। আমি যদিও পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম যে, আমার অতিরিক্ত পনের দিবসের ছুটি মঞ্জুর হইয়াছে; কিন্তু সে সম্বন্ধে কোনও পত্রাদি না পাওয়ায়, আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্নচিত্ত ছিলাম। এ সময়ে সুপ্রসিদ্ধ পেন সাহেব ডাক্তারি-বিভাগের সর্ব্বপ্রধান কার্য্যে অধিরূঢ় হইয়াছিলেন। তিনি উক্ত বিভাগের ব্যয় কমাইবার জন্য যেখানে দু'জন কম্পাউণ্ডার, সেখানে একজন মাত্র রাখিলেন। আমাদের ডাক্তারখানার দু'জন কম্পাউণ্ডারের মধ্যে আমি অপেক্ষাকৃত নূতন, এইজন্য আমার পদ এবালিস করিয়া দিলেন। ডাক্তারখানায় গিয়া এই সংবাদ পাইবামাত্র আমার মাথা ঘুরিয়া গেল। চক্ষে যেন চতুর্দ্দিকে সরিষার ফুল দেখিতে লাগিলাম। আমি অবিলম্বে বাটী পড়িলাম। কিরূপেই বা পরিবার-প্রতিপালন করিব এবং কিরূপেই বা নিজের উদরপূরণ করিব, এই ভাবনায় আমার চিত্ত অত্যন্ত চিন্তাযুক্ত হইল।

চাকরি কি ভয়ানক পদার্থ! অহিফেন সেবন করা ও চাকরি করা উভয়ই সমান। যাহারা অহিফেন সেবন করে, তাহারা বিনা অহিফেনে থাকিতে পারে না। আর যে যতদিন সেবন করিয়াছে, তাহার নিয়মিত সময়ে অহিফেনটুকু ততই দরকার। সেইরূপ, যে ব্যক্তি একবার চাকরি করিতে আরম্ভ করিয়াছে, সে বিনা চাকরিই থাকিতে পারে না; [illegible] যে যত অধিক দিন চাকরি করিয়াছে, তাহার চা[illegible]র উপর নির্ভর ততই অধিক। এইজন্য যাহা[illegible]কবার মুন্সেফি করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহাদিগের ওকালতি করিতে সাহস হয় না। যে ডাক্তার একবার সরকারি কাজ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, সে কখন চাকরি ছাড়িয়া নিজের ব্যবসা করিতে পারে না। অথচ উভয় কার্য্যেই চাকরির আয় অপেক্ষা অধিক আয় হইয়া থাকে। কিন্তু প্রথমত কয়েকদিবস অথবা কয়েক মাস পূর্ব্ববৎ আয় হইবে না, এই ভয়েই তাহারা অত্যন্ত ভীত হয়।

আমি যখন শুনিলাম যে, আমার চাকরি এবালিস হইয়াছে, অমনি অকূল-পাথারে পড়িলাম। নিজের ইচ্ছা-প্রযুক্ত চাকরি কখন ছাড়িতাম না। কিন্তু উপস্থিত বিষয়ে আমার কোন হাত ছিল না; দৈবের বশবর্ত্তী হইয়া আমি কর্ম্মচ্যুত হইলাম। এক্ষণে কি করিব ভাবিতে লাগিলাম। আমার কর্ম্মস্থলে বাসা-ভাড়া করিয়া থাকা আর পোসাইবে না বুঝিলাম। বাসা-খরচ কোথা হইতে যোগাইব? সুতরাং নিজ-গৃহে গমন করিলাম।

এস্থানে চাকরি ত্যাগ করা না ত্যাগ করা সম্বন্ধে একটী প্রকৃত ঘটনা বর্ণনা করিয়া এ অধ্যায় ত্যাগ করিব। আমি কোন এক জেলার সদর ডিস্পেন্সারিতে চাকরি করিতাম। ঐ ডিস্পেন্সারির নিকটবর্ত্তী এক গ্রামের কোনও এক ব্যক্তি ঐ সদর-ষ্টেশনের রোডসেস্-আফিসে ৫০৲ টাকা বেতনে চাকরি করিতেন। তাঁহার চাকরির স্থল হইতে তাঁহার বাটী ২মাইল আন্দাজ তফাৎ হওয়ায়, তিনি প্রতিদিন যথাসময়ে কার্য্যালয়ে পৌঁছিতে পারিতেন না। যেদিন দেরি হইত, সে দিবস কার্য্যালয়ের প্রধান কর্ম্মচারী কিঞ্চিৎ বকাবকি করিতেন। কেরাণী বাবু শুনিয়া কহিতেন,—"থাক্, এ চাকরি আর করিব না। এ চাকরি থাকিলেই বা কি, আর গেলেই বা কি?" এমন সময়ে সেই কার্য্যালয়ে তহবিল-সম্বন্ধে কোনও এক গোলযোগ উপস্থিত হইল। কেরাণী বাবুর চাকরি যায় যায় হইয়া উঠিল। তখন তাঁহার মুখে—"এমন চাকরি গেলেই বা কি, থাকলেই বা কি?"—একথা আর নাই। পরন্তু বার জন সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া শিব-স্বস্ত্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার বন্ধুবর্গের অনুরোধে তাঁহার চাকরিটী বজায় রহিল। পুরোহিতেরা যথাযোগ্য দক্ষিণা প্রাপ্ত্যন্তর স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

আমার যৎসামান্য বেতনের চাকরি আমি লাট-সাহেবের চাকরির ন্যায় মনে করিতাম। লাট-সাহেব বড়লোক, সুতরাং তাঁহার ব্যয় অধিক। আমি যেমন সামান্য লোক, আমার ব্যয়ও সেইরূপ সামান্য; অতএব তাঁহার চাকরিতে আর আমার চাকরিতে প্রভেদ কি? তাঁহারও যেরূপ আয় তেমনি ব্যয়, আমারও যেরূপ আয় তেমনি ব্যয়। এ স্থানে আমাকে আর একটী কথা বলিতে হইতেছে। সে কথাটী আর কোন স্থানে আছে কি না বলিতে পারি না। অনেক স্থলে লোকের অসুখ স্বকপোল-কল্পিত। লোকে আপনাপেক্ষা ধনী লোকের সহিত নিজ নিজ অবস্থার তুলনা করে। এরূপ তুলনা করিয়া অসুখী হয়। কিন্তু তাহার অপেক্ষা অল্প আয়ের লোকের সহিত তুলনা করে না। এরূপ তুলনা করিলে আর অসুখের কারণ থাকে না। রামের অপেক্ষা শ্যাম অধিক লেখা-পড়া জানে, অধিক বলবান্, অধিক সুশ্রী, অধিক বুদ্ধিমান; কিন্তু শ্যাম মাসে পাঁচ টাকা উপার্জ্জন করে, রাম পঁচিশ টাকা উপার্জ্জন করে। তুলনা করিবার সময় কিন্তু রাম শ্যামের সহিত নিজ-অবস্থার তুলনা করিবে না। সে সময় তাহা অপেক্ষা যে অধিক ধনী, তাহারই সহিত তুলনা করিবে।

আরও একটা কথা মনে পড়িল। পঙ্গু বলিবে যে, যাহাদের গমনাগমন শক্তি আছে, তাহারা তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; যে নির্ধনী, সে স্বীকার করিবে, ধনীলোক তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; কিন্তু বুদ্ধি-বিষয়ে কেহ কাহাকে শ্রেষ্ঠপদ দিতে চায় না। সকলেই মনে করে, সেই সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান। পরন্তু যে যত অল্পবুদ্ধি, সে ততই আপনাকে বুদ্ধিমান মনে করে, এবং অপরকে সেইরূপ পরিমাণে অল্পবুদ্ধি বিবেচনা করে। (ক্রমশঃ।)

সনাতনপুরের সিদ্ধেশ্বর। *

চুট্‌কি গল্প।

(৫)

প্রত্যুষে উঠিয়া রামেশ্বর নিকটস্থ পুষ্করিণীতে স্নানাদি ক্রিয়া সমাপন করিলেন। তৎপরে সোপানাবলী আরোহণ করিয়া ঊর্দ্ধমুখে যুক্ত-করে রোদনোন্মুখস্বরে বলিলেন,—"করুণাময়, আর যাতনা সহিতে পারি না যে, দেব! আর এ দুর্দ্দশা যে চক্ষেও দেখিতে পারি না, প্রভো! কিরূপে এই দুর্ব্বল অসহায় দুর্ব্বহজীবন বহন করিব, সে উপায় কি বলিয়া দিবে না? নিতান্তই কি অধম সন্তানকে ত্যাগ করিলে, মধুসূদন? পরমেশ! তুমি কি আমাদের প্রভু নও, দেব? দোষী হইলেও কি ভৃত্যের অপরাধের মার্জ্জনা

* গত বারের 'অনুসন্ধানে' প্রকাশিত অংশের শেষ।

উচিত নহে, প্রভু ? তুমি ভিন্ন আর কাহাকেও যে সঙ্কট-নিবারণ বলিয়া জানি না, জগদীশ !" এমন সময়ে পশ্চাতে কে ডাকিল,—"মুখুয্যে মশাই !"

ফিরিয়া দেখিলেন, রতনের ভৃত্য। ভৃত্য বলিল,—"দত্তজামশাই বড় তাগাদায় একবার আপনাকে ডেকেছেন।"

"এক্ষণেই ?"

"হাঁ, এক্ষুনি।"

"তবে চল" বলিয়া, ভৃত্যকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া, পশ্চাৎ পশ্চাৎ আপনিও যাইতে লাগিলেন। দ্বিতীয় বস্ত্রের অভাবে সেই আর্দ্র বস্ত্রেই রামেশ্বর চলিলেন।

রতন অত্যন্ত আগ্রহের সহিতই রামেশ্বরের আগমন-প্রতীক্ষা করিতেছিল। এক্ষণে তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া অতি সানন্দমনে তাঁহার অভ্যুত্থান করিল। স্বাগত-প্রশ্নে বলিল,—"মুখুয্যে মশাই, আমি একটী ভিক্ষা চাহিবার জন্যই আপনার নিকট লোক পাঠাইয়াছিলাম।"

রামেশ্বর আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন,—"ভিক্ষুকের নিকট আবার ভিক্ষা !"

রতন।—অমন কথা বলিবেন না। আপনারা ব্রাহ্মণ, মনে করিলে সকলই করিতে পারেন। বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের সহিত যুদ্ধকালে মুহূর্ত্তমধ্যে কত শত সৈন্যই সৃষ্টি করিয়া ফেলিলেন। রামচন্দ্রের দেশাগমন-কালে কি-মুনিও, শুনিয়াছিলাম, রামের সমস্ত অনুচর ও সৈন্যগণের অতিথি-সৎকারে তাঁহাদিগকে পরমাপ্যায়িত করিয়াছিলেন।

রামেশ্বর।—সে সকল যোগী-ঋষিদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহারা তপোবলে সাক্ষাৎ দেবতাস্বরূপ হইয়াছিলেন। আমরা যোগ-তপ-বিহীন ক্ষুদ্র-প্রাণ সামান্য ব্রাহ্মণ। তাঁহাদের সহিত আমাদের তুলনাই নিতান্ত ধৃষ্টতা ও সাহসের কাজ।

রতন।—তাহা হইলেও আমরা শূদ্র। আমাদের নিকট আপনারা সেইরূপই পূজ্য। যোগী-ঋষিদিগের যাহা না থাকিত, তাহা তাঁহারা তপোবলে সৃষ্টি করিয়া দিতে পারিতেন। আপনাদের যাহা আছে, তাহাও ত দিতে পারেন ?

রামেশ্বর।—কিন্তু আমার কি আছে, রতন, থাকিবার মধ্যে আছে—কেবল দরিদ্রতা, ও সর্ব্ববিষয়ে অত্যন্তাভাব। তাহাই কি তুমি চাও ! যাহার কিছুই নাই সে কি দিবে ?

রতন।—যদি কিছুই না থাকে, তবে বল, অদ্য আপনি যাহা পাইবেন, তাহাই আমায় দিবেন ?

রামেশ্বর।—রতন, আমার পুত্রকন্যাগণ দিবস কিছুই আহার করে নাই। ক্ষুধায় তাহারা অবসন্ন ও মৃতপ্রায় হইয়া আছে। এরূপ অবস্থায় যদি কোথা হইতে কিছু তণ্ডুল কি কিছু অর্থ পাওয়া যায়, আর তাহা লইতে যদি তোমার মনে কিছুমাত্র দ্বিধা উপস্থিত না হয়, লইতে পার। আমার কথা বলিতেছি, কেবল আমার নিজের জন্যই যদি প্রয়োজন হইত, তাহা হইলে আমি তোমায় অকাতরে তাহা দিতে পারিতাম। কিন্তু সেই হতভাগ্যগণ যদি আজও কিছু খাইতে না পায়, আমার বোধ হয়, তাহারা আর ইহলোকের জীব থাকিবে না।" বলিতে বলিতে ব্রাহ্মণের স্বর কম্পিত ও গণ্ড বহিয়া দুই বিন্দু অশ্রু নিপতিত হইল।

সে কাতর-মূর্ত্তি দেখিয়া পাষাণ-হৃদয় রতনেরও মনে মুহূর্ত্তের জন্য করুণার উদয় হইল। বলিল,—"আচ্ছা, আমি যদি আপনাকে একশ' টাকা দিই, তবে আপনি আজ যাহা পাইবেন, তাহা আমায় দিতে পারেন ?"

রতনের এই আকস্মিক মুক্ত-হস্ততা দেখিয়া রামেশ্বর অবাক্ হইলেন ! এই রতনের নিকট ইতিপূর্ব্বে রামেশ্বর একদিন অত্যন্ত কাতরতার সহিত যৎসামান্য অর্থ-প্রার্থনা করাতে বলিয়াছিল,—"আমি কোথায় পাইব ? আমার কোন ক্ষমতা নাই ; আমি কিছুই দিতে পারিব না।

অবশেষে কি ভাবিয়া কয়েক মুষ্টি তণ্ডুল ও একটী মাত্র পয়সা (মনে মনে ভিক্ষুকের স্বভাবের প্রতি অনেক দোষারোপ করিতে করিতে) প্রদান করিয়াছিল। আজি সেই রতনের হঠাৎ এইরূপ দানশীলতা দেখিয়া রামেশ্বর বিস্মিত হইলেন। তিনি তাহার কথার সত্যতায় হঠাৎ বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। ভাবিলেন, নিশ্চয়ই রতন তাঁহার সহিত রহস্য বা কৌতুক করিতেছে। তখন রামেশ্বর কাতরভাবে বলিলেন,—"রতন, যদিও আমরা নিতান্ত দরিদ্র, যদিও আমাদের কেহ কিছু বলিলে কি অপমান করিলে তাহার প্রতিবিধান করিবার শক্তি নাই, কিন্তু তাই বলিয়া, আমাদের নিস্ব ও নিঃসহায় দেখিয়া ব্যঙ্গ করা কতদূর শীলতাসঙ্গত, তাহা বুঝিতে পারি না। আমার সহিত রহস্য করিয়া তোমার কি লাভ হইবে ?"

রতন তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিল,—"দোহাই ধর্ম্মের, আমি আপনার সহিত রহস্য করি নাই। সত্য সত্যই আমি আপনাকে একশত টাকা দিতে প্রস্তুত আছি ; তদ্বিনিময়ে কেবল আপনি অন্য সূত্র হইতে আজ যাহা পাইবেন, তাহাই মাত্র চাহিতেছি।"

রামেশ্বর।—আমি অন্য স্থান হইতে কি পাইব, তাহার কিছুরই স্থিরতা নাই। যদিই কিছু পাই, তাহা তোমার ন্যায় লোকের পক্ষে যৎসামান্য। সে যৎসামান্যের বিনিময়ে তুমি আমাকে এক-শ টাকা কেন দিবে, বুঝিতে পারিতেছি না।

রতন উদ্বিগ্ন হইল ; ভাবিল, ব্রাহ্মণ বুঝি অসম্মত বলিয়াই এইরূপে পাশ কাটাইবার চেষ্টা করিতেছে। তাই সে ব্যস্ততা-সহকারে বলিয়া উঠিল,—"আপনার কষ্ট দেখিয়া আমি বড় দুঃখিত হইয়াছি ; সেই কষ্ট কিয়ৎ পরিমাণে মোচন করাই আমার উদ্দেশ্য। আচ্ছা, আমি আপনাকে দু-শো টাকা দিতেছি। আর যে বিনিময়ের কথা বলিতেছি, তাহা কেবল উপলক্ষ-মাত্র।"

রামেশ্বর ভাবিলেন, এ কি কৌতুক ! যথার্থ মর্ম্মানুধাবন করিতে না পারিয়া বলিলেন,—"ইহাতেও আশ্চর্য্য হইতেছি ! নিতান্ত কাতর-ভাবে ২।৪টী পয়সা চাহিলে যে চিত্ত একটী দিতেও কুণ্ঠিত হয়, সেই চিত্ত যে অকস্মাৎ এরূপ দয়ালু হইবে, এও অল্প বিস্ময়ের বিষয় নহে !"

রতন।—বস্তুতঃ সেই দিন আপনার সেই অবস্থা দেখিয়া পর্য্যন্ত আমার হৃদয় বড় ব্যাকুল হইয়াছে। আপনার যাইবার পর হইতে অনুতাপেও আমার অন্তর দগ্ধ হইতেছে। তাহারই প্রায়শ্চিত্ত-স্বরূপ এবং কিয়ৎপরিমাণে আপনার দুঃখ-মোচনের উদ্দেশ্যেই আমি এই কার্য্যে মনস্থ করিয়াছি। এক্ষণে বলুন, আপনি কি স্বীকৃত ?

রামেশ্বর রতনের আন্তরিক অভিপ্রায় স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন না। সত্যই কি লোকটার অন্তরে দয়াপ্রবৃত্তির স্থান আছে ? অথবা ইহার অন্য কোন গূঢ় অভিসন্ধি আছে ? অস্থিরভাবে বলিলেন,—"যদি তুমি প্রশস্তমনে দিতে প্রস্তুত থাক, তবে আমি লইতে অসম্মত নহি।"

"তবে আমাকে লিখিয়া দেন, আপনি আজ যাহা পাইবেন, তাহা আমায় দিবেন।"

রামেশ্বর বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—"তোমার ঐ কথাতেই আমার আরও সন্দেহ-বৃদ্ধি হইতেছে। যদি কৃপাপরবশ হইয়া দিতেই ইচ্ছা হয়, তবে ও ধুয়া ধরিয়াছ কেন ?"

ঐ গো ! বামুন বুঝি রাজী না হয় ! রতন আরও উদ্বিগ্ন হইল। কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া বলিল,—"না, ওকথা তেমন কিছুই নহে। আমি ত ইতিপূর্ব্বেই আপনাকে বলিয়াছি যে, উহা কেবল উপলক্ষ-মাত্র। আপনার দৈনিক উপায় কত, তাহা কি আমি জানি না ? তবে যে এরূপ করিতে বলিতেছি, তা' কেবল আপনার অদৃষ্ট-পরীক্ষা করিবার জন্য।"

রতনের কথায় ও তাহার আকার-ইঙ্গিতে ব্রাহ্মণ বড়ই সন্দিহান হইলেন। ঘোর অভিসন্ধি

কি, বুঝিতে না পারিয়া এবং "ইহা কৌতুক ভিন্ন আর কি হইতে পারে?"—এই ভাবিতে ভাবিতে, গাত্রোত্থান করিলেন। ব্রাহ্মণ পলায় দেখিয়া, ব্যাকুলিতচিত্তে তাঁহার পথরোধ করিয়া, রতন বলিয়া উঠিল,—"অর্দ্ধেকই ভাল! আচ্ছা, আমি আপনাকে পাঁচশত টাকাই দিতেছি। বসুন, আমাকে লিখিয়া দিন,—অদ্যকার সকল উপার্জ্জনই আমার হইবে।"

রামেশ্বর অবাক! ভাবেন, এ কি! রতন কি ক্ষিপ্ত হইয়াছে? বলিলেন,—"রতন তুমি কি উন্মত্ত হইয়াছ? কেন তুমি আমাকে শুধু শুধু পাঁচশত টাকা দিবে?"—এই কথা বলিয়া তীব্র-দৃষ্টিতে রতনের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, তথায় যেন কিছু উদ্বেগ লক্ষিত হইতেছে;—উন্মাদের কোন বিশেষ চিহ্ন দেখিতে পাইলেন না। বিস্ময়পূর্ণভাবে তখন বলিলেন,—"আমি তোমাকে এইরূপ লিখিয়া দিয়া, টাকা লইয়া তোমার দরজার বাহিরে যাইতে না যাইতেই, তোমার লোকে যে তাহা কাড়িয়া লইবে না, তাহাই বা কেমন করিয়া বুঝিব?"

তখন রতন স্বীয় স্বরে যথাসাধ্য দয়া সংমিশ্রিত করিয়া যথাসাধ্য প্রশান্তচিত্তে ব্রাহ্মণকে বুঝাইয়া দিল যে, সে যথার্থই রামেশ্বরকে ৫০০৲ পাঁচশত টাকা দিতে প্রস্তুত আছে; এবং দিয়াও কোনরূপে তাঁহার নিকট হইতে চাহিয়া লইবে না। মাত্র অন্যসূত্রে তিনি সে দিবস যাহা পাইবেন, তাহাই রতনের হইবে।

এই প্রস্তাবে রামেশ্বর সম্মত হইলে, রতন তাঁহাকে পাঁচশত টাকা গণিয়া দিল। টাকা গণিতে গণিতে রতনের হস্ত অনেকবার কাঁপিয়া উঠিয়াছিল; এবং দুই একবার ভাবিয়াও ছিল যে,—"যদি ব্রাহ্মণ হাজার টাকা না পায়, তবে কি হইবে? ঘরের পাঁচ-শ'ত এখন জলে পড়িল!" এ চিন্তায় রতন অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল বটে; কিন্তু তখনই মনকে এই বলিয়া প্রবোধ দিল যে,—"দেবগণের বাক্য কখন মিথ্যা হয় না; বিশেষ, আমাদের সনাতনপুরের সিদ্ধেশ্বর! ইনি প্রত্যক্ষ!"

টাকা পাইয়া রামেশ্বর প্রহৃষ্ট-মনে নারায়ণকে ধন্যবাদ দিতে দিতে গৃহে প্রস্থান করিলেন, ও অবিলম্বে আহারীয় সামগ্রী কিনিয়া আনিয়া স্ত্রী-পুত্রাদির বুভুক্ষা-নিবারণের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

রতনও, পাছে ব্রাহ্মণ প্রতারণা করে—এই আশঙ্কায়, তাঁহার গৃহদ্বারে স্বয়ং আসিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। বলিবার প্রয়োজন আছে, রতন দৈব-অর্থের প্রতীক্ষা করিতে আসিল?

(৬)

আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া, আশায় উন্মত্ত রতন এইরূপে সারাদিন অর্থের প্রতীক্ষা করিয়া, যত বেলা অবসান হইতে লাগিল, ততই তাহার চিত্ত অস্থির হইয়া উঠিল। কি উপায়েই বা টাকা হস্তগত হইবার সম্ভাবনা? গণপতি ত সে উপায় ব্যক্ত করেন নাই! কল্পনাবলে রতন নানাপ্রকার উপায় সৃষ্টি করিয়া চিন্তা করিতে লাগিল। শেষে এক এক করিয়া সকলগুলির আশাই পরিত্যাগ করিল। ক্রমে দিনমণি অস্তগমন করিল। রতনও ক্রমে নানাপ্রকার উদ্বেগে ও সন্দেহে ব্যাকুল হইতে লাগিল। পৃথ্বীতলে গাঢ় অন্ধতমস ঢালিয়া দিয়া, তদপেক্ষা রতনের অন্তরে প্রগাঢ়তর অন্ধকার মাখাইয়া দিয়া, রজনী আসিল। একে একে আকাশে তারা ফুটিতে লাগিল। কিন্তু, কই, রতনের নিরাশপ্রায় অন্তরে একটুও ত আশার জ্যোতি দেখা দিল না! নিবিড় কানন, গুহা প্রভৃতি গোপনীয় স্থান হইতে অন্ধকার পৈশাচিক আস্ফালন-নৃত্য করিতে করিতে আসিয়া প্রান্তর-পল্লী-পথ-জলপথ সর্ব্বত্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া জমিতে লাগিল। বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতিরও অটুট সম্বন্ধ! রতনের অন্তরও সঙ্গে সঙ্গে অধিকতর হতাশ-কাতর হইতে লাগিল। বৃদ্ধের একমাত্র আশাস্থল—একমাত্র বয়ঃপ্রাপ্ত কৃতী

পুত্রের মৃত্যুতে সে যতদূর না কাতর হয়, কৃপণ ব্যক্তি অর্থনাশে ততোধিক ব্যাকুল হইয়া উঠে।

ক্রমে রতন দেববাক্যে সন্দিহান হইতে লাগিল। "গণপতির বাক্য কি তবে মিথ্যা? অথবা আমার সহিত তিনি ছলনা করিতেছেন? কিন্তু কেনই বা তিনি আমার সহিত ছলনা করিবেন? আমার যখনই কিছু লাভ হইয়াছে, আমি তখনই তাঁহার সওয়া পয়সা পূজা দিয়াছি! এই সেদিন যাহাতে দেবেন ভট্টাচার্য্য সময়মত আমার টাকা দিতে না পারায় তাঁহার দশ বিঘা ব্রহ্মোত্তর আমার হইল (জমীটুকু বড় উর্ব্বরা বলিয়া তাহা হস্তগত করিতে আমার বিশেষ আকিঞ্চনও ছিল), তাহাতে আমি পাঁচহাতি একটী জোড় দিয়া গণেশের পূজা দিয়াছিলাম। ইহাতেও কি আমার তাঁহার প্রতি অচলা ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ পায় নাই? ইহাতেও কি আমি তাঁহাদের কৃপাপাত্রের যোগ্য নহি? অথবা আমি কি দেবগণের প্রপঞ্চে পড়িলাম? কিম্বা আমার দ্বারাই রামেশ্বরকে টাকা দেওয়ান কি তাঁহাদের উদ্দেশ্য?" বিদ্যুদ্বৎ এই কথা মনে উদয় হইবামাত্র রতন আকুল হইয়া উঠিল! "বাপ্‌রে! পাঁচ পাঁচ-শ' টাকা বৃথা লোভে পড়িয়া হারাইলাম! কিন্তু এর জন্য দোষী কে? রামেশ্বর শর্ম্মা? তাহার দোষ কি? আমিই ত জেদ করিয়া তাহাকে টাকা গছাইয়াছি! তবে কি আমি নিজে?" রতন যে ঘোর লোভে পড়িয়া টাকা হারাইয়াছে, তাহা সে ভাবিতে পারিল না। সে ভাবিল,—এ দোষ গণেশের! গণেশের কথায় বিশ্বাস করিয়াই ত তাহার এই দুর্দ্দশা! গণেশই প্রধান ও প্রকৃত অপরাধী। তখন গণেশের প্রতি তাহার বিজাতীয় ক্রোধ উপস্থিত হইল। রোষে চক্ষুর্দ্বয় ও মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ধারণ করিল। দন্তে দন্তে ঘর্ষণ হইতে লাগিল! "নিশ্চয়ই দেবগণ আমাকে প্রতারণাজালে জড়িত করিয়াছেন! কিন্তু কি দারুণ অপরাধে আমার প্রতি তাঁহাদের এই বিষম শত্রুতাচরণ? অহো! বুঝিলাম,—জগতে ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই, পাপ-পুণ্য নাই, দেবগণের কার্য্যেও বিশ্বাস নাই!" গণেশের প্রতি রতনের আর তখন দেবভাব নাই। তাহার প্রতিহিংসা-বৃত্তি জ্বলিয়া উঠিয়াছে। দুঃখে, ক্রোধে, হিংসায় সে তখন উন্মত্ত। তখন সে দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য। তাহার একেবারে ধৈর্য্যচ্যুতি হইয়াছে! তখন হঠাৎ উন্মত্তভাবে সেই নৈশ-অন্ধকার ভেদ করিয়া রতন সিদ্ধেশ্বরের মন্দিরের দিকে ছুটিল। তাহার বস্ত্রাদি স্খলিত, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রোষ-কম্পিত! তাহার সে বিকট-মূর্ত্তি দেখিলে সকলেরই ভয় হয়!

এইরূপে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া গিয়া, উন্মত্ত রতন একেবারে গণেশের উদর লক্ষ্য করিয়া সবলে এক প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিল। সে নিদারুণ আঘাতের জোরে সেই শূন্যগর্ভ পিত্তল-প্রতিমূর্ত্তির বিশাল উদর ভেদ করিয়া তাহার হস্ত ভিতরে ঢুকিয়া গেল! হস্ত এরূপভাবে প্রবেশ করিল যে, ভগ্ন উদরের সূচল অংশ-সকল তাহার হস্তে চারিদিক হইতে বিদ্ধ হইয়া গেল। তখন, হস্ত বাহির করিতে পারা দূরে থাক্, একটু টানিতে গেলেই বিদ্ধ পিত্তলখণ্ড সকল দারুণ যন্ত্রণায় অস্থির করিয়া তুলে! রতন ঘুসী মারিয়া মহা ফাঁপরে পড়িয়া গেল। রাত্রি ঘোর অন্ধকার। সে নির্জ্জন প্রান্তরে কোন লোকেরই সমাগম নাই। বাহিরে সেই বৃহৎ বটবৃক্ষ অন্ধকারকে আরও ঘনীভূত করিয়া তুলিয়াছে। পাষণ্ড রতনের মনেও ভয়ের উদয় হইল। সে অপর হস্তের সাহায্যে ডান হাত বাহির করিবার জন্য আর একবার বিশেষ করিয়া চেষ্টা করিল। কিন্তু সে উদ্যমও ব্যর্থ হইল। লাভের মধ্যে গণেশের শুণ্ড রতনের গলদেশে জড়াইয়া গেল। এদিকে হস্তের ক্ষতস্থান হইতে ক্রমাগত রক্তস্রাব হইতেছিল। আকস্মিক ক্রোধের উত্তেজনাও তখন অপগত হইয়াছিল। একে অর্থনাশে হৃদয় কাতর; তাহাতে অবিরত রক্ত-মোক্ষণে শরীর অবসন্ন—বিদ্ধ পিত্তলখণ্ড সকল সূচীবেধের ন্যায়

অসহ্য যন্ত্রণা দিতেছে! তাহার উপর সেই স্থান-সম্বন্ধে যে সকল বিভীষিকাপূর্ণ প্রবাদ শুনিয়াছিল, একে একে সমস্ত মনে পড়িতে লাগিল। আতঙ্কে রতনের শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। তাহার বোধ হইল, যেন চারিদিকে পিশাচেরা তাণ্ডবনৃত্য করিতেছে! কেহ বা যেন অট্টহাস্যের সহিত তাহার প্রতি শ্লেষোক্তি করিয়া বিকৃত-স্বরে বলিতেছে,—"কেমন? দেবতার সহিত বিবাদ করিবে না?" রতনের বুক দুরু দুরু করিতে লাগিল! তবে কি গণেশ নিজেই ইচ্ছা করিয়া রতনের গলদেশ জড়াইয়া ধরিয়াছেন? রতন আর ভাবিতে পারিল না; তাহার চেতনা বিলুপ্ত হইল।

এইরূপভাবে কতক্ষণ ছিল, রতনের তাহা জ্ঞান নাই। যখন অল্প অল্প চৈতন্যোদয় হইতেছে, তখন শুনিল, কে বলিতেছে,—"হাঁ, ৫০০৲ পাঁচশত টাকা দেওয়া হইয়াছে; আর, বাকী ৫০০৲ পাঁচ-শ' টাকার জন্য এই আসামী কয়েদ করিয়া রাখিয়াছি।" সর্ব্বনাশ! এত রতনের সম্বন্ধেই কথা বোধ হইতেছে! ব্যাকুলভাবে কম্পিতকণ্ঠে রতন বলিয়া উঠিল,—"দেবগণ! রক্ষা করুন! বলুন, কি অপরাধে আমার এ দুর্গতি! আর, কেনই বা আমার অর্থে রামেশ্বরের ভাণ্ডার পূর্ণ হইবে?"

তখন বজ্রগম্ভীর-স্বরে উত্তর হইল,—"পাষণ্ড, এখনও তোর চেতনা হয় নাই? জানিস্ না, দেবগণ রুষ্ট হইলে কিছুতেই নিস্তার নাই? অধর্ম্মে অর্থোপার্জ্জন করিয়া তোর ধর্ম্মপ্রবৃত্তি কি এতই নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে যে, ন্যায়ান্যায়-বোধ একবারেই বিলুপ্ত হইয়াছে! ভাবিস্ কি, একজনের গৃহে টাকা পচিতে থাকিবে, এবং আর একজন অর্থাভাবে না খাইতে পাইয়া শুকাইয়া মরিবে? সিদ্ধেশ্বর এ বৈষম্য চিরকাল সহ্য করেন না। দেবতারা স্বতন্ত্র টাঁকশাল রাখেন না। কর্ম্মফলানুসারে ইহ-সংসারেরই একের টাকা অপরে পায়। সাবধান! কল্য প্রাতেই যেন বাকী পাঁচ-শ' টাকা রামেশ্বরকে প্রদত্ত হয়।"

রতন আর কিছু শুনিতে পাইল না। তাহার আবার সংজ্ঞালোপ হইয়াছে। যখন জ্ঞান হইল, তখন প্রাতঃ-সূর্য্যকিরণে পৃথিবী হাসিতেছে, এবং বাহিরে কাহারা কোলাহল করিতেছে। কথার স্বরে রতন বুঝিতে পারিল যে, তাঁহারা তাহারই আত্মীয়-স্বজন। তাঁহারা বহুকষ্টে রতনের হস্ত গণেশের উদর-মধ্য হইতে বাহির করাইলেন। অনেক স্তবস্তুতি ও শান্তি-স্বস্ত্যয়ন করান হইল; বহু উপচারে গণেশের রীতিমত পূজা দেওয়া হইল। মেয়েরা রতনের হস্তের ক্ষত শীঘ্র ভাল করিয়া দিবার জন্য গণেশের নিকট অনেক মানসিকও করিয়া রাখিল। বলা বাহুল্য, সর্ব্বাগ্রেই রামেশ্বরকে বাকী পাঁচশত টাকা প্রদত্ত হইয়াছিল; এবং তাঁহার দ্বারাই পূজাদি কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল।

আর কেন?

আন্দোলন ঢের হইয়াছে। ফলও হাতে হাতে মিলিতেছে। তবে আর কেন? বাঙ্গালীর আন্দোলন বাক্য বৈ আর কিছুই নহে; এই বাক্যের দায়ে লাঞ্ছনা-ভোগ কেন? পরাধীন জাতির আন্দোলনে কোন কাজ নাই। আন্দোলনের উদ্দেশ্য, সাধারণের মতামত-সঙ্কলন। যেখানে সাধারণ-মতের দাম আছে, সেইখানেই আন্দোলনে কাজ হয়। বিলাতে আন্দোলন কার্য্যকরী; কারণ, সেখানে প্রজা জানে, তাহাদের মতামতের উপর নির্ভর করিয়াই রাজ্যশাসন চলিবে। আজ যে আইন-কানুনের কারণ কাহার কাহার কষ্ট-বোধ হইতেছে, তাহারা জানে, যদি সাধারণে অর্থাৎ অধিকাংশ প্রজা সেই কষ্ট উপলব্ধি করিতে পারে, তবে সে আইন-কানুন আর থাকিবে না। তাহারা জানে, আজ বিলাতের ১৫ আনা লোক যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিবে, কালই তাহা কার্য্যে অনুষ্ঠিত

অনুসন্ধান

...র ...নের ...রে, তবে... ...হয়। নতুবা উহা কেবল ফ... এমন ফাঁকা আওয়াজের উপর আস্থা কেন. ভারতে বর্ত্তমান কালের মত আন্দোলন কখন ছিল না; সভা-সমিতি করা, প্রস্তাব-অনুমোদন করা, খবরের কাগজ চালান ইত্যাদি প্রকারের বিলাতী আন্দোলন-প্রথা ভারতে আসিয়া দেশীয়দিগের কি কিছু লাভ হইয়াছে? সেই কথাই আমাদের বিবেচ্য। ভারতে এ সকল প্রথার আবাহন মহানুভব ইংরাজ রাজনৈতিকগণের দ্বারাই হইয়াছে; এবং ঐ সকল হইতে তাঁহারাই সমস্ত লাভের অধিকারী হইয়াছেন। কারণ, এই বিস্তৃত মহাদেশ-প্রায় দেশে প্রজাপুঞ্জের মনের গতি কোন্ দিকে ফিরিতেছে, প্রজার অভিপ্রায় কি, তাহাদের নালিশ করিবারই বা কি আছে, এ সমুদায় পরিজ্ঞাত হওয়া রাজপুরুষদিগের অতীব প্রয়োজনীয়। সুগম উপায়ে ঐ সমস্ত জানিতে না পারিলে 'চর-সম্প্রদায় রক্ষা করা আবশ্যক হইয়া উঠে; সমস্ত মহাদেশে চর রাখিতে গেলে খরচ-পত্রও বড় কম হয় না। এবং ব্যয়সাধ্য হইলেও তাহা তত সন্তোষকর হইতে পারে না। বিশেষ, হিন্দুদিগের ইচ্ছা থাকিলে মনোভাব গোপনে ক্ষমতা আছে; কারণ, তাঁহারা স...ংযমী। অতএব চরের দল বড় বিদেশ; কামি-

...ভিতর আবার ... হইবে, যত অকপট ... করিতে হয়, তিনি যেটী ...র, কবিতা যত জটিল, তাহাকেই বেশি সুন্দরী ... কর পক্ষে, প্রণয়ীর ...বাধ জনকের সাধ্যায়ত্ত নহে ...ষ্ট। কাব্যের ভিতর ...কবিতা-রসমাধুর্য্যং কবি ...র, কামিনীর অন্ত-...নী-ভ্রূকুটী-ভঙ্গি ভবো ...কতে পারে; কিন্তু ...ক অপেক্ষা কবিতার ...য়ায় তাহা বুঝিবার ...ন্দর্য্য উপভোগ করেন তি...

বুঝিতে পারিতেছেন; প্রজাদের শোচনীয় অবস্থা জলন্তভাবে দেখিতে পাইতেছেন; আপনাদিগের স্বার্থ-সাধনের পন্থা পরিষ্কার করিয়া লইতে পারিতেছেন। প্রজাপুঞ্জের সাধারণ মত এইরূপে বিনা-ব্যয়ে সংগৃহীত হইতেছে, এবং তাহা গ্রাহ্য না করিয়াও কিরূপে চলিতে হইবে তাহা ঠিক করিয়া লইতে পারিতেছেন। এইরূপে বর্ত্তমান প্রথায় রাজপুরুষেরই সম্পূর্ণ লাভ হইতেছে। প্রজাপুঞ্জের কিন্তু ক্ষতি ভিন্ন লাভ নাই; পরাধীন প্রজার ক্ষমতা ত বড়! তাহার মতামত প্রকাশ করিতে যাওয়াই ঔদ্ধত্য। এ ঔদ্ধত্যের বিকাশই ত প্রথম ক্ষতি। দ্বিতীয় ক্ষতি, দেশহিতৈষী, প্রিয়চিকীর্ষু ভদ্রলোকদিগের বন্ধনাশা। মনে কর, কোন স্থানে রাজপুরুষদিগের প্রজার ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিবার ইচ্ছা বলবতী হইল, বর্ত্তমান-প্রথায় অমনি সভাসমিতি গঠিত হইবে, ভদ্রলোকেরা গোলমাল চুকিয়া যাইবার আশায় সভায় যোগদান করিবেন, তাঁহারা সাধারণের নিকট মান্য-গণ্য হইলে সাধারণে তাঁহাদিগকে উক্ত সমিতিতে কর্ত্তৃপক্ষের দলে না ফেলিয়া ছাড়িবে না, খবরের কাগজাদিতে তাঁহাদের নামই আগে উঠিবে। কিন্তু ঘটনাক্রমে যদি তাঁহাদের বিস্তর কাঁদা-কাটায়ও গোলমাল না চুকিয়া ক্রমে পাকাপাকি হইয়া উঠে, আর সে হাঙ্গামায় উক্ত কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা লিপ্ত না থাকিলেও কি মনে কর, তাঁহাদের হয়রাণীর হাত হইতে অব্যাহতি হইবে? কাগজের সম্পাদকগিরি একটা বর্ত্তমান হুজুগ। এ সকল কাগজ এক এক সম্প্র-

সরস... মুখপত্র-স্বরূপ। ইহাতে প্রবৃত্ত হইতে হইলে বাক্য-বিহীন, ...জ্ঞান থাকিবে, তাঁহাকেই নিজ-থাকিয়া অপ্রিয়বাদিনী ...প্রকাশ করিতে হইবে। এ ও বনবাস সমান কথা।

অলঙ্কার উভয়েরই প্রিয় পদার্থ। কবিতা অলঙ্কার-প্রিয়, কামিনীও তথৈবচ। কবিতার দুই রকম অলঙ্কার,—অর্থালঙ্কার ও শব্দালঙ্কার; কামিনীরও দুই প্রকার অলঙ্কার,—অর্থালঙ্কার ও শব্দালঙ্কার। শব্দালঙ্কার অপেক্ষা অর্থালঙ্কারের

সমর্থনে এবং তাহাদের ধর্ম্মরক্ষণে বৃদ্ধ-পরিকর হন, তিনি দেশে ভক্তিভাজন। বর্ত্তমান-প্রথা না থাকিলে তাঁহাকে কর্ত্তৃপুরুষদিগের জানিতে দেরী হইতে পারিত; কিন্তু এ আন্দোলনের দিনে তাহার সম্ভাবনা বিরল। উদাহরণ মনে মনে আরো ভাবিয়া লইলে চলে।

তৃতীয় ক্ষতি, গোদাপায়ের লাথির ভয়ভাঙ্গা। আন্দোলন-প্রথা চলিয়া বিশেষ স্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে যে, ঘরের ভিতর সাতঘরা। একথা প্রকাশ না হইলে একটা আব্‌ছাওয়া আব্‌ছাওয়া গোছ কিম্ভূত-কিমাকার সাধারণ মত থাকিত। এ মত চরবর্গ দ্বারা সংগৃহীত হইতে হইলে যে ব্যয় ও আয়াশ লাগিত, তাহাতেই ইহার একটু কদর বাড়িত, এবং সেই তদন্তের পর যাহা সাধারণ-সম্মত বলিয়া স্থিরীকৃত হইত, তাহার ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ বড় বিশদ হইত না। কাজেই একটা গুরুতর বিষয় বলিয়া মনে হইতে পারিত। কিন্তু এ খবরের কাগজ ও আন্দোলনের দিনে সকলই প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। কেবল বাক্য আর সকলই ভূয়া, একথা জানিতে আর কাহারও বাকি নাই। চতুর্থ ক্ষতি, অপ্রস্তুত ও অপদস্থ হওয়া। যত আন্দোলন হয়, তত কাজ হয় না। কতই ব্যাপার কাগজে কলমে হইয়া থাকে, কিন্তু ফলে এক আনাও নহে।

পঞ্চম এবং বিশেষ ক্ষতি, অন্তর্দ্দাহ। খবরা-খবরের ও আন্দোলনের গুণে কত অন্যায় ও অপমানকর বিষয়-পরম্পরা প্রত্যহ গোচরীভূত হয়, কিন্তু তাহার প্রতিকারের কোন উপায় থাকে না।

তাই বলি, এমন নালা কাটাইয়া রোগ আনিবার দরকার কি? রোগে যে উড়কুড় উঠিয়া যাইবার উদ্যোগ হইতেছে! এই সম... কেন রোগের হাত হইতে পলাইয়া যাক্ না! বিলাতী প্রথার অ..., একবারে উঠাইয়া দেও ...ই ভ...বে, এবং আর বিবেচিত হয়. তাহাতে... একজন অর্থাভাবে না... তে পাইয়া শুকাইয়া মরিবে? সিদ্ধেশ্বর এ বৈষম্য চিরকাল সহ্য করেন না। দেবতারা স্বতন্ত্র টাঁকশাল রাখেন না। কর্ম্মফলানুসারে ইহ-সংসারেরই একের টাকা অপরে পায়। সাবধান! কল্য প্রাতেই যেন বাকী পাঁচ-শ' টাকা রামেশ্বরকে প্রদত্ত হয়।"

রতন আর কিছু শুনিতে পাইল না। তাহার ...বার সংজ্ঞালোপ হইয়াছে। যখন জ্ঞান হইল, ক... দে... প্রাতঃ-সূর্য্যকিরণে পৃথিবী হাসিতেছে, এবং সে ... কাহারা কোলাহল করিতেছে। কথার যথা...তন বুঝিতে পারিল যে, তাঁহারা তাহা... ভাই, স্বজন। তাঁহারা ... ...পেক্ষা মানস-পূজা ... অধিক। তাই বলি, বাহ্য-পূজা ছাড়ি... উদর... ও, মানস-পূজায় মন দাও। নচেৎ ভরা-ডুবির বিলম্ব নাই।

অনুসন্ধান-সমিতির বিবরণী।

প্রতারণা-প্রবঞ্চনা।

জুয়াচোর-দল,

ইতিমধ্যেই পূজার-বাজারের হাণ্ডবিল-বিজ্ঞাপন জারি করিতে আরম্ভ করিয়াছে; সুলভে—গাধার দামে হাতী দিতে, এক টাকায় পাঁচ টাকার মাল উপহার দিতে, এইরূপ কতই কি প্রলোভন-পূর্ণ বিজ্ঞাপন আজকাল বিলি হইতে আরম্ভ হইয়াছে। যাইহোক, সে সকল বিজ্ঞাপনের নাম আর এখন করিব না। মোটের উপর যেখানে যতই প্রলোভন, সেইখানেই তত প্রতারণা, এই যেন সকলের স্মরণ থাকে।

নবাব

বা Tincture of tobaco এই নাম দিয়া আজকাল কাগজে একটা বিজ্ঞাপন বাহির হইয় থাকে। আগে 'হ্যারিংটন কোম্পানী' এই নাম দিয়া ঐ বিজ্ঞাপন বাহির হইত; মধ্যে 'হ্যারিংটন'-রূপী মহেন্দ্রনাথ মিত্র নামক এক ব্যক্তি মৃজ্জাপুর ষ্ট্রীট হইতে উহা বিক্রয় করিত। কিন্তু, তাহার নানারূপ প্রতারণার কথা ক্রমে প্রকাশ হওয়ায়, সে চম্পট দেয়। এক্ষণে, আবার আর একদলের সহিত যোগ দিয়া, সে আবার বাহির ...দের মত হইয়াছে। তাই আবারও এই কথা বলিতে ...ংচারটা ...ক এবং বিক্রেতাই ব... 'চলিবে। আজ যে ... কাহার কাহার কষ্ট-বোধ হইতেছে, তাহারা জানে, যদি সাধারণে অর্থাৎ অধিকাংশ প্রজা সেই কষ্ট উপলব্ধি করিতে পারে, তবে সে আইন-কানুন আর থাকিবে না। তাহারা জানে, আজ বিলাতের ১৫ আনা লোক যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিবে, কালই তাহা কার্য্যে অনুষ্ঠিত

অনুসন্ধান।

অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র।

৫ম খণ্ড] ৩১এ ভাদ্র, ১২৯৮। [৪র্থ সংখ্যা।

"আধ্যাত্মিক কৌতুক।

সাগর হইতে আসি' মরুভূমি মাঝে পশি
তৃষিত-পরাণে খুঁজি শীতল সলিল;
ত্যেয়াগিয়া উপবন করি পাষাণ খনন
দেখি যদি পাই তাহে বায়ু সুবিমল!
মুদিয়া দুইটি আঁখি আঁধার ঘরেতে দেখি
কোথায় রয়েছে মোর লুকান রতন;
ভক্তি-পথ উপেক্ষিয়া বিজ্ঞানের সাথে গিয়া
অজ্ঞানে ডুবিয়া করি ব্রহ্ম-নিরূপণ.—
দেখ দেখি কৌতুক কেমন!"

কাব্য ও কামিনী।

কাব্য ও কামিনী একই পদার্থ। কাব্যের প্রধান গুণ সরলতা, কামিনীরও প্রধান গুণ সরলতা। কাব্য যত সরল হইবে, যত সরলভাবে ...বির মনের ভাব অকপটে প্রকাশ করিবে, স...ঠকের পক্ষে ততই আদরের জিনিস; কামি-প... ...ভিতর আবার ... হইবে, যত অকপট ও করিতে হয়, তিনি যেটী ...র, কবিতা যত জটিল, তাহাকেই বেশি সুন্দরী ... ক...কর পক্ষে, প্রণয়ীর ...বাধ জনকের সাধ্যায়ত্ত নহে ...ষ্ট। কাব্যের ভিতর পা... কবিতা-রসমাধুর্য্যং কবি...র, কামিনীর অন্ত...নী-ভ্রূকুটী-ভঙ্গি ভবো... ...কিতে পারে; কিন্তু প...ক অপেক্ষা কবিতার ... ...ন্দর্য্য উপভোগ করেন তি...য়ায় তাহা বুঝিবার উপায় নাই। যাহা বুঝিতে পারিলাম না, তাহার ভাল-মন্দ কি জানিব? তাই বলিতেছি, এতদুভয়ের সার-গুণ সরলতা। অনেক ভাল কবিতা এই সরলতা-বিহীন বলিয়া সদ্ভাব-পূর্ণ হইয়াও অনাদৃতা, অনেক কামিনীও বিশুদ্ধ-স্বভাবা হইয়াও কপটতা-নিবন্ধন অনাদৃতা। যার যে কবিতা সরল, যে কামিনী সরল, তাহার আদর সর্ব্বত্র। আর কোন গুণ না থাকিলেও এই একমাত্র গুণে উভয়ের সর্ব্বত্রই আদর।

কবিতায় গাম্ভীর্য্য অনেকে ভালবাসেন, বণিতারও গম্ভীরা-মূর্ত্তি অনেকের আমোদজনক। আমার মতে সময় বুঝিয়া কখন কখন গম্ভীর-ভাব ভাল বটে, কিন্তু সর্ব্বদা গম্ভীরা-মূর্ত্তি ভাল লাগে না। সেইজন্যই বোধ হয়, মিণ্টন অপেক্ষা বাইরণ ভাল লাগে; "মেঘনাদ বধ" অপেক্ষা "কবিতাবলি" ভাল লাগে। আর কামিনীরও গম্ভীরা-মূর্ত্তি অপেক্ষা তাঁহার সরল সরস ভাব ভাল লাগে। যে কাব্য রসাত্মক-বাক্য-বিহীন, তাহা কাব্যই নহে; আর সংসারে থাকিয়া অপ্রিয়বাদিনী কামিনীর সহবাসে বাস ও বনবাস সমান কথা।

অলঙ্কার উভয়েরই প্রিয় পদার্থ। কবিতা অলঙ্কার-প্রিয়, কামিনীও তথৈবচ। কবিতার দুই রকম অলঙ্কার,—অর্থালঙ্কার ও শব্দালঙ্কার; কামিনীরও দুই প্রকার অলঙ্কার,—অর্থালঙ্কার ও শব্দালঙ্কার। শব্দালঙ্কার অপেক্ষা অর্থালঙ্কারের

মর্য্যাদা বেশি। অনুপ্রাস, যমক প্রভৃতি অপেক্ষা রূপক, মালোপমা প্রভৃতির যেমন আদর অধিক, তেমনি মল, পাঁইজোর প্রভৃতি অপেক্ষা হীরার বালা ও মুক্তার মালা প্রভৃতির আদর বেশি। আজ-কালকার কবিতায় শব্দালঙ্কার বড় কম, এক্ষণকার কবিরা, শব্দালঙ্কারকে একপ্রকার ঘৃণার চক্ষে দেখেন, নাক বাঁকাইয়া বলেন,—"Alliteration's Artful Aid"; আজকালকার বনিতারাও আর বড় মল-চুটকি-পাঁইজোর পরিতে চাহেন না। অনেকে সৌখিনভাবে বলেন,—মলে পায়ে কড়া হয়, দাগ পড়ে। অর্থালঙ্কারের গৌরব সকল সময়েই অধিক,—তবে অর্থালঙ্কার ব্যবহার করা সকল কবির কর্ম্ম নহে। কবি যত বড় হইবেন, অর্থালঙ্কার তত সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর হইবে; আর কবি যত কাঁচা হইবেন, অর্থালঙ্কারে তত দোষ লক্ষিত হইবে। কালিদাস বা সেক্ষপিয়ারের কাব্যে অর্থালঙ্কার বহুল পরিমাণে বর্ত্তমান, অথচ তাঁহাদের কবিতায় অলঙ্কার-দোষের লেশমাত্র নাই। কামিনীর পক্ষেও অর্থালঙ্কার সেইরূপ। যিনি যত অর্থশালিনী, তাঁহার অলঙ্কার ততই মূল্যবান; আর গরিবের মেয়ের দামী গহনা পরিতে সাধ হইলেই কেমিকেল-সোণা ও ঝুঁটা পাথরের গহনা পরিয়া সাধ মিটাইতে হয়। অনেক কাব্যেও এই কেমিকেল-সোণা ও ঝুঁটা পাথর, অনেক কামিনীতেও কেমিকেল-সোণা ও ঝুঁটা পাথর। ভাবের স্ফূর্ত্তির জন্য কবিতায় অলঙ্কারের সৃষ্টি, রূপের চটক বাড়াইবার জন্য কামিনীর অলঙ্কারের প্রয়োজন। যে কবিতা স্বভাব-সুন্দর, তাহাতে অলঙ্কার প্রয়োজন হয় না, "কিমপিহি মধুরাণাং মণ্ডনৈরাকৃতিনাং।" যে কামিনী আপনা-আপনিই সুন্দরী, তাঁহার আবার অলঙ্কারের দরকার কি? তবে সে কবিতাও বড় কম, সে কামিনীও বড় বিরল।

কবিতা দুই প্রকার—গদ্যময়ী ও পদ্যময়ী। কিন্তু গদ্যে অপেক্ষা আমরা পদ্যে কবিতা পড়িতে ভাল-বাসি। গদ্যে-পদ্যে উভয়েই সমান ভাবই প্রকাশ হয়। তবে গদ্যে মিল নাই, পদ্যে মিল আছে। আমরা এই মিলনটুকু বড় ভালবাসি। কামিনী সদ্ভাব-সম্পন্না, বিশুদ্ধ-স্বভাবা হইয়াও একাকিনী বাস করিতে চাহেন, তাহাই করুন; কিন্তু আমরা চাহি যে, পাঁচজনের সঙ্গে একত্র থাকিয়াও সেই সদ্ভাব—সেই বিশুদ্ধ-সদ্ভাব থাকে। এ বিষয়ে বিলাতী ও দেশী বনিতা ও কবিতার বড় সাদৃশ্য দেখিতে পাই। বিলাতি কামিনী পাঁচ জনের সহিত একত্র থাকিতে মোটেই চাহেন না। একলা একলা থাকিবেন, আর আপনার গণ্ডা বুঝিবেন। আর, আমাদের দেশী কামিনীরা শাশুড়ী, ননদ, জা প্রভৃতি পাঁচজনের সহিত একত্র থাকিতে বড় ভাল-বাসেন। ইংরাজী কবিতাতে মিলের ভাগ কম, মিল অপেক্ষা ব্ল্যাঙ্কভার্স বেশি, আবার ব্ল্যাঙ্ক-ভ্যার্স অপেক্ষা গদ্যের সমধিক উন্নতি। বিলাতি কবিতার আদর্শ-ভূমি সেক্ষপিয়ারের কাব্য-নিচয়ে দেখুন। সেক্ষপিয়রের প্রথম বয়সের নাটকে মিল (rhyme) যত বেশি; যত বয়স পাকি আসিয়াছে, কাব্যে হাত পাকিয়া আসিয়া ক্রমে ব্লাঙ্কভ্যার্স—পরে গদ্যের ভাগ ত বাড়িয়াছে। আমার বোধ হয়, ইংরাজ-জাতির স্বাভাবিক প্রবৃত্তি-বশতঃই ইংরাজী গদ্য অত্যন্ত উন্নতি লাভ করিয়াছে—এমন গদ্য বুঝি আর কোন ভাষায় নাই! আর, আমাদের নিজের কথা, আমাদের কামিনীরা যেমন পাঁচজনা জুটিয়া একত্র থাকিতে ভালবাসেন, আমাদের কবিতাতেও তেমনি পয়ার, ত্রিপদী, চৌপ[illegible] তোটক প্রভৃতি ক[illegible] অসংখ্য প্রকারই [illegible] [illegible]রণ আ[illegible] একটী করিতে হইলে [illegible]রা লি[illegible] কথার বি[illegible]পর একটী [illegible]জা ভাব্[illegible]ও সেইরূপ পাঁর[illegible] কামিনীদে[illegible] সে জ[illegible] কখনও কি মি[illegible] তাকাইলে [illegible]ন, হয় [illegible]আমাদের কামি[illegible]য়া লাগিয়া [illegible]ব্য নীরাও[illegible]ইয়াছেন, [illegible] স্বাতন্ত্র-প্রিয় হ[illegible] কবিতা[illegible]মেলো হই[illegible] তেমনি এলো

যাইতেছে। এখন আর সে পুরাতন বনিয়াদী গৃহস্থালিও নাই, সে ভারতচন্দ্রের কবিতার মত কবিতায় মিলও নাই। অনেক স্থলে কষ্ট-সৃষ্ট করিয়া মিলাইতে হয়। সে কবিতাতেও হয়, কামিনীতেও হয়। সে কষ্ট-কল্পনা দেখিলেই বুঝা যায়। সে সংসারেও সুখ নাই, সে কবি-তাতেও আমোদ নাই।

কাব্য ও কামিনীর সৌন্দর্য্য চির-প্রসিদ্ধ! সুন্দর কাব্য ও সুন্দরী স্ত্রী চিরদিনই অতি প্রীতি-কর জিনিষ। সে সৌন্দর্য্য কিন্তু কাব্য ও কামিনী ইহারা জানিতে পারে না। কাব্য সুন্দর হউক বা কুৎসিত হউক, কাব্যের তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নাই; কামিনীও সুন্দরী হউন বা বা কুরূপাই হউন, তিনি নিজে তাহা কিছু মনে করেন না। তবে ভাবগ্রাহী পাঠকের কাছে কবিতার সৌন্দর্য্যের সমাদর, আর প্রিয়জনের কাছে কামিনীর সৌন্দর্য্যের মর্য্যাদা। "প্রিয়েষু সৌভাগ্যফলা হি চারুতা" একথা ভাল কামি-নীও বলিবেন, কবিতাও বলিবেন। এ সৌন্দর্য্য-বোধ উভয় স্থলেই স্বয়ং কবির ঠিক হয় না। আমি কবি, অনেকগুলি কাব্য লিখিলাম, ভাল-মন্দ দুইই আছে, আমাকে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, ইহার মধ্যে কোন্‌খানি সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর, আমি হয় ঠিক করিয়া বলিতে পারিব না, না হয় পাঁচজনে হয়ত যেখানিকে অপকৃষ্ট বলিয়া জানেন, আমার চক্ষে সেইখানি সর্ব্বাঙ্গীন সুন্দর বলিয়া পরিচিত হইবে। কামিনীর পক্ষেও তাহাই। পিতার কাছে সকল কন্যাই সমান সুন্দরী। তাহাদের ভিতর আবার যদি পিতাকে বিচার করিতে হয়, তিনি যেটী অপেক্ষাকৃত কুৎসিত, তাহাকেই বেশি সুন্দরী বলিবেন। সৌন্দর্য্য-বোধ জনকের সাধ্যায়ত্ত নহে; সেইজন্যই বলে,—"কবিতা-রসমাধুর্য্যং কবি বেত্তি ন তৎকবি। [illegible]নী-ভ্রূকুটী-ভঙ্গি ভবো বেত্তি ন ভূধর॥" স্বয়ং [illegible]ক অপেক্ষা কবিতার মাধুর্য্য ও কামিনীর [illegible]ন্দর্য্য উপভোগ করেন তিনিই, যিনি তাহাকে নিজের প্রিয় বস্তু বলিয়া পরিগ্রহ করিয়াছেন। কবিতার ও কামিনীর সৌন্দর্য্য নানা-রূপে আমা-দের চক্ষের সমক্ষে উপস্থিত হয়। অনেক কবিতা বেশ ভাবপূর্ণ, কল্পনার ছটায় সমুজ্জ্বল, চক্ষু ঝলসিয়া যায়; কিন্তু সে কবিতা পড়িয়া মন চঞ্চল হয়, হয়ত মনে অনেক কুৎসিত-ভাব আনয়ন করে। আবার অনেক এমন কবিতা আছে, যাহাতে মনে পবিত্র বিশুদ্ধভাব আনয়ন করে, মন নির্ম্মল-ভাবে পরিপূর্ণ হয়। এমন অনেক সুন্দরী আছেন, যাঁহাদের রূপের ছটায় চক্ষে ধাঁদা লাগে, মন গলিয়া যায়; কিন্তু আবার সেই সঙ্গে মনকে একটু চঞ্চল করায়, মনে কলুষিত ভাবের উদয় করায়। আবার অনেক সুন্দরী আছেন, যাঁহাকে দেখিলে স্বতঃই মনে বিশুদ্ধ সদ্ভাবের উদ্রেক হয়, ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতে আপনা হইতেই প্রবৃত্তি হয়। যে কবিতায় মনে বিশুদ্ধভাব আনয়ন করায়, সেই কবিতাই যথার্থ সুন্দর; আর, যে কামিনীকে দেখিলে মনে ভক্তির উদ্রেক হয়, নির্ম্মলভাবের উদয় হয়, তিনি যথার্থ সুন্দরী।

কবিতা ও বনিতা উভয়েই বড় স্বাধীনতা-প্রিয়। কবিতা কবি-দ্বারা সৃষ্ট, পরিপুষ্ট ও পরি-স্ফুট হইয়াও স্বাধীন। কবি যত বড়ই হউন না, তিনি যখন তখন যাহা তাহা লিখিলেই কবিতা হয় না। কবিতা তাঁহার আজ্ঞাধীন নহে। উপরোধ-অনুরোধে দায়গ্রস্থ হইয়া কবিতা হয় না, সে "quit rent ode" দেখিলেই চেনা যায়। কামিনীও পতি-দ্বারা আদৃতা ও পালিতা হইয়াও তিনি স্বাধীনা; তিনি স্বামীকে ভালবাসেন, ভক্তি করেন। কিন্তু কবিতার ন্যায় বনিতার ভালবাসা ও ভক্তির উপর স্বামীর জোর-জবরদস্তি নাই; উপরোধ-অনুরোধে আর যাহাইহউক, ভক্তি-ভাল-বাসা হয় না। সে জোর-জবরদস্তির মিলন ও উপ-রোধ-অনুরোধ পতি-পত্নীভাব দেখিলেই বুঝা যায়।

মন মজাইতে এই দুইয়ের মত আর কিছুতে পারে না। যিনি ছেলে-বেলা হইতে কবিতাপাঠ ও কাব্য-রসাস্বাদে মজিলেন, তাঁহার চিরদিন

সংসারের সমস্ত কষ্ট। তাঁহার সাংসারিক উন্নতি হওয়া দুর্ঘট। তিনি লিখিবেন কবিতা ভাবিবেন কবিতা, তাঁহার জীবন একেবারে কাব্যময়। তিনি স্বপনে-জাগরণে কবিতা ভাবেন, সংসারের অন্নবস্ত্র-কষ্ট মনে স্থান পায় না, পুত্র-কলত্রের কষ্ট মনে হয় না। আবার যিনি কামিনীতে মজিয়াছেন, তাঁহার দুর্দ্দশা ততোধিক। তাঁহার উন্নতির পথ অবরুদ্ধ। তিনি সংসারে অশেষ দুঃখ ভোগ করেন। কবির দুঃখের কথা চির-প্রসিদ্ধ। কামিনী-প্রিয় লোকের কষ্টের কথাও সকলেই জানেন। একজন কবি বলিয়াছেন,—যাঁহার ঘরে প্রখরা স্ত্রী, তিনিই সংসারে বড় বড় কার্য্য করিতে পারেন। কথাটা ঠিক কিনা জানি না; তবে প্রায়ই দেখিতে পাই, যিনি কাব্যে ও কামিনীতে মজিয়াছেন, তাঁহার দ্বারা সংসারের উন্নতি হয় না। দুইটীই বড় ভাল জিনিষ। কামিনী ভাল হইলে বাস্তবিকই "Earth's noblest thing a woman perfected"; ভাল কবিতাও জগতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট জিনিস।

সাধু কবির পক্ষে জগৎ কাব্যময়। যেদিকে দেখেন, সেই দিকেই কাব্য। নদীর বেগে, পর্ব্বতের উচ্চতায়, সূর্য্যের কিরণে, অরণ্যের বিজনে, সমস্তই কাব্য। পাখি ডাকিতেছে, মেঘ গর্জ্জিতেছে, বৃষ্টি পড়িতেছে, ঝড় বহিতেছে, সে সকলই কাব্যের বিষয়। শিশুর রোদনে, বন্দীর ক্রন্দনে, তেজস্বীর আস্ফালনে, দুর্ব্বলের নির্য্যাতনে, কাব্য ভিন্ন আর কিছুই দেখেন না। আবার এই সকল কাব্যের ভিতর দিয়া যে কবি এই চরাচর জগৎরূপ মহান্ কাব্য রচনা করিয়াছেন, তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করেন। যিনি প্রকৃত সাধু, তিনি এ সংসারে একমাত্র কামিনী দেখেন জননী; যেখানে যাঁহাকে দেখেন, তাঁহাকে জননী-বোধে ভক্তি করেন, ভাল বলেন, স্নেহ করেন। আবার যিনি বেশি ভাবুক, তিনি সকলের ভিতর সেই শ্রেষ্ঠা কামিনী—মাতার মাতা জগতের জননীকে দেখিতে পান। তাঁহাদেরই জীবন সার্থক।

অদৃষ্ট।

একবিংশ অধ্যায়।

জয়গোপালের ভঙ্গী-স্নেহ।

জয়দুর্গা অত্যন্ত অনিচ্ছাপূর্ব্বক স্বামী-গৃহে বাস করিতে লাগিলেন। পরের বাটীতে নিজের ইচ্ছাপূর্ব্বক যাওয়া যায়, কিন্তু আসিবার সময় গৃহস্বামীর বিনা অনুমতিতে আসা যায় না। পুরুষের পক্ষে এই নিয়ম। স্ত্রীলোকের পক্ষে যে নিয়ম আছে, তাহা ইহা অপেক্ষাও শক্ত। স্ত্রীলোক এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে হইলেও অনুমতি চাই; তথা হইতে প্রত্যাগমন করিবার সময়েও অনুমতি চাই। জয়দুর্গা বিশেষ পরের বাটীতে যান নাই। তিনি তাঁহার নিজ-বাটীতেই গমন করিয়াছেন। সেই বাটীতে তাঁহার যৌবন, প্রৌঢ় ও বার্দ্ধক্য সমস্তই কাটাইতে হইবে, সম্ভবতঃ সেইখানেই তাঁহার পঞ্চভূতের দেহ পঞ্চভূতে মিশিয়া যাইবে। সুতরাং সে স্থানে থাকিতে যৎপরোনাস্তি অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি সেখান হইতে পিত্রালয়ে যাইবার প্রস্তাব করিতে পারেন না। অন্য লোকে তাঁহাকে যত ভাল বাসুক না বাসুক, তিনি কাহাকেও ভাল বাসিতেন না—কেবল এক ব্যক্তি ছাড়া; সে ব্যক্তি—**শ্রীমতী জয়দুর্গা দেবী।** পিতা, মাতা, শ্বশুর, শাশুড়ী,—সকলেই তাঁহার চক্ষে সমান। এ সমস্ত উৎপাত অসহ্য হইলেও সহ্য করিতে হইবে, সুতরাং ইহাদিগকে কিছু বলিতে পারেন না। সুখদা ও মহামায়া তাঁহার চক্ষের বালি। পৃথিবীর মধ্যে শ্রীমতী জয়দুর্গা ব্যতীত তিনি আর একটী লোককে কিঞ্চিৎ স্নেহ করিতেন: সেটি জয়গোপাল। জিন্তু জয়গোপালকে কিরূপ স্নেহ করিতেন? আর, সেরূপ মনের ভাবকে স্নেহ বলিলাম কেন? তাহার কারণ এই, মনের সহিত মনোমিল হইলে যেরূপ আত্মীয়তা হয়, জয়দুর্গার স্নেহ সেরূপ নহে। লোকে একটা কুকুর, বিড়াল, অথবা

পাখী পুষিলে তাহাকে যেরূপ স্নেহ করে, জয়গোপালের উপর জয়দুর্গার স্নেহ সেইরূপ। কিন্তু তাই বলিয়া পাঠকবর্গ মনে করিবেন না যে, জয়দুর্গা এরূপ মনোভাব জয়গোপালকে জানাইতেন, বা যাহাতে জানিতে পারেন, তাহার কোন কারণ দেখাইতেন।

আপাততঃ জয়দুর্গা কি ছলে পিত্রালয়ে পুনর্ব্বার গমন করিবেন, তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যে যে কারণবশতঃ তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা, জয়গোপালের নিকট তাহার এরূপ অনেক কারণের উল্লেখ করিলেন। কিন্তু তথাপি "ফয়গোপাল" "ফয়দুর্গাকে" পিত্রালয়ে যাইবার অনুমতি দিলেন না। এস্থানে একটী অপ্রাসঙ্গিক কথা কহিতে হইতেছে। জয়গোপালের সহিত জয়দুর্গার বিবাহ হওয়া অবধি জয়দুর্গা নিজ-নামের প্রথমার্দ্ধ-উচ্চারণ-ক্ষমতা হইতে বঞ্চিতা হইলেন। স্ত্রীলোকদিগকে নামের পরিচয় প্রায়ই দিতে হয় না। অতি অল্প লোকেই তাহাদিগকে নাম ধরিয়া ডাকে। আজকাল নাম ধরিয়া ডাকার প্রথা হইতেছে বটে, কিন্তু সে প্রথা এখন পর্য্যন্ত সহরের বাহিরে যায় নাই। তবে অনেক পল্লীগ্রামের লোক সহরে বাস করে। তাহারা যখন পূজাপার্ব্বণ-উপলক্ষে স্ব স্ব পল্লীগ্রামে গমন করে, তখন উক্ত প্রথার কিঞ্চিৎ সূত্রপাত করিয়া আইসে। তাহাও গরিবের ঘরে নয়। পল্লীগ্রামে যাহারা ধনী বলিয়া পরিগণিত, এরূপ নাম ধরিয়া ডাকিবার সূত্রপাত তাহাদিগের ঘরেই প্রথমে হইয়া থাকে। নচেৎ অদ্যাপি সাবেক নিয়ম প্রচলিত আছে। অর্থাৎ "ছোট", "বড়" অথবা বাপের বাড়ীর গ্রামের নামীয় বউ—যথা "জনাইয়ের বউ", "শ্রীরামপুরের বউ"—ইত্যাদি নামে স্ত্রীলোকেরা প্রায়ই অভিহিত হইতে থাকেন। একটী সন্তান হইলে এই সমস্ত নাম চাপা পড়িয়া যায়। ইষের মূল ঘ্রাণে যেরূপ সর্প পলায়ন করে শুনা গিয়া থাকে, একটী সন্তান হইলেও সেইরূপ স্ত্রীলোকের পূর্ব্বেকার নাম কোথায় চলিয়া যায় তাহা বলা যায় না। তখন বউ "খোকার মা" বা "খুকীর মা" হইয়া পড়েন। কিন্তু শেষোক্ত উপাধি অর্থাৎ 'খুকীর মা' প্রায় শুনা যায় না। লোকে 'খোকার মা' বলিয়াই ডাকে। সুতরাং পুত্র কেবলমাত্র মাতার পুন্নাম-নরকত্রাতা নহেন, কুনাম বা বন্ধ্যা-নাম-নরকের ত্রাতাও বটেন। জয়দুর্গাকে কাহারো নিকট নিজনামের পরিচয় দিতে হইত না বটে, কিন্তু তিনি মাঝে মাঝে রাগ করিয়া নিজের নাম নিজেই জাহির করিতেন। যদি কেহ 'জয়দুর্গা জয়দুর্গা' বলিয়া একাধিবার তাঁহাকে ডাকিত, তিনি রাগ করিয়া কহিতেন,—"কি উৎপাত! একশবার 'ফয়দুর্গা' 'ফয়দুর্গা' কেন? এই ত 'ফয়দুর্গা' এখানে আছে?"

এক দিবস সুখদা ও জয়গোপালের কথোপকথন হইতেছে। সুখদা জয়গোপালকে প্রফুল্লচিত্ত দেখিয়া কহিলেন,—"দাদা, তুমি আমাকে অনেক দিন থেকে একটা ডবল-টিনের বাক্স দেবে বলেছিলে; কিন্তু আজ পর্য্যন্ত দিলে না। চাইলেই বল, টাকা হাতে নেই। এই তো সে দিন ৪০৲ টাকা পেয়েছ, এইবার কিনে দাও না কেন? তোমার সঙ্গে আমার সঙ্গে দেখা হওয়া দুষ্কর। যদি দৈবযোগে এবার হলো, আর বিশেষ তোমার হাতেও টাকা এসে পড়েছে, এইবারই দাও না কেন?"

জয়গোপাল।—সুখদা, দিদি, আমি তোমাকে যেখানে একবার বলেছি একটী বাক্স দেবো, সেখানে দেবোই দেব; আজ না হয় দু'দিন পরেই দেব।

সুখদা।—আর আমার কবে আসা হবে, তার ঠিক নেই। দিতে হয় তো এইবারই দাও; নয় কোথায় পাওয়া যায় বোলে দাও, আমি নিজেই কিনে নেব।

জয়দুর্গা এই কথোপকথন অন্তরালে থাকিয়া শুনিতেছিলেন। টিনের বাক্সের নাম শুনিয়া

তিনি মনে করিলেন, আট-আনা দশ-আনায় যে টিনের বাক্স পাওয়া যায়, তাহারই উল্লেখ হইতেছে। কিন্তু সুখদা যে নিজের গহনা-পত্র রাখিবার জন্য চব্‌সের (Chub's) চাবিওয়ালা একটা বড় ক্যাশবাক্স চাহিতেছেন এবং জয়গোপালও যে সেইরূপ একটী বাক্স দিবেন অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাহা টের পান নাই ; বস্তুতঃ ক্যাশবাক্স বলিয়া যে একরূপ বাক্স আছে ও তাহার যে এত দাম অধিক, জয়দুর্গা তাহার কিছুমাত্র অবগত ছিলেন না। সুতরাং যখন সুখদা কহিলেন,—"নয় কোথায় পাওয়া যায়, বোলে দাও, আমি নিজেই কিনে নেব" ; তখন জয়দুর্গা হাসি সম্বরণ করিতে পারিলেন না। মনে মনে ভাবিলেন,—এরূপ বদ্ধ পাড়াগেঁয়ে কি আজও পর্য্যন্ত আছে যে, একটা টিনের বাক্স কোথায় পাওয়া যায় তাহা বলিয়া দিতে হইবে, নতুবা খরিদ করিতে পারিবে না? জয়দুর্গার মনে এইরূপ ভাবের উদয় হইবার অনতিবিলম্বে সুখদা যাহা জিজ্ঞাসিলেন শুনিয়া অবাক হইলেন। সুখদা জিজ্ঞাসিলেন,—"দাদা ক'-আনা কোরে ইঞ্চি বলেছিলে ?"

(জয়দুর্গা স্বগতঃ—"ইঞ্চি আবার কি ?")

জয়গোপাল।—সেটা আমার ঠিক মনে হচ্ছে না। কিন্তু তুমি যত বড় বাক্সটী চাও, তা ৩০৲ টাকার কমে পাওয়া যা'বে না।

(জয়দুর্গা হতবুদ্ধি। টিনের বাক্সর এত দাম !)

সুখদা।—বেশ, ৩০৲ টাকার বেশী নয় তো ? সেদিন তো তুমি ৪০৲ টাকা পেয়েছ। তা থেকে কেন আমায় একটা বাক্স দাও না ?

জয়গোপাল লজ্জায় নম্রমুখ হইয়া বলিলেন,—"দিদি, একটা কিন্‌লে তো চল্‌বে না। দু'টা না কিন্‌লে হবে না। দুটা কিন্‌তে পারি, এত টাকা তো আমার কাছে নেই ?"

সুখদা।—ও দাদা, তোমার পায়ে পড়ি—আমার বাক্সটা আগে আমাকে এই টাকা থেকে দাও। আমি একবার বাড়ী গেলে আর আস্‌তে পারি কি না সন্দেহ। আমি এইবারে যে কয় দিনের কথা কয়ে এসেছিলাম, তার অধিক হয়ে গিয়েছে। হয় তো দু-এক দিনের মধ্যেই আমাকে নিয়ে যাবার জন্যে লোক আস্‌বে। এবার গেলে আর শিগ্‌গির আস্‌তে পাব না, তা নিশ্চয়। তাই বল্‌ছি, এইবারেই আমার বাক্সটী দাও। বউ তো বাড়ীই থাক্‌বেন, তাঁকে যখন তখন কিনে দিতে পার্‌বে।

জয়গোপাল সম্মত হইলেন। কহিলেন,—"আজই আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি। ভাত খেয়েই চিঠি লিখে দেব।"

সুখদা।—না দাদা, তা' হলে তুমি ভুলে যাবে।

জয়গোপাল।—না না, দিদি, ভুলবো না।

সুখদা।—তুমি ভুল্‌বেই ভুল্‌বে।

জয়গোপাল।—ভুলবো না, ভুলবো না।

সুখদা।—তবে এক্ষুণি লিখ্‌তে তোমার আপত্তি কি ?

জয়গোপাল।—দোয়াত, কলম, কাগজ কোথায় ?

সুখদা।—সমস্তই আমার কাছে আছে।

এই বলিয়া তিনি দোয়াত, কলম, কাগজ ও একখানি টিকিট-ছাপান খাম জয়গোপালের সম্মুখে ধরিয়া দিলেন।

জয়গোপাল মনে করিয়াছিলেন, জয়দুর্গার সহিত পরামর্শ করিয়া চিঠি লিখিয়া দিবেন। যদি জয়দুর্গা বাক্সটি দিতে সম্মত হন, তবে দিবেন ; নচেৎ লিখিয়া দিবেন, যেন এক্ষণে সেরূপ বাক্স কলিকাতায় পাওয়া যায় না, এরূপ জবাব আইসে। কিন্তু সুখদা জয়গোপালকে সে অবকাশ দিলেন না। জয়গোপাল কাগজ কলম লইয়া কিঞ্চিৎ ভাবিলেন ; ভাবিবার সময় তাঁহার মুখচক্ষু কিঞ্চিৎ মলিন বলিয়া সুখদার মনে হইতে লাগিল। জয়গোপাল মাথা চুলকাইয়া লিখিতে গেলেন,—যেন জবাবে আইসে যে, সেরূপ বাক্স এক্ষণে পাওয়া যায় না।

এই স্থির করিয়া জয়গোপাল চিঠি লিখিতে

আরম্ভ করিলেন। তখন সুখদা কহিলেন,—"দাদা, তুমি যাহাই লেখ, আমি পরেশকে দিয়া না পড়াইয়া চিঠি পাঠাইয়া দিব না।" পরেশ, জয়গোপাল ও সুখদার খুল্লতাত ভ্রাতা। তিনি বি, এ, পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

সুখদার কথা শুনিয়া জয়গোপাল ফাঁপরে পড়িলেন। সুতরাং অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহাকে বাক্স পাঠাইতে লিখিতে হইল।

সুখদা যথার্থই পরেশকে দিয়া পত্রখানি পড়াইয়া বন্ধ করিয়া নিজের দাসীর দ্বারা ডাকঘরে পাঠাইয়া দিলেন।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

ভগ্নীস্নেহের ফল।

"বলি, আজ দুই ভাই-বোনে কি পরামর্শ হচ্ছিল ?"—এই কথা জয়দুর্গা স্বামীকে বিরলে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। কথা কহিবার সময় জয়দুর্গার মুখখানিতে একটু দুষ্ট-হাসির আবির্ভাব হইল।

জয়গোপাল বলিলেন,—"কেন ? তুমি কি জান না, সুখদা অনেক দিন থেকে একটা টিনের বাক্স আমার কাছে চাচ্ছিল, তাই তা'রি একখানা চিঠি লিখে দিলাম।"

জয়দুর্গা অপেক্ষাকৃত গম্ভীরভাব অবলম্বন করিয়া কহিলেন,—"ভাল, ঠাকুরঝি একটা টিনের বাক্স চাচ্ছে, তাতে তোমার আপত্তি কি ? হদ্দ সাতসিকে-দুটাকা দাম বইত নয় ! তোমার কি এতই দুরবস্থা হয়েছে যে, তুমি ঠাকুরঝিকে একটা টিনের বাক্স দিতে পার না ?"

জয়গোপাল।—কেন পারবো না ?

জয়দুর্গা।—তবে কেন দাও না ?

জয়গোপাল কহিলেন,—"মনে করিয়াছিলাম, দুটা বাক্স এক সঙ্গে কিনে একটা তোমাকে দেব, আর একটা সুখদাকে দেব। তা' সুখদা যে জিদ করে ধর্‌লে, তাকেই আগে দিতে হলো।"

জয়দুর্গা।—ত্রিশ টাকা, ত্রিশ টাকা দামের কথা শুন্‌ছিলাম যে ? বাক্সটার দাম কি ত্রিশ টাকা ? সেটা তো টিনের বাক্স ; তাতে কি রূপো-সোণা বসানো আছে ?

জয়গোপাল।—তাতে রূপোও নেই, সোণাও নেই ; কিন্তু রূপো-সোণা রাখ্‌বার জন্য।

জয়দুর্গা।—সে কেমন বাক্স একবার ভেঙ্গেই বল না ? ত্রিশ টাকা একটা টিনের বাক্সর দাম, এ তো আমি কখনও শুনিই-নি !

জয়গোপাল বলিলেন,—"সচরাচর লোকে তাকে ডবল টিন বলে। বস্তুতঃ সে বাক্স টিনের নয়, লোহার। লোকে যাকে কথায় কথায় টিন বলে, সে টিন নয়—টিনে কলাই করা লোহা। আদত টিনকে বাঙ্গালায় রাং বলে ; যা দিয়ে ঠাকুরের সাজ-টাজ প্রস্তুত করে। তাই গলাইয়া লোহার পাতের উপর কলাই করিলে টিন হইল। সচরাচর যে টিনের বাক্স পাওয়া যায়, তাহাতে লোহার পাতলা পাতের উপর টিনের কলাই। সুখদা যে বাক্স চাহিতেছে, তাহার লোহার পাত এত পুরু যে, একজন লোক তাহার উপর দাঁড়াইলেও নোয় না।"

জয়দুর্গা।—যদি পুরু লোহার পাতের উপর কলাই করা হবে, তবে ত্রিশ টাকা দাম হবে কেন ?

জয়গোপাল।—ত্রিশ টাকা দাম কেবল সে টিনের জন্য নয়। সে বাক্সর যে কল থাকে, তাহা কেহই খুলিতে পারে না। তাহার প্রত্যেক বাক্সর ভিন্ন ভিন্ন কল, ও সেই কল খুলিবার দুটী বই চাবি প্রস্তুত করে না ; দুটীই—যে খরিদ করে, তাহাকেই দেয়। সুতরাং আর কোন চাবিতে তাহা খোলা যায় না।

জয়গোপাল যতই বলিতে লাগিলেন, জয়দুর্গার মুখাকাশে ততই মেঘের সঞ্চার হইতে লাগিল। কথাও শেষ হইল ; জয়দুর্গার মুখ বৈশাখমাসের সায়াহ্নের বায়ুকোণের ন্যায় হইয়া উঠিল। তদ্দর্শনে জয়গোপালের হৃদ্‌পিণ্ড ধক্‌ ধক্‌ করিতে লাগিল। দুই তিন মিনিট জয়দুর্গা তথায় চুপ করিয়া থাকিয়া স্থানান্তরে চলিয়া

গেলেন। যাইবার সময় জয়গোপাল বারম্বার কহিতে লাগিলেন,—"যেও না, যেও না; আর একটা কথা শুনে যাও।"

জয়গোপাল মনে করিলেন, কাহারো নিকট হইতে আর কুড়িটী টাকা ধার করিয়া একেবারে দুটা বাক্সর জন্য লিখিয়া দিবেন।

"শুনে যাও, শুনে যাও"—জয়গোপাল এইরূপ দশ-বার বার বলিলেন; জয়দুর্গা না শুনিয়া চলিয়া যাইতে লাগিলেন। জয়গোপাল তথাপি "শুনে যাও, শুনে যাও" বন্ধ করিলেন না। তখন জয়-দুর্গা একটু ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন,—"বল, কি শুন্‌তে হবে?"

জয়গোপাল।—কাছে এস, তবে তো বল্‌বো।

জয়দুর্গা।—ঐখান থেকেই বল; আমার কাণ আছে, শুন্‌তে পাব। মানই নয় গিয়েছে!

জয়গোপাল পালা-জ্বরের রোগীর ন্যায় কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন,—"আমার মাথা খাও, একটু কাছে এস।"

"মাথা কি কেউ কখনো কারু খায়?"—এই বলিয়া, জয়দুর্গা, একটু জয়গোপালের দিকে অগ্র-সর হইয়া থামিয়া, বলিলেন,—"বল, এই তো কাছে এলাম!"

জয়গোপাল কহিলেন,—"তোমার জন্যেও একটা বাক্সর কথা লিখে দিয়েছি। একেবারে দুটাই আস্‌বে।" জয়গোপাল ভাবিলেন যে, অবিলম্বে আর একটী বাক্সর জন্য পত্র লিখিবেন।

জয়দুর্গা।—কাটা ঘায়ে নূনের ছিটে দাও কেন? কথায় কথায় পদে পদে এত অপমান কেন? তুমি যে চিঠি লিখেছ, তাকি আমি শুনি-নি? যখন পরেশ পোড়ে ঠাকুরঝিকে শোনায়, তখন আমি সমস্তই শুনেছি।

জয়গোপাল।—হাঁ, ঠিক বটে! কিন্তু আমি এই যাচ্ছি, এক্ষুণিই চিঠি লিখে দিচ্ছি।

জয়দুর্গা।—আর তোমার চিঠি লিখ্‌তে হবে না। আমার বাক্সও চাই না। আমাকে বাড়ী পাঠিয়ে দাও, এইমাত্র চাই। আমি তোমার বাক্সও চাই না, তোমার মিষ্টি কথাও চাই না। তুমি তোমার ভগ্নী নিয়ে ঘরসংসার কর; আমি যেখান থেকে এসেছিলাম, সেই-খানেই চলে যাই। আবার যদি কারু ব্যামো হয়, ডেকে পাঠিও। আমি ত মেথ্‌রাণী বই নয়! লোকের ব্যামো হলে সেবা-শুশ্রূষা কর-বার সময়ই আমার তলপ হয়! যখন সকলে সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকে, তখন তুমি আর তোমার ভগ্নী—আর কারু দরকার করে না!"

এই কথা কহিয়া ঝম ঝম করিয়া মল বাজাইতে বাজাইতে জয়দুর্গা তথা হইতে রোষভরে চলিয়া গেলেন। জয়গোপাল আবার ডাকিতে লাগি-লেন,—"শুনে যাও, শুনে যাও!" কিন্তু সে কেবল অরণ্যে রোদনমাত্র হইল। জয়দুর্গা আর ফিরিলেন না। বরাবর রন্ধনশালার দিকে গমন করিলেন; কিন্তু রন্ধনশালায় আর না প্রবেশ করিয়া খিড়কীর রাস্তা দিয়া আপনার শয়নাগারে গমন করিয়া দ্বার রুদ্ধ-করতঃ শয়ন করিলেন।

এদিকে জয়গোপাল সাত-পাঁচ ভাবিয়া কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া তিনিও নিজ শয়নাগারে গমন করিলেন। দেখিলেন, কবাট বন্ধ। তিনটী দ্বার দিয়া তাঁহার শয়নাগারে প্রবেশ করিতে পারা যায়। একে একে তিন কবাটের নিকট গিয়া ধাক্কা দিলেন, কোনটিই খুলিল না। "ওগো দুয়োর খোলো, দুয়োর খোলো"—বলিয়া অনেক-ক্ষণ ডাকাডাকি করিলেন। জয়দুর্গা কোন মতে উঠিলেনও না, কবাটও খুলিয়া দিলেন না। জয়গোপালের মনে নানাপ্রকার ভয়ের সঞ্চার হইতে লাগিল। তাঁহার অহিফেনের কৌটা বালিশের নীচে ছিল। জয়দুর্গা কি আফিঙ্ খাইল? অথবা উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিল? এইরূপ ভাবিয়া, তিনি একখানি কুঠার আনিতে গেলেন। মনে করিলেন, আর দু-একবার কবাট খুলিয়া দিবার জন্য মিনতি করিবেন। যদি জয়দুর্গা কবাট খুলিয়া না দেন, তাহা হইলে কুঠার-দ্বারা কবাট ভাঙ্গিয়া ফেলিবেন।

অত্যন্ত প্রয়োজনের সময় দরকারী জিনিষ পাওয়া যায় না। আমি এরূপ দেখিয়াছি, বাম হস্তে একখানি ছুরী রাখিয়া ২।৩ ঘণ্টা সেই ছুরিখানির জন্য লোকে নানাবিধ স্থানে অন্বেষণ করিতেছে। জয়গোপাল অদ্য কুঠার খুঁজিয়া পাইতেছেন না, অথচ কাহারও নিকট চাহিতে পারিতেছেন না। চাহিলে নানাবিধ প্রসঙ্গ উপস্থিত হইবে। অবশেষে যখন কুঠারখানি মিলিল, তখন দ্বিতীয় পরশুরামের ন্যায় সেই কুঠার হস্তে করিয়া ক্ষিপ্তের মত আপন শয়না-গারের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! কি ইন্দ্রজাল!—শয়নাগারের সমস্ত দ্বারই খোলা!! দৌড়িয়া গৃহের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। দেখিলেন, যে দ্রব্য খুঁজিতেছিলেন, তাহা নাই! জয়দুর্গা সে গৃহে নাই!!

জয়গোপাল অভিলষিত দ্রব্য না পাইয়া যে অত্যন্ত বিমর্ষ হইলেন, এ কথা বলাই বাহুল্যমাত্র।

যোগ ও যোগানুষ্ঠান।

মানবমণ্ডলীতে যতপ্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান-পদ্ধতি ও ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে যোগশাস্ত্র সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মশাস্ত্র, এবং যোগানুষ্ঠান সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মানুষ্ঠান হইতে শ্রেষ্ঠ। আর্য্য-শাস্ত্র সকল যে বহু শতাব্দী যাবৎ সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মশাস্ত্রের উপর প্রাধান্যরূপে প্রকাশ পাইতেছে, যোগানুষ্ঠান-পদ্ধতিই তাহার প্রধান কারণ। আর্য্যধর্ম্মাবলম্বী মহর্ষিগণ যে অমররূপে খ্যাত, যোগানুষ্ঠানই তাহার প্রধান হেতু; এবং আর্য্যধর্ম্ম-পদ্ধতি যে প্রত্যক্ষ শুভফল-প্রসূ বলিয়া বিখ্যাত, যোগাচরণই তদ্বিষয়ের প্রধান নিদান, সন্দেহ নাই।

আর্য্যধর্ম্মাতিরিক্ত ধর্ম্মপ্রবক্তাগণ যদি যোগানু-ষ্ঠানের শুভফল সকল পরিজ্ঞাত থাকিতেন, তবে স্ব স্ব ধর্ম্মপুস্তকে যোগের কীর্ত্তন করিয়া আর্য্য-ধর্ম্মের ন্যায় স্ব স্ব ধর্ম্ম-পুস্তকও উপাদেয় করিয়া তুলিতেন; অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্র এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানও আর্য্যধর্ম্মানুষ্ঠানের ন্যায় প্রত্যক্ষ ফল-প্রসূ হইয়া সমকক্ষরূপে প্রকাশ পাইত। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অন্যান্য ধর্ম্ম-প্রবক্তাগণ আর্য্যধর্ম্ম-শাস্ত্র হইতে বহু উপাদেয় বস্তু অপহরণ করিলেও মহার্ঘ যোগরত্নের আলোক-মাত্রও অবলোকন করিতে পারেন নাই। আর্য্যদিগের বৈদিক ধর্ম্মানু-মোদিত এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের উপাসনাই পরজাত সকল প্রকার ধর্ম্মে বিকীর্ণ হইয়া-বিবিধ রঙ্গে রঞ্জিত হইয়া, নানা রূপ ও বিরূপ ধারণ করিয়াছে। এক আর্য্য-জাতি বিবিধ শ্রেণী-ভেদে বিভক্ত হইয়া যেমন বহুবিধ জাতিতে পরিণত হইয়াছে, সেইরূপ এক বৈদিক ধর্ম্মই (এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের উপাসনা-মাত্র রূপই) বিবিধ শ্রেণীভেদে প্রকাশ পাইয়া অভিনব ভাব সকল ধারণ করিয়াছে। কিন্তু চঞ্চলচিত্ত মানব-দিগের পরমেশ্বরে দৃঢ়রূপে চিত্তার্পণ করার পক্ষে যোগ-সাধনই যে প্রধান কারণ, তদ্ভিন্ন আর প্রধান উপায় নাই, এবিষয়ে ভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বিগণ অনুমাত্রও অনুসন্ধান করিতে সমর্থ হন নাই। আর্য্য-ধর্ম্মাবলম্বি মহর্ষিগণ যোগের প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ ফল সকল পরিজ্ঞাত হইয়াই আর্য্য-ধর্ম্মশাস্ত্র মাত্রেই যোগের কীর্ত্তন করিয়াছেন। তদ্বিবরণ ক্রমে কীর্ত্তিত হইতেছে।

যোগশব্দের যৌগিক অর্থ-দ্বারা ঈশ্বরে আত্মার সংযোগ—এই অর্থই প্রকাশ পায়। যথা,—"যুজ্যতে আত্মানমীশ্বরে অনেন অনুষ্ঠানেন ইতি যোগঃ।" যে অনুষ্ঠান দ্বারা পরমেশ্বরে আত্মা (জীব) অভিনিবিষ্ট হয়, তাহার নাম যোগ। যোগশাস্ত্র-প্রধান পাতঞ্জল-দর্শনেও "যোগ-শ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" এই সূত্র দ্বারা পরমেশ্বরে চিত্তবৃত্তির নিরোধকে (প্রবেশকে) যোগ বলে। বস্তুতও যোগানুষ্ঠান দ্বারা দুর্নিগ্রহ মন সংযত ও সুস্থির হইয়া পড়ে। চঞ্চল চিত্ত পরমেশ্বরে মিলিত হইয়া যায়। অহঙ্কার সমূলে বিলীন হয়, এবং নির্ম্মল বুদ্ধিবৃত্তি সর্ব্বদাই

ঈশ্বরে বিরাজমানা থাকে। এইরূপ অবস্থায় প্রমত্ত ইন্দ্রিয়সমূহ সুসংযত হইয়া যায়। জীব ও ঈশ্বরে (পরব্রহ্মে) অনলাক্ত লৌহের ন্যায় অভেদরূপেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। বিষয়-বাসনা বা বৈষয়িক জ্ঞানমাত্রও থাকে না। আত্মার এ অবস্থার নাম "অসম্প্রজ্ঞাত যোগ"; অর্থাৎ পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কোনও পদার্থ সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত হওয়া যায় না বলিয়াই ইহার নাম "অসম্প্রযাইজ্ঞাত।" এবং যে অবস্থায় ঈশ্বরেও চিত্তাদি সমাহিত রহিয়াছে, অথচ বিষয়-বোধও হইয়া থাকে, ফিি অবস্থার নাম "সম্প্রজ্ঞাত যোগ" বলে। ঈশ্বর-নিষ্ঠদিগের প্রথমতঃ 'সম্প্রজ্ঞাত' যোগানুষ্ঠান হইয়া, পরে 'অসম্প্রজ্ঞাত' যোগ ক্রমে প্রকাশ পাইতে থাকে।

যোগানুষ্ঠানের শুভফল।—এই যোগসাধন দ্বারা (১ম) শরীরের শোধন, (২য়) শরীরের দৃঢ়তা, (৩য়) স্থিরতা, (৪র্থ) ধৈর্য্য, (৫ম) লঘুতা, (৬ষ্ঠ) ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার, (৭ম) নির্ব্বাণ-মুক্তি, এই সাত প্রকার প্রত্যক্ষসিদ্ধ শুভফলই প্রাপ্ত হওয়া যায়। *

১। ধৌতি, বস্তি, নেতি, লোণিকি, ত্রাটক, কপালভাতি, এই ছয় কর্ম্ম দ্বারা শরীরের বাহ্য ও অভ্যন্তরস্থ মল সকল বিশুদ্ধ হয়। ইহাকেই যোগশাস্ত্রে শোধন বলে। †

২। পদ্মাসনাদি দ্বারা শরীরের দৃঢ়তা জন্মে।

৩। মূলবন্ধ-মহাবন্ধাদি মুদ্রানুষ্ঠান দ্বারা শরীর ও অন্তঃকরণের স্থিরতা হয়।

৪। বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়ের প্রত্যাহরণ দ্বারা ধৈর্য্য হয়।

৫। প্রাণায়াম দ্বারা শরীরের লঘুতা জন্মে।

৬। ধ্যান-যোগানুষ্ঠান দ্বারা পরমেশ্বরের প্রত্যক্ষতা লাভ হয়।

৭। সমাধি দ্বারা (চরম যোগ-বিশেষ দ্বারা) নির্ব্বাণ-মুক্তিলাভ হয়।

(১) অন্তর্ধৌত, (২) দন্তধৌত, (৩) হৃদয়-ধৌত, (৪) গুহ্যদেশস্থ মলাধার নাড়ী-শোধন,—এই চতুর্ব্বিধ ধৌতি দ্বারা যোগিগণ শরীর-শোধন করিবেন।

(১) বাতসার, (২) বারিসার, (৩) বহ্নিসার, এবং (৪) মধ্যস্থনাড়ী (মলাধার নাড়ী) বহিস্কার-রূপ অন্তর্ধৌত চতুর্ব্বিধ বলিয়া যোগশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। উক্ত ধৌতরূপ কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা শরীরস্থ মল-সকল বহিষ্কৃত হয়, এবং বর্ত্তমান জন্মেই দেবতার ন্যায় নির্ম্মল দেহলাভ করিতে পারে; এবং কোনপ্রকার রোগগ্রস্থ বা বার্দ্ধক্য-জনিত জরাক্রান্ত হয় না। (কথিত ধৌতাচরণ-পদ্ধতি ও পরলিখিত বিষয় সকলের অনুষ্ঠান-পদ্ধতি প্রকাশে বিরত থাকিয়া, এস্থলে কেবল নামমাত্র নির্দ্দেশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। অষ্টাঙ্গযোগ প্রদর্শনই এ প্রবন্ধের মুখ্যোদ্দেশ্য। যোগানুষ্ঠাতাদিগের প্রথম কর্ত্তব্য ধৌতি-বস্তি প্রভৃতির প্রসঙ্গতঃ নাম কীর্ত্তন করা হইল। ঘেরণ্ড-সংহিতা ও হট্‌যোগ-চন্দ্রিকা প্রভৃতি বহুতর গ্রন্থেই ইহার অনুষ্ঠান-পদ্ধতি বিস্তৃত রহিয়াছে।)—যোগিগণ অন্তর্ধৌত সম্পাদন করিয়া দন্ত-ধৌত করিবেক। (১) দন্তের মূলদেশ, (২) জিহ্বামূল, (৩) মুখ, (৪) কর্ণদ্বয়ের রন্ধ্র, এবং (৫) কপালের রন্ধ্র, এই পাঁচস্থান বিধিপূর্ব্বক ধৌত করাকেই দন্ত-ধৌতি বলে। ইহারও নীরোগিতাদি শুভফল প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ।—হৃদয়-ধৌত দ্বিবিধ,—(১ম) ভোজনান্তে আকণ্ঠ জলপান করিয়া ঊর্দ্ধদৃষ্টি-পূর্ব্বক তজ্জল সকল বমন করা। এই হৃদয়-ধৌত দ্বারা বহুবিধ রোগ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। (২য়) চতুরঙ্গুল বিস্তার সূক্ষ্ম বস্ত্রখণ্ড গ্রাস করিয়া পুনর্ব্বার ঐ বস্ত্রখণ্ড প্রত্যাহরণ করা। এই হৃদয়-ধৌত দ্বারা বহুবিধ রোগ নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে।—গুহ্যস্থ মলাধার নাড়ীর বহিস্কার ও তন্মধ্যস্থ মল-নিষ্কাষণ এবং পুনর্ব্বার অভ্যন্তরে যথাস্থানে প্রবেশ করা, গুরুর উপদেশ ও অভ্যাস-সাপেক্ষ। উহা বিধি-দৃষ্টে সম্পন্ন করা কঠিন। যোগশাস্ত্রে এই চতুর্ব্বিধ ধৌতির প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ শুভফল সকল নির্ব্বাচিত হইয়াছে। এই ধৌতি-অনুষ্ঠাতাদিগের কোনও প্রকার রোগ থাকিতে পারে না। শরীর কর্ম্মঠ হয় ও আলস্য থাকে না।

যোগিগণ পূর্ব্ববর্ণিত চতুর্বিধ ধৌতি-কার্য্য সম্পন্ন করিয়া বস্তি-শোধন করিবেক। নাভির অধোভাগস্থিত বাহ্যাভ্যন্তরীয় মল-নিষ্কাষণের নাম বস্তি-শোধন। পশ্চিম তাল আসন ও অশ্বিনী মুদ্রার সাহায্যে বস্তি-শোধন করিতে হয়। ইহাও গুরুর নিকট উপদেশ-সাপেক্ষ।

দ্বাদশাঙ্গুল পরিমিত সূক্ষ্ম-সূত্র নাসারন্ধ্র দ্বারা গ্রাস করিয়া মুখ-দ্বারা বিনির্গমের নাম নেতি-কর্ম্ম। ইহা দ্বারা খেচরী মুদ্রা সিদ্ধি হয়, এবং কফদোষ বিনাশ পায়।

অমন্দবেগ দ্বারা মুখমণ্ডল উভয়দিগে পরিচালন করার নাম লোহনাকি কর্ম্ম। ইহা দ্বারা মুদ্রাসিদ্ধির সাহায্য হয়।

দর্পণাদিতে কালির বিন্দু চিহ্নিত করিয়া ঐ সূক্ষ্ম লক্ষ্যকে নিমেষ ও উন্মেষ-শূন্য নেত্রদ্বারা নিরীক্ষণ করিবেক। যাবৎ পর্য্যন্ত চক্ষুর জল নিপতিত না হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত একদৃষ্টে ঐ সূক্ষ্ম লক্ষ্য দৃষ্টি করিবেক। ইহার নাম ত্রাটক। এই ত্রাটক দ্বারা শাম্ভবী মুদ্রা সিদ্ধি হয়।

বাতক্রম, ব্যুৎক্রম এবং শীৎক্রম এই ত্রিবিধ প্রকার অনুষ্ঠান দ্বারা কপালভাতি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেক। পূরক, কুম্ভক ও রেচক দ্বারা বায়ু-ধারণের নাম বাতক্রম। নাসিকা দ্বারা জলপান করিয়া মুখ-দ্বারা নির্গমের নাম ব্যুৎক্রম; এবং মুখ দ্বারা শীৎকার করিয়া জলপান পূর্ব্বক নাসিকা-নালে পীত জলত্যাগের নাম শীৎক্রম। এইরূপে কার্য্যানুষ্ঠানের নাম কপালভাতি কর্ম্ম।

এই ষট্‌কর্ম্ম দ্বারা শরীর-শোধন করিয়া যোগিগণ আসন অভ্যাস করিবেক। পরম যোগিবর মহাদেব যোগশাস্ত্রে ৮৪০০০০০ লক্ষ আসন নিরূপণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে মর্ত্ত্যলোকে ৮৪ প্রকার আসন উৎকৃষ্ট, তন্মধ্যেও ৩২ প্রকার আসনই যোগিদিগের পরম শুভকর বটে।

আসনের নাম।—১। সিদ্ধাসন, ২। পদ্মাসন, ৩। ভদ্রাসন, ৪। মুক্তাসন, ৫। বজ্রাসন, ৬। স্বস্তিকাসন, ৭। সিংহাসন, ৮। গোমুখাসন, ৯। বীরাসন, ১০। ধনুরাসন, ১১। মৃতাসন, ১২। গুপ্তাসন, ১৩। মৎস্যাসন, ১৪। মৎস্যেন্দ্রাসন, ১৫। গোরক্ষাসন, ১৬। পশ্চিমতালাসন, ১৭। উৎকটাসন, ১৮। শকটাসন, ১৯। ময়ূরাসন, ২০। কর্কটাসন, ২১। কূর্ম্মাসন, ২২। উত্তান কূর্ম্মাসন, ২৩। মণ্ডূকাসন, ২৪। উত্তান মণ্ডূকাসন, ২৫। বৃক্ষাসন, ২৬। গরুড়াসন, ২৭। মকরাসন, ২৮। সলভাসন, ২৯। বৃষাসন, ৩০। উগ্রাসন, ৩১। ভুজঙ্গাসন, ৩২। যোগাসন।

বর্ণিত দ্বাত্রিংশৎ আসনের প্রকারভেদ এবং অনুষ্ঠান-পদ্ধতি যোগশাস্ত্রে বিস্তৃতরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। বিস্তার-ভয়ে তৎপদ্ধতি বর্ণনায়ও বিরত রহিলাম। বর্ণিত আসনের অনুষ্ঠান দ্বারা ব্যায়াম-শোধিত শরীরের ন্যায় শরীরের দৃঢ়তা জন্মে। আসনাভ্যস্ত যোগিবর যে কোনপ্রকার আসনারূঢ় হইয়া অক্লেশে বহুযুগযুগান্ত অতিবাহিত করিতে সক্ষম হয়েন। এই আসনানুষ্ঠান অষ্টাঙ্গ-যোগের প্রধান বাহ্যাঙ্গ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

আসনারূঢ় যোগিগণই মুদ্রানুষ্ঠান করিবেন। ইহাদ্বারা স্থিরতা জন্মে। মুদ্রা পঞ্চবিংশত প্রকার। যথা,—১। মহামুদ্রা, ২। নভোমুদ্রা, ৩। উড্ডিয়ান, ৪। জলন্ধর, ৫। মূলবন্ধ, ৬। মহাবন্ধ, ৭। মহাবেধা, ৮। খেচরী, ৯। বিপরীত-কারিণী'

---

* শোধনং দৃঢ়তাচৈব স্থৈর্য্যং ধৈর্য্যঞ্চ লাঘবং।
প্রত্যক্ষঞ্চ নিলির্প্তঞ্চ ষটস্য সপ্তশোধনং ॥ ১০

† ধৌতির্বস্তিস্তথা নেতির্লৌলিকস্ত্রাটকং তথা।
কপালভাতিশ্চেতানি ষটকর্ম্মাণি প্রচক্ষতে।১৩
ষটকর্ম্মণাশোধনঞ্চ আসনেন তস্মেদ্দৃঢ়ং।
মুদ্রয়া স্থিরতাচৈব প্রত্যাহারেণ ধীরতা। ১১
প্রাণায়ামল্লাঘবঞ্চ ধ্যানাৎ প্রত্যক্ষমাত্মন ঃ।
সমাধিনা নির্লিপ্তঞ্চ মুক্তিরেব ন সংশয়। ১২
ঘেরণ্ড-সংহিতা ১ম. ঐ

১০। যোনি, ১১। বজ্রোনি, ১২। শক্তিচালনী, ১৩। তড়াগী, ১৪। মাণ্ডুকী, ১৫। ১৬। ১৭। ১৮। ১৯। শাম্ভবী মুদ্রা পাঁচপ্রকার, ২০। ধারণা মুদ্রা, ২১। অশ্বিনী, ২২। পাশিনী, ২৩। কাকী, ২৪। মাতঙ্গী, ২৫। ভুজঙ্গিনী। এই পঞ্চবিংশতি মুদ্রানুষ্ঠানের পদ্ধতিও যোগ-শাস্ত্রে বিশদরূপে প্রকাশ পাইয়াছে।

যোগিদিগের ইন্দ্রিয়ার্থ বিষয়-সমূহ হইতে ইন্দ্রিয়-সমূহকে আহরণ করিয়া (নিবৃত্তি করিয়া) মনকে আত্মাতে নিশ্চলরূপে অবস্থাপন করার নাম প্রত্যাহার বলে। প্রত্যাহার দ্বারা ধীরতা জন্মে। এমন কি, আত্মসংযমী যোগিবরের কর্ণকুহরের নিকটে যুগপৎ সহস্র ঢক্কা বাদিত হইলেও তৎশব্দ শ্রুতিগোচর হয় না। এ বিষয়ে পরে কতিপয় প্রসিদ্ধ প্রমাণ প্রদর্শিত হইবে। তদ্দ্বারাই অসংশয়রূপে যোগানুষ্ঠানের প্রত্যক্ষ ফল সকল প্রকাশ পাইবে। (ক্রমশঃ)

DETECTIVE STORIES.

জালিয়াৎ যদু।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এক দিবস প্রাতে এদেশীয় একখানি প্রধান ইংরাজি সংবাদপত্রে একটী প্রবন্ধ বাহির হইল, তাহার সংক্ষেপ মর্ম্ম এই,—

বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন যে, কলিকাতার ভিতর —কোম্পানির ন্যায় প্রসিদ্ধ মহাজন এতদ্দেশে প্রায় আর কেহই নাই। সেই আফিসে যেরূপ একটী ভয়ানক জাল ও জুয়াচুরি হইয়া গিয়াছে, তাহা সহজে কাহারও বোধগম্য হয় না; অথচ জুয়াচোরগণ সেই অচিন্ত্যনীয় উপায় অবলম্বন করিয়া এক মাসের মধ্যে প্রায় বাইস হাজার টাকা বাহির করিয়া লইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে যে আর কত টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে, তাহা এপর্য্যন্ত স্থিরীকৃত হয় নাই। এই সংবাদ পুলিশে দেওয়া হইয়াছে; পুলিশ তাহার অনুসন্ধান করিতেও প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন প্রকার শুভফল দেখা যায় নাই।

এই সংবাদ পাঠ করিয়া সাহেব আমাকে ডাকাইলেন, এবং ঐ সংবাদপত্রখানি আমাকে দেখাইলেন। উহা দেখিয়া আমার মনে এক ভাবের উদয় হইল; কিরূপ অচিন্ত্যনীয় উপায় অবলম্বন করিয়া এই জুয়াচুরি-কাণ্ড সম্পন্ন হইয়াছে, তাহা জানিবার ইচ্ছা বলবতী হইল। তখন সাহেবের আদেশমত আমি আস্তে আস্তে অন্য কর্ম্মের ভান করিয়া একটী থানায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। এবং দেখিলাম, সেই স্থানে একটী বাবু কতকগুলি কাগজপত্র-সহিত একজন সাহেব-কর্ম্মচারির নিকট সেই মকর্দ্দমার অবস্থা বিবৃত করিতেছেন। পাঠকগণও যাহাতে সহজে তাহা বুঝিতে পারেন, এই নিমিত্ত তাঁহাদের কথোপকথনের কতক অংশও সংক্ষেপে নিম্নে দেওয়া হইল।

"কর্ম্মচারী।—আপনি দেখিতেছি, অনেকগুলি কাগজ সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছেন, এইগুলি সমস্তই কি জাল কাগজ?

বাবু।—এগুলি সমস্তই জাল করা কাগজ। এই কাগজগুলি জাল করিয়াই বাইস হাজার টাকা আমাদিগের আফিস হইতে জুয়াচুরি-পূর্ব্বক লইয়া গিয়াছে।

কর্ম্মচারী।—আপনি আমাকে পৃথক পৃথকরূপে এই কাগজগুলির অবস্থা বুঝাইয়া দেন; তাহা হইলে এই মকর্দ্দমার অবস্থা সহজেই বোধগম্য হইবে।

বাবু।—আচ্ছা মহাশয়, আমি তাহাই করিতেছি; এক এক করিয়া ইহার সমস্ত অবস্থাই আপনাকে বুঝাইয়া দিতেছি। প্রথমে ওজনের ফর্দ্দের অবস্থা আপনাকে বুঝাইয়া দিই; প্রথম হইতে বুঝাইয়া দিলে বুঝিতে আর অধিক কষ্ট হইবে না।

কর্ম্মচারী।—ইহার ভিতর 'ওজনের ফর্দ্দ' আপনি কোন্ কাগজকে বলেন?

বাবু।—এই যে সকলের বড় কাগজগুলি

দেখিতেছেন, যাহাতে কেবলই অঙ্কপাত করা আছে, ইহাকে আমরা 'ওজনের ফর্দ্দ' বলি।

কর্ম্মচারী।—এই ফর্দ্দের সহিত এই মকর্দ্দমার সম্বন্ধ কি, তাহা আমাকে পরিস্কার করিয়া বুঝাইয়া দেন!

বাবু।—আমাদিগের আফিসে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম আছে। তাহা সমস্ত এখন বলিতে হইলে অনেক সময় নষ্ট হইয়া যাইবে। বিশেষ, তাহাতে উপস্থিত বিষয়ের কোন প্রকার উপকারই হইবে না। সুতরাং সে সমস্ত বিশেষ করিয়া না বলিয়া, কেবল যে কার্য্য অবলম্বন করিয়া এই জুয়াচুরি-কাণ্ড সম্পন্ন হইয়াছে, তাহাই আপনাকে বুঝাইয়া দিতেছি। আমাদিগের পাটের কার্য্যের নিয়ম এই যে, যদি কোন বড় মহাজনের বাটীতে আমরা পাটের কাঁটা করি, তাহা হইলে যে সরকার ঐ পাট ওজন করিতে যান, তিনি, প্রত্যেক পাটের বস্তায় যে পরিমাণ পাট থাকে তাহা পৃথক পৃথক ওজন করিয়া, একখানি কাগজে উহার ওজন লিখিতে থাকেন। এইরূপে সমস্ত ওজন শেষ হইলে ঐ কাগজের সমস্ত অঙ্ক একত্র করিয়া কত পরিমাণ মোট ওজন হইল, তাহা স্থির করেন; এবং ঐ কাগজে আপন নাম সহি করিয়া সেই মহাজনকে অর্পণ করেন। মহাজনও পূর্ব্ব-কথিতমত অন্য আর একটী ফর্দ্দ লিখিয়া, ঐ ফর্দ্দের সহিত মিলাইয়া, তাহাতে আপন নাম সহি করেন, ও উহা সেই ওজন-সরকারের হস্তে অর্পণ করেন। এই কাগজকেই আমরা ওজনের ফর্দ্দ কহি। ওজন-সরকারও ঐ কাগজে আপন নাম সহিপূর্ব্বক তাঁহার ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারির নিকট অর্পণ করেন। সে ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারিও আর কেহ নহেন—হেম বাবু। হেম বাবু ঐ কাগজের আর এক প্রস্থ নকল করিয়া লন, ও সরকার-প্রদত্ত কাগজখানিতে আপনার নাম সহি করিয়া উহা হেড-আফিসে পাঠাইয়া দেন। হেড-আফিসে ঐ কাগজ যাইলে আফিসের খাতায় ঐ মহাজনের নামে ঐ ফর্দ্দ-অনুযায়ী দ্রব্য জমা করিয়া লওয়া হয়। এ কার্য্য রাম বাবুর। রাম বাবু ঐ মাল জমা করিয়া লইয়া ঐ ফর্দ্দ আপনার ফাইলে রাখেন। ঐ কাগজকেই আমরা 'ওজনের ফর্দ্দ' কহি।

পাট ওজনের সাত দিবস পরে মহাজন তাঁহার নিকটস্থিত ফর্দ্দ লইয়া হেম বাবুর নিকট তাঁহার দ্রব্যের মূল্যের নিমিত্ত আগমন করিলে, আমাদিগের আফিসের নিয়ম-মত তিনি টাকা পাইতে পারেন। অর্থাৎ মহাজন ঐ ফর্দ্দ হেম-বাবুকে প্রদান করিলে, তিনি উহাতে সরকারের স্বাক্ষর দেখিয়া পরিশেষে সেই সরকারের প্রদত্ত অন্য ফর্দ্দের নকল বাহির করিয়া উহার সহিত মিলাইয়া দেখেন। যদি কোনরূপ প্রভেদ না দেখিতে পান, তাহা হইলে তাঁহার আফিসে বিলের লিখিত যে এক প্রকার ছাপান কাগজ (Bill Form) আছে, তাহাতে ঐ ফর্দ্দের লিখিত দ্রব্যের হিসাব-অনুযায়ী একখানি বিল প্রস্তুত করেন; এবং তাহাতে ও পূর্ব্বকথিত দুইখানি ফর্দ্দে আপন নাম সহি করিয়া তিনখানি কাগজ একত্রে মহাজনের হস্তে প্রদান করেন। মহাজন ঐ বিলের উপর আপন নাম স্বাক্ষর করিয়া আমাদিগের হেড-আফিসে ঐ কাগজগুলি আনিয়া রাম বাবুর হস্তে অর্পণ করেন। রাম বাবু আপন খাতা খুলিয়া যখন সেই সমস্ত মাল সেই মহাজনের নামে জমা দেখিতে পান, তখন পূর্ব্ব-কথিত হেম বাবুর প্রেরিত ফর্দ্দ আপন ফাইল হইতে বাহির করিয়া তাহাতে ও বিলের ফরমে আপন নাম স্বাক্ষর করিয়া মহাজনের হস্তে প্রদান করেন। মহাজন ঐ সকল কাগজ একত্রে বড় বাবুর নিকট লইয়া গেলে তিনি তাহাতে আপন নাম স্বাক্ষর করিয়া পুনরায় মহাজনের হস্তে অর্পণ করেন। মহাজন তখন উহা সেই আফিসের ক্যাসিয়ার বাবুর নিকট লইয়া গেলেই, তিনি ঐ সকল স্বাক্ষর পরীক্ষা-পূর্ব্বক তখনই মহাজনকে টাকা প্রদান করিয়া থাকেন।

এই তো আমাদিগের আফিসের কার্য্য-প্রণালী! এই প্রণালীমত আমাদিগের সমস্ত পাটের টাকা প্রদান করা হয়। আর, সেই প্রণালী মতনই এই বাইস হাজার টাকা এই পাঁচখানি বিলে পাঁচ জন মহাজনকে দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু, এখন দেখিতেছি, সমস্ত টাকাই কে জাল করিয়া বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছে।

কর্ম্মচারী —আপনাদিগের আফিসের কর্ম্মের নিয়ম তো অবগত হইলাম। কিন্তু ইহার কি জাল করিয়া বাইস হাজার টাকা লইয়া গিয়াছে?

বাবু।—মহাশয়, ইহার সমস্তই জাল। ইহার একখানি কাগজও প্রকৃত নহে।

কর্ম্মচারী।—ইহার যদি সমস্তই জাল, ও একখানি কাগজও প্রকৃত নহে, তবে টাকা বাহির করিয়া লইল কেমন করিয়া?

বাবু।—মহাশয়, আপনি প্রথম হইতে সমস্ত বিশেষ করিয়া দেখুন, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবেন। প্রথমে ওজন-সরকারের যে ফর্দ্দের কথা বলিয়াছি, তাহা জাল। এ ফর্দ্দ ওজন-সরকারের লিখিত প্রকৃত ফর্দ্দ নহে—এ স্বাক্ষরও ওজনসরকারের প্রকৃত স্বাক্ষর নহে। এ ফর্দ্দও মহাজনের লিখিত ফর্দ্দ নহে। উহার এই স্বাক্ষর মহাজনের স্বাক্ষর নহে, এ ফর্দ্দ হেম বাবুর নকল করা ফর্দ্দও নহে। এই বিল হেম বাবুর আফিসের সেই ছাপান প্রকৃত বিল নহে; এই সমস্ত কাগজে হেম বাবুর যে স্বাক্ষর দৃষ্ট হইতেছে, তাহাও হেম বাবুর স্বাক্ষর নহে। ঐ বিলের উপর মহাজনের যে স্বাক্ষর আছে,তাহা সেই মহাজনের স্বাক্ষর নহে; এই সমস্ত কাগজে রাম বাবুর যে স্বাক্ষর দেখিতেছেন, তাহাও রাম বাবুর স্বাক্ষর নহে। এই বড় বাবুর স্বাক্ষরগুলি একটীও বড় বাবুর প্রকৃত স্বাক্ষর নহে। এতগুলি কাগজ সমস্তগুলিই জাল। এতগুলি স্বাক্ষর সমস্তই কৃত্রিম স্বাক্ষর। কেবল কেসিয়ার বাবুর স্বাক্ষরগুলিই প্রকৃত। কারণ, তিনি উহাতে তাঁহার আপন নাম স্বাক্ষর করিয়া তবে টাকা দিয়াছেন।

কর্ম্মচারী।—তাহা তো বুঝিলাম, যে সমস্তই জাল—কেবল কেসিয়ার বাবুর স্বাক্ষরই প্রকৃত! কিন্তু এরূপ অবস্থায় কেসিয়ার বাবু কিরূপে যে টাকা দিলেন, তাহা বুঝিতে পারিতেছি না!

বাবু।—কেন মহাশয়, এ অতি সহজ কথা। কোন প্রকৃত বিল প্রস্তুত হইয়া যেরূপে এক একজন কর্ম্মচারির নিকটে দিয়া ক্রমে বড় বাবুর স্বাক্ষর পর্য্যন্ত শেষ হইলে, মহাজন সেই সমস্ত কাগজ কেসিয়ার বাবুর নিকট লইয়া গেলে, তিনি যেমন স্বাক্ষর দেখিয়া টাকা দিয়া থাকেন, ইহাও সেইরূপ হইয়াছে। তবে এই সমস্ত কাগজ কোন কর্ম্মচারির হস্তে প্রদত্ত না হইয়া একেবারেই গোবিন্দ বাবুর হস্তে অর্পিত হইয়াছে। গোবিন্দ বাবু ইহার স্বাক্ষর আদি দেখিয়া মনে করিয়াছেন যে, ইহা প্রকৃত স্বাক্ষর, ও আফিসের নিয়মমত সকলের হস্তে হইয়া তাঁহার নিকট প্রকৃত বিলের মতই আসিয়াছে। সুতরাং তাঁহার কোনপ্রকার সন্দেহই হয় নাই; এবং ঐ বিলের লিখিত সমস্ত টাকাই তিনি প্রদান করিয়াছেন।"

বনিল না।

তোমার সহিত আমার বনিল না। তুমি সভ্য, আমি অসভ্য; তুমি শিক্ষিত, আমি অশিক্ষিত; তুমি জ্ঞানী, আমি মূর্খ;—তোমায় আমায় 'আসমান্-জমিন্' তফাৎ; বনিবে কেমন করিয়া? তুমি সংস্কারক, আমি কুসংস্কারাচ্ছন্ন; তুমি ধার্ম্মিক, আমি ধর্ম্মহীন; তুমি দেশ-হিতৈষী, আমি দেশবৈরী;—তোমার সহিত আমার 'বনি-বনাও' হইতে পারে না। তুমি উন্নতিশীল, নূতনের উপাসক, পুরাতন ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া সবই তুমি নূতন করিয়া গড়িতে চাহ; আর আমি পুরাতনের উপাসক—পুরাতনকে পূজা করি; তুমি পুরাতনের মধ্যে সারপদার্থ কিছুই পাও না, আমি তোমার নূতনের মধ্যে সার কিছুই দেখি না—মিলিবে কেমন করিয়া বল দেখি? তাই বলিতেছিলাম, তোমার সহিত আমার বনিল না।

ধর্ম্মে বল, সমাজে বল; আহারে বল, বিহারে বল; আচারে বল, চরিত্রে বল,—তোমায় আমায় প্রভেদ কত! দুজনার মাঝখান দিয়া যেন এক মহাসমুদ্র প্রবাহিত!

আমি মৃণ্ময় আধার অবলম্বন করিয়া চিন্ময়ী দেবীর পূজা করি, সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করি; আর তুমি আমাকে পৌত্তলিক বলিয়া উপহাস কর—আমার ধর্ম্ম কিছুই নহে, অপধর্ম্ম বলিয়া তুমি হাসিয়া উড়াইয়া দাও। আমার পূর্ব্বপুরুষগণ মহামূর্খ ছিলেন, মুনিঋষিগণ ভ্রান্ত, তৎপ্রণীত শাস্ত্রাদিও ভ্রমসঙ্কুল, এ কথা তুমি অনায়াসেই বলিয়া থাক। আর তোমার ধর্ম্মটা কি?

তাহার নাম জানি না। যাহা বেদে নাই, বাইবেলে নাই, কোরাণে নাই, জেন্দাবেস্তায় নাই,—তাহার কি নাম, কেমন করিয়া জানিব? তুমি বলিয়া থাক, তোমার ধর্ম্ম কোন বিশেষ পুস্তকানুমোদিত নহে। কিন্তু তর্কবিতর্ক ছাড়িয়া, প্রকৃত প্রাণের কথাটা যদি বলিতে পার, যদি সে সাহস থাকে, তবে অবশ্যই বলিবে, আমার পথ ছাড়া তোমার অন্য পথ নাই। যেখান দিয়া, যে উপায়েই যাও, হিন্দু-ধর্ম্মের সার্ব্বভৌমিকতা ও শ্রেষ্ঠতা অনুভব করিয়া, নিশ্চয়ই বুঝিবে, এ মহাধর্ম্মের মধ্যে সকল ধর্ম্মই প্রতিপালিত ও পরিপোষিত হইতেছে। তুমি সে কথা মানিবে না,—আমি হাজার যুক্তি দিয়া প্রতিপন্ন করি, তুমি ত তাহা শুনিবে না! তবে তোমার সহিত আমার কেমন করিয়া বনিবে?

তুমি কখন বা বল, সকল নীতি মানিয়া চলিবে, ধর্ম্মের কোন প্রয়োজন নাই। কিন্তু তোমার এ কথাটার অর্থ, আমি অনেকবার ভাবিয়াছি, কিছুই ঠিক করিতে পারি নাই। ধর্ম্ম ও নীতি, ওরফে রিলিজান্ ও মরালিটি, তুমি যেরূপ বিভিন্ন বলিয়া মনে কর, আমি সেরূপ করি না। তুমি ইংরাজের শিষ্য; মহামতি মিল্, কি কাণ্ট্, কি স্পেন্সার, কি অন্য কোন ইউরোপীয় মহাত্মার মত গ্রহণ করিতে তোমার দ্বিধা নাই; আর তোমার দেশের কত মহাত্মার কত অমূল্য ধন রহিয়াছে, তাহাতে তোমার আস্থা নাই; প্রত্যক্ষ সত্য হইলেও, তাহা গ্রহণ করিতে তুমি নারাজ!

কখন বা বল—ঈশ্বর আছেন, মানিলাম; কিন্তু তাঁহাকে জানিবার প্রয়োজন কি? যদি বা অনুগ্রহ করিয়া প্রয়োজন-স্বীকার কর, আবার বল যে, তাঁহাকে জানা যায় না। এই অজ্ঞেয়তাবাদ (ইংরাজিতে যাহাকে Agnosticism বলিয়া থাকে) যখন তোমার হৃদয় অধিকার করে, আমি তোমার উন্নত জ্ঞান দেখিয়া, নিজের মূর্খতার প্রশংসা করি! ঈশ্বরকে যদি জানাই যায় না, কেমন করিয়া তাঁহার কথা বল? কেমন করিয়া বা জানিলে, তাঁহাকে জানা যায় না? অবশ্য তুমি এমন কিছু জানিয়াছ, যদ্দ্বারা বুঝিয়াছ যে, তাঁহাকে জানা যায় না; কিন্তু সে 'কিছু' কি? কথাটা বেশ বুঝিতে পারিতেছ, অথচ স্বীকার করিতেছ না; কেন না, অনেক ইংরাজ-দার্শনিক অজ্ঞেয়তাবাদ স্বীকার করিয়া থাকেন! ভাই, তোমার সহিত এ মূর্খের বনিল না।

তোমার ধর্ম্মে কখন আস্তিকবাদ, কখন নিরীশ্বরবাদ; কখন সাকারবাদ, কখন নিরাকারবাদ; তোমার মহিমা যেমন, তোমার ধর্ম্মের মহিমাও তেমন! তুমি না হিন্দু, না মুসলমান, না খৃষ্টান,—তুমি কি?

তোমার আমার সমাজে প্রভেদ কত! যে ইংরাজদিগের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি পর্য্যালোচনা করিয়াছে, সেই বলিবে, তোমার সবই ইংরাজি-ছাঁচে ঢালা! যদি একেবারে ইংরাজ হইয়া যাইতে পারতে, বরং ছিল ভাল; কিন্তু এ আধা-বাঙ্গালী, আধা-ইংরাজ হইয়া— আ ছিঃ, ছিঃ!—মূর্ত্তিখানা কি হইয়াছে, দেখ দেখি!

আমার সমাজে জাতিভেদ আছে, তোমার সমাজে সে বৈষম্য নাই,—যেহেতু তুমি সাম্য-

বাদী! তোমার সাম্য-পতাকার মূলদেশে সকল জাতিই এক। আমি আজও এত উন্নত হই নাই যে, যে আমার 'পাইখানা' পরিস্কার করে, তাহার সহিত একত্রে বসিয়া আহার করিতে পারি, কিম্বা তাহার কন্যার সহিত আমার পুত্রের বিবাহ দিতে পারি। আমার সমাজে জাতিগত-পার্থক্য আছে বলিয়াই, একটা শৃঙ্খলা আছে। তুমি যদি প্রবৃত্তির উপর নির্ভর করিয়া সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত করিতে চাও, তবে তাহা অন্য কোন 'নামে' অভিহিত করিও। সাম্যের মধ্যে প্রবৃত্তি কি, রুচিই বা কি? আর, হিন্দু কি সাম্যবাদী নহেন? হিন্দুর সাম্যবাদ আহারে নহে, বিহারে নহে, বাক্যে নহে, বক্তৃতায়ও নহে,—প্রাণে। সে কথা তুমি বুঝ না, তুলিয়া ফল কি?

তোমার স্ত্রী-স্বাধীনতা আছে। দেশীয় পরিচ্ছদ তোমার ভাল লাগে না, তোমার গৃহিণীরও ভাল লাগে না। তুমি ধুতি-চাদর পরিত্যাগ করিয়া, কোট-প্যাণ্ট লুনে নিজ-শরীর আবৃত কর, তোমার গৃহিণীও শাড়ি পরিত্যাগ করিয়া গাউনে সুন্দর বপু সুশোভিত করেন। দেশ অন্নহীন, সে কথা একবার ভাব না; অনুকরণে ও বিলাসিতায় সে কথা বিস্মৃত হইয়াছ। সুন্দর পরিচ্ছদে সাজাইয়া, গৃহিণীকে লইয়া, ভ্রমণে বহির্গত হও—এ সব আমার ভাল লাগে না। স্ত্রীকে লইয়া তুমি বেড়াইতে যাইবে, নাট্যশালায় যাইবে, গির্জ্জায় যাইবে, বন্ধুর বাড়ী নিমন্ত্রণে যাইবে, গার্ডেন-পার্টিতে যোগদান করিবে,—অসভ্য আমি, স্ত্রীকে ভালবাসিতে জানি না, তাই এসব আমার চক্ষে ভাল দেখায় না। কিন্তু আমার স্ত্রীকে আমি 'কস্তাপেড়ে সাড়ি' পরাইয়া, সিঁথিতে সিন্দুর দিয়া, অন্দরের মধ্যে থাকিয়া, আমার বৃদ্ধ পিতা-মাতার সেবা করিতে দেখিলে সুখী হই। আমার স্ত্রীও তাহাতে সুখী। তিনি বসন-ভূষণের অত 'জাঁকজমক'ও জানেন না, অত 'বায়না' করিতেও শিখেন নাই। স্বাধীন করিয়া দিই নাই বলিয়া, একদিনও তাঁহাকে দুঃখ করিতে শুনি নাই,—আমার প্রতি তাঁহার ভালবাসা বা ভক্তির কিছু হ্রাস-বৃদ্ধিও দেখি নাই। তোমার কি ভাই? আজ তোমাদের পতি-পত্নীতে কত ভাব, কত প্রেম; কাল হয়ত তোমার স্ত্রী তোমায় পরিত্যাগ করিয়া, তোমার এক বন্ধুরই সহধর্ম্মিণী (?) হইয়াছেন! তোমাদের স্বামী-স্ত্রীর এমনই প্রগাঢ় প্রেম বটে! আমি নিতান্ত 'সেকাল-ঘেঁসা' নাকি, তাই তোমার অনুসরণ করিতে পারিলাম না! তোমার স্ত্রীকেই জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিও,—এখন নহে, আরও দু'চার দশ বৎসর যাউক, এখনও রক্তের তেজটা প্রবল আছে,—তিনিও কি বলেন শুনিও। তুমি যে স্ত্রী-স্বাধীনতার জন্য এত লাফালাফি-ঝাঁপাঝাঁপি করিতেছ, শুনিও, তিনি তাহাতে সুখী কি না! তুমি একদেশদর্শী বলিয়া আমায় ঘৃণা কর; কিন্তু সকল দেশদর্শী হইয়া বলিতেছি, ওটা আমার ভাল লাগে না। তবে তোমার সহিত আমার বনিবে কেন ভাই?

তুমি মৈত্রী-ভাবাপন্ন; বিশ্ব-প্রেম তোমার হৃদয়ে জাগিতেছে। সমগ্র জগৎ আলিঙ্গনের জন্য তুমি উদ্যত! আমি তোমায় প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে পারিতাম। কিন্তু তোমার মৈত্রী-করণেচ্ছা, বড় বিচিত্র রকমের! তুমি স্বীয় পিতা-মাতা, ভ্রাতা-ভগ্নীর সহিত মিশিয়া থাকিতে পার না; অথচ অনন্ত জগৎ ক্রোড়ে রাখিতে চাও! গৃহে বিধবা ভগ্নী আছে, পিসিমা আছে, তাহাদিগকে এক মুঠা অন্ন দিতে তুমি কাতর; অথচ, বিলাতে কোথায় কাহার স্মরণার্থ সভায় চাঁদা দিতে তুমি মুক্তহস্ত! পরের অভাব দূর করিতে, তোমার প্রাণ যে কাঁদে না, এমন কথা বলি না। এই দামোদরের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গিয়া, সেখানকার লোকের কি কষ্টই উপস্থিত! তোমার হৃদয় অস্থির হইল, কিছু টাকা পাঠাইলে; আমরা দুই হাত তুলিয়া তোমায় আশীর্ব্বাদ করিলাম। কিন্তু পরদিনে দেখি, তুমি সংবাদপত্র 'হাঁত্‌ড়াইতেছ!' অর্থাৎ, তোমার নাম

সংবাদপত্রে 'জাহির' হইয়াছে কি না, দেখিতে ব্যস্ত! এখন কি আর আশীর্ব্বাদ করিতে ইচ্ছা হয়, না—দূর হউক, তোমার সহিত ত বনিল না!

দেশের ভাষা তোমার ভাল লাগে না, দেশের একখানা গ্রন্থও তোমার মনঃপুত নহে! তুমি রায়গুণাকরকে কুরুচির আকর বলিয়া থাক! বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, মুকুন্দরাম প্রভৃতি তোমার কাছে কিছুই নহে। আর আর গ্রন্থকারদিগের কথা যাহা বল, তাহা না তুলাই ভাল। তুমি বল, মারলোর যেমন 'ফস্‌টাস্,' সেক্ষপীয়রের যেমন 'হ্যামলেট,' 'ওথেলো' প্রভৃতি,—তেমন একখানা নাটক আমাদের দেশে কৈ? উপন্যাস লিখিতে যেমন স্কট্, লিটন্, ডিকেন্স, ইলিয়ট্; কাব্য লিখিতে যেমন, হোমার, ডান্টে, মিল্টন্ প্রভৃতি; এমন একজন এদেশে কে? দর্শন লিখিতে যেমন মিল্, বেন্থাম, ডের্কাট, কাণ্ট, হিগেল, মার্টিনিউ,—এমন আমার দেশে কে ছিল, কে আছে? সেলির সঙ্গীতে তোমার প্রাণ মোহিত হয়, স্কটের যুদ্ধ-বর্ণনায় তোমার বীর-হৃদয় উন্মত্ত হইয়া নৃত্য করে; এদেশে এমন লেখা কৈ? কি উত্তর দিব, ভাবিয়া পাই না; তোমার প্রশ্নে আমার শ্বাসরুদ্ধ হয়,—উত্তর দিব কি?

কিন্তু ভাই, তুমি কি কখন কালিদাসের 'শকুন্তলা' বা ভবভূতির 'উত্তর-চরিত' চক্ষে দেখিয়াছ? জয়দেবের "পদাবলী' তুলসীদাসের 'দোঁহা' কি কখন পাঠ করিয়াছ? অদ্বৈতগুরু শঙ্করের 'শাঙ্করভাষ্য', 'বেদান্ত-দর্শন' প্রভৃতির নামও কি কখন শুনিয়াছ? ঠাকুর-মা, দিদি-মার, মুখে গল্প শুনা ছাড়া নবরসের সপ্তসমুদ্র-বিশেষ 'রামায়ণ'-'মহাভারত' কি কখনও আয়ত্ব করিতে চেষ্টা করিয়াছ? আর, জীবনের মধ্যে এক দিনও কি গুরুর নিকট 'ভাগবত' বা 'গীতার' উপদেশ গ্রহণ করিয়াছ? বক্ষে হাত দিয়া বল দেখি, এই অমূল্য সুধার আস্বাদ কখন পাইয়াছ কি না? আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, তুমি 'হুজুগ-জুয়ারে' অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছ; দেশের কোন দ্রব্যই তুমি দেখ নাই, শুন নাই, অনুসন্ধানও কর নাই। অথবা তোমার সে ক্ষমতাই আছে কি না সন্দেহ। কিন্তু ভাই, কথায় তোমায় আঁটে কে? তুমি পাশ্চাত্য পণ্ডিতের শিষ্য কিনা,—'truth' তাই তোমার কণ্ঠাগত!

আমি ত বলিয়াছি, তুমি সভ্য, তুমি উন্নত; আমার সহিত তোমার 'বনি-বনাও' হওয়া অসম্ভব। তেলে-জলে কি কখন মিশ খায়? আমি নিজেকে যেমন ভাল-বাসি, নিজের ভাষাকেও সেইরূপ ভালবাসি, নিজের ভাষার গ্রন্থগুলিও তদ্রূপ ভালবাসি। আমার সমাজে তোমার স্থান, কৈ ভাই! তাই বলিতে হইল, তোমার সহিত আমার বনিল না।

সকল প্রকারেই দেখিলাম, তোমার সহিত আমার বনিল না। এজন্য তুমি সুখী, কিন্তু আমি দুঃখিত। যদি রাগ না কর ত বলি ভাই একটা কথা,—আরও কিছুদিন চুপ-চাপ থাকিলে ভাল হইত; একেবারে ছাঁকা আলোকে বাহির হইয়াছ, এখন ভয় হয়, পাছে, নির্ব্বোধ পক্ষিগুলা তোমায় বিরক্ত করিয়া আবার অন্ধকার কোঠরে ঠেলিয়া দেয়।

শঠে-শঠে।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ ও নগেন্দ্রনাথ ঘোষের বাসস্থান নদীয়া-জেলার অন্তর্গত কোন একটী প্রসিদ্ধ পল্লিগ্রামে। উভয়েই একই বংশে জন্মগ্রহণ করেন। উভয়েরই অতিবৃদ্ধ-প্রপিতামহ এক। উভয়ের বৃদ্ধপিতামহদ্বয় পরস্পর সহোদর ভ্রাতা ছিলেন। দুই ভ্রাতায় সম্পূর্ণরূপ সদ্ভাব না থাকায় উভয়ে পৃথক হন। পৃথক পৃথক বাড়ী প্রস্তুত করিয়া উভয়েই বসবাস করিতে থাকেন। সেই সময় হইতে যে মনোবিবাদ পরিলক্ষিত হইত, তাহার শেষ হয় নাই। বংশানুক্রমে সেই বিবাদ চলিয়া আসিতেছে।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ ও নগেন্দ্রনাথ ঘোষের মধ্যে যে কত মকর্দ্দমা হইয়াছে, তাহার সংখ্যা করা সহজ নহে। কিন্তু উভয়েই অতিশয় চতুর ও কৌশল-অবলম্বী, কাজেই পরস্পরের মধ্যে কেহই কাহাকে পরাজিত করিতে সমর্থ হন নাই। উভয়েই যেরূপ মকর্দ্দমা-প্রিয় ও কৌশলাবলম্বী, তাহাতে উভয়ের যদি অজচ্ছল পয়সা থাকিত, তাহা হইলে যে কি হইত, তাহা বলা যায় না। কিন্তু ঈশ্বর সেই বিষয়ে বিশেষ কৃপণতা প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়াই মঙ্গল।

উভয়েরই নিতান্ত ইচ্ছা যে, কোন গতিকে পরস্পর পরস্পরকে জেলে দেন। এক দিবস রাত্রে কালীপ্রসন্ন ঘোষ আহারাদি করিয়া শয়ন করিলেন, কিন্তু একটী চিন্তার প্রবল গতি তাঁহার নিদ্রাকে অবরোধ করিল। শুইয়া শুইয়া ভাবিতে লাগিলেন,—"কোন উপায় অবলম্বন করিয়া এত দিবস পর্য্যন্ত নগেন্দ্রনাথকে উত্তমরূপ শিক্ষা দিতে সমর্থ হই নাই; কিন্তু এখন আর কি এক নূতন উপায় অবলম্বন করা যায়, যাহাতে সে চিরদিবস বা দীর্ঘকালের নিমিত্ত জেলে থাকিতে পারে।" এই বিষয় সমস্ত রাত্রি ভাবিতে লাগিলেন, ভাবিতে ভাবিতে একটী উপায়ও মনে মনে স্থির করিলেন। পর দিবস হইতে সেই নূতন উপায় অবলম্বন করিয়া নগেন্দ্রনাথের সর্ব্বনাশ-সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

তিন চারি দিবস পরেই দেখা গেল, সেই স্থানের পুলিশ নগেন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করিয়া আনিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট চালান দিলেন। সকলেই শুনিলেন যে,—এবার নগেন্দ্রনাথ ভয়ানক অপরাধ করিয়াছেন, বলপ্রকাশে একটী দরিদ্রা স্ত্রীলোকের সতীত্ব-নষ্ট করিয়াছেন। এই সংবাদ যিনিই শ্রবণ করিলেন, তিনিই নগেন্দ্রনাথের উপর বিশেষ অসন্তুষ্ট হইলেন; যাহাতে নগেন্দ্রনাথের বিশেষ শাস্তি হয়, সকলেই তাহারই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

মাজিষ্ট্রেট সাহেব এই মকর্দ্দমার বিচার করিলেন, ফরিয়াদির পক্ষীয় সমস্ত সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ করিলেন। সকলেই দেখিলেন যে, নগেন্দ্রনাথের বিপক্ষে বলাৎকার-মকর্দ্দমা প্রমাণ হইল। মাজিষ্ট্রেট সাহেব নগেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাঁহার কিছু বলিবার আছে কি না! উত্তরে নগেন্দ্র কেবল এইমাত্র কহিলেন যে,—"এই মকর্দ্দমায় আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী। কিন্তু আমার যাহা বলিবার আছে, তাহা এখন আমি এই শত্রুমণ্ডলীর ভিতর বলিতে ইচ্ছা করি না। দেখিতেছি,আপনি এই মকর্দ্দমা দায়রায় পাঠাইতেছেন; সুতরাং যাহা বলিবার সেইস্থানেই বলিব।" মাজিষ্ট্রেট সাহেব অতঃপর এই মকর্দ্দমা দায়রায় পাঠাইয়া দিলেন।

সময়-মত দায়রা বসিলে এই মকর্দ্দমার বিচার আরম্ভ হইল। সরকারী উকিল এই মকর্দ্দমা চালাইতে লাগিলেন। আসামী নগেন্দ্রনাথের উকীল নাই। তিনি উকীল নিযুক্ত করিতে সমর্থ হন নাই বা ইচ্ছা করিয়াই কোন উকীল দেন নাই, তাহা আমরা অবগত নহি। কিন্তু তাঁহার বিনা উকিলেই মকর্দ্দমা চলিতে লাগিল। সরকারী উকীল মকর্দ্দমার অবস্থা জজ ও জুরিগণকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিলেন।

জজ।—আসামী, তোমার উপর এই গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত হইয়াছে; ইহাতে তুমি কি বলিতে চাহ,—তুমি দোষী, কি নির্দ্দোষী?

নগেন্দ্র।—ধর্ম্মাবতার, এ মিথ্যা মকর্দ্দমা; এই মকর্দ্দমায় আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী।

আসামীর এই কথা শুনিয়া জজসাহেব সরকারী উকিলকে কহিলেন,—"আসামী যাহা বলিতেছে, তাহা শুনিলেন ত! এখন আপনি সাক্ষীগণকে ডাকিয়া এই মকর্দ্দমা প্রমাণ করিতে পারেন।"

উকিল মহাশয় এই কথা শুনিয়া সাক্ষীগণকে ডাকিতে লাগিলেন। তাহারা যেরূপ জবানবন্দি দিয়াছিল, তাহা সমস্ত লিখিতে হইলে এই প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া যায়; অথচ না লিখিলেও

পাঠকগণ এই মকর্দ্দমার অবস্থা সম্যকরূপে বোধগম্য করিতে সমর্থ হইবেন না বলিয়াই, সাক্ষীগণের সংক্ষিপ্ত জবানবন্দী এই স্থানে প্রদত্ত হইল। উকীল মহাশয় যেরূপ পরপর সাক্ষীগণকে ডাকিয়াছিলেন, সেইরূপই পরপর তাহাদের সংক্ষিপ্ত জবানবন্দী নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১নং সাক্ষী কামিনী দাসী।—নগেন্দ্রনাথ যে পাড়ায় বাস করে, আমিও সেই পাড়ায় থাকি। আমরা গরিব লোক, পরের বাড়ী কর্ম্ম না করিলে আমাদিগের চলে না, সুতরাং রাস্তা দিয়া একাকী গমন করিতে হয়। নগেন্দ্রনাথ আমাকে দেখিলে নানাপ্রকার ঠাট্টা-তামাসা করিত। কিন্তু তাহার মন্দ অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া আমি সর্ব্বদা তাহার ভয়ে ভীত থাকিতাম, এবং তাহাকে দূর হইতে দেখিতে পাইলেই অন্য পথে গমন করিতাম। গত ২৫এ অগ্রহায়ণ তারিখে সন্ধ্যার পর আমি কর্ম্ম করিয়া আমার বাড়ী গমন করিতেছিলাম। নগেন্দ্রনাথের বাড়ীর সম্মুখে গমন করিবামাত্র, কি জানি কোথা হইতে বাহির হইয়া, জোর-পূর্ব্বক সে আমার হস্ত ধরিল। আমি হাত ছাড়াইতে বিশেষ চেষ্টা করিলাম; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। তখন চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলাম। তাহাতেও সে না শুনিয়া, জোরপূর্ব্বক ধরিয়া, আমাকে তাহার বাড়ীর পশ্চাৎভাগে একটী জঙ্গলের ভিতর লইয়া গেল। আমি দুর্ব্বল স্ত্রীলোক, কাজেই বলবান পুরুষের জোরে পারিলাম না। সে জোরপূর্ব্বক আমার ধর্ম্মনষ্ট করিয়া আমার সর্ব্বনাশ-সাধন করিল। আমি অনন্যোপায় হইয়া কেবল চীৎকার করিতে লাগিলাম। সেই সময়ে আমাদিগের পাড়ার রামসদয় দাস ও গোফুর সর্দ্দার আমার সাহায্যের নিমিত্ত উপস্থিত হইল। তাহারা প্রথমে নগেন্দ্রকে গালিগালাজ দেওয়াতেও, সে আমাকে পরিত্যাগ করিল না। পরিশেষে উহাদিগের নিকট হইতে মার খাইয়া আমাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিল। ঐ দুই ব্যক্তিই আমাকে সেই স্থান হইতে আনয়ন করেন। পরিশেষে আমি থানায় গিয়া উহার নামে নালিশ করিয়াছিলাম। থানাওয়ালা আমার নালিশ লিখিয়া লন, ও আমাকে পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত একজন ডাক্তারের নিকট প্রেরণ করেন।

জজ।—আসামী! ফরিয়াদি যাহা বলিল, তাহা তো শ্রবণ করিলে! এখন, তুমি উহাকে জেরা করিতে পার।

নগেন্দ্র।—ও যাহা বলে, বলুক। কিন্তু যখন আমি নির্দ্দোষী, তখন আর উহাকে জেরা করিব কি?

২য় সাক্ষী রামসদয় দাস।—নগেন্দ্র যে পাড়ায় বাস করে, আমিও সেই পাড়ায় থাকি। ২৫এ অগ্রহায়ণ তারিখে কামিনীর চীৎকার শুনিয়া আমি ও গোফুর সর্দ্দার নগেন্দ্রের বাড়ী-অভিমুখে গমন করি; ও সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া গমন-পূর্ব্বক দেখি যে, একটী জঙ্গলের ভিতর নগেন্দ্র কামিনীর ধর্ম্মনষ্ট করিতেছে। আমি একটী লণ্ঠন-হস্তে আসিয়াছিলাম; সুতরাং আলোর সাহায্যে আমরা সমস্তই দেখিতে পাই। আমরা প্রথমে নগেন্দ্রকে গালিগালাজ দিই; কিন্তু তাহাতেও কামিনীকে পরিত্যাগ করে না। পরিশেষে গোফুর সর্দ্দার অতিশয় রাগান্বিত হইয়া তাহার হস্তস্থিত যষ্টির দ্বারা নগেন্দ্রকে প্রহার করে। মার খাইয়া, পরিশেষে নগেন্দ্র, কামিনীকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক, পলায়ন করে। আমরা উহাকে উলঙ্গ-অবস্থায় জঙ্গলের বাহির করিয়া আনি, ও উহার বস্ত্র অন্বেষণ করিয়া উহাকে প্রদান-পূর্ব্বক উহার লজ্জা-রক্ষা করি।

এই সাক্ষীকেও নগেন্দ্র কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না।

৩য় সাক্ষী গোফুর সর্দ্দার, রামসদয় যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই বলিল। তাহাকেও নগেন্দ্র কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া অল্প অল্প হাসিতে লাগিলেন।

৪র্থ সাক্ষী ডাক্তার ব্রজনাথ বসু। ইনি কহিলেন,—"আমি ২৫ এ অগ্রহায়ণ রাত্রি প্রায় ২টার সময় কামিনীকে পরীক্ষা করিয়াছি, এবং তাহার শরীরে জোরের সহিত স্ত্রী-সহবাস করিলে যে সকল চিহ্ন প্রভৃতি থাকার সম্ভাবনা, তাহার সমস্ত চিহ্নই দেখিয়াছি।"

৫নং সাক্ষী দারোগা হামিদুল্লা কহিলেন,—"আমি থানার দারোগা। এই কামিনী দাসী আসিয়া আমার নিকট এজাহার দেয় যে,—'২৫এ অগ্রহায়ণ সন্ধ্যার পর সে যখন আসামী নগেন্দ্রনাথের বাড়ির সম্মুখ দিয়া গমন করিতেছিল, সেই সময় নগেন্দ্রনাথ তাহার বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিল। সে কামিনীকে দেখিয়া জোর করিয়া তাহার হাত ধরে, ও জোর করিয়া তাহাকে টানিয়া ঘরের পশ্চাতে একটী জঙ্গলের ভিতর লইয়া যায়; এবং সেইস্থানে বলপূর্ব্বক ও কামিনীর অনিচ্ছাসত্বে তাহার ধর্ম্মনষ্ট করে। কামিনী সেই সময় চেঁচাইতে থাকায়, প্রতিবেশী রামসদয় দাস ও গোফুর সর্দ্দার আসিয়া উপস্থিত হয়! তাহারা স্বচক্ষে এই নৃশংস অবস্থা দর্শন করে, ও জোর করিয়া—এমন কি প্রহার পর্য্যন্ত দিয়া নগেন্দ্রকে তাড়াইয়া দেয়।' এই সংবাদ আমি 'প্রথম এতলায়' লিখিয়া লইয়া, অনুসন্ধানে নিযুক্ত হই; ও সাক্ষীগণের এজাহার গ্রহণ করি। পরে কামিনীকে ডাক্তারের নিকট পরীক্ষার নিমিত্ত পাঠাইয়া দিই, ও আসামী নগেন্দ্রকে ধৃত করিয়া চালান দিই।

নগেন্দ্র দারোগাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। এই কয়টী সাক্ষীর এজাহারেই মকর্দ্দমা শেষ হইল। সরকারী উকিল জুরিদিগকে উত্তমরূপে মকর্দ্দমা বুঝাইয়া দিলেন; এবং ভাব-ভঙ্গিতে বোধ হইল যে, জুরিগণও এই মকর্দ্দমা সম্পূর্ণরূপ বিশ্বাস করিলেন; নগেন্দ্র যে এই ভয়ানক দোষে দোষী, তাহাও সকলেই সাব্যস্থ করিয়া লইলেন।

পরিশেষে জজ সাহেব নগেন্দ্রকে কহিলেন,—"আসামী! তোমার উপর এই গুরুতর মকর্দ্দমা পরিস্কার প্রমাণ হইয়া গিয়াছে। যদিও তুমি এখনও বলিতেছ যে তুমি নির্দ্দোষী, তথাপি তুমি কোন সাক্ষীকে—এমন কি ফরিয়াদিকে পর্য্যন্তও, জেরা না করায় বোধ হইতেছে যে, তাহারা সকলে যে সাক্ষ্য দিয়াছে, তাহা মিথ্যা নহে। এমন অবস্থায় এখন তুমি কি বলিতে চাহ?"

নগেন্দ্র।—ধর্ম্মাবতার, আমি এখনও বলিতেছি যে, আমি নির্দ্দোষী; এবং ইহাও বলিতেছি যে, এই মকর্দ্দমা সম্পূর্ণ মিথ্যা। এই মকর্দ্দমা-সম্বন্ধে আমি কোন কথা বলিতে চাহি না। কেবল আমার দুইজন মাত্র সাক্ষী আছেন, তাঁহাদিগের একজন অদ্য আদালতেও উপস্থিত আছেন। আমি তাঁহাকেই একবার ডাকিয়া একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাহি। তাঁহার কথা শুনিলেই আপনারা জানিতে পারিবেন যে, এই মকর্দ্দমা মিথ্যা কি না!

এই কথা শুনিয়া জজ সাহেব হাসিয়া উঠিলেন; এবং কহিলেন—"যে মকর্দ্দমা এরূপ প্রমাণ হইয়াছে, তাহা একজন সাক্ষীর দ্বারা তুমি উড়াইয়া দিতে চাহ,—না-জানি তোমার সাক্ষীই বা কেমন! আচ্ছা, তুমি তোমার সাক্ষীকে ডাকিয়া যাহা জিজ্ঞাসা করিতে চাহ, তাহা জিজ্ঞাসা করিতে পার।"

এই কথা শুনিয়া, নগেন্দ্র তাঁহার সাক্ষী শ্রীযুক্ত বাবু রামচন্দ্র রক্ষিতকে ডাকিলেন।

নগেন্দ্র।—আপনি কি কাজ করেন?

রামচন্দ্র।—আমি ডাক্তারি করি।

নগেন্দ্র।—আপনি কত দিবস হইতে ডাক্তারি করিতেছেন।

রামচন্দ্র।—প্রায় ২০ বৎসর পর্য্যন্ত।

নগেন্দ্র।—আপনি ডাক্তারিতে পাস করিয়াছেন কি না?

এইকথা শুনিয়া জজ ও জুরিগণ কহিলেন,—"এসম্বন্ধে রামচন্দ্র বাবুকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার আবশ্যক নাই। কারণ, রামচন্দ্র বাবু এই স্থানের একজন প্রসিদ্ধ পাস-করা ডাক্তার, তাহা সকলেই অবগত আছেন। এই মকর্দ্দমা-সম্বন্ধে তুমি রাম বাবুকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতে চাহ, তাহাই জিজ্ঞাসা কর।"

নগেন্দ্র।—মহাশয়, আপনি আমাকে কত দিবস হইতে চিকিৎসা করিতেছেন, কোন্ রোগের চিকিৎসা করিতেছেন, এবং যদি আমার কোন রোগ থাকে, তাহার অবস্থাই বা কি?

রামচন্দ্র।—আমি প্রায় পাঁচ বৎসর হইতে তোমাকে চিকিৎসা করিতেছি। তোমার ধ্বজভঙ্গ রোগ আছে; আর, ঐ রোগ যে সহজে আরোগ্য হইবে, তাহাও বোধ হয় না।

নগেন্দ্র।—মহাশয়, আমার যে রোগ আছে কহিলেন, তাহাতে আমি স্ত্রী-সংসর্গ করিতে সমর্থ কি না?

রামচন্দ্র।—এ রোগ যাহার আছে, সে স্ত্রী-সহবাসে সমর্থ হইতে পারে না।

এই কয়েকটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে না করিতেই, জুরিগণ আসামীকে নিরস্থ করিয়া কহিলেন,—"রামচন্দ্র বাবুকে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবার আবশ্যক নাই। এখন দেখিতেছি; তুমি নির্দ্দোষী; আর, এই মকর্দ্দমা তোমার বিরুদ্ধে অন্যায়রূপে আনা হইয়াছে।"

জুরিগণের এই কথা শুনিয়া জজ সাহেব কহিলেন,—"আমারও ঐ মত। যে ব্যক্তি স্ত্রী-সহবাস করিতে কোন ক্রমে সমর্থ নহে, তাহা দ্বারা এই কার্য্য কোনরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। সুতরাং আমি নগেন্দ্রনাথকে নির্দ্দোষী সাব্যস্থে মুক্তিপ্রদান করিলাম।"

প্রহরিগণ নগেন্দ্রনাথকে ছাড়িয়া দিলেন। তিনি হাসিতে হাসিতে আদালতের বাহিরে আসিলেন। আদালতের বাহিরে আসিয়া দেখেন, কালীপ্রসন্ন দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহাকে দেখিয়া, নগেন্দ্রনাথ কহিলেন,—"খুব এক খেলা খেলিয়াছিলে। কিন্তু আমিও নগেন্দ্রনাথ, ইহার প্রতিশোধ আমিও একবার লইতে চেষ্টা করিব। তাহা পূর্ব্বেই তোমাকে বলিয়া দিলাম। তুমি পার ত এখন হইতে সাবধান থাকিও।" এই বলিয়া নগেন্দ্রনাথ আপন বাড়ী-অভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

এইস্থানে পাঠকগণকে বোধ হয় বলিয়া দেওয়া উচিত যে, কামিনী, কালীপ্রসন্ন ঘোষেরই এক জন রক্ষিতা স্ত্রীলোক; এবং তাহারই পরামর্শে সে এই মিথ্যা মকর্দ্দমা রুজু করিয়াছিল। আর, সাক্ষীদ্বয়ও মিথ্যা সাক্ষী দিয়াছিল। কিন্তু ডাক্তার ব্রজলাল মিথ্যা কথা কহেন নাই; তিনি বাস্তবিকই কামিনীর অঙ্গে পুরুষ-সহবাসের চিহ্ন দেখিয়াছিলেন। কিন্তু সেই সহবাস নগেন্দ্র কর্ত্তৃক নহে, কালীপ্রসন্নের পরামর্শমত অন্যপুরুষ কর্ত্তৃক। নগেন্দ্র যখন দেখিলেন, তাঁহার আর এই মকর্দ্দমা হইতে নিস্তার নাই, তখন তিনি, রামচন্দ্র বাবুর হাতে-পায়ে ধরিয়াই হউক বা ভিজিটের জোরেই হউক, তাঁহাকে বশীভূত করিয়াছিলেন বলিয়াই রামবাবু সাক্ষ্য প্রদান করেন। বাস্তবিক কিন্তু নগেন্দ্রের ধ্বজভঙ্গ বা কোন পীড়াই নাই।

কবিতা ও গান।

রূপ-লালসা।

(১)

ও তোর মুখের হাসি, কেন এত ভালবাসি,
কেন তোর রূপ দেখে মিটে না বাসনা?
ও তোর সুন্দর রূপে, কি আছে রে, ব'লে দেরে,
কেন তোর রূপ করে আমারে ছলনা?
যখনি রে তোরে ভাবি, ভাবের সাগরে ডুবি,
তবু তোর রূপতত্ত্ব পারি না বুঝিতে।
ভেবে ভেবে অনুক্ষণ, কি জানি কোথায় মন,
চ'লে যায়, কিছুতেই পারি না ধরিতে।
সকলি ভুলিয়া যাই, শুধু তোর মুখখানি,
আমার মনের চক্ষে হাসিধারা ঢালে।
ভালবাসা-মাখা মুখে, ভালবাসা-মাখা হাসি,
তাহে তোর আঁখি দু'টি নাচে তালে তালে।
কে রে তুই? কেন দেখা দিলি?
দেখা দিয়ে প্রাণ কেড়ে নিলি।

(২)

তোরে দেখিবার তরে, মন যে কেমন করে,
ইচ্ছা হয় দিবানিশি তোরে কাছে রাখি ;
আত্মহারা হ'য়ে যাই, শুধু তোর পানে চাই;
হৃদয়-পিঞ্জরে তোরে ধ'রে রাখি, পাখী !
আয় আয়, কাছে ব'সে থাক্।
প্রাণ মোর জ্বালা ভুলে যাক্॥

২৬এ ভাদ্র, ১২৯০।

কৈ এল সে ?

মিয়া-মল্লার—যৎ।

ব'সে বঁধূয়ার পাশে, গলা ধ'রে হেসে হেসে,
আধ আধ প্রেমভাষে ব'লে গেল সে,—
'যাবত জীবন রবে, জীবন তোমারি হবে।'
আরো যে কতই কথা বলে গেল সে।
তখন সে কথা শুনে, বিশ্বাস হইল মনে,
'প্রেমে-বাঁধি নিরবধি থাকিবে দুজনে' ;—
কত দিন হ'ল গেল, কত রাতি পোহাইল,
বঁধূয়া বিবশা হ'ল, **কই এল সে ?**

মিয়া-মল্লার—ধামার।

শ্রীমুখ-চন্দ্রে কবিতা-ছন্দে,
প্রেম আনন্দে কিরণ ভায় ;
চকোর রঙ্গে বাসনা সঙ্গে,
পিয়াস-ভঙ্গে পিবতি ধায়।
অসীম বিশ্ব হতেছে দৃশ্য,
মোহ-রহস্য সকলি তায়,
হেরিয়ে তোমার বিমল আস্য,
এ ভব ভবন কিছু না চায়।
একা একাসনে আছিল বাস,
সুদূরে হাসিত শশীর হাস,
এবে হেরে তোরে হৃদে প্রকাশ,
শশী-হাসি-জ্যোতি মলিন পায়।

সংসার।

"স্বার্থপর যদি মানবজীবন—
আত্মসুখ যদি জীবের কামনা,
অনুরাগ যদি সুধু বিনিময়—
কেন স্নেহমায়া প্রণয়-কল্পনা !
নয়ন মুদিয়া ভাব রে মানব
সুখ-দুঃখ-ময় জীবন তোমার,
ভ্রমিছ কি সুধু বিপণির মাঝে
হৃদয়ে ধরিয়া প্রেমের ভাণ্ডার !

দেখ চেয়ে ওই গৃহ-পানে তব
ভ্রমে চারিধার প্রাণের পুতলি,
পলকে পলকে যে মুখ নিরখি
আনন্দে হৃদয় উঠিছে উথলি !
সে কি রে কেবলি বণিকের মেলা !
মানব রে আঁখি খুলিওনা আর,
কার মুখ হেরি জীবন-সংগ্রামে
হৃদয়-শোণিত ঢালিছ তোমার !

(২)

ভেঙ্গে ফেল তব সাধের ভবন
চূর্ণ কর ওই আভরণ তার,
শাণিত ছুরিকা দেও বসাইয়া
বুকে বুকে ওই গৃহ-প্রতিমার,
উপাড়ি নয়ন অভ্যন্তর তার
দেখ ছুরিকায় করিয়া বিদার,
ছিল কি না ছিল সরলতা বিন্দু
শিরায় শিরায় কোনখানে তার,
নাহি মিলে যদি দৃষ্টিপথ হ'তে
পদাঘাতে তায় কর অপসৃত,
গৃহে গৃহে বহ্নি করিয়া সংযোগ
কর রে সংসার ভস্মে পরিণত।
প্রতারণা সুধু করি উপাসনা
কোন অভিলাষ করিবে পূরণ !
হেন নর-নারী করিয়া পোষণ
করিবে কি ধরা পাপে নিমগন !

(৩)

ধর রে মানব নৃশংস প্রকৃতি
অরণ্য-আবাসে আছিলে যেমন,
জীব-রক্তস্রোত করি প্রবাহিত
কর বসুধার পাপ প্রক্ষালন,
এ নহে তোমার সাধের সংসার—
অরণ্য-অধিক গহন ভীষণ,
এ নহে তোমার সাধের সে প্রাণী—
পিশাচের বংশ করিছ সৃজন,
সুদুর্লভ সেই স্বাধীনতা তব
ত্যজিলে কি এই নরকের তরে !
অকপট সেই নৃশংসতা ত্যজি
হীন প্রবঞ্চনা ধরিছ অন্তরে !
যুগযুগান্তর নিরখি প্রকৃতি
লভিলে মানব শেষে এই জ্ঞান !"
ধর নিজ বীর্য্য কর রে সংহার
নরের বসতি কর রে শ্মশান।

(৪)

ছিল এ ধরণী যে অরণ্যময়
সে অরণ্য তায় কর আর বার,
ভক্ষ্য-পেয় তব হইবে সুলভ
এ শ্রম-ভাবনা রহিবে না আর।
কত পরিজন মিলিবে তোমার
অকপট প্রাণে রবে অনুগত,
জটিল সমাজ কুটিল প্রথায়
করিতে নারিবে প্রাণ কলুষিত।
ন্যায়ের ছলনা না রহিবে তথা—
না রহিবে তথা সাম্যের ভাণ,
সৃজিয়া অভাব রচি পাপ-পুণ্য
অকারণ ক্লেশ না সহিবে প্রাণ।
নৃশংসতাময় হেরিবে অরণ্য
সেই পরিতাপ রহিবে জীবনে,
হেরিব না এই ধরার কলঙ্ক
হীন প্রতারণা কখন নয়নে।

(৫)

বল রে সংসার বল একবার
সত্য কি হৃদয়ে নাহি তব প্রাণ !
বসুধা-বিস্তৃত হৃদয়-জগতে
নিরখি কি সুধু মমতার ভাণ।
সত্যরূপা ওই প্রকৃতির মাঝে
করিছ কি নিত্য মিথ্যা অভিনয় ?
ঝরিছে যে সুধা অধরে নয়নে
সে কি রে কেবলি প্রতারণাময় !
প্রতারণা কি রে প্রিয়ার সে হাসি—
প্রতারণা কি রে তার অশ্রুজল !
প্রতারণা কি রে সন্তানের মুখে
বিকশিত যেই ভক্তির কমল !
সোদরের ওই মঙ্গলকামনা—
সোদরের ওই দেহভরা প্রাণ,
সুহৃদের ওই অপার্থিব ভাষা,
সে কি রে কেবলি—কেবলি ভাণ !

(৬)

বিরাগের রেখা হেরিয়া ও মুখে
প্রাণের পরাণ উঠিছে আকুলি,
কণা অভিমান হেরিয়া উহার
হৃদয়-পিঞ্জর পড়িছে বিগলি !
হেরি অশ্রুকণা নয়নে উহার
নয়নের দ্যুতি নিবিয়া যে যায় !
হেরি মৃদুহাসি অধরে উহার
পারিজাত ফোটে শ্মশানের গায় !
সসীম হৃদয়ে উহাদেরি তরে
ধরিয়া রেখেছি অসীম বাসনা,
ওই মুখ হেরি মানবজীবনে
ধরিয়াছি বুকে দেবের কামনা !
সে কি রে কেবলি অলীক স্বপন
মরুভূ-হৃদয়ে সরসী-রচনা !
স্নেহ মায়া প্রেম নরের সংসারে
কেবলি কি সুধু স্বার্থের ছলনা !

(৭)

কোথা বিশ্বপিতঃ ! দেখ একবার
এ মানব কি হে তোমার সৃজন !
জনক জননী সৃজিলে যে করে
এ জীব কি তায় করিলে গঠন !
যে হৃদয়ে তব— জগতের মণি—
প্রাণের ভূষণ—প্রণয়-কল্পনা,
সে হৃদয়ে কি হে করিলে রচনা
হীনতম এই পাপ-প্রতারণা !
যে মধুর ভাবে সুধাময় ভাষা—
"প্রিয়" শব্দ দেব ! করিলে সৃজন,
সে ভাব কি পিতঃ ! গিয়াছিলে ভুলি
সৃজিলে যখন ছলনা ভীষণ !
সৃজিলে হে যদি নরক-কলঙ্ক
নারকীর বুকে না রাখিলে কেন ?
বদন নয়ন শোভিত সুন্দর
নরহৃদে কেন গরল এমন !

(৮)

ব'লে দেও পিতঃ ! ভ্রম এ আমার—
নহে পণ্যশালা নরের সংসার,
বুকে বুকে হেথা মাখা সরলতা
মুখে মুখে হেথা নির্ঝর সুধার ;
জীবনের গ্রন্থি নহে স্বার্থ তার—
পরিজন তার জীবন-বন্ধন,
প্রীতি নহে তার— ইন্দ্রিয় প্রসাদ,
প্রীতি পরিজনে আত্ম বিতরণ,
জড় রজতের অর্চ্চনা তাহার
সে কেবলি জড় জীবনের তরে,
প্রাণ জগতের রতন-ভাণ্ডার
বিতরিছে সদা উদার অন্তরে।
এই যেন সত্য হয় বিশ্বনাথ !
মিথ্যা যেন হয় কল্পনা আমার,
মানবের এই সাধের সংসার
নাহি যেন ধরে নরক আকার।

সাহিত্য।

অনুসন্ধান-সমিতির বিবরণী।

প্রতারণা-প্রবঞ্চনা।

পূজার বাজারের

বিজ্ঞাপন-জারির ধূম এখন হইতেই পড়িয়া গিয়াছে। সকলেরই পূজার আয়োজন—অনেকেই পূজা পর্য্যন্ত হয় উপহার দিতেছেন, নয় দাম কমাইতেছেন! ফলতঃ এসময় চারিদিকেই চটক্! কে ভাল, কে মন্দ চিনিবার কষ্ট এসময় যত অধিক, তত আর কখনই নহে। সুতরাং সাধারণে সাবধান—বিশেষ জানা-শুনা দোকান নহিলে কোথাও বিপাকে পড়িয়া ঠকিবেন না!

'ভারত-কুসুম'

মাসিকপত্রের বিজ্ঞাপন দেখিয়া, উক্ত পত্রিকা-সম্বন্ধে এবং উহাতে বিজ্ঞাপিত পুস্তকাদি-সম্বন্ধে আমরা যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলাম, কার্য্যতঃও এখন দেখিতেছি, ঠিক তাহাই হইতেছে। এ সম্বন্ধে আমরা আর অধিক কিছু না বলিয়া, আমাদের একজন সহৃদয় গ্রাহক-মহাশয়ের ঐ সম্বন্ধীয় পত্রখানি এইখানেই প্রকাশিত হইল। দেখিবেন, পাঠক, কি শোচনীয় ব্যাপার! পত্রখানি এই,—"'ভারত-কুসুম'নামক মাসিকপত্রিকার সম্পাদক এ, সি, ঘোষ, বনামে অঘোরচন্দ্র ঘোষ নামক জনৈক সম্পাদক, ঘোষ এণ্ড সন্স, ১১নং গোবর্দ্ধন দাসের লেন, কলিকাতা,—এই ঠিকানায় তাঁহার 'ভারত-কুসুমে' কতকগুলি ভাল ভাল পুস্তকের উচিত মূল্যেই বিজ্ঞাপন দিয়াছেন।

পত্রিকা-সম্পাদক মহাশয়েরা কখনই প্রতারণা করেন না,—এই বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া ঐ বিজ্ঞাপন হইতে আমার মনোনীত কতকগুলি ভাল ভাল পুস্তক পাঠাইতে অর্ডার দিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি ভাল পুস্তকের পরিবর্ত্তে বটতলার কতকগুলি রাবিশ পুস্তক যাহা আনায় ৫।৬ খান করিয়া বিক্রি হয়, তাহার কতকগুলি পুস্তক ভিঃ পিঃ পোষ্টে পাঠাইয়া আমাকে যৎপরোনাস্তি প্রতারিত করিয়াছেন। অতএব বিনীত নিবেদন এই যে, অন্যান্য মহোদয়গণকে এইরূপ প্রবঞ্চক ব্যক্তির প্রতারণা হইতে রক্ষা করিবার জন্য এবং এই প্রতারণার প্রতিবিধান-জন্য উল্লিখিত কয়েক পংক্তি মহাশয়ের অনুসন্ধানে উঠাইয়া দিলে চিরবাধিত হইব।

বশম্বদ—শ্রীহরনারায়ণ তেওয়ারি।"

এ সম্বন্ধে আমরা আর কি বলিব? এখন ঘোষ মহাশয় যদি কোন উত্তর দিতে পারেন, তাহা হইলেই সুখী হই।

অঙ্গুরী বা কেমিকেলের

গহনা প্রভৃতির সহিত ঘড়ি প্রভৃতি যে সকল দ্রব্য উপহার দিবার কথা থাকে, কোন কোন গ্রাহক তাহা পান না,—এইরূপ আমরা কোন কোন কোম্পানীর নামে অভিযোগ পাই। এবারও আমরা তাঁহাদের নাম করিতে ইচ্ছা করি না। কিন্তু গ্রাহকগণ যদিও ঐ সকল দ্রব্য ক্রয় করেন—যদিও গাধার দামে হাতিতে চড়ার সুখ উপভোগ করিতে চাহেন, তবে এখন হইতে একটু সতর্ক হইবেন। অন্ততঃ উহাঁদের মধ্যে কে একটু ভদ্র, তাহা জানিয়া, তবে অর্ডার দিবেন। না দিলে যার তার কুহকে পড়িয়া শেষে বঞ্চিত হইতে হইলে বড়ই দুঃখের কথা! একে আসল জিনিসই—যেটার সঙ্গে উপহার, সেটাই যখন কিছু নহে; তখন তার সঙ্গের উপহারটাও যদি কেহ না পান, তবে তাহা অপেক্ষা আপ্‌শোষের কথা আর কি আছে? তাই বলি, বিশেষ জানিত দোকান ভিন্ন—জানিয়া-শুনিয়া না লইয়া, কিছুতেই কেহ ওরূপ কোন জিনিসের অর্ডার দিবেন না। বিশেষতঃ এই পূজার মুরসুমের সময় আরও সতর্ক হওয়া দরকার।

প্যাটেণ্ট ঔষধের বাজারে

অনেক রকমেরই জুয়াচুরী হইয়া থাকে। কাজেই কে সৎ ও কে অসৎ, তাহা কিছুতেই বুঝিবার যো নাই—চারিদিকেই, সেই দারুণ বিভীষিকা! এরূপ সময়ে প্রকৃতই ভাল ঔষধ বলিয়া যদি কোনটীর পরিচয় পাওয়া যায়, তবে এ অবস্থায় সাধারণে সে কথা প্রচার না করিলেও কর্ত্তব্যের ত্রুটী হয়। তাই আমরা যেরূপ জানিতে পারি, মধ্যে মধ্যে দুই একটী ঔষধের বা দ্রব্যের গুণের বিষয়ও 'অনুসন্ধানে' প্রকাশ করিয়া থাকি। আর এই জন্যই সম্প্রতি আমরা আহ্লাদ সহকারে প্রকাশ করিতেছি যে, ৺ কামিনীমণি দেবীর আবিষ্কৃত অর্শের ঔষধটিতেও অনেকে উপকার পাইয়াছেন; ক্যাম্বেল হাঁসপাতালের ডাক্তারেরাও উহা ব্যবহার করিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিতেছেন। কাজেই অর্শ-রোগাক্রান্ত ব্যক্তিগণ উহা ব্যবহার করিয়া দেখেন, এই বাসনা। প্রশংসাপত্রাদি দেখিয়া এবং উহার বিষয় শুনিয়া বাস্তবিকই আমাদের বিশ্বাস হইয়াছে যে, উহার দ্বারা প্রকৃতই উপকার হইতে পারে।

——

অনুসন্ধান

অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র

[৫ম খণ্ড] ১৫ই আশ্বিন, ১২৯৮। [৫ম সংখ্যা।

কালী-কীর্ত্তন।

(৺ রামপ্রসাদী সুর।)

মন্ কবে, সেবিবে কালী?
একাল্ ওকাল্ সেকাল্ বলে,
সকল্ কালই গেল চলি।
তবু বিষয়-মদে মত্ত হয়ে তত্ত্বজ্ঞান রইলে ভুলি॥
কালাকাল বিচার নাই কালের,
সদাকাল 'সে' ঘুরছে খালি,—
এসে গলায় ফাঁসি, লাগায় কসি,
দয়া নাই দীন-দুঃখী বলি॥
কালে যখন যাবে, কালের ভ্রুকুঞ্চনে, জীবন চলি,
তখন রক্ষা কে, করিবে রে মন!
বিনা সেই 'রক্ষাকালী॥'
দেখে নিত্য, সব অনিত্য,
তবু (ও) নেশায় আছে ঢলি,—
হয় না একটু ভ্রুক্ষেপ, 'এইত' আক্ষেপ,
নিজের দোষে মজে গেলি॥

——

যোগ ও যোগানুষ্ঠান। *

যোগীদিগের বার্ত্তমানিক জীবনেই অমরত্ব-লাভের প্রধান উপায়-স্বরূপ প্রাণায়ামানুষ্ঠান দ্বারা শরীরের লঘুতা জন্মে। প্রাণায়ামে প্রাণবায়ুর (হৃদয়স্থিত নাসাগ্রবর্ত্তী বায়ুর) ধারণাধীন দীর্ঘজীবন লাভ হয়।

প্রাণায়ামের অভ্যাস-সময়ে (১ম) স্থান-নির্ণয়, (২য়) কাল-নিরূপণ, (৩য়) পরিমিতাহার, এবং (৪র্থ) শরীরস্থ নাড়ীশুদ্ধির আবশ্যকতা। ইহার ব্যতীক্রম ঘটিলে উৎকট রোগাদি জন্মে।

(১) যোগীদিগের ভক্ষণীয় সুলভ, প্রাচীর-পরিবেষ্টিত, সুপরিষ্কৃত স্থানে ও নির্ম্মল জলাশয়-সন্নিধানে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে প্রথমতঃ প্রাণায়াম অনুষ্ঠান করিবেক। ইহাই যোগ-শাস্ত্রে প্রাণায়ামের উপযুক্ত স্থান-নির্ণয় হইয়াছে। তদ্ভিন্ন কতিপয় স্থান নিতান্ত বিরুদ্ধ; যথা,—অবিশ্বস্ত দূরদেশ, ভক্ষ্য-বর্জ্জিত অরণ্য, যোগবিঘ্নকর জনাকীর্ণ স্থান, এবং হিংস্র জল-জন্তু-পূর্ণ নদ্যাদির তট, যোগীগণ বর্জ্জন করিবেক।

(২) যোগীগণ প্রথমতঃ বসন্তকালে ও শরৎকালে প্রাণায়ামাদি যোগানুষ্ঠান করিবেক। হেমন্ত, শিশির, গ্রীষ্ম ও বর্ষা ঋতুতে যোগানুষ্ঠান করিলে নিশ্চয়ই রোগাক্রান্ত হইবে।

(৩) যোগশাস্ত্রে যোগীদিগের পথ্যাপথ্য-সম্বন্ধে বিস্তীর্ণ বিধি প্রকাশিত রহিয়াছে। তৎসারাংশ এই;—হৈমন্তিক শুক্লতণ্ডুলান্ন, যব ও গোধূম-পিষ্টক, মুগ, মাষ, বুট (ছোলা) নিস্তুষ করিয়া আহার করিবেক। পটোল, গোলমরিচ, কিস্‌মিস্, কাঁকুড়, ডুম্বর (ডুমুর), খারকান কচু, কাঁচাকলা, সুপক্ক রম্ভা, ভারাড়ী (ভাদ্দইর), মুলা এবং বেগুন (বার্ত্তাকু) ভক্ষণ করিবেক। শাকের মধ্যে, ১। বানাশাক, ২। পটোলপত্রের শাক, ৩। বেউত

* পূর্ব্ব-সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর।

শাক, ৪। পানিহেলিঞ্চা, ৫। কালশাক, এই পাঁচ শাক খাইবে। ননী, ঘৃত, দুগ্ধ, গুড়, চিনি, নারিকেল, দাড়িম, সইক্ষু-সম্ভব লোনাফল, মিষ্ট আম, এলাচি, জাতিফল, লবঙ্গ, হরিতকী, খেজুর ভক্ষণ করিবেক। আহারের নিয়ম,—অন্ন-ব্যঞ্জনাদি দ্বারা উদরার্দ্ধ পূর্ণ করিবেক; জল দ্বারা তৃতীয় ভাগ পূরিবে। বায়ুর গতির নিমিত্তে (উদরে বায়ুর বিচরণার্থে) চতুর্থভাগ যত্নক্রমে রক্ষা করিবেক।* অতিশয় ঝাল, অম্ল দ্রব্য, অতি লবণ ও তিক্ত দ্রব্য, ভৃষ্ট (ভাজা) দ্রব্য ও দধি, উৎকট শাক, মদ্য, তাল, কাঁঠাল, মসুর, কুষ্মাণ্ড, লাউ এবং বেল প্রভৃতি অন্যান্য দ্রব্য ভক্ষণ করিবেক না। বিশেষতঃ যোগারম্ভ-সময়ে পথ-পর্য্যটন, স্ত্রীসম্ভোগ এবং অগ্নির উত্তাপ গ্রহণ সর্ব্বথা প্রকারে বর্জ্জন করিবেক। কিন্তু শুদ্ধ সুমধুর ও স্নিগ্ধ অন্যান্য অনুক্ত দ্রব্যও ভক্ষণ করিতে পারিবেক। কেবল কাঠিন্য, দূরিত, দুর্গন্ধ, উষ্ণ ও পর্য্যুসিত এবং অতীশত্য ও অত্যুগ্র দ্রব্য ভক্ষণ করিবেক না। এবং প্রাতঃস্নান, উপবাস ও কায়ক্লেশকর কার্য্য (অর্থাৎ বায়ু বদ্ধক কার্য্য-মাত্রই) ত্যাগ করিবেক। দিবাতে ও রাত্রে যথাসময়ে ভোজনদ্বয় করিবেক, এবং যোগের আরম্ভ-সময়ে দুগ্ধ ও ঘৃত প্রতিদিন ভোজন করিবেক।

(৪) পূর্ব্বোক্তরূপে সংযত যোগিগণ, ১। কুশাসন, ২। মৃগচর্ম্ম, ৩। ব্যাঘ্রচর্ম্ম, ৪। কম্বল কিম্বা ৫। তুলাদ্বারা পূর্ণ উচ্চাসনে আসীন হইয়া নাড়ীশুদ্ধি পূর্ব্বোক্ত ধৌতকর্ম্ম-দ্বারা সম্পন্ন করিবেক। সমন্ত্রক নাড়ীশুদ্ধি বায়ুবীজ (যং), অগ্নিবীজ (রং), বরুণবীজং (বং) এবং চন্দ্রবীজ (লং), এইবীজ চতুষ্টয়-দ্বারা পূরক (১৬ মাত্রায়), কুম্ভক (৬৪) মাত্রায়, এবং রেচক (৩২) মাত্রায় প্রত্যেকে চারিবার করিবেক। এবং ভূতশুদ্ধি-প্রকার অবলম্বন করিয়া নাড়ীশুদ্ধি-চিন্তা করিবেক। এইরূপে নাড়ীশুদ্ধি হইলে প্রাণায়াম অনুষ্ঠান করিবেক। যোগশাস্ত্রে প্রাণায়াম আট প্রকার প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা,—১। সহিত, ২। সূর্য্যভেদ, ৩। উর্জ্জায়ী, ৪। শীতলী, ৫। ভস্ত্রিকা, ৬। ভ্রামরী, ৭। মূর্চ্ছা, ৮। কেবলা। এই আট প্রকার কুম্ভকের অনুষ্ঠান-পদ্ধতি যোগশাস্ত্রে বিশেষরূপে বর্ণিত রহিয়াছে। এই প্রাণায়াম-সকলের সান্বর্থ সংজ্ঞাসকল যোগশাস্ত্রে দ্রষ্টব্য। ইহার মধ্যে সহিত কুম্ভক দ্বিবিধ,—সগর্ভ ও নির্গর্ভ। বীজপূরিত সগর্ভ, এবং কেবল বায়ুপূরণ নির্গর্ভ। উত্তম, মধ্যম, অধম ভেদে প্রাণায়াম ত্রিবিধ। যথা,—২০ মাত্রায় * পূরণ, ৮০ মাত্রায় ধারণ, ৪০ মাত্রায় রেচনাত্মক প্রাণায়াম উত্তমরূপে উক্ত হইয়াছে। ১৬ মাত্রায় পূরণ, ৬৪ মাত্রায় ধারণ, ৩২ মাত্রায় রেচনাত্মক প্রাণায়াম মধ্যম। ১২ মাত্রায় পূরণ, ৪৮ মাত্রায় ধারণ, ২৪ মাত্রায় রেচনাত্মক প্রাণায়াম অধমরূপে বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ৮ মাত্রায় পূরণ, ৩২ মাত্রায় ধারণ, ১৬ মাত্রায় রেচনাত্মক প্রাণায়াম অধমাধম নির্ণীত হইয়াছে। ৪ মাত্রায় পূরণ, ১৬ মাত্রায় ধারণ, ৮ মাত্রায় রেচন, সর্ব্বনিকৃষ্ট প্রাণায়াম-মধ্যে গণ্য। এই পাঁচপ্রকার দ্বারা পূর্ব্বোক্ত আট প্রকারকে গুণ করিলে ৪০ প্রকার প্রাণায়াম হয়। সহিত প্রাণায়ামের দ্বৈবিধ্য ধরিলে ৪৮ প্রকার প্রাণায়াম হইতেছে।

প্রাণায়াম-সিদ্ধির প্রত্যক্ষ প্রমাণ নিরূপিত হইয়াছে। যথা,—অধম প্রাণায়াম-দ্বারা শরীরে এবং নখে ও কেশে ঘর্ম্মোদয় হয়। মধ্যম প্রাণায়াম দ্বারা পৃষ্ঠস্থ মেরুদণ্ড পর্য্যন্ত কম্পিত হয়। এবং উত্তম প্রাণায়াম দ্বারা ভূমিত্যাগ-পূর্ব্বক আকাশে (শূন্যে) অবস্থিতি করিতে সক্ষম হয়।

* দ্বৌভাগৌ পূরয়েদন্নৈভাগমেকঞ্চবারিনা।
বায়ু-প্রচলনার্থায় শেষং রক্ষেৎ প্রযত্নতঃ॥

* প্রাণায়ামের মাত্রা শব্দের অর্থ এই যে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক বায়ু বিচ্ছেদভাবে টানিতে হয়। যথা,—ওঁ—শ্বাস টানিয়া বিচ্ছেদ—পরে আর বার—ওঁ—এইরূপে টানিতে হয়।

প্রতিনিয়ত প্রাণায়ামে ক্রমশঃ বিবিধ নাদ শ্রবণ হয়। যথা,—প্রথমে ঝিঁ ঝিঁ কীটের নাদ, (শব্দ) কর্ণে উত্থিত হয়। ক্রমে বাঁশির নাদ, তৎপরে মেঘের ঘর্ঘর শব্দ, তদনন্তরে ঘণ্টা, কাঁশী, ভেরী, তুরী, মৃদঙ্গ, বীণা, পিনাক এবং দুন্দুভির নাদ শ্রবণ হইয়া থাকে। তদনন্তর হৃদয়স্থ অনাহত চক্র হইতে যে মনোজ্ঞ শব্দ উত্থিত হইয়া থাকে, সেই শব্দে প্রমুগ্ধ ও আনন্দময় যোগীবর জ্ঞান-চক্ষু দ্বারা পরব্রহ্মের পরম পদ প্রত্যক্ষ করিতে শক্ত হন।

প্রাণায়ামের অবশ্য-কর্ত্তব্যতা-সম্বন্ধে যোগশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। প্রাণিদিগের প্রতি দিবা-রাত্রে নিয়মতঃ ২১৬০০ শ্বাস-প্রশ্বাস হইয়া থাকে; ইহাকে অজপা কহে। মনুষ্যদিগের মধ্যে কর্ম্মক্ষম ব্যক্তিদিগের শরীর ৯৬ অঙ্গুলী প্রমাণ (চারি হস্ত প্রমাণ) হয়। স্বভাবতঃ মনুষ্যদিগের দেহ হইতে দ্বাদশাঙ্গুল পরিমিত বায়ু নিঃসৃত হয়। সঙ্গীত করিতে ১৬ অঙ্গুল, ভোজনে ২০ অঙ্গুল, পথ-পর্য্যটনে ২৪ অঙ্গুল, নিদ্রা-সময়ে ৩০ অঙ্গুল, মৈথুনে ৩৬ অঙ্গুল, ব্যায়ামে ৪০ অঙ্গুল, কিম্বা ততোধিকও দীর্ঘ বায়ু প্রবাহিত হয়। স্বাভাবিক বায়ুর (প্রাণ-বায়ুর নিশ্বাস-প্রশ্বাসের) গতির লাঘব করিতে পারিলে নিশ্চয়ই পরমায়ুর বৃদ্ধি হইবে। বায়ু নিয়মের অতিরিক্ত প্রবাহিত হইলেই অল্পায়ু হইবে। অতএব প্রাণায়াম দ্বারা প্রাণবায়ুর গতির লাঘব করিয়া সঞ্চয় করিতে পারিলে অবশ্যই দীর্ঘজীবন হইবে; এমন কি, প্রাক্তন দীর্ঘজীবী মুনিদিগের ন্যায় বার্ত্তমানিক যোগিগণও দীর্ঘজীবী হইয়া পরমানন্দ অনুভব করিতে সক্ষম হইবে। এই নিমিত্তই যোগশাস্ত্রে প্রাণায়ামের বহু প্রশংসা প্রকাশ পাইয়াছে। অতএব দীর্ঘজীবন-কামী অবশ্য প্রাণায়াম অনুষ্ঠান করিবেক।

ধ্যান।—যোগশাস্ত্রে ঈশ্বর-ধ্যান ত্রিবিধ উক্ত হইয়াছে। যথা,—১। স্থূলধ্যান, ২। সূক্ষ্মধ্যান, ৩। জ্যোতির্ধ্যান। এই ধ্যানানুষ্ঠান দ্বারা আত্ম-প্রত্যক্ষ হয়, এবং তন্ময়তা জন্মে। সাধারণ কীট যেমন কুমীরা কীটের চিন্তায় তন্ময় হয়, তদ্রূপ জীবও পরব্রহ্মের প্রগাঢ় চিন্তায় তন্ময়তা লাভ করে। সমাধি।—ধ্যানদ্বারা আত্ম-সাক্ষাৎকার হইলে চরমানুষ্ঠেয় জীব-ব্রহ্মের অভেদাত্মক বোধ-রূপ চরম যোগের নাম সমাধি। সমাধি দ্বারা নির্ব্বাণ মুক্তিলাভ হয়। যোগশাস্ত্রানুসারে সমাধির সময়ে ষড়বিধ রাজযোগ হইয়া থাকে। যথা,—১। ধ্যান, ২। নাদ, ৩। রসানন্দ, ৪। লয়সিদ্ধি, ৫। ভক্তিযোগ, ও ৬। মনোমূর্চ্ছা। এই ষড়বিধ রাজ-যোগের লক্ষণ ও পার্থক্য যোগশাস্ত্রে বিশেষ বর্ণিত হইয়াছে। 'শিবসংহিতায়' রাজযোগের পরেও রাজাধিরাজ যোগ হয় বলিয়াছেন। ফলে এই সকল নির্ব্বাণের প্রকারতা ভেদ-মাত্র। সুতরাং যোগীদিগের পরম-পুরুষার্থ লাভ যুক্তি ও শাস্ত্রানুসারে সুখ-সাধ্য বলিয়া প্রতীতি হয়।

যোগী দ্বিবিধ,—(১) যুক্ত, (২) যুঞ্জানা। যাঁহার সর্ব্বদা পরব্রহ্মের ভান (অনুভব) হয়, তাঁহাকে যুক্ত যোগী বলে; এবং যাঁহার চিন্তা দ্বারা পরম ব্রহ্মের অনুভব হয়, তাঁহাকে যুঞ্জান যোগী বলে। যোগসাধনের কতকগুলি মহান্ বিঘ্ন আছে; যোগীদিগের তদ্বিষয়ে সাবধান হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। যথা,—বিষয়ভোগেচ্ছা যোগের পরম প্রতিবন্ধক। স্ত্রী-সম্ভোগ, অপূর্ব্ব শয্যা, মনোরম বস্ত্র, ধন-সম্পত্তি, তাম্বুলাদি ভক্ষণ, রথ-শকট-শিবিকাদি আরোহণ, রাজ্যৈশ্বর্য্য, নানাবিধ ঐশ্বর্য্য, স্বর্ণ-রৌপ্য-তাম্রাদি এবং হীরক-প্রবাল-মণিমুক্তাদিতে লোভ,যোগবিঘ্নকর। অগুরু প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য গ্রহণ, গোধনাদি লাভ, বেদশাস্ত্রাদিতে পাণ্ডিত্য-প্রকাশ, নৃত্যগীত ও নানাবিধ ভূষণাদি সামগ্রী-সেবন, বীণাবেণু ও মৃদঙ্গাদি যন্ত্র-বাদন বা তচ্ছ্রবণাদিতে আগ্রহতা, হস্ত্যশ্বাদি বাহনারোহণ, এবং স্ত্রী-পুত্রাদিতে আসক্তি,যোগবিঘ্নকর। যোগসাধনে কতিপয় ধর্ম্মানুষ্ঠানরূপ যোগ-বিঘ্ন হইয়া থাকে; এবং কতিপয় জ্ঞানরূপও যোগবিঘ্ন হয়।

বাহুল্য-ভয়ে এস্থলে তাহা উপেক্ষিত হইল; তাহার বিবরণ শিবসংহিতায় দ্রষ্টব্য। যোগীদিগের মধ্যে, ১। মৃদুসাধক, ২। মধ্য-সাধক, ৩। অধিমাত্রসাধক, এই ত্রিবিধ সাধক-ভেদ দৃষ্ট হয়। ইহাঁদেরও লক্ষণ শিবসংহিতায় দ্রষ্টব্য। যোগসাধনের প্রত্যক্ষ ফল সাধারণের প্রত্যক্ষার্থে নিম্নে কতিপয় প্রসিদ্ধ উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছি। তদ্দ্বারাই সকলের সংস্কার দৃঢ়তর হইবে, সন্দেহ নাই।

১। কতিপয় বৎসর গত হইল, মহানগরী কলিকাতার সমীপবর্ত্তী ভূকৈলাশ-গ্রামের রাজধানীতে এক মহাত্মা সমাধি-যোগী আনীত হয়েন। সেই আনীত অদ্ভুত-দর্শন যোগিপুরুষ-দর্শনে তত্রত্য সকলেই বিস্ময়-সাগরে মগ্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার (যোগীবরের) বাহ্যে কিঞ্চিন্মাত্রও ক্ষমতা প্রকাশ ছিল না। তদ্দর্শনে অনেকেই তাঁহাকে অহোরাত্র জলমগ্ন করিয়া রাখে। কেহবা অগ্নিবৎ প্রতপ্ত লৌহ-শলাকা দ্বারা যোগীবরের অঙ্গ দগ্ধ করে। কেহ বা নাসিকা-রন্ধ্রে সুতীব্র বিষের বিষম ঘ্রাণ প্রদান করে। ইত্যাদি বহুবিধ যোগবিঘ্নকর উপায় দ্বারা তাঁহার সমাধি-যোগের কিঞ্চিন্মাত্রও হানি করিতে পারিলেক না। পরিশেষে কদর্য্য উপায় দ্বারা অসদঙ্গ-স্পর্শন-জন্য কিঞ্চিৎ চৈতন্য হইয়াছিল। যোগীবর কাহারও সহিত কোনপ্রকার বাক্য-ব্যয় না করিয়া মুমূর্ষু-কালে এইমাত্র কহিয়াছিলেন,—"আগামী পরশ্ব দিবস আমার কলেবরোপন্যাস হইবে। আমার পরিত্যক্ত দেহ মৃত্তিকাতলে প্রোথিত বা অগ্নি-জ্বালাতে ভস্মসাৎ না করিয়া জাহ্নবী-জলে বিসর্জ্জন করিও।" পরে তত্রত্য মহানুভবগণ তাহাই করিলেন।

২। মান্দ্রাজের যোগীবরের বিষয় অনেকেই শুনিয়াছেন। উক্ত যোগীবর প্রাণায়াম-প্রভাবে কুম্ভকের ফললাভ করাতে ভূমিত্যাগ-পূর্ব্বক সার্দ্ধত্রয় হস্ত ঊর্দ্ধে নিরালম্ব শূন্যে অবস্থিতি করিতে সক্ষম ছিলেন। তৎকালে তত্রস্থ লোকে তাঁহাকে দর্শন করিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন।

৩। পাঞ্জাবদেশীয় যোগীবর হরিদাস প্রাণায়াম প্রভাবে মৃত্তিকার নিম্নে ছয় মাসকাল অবস্থিত ছিলেন। তাহাতে তাঁহার শরীরের কোনও হানি হইয়াছিল না। মহারাজাধিরাজ রণজিৎ সিংহ মহোদয় হরিদাস বাবাজীকে পাঁচ হাত পরিমিত মৃত্তিকার তলে এক বাক্স-মধ্যে স্থাপন করিয়া ঐ গভীর গর্ত্ত মৃত্তিকা-দ্বারা পূর্ণ করতঃ তদুপরি গোধূম ও ধান্যাদি শস্য বপন করাইয়াছিলেন। সন-মাসান্তর পরে ঐ শস্য পরিপক্ক হইলে ও কৃষকগণ তাহা ছেদন করিলে, মহারাজ বাহাদুর রণজিৎ সিংহ হরিদাস বাবাজীকে মৃত্তিকার মধ্য হইতে উত্থিত করিতে আদেশ করিলেন। আদিষ্ট ভৃত্যগণ বাবাজীকে মৃত্তিকা হইতে উঠাইলে সকলেই বিস্ময়-বিস্ফারিত লোচনে দর্শন করিয়া বিস্মিত হইলেন। হরিদাস বাবাজীকে যেরূপ অবস্থায় মৃত্তিকার তলে রাখিয়াছিলেন, উত্থানের পরে ঠিক তদবস্থাই দেখিতে পাইলেন। তৎকালে পাঞ্জাব-রাজ্যে গবর্ণর বাহাদুর অবস্থিত ছিলেন। তিনি যোগীবর হরিদাসকে দেখিয়া আশ্চর্য্য-জ্ঞানে বহু প্রশংসা করিয়া বলিলেন,—"আমি এইরূপ আশ্চর্য্য বিষয় কদাপিও—দেখা দূরে থাকুক—শুনিও নাই।" যোগসাধনে মনুষ্য যে মৃত্যুঞ্জয় হইতে পারে, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই।

৪। চট্টগ্রামস্থ প্রসিদ্ধ বিগ্রহ শম্ভুনাথ শিবের মহান্ত মহাত্মা গন্তিবন বাবাজীকে চন্দ্রনাথের যাত্রিক-মাত্রেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। অনেকেরই প্রপিতামহ বা পিতামহ যেইরূপ বাবাজীকে দর্শন করিয়াছেন, তৎ প্রপৌত্র বা পৌত্রগণও ঠিক সেইরূপই দেখিয়াছেন। সেই তপ্ত-কাঞ্চন-নিভ বাবাজীকে বার্দ্ধক্যেও যুবার ন্যায় দর্শন করিয়া অনেকেই যোগের আশ্চর্য্য প্রভাব প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

৫। কাশীস্থ যোগীবর তৈলঙ্গস্বামীকে বহুকাল যাবৎ বহুলোকেই দর্শন করিয়া আসিতেছিলেন। ইহাঁর অজরামরাবস্থা কি যোগপ্রভাবমূলক নহে? প্রকাণ্ড শীতে বিবসনভাবে বিচরণ কি যোগবলাপেক্ষী নয়? এবং নিদাঘের মধ্যাহ্নে প্রচণ্ড সৌর-খরকরে অনাত-পত্র চংক্রমণ কি যোগপ্রভাবে হয় নাই?

পূর্ব্বোক্ত উদাহরণ-পঞ্চক দ্বারা যোগের প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ ফল, বোধ হয়, মুক্তকণ্ঠে সকলেই স্বীকার করিবেন। তদ্বিষয় বাগাড়ম্বর বাহুল্য।

অদৃষ্ট।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

চাকরী-বিরহিত জীবনের দুঃখ।

কুসংবাদ বায়ুবেগে দৌড়িয়া বেড়ায়; সু-সংবাদ যেখানকার, সেইখানেই পড়িয়া থাকে। আমার কার্য্য গিয়াছে, এ সংবাদ, আমি বাটী না আসিবার পূর্ব্বেই, আমাদিগের দেশে প্রচারিত হইয়াছে। আমি বাটী আসিবার পর, যাহার সহিত সাক্ষাৎ হয়, সেই জিজ্ঞাসা করে,—"কেনহে যদু, তোমার চাকরিটী গেল কেন? আহা! দিব্বি কাযটী ছিল! ১০৲। ১২৲ টাকা বেতন পাইতে, আর উপরিও ত কিঞ্চিৎ ছিল। এমন চাকরী যাওয়া কম দুরদৃষ্টের কথা নয়!" আমি সকলের নিকটেই প্রকৃত কারণের উল্লেখ করি; কিন্তু দুঃখের বিষয়, কেহই আমার কথা বিশ্বাস করে না! কেহ কেহ বলে,—"অত বাড়ী আসিলে কি সরকারী চাকরী থাকে?" কেহ কেহ বলে,—"ওর চাকরী ত শ্বশুরবাড়ীই ছিল। মাসকাবার হ'লে একবার ডাক্তারখানায় গিয়ে মাইনের টাকাগুলো আন্‌ত!" এ সমস্ত কথা আমি হাসিয়া উড়াইয়া দিতাম। কিন্তু তৃতীয় একদল লোক ছিল, তাহাদিগের কথায় যথার্থই মর্ম্মে বেদনা পাইতাম। ইহারা আমার চাকরী যাইবার আমি যে কারণ নির্দ্দেশ করিতাম, তাহা বিশ্বাস করিত না। বাঙ্গালা সমাচার-পত্র পড়িয়া ইহারা জানিতে পারিয়াছিল যে, বাস্তবিক গবর্ণমেণ্ট ব্যয় কমাইবার জন্য অনেকের কার্য্য এবলিশ করিয়া দিয়াছে। এতদূর প্রকৃত কথাই বটে! কিন্তু শুনা যায়, একরূপ সাপ আছে; তাহাদিগের বিষ লেজে থাকে। তাহাদিগের দংশনে কিছু হয় না; কিন্তু দংশনের পর যদি একবার লেজের দ্বারা আঘাত করিতে পারে, তাহা হইলে সে রোগীর আর রক্ষা নাই। সেইরূপ ইহারা অর্দ্ধেক কথা প্রকৃত বলিয়া অপর অর্দ্ধেক বিষময় করিত। বলিত,—"যেমন কর্ম্ম, তেমনি ফল! হবেই ত! ওর চাকরী যাবে না ত কার যাবে? অশীতিবর্ষীয়া মাতাকে বাড়ীতে এক কুঁড়ে ঘরে ফেলিয়া রাখিয়া নিজে শ্বশুরবাড়ী পড়ে থাকতেন, আর দু-বেলা চব্য-চুষ্য করিয়া আহার করিতেন! একে বৃদ্ধা, তায় গুরুলোক। এঁদের শাঁপ অকাট্য; এঁদের শাঁপ ফল্‌বে না ত কা'র শাঁপ ফল্‌বে?" এসমস্ত কথা-বক্তারা যে আমার সম্মুখে বলিতেন, তাহা নহে; তৃতীয় ব্যক্তির নিকটেই এসমস্ত বলা হইত। সেই তৃতীয় ব্যক্তিরা কথাগুলি গরম থাকিতে থাকিতেই আমার নিকটে বর্ণনা করিয়া আমার কর্ণকুহরে মধুসিঞ্চন করিতেন! এ সম্বন্ধে একটী বিশেষ দুঃখের বিষয় এই,—যাঁহারা কুৎসা করিতেন, তাঁহারা নিজ-নিজ বক্তব্য শেষ হইলেই, শ্রোতাদিগকে অঙ্গীকার করাইয়া লইতেন যে, তাঁহারা সে কথা যেন আমার নিকটে প্রকাশ না করেন। কেহ কেহ এরূপ অঙ্গীকার প্রায়ই তাঁহাদিগের বক্তৃতার অগ্রেই করাইয়া লইতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমি এরূপ সমস্ত বক্তৃতাই শুনিতে পাইতাম। কখন কখন বক্তা যাহা নাও বলিতেন, তাহাও শুনিতাম। কারণ, আমার নিকট যাঁহারা বলিতেন, তাঁহারা নিজের টীকা-টিপ্পনী দিয়াই বলিতেন। আমার নিকট বর্ণনা করিবার সময় এক একজন এক এক মল্লিনাথ হইয়া পড়িতেন। পরের কুৎসা শুনিতে লোকে কতই আগ্রহ প্রকাশ করে? প্রথমতঃ প্রতিজ্ঞা

করিতে হয় যে, শ্রোতা কাহার নিকটে বলিবেন না। সে প্রতিজ্ঞা তিনি অনায়াসেই করেন; কিন্তু মনে মনে বিলক্ষণ জানেন যে, তিনি সে প্রতিজ্ঞা কখনই পালন করিবেন না। এরূপ অবস্থাতেও—পরের কুৎসা শুনিতে পাইবার জন্য, আপনাকে ধর্ম্মভ্রষ্ট করিতে কেহই সঙ্কুচিত হ'ন না!

আমার পিতা আমাকে যে শিক্ষা দিয়াছেন, তাহার দোষে (গুণ আর তাহাকে কি বলিয়া বলি?) আমাকে বিপাকে পড়িতে হইত। আমার নিকটে আমার নিজের কুৎসা প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে—'আমি কাহাকে বলিব না'—আমাকে এরূপ অঙ্গীকার করিতে হইত। সে অঙ্গীকার আমি কখনও ভঙ্গ করিতাম না। ইহাতে আমার যে কি কষ্ট হইত, বলিতে পারি না। রাগে শরীর গর-গর করিত। যে আমার কুৎসা করিয়াছে, অর্দ্ধঘণ্টা পরেই তাহার সহিত সাক্ষাৎ হইলে আমাকে সসম্মানে সবিনয়ে কথা কহিতে হইত—অন্তরে কিন্তু প্রতিহিংসা-অগ্নি ধক্‌ধক্ করিয়া জ্বলিত! আমার মাতার শাপে আমার কর্ম্ম গিয়াছে,—একথা যিনি প্রথম প্রচার করেন, তিনিই এরূপ প্রচার করিবার ক্ষণকাল পরেই তাঁহার কন্যাকে দেখাইবার জন্য আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন। ভাল দ্রব্য অপব্যয় করিতে নাই—এ সংস্কার তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল। টাকা—একটী ভাল দ্রব্য; সুতরাং টাকাব্যয়ে অত্যন্ত কাতর; দেনা দেন না; কর্জ্জ করিতে খুব মজবুত। এবং সত্যকথা, একটী উৎকৃষ্ট পদার্থ বলিয়া, তার অপব্যয় দূরে থাকুক, নিয়মিত ব্যয়ও করিতেন না। ইনি কথা কহিবার সময় একটু নাকীসুরে কথা কহিতেন। বাল্যকালে একজন প্রতিবাসীর একটী ঘোড়া ছাড়া পাওয়ায়, তাহাকে ধরিয়া আরোহণ করায় ও তৎপরেই পড়িয়া যাওয়ায়, তাঁহার নাক ভাঙ্গিয়া যায়। সে নাক তদবধি আর স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই। মধ্যস্থলে একটী খাল হইয়াছে। সেইটী লুকাইবার জন্য সেই বাল্যকাল হইতেই তাঁহার পিতামাতা ও বন্ধুবর্গের পরামর্শে চসমা পরিতে সুরু করেন। ইনি একজন পাড়াগেঁয়ে বড়মানুষ; সুতরাং সকালে বৈকালে অনেক লোক ইঁহার বৈঠকখানায় সমবেত হইয়া থাকে। তাঁহারা বাবুর গুণ ভিন্ন কখন দোষ দেখিতে পাইতেন না! উপস্থিত হইবামাত্রই তিনি আমাকে সমাদরে বসিতে বলিলেন। কহিলেন,—"এস যদু, এস; বোসো। এই তোমার কথাই হচ্ছিল। না হরেকৃষ্ণ বাবু! যদুর কথা হচ্ছিল না? আহা! এরূপ ছেলে এখন আর দেখা যায় না। কেমন শিষ্ট-শান্ত, কেমন সত্যবাদী ধার্ম্মিক; আর পিতামাতার সেবা-সুশ্রুষা, আজকাল যদুর মত আর কে করিয়া থাকে? কেমন হরেকৃষ্ণ বাবু, এইমাত্র এই কথাই বলছিলাম না?" হরেকৃষ্ণ বাবু কহিলেন,—"হাঁ, এইত এক্ষণে যদুবাবুর কথাই হচ্ছিল। আর আপনি যাহা যাহা বলিয়াছেন, সমস্তই সত্য; একথা কে না বলিবে? যদুবাবুর ন্যায় সত্যবাদী আজকাল আর এ অঞ্চলে কে আছে। বৃদ্ধা মাতাকে এরূপ যত্নই বা আর কে করে থাকে?" ইত্যাদি। এই সমস্ত শুনিয়া, আমার শরীর রাগে থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, কিন্তু কি করি? যাঁহার নিকট ইহাঁর মনের কথা শুনিয়াছিলাম, তিনি আমাকে প্রথমে অঙ্গীকার করাইয়া লইয়াছিলেন যে,—তিনি যাহা বলিবেন, তাহা আমি কাহারও নিকটে প্রকাশ করিব না। সুতরাং নিজের রাগ নিজেই বরদাস্ত করিয়া থাকিলাম।

নিজের ইচ্ছা-পূর্ব্বক চাকরী-ত্যাগে যে কষ্ট হয়, তাহা দ্বিবিধ। প্রথমতঃ অন্নবস্ত্রের, দ্বিতীয়তঃ নিজ-অন্তঃকরণের। এ দু'য়ের মধ্যে দ্বিতীয়টিই অধিক কষ্টকর। মাছ-ভাত না খাইয়া ডাল-ভাত খাইলেও চলে; কিন্তু আত্মগ্লানি কোনরূপ প্রবোধই মানে না। বোধ হয় লোকে সে কষ্ট দেখিতে পায় না, অথবা যে

কষ্টের কথা অপরের সহিত বলিলে কেহই বিশ্বাস করে না। এই তাহার মূলীভূত কারণ। যাহাই হউক, ঈশ্বরের ইচ্ছায় আমাকে সে কষ্ট পাইতে হয় নাই। যে যাহাই বলুক না কেন, আমার ক্ষণিকমাত্র কষ্ট ভিন্ন তাহাতে আর কিছুই হইত না। জানিতাম, আমি সহস্র চেষ্টা করিলেও আমার চাকরী বজায় থাকিত না। মনে মনে ভাবিলাম,—যাহা আমার নিজের আয়ত্তে নয়, তাহাতে আর দুঃখ করিলে কি হইবে? অন্নবস্ত্রের কষ্টও আমার হয় নাই। তবে আমি আর সাবেক চালে চলিতাম না। যে অর্থ আমি সংগ্রহ করিয়াছিলাম, তাহা সত্বর পাছে খরচ হইয়া যায়, এইজন্য কোন কোন বিষয়ে ব্যয়সংক্ষেপ করিয়া দিলাম। বলা উচিত, এ কার্য্যও আমি করি নাই; মহামায়া নিজেই, ভবিষ্যৎ ভাবিয়া, এ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। আমার মাতাকে এসম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নাই। আমার চাকরী আছে কি গিয়াছে, তিনি তাহার কিছুই জানিতে পারেন নাই। তাঁহার জন্য যে ব্যয় হইত, তাহাতে মহামায়া হস্তক্ষেপ করে নাই। বাস্তবিক মহামায়ার মহাগুণের বথার পরিচয় দেওয়া সহজ কার্য্য নহে। আমার সংসারের যে ব্যয় কমিয়া গিয়াছে, তাহা আমিও প্রথম প্রথম জানিতে পারি নাই। খরচপত্র সমস্তই মহামায়ার মতানুসারে হইত; টাকাকড়িও মহামায়ার হাতে। আমার কেবল দুইটী কার্য্য ছিল;—দু-বেলা আহার করা, আর কিসে সংসার চালাইব—এই ভাবনা। আহার-সম্বন্ধে আমার কখনও বিশেষ মনোযোগ ছিল না। কোন কথা না জিজ্ঞাসা করিয়া, যাহা পাইতাম, তাহাই আহার করিয়া চলিয়া আসিতাম। হঠাৎ এক দিবস আহার করিতে বসিয়া কিঞ্চিৎ শারীরিক অসুস্থতা-নিবন্ধন তরকারি না খাইয়া মনে করিলাম,—একটু মৎস্যের ঝোল আর চারিটী ভাতমাত্র খাইয়া চলিয়া আসিব। কিন্তু সে দিবস মৎস্য নাই! আমি মহামায়াকে জিজ্ঞাসিলাম,—"মাছ নাই কেন?" মহামায়া কহিল,—"বাজারে এখন প্রতিদিন মাছ পাওয়া যায় না।" আমি সেই কথাই শুনিয়া চলিয়া আসিলাম। পরদিবস আহারের সময় যথাবিহিত মৎস্য পাওয়া গেল। আমি আহার করিলাম, আমার পুত্রটীও আমার পাতে বসিয়া আহার করিল। ক্ষণকাল পরে কোনও এক কারণবশতঃ আমাকে রন্ধনশালায় আসিতে হইল। দেখিলাম,—মহামায়া অন্নব্যঞ্জনাদি এক থালায় লইয়া আহার করিতে বসিবে। আমি তদ্দর্শনে আর কোন কথা না বলিয়া চলিয়া আসিব, এমন সময় মহামায়া কহিল,—"কি জন্যে এসেছিলে?"

আমি বলিলাম,—"তুমি আহার কর, পরে বলিব।"

মহামায়া।—পরে বলিবে কেন? এখনি বল।

আমি কহিলাম,—"চাবিটী লইতে আসিয়াছি।"

মহামায়া।—তুমি একটু দাঁড়াও। দেখো, ভাতে যেন কিছু না পড়ে; আমি হাত ধুয়ে চাবি দিচ্ছি।

এই বলিয়া মহামায়া হাত ধুইবার জন্য রান্নাঘরের রোয়াকে গেল। আমি সেই অবকাশে দেখিলাম, মহামায়ার ভাতগুলি মোটা, লাল রঙ্গ; পাতে মৎস্য নাই, এবং তৎপরিবর্ত্তে দু-এক টুকরা কাঁটা রহিয়াছে! আমি ভাল মিহি শাদা ভাত খাইয়াছিলাম, বড় বড় চারটী খল্‌সে মাছও পাইয়াছিলাম। মহামায়ার পাতে মাছের তরকারি, দু-এক টুকরা বেগুণ ও একটু ঝোল আছে মাত্র, আর মৎস্যের অভাবে দু-এক টুকরা ঐ খল্‌সে মাছের কাঁটা!!

এরূপ আহার্য্যদ্রব্য দেখিয়া আমার মনে যে কত দুঃখ হইল, তাহা বলিবার নহে। কিন্তু আমি, তথায় আর অধিকক্ষণ না থাকিয়া এবং কোন কথা না কহিয়া, চাবিটী লইয়া চলিয়া আসিলাম।

——

জীবাত্মা ও কামনা।

যতদিন বীজের বীজত্ব থাকে, ততদিন তাহা হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হয়—বীজত্ব ধ্বংশ হইলে তাহা হইতে আর বৃক্ষ জন্মে না। এই সূত্র অবলম্বন করিলে জানা যায় যে, যতদিন মনুষ্যের কামনা অপূর্ণ থাকে, ততদিন তাহাকে জন্মভার বহন করিতে হয়। এজন্মে যদি মনুষ্যের সকল কামনা পূর্ণ না হয়, তাহা হইলে তাহাকে পূর্ণকাম হইবার জন্য পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হইবেই হইবে—ইহাই পুনর্জ্জন্মের মূল সূত্র, এবং সূত্রটা বাস্তবিকই অকাট্য ও বিজ্ঞানসম্মত। বিজ্ঞান যেমন স্পষ্ট দেখাইয়া দিতেছে যে, কোন দ্রব্যে বল সঞ্চারিত হইলে অন্য বলের দ্বারা প্রতিহত না হইলে সঞ্চারিত বলের অপচয় হয় না, তেমনই কামনা-পূর্ণ জীবাত্মার যতদিন না কামনা ধ্বংশ হয়, ততদিন তাহার মুক্তি নাই। কামনা পূর্ণ না হইতেই মনুষ্যের মৃত্যু হইতে পারে; কিন্তু মৃত্যুতে আত্মার মুক্তি হয় না, কেবল ভৌতিক দেহের সহিত বিচ্ছেদ ঘটে মাত্র। সুতরাং জীবাত্মা যতদিন না মুক্তিলাভ করে, ততদিন ভৌতিক দেহ ত্যাগ করিয়া থাকিতে পারে না—লোকে যেমন জীর্ণ-বস্ত্র ত্যাগ করিয়া নব-বস্ত্র পরিধান করে, জীবাত্মাও তেমনই দেহ হইতে দেহান্তর অবলম্বন করে। ইন্ধন ব্যতিরেকে যেমন অগ্নির গুণ প্রকাশ হয় না, তেমনই ভৌতিক জগৎ ব্যতিরেকে মনুষ্যের সম্ভোগ সম্পূর্ণ হয় না; সুতরাং কামনা-সত্বে ভৌতিক জগৎ ও দেহ ত্যাগ করা জীবাত্মার পক্ষে অসম্ভব। এইজন্য যতদিন জীবাত্মা মুক্ত না হয়, ততদিন মনুষ্যকে বারবার জন্ম-পরিগ্রহ করিয়া ভৌতিক পদার্থের অধীন হইতে হয়। সংক্ষেপতঃ ইহাই পুনর্জ্জন্মের মূল কারণ।

যেমন এক জাতীয় দুইটী দ্রব্য পরস্পর সম্পূর্ণরূপে মিলিত হইয়া যায়, তেমনই জীবাত্মারও মিলিয়া এক হইবার সামগ্রী আছে—সে সামগ্রী এক পরমাত্মা। বৃহৎ জলরাশিতে যেমন একবিন্দু জল মিশ্রিত হইয়া যায়, জীবাত্মাও শুদ্ধ ও নির্ম্মল হইলে তেমনই পরমাত্মায় লীন হইয়া যায়। ইহাই জীবাত্মার মুক্তি বা মুক্তাবস্থা। জীবাত্মা মূলে শুদ্ধ চৈতন্যময়, কিন্তু অবিদ্যার প্রভাবে বিকৃতাবস্থাপন্ন থাকে; সুতরাং যতদিন না তপ্ত-কাঞ্চনের ন্যায় মলিনত্ব বিনষ্ট করিয়া শুদ্ধ-সত্বে পরিণত হয়, ততদিন তাহা পরম পবিত্র চৈতন্যময় ও আনন্দময় পরমাত্মায় বিলীন হইতে পারে না। উভয়ই তরল পদার্থ হইলেও যেমন জলে তৈলের সংমিশ্রণ ঘটে না, তেমনই অবিদ্যাচ্ছন্ন জীবাত্মার পরমাত্মায় মিলন ঘটে না। পরমাত্মা সম্পূর্ণরূপে অবিকৃত ও নির্গুণ; সুতরাং জীবাত্মা যতদিন না অবিকৃত ও নির্গুণ হয়, ততদিন পরমাত্মায় মিলিতে পারে না। পরমাত্মায় জীবাত্মার মিলন হইলে জীবাত্মাকে আর দেহ-ধারণ করিতে হয় না—দেহ-ত্যাগ বা মৃত্যুর সহিত তাহার মুক্তিলাভ হয়। প্রত্যেক জীবাত্মাই একদিন না একদিন সেই অদ্বৈত আনন্দময় পরমেশ্বরে লীন হইবে; কিন্তু কত দিনে, কত জন্মে যে তাহার মলিনত্ব দূর হইবে, তাহা কেহই নির্ণয় করিতে পারে না। পরমাত্মায় জীবাত্মার সংযোগের নাম যোগ—যোগী-গণ এই সাধনায় বাহ্যজ্ঞান-বিবর্জ্জিত। বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইয়া ঈশ্বরের স্বরূপ ধ্যান করিতে পারিলেই কেবল আত্মায় ও পরমাত্মায় মিলন হইতে পারে; নচেৎ ভরতমুনির ন্যায় মৃগ-চিন্তা করিলে মৃগ-রূপে জন্ম-পরিগ্রহ করিতে হয়, তাহাতে আর সংশয় নাই।

যে যাহা চিন্তা করে, একদিন না এক দিন, এক জন্মে না এক জন্মে, সে তাহা পাইবেই পাইবে—ইহা জ্ঞানময়ের আশ্চর্য্য কৌশল। এ উপায় না থাকিলে জীবের মুক্তি সম্ভাবিত হইত না। কিন্তু অবিদ্যা-প্রভাবে মানুষ এমনই বিকৃত এবং জীবাত্মা এমনই মায়ায় মুগ্ধ যে, যাহা অনিত্য ও অসত্য, তাহার চিন্তাতেই নিয়ত নিরত! ধনমান ও পুত্রকন্যার চিন্তাতেই আবোধ মনুষ্য নিয়ত নিমগ্ন; সুতরাং তাহাকে বারবার জন্মগ্রহণ করিয়া সংসার-মায়ায় ঘন-জড়ীভূত হইতে হয়—মায়া-পাশ ছেদন করিয়া অনন্ত-জ্ঞান চৈতন্যে বিলীন হওয়া তাহার ভাগ্যে শীঘ্র ঘটে না। তদ্গত হইয়া যে যাহা চিন্তা করে, সে তাহাই পায়। ইহা একটী আশ্চর্য্য সত্য, প্রমাণ করিবার প্রয়াস পাওয়া বাহুল্য-মাত্র। যাঁহারা কাচপোকার জন্ম দেখিয়াছেন, তাঁহারা এই সত্যের সত্যতা বিলক্ষণ উপলব্ধি করিয়াছেন।

এক্ষণে এই ঘোর মায়া-নাশের উপায় কি? যাহাতে অনিত্য সংসারের অসত্য চিন্তা ত্যাগ করিয়া, একমাত্র নিত্য সত্যের চিন্তায় মনকে নিয়োগ করা যাইতে পারে, এমন উপায় কোথায়? জগতের মঙ্গলের জন্য সিদ্ধ-পুরুষগণ সময়ে সময়ে দেখা দিয়া অবোধ মানবকে পথ বলিয়া দেন সত্য; কিন্তু আমরা মহা পাতকী, আমাদিগের সে প্রকার সাধু-দর্শন ঘটিবে কেন? কুপথ ত্যাগ করিয়া সৎপথ অবলম্বন করিবার জন্য প্রাণের ব্যাকুলতা কোথায়? ক্ষেত্র প্রস্তুত না হইলে বীজ-বপনে ফলোদয় নাই; সুতরাং আন্তরিক ব্যাকুলতা ব্যতিরেকে সৎপথের সন্ধান পাওয়া একপ্রকার অসম্ভব। আমরা ঘোর বিষয়াশক্ত, এবং আমাদিগের জীবাত্মাও জড়-সহবাসে জড়-ভাবাপন্ন; সুতরাং অল্পে অল্পে আশক্তি-ত্যাগ ও জড়ত্ব-পরিহার করিতে না পারিলে মঙ্গলের আশা সুদূরস্থিত ও ঘোর অন্ধকার-গর্ভে-প্রোথিত।

ইহ-সংসারের সহিত যাহা সম্বন্ধ এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা ক্রিয়মান, তাহারই চিন্তা জীবাত্মাকে জড়ভাবাপন্ন করিয়া রাখে। এক বস্তু অপর বস্তুর সহবাসে বিস্তর পরিমাণে তাহার গুণ প্রাপ্ত হয়, এবং ক্রমে ক্রমে তাহার তুল্য হইয়াও উঠিতে পারে—বহুকাল যাবৎ ব্রাহ্মণ-সহবাসে শূদ্রকেও ব্রাহ্মণ-তুল্য হইতে শুনা যায়। জড়ের সহিত মন-সম্বন্ধ এবং জড়ে ওতঃপ্রোত বলিয়া

আত্মাতে বিস্তর পরিমাণে জড়ত্ব মিলিবে, তাহাতে সন্দেহ কি? স্থূল দৃষ্টিতে সংসারে জড় ভিন্ন অপর কিছুই দেখা যায় না—চৈতন্য-বোধ জ্ঞান-সাপেক্ষ। সুতরাং আত্মা সহজেই জড়ের বশীভূত, এবং জড়-জাত শোক-তাপ ও সুখ-আনন্দের অধীন। আত্মার উপর জড়ের এমনই প্রভাব যে, জ্ঞান-সহযোগে চৈতন্য-বোধ হইলেও, মনুষ্য তাহার অস্তিত্ব-মাত্র স্বীকার করিয়াই সম্পূর্ণরূপে জড়ের অধীন থাকে—জড়কে অতিক্রম করা অতি দুরূহ ব্যাপার! ধার্ম্মিক ব্যক্তি নিয়ত ধ্যান-ধারণায় নিরত থাকিলেও তাঁহার কামনা জড়-ভাবাপন্ন হইতে পারে; যতদিন না সমস্ত কামনা জড়কে অতিক্রম করিয়া একমাত্র পরমাত্মাই তাঁহার কাম্য হয়, ততদিন সংসার-যন্ত্রণা অতিক্রম করিতে পারেন না। কামনার মূলে যে আশক্তি আছে, তাহাই কামনাকে দূষিত করিয়া জড়কে অতিক্রম করিতে দেয় না। অতএব কামনাকে বিশুদ্ধ করিতে হইলে অর্থাৎ এক পরমাত্মাকেই কাম্য বলিয়া জানিতে হইলে এই আশক্তিকে ত্যাগ করিতে হয়। ইহার আকর্ষণ অতিশয় তেজস্বী; এক পরমাণুর সহিত অন্য পরমাণুর যে প্রকার সংশক্তি, আশক্তির সহিত জীবাত্মারও তেমনই সংশক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু জ্ঞানবলে মনুষ্য এই সম্বন্ধ যে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না, এমন নহে। আশক্তি অতিক্রম করিবার এক উপায় সংসার হইতে দূরে অবস্থান। যেখানে পুত্র-কন্যা, স্ত্রী-পরিবার, ধন-মান, সুখ-ঐশ্বর্য্য, সেখানে সহজেই মন তাহাতে লিপ্ত হইতে পারে; সুতরাং সে সকল হইতে দূরে থাকা কর্ত্তব্য, নতুবা আশক্তি অতিক্রম করা যায় না। এইজন্য শাস্ত্রকারেরা বাণপ্রস্থ ও প্রব্রজ্যার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সংসার-ভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত হইলে, মায়া-মোহ হইতে দূরে থাকিয়া, ঈশ্বরাধনায় অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিবার প্রথা অতি সুন্দর এবং বার্দ্ধক্যের উপযোগী হইলেও, তদ্দ্বারা যে পরমাত্মার সহিত

জীবাত্মার মিলনের পথ পরিস্কৃত হইতে পারে, এমত বোধ হয় না; কারণ, বার্দ্ধক্যে আশক্তি-শূন্য হইলেই যে যৌবন ও প্রৌঢ়ার্জ্জিত কামনা ধ্বংশ হয়, এমন হইতে পারে না। আজন্ম সংসার হইতে দূরে অবস্থান করিয়া অথবা সংসারে থাকিয়াও, আশক্তি-বিরহিত হইয়া—তদ্গত-চিত্ত হইয়া, ঈশ্বর-চিন্তায় জীবন-যাপন করিতে পারিলেই, জীবাত্মা পরমাত্মার নিকট-বর্ত্তী হইতে পারে। আশক্তি পরিহার করিবার এই দুই পথের মধ্যে জ্ঞানীরা শেষোক্ত পথকেই বিশিষ্ট বলিয়া বিবেচনা করেন; কারণ, সংসারে প্রলোভনের মধ্যে নির্লিপ্ত ভাবে অবস্থিতি করিতে পারিলে আত্মার যে প্রকার দৃঢ়তা জন্মে, প্রলোভন হইতে দূরে থাকিলে সে প্রকার সম্ভবে না; এবং কোন সময়ে প্রলোভনে পড়িলে হয় ত তাহাতে জড়িত হইয়া পড়িতে পারে।

সংসার ত্যাগ করা সকল মনুষ্যের পক্ষে সম্ভব নহে; এবং সকলেই সংসার ত্যাগ করিয়া নিভৃত গিরিগহ্বরে প্রবেশ করিলে সংসার চলিতে পারে না। সংসারকে মনুষ্য-শূন্য করা এবং মনুষ্য-সমাজকে উচ্ছন্ন করিয়া মনুষ্যের মনুষ্য-বৃত্তির পরিচালনা একেবারে রহিত করা, ঈশ্বরের অভিপ্রেত বলিয়া বোধ হয় না। মনুষ্য যে সকল সদ্গুণে ভূষিত, তাহার বিকাশেই তাহার উন্নতি ও পরমার্থ-জ্ঞান নির্ভর করিতেছে, এবং এই সংসার বা মনুষ্য-সমাজই তাহার বিকাশ ও পরিচালনার স্থান। অতএব দেখা যাইতেছে যে, পরমার্থ-জ্ঞান লাভ করিবার পূর্ব্বে, একাকী গিরি-গহ্বর আশ্রয় করা ঈশ্বরাভিপ্রেত নহে; এবং উক্ত জ্ঞান জন্মিবার পরেও, প্রলোভন-শূন্য অরণ্য বা গিরি-গহ্বর অপেক্ষা সংসারে থাকিলে, আত্মার কঠিন পরীক্ষা হইতে পারে। সংসার বা কর্ম্ম ত্যাগ করা কোন শাস্ত্রেরই ব্যবস্থা নহে—জনকাদি মহর্ষির ন্যায় সংসারে থাকিয়াও তাহাতে লিপ্ত না হইয়া পরমাত্মার ধ্যান-ধারণায় জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করাই গীতাদি শাস্ত্রের বিধি। বিশেষতঃ আত্মা-শুদ্ধির জন্য প্রথমে কর্ম্মাদির প্রয়োজন দেখা যায়—তৎপরে নিষ্কাম কর্ম্মের অর্থাৎ কাম্য-ফল শ্রীকৃষ্ণে অর্পণের ব্যবস্থা। সংসারে থাকিয়া মনুষ্যকে সকলই করিতে হইবে; কিন্তু আশক্তি-বিবর্জ্জিত হইয়া—যেমন পদ্ম-পত্রের জল পত্রে লিপ্ত হয় না অথচ পত্রেই থাকে, তেমনই মনুষ্যও সংসারে থাকিবে, অথচ তাহাতে লিপ্ত হইবে না। আত্মাকে এবম্প্রকার আশক্তি-শূন্য করিতে পারিলেই, তাহার জড়ত্ব-মোচন এবং শুদ্ধ-চৈতন্যে মিলিত হইবার পথ পরিস্কার হয়।

সন্ন্যাসীর জীবনী।

ভূমিকা।

গত বৎসর পৌষ মাসে আমার সঙ্গে একটী সন্ন্যাসীর দেখা হয়। সন্ন্যাসী ইংরাজী ও সংস্কৃতে অভিজ্ঞ—সুতরাং পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে কিছুদিন নিকটে রাখিলাম। ক্রমে আলাপ এবং প্রণয় হইল—শেষে এতদূর খোলা-খুলি হইল যে, তাঁহার জীবনের সমস্ত ঘটনাই আমি শুনিতে পাইলাম। তাহাই অদ্য আমি তাঁহার নিজ-কথায় লিখিতেছি। সন্ন্যাসী বাঙ্গালী; এখন তাঁহার বয়স ৪৫ বৎসর।

প্রথম অধ্যায়।

আমি কায়স্থ। আমার বাটী যশোহর-জেলায়। যখন আমার বয়স ১২ বৎসর, তখন গ্রামের স্কুলে মাইনর-পরীক্ষার পুস্তক পাঠ করি। ঐ সময় ব্রাহ্ম-প্রচারক বিজয় গোস্বামী তথায় আসিয়া বক্তৃতা দেন। সেই বক্তৃতার কথাগুলি আমার কাঁচা হৃদয়ে এত বিদ্ধ হইয়াছিল যে, আমি বাটী হইতে পলাইয়া কলিকাতা আসিলাম। কলিকাতা আসিয়া, বাড়ীতে চিঠি লিখিলাম যে,—কলিকাতায় লেখা-পড়া করিব। বাবা জমীদারের নায়েব ছিলেন—আর আমি তাঁহার একমাত্র পুত্র, সুতরাং মাস মাস খরচ

পাঠাইতে লাগিলেন। বাড়ীতে মা ও আমার একটী ছোট ভগিনী ব্যতীত অন্য কেহ ছিল না। আমি কলিকাতার হিন্দুস্কুলে ভর্ত্তি হইলাম। প্রথম শ্রেণী পর্য্যন্ত একরূপ পড়িলাম। কিন্তু ইহার পর হইতেই, একেবারে স্কুলের পড়া ছাড়িয়া, ব্রাহ্ম-সাহিত্য-পাঠ ও ব্রাহ্ম-মন্দিরে গমনাগমন করিতে লাগিলাম। অনেকবার দীক্ষিত হইতে ইচ্ছা হইয়াছে, সেজন্য উৎসাহও পাইয়াছি। কিন্তু মাতার মুখ মনে হইলেই শরীর কাঁপিয়া উঠিত; কান্না পাইত; মনে হইত,—কিসের ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম, মা-ই আমার শত ব্রাহ্মধর্ম্ম।

ঠিক এই সময়ে বাড়ীর চিঠি পাইলাম,—পিতা পীড়িত, এবং ভগিনীর বিবাহ। আমি বাড়ীতে যাইলে বিবাহ হইল, কিন্তু বাবার পীড়া আর ভাল হইল না—এক মাস ভুগিয়া তিনি ইহলোক ত্যাগ করিলেন। স্বামী-শোকে মাও পীড়িতা হইয়া অচিরে মৃত্যু-শয্যায় শয়ন করিলেন—তাঁহাকেও আর ভাল করিতে পারিলাম না। পিতৃ-মাতৃ-শোকে ক্ষিপ্তপ্রায় হইলাম। ভগিনী শ্বশুরালয় চলিয়া গেল; বাড়ীতে যাহা কিছু ছিল, বিক্রয় করিয়া, আমি কলিকাতা আসিলাম। এখন আমার হাতে ৪০০৲ টাকা ছিল। কলিকাতা আসিয়াই, থানকাপড় ও সোণার চশমা কিনিলাম। থান ও চশমা কেন কিনিলাম, বোধ হয় বুঝিয়া থাকিবেন। সকল ধর্ম্মেরই একটা চিহ্ন ও পোসাক আছে; আমি যে ধর্ম্মে যাইয়াছিলাম, তাহার পোসাক এই। একদিন সুসময়ে থান পরিয়া, চশমা পরিয়া, ৺কেশবচন্দ্র সেনের নিকট যাইয়া বলিলাম,—"**আমায় দীক্ষিত করুন।**" সেই মহাত্মা আমার মুখপানে কিছুকাল তাকাইয়া হাসিলেন। কি ভয়ঙ্কর দৃশ্য!—কি ভয়ঙ্কর হাসি! উহা যেন আমার হৃদয় ছিঁড়িয়া, ভিতরে গিয়া, তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে লাগিল; আমার শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। এখন বুঝিয়াছি,—তিনি বুঝি আমার পরিণাম ও ভবিষ্যৎ দেখিয়াই হাসিয়াছিলেন। তিনি হাসিয়া বলিলেন,—"তুমি বালক—অগ্রে কিছু লেখা-পড়া শিক্ষা কর, পশ্চাৎ তোমাকে ধর্ম্ম শিখাইব।" নৈরাশ হইয়া, ফিরিয়া বাসায় আসিলাম। বর্ত্তমান গোল-দীঘির ধারে ব্রাহ্মদের একটা ডিপো ছিল—বাসা সেইখানে। এখানে এখন তেরটী পূর্ণ ও অপূর্ণ যুবতী ও চারিটী পুরুষ ছিল। তিনটীর স্ত্রী সঙ্গে ছিল, আমিই একাকী। একাকী ছিলাম বলিয়া, আমার কোন কষ্ট ছিল না—সান্ত্বনা, শুশ্রূষা, ভালবাসা, সকলই এখানে ছিল। থাকিবার কারণও ছিল। একটী বিধবা ব্রাহ্মণী দুইটী কন্যা লইয়া এখানে ছিলেন; সেই দু'টীর বড়টী আমাকে বিবাহ করিবে বলিয়া মনন করিয়াছিল। তাই বলিয়া আমাদের মধ্যে কোন অশিষ্ট ব্যবহার ছিল না। পাপের কথা আমার মনে উদয় হইত না। আমি যেদিনে কেশবচন্দ্রের নিকট গিয়াছিলাম, তার এগার দিন পরে তিনি বম্বে-অঞ্চলে চলিয়া গেলেন। তখন তাঁহার স্থানে অন্য লোক আচার্য্য হইলেন—আমি এবারে অনায়াসে দীক্ষিত হইলাম। দীক্ষিত হইবার কয়েক দিন পরেই, আমি বুঝিতে পারিলাম,—মেয়েরা আমাকে দেখিলেই একটু হাসে ও কানাকানি করে; আবার যাহার সহিত আমার বিবাহের কথা, সে আমাকে দেখিলেই লজ্জায় গাল রাঙা করিয়া মুখ নীচু করিয়া সরিয়া যায়। এসব কেন হয়, কিছুই বুঝিতে পারি না।

একদিন রাত ঠিক দুটো কি দেড়টার সময়, হটাৎ জাগিয়া দেখি, কে আমার পাশে শুইয়া আছে। তাড়াতাড়ি উঠিয়া, আলো জ্বালিয়া, বিস্মিত হইলাম। যাহার সহিত আমার বিবাহের কথা, এই সেই!

'তুমি এখানে কেন?"

"দোষ কি?"

"দোষ যথেষ্ট—তুমি যাও।"

"যাইব না।"

"এত জবরদস্তি কেন?"

"জবরদস্তি কেন, শুন—আমি তোমাকে

ভালবাসি, তুমি আমাকে বিবাহ করিবে ইহাও স্থির; তবে দেরি করিতেছ কেন? বিবাহ কবে করিবে, বল—আমার মাথার দিব্বি, বল। না বলিলে যাইব না—কাঁদিব—আত্মহত্যা করিব—শুনিলে?"

আমি তাহার মুখপানে চাহিলাম। বড় সুন্দর মুখ! বড় স্নেহমাখা—বড় কোমল! আমার প্রাণ জুড়াইল। জীবনে কোমল হস্ত কখনও এ শরীর স্পর্শ করে নাই—সুন্দরীর সুন্দর নয়ন কখনও এ প্রাণে শীতল জ্যোৎস্না ঢালিয়া দেয় নাই—আমার সংসার শূন্য, পৃথিবী শূন্য; কিন্তু আজ তাহা পূর্ণ বলিয়া বোধ হইল—ক্ষণেকের জন্য আমি স্বপ্নের রাজা বা নাট্যশালার রাজা হইলাম। সতী-সোহাগী হইলাম—সতী যাহা বলিল, তাহাই করিলাম—যাহা করিল, তাহাই করিলাম। এক মুহূর্ত্তে জীবনের ঘোর পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিলাম। আয়নার ঘরে ঢুকিয়া দিশাহারা হইলাম—পথ ভুলিয়া আয়না ভাঙ্গিলাম। শরীর কাটিল, রক্তারক্তি হইল, তবে চৈতন্য হইল। বুঝিলাম—বুঝিলাম—সর্ব্বনাশ—নরক—মহানরক—আর রক্ষা নাই!

পরদিন শুনিতে পাইলাম, আমার সতী গর্ভবতী। অবাক!—বাসার সকলে আমার প্রতি উহা আরোপ করিতেছিল! কিন্তু আমি জানি, আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী—ঐ রাত্রির পূর্ব্বে আমি কখনই নির্জ্জন স্থানেও উহার সহিত কথা কই নাই! আমি তখন বুঝিতে পারিলাম, ভিতরের কাণ্ডখানা কি! এ ব্যাপারে আমি যত আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম, এত কেহই হইল না—হইবার কারণও নাই। আমার তখন বড়ই ঘৃণা হইল—আমার যথার্থই মরিতে ইচ্ছা হইয়াছিল। কিন্তু, না মরিয়া, পরদিন অতি-ভোরে উঠিয়া পলায়ন করিলাম। কোথায় যাইলাম, কি করিলাম, পরে বলিব। আমার কাহিনী শীঘ্র ফুরাইবে না।

———

Detective Stories.

জালিয়াৎ যদু।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

যেরূপ উপায়ে জাল ও জুয়াচুরি হইয়া ঐ ২২ হাজার টাকা —কোম্পানির লোকসান হইয়াছে, তাহা আমি যেরূপ শুনিলাম,তাহা আসিয়া সাহেবকে বলিলাম। তিনি সমস্ত শুনিলেন, ও কহিলেন,—"তুমি প্রস্তুত থাকিও; পরিশেষে এই মকর্দ্দমা তোমার হস্তেই পড়িবে।"

সাহেব যাহা বলিয়াছিলেন, ঘটিলও তাহাই। এই ঘটনার দুই দিবস পরেই ঐ মকর্দ্দমার অনুসন্ধানের ভার আমারই উপর পড়িল। আমি জুয়াচুরির অবস্থা পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলাম; কিন্তু কি উপায়ে যে ঐ মকর্দ্দমার অনুসন্ধান করিতে সমর্থ হইব, তাহাই ভাবিতে লাগিলাম।

প্রথমে সেই আফিসে গমন করিয়া, যাহার যাহার নাম জানা হইয়াছে, তাহাদিগের প্রত্যেককেই পৃথক পৃথক জিজ্ঞাসা-বাদ করিলাম, ও সমস্ত কাগজ-পত্র পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিলাম। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। পরিশেষে কেশিয়ার মহাশয়কেও বিশেষরূপে জিজ্ঞাসা-বাদ করিতে ত্রুটী করিলাম না। তাঁহার নিকট অন্যান্য অনেক কথার মধ্যে একটী বিশেষ আবশ্যকীয় বিষয় অবগত হইলাম। তিনি কহিলেন,—যে সকল ব্যক্তি তাঁহার নিকট হইতে এই ২২ হাজার টাকা বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছে, তিনি তাহাদিগকে দেখিলে বোধ হয় চিনিতে পারিবেন। আর, যে সকল টাকা দেওয়া হইয়াছে, তাহার সমস্তই প্রায় নগদ টাকা ও ১০৲ টাকা ৫৲ টাকার করেন্সি নোট; কেবল একদিবস মাত্র তিনি একখানি হাজার টাকার নোট প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার নম্বর তিনি নিয়মিতরূপ খাতায় লিখিয়া রাখিয়াছেন।

খাতা হইতে ঐ হাজার টাকার নোটের নম্বর লইলাম। তখন মনে একটু আশা হইল; ভাবিলাম,—"যাহা হউক এখন একটু সামান্য সূত্র পাইলাম; এই সূত্র ধরিয়া অনুসন্ধান করিলে বিশেষ ফল হইলেও হইতে পারে।" তখন আর সময় নষ্ট না করিয়া করেন্সি-আফিস-অভিমুখে গমন করিলাম। এবং সেইস্থানে অনুসন্ধান করায় জানিতে পারিলাম, সেই হাজার টাকার নোটের পরিবর্ত্তে চাঁপাতলার কৈলাশচন্দ্র মিত্র নামীয় একজন নগদ টাকা লইয়া গিয়াছে।

তখনই চাঁপাতলায় গমন করিলাম, এবং অনেক অনুসন্ধানের পর কৈলাশচন্দ্র মিত্র নামীয় এক ব্যক্তির সন্ধানও পাইলাম। কিন্তু তাঁহাকে নোটের কথা জিজ্ঞাসা করায়, তিনি সমস্ত অস্বীকার করিলেন। কৈলাশ বাবুর অবস্থা দেখিয়া ও তাঁহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া, তাঁহার উপর বিশেষ কোন সন্দেহই হইল না। তখন, যদি অন্য কোন কৈলাশচন্দ্র মিত্রকে পাওয়া যায় এই ভাবিয়া, পুনরায় অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। অনেক অনুসন্ধানের পর, আর একজন কৈলাশকে পাওয়া গেল। সে একজন সামান্য ব্যক্তি; সামান্য দালালী প্রভৃতি করিয়া অতি কষ্টে ১০৲। ৫৲ টাকা উপার্জ্জন করে, ও সেই অর্থেই সংসার-প্রতিপালন করে।

কৈলাশকে নোটের কথা জিজ্ঞাসা করায়, সে কহিল,—"হাঁ মহাশয়, আমি একখানি হাজার টাকার নোটের পরিবর্ত্তে করেন্সি-আফিস হইতে নগদ টাকা আনয়ন করি সত্য; কিন্তু সে টাকা আমার নহে—একটী বাবুর টাকা। আমি টাকা আনিয়া তাঁহাকে প্রদান করিয়াছি; তিনি আমাকে ৫৲টী টাকা-মাত্র প্রদান করেন।"

এই কথা শুনিয়া, আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কৈলাশ, তুমি যাঁহার নোট করেন্সি-আফিসে বদলা হইয়াছ, তুমি তাঁহাকে কত দিবস হইতে জান? তিনি কোথায় থাকেন, তাঁহার নামই বা কি?"

কৈলাশ তাহাতে যাহা উত্তর করিল, তাহা এই,—"সেই বাবুটীকে আমি ভালরূপ চিনি না; তাঁহাকে দুই দিবস মাত্র দেখিয়াছি। প্রথম দিবস আমি কোন কার্য্য-উপলক্ষে উইলসনের হোটেলে গমন করিয়াছিলাম। সেই স্থান হইতে প্রত্যাগমন করিবার সময় আমি সেই বাবুটীকে করেন্সি-আফিসের সম্মুখে দেখিতে পাই। সেই সময় হঠাৎ চোরবাগানের রাম বাবুর সহিতও দেখা হয়। তিনি আমাকে দেখিয়া বলেন,—'কৈলাশ, আমি স্কট্-টম্‌সনের ডাক্তারখানায় একটী ঔষধের জন্য গমন করিতেছি। আমার পুত্রটী অতিশয় পীড়িত। আমাকে ঔষধ লইয়া, যত শীঘ্র পারি,গমন করিতে হইবে। আমি ঔষধ আনিতে গমন করিতেছি; ইত্যবসরে তুমি এই ৫০৲ টাকার নোটখানি বদলাইয়া, তাহার পরিবর্ত্তে নগদ টাকা লইয়া, এইস্থানে অপেক্ষা কর। আমি ঔষধ লইয়া যেমন আসিব, অমনি টাকা লইয়া গমন করিব। তাহাতে ঔষধ লইয়া যাইতে বিশেষ বিলম্ব হওয়ার সম্ভাবনা নাই; আর, এই কার্য্যের নিমিত্ত তোমারও লোকসান হইবে না।' আমি রাম বাবুর বিশেষ পরিচিত; সুতরাং তাঁহার এই বিপদের সময় তাঁহার কথা অবহেলা করিতে পারিলাম না। বিশেষ, তাঁহার কথায় একটু লোভ আসিয়াও উপস্থিত হইল। রাম বাবু, আমার হস্তে সেই ৫০৲ টাকার নোটখানি প্রদান করিয়া, ঔষধ আনিবার অভিপ্রায়ে, গমন করিলেন। আমিও, সেই নোট লইয়া করেন্সি-আফিসে গমন-পূর্ব্বক তাহার পরিবর্ত্তে ৫০৲ টাকা লইয়া, বাহিরের ফুটের উপর রাম বাবুর অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। পরিশেষে, রাম বাবু আগমন করিলে, তাঁহাকে সেই টাকা প্রদান করিলাম। তিনিও পরিশ্রমের নিমিত্ত আমাকে চারি আনা প্রদান-পূর্ব্বক গমন করিলেন।

"যে সময়ে আমি ঐ ৫০৲ টাকা লইয়া সেই স্থানে দণ্ডায়মান ছিলাম, সেই সময় ঐ বাবুটী আমার সহিত গল্প আরম্ভ করিলেন; এবং যে কারণে আমি সেই স্থানে দণ্ডায়মান ছিলাম,

কথায় কথায় তাহার সমস্ত বিষয় অবগত হইলেন। সেই সময় তিনি আমাকে কহিলেন,—'মহাশয়, যদি আপনি আমারও একটু উপকার করেন, তাহা হইলে আমি আপনার নিকট চিরবাধিত হই।' সেই বাবুটী যখন আমাকে এই কথা বলিতেছিলেন, তখনই রামবাবু আসিয়া উপস্থিত হন, ও আমার নিকট হইতে টাকা লইয়া গমন করেন।

"সেই বাবুটীকে আমি কহিলাম,—'মহাশয়, আমি সামান্য ব্যক্তি; আমার দ্বারা আপনার কি উপকার হইতে পারে, আজ্ঞা করুন; যদি আমার অনায়াস-সাধ্য হয়, তাহা হইলে সেই কার্য্য সম্পন্ন করিতে বিশেষ চেষ্টা করিব।'

"আমার কথা শুনিয়া, সেই বাবুটী কহিলেন,—'কোন অলঙ্ঘনীয় কারণ-বশতঃ, আমার ভদ্রাসন-বাড়ী বন্দক দিয়া, আমাকে দুই-সহস্র মুদ্রা ঋণ গ্রহণ করিতে হইয়াছে, ও সেই দুই সহস্র মুদ্রাই দুইখানি নোটে পাইয়াছি। কিন্তু অভাব-পক্ষে একখানি নোট না ভাঙ্গাইলে, আমি আমার সেই কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিতেছি না। কিন্তু মহাশয়, বলিতে একটু লজ্জা হয় যে, ঐ টাকা আমি আমার ভ্রাতার বিনা-অনুমতিতে গ্রহণ করিয়াছি, আর আমার সেই ভ্রাতা এই করেন্সি-আফিসে কার্য্য করেন। যদি আমি এই নোট ভাঙ্গাইতে ইহার ভিতর গমন করি, তাহা হইলে তিনি আমাকে নিশ্চয়ই দেখিতে পাইবেন, ও সমস্ত অবস্থা জানিতে পারিলে, আমিও আমার কার্য্য সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইব না। আপনি ইহাও বিশেষ অবগত আছেন যে, হাজার টাকার নোট বাজারে ভাঙ্গান বড় সোজা নহে। আপনি যদি অনুগ্রহ-পূর্ব্বক এই নোটের পরিবর্ত্তে ছোট নোট বা নগত টাকা আনিয়া দেন, তাহা হইলে আমি বিশেষ উপকৃত হই; এবং আপনি যেরূপ-ভাবে আপনার প্রাপ্য ঐ বাবুটীর নিকট প্রাপ্ত হইলেন, আমিও তাহা দিতে সম্মত আছি।'

এই কথা শুনিয়া, আমি একবার ভাবিলাম, 'এই নোট আমি বিনা-ক্লেশেই করেন্সি-আফিস হইতে ভাঙ্গাইয়া আনিতে পারি; কিন্তু ঐ বাবুটী যাহা কহিলেন, তাহাই কি সত্য?—না কোন চোরা নোট ভাঙ্গাইতে আনিয়াছেন, ও ধরা পড়িবার ভয়ে সাহস করিয়া ভিতরে গমন করিতেছেন না! কি জানি, যদি ঐ নোটের নম্বর এখানে দেওয়া (stop) থাকে, তাহা হইলে যে নিশ্চয়ই ধরা পড়িতে হইবে! যাহা হউক, ৫৲ টাকার লোভও সহজে ছাড়া যাইতে পারে না।' এইরূপ সাত-পাঁচ ভাবিয়া, সেই বাবুটীর প্রদত্ত সেই হাজার টাকার নোটখানি লইয়া, আমি আফিসের ভিতর প্রবেশ করিলাম। সেইস্থানে যে চপরাসি ছিল, তাহাকে আমি নিভৃতে ডাকিয়া লইয়া গিয়া সমস্ত কথা বলিলাম; এবং পরিশেষে আরও কহিলাম যে,—'আমি যখন নোট ভাঙ্গাইতে থাকিব, সেই সময় তুমি উহার উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখিও; যদি নোট চোরাই হয় তাহা হইলে এখনি জানিতে পারিব, ও তুমি গিয়া উহাকে ধরিয়া ফেলিবে। আর, যদি চোরাই না হয়, তাহা হইলে আমি যাহা পাইব, তাহা হইতে তোমাকেও একটি টাকা প্রদান করিব।' আমার কথায় চাপরাসি সম্মত হইল, ও আমার পরামর্শ-অনুযায়ীই কার্য্য করিল। কিন্তু দেখিলাম, ঐ নোটের নম্বর 'ষ্টপ' নাই; কাজেই নগদ সহস্র মুদ্রা প্রাপ্ত হইলাম। পরে ঐ টাকা লইয়া সেই বাবুকে প্রদান করিলে, তিনি আমাকে ৫৲টি টাকা প্রদান করিয়া চলিয়া গেলেন; আমিও এক টাকা সেই চাপরাসিকে দিয়া আপন বাড়িতে আগমন করিলাম। এই আমার নোট ভাঙ্গাইবার কারণ। সে বাবুকে আমি ইহার পূর্ব্বে আর দেখি নাই, তাঁহার সহিত সেই আমার প্রথম দেখা।"

কৈলাশের এই কথা শুনিয়া, আমি তাহাকে কহিলাম,—"নোট-সম্বন্ধীয় সমস্ত কথাই ত শুনিলাম! কিন্তু সেই বাবুটী কোথায় থাকেন বা কি

কাজ করেন, ও তাঁহার নামই বা কি, তাহা তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে কি?"

কৈলাশ।—হাঁ মহাশয়, তাহা আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, এবং তিনিও তাহা বলিয়াছিলেন।

আমি—যদি তোমার সেই সকল কথা ঠিক মনে থাকে, তাহা আমাকে গোপনে বল। এই স্থানে সর্ব্ব-সমক্ষে সেই কথা বলিবার প্রয়োজন নাই।

আমার এই কথা শুনিয়া, কৈলাশ আমাকে একটু নিভৃতে লইয়া গেল; এবং আমার কানে কানে তাহার নাম, ও যে স্থানে কর্ম্ম করার কথা শুনিয়াছিল, তাহা বলিল। আমি কিন্তু, সেই কথা শ্রবণ করিয়া, প্রথমে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। সেই অসম্ভাবনীয় কথা বিশ্বাস করিতে প্রথমে আমার প্রবৃত্তি হইল না। কিন্তু পরিশেষে, বিশ্বাস না করিয়াও আর থাকিতে পারিলাম না।

কৈলাশকে পুনরায় কহিলাম,—"কৈলাশ, একটু পূর্ব্বে তুমি আমাকে বলিয়াছ যে, তুমি সেই বাবুকে দুই দিবস মাত্র দেখিয়াছ; কিন্তু তার এক দিবসের কথা-মাত্র জানিতে পারিলাম—অন্য দিবসের কথা ত কিছু বলিলে না!"

কৈলাশ।—এই ঘটনার দুই দিবস পরে আমি নাথের-বাগানের ভিতর দিয়া একদিবস গমন করিতেছিলাম। সেই দিবস রাস্তার উপর তাঁহাকে পুনরায় দেখিতে পাই, ও জিজ্ঞাসা করায়, তিনি একটী বাড়ী দেখাইয়া দিয়া কহেন যে,—'এই বাড়ীতে আমার 'শশী' নামীয়া একটী স্ত্রীলোক আছে, তাহারই নিকট আমি গমন করিয়াছিলাম।' এই বলিয়াই, সেই স্থান হইতে তিনি প্রস্থান করিলেন, আমিও আপন কার্য্যে গমন করিলাম।

কৈলাশের এই কথা শুনিয়া, মনে একটু আশা হইল। শশীর নিকট গমন করিলে আরও অনেক কথা জানিতে পারিব ভাবিয়া, কৈলাশকে সঙ্গে লইয়া নাথের বাগানে গমন করিলাম। কৈলাশ একটী বাড়ি দেখাইয়া দিল; এবং সেই বাড়ির ভিতর গমন করিয়া শশীকেও পাইলাম। শশীকে জিজ্ঞাসা করাতে, সে অন্য কোন কথা বলিতে পারিল না। কিন্তু সে যাহার রক্ষিতা, তাহার নাম বলিল, ও সে যে স্থানে কর্ম্ম করে, তাহাও বলিল। দেখিলাম, কৈলাশ যে নাম ও ঠিকানা দিয়াছিল, শশীও সেই নাম ও ঠিকানার কথাই বলিল। তখন, কৈলাশের কথার উপর বিশ্বাস হইল, ও সেই বাবুই যে এই নোট ভাঙ্গাইয়াছে, তাহাই স্পষ্ট বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু এ কথা সর্ব্ব-সমক্ষে প্রকাশ করিতে পারিলাম না। যে নাম ও ঠিকানা পাইলাম, তাহা আপন মনের ভিতর রাখিয়াই অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। সর্ব্ব-সমক্ষে সে নাম প্রকাশ করিতে লজ্জা বোধ হইতে লাগিল। মনের ভিতর নানারূপ ভাঙ্গা-গড়া করিতে লাগিলাম, ও পরিশেষে একজনের সহিত পরামর্শ করিয়া এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ করাই সাব্যস্থ করিলাম। সেই "একজনের" নামও এখন পাঠকগণ অবগত হইতে পারিলেন না সত্য, কিন্তু সময়-মত কাহারও যে একথা জানিতে বাকি থাকিবে না, তাহা আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি।

বনিল না কেন?

বুঝিতে পার নাই; বুঝাইতে পার নাই। সভ্য, অসভ্য; শিক্ষিত, অশিক্ষিত; জ্ঞানি, মূর্খ; প্রভৃতি পরস্পর বিপরীত-ভাবাপন্নদিগের মধ্যে বনি-বনাও নাই, এ কথা তোমায় কে বলিল? তুমি যতদিন সংসার-নাট্যশালায় অভিনয় করিবে, ততদিন, প্রতি দণ্ডে, প্রতি মুহূর্ত্তে, প্রতি পলকে, দেখিতে পাইবে,—সভ্যে অসভ্যে, শিক্ষিতে অশিক্ষিতে, জ্ঞানী ও মূর্খে প্রতি-নিয়তই কর্ম্মসূত্রে-বাঁধা। মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া, কে কবে সভ্য, শিক্ষিত ও জ্ঞানী হইয়াছে, বল দেখি? চিরদিনইত দেখা যাইতেছে,—অসভ্য

সভ্যের নিকট, অশিক্ষিত শিক্ষিতের নিকট, মূর্খ জ্ঞানীর নিকট শিক্ষালাভ করিয়া, যথাক্রমে সভ্য, শিক্ষিত এবং জ্ঞানী হইয়া থাকে। এইরূপ জগতের চক্ষে যতগুলি "কু" বলিয়া পরিলক্ষিত হয়, তাহার সকলগুলিই "সু"র সহিত সংসৃষ্ট হইয়া "সু"তে পরিণত হয়। তাই বলিতেছিলাম,—বনিল না কেন, বুঝিতে পার নাই।

একটা সাদা কথায় এই কথাটা খোলসা করিয়া দিই। তোমার সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে প্রতিদিন অসংখ্য অশিক্ষিত, অসভ্য প্রভৃতির সহায়তা না হইলে চলে না। গৃহস্থালীতে ঝি, চাকরাণী, বেহারা, দ্বারবান প্রভৃতিকে তুমি জোর করিয়া সভ্য করিতে চাহিলেও, ইহারা যে অসভ্য, অশিক্ষিত এবং অজ্ঞানী, ইহা ত আমি অস্বীকার করিতে পারিব না! সহজ কথায়, বনের বিড়াল, কুকুর, ঘোড়া প্রভৃতি জন্তুর সহিতও যখন মানুষের বনি-বনাও হইতে দেখা যায়, তখন তুমি মানুষ, আমি মানুষের সহিত "বনিল না কেন", তাহা তুমি বুঝিতে পারিলে কৈ?

ধর্ম্মে, সমাজে, আহারে, বিহারে, আচারে, চরিত্রে, অথবা আর যাহাতেই বল, তোমাতে আমাতে একটুও প্রভেদ নাই—তবে প্রভেদটুকু তোমার বুদ্ধির। তুমি দেখিতেছ, দু'জনার মাঝখান দিয়া এক মহাসমুদ্র প্রবাহিত; কিন্তু আমি দেখিতেছি, দুজনার মাঝখানে সামান্য একটুকু ঝিল! এই ঝিলটুকু কিসে অতিক্রম করিবে, বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছ না।

তুমি চিন্ময়ী-দেবীর উপাসনার জন্য যদি মৃণ্ময়-আধার গঠন কর, তবে অবশ্যই স্বীকার করিবে, তোমার দেব অথবা দেবী চিন্ময় অথবা চিন্ময়ী। কিন্তু যখন ঈশ্বর চিন্ময় বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছ, তখন পৌত্তলিকতার আড়ম্বর তোমার পক্ষে ভণ্ডামি নয় কি? আমি তোমার ধর্ম্মকে অপধর্ম্ম বলি "না, তোমার কর্ম্মকে অপকর্ম্ম বলি। আর, তোমার পূর্ব্বপুরুষগণ অথবা মুনি-ঋষিগণও ভ্রান্ত ছিলেন না; তোমার বুঝিবার ভুল, তুমি বুঝিতে পার না—তুমিই ভ্রান্ত।

তোমাকে এত বড় একটা শক্ত কথা কেন বলিলাম, তাহা একটু খোলসা করিয়া বলা ভাল। চটিও না, অথবা আমাকে বিধর্ম্মী বা যা-ইচ্ছা-তাই বলিয়া গালাগালি দিও না। মনে কর, তুমি ক'য়েতের ছেলে, শূদ্র; সুতরাং হিন্দু। কিন্তু তুমি যে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া হিন্দু বলিয়া গুমর কর, সেই শাস্ত্রেই বলে,—ব্রাহ্মণের পদসেবা করা শূদ্রের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কিন্তু, তুমি তাহা কর কি? তোমার পূর্ব্ব-পুরুষেরা ব্রাহ্মণ দেখিবামাত্র অশেষ ভক্তি-সহকারে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিয়া চরিতার্থ হইতেন; কিন্তু তুমি আজ কোন্ লাজে সেই ব্রাহ্মণের সহিত একাসনে বসিতে কুণ্ঠিত হও না? তোমার পূর্ব্ব-পুরুষেরা ব্রাহ্মণ দেখিবামাত্র যেস্থলে পদধূলি লইতেন, তুমি নিজের বুকে হাত দিয়া বল দেখি, আজ সেই ব্রাহ্মণের সহিত 'হেণ্ডসেক করিয়া' সেই কাজ সারিয়া দেও কি না? ভণ্ডামি করিয়া বলিও না, নিজের প্রাণের অন্তস্তল পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিয়া দেখ দেখি,—তোমার যে পূর্ব্ব-পুরুষ এত দিন অন্যের পক্ক দ্রব্য গলাধঃ করিতে জাতিধ্বংশ মনে করিতেন, আজ তাঁহাদেরই সন্তান তুমি—ময়রা-দোকানের ছত্রিশ-জাতি-পৃষ্ট লুচি-তরকারিতে উদর-পুর্ত্তি করিয়া হিন্দু হইতে চাও কি না?

কত বলিব! তোমার পূর্ব্ব-পুরুষ এবং মুনি-ঋষিগণ যে চর্ম্মপাদুকাকে গো-চর্ম্ম-নির্ম্মিত বলিয়া অপবিত্র মনে করিতেন, বল দেখি, তুমি ঠনঠনিয়ার সেই চর্ম্ম-পাদুকা লইয়া রন্ধনশালে প্রবেশ কর কি না? আর, তাহা আসনের পশ্চাদ্ভাগে রাখিয়া, চব্য-চোষ্য-লেহ্যপেয় অকাতরে গ্রহণ কর কি না? তাই বলি, পূর্ব্ব-পুরুষের কথা ছাড়িয়া দেও; জ্যেঠামির সহিত 'শাণে-ঘসা হিন্দুয়ানি' লইয়া লোকের নিকট বাহাদুরী দেখাইতে যাইয়া হাস্যাস্পদ হও কেন?

'আমার ধর্ম্মটা কি?'—তাহা তুমি বুঝিতে পার নাই। ফলতঃ "ধর্ম্ম" পদার্থটা কি, এটা হৃদয়ঙ্গম করা বড় শক্ত কথা—তোমার-আমার কর্ম্ম নয়! তবে আমি 'আমার' জন্য যেটুকু বুঝিয়াছি, তাহাই তোমাকে বলি। সাদা কথায় বুঝিয়া লও,—"ন্যায়ই ধর্ম্ম।" কিন্তু তোমার মনের ধর্ম্মভাব বোধ হয় তেমন নহে। কিন্তু এটা মনে রাখিও,—তুমি গোঁড়া-হিন্দুয়ানীর অন্তরালে থাকিয়া, তোমারই পূর্ব্ব-পুরুষগণের আচার-ব্যবহারের বিপরীত চলিয়া, শুদ্ধ মৃণ্ময় আধার অবলম্বন করিয়া চিন্ময়ীর আরাধনায় ধার্ম্মিক হইবার দাবি করিতে পার না! তোমার পূর্ব্ব-পুরুষের কেহ কখন পঙ্ক ব্যঞ্জন বাজার হইতে ক্রয় করিয়া উদরসাৎ করিয়াছেন কি? তাই বলিতেছিলাম,—'বনিল না কেন,' বুঝিতে পারিলে না, পারিবেও না।

ধর্ম্মের কথা আর তোমাকে বলিব না। ঈশ্বরের অস্তিত্ব যে আমি স্বীকার করি না, ইহা তোমার ভুল। ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকারের গূঢ় অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিবার অধিকার তোমার আছে কি না, আমার বিশ্বাস হয় না। তুমি বাইবেল, কোরাণ, হিন্দুশাস্ত্রাদি মাথায় তুলিয়া লইয়া, উচ্চ হইতে চাও; কিন্তু আমি দেখিতেছি 'সরকারের খাড়বুকে' তোমার দখল নাই। একথা কেন বলিলাম, তাহাও বলি;—

"There lives a soul in all things and that soul is God."

অর্থাৎ পার্থিব সকল বস্তুতেই একটী আত্মা আছে, সেই আত্মাই ঈশ্বর। যে হিন্দুশাস্ত্রকে তুমি তোমার বলিয়া টানিয়া লইতেছ, তাহাতেই এই আত্মাকে (soul) পরমাত্মা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছে। এখন, তুমি নিজে বুঝিতে পার না, অথচ অনর্থক চীৎকার করিয়া বেড়াও—'বনিল না।'

তোমার সকল কথাগুলি বুঝাইয়া দিতে হইলে পুঁথি বাড়িয়া যায়; তাই এবারে আর বেশী না বলিয়া, তোমার পরিচ্ছদের কথাটা বলিয়াই উপসংহার করিব। তুমি যে হিন্দু বলিয়া আমাদের পরিচ্ছদের নিন্দাবাদ করিতেছ, আমরা অনুকরণ করিয়াছি বলিতেছ, কিন্তু তুমি কি করিয়াছ? কপ্‌দার সার্ট, বেলদার পিরান, পাঞ্জাবী আস্তীনের দীর্ঘ কোট পরিধান করিয়া, যখন মৃণ্ময়ী মহামায়ার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত কর—কপের ইস্ত্রীটী ভাঙ্গিয়া যাইবে, সার্টের ইস্ত্রীটী নষ্ট হইয়া যাইবে বলিয়া, লোকদেখান-মত মাথাটী নোঙাইয়া ভক্তি দেখাও; বল দেখি, সামান্য উত্তরীয় গল-লগ্ন করিয়া যে প্রণিপাত করে, তাহার নিকট তুমি হাস্যাস্পদ কি না? এ কথাও চুলোয় যাক্; কিন্তু বলি, সার্ট-পিরান কি তোমার হিন্দুর পরিচ্ছদ? হিন্দুর কি পরিচ্ছদ নাই? তুমি সভ্যতা-রক্ষার ভান করিয়া যে সার্ট-পিরানের আবশ্যকতা প্রতিপাদন করিতে চাও, আমি বলি, তাহা ছাড়াও সভ্যতা রক্ষা হয় না কি? প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় জীবনে পিরান ব্যবহার না করিয়া, শুদ্ধ চাদর ব্যবহার করিয়াছিলেন; তিনি কি তোমার-আমার ন্যায় অসভ্য ছিলেন? তাই বলি, আর বাজে কথা বলিও না। প্রথমে শিক্ষা কর, সুপথ-কুপথ বাছিয়া বাহির করিতে শিখ, তবেই দেখিতে পাইবে, বনিবে। নতুবা ইহজন্মে আর বনিবে না; বনিবে না কেন, তাহাও বুঝিতে পারিবে না।

শ্রী—জনৈক সংস্কারক।

সভ্য ইউরোপীয় যুগ।

যে সভ্যতা অবলম্বন করিয়া ইউরোপ গরবে পৃথিবীকে ভারাক্রান্তা করিয়াছে, এখনও কি তাহার পরাকাষ্ঠা হইবার বাকি আছে? যে জড়-পূজা এই সভ্যতার ভিত্তি, তাহার ফল কি ইহা অপেক্ষাও উৎকর্ষ-লাভ করিবে? জড়জগতে কি অধিকতর অধিকার-বিস্তার সম্ভব? তড়িৎ, আলোক, উত্তাপ প্রভৃতি বহুবিধ প্রাকৃতিক শক্তিই তো আজ্ঞাবহ ভৃত্যের ন্যায় দণ্ডায়মান!

বর্ত্তমান-সভ্যতা-কাণ্ডে ইহাই এক দর্শনীয় পদার্থ। আহা! এত ক্ষমতা, এত অধিকার যদি শুদ্ধ সৎ-অনুষ্ঠানের জন্য হইত, তবে কি সুখ-চিত্রই ভবিষ্যতের জন্য অঙ্কিত থাকিত! কিন্তু পৃথিবী এমন মাটী হ'য়ে আছে যে, ছাই দুঃখ ছাড়া সুখ, সয়তানি ছাড়া ক্ষমতা, কুটিলতা ছাড়া বুদ্ধিমত্তা নজরে আসে না। শ্রীরামচন্দ্রের আমলের রাজ্য, যুধিষ্ঠিরের আমলের ধর্ম্ম—এ সকল ত গল্প হইয়া গিয়াছে! তাই বলি, এই যে আশ্চর্য্য ইউরোপীয় সভ্যতা জড়-জগতের উপর অপূর্ব্ব আধিপত্য করিতেছে, ইহাতে ভয়ের কারণও বড় কম নাই।

যে সভ্যতার অনুজ্ঞায় অগ্নিদেব শকটবাহী, তাহারই ঈঙ্গিতে রসায়ণ, বারুদ, ডাইনামাইট, এক্রাসাইট প্রভৃতি শাণিত অস্ত্র-হস্তে আগুয়ান! নিমেষে অক্ষৌহিণী-বধে উদ্যোগী! যে সভ্যতার তাড়নায় গভীর জলধি বিহীন-বিক্রম, তাহারই প্ররোচনায় টর্পিডো নিমেষে শত পোত-ধ্বংশে বদ্ধ-পরিকর! যে সভ্যতার আদেশে চপলা আবদ্ধা থাকিয়া ঘাটে-পথে আলো জ্বালিয়া বেড়াইতেছেন, তাহারই আজ্ঞায় সেই চপলা মুহূর্ত্তে সহস্র প্রলয়-বজ্র-বর্ষণেও কুণ্ঠিতা নহেন।

বর্ত্তমান-সভ্যতার একদিকে যেমনি শক্তি বাড়িয়াছে, অপরদিকে তেমনি শান্তি-হ্রাস হইয়াছে। দিন নাই, রাত নাই, জলে, স্থলে, শূন্য-দেশে—মনুষ্য কেবল অবিশ্রান্ত 'টাকা টাকা' করিয়া সারা হইতেছে। কেবল ছুটা-ছুটী, ছুটা-ছুটী, —বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, জড়-পদার্থের আদরেই অজ্ঞান! ধনকুবের রাজন্যবর্গ ধনতৃষ্ণায় অস্থির! আফ্রিকা, আশিয়া প্রভৃতি সকল মহাদেশই আপনা-আপনির মধ্যে ভাগাভাগি করিয়া লইবার জন্য লালায়িত! এদিকে পরাক্রান্ত রুষ-রাজ সদা শশঙ্কিত—শত শত নিহিলিষ্ট প্রজা তাঁহার বিরুদ্ধে গূঢ়চারী; অপরদিকে অপরাপর রাজ্য পরস্পরের ক্ষমতা-বৃদ্ধির আশঙ্কায় অস্থির! সমাজও টলমল! পবিত্র বিবাহ-সংস্কার উঠিয়া যাইতেছে। সাংসারিক সুখ-স্বচ্ছন্দতায় আত্যন্তিক অভাব হইয়া আসিতেছে। নৈতিক অবনতির অসম্ভব পরিচয় মাঝে মাঝে মিলিতেছে। ধর্ম্মের প্রাণ শেষ হইতেছে। পার্থিব সুখের আশায় যে জীবন-সংগ্রাম চলিয়াছে, তাহাতে কাহারই অব্যাহতি নাই। ইহার কি যে পরিণাম, কে বলিবে? মহাকালের নিকট কিছুই চিরস্থায়ী নহে। কত যুগ-যুগান্তর কাটিয়া গিয়াছে, লক্ষ লক্ষ বৎসরের যত্ন-বর্দ্ধিত কত কত সমাজ তিরোহিত হইয়াছে, তাহাদের সত্তার গল্প-মাত্র পড়িয়া আছে। কে বলিতে পারে যে, এমন সময় আসিবে না, যখন এত গরবের বর্ত্তমান যুগও তিরোহিত হইবে! রোম, গ্রীশ কত উন্নত ছিল; কিন্তু এখন তাহার গল্পমাত্র পড়িয়া আছে। নর্ম্মানাদি জাতির অভ্যুদয়ের কথাও জল্পনা-মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে। আবার বর্ত্তমান ইউরোপীয় হুহুঙ্কারও হয় ত এক সময় এইরূপ ইতিহাসের পৃষ্ঠামাত্রে লিখিত থাকিবে। চিরস্থায়ী কিছুই নহে, তাই শাস্ত্রে গর্ব্ব নিষিদ্ধ। ভবিষ্যতের নিকট বিচারের ভার। বর্ত্তমানে নিজের অনুষ্ঠিত কার্য্যে নিজের প্রশংসা-পত্র জাহির করা কেবল বিড়ম্বনা-মাত্র। বীরদর্পী রাবণ তিরোধান করিয়াছে; কিন্তু তাহার সতী সাধ্বী সীতা-হরণের কথা এখনও লোক-সমাজে প্রচলিত রহিয়াছে। ভীষ্ম, দ্রোণ, যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন—ইহাঁরাও পৃথিবী-পৃষ্ঠ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু ইহাঁদেরও কথা সমাজে চিরস্মরণীয়। বীর নেপোলিয়ন মানব-জীবন ত্যাগ করিয়াছেন; তাঁহারও কীর্ত্তিকলাপ গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে। মানুষ চিরকাল থাকে না; দেশ, মহাদেশেও পরিবর্ত্তন সঙ্ঘটিত হয়; যুগের পর যুগাবর্ত্তন হয়; কিন্তু ঘটনাবলির ইতিবৃত্ত থাকিয়া যায়। সেই ইতিবৃত্ত অবলম্বন করিয়া শেষে বিচার হয়। সে বিচারে, ভালর নাম মন্দ বলিতে বা মন্দের নাম ভাল বলিতে, কোন উকিল-ব্যারিষ্টার থাকে না।

এই সেদিনকার কথাই ধরনা কেন? বীর নেপোলিয়নের যশঃসূর্য্য যখন তুঙ্গস্থান অধিকার করিল, তাঁহার প্রজাবাৎসল্য যখন ফ্রান্সের জনসাধারণকে একসূত্রে গ্রথিত করিল; তখন ইংরাজ-রাজ্যাধ্যক্ষেরা তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবার যুক্তি-প্রদর্শনার্থ রাশি রাশি অপবাদ প্রচার করাইতে লাগিলেন। নেপোলিয়ন নর-পিশাচ, মনুষ্য-শার্দ্দূল, গণ্ডমূর্খ, রুধির-লালসায় অন্ধ, প্রচণ্ড লোভী, দুর্দ্দম্য দস্যু, প্রভৃতি কত নামেই অভিহিত হইয়াছিলেন! কিন্তু কালের সঙ্গে সঙ্গে সে সকল কলঙ্ক ঘুচিয়াছে; এখন, প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার এ্যাবটের মতই জগতের হৃদয়-গ্রাহী হইয়াছে। এখন আর তাঁহার মহত্ত্বের কথা পড়িলে, তাহাকে চাপা দিবার লোক বেশী মিলে না। কিন্তু, ইংরাজের ছলনার কথা—নেপোলিয়নকে আতিথ্য-দানের অভিপ্রায় জানাইয়া শেষে বন্দী করিবার কথা—মৃত বীর নেপোলিয়নের উপরও নীচ প্রতিহিংসা-প্রদর্শনের কথা, যাহা রটিয়াছে, তাহাই রহিয়া গেল।

সিরাজ-উদ্দৌলা মরিয়াছে; কিন্তু তাহার অনবধানতায় যে অন্ধকূপ-হত্যা হইয়া গিয়াছে, তাহার জঘন্য কাহিনী চিরকালই সিরাজের কলঙ্ক-ঘোষণা করিবে। নন্দকুমার হত হইয়াছেন; কিন্তু তাঁহার নামে যে কলঙ্ক-কালিমা ঘোষিত হইয়াছিল, তাহার গভীরতা আর নাই।

উদাহরণের অপ্রতুল নাই। মহাকাল চিরকালই ঘোষণা দিয়া আসিতেছেন,—"মানব, অতি অকিঞ্চিৎকর। তাহার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের কথা যেন প্রতিনিয়ত স্মরণ থাকে। কারণ, বৃথা নিন্দা বা বৃথা সুখ্যাতি প্রচার করিলে ভবিষ্যতে তাহা টিকিবে না। বর্ত্তমানে কাজ, ভবিষ্যতে বিচার।"

মনে কর, বর্ত্তমান ইউরোপীয় যুগের অবসান হইল; ইহার প্রধানতম ঘটনাবলী, অপরাপর যুগের ইতিহাসের সহিত মিলিত হইল; এবং ভবিষ্যৎ নবযুগের নর-সমাজ সেই ইতিহাসের বিচার আরম্ভ করিল। হয়ত তখন রামচন্দ্রের সাগর-বন্ধনের মত বর্ত্তমান-যুগের টনেল বাঁধার কথা গল্প বলিয়া লোকে মনে করিবে! হয়ত তখন ব্যোমযানের কথা পুষ্পক-রথের সহিত মিলিয়া যাইবে! বারুদ, ডাইনামাইটের কথা, আগ্নেয়াস্ত্র-ব্রহ্মাস্ত্র প্রভৃতির মত অলৌকিক বলিয়া মানুষের ধারণা হইবে! তড়িতাদির বিদ্যা, তন্ত্র-মন্ত্রের সামিল হইয়া পড়িবে! কিন্তু যে লোক-ব্যবহারের গল্প থাকিয়া যাইবে, তাহাতে ভবিষ্যৎ মনুজের চরিত্র-গঠনের যে যথেষ্ট উপদেশ থাকিয়া যাইবে, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। কারণ, যদিও যুগাবর্ত্তনের সঙ্গে বিদ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি ও পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে; আহার-বিহার, বসবাস, যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রভৃতিতেও পরিবর্ত্তন হয়; কিন্তু নৈতিক-জ্ঞানের বড় একটা হ্রাস-বৃদ্ধি মনুষ্য-সমাজে দেখা যায় না। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপরে ভাল-লোক বলিতে গেলে, যেমন পরার্থপরতা, সদ্ব্যবহার, সৌজন্য, দয়া, দাক্ষিণ্য, সত্যপ্রিয়তা প্রভৃতি সদ্গুণের আধার বলিয়া স্থির হইত; এই ঘোর কলিতেও ভাল-লোক শব্দে মানুষের সেই সকল সদ্গুণের দিকেই লক্ষ্য হয়। তবে তফাৎ এই, ওরূপ লোক বড় একটা একালে মিলে না। কিন্তু সামর্থ্যে কুলান নাই হউক, কিরূপে ভাল লোক হইতে হয়, সে জ্ঞানটা অনেকেরই আছে।

তাই বলিতেছিলাম, বর্ত্তমান-যুগের এত সাধের বিদ্যা, শাসন-প্রণালী, বাণিজ্য-ব্যবসায়ের পন্থা, সমর-কৌশল প্রভৃতি হয়ত এক সময় জগতে কথার কথা হইয়া দাঁড়াইবে—তাহাদের কোন কার্য্যকারিতা থাকিবে না! কিন্তু এখনকার নৈতিক উন্নতি বা অবনতির কথা ভবিষ্যৎ যুগের লোক বেশ বুঝিতে পারিবে—বিচার করিতে পারিবে; এবং ইহা দেখিয়া উৎসাহ পাইতে থাকিবে বা সাবধান হইতে শিখিবে। অতএব চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখা সকলেরই কর্ত্তব্য। চরিত্র লইয়া যে নিন্দা-সুখ্যাতি বাহির হয়, তাহার তেজ চিরকাল সমান থাকে। কত কালের কথা, সপ্তরথীতে বেড়িয়া বাল-বীর অভিমন্যুকে বধ করিয়াছিল; কিন্তু আজিও, বহু-কাপুরুষের হস্তে কোন অসহায়ের নিগ্রহ হইলে, অভিমন্যুর উদাহরণ

সর্ব্বাগ্রে লোকের সম্মুখে আসে। আবার কর্ণ ঘোরতর সংগ্রামের কালে, জীবনে উপেক্ষা করিয়া, নিজের রক্ষা-কবচ প্রার্থীর হস্তে অবাধে দান করিয়াছিলেন; সে কীর্ত্তির অনুমাত্রও হ্রাস হয় নাই। ব্যক্তিগত চরিত্রের ন্যায় জাতিগত ও দেশগত চরিত্রও লোকের দৃষ্টি বরাবর সমভাবে আকর্ষণ করে। হিন্দুর উন্নত অবস্থা আর নাই; কিন্তু ব্রাহ্মণ-কুলের তেজ, নশ্বর-পদার্থে অনাশক্তি, দর্শন ও ধর্ম্মশাস্ত্রে পরাকাষ্ঠা, এবং সেই সকল উপাদান হইতে পবিত্রতম জীবন, এখনও পণ্ডিত-মণ্ডলীর সমক্ষে আদর্শ-স্থান অধিকার করিতেছে। ক্ষত্রিয়ের বীরত্ব, পরার্থে জীবনোৎসর্গ, প্রভৃতির কথা জগৎ হইতে কখনই লোপ পাইবে না।

ক্ষত্রিয়ের হস্তে রাজ্য-পরিচালনের ভার ছিল। ক্ষত্রিয় প্রজার সুখ-শান্তির জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতেন। ক্ষত্রিয় অস্ত্রবিদ্যায় অধিকারী; অতএব শরণাগতের রক্ষাই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। ভারতের প্রাচীন ইতিহাসে ইহাই লেখা। যখন বর্ত্তমান যুগ অতীত হইয়া পুরাতনের সামিল হইবে, তখন অস্ত্রধারী ক্ষত্রিয়ের সহিত তুলনায় ইউরোপীয় কাপুরুষ বীরদিগের ইতিবৃত্ত কি জাজ্জ্বল্যই বোধ হইবে! প্রজাপ্রাণ রাজার পদবী লাভ করিয়া, রুষ-রাজপুরুষেরা য়িহুদী-প্রজাপুঞ্জের প্রতি যে ব্যবহার করিতেছেন; অথবা অতুল বলের অধিকারী থাকিয়া, পরাক্রান্ত ইংরাজ, অসহায় ক্ষীণজীবি ব্রহ্ম ও মণিপুরীদিগের সহিত যে ব্যবহার করিলেন; তাহা সুসভ্যোচিত বলিয়া কি কেহ বিশ্বাস করিবে? অহো! সিরাজ! তুমি রাজদ্রোহী বলিয়া কতিপয় ইংরাজকে কারাগারে বদ্ধ করিয়া রাখিতে কহিয়াছিলে, আর তোমার লোকজনের বুদ্ধির দোষে তাহাদিগকে অপ্রশস্ত গৃহে রাখা হইয়াছিল! কিন্তু তাহাতে যে অন্ধকূপ-ঘটনা হইয়া গিয়াছে, সে কলঙ্ক তোমার ক্ষালন হয় নাই। ইংরাজের ইতিহাসে তুমি যে সয়তানী কালমূর্ত্তিতে চিত্রিত হইয়াছ, তাহা কখন মুছিবে না। কিন্তু আজ মণিপুরের বৃদ্ধ মন্ত্রী বীর থঙ্গেল তাহার স্বদেশ-রক্ষণ-প্রবৃত্তির অপরাধে ইংরাজের হস্তে ফাঁশি-কাঠে ঝুলিল! আর, এই মহৎ কার্য্য অতীব সদনুষ্ঠান বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য অনেক ইংরাজ ভায়াই ব্যাকুল! সত্য-মিথ্যা ভগবান জানেন, তোমার নামে অপবাদ আছে যে, তুমি অসহায় অবলাদিগকে হত্যা করিয়া তাহাদের উদরস্থ সন্তান দেখিতে ভালবাসিতে! কিন্তু তোমার ভাগ্যে কখন কি কোন জরাগ্রস্ত, মুমূর্ষু, রাজমন্ত্রীকে কাষ্ঠাসনে করিয়া বহিয়া লইয়া গিয়া, ফাঁশীকাঠে ঝুলান ঘটিয়াছে? বা পাছে সে বৃদ্ধের প্রাকৃতিক মৃত্যু উপস্থিত হইয়া পড়ে, সেই ভাবনায় অধীর হইতে হইয়াছে?

সিরাজ! তুমি পৃথিবী ছাড়িয়াছ! এক সময়ে বর্ত্তমান ভীষণ সভ্যতাও তিরোহিত হইবে। ভবিষ্যৎ বলিতে পারে, কার চিত্র কোন স্থান অধিকার করিবে!

আগমনী।

দিবাকরের সুদূর-গামিনী, রসাংশ-শোষিণী তাপশক্তির প্রভাবে, পার্থিব রসাংশ, বিশোষিত ও সমাকৃষ্ট হইয়া, অনুলোম-সমীরণ-প্রভাবে বাষ্পাকারে পরিণত হয়। ঐ বাষ্পনিচয়, আবহ-বায়ুর সংশ্লেষণ-শক্তির ক্রিয়াবশতঃ মেঘমালায় পরিণত হইয়া, অনুকূল-সমীরণে সঞ্চালিত হইলে, প্রাবৃট্-কালের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। এইকালে মেঘসঞ্চায়ক বায়ু প্রায় নিয়তই বহিতে থাকে, মেঘমালা সমন্তাৎ বিকীর্ণ হইয়া দশ দিক সমাচ্ছন্ন করে, সূর্য্য-চন্দ্র প্রভৃতি গ্রহগণ ও নক্ষত্রসমূহ সম্পূর্ণরূপে প্রতিভাত হয় না। পথ পঙ্কিল, সলিল নিয়তই কলুষিত, অনবরত বর্ষণ, গভীর মেঘনির্ঘোষ, অশনি-সম্পাত, ক্ষণ-প্রভার ক্ষণে ক্ষণে বিকাশ, সলিল-কণ-বাহী বায়ুর উচ্ছৃঙ্খল গতি; এই সকল ভীষণ প্রাকৃতিক ব্যাপার, জীবসমূহের আতঙ্ককালিমা সঞ্চার করে, তরঙ্গিনীর ভীষণ বেগের সহিত মানসিক উদ্বেগ-তরঙ্গও উদ্বেলিত করে। এমন কি এই সময়ে হৃদয়, প্রাণ, বুদ্ধি ও আশা, সকলই স্তম্ভিত, নিরুদ্যম ও নির্ব্যবসায় হইয়া উঠে। এজন্য কৃষির সুসময়, কৃষকের সভয়—আনন্দময় এই দুঃসময়ে, সকল জীবই নিদারুণ ক্লেশে নিপতিত হয়। তবে যাঁহারা বড়-লোক, যাঁহাদিগকে বাটীর বাহির হইতে হয় না, চাকরের দ্বারা যাঁহাদিগের সকল কার্য্যই সমাহিত হয়; তাঁহাদিগের ততদূর কষ্ট হয় না। ফলতঃ কষ্ট আছেই আছে, এবিষয়ে তাঁহারাই প্রমাণ।

কালের পরিবর্ত্তন-ক্রমে, স্বভাবের অনির্ব্বচনীয় স্বভাবে, রথচক্রের ন্যায়, শাণযন্ত্রের ন্যায়, মানবের সংসার-ভ্রমণের ন্যায়, এহেন বর্ষাসময় আজ পরিবর্ত্তিত ও অন্তর্হিত হইল। প্রকৃতি-লতিকার সৌন্দর্য্য-কুসুম বিকসিত হইয়া উঠিল। সূর্য্যের তেজস্বিনী শক্তি প্রকটিত হইল, সুধাংশুময় সুধাংশুর কৌমুদী-সোহাগে কুমুদিনীর কুসুমাঙ্গ প্রস্ফুরিত হইল। তজ্জন্য আজ কুমুদিনী সোহাগভরে দুলিতেছে, আনন্দ-সলিলে ভাসিতেছে, কখন বা কান্তের সুধাময়ী কান্তি নয়ন-চষকে পান করিতেছে। ঐ দেখ, চকোরকুল আনন্দভরে আকুল হইয়া, কৌমুদী-সলিলে অবগাহন করিতেছে, ঔৎসুক্যময়ী তরঙ্গমালায় অঙ্গ ঢালিয়া দিতেছে। এই শরৎকাল, বর্ষাকালের নিদারুণ ক্লেশ অপনয়ন করিয়া শান্তিবিধান করিল। কষ্টের পর আনন্দই, পরমানন্দরূপে অনুভূত হইয়া থাকে। তাই আজ আনন্দময় শরৎ-সময়ে পরমানন্দময়ী মহাশক্তির শুভাগমন। সেই অনির্ব্বচনীয়-স্বরূপা মহাশক্তির মহীয়সী শক্তির অন্তস্তলে প্রবেশ করিতে কাহার শক্তি আছে?

"কিং তত্র পরমাণুর্ব্বৈ, যত্র মজ্জতি মন্দরঃ।"

মাদৃশ পরমাণুর কথা ত অতি দূরের কথা। ব্রহ্মাদি মন্দরপর্ব্বতও যাহাতে ডুবিয়া যায়, আমি কোন্ প্রাণে, কোন্ হৃদয়ে, এবং কোন্ বুদ্ধিতে, তাঁহার স্বরূপ-নির্ণয় করিব? তবে পক্ষীর পক্ষবল যতদূর, শরের প্রয়োগবল যতদূর, ততদূরই সে ঊর্দ্ধদিকে গমন করে। অনন্ত অপরিচ্ছিন্ন আকাশের সীমা কে করিবে? তাই সে সেই পর্য্যন্ত যাইয়াই প্রতিনিবৃত্ত হয়। ক্ষুদ্রবুদ্ধি আমি—আমিও সেইরূপ যতদূর যাইতে ক্ষম, ততদূর গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

বহির্জগতে যেমন বসন্তের পর গ্রীষ্ম, গ্রীষ্মের পর বর্ষা ও বর্ষার পর শরৎকালের ক্রমিক প্রাদুর্ভাব হয়; অন্তর্জগতেও সেইরূপ ঋতুভেদের সঞ্চার হইয়া থাকে। বহির্জগতে যেমন বসন্ত ও শরৎ এই দুইটি অতুলনীয় আনন্দময় সময়, অন্তর্জগতেও এইরূপ দুইটী আনন্দময় সময় সময়ে সময়ে সমাগত হইয়া থাকে। প্রথমটি সংসারের অসারত্ব-দর্শনে তাহাতে অনাশক্তি, অপরটি সংসারের তীব্র যাতনা-ভোগান্তে বৈরাগ্য। বসন্ত ও শরৎ, এই উভয় কালেই আনন্দময়ী জগজ্জননীর প্রাদুর্ভাব। এক্ষণে শারদী দেবীর শুভাগমনই আমাদের আলোচ্য। এই দেহরূপ জগতে মেরুদণ্ডই সুমেরু। উহার নিম্নভাগে দ্বাদশ-কলান্বিত দিবাকর পিঙ্গলমার্গে ঊর্দ্ধরশ্মি হইয়া অবস্থান করিতেছেন। হৃদয়ে প্রাণনামক বায়ু অবস্থিত হইয়া শরীর রক্ষা করিতেছেন, ও ললাটদেশে ষোড়শ-কলান্বিত সুধাকর, নিয়ত সুধাংশু বিকীরণ করিয়া, শরীরকে সরস ও পরিপুষ্ট করিতেছেন। যেমন বহির্জগতে চন্দ্র, সূর্য্য ও বায়ুদ্বারা সমুদায় অত্যাবশ্যকীয় কার্য্য ও ঋতুভেদের প্রবর্ত্তন হইয়া থাকে, সেইরূপ শরীরস্থ উক্ত পদার্থত্রয়ের পরস্পর সাহায্যে ঋতুভেদেরও প্রবর্ত্তন প্রকটিত হয়। ঐ নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক রাত্রিন্দিব পূর্ণোদয় পূর্ণবিম্ব সুধাংশু হইতে নিয়ত ক্ষরিত সুধাংশু, নিম্নস্থ সূর্য্যের ঊর্দ্ধগামী প্রখর কিরণনিচয়ে বিশোষিত হওয়ায়, এই শরীর বাল্য-যৌবন-বার্দ্ধক্য প্রভৃতি পরিণামে পরিণত হইয়া কৃতান্তের করাল কবলে নিপতিত হইতেছে। যখন আমাদের হৃদয় সাংসারিক তাপে বিষম উত্তপ্ত হয়, তখন শরীর-শোষকারিণী

নিম্নস্থ মার্ত্তণ্ডের ময়ূখমালার বেগ প্রবলরূপে বর্দ্ধিত হয়; সুতরাং অন্তর্জগতে সেই সময়ই গ্রীষ্মকাল বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। তখন দেহ নিশ্চেষ্ট, ইন্দ্রিয় নিঃশক্তি, প্রাণ নিতান্ত দুর্ব্বল, কেবল হৃদয়গগনে ভয়, বিস্ময়, মোহ ও সন্তাপ প্রভৃতির বাষ্প-সমুদায় সঞ্চিত হইতে থাকে। এই সকল বাষ্প, ক্রমে কর্ম্ম-বায়ুর সংশ্লেষণশক্তির প্রভাবে ঘণীভূত হইয়া, জৈবিক-ক্লেশরূপ মেঘে পরিণত হইয়া, প্রাবৃট্-কালের সঞ্চার ঘটাইয়া দেয়।

এই সময়ে অনবরত অশ্রু বর্ষণই, বারিবর্ষণ! উদ্বেগের তরঙ্গমালাই স্রোতস্বিনীর কলোচ্ছ্বাস; ঘন ঘন দীর্ঘ-নিশ্বাসই, উচ্ছৃঙ্খল বায়ু-প্রবাহ; তীব্র যাতনার ক্ষণে ক্ষণে স্ফুরণই, ক্ষণ-প্রভার তীব্র বিকাশ; ইষ্ট-বিয়োগ-জনিত দারুণ শোকই, ভীষণ অশনি-সম্পাত; সরস বাগিন্দ্রিয়, তখন কোকিলের ন্যায় নীরব; এমন কি, তখন কি মনোবৃত্তি," কি ইন্দ্রিয়-শক্তি, কি স্নায়বিক শক্তি, কি শারীরিক শক্তি, সকলপ্রকার শক্তিই সমাচ্ছন্ন, নিশ্চেষ্ট ও নির্ব্বীর্য্য;—এই এতাদৃশ ভয়ঙ্কর বর্ষাগমেই জীবমাত্র নিপতিত রহিয়াছে। যখন জীবের যাতনার পরাকাষ্ঠা মৃত্যু আছে, তখন আর কি নাই? সকলি আছে। কালের পরিবর্ত্তন-ক্রমে এতাদৃশ বর্ষাকালও পরিবর্ত্তিত হইবে; জীবের সুখময় শরৎ-সময়ও সমাগত হইবে। যখন জীব সাধনার বলে মনোমালিন্য রূপ মেঘবৃন্দকে অপসারিত করিবেন; তখন তাঁহার চিত্তনদী নির্ম্মলা, গন্তব্য-মার্গ অপঙ্কিল ও প্রশস্ত, মানসরূপ নির্ম্মল গগনে সুখময় পূর্ণচন্দ্রের পূর্ণ-বিকাশ, তখন তাঁহার প্রীতি কুমুদিনী কান্তের মধুময় মাধুর্য্যে সংহর্ষিণী।

এই সময়ে কি দৈহিকী শক্তি, কি ঐন্দ্রিয়িকী শক্তি, কি আভ্যন্তরী শক্তি, কি স্নায়বিকী শক্তি, সকল শক্তিই সম্যক্‌রূপে স্ফুরিত হয়। তাই এই সময়ে সর্ব্বশক্তির মূলাধার আনন্দময়ী আদ্যাশক্তির আবির্ভাব বলিয়া পুরাণ-আগমাদি শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

এক্ষণে 'মহাশক্তির স্বরূপ কি?'—ইহাই আমাদের আলোচ্য। যে শক্তির নিকট সকল শক্তিই পরাভূত; যে শক্তিতে লিখন-শক্তির সমবায় পরিলক্ষিত হয়, যে শক্তি হইতে সকল শক্তিই সমুৎপন্ন হইয়াছে, যে শক্তি ব্যতিরেকে অপর শক্তিগুলি শক্তিহীন হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে; সেই মহাশক্তি চিদানন্দরূপা, অর্থাৎ তিনি জ্ঞানময়ী ও আনন্দময়ী। জ্ঞান-শক্তির নিকট, কি পার্থিবী শক্তি, কি জলীয় শক্তি, কি তৈজসী শক্তি, কি বায়বী শক্তি, কি জড়-শক্তি, কি সংহত শক্তি, সকল শক্তিই পরাভূত। বিশুদ্ধ-জ্ঞান-শক্তি হইতেই অনন্ত অচিন্ত্য আনন্দময়ী শক্তির স্ফুরণ হইয়া থাকে। তাই বিশ্বতারিণী তারিণী মা আমার চিদানন্দময়ী বলিয়া শাস্ত্রে এবং লোকে অভিহিত হইয়াছেন।

অশিব-হারিণী, শিবদায়িনী, শিবগেহিনী মা আমার, শিবময় শিবধাম কৈলাশ অর্থাৎ আনন্দময় কোষ-সহস্রার হইতে জীবের হৃদয়রূপ অবনীতে চিত্তশুদ্ধিরূপ শরৎ সময়েই প্রাদুর্ভূত হন। মা আমার আনন্দময়ী, তাই তিনি আনন্দময় শিবের বিবাহিতা। মা আমার সর্ব্বশক্তি-প্রসবিনী, তাই তিনি শক্তিধর পুত্র ষড়াননকে প্রসব করিয়াছেন। মা আমার জ্ঞানময়ী, তাই তিনি জ্ঞানপতি গণপতি পুত্রকে গণপতি করিয়াছেন। মা আমার, সর্ব্ববিদ্যা ও সর্ব্ব-সম্পত্তির মূলাধার, তাই তিনি বামে সরস্বতী ও দক্ষিণে লক্ষ্মীকে স্থান দিয়াছেন। সম্পত্তি অপেক্ষা বিদ্যার সমধিক গৌরব, তজ্জন্য বিদ্যাদেবী তাঁর বামভাগ সুশোভিত করিয়াছেন, আর সম্পত্তিদেবী তাঁহার দক্ষিণভাগ অলঙ্কৃত করিয়াছেন। তিনি দয়াবতী হইয়া জীবকে বিবিধ সম্পত্তি উপভোগ করান; পশ্চাৎ ভক্তজনের বশীকরণী ভক্তির বলে বশীভূত হইয়া, বন্ধক্ষয়করী মোক্ষকরী দুর্ল্লভা বিদ্যাও অর্পণ করিয়া থাকেন।

আর, তজ্জন্যই 'বিদ্যার গৌরব অধিক' কথিত হইয়াছে।

মার পদতলে মহাসিংহ; সর্ব্বাভিষ্টদায়িনী কাত্যায়নীকে যাঁহারা উপাসনা করেন, কৃতান্ত-কুঞ্জর তাঁহাদের কি করিতে পারে? মা আমার তাঁহাদিগকে মহাসিংহত্ব প্রদান করিয়া, অজেয় করেন; তাই মার পদতলে মহাসিংহ। এই আনন্দময়ী চৈতন্যরূপা শক্তির বিকাশের গৌণ প্রয়োজন অসুর-দলন; তিনি পাপরূপ অন্ধকার-ছবি মহিষাকৃতি অসুরকে বিজ্ঞান-খড়্গে দ্বিখণ্ড করিয়া জীবের পরমগতি দান করিয়া থাকেন। তাই তিনি মহিষাসুর-বিমর্দ্দিনী হইয়া জীবকে অভয়-প্রদান করিতেছেন। মা আনন্দময়ী শক্তি দশদিক্‌কে ইন্দ্রাদি-দশদিক্‌পালরূপে রক্ষা করিতেছেন, তাই তিনি দশভুজা; অথবা জীবের হৃদয়-পদ্মে সমাসীন হইয়া জীবের জীবনী-শক্তিকে প্রাণাদি দশ বায়ু দ্বারা রক্ষা করিতেছেন, তাই তিনি দশভুজা। মা আমার ত্রিনয়না, তাই তিনি সূর্য্যনেত্রে জীবগণকে বুদ্ধি-বৃত্তি প্রদান করিতেছেন, চন্দ্ররূপ প্রসন্ন-দৃষ্টিতে জগৎকে আপ্যায়িত করিতেছেন, আর বহ্নিনেত্র দ্বারা বিবিধ হিতকর শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান করাইতেছেন। মা আমার নাগপাশধারিণী; অসুর-প্রকৃতি লোকদিগকে বিষম মায়াপাশে যোজিত করিয়া, যন্ত্রণাময় মোহকূপে নিক্ষেপ করেন; সেই মায়াপাশই নাগপাশ, তাই তিনি নাগপাশ ধারণ করিয়াছেন। বিশ্বরূপা, বিশ্বগুণা, বিশ্বশক্তি, বিশ্বময়ী, বিশ্বেশ্বরী মার অচিন্ত্য স্বরূপ কে নিরূপণ করিবে? তাই বুদ্ধি এখন নিশ্চল, নিরুদ্যম ও নিঃশক্তি হইয়া প্রতিনিবৃত্ত হইল। এইজন্যই কবি পরিশ্রান্ত হইয়া বলিয়াছেন,—

"মহিমানং যদুৎকীর্ত্ত্য, তৎ সংহ্রিয়তে বচঃ।
শ্রমেণ তদশক্ত্যা বা, ন গুণানামিয়ত্তয়া॥"

অনুসন্ধান-সমিতির বিবরণী।

প্রতারণা-প্রবঞ্চনা।

ভয়ানক জুয়াচুরী!

আজকাল এত রকমেরই জুয়াচুরী হইয়া থাকে যে, তাহা আর বলিবার নহে। কতই নামে, কতই কায়দায়, কতই সাজে যে জুয়াচুরী-ব্যাপার চলিতেছে, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। এতই রকমওয়ারী জুয়াচুরী-কুহক, যে, তাহা সহজে বুঝিবে সাধ্য কার? এই দেখুন, পাঠকগণ, তাহার দুইটী নমুনা,—

এক নম্বর নমুনা। *

"৺ বৈদ্যনাথধাম।

বিনামূল্যে বিতরিত (স্বল্পে প্রাপ্ত) ধাতু দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ দুশাধ্য রোগ হইতে মুক্তি লাভের এক মাত্র উপায় প্রবঞ্চনা বা স্বার্থ সাধন উদ্দেশ্য নহে দেশের হিতসাধন কর্ত্তব্য মনে করিয়া প্রচার করিলাম ইহা সেবনে ধাতু দৌর্ব্বল্য, বিংশতি প্রকার মেহ পুরুষত্বহানী, যৌবনের প্রারম্ভে কুঅভ্যাসজনিত না না পীড়া ও তদনুষায়িক জাবতীয় উপসর্গাদি বাবা বৈদ্যনাথের কৃপায় এক সপ্তাহে নিশ্চয় আরোগ্য হয়। গ্রহনেচ্ছুকগণ বিজ্ঞাপনের ও প্যাকিং খরচাদি ব্যয় ॥০ আনা পাঠইলে ঔষধ পাইবেন। পীড়া আরোগ্যান্তে ৺ বৈদ্যনাথের নামে ।৫ পসার ভোগ দিতে হয়।

প্রকাশীকাঃ শ্রীমত্যা বসন্তকুমারী দেবী
নং ৫০।২ কলেজষ্ট্রীট কলিকাতা।"

দুই নম্বর নমুনা।

"অত্যাশ্চর্য্য লেখনি।

"শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই প্রয়োজনিয়"

সম্প্রতি আমেরীকাস্থ হেরীংটন কোম্পানির নিকট হইতে নূতন ইণ্ডেণ্ট করা হইয়াছে, দেখিতে অতি সুন্দর ও নানাবিধ বিচিত্র রচনায় প্রস্তুত। সর্ব্বদা পকেটে রাখিয়া ব্যবহার করিবার জন্য সু কোশলে নির্ম্মিত হইয়াছে। যদি অল্প ব্যয়ে ও সামান্য আয়াসে লেখা পড়ার সমস্ত কার্য্য সুখে নির্ব্বাহ করিতে বাসনা করেন তবে ইহার এক একটী সংগ্রহ করিয়া রাখুন। দীর্ঘ-জীবন কাটীবে। বস্তুতঃ সর্ব্বদা কালীর প্রয়োজন হইবে এই লেখনি হস্তে ধারণ করিয়া সামান্য অঙ্গুলীর চাপ দিলেই ক্রমান্বয়ে ছুরি পেন, ও পেনসীল ইত্যাদি বাহির হয়।

বিজ্ঞাপনের বৃথা আড়ম্বর প্রয়োজন নাই' ব্যবহার করিলেই ইহার উপকারীতা অনুভূত হইবে। আজকাল ইহা ছাত্র শিক্ষক উকিল, মোক্তার, এবং ডাক্তার প্রভৃতি সকলের নিকটেও আদরের সহিত ব্যবহৃত হইতেছে, মূল্য প্রত্যে-

* বলা বাহুল্য, বিজ্ঞাপন দুইটির ভাষার বা বর্ণাশুদ্ধি যেমনটী বাহির হয়, অবিকল তাহাই উদ্ধৃত হইয়াছে।—৭ই আশ্বিনের 'সহচর' দেখুন।

কটী ২৲ বিদেশে প্যাকিং ৵০ ভারতে এক মাত্র আমদানীকারক ও এজেণ্ট।

পি মহিটী স্কোয়ার
নং ৫০।২ কলেজষ্ট্রীট কলিকাতা।"

এ দু'টিই বিজ্ঞাপনের নমুনা। এ বিজ্ঞাপন বড় এক আদখানি কাগজেও বাহির হইতেছে না; 'সহচর', 'সহযোগী', নবযুগ' প্রভৃতি অনেক পত্রেই আজকাল এই বিজ্ঞাপন দু'টি দেখা যায়। কোন কোনটীতে আবার ইহা অপেক্ষাও অধিক বোলচাল—ইহা অপেক্ষাও অধিক ভণ্ডামী! কোথাও বা আবার ছবি দিয়া বিজ্ঞাপনের আরও বাহার করা হইয়া থাকে! কিন্তু, এখন, এই বিজ্ঞাপন দুইটীর গূঢ় রহস্য পাঠকগণ শুনিবেন কি? এমন চটকদার বিজ্ঞাপন—বিজ্ঞাপনদাতাও একজন 'স্কয়ার' (Esquire); কিন্তু তাঁহার ব্যাপারখানা জানিবেন কি? তবে প্রথম হইতেই একবার বলি। একদিন 'কলিকাতা পুলিশ ট্রেনীং স্কুলের' (Calcutta Police Training School এর) একটী বাবু এই বিজ্ঞাপন-মোহে মোহিত হইয়া, ঐ ঔষধ ও অত্যাশ্চর্য্য লেখনী কিনিতে যান; কিন্তু তিনি, ব্যাপার দেখিয়া, অবাক হইয়া, ফিরিয়া আসিয়া, আমাদিগকে ঐ কথা জ্ঞাপন করেন। তার পর, আমরাও কয়েকদিনই উহার অনুসন্ধান লই; এবং তাহাতে আমরা যাহা জানিয়াছি, তাহাই এস্থলে বলিতেছি। প্রথম দিন আমরা যাইলে, প্রথমতঃ ঐ ৫০।২নং বাড়ীটিই তো খুঁজিয়া পাই নাই। কিন্তু 'পুলিশ ট্রেনিং স্কুলের' সেই বাবুটির নিকট শুনিয়াছিলাম; তাই একটু চেষ্টা করিয়াই বাড়ীটি খুঁজিয়া পাইলাম। দেখিলাম, সেটি একটি অতি কদর্য্য রকমের ক্ষুদ্র খোলার বাড়ী—তাহার উঠানে কয়েকটি মেয়ে-মানুষ! অপরিচিত বাড়ীতে, এরূপ অবস্থায়, স্ত্রীলোকের সহিতই বা কি করিয়া কথা কই? কাজেই সঙ্কুচিত হইলাম। কিন্তু ইত্যবসরেই দেখি, একটী ছোকরা-বয়েসী কাল-রঙের ছিপ্‌ছিপে যুবক দেখা দিলেন। তাঁহাকে ঐ বিষয় জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বলিলেন,—"এ বাড়ীতে আগে উহাঁরা থাকিতেন বটে, কিন্তু এখন ৮৭ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে আছেন; আপনি সেইখানে যাউন—সাক্ষাৎ হইবে।" সম্ভবতঃ যুবকটী আমাদের প্রেরিত প্রতিনিধি মহাশয়কে চিনিতে পারিয়াই, ঐ কথা বলিয়াছিলেন কিনা জানি না। যাইহোক, স্ত্রীলোকের বাড়ী—সম্মুখেই স্ত্রীলোক; কাজেই, আর সেখানে কোন কথা না কহিয়া, আমরা কর্ণওলালিস্ ষ্ট্রীট-অভিমুখেই প্রত্যাগমন করি। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, সেখানে তো উহাঁদের—কি 'শ্রীমত্যা বসন্তকুমারীর রা পি মাইটী এস্কয়ারের'—কাহারও সাক্ষাৎ বা কোনরূপ সন্ধানও পাইলাম না। এই তো সে দিনের ব্যাপার! তারপর, আরও একদিন, ঐ বিষয়ের আরও কিছু সন্ধান পাইয়া, আমরা সেই ৫০।২নং কলেজ ষ্ট্রীটের সেই খোলার বাড়ীতেই গমন করিলাম। সেদিন গিয়াছিলাম, বৈকালে; এদিন যাইলাম, দুই প্রহরের সময়। কিন্তু, এদিন আর সে যুবকের সহিতও সাক্ষাৎ হইল না—বাড়ীর স্ত্রীলোকদের একজনই, আমাদের সম্মুখীন হইয়া, কথা কহিয়া বলিতে লাগিল,—"হাঁ, হাঁ, এই বাড়ীই বটে! কিন্তু সে তো এখন এখানে নেই।" এই বলিয়া, সেদিন ঠিক যে ঘর হইতে সেই যুবকটীকে বাহির হইতে দেখিয়াছিলাম, সেই ঘরের দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—"এই ঘরই বটে! কিন্তু এখন সে তো নাই! ঐ ডাক্তারখানার (মেডিকেল কলেজের) দক্ষিণে ফুটপাথের—দোকানে বোধ হয় থাকিতে পারে।" স্ত্রীলোকের সহিত, অজানা-পুরুষ—আমরা আর কি কথা কহিব? কাজেই ফিরিয়া আসিতে হইল। কিন্তু এমন সময়ই আমাদের রাম বাবুর সঙ্গে দেখা! "এখানে কেন, আপনারা!"—এই বলিয়া সম্বোধন করিতেই, আমরা আনুপূর্ব্বিক তাঁহাকে সমস্ত বলিলাম। তিনি অমনি বলিয়া উঠিলেন,—"এটা আর আপনারা জানেন না! ঐ যে কালমত ছিপ্‌ছিপে ছোঁড়াটা—ওটারই ঐ খেলা! এর সবই জুয়াচুরী। যে কলম এ 'হেরিংটনের আবিষ্কৃত' বলিয়া ২৲ দুই টাকা করিয়া বিক্রয় করিতেছে, আমি দেখিয়াছি, মুর্গিহাটায় ওগুলা ॥০ আনা ॥৵০ আনায় পাওয়া যায়। কখনও কখনও আরও কমেও পাওয়া যায়। আর, মাদুলির কথা আর কি বলিব? ওসব তো আর আপনার অছাপি নাই! ওর ঐ আট আনাই লাভ! ছোঁড়াটা ভারী জুয়োচোর!" এই বলিয়া, তিনি ঐ ছোকরার আরও নানা নাম ও কীর্ত্তির কথা কহিলেন। আমরা তো অবাক্! যাইহোক, ইহার জন্য যাহাতে কোন উপায়ান্তর গ্রহণ করা হয়, তাহারও চেষ্টা হইতেছে; সে ফলও পরে জানাইব। এক্ষণে, সাধারণে মাত্র সাবধান!

অনুসন্ধান।
অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র।

৫ম খণ্ড] ৩০এ আশ্বিন, ১২৯৮। [৬ষ্ঠ সংখ্যা।

শারদীয়া পূজা।

আনন্দময়ি, তোমার আসিবার সময়ই বটে, মা! প্রাবৃটের ঘন-ঘটা দূর হইয়াছে; চক্ষুস্ত্রাস চপলার চঞ্চলচ্ছটা ও কর্ণ-বিদারী গুরুগর্জ্জনও লুকাইয়াছে; ঘণবর্ষী বারিধারা এখন নিস্তব্ধ। দিনমণি সুপ্রকাশ, সুপ্রসন্ন; দিঙ্মণ্ডল পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। দিগ্বালাগণ আবার আনন্দে লুটোপুটী। প্রকৃতি প্রফুল্ল। প্রজাপতি আবার নাচিতে নাচিতে বাহির হইয়াছে। পশু-পক্ষী-কীটপতঙ্গ-মানব—সবাই বর্ষার বাহিরে আসিয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিয়াছে। পঙ্কিল পথ এখন শুষ্ক, ঝর্‌ঝরে। আর, ঐ মাঠের দিকে চাহিয়া দেখ দেখি,—হরিদ্বর্ণে চক্ষু জুড়াইয়া যাইবে। ধানের কানায় কানায় জল;—বায়ুভরে তরুণ তৃণগুলি তরঙ্গ-খেলা শিখিতেছে। এমন সময়ে না হইলে আর কোন্ সময়ে আসিবে, মা?

উপরে শাফ্ সুনীল আকাশ; কলঙ্কের রেখামাত্র নাই;—ক্বচিৎ এক-আধটুকু পথ-হারা মেঘ দুষ্ট বায়ুর কথায় ঘুরিয়া মরিতেছে। নীল চাঁদোয়ার নীচে ধরণী উজ্জ্বল সবুজ গালিচা বিছাইয়াছে। সবাই তোমার আগমন-প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব। জলে—কুমুদ, কহ্লার; স্থলে—স্থলকমল, দোপাটী, বক; শিশিরস্নিগ্ধ নধর ঘাসের উপরে শেফালিকা-রাশি-বিন্যস্ত। পবনান্দোলিত কাশ-কুসুমের আনন্দে প্রান্তর পুলকিত। শরতের ধরণী পুষ্প-সম্ভার হস্তে লইয়া দ্বারে দণ্ডায়মান। আর নিশি? নিশিই কি নিরানন্দ? জ্যোৎস্নার হাসিতে গলাগলি! সে হাসি তরুলতাগণ লুফিয়া লুফিয়া ধরিতেছে! শরতের নিশি সহস্র সহস্র ফুটফুটে চক্ষু খুলিয়া অনিমেষে ধরণীর দিকে চাহিয়া রহিয়াছে। কেন মা? তোমারই আসার আশায় সবাই আনন্দে উৎফুল্ল;—সকলেই সতৃষ্ণ নয়নে একই দিকে চাহিয়া দেখিতেছে।

আর বাঙ্গালী?—ভীরু, নির্জ্জীব, পরাধীন, পরপদদলনে জর্জ্জরিত-কলেবর বাঙ্গালী? পেটে অন্ন নাই, পরণে বস্ত্র নাই, দেহে বল নাই, হৃদয়ে সাহস নাই; পরস্পরে ঐক্য নাই। তোমার আগমনে পুত্র-কন্যা প্রভৃতি আত্মীয়-স্বজনকে মনোসাধে সাজাইতে পারিতেছে না (কেন না, টাকার টানাটানী বিষম) বলিয়া তাহাদের ক্ষোভ রাখিবার স্থান নাই। তাহাও যাক্, দু'দিন যে গৃহে থাকিয়া তাহাদের একটু দেখিবার সাধ মিটাইবে—একটু স্বাধীনভাবে দু'দিন মুক্ত-বায়ুতে একটু দম লইবে, তাহাও সে অভাগাদের অদৃষ্টে নাই। এহেন নির্ব্বিঘ্ন-হৃদয় বাঙ্গালীর অন্তরেও কি-এক আনন্দ-হিল্লোল নিঃশব্দে বহিয়া যাইতেছে!—কেবল তোমারই আগমন-উল্লাসে মা!

তবে এস, আনন্দ-রূপিণী,—একবার শান্তি-

রূপে ভারতে অধিষ্ঠান কর, মা! ভারত আজ নানা অশান্তিতে সংক্ষুব্ধ। তাহার উঠিতে স্বস্তি নাই, বসিতে স্বস্তি নাই; তাহার খাইতে, শুইতে, দাঁড়াইতে—কিছুতেই স্বস্তি নাই। তাহার পারিবারিক অশান্তি, সামাজিক অশান্তি,—কয়টা অশান্তির কথা বলিব, মা? এত উদ্বেগ—এত অশান্তির মাঝে ছেলেকে রাখিতে কি একটু মায়া হয় না, মহামায়া? যদি অধম বলিয়া সন্তানের প্রতি এতই অস্নেহ হইয়া থাকে, তবে ইহাদের নাম আর পৃথিবীতে রাখিয়াছ কেন, পাষাণী? তুমি ত মা সর্ব্বসংহারিণী! ছাগকুলের প্রতি তোমার যে স্নেহ, তাহাই ইহাদের দাওনা;—এ প্রহসনের যবনিকা পড়িয়া যাক্! আর, যদি তাহাতে রাজী না হও, তবে একবার মুখ তুলিয়া চাও, মা! তোমার করুণা-কটাক্ষের অধিকার আমাদের চিরকালই আছে। সত্য আমরা এখন বহিয়া গিয়াছি। আমাদের তন্ত্র-মন্ত্র মনে নাই; ভূতের অধিকারে পড়িয়া 'ভূত-শুদ্ধি' ভুলিয়া গিয়াছি। কিন্তু, দারুণ পশ্বাচারী হইলেও, মার স্নেহ কখন সন্তান হইতে ত দূর হইবার নয়! একবার করুণা-নেত্রে চাও, মা!

তবে উঠ ভাই, ভারতবাসী। আঠাইশ কোটী নরনারী মিলিয়া একবার জাগ। ঐ শুন মৃত-সঞ্জীবনী মন্ত্র—"উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য, বরান্ নিবোধত।" উঠ, উদ্বুদ্ধ হও; তারপর মার বোধনে নিযুক্ত হও। দেখ, মা মুখ তুলিয়া চাহেন কি না। সকলে মিলিয়া একবার জাগাও মহাশক্তিকে। দেখো ভাই, সাধনার ক্রম-পদ্ধতি যেন ভুলিও না। প্রথমেই বিঘ্নাপসরণ কর;—বিঘ্ন-সকল বিদ্যমান থাকিলে সিদ্ধি সুদূর-পরাহত হইবে। যদি মঙ্গল চাও, যদি কল্যাণ-কামনা কর, তবে প্রথমেই বিঘ্ন-সকল দূর কর। হৃদয়ে সাহস করিয়া, বুকে বল বাঁধিয়া, অন্তরে মঙ্গলময়ীর চিন্তা করিতে করিতে বল,—

"বেতালাশ্চ পিশাচাশ্চ রাক্ষসাশ্চ সরীসৃপাঃ।
অপসর্পন্তু তে সর্ব্বে বৈষ্ণবাস্ত্রেণ তাড়িতাঃ॥
অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ।
যে ভূতা বিঘ্নকর্ত্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া॥"

যদি কোন বিঘ্ন বড় প্রবল দেখ, তাহাকে তাড়ান বড় শঙ্কট বুঝ,—তবে তাহাকে অন্য উপায়ে শান্ত কর। তাহাকে "মাষভক্ত-বলি" দাও। বল,—"প্রভুহে, তোমার এই 'বলি' গ্রহণ করিয়া সুস্থির হও,—আমাকে প্রসন্ন হইয়া একটু অবকাশ দাও, আমি মার উদ্বোধনে নিযুক্ত হই। তোমরা দূর হইতে আমার পূজা করা দেখ।"

"ওঁ ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ যে বসন্ত্যত্র ভূতলে।
তে গৃহ্ণন্তু ময়া দত্তো বলিরেষঃ প্রসাধিতঃ॥
পূজিতা গন্ধপুষ্পাদ্যৈর্ব্বলিভস্তর্পিতাস্তথা।
দেশাদস্মাদ্বিনিঃসৃত্য পূজাং পশ্যন্তু মৎকৃতাং॥"

সঙ্গে সঙ্গে শুন ঐ 'চণ্ডীপাঠ'! আহা! কি মধুর! কত আশাপ্রদ, কত সান্ত্বনাদায়ক! মরি, মরি!

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।"

"বাঙ্গালী ভূতের দেহ, শক্তি ত না দেখে কেহ!
ছিলে যদি শক্তিরূপে কেন হ'লে লয়?
আদ্যাশক্তি, শক্তিদেহ; জয় মা চণ্ডীর জয়!"

আবার,—

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা।"

ভারতের এমন বুদ্ধি-বিপর্য্যয় কেন, মা? তুমি যদি বুদ্ধিস্বরূপিণী, সর্ব্বভূতে তুমিই যদি বুদ্ধিরূপে অবস্থিতি করিতেছ, তবে তোমার ভারতের এমন কুমতি কেন, মা? ভারতের ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিরোধ, ঘরে ঘরে গরমিল। ভারত দৈত্যের বিচরণ-ভূমি হইয়া পড়িয়াছে। ভারত আজ নানা অসুরের উপদ্রবে উৎপীড়িত। ভারতে পারিবারিক-দৈত্যে সাংসারিক সুখের সমাধি করিয়াছে; সামাজিক-দৈত্যে সমাজ ছারখার করিতেছে; ধর্ম্মদৈত্যে অধর্ম্ম ও অনার্য্যাচারকে প্রশ্রয় দিতেছে;—দুর্ভিক্ষদৈত্যে গ্রাম-নগর উৎসন্ন দিতেছে! ভারতে কত শত্রুর অধিকার, তবু ভারতের চৈতন্য নাই; তবু ভারত অসাড়! চৈতন্যরূপিণী, এ অসাড় দেহে একটু জীবনী

শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের দুর্গোৎসব।

একবার দেখ মন, ভক্তি কা'রে বলে? মায়ের পূজার একটী পদ্ম কম পড়িয়াছে; রঘুকুলতিলক রামচন্দ্র তাই তৎপরিবর্ত্তে চক্ষু উৎপাটন করিয়া মার পদতলে প্রদান করিতেছেন।

দাও, মা! একটু সুবুদ্ধি সঞ্চারিত কর, মা। এ আঠাইশ কোটী কণ্ঠ একবার সুবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া, এ শুভ শরৎ সময়ে, তোমার বোধন করুক; আঠাইশ কোটী কণ্ঠে একবার বলিয়া উঠুক,—

"শক্রেণ সংবোধ্য স্বরাজ্যমাপ্তং
তস্মাদহং ত্বাং প্রতিবোধয়ামি।
যথৈব রামেণ হতো দশাস্য-
স্তথৈব শত্রূন্, বিনিপাতয়ামি॥"

তাহারা ভুলিয়া গিয়াছে যে, তোমার কৃপা-বলেই তাহাদের এত অভ্যুদয় হইয়াছিল,—তোমার অনুগ্রহেই এত প্রভাবৈশ্চর্য্য লাভ করিয়াছিল।

তবে এস, ভাই, সকলে মিলিয়া একবার কর দেখি মার পূজা! তোমার সমস্ত বিপদ দূর ও সকল আপদের শান্তি হইবে। সকল অভীষ্ট-সিদ্ধি ও পরম ঐশ্বর্য্যলাভ এবং সমস্ত শত্রু নিপাতিত হইবে। মাকে প্রসন্ন করিতে যদি হৃৎপিণ্ডও ছিন্ন করিয়া দিতে হয়, তাহাতেও কাতর হইও না। দেখিও, যেন সঙ্কল্প ঠিক থাকে। জান ত রামচন্দ্র স্বীয় কমল চক্ষু পর্য্যন্ত উৎপাটন করিয়া সঙ্কল্প বজায় রাখিতে গিয়াছিলেন।

এখন করযোড়ে ভক্তিভরে মার আবাহন কর। কোটী কোটী কণ্ঠে কাতরভাবে বল,—

"ওঁ এহ্যেহি ভগবত্যম্ব শত্রুক্ষয় জয়প্রদে।
আগচ্ছ মদ্গৃহে দেবি সর্ব্বকল্যাণহেতবে॥"

ডাকার মত একবার ডাক দেখি ভাই; দেখি, কেমন মা না আসিয়া থাকিতে পারেন? কিন্তু হায়! মা এসে দাঁড়াবেন কোথায়? এ শ্মশান-ভূমে দৈত্য-দানব-পিশাচের তাণ্ডব—শৃগাল-কুক্কুরের কলহধ্বনি—শকুনি-গৃধিনীর উল্লাস—পেচকের কর্কশ চীৎকার—ইহার মধ্যেই এস মা। দেউল ভগ্নচূড়—পূজার দালান ভূমি-সাৎ—হৃদয় ভগ্ন—এ পুঞ্জীভূত ইষ্টক-স্তূপের উপরেই আসিয়া একবার দাঁড়াও, মা সর্ব্বকল্যাণ-দায়িনী! তোমার চারু চরণ-স্পর্শে তাহা পবিত্র হউক—এ শ্মশান-ভূমি নিমেষ-মধ্যে নন্দনকাননে পরিণত হউক। তোমার সমাগমের সূচনা-তেই এই ভগ্ন অট্টালিক-স্তূপ হইতে বৈজয়ন্তীর শোভা ফুটিয়া বাহির হইবে। কিন্তু মহালক্ষ্মি, তুমি তোমার ভ্রান্তিরূপ ত্যাগ করিয়া আইস, মা। জগদবস্থায়—সংসারী-অবস্থায় এমন করিয়া প্রলয় আনিও না। অসুরদলকে আর প্রশ্রয় দিও না, মা। একবার মহিষমর্দ্দিনী-বেশে উদয় হও। এস, একবার দনুজদলনী দশভুজা মূর্ত্তিতে। সঙ্গে আন, সর্ব্ববিঘ্নবিনাশন সর্ব্বসিদ্ধি-দাতা গণেশ,—বলবীর্য্যাবতার দেবসেনানী তারকারি কুমার কার্ত্তিকেয়,—সৌভাগ্যৈশ্বর্য্য-রূপিণী লক্ষ্মী,—আর,—বাণী-বিদ্যা-প্রদায়িণী সরস্বতী। দেখি মা, তোমার দৈত্যদানব-দর্পহা শত্রুক্ষয়করী অথচ প্রসন্নবদনা চারুমূর্ত্তি! মরি মরি, কি সুন্দর!—কি অপরূপ মূর্ত্তি!

"ওঁ জটাজুট-সমাযুক্তামর্দ্ধেন্দুকৃতশেখরাং।
লোচনত্রয়সংযুক্তাং পূর্ণেন্দুসদৃশাননাং॥
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাং।
নবযৌবনসম্পন্নাং সর্ব্বাভরণ-ভূষিতাং॥
সুচারুদশনাং তদ্বৎ পীনোন্নতপয়োধরাং।
ত্রিভঙ্গ-স্থান-সংস্থানাং মহিষাসুরমর্দ্দিনীং॥
মৃণালায়ত-সংস্পর্শ দশবাহু-সমন্বিতাং।
ত্রিশূলং দক্ষিণে হস্তে খড়্গাং চক্রং ক্রমাদধঃ॥
তীক্ষ্ণবাণং তথাশক্তিং দক্ষিণে সন্নিবেশয়েৎ।
খেটকং পূর্ণচাপঞ্চ বজ্রমঙ্কুশমেবচ॥
ঘণ্টাং বা পরশুং বাপি বামতঃ সন্নিবেশয়েৎ।
অধস্তান্মহিষং তদ্বদ্বিশিরস্কং প্রদর্শয়েৎ॥
শিরশ্ছেদোদ্ভবং বীক্ষ্যেদানবং খড়্গপাণিনং।
হৃদিশূলেন নির্ভিন্নং নির্যদন্ত্রবিভূষিতং॥
রক্তরক্তীকৃতাঙ্গঞ্চ রক্তবিস্ফুরিতেক্ষণং।
বেষ্টিতং নাগপাশেন ভ্রূকুটীভীষণাননং॥
সপাশ বামহস্তেন ধৃতকেশঞ্চ দুর্গয়া।
বমদ্রুধিরবক্ত্রঞ্চ দেব্যাঃ সিংহং প্রদর্শয়েৎ॥
দেব্যাস্তু দক্ষিণং পাদং সমং সিংহোপরিস্থিতং।
কিঞ্চিদূর্দ্ধং তথা বামমঙ্গুষ্ঠং মহিষোপরি॥

উগ্রচণ্ডা প্রচণ্ডা চ চণ্ডোগ্রা চণ্ডনায়িকা।
চণ্ডা চণ্ডবতী চৈব চণ্ডরূপাতি-চণ্ডিকা॥
আভিঃ শক্তিভিরষ্টাভিঃ সততং পরিবেষ্টিতাং।
প্রসন্নবদনাং দেবীং সর্ব্বকামফল প্রদাং।
শত্রুক্ষয়করীং দেবীং দৈত্যদানবদর্পহাং॥"

দেখ—প্রাণ ভরিয়া, সাধ মিটাইয়া, মাকে দেখিয়া লও—আর এই মূর্ত্তি হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখ। যেন এ রূপ সতত প্রাণে জাগরূক থাকে। বাজাও জোরে ঢাক-ঢোল কাঁশি—কাড়ানাগরা। ধর গান শানাইয়ে,—

"গেল অমঙ্গল আজি মঙ্গলারি আগমনে।"

আবার পড় "চণ্ডী" পুরোহিত মহাশয়,—

"স্তুতা সুরৈঃ পূর্ব্বমভীষ্টসংশ্রয়াৎ
তথা সুরেন্দ্রেণ দিনেষু সেবিতা।
করোতু গানঃ শুভহেতুরীশ্বরী
শুভানি ভদ্রাণ্যভিহন্তু চাপদঃ॥
যা সাম্প্রতং চোদ্ধতদৈত্যতাপিতৈ-
রস্মাভিরীশা চ সুরৈর্নমস্যতে।
যা চ স্মৃতা তৎক্ষণমেব হন্তি নঃ
সর্ব্বাপদো ভক্তি-বিনম্র-মূর্ত্তিভিঃ॥"

ভাবার্থ,—আমরা অভীষ্ট লাভ করিবার পূর্ব্বে যাঁহার স্তব করিয়াছিলাম, দেবরাজ ইন্দ্র বহুদিন ধরিয়া যাঁহার সেবা করিয়াছিলেন, যিনি সমস্ত মঙ্গলের কারণ, প্রচণ্ড দৈত্য-প্রপীড়িত হইয়া সম্প্রতি আমরা যে পরমেশ্বরীকে প্রণাম করিতেছি, ভক্তি-বিনম্র-শরীর হইয়া আমরা স্মরণ করিলে যিনি তৎক্ষণাৎ আমাদের সকল বিপদ বিনষ্ট করেন,—সেই ঈশ্বরী দেবী আমাদের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল করুন, এবং সকল বিপত্তি বিনাশ করুন!

এখন, আঠাইশ কোটী কণ্ঠে দিগন্ত প্রতি-নিনাদিত করিয়া ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গে মাকে প্রণাম ও বর-প্রার্থনা কর দেখি,—

"ওঁ সর্ব্বমঙ্গল-মঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থ-সাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী নারায়ণী নমোঽস্তুতে॥
ওঁ শিরো মে চণ্ডিকা পাতু পাতু কণ্ঠং মহেশ্বরি।
হৃদয়ং পাতু চামুণ্ডা সর্ব্বতঃ পাতু কালিকা॥
ওঁ আয়ুর্দ্দদাতু মে কালী পুত্রান্দেহি সদাশিবে।
ধনন্দেহি মহামায়ে নারসিংহি যশো মম॥
ওঁ আঢ্যং কুষ্ঠঞ্চ দারিদ্র্যং রোগং শোকঞ্চ দারুণং।
বন্ধুস্বজন-বৈরাগ্যং দুর্গে ত্বং হর দুর্গতিং॥
ওঁ হরপাপং হরক্লেশং হরশোকং হরাশুভং।
হরদুঃখং হরক্ষোভং হরদেবি হরপ্রিয়ে॥
ওঁ দেবদ্বারে নদীতীরে রাজদ্বারে চ সঙ্কটে।
পর্ব্বতারোহণে দুর্গে দুর্গে রক্ষ নমোঽস্তুতে॥
ওঁ কায়েন মনসা বাচা কর্ম্মণা যৎকৃতং ময়া।
জ্ঞানাজ্ঞানকৃতং পাপং হরদেবি হরপ্রিয়ে॥
ওঁ পথি দেবালয়ে দুর্গে অরণ্যে প্রান্তরে জলে।
সর্ব্বত্র রক্ষ মাং দুর্গে দুর্গে রক্ষ নমোঽস্তুতে॥
ওঁ মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং মহেশ্বরি।
যদর্চ্চিতং ময়া দেবি পরিপূর্ণং তদস্তু মে॥"

সন্ন্যাসীর জীবনী।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

আমি বলিয়াছি,—আমার হাতে কিছু টাকা ছিল—সে টাকা আমি যাহাদের সঙ্গে ছিলাম তাহাদেরই মধ্যে একটী প্রবীণ লোকের নিকট রাখিয়া দিয়াছিলাম। সুতরাং পলায়ন করিবার সময় লজ্জায় তাঁহার সহিত দেখা করি নাই। মনে ছিল, দূর স্থান হইতে চিঠি লিখিলেই টাকা পাইব। কেননা, তিনি ধার্ম্মিক, প্রবীণ এবং বিজ্ঞ; সুতরাং আমার তাঁহার প্রতি সন্দেহ হয় নাই। বিশেষতঃ সন্দেহ করিতেও তখন আমি শিখি নাই।

আমি ত পলাইলাম! কিন্তু পলাইবার মুহূর্ত্ত পূর্ব্বেই এটা স্থির করি নাই—কোথা যাইব, কি করিব। পরে বাহির হইয়া ভাবিলাম, ধর্ম্ম-প্রচারক হইয়া নানা-স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইব। মনে আশা ও সাহস হইল; সেই কথা বলিবার ও অনুমতি লইবার জন্য আমার দীক্ষা-গুরু সেই আচার্য্য-মহাশয়ের নিকট যাইলাম। ভাবিয়াছিলাম,—

প্রচারকগণ পাথেয় ব্যয়াদি পাইয়া থাকেন, আমিও পাইব। কিন্তু আমার অদৃষ্টে তাহা ঘটিল না। আমার অল্প বয়েস, বুদ্ধি কম, ধর্ম্মচর্চ্চা অনেক দিন করি নাই, প্রচারকের কাজ শিখি নাই; সুতরাং আচার্য্য আমায় ঐ সকল কথা কহিয়া নৈরাশ করিলেন।

আমি নিরুপায় হইয়া, শ্রীযুক্ত * * * * দাস মহাশয়ের বাসায় গমন করিলাম। জানিতাম, তিনি দাতা, দয়ালু এবং ধার্ম্মিক। তিনি অনুগ্রহ করিয়া আমায় বাসায় স্থান দিলেন। ছয়মাস তাঁহার বাসায় থাকিয়া, আমার বিশ্বাস হইল, * * দাস মহাশয় শুধু দাতা ও দয়ালু নহেন—তিনি সর্ব্ব-বিষয়ে দেবতুল্য। তিনি দুঃখী এবং দুঃখিনীগণের কেবল আশ্রয়-দাতা নহেন পিতা। তাঁহার নিজ পুত্র-কন্যা ছাড়া আমার আবস্থাপন্ন অনেক পুত্র-কন্যা। সকলই তাঁহার আপনার। তাহার পত্নী * * দেবী যথার্থই অন্নপূর্ণা করুণাময়ী মাতা। ফলতঃ আমি বড় সুখে ছিলাম। কিন্তু এ সুখেও আবার বিষ পড়িল। আমাকে অনেকগুলি কুমারী ও বিধবা যুবতীর সংশ্রবে নিয়ত থাকিতে হইত; তাহাদের আচরণে (অবশ্য সকলের নহে) সময়ে সময়ে বড় ভয় হইত। আমি একদিন একখানি বই পড়িতেছি—বেলা তখন দুইটা, * * * দাস মহাশয় আফিসে। ঠিক্ সেই সময়ে একটী পনের কি ষোল বৎসরের মেয়ে দেখিতে 'শ্যামবর্ণা' এবং বেশী সুন্দরী নহেন। এই কন্যাটী বিধবা। শুনিয়াছিলাম, কৃষ্ণনগরের একজন কেরাণীর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। এখন তাঁহার কি হইয়াছে বা তিনি কোথায় আছেন, জানি না) আমার কাছে আসিয়া বসিয়া বলিলেন,—"আমাকে পড়া বলিয়া দেন?" চাহিয়া দেখিলাম, তাঁহার হাতে বই নাই। জিজ্ঞাসা করিলাম,—"বৈ কোথা, কি পড়া বুঝাইব?" তিনি হাসিয়া বলিলেন,—"কেন 'সু——'কেত বিনে বহিতেই পড়াইতেন?" সর্ব্বনাশ! আমার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল—বিস্মিত হইলাম! ভাবিলাম,—সেকথা, সে ভয়ঙ্কর মিথ্যা—"সত্য" 'এ কি করিয়া জানিতে পাইল! আমি কোথায় আছি, কি করিতেছি, ক্ষণেকের জন্য ভুলিয়া গেলাম। শরীর ভয়ে-ভাবনায় ঘামে ভিজিয়া যাইতে লাগিল—প্রায় দশ মিনিট পরে প্রকৃতিস্থ হইয়া দেখি, সেই মেয়েটী আঁচলে আমার ললাটের স্বেদ-স্রোত নিবারণ করিতেছেন! একটু লজ্জিত হইয়া, সরিয়া বসিয়া, বলিলাম,—"আপনি স্কুলে যান নাই কেন?"

"আপনারই জন্য!"

"আমার জন্য?"

"হাঁ, আপনি অতি গর্হিত কাজ করিয়াছেন?"

"কি করিয়াছি?"

"একটী সরলা বালিকার সর্ব্বনাশ করিয়াছেন!"

"আমি আপনার কথা বুঝিতে পারি না।"

"তা' পারিবেন কেন?—কেবল পারিয়াছিলেন—"এই বলিয়া, আমার চিবুক ধরিয়া হাসিয়া, মেয়েটী এমন করিয়া আমার মুখপানে চাহিয়া রহিল—যেন তাহার দুইটী চক্ষু ক্রমে বিস্ফারিত হইয়া বৃহৎ গবাক্ষ তুল্য হইল, যেন ঐ গবাক্ষে আমায় গ্রাস করিয়া ফেলিবে—হায়! আবার সেই বিস্ফারিত চক্ষু—আবার সেই বিষাদ-কালিমা সূক্ষ্ম হাসির কিরণে ঢাকা—লালাইত ললনা-বদন! কোথা যাব! মন ও পা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু কেহ কাহারও আগে যাইতে চায় না—আবার মোহিনী! দেখ, আর এক সর্ব্বনাশ! হঠাৎ সেই ঘরে * * দাস মহাশয়ের স্ত্রী আসিয়া উপস্থিত! আর কেহ হইলে, আমাদের এই অসাবধান অবস্থা দেখিয়া, বিষম ক্রোধে ও গর্জ্জনে অনর্থ ঘটাইত। কিন্তু সে প্রশান্তময়ী জগদ্ধাত্রী-রূপিণী দেবী নিঃশব্দে অঙ্গুলী-সঙ্কেতে আমায় ডাকিলেন। আমি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আর একটী গৃহে গমন করিলাম। তিনি আমার হাতে দশটী টাকা এবং একখানি চিঠি দিয়া বলিলেন;—"আমার ভাসুরের বাসায় দিয়া আইস।"

চিঠি ও টাকা দিয়া আর ফিরিলাম না। যদিও কোন পাপ করি নাই, তথাপি মনে একটা দারুণ ঘৃণা ও ভয় হইল। কোথা যাই—ভাবিতে লাগিলাম, এবং ধীরে ধীরে পথ চলিতে লাগিলাম। এইরূপে অজ্ঞাতসারে প্রায় কালীঘাটের নিকটে আসিলাম; হঠাৎ কে আমার গতিরোধ করিল। চাহিয়া দেখি, আমার একজন পূর্ব্বতন সহাধ্যায়ী। তাঁহাকে দেখিয়া মনে আনন্দ হইল। নিজের প্রকৃত অবস্থা গোপন করিয়া বলিলাম,—"ভাই, তোমার সঙ্গে দেখা হইয়া ভাল হইল। আমি বড় বিপদগ্রস্ত—হাতে পয়সা নাই; যদি আমার এই চশমাখানি লইয়া আমাকে কিছু টাকা দাও, তবে যাবজ্জীবন তোমার কৃতদাস হইয়া থাকি।" সহাধ্যায়ী আমাকে বিশেষ অবস্থাপন্ন বলিয়া জানিতেন; হঠাৎ আমার দুর্দ্দশার কথা শুনিয়া বলিলেন,—"বুঝিয়াছি! তুমি বুঝি বাড়ী হইতে রাগ করিয়া আসিয়াছ—এখন কিছু টাকা পাইলেই পলাইবে। কিন্তু পলাইও না—পিতামাতাকে কষ্ট দিও না—নিজে কষ্টে ও বিপদে পড়িও না।"

পিতা-মাতার নাম শুনিয়া পূর্ব্বস্মৃতি জাগরিত হইল—চক্ষে জল আসিল। আমার অবস্থা দেখিয়া, তাঁহার দয়া হইল; বলিলেন,—"এখন কোথায় যাইতেছ?" কোথা যাইব! অনন্ত পথে দাঁড়াইয়াছি—স্থান নাই, গৃহ নাই, বন্ধু নাই—কি বলিব?—কাজেই চুপ করিয়া রহিলাম। তিনি বলিলেন, "এস, আমাদের বাসায় যাবে।"

বাসা বেশী দূর নহে। তিনি, আমাকে সঙ্গে করিয়া, যে ঘরে থাকেন, তথায় লইয়া গেলেন। বাসা আমার সহাধ্যায়ীর নহে—তাঁহার মামার। মামা ব্যাঙ্কে চাকরী করেন; এবং তাঁহার অবস্থাও খুব ভাল। আমরা যখন বাসায় গেলাম, তখন পাঁচটা বাজিয়াছে। অল্পকাল পরে ঝি দুই থালা মেঠাই লইয়া আসিল; উভয়ে একত্রে আহার করিলাম। সহাধ্যায়ীর নাম গগণ।

রজনী আট ঘটিকার সময় আমার খাবার আসিল। আমি খাইলাম। কিন্তু গগণ না খাইয়া বলিল,—"তুমি যাহা খাইতেছ, ইহা আমার খাবার। অদ্য আমার নিমন্ত্রণ আছে; এইজন্য, একজন অতিরিক্ত লোক খাইবে, একথা বাড়ীতে বলি নাই। কাল হ'তে সব ঠিক হ'বে—আমার মাথার দিব্বি, তুমি কোথাও যেও না—আমার এই খাটে মশারি ফেলিয়া শুইয়া থাক। পাশের ঘরে জল ও গাড়ু থাকে—তৎপার্শ্বের ঘরই পাইখানা; যদি আবশ্যক হয়, তজ্জন্য কাহাকেও ডাকিতে হইবে না।" এই বলিয়া, জামা-চাদর লইয়া, তিনি বাহির হইয়া গেলেন। আমি দরজা ভেজাইয়া দিলাম—বন্ধ করিলাম না। পরে, ল্যাম্পের আলো খুব কমাইয়া দিয়া, মশারী ফেলিয়া, বহুকালের পর দুগ্ধ-ফেন-নিভ কোমল শয্যায় শয়ন করিলাম। কিন্তু, মনে সুখ না থাকিলে, এমন শয্যাও কণ্টকময় বলিয়া বোধ হয়—তাহা এই প্রথম উপলব্ধি হইল।

আগমনী।

"জীর্ণ-শীর্ণ তনু, অবসন্ন প্রাণ,
বিষাদ-সলিলে ম্লান দুনয়ান,
অন্ন নাহি গৃহে, দেহে-নাহি বাস,
আঁধারের মাঝে করিতেছে বাস।
কাতর হৃদয়ে কেঁদে কেঁদে সবে
বলে মুখু, কবে মরণ গো হবে?
আজ তারা ওই, কি দেখে স্বপন
শুনিয়ে কাহার মধুর বচন,
রোদন ত্যজিয়ে পরি নব বাস
কার কাছে ধায়, কি পেয়ে আশ্বাস!
হাসি মুখে এসে কেঁদে চলে যায়
কেন হ'ল হেন—একি দুঃখ হায়!
শোক-তাপ ভুলে বড় আশা ক'রে
এসেছিল ওরা মায়ের দুয়া'রে,

মুছিল না অশ্রু, পূরিল না আশা,
মিটিল না ক্ষুধা, ঘুচিল না শ্বাস,
এসেছিল সবে মা দেখিব বলে
শূন্য প্রাণে ওই ফিরে গেল চলে!
পাষাণ-তনয়া তুই কি পাষাণী?
না না মা তুমি যে জগত-জননী!
দরিদ্র সন্তানে লও তুলে কোলে,
ব্যথা মুছে দাও আশা-কথা বোলে,
সিংহ-বিহারিণী দশভুজা-সাজে,
কেন মা উদয় ভারতের মাঝে!
ক্ষুধিত কাতর দীন-হীন অতি,
দেখিতেছ তব সন্তান-দুর্গতি,
হেথা কেন এলে পরি রণ-বাস
ব্যাকুল পরাণে জাগাইতে ত্রাস!
অন্নপূর্ণা-বেশে কর আগমন
দেখিয়ে হরষে গলে যাক্ মন!
দশভুজে তুমি অন্ন কর দান
কোলে লও তুলে ব্যথিত সন্তান!
ফেলে দাও দেবি, অস্ত্র সজ্জা সব
শুধু আন তব জননী-গৌরব!
একদিন তরে দেখি মার মুখ
ভুলে যাই মোরা ক্ষুধা ব্যথা দুখ,
ভুলে যাই লাজ, ভুলি অপমান
মার কোল পেয়ে—সব অবসান।"

* * *

মা কি আসিবে আমার?

মনে কি প'ড়েছে মার! মা কি আসিবে আমার!
সন্তান বলিয়া দয়া হ'য়েছে কি তাঁ'র?
এত কষ্ট, এত ক্লেশ, এত যাতনা অশেষ,
এত দিনে দৃষ্টি তায় পড়িল কি মার?
এই প্রাণ—এই যায়, ত্রাহি ডাকি যাতনায়,
চিন্তা-কীট নিভৃতে জীবন-গ্রন্থি কাটে।
ফণী বিলোল-রসনা, ধরি সে বিষম ফণা,
দংশিতে আসিছে ওই,—ত্রাসে প্রাণ ফাটে॥
দুঃখের সময় হেন, জননী কি আসিবেন,
সান্ত্বনা কি করিবেন তনয়ে আবার!
মনে কি পড়েছে মার! মা কি আসিবে আমার!
সন্তান বলিয়া দয়া হ'য়েছে তাঁর?

* * *

আগমনী কেন আর?

"পাষাণি, পাষাণ-সুতা! চাহিনা মা তোরে আর।
ফিরে যা এবার উমা, হৃদয় যে অন্ধকার।
কাঁদিতে জনম গেল, না মুছিল অশ্রুজল,
অবিরাম শোক-শেল, বাজে বুকে অভাগার॥
অন্ন বিনা হাহাকার, প'ড়েছে মা চারিধার,
তুমি ত মা অন্নপূর্ণে, করিলে কি প্রতিকার;
যায় বিশ্ব রসাতল, মরে জীব অবিরল,
শুন দুঃখ কোলাহল, 'আগমনী' কেন আর॥"

* * *

কেন পূজি মহামায়া?

প্রাণ যে মানে না কিছু আর,
সেই মুখপানে অনিবার,
ফিরে ফিরে করিছে নেহার
লভিবারে শান্তি-পদ-ছায়া।
শরতে সুচারু শশি
হাসিছে মায়ের হাসি,
খণ্ড খণ্ড মেঘরাশি
খেলিছে মায়ের খেলা, ধরি শত কায়া।
মা যে শিব-সোহাগিনী
জননীর স্নেহধারা
লভিয়া উল্লাসে ধরা
শ্যামল তরঙ্গে ভরা
মন সুখে উন্মাদিনী দেখ গরবিনী।
মায়ের সোহাগে ভুলি
মোহন হিল্লোল তুলি
শ্যামল সে তৃণগুলি
নাচিতেছে; দেখি তাই হাসিছে জননী
(মায়ের) রূপে আলো ত্রিভুবন
রাশি রাশি সেফালিকা,
ফুটন্ত ফুল-কলিকা
দুলিছে মৃদুলতিকা
বক্ষে ধরি কত ফুল অগণন।
মায়ের সেরূপ হাসি,
গগনে তারার হাসি,
স্বর্গশোভা পরকাশি,
মর্ত্তহাসে কিবা সুশোভন।

শঠে-শঠে।

দ্বিতীয় প্রকারে। *

নগেন্দ্রনাথ এইরূপে কৌশল-অবলম্বনে দায়রা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া আপন বাড়িতে গমন করিলেন। আদালত হইতে বহির্গত হইবার সময় তিনি যদিও কালীপ্রসন্নকে বলিয়া আসিয়াছিলেন যে, আমি ইহার প্রতিশোধ লইব; কিন্তু পরিশেষে মনে মনে ভাবিলেন,—"কালীপ্রসন্ন যদিও আমাকে নানারূপ মকর্দ্দমায় বারবার বিশেষ কষ্ট দিয়াছেন, কিন্তু আমি আর কিছু করিব না—ঈশ্বরই ইহার বিচার করিবেন। তবে ইহার পরও কালীপ্রসন্ন যদি আমাকে আবার বিপদগ্রস্থ করেন, তাহা হইলে পরিশেষে সকল প্রতিশোধ আমি একেবারে লইতে চেষ্টা করিব।" এই ভাবিয়া, নগেন্দ্রনাথ কোনরূপ উপায় অবলম্বন না করিয়া, নিরস্থ হইলেন।

কালীপ্রসন্ন বিশেষরূপে লজ্জিত ও অপমানিত হইয়া আপন স্থানে গমন করিলেন, ও মনে মনে সর্ব্বদাই ভাবিতে লাগিলেন,—"নগেন্দ্র না জানি কি উপায় অবলম্বন-পূর্ব্বক আমার কার্য্যের প্রতিশোধ লইতে চেষ্টা করিবে!" এইরূপ চিন্তায় প্রায় একমাস অতীত হইয়া গেল। কালীপ্রসন্ন এক মাস চিন্তার পর স্থির করিলেন যে, নগেন্দ্র আমার উপর যাহাতে কোনরূপ মকর্দ্দমা না করিতে পারেন, তাহার বন্দোবস্ত পূর্ব্ব হইতেই করা আবশ্যক।

এক দিবস কালীপ্রসন্ন স্বয়ং থানায় গিয়া উপস্থিত হইলেন, ও দারোগার নিকট যেরূপ এজাহার দিলেন, তাহার সার মর্ম্ম এই;—"নগেন্দ্রনাথ মকর্দ্দমা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া পর্য্যন্তই আমাকে বিশেষরূপে অপমানিত করিবার ভয় প্রদর্শন করিতেছে। সেই ভয়ে আমি নিতান্ত ভীত হইয়া, অদ্য কেবলমাত্র সাত দিবস হইল, বেচু সিং নামীয় একজন ক্ষত্রিয়কে আমি আমার দরোয়ান নিযুক্ত করি; এবং নগেন্দ্রনাথকে দেখাইয়া দিয়া তাহাকে বলিয়া দিই যে,—'এই ব্যক্তি আমার বিশেষ শত্রু; এ যেন কোনরূপে আমার বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতে না পারে।' বেচু আমার আজ্ঞা প্রতিপালন করিবার নিমিত্ত সর্ব্বদাই আমার দরজায় বসিয়া থাকিত। অদ্য পাঁচ দিবস হইল অর্থাৎ বেচু কর্ম্মে নিযুক্ত হইবার দ্বিতীয় দিবসের রাত্রে, নগেন্দ্রনাথ একাকী আমার বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিবার চেষ্টা করে; কিন্তু বেচু কর্ত্তৃক প্রতিবন্ধক প্রাপ্ত হইয়া আমার বাড়ীতে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না, বরং বেচুর নিকট বিশেষরূপে অপমানিত হইয়াই প্রস্থান করে। যখন এই সকল অবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহার কিছুই আমি জানিতে পারিয়াছিলাম না। পরদিবস প্রাতঃকালে তাহারই মুখে এই অবস্থা শুনিতে পাই। যে রাত্রে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল, তাহার পর দিবস সন্ধ্যার পর দরোয়ানকে দরজায় রাখিয়া আমি বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করি। পরদিবস প্রাতঃকালে বাড়ীর ভিতর হইতে বাহিরে আসিয়া দেখিতে পাই যে, দরজা খোলা রহিয়াছে ও দরোয়ান নাই। প্রথমে মনে করি যে, সে কোন স্থানে গমন করিয়াছে; কিন্তু যখন আর সে ফিরিয়া আসিল না, তখন মনে ক্রমে ক্রমে নানা-রূপ চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হয়, ও তাহার অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করি। তথাপি কোনরূপে তাহার অনুসন্ধান প্রাপ্ত হই না। কিন্তু কল্য রাত্রে আমি জানিতে পারিয়াছি যে, নগেন্দ্রনাথ আমার সেই দরোয়ানকে হত্যা করিয়াছে, এবং তাহার মৃতদেহ কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছে।"

দারোগা।—তুমি কিরূপে জানিতে পারিলে যে, নগেন্দ্রনাথই তোমার দরোয়ানকে হত্যা করিয়াছে?

কালী।—মহাশয়, আমি যাহা বলিতেছি, আপনি অনুসন্ধান করিলেই তাহা জানিতে পারি-

* প্রথম প্রকারের শঠতা এই বর্ষের ৪র্থ সংখ্যায় দ্রষ্টব্য।

বেন। তাহাকে হত্যা করিতে কেহ কেহ দেখিয়াছে ; এবং নগেন্দ্রনাথ ও তাহার একজন চাকর সেই মৃতদেহ লইয়া গমন করিবার সময়ও যাহারা দেখিয়াছে, তাহাদের নিকট আপনি জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবেন।"

এই বলিয়া ৪।৫ জন সাক্ষীর নাম তিনি দারোগার নিকট লিখাইয়া দিলেন।

হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পাইয়া দারোগা-মহাশয় আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তখনই তিনি ঘটনা-স্থানে গমন করিয়া অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দারোগা মহাশয় যদিও বিশেষ চালাক-চতুর ছিলেন, কিন্তু সেই কার্য্যে অতি অল্প দিবসই ব্রতী হইয়াছিলেন। অনুসন্ধানে তিনি আসামী নগেন্দ্রনাথ ও তাঁহার চাকর কৈলাশকে ধৃত করিলেন। তাঁহাদের বিপক্ষে যে সকল সাক্ষ্য সংগ্রহ হইল, তাহাদের এজাহার গ্রহণ-পূর্ব্বক আসামীদ্বয়ের এজাহার লইতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা উভয়েই কিন্তু কহিলেন,—"আমরা নির্দ্দোষী।" আরও কহিলেন,— "আমরা এখন খুনি মকর্দ্দমার আসামী। কোন্ কথা বলিলে আমাদিগের বিপক্ষে যাইবে, বা কোন্ কথায় আমাদিগের এখন উপকার দর্শিতে পারে, তাহা আমরা এখন বুঝিতে পারিব না। সুতরাং আমাদিগকে যাহাই আপনি জিজ্ঞাসা করিবেন, তাহারই উত্তরে 'নির্দ্দোষী' ভিন্ন অন্য কোন কথা আমরা বলিব না।" এই কথা শুনিয়া দারোগা মহাশয় তাঁহাদের এজাহার লইতে অপারক হইলেন। কিন্তু এই মকর্দ্দমা তাঁহার সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া বিশ্বাস হওয়ায়, তিনি উহা মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট প্রেরণ করিলেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেব সাক্ষীগণের জবানবন্দী গ্রহণ-পূর্ব্বক আসামীদ্বয়কে দায়রায় সোপরদ্দ করিলেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটও আসামীদ্বয় কহিলেন যে,—"আমরা এই মকর্দ্দমায় সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী ; এবং আমাদিগের যাহা বলিবার আছে, তাহা জজ সাহেবের নিকটই বলিব।"

আসামীদ্বয় দুই মাসকাল হাজতে থাকার পর দায়রায় মকর্দ্দমা উপস্থিত হইল। সরকারী উকিল মকর্দ্দমা চালাইতে লাগিলেন। আসামীদ্বয়ের উকিল নাই। নগেন্দ্রনাথের কোন কোন আত্মীয় নগেন্দ্রকে কহিলেন,—"তুমি খুনি মকর্দ্দমায় পড়িয়াছ, জুরিগণ তোমার মকর্দ্দমার বিচার করিবেন ; সুতরাং উকিল ভিন্ন জুরিগণকে তোমাদিগের কথা কে বুঝাইয়া দিবে ? একজন ভাল উকিল নিযুক্ত কর ; যদি তুমি তাঁহার 'ফি' প্রভৃতির সংস্থান না করিতে পার, তাহাও আমাদিগকে বল, আমরা তাহার যোগাড় করিব।" এই কথায় নগেন্দ্র একটু হাসিলেন, এবং কহিলেন,—"আমার অদৃষ্টে যদি কষ্ট থাকে, তবে উকিলের সাধ্য নাই যে, তিনি তাহা দূর করিতে পারেন! আপনাদিগের বিশেষ ব্যস্ত হইবার আবশ্যক নাই ; যাহা করিতে হইবে, তাহা আমিই করিব। আমার নিজের অবস্থা আমি যতদূর বুঝিতে পারিব, উকিলে তাহা বুঝিবে কোথা হইতে ?" এই বলিয়া নগেন্দ্র নিরস্ত হইলেন। তাঁহার আত্মীয়গণ ক্ষুণ্ণ-মনে দর্শকের স্থানে গিয়া উপবেশন-পূর্ব্বক ভাবিতে লাগিলেন,—"নগেন্দ্রের মস্তিষ্ক কি বিকৃত হইয়া গিয়াছে! একথা পাগলের কথা ভিন্ন আর কি মনে ভাবিতে পারি!"

মকর্দ্দমার বিচার আরম্ভ হইল। ইংরাজ জজের দক্ষিণ পার্শ্বে ৫ জন জুরি উপবেশন করিলেন। সরকারি উকিল মকর্দ্দমার অবস্থা সকলকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিলেন।

জজ সাহেব তখন আসামীদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমাদিগের উপর দণ্ডবিধি আইনের ৩০২ ধারা মতে খুন-মকর্দ্দমা আনীত হইয়াছে। এই মকর্দ্দমায় তোমরা দোষী, কি নির্দ্দোষী ?"

আসামী।—আমরা সম্পূর্ণরূপে নির্দ্দোষী।

ইহার পরই সাক্ষীগণের জবানবন্দী আরম্ভ হইল। প্রথম সাক্ষী কালীপ্রসন্ন।) তি[illegible] দারোগার নিকট যেরূপ বলিয়াছিলেন, তাহাই একটু বাড়াইয়া বলিলেন মাত্র।

দুই নম্বরের সাক্ষী কেবলরাম দাস কহিল,— "রাত্রি আন্দাজ ২টার সময় আমি ও সেক জুম্মন, কালীপ্রসন্ন বাবুর বাড়ির নিকট দিয়া গমন করিতেছিলাম। সেই সময় দেখিলাম, এই নগেন্দ্র বাবু ও ইহাঁর চাকর, কালীপ্রসন্ন বাবুর বাড়ির ভিতর হইতে বেচুসিংহকে বাহির করিয়া আনিলেন, ও উহাকে ধরিয়া লইয়া গেলেন। বেচু চীৎকার করিতে চেষ্টা করিতেছিল ; কিন্তু, বোধ হয়, তাহার মুখের ভিতর কাপড় দেওয়া হইয়াছিল বলিয়াই, সে চীৎকার করিতে পারিতেছিল না। এই দেখিয়া, আমরা ভয়ে ভীত হইয়া চলিয়া গেলাম। কিন্তু এই কথা প্রথমে কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে সাহসী হই নাই ; কারণ, নগেন্দ্রনাথ অতিশয় ভয়ানক লোক। তাঁহার ভয়ে কেহই তাঁহার বিপক্ষে কোন কথা বলিতে সাহসী হয় না।"

৩ নম্বর সাক্ষী সেক জুম্মন। কেবলরাম যেরূপ সাক্ষী দিয়াছিল, এ ব্যক্তিও তাহাই বলিল।

আসামীদ্বয়কে জজ সাহেব জেরা করিতে বলায়, নগেন্দ্রনাথ কহিলেন,—"আমরা জেরা করিতে ইচ্ছা করি না। এ সমস্ত সাক্ষীই মিথ্যা। সুতরাং মিথ্যা-সাক্ষীগণকে জেরা করিয়া কেবল কোর্টের নিরর্থক সময় নষ্ট করা ভিন্ন অন্য কোন উপকার দেখিতে পাওয়া যায় না।"

৪র্থ সাক্ষী গদাধর দাস কহিল,—"আমার একখানি মাত্র ঘর। তাহাও সরকারদের বাগানের ভিতর। রাত্রি প্রায় ২॥টার সময় 'গোঁ গোঁ' শব্দে হঠাৎ আমাদিগের নিদ্রা-ভঙ্গ হইল। আমি যে ঘরে ছিলাম, আমার স্ত্রী কামিনীও সেই ঘরে ছিল। আমার বিধবা ভগ্নী অলকাও সেই ঘরের দাওয়ায় শুইয়া ছিল। ঐ সঙ্গে আমাদিগের তিন জনেরই নিদ্রা-ভঙ্গ হইল। পরিষ্কার জ্যোৎস্না আলোকে আমরা দেখিলাম যে, আমাদিগের ঘরের অনতিদূরে নগেন্দ্রনাথ ও তাঁহার চাকর একটী লোককে নির্দ্দয়রূপে প্রহার করিতেছেন। সে যতই যাতনায় ছটফট করিতে লাগিল, ইহাঁরা ততই উহাকে মারিতে লাগিলেন, ও মারিতে মারিতে সে মরিয়া গেল। তখন একটী জঙ্গলের ভিতর ঐ মৃত-দেহ রাখিয়া ইহাঁরা কোথায় গমন করিলেন। যে ব্যক্তি মরিয়া গেল, তাহাকে আমরা পূর্ব্বে চিনিতে পারিয়াছিলাম না ; কিন্তু নগেন্দ্রবাবু ও তাঁহার চাকরকে উত্তমরূপে চিনিয়াছিলাম। মৃতদেহ সেই স্থানে রাখিয়া গমন করিলে, আমরা তিন জনেই আস্তে আস্তে গিয়া সেই মৃতদেহ দেখিতে পাই, ও দেখিয়া, তাহাকে কালীপ্রসন্ন বাবুর নূতন দরোয়ান বলিয়া চিনিতে পারি। নগেন্দ্র বাবু যেরূপ ভয়ানক লোক, তাহাতে এ কথা প্রকাশ করিয়া, কে আপনার সর্ব্বনাশ-সাধনের উপায় আপনিই আনয়ন করিবে ? এই ঘটনার প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে, নগেন্দ্রবাবু, এই চাকর কৈলাশ ও আরও একব্যক্তি, যাহাকে আমরা পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই, একখানি চারিপায়ার সহিত আগমন করিলেন, ও লাসটী সেই চারিপায়ার উপর উঠাইয়া লইয়া, তিন জনেই প্রস্থান করিলেন।"

৫ নম্বরের সাক্ষী গদাধরের স্ত্রী কামিনী এবং ৬ নম্বরের সাক্ষী তাহার সেই বিধবা ভগ্নী অলকা—ইহারাও গদাধর যেরূপ বলিয়াছিল, তাহাই বলিল।

নগেন্দ্রনাথ ইহাদিগকেও কোনরূপ জেরা করিলেন না।

৭ম নম্বরের সাক্ষী কেদার গোয়ালা।—নগেন্দ্র বাবু, তাঁহার চাকর কৈলাশ ও অপর এক ব্যক্তি, একটী লাস লইয়া গ্রামের বাহিরে ময়দান অভিমুখে গমন করিতেছিলেন, এই অবস্থা সে দেখিয়াছে, কহিল। তাহার একটী গরু হারাইয়া গিয়াছে ; সেই গরুর অনুসন্ধানে রাত্রে বাহির হইয়াছিল বলিয়াই, এই অবস্থা দেখিতে পায়।

৮ম নম্বরের সাক্ষী অনুসন্ধানকারী দারোগা। তিনি অনুসন্ধানে যাহা যাহা করিয়াছিলেন,

তাহাই বলিলেন; যেরূপ উপায়ে এই সকল সাক্ষীগণকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাও প্রকাশ করিলেন; এবং আরও কহিলেন যে, বিশেষ চেষ্টা করিয়াও তিনি লাসের কোন কিনারা করিতে সমর্থ হন নাই।

এই সাক্ষী কয়েকটী যেরূপ সাক্ষী প্রদান করিল, তাহাতে কাহারও মনে কোন প্রকার সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে না। ভাবগতিক দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল যে, জজ ও জুরিগণ সকলেই এই মকর্দ্দমা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিয়াছেন। জজ সাহেব স্পষ্টই আসামীগণকে কহিলেন,—"তোমাদের বিপক্ষে যে সকল সাক্ষীগণ সাক্ষ্য প্রদান করিল, তাহাদের উপর একটী মাত্র জেরা করিয়া যখন তাহাদের কথা মিথ্যা প্রমাণ করিবার চেষ্টাও করিলে না, তখন আমরা কি করিয়া বিশ্বাস করিব যে, এই মকর্দ্দমায় তোমরা নির্দ্দোষী।"

জজ সাহেবের এই কথা শুনিয়া, নগেন্দ্রনাথ কহিলেন,—"ধর্ম্মাবতার, আমি যদিও সাক্ষীগণকে জেরা করিলাম না, তথাপি এমন ভরসা ক র যে, আমি প্রমাণ করিতে পারিব যে, এই মকর্দ্দমা সম্পূর্ণরূপ মিথ্যা। এই মকর্দ্দমা-সম্বন্ধে আমি অধিক কথা বলিতে চাহি না। কেবল আমার দুইটী মাত্র সাক্ষী আছে,—তাহাদের মধ্যে এক জনকে ডাকাইলেই আপনারা জানিতে পারিবেন যে, এই মকর্দ্দমা সত্য কি মিথ্যা। পরে, আবশ্যক হয়, দ্বিতীয় সাক্ষীকেও ডাকিব।"

এই কথা শুনিয়া, সকলেই হাসিয়া উঠিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন ইহাও আস্তে আস্তে কহিলেন,—"না জানি স্বর্গ হইতে এখন কোন দেবতাকেই ডাকিবে যে, সে এক কথায় এই মকর্দ্দমা উড়াইয়া দিবে।"

জজ।—তোমার যে সাক্ষী থাকে, তাহা এখন তুমি ডাকিতে পার।

নগেন্দ্র।—আমার বিপক্ষে যাহা কিছু বলিবার আছে, তাহার সমস্ত বলা না হইলে আমি আমার সাক্ষী ডাকিতে ইচ্ছা করি না।

জজ।—তোমার বিপক্ষে যাহা বলিবার বা প্রমাণ করিবার আবশ্যক, তাহা সমস্তই শেষ হইয়াছে। তোমার বিপক্ষে আর কিছুই নাই, বা যদি আর কিছু থাকে, আইন-অনুসারে তাহা আর শোনা যাইতে পারিবে না। এখন তুমি তোমার সাক্ষীকে ডাকিতে পার।

জজ-সাহেবের এই কথা শুনিয়া, নগেন্দ্র তাঁহার একজন সাফাই সাক্ষীকে ডাকিলেন।

নগেন্দ্র।—তোমার নাম কি?

সাক্ষী।—আমার নাম-ঘরভবন সিং।

নগেন্দ্র।—তোমার দেশ কোথায়, এবং তুমি কোথায় থাক?

ঘর।—আমার জন্মস্থান আরা-জেলায়। এখন গোবিন্দপুরে আমি শুভলবাবুর দরোয়ানি করি।

নগেন্দ্র।—বেচু সিং তোমার কে হয়?

ঘর।—বেচু সিং আমার পুত্র।

নগেন্দ্র।—বেচুসিং কর্ম্ম করিত?

ঘর।—হাঁ, কর্ম্ম করিত।

নগেন্দ্র।—কোথায় কর্ম্ম করিত? এবং কি রূপেই বা তাহার কর্ম্ম হয়?

ঘর।—হঠাৎ একদিবস একটী লোক আসিয়া আমাকে কহিল যে, কালীপ্রসন্ন বাবু একজন দরোয়ানের অনুসন্ধান করিতেছেন। সেই সময় আমার পুত্র বেচু সিং বেকার অবস্থায় বসিয়া ছিল। এই সংবাদ পাইয়া, আমি আমার পুত্রকে সঙ্গে লইয়া, কালীপ্রসন্ন বাবুর বাড়ীতে গমন করিলাম। তিনি আমার পুত্রকে দেখিয়া বিশেষ পছন্দ করিলেন, এবং ৮৲ টাকা বেতনে তাঁহার বাড়ির দরোয়ান নিযুক্ত করিলেন।

নগেন্দ্র।—তুমি কালীপ্রসন্ন বাবুকে চেন?

ঘর।—হাঁ মহাশয়, খুব চিনি। এই তিনি দাঁড়াইয়া আছেন। ইনিই আমার পুত্র বেচু সিংহের মনিব ছিলেন।

এই সময় কালীপ্রসন্ন বাবুর মুখে আর হাসি

ধরে না; তিনি অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। তাঁহার মুখের দিকে যেই দৃষ্টিপাত করিল, সেই দেখিল যে, তাঁহার মনে কি যেন এক অপূর্ব্ব ভাবের আবির্ভাব হইয়াছে, আনন্দে হৃদয় উচ্ছসিত হইতেছে; আর, তিনি সেই ভাব গোপন করিবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু যেন কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না।

কালীপ্রসন্ন ঘরভবনের একটীমাত্র কথাতেই যে কেন এত আনন্দিত হইলেন, তাহা এই স্থানে সংক্ষেপে পাঠকগণকে বলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

কালীপ্রসন্ন যখন এই ভয়ানক খুনি-মকর্দ্দমায় নগেন্দ্রনাথকে আসামী করেন, তাহার পূর্ব্বে অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া—অনেক পরামর্শ করিয়া, এই মকর্দ্দমার সূত্র স্থাপিত করেন। এক কথায় তাহার মর্ম্ম পাঠকগণকে বলিয়া দেই যে, দারোগা এই মকর্দ্দমার অনুসন্ধান করিয়া, জজ ও জুরিগণ এই মকর্দ্দমার অবস্থা সাক্ষীগণের মুখে শ্রবণ করিয়া, যতই কেন বিশ্বাস করুন না যে, ইহা একটী প্রকৃত মকর্দ্দমা ও নগেন্দ্রনাথ ক্রোধান্ধ হইয়াই এই ভয়ানক হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন করিয়াছেন; কিন্তু পাঠকগণ নিশঙ্কচিত্তে বিশ্বাস করিতে পারেন যে, এই মকর্দ্দমার অণুমাত্রও সত্য নহে, সমস্তই মিথ্যা। যে যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দিয়াছে, তাহাদের মধ্যে সত্য কথা একজনও কহে নাই। কালীপ্রসন্ন যাহাকে যেরূপ বলিতে বলিয়াছেন, সে তাহাই বলিয়াছে। সকলেই তাঁহার বশীভূত লোক, ও সকলেরই জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায় কালীপ্রসন্ন। এই সাক্ষীগণের উপর যদি জেরা হইত, তাহা হইলে সত্য কথা নিশ্চয়ই প্রকাশ হইয়া পড়িত। কোন্ সাক্ষী কি চরিত্রের লোক, তাহাও সকলে জানিতে পারিতেন। জজ ও জুরিগণের মনে এখন যেরূপ ধারণা হইয়াছে, তাহা বোধ হয় হইত না। এই মকর্দ্দমায় যে দরোয়ানের কথা উল্লেখ হইয়াছে, সে দরোয়ানকে হত্যা করা অপরাধে নগেন্দ্র ফাঁসি-কাষ্ঠে ঝুলিতে গমন করিতেছেন, সে নামের কোন দরোয়ানই কালীপ্রসন্নের কখনও ছিল না। বেচু সিং নামীয় কোন ব্যক্তি কখনও তাঁহার দরোয়ানি করে নাই। সমস্তই মিথ্যা সাজাইয়া, নগেন্দ্রকে জনমের মত ইহলোক হইতে বিদায় দিবার অভিপ্রায়ে, এই ভয়ানক ষড়যন্ত্রের সৃষ্টি, ও এই প্রাণধ্বংশকারী মকর্দ্দমার অবতারণা। আর, আসামীর পক্ষের সাক্ষীর দ্বারা, তাঁহার সেই মিথ্যা কথার সত্যতা প্রতিপাদিত হইল দেখিয়াই, কালীপ্রসন্নের এত আনন্দ! তিনি যে মিথ্যা দরোয়ান বেচু সিং মরিয়া গিয়াছে বলিয়াছেন, এখন সেই বেচু সিংহের পিতা আসিয়া স্পষ্টই বলিতেছেন যে, তাহার পুত্র কালীপ্রসন্ন বাবুর বাড়ির দরোয়ান ছিল। তাঁহার মিথ্যা কথা এখন সত্যই প্রমাণিত হইল; কাজেই কালীপ্রসন্ন এত আনন্দিত!

নগেন্দ্র।—তোমার পুত্র বেচু সিং এখনও কি কালীপ্রসন্ন বাবুর বাড়তে আছে?

ঘর।—না মহাশয়, সে যদি এখন সেই স্থানে কর্ম্ম করিত, তাহা হইলে আমাকে আজ সাক্ষ্য দিতে আসিতে হইবে কেন?

এই উত্তর শুনিয়া, দর্শক-বৃন্দের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি হঠাৎ বলিয়া উঠিল,—"নগেন্দ্র, তোমার গলার দড়ি যাহা একটু ঢিল ছিল, তাহা দেখিতেছি, আরও আঁটিয়া দিতেছ।"

এই সময় নগেন্দ্র একজন চাপরাসিকে কহিলেন,—"ঐ যে লোকটী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, উহাকে সর্ব্ব-সমক্ষে আনয়ন কর।"

যে পর্য্যন্ত বিচার নিষ্পত্তি না হয়, সেই পর্য্যন্ত খুনি-মকর্দ্দমার আসামীর সকল কথা বিচারক-মাত্রেই শুনিতে বাধ্য। কাজেই নগেন্দ্রনাথের নির্দ্দেশমত সেই ব্যক্তি সর্ব্ব-সম্মুখে আনীত হইল।

নগেন্দ্র।—(সেই ব্যক্তির প্রতি নির্দ্দেশ করিয়া) ঘরভবন, দেখ দেখি, তুমি এই লোকটীকে চেন কি না?

ঘর।—চিনি বই কি, খুব চিনি!

জজ।(সেই ব্যক্তির প্রতি) তোমার নাম কি?

সেই ব্যক্তি জজ-সাহেবের এই কথা শুনিয়া সর্ব্ব-সমক্ষে স্পষ্ট করিয়া আপনার নাম বলিল। সে আপনার নাম বলিবা-মাত্রেই আদালতের ভিতর ভয়ানক গোলমাল উত্থিত হইল; সকলেই অতিশয় বিস্মিত হইলেন। পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে তাকাইতে লাগিলেন। জুরিগণ একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন,—"আসামীদ্বয় নির্দ্দোষী; উহাদিগকে এই মুহূর্ত্তেই ছাড়িয়া দেওয়া উচিত।" জজ সাহেবও সেই মতে মত দিলেন। কিন্তু কহিলেন,—"আর দুই একটী কথা মাত্র জিজ্ঞাসা করিয়া আসামীদ্বয়কে মুক্তি-প্রদান করা কর্ত্তব্য।"

জজ।—(স্বরভবনের প্রতি) এই ব্যক্তি যে নাম বলিল, উহাই কি ইহার প্রকৃত নাম?

স্বর।—এই উহার প্রকৃত নাম, ও এই আমার পুত্র বেচু সিং।

ইহার পর জজ-সাহেব সেই ব্যক্তিকে ডাকিয়া দুই একটী কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। সে যেরূপ উত্তর দিল, তাহার সার মর্ম্ম এই;—"আমি কালীপ্রসন্ন বাবুকে চিনি। আমার পিতা স্বরভবন সিংহ এক দিবস আমাকে সঙ্গে করিয়া তাঁহার বাড়িতে লইয়া যান, এবং ৮৲ টাকা বেতনে আমি তাঁহার দরোয়ান নিযুক্ত হই। আমি দুই দিবস-মাত্র সেই স্থানে কর্ম্ম করিয়াছিলাম। এক দিবস অতি তুচ্ছ কারণ-বশতঃ কালীপ্রসন্ন বাবু আমাকে বিশেষরূপ তিরস্কার করেন বলিয়াই, আমি তাঁহাকে কিছু না বলিয়া চলিয়া আসি, ও গোবিন্দপুরে আমার পিতার নিকটেই অবস্থান করি। পরিশেষে, সফিনা পাইয়া, আমরা উভয়েই সাক্ষ্য দিতে আসিয়াছি। আমি মরি নাই বা নগেন্দ্রনাথ আমায় হত্যা করিয়া আমার লাস লুক্কাইত রাখেন নাই।"

এই কথা শুনিয়া, জজ সাহেব, নগেন্দ্রনাথ ও কৈলাশচন্দ্রকে তখনই মুক্তিপ্রদান করিলেন। তাঁহারা হাসিতে হাসিতে সেই আদালত হইতে বহির্গত হইলেন। জজ-সাহেব, কালীপ্রসন্ন ও সাক্ষীগণের অনুসন্ধান করিলেন। কিন্তু সেই স্থানে কাহাকেও পাইলেন না। সেই গোলমালের ভিতর কে কোথায় যে পলাইল, তাহার ঠিকানাই তখন কেহ বলিতে পারিল না।

কালীপ্রসন্ন যেমন চতুরতা-পূর্ব্বক মিথ্যা মকর্দ্দমা সাজাইয়া নগেন্দ্রকে ফাঁসি দেওয়ার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, নগেন্দ্রনাথও সেইরূপ মিথ্যা বেচু সিং ও মিথ্যা স্বরভবন সিংহ সাজাইয়া সেই ফাঁসি হইতে নিষ্কৃতি হইলেন। কিন্তু এবার মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন,—"এরূপ ভয়ানক শত্রুর বিনাশ-সাধন যেরূপেই হউক করিব। ইহাতে পাপ নরকেরও ভয় করিব না।"

যোগ ও যোগানুষ্ঠান। *

আর্য্যদিগের কি দর্শন-শাস্ত্র, কি স্মৃতি-শাস্ত্র, কি পুরাণ, কি তন্ত্র, কি ইতিহাস, সকল শাস্ত্রেই অষ্টাঙ্গ-যোগের বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। যেখানে বিষয় বর্ণনা নাই, আর্য্যদিগের তাদৃশ ধর্ম্মশাস্ত্র বিরল বলিলেও হয়। সংক্ষেপে তদ্বিষয়ের প্রমাণ প্রদর্শন করাইতেছি; তদ্দ্বারা পূর্ব্বোক্ত বিষয়ের প্রচুর প্রমাণ হইবে। বহু শতাব্দী-প্রসিদ্ধ সেই সাংখ্য-প্রবর্ত্তক পাতঞ্জলি মুনি-প্রণীত পাতঞ্জল দর্শনের সাধন-পাদ হইতে অষ্টাঙ্গ-যোগ প্রদর্শিত হইতেছে। যথা—

"যমনিয়মাসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যান-সমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানি॥ ২৯। সূত্র।"

(১) যম, (২) নিয়ম, (৩) আসন, (৪) প্রাণায়াম, (৫) প্রত্যাহার, (৬) ধারণা, (৭) ধ্যান, (৮) সমাধি, যোগের এই আট অঙ্গ।

"অহিংসা সত্যাস্তেয় ব্রহ্মচর্য্যা পরিগ্রহা যমাঃ॥ ৩০॥"

যম পাঁচ প্রকার,—১। অহিংসা (সর্ব্বপ্রকার হিংসায় বিরত), ২। সত্য (মিথ্যা বাক্য ও মিথ্যা ব্যবহারে বিরত), ৩। অস্তেয় (সর্ব্বপ্রকার

* পূর্ব্ব-সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর।

চৌর্য্য বা অপহরণে বিরত), ৪। ব্রহ্মচর্য্য (সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়-সংযত-পূর্ব্বক পরব্রহ্মে বিচরণ), ৫। অপরিগ্রহ (বিষয়ের অর্জ্জন, রক্ষণ, ক্ষয়, সঙ্গ, ও হিংসাদি দোষদর্শনাধীন তাহার অস্বীকার)।

"শৌচ সন্তোষতপঃ সাধ্যায়েশ্বর প্রণিধানানি নিয়মাঃ। ॥ ৩২॥"

নিয়ম পাঁচ প্রকার। যথা,—১। দ্বিবিধ শৌচ (মৃত্তিকা ও জলাদি দ্বারা ও পবিত্র বস্তুর ব্যবহার দ্বারা বাহ্যশুদ্ধি, এবং জ্ঞান ও তপস্যার অনুষ্ঠান দ্বারা ও ধৌতিদ্বারা আভ্যন্তরিক শুদ্ধি), ২। সন্তোষ (বিমর্ষাভাব বা সান্নিধ্য-সাধনাধীন অধিক বিষয়ে অনিচ্ছা), ৩। তপ, (ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শীত, উষ্ণ, জয়, পরাজয়, লাভ, অলাভ, এবং সুখ-দুঃখ ইত্যাদি দ্বন্দ্ব-সহিষ্ণুতা; এবং কৃচ্ছ্র ও চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি ব্রতও তপঃ-শব্দে খ্যাত।), ৪। স্বাধ্যায় (মোক্ষশাস্ত্রের অধ্যয়ন এবং প্রণব জপ।) ৫। ঈশ্বর-প্রণিধান, (সেই পরমগুরু পরমেশ্বরে সর্ব্বকর্ম্ম-ফলার্পণ)।

—"স্থিরসুখমাসনং॥ ৪৬॥"

পদ্মাসন, বীরাসন, ভদ্রাসন ও স্বস্তিকাসনাদি স্থিরভাবে সুখ-সাধকের নাম আসন।

"তস্মিন্ সতি শ্বাস-প্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ॥ ৪৯॥"

গুরুর উপদেশানুসারে অভ্যাসাধীন পদ্মাসনাদির অনুদ্বিগ্নকররূপে সিদ্ধি হইলে প্রাণবায়ুর শ্বাস-প্রশ্বাসাদি ক্রিয়ার গতিরোধের নাম প্রাণায়াম।

"স্ববিষয়া সম্প্রয়োগে চিত্তস্য স্বরূপানুকার ইবেন্দ্রিয়ানাং প্রত্যাহার॥ ৫৩॥"

স্ববিষয়ের সম্ভোগাভাব সময়ে (অর্থাৎ মোহনীয় ও রঞ্জনীয় এবং কোপনীয় শব্দাদি বিষয়দ্বারা চিত্ত সংযুক্ত না হইলে, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকলও বিষয়ে প্রধাবিত হয় না; সুতরাং তৎকালে ইন্দ্রিয়-সমূহের চিত্তস্বরূপের ন্যায় অবস্থান হয়—তদবস্থায়) সমুদায় ইন্দ্রিয়ার্থ বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়দিগের আহরণ হয় বলিয়া ইহার নাম প্রত্যাহার।

পাতঞ্জল-দর্শনের ব্যাসদেব-কৃত ভাষ্য-ব্যাখ্যাকৃৎ মহামহোপাধ্যায় বাচস্পতি মিশ্র লিখিয়াছেন,—"পঞ্চভ্যশ্চ যোগাঙ্গেভ্যো বহিরঙ্গেভ্যো হস্যাঙ্গত্রয়স্যান্তরঙ্গতয়া বিশেষ জ্ঞাপনার্থং অত্র ত্রয়স্যোপন্যাসঃ॥ তত্রাপিচ ধারণা-ধ্যান-সমাধীনাং কার্য্যকারণ-ভাবেন নিয়ত পৌর্ব্বা-পর্য্যত্বাৎ তদনুরোধেনোপন্যাস ক্রম ইতি প্রথম ধারণা॥"—বিভূতি-পাদের ১ম সূত্রের ভাষ্য-ব্যাখ্যা।

পূর্ব্বোক্ত অষ্টাঙ্গযোগের মধ্যে, ১। যম, ২। নিয়ম, ৩। আসন, ৪। প্রাণায়াম, ৫। প্রত্যাহার, এই পাঁচ যোগাঙ্গ, ঈশ্বর-প্রাপ্তিতে বাহ্যাঙ্গ মাত্র। এই পাঁচ অঙ্গ হইতে, ১। ধারণা, ২। ধ্যান, ৩। সমাধি, এই অঙ্গত্রয় অন্তরঙ্গ বলিয়াই স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদে 'বিভূতিপাদে' এই ত্রয়ের প্রদর্শন করিয়াছেন। এই অন্তরঙ্গ অঙ্গত্রয়ের মধ্যে ধারণা-জন্য ধ্যান, ও ধ্যান-জন্য সমাধি এইরূপ কার্য্যকারণ-ভাবের বিদ্যমানতা-বশতঃ এই তিনের নিয়ত পৌর্ব্বপর্য্যভাব রহিয়াছে। তন্নিবন্ধনেই মহর্ষি পতঞ্জলি বিভূতিপাদে যথাক্রমে ধারণা, ধ্যান ও সমাধির লক্ষণ নিরূপণ করিয়াছেন। এই লেখা দ্বারাও স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে, পূর্ব্বোক্ত পঞ্চাঙ্গ দ্বারা শরীরের কর্ম্মঠতা, নীরোগিতা, দৃঢ়তা এবং একাগ্রতাদি জন্মে। পরোক্ত ধারণাদি যোগাঙ্গত্রয়ের অনুষ্ঠানেই সম্পূর্ণরূপে পরম পুরুষার্থ লাভ হয়।

"দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা॥১॥"—বিভূতিপাদে।

অর্থাৎ দেশ শব্দে এই স্থানে আধ্যাত্মিক দেশ ধরিতে হইবে। নাসিকাগ্রে—হৃৎপদ্মে, মস্তকস্থ সহস্রারে—জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মাতে, এবং জিহ্বাগ্রে—এবম্বিধ আভ্যন্তরিক স্থানসমূহে, চিত্তসম্বন্ধকে—কিম্বা ধ্যানপ্রাপ্ত স্বাকাররূপে চিত্তবৃত্তিকে, ধারণা বলে॥—(অবিকল ভাষ্যের অনুবাদ)।

"তত্র প্রত্যয়স্যৈকতানতাধ্যানং॥ ২॥"

অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত আধ্যাত্মিক দেশ-সমূহে

ধ্যেয় পরমেশ্বরের আলম্বনাধীন জ্ঞানের একাগ্রতার নাম ধ্যান।

"তদেবার্থমাত্র নির্ভাসং স্বরূপ শূন্যমিব সমাধি ॥ ৩ ॥"

অর্থাৎ ধ্যানই যে সময়ে ধ্যেয় পরমেশ্বরের আকাররূপে প্রকাশ পায়—ধ্যেয় স্বভাবের আবেশাধীন ঈশ্বরকে চিন্তা করিতেছি ঈদৃশ জ্ঞানও তৎকালে থাকিবে না, ধ্যানই ধ্যেয়রূপে প্রকাশমান হইতেছে—এইরূপ অবস্থার নাম সমাধি।

যোগ-শাস্ত্র-প্রধান সর্ব্বপ্রসিদ্ধ পাতঞ্জল-দর্শন বহুবিস্তৃতেও নিতান্ত কঠিন। তাহার বঙ্গানুবাদ সুকর নহে। কিন্তু স্মৃতি ও পুরাণ-প্রণেতা পরজাত মুণিদিগের পাতঞ্জল-দর্শনই আদর্শ। যে যে স্থানে সেশ্বর সাংখ্যের নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন, সেই সেই স্থানেই মহর্ষি পতঞ্জলি উপস্থিত! (এই পতঞ্জলি সত্যযুগাবতীর্ণ—পানিনি-ভাষ্যকৃৎ পতঞ্জলি অপর ব্যক্তি তন্নামা) প্রজ্ঞাবান মাধবাচার্য্য "সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে" যোগশাস্ত্র-প্রধান পাতঞ্জল-দর্শনের অতীব উৎকৃষ্ট সমালোচনা করিয়াছেন; সংক্ষেপে তদ্বিষয় প্রদর্শিত হইল। সাংখ্য-প্রবচনের অপর নাম ধ্যেয়ক যোগশাস্ত্র পতঞ্জলি-প্রণীত পাতঞ্জল-দর্শন পাদচতুষ্টয়ে বিভক্ত।

তাহাতে প্রথম পাদে (সমাধিপাদে) "অথ যোগানুশাসনং" এই সূত্র দ্বারা যোগশাস্ত্রারম্ভের প্রতিজ্ঞা করিয়া "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত দ্বিবিধ যোগ বলিয়া সমাধি-প্রপঞ্চ-প্রদর্শনে ভগবান পতঞ্জলি বিশেষ দক্ষতা প্রকাশ করিয়াছেন। এই পাদে সমাধির বিস্তার হইয়াছে বলিয়াই ইহার নাম সমাধি পাদ।

উহার দ্বিতীয় পাদে (সাধন-পাদে) "তপঃ-স্বাধ্যায়েশ্বর প্রণিধানানি ক্রিয়া-যোগ" (তপস্যা, স্বাধ্যায়, প্রণবাদি জপ বা মোক্ষ শাস্ত্রাধ্যয়ন, ঈশ্বর-প্রণিধান, সর্ব্বকর্ম্মের পরমেশ্বরে অর্পণ অথবা ক্রিয়াজনিত ফলাভিসন্ধি-ত্যাগ ক্রিয়াযোগ জানিবে) ইত্যাদি দ্বারা বিষয়াকৃষ্ট চিত্তদিগেরও ক্রিয়াযোগ ও যমনিয়মাদি পঞ্চ বহিরঙ্গ সাধনাধীন যোগসিদ্ধি বলিয়াছেন। সাধনোপায় বলাতেই ইহার নাম সাধনপাদ।

উহার তৃতীয় পাদে (বিভূতিপাদে) "দেশ-বন্ধচিত্তস্য ধারণা" ইত্যাদি সূত্র দ্বারা ধারণা, ধ্যান ও সমাধিত্রয় অন্তরঙ্গ উপায় বলিয়া, তাহাতে অবান্তর ফল বিভূতি-লাভ হয় বিধায়, ইহার নাম বিভূতিপাদ হইয়াছে।

উহার চতুর্থপাদে (কৈবল্য পাদে) "জন্মৌষধিমন্ত্রতপঃ সমাধিজাঃ সিদ্ধয়ঃ" ইত্যাদি সূত্রদ্বারা সমাধিজনিত সিদ্ধি-সকল বলিয়া সিদ্ধি-প্রপঞ্চের পরম প্রয়োজন কৈবল্য (নির্ব্বাণ) নির্দ্দেশ করিয়াছেন বলিয়াই এই পাদের নাম কৈবল্য-পাদ।

প্রসঙ্গতঃ কপিল-প্রণীত সাংখ্য-দর্শনোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব প্রদর্শন করাইয়া ষড়বিংশতি পদার্থ পরমেশ্বরকে "ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়ৈর পরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ" এই সূত্রদ্বারা নির্ব্বাচন করিয়াছেন। অর্থাৎ অবিদ্যাদি ক্লেশ, কুশলাকুশল-জনক কর্ম্ম, তৎফল বিপাক, তদনুবন্ধিনী বাসনা, আশয়, তাহাতে অনাকৃষ্ট পুরুষ-বিশেষকে ঈশ্বর বলে।

মনস্বী পতঞ্জলি পূর্ব্বোক্ত বিষয় সকলকে ন্যায়ানুগত যুক্তি-তর্কদ্বারা তন্নতন্নরূপে বিচার করিয়া যোগশাস্ত্রকে এক অনির্ব্বচনীয় পদার্থরূপে পরিণত করিয়াছেন। অতএব যোগসাধন এক পরমোপাদেয় ধর্ম্মজনক কার্য্য।

জালিয়াৎ যদু।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

এই জাল-জুয়াচুরি-সম্বলিত মর্কদ্দমার বিষয় যতই ভাবিতে লাগিলাম, মনে ততই নূতন নূতন ভাবনা আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। সেই "একজনের" সহিত পুনরায় পরামর্শ করিবে আরম্ভ করিলাম। সেই "একজন" অপর কেহই নহেন—আফিসের সেই বড় বাবু। আমার নিকট সমস্ত কথা শুনিয়া, অনুসন্ধানে যাহা যাহা আমি জানিয়াছিলাম, সমস্ত বিষয় আমার নিকট হইতে অবগত হইয়া, তিনি যদুনাথের উপর নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইলেন; এবং তখনই তাঁহার অনুগ্রহে অনুগৃহীত, ও তাঁহারই দ্বারা প্রতিপালিত দুই ব্যক্তিকে ডাকিলেন। আজ্ঞা-মাত্রই দুই ব্যক্তি আসিয়া বড়-বাবুর সম্মুখে উপনীত হইল। ঐ দুই ব্যক্তি সেই আফিসেরই কর্ম্মচারী, ইহারা দুইজনই যদুনাথের দক্ষিণে ও বামে বসিয়া আফিসে লেখা-পড়া করিয়া থাকেন। যদুনাথ সম্বন্ধে দুই একটী কথা ইহাঁদিগকে জিজ্ঞাসা করায়, আরও জানিতে পারা গেল যে, যদুনাথ কোন দিবসই নিয়মিতরূপে আফিসে আসেন না; আফিসে আসিবার সময় বেলা ১০টা নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও, ১২টা-একটার কম কেহই তাঁহাকে আফিসে দেখিতে পায় না। ইহার মধ্যে আবার কোন কোন দিবস একেবারেই অনুপস্থিত হইয়া থাকেন। যদুনাথ বড়-বাবুর লোক, বড়-বাবু ইহাঁকে বিশেষ ভালবাসেন বলিয়া, ইহাঁর বিপক্ষেও কোন কথা বলিতে কেহই সাহসী হন না। কাজেই এসকল কথা বড় বাবুর কাণে উঠে না।

কর্ম্মচারী-দ্বয়ের নিকট হইতে এই ভাবের কথা শুনিয়া, বড়-বাবুর সন্দেহ আরও অধিক হইল; তখন তিনি কর্ম্মচারী-মাত্রের হাজিরার পুস্তক আনাইয়া দেখিলেন, বাস্তবিকই যদুনাথ মধ্যে মধ্যে অনুপস্থিত থাকেন। ঐ পুস্তক হইতে আরও একটী বিষয় অবগত হইয়া তিনি আরও বিস্মিত হইলেন যে, যে দিবস উপরি-কথিত হাজার টাকার নোট করেন্সি-আফিসে বদলান হয়, সেই দিবস যদুনাথ আফিসে অনুপস্থিত ছিলেন। এই ঘটনাটী বড়ই সন্দেহের।

এই সকল অবস্থা আমি সেই স্থানে চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া দেখিতে লাগিলাম; এবং এই সম্বন্ধে যতই ভাবিতে লাগিলাম, ততই যদুনাথের উপর আমার সন্দেহও আরও বাড়িতে লাগিল।

এই সমস্ত অবস্থা দেখিয়া, 'বড়-বাবুর ক্রমেই ক্রোধের উদ্রেক হইতে লাগিল। তিনি, আর কোনরূপে স্থির থাকিতে না পারিয়া, তখনই যদুনাথকে ডাকাইলেন। যদুনাথ সেই স্থানে আসিয়া উপনীত হইবা-মাত্রই, বড়বাবু তাঁহার উপর রাগভাব প্রকাশ করিয়া কহিলেন,—"যদু, এ সব কি শুনিতেছি! দরিদ্রের উপকার করিলে সে যে এইরূপ অপকার করিয়া তাহার প্রতিশোধ দেয়, তাহা আমি এই প্রথম দেখিলাম!"

বড়-বাবুর এই কথা শুনিয়া, যদুনাথ যেন একেবারে বিস্মিত হইলেন; এবং ধীরে ধীরে ও নিতান্ত বিনীতভাবে কহিলেন,—"মহাশয়, আপনি কি নিমিত্ত যে আমাকে তিরস্কার করিতেছেন, তাহা আমি কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না; আমাকে সমস্ত কথা পরিস্কাররূপে করিয়া বলুন। যদি আমার দ্বারা কোনরূপ অন্যায় কার্য্য হইয়া থাকে, তাহা আমি আপনার নিকট গোপন করিব না। সমস্ত কথাই স্পষ্টরূপে স্বীকার করিব, বা যতদূর আমি অবগত আছি, তাহা প্রকাশ করিতেও কোনরূপে কুণ্ঠিত ও লজ্জিত হইব না।"

যদুনাথের এই কথা শুনিয়া, বড়-বাবু তাঁহাকে সমস্ত কথা কহিলেন; আমার নিকট হইতে যে সকল বিষয় তিনি অবগত হইয়াছিলেন ও নিজে অনুসন্ধানেও যে সকল বিষয় অবগত হইলেন, তাহার একটি কথাও গোপন করিলেন না; এবং পরিশেষে ইহাও কহিলেন যে,—"যদি তুমি সংসর্গ-দোষে পড়িয়া এই কার্য্য করিয়াও থাক, তাহাও স্পষ্টরূপে স্বীকার করিয়া সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া দেও। তুমি যাহাতে কোনরূপে বিপদগ্রস্ত না হও, তাহার ভার আমার উপর থাকিল।"

বড়-বাবুর কথা শুনিয়া যদুনাথ কহিলেন,—

"মহাশয়, আমি আপনার নিকট কখন মিথ্যা কথা কহিব না। আপনি যে সকল কথা আমাকে কহিলেন, ইহার সমস্তই মিথ্যা; আমি ইহার বিন্দু-বিসর্গও অবগত নহি। কিন্তু একটী কথা প্রকৃত, তাহা আমি আপনার নিকট বলিতে নিতান্ত লজ্জা বোধ করি।" এই বলিয়া, যদুনাথ আমাকে একটু অন্তরালে লইয়া গেলেন, ও চুপে চুপে আমাকে কহিলেন,—"নাথের-বাগানে 'শশী' নাম্নী যে একটী আমার রক্ষিতা স্ত্রীলোকের কথা হইয়াছে, তাহা সত্য; কিন্তু কৈলাশের সহিত কখনও আমার সেই স্থানে সাক্ষাৎ হয় নাই—আমি কৈলাশকে চিনি না, বা আমি কখন হাজার টাকার নোট ভাঙ্গাই নাই।"

পাঠক-মহাশয়গণ, এখন বোধ হয়, বুঝিতে পারিলেন যে, কৈলাশ আমাকে কোন্ ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা বলিয়াছিল; এবং কাহার সহিতই তাহার নাথের-বাগানে সাক্ষাৎ হইয়াছিল।

যদুনাথের এই কথা শুনিয়া, একবার ভাবিলাম যে, সে সত্য কথা কহিতেছে। কিন্তু যতই বিশেষ করিয়া ভাবিয়া দেখিতে লাগিলাম, ততই সে ভাবনা মনে স্থান দিতে পারিলাম না। কিন্তু যদুনাথ বারবার কহিতে লাগিল,—"আমি ইহাতে সম্পূর্ণরূপে নির্দ্দোষী, এই কার্য্য আমার দ্বারা সম্পন্ন হয় নাই।"

বড়-বাবু যদুনাথের এই কথা শুনিয়া, আর সহ্য করিতে পারিলেন না; তিনি সেই মুহূর্ত্তেই তাঁহাকে কর্ম্ম হইতে জবাব দিলেন, ও আমার হস্তে তাঁহাকে অর্পণ করিয়া কহিয়া দিলেন,—"আমার বেশ বোধ হইতেছে যে, এই যদুনাথ ইহার সমস্ত বিষয়ই অবগত আছে। আপনি ইহাকে লইয়া বিশেষ চেষ্টা করিয়া দেখুন; আমার বোধ হয়, আপনি কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন।"

আমি যদুনাথকে সঙ্গে লইয়া আপন স্থানে আগমন করিলাম। তাঁহাকে কতরূপে বুঝাইলাম, কতপ্রকার আশ্বাস-বাক্য প্রদান করিলাম। কিন্তু সে কিছুতেই বুঝিল না। সেই একমাত্র কথা "আমি নির্দ্দোষী" ভিন্ন, অন্য কোন কথা তাহার মুখ হইতে বহির্গত হইল না।

এইরূপে, যদুনাথকে বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া বলাতেও, যখন সে "আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী" ভিন্ন অন্য কোন কথা বলিল না, তখন আমাদিগের যাহা যাহা কর্ত্তব্য, তাহার সমস্তই একে একে করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এতক্ষণ পর্য্যন্ত যদুনাথ আমার নিকটেই ছিল; আমার নিকটেই একখানি চৌকির উপর বসিয়া আমার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিল। কিন্তু যখন সে কোনক্রমেই আমার কথায় কর্ণপাত করিল না, তখন আমার মনে একটু ক্রোধের উদয় হইল। একে যে সকল প্রমাণ যদুনাথের বিপক্ষে সংগ্রহ হইয়াছিল, তাহাতে স্পষ্টই বোধ হয় যে, যদুনাথ এই জুয়াচুরি-কাণ্ডে বিশেষরূপে মিশ্রিত আছে; তাহার উপর বড়-বাবুর মনেও বিশেষরূপ সন্দেহ না হইলেই বা তিনি ইহাকে কর্ম্ম হইতে জবাব দিবেন কেন? যদুনাথ আমার কথা শুনিল না; আমার পরামর্শমত কার্য্য করিতে স্বীকার হইল না। কার্জেই আমি তাহাকে আর কতক্ষণ কনষ্টেবলের জিম্মায় না দিয়া থাকিতে পারি।

আমার মুখের কথা বাহির হইতে না হইতেই, কনেষ্টবল-সাহেবদের মধ্যে একজন তাহাকে লইয়া অন্তরালে গমন করিল। সেই স্থানে লইয়া গিয়া যে সে কি করিল, তাহা সেই জানিল, আর অন্তর্য্যামী ভগবানই জানিলেন। আরও জানিলেন, ভুক্তভোগী যদুনাথ! আমরাও ইহার কিছুই জানিতে পারিয়াছিলাম না। কিন্তু একবারমাত্র এইকথা শুনিয়াছিলাম যে, সেই কনেষ্টবোল-সাহেব অপর আর একজনকে বলিতেছিল যে,—"হামারা 'সমজাউন' ও 'বুঝাউন' লে আও আর উস্‌কো আচ্ছিতরে সমজায়েঙ্গে ও বুঝায়েঙ্গে।" ইহার কিছুক্ষণ পরে যদুনাথকে পুনরায় আমার সম্মুখে আনিয়া উপস্থিত করিল। এবার দেখিলাম, তাহার বাঁকাসিঁথি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, চুল

আলু-থালু হইয়াছে, চক্ষু রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছে। নাসিকা দিয়া ঘন ঘন শ্বাস-প্রশ্বাস বহির্গত হইতেছে। পরিধেয় বস্ত্র ও পিরান প্রভৃতির স্থানে স্থানে ময়লা হইয়া গিয়াছে, ও স্থানে স্থানে ছিন্ন হইয়াছে। যদুনাথের চেহারা যেন সম্পূর্ণ প্রভেদ বোধ হইতেছে।

আমি কি যেন একটী কথা সেই সময়ে যদুনাথকে জিজ্ঞাসা করিবার উপক্রম করিতেছিলাম; কিন্তু সে আমাকে দেখিবামাত্র কাঁদিয়া ফেলিল। চক্ষু দিয়া প্রায় এক পোয়া আন্দাজ জল বাহির হইয়া গেল। যদুনাথের এই অবস্থা দেখিয়া আমারও মনে একটু দয়ার উপক্রম হইল। পুনরায় আমি তাহাকে আপনার নিকটেই বসাইয়া রাখিলাম।

যদুনাথের এই প্রকার অবস্থা দেখিয়া আমি বিশেষ বিবেচনা-পূর্ব্বক ভাবিতে লাগিলাম। কিন্তু কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলাম না। তথাপি সেই বিষয়ের চিন্তা পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ হইলাম। সেই সময় আমার একটী কথা হঠাৎ মনে পড়িল। সেই কথা হঠাৎ মনে হওয়ায়, আমি দেখিলাম,—আমি যেরূপ ভ্রমে পতিত হইয়া এই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহা পুলিশ-কর্ম্মচারির পক্ষে কেবলমাত্র বিশেষ লজ্জাকর কথাও নহে—ইহা একটী ভয়ানক ভুল। এইরূপ ভ্রমে পতিত হইলে নির্দ্দোষী ব্যক্তিও দোষী প্রমাণিত হয়। দোষী ব্যক্তিও বিনা দণ্ডে নিষ্কৃতি-লাভ করে। বিশেষ বিবেচনা-পূর্ব্বক অনুসন্ধান না করিলে পুলিশ-কর্ম্মচারিমাত্রকেই এইরূপ বিষম ভ্রমে পতিত হইতে হয়। অনেকেই এইরূপ ভ্রমে পড়েন বলিয়াই, বর্ত্তমান পুলিশের এত দুর্নাম!

যখন দেখিতে পাইলাম যে, আমি ভয়ানক ভ্রমে পতিত হইয়াছি, ও সেই ভয়ানক ভ্রমবশতঃই যদুনাথ প্রকৃত দোষী কি নির্দ্দোষী তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছি না; তখন আমার মনে অতীব আনন্দের উদয় হইল। আর কাল বিলম্ব না করিয়া, আমি যদুনাথকে সঙ্গে লইয়া তখনই বহির্গত হইলাম। দেখিতে দেখিতে কৈলাশের বাড়িতে গিয়া উপনীত হইলাম। কৈলাশচন্দ্র সেই সময় বাড়িতেই ছিলেন। তাঁহাকে ডাকিবা-মাত্রই তিনি বাহিরে আগমন করিলেন। সেই সময় যদুনাথ আমার পার্শ্বে দণ্ডায়মান। আমি কৈলাশচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আপনি যে যদুনাথের কথা আমাকে বলিয়াছিলেন, সেই যদুনাথকে আপনি দেখিলে চিনিতে পারিবেন কি না?" উত্তরে কৈলাশচন্দ্র কহিলেন,—"আমি সে কথা পূর্ব্বেই আপনাকে বলিয়াছি যে, তাঁহাকে দেখিবামাত্রই আমি চিনিতে পারিব। যে কথা একবার আপনি জানিতে পারিয়াছেন, সেই কথা পুনরায় অবগত হইবার নিমিত্ত আবার এতদূর আসিয়াছেন কেন?" কৈলাশের এই কথা শুনিয়া আমি স্পষ্ট করিয়া আর কিছু বলিলাম না; নিজেই আহাম্মুক সাজিয়া কহিলাম,—"আপনি যে এইকথা পূর্ব্বেই আমাকে বলিয়াছিলেন, তাহা আমার মনে ছিল না বলিয়াই আপনাকে একটু কষ্ট দিলাম। যাহা হউক, তাহার নিমিত্ত অসন্তুষ্ট হইবেন না।" এই বলিয়া, যদুনাথের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, পুনরায় কৈলাশচন্দ্রকে কহিলাম,—"মহাশয়, আপনি যে যদুনাথের কথা বলিয়াছিলেন, তাঁহার বয়ঃক্রম ইহাঁর অপেক্ষা অধিক কি অল্প।" আমার কথা শুনিয়া কৈলাশচন্দ্র যদুনাথকে বিশেষরূপ দেখিয়া কহিলেন,—"যদুনাথের বয়ঃক্রম ইহাঁর বয়ঃক্রম অপেক্ষা অনেক বেশী।"

স্বর্গীয় তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

বঙ্গভাষা আর একটী রত্ন হারাইলেন। বাঙ্গালীর গৌরব-স্থল "স্বর্ণলতার" প্রসিদ্ধ লেখক তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় আর নাই। গত ২৩এ সেপ্টেম্বর বক্সার-পাহাড়ে পক্ষাঘাত-রোগে তাঁহার জীবন-লীলার অবসান হইয়াছে।

এক 'স্বর্ণলতা' লিখিয়াই তারকনাথ বাঙ্গালা সাহিত্যে অমরত্ব-লাভ করিয়াছেন। তদ্ভিন্ন তাঁহার 'হরিষে বিষাদ' ও 'তিনটী গল্প' নামক পুস্তকও উপাদেয়। ঐ তিনখানি পুস্তক ছাড়া, তারকনাথের আর একখানি পুস্তক অদৃষ্ট—এই 'অদৃষ্টই' 'অনুসন্ধানে' বাহির হইতেছে। এই তারকনাথের শেষ লেখা—'অদৃষ্টই' তাঁহার শেষ। আমাদের 'অনুসন্ধানেরও' দুরদৃষ্ট, তাঁহার অদৃষ্টেরও দুরদৃষ্ট, অভাগিনী বঙ্গভাষারও দুরদৃষ্ট, যে, এমন সময়ই আমরা তারকনাথকে হারাইলাম।

তারকনাথ, যশোহর-জেলার বনগ্রামের নিকটবর্ত্তী বাগ-আঁচড়া গ্রামের ৺ মহানন্দ গঙ্গোপাধ্যায়ের পুত্র। ইনি শৈশব-কালাবধি ইহাঁর পিতৃব্য-পুত্র (জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র) ৺ অম্বিকাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সহিত কলিকাতা—ভবানীপুরে থাকিয়া, 'লণ্ডন মিশনারী স্কুলে' লেখা-পড়া শিক্ষা করেন। 'লণ্ডন মিসনারী স্কুল' হইতে ইনিই প্রথম ১৪৲ টাকা স্কলারসিপ লইয়া, কলিকাতার মেডিক্যাল-কলেজে ভর্ত্তি হয়েন। তথায় ৫ বৎসর পাঠ করিয়া তথাকার পরীক্ষায় ভালরূপে উত্তীর্ণ হয়েন; এবং তথা হইতে পুরস্কার-স্বরূপ মেডেল প্রাপ্ত হন। ইহার পর, কয়েক বৎসর মেডিকেল-কলেজের 'সুপারিনিউমারেরী' (Super-numerary) থাকিয়া, অবশেষে 'সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট অব্ ভ্যাক্‌সিনেসনের (Superintendant of vaccination এর) পদে নিযুক্ত হইয়া জলপাইগুড়ি প্রভৃতি জেলায় প্রেরিত হন। এই সময়েই ভূতপূর্ব্ব 'জ্ঞানাঙ্কুর' পত্রের সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীকৃষ্ণ দাস মহাশয়ের সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহার্দ্দ হয়; এবং শ্রীকৃষ্ণ বাবুর সম্পাদিত উক্ত পত্রেই সর্ব্বপ্রথম তাঁহার "স্বর্ণলতা" প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। এই সময় 'ললিত-সৌদামিনী' নামক একটী গল্পও তিনি রচনা করেন—এক্ষণে ঐ গল্প ও নূতন দুইটী গল্প দিয়াই তাঁহার 'তিনটী গল্প' নামক পুস্তক পরে প্রকাশিত হইয়াছে।

যাহা হউক, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি জেলার কার্য্য করিবার সময়, তাঁহার বড়ই পীড়া হয়; এবং ৯ মাসের ছুটী লইয়া তিনি চিকিৎসার্থ কলিকাতায় চলিয়া আসেন। এই সময়, কলিকাতায় থাকিয়া আরোগ্যলাভ করিলে, ছুটীর বাকী কয়েক মাস, স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার কলেজে তারকনাথকে ইতিহাস ও রসায়নের অধ্যাপক-পদে নিযুক্ত করেন। কিন্তু, ছুটী উত্তীর্ণ হইলেই, তারকনাথ আবার পূর্ব্বের কার্য্যে গমন করেন। ইহার পর জলপাইগুড়ি হইতে ইনি যশোহরে বদলী হয়েন। এবং এই সময় 'গ্রেডের' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, ক্রমে 'বক্সারের' 'এ্যাসিসট্যাণ্ট সার্জ্জনের' পদ প্রাপ্ত হন। বক্সারে থাকিয়াই তিনি 'হরিষে-বিষাদ' রচনা করেন। "অদৃষ্টও" তাঁহার বক্সার হইতেই আরম্ভ হয়। 'বক্সারে' থাকিয়া, ক্রমে তিনি প্রথম শ্রেণীর এ্যাসিসট্যাণ্ট সার্জ্জনের পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। তাঁহার ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারীগণ সকলেই তাঁহার কার্য্য-নিপুণতায় সন্তুষ্ট ছিলেন; এবং তারকনাথের অমায়িকত্বে তাঁহার বন্ধু-বান্ধব সকলেই বিশেষ পরিতুষ্ট ছিলেন। মৃত্যুকালে তারকনাথের বয়ঃক্রম প্রায় ৪৫ বৎসর হইয়াছিল। তারকনাথের মৃত্যুতে আজ বাঙ্গালী পাঠকমাত্রেই যে দুঃখিত হইবেন, তাহা বলা বাহুল্য।

তারকনাথের পুস্তকগুলি—"হরিষে-বিষাদ," "তিনটী গল্প," "অদৃষ্ট,"—বিশেষতঃ "স্বর্ণলতা", সকলেরই পাঠ করা উচিত। আজকাল রঙ্গালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ 'সরলার' অভিনয়ে যে রাশি রাশি অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন, বলা বাহুল্য, তারক বাবুর 'স্বর্ণ-লতার' একটি অংশই এই 'সরলা।' তাই বলি, তারক বাবুর পুস্তকাদি যিনি না পড়িয়াছেন, তিনিও, উহা পড়িলেই, তাঁহাকে আর ভুলিতে পারিবেন না।

পূজায় পঞ্চরং।

ঠান্‌দিদির বিয়ে।

ঘোর কলিকাল! দেখবো কত আর!
কালের বসে ঠান্‌দিদির বিয়ে যে আবার॥
বর-মহাশয় শিব-শম্ভু বয়স সবে ষাট্।
ঠাক্‌রুণ-দিদিও কাছাকাছি—আন্‌লেই হয় খাট॥
বিয়েয় তাই বড়ই রগড়—নূতন বিধান তাতে।
ভূত-পেত্নী-শাঁকচুন্নীর বরণ-ডালা হাতে॥
শ্মশান হো'লো বাসর-ঘর, চিতা-শয্যা খাট।
দৈত্য-দনু ছুটে তাই মাথায় লয়ে কাট॥
হুলুধ্বনি নাইকো—আ'য় 'হরিবোল হরি!'
রূপের বাহার অপরূপ কিবা বলিহারি॥
আর পক্ষের ছেলে তিনটা কেঁদেই তাই সারা।
"কোথা যাস্ তুই," বলেই কাপড় চেপেধরে তারা॥
ঠান্‌দি বলে,—"ভয় কি, বাপু-বাছা!
যেই বাপ্ মলো,নতুন পেলে,পর্‌তে হলোনা কাচা॥"
বিয়েয় যাঁরা ঘটক-ম'শায় তাঁরাও বলেন তাই।
"কাঁদ কেন, নতুন বাবা, পেলে তোমরা ভাই॥"
এমনি কলির কারখানাটা বুঝে উঠা ভার।
কালের বসে ঠান্‌দিদির বিয়ে যে আবার॥

* * *

চারি পয়সার গল্প।

একজন লোক গল্প বলিয়া সকলের নিকট পয়সা আদায় করিতেন। তাঁহার গল্পের বাঁধা দর ছিল; অর্থাৎ যে যেমন পয়সা দিত, তিনি তাহাকে সেই প্রকার গল্প বলিতেন। এমন কি, তিনি এক আনা হইতে ষোল টাকা পর্য্যন্ত মূল্যের গল্প বলিতে পারিতেন।

একদিন একজন আসিয়া কহিল,—'মহাশয়, আমার নিকট চারিটী মাত্র পয়সা আছে—আমায় এক আনার উপযুক্ত একটা গল্প বলুন।"

গল্পকার, এক আনা পয়সা হস্তগত করিয়া, একটী গল্প বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"প্রকাণ্ড রাজার—প্রকাণ্ড বাড়ী, বড় বড় থাম, বড় বড়

সিংহদ্বার, ইন্দ্রভুবনও তাহার কাছে হার মানিয়া যায়। রাজা তথায় ষষ্ঠীসহস্র মহিষী লইয়া সুখে বাস করেন। হঠাৎ একদিন একটী প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র (Royal Tiger) আসিয়া নগরের বহু লোকজন হত্যা করিয়া, রাজবাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। রাজার মা ভয়ে তাঁহার নিজ-কক্ষের আগড় বন্ধ করিলেন—"

যিনি গল্প শুনিতেছিলেন,—তিনি 'আগড়' কথাটী শুনিয়াই বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—"এ কি রকমের গল্প মহাশয়! 'রাজার মা' 'আগড়' দিলেন কি প্রকার? এই বলিলেন, 'প্রকাণ্ড বাড়ী'—'ইন্দ্রভুবনও তাহার সমতুল্য নহে'; আবার বলিতেছেন, 'রাজার মা' 'আগড়' দিলেন।' এ কেমন কথা!"

গল্পকারও বিরক্ত হইয়া বলিলেন "তা, চার পয়সায় কি আর প্যানাল্‌ওলা দরজা, জানালা, খড়খড়ি হইবে? যা' বলেছি, চার পয়সায় ঐ পাওয়া হয় না! যেমন দেবে তেমনি তো পা'বে! রাগ করলে চলবে কেন, বাপু!" যে লোকটী গল্প শুনিতে আসিয়াছিলেন, তিনি ব্যাপার বুঝিয়া-সুজিয়া সরিয়া পড়িলেন।

* * * *

ফুরুৎ।

ঠাকুর-দা' গল্প বলিতেছেন,—"দেখ ভায়ারা, গল্প বলিতে রাজি আছি। কিন্তু আমি থামিলেই 'তার পর কি হইল' বলিয়া জিজ্ঞাসা করিতে হইবে।"

ভায়ারা বলিল,—'তা'র আর বেশী কথা কি? আপনি থামিলেই আমরা জিজ্ঞাসা করিব—'তার পর!"

ঠাকুর-দা' গল্প বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"এক ভয়ানক অজাগর বন। সহজে মানুষ তা'র ভেতর ঢুকতেই পারে না। কেবল ব্যাধেরা শিকারের জন্য অতি কষ্টে-স্থষ্টে যা' দু'একবার যায়।"

ভায়ারা!—তার পর?

ঠাকুর-দা' আহ্লাদিত হইয়া আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"সেই বনে এক বৃহৎ ঝাঁকড়া সেওড়া গাছ। সেই গাছে, ঠিক সন্ধ্যার কিছু আগে, প্রায় হাজার-দু'হাজার পাখী এসে বসে আছে। একজন ব্যাধ এই সময় সেই গাছে এক জাল চাপা দিল। জালের এক জায়গায় একটু ছেঁড়া ছিল। প্রথমেই সেইখান দিয়ে একটী ছোট পাখী 'ফুরুৎ' করিয়া উড়িয়া গেল।" এই বলিয়া, ঠাকুর-দা', মজা দেখিবার জন্য, কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া, তাঁহার থেলো হুঁকোয় 'ভুরুৎ' 'ভুরুৎ' করিয়া টান দিতে লাগিলেন।

ভায়ারা জিজ্ঞাসা করিল,—"তার পর?"

ঠাকুর-দা' বলিলেন,—"ফুরুৎ।" অমনি এই কথার সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর-দা'র মুখ-বিবর দিয়া একরাশি ধূম বাহির হইয়া গেল। পরক্ষণেই আবার হুঁকায় প্রতিধ্বনি—ভুরুৎ! ভুরুৎ!!

ভায়ারা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল,—"তার পর!" ঠাকুর-দা'ও উত্তর দিলেন, "ফুরুৎ।"

এইরূপ অর্দ্ধঘণ্টা 'ফুরুৎ' 'ফুরুৎ' শুনিয়া ভায়ারা বিরক্ত হইয়া উঠিয়া গেল। সে 'ফুরুৎ'ও আর ফুরাইল না। গল্পও আর শেষ হইল না।

* * *

বিজ্ঞাপন! বিজ্ঞাপন!

আর সময় নাই—পূজাও ফুরাইয়া গেল।

এখনও গ্রাহক হউন—এখনওউপহার লউন।

বড় দিব্বি! মাথার দিব্বি!!

ইষ্টিগুরুর দিব্বি!! সেজোদিদির দিব্বি!!

শেষ গিন্নির দিব্বি!!!

এখনও গ্রাহক হউন।

নহিলে আর উপহার পাইবেন না। শেষে মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতে হইবে; রাস্তায় রাস্তায় কাঁদিতে হইবে; ঘরের কোনে বসিয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে হইবে।

সর্ব্বকাম-সিদ্ধি।

ইহার আর নূতন পরিচয় দিব কি? ইহাতে সবই আছে। এক কথায় ইহাতে পুস্তক আছে, পত্রিকা আছে, নাটক আছে, নভেল আছে, পদ্য

ছে, গদ্য আছে; ঔষধ আছে—প্যাটেণ্ট ছে, হোমিওপ্যাথিক আছে, অ্যালোপ্যাথিক ছে, হোম ফার্ম্মেসি আছে; সবই আছে। ড়িং অঙ্গুরী আছে, কেমিকেল সোনা আছে। ত বলিব? সবই আছে। পোষাক আছে—রিচ্ছদ আছে; সার্ট আছে, কোর্ট আছে, বডি আছে, ঘাঘরা আছে; মজুমদার কোম্পানী আছে, মল্লিক ব্রাদার্স আছে; বঙ্গবাসী আছে, জীবনী আছে; বি এম্ কার আছে, পি, সি, স আছে, জি নকুল এণ্ড কোং আছে; র্টিষ্ট প্রেস আছে, সব আছে? কত বলিব? বই আছে। সন্দেশ আছে, মোণ্ডা আছে, করা আছে, পাণতোয়া আছে—হরে ময়রা ছে, শম্ভু ঘি-ওয়ালা আছে, হরি ঘোষ আছে—য়লানী আছে? কত বলিব?—সবই আছে।

তার উপর আবার উপহার।

উপহার ফুরিয়ে গেল—ফুরিয়ে গেল! কলিতার লোকদের দিতে দিতে সবই ফুরিয়ে গেল! মফঃস্বলের গ্রাহকগণ শেষে নৈরাশ না ! সেইজন্যই আবারও বলি, সত্বর উপহার ন। না লইলে নেহাৎ ঠকিবেন!

এখন, উপহার কি?

আর কি? এ বিরাটব্যাপারে উপহার আর কি হইতে পারে?

উপহার,—ঝাঁটা ও জুতা।

ফুরাইয়া গেল—ফুরাইয়া গেল! ছিঁড়িয়া
গেল—ছিঁড়িয়া গেল!! ভাঙ্গিয়া
গেল—ভাঙ্গিয়া গেল!!!

এখনও, নূতন থাকিতে থাকিতে—শক্ত থাকিতে থাকিতে, গ্রাহকগণ অগ্রসর হউন। নহিলে শেষে ছেঁড়া জুতো' আর 'মুড়ো টা' মনের ক্ষোভ রাখিবেন কেন?

মূল্য! মূল্য!! বড়ই সস্তা! বড়ই সস্তা!!

বিনামুল্য বলিলেও হয়।

ডাকমাশুল বা ভ্যালুপেয়েবেলের খরচখরচাও লাগিবে না। কেবল বিলি করার পারিশ্রমিক স'পাঁচ পয়সা দিতে হইবে মাত্র।

শ্রীমুগুর মুষলেন্দ্র নোড়া
ঠিকানা,—শিল।
পোঃ—চুলো। জেলা খেংরাখালি।

* * * *

নাচ।

মাথার বোঝা নামিয়েছি এবার।
আনন্দে তাই নাচি-হাসি, ভাবনা নেইকো আর ॥
তাক্ তাক্‌সিন্, হি হি হি, বড়ই মজা ভাই!
এখন, মরুক গিয়ে, বারুন্দুরে যেমন দুষ্ট-চাল।
আমার আর কি, নেচে-কুঁদেই আসর করি ঘাল ॥
তাক্ তাক্‌সিন্, হি-হি-হি, বড়ই মজা ভাই!
একটার ওপর আর একটা, বোঝায় শাকের আটি।
এই বুঝিয়েই, বাগিয়ে করি, এক বুলিতেই মাটী ॥
তাক্ তাক্‌সিন্, হি-হি-হি, বড়ই মজা ভাই!
এখন, বাইরে থেকেই দেখবো রগড়,
নাচবো তা-ধিন্ ধিন্!
বলবো তবু—"ভয় কি ভায়া,
আছি শেষের দিন ॥"
আর কি চাই!—এইতো মজা—
এমনিই তো চালাক হওয়া চাই।
তাক্ তাক্‌সিন্ হি-হি-হি বড়ই মজা ভাই!

(আনন্দে নৃত্য ও যবনিকা-পতন।)

এন্‌কোর—এন্‌কোর—এন্‌কোর।

* * *

প্রেমে ডগমগ ভক্তের ভক্তি।

প্রিয়ে, সাজ মহিষমর্দ্দিনী।
প্রাণ ভরিয়ে, নয়ন চিরিয়ে,
হেরিব তোমার মুখখানি॥
তোমার স্বামী, মহিষ আমি,
প্রেম-ঘাস-অভিলাষী।
তোমারি তরে, আছি হে ম'রে,
কভু কাঁদি, কভু হাসি॥
সৃষ্টি-বিনাশী, দৃষ্টি-ত্রিশূল,
বিঁধ হে আমার বুকে।
যাতনায় সুখ, পাব একটুক,
নয় যাব শিঙে ফুঁকে॥
(আজ) পূজিব তোমারে, প্রিয়ে!
বিলাতী মসলা দিয়ে॥
ল্যাভেণ্ডার সোপ, পাউডার-থোপ,
আর সে হেলিওট্রোপ।
জ্যাস্‌মিন্ ঢেলে, জোড়া পদতলে,
জুড়াব তোমার কোপ॥
অটো-ডি-রোজে, থাক্, প্রিয়ে, ভিজে,
নাকের কোটর দুটি।
সোপে সাফা চুল, উড়াও বাতাসে,
দেখে আমি চোঁচা ছুটি॥
বিগল্-গর্জ্জনে, গরজ, সুন্দরি,
বজর মামুক হার।
বিকট দৃশনে, কর কড়মড়ি,
চমৎকার—চমৎকার॥
স্থূল বর্ম্মময়, মহিষ আমি হে,
বড়ই কঠিন পিঠ।
নরম চরণে, গরম হবে না,
বুটপায়ে কর ঢিট॥
চাল-কলা দিয়ে, বাঙালিরা পূজে,
মাটিগড়া দুর্গা ছিছি।
নেহাৎ বেয়াড়া, সে রকম পুজো,
চণ্ডীপাঠ কিচিমিচি॥
জ্যান্ত ভগবতী, মহিষমর্দ্দিনী,
তুমি হে আমার দেবি।
রুটী বিস্‌কুটে, হ্যাম্ র‍্যাম্ চাপ,
রসনা তোমার সেবি॥
বিলাত হইতে, আইনু ফিরিয়ে,
পূজিব বিলাতী ভাবে।
দেখুক বাঙালি, ভকতি আমার,
তবেই মুকতি পাবে॥

* * *

বৈজ্ঞানিক-বিভ্রাট।

বিজ্ঞান-শাস্ত্রের মত,—যে অঙ্গের যত ব্যব-হার, তাহার ততই পরিপুষ্টি। যেমন বেহারাদের কাঁদের পরিপুষ্টি, শকটবাহী ষাঁড়ের কাঁধ-পুষ্টি, জিমনাষ্টিকের ছেলেদের 'মস্‌ল্'-পুষ্টি, ইত্যাদি

কিন্তু রামদাস বাবু বিজ্ঞান-শাস্ত্রে একজ[ন] বড়ই পণ্ডিত! কাজেই, দিন-রাত্রি মস্তিষ্কে[র] চালনায়, তাঁহার অন্যান্য অঙ্গ অপেক্ষা মস্তিষ্কে[র] বড়ই পরিপুষ্টি! এমন কি, ক্রমে ক্রমে বাড়ি[য়া] গিয়া, তাঁহার মস্তকটী বৃহদাকার ধারণ করিয়াছে

তারপর, বিজ্ঞানের যুক্তি-ক্রমে, মাধ্যাকর্ষ[ণ] শক্তি দ্বারায়, মস্তকের ভার-বৃদ্ধি হেতু, ঐ দেখু[ন] মস্তকটি নীচের দিকে ঝুলিয়া পড়িয়াছে; অ[ার] পদদ্বয় প্রভৃতি ঊর্দ্ধদিকে উঠিয়াছে।

অনুসন্ধান
অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র।

[...ম খণ্ড] ৩০এ কার্ত্তিক, ১২৯৮। [৭ম সংখ্যা।

বিজয়া।

[ক]ই এলে, কোথা গেলে, কই মা আমার!
[ক]িছুই তো বুঝিবারে না পারি তোমার॥
[স]েই শত্রু—সেই তার দেখি দশানন।
সেই জরা, সেই ব্যাধি, সেই অনশন॥
এখনও তো সেই কান্না—সেই হাহাকার।
তবে মা তোমার আসা হ'লো কি প্রকার?।
এখনো বহে সে ঝড়—নীরবতা নাই।
বিজয়ার 'শান্তিজলে' শান্তি কই পাই!।

কালী-কীর্ত্তন।

(বাউলের সুর।)

কি কলে রলি ভুলি, কাল যায় চলি,
কালী বুলি বল্ রসনা!
[এ]হেন কাল আর্ কি পাবে, মন্ এভবে,
মানব্ জনম্ আর হবেনা।
[স]বল থাকিতে দেহ, কেন, মোহ—
পাশ কেটে নিস্কৃতি হওনা।
যখনে জরাজীর্ণ হবে শীর্ণ
'এহেন' তোর্ দেহখানা,
হইবে বাক্-শক্তি-রোধ্ ওরে নির্ব্বোধ্
দেখে-শুনে শিখে লওনা।
[ড]াক্ মা'রে, বারে বারে ভক্তি ক'রে
পরে সহায় নাই 'সে' বিনা।
যেকালে, কালে এসে ধর্‌বে কেশে
তোর পাশে আর কেউ ঘেঁস্‌বেনা?
সেকালে, মুক্তকেশী কালী আসি,
ধরে অসি কর্‌বে মানা।

অদৃষ্ট। *

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

জয়গোপালের দুঃখ।

জয়দুর্গাকে নিজ-শয়ন-গৃহে না দেখিতে পাইয়া জয়গোপাল তাঁহাকে নানা স্থানে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। প্রথমতঃ রন্ধন-শালায় গেলেন, সেখানে জয়দুর্গা নাই; পরে এক এক করিয়া সমস্ত কুট্‌রী দেখিলেন, কোন খানেই জয়দুর্গাকে পাইলেন না। এদিকে বেলা ১১ টা বাজিয়া গেল। অন্যান্য দিবস এমন সময় জয়গোপাল আহার করিয়া শয়ন করিতেন, কিন্তু অদ্য তাঁহার ক্ষুধা নাই। স্ত্রীকে কোন স্থানে না দেখিতে পাইয়া জয়গোপাল আপনার শয়ন-গৃহে আসিয়া শয্যায় লম্বমান হইয়া একখানি পুস্তক খুলিয়া পড়িবার ভান

* "স্বর্ণলতা"-প্রণেতা স্বর্গীয় তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের এই "অদৃষ্টই" শেষ লেখা। "অদৃষ্ট" শেষ করিয়াই তিনি অকালে স্বর্গারোহণ করিয়াছেন; সুতরাং "অদৃষ্টের" পর আর তাঁহার নূতন লেখা কেহই কিছু পড়িতে পাইবেন না। "অদৃষ্ট" শেষ হইলেই তাঁহার লেখা ফুরাইল। হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু-সংবাদে আমরা ভাবিয়াছিলাম, "অদৃষ্টও" বুঝি বা অসম্পূর্ণই রহিয়া গেল। কিন্তু এখন তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বাবু ভূধরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট "অদৃষ্টের" শেষাংশ প্রাপ্ত হইয়া বড়ই আশ্বস্ত হইলাম। তারক বাবুর স্বহস্ত-লিখিত "কাপি" হইতেই ভূধর বাবু উহা আমা-দিগকে প্রদান করিয়া অনুগৃহীত করিতেছেন।

করিতে লাগিলেন। একদৃষ্টে পুস্তকের দিকে তাকাইয়া আছেন; কিন্তু কিছুই পড়িতেছেন না। সুতরাং পুস্তকের পাতা উল্টাইবারও দরকার হইতেছে না। মনে মনে নানাবিধ বিষয় চিন্তা করিতেছেন। লোকে বিবাহ করে কেন?—এই কথা প্রথমতঃ তাঁহার মনে উদিত হইল। এ প্রশ্নের উত্তর তিনি নিজেই দিলেন। তাঁহার বিবেচনা হইল, বিবাহ সুখের দরুণ। কিন্তু সে মানসিক সুখ। তখন ভাবিতে লাগিলেন, তাঁহার সে সুখ হইয়াছে বা হইতেছে কি না? কিন্তু ভাবিয়া দেখিলেন, সে সুখ তাঁহার কিছুমাত্রও হয় নাই। যতদিন জয়দুর্গা বালিকা ছিলেন, ততদিন তিনি জয়গোপালের নিকট একটী খেলনা-মাত্র ছিলেন। জয়দুর্গা যৌবনাবস্থায় আরূঢ় হইয়া অবধি, তিনি কেবল ভাল কাপড় ও ভাল অলঙ্কারের বিষয় ভিন্ন আর তাঁহার সহিত অন্য কোন আলাপ করেন নাই। কিসে তাঁহার সংসার সুশৃঙ্খলা-পূর্ব্বক চলিবে, কিসে তাঁহার পিতা-মাতা সুখে থাকিবেন, এ সমস্ত বিষয় জয়গোপাল উত্থাপন করিলেও, সে সম্বন্ধে জয়দুর্গা কিছুই বলিতেন না। পূর্ব্বে জয়গোপাল তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে সম্মান করিতেন, এবং অত্যন্ত বাহ্যিক ভক্তিও দেখাইতেন; তদ্ভিন্ন, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকেও স্নেহ করিতেন। কিন্তু জয়দুর্গা সে সমস্ত ভ্রান্তি বলিয়া যে অবধি তাঁহার স্বামীকে বুঝাইয়া দিয়াছেন, সেই অবধি সেই মন্ত্রের বশীভূত হইয়া তাঁহাদিগকে পরের ন্যায় দেখিতেছেন। সুখদা সর্ব্বদা নিকটে থাকেন না বলিয়া, তাঁহার উপর জয়গোপালের যে স্নেহ ছিল, তাহাও এক্ষণে যাইবার উপক্রম হইতেছে। জয়গোপালের ইষ্টক-নির্ম্মিত বাটী—বাটীতে পূজা-পার্ব্বণ হয়; কিন্তু জয়দুর্গার চক্ষে সে সমস্ত ভাল লাগে না। প্রতিবেশী স্ত্রীলোকেরা আসিয়া পূজা-পার্ব্বণের সময় অনেক কাজ-কর্ম্ম করিয়া দেয়, রন্ধনাদি করে; কিন্তু জয়দুর্গা, কাজ করা দূরে থাকুক, একটী মিষ্ট কথা কহিয়াও তাহাদিগকে কখনও উৎসাহিত করিতেন না। জয়গোপাল দেখিলেন,—দুর্গোৎসবের সময় বাটীর অন্যান্য লোক অর্থাৎ তাঁহার পিতা জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা, যেরূপ সমস্ত দিবস উপবাসী থাকিয়া, রাত্রে সকলের আহারাদি শেষ হইয়া গেলে এবং যখন আর কেহই অভুক্ত থাকিত না, তখন চারিটী যাহা পাইতেন তাহাই আহার করিতেন, এবং অদ্যাপিও সেইরূপ করিয়া থাকেন। কিন্তু জয়দুর্গার পরামর্শানুসারে তিনি আর সেরূপ না করিয়া দশটার পূর্ব্বেই আহারাদি করেন। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া তাঁহার যথার্থই দুঃখবোধ হইল। আর একটি কথা স্মরণ হওয়ায়, এই দুঃখ অধিকতর প্রবল হইয়া উঠিল। তিনি অনেকবার মহামায়াকে বলিতে শুনিয়াছেন যে, মহামায়া আপন স্বামীর বাটীকেই আপনার বাটী বলে, এবং আপনার স্বামীর গৃহে যাহা আছে তাহাই নিজের বলে; কিন্তু জয়দুর্গা সেরূপ বলে না। জয়দুর্গা স্বামীর সহিত কথোপকথনের সময় তাহার স্বামী-গৃহকে বলে, "তোমাদের বাড়ী", "তোমাদের ঘর", "তোমাদের লোকজন"; আর যখন "আমাদের বাড়ী", "আমাদের ঘর", "আমাদের লোকজন" বলে, তখন তাহার অর্থ, তাহার "পিতৃগৃহ", "পিতৃগৃহের লোকজন" ইত্যাদি। এই কথা হঠাৎ মনে হইয়া জয়গোপালের মনে হইল,—"আহা! যদু কি সুখী, আর আমি কি দুঃখী! যদু ডাল-ভাত খাইয়া যে সুখে থাকে, আমি পলান্ন-মিষ্টান্ন খাইয়াও সেরূপ সুখী হইলাম না! কোথায়ই বা আমার টাকা থাক্‌বে, আর কোথায়ই বা আমার বিষয়-আশয় থাক্‌বে, যখন এ চক্ষু জন্মের মত মুদিত করিতে হইবে। এজন্মে টাকায় আমার সুখ হইল না, বিষয়-আশয়েও না। কেনই বা হইবে? এ সমস্ত নির্জ্জীব পদার্থ!! জীবিত পদার্থ যিনি আমার

তিনিই আমার সুখে সুখী নন, আমার দুঃখে দুঃখী নন—আমার বাড়ী তাঁহার বাড়ী নয়, আমার বাপ-মা তাঁহার বাপ-মা নন! তাঁর আপন, কেবল টাকা ও অলঙ্কার! যথেষ্ট টাকা ও অলঙ্কার হইলেই তাঁহার সুখ হইল। আমি এই সমস্ত দিয়া যদি মরিয়া যাই, তাহাহইলেও তাঁহার কোনই দুঃখ নাই। না দিয়া মরিলেই কিঞ্চিৎ দুঃখ হইবার সম্ভাবনা।" তখন, আর একবার যদুর কথা ও মহামায়ার কথা মনে উদিত হওয়ায়, মনে মনে কহিলেন,—"যদু, তুমিই সুখী! তুমি বাহ্যিক রূপার বাটীতে তরকারী খাওনা বটে, কিন্তু তুমি যে বাটীতে তরকারী খাও, স্বর্ণ অপেক্ষাও তাহা মূল্যবান। তোমার যে ধন আছে, এ ধন কার আছে? তোমার স্ত্রী তোমাকে যেরূপ ভালবাসে, আমার স্ত্রী আমাকে সেরূপ বাসিলে, আমি মাটীর খুরীতে তরকারী পাইলেও সুবর্ণ-পাত্রে তরকারী খাইতেছি, মনে করিতাম। মহামায়া! তুমিই সুখী! তোমার অলঙ্কার ছিল না; কিন্তু বিনা অলঙ্কারে তোমার ন্যায় শোভা কার? তোমার অলঙ্কারে দরকার কি? শতদল পদ্মকে কি কেহ রং ফলাইয়া চিত্রিত করে? তুমি বিনা অলঙ্কারে গৃহ উজ্জ্বল করিতেছ। তোমার ন্যায় স্ত্রীকে অলঙ্কার দেওয়া, আর শতদল পদ্মকে চিত্রিত করা, সমান কথা। তুমি আমার কথা শুনিতেছ না; আমি যে তোমাকে ভক্তি-সহকারে সম্ভাষণ করিতেছি তাহাও জানিতে পারিতেছ না। জানিতে পারিলেও, তুমি লজ্জিতা ভিন্ন গর্ব্বিতা হইতে না। আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছি,—"মহামায়া, তুমি চিরসুখী হইয়া থাক।"

তখন জয়গোপাল পূর্ব্বের লিখিত বিষয়গুলি মনে মনে ভাবিতেছিলেন মাত্র। কিন্তু যখন কোন বিষয় আমাদিগের সম্পূর্ণ বিশ্বাসে পরিণত হয়, যখন কোন বিষয় একাগ্রচিত্তে ধ্যান করা যায়, তখন একরূপ বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত হয়। জয়গোপাল সেইরূপ সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া, আত্মবিস্মৃত হইয়া, বাক্যোচ্চারণ-পূর্ব্বক বলিয়া ফেলিয়াছিলেন,—"মহামায়া, তুমি চির-সুখী হইয়া থাক।" ঠিক এই সময় জয়দুর্গা স্বামীর অজ্ঞাতসারে সেই গৃহে প্রবেশ করিয়া, জয়গোপালের আশীর্ব্বাদ-বাক্য শ্রবণ করিয়া, কহিলেন,—"তথাস্তু; আর জয়দুর্গা মরে যাক্।"

পথিক নিঃশঙ্ক-চিত্তে চলিয়া যাইতে যাইতে পথিমধ্যে কালকূটে-ভরা কালসর্প দেখিয়াও যত চমকিত না হয়, জয়দুর্গার কথা শুনিয়া, জয়গোপাল তদপেক্ষা ভীত ও বিস্মিত হইয়া চক্ষু খুলিয়া দেখিলেন, সম্মুখে জয়দুর্গা; এবং তিনিই 'তথাস্তু' বলিয়াছেন। তখন জয়-

"গোপাল বুঝিলা মর্ম্মে
ঘাটি হৈলা এই কর্ম্মে।"

কিন্তু আর চারা নাই। যাহা হইবার, হইয়া গিয়াছে।

এইরূপ ঘটনা ঘটায় উভয় পক্ষেরই সুবিধা হইল। জয়গোপাল নানা স্থানে স্ত্রীকে অন্বেষণ করিয়া, কোন স্থানে তাঁহাকে না দেখিতে পাইয়া, রাগ করিয়া শয়ন করিয়া ছিলেন; এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাঁহার অদৃষ্টে যাহাই থাকুক, অদ্য জয়দুর্গা আসিলে তাঁহাকে যতদূর সাধ্য তিরস্কার করিবেন। জয়দুর্গাও জানিতে পারিয়াছিলেন যে, তিনি তিরস্কৃত হইবেন; কারণ, তাঁহার এতক্ষণ লুক্কাইত থাকা উচিত হয় নাই। এস্থানে পাঠকবর্গকে বলিয়া দেওয়া আবশ্যক যে, তিনি ছাদের উপর বসিয়া জয়গোপালের উদ্ভ্রান্ত-প্রেমস্বরূপ অবস্থিতি করতঃ তাঁহার ছটফটানি আগ্রহ-সহকারে উপভোগ করিতেছিলেন। জয়গোপালও কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন যে, তিনি অদ্য স্ত্রীকে যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করিবেন। কিন্তু মহামায়াকে আশীর্ব্বাদ করায় তাঁহার ক্রোধের বিষময় ফল মঙ্গলেচ্ছায় পর্য্যবশিত হইল; এবং জয়দুর্গার ভয়ও সেই আশীর্ব্বাদ-

সাহসে তিরোহিত হইয়া গেল। পরিশেষে এই বন্দোবস্ত হইল যে, অতি ত্বরায় জয়দুর্গা ও জয়গোপাল উভয়েই একত্র হইয়া জয়দুর্গার পিত্রালয়ে অভূতপূর্ব্ব জাঁকজমকে গমন করিয়া পল্লীগ্রাম-বাসীদিগকে চমৎকৃত ও বিমোহিত করিবেন, এবং মহামায়ার মনে হিংসাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিবেন। এ বন্দোবস্তের ফলও অতি সত্বরেই প্রকাশিত হইবে।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

শ্বশুর-জামাই।

আমি এ অধ্যায়ে আবার একটু পূর্ব্বের কথা বলিব। আমি কার্য্য-স্থানে যাইয়া যখন শুনিলাম, আমার চাকরি "এবলিস" হইয়াছে; তখন ভাবিলাম, এখানে বাসাভাড়া করিয়া থাকা আর পোশাইবে না। অথচ বাটী আসিবারও আর কোন দরকার ছিল না। তথাপি ভাবিলাম, যাত্রা-পরিবর্ত্তন না করিয়া আসিলে কোন স্থানেই কিছু সুবিধা করিতে পারিব না। এই ভাবিয়া, বাটী আসিয়াই দেখিলাম, মাতা-ঠাকুরাণী অপরাহ্ণে সূর্য্যের দিকে পিঠ করিয়া বসিয়া আছেন।

বাটী আসিয়া, মাতাকে তদবস্থ দেখিয়া ও গৃহে কোন সাড়া-শব্দ না শুনিয়া, অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। মাতাকে প্রণাম করিয়া যখন সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলাম, তখন মাতা মুখ তুলিয়া আমার দিকে তাকাইয়া কহিলেন,—"বাবা, সমস্ত মঙ্গল তো? তুমি এত শীঘ্র আস্‌বে, তা তো বলে যাও-নি? তোমার মুখ দেখে আমার কেমন ভয় হচ্চে! বলি সব ভাল তো?" আমি মাতাকে কি প্রকারে মিথ্যা কথা কহিব, তাহাই ভাবিতেছিলাম। সেইজন্যই আমার চিত্ত বিকলিত হইয়াছিল, এবং মুখমণ্ডল হৃদয়ের দর্পণস্বরূপ হওয়ায় মুখে সেই ভাব প্রতিভাত হইয়াছিল। হাস্যমুখে কহিলাম,—"মা, সমস্তই ভাল, সমস্তই মঙ্গল।" মাতা শুনিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন,—"এত করে বৌকে নিয়ে যেতে বারণ কল্লাম, কোন মতে শুন্‌লে না। এখন কেই বা চাট্টি রাঁদে-বাড়ে, কেই বা কি করে?"

আমি কহিলাম,—"কেন, বউ কোথায়?"

মাতা।—তাকে যে এইমাত্র নিয়ে গেল বল্লে,—উকিল বাবু রাত্রে আস্‌বেন্, জয়দুর্গা আস্‌বেন; মহামায়া না গেলে কেই বা চাট্টি রাঁধবে, কেই বা কিছু খেতে দেবে? বৌয়ের মার যেরূপ পীড়া, মরেন কি বাঁচেন তার ঠিক'নাই।

মাতাকে দেখিয়া, আমার চিত্ত প্রথমতঃ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইল। কুড়ি-বাইশ দিন-মাত্র আমি কর্ম্ম-স্থলে গিয়াছিলাম। এই কুড়ি-বাইশ দিনের মধ্যেই বোধ হইল, যেন তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা দশগুণ বৃদ্ধা হইয়া পড়িয়াছেন। অনন্তর, কি বিচেনায় মাতাকে এরূপ অবস্থায় দেখিয়া মহামায়াকে লইয়া গেল, আর মহামায়াই বা কিরূপে মাতাকে ফেলিয়া চলিয়া গেল? অপর কোন কথা না কহিয়া, আমি মাতাকে "এক্ষণেই আসিতেছি" বলিয়া বাটী হইতে প্রস্থান করিলাম। রাস্তায় যাইতে যাইতে পূর্ব্বাধ্যায়ে বিবৃত অনেক কথা শুনিতে পাইলাম। কিন্তু যত লিখিয়াছি, সে সমস্তই যে একদিনেই শুনিয়াছিলাম, তাহা নহে। সে সমস্ত কথা ক্রমে ক্রমে তিন চারি দিনে জানিতে পারিলাম।

আমার চাকরি যাইবার বিষয় যে যাহা বলিবার, তাহা বলিল। আমি অত্যন্ত ব্যস্ত আছি বলিয়া তাহাদিগের কথায় উত্তর দিবার জন্য কালবিলম্ব করিলাম না। দ্রুতপদে নদীর তীরে পৌঁছিলাম। দৈবের আনুকূল্যে নৌকাখানি আমাদিগের পারেই পাইলাম। নদী পার হইয়া পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আমার শ্বশুরালয়ে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, সদর-বাটীতে স্বয়ং আমার শ্বশুর জনকতক লোক লইয়া বাড়ী-ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিতেছেন। আমি গিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইবা-মাত্র শ্বশুর-মহাশয় কহিলেন,—"কেও, যদু নাকি?" আমি কহিলাম,—"আজ্ঞে!" তখন শ্বশুর-মহাশয় কহিলেন,—"সমস্ত মঙ্গল তো?" আমি "হাঁ সমস্ত মঙ্গল" বলিয়া যেমন নিজের দুরবস্থার বিষয় পরিচয় দিতে গেলাম, অমনি শ্বশুর-মহাশয় কহিলেন,—"ও সমস্ত কথা পূর্ব্বেই শুনা গিয়াছে। ও সম্বন্ধে তোমার সহিত আমার অনেক কথা আছে, সে সমস্ত কথা আহারান্তে আমরা দু'জনে বলাবলি করিব। আপাততঃ বাপু, আমি এক বিষম বিপদে পড়িয়াছি। অদ্যই সন্ধ্যার সময় উকীল বাবু ও জয়দুর্গা এ বাটীতে পদার্পণ করিবেন। কিন্তু বাটীতে এমন একজন হিন্দু চাকর নাই যে, কিঞ্চিৎ জল-খাবার আনিয়া দেয়। জয়গোপাল কেমন অভিমানী, তা ত তুমি বিলক্ষণ জান। সে বিষয়ে আর আমি তোমাকে নূতন কি বল্‌বো? মহামায়াকে বিস্তর কষ্টে রাত্রে চাট্টি অন্ন-পাক ক'রে দেবার জন্য আনয়ন করা হয়েছে। এক্ষণে তুমি যদি বাজার থেকে কিঞ্চিৎ খাবার এনে দেও, তবে আমার প্রতি বিশেষ উপকার করা হয়।"

শ্বশুর-মহাশয়ের কথা শুনিয়া রাগে আমার আপাদ-মস্তক ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। কহিলাম,—"আমার সরকারী চাকরি গিয়েছে বলে কি আমি আপনার খানসামা হয়ে থাক্‌বো? আর আমার স্ত্রী আপনার বাটীর রাঁদুনী হয়ে থাক্‌বে? আমি অনেক দিন থেকে মনে কর্‌চি, আপনাকে এই বিষয় কিঞ্চিৎ বোল্‌বো; কিন্তু আপনার কন্যার খাতিরে বলি নাই। আজ আমি আর থাক্‌তে পাচ্চি-নে। যেদিন হাতে পৈতা জড়ায়ে আমার হাত ধরে আপনার জাত-রক্ষা কর্‌তে বলে-

ছিলেন, যেদিনের কথা কি মনে পড়ে? আপনার বড়-কন্যা কি জলে ভেসে এসেছিল; না, আমি আপনার খোসামোদ করে তাকে বিবাহ করেছিলাম! কে কাকে খোসামোদ করেছিল? আপনি পদে পদে আমাকে অপমান করে আসচেন, কেন? আমার অপরাধ কি? আমি অধিক টাকা রোজগার কোর্‌তে পারি না, এই? আপনি নিজে কত রোজগার করে থাকেন? আপনার চাইতে তো আমি অধিক রোজগার করে থাকি? তা হ'লেও তো অন্ততঃ আমি আপনার চাইতে বড়! তবে কেন আপনি আমাকে অপমান করেন? আপনি যদি ভাল চান, তবে এই মুহূর্ত্তেই আমার স্ত্রীকে পাঠাইয়া দেন। আমি কি আপনার চাকর যে, আমি আপনার প্রিয়তম জামাইয়ের জন্য জলখাবার আন্‌তে যাব? আর মহামায়া কি আপনার দাসী যে, সে আপনার প্রিয়তমা কন্যার জন্য রন্ধন কর্‌বে? দেন, তা'কে এখনই পাঠিয়ে দেন। ভাল বিনা-বেতনের দাস-দাসী পেয়েছেন! আমি বাড়ীর ভিতর চল্লাম; দেখি, মহামায়াই বা কি আক্কেলে আমার কাহিল মাকে একলা ফেলে আপনার দাসীপনা কত্তে এল?" এই কথা বলিয়া আমি বাটীর ভিতর চলিলাম। দেখিলাম, আমার কথা শুনিয়া শ্বশুর-মহাশয়ের মুখ ম্লান হইয়া গেল। তিনি আর কোন উত্তর দিতে পারিলেন না, ও উত্তর দিবার চেষ্টাও করিলেন না।

বাটীর অভ্যন্তরে গিয়া মহামায়াকে একাকী পাইলাম। কিন্তু সে দিবস আর পাঁচ শত লোকের মধ্যে পাইলেও তাহার সহিত কথা কহিতে আমার লজ্জা হইত না। মহামায়া দূর হইতে আমার চেহারা দেখিয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল; এবং আমার রাগের কারণ বুঝিতে পারিয়া, আমি নিকটবর্ত্তী হইবামাত্রই, দৌড়িয়া আসিয়া গলায় আঁচল দিয়া,

আমার পায়ে পড়িল। আমি তখন একটী-মাত্রও কথা কহি নাই। আমার পায়ে ধরিয়া কহিল,—"আমার অপরাধ হয়েছে, আমায় মাপ কর। পীড়িত শাশুড়ীকে ফেলে বাপের বাড়ী এসেছি, তাই তুমি রাগ করেচ; কিন্তু আমার কথা শুন। শুনে, মারতে হয় মের, আর কাটতে হয় কেট। আমি তোমার ছায়া-মাত্র বই নই। তুমি যেখানে, আমিও সেই-খানে; তুমি যখন যেমন, আমিও তেমনি। তুমি তোমার মাতাকে ভালবাস ও ভক্তি কর; কিন্তু আমি যখন তোমার ছায়া বই নই, তখন তিনি আমারও মা। মনে করিও না যে, তুমি আমার চাইতে আমার শাশুড়ীকে ভালবাস। মনের কথা দেখাইবার যো নাই; বলিলে, লোকে বিশ্বাস করতেও পারে, নাও পারে। এ পৃথিবীতে স্ত্রী-লোকের বাপ-মা-পুত্র-কন্যা সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতর, গুরুতর ও প্রিয়তর দ্রব্য স্বামী। আমি সেই স্বামীর পায়ে হাত দিয়া বলিতেছি, যদি লোকে গিয়া আমাকে না বলিত যে, আমার মাতা মরেন কি বাঁচেন এরূপ অবস্থাপন্ন হইয়াছেন, তাহাহইলে আমি কখনই এখানে আসিতাম না। এই দেখ, আমি যে কাপড় পরিয়া ছিলাম, সেই কাপড় পরিয়াই আসিয়াছি। এখানি ছাড়িয়া আর একখানি পরিষ্কার পরিবার অবকাশও হয় নাই। আসিয়া দেখিলাম, মাতা ভালই আছেন। আমাকে যাহা বলিয়াছিল,সে সমস্তই মিথ্যা। সেইজন্য আমি পুনরায় বাড়ী যাইবার,বন্দোবস্ত করিতেছিলাম। এমন সময় শুনলাম, তুমি এসেছ; তাই ভাবলাম,দুজনে একত্র হয়ে যাব। আর, সেইজন্যই আমার দেরী হয়েছে। আমি তোমার পা ছুঁয়ে বলচি, আমি এখনও আধ-ঘণ্টাও এখানে আসি নাই।" এই কথা বলিবার সময় মহামায়া কাঁদিতেছিল। কথা শেষ করিয়া, বর্ষাকালের মেঘের ন্যায় ঝর ঝর নেত্রবারি বর্ষণ করিতে লাগিল।

আমি কহিলাম,—"মহামায়া, তোমার কথা আমি কখনই অবিশ্বাস করি নাই। তোমার দিব্বি করবার দরকার কি? এখন চল, আমার সঙ্গে চল। দু'জনে একত্র হয়ে যাই। আমারও অনেক কথা বলবার আছে। হয় রাস্তায়, নয় বাড়ী গিয়ে বোল্‌বো।"

মহামায়া কহিল,—"আচ্ছা, তুমি একটু ওদিকে যাও; আমি বাবাকে বলি।"

এই কথা শুনিয়া,আমি বাহির্বাটীতে চলিয়া আসিলাম। আসিয়া, শ্বশুর-মহাশয়ের একটী কথা শুনিতে পাইলাম। তিনি মজুরদিগের সহিত আমার সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন; এবং বোধ হয়, আমার কর্ম্মচ্যুতি-বিষয়েই সে কথা-বার্ত্তা হইতেছিল। আমি উপস্থিত হইয়া এইমাত্র শুনিলাম যে,—"বিষের সঙ্গে খোঁজ নাই তার কুলপানা চক্র।" শুনিয়াই, আমি জানিতে পারিলাম, আমারি কথা হইতেছিল। কারণ, আমি এতদিন শ্বশুর-মহাশয়কে কোন কর্কশ কথা কহি নাই; অদ্য রাগ-সম্বরণ করিতে না পারিয়া কর্কশ কথা বাহির হইয়া পড়িয়াছিল।

আমি যখন বহির্ব্বাটী আসিলাম, শ্বশুর-মহাশয় অন্যদিকে "চাহিয়া রহিলেন; যেন আমাকে দেখিতে পাইলেন না। আমি তথায় মিনিট দুই না থাকিতে থাকিতে দাসী আসিয়া শ্বশুর-মহাশয়কে কহিল,—"ওগো, তোমাকে বাড়ীর ভিতরে ডাকছে।" শ্বশুর-মহাশয় দাসীর দিকে চাহিয়া দেখিবেন, এমন সময় পল্লিগ্রামে অশ্রুতপূর্ব্ব এক শব্দ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। আমিও সেই শব্দ শুনিলাম। শব্দ শুনিয়া আমার বোধ হইল, যেন একখানি ঘোড়ার গাড়ি আসিতেছে। শ্বশুর-মহাশয় একেবারে স্তব্ধ। দুই এক মিনিট পরেই কোদালি-হস্তে দুই জন লোক দৃষ্টিগোচর হইল। তাহার কিঞ্চিৎ পরেই একখানি ঘোড়ার গাড়ি দেখিতে পাওয়া গেল। তদ্দর্শনে শ্বশুর-মহাশয় সম্মুখীন মজুরদিগকে কহিলেন,—

"একখানা ঘোড়-গাড়ি আস্‌চে; বোধ হয়, মেজেষ্টর সাহেব আস্‌চেন। ডাকো, ডাকো, যে যেখানে আছে ডাকো; সকলে এসে দেখে যাক।"

শ্বশুর-মহাশয় মনে করিয়াছিলেন, গাড়ি-খানি থানায় যাইবে; কিন্তু যখন দেখিলেন, রাস্তার মোড় ঘুরিয়া তাঁহার বাটির দিকে আসিতে লাগিল, তখন তাঁহার চক্ষু কপালে উঠিল; ওষ্ঠাধর শুষ্ক ও কম্পিত হইতে লাগিল। কি করিবেন ভাবিয়া না পাইয়া, বাটীর অভ্যন্তরে পলাইবার চেষ্টা করিয়া, দ্রুতপদে চারি পাঁচ হাত গিয়া ধরণীতলে জ্ঞানশূন্যপ্রায় হইয়া পতিত হইলেন। মজুরেরা যে যেদিকে পারিল পলায়ন করিল। যে দাসী আসিয়া শ্বশুর-মহাশয়কে বাটীর ভিতর যাইবার সম্বাদ দিয়া-ছিল, সে তখন অনেকদূর যাইতে পারে নাই। শ্বশুর-মহাশয়ের ভূতলে পতন শব্দ শুনিয়া চীৎ-কার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল,—"ওমা আমাদের কি হল? কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ!!" সত্য কথা বলিতে দোষ কি, আমারও চিত্তটা চঞ্চল হইয়া উঠিল ও বুক ধক্‌ধক্ করিতে লাগিল। ভাবিলাম, যদি মেজেষ্টর সাহেবই আসিবেন, তবে সম্মুখে দুই জন কোদালি-স্কন্ধে বলবান কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘ-কলেবর পুরুষ কেন আসিবে? কিন্তু দুই এক মিনিট পরেই তাহার মর্ম্ম জানা গেল। শ্বশুর-মহাশয়ের বাটী গ্রামের এক প্রান্ত-ভাগে অবস্থিত; সুতরাং বহির্ব্বাটীর সম্মুখেই একটী মাঠ, এবং ঐ মাঠে ধান্য প্রভৃতি শস্য জন্মিত। এই মাঠটিও অন্যান্য মাঠের ন্যায় চতুষ্পার্শ্বে আইলের দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চতুষ্কোণ ক্ষেত্রে বিভক্ত। ঐ সমস্ত ক্ষেত্রের মধ্য দিয়া পদব্রজে গমনাগমনের রাস্তা আছে। এইরূপ এক ক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া গেলে গ্রামের সদর রাস্তায় যাওয়া যায়। সেই সদর রাস্তা ত্যাগ করিয়া শ্বশুর মহাশয়ের বাটী গাড়িতে আসিতে হইলে,কোদালি দ্বারা আইল গুলি কাটিয়া রাস্তা না প্রস্তুত করিলে, আসা যায় না। প্রথম আইলের সম্মুখীন হইবামাত্র কোদালি-বাহকদ্বয় ঐ আইল কাটিতে আরম্ভ করিল। তদ্দর্শনে, কোদালি ও তদ্বাহকদ্বয়ের প্রয়োজন বুঝা গেল। অতঃপর, আইল কাটিয়া রাস্তা করিয়া গাড়ি-আরোহণে কাহার আসিবার সম্ভাবনা? পুরুষ হইলে, হাজার ধনী হউক, সদর রাস্তা ছাড়িয়া যে কয়েক রসী পদব্রজে আসিলে শ্বশুর-মহাশয়ের বাটী পৌঁছান যায়, তাহা অনায়াসেই চলিয়া আসিতে পারিত। তাহা না করিয়া যখন আইল কাটিতেছে দেখিলাম, তখন ভাবিলাম, এ গাড়ির ভিতর অবশ্যই স্ত্রীলোক আছে, তাহার সন্দেহ নাই। আন্দাজ ১৫ মিনিট পরে, আইল কাটিয়া রাস্তা করিয়া, ঐ রাস্তা দিয়া গাড়িখানি আসিয়া শ্বশুর-মহাশয়ের বহিঃপ্রাঙ্গনে সংলগ্ন হইল। জয়গোপাল গাড়ির দরজা খুলিয়া প্রথমতঃ ভূমিতলে হাস্য-বদনে অবতীর্ণ হইলেন। আমায় দেখিয়া বোধ হইল, যেন কলম্বস্ জাহাজ হইতে নামিয়া নবাবিষ্কৃত মার্কিন-মুলুকে পদার্পণ করিলেন। গাড়ির অপর দিকের দরজা খুলিয়া শ্রীমতী দাসী ঠাকুরাণী রঙ্গভূমিতে পদার্পণ করিলেন। নান্দি-পাঠের নট-নটী উভয়েই একত্র হইল। নীল সলিলে প্রস্ফুটিত পঙ্কজদ্বয়ের ন্যায় উভয়েরই মন প্রফুল্ল। দুঃখের বিষয় এই যে, নট রঙ্গভূমিতে প্রবেশমাত্র "গুণীজন"-পরিপূরিত সভা দেখিতে পায়। জয়গোপালও তাহাই দেখিতে পাইবেন, মনে করিয়াছিলেন। ভাবিয়াছিলেন, তাঁহার অশ্ব-শকট দেখিতে পাইয়া, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সক-লেই তাঁহাদিগকে দেখিতে আসিবে। কিন্তু ভয়ে যে তাহারা পলায়ন করিবে, সে কথা তাঁহার চিত্তে স্থান পায় নাই। সুতরাং একাকী আমাকে মাত্র দেখিয়া জয়গোপালের প্রফুল্ল-মুখকমল অবিলম্বে শুষ্ক হইয়া গেল। দাসী ঠাকুরাণীর অবস্থাও সেইরূপ হইল। উভয়েরই

হরিষে বিষাদ। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা হরিষে বিষাদ জয়দুর্গার। তিনি পূর্ব্বেই লিখিয়াছেন, যেন একজন লোক আনিয়া রাখা হয়—যে রন্ধন করিয়া সকলকে খাওয়াইতে পারে। এই ভাবিয়া এক্কথা লিখিয়াছিলেন যে, অবশ্যই মহামায়া আনীত হইবেন; আর, যখন সকলে আসিয়া, গাড়িতে কে আসিল দেখিতে সমবেত হইবে, তন্মধ্যে মহামায়াও থাকিবেন। সগর্ব্বে কম্পাউণ্ডার-ভার্য্যাকে দেখাইবেন, উকীলের ভার্য্যার সহিত সামান্য কম্পাউণ্ডারের ভার্য্যার কত তফাৎ! কিন্তু হায়! সে আশা ফলবতী হইল না। কোথায় পাড়ার লোকজনে পরিবেষ্টিত হইয়া গাড়ি হইতে নামিবেন, তাহা না হইয়া নিজ-দাসীর হস্ত ধরিয়া গাড়ি হইতে অবতরণ করিতে হইল।

যখন সকলে দেখিল যে,অশ্বারোহীরা মেজিষ্ট্রেটও নন, কালেক্টরও নন; তখন এক এক করিয়া আপন-আপন লুক্কায়িত স্থান হইতে সকলেই বাহির হইতে লাগিল। শ্বশুর-মহাশয় কহিলেন, তিনি গাড়ি দেখিবার জন্য সকলকে ডাকিয়া আনিতে গিয়াছিলেন, এবং দ্রুতপদে গমন করিতেছিলেন বলিয়া পড়িয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তখনও তিনি মাথার তেল-জল শুষ্ক করিতে পারেন নাই। এইরূপ এক এক জন এক এক প্রকার কথা কহিতে লাগিল। আমিই কেবল নিঃশব্দে দাঁড়াইয়াছিলাম। কারণ,আমার চাকরী যাওয়ায় সকলেই আমাকে এরূপ হেয় জ্ঞান করিল যে, কেহই আমার সহিত কথা কহিল না। আমিও ভাবিলাম, আমি কথা কহিলে কেহ শুনিবে না; এজন্য চুপ করিয়া রহিলাম।

এদিকে জয়গোপাল ও জয়দুর্গাকে লইয়া শ্বশুর-মহাশয় ও শাশুড়ী-ঠাকুরাণী ব্যস্ত হইলেন। আমরাও আর অধিকক্ষণ তথায় থাকা অনাবশ্যক ভাবিয়া, শাশুড়ী-ঠাকুরাণীকে "তবে আমরা আসি" বলিয়া বহিষ্ক্রান্ত হইয়া অনতিবিলম্বে বাটী আসিয়া পৌঁছিলাম।

সন্ন্যাসীর জীবনী।

তৃতীয় অধ্যায়।

রজনী দ্বাদশ ঘটিকার সময় কে আমার গৃহে মৃদুপদে প্রবেশ করিল। তন্দ্রাঘোরে ভাবিলাম,গগন। খাট বড়, শয্যা প্রশস্ত, পাশে অনেক স্থান রহিয়াছে; সুতরাং সরিয়া যাইবার প্রয়োজন হইল না। কিন্তু আশ্চর্য্য, মুহূর্ত্ত মধ্যে কে আমার পাশে শুইয়া আমাকে চাপিয়া ধরিল। এ তো গগনের শরীর নহে! কোমল বাহু—কোমল শরীর—সে কোমলতায় আবার পারশ্যের অটো মাখা, একি!

বিস্মিত হইয়া ফিরিয়া চাহিলাম। চারি চক্ষে মিলন হইল; নীরবে উভয়ে উভয়কে দেখিলাম। উভয়েই বিস্মিত হইলাম—উভয়েই ভাবিলাম,—"এ কে?" মোহ ভাঙ্গিল। বিছানায় উঠিয়া বসিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম,—"তুমি কে?" রমণী আমার মুখপানে চাহিয়া,—বোধ হয় গগন অপেক্ষায় আমার সুন্দর মুখের প্রশংসা বা সমালোচনা করিতেছিল; আমার প্রশ্ন শুনিয়া, লজ্জায় মাথা নত করিল—উত্তর দিল না। আমি তাহাকে লজ্জিতা দেখিয়া, বলিলাম,—"কি—গগনকে খুঁজতে এসেছ?"

"হাঁ!"

"তুমি তার কে?"

নিরুত্তর

"এত রাতে গগনকে কেন?"

একটু হাসি। এ হাসির অর্থ হয়ত সরল লোক বুঝিতে পারিবেন না। কেন-না, অর্দ্ধরাত্রে অভিসারের শয্যা করিয়া—মদনের সকল বর্ম্ম-চর্ম্মে আবৃতা হইয়া—গগনের স্বরে গগন-ভ্রমে যে আমাকে নারকীয় যুদ্ধে 'চ্যালেঞ্জ' করিল, আমি না তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"এত রাতে গগনকে কেন?" আমার মত বোকা কে? আমি বড় বোকা, তাই রমণী হাসিয়াছিল।

লজ্জা, নিরুত্তর, নীরব হাসি—এ অবস্থায় দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না; সুতরাং শীঘ্রই পরস্পর পরিচিত হইলাম। রমণীর বালিকা-বয়েস সবে উত্তীর্ণ হইবার নিকটে দাঁড়াইয়াছে। বর্ণ—শ্বেতপদ্মের মত; নাক-মুখ-চক্ষু—বিলাস-মণ্ডিত, অতি সুন্দর, মনোহর এবং প্রশংসা-যোগ্য। ধরণ-ধারণ,রকম-সকম, ভাব-ভঙ্গি—সকলই ইংরেজ-লাবণ্য-মিশ্রিত—সুখকর—দেখিবার ও দেখাইবার যোগ্য। যে ক্ষমতায় 'আসমানী' ও 'গিরিজায়ার' চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, যদি সেই ক্ষমতা আমার থাকিত, তবে সহজে বুঝিতে পারিতে যে, যাহার কথা কহিতেছি, সে কিরূপ সুন্দরী ও তাহার শরীরে কত লাবণ্য—আর তাহার কথায় কত (এলোকোয়েন্স) মাধুরী!

এত সুশিক্ষিতা রমণী—আমি পূর্ব্বে কখনও দেখি নাই। যে ইংরেজী কহিতে পারে, সুন্দর কবিতা লিখিতে পারে, এক্ মুহূর্ত্তে মলেয়ার, রিমনীয় ও সেক্স্পিয়রের সকল শ্রেষ্ঠ নায়িকার চরিত্র অভিনয় করিতে পারে, যে তোমাকে নরকের পথে নন্দন-কাননে লইয়া যাইতে স্বীকার করায়, যাহার মধুর স্বরে ধর্ম্মের পথ কণ্টকিত হয় ও পাপের পথে কমল ফুটিয়া রাঙ্গা করে—তাহাকে সুশিক্ষিতা বলিব না ত কি বলিব? আলাপ-পরিচয়ের পরে রমণী আমাকে বলিল,—তাহার বয়েস ৫ বৎসর; সে স্কুলে পড়ে; গগন তাহার পিশ্‌তাত ভাই—সে অত রাতে তাহার কাছে রসায়ণ-শাস্ত্র শিখিতে আসে। বিবাহ হয় নাই—বিবাহে মতিও নাই—বালিকা-বিবাহে তাহার পিতা অসম্মত। তাহাকে সকলে জুঁই বলিয়া ডাকে। কথাগুলি—সরলা বালিকার—আমিও সরল ভাবেই লইয়াছিলাম। কিন্তু পৃথিবীর সকল লোকই মূর্খ—কেন-না, এ কাহিনী শুনিয়া, গগন যে এ জুঁইটীর ঘ্রাণ নেয় না, একথা কখনও কেহ বিশ্বাস করিবে না।

দুইটা বাজিলে জুঁই চলিয়া গেল। যাইবার সময় বলিল,—"আমাদের বন্ধুভাব—ভ্রাতৃ এবং ভগিনী-ভাব—গোপন থাকিবে; গগন যেন টের না পায়! টের পাইলে, সে তোমার ও তাহার নিজ-মুখের সৌন্দর্য্যের তুলনা করিবে—হয়ত পরাভব মানিবে—হয়ত মনে করিবে,—আমিও এই দুই মুখের তুলনা করিয়াছি—তুলনায় সে মুখের পরাভব—এমুখের জয় অনুমান করিয়া লইয়াছি।"

জুঁই চলিয়া যাইলে, আমি দেখিলাম,—সে বালিকা বটে; কিন্তু তাহার পাণ্ডিত্য-পূর্ণ এক একটী কথার কতই গূঢ় ভাব! চঞ্চল হইলাম, ভাবিতে লাগিলাম,—'তুলনায় গগনের মুখ পরাভব মানিবে'—তবে কি ইহার অর্থ—গগনের চেয়ে আমার মুখ বেশী সুন্দর—আর সেইজন্য জুঁই গগন চেয়ে আমায় বেশী ভালবাসিবে! কিন্তু একথা ত একবারও তখন ভাবি নাই যে, আমা হ'তেও তো আরো সুন্দর মুখ আছে বা জুঁই-জাতীয়া রমণীরা এইরূপ উত্তরোত্তর সৌন্দর্য্যের এক স্তর হইতে আর এক স্তরে স্বতঃই আরোহণ করিয়া থাকে। যাহাহউক, ভাবিতে ভাবিতে ক্লান্ত হইয়া অবশেষে ঘুমাইয়া পড়িলাম। কিন্তু এ ইন্দ্রজালে ঘুমাইলেও নিস্কৃতি নাই! যাহা জাগ্রতে, তাহাই নিদ্রাতে—আবার দেখিতে লাগিলাম।

পরদিন উঠিতে বেলা হইল। জাগিয়া দেখি, গগন আসিয়াছে। তাহার নিকট দুই পেয়ালা চা। আমি প্রাতকৃত্য সমাপন করিয়া গগনের সঙ্গে চা-পান করিতেছি, এমন সময় একটী কুমারী একখানি গণিতের পুঁথি হাতে করিয়া গগনের নিকট উপস্থিত হইল। গগন তাহাকে ইংরেজি-প্রথানুসারে আমার সহিত পরিচয় করিয়া দিল। কুমারী কে—বুঝিয়াছ ত—সেই জুঁই। জুঁই সেমিজ ও জ্যাকেট পরিয়াছে—কানে দুল দিয়াছে—চারু মুখে (রস) পাউডর মাখিয়া বাহার দিয়াছে—সাধে কি দেশের

ছেলে-ছোকরা ও আমার মত অর্দ্ধশিক্ষিত যুবাদের মাথা ঘুরিয়া যায়! কিন্তু এদোষ কাহার? —ছুঁড়িদের না ছোঁড়াদের? আমার বিবেচনায় দোষ কাহারও নহে—দোষ উনবিংশ শতাব্দীর—দোষ কুপিডের (Cupid)। মদনের নহে—মদনের শাসন ছিল ভাল—যেদিন হইতে শ্বেতদ্বীপ হইতে 'কুপিড' আসিয়া তাহাকে সিংহাসন-চ্যুত করিয়াছে, সেইদিন হইতেই ছুঁড়ি-ছোঁড়া-গুলোর নূতন বাহার নূতন দোষ ধরিয়াছে। তুমি বাহারকে 'ফেসিয়ান' ও দোষকে (এন্‌লাইটমেণ্ট) গুণ বলিতে পার; কিন্তু আমি দেখিয়াছি, ফেসিয়ানে এন্‌লাইট্‌মেণ্ট মিশ্রিত হইলে বড় নেশা—ওয়াইনে আলকোহল বা আল্‌কোহলে মরফিয়া যাহা, তাই। ইহার শ্রাদ্ধ গড়ায় ভাল। গড়ায় অনেক দূর।

যাহা হউক, জুঁইর সঙ্গে পরিচয় হইয়া আমার নূতন বিপদের সূত্রপাত হইল। জুঁই এখন আমাকেই বেশী ভাল-বাসিতে লাগিল; গগনের প্রতি অনুরাগ ক্রমে কমিয়া যাইতে লাগিল। গগনের হিংসা হইল; গগন আর আমাকে ভাল-বাসে না—বিষ-নয়নে দেখে। কিন্তু বিষ-নয়নে দেখিলে কি হইবে?—এখন আমাকে আর তাড়াইবার তাহার সাধ্য নাই! আমি জুঁইর পিতার সহিত পরিচিত হইয়াছি, মাতার সহিত পরিচিত হইয়াছি—তাঁহারাও আমাকে স্নেহ করেন; আর জুঁই—তাহার ত কথাই নাই! জুঁইর একটী ছোট ভগ্নী ছিল—তাহার নাম মল্লিকা—বয়েস দশ বৎসর। তাহাকে আমি পড়াই; সুতরাং টাকা বা পরিধেয় প্রভৃতির জন্য চিন্তা করিতে হয় না।

একদিন হঠাৎ আমাদের বাসায় চুরি হইল—কর্ত্তার (জুঁইর পিতাকে বাসার সকলে কর্ত্তা বলে) ঘড়ি-চেন পাওয়া যায় না! গগন চুরির অপবাদ আমারই প্রতি আরোপ করিল। কিন্তু জুঁইর কৃপায় সে কথা কেহ বিশ্বাস করিল না। চুরির বিষয়ে পুলিশে সংবা দেওয়া হইয়াছিল—এক মাস পরে পুলি ঘড়িচেন শুদ্ধ চোর ধরিয়া আনিল। চোর এক ভদ্রলোক। তিনি বলিলেন, তিনি ঐ দ্রব্য বহুবাজারের একজন পোদ্দারের নিক কিনিয়াছেন। পোদ্দার বলিল, সে কালীঘাটে একজন সেকরার নিকট কিনিয়াছে। সেক বলিল, গগন বাবুর নিকট কিনিয়াছে। অ শেষে গগনই চোর হইল। কর্ত্তা আমার না চুরির অপবাদ দেওয়াতে গগনের উপর বড় ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং এই ঘটনায় আমার প্রতি তাঁহার স্নেহ আরও বেশী হইল। গগন বিন বাধায় জেলে গেল। মামা হইয়া নিজে ভাগিনাকে জেলে দেওয়া আমি এই প্রথ দেখিলাম; এবং ভাবিয়া, শিহরিলাম।

জুঁইর মাতার একটী পীড়া ছিল। রো বারটা হইতে তিন-চারিটা পর্য্যন্ত এ পীড় থাকে—কেবল রবিবার ও অন্যান্য আপিস বন্ধের দিন হয় না। এ পীড়া আজকা অনেক ভদ্র-পরিবারেই সংক্রামক হই দাঁড়াইয়াছে। ইহার নাম হিষ্টিরিয়া। জুঁই মাতার বয়েস ৩২ বৎসর—দেখিতে আর কম বয়েস বলিয়া বোধ হয়, এবং জুঁই অপে ক্ষায়ও রূপবতী। বাঙ্গালা বেশ জানে ইংরেজী লেখা-পড়ার জ্ঞান সামান্য। কি সাজ-পোষাক ও ধরণ-ধারণ দেখিলে পা বিবি বলিয়া বোধ হয়। আমার চক্ষে ওর সাজ-পোষাক ও ওরূপ চাল-চলন সভ্যত লক্ষণ ও ভাল বলিয়া বোধ হইত। কর্ত্তৃঠা রাণীর পীড়ার জন্য প্রায়ই একজন চিকিৎস সাড়ে বার কি একটার সময় আসিয়া আড় কি তিনটার সময় চলিয়া যান। চিকিৎসকে বয়েস চল্লিশ পার হইয়াছে; শরীর সবল প্রায়-স্থূল, বর্ণ শ্যাম; চক্ষে চশমা; অতি দী শ্মশ্রু। পোষাক থান-ধুতি, থানের চাদ পিরাণ, চটী পায়। সকলেই তাঁহাকে ধার্ম্মিক

শয় বলিয়া জানে—আমারও তাঁহার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা। আমি অনেক দিন পরে খিলাম যে, ডাক্তার বাবু যেদিন যত শীঘ্র ম, কর্ত্তৃঠাকুরাণীর ব্যারাম সেদিন তত শীঘ্র ল হয়। আমার ইহাতেও সন্দেহ হইল বরং ডাক্তার বাবুর ও তাঁহার ঔষধের প্রতি রও শ্রদ্ধা বাড়িল। আর একটী কথা, বাড়ীর গাড়ী কিম্বা লোক না যাইলে ডাক্তার বাবু সেন না।

আমার আজিও বেশ স্মরণ আছে—এক ন ঠিক এগারটার সময়—জুঁই-মল্লিকা স্কুলে, র্ত্তা আপিসে, পাচক-ভৃত্যগণ স্নান-আহারে স্ত আছে—কর্ত্তৃঠাকুরাণী আমার (গগনের) রে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আমি কেবল হইয়া আসিয়া বসিয়াছিলাম—সম্ভ্রম-সহকারে ড়াইলাম। কর্ত্তৃঠাকুরাণী হাসিয়া বলিলেন,—"তুমি ঘরের ছেলে, অত সম্মানের য়োজন কি?" আমি মাথা হেঁট করিয়া চুপ রিয়া রহিলাম। তিনি একটু অগ্রসর হইয়া স্বরে বলিলেন,—"চুলগুলি চিরুণী দিয়ে টু গুচিয়ে রাখ্‌তে নেই কি?" আমি কিছু লাম না। তিনি ডেস্‌কের উপর হইতে টী ব্রস লইয়া আমার চুলগুলি ভাল রিয়া দিলেন—দিয়া বলিলেন,—"আয়নায় দেখ দেখি, এখন কেমন হইল।" আমার গা কাঁপিতে লাগিল—লজ্জা করিতে লাগিল; তথাপি নীরবে রহিলাম। তিনি আমার নাম রিয়া আবার বলিলেন,—"দেখ, আমার বেয়ারাম হ'লে তুমি আমার কাছে থেক। আমি অজ্ঞান হ'য়ে পড়ি—তখন চাকরেরা আমার কাছে থাক্‌বে, সেটা ভাল নয়—তুমি বুঝ্‌তে পেরেছ?" আমি সরল ও বিশুদ্ধভাবে তাঁহার কথা গ্রহণ করিয়া স্বীকৃত হইলাম। ঠাকুরাণী আবার বলিলেন,—"এইত এখনি আমার মাথা ঘূর্‌চে! আজ বোধ হয়, বারটার আগেই আমার অসুখ হবে। তুমি আর একটু পরে এস—আমি যাই, শুইগে!" আমি তাঁহার মুখপানে চাহিলাম। দেখিলাম—মুখ রাঙা হইয়াছে—চক্ষু জ্যোতিঃপূর্ণ হইয়াছে—তাঁহার শরীর যেন মৃদুমন্দ কম্পিত হইতেছে। ভাবিলাম,—এই বুঝি পীড়ার পূর্ব্ব-লক্ষণ। মনে তাঁহার জন্য দুঃখ হইল। তিনি একটু মৃদু হাসিয়া চলিয়া গেলেন।

মেয়ে ঠগ।

প্রায় ত্রিশ বৎসরের কথা বলিতেছি—সেই সময় আমি কোন বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে আলিগড়ে অবস্থান করিতেছিলাম। সেই সময়ে পশ্চিমে ঠগীর বড় উৎপাত। বিদেশে যাইতে হইলে সকলেরই মুখ শুষ্ক হইয়া থাকে; কেহ কখন একাকী পথ চলিত না, দুই চারি জন প্রতিবেশী সঙ্গে না লইয়া দূর-দেশেও যাইত না; এবং সাধ্য-মতে মাঠের নির্জ্জন পথ পরিত্যাগ করিয়া সদর রাস্তায় কেবল দিবা-ভাগে সকলে পথ চলিত।

ঠগ সহজে চিনিবার যো নাই! তুমিও পান্থ, রাস্তার মধ্যে তোমার আর এক সহযাত্রী জুটিল—তাহারও পাথিকের বেশ! তুমি তাহার গন্তব্য-স্থান জিজ্ঞাসা করিলে—তাহার সহিত আলাপ করিয়া লইলে—একাকী ছিলে দুই জন হইলে—ভাবিয়া, হয়ত মনে সাহস বাঁধিলে—তাহার সরলতাময় কথোপকথনে মুগ্ধ হইয়া মনের অনেক কথা অকপটে প্রকাশ করিয়া বলিলে—শেষ হয়ত সেই ছদ্মবেশী পথিকের হাতেই তোমার প্রাণ গেল।

হয়ত তুমি মধ্যবিত্ত লোক, একাকী হাঁটিয়া পথ চলিতেছ—পথিমধ্যে একখানি 'বয়েল' আসিয়া দেখা দিল। 'বয়েলের' সঙ্গে অনেক লোক-জন; চালককে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলে, কোন বড়-লোক অমুক যায়গায় যাইতেছে। তুমি পথভ্রান্ত ও ভয়ত্রস্ত হইয়াছ; সুতরাং চালককে বলিলে,—"ভাই, তোমায়

কিছু দিব, আমায় গাড়িতে তুলিয়া লও।" সে বলিল,—"এ গাড়ী আমির সাহেব ভাড়া করিয়াছেন, তাঁহাকে বল।" সেই শকটের আরোহী এক সৌম্যমূর্ত্তিধারী ছদ্মবেশী যুবক—তিনি হয়ত দয়াবশে তোমায় গাড়িতে তুলিয়া লইলেন ভাবিয়া, তুমি সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহাকে ধন্যবাদ দিলে—কিন্তু পথিমধ্যে সেই আমীর-বেশীর হস্তেই তোমার জীবন নিহত হইল। তোমার শবদেহ সেই নির্জ্জন প্রান্তর-মধ্যে নীরবে সমাহিত হইল, অথবা শকট হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া শৃগাল-কুক্কুরের ভক্ষ্য হইল।

হয়ত পথিমধ্যে ব্যবসায়ী বেণিয়া শস্য লইয়া গোরুর পৃষ্ঠে বোঝাই দিয়া যাইতেছে; তুমি ভাবিলে,ভাল হইল—ইহার সঙ্গ পাইলাম; কিন্তু সেই বেণিয়ার ফাঁসেই হয়ত তোমার জীবলীলা পরিসমাপ্ত হইল। বস্তুতঃ ঠগেরা কখন্ কোন্ মূর্ত্তিতে বিচরণ করিত, তাহা অনুসন্ধান করা অতীব তীক্ষ্ণদৃষ্টি ও ক্ষমতা-বহির্ভূত কার্য্য।

ঠগ দুই প্রকারের—এক জলপন্থী ও অপর স্থলপন্থী। জলপন্থী অপেক্ষা স্থলপন্থীর ভাগই বেশী, ইহাদেরই উৎপাত বেশী। জলপন্থীরা নিজে নিজে ভাড়াটিয়া নৌকা রাখিত—দলের লোককে যাত্রী সাজাইয়া নৌকায় বসাইয়া রাখিত, এবং নূতন যাত্রী দেখিলেই তাহাকে আগ্রহের সহিত তুলিয়া লইত। সেও, অনেক যাত্রী যাইতেছে ভাবিয়া প্রাণের ভয় ভুলিয়া গিয়া, সেই নৌকায় উঠিত; এবং খানিক না যাইতেই, তাহার যথাসর্ব্বস্ব হৃত ও ভগ্ন-মেরুদণ্ড* হইয়া, নদীর তরঙ্গময় বক্ষকে তাহার শীতল শোণিত-স্রাবে সুরঞ্জিত করিত।

স্থলপন্থীদের কার্য্য আরও নৃশংসতা ও রহস্য-বিজড়িত। সব কথা বলিতে গেলে স্থানে কুলাইবে না। মোটামুটী দুই চারিটী কথা বলিয়া রাখি। তাহারা ছদ্মবেশে পথিকের সঙ্গ লইয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত যাইত, এবং সুবিধামত স্থান দেখিলেই "ঝিরণী"* দিত; কখনও কখনও বা সরাই পর্য্যন্ত তাহাদের সঙ্গ লইত। সরাইওয়ালা হয়ত তাহাদের বখরাদার; সুতরাং নির্ভয়ে বিনা-বাধায় একে বারে ৭।৮ জন নিদ্রিত পথিককে ফাঁসি দিয়া বধ করিয়া তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইত এবং অদূরে প্রান্তর-মধ্যে বা আম্র-কাননতলে দুই চারি হাত প্রশস্ত কবর খনন করিয়া মৃত ব্যক্তিদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কুঠারে খণ্ড-বিখণ্ড করিয়া সেই অল্পখনিত সমধি-স্থলে সমাহিত করিয়া তাহার উপর ঈশপগুলের পাতা ছড়াইয়া দিত। এরূপ করাতে শৃগাল-কুক্কুরে সেই মৃতদেহ টানিয়া বাহির করিতে পারিত না। জলপন্থী কি স্থলপন্থী উভয় শ্রেণীর ঠগেরাই রেশম-নির্ম্মিত সূক্ষ্ম রজ্জুর দ্বারা গলদেশে ফাঁস দিয়া শিকার বধ করিত। অস্ত্র-দ্বারা আহত করিয়া বধ করা তাহাদের ধর্ম্ম-বহির্ভূত ছিল; তবে মৃত ব্যক্তির অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করিবার কোন নিষেধ-আজ্ঞা ছিল না।

পুরুষ ঠগের কথাই আমি শুনিয়াছি দেখিয়াছি। কিন্তু মেয়ে ঠগের কথা শুনি নাই ষেটীর কথা শুনিয়াছি, তাহা সহস্রের মধ্যে একটী। এইজন্যই সেই ঘটনাটী আমি বিবৃত করিব। হতভাগিনী লক্ষ্মীবাইএর কথা আজও স্মৃতিপথ-বহির্ভূত হয় নাই; তাহার শোচনীয় লোমহর্ষক পরিণাম আজও আমি বিস্মৃতির কুক্ষিগত করিতে পারি নাই। ও সে কথা মনে হইলে আজও এ বৃদ্ধ-বয়সে আমার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠে—ভয়ানক হৃৎকম্প হয়—ভয়ে আমি মৃতের ন্যায় হই

*নৌকার ঠগেরা,যাত্রীকে ফাঁস দিয়া হত্যা করিয়া, তাহার পৃষ্ঠের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া, জলে ফেলিয়া দিত; ইহাতে তাহার আর বাঁচিবার সম্ভাবনা থাকিত না।

* ঠগেরা যে সমস্ত সাঙ্কেতিক 'শব্দ ব্যবহার ক পথিকদের প্রাণ-সংহার করিত, তাহাকে 'ঝিরণী' 'হুক্কা ভর লাও', 'আইও হো তো ঘর চল ই সাঙ্কেতিক শব্দই 'ঝিরণী'-স্বরূপ ব্যবহৃত হইত।

ড়ি! তোমরা সেই লোমহর্ষক কাহিনী নিবে কি?

আলীগড়ে আমার বাড়ীর পার্শ্বে ধনশ্রী-লাল নামে এক ধনী হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ধনশ্রীর অবস্থা অতি উন্নত; বাড়ী তিন মহল, লোক-জন কর্ম্মচারী দাস-দাসী অগণ্য, মান-সম্ভ্রম ও খ্যাতি-প্রতিপত্তিও খুব। আমার সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিল। তিনি আমায় আদর করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় 'দাদা বাবু' বলিয়া ডাকিতেন।

এই অতুল ঐশ্বর্য্য—এই প্রকাণ্ড অট্টালিকা, ইহার ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারিণী ধনশ্রীর এক-মাত্র কন্যা। ধনশ্রীর আর পুত্র-সন্তান হয় নাই। তাঁহার দুই সংসার—দ্বিতীয়ার গর্ভে লক্ষ্মীবাই-এর জন্ম; প্রথম সংসার গত হইয়াছেন। লক্ষ্মী-বাই ধনশ্রীর অন্ধের যষ্টি, ভিক্ষুকের ভিক্ষালাভ, তৃষ্ণার জল, পরিণয়-বৃক্ষের একমাত্র সুরস ফল, মরুভূমে সুবাসিত কুসুমবৎ সর্ব্বদাই শোভমানা।

লক্ষ্মী আমায় জ্যেঠা-মহাশয় বলিত—কেন-না, তাহার বাপ আমায় দাদা বলিতেন। অমন সুন্দরী মেয়ে আমি খুব কম দেখিয়াছি—সে রূপে লক্ষ্মী, গুণে লক্ষ্মী। তাহার আকর্ণ-বিস্তৃত ফুল্ল উৎপলদলের ন্যায় কৃষ্ণাভ তারকাবিশিষ্ট উজ্জ্বল চক্ষু, শরতের শোভাময় পূর্ণ-বিকশিত দলবিশিষ্ট সরোজিনীর ন্যায় সুন্দর মুখ, আগুল্‌ফ-লম্বিত কেশ-পাশ, চম্পক-বিনিন্দিত বর্ণ, আর কোকিল-বিনিন্দিত স্বর। লক্ষ্মী বড় দয়াবতী; দরিদ্রের অশ্রুজল তাহার নিকট অসহ—রুগ্নের চীৎকার তাহার নিকট অসহ—কাহারও প্রার্থিত অভাব পুরণ করা তাহার জীবনের সার ব্রত।

লক্ষ্মীর বিবাহে খুব জাঁক হইল। সকলে বলিল, আলিগড়ে এত জাঁকের বিবাহ কেহ কখনও দেখে নাই। পাত্রটীও কন্যার অনুরূপ—রূপে-ঐশ্বর্য্যে সবদিকেই সমান। উপযুক্ত পাত্রে কন্যাদান করিয়া ধনশ্রীর মনের সুখ বাড়িল। পাত্রের বাড়ী মথুরায়। বিবাহের পর কন্যা পাঠান হয় নাই; কোন একটী বিশেষ প্রতিবন্ধক ঘটিয়াছিল। সুতরাং তাহার দুই মাস পরে কন্যা পাঠান হইল।

কন্যা প্রথম শ্বশুর-বাড়ীতে যাইবে; সুতরাং তাহার উপযুক্ত অনুষ্ঠানের আর কিছুই বাকী রহিল না। একখানি ভাল 'বয়েল' গাড়ী—ভিতরে দিব্য বিছানা পাতা; দুইটী বড় বড় তেজীয়ান গরু—রোজ দশ ক্রোশ চলিলেও ক্লান্ত হয় না। সঙ্গে দশ জন পাইক ও চারি জন মেহেরা (দাসী) চলিল; আর ৮ জন বেহারায় কিঙ্খাপের বস্ত্রাচ্ছাদিত এক পাল্কী লইয়া উপস্থিত হইল। কন্যা পাল্কীতেই যাইবেন; তবে পাল্কীতে যখন ক্লান্ত হইয়া পড়িবেন বা বিরক্তি ধরিবে, তখন 'বয়েলে' চড়িবেন—কেন-না, রাস্তা অতি দূরতর। আলীগড় হইতে হাঁটাপথে মথুরা প্রায় দুই দিনের পথ।

যেখানে যা কিছু রত্নালঙ্কার ধরে, তাই দিয়া কন্যাকে সাজান হইল; আর একখানি গো-শকটে মাল-পত্র চলিল। পুরোহিত আসিয়া শুভ-লগ্ন স্থির করিয়া দিলেন। সকলে যাত্রা করিল। ধনশ্রী কাঁদিতে লাগিলেন, বাড়ীর সকলেই কাঁদিতে লাগিলেন। আমি ভাবিলাম, বঙ্গদেশে বসিয়া যেন মেয়ে-পাঠান ব্যাপার দেখিতেছি।

সন্ধ্যা হইয়াছে। তামসীর ছায়া ক্রমশঃ সমস্ত প্রকৃতিকে গ্রাস করিয়াছে। এমন সময়ে গাড়ী আসিয়া এমন এক স্থলে থামিল যে, তাহার দুইদিকে বন। সঙ্গে অনেক লোকজন—অস্ত্রশস্ত্র আছে—সুতরাং কেহ ভয় পাইল না। সেইখানে ঘণ্টাকয়েক বিশ্রাম করিয়া পুনরায় সকলে চলিতে লাগিল।

এবার সদর রাস্তা দিয়া গাড়ি চলিতেছে। আশে-পাশে দুই-একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম। গ্রাম-গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মৃত্তিকাময় পাহাড়ের উপর অব-

স্থিত। গ্রামবাসিনী স্ত্রীলোকেরা মশালের আলো দেখিয়া নিকটে আসিল, এবং গাড়ির পর্দ্দা তুলিয়া নব-বধূর মুখ দেখিল। স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোকের মুখ দেখিতেছে; সুতরাং কেহ আপত্তি করিল না। ইহার পর প্রায় অর্দ্ধ-ক্রোশ পথ অতিবাহন করা হইলে, সহসা এক অস্ফুট ক্রন্দন-রোল সেই নৈশ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া সকলের কর্ণগোচর হইল। সকলের একটু কৌতূহল হইল; তাহারা দেখিল, একটা বুড়ী পথের ধারে বসিয়া অজস্র অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতেছে।

রক্ষীগণের কঠোর হৃদয়; সুতরাং বুড়ির ক্রন্দনে ভিজিল না। তাহারা কারণ জিজ্ঞাসা না করিয়াই চলিয়া গেল। লক্ষ্মী তখন বয়েলের মধ্যে অসিয়া বসিয়াছেন; পাল্কীখানি খালি চলিয়াছে—বয়েল সকলের পশ্চাতে। লক্ষ্মীর কর্ণে বৃদ্ধার ক্রন্দন-শব্দ পৌঁছিল—দয়াবতীর দয়ার মন সহজেই গলিল; হুকুম হইল,—"গাড়ী থামাও।" গাড়ি থামিল। গাড়ির রাস ছিঁড়িয়াছে ভাবিয়া, সঙ্গীদল না দাঁড়াইয়া একটু অগ্রসর হইল। লক্ষ্মী বুড়িকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বুড়ি, কাঁদিতেছিস কেন?"

বুড়ী ক্রন্দনের রোল আরও একটু বাড়াইল—সহানুভূতির স্পর্শে তাহার পূর্ব্বশোক যেন জাগিয়া উঠিল। বুড়ী বলিল,—"মা! তুমি রাজরাণী হও, রাজার মা হও; আমি বড় দুঃখিনী, আমার আর কেউ নাই গো—কেবল এক মেয়ে—" এই বলিয়া বুড়ী আবার কাঁদিতে লাগিল।

বুড়ির শরীরের গঠন অতি কৃশ; কঙ্কালগুলি স্পষ্ট দেখা যাইতেছে; তাহার উপর কর্কশ চর্ম্মের আচ্ছাদন। কিন্তু চক্ষুতে কুটিল দৃষ্টি—মুখে যেন একটু কি-যেন-কেমন ভাব; হস্তে এক যষ্টি ও কাছে পড়িয়া এক পুঁটুলী। লক্ষ্মী বলিল,—"বুড়ী, কাঁদিস্ কেন? কি হইয়াছে, বলনা! তোর মেয়ের কি কিছু অমঙ্গল হইয়াছে?"

বুড়ী বলিতে লাগিল,—"মা-লক্ষ্মী! আর আমার ছেলে-পিলে নাই—ঐ একমাত্র মেয়ে—যমের এঁটোকাঁটা একটা পড়িয়া আছে। শেষে আবার তার উপর বিধাতার নজর পড়িয়াছে। মাগো! আমার কি হবে গো?" এই বলিয়া, বৃদ্ধা গুমরাইয়া কাঁদিতে লাগিল।

লক্ষ্মী আর বুড়ীর ক্রন্দনের সুরের সহিত যুঝিতে পারিল না। সে নিজ খাদ্য-দ্রব্য হইতে কতকগুলি মিষ্টান্ন লইয়া বুড়ীকে খাইতে দিল। বুড়ী কান্না ভুলিয়া আহারে মনোযোগ-প্রদানে ব্যস্ত রহিল। আহারাদি সমাপ্ত হইলে, লক্ষ্মী তাহার কথিত কাহিনী হইতে এই বুঝিল,—বৃদ্ধার নিবাস সে যেখান হইতে উঠিয়াছে সেই গ্রামেই। তাহার অনেকগুলি পুত্র-সন্তান হইয়াছিল; কিন্তু আর তাহার কেহই নাই—থাকিবার মধ্যে একমাত্র কন্যা। বুড়ী জাতিতে আহির; তাহার জামাতার অবস্থা বড় মন্দ। কন্যাটী সাঙ্ঘাতিক পীড়িত—কন্যার শ্বশুরবাড়ী মথুরা হইতে চারি ক্রোশ দক্ষিণে। এই সকল কাহিনীর পর বুড়ী অনেকটা স্থির হইল।

রাত্রির অন্ধকার চারিদিকে বেড়িয়াছে—মাঠের মধ্যে নিবিড় অন্ধকার। গাছের তলায়, পাতার কোলে, নদীর জলে, কঙ্করময় রাজপথে, চারিদিকেই কে যেন মসী-বৃষ্টি করিয়াছে। আকাশে নীল নভোস্থলে অনেকগুলি তারকা উজ্জ্বলভাবে দীপ্তি প্রকাশ করিতেছে। প্রকৃতি নিস্তব্ধ—ঘোর নিস্তব্ধ! কেবল বয়েলের চাকার শব্দ—চালকের হতভাগ্য গরুগুলির উপর নানাবিধ সম্পর্ক-বিরুদ্ধ সম্ভাসন-বাণী ও গ্রাম্য সারমেয়ের চীৎকার-রব ভিন্ন আর কিছু শুনা যাইতে ছিল না।

বুড়ী আপনার মনে বকিতে লাগিল। লক্ষ্মী সাধ্যমত তাহার গল্প শোনে—কখনও বা "হুঁ" দিয়া সারে—আবার কখনও বা পিতা-

মাতাকে ছাড়িয়া যাইতে হইতেছে, এই চিন্তায় অবসন্ন হয়। বুড়ীর কিন্তু গল্প থামে না।

লক্ষ্মীর তৃষ্ণা পাইল। সমস্ত দিন সূর্য্যের প্রখর উত্তাপে কাটিয়াছে; বয়েলের চারিদিক বস্ত্রে আবৃত—একটুও বাতাস খেলিবার যো নাই; ভয়ানক গ্রীষ্ম! লক্ষ্মী বুড়িকে বলিল,—"বুড়ি-মা, একটু জল দিতে পারিস্!" বুড়ী বলিল,—"জল কি হইবে মা—খাবে! তা দিচ্চি! বয়েল থামাইতে বল—কুয়া কোথায় আছে, নামিয়া দেখি; রসী ও লোটা ত সঙ্গে আছে?" বালিকা বলিল,—"না—না, কুয়া দেখিতে হইবে না। এখানে মাটীর কলসীতে জল আছে, তাই দে।" বুড়ী কলসী হইতে জল গড়াইল; এবং একবার এদিক-ওদিক চাহিয়া দেখিয়া, বস্ত্র-প্রান্ত হইতে একটী ক্ষুদ্র কাগজের মোড়ক হইতে চূর্ণবৎ পদার্থ তাহাতে মিশাইয়া দিল।

বালিকা বলিল,—"জল দিতে এত দেরি করিতেছিস্ কেন? ঐযে ঐখানে কলসী—দেখিতে পাইতেছিস্ না?"

বুড়ী বলিল,—"হাঁ—মা, শুধু জল খাবি!"

"হাঁ—হাঁ, শুধু জল খাব—বুড়ী তুই জ্বালালি দেখ্‌ছি! দে, জল দে।"

বুড়ী সেই অন্ধকারে বিকট হাস্য করিল। বয়েলের ভিতর ঘোর সূচীভেদ্য অন্ধকার—সেই বিকট হাস্য—সেই ঘোর অন্ধকারের পৈশাচিক ভাবের মধ্যে মিশিয়া গেল।

লক্ষ্মী একটানে সব জল খাইয়া ফেলিল। প্রায় পাঁচ মিনিট কাটিয়াছে; বালিকা বলিল,—"বুড়ি, আমার গা কেমন করিতেছে—তুই আমার দরওয়ানকে ডাক্।" এই বলিতে বলিতে বালিকা বুড়ীর কোলে ঢুলিয়া পড়িল। বুড়ী বালিকার জলের সহিত বিষ মিশাইয়াছিল।

লক্ষ্মী, বুড়ীর কোলে শুইয়া। সে সহজে প্রতিমুহূর্ত্তে তাহার শ্বাস-প্রশ্বাস পরীক্ষা করিতে লাগিল। পরে, অবসর বুঝিয়া, একখানি রেশমের রুমাল বস্ত্র-মধ্য হইতে বাহির করিয়া সেই বালিকার গলায় ফাঁস দিয়া, তাহার শেষ-শ্বাসক্রিয়া বন্ধ করিয়া দিল। ক্ষুদ্র বালিকা—অভাগিনী, নির্দ্দোষী বালিকা—হৃদয়ের সুকুমার প্রবৃত্তি-বশে নিজের জীবন হারাইল।

কাজ সিদ্ধ হইয়াছে দেখিয়া, সেই অন্ধকারে হাতড়াইয়া, বুড়ী তাহার গহনার বাক্সটী লইল। পরে, বিকট হাস্য করিয়া, বালিকার মুখের কাছে মুখ দিয়া, বিড় বিড় করিয়া কতকগুলি কি মন্ত্র পড়িল; তারপর, ধীরে ধীরে নামিয়া প্রস্থান করিল। গাড়ীর মধ্যে রহিল,—লক্ষ্মীর প্রাণহীন, নিস্পন্দ দেহ।

বয়েল গিয়া—রাত্রি চারিটার সময়—লক্ষ্মীর শ্বশুর-বাড়ীর দ্বারে দাঁড়াইল। প্রথমবার বধূ ঘর করিতে আসিতেছেন—বাড়ীর কেহই সমস্ত রাত ঘুমায় নাই—বাড়ীর দ্বারে আলপনা—দ্বারের নিকটস্থ পথে পঞ্চবর্ণের গুঁড়ি ও চারিদিকে পুষ্পরাশি ছড়ান—ঘরের লক্ষ্মী আসিতেছেন, তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনার জন্য এই সব আয়োজন।

লক্ষ্মীর শাশুড়ী-ঠাকুরাণী, মঙ্গল-দীপ হাতে লইয়া—দাসদাসী-বেষ্টিত হইয়া—ধীরে ধীরে বয়েলের দ্বার খুলিলেন; দেখিলেন—বধূ শুইয়া রহিয়াছে; গৃহিণী ডাকিলেন,—"মা! মা! উঠ মা! ঘরের লক্ষ্মী ঘরে আসিয়াছ—উঠ মা!" কিন্তু হায়! মা কি আর তাহাতে আছে?

গৃহিণী আলো লইয়া বধূর মুখের কাছে ধরিলেন। কি ভয়ানক! কি লোমহর্ষক! কি শোচনীয়! সেই প্রভাত-কমলবৎ অপরিস্ফুট সৌন্দর্য্যে কে যেন কালিমা ঢালিয়া দিয়াছে—সোণার অঙ্গ হিম হইয়া গিয়াছে—সেই খঞ্জনবৎ চঞ্চল চক্ষু স্থির ও নিস্তব্ধ—সেই ভ্রমরকৃষ্ণবৎ সুন্দর তারকা ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে! গৃহিণী, বধূর শবদেহ দেখিয়া, ভয়ানক চীৎকার করিয়া মূর্চ্ছিতা হইলেন। বাড়ীতে একটা ভয়ানক হাহাকার উঠিল—আনন্দ-উচ্ছ্বাস সেই

ক্রন্দনের রোলে ডুবিল। পথের ফুল—পথেই পড়িয়া রহিল; গৃহিনীর মনের সাধ ঘোর বিষাদে ডুবিল। সকলে সেই সংজ্ঞাহীনা গৃহিণী ও সেই শবদেহ ধীরে বাটীর মধ্যে আনিল।

হায়! কি দুর্দ্দৈব! বোধ হইল, যেন বিবাহ-বাসরে শ্মশানের আবির্ভাব হইয়াছে—আনন্দ ও বিভীষিকা যেন পাশাপাশি দাঁড়াইয়া হাসিতেছে—হর্ষ ও বিষাদ যেন অনেক কালের পর একত্রে মিলিয়াছে। এইখানেই এই শোচনীয় কাণ্ডের যবনিকা পড়িল।

এই দুর্ঘটনার মূল কারণ, সেই দুশ্চারিণী রাক্ষসী—পরে ধৃত হইয়া পুলিসের সমক্ষে সমস্ত কথা খুলিয়া বলিয়াছিল। তাহার কথিত ঘটনা হইতেই আমরা এই সমস্ত সংগ্রহ করিয়াছি।

বিজয়ার পত্র।

(১)

ভ্রান্তি-বশে তাপ যত সংসার-মাঝারে
পাইয়াছি সখে, কত বলিব তোমারে!
জানত সকলি তুমি, দেখেছ ত মরুভূমি
হৃদয়ে কেমন মোর সদা ধূ-ধূ করে.
প্রজ্বলিত চিতারাশি নিশিদিন তরে!।

(২)

মরীচিকা-মুগ্ধ মৃগ মতন কতই
ছুটে যাই দশদিকে, শান্তি পাই কই ?
জীবন জুড়াব বলে, যা'কে লই বুকে তুলে,
দ্বিগুণিত দুঃখ-জ্বালা করে মো'র সেই।
সংসার-সংস্রবে সখে, অন্য কিছু নেই!।

(৩)

মনে রেখ, নহে কেহ সুখদুঃখ-দাতা,
কর যাহা, পাও তাহা, এই সার কথা।
অভিমানী জীব যত, জানে না জড়ের মত
মানব-জীবন শুধু কর্ম্ম-সূত্রে গাঁথা।
আত্ম-শান্তি পর কাছে পাবে বল কোথা?।

(৪)

একমাত্র শান্তি-ছায়া শুভকর্ম্ম-ফলে
পাইলে পাইতে পার এ প্রান্তর-স্থলে;
জুড়া'বে যাইলে তথা, পাপ-তাপ মন-ব্যথা,
ত্রিতাপহারিণী মা'র চরণ-কমলে।
মাতৃহীনে কোন সুখ নাই ধরাতলে॥

(৫)

গুণময়ী মায়াময়ী মায়ের মায়ায়
মুগ্ধ-জীব বদ্ধ—ভাগ্য-চক্রের দ্বারায়
নিষ্পেশিত নিরন্তর; কত যোনি জন্মান্তর
ভ্রমিয়া, ভ্রমেও কভু না বুঝে হৃদয়,—
সে মা'র চরণ বিনা নিষ্কৃতি না হয়॥

(৬)

কেন সখে, কেন তবে মূঢ়ের মতন,
পূর্ব্ব-স্মৃতি জ্বালি বৃথা করহে রোদন!
জ্বলন্ত বিবেক-দীপে, পুড়াও সংস্কার-স্তূপে,
ভক্তির বিভূতি করি অঙ্গে মাখ আর;
দূরে রাখ মোহময় এছার সংসার॥

(৭)

ব্রহ্মাণ্ডময়ীর লীলা দেখ হাসিমুখে,
ভেবে দেখ, বুঝে দেখ, ভাসি সদা সুখে।
মরি মরি কি বাহার! সম্মিলন একবার,
আবার বিচ্ছেদ—কাল তরঙ্গ-তাড়নে—
উলটি পালটি জীব স্রোতমুখে ক্ষণে!।

(৮)

যে হৈম পিঞ্জরে কাল পুষেছ যতনে,
জ্বলিতেছ দিবানিশি যাহার দংশনে;
পোষ দেখি পিকবরে, গ্রাসিতে সে বিষধরে,
মোহিত হইবে মন তাহার নর্ত্তনে—
শিখা বিস্তারিয়া চিদ্‌ঘন দরশনে॥

(৯)

এস সখে, এস তবে আজি শুভদিনে,
শুভ লগ্নে দুই জনে যাই বিসর্জ্জনে।
কভু হাত ধরাধরি, কভু আলিঙ্গন করি,
ভাসি যাই, এস ভাই, তরঙ্গ-তুফানে।
আশ্রয় দিবেন মাতা অধম সন্তানে॥

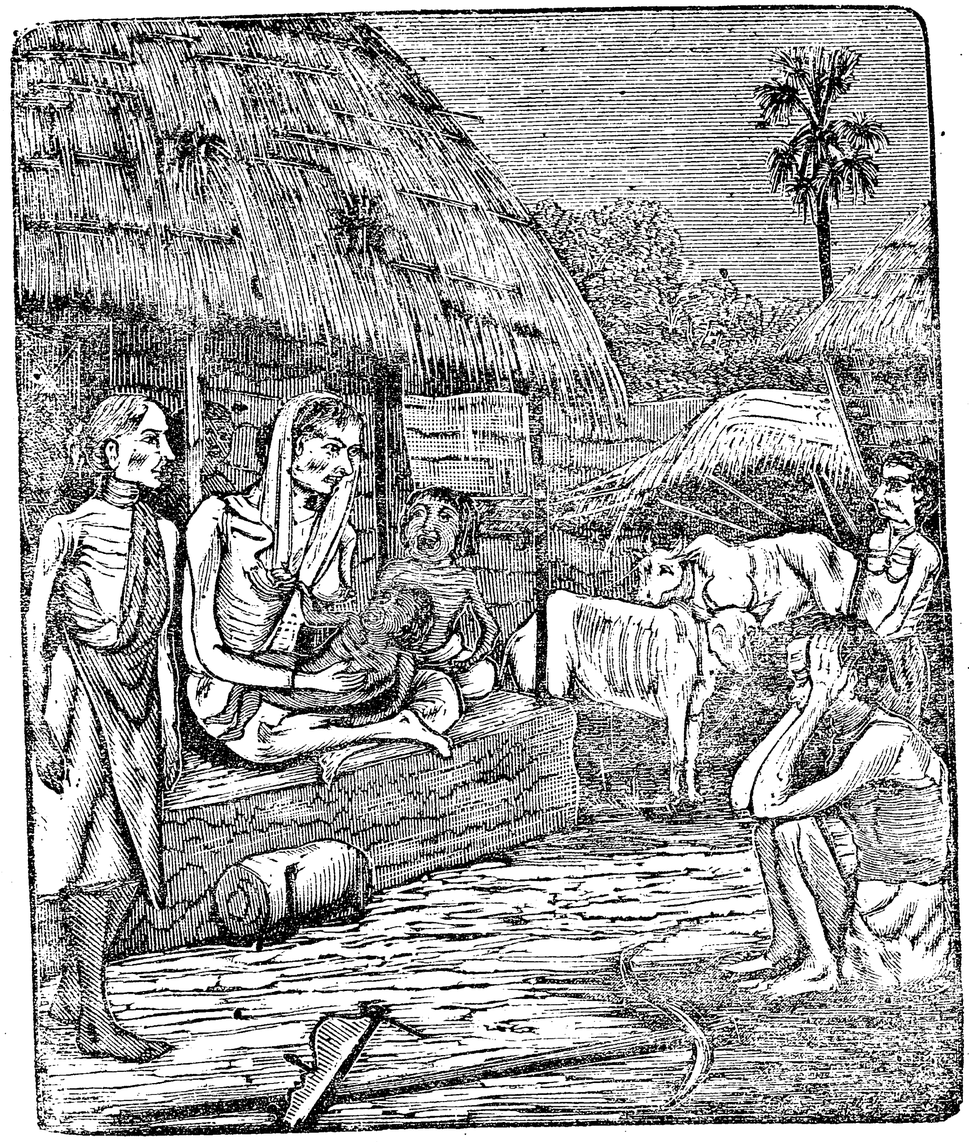

দুর্ভিক্ষের সূত্রপাত।

যেরূপ দেখা যাইতেছে, এবৎসর বাঙ্গালায় অন্নকষ্টের সমূহ সম্ভাবনা—কোন কোন প্রদেশ হইতে তো দুর্ভিক্ষেরই দারুণ সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে! চাউলের দর প্রতি নিয়তই বৃদ্ধি পাইতেছে; কৃষকগণ হাহাকার করিতেছে। মাঠের ধান্য, অনেক স্থলে, মাঠেই শুখাইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে—ধানের মাটি কোথাও যেন ফুটি-ফাটা! কৃষক লাঙ্গল ফেলিয়া মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতেছে—তাহাদের পুত্র-পরিবারগণ অনাহারে দিন দিন আসন্নশায়ী হইয়া আসিতেছে। এমন দিনে—শরতের শেষে, তাহাদের মুখের হাসি কোথায় ধরিবে না, তা-না এই বিপর্য্যয়! অনেক পল্লীতেই আজ এই হাহাকার! দূর সহরে বসিয়া অনেকে তাহা না বুঝিতে পারেন, কিন্তু অভ্যন্তরের অবস্থা এমনই ভয়ানক! জানি না, ভগবান এবার অদৃষ্টে আরও কি লিখিয়াছেন!

বঙ্গের বর্ত্তমান।

"ইংরাজের প্রকট মূর্ত্তি" নামে যে অন্যতম প্রবন্ধের দায়ে 'বঙ্গবাসী' বিচারালয়ে নীত হইয়াছিলেন, তাহা সামরিক কিনা?—এ প্রশ্ন অনেকের অন্তঃকরণে স্বতঃই উত্থিত হইয়াছিল। প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া অনেকে যে হৃষ্ট হইয়াছিলেন, সেকথাও ঠিক; কিন্তু মর্কদ্দমা মিটিবার সময় সেই প্রবন্ধ অন্যায় বলিয়া স্বীকার করাতেও কাহার বড় একটা আপত্তি হয় নাই।

প্রথমোক্ত মনোভাব সম্মতির আইন-রূপ রাজপুরুষদিগের প্রচণ্ড হঠকারিতায় উত্যক্ত নিরীহ প্রজাকুলের অগত্যা-তুষ্টিমাত্র; আর, শেষোক্ত মনোভাব উদ্বেগান্তে স্থির বুদ্ধি। বর্ত্তমানে যদিও ইংরাজ বিপুল প্রজাপুঞ্জের মতামতের উপর অতি অল্পই আস্থা প্রদান করেন, যদিও ইংরাজ প্রজায়-প্রজায় বিবাদ বাধাইতেই কখন কখন উদ্যোগী দেখা যায়, যদিও ইংরাজ বিচারালয়ে এ-দেশবাসীদিগকে অধিকতর দণ্ড দিতে পুলকিত হন বলিয়াই মনে হয়, যদিও ইংরাজ তাঁহার স্বদেশীয়ের দ্বারা ভারতের কোন প্রজা-হত্যা মাঝে মাঝে অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই প্রতিপন্ন করেন দেখা যায়, যদিও ইংরাজের শাসনে অন্নপূর্ণ ভারতের কোথাও না কোথাও দুর্ভিক্ষ লাগিয়াই আছে; তথাপি দেশে বর্ত্তমানে যেটুকু শান্তি বিরাজ করিতেছে, তাহার নিমিত্ত সাধারণে ইংরাজ বাহাদুরের নিকট যথেষ্ট কৃতজ্ঞ। আজ শতাধিক বৎসর ইংরাজ বঙ্গদেশে অধিকার বিস্তার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন; এবং ইহার মধ্যে রাজা-প্রজায় অনেকই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কিন্তু উভয়েরই যদি নৈতিক পরিবর্ত্তনের বিষয় আলোচনা করা যায়, তবে প্রজা সপেক্ষা বোধ হয় রাজার উন্নতিই বেশী হইয়াছে। যখন ইংরাজ বণিক-বেশে বাঙ্গালায় আসিয়া প্রথম উৎপাত আরম্ভ করেন, তখন ইংরাজ বোম্বেটের দল। কিন্তু এখন ত ইংরাজ সুসভ্য রাজ্যেশ্বর! যখন ক্লাইভ, হেষ্টিংস ও ধারোয়েল-প্রমুখ ইংরাজগণ রেশমের কারবার খুলিয়া প্রজাদিগের সর্ব্বনাশ করিতে বসিলেন, তাঁতিরা দাদনের ভয়ে আপনা-আপনি অঙ্গুষ্ঠ কর্ত্তন করিতে লাগিল; তখনকার ইংরাজের সহিত বর্ত্তমান ইংরাজ-সাধারণের অনেক প্রভেদ। হয়ত অন্তরে বস্তু একই আছে; কিন্তু কার্য্যকারিতা দেখিলে বলিতে হয়, শতাধিক বৎসরে ইংরাজের প্রবৃত্তি মনুষ্যত্বের দিকে অনেক ফিরিয়াছে। নীলকরদের আমলের সময়ের সহিত বর্ত্তমান চা-করদিগের নিষ্ঠুরতার তুলনা করিলে, এখন অন্ততঃ উৎপীড়নের সুবিধা কমিয়াছে—একথাও বলিতে হয়।

কিন্তু বাঙ্গালীর নৈতিক ব্যাপার যদি পর্য্যালোচনা কর, কি দেখিতে পাও? কোম্পানির আমলের নিমকের গোমস্তা ও রেসমের গোমস্তা যে বাঙ্গালার মধ্যে মিলিয়াছিল; সেই বাঙ্গালীর মধ্যে আজিও চা-বাগানের কুলি-সরবরাহকার মিলিতেছে! বর্ত্তমান শতাব্দীতে কোন কোন দেশ হইতে জল্লাদের অভাবে ফাঁশী দিবার প্রথা উঠিয়া যাইতেছে; কিন্তু হতভাগ্য বঙ্গদেশে সরলপ্রকৃতি গৃহস্থ, সহায়হীনা রমণী, ও দুর্ব্বল বালকদিগকে সর্ব্বনাশে ফেলিবার জন্য অসংখ্য নরপিশাচ প্রস্তুত আছে—টাকা থাকিলেই নিয়োগ কর! যে 'ইম্পির' বিচারে মহারাজ নন্দকুমার নিহত হইয়াছিলেন,—'মেকলে' লিখিয়াছেন,—"নরপিশাচ জেফ্রিজের মৃত্যুর পর আর কোন বিচারকের দ্বারা বিচারাসন সেরূপ কলঙ্কিত হয় নাই;" কিন্তু সেই ইম্পিকে খোষনাম দিবার লোকও বাঙ্গালীর মধ্যে ছিল। আবার মহারাণীর ঘোষণা-পত্রের মর্ম্ম উড়াইয়া দিয়া, যে সম্মতির বিল পাশ হইল, তাহারও পরিপোষণে বাঙ্গালী কৃতবিদ্য অনেকগুলি জুটিল! বাঙ্গালীর মধ্যে স্বার্থত্যাগী দেশহিতৈষীর যেমন আত্যন্তিক অভাব ইংরেজাগমের প্রারম্ভে ছিল, এখনও তাই। বাঙ্গালীর বিদ্যাশিক্ষা যেমন অর্থোপত্তির উপাদান-স্বরূপ অতীতের কাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে, এখনও তাই। বাঙ্গালী সেকালেও যেমন সমাজে পাপের প্রশ্রয় দিয়াও আক্রোশে মিথ্যা-অপবাদে দলাদলির ধূমধাম করিত, এখনও তাহাই করে। বাঙ্গালীর যে সহানুভূতির অভাবে আজ শত বৎসর পূর্ব্বে অধীনতা, দাস্য ও যন্ত্রণা আসিয়া জুটিয়াছে, এখনও সেই সহানুভূতির অভাব—বরং কিছু গুরুতর হইয়াছে। বাঙ্গালীর নামের সঙ্গে ন্যায়-পঞ্চানন, তর্ক-সিদ্ধান্ত প্রভৃতি উপাধি কমিয়া আসিলেও, তর্কে সমান প্রতিপত্তিই বিদ্যমান আছে! বাঙ্গালী বহু বর্ষ পূর্ব্বে সমাজ-সংস্কারে যেরূপ উদাসীন ছিল, এখনও তাই আছে। এক কথায় বাঙ্গালী সেই সে কালের "হুজ্জুতে বাঙ্গাল।"

তবে কোথাও যদি একটু আধটু ব্যতিক্রম দেখা যায়, সেটা বড় ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়। মাঝে মাঝে মনে হয়, বুঝি ভাল হইবার উপক্রম হইয়া আসিতেছে, বাঙ্গালী এখন সভা করিতে শিখিয়াছে, ধর্ম্মের দিকে টলিয়াছে, সমাজ-সংস্কারে চেষ্টা করিতেছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু কাজের বেলা প্রায়ই 'যে বার বুড়ি সেই তিন পণ!' তবে একটা বিষম লাভ হইয়াছে—যদি তাহাকে কেহ লাভ বলিতে চাও! 'স্বাধীন চিন্তা'-রূপ একটা অপূর্ব্ব পদার্থ এখন বিশেষ অধিকার লাভ করিয়াছে; এবং সঙ্গে সঙ্গে, প্রকাশ্যেই হউক অপ্রকাশ্যে হউক, রায় বাহির হইয়াছে যে,—'স্বাধীন চিন্তা' ও 'স্বাধীন মতের' নিমিত্ত কেহ কাহারও নিকট দায়ী নহে। এটা

বিশৃঙ্খলার একটা অন্যতম সাধন বলিয়াই ত মনে হয়!

যাহা হউক, বাঙ্গালীর এই বর্ত্তমান নৈতিক ব্যাপারের কথা মনে রাখিলে, ইংরাজের কোন কথা লইয়া তাহার উপর বিশেষ অনুযোগ করা উচিত হয় না। বাঙ্গালী যদি এতদিন নানাবিধ পীড়ন, যন্ত্রণা ও দাস্য প্রভৃতি সহ্য করিয়াও, তাহাদের মূল কারণ-স্বরূপ নীচ স্বার্থ, ক্ষুদ্রাশয়তা, অনৈক্য, ঔদাশীন্য, বচন-সর্ব্বস্বতা, দাস্যস্পৃহা প্রভৃতির কিছুই ছাড়িতে পারিল না; তবে যে ইংরাজ ডাকাতি, বদমায়েসি, নরহত্যা, বিশ্বাস-ঘাতকতা, অধর্ম্মাচরণ, ধনৈক দেবত্ব, আত্মসুখৈক লক্ষতা, প্রভৃতির উপর ভারত-রাজ্যের ভিত্তি-স্থাপন করিয়াছে, সেই ইংরাজ যে পূর্ব্বের ভাব একেবারেই ত্যাগ করিবে—এরূপ আশাই বা করা যায় কিরূপে? বরং এখন যেটুকু প্রজা-হিতৈষিতা দেখা যাইতেছে, তাহার নিমিত্ত ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।

বঙ্গের বর্ত্তমান অবস্থা দেখিতে গেলে, যেমন রাজ-পুরুষ-দিগের ভাব-গতি দেখা আবশ্যক; তাঁহাদের শাসিত প্রজা-পুঞ্জের ভাব-গতিক পর্য্যালোচনা করাও তেমনি প্রয়োজনীয়। বর্ত্তমানে অনেক কারণে বঙ্গের উন্নতি হওয়া আবশ্যক, একথা স্পষ্টিকৃত হইয়াছে। 'ইলবার্ট-বিলের' পর হইতে 'স্কোবল-বিলের' প্রকটন পর্য্যন্ত ধারাবাহিক-রূপে বঙ্গে যে আন্দোলন-স্রোত চলিয়াছে, তাহাতে দুর্ব্বল বাঙ্গালীর শোচনীয় দুর্ব্বলতা পরিস্ফুট হইয়া তাহাদিগকে উন্নতির দিকেই ঠেলিয়া দিতেছে।

মহাত্মা রিপণ-প্রদত্ত আত্ম-শাসন, সুযোগ্য রাজপুরুষগণ দ্বারা নিক্ষিপ্ত বাঙ্গালীর চাকরী-অবরোধ, আন্দোলন-পরম্পরায় যোথ-কারবারাদিতে প্রবৃত্তির উদ্দাম প্রভৃতি উন্নতির উপাদান সম্মুখে আসিতেছে; কিন্তু বাঙ্গালা কি পূর্ব্ববৎ স্থবির ও স্থাণুই থাকিবে?

একথা বলি না যে, বাঙ্গালীর বর্ত্তমান ব্যবহারে উন্নতির আশা একেবারেই তিরোহিত হয়। কতকগুলি অনুষ্ঠানে জাতীয়ত্বের বিকাশ হইবার সাহায্য মিলিবে বলিয়া ভরসা হয়। প্রথম ইংরাজী-শিক্ষার সমকালে বাঙ্গালীর সংসারে যেরূপ উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিয়াছিল, এখন তাহার অনেকটা প্রশমন হইয়াছে। তখনকার শিক্ষিত সম্প্রদায় মদ্যপান, হিন্দু-নিন্দা প্রভৃতিতে বাহাদুরি করিত। কিন্তু এক্ষণে তাহা নহে; শিক্ষিতদিগের মধ্যে পান-দোষাদিও অনেক পরিমাণে কমিয়াছে—তাহাদিগের মধ্যে হিন্দু-বিদ্বেষীর সংখ্যাও হ্রাস হইয়াছে। ব্রাহ্মণ্যের অধিকারী হইতে নাই পরুক, যজ্ঞোপবীতটা যে ছিঁড়িয়া ফেলা, সেটা আর বড় দেখা যায় না। হিন্দুর আচার-ব্যবহারের পবিত্রতা কতকটা অনুভব করিতে শিখিয়াছে। অপরদিকে ত্রিসন্ধ্যাকারী অথচ পাপাচারী ভণ্ডদিগের দলও ক্রমে কমিয়া আসিতেছে। স্ত্রী-স্বাধীনতার উপর শিক্ষিতেরাও সন্দিহান হইতে আরম্ভ করিয়াছেন; অথচ গার্হস্থের আইন অক্ষুণ্ণ রাখিয়াও স্ত্রী-শিক্ষা অল্পে অল্পে উন্নতিলাভ করিতেছে। অপরদিকে গৃহ-লক্ষ্মীদিগের উপর ভক্তি ও বিশ্বাস বাড়িয়াছে। মূর্খ টোলধারী নীরস পণ্ডিতগণের,—

"ন স্ত্রীনামপ্রিয়ঃ কশ্চিৎ প্রিয়োবাপি ন বিদ্যতে।
গাবস্তৃণমিবারণ্যে প্রার্থয়ন্তি নবং নবং ॥"

এই ঘৃণিত মত আর সাধারণের হৃদয়গ্রাহী নহে। তৎপরিবর্ত্তে সাধারণে বুঝিয়াছে যে, বঙ্গ-রমণীগণের পবিত্র সতীত্বই তাহাদের স্বভাব-সিদ্ধ। পুরুষের বহু-বিবাহও কমিয়া আসিয়াছে; বৈধব্য-রক্ষার উপকারিতাও লোকে বুঝিতে শিখিতেছে। চাকরি-প্রাণ বাঙ্গালীর চাকরি-স্পৃহা কিঞ্চিৎ কমিয়া আসিয়াছে। তাহারা চাকরী অপেক্ষা ব্যবসায়াদি করা ভাল একথা বুঝিতে শিখিতেছে; এবং এতদিনকার মান-অপমানের সংজ্ঞা কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিতে বসিয়াছে।

এইরূপ একটু আদটু পরিবর্ত্তনে মনে যে আশার সঞ্চার হয়, ঈশ্বর কি বঙ্গ-দেশের ভাগ্যে সে আশা পূরণ হইবার কথা লিখিয়াছেন? কখনও কি বাঙ্গালী জাতি স্বাবলম্বন-প্রিয় বলিয়া খ্যাতিলাভ করিবে? কখনও কি কর্ম্মঠ বলিয়া বাঙ্গালী অপর জাতির নিকট প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে? পরমুখাপেক্ষী বলিয়া বাঙ্গালীর যে অপবাদ অস্থি-মজ্জাগত হইয়া রহিয়াছে, কখনও কি তাহার ক্ষালন হইবে? দুর্ব্বল, নিরীহ, ক্ষুদ্রাশয়, বিশৃঙ্খল বাঙ্গালী কখনও কি প্রবল জাতীয়ত্ব লাভ করিয়া দাস্য-বৃত্তিকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে শিখিবে, ও আচারে-ব্যবহারে হিন্দু-নামের গৌরব রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে?

তীর্থ-কালিমা।

পাশ্চাত্য সভ্যতা ও পাশ্চাত্য শিক্ষার অনুকম্পায় আমাদিগের জাতীয় জীবন ক্রমশঃ নির্জীব হইয়া পড়িতেছে—হিন্দুর হিন্দুয়ানী অতীতের সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইতেছে—অবিরাম আলোড়ন-বিলোড়নে ধর্ম্ম-কর্ম্ম ক্রমে বিলুপ্ত হইবার উপক্রম হইতেছে। আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা—যাহা সভ্য-মহলে "উচ্চশিক্ষা" বলিয়া পরিগণিত—আমাদের নৈতিক উন্নতি-সাধনের বা চিত্ত-সংযমের কোন উপায় করিতেছে না, বরং শিক্ষাগুণে তদ্বিপরীত ফলই অনেক স্থলে লক্ষিত হইতেছে। এরূপ অবস্থায়, আমাদের শান্ত সরল জাতীয় ভাব, আমাদিগের শ্রদ্ধাভক্তিপূর্ণ ধর্ম্মভাব, ক্রমশঃ বিলীন হইবে—বিচিত্র কি? এই মহা দুর্দ্দিনেও হিন্দুয়ানীর যে সূক্ষ্ম রেখাটুকু অস্ফুটভাবে আমরা সময়ে সময়ে দেখিতে পাইতাম,—ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, সন্ন্যাসী-উদাসীন,

প্রভৃতি ধর্ম্মলিপ্সু লোকের নিকট আমরা যেটুকু ধর্ম্মভাব প্রত্যাশা করিতাম,—কাল-বিপর্য্যয়ে, প্রতারণা-প্রবঞ্চনা, কুটিলতা-মলিনতা, প্রবেশ করিয়া সে ভাবটুকুও সম্পূর্ণ কলুষিত করিয়া ফেলিতেছে। এখন "অপরস্মা কিং ভবিষ্যতি" বলিয়া নীরবে অশ্রুপাত করা ভিন্ন আমাদিগের গত্যন্তর দেখিতেছি না।

আশ্চর্য্যের বিষয়, যেখানে ধর্ম্ম-কর্ম্মের ক্ষেত্র, যেখানকার মঠমন্দির পবিত্র, যেখানকার স্থান-মাহাত্ম্য বিচিত্র,—সেখানেই সারল্য-সততা বিরল, সেইস্থানেই কলঙ্ক-কালিমা প্রোজ্জ্বল, সেই ক্ষেত্রেই শঠতা-লম্পটতা পূর্ণমাত্রায় প্রবল। বারাণসী-বৃন্দাবন হিন্দুর পুণ্যক্ষেত্র, পবিত্র বিশ্রাম-স্থল। দুঃখের বিষয়, ঐ দুই স্থলেই অধিক প্রতারণা, অধিক কুটিলতা, অধিক কলুষিতা;—গোঁয়ার-গুণ্ডা, জালিয়াৎ-জুয়াচোর, বিলাসী বেশ্যার ঐ দুইটীই প্রধান সঙ্গমস্থল;—ধর্ম্ম-কর্ম্মের আবরণে যত ভ্রূণহত্যা, বিশ্বাসঘাতকতা, ঐ সকল স্থানেই আশ্রয় পায়। এই কারণেই হিন্দুর ধর্ম্মের প্রতি লোকের অনাস্থা জন্মে, অহিন্দু প্রকৃত হিন্দুকেও নিতান্ত ঘৃণার চক্ষে দেখে। হিন্দুয়ানীর ঐ প্রাণটুকু সজীব রাখিবার জন্য প্রত্যেক ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর, ঐ সমস্ত কলুষিত ভাব উন্মূলিত করিতে, এখনও কায়মনে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য; তীর্থ-কালিমা যতদিন না পূর্ণমাত্রায় তিরোহিত হয়, ততদিন হিন্দুয়ানীর সজীবতার আশা দুরাশা মাত্র।

সুদূর বারাণসী-বৃন্দাবনের কথা দূরে থাকুক, আমাদিগের বাঙ্গালার মধ্যে, বাটীর পার্শ্বে, প্রধান তীর্থ আজ বিলাসিতার বিনোদক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তারকেশ্বরের মন্দিরে গতিবিধি নাই, বঙ্গীয় হিন্দুসন্তানের মধ্যে, এরূপ লোক নিতান্ত বিরল; 'মানসিক' মিটাইবার জন্য হউক, সন্ন্যাসীর সন্ন্যাসব্রত উদ্যাপনের জন্য হউক, বা নিপীড়িতের শান্তি-সাধনোদ্দেশে বাবার নিকট 'হত্যা' পড়িবার জন্যই হউক, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা শত শত লোক তারকেশ্বরে গমনাগমন করিয়া থাকেন। হিন্দু-রমণীর হৃদয়খানি সহজেই ধর্ম্মভাবে কোমল; বিপদের ঈষত্তরঙ্গাঘাতে উদ্বেলিত-চিত্ত হইয়া তিনি বিপদুদ্ধারের কারণ বিপদ-ভয়-বারণ বিশ্বেশ্বরের পাদপদ্মে বর-কামনায় বাবার দ্বারে উপনীত হয়েন; কিন্তু দুর্দ্দৈবের বিষয়, বাবার দ্বার নিরাপদ নহে, বরং বরবর্ণিণীদিগের পক্ষেই বিষম বিপদশঙ্কুল। মঠধারী মোহান্ত কোথায় আশ্রিত তীর্থযাত্রীর আশ্রয়স্থল হইবেন, না তিনিই সরলা হিন্দুবালার ধর্ম্মনষ্ট করিবার হেতু হইয়া দাঁড়ান! মোহান্তরাজ রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইয়া বিলক্ষণ শাস্তিভোগ করিয়াছেন, এবং সহৃদয় "বঙ্গবাসী" সময়ে সময়ে তাঁহার যে সমস্ত বিচিত্র কাহিনীর কথা লোকসমক্ষে প্রচার করিয়াছেন, সত্য হইলে, তাহাতে, ইহলোকে না হউক, পরলোকেও যে তাঁহাকে অধিকতর শাস্তিভোগ করিতে হইবে, তৎপক্ষে অণুমাত্র সংশয় নাই। কিন্তু তিনি শাস্তিভোগ করুন, আর নাই করুন, লোকসাধারণের তাহাতে শান্তি কোথায়?—তীর্থভূমিই বা তাহাতে নিরাপদ কিসে? আজিকালি তৎসম্বন্ধে কোনরূপ কুৎসার কথা শুনা যায় না বটে, কিন্তু তাহাতেই বা তীর্থের অন্তর্নিহিত কলঙ্করেখা বিলীন হইবে কিরূপে? ত্রিপতির মোহান্তরাজ লইয়াও মধ্যে বিলক্ষণ গোলমাল চলিয়াছিল; একারণে না হউক, অন্যরূপে তিনিও যে সাধারণের সমক্ষে বিলক্ষণ দোষের ভাগী হইয়াছেন, তৎপক্ষে অণুমাত্র সংশয় নাই। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত আছি, মিথিলার অন্তর্গত কোন মঠের মোহান্ত এইরূপ বিলাসিতা ও রূপতৃষ্ণার দাস; ধর্ম্মানুভূতির বিন্দুমাত্র লক্ষণ তাঁহার হৃদয়-মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে কি না, সর্ব্বান্তর্যামী বিধাতাই জানেন; কিন্তু, প্রকাশ্যতঃ, তিনি বিলাসিতা

ও অসাধুতার জীবন্ত ছবি—সাহেবী ছাঁদে সুদৃশ্য পরিচ্ছদে আঁটা একটী ঘোর তামসিক বাবু।

অনুসন্ধান করিলে, ধর্ম্মের আবরণে অধর্ম্মের কাণ্ড এইরূপ অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়। যতদূর বুঝা যায়, অর্থই এই সমস্ত অনর্থের মূল; মোহান্ত মহারাজেরা দেবতার নামে দেশের টাকা আত্মসাৎ করিয়া ঘোর বিষয়ী হইয়া পড়েন,—বিষয়ের সঙ্গে স্বভাবতঃই বাসনা বাড়ে, এবং ক্রমে তদনুসঙ্গিক মোহ ও বুদ্ধি-বিপর্য্যয় ঘটে; তখন আর কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না, আকাঙ্ক্ষার স্রোত শতমুখী হইয়া রূপ-তৃষ্ণা, ধনলিপ্সা, যথেচ্ছাচারিতা, প্রভৃতি বিবিধ আকারে পরিণত হয়। দুঃখের বিষয়, হিন্দুসমাজ এই সমস্ত দেখিয়া শুনিয়াও অন্ধ—ধর্ম্মক্ষেত্রের কলুষিত ভাব দূরীভূত করিয়া তথায় পবিত্রতা স্থাপন করিতে একেবারে নিশ্চেষ্ট। মঠধারী মোহান্তের হস্তে যাহাতে অবাধে অর্থাগম না হইতে পারে, তৎপক্ষে লক্ষ্য রাখা হিন্দুসমাজের বিশেষ কর্ত্তব্য বোধ হয়। দেবতা, সাধারণের সমান সম্পত্তি;—তাহা ব্যক্তিবিশেষের অর্থাগমের উপায় হওয়া এবং সেই অর্থ তাহার স্বকীয় সুখ-চরিতার্থতায় নিয়োজিত হওয়া, যে নিতান্ত অবৈধ, ইহা সহজ জ্ঞানেই বুঝা যায়; সাধারণে, জানিয়া শুনিয়া, এই অবৈধতাকে কেন প্রশ্রয় দেন, আমরা বুঝিতে পারি না। সচরাচর দেখা যায়, মোহান্ত আপন মনোমত কোন শিষ্য গ্রহণ করিয়া তাহাকে পুত্র-নির্ব্বিশেষে প্রতি-পালন করেন, এবং, মোহান্তের পরলোকপ্রাপ্তে, সেই শিষ্যই মঠাধিকারী হইয়া পড়েন। শিষ্য, সদাচার শিক্ষা করা দূরে থাকুক, কৈশোর হইতেই গুরুর নিকট বিলাস-সখের আস্বাদ পাইয়া থাকেন; ক্রমে স্বয়ং কর্ত্তা হওয়ায় বিলা-সেরও বিলক্ষণ গুরুত্ব বাড়িয়া যায়। এইরূপ—মোহান্তের দ্বারা তাঁহার উত্তরাধিকারী মোহান্ত নির্ব্বাচন—প্রথা মঠের পক্ষে নিতান্ত অমঙ্গ[illegible] কর। দেশের গণ্যমান্য পণ্ডিত-উপাধ্যা[illegible] সদাচারী স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের সমিতি দ্বা[illegible] বিষয়-নির্লিপ্ত, ধর্ম্মপরায়ণ এবং প্রবীণ মোহা[illegible] নির্ব্বাচন করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়, এবং তৎ[illegible] সঙ্গে মঠের মূলধনে মোহান্তের যাহাতে সম্য[illegible] কর্ত্তৃত্ব না থাকে, তদ্রূপ বিধান বিবিবদ্ধ করা[illegible] অন্যতম কর্ত্তব্য। দেবোদ্দেশে দত্ত সম[illegible] সম্পত্তি কেবল দেবালয়ের উন্নতি-কল্পে[illegible] ব্যয়িত হইবার সামগ্রী; তদ্ভিন্ন, দীন-দরিদ্রে[illegible] জন্য অন্নসত্র সংস্থাপন, দুর্ভিক্ষাদি দৈব দুর্বি[illegible] পাকে যথোপযুক্ত আনুকূল্যসাধন, অতিথি[illegible] অভ্যাগতের যথারীতি সৎকার-পালন, প্রভৃ[illegible] লোকহিতকর কার্য্যও ঐ অর্থ হইতে অনু[illegible]ষ্ঠেয়। মোহান্তজী যথাবিধানে ঐ সমস্ত কা[illegible] সম্পন্ন করেন কি না, উল্লিখিত নির্ব্বাচক-সমি[illegible] সময়ে সময়ে পর্য্যবেক্ষণ করিলেই মঠে কো[illegible] রূপ অনাচারের আশঙ্কা থাকে না। হি[illegible] সমাজ স্বধর্ম্মরক্ষার খাতিরে কি এই কর্ত্তব্য[illegible] পালন করিবেন না? আজকাল কলিকা[illegible] মহানগরীতে "ধর্ম্মমণ্ডলী" প্রতিষ্ঠিত হইতেছে[illegible] সুদূর ইন্দ্রপ্রস্থে "ভারত-ধর্ম্ম-মহা-মণ্ডলীর" [illegible] হইয়াছে, এবং ভারতের চতুর্দ্দিকেই প্র[illegible] সনাতন হিন্দুধর্ম্ম-রক্ষিণী সভা গঠিত হইয়াছে[illegible] ইহাঁদিগের অন্যান্য কার্য্যের সঙ্গে তীর্থকালি[illegible] অপনোদনের প্রতি কিঞ্চিৎ লক্ষ্য থাকিলে[illegible] এই কার্য্য সহজে সম্পন্ন হইতে পারে; আ[illegible] "অনুসন্ধান" কেবল সহরের ক্ষুদ্রচেতা ব্য[illegible] সায়ীগণের নগণ্য প্রতারণা-প্রবঞ্চনা অনুসন্ধা[illegible] ব্যাপৃত না থাকিয়া যদি উল্লিখিত ভাবের তী[illegible] কালিমা অনুসন্ধানে নিজ-কর্ত্তব্যের প্র[illegible] বৃদ্ধি করেন, তবে হিন্দুসমাজের সমধিক উ[illegible]কার সংসাধিত হয়।

তীর্থক্ষেত্রের আর এক কলঙ্ক—যা[illegible] নিকট অযথা অর্থপীড়ন। আমরা স্বচ[illegible] দেখিয়াছি, শ্রীবৃন্দাবনে গোঁসাইজীদি[illegible]

[illegible]পক্ষে তাঁহাদিগের আদেশমত অর্থ 'ভেট' [illegible]তে না পারিলে, রাধাগোবিন্দজীর মুখারবিন্দ [illegible]নের 'পরওয়ানা'ই পাওয়া যায় না। অন্যান্য [illegible]ল তীর্থেই মঠাধ্যক্ষ কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগের, [illegible]াধিক্য পরিমাণে, এইরূপ অর্থশোষণ-[illegible]লী প্রবল আছে। ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত [illegible]য়া তীর্থযাত্রী কত দূর দেশান্তর হইতে [illegible]তাদর্শনে গমন করে; তথায় তাহার সাধ্য-[illegible] অর্থ যে সে দেবোদ্দেশে 'দর্শনী' দিবে, [illegible]তে বিন্দুমাত্র সংশয় জন্মিতে পারে না। [illegible] মঠাধ্যক্ষ মহাত্মারা তাহা কোন মতেই [illegible]াস করেন না—যাত্রীর অবস্থার প্রতি [illegible] না করিয়া তাহার নিকট অযথা অর্থ [illegible]ঞা করেন, এবং যতক্ষণ সে তাহা, কোন [illegible]কে, দিতে না পারে, তাহার দেবদর্শনোৎ-[illegible] অন্তরে দারুণ মর্ম্মপীড়া দেন। ধর্ম্মাধি-[illegible]ণ এই সমস্ত ভণ্ড-ধর্ম্মীদিগের কি কোন [illegible]ধর্ম্মশিক্ষা সম্ভবে না? শ্রী——

মতামত।

পুস্তক-সম্বন্ধে।

[illegible]গীতা, হাওয়া, মাধুরী, শৈল।—চারিখানি [illegible]াস। শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক [illegible]শিত। মূল্য প্রত্যেকের।০ আনা; কিন্তু একত্রে [illegible]খানিই লইলে ৷৷০ আট আনা। গীতা বা প্রেম, হাওয়া বা ভালবাসা, মাধুরী বা ভক্তি, শৈল বা রহস্য [illegible]চারিখানি পুস্তকের এই নাম বা নামে পরিচয়। ক্ষুদ্র [illegible] চারিটি গল্পে—এই চারিখানি পুস্তকে—দেখান [illegible]ছে প্রেম, দেখান হইয়াছে ভালবাসা, দেখান [illegible]ছে ভক্তি, দেখান হইয়াছে রহস্য। ফলতঃ পুস্তক [illegible]নিই পড়িতে কৌতূহলোদ্দীপক—পড়িতে আরম্ভ [illegible] স্বতঃই শেষ করিতে প্রবৃত্তি জন্মে। বিশেষতঃ [illegible]তিনখানি গল্পাংশে আরও মনোহর।

[illegible]বুদ্ধদেব।—তাঁহার জীবনী ও ধর্ম্মনীতি।—[illegible]ার রামদাস সেন প্রণীত। মূল্য ১৲ একটাকা। [illegible] এখানি একখানি পুস্তকের মত পুস্তক। স্বর্গীয় [illegible] রামদাস সেনের অনুসন্ধিৎসা, গবেষণা ও [illegible]লতার পরিচয় ইহাতেও যথেষ্ট আছে। বুদ্ধ-দেবের জীবনী ও ধর্ম্মনীতি বিষয়ে যিনিই আলোচনা করিবেন, এপুস্তক তাঁহারই পাঠ করা কর্ত্তব্য। পণ্ডিত-বর কালীবর বেদান্তবাগীস মহাশয় এই পুস্তকের ভূমি-কায় লিখিয়াছেন,—"তাঁহার (রামদাস বাবুর) আশা ছিল, লোকে আমার প্রচারিত বুদ্ধদেব পুস্তক পাঠ করিয়া অসন্দিগ্ধরূপে বুদ্ধজীবন ও বুদ্ধধর্ম্ম বুঝিতে সক্ষম হইবে। অনুমান করি, ইহার প্রচারে তাঁহার সেই সদভিপ্রায় সিদ্ধ হইয়াছে।" বাস্তবিকই তাই। বুদ্ধ-দেব সম্বন্ধে অনেক পুরাতত্ত্বই এপুস্তকে সংগৃহীত হইয়াছে। বুদ্ধের আবির্ভাব হইতে তাঁহার নির্ব্বাণ পর্য্যন্ত সকল বিষয়ই উহাতে বর্ণিত আছে। কাল-নির্ণয়, বংশ-নির্ণয়, উপদেশাবলী-সংগ্রহ বড়ই অনুসন্ধানের ফল। ৺ রামদাস বাবুর অন্যান্য গ্রন্থগুলির মধ্যে এখানিও একখানি উপাদেয় হইয়াছে।

শিশুহার।—শ্রী রসিকলাল দে প্রণীত।—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি বালক-পাঠ্য কবিতা। কবিতাগুলি সরল।

ধর্ম্মবিজ্ঞান।—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে প্রণীত। এই পুস্তকে ধর্ম্মের সহিত বিজ্ঞানের কি সম্বন্ধ, আপ্তবাক্যের গৌরব, পুরুষকার ও দৈবের তত্ত্বকথা, ঈশ্বর-তত্ত্ব, হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রভৃতি হিন্দুধর্ম্ম-সংক্রান্ত কয়েকটি বিষয় অতি সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই পুস্তকের 'ধর্ম্মশাস্ত্র,' 'ঈশ্বর-তত্ত্ব' প্রভৃতি কয়েকটি বিষয় গত বর্ষের 'অনুসন্ধানে' প্রকাশিত হইয়াছিল; এবং তাহার সহিত 'আপ্তবাক্য, 'পুরুষকার' প্রভৃতি কতকগুলি নূতন বিষয় সংযোজিত করিয়াই এই পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। যখন 'অনুসন্ধানে' ঐ সকল বিষয় প্রকাশিত হইতেছিল, তখন 'অনুসন্ধানের' অনেক পাঠকই আগ্রহ-সহকারে উহা পাঠ করিতেন; এবং সকলেই উহাতে পরিতুষ্ট ছিলেন। সুতরাং এখন আর এ পুস্তকের অধিক পরিচয় অনাবশ্যক—সে পরিচয়ে একপক্ষে আমাদের আত্মশ্লাঘা-মাত্রই করা হয়। বিশেষতঃ পণ্ডিত বীরেশ্বর বাবু 'অনুসন্ধানের' পাঠক মহাশয়গণের নিকট অপরিচিত নহেন—তাঁহার লেখাও সকলেই দেখিয়াছেন। সুতরাং এখন আর নূতন করিয়া কি বলিব! ফলতঃ ধর্ম্মপিপাসু হিন্দুর নিকট এ পুস্তক যে সমস্ত আদরলাভ করিবে, তাহা বলা বাহুল্য।

বিবিধ বিষয়ে।

—বি, সি. চাটুর্য্যি এণ্ড কোং, ৫নং মিসন রো, কলিকাতা হইতে 'জ্বর-নির্ব্বাণ রস' প্রভৃতি ঔষধের যে বিজ্ঞাপন বাহির করেন, পরিচয়ে জানিলাম, তাঁহার ঔষধাদি মন্দ নহে। আমাদের কোন কোন বন্ধু-বান্ধব তাঁহার 'জ্বর-নির্ব্বাণ রস' ব্যবহারে উপকার পাইয়াছেন জানিয়া, বড়ই সুখী হইয়াছি।

—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর পাঁড়ে মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে—তাঁহারই পুস্তকের দোকানের সহিত, একটি দেশী কাপড়ের দোকান খোলা হইয়াছে। দেশী জিনিস ব্যবহারে যাঁহাদের উৎসাহ আছে, তাঁহারা এই সকল দোকানে যে উৎসাহ দিবেন, তাহা বলা বাহুল্য। বিশেষতঃ জানা গেল, এখানে একরূপ সকল [illegible]

কাপড় সংগৃহীত হইয়াছে যে, "দেখিলে কিছুতেই বিলাতী কাপড় কিনিতে প্রবৃত্তি হইবে না। ১৷৷০ টাকা ১৸০মূল্যে যোড়া ধুতি উড়ানি উত্তম আটপৌড়ে ব্যবহার চলিবে ও ২৷৷০, ৩৲ টাকা মূল্যের কাপড় পোষাকিও চলিতে পারে। ১০, ১৷৵০ যোড়ার কাপড়ও ব্যবহার চলে। দেশী লংক্লথ প্রভৃতিও যোগাড় হইয়াছে।"

অনুসন্ধান-সমিতির বিবরণী।

প্রতারণা-প্রবঞ্চনা।

সরকার এণ্ড কোং—গরাণহাটা,

এই কারবারের বিরুদ্ধে আমরা মধ্যে মধ্যেই নানা অভিযোগ পাই। কেন এরূপ হয়, জানি না। যাইহোক, কর্ত্তব্য-বোধে ঐরূপ অভিযোগ-পত্র একখানি এইস্থানেই প্রকটিত হইল। যথা,—

" নিবেদনমিদম্,—শুনিলাম, আপনারা মফঃস্বলবাসীদিগকে কলিকাতার প্রতারক-দিগের হস্ত হইতে মুক্ত করিতেছেন; সেই কারণ আমিও আপনাদিগকে একটী ঘটনার বিষয় বলিতেছি।

ঘটনা,—'সরকার এণ্ড কোং' এক বিজ্ঞাপন দেয় যে, যে ব্যক্তি ৩০এ চৈত্র মধ্যে আড়াই টাকা দিয়া মায় সরঞ্জাম একটী রবার-ষ্ট্যাম্পের গ্রাহক হইবেক, তাহাকে ৬ খানি পুস্তক* ও ছুইখানি ছবি উপহার দিব। ইহাতে আমি একটী ষ্ট্যাম্পের গ্রাহক হই। ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ তারিখে সরঞ্জাম-সহ একটী রবার-ষ্ট্যাম্প ভিঃ পি পোষ্টে আমার নিকট উপস্থিত হয়। আমি উপযুক্ত চার্য্য দিয়া সেই ষ্ট্যাম্পটী গ্রহণ করি। যে নাম ও যেরূপ আকারের ষ্ট্যাম্প লইয়াছি, তাহার একটী প্রতিকৃতিও এই পত্রের শিরোভাগে দিলাম। ষ্টাম্পটী গ্রহণ করিয়া উপহারীয় পুস্তক ও ছবির জন্য উক্ত কোম্পানীকে রিপ্লাই-কার্ড লিখি। ২২এ মে তারিখে একটী রিপ্লাই-কার্ডের উত্তর পাই; তাহাতে লেখা আছে যে,—'আপনার এক রিপ্লাই-কার্ড পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইলাম। আপনার টাকা আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তজ্জন্য কোন চিন্তা করিবেন না। আপনার পুস্তক পাঠাইতে বিলম্বের কারণ আর কিছুই নহে; কোন কারণ-বশতঃ আমাদের একটী মকর্দ্দমা চলিতেছে, সেই কারণ নানা গোলযোগ-বশতঃ পাঠাইতে বিলম্ব হইয়াছে। গোলমাল মিটিলেই আপনার পুস্তক প্রেরিত হইবে; কোন চিন্তা নাই। নিবেদন ইতি ২২এ মে। বশম্বদ সরকার এণ্ড কোং।'

পুস্তক পাঠাইতে বিলম্ব দেখিয়া, পুনরায় আর একখানি রিপ্লাই-কার্ড লিখি। ১৮ই জুন তারিখে তাহার উত্তর পাই। তাহাতে লেখা আছে যে,—'মহাশয়, আপনার টাকা আমাদের হস্তগত হইয়াছে, তজ্জন্য কোন চিন্তা করিবেন না। কোন অনিবার্য্য কারণ-বশতঃ পুস্তক পাঠাইতে বিলম্ব হইয়াছে; তজ্জন্য অপরাধ ক্ষমা করিবেন। যথা-সময়ে পুস্তক ও ছবি প্রেরিত হইবে; সেজন্য ভীত হইবেন না। পুস্তক ও ছবি নিশ্চয়ই পাইবেন। নিবেদন ইতি ১৮ই জুন। বশম্বদ সরকার এণ্ড কোং।'

পুনরায় আমি আর একখানি রিপ্লাই-কার্ড লিখি। ৩০এ বৈশাখ তাহার উত্তর প্রাপ্ত হই; তাহাতে লেখা আছে যে,—'মহাশয়, কোন অনিবার্য্য কারণ-বশতঃ পুস্তক পাঠাইতে বিলম্ব হইয়াছে, তজ্জন্য অপরাধ ক্ষমা করিবেন। যথা-সময়ে উপহারের পুস্তক ও চিত্র প্রেরিত হইবে; তজ্জন্য কোন চিন্তা করিবেন না। ইতি ৩০এ বৈশাখ। বশম্বদ সরকার এণ্ড কোং।'

কিন্তু মহাশয়, অদ্যাবধিও উপহারীয় পুস্তক ও ছবিগুলি প্রাপ্ত না হইয়া আপনাদিগের আশ্রয় লইলাম।

অনুগত শ্রীশ্যামাচরণ নন্দী,
২য় শিক্ষক গুড়াপ স্কুল, ডাস্তাড়া পোষ্ট, হুগলি।

আমরা এসম্বন্ধে আর কিছু বলিব না। অনেকগুলি পত্র পাইয়াছি—অনেকেই অভিযোগ করেন। এখন, কোম্পানী আমাদিগকে কি উত্তর দেন, দেখিবার বাসনা।

সাহেব কোম্পানীর

নাম দিয়া, আজকাল যত বিজ্ঞাপন বাহির হয়, তাহার অধিকাংশই বাঙ্গালীর কারবার। বাঙ্গালী,সাহেবী নামে কারবার করিয়া লোকের চোখে ধাঁধা দেয় মাত্র। মফঃস্বলের লোকেরা সাহেবের দোকান—সাহেবী জিনিস মনে করিয়া ঐ সকল দ্রব্যাদি ক্রয় করেন; কিন্তু অবশেষে ঠকিয়া থাকেন। বিশেষতঃ প্যাটেন্ট ঔষধ প্রভৃতিতেই এই সকল নাম আরও চলিয়া থাকে। আমরা সাধারণকে এবিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে বলি।

---

* পুস্তক কয়খানির নাম। যথা,— ১। হরিদাসীর গুপ্তকথা, ২। কৃষ্ণলীলা-রহস্য, ৩। আদর্শ নারী, ৪। জ্যোতিঃ ৫। সৌভাগ্য-লক্ষ্মী, ৬। কাণাকড়ি।

অনুসন্ধান
অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র।

৫ম খণ্ড] ১৫ই অগ্রহায়ণ, ১২৯৮। [৮ম সংখ্যা।

কালী-কীর্ত্তন।

(৺রামপ্রসাদি সুর।)

মন! যাবে সমন-আবাসে—
'এ কথা' কি তোর মনে ভাসে?
এবে আপন বশী, তার কেহ না রবে পাশে।
(ও তোর) পঞ্চভূতাত্মক দেহ,
পঞ্চভূতে যাবে মিশে॥
...ন ইতি ক্ষিতি, ভবার্ণবে রবে ভেসে,
(ওরে) অগাধ অতল জলে,
জীবন যৌবন যাবে প'শে॥
...) ধর্ম্মাধর্ম্ম মিত্রবৈরী,দু'জন যাবে সঙ্গীবেশে।
তারা যমরাজাকে সাক্ষী দিবে,
স্বকর্ম্ম-ফল ভোগ বে শেষে॥
জীবনান্ত দিন, ভ্রান্ত! ভাবনারে কেন, বসে।
হবে দেহ ক্লান্ত,মন অশান্ত,একান্ত যন্ত্রণা বেশে॥
(ওরে) শ্মশানে তোর্ বিবেক্ হয় না,
হয় না জ্ঞান উপদেশে।
বৃথা ঘূরে-ফিরে মন-পামরা,
মরিস্ যেয়ে দেশ-বিদেশে॥
যবে যমদূত আসি, বস্‌বে রে তোর শয্যা ঘেঁসে।
সাধন-ভজন বিনা, রে মন!
তখন ত্রাণ পাবে কিসে?।
(ওরে) মুক্তি-পথের যুক্তি ধর,
শেষে কি আর পাবে দিশে?
ভক্তিভাবে শক্তি সেবে,শান্তিরসে যাওনা মিশে॥
দ্বিজ রোহিণী কয়, থাক্‌তে সময়,
দিবানিশি ঘরে বসে,
সেব, মায়ের চরণ, ওরে ও মন!
সমন ভয় আর থাক্‌বে কিসে?।

অদৃষ্ট।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

দাদার চিঠি।

আমার চাকরি যাওয়ায় যে আমি একেবারে দরিদ্র হইয়া পড়িলাম, তাহা নহে। পাঠকবর্গ জানেন যে, ইতিপূর্ব্বে আমি পিতৃশ্রাদ্ধ-উপলক্ষে যে সমস্ত জমাজমী বন্ধক দিয়াছিলাম, তাহা পরে ছাড়াইয়া লইয়াছিলাম, এবং অন্যান্য জমাজমীও খরিদ করিয়াছিলাম। পৈতৃক সম্পত্তি ও আমার স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তিতে পল্লিগ্রামে আমার ন্যায় লোকের অনায়াসেই চলিয়া যাইতে পারিত। কিন্তু চাল-চলনটা কিঞ্চিৎ সঙ্কীর্ণ করিতে হইত। সেই চাল-চলন সঙ্কীর্ণ সম্বন্ধেও আমি নূতন হইতাম না। আমাদিগের গ্রামের একজন বর্দ্ধমান-রাজ-সরকারে কর্ম্ম করিতেন। ছুটী-উপলক্ষে বাটী আসিলে, তিনি প্রত্যহ তিন-চারিবার বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন করিতেন। সে বস্ত্রাদি ধুতি-চাদর নহে; পাঠক যেন তাহা মনে না করেন। সে সমস্ত চাপকান, ইজের ইত্যাদি। আমরা তখন অতি অল্প-বয়স্ক ছিলাম। তাঁহাকে দূর হইতে দেখিয়াই ভয়ে পলায়ন করিতাম। ক্রমে এই মহাত্মাকে একখানি গামছা পরিয়া স্নানের পূর্ব্বে আঁস্তাকুড় পরিষ্কার করিতে দেখিয়াছি।

সুতরাং চাল-চলন সঙ্কীর্ণ বিষয়ে আমার কোন ভয় বা আপত্তি ছিল না। মহামায়ারও ছিল না। কিন্তু হঠাৎ পরিবর্ত্তন দর্শন করিয়া মাতা কি মনে করিবেন, এই আমার এক আশঙ্কা হইল। তাঁহার শ্রবণ-শক্তি এক্ষণে অত্যন্ত হ্রাস হইয়াছে বটে, কিন্তু দর্শন-শক্তি পূর্ব্বের ন্যায়ই আছে। তিনি পাছে হ্রস্ব চাল-চলন দেখিয়া কোন কথা জিজ্ঞাসা করেন, অথবা কোন দুঃখপ্রকাশ করেন, এইজন্য আমি সমস্তই পূর্ব্ববৎ রাখিলাম। পাড়ার লোকে নানা কথা কহিতে লাগিল; তাহাতে আমি কর্ণপাতও করিতাম না। সেই নাক-ভাঙ্গা বাবুটী কত কথা কহিলেন, তাহা বলা যায় না। দুই একটা কিন্তু না বলিলেও নয়। তিনি অন্যান্য লোকদিগের নিকট কহিলেন যে,—"তিনি বাল্যকালে ইংরেজী পুস্তকে পড়িয়াছিলেন বিপদ কখন একাকী আইসে না। যখন আসিতে আরম্ভ করে, তখন একেবারে পালে পালে আসিয়া পড়ে। নতুবা শ্বশুরের সহিত উহার বিবাদ হইবে কেন? উহার স্ত্রী তো কম্পাউণ্ডারের স্ত্রী—সে কম্পাউণ্ডারও কর্ম্মচ্যুত! তবু আপন পিত্রালয়ে গিয়া আপনার ভগ্নীপতি জয়গোপালকে চাটি রাঁধিয়া দিতে পারিবেন না! ওরে জয়গোপাল কি তোর মতন লোক? মনে কল্লে কাল মুন্সেফ হ'য়ে পেয়াদা দ্বারা তোর বাড়ী-ঘর-দোর 'কল্সীর' জলে ফেলে দিতে পারে!" এস্থলে বলা উচিত, আমাদিগের গ্রাম ও আমার শ্বশুর-বাটীর গ্রামের মধ্যে যে নদীটী ছিল, তাহার নাম কল্সী।

এইরূপ নানা কথা নানাস্থান হইতে আমার কর্ণকুহরে লৌহ-শলাকার ন্যায় প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। কিন্তু আমি সে সমস্ত একেবারেই গ্রাহ্য করিলাম না। বরঞ্চ আমি পূর্ব্বে যাহা করি নাই, এক্ষণে তাহা করিতে লাগিলাম। পূর্ব্বে আমার বাটীতে একজন মাত্র দাসী ছিল। এক্ষণে একজন চাকর রাখিলাম, ও সর্ব্বদা বাটীতে থাকিতে হইবে বলিয়া বাটীর সম্মুখে একখানি ঘর প্রস্তুত করিলাম। তাহাতে আবার দু'একজনে পরস্পর জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল,—'ঘরখানি যখন বিক্রয় হইবে, তখন কত মূল্যে বিক্রয় হইবার সম্ভাবনা।"

এইরূপ কয়েক দিবস অবস্থিতি করিতেছি, এমন সময় আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট হইতে একখানি পত্র পাইলাম। তিনি যেখানে ওকালতি করিতেন, আমিও সেইখানে কম্পাউণ্ডারের কার্য্য করিতাম। তাঁহার সহিত সর্ব্বদা দেখা-শুনা হইত; তাঁহার বাটীর কাহারও পীড়া হইলে আমিই দেখিতাম ও বিনামূল্যে ঔষধাদি দান করিতাম। আমি তথায় থাকিতে থাকিতে তাঁহার একটী কন্যার বিবাহ হইয়াছিল; তাহাতে আমি অর্থ-দান ও কায়িক পরিশ্রম উভয়রূপে যথেষ্ট তাঁহার উপকার করিয়াছিলাম। এক্ষণে আমার চাকরী যাওয়ায় তাঁহার মনে ভয় হইল, পাছে আমি তাঁহার নিকট কোন দায় জানাইয়া অর্থ বা অন্য কোন সাহায্য প্রার্থনা করি; সেইজন্যই তাঁহার চিটি-খানি লেখা। লিখিয়াছিলেন, তাঁহার মধ্যম কন্যা বিবাহ-যোগ্যা হইয়াছে ও জ্যেষ্ঠ পুত্রটীরও বিবাহ দিতে হইবেক; অতএব যদি আমি তাঁহাকে এক্ষণে পাঁচ শত টাকা কর্জ্জ দিতে পারি, তাহা হইলে তিনি বিশেষ উপকৃত হইবেন। এ পত্রখানি ডাকে পাঠাইয়া দেন নাই। একজন ব্যক্তি আনিয়া পত্রখানি আমাকে দিল। আমি প্রথমে মনে করিলাম, দাদার যথার্থই অর্থ-কষ্ট হইয়াছে, এইজন্য একজন লোক দিয়া পত্রখানি আমার নিকট পাঠাইয়াছেন। আমি কি উত্তর দিব, স্থির করিতে পারিতেছি না, এমন সময় পত্রবাহক চলিয়া যাইবার উপক্রম করিল দেখিয়া, আমি জিজ্ঞাসিলাম,—"তুমি পত্রের জবাব লইয়া যাইবে না?" সে কহিল,—"কিসের জবাব?"

আমি কহিলাম,—"যে পত্র আনিয়াছ, তাহার জবাব?" আমার কথা শুনিয়া পত্রবাহক রাগত হইয়া কহিল,—"এইআড়াই ক্রোশ রাস্তা খাতিরে চলে এলাম; তার উপর আবার জবাব নিয়ে যেতে হবে নাকি? তবুত মকর্দ্দমা জিতি নাই!" এই বলিয়া, পত্রবাহক চলিয়া গেল। আমি পত্রখানি হস্তে লইয়া আসিয়া মহামায়াকে পড়িয়া শুনাইলাম।

মহামায়া শুনিয়া কহিল,—"এ পত্রখানি কখনই তোমার দাদার বুদ্ধিতে লেখা হয় নাই। তুমি যাহা মনে মনে করিয়াছ, তাহাই ঠিক বটে। পাছে চাকরী গিয়াছে বলিয়া তুমি কিছু চাও, তাহাই বন্ধ করিবার জন্য পত্রখানি লেখা হইয়াছে। কিন্তু এ আমার দিদির বুদ্ধির ফল, বড় ঠাকুরের নয়?"

আমার ইতিপূর্ব্বেই তাহা বোধ হইয়াছিল; এক্ষণে মহামায়ার কথা শুনিয়া আমার বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইল। আমি তৎক্ষণাৎ পত্রের জবাব না দিয়া দুই তিন দিন দেরী করিলাম। পরে লিখিয়া দিলাম,—"আপনি তো আমার অবস্থার বিষয় সমস্তই অবগত আছেন। আমি কখনও দশ টাকার অধিক বেতন পাই নাই। আর উপরি যাহা পাইয়াছি, তাহা আমার বাসা খরচেই পর্য্যবসিত হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে চাকরী যাওয়া অবধি আমি একরূপ কষ্টেই পড়িয়াছি। অধিকন্তু মাতার বার্দ্ধক্য। তিনি যে আর অধিক দিবস বাঁচিবেন, তাহা বোধ হয় না। কখন যে এ ঘটনা ঘটিবে, তাহার ঠিক নাই। সে ভীষণ সময়ে যে আমি কি করিব, তাহা ভাবিয়া পাইতেছি না।" আরও লিখিলাম যে,—"আমার পরামর্শে এই কন্যার ও পুত্রের বিবাহে যেন অধিক টাকা ব্যয় না করেন; এবং যখন যে কার্য্য করিবেন, মাতার শেষ-কালের উপর দৃষ্টি রাখিয়া যেন করেন। এখন কোন কার্য্যে অধিক ব্যয় করিলে, আর পরে মাতৃশ্রাদ্ধে অল্প ব্যয় করিলে, লোকে নিন্দা করিবেই করিবে।" এইরূপ নানাপ্রকার কথা লিখিয়া, চিঠিখানি ডাকে পাঠাইয়া দিলাম।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

শ্বশুর-জামাই হাটে।

সঞ্চিত অর্থ নিষ্কর্ম্মা হইয়া ব্যয় করিতে আরম্ভ করিলে, তাহাতে আর কত কাল কুলায়? প্রথমে যখন চাকর নিযুক্ত করিয়াছিলাম, তখন ভাবিলাম, আমি কার্য্যস্থলে থাকিতে একজন চাকর ও একজন ব্রাহ্মণ রাখিতাম; তা'ছাড়া, তখন দুটা বাটী ছিল, একটী আমার গ্রামে ও আর একটী আমার কার্য্যস্থলে। আমার চাকরী যখন গেল, তখন ভাবিলাম, দুটা বাটীর আর সমস্ত খরচ উঠিয়া গেল, তবে কেন একজন ভৃত্য রাখিতে পারিব না? এই ভাবিয়া চাকরটীকে রাখা হইয়াছিল। বিশেষ মনে করিয়াছিলাম, চিরকালই কিছু আমায় বসিয়া থাকিতে হইবে না। ঘরে বসিয়া চিকিৎসা ব্যবসায় করিয়া অন্ততঃ চাকরটীর বেতনের ও আহারের উপযোগী অর্থও পাইব! পরে যাহা জমা-জমী হইতে আয় হইবে, তাহাতে কষ্টে-শ্রষ্টে আমাদিগের সংসারের ব্যয় চলিয়া যাইবে। কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা ঘটিল না। অগ্রে যাহারা আমাকে ডাকিত, তাহারা আর ডাকে না। আমাদিগের গ্রামে আর একজন আমার ন্যায় পণ্ডিত ডাক্তার ছিলেন। সকলেই তাঁহাকে ডাকিতেন। আমি যখন ছুটী লইয়া বাটী আসিতাম, তখন সকলেই আমাকে ডাকিতেন। আমি তখন মনে করিতাম যে, লোকে তাঁহাপেক্ষা আমাকে অধিক শ্রদ্ধা করে, এই জন্যই আমাকে ডাকে। তখন অবশ্য আমি কাহারও নিকট হইতে পয়সা লইতাম না। লোকে যে সেই কারণেই আমাকে ডাকিত, তাহা আমি এতদিন পরে জানিতে পারিলাম। কারণ, কার্য্য যাওয়ার পর, যখন নিজ-গ্রামে চিকিৎসা-ব্যবসায় করিতে বসিলাম, তখন

সকলেই জানিতে পারিল—আমিও টাকা লইব। তখন আর কেহই আমাকে ডাকে না। তবে আমার বাটীর নিতান্ত নিকটবর্ত্তী দুই চারি জনে ডাকিতেন। তাঁহাদিগের নিকট হইতে কোন ক্রমেই টাকা লওয়া যাইতে পারে না। এই দুই চারি জনই কেবল আমার প্রশংসা করিতেন, এবং আমার বাটী আসিয়া থাকায় ইহাঁদেরই উপকার হইয়াছিল। কারণ, গ্রামস্থ ডাক্তারকে ডাকিলে যে অর্থ দিতে হইত, আমাকে ডাকিলে তাহা দিতে হইত না।

ক্রমে ক্রমে আমার আর পূর্ব্বের ন্যায় চাল-চলন বজায় রাখা ভার হইয়া উঠিল। তখন মনে করিলাম, আর বাটীতে থাকা কোন ক্রমেই উচিত নহে। দূরে গিয়া অকাতরে যে কষ্ট সহ্য করা যায়, বন্ধুগণের মধ্যে থাকিয়া সেরূপ কষ্ট সহ্য করিতে হইলে অত্যন্ত লজ্জা বোধ হয়। বিশেষ, আমি বাটীতে থাকিয়া এরূপ কষ্ট কখনও সহ্য করি নাই। একটা সংস্কৃত শ্লোকে আছে,—বন্ধুগণের মধ্যে ধনহীন জীবন অতিশয় কষ্টকর; কিন্তু তাহা যে এতদূর কষ্টকর, তাহা পূর্ব্বে জানিতে পারি নাই। জামাগুলি ছিঁড়িয়া যাইতে লাগিল; তৎপরিবর্ত্তে নূতন কয়েকটী প্রস্তুত করিলাম। কিন্তু পূর্ব্বে জামাগুলির কাপড় যেরূপ ছিল, এগুলির সেরূপ হইল না। সেরূপ ছাঁটও হইল না, সেরূপ সেলাইও হইল না। পূর্ব্বে, বাহিরে যাইতে হইলেই, দেশী ধুতি ফরাসডাঙ্গা হইতে ডাকে আনাইয়া পরিতাম; এক্ষণে বিলাতি ধুতির উপর সমস্তই নির্ভর। তাহার ফল এই, ধোয়া খরিদ না করিলে চলিত না; কিন্তু একরূপ গুণের কোরা ধুতি অপেক্ষা ধোয়ার দাম অধিক, তথাপি সেই অধিক দামই দিতে হইত; কারণ, বিলাতি কোরা ধুতি সাফ হইতে ও ছিঁড়িতে যুগপৎ আরম্ভ করে। যাঁহারা ভুক্তভোগী, তাঁহারা একথার সত্যতা অনায়াসেই জানিতে পারিবেন।

সাত-পাঁচ ভাবিয়া, আমি মনে করিলাম, যেস্থানে ওলাউঠার চিকিৎসার জন্য গমন করিয়াছিলাম, সেইখানেই যাইব। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, সে সমস্ত গ্রাম জয়-গোপালের গ্রামের নিকট। আমার তথায় যাইবার প্রস্তাব শ্রবণ করিয়া, মহামায়া কহিল,—"সেখানে আর যাওয়া কোন মতেই উচিত নয়! আর কোন স্থানে গিয়া অল্প উপার্জ্জন করাও ভাল, তথাপি সেস্থানে গিয়া অধিক উপার্জ্জন করা ভাল নহে।" আমি বিস্তর বুঝাইয়া কহিলাম যে, এস্থলে অল্প ও অধিক উপার্জ্জনের কথা হইতেছে না—এস্থলে উপবাস ও উপার্জ্জনের কথা! কারণ, যেস্থানে লোকে আমাকে না চিনে, সেস্থানে কোনই উপার্জ্জন হইবার সম্ভাবনা নাই। যেস্থানে লোকে আমাকে জানে, সেস্থানে কথঞ্চিৎ হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু তথাপি মহামায়ার মন উঠিল না। তখন ভাবিতে লাগিলাম,—আর কোথায় যাই, কোথায় গেলেই বা কিঞ্চিৎ উপার্জ্জন হইবার সম্ভবনা! এইরূপ ভাবিতেছি, ইত্যবসরে আমার লোকাসয়ে মুখ দেখান ভার হইয়া উঠিতে লাগিল। যাহার সহিত সাক্ষাৎ হয়, সেই জিজ্ঞাসা করে,—"কেমন যদু, কিরূপ চলিতেছে?" আমি বরাবর এক জবার দিতাম,—"এখনও কিছু সুবিধা করিতে পারি নাই।" প্রত্যুত্তর শুনিতাম,—"আহা, তখন বুঝে শুঝে কাজ কল্লে না, উপস্থিত চাকরী কি কেহ কখনও ত্যাগ করে?" আমি বলিতাম,—"আমি তো নিজের ইচ্ছায় ত্যাগ করি নাই?" তাহার উত্তর পাইতাম,—"ও ভাই, হলেই হলো! ও সমস্ত একই কথা। চাকরি কর্‌তে নামে, কেবল ওপারে (অর্থাৎ আমার শ্বশুর-বাড়ী) গিয়া পড়িয়া থাকিতে, আর মাস-কাবার হইলে এক একবার বেতন পাইবার দিন ডাক্তারখানায় যাইতে!" আমার শ্বশুর-মহাশয় পূর্ব্বে আমার সহিত বাক্যলাপ করিতেন না; কিন্তু ইদানীং

আমার দুরদৃষ্ট দেখিয়া, তাঁহার দণ্ড তীক্ষ্ণতর করিবার নিমিত্ত, আমার সহিত কথা-বার্ত্তা আরম্ভ করিলেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি, আমাদিগের পুলিস-থানা আমাদিগের শ্বশুর-বাটীর গ্রামে; আমাদিগের হাটও সেই, অর্থাৎ আমার শ্বশুর-বাটীর গ্রামে। সুতরাং প্রতি হাটবারে আমাকে সে গ্রামে হাট করিবার জন্য যাইতে হইত; এবং ঐ হাটে শ্বশুর-মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইত। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, পূর্ব্বে পূর্ব্বে তাঁহার সহিত কালে-ভাদ্র সাক্ষাৎ হইত; কিন্তু আজকাল প্রতি হাটেই সাক্ষাৎ হইতে লাগিল। শ্বশুর-মহাশয় কি যত্ন করিয়া যাহাতে আমার সহিত সাক্ষাৎ হয় এইরূপ বন্দোবস্ত করিতেন, কিম্বা দৈবযোগে এরূপ ঘটনা ঘটিত, তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু এখন সে সময়ের কথা ভাবিয়া দেখিলে বোধ হয়, তিনি যত্ন করিয়াই যাহাতে আমার সহিত সাক্ষাৎ হয়, তাহার তদ্বির করিতেন। যাহাই হউক, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইলেই আমার মন খারাপ হইয়া যাইত। সাক্ষাৎ হইলেই, প্রথমতঃ তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন,—"যদু, তুমি যে হাটে আসিয়াছ?" আমি কহিতাম,—"আমি তো প্রতি হাটেই আসিয়া থাকি!" শ্বশুর মহাশয় যেন আমাকে কখনও হাটে দেখেন নাই, এই ভান করিয়া কহিতেন,—"কই আগে তো তোমাকে হাটে দেখিতাম না?" আমি কহিতাম,—"যখন বিদেশে থাকিতাম, তখন কি প্রকারে হাটে আসি?" শ্বশুর-মহাশয় কহিতেন,—"বটে বটে, কিন্তু আমার সংস্কার ছিল, তুমি কখনই হাটে আইস না।" পরে আমার পশ্চাতে আমার ভৃত্যের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কহিতেন,—"নবনে, তুই কোথায় যাচ্ছিস্?" আমার চাকরের নাম নবীন! নবীন কথা কহিতে না কহিতে আমি বলিতাম,—"ও এখন আমার বাড়ীই থাকে?" তখন শ্বশুর-মহাশয় কহিতেন,—"বটে, বটে!" বোধ হয়, পাঠক বুঝিয়াছেন যে, আমি জয়গোপালের জন্য জলখাবার আনিতে যাই নাই, সেইজন্য এই সমস্ত কথা হইত।

এইরূপ দিন কয়েক যায়, এক দিবস বর্ষা-কালে ধোপা অনেক দিন কাপড় ফেরত না দেওয়ায়, আমি অপেক্ষাকৃত মলিন বস্ত্র পরিয়া হাটে গিয়াছি। শ্বশুর-মহাশয়ের অবস্থা এক্ষণে যতদূর ভাল হইতে পারে, ততদূর ভাল হইয়াছে। জয়গোপালের প্রসাদে এক্ষণে তিনি তাঁহার নিজের গ্রামের নায়েব হইয়াছেন। সুতরাং তিনি এক্ষণে একজন বড়-মানুষ। হাটের বড় মাছটী, নূতন তরকারিটী, তিনিই খরিদ করেন। আমার মলিন বস্ত্র দর্শন করিয়া, পূর্ব্বে পূর্ব্বে যেরূপ বিদ্রূপ হইত, তাহার পর অদ্য কহিলেন,—"তোমার কি এত অধিক বেসাতি, যে, একটা চাকর রাখতে হয়? যা কিন্‌তে হয়, নিজে হাতে করিয়া লইয়া গেলেই পার?" তাঁহার কথা শুনিয়া রাগে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। আমি কহিলাম,—"মহাশয়, পণ্ডিত হইয়া একথা কহিলেন, ইহাতে বড় কষ্ট বোধ হইতেছে। অপরে একথা বলিলে আমি হাসিয়া উড়াইয়া দিতাম। কিন্তু আপনি পড়া-শুনা করিয়া কহিলেন কেন? আপনি কি জানেন না যে, চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানিচ সুখানি চ।"

শ্বশুর।—ভাল ভাল, তুমি শাস্ত্রাভ্যাস করিয়াছ। ইহাতে বড় সন্তুষ্ট হইলাম।

এই বলিয়া একটু হাসিলেন। আমি কহিলাম,—"বাঙ্গালায় একটা কথা আছে,—যত হাসি তত কান্না, বলে গেছে রাম শর্ম্মা।"

শ্বশুর।—ঠিক্—ঠিক্! যাহা বলিয়াছ, সমস্তই সত্য। আমার ছোট কন্যাটীর বিবাহ দিয়া আমি যেরূপ আনন্দে হাসিতেছি, বড় কন্যাটীর বিবাহের দরুণ সেইরূপ নিরানন্দে কাঁদিতেছি।

আমি কহিলাম,—"তবু ভাল! মহামায়া যে

আপনার কন্যা ইহা স্মরণ করিয়াছেন, এ কথা আমার মুখে শুনিলে সে অবশ্যই আহ্লাদিত হইবে। ফলে মহামায়ার বিবাহের জন্য যে আপনি কাঁদিতেছেন, এত আর নূতন কথা নহে! বিবাহের প্রস্তাবের সময়েও আপনাকে কাঁদিতে হইয়াছিল। আপনার পৈতা দিয়া আমার হাত-দুখানি ধরিয়া যখন কাঁদিয়াছিলেন, সে কথা কি এত পুরাতন হইল যে, আপনার স্মরণ নাই?

শ্বশুর।—কন্যা পাত্রস্থ করিতে গেলে সকলেরই চক্ষে জল পড়ে। বিশেষ, জানিয়া-শুনিয়া তাহাকে দুঃখসাগরে নিমগ্ন করিতে হইলে, কোন্ পাষাণ হৃদয় আছে যে না কাঁদিয়া থাকিতে পারে!

আমি কহিলাম,—"তবে যেখানে কষ্ট পাইবে না, সেইখানেই কেন দিলেন না?"

শ্বশুর।—প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ—কাহার সাধ্য খণ্ডন করে?

আমি উত্তর করিলাম,—"তবে আমি একটী কথা নিবেদন করি—শুনিলে আপনি যথার্থই সুখী হইবেন। আপনি বলিতেছেন, আপনার কন্যাকে দুঃখসাগরে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু আপনার কন্যা সেরূপ বিবেচনা করে না। আপনি ইতিপূর্ব্বেই তাহার বাক্যে ও কার্য্যে জানিতে পারিয়াছেন; এক্ষণেও আমি আপনাকে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি, আপনার কন্যা আমার মঙ্গল-কামনা না করিয়া জলগ্রহণ করে না। আমার সহিত তাহার বিবাহ দেওয়ায় সে যেরূপ সুখী হইয়াছে মনে করে, অতুল ঐশ্বর্য্য-শালী ভূপতির সহিত তাহার বিবাহ হইলে তাহার বিবেচনায় এরূপ সুখী হইত না।"

শ্বশুর।—আহা, তাহার পিতা-মাতার কি পুণ্য! তাহার পিতা-মাতার পুণ্য এরূপ না থাকিলে, কন্যা এত কষ্টে পড়িয়াও সুখী হইয়াছে মনে করে!

শ্বশুর-মহাশয়কে বাক্য-যুদ্ধে পরাস্ত করিতে না পারিয়া, আমার রাগ দশগুণ বৃদ্ধি হইল। পাছে হিতে বিপরীত হয় এই ভাবিয়া, আমি তাঁহার পুণ্যের কথায় কি বলিব তাহা না শুনিয়া, সত্বর তথা হইতে চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিলেন। আমি তাঁহার বস্ত্র ধরিয়া কহিলাম,—"মহাশয়, অদ্যকার এই কথা স্মরণ করিয়া রাখিবেন। ইহার প্রতিফল অবশ্যই ফলিবে—ফলিবে, ফলিবে—সন্দেহ নাই।"

"ধেড়ের শাপে গাং শুখায় না"—এই কথা বলিয়া, ঘৃণাত্মক দৃষ্টিতে আমার প্রতি তাকাইয়া দেখিয়া, শ্বশুর-মহাশয় চলিয়া গেলেন।

অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ।

শ্বশুরের উন্নতি।

পূর্ব্বাধ্যায়ে বিবৃত শ্বশুর-মহাশয়ের উচ্চ কথার কারণ জয়গোপালের উচ্চাবস্থা। অদৃষ্ট অতি অল্প লোককে এরূপ আনুকূল্য করিয়া থাকেন। তাঁহার ওকালতিতে যে কেবল টাকা আসিতে আরম্ভ হইল, এরূপ নহে। বোধ হয় অনেকেই বিদিত আছেন যে, অনেক মকর্দ্দমায় দুই পক্ষ লড়িয়া লড়িয়া এরূপ অর্থ-বিষয়ে দুর্ব্বল হইয়া পড়ে যে, যে বিষয় লইয়া মকর্দ্দমা তাহা খরচার দাবিতে বিক্রয় হইয়া যায়। জয়গোপাল এইরূপ অবকাশে আপনার ও অপরের অনেক মক্কেলের যথা-সর্ব্বস্ব যত অল্প মূল্যে হয় খরিদ করিয়া লইতেন। এ উপায় ভিন্ন তাঁহার বিষয়-আশয় বৃদ্ধি করিবার আর এক উপায় ছিল; সে উপায়টী কেবল জয়গোপাল বাবুর ন্যায় বুদ্ধিমান ব্যক্তি ভিন্ন, আর কেহই বোধ হয় অবলম্বন দূরে থাকুক, শতকরা নিরনব্বই জন উকিলের বুদ্ধিতে সে অভিসন্ধি কখনও আইসে না। অভিসন্ধিটী অতি সামান্য; কিন্তু সহরবাসী পাঠক বুঝিতে পারিবেন কি না সন্দেহ। অভিসন্ধিটী সংক্ষেপতঃ এই,—বঙ্গদেশে এরূপ জমীদার অনেক আছে যে, তাঁহাদিগের লাটের কিস্তির খা

জুটিয়া উঠে না। পৈত্রিক, কৌলিক কার্য্য-কর্ম্ম করিতে করিতে তাঁহাদিগের খাজানার জন্য সঞ্চিত অর্থ পর্য্যন্ত ফুরাইয়া যায়। পিতৃ-পিতামহেরা যে আয়ে যে সমস্ত কার্য্যকলাপ করিতেন, এক্ষণে সে ব্যয়ে সে সমস্ত সম্যক সমাধা হয় না; অথচ সেগুলিকে স্থগিত করিতেও পারেন না। সুতরাং লাটের খাজানা ভাঙ্গিয়া তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা উপস্থিত কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে হয়। পরে,লাটের দিনের অগ্রে যদি সে টাকাসংগ্রহ করিতে পারেন,তবে ভালই; নচেৎ তাঁহাদিগকে কর্জ্জ করিয়া লাটের খাজানা দিতে হয়। জয়গোপাল এইরূপ বিপন্ন জমীদারদিগকে অর্থ কর্জ্জ দিলেন। এরূপ অর্থের সুদ মাসিক শতকরা অতি অল্প পরিমাণে পাঁচ টাকা। কখন কখন ৩০৲ ত্রিশ টাকা পর্য্যন্তও হইয়া থাকে। জয়গোপাল এইরূপ অবস্থায় অর্থ দিয়া অতি অল্প দিনের মধ্যেই যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করিলেন। কিন্তু বস্তুতঃ তাঁহার যত অর্থ হইল, প্রতিবাসিবর্গ তাহাকে অন্ততঃ দশ গুণ অধিক করিয়া ধরিয়া লইত। পরের ধন আর নিজের পরমায়ু কেহই অল্প দেখে না—একথা ত সকলেরই জানা আছে! সুতরাং প্রতিবাসিবর্গের এরূপ কল্পনায় আশ্চর্য্য হইবার বিষয় কিছুই নাই।

দুই এক বৎসর এইরূপ যায়। অন্যান্য জন কয়েক অপর উকীলেও এ অভিসন্ধি শিখিয়া লইল। বস্তুতঃ মফস্বলে উকীলদিগের ন্যায় ধনবান ব্যক্তি অতি অল্প; সুতরাং অর্থের প্রয়োজন হইলে সকলেই তাঁহাদিগের নিকট যায়। জয়গোপাল দেখিলেন, তাঁহার ব্যবসায়ে ভাগী আসিয়া দেখা দিল; তখন তিনি পূর্ব্ব অভিসন্ধি আর একটু উন্নত করিলেন। তিনি ঘোষণা করিয়া দিলেন, যে ব্যক্তি যত সুদে টাকা কর্জ্জ দিবেন, তিনি অন্ততঃ তাহার শতকরা এক টাকা কমে দিবেন। সুতরাং তাঁহার ব্যবসায় পূর্ব্বে যেরূপ গুলজার ছিল, এক্ষণেও পুনরায় সেইরূপ দাঁড়াইল। কিন্তু অন্যান্য উকীলেরাও যখন সেইরূপ আরম্ভ করিলেন, তখন জয়গোপালও একেবারে বুদ্ধির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করাইলেন; তিনি কোম্পানিরদর সুদে টাকা কর্জ্জ দিতে লাগিলেন। সুতরাং সকলেই তাঁহার নিকট অর্থ কর্জ্জ করিতে যাইতে লাগিলেন। কিন্তু ইহার মধ্যে বুদ্ধির সূক্ষ্মতা এই যে, তিনি ঘরে বসিয়া টাকা দিতেন না। কাছারী গিয়া টাকা দিতেন। দুই-একবার এইরূপ দিলেন, পরে "দিচ্ছি, এই দিচ্ছি" বলিয়া দেরী করিয়া, মহল নিলামে চড়াইয়া অল্প মূল্যে খরিদ করিতে লাগিলেন। এইরূপ অনেক মহল খরিদ করিয়া, পরিশেষে আপনার নিজগ্রাম ও তাঁহার শ্বশুর-বাটীর গ্রাম খরিদ করিয়া লইলেন। নিজের গ্রামে তাঁহার পিতাকে নায়েব করিয়া দিলেন ও তাঁহার শ্বশুরকে শ্বশুর-বাটীর গ্রামের নায়েব করিয়া দিলেন।

যোগ ও যোগানুষ্ঠান। *

প্রাচীন স্মৃতিকারগণও যোগের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। এইস্থানে সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ প্রদর্শিত হইতেছে। মহর্ষি হারীত স্বীয় সংহিতায় লিখিয়াছেন,—

"যোগশাস্ত্রং প্রবক্ষ্যামি, সংক্ষেপাৎ সারমুত্তমং।
যস্যচ শ্রবণাদ্‌যান্তি মোক্ষঞ্চৈব মুমুক্ষবঃ।২॥"

অর্থ,—আমি সংক্ষেপে উত্তম সারগর্ভ যোগশাস্ত্র বলিতেছি, যে যোগশাস্ত্রের শ্রবণাধীন মুক্তির ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ মোক্ষ প্রাপ্ত হয়।

"যোগাভ্যাসবলেনৈব নশ্যেয়ুঃ পাতকানিতু।
তস্মাদ্যোগ পরোভূত্বা ধ্যায়েন্নিত্যং ক্রিয়াপরঃ।৩॥"

অর্থ,—যোগাভ্যাসরূপ বলদ্বারা সমুদয় পাতক বিনষ্ট হয়। অতএব বিহিত কর্ম্মাচরণ-পূর্ব্বক যোগানুরক্ত হইয়া অবিরত ঈশ্বরধ্যানে রত হইবে।

* এই বর্ষের ৬ষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর।

"প্রাণায়ামেন বচনং প্রত্যাহারেণচেন্দ্রিয়ং।
ধারণাভির্ব্বশেকৃত্বা পূর্ব্বং দুর্ধর্ষণং মনঃ। ৪॥
একাকারমনানন্দং বুধৈরূপমনাময়ং!
সূক্ষ্মাৎসূক্ষ্মতরংধ্যায়েজ্জগদাধারমুচ্যতে॥ ৫।"

অর্থ,—যোগিগণ প্রাণায়াম দ্বারা (প্রাণ-বায়ুর ধারণ দ্বারা) বাক্যের সংযম করিবেক। প্রত্যাহার দ্বারা (ইন্দ্রিয়ার্থ বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় সকল আহরণ দ্বারা) ইন্দ্রিয়দিগকে বশীভূত করিবেক, এবং ধারণা (অদ্বিতীয় পরব্রহ্মে অন্তঃকরণের অভিনিবেশ) দ্বারা প্রথমতঃ দুর্দ্দম্য মনকে বশীভূত করিয়া, এক অদ্বিতীয় নিবীড়ানন্দ স্বরূপ, সূক্ষ্মতর নিরাময়রূপ পরব্রহ্মকে ধ্যান করিবেক। পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক এইরূপ কথিত হইয়াছে।

"আত্মানং বহিরন্তস্থং শুদ্ধচামীকরপ্রভং।
রহস্যেকান্তমাসীনো ধ্যায়েদামরণান্তিকং॥ ৬।"

অর্থ,—নির্জ্জন স্থানে যোগশাস্ত্রোক্ত যে কোন প্রকার আসনে আসীন হইয়া বাহ্য ও অভ্যন্তরস্থ বিশুদ্ধ প্রতপ্ত স্বর্ণবর্ণবৎ আত্মাকে মরণ-সময় পর্য্যন্ত চিন্তা (ধ্যান) করিবেক।

"আত্মলাভসুখং যাবৎ তপোধ্যানমুদীরিতং।
শ্রুতিস্মৃত্যুদিত ধর্ম্মং তদ্বিরুদ্ধং নচাচরেৎ॥৭।"

অর্থ,—যাবৎ কাল পর্য্যন্ত আত্মসাক্ষাৎকার-জনিত সুখানুভব হয়, তাবৎ কাল পর্য্যন্ত তপস্যা ও ধ্যানানুষ্ঠান কথিত হয়। এবং আত্ম-সাক্ষাৎকারের বিরোধী বেদ বা স্মৃত্যুক্ত কোনও কার্য্য করিবেক না। অর্থাৎ আত্ম-সাক্ষাৎকার হইলে, ধ্যানই ক্রমে ধ্যেয়রূপে পরিণত হইয়া সমাধি জন্মিবে। তৎকালে বেদ বা স্মৃতি-বিহিত কার্য্যানুষ্ঠানের কোন আবশ্যকতা নাই।

বিদ্যাতপোভ্যাং সম্পন্নোব্রাহ্মণো যাগতৎপরঃ।
দেহদ্বয়ং বিহায়াস্ত মুক্তো ভবতি বন্ধনাৎ।
নতথাক্ষীণদেহস্য বিনাশোবিদ্যতে ক্বচিৎ।১১॥

অর্থ,—বিদ্যাতত্ত্বজ্ঞান ও তপস্যা-সম্পন্ন যোগ-তৎপর ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ স্থূলশরীর (ভৌতিক দেহ) ও সূক্ষ্ম শরীর (১৭শ বা ১৮শ বা মত-ভেদে ১৯শতি অবয়বাত্মক লিঙ্গ-শরীর) এই শরীরদ্বয় কর্ম্ম-বন্ধন হইতে শীঘ্র মুক্ত হয়। কারণ, শরীরাবচ্ছিন্ন তদাত্মা কোন কালেও পূর্ব্ব শরীরদ্বয়ের ন্যায় আর বিনাশ প্রাপ্ত হইবে না। (তাঁহারও নির্ব্বাণ হইবে।)

মনু প্রভৃতি ঊনবিংশতি স্মৃতি-সংহিতা-কর্ত্তারাও স্বীয় স্বীয় সংহিতায় প্রসঙ্গতঃ যোগাঙ্গ-বিষয় সকলের বর্ণন করিয়াছেন। বাহুল্য-ভয়ে বিস্তারে বিরত রহিলাম। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে যোগীশ্বর যোগীন্দ্র প্রভৃতি বহুতর যোগনিষ্ঠের সম্বোধন মুনিগণ করিয়াছেন। যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতার প্রারম্ভে "যোগীশ্বরং যাজ্ঞবল্ক্যং-সংপূজ্য মুনয়ো ব্রুবন্", "মিথিলাস্থ সযোগীন্দ্রঃ ক্ষণং ধ্যাত্বাব্রবীন্ মুনীন্।" ইত্যাদি। যোগীবর জনকের রাজধানীতে তাঁহার রাজত্ব-কালে যোগানুশীলনের বিশেষ চর্চ্চা ছিল। যোগী যাজ্ঞবল্ক্য তৎকালের মহর্ষি বলিয়া যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা দৃষ্টে প্রতীতি হয়; অন্যথা "মিথিলাস্থ" এই বিশ্লেষণ সংহিতায় প্রযুক্ত হওয়ার তাৎপর্য্য থাকে না। রাজার যে ধর্ম্মে বিশেষ অনুরাগ, ধর্ম্মযাজক মহর্ষিগণ ও তদ্ধর্ম্মাবলম্বী হন। জনকের যোগসিদ্ধের প্রমাণ, পুরাণ ও ইতিহাস-প্রসঙ্গ সমূহ; তদ্বিস্তার অপ্রসঙ্গ বলিলেও হয়। কিন্তু ত্রেতাযুগেও যে আর্য্যদিগের মধ্যে যোগানুশীলন ছিল, তদ্বিষয়ের প্রমাণার্থে স্মৃতিকার যোগী যাজ্ঞবল্ক্যের ও মহারাজ জনকের প্রসঙ্গ করা হইল। অষ্টাবক্র মুনি জনককে অষ্টাবক্র-সংহিতা দ্বারা অষ্টাঙ্গ যোগোপদেশ করেন; সুতরাং যোগ সর্ব্বোৎকর্ষ ধর্ম্ম বলিয়াই আর্য্য-ধর্ম্মে অক্ষুন্নভাবে বিরাজ করিতেছে।

পুরাণ-সমূহেও অবিকল পাতঞ্জল-দর্শনানুমোদিত অষ্টাঙ্গ যোগ সকল প্রদর্শিত হইয়াছে। এস্থলে কতিপয় পুরাণের মাত্র

উল্লেখ করিতেছি। অগ্নি-পুরাণে মুনিগণ-পৃষ্ট অগ্নিদেব ক্রিয়াযোগ বিশদরূপে বলিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণের ৬ষ্ঠ অংশের ৭ম অধ্যায়ে প্রশ্নকর্ত্তা খাণ্ডিক্যমুনিকে উত্তরদাতা কেশিধ্বজ মুনি অষ্টাঙ্গ যোগ অতীব উত্তমরূপে বলিয়াছেন। পাতঞ্জল-দর্শনের ভাষ্য-ব্যাখ্যায় অবিকল এই অংশ বাচস্পতি মিশ্র উদ্ধৃত করিয়াছেন; এবং ব্যাখ্যাও এই মতানুগতই করিয়াছেন।

এক্ষণে, যোগশাস্ত্র-প্রতিপাদ্য বিষয় সকল একপ্রকার বলিয়াই, বাহুল্য-ভয়ে বিষ্ণুপুরাণের বিস্তৃতাংশ প্রকাশ করিতে বিরত রহিলাম।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণের জন্মখণ্ডের বিংশতি অধ্যায়ে স্বয়ং ব্রহ্মা যোগশাস্ত্র বলিয়া সাধকদিগকে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। ইহাতে প্রাণায়াম-ধারণা-ধ্যান, এই তিন বিষয়ই বাহুল্যরূপে উক্ত হইয়াছে। গরুড়-পুরাণের ১৪শ অধ্যায়ে হরি ও হর (বিষ্ণুশিব) যোগ-শাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিয়া ধ্যান-যোগ অতীব মনোজ্ঞরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। মার্কণ্ডেয়-পুরাণান্তর্গত যোগি-চিকিৎসাধ্যায়ে যোগশাস্ত্র বলিয়া যোগবিঘ্ন-সম্ভূত রোগযুক্ত যোগির চিকিৎসা সকল বলিয়াছেন। ঘেরণ্ড সংহিতায়ও বহু রোগ-বিনাশের প্রক্রিয়া উক্ত হইয়াছে।

এইস্থানে গরুড়-পুরাণের ৪৯ অধ্যায় হইতে অষ্টাঙ্গ যোগের সারাংশ উদ্ধৃত হইল। যথা,—

"মুক্তিরষ্টাঙ্গ বিজ্ঞানাৎ সংক্ষেপাত্তু ব্যদশৃণু।
যমাঃ পঞ্চত্বহিংসাদ্যা অহিংসাপ্রাণ্যহিংসনং॥
সত্যং ভূতহিতংবাক্যমপ্তেয়ং স্বাগ্রহং পরং।
অমৈথুনং ব্রহ্মচর্য্যং সর্ব্বত্যাগোঽপরিগ্রহঃ॥"

যেই অষ্টাঙ্গ যোগ অবগত হইলে মুক্তিলাভ করিতে পারে, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর;—

১। অহিংসাদি পাঁচকে যম বলে।—(১) অহিংসা অর্থাৎ প্রাণীদিগকে হিংসা না করা। (২) সর্ব্বভূতহিতকর বাক্যই সত্য। (৩) অস্তেয়, পরধনের (চুরি করিয়া) অগ্রহণ। (৪) ব্রহ্মচর্য্য, স্ত্রীসম্ভোগে বিরত অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ। (৫) অপরিগ্রহ, সর্ব্ববিষয় ত্যাগ।

২। "নিয়মাঃপঞ্চশৌচাদ্যা বাহ্যমভ্যন্তরংদ্বিধা।
শৌচং তুষ্টিশ্চ সন্তোষস্তপশ্চেন্দ্রিয়নিগ্রহঃ॥
স্বাধ্যায়ঃ স্যান্মন্ত্রজপঃ প্রণিধানং হরের্যজিং॥

নিয়ম পাঁচ প্রকার:—তন্মধ্যে (১) শৌচ—বাহ্য ও অভ্যন্তর-শুদ্ধিভেদে দ্বিবিধ। (২) সন্তোষ—সর্ব্বদা সন্তুষ্ট। (৩) তপঃ—ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ করা, (সংযত-ইন্দ্রিয় হওয়া) (৪) স্বাধ্যায়—প্রণবাদি মন্ত্রজপ। (৫) প্রণিধান—ঈশ্বরে একাগ্রতা-পূর্ব্বক আরাধনা।

৩। "আসনংপদ্মকাদ্যুক্তং প্রাণায়ামোমরুজ্জয়ঃ।
মন্ত্রধ্যানযুতো গর্ভো বিপরীতোহ্যগর্ভকঃ।
অগর্ভাত্তু সগর্ভস্থঃ প্রাণায়ামস্ততোঽধিকঃ॥"

পদ্মাসনাদি আসন পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

৪। বায়ুর ধারণাধীন প্রাণায়াম হয়। প্রাণায়াম দ্বিবিধ। মন্ত্র ও ঈশ্বরধ্যানযুক্ত প্রাণায়াম সগর্ভ। তদ্রহিত প্রাণায়াম অগর্ভ। অগর্ভ হইতে সগর্ভ প্রাণায়াম শ্রেষ্ঠ।

"এবংদ্বিধাত্রিধাপ্যুক্তঃ পূরণাৎ পূরকঃ সচ।
কুম্ভকো নিশ্চলত্বাৎ স রেচনাদ্রেচকস্ত্রিধা॥

পূর্ব্বোক্ত সগর্ভনিগর্ভ প্রাণায়াম মাত্রাভেদে ত্রিবিধ। বায়ুর পূরণাধীন আকর্ষিত বায়ুর নাম পূরক। শরীরাভ্যন্তরে আকর্ষিত বায়ুর স্থিরতাধীন তাহার নাম কুম্ভক। এবং উক্ত বায়ুর রেচনাধীন তাহার নাম রেচক।

"লঘুদ্বাদশমাত্রঃ স্যাৎ চতুর্বিংশতিকঃ পরঃ।
ষট্‌ত্রিংশন্মাত্রিকঃ শ্রেষ্ঠঃ প্রত্যাহারশ্চরোধনং॥"

অর্থ,—দ্বাদশ মাত্রিক (অর্থাৎ ১২ মাত্রায় পূরণ, ৪৮ মাত্রায় ধারণ, ২৪ মাত্রায় রেচন) প্রাণায়াম লঘু (নিকৃষ্ট); ৯৬ ও ৪৮ মাত্রিক প্রাণায়াম মধ্যম। ৩৬, ১৪৪ ও ৭২ মাত্রিক প্রাণায়াম শ্রেষ্ঠ। (বায়ুধারণ বিচ্ছেদভাবে কর্ত্তব্য। বিরাম শব্দই মাত্রারূপে গণ্য।—উপদেশ-সাপেক্ষ) এই মতে পূর্ব্বোক্ত মতের সহিত মাত্রাগত বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়, এইমতে প্রথম

মাত্রার দ্বিগুণ ও ত্রিগুণ পরে প্রদর্শিত হইয়াছে।

৫। প্রত্যাহার—ইন্দ্রিয়াবরোধ করা।

"ব্রহ্মাত্মচিন্তাধ্যানংস্যাৎ ধারণামনসোধৃতিঃ।
অহংব্রহ্মেত্যবস্থানং সমাধিব্রহ্মণঃ স্থিতিঃ॥"

৬। ব্রহ্মস্বরূপ পরমাত্মার চিন্তার নাম ধ্যান।

৭। ঈশ্বরে মনের ধৈর্য্যের নাম ধারণা।

৮। আমি জীবই ব্রহ্মরূপে অবস্থিত, এইরূপ অভেদভাবে অবস্থানের নাম সমাধি।

এই অধ্যায়ে সমাধির বিষয় সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে; বাহুল্যভয়ে বিরত রহিলাম।

আর বড়াই কাজ নাই!

আমরা বাঙ্গালী, ভাই, বড়ই বড়াই ভালবাসি। যখন সকল সারবত্তা হারাইতে বসিয়াছি, তখনও বড়াই কমে না—একি এ বালাই! উড়িয়ার মার-খাওয়ার মত যত মার খাবে, ততই বলিবে—"মার দেখি এইবার!" এ বিড়ম্বনা আর কেন! সংস্কারক বা হিন্দু যে কেহ বাঙ্গালী আছ, ইচ্ছা করিলেই, পরস্পরের শত ছিদ্র বাহির করিতে পার; কিন্তু নিজের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া যদি অপরের দোষগুলি' গুণিতে বসিয়া যাও, তবে তোমার 'শট্‌কেতে' আসিবে না—কারণ, 'পরের দোষ আকাশ-জোড়া!' পরস্পরের দোষোল্লেখের আমোদে বেশ তর্জ্জা গাওয়ার সুখ উপলব্ধি হইবে বটে; কিন্তু, গাহনা যেমনই হউক, তোমাদের উভয়কে তর্জ্জাদারের অপেক্ষা উন্নত পদ ত কেহই দিবে না!

ভাই ব্রাহ্ম-সংস্কারক! তোমার সংস্কারের দোহাই দিয়া সাধারণের নিকট যে সহানুভূতি প্রার্থনা কর, সাধারণের অপেক্ষা উচ্চ-স্তর অধিকারে অগ্রসর, তোমার সেই সংস্কারের দুর্দ্দশা একবার চক্ষু মেলিয়া দেখ দেখি! তোমার স্ত্রীশিক্ষার পরিণাম—নাটক-নভেলের আত্যন্তিক আদর, রসিকতার চূড়ান্ত ও অবৈধ পত্রাদি লেখনের প্রবৃত্তিতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তোমার স্ত্রী-স্বাধীনতায়, স্বৈরিণীয় গৃহলক্ষ্মী-নাম হইয়াছে। তোমার পবিত্র প্রেমের পরাকাষ্ঠায় শব-দাহের পরিবর্ত্তে কবর-প্রথার উদ্গম হইতেছে। তোমার আলোক-ঘটার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে স্বেচ্ছাচারিত্বের প্রভাব বর্দ্ধিত হইয়া উচ্ছৃঙ্খল করিয়া ফেলিতেছে। কাজেই মাঝে মাঝে লোকে তোমার পংক্তি বুঝিতে পারে না! তুমি এতই স্বভাব-চরিত্রের আদর্শ-পবিত্রতা ভাল-বাস যে, আশৈশব শত শত প্রলোভনের মধ্যে প্রত্যেক ভ্রাতা-ভগ্নীকে নিমজ্জিত রাখিয়াও, আশা করিতেছ, উহার ভিতর হইতে অগ্নি-সংস্কৃত কাঞ্চন-খণ্ডের ন্যায় কাহার বিমল চরিত্র দেখা দিবে, এবং তাহাই তুমি বিশ্বের সমক্ষে উপস্থিত করিয়া আপ্যায়িত হইবে! কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মে ইতিমধ্যেই যে ছারখারের সূত্রপাত হইবে, তাহার কি ভীষণ পরিণতি, তাহা কি ভাবিতেছ? বা তাহার নিরাকরণের উপায় অবলম্বন করিতেছ? তুমি যে সাম্য-মতাবলম্বী হইয়া নূতনতর সমাজ গড়িয়াছ, সেই সাম্যের প্রভাবে বা অসদ্ভাবে তোমাতেই দলাদলির পাণ্ডা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। তুমি পৌত্তলিক হিন্দু-জাতির মধ্য হইতে বহির্গত হইয়া পুত্তলী-পূজা ছাড়িয়াছ; কিন্তু তোমাকে পরক্ষণেই পুত্তিকা-পূজা আরম্ভ করিতে হইয়াছে। তোমার বল্মীকে স্ত্রী-পুত্তিকা সকল পূজাস্থানই অধিকার করিতে বসিয়াছে! তুমি হতভাগিনীর দুঃখে অধীর হইয়া বিধবা-বিবাহ প্রথম প্রচারিত করিলে, এবং বিবাহে কোর্টসিপ্ চালাইলে! কিন্তু তাহাতে কি ফল ফলিয়াছে!—বিবাহের পবিত্রতা ও ধর্ম্ম-ভাব দূরে গিয়া ইউরোপীয় কামময় পরিণয়ের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে মাত্র! তুমি একমাত্র জ্যোতিঃ-স্বরূপের পূজায় মন দিবে বলিয়া যে সমাজ গঠিলে, তাহাতে রামা, শ্যামা, কান্তে সকলেই ঢুকিল; উপাসনায় তাহাদিগকে তোমার সঙ্গে

সঙ্গে চক্ষু মুদিতে কহিলে! কিন্তু তুমি হয়ত হৃদয়-মাঝে দেখিলে, স্বর্গের সিঁড়ি; তাহারা দেখিল, প্রগাঢ় অন্ধকার! অথচ উভয়েই ভাবিলে, মাথাল-পূজা করা অপেক্ষা সহস্র গুণে উন্নত ব্যাপারের অনুষ্ঠান হইয়া গেল। ফলে অনধিকারীর ভক্তি-পথটী পর্য্যন্ত অবরুদ্ধ হইল।

যাহা হউক ভাই, চটিও না—মাঝে মাঝে আত্মদৃষ্টি-বলে দেখিও ও ভাবিও যে, কি লইয়া সমাজ ছাড়িয়াছিলে, আর এখন কি লইয়াই বা আছ? কি আশায় সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে, আর এখন কত আশাই বা সকল হইয়াছে! হিন্দুও যে মুনিঋষির দোহাই দেয়, তুমিও সেই মুনিঋষির দোহাই দিয়া থাক; তবে কেন উভয়ে ভিন্ন পথে চলিয়াছ? ঋষি-প্রণোদিত ধর্ম্মপন্থা কি, তাহার তথ্যানুসন্ধানে জীবন-ব্যয় করা ভাল; কিন্তু তাঁহাদের দুই একটী অনুকূল বচন লইয়া নিজের একটা অকিঞ্চিৎকর মত চালাইবার উৎসাহের দরকার কি? আর একটা কথা, নিরীহ বাঙ্গালীর একেই জাতীয়ত্বের অভাব, সেই জাতীয়ত্ব-স্থাপনের চেষ্টা না করিয়া তাহার সুদূর-নিহিত যে একটু আধটু চিহ্ন আছে, তাহাও অপলাপ করিতে বসাই কি ভাল! ম্লেচ্ছত্বের আমদানি করিতে কাহার সহানুভূতি পাইবে?

ভাই রাজনৈতিক সংস্কারক! তুমিও অধম বাঙ্গালী জাতির কথা লইয়া মাঝে মাঝে আক্ষেপ কর। বাঙ্গালী অধম বলাতে তোমার উপর কোন রাগ বা অভিমান করিবার কারণ নাই; কিন্তু তুমি যে মাঝে মাঝে যেন ভুলিয়া মনে কর যে তুমি বাঙ্গালী ছাড়া, এই দুঃখ! তোমার বৃথা বড়াই শুনিয়া বড়ই মর্ম্মাহত হইতে হয়। তুমি দেশ-হিতৈষিতা-হিমাদ্রির তুঙ্গ শৃঙ্গ হইতে কুমারিকা অন্তরীপের সুদূর প্রান্ত পর্য্যন্ত কম্পান্বিত করিতে চাও, জিজ্ঞাসা করি, কতটা স্বার্থ ভাই তুমি নিজে ত্যাগ করিতে পারিয়াছ? তুমি যে আন্দোলন করিতে বসিয়াছ, তাহার মধ্যে তোমার বুকের গুর্‌গুরুনিই বেশী শুনা যাইতেছে। যাহার পরামর্শের পরাকাষ্ঠা তারস্বরে ভিক্ষার্থ প্রস্তুত হওয়া, তাহার আড়ম্বরের প্রয়োজন কি? স্বার্থচিন্তায় ২৪ঘণ্টার মধ্যে ২৩ঘণ্টা ব্যয় করিয়া ঘণ্টা-মাত্র কাল দেশ-হিতৈষিতায় ব্যয়িত করিলে, 'বক্তা' বা 'কম্বক্তা' বলিয়া পরিচিত হইবার সম্ভাবনা বটে; কিন্তু জীবনোৎসর্গ না করিলে তোমা হইতে উপকারের প্রত্যাশা নাই। দেশহিতৈষী শব্দে প্রযুক্ত হইতে হইলে, দেশের সাধারণ জনসমাজের সহিত সহানুভূতি চাই, তাহাদের অবস্থা জানা চাই, তাহাদের মনোভাব জানা চাই, তাহাদের সমাজভুক্ত হওয়া চাই; নতুবা নিজের মনগড়া সংস্কারে—আরমানীর হিন্দুসমাজ উন্নত করিবার চেষ্টার ন্যায়—হাস্যাস্পদ ও ঘৃণিত হইতে হয়। তাই বলি—রাজনৈতিক সংস্কারকদলকে, বড়াই করিবার আগে নিজের অবস্থা চিন্তা করা ভাল।

ভাই বঙ্গবাসীর মনগড়া বাবু! তোমাকে নির্ব্বাক হইয়া অনেক কথা সহিতে হইতেছে; কারণ, তোমার কোন বড়াই করিবার যন্ত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। শুনিতে পাই, তোমার স্থিতি সর্ব্বত্রে; কিন্তু তুমি নাকি ব্রাহ্মের দলেও না, বঙ্গবাসীর দলেও না, গৃহস্থের দলেও না, তোমায় জানেন পঞ্চানন! যেমন ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত রমণী হইতে তিল তিল রূপ সংগৃহীত হইয়া তিলোত্তমার সৃষ্টি হইয়াছিল, তেমনি বোধ করি, বাঙ্গালীর সকল অপগুণ মাত্রায় মাত্রায় সঞ্চিত হইয়া বঙ্গবাসীর বাবু সৃষ্ট হইয়াছে। তবে যদি এরূপ কোন সম্প্রদায়ের উপর লক্ষ্য করিয়া উক্ত শব্দ প্রযুক্ত হয় যে, তাহাদের বড়াই নাই, তাই তাহাদের কেহ চেনে না; তাহারা বাঙ্গালীর অকিঞ্চিৎকরত্ব জানিয়া হেঙ্গামায় যোগদান করে না; বাঙ্গালার

উন্নতির উপায় কমিয়া আসিতেছে জানিয়াও উচ্চকণ্ঠে তাহার উৎকর্ষ-ধ্বজা উড়ায় না; তবে তাহাদেরই প্রদর্শিত পথ বাঙ্গালীর উপযুক্ত। কার্য্যকারিত্বের পূর্ব্বে সুদীর্ঘ বচনরাজি বিন্যাস করা কি ভাল? কিন্তু ভাই বাবু! তুমি যদি ওরূপ নির্ব্বাক না থাকিয়া নানা বেশে মাঝে মাঝে বাহির হইয়া বড়াই করিয়া থাক যে, তোমার অবলম্বিত পথই ধন্য, তাহাহইলে তুমিও চুপে যাও। কারণ, বাঙ্গালীর যে কার্য্য-বৈমুখ্যরূপ চির-কলঙ্ক বিরাজিত, যে ফাঁকিদার তৈয়ার বা শিয়ানা-রূপী বাঙ্গালী সর্ব্ব-সুযোগে বাক্য লইয়া অগুয়ান, তাহার ব্যতিক্রম যতদিন না ঘটিতেছে, ততদিন লোল-দীর্ঘ-রসনা-চেষ্টিত কাহারই মনোহরণ করিতে পারিতেছে না।

আর ভাই বঙ্গবাসীর দল! তোমরাও যে "ছোঁড়াগুলা গোল্লায় গেল" বলিয়া বলিয়া চিরকাল রস-গোল্লায় রহিয়াছে; সংস্কারকদিগকে ও তোমার বাবুদিগকে ব্যথিত-হৃদয় করিবে বলিয়া মাঝে মাঝে বুকে হাত দিবার পরামর্শ দিয়া থাক; কিন্তু তোমার হৃদয়টা বেশ স্বস্তিতে আছে ত? তোমার যতটা বড়াই, ততটার মত একটুও কাজ আছে ত? তোমার দল বলিতে, যাহাদের মুখে হিঁদুয়ানির গোঁড়ামি শুনিতে পাওয়া যায়, অনেকে তাহাদেরই মনে করে। কিন্তু রাগ করিও না, ওরূপ অর্থাপত্তির সঙ্গে সঙ্গে যদি তোমাকে কুঁড়াজালি-হস্তে, চন্দন-রেখাঙ্কিত অঙ্গে, ধূর্ত্ত-চূড়ামণি দলাদলির পাণ্ডা বলিয়া অনুমান হয়! হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিবার লোক বাঙ্গালায় অনেকে আছেন, কিন্তু গোঁড়াদিগের তাহাতে চলে না! তাহাদের বড়ই বড়াই যে, তাহাদের প্রদর্শিত ও অবলম্বিত পথই হিন্দু-দিগের আদর্শ, তাহাদিগের মনের মত না হইলে সে আর হিন্দু হইল না, হয় ব্রাহ্ম নচেৎ বাবু হইয়া গেল! সেই বড়াইদারদের জিজ্ঞাসা করিতে হয়, তাহাদের মধ্যে কয়জনের ব্রাহ্মণ্য আছে! তাহারা যে সমাজের সমর্থনে বদ্ধ-পরিকর, সে সমাজের অবস্থা কি? তাহারা যে সমাজে বিদেশীয় কোন কিছু পাছে প্রবেশ করে সেই ভাবনায় অধীর; স্বদেশীয়ের হাতে সেই সমাজের যে নিগ্রহ হইতেছে, তাহা নিরাকরণে কি কোন চেষ্টা তাহারা করিতেছে, বা তাহাতে সফল হইতেছে?

ভাই, এ সকল কথা চাপা দিবার বা ঢাকা দিবার নহে। যাহারা হিন্দুসমাজ-ভুক্ত, যাহারা ব্রাহ্ম-সংস্কারকাদির চেষ্টা-চরিত্রের অসারতা বুঝিয়া হিন্দুয়ানি মানিতে প্রস্তুত, তাহাদের সকলেরই বর্ত্তমান-সমাজের অবস্থা পর্য্যালোচনা করা উচিত; বিশেষ, গোঁড়ামি করিবার পূর্ব্বে ঘর ঠিক না করিতে পারিলে বড়ই গোল-যোগ! তোমার দোষ তুমি যদি না ধরিতে পার, তোমার ছিদ্রান্বেষীর নিকট তাহার কিছুই ছাপা থাকিবে না—সে তোমার চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিবে! তখন "তোর চেয়ে মোর ভাল" এই এক বৃথা তর্ক অবলম্বন করা অপেক্ষা ঘরের আপদগুলা আপনা-আপনি মিটানই ভাল নয় কি? তোমরা সংস্কারকদিগকে দোষ দাও যে, তাহারা বিধবা-বিবাহ প্রচলিত করিল কেন? বেশ কথা! কিন্তু তোমার সমাজে যে নরাধম দ্বারা বিধবার পবিত্রতা-হানি হয়, তাহাকে প্রশ্রয় দিয়া বিধবার সর্ব্বনাশ করা হয় কেন? কখনও বা অন্যায় অপবাদ তোমাদের নিকট অবাধে স্থান পাইয়া অবলার সর্ব্বনাশ করিতে ব'সে, আর তোমরা নিশ্চেষ্ট থাকিয়া দলাদলির স্রোতে গা ঢালিয়া দাও! এই কি তোমার বঙ্গের বিধবা-রূপ গৃহ-দেবতার পূজা? আমার কথা অবোধ্য হইয়া থাকে, তোমার সমাজে তথ্য লও; দেখিবে—অনেক হতভাগ্য, কারণে-অকারণে, বিধবা কন্যা, ভগ্নী বা অন্য কাহারও অপবাদে সমাজচ্যুত হইয়া রহিয়াছে!

কিন্তু এই গুরুতর ব্যাপারে যে পুরুষের সংশ্রব ছিল, লোকে তাহাকে জানিয়া-শুনিয়াও

দলে রাখিয়াছে। শুনা গিয়াছে, মুসলমান-দিগের আমলে কোন হিন্দু মুসলমানের হস্তে নিগৃহীত হইলে তাহার সমাজ সদম্ভে উক্ত হিন্দুকে জাতিচ্যুত করিত। আজিও বোধ করি, গোঁড়াদিগের বিচার ইহা অপেক্ষা অন্যতর হইবে না। সমাজের জনৈক পুরুষ অপর জাতির হস্তে বিড়ম্বিত হইল—সে বিড়ম্বনার প্রতিশোধ না লইয়া বিড়ম্বিতেরই সর্ব্বনাশ করিতে বসিলে! যে সমাজে এতটা সহানুভূতি, তাহার বালাই লইয়া মরি! পাড়াগাঁয়ের বঙ্গ-সমাজ যদি দেখ, এখনও প্রায় অমনই সহানু-ভূতি দেখিতে পাইবে! দুর্ব্বল দরিদ্র যতই উৎপীড়িত হউক না কেন, সমাজ তাহার অতি অল্পই উপকারে আইসে।

বিবাহের পবিত্রতা ও ধর্ম্মভাব লইয়া যে শ্লাঘা কর, একবার দেখ দেখি, সেই সাধের বিবাহ-প্রথার কি শোচনীয় অবস্থা তোমাদের হাতে হইয়াছে? বল্লাল সেনী কুলীন—মূর্খ-অসভ্য-হলধর—কুলের অহঙ্কারে তোমার সমা-জের শীর্ষস্থান অধিকার করিতে কুণ্ঠিত নহে; ইহাতে কি তোমার মুখে চুণকালি দিতেছে না! কৌলিন্য-প্রথায় আবির্ভূত ঘটক-সম্প্র-দায় অর্থের প্রলোভনে কিনা করিয়াছে! কিন্তু তুমি সেই ঘটকের পরিচয় সর্ব্বথা মান্য করিয়া পাত্রাপাত্র স্থির করিতেছ, ইহা অপেক্ষা বিড়-ম্বনার বিষয় আর কি আছে? তুমি যে মুনি-ঋষিদের দোহাই দিয়া সকল কাজে অগ্রসর, যার-পর-নাই বিবাহ-প্রথায় সেই মহাত্মাদিগের শাসন তুমি ঠেলিয়াছে—শাস্ত্রোক্ত কৌলিন্যে তোমার চলিবার যো নাই! মোহান্ধে এমনই করিয়া বসিয়াছ যে, কন্যাদায় উপস্থিত হইলে এই বিস্তীর্ণ বঙ্গভূমির মধ্যে দুই চারি ঘর ভিন্ন তোমার করণীয় ঘর দেখিতে পাইবে না। এ বিপদ হইতে উদ্ধারের কি ব্যবস্থা করিতেছ, ভাই?

তুমি হিন্দুর ধর্ম্ম লইয়া মাঝে মাঝে বড়ই চীৎকার কর। বেশ কথা! কিন্তু পাঁচজন সাধারণের কথা ছাড়িয়া দিয়া, যাঁহাদিগের হাতে হিন্দুয়ানি রক্ষার ভার, সেই ব্রাহ্মণ-কুল-চূড়ামণি পুরোহিত ও টোলধারী-সম্প্রদায়ের কথাই একবার আলোচনা করিয়া দেখ দেখি! আমাদের দেশে তন্ত্রই প্রধান। দুর্গা-পূজা বাঙ্গালীর সকলেই অনুষ্ঠান করে। কিন্তু, তন্ত্রের পূজা-পদ্ধতি কয় জন জানেন? আমাদের বিশ্বাস, বর্ত্তমান ইউরোপীয় সভ্যতায় প্রকৃতি-বিজ্ঞান যে স্থান অধিকার করিয়াছে, অতীত ভারত-সভ্যতায় আধ্যাত্ম-বিজ্ঞান সেই স্থান অধিকার করিয়াছিল। তন্ত্র সেই আধ্যাত্ম-বিজ্ঞানের ফল। কৃতকর্ম্মা তান্ত্রিক, কৃতকর্ম্মা বিজ্ঞান-বিদের ন্যায় প্রকৃতির উপর অধিকার বিস্তার করেন। জিজ্ঞাসা করি, উপরি উক্ত মহাজন-দিগের মধ্যে কয়জন ওরূপ ফলবান তান্ত্রিক আছেন? ব্রাহ্মণের অপকর্ষ না হইলে হিন্দুর অবনতি হইত না। উৎকৃষ্ট ব্রাহ্মণ যতদিন না বঙ্গদেশ আলোকিত করিতেছেন, ততদিন কথায় কথায় কিছুই হইবে না। শ্রাদ্ধ-সভায় পল্লব-গ্রাহীদিগের দুই চারিটা শ্লোক শুনাইতে পাইলেই কি হিন্দুর চূড়ান্ত উৎকর্ষ দেখান হইল? তবে কেন বড়াই ভাই! পরিচয়ের স্থল হউক, দেখাইবার জিনিষ হউক, তখন বড় গলা করিয়া বলিও যে,—"পবিত্র সমাজ কাহাকে বলে, জগৎ একবার দেখুক।" হিন্দুধর্ম্ম ত মজা-ইবার বা ভজাইবার ধর্ম্ম নহে! হিন্দুর ব্রাহ্মণের মান্য ত জোর করিয়া আনিতে হয় না! যাঁহার ব্রাহ্মণ্য আছে, সাধারণ অবনত শিরে তাঁহার পদতলে আশ্রয় লইবে। কিন্তু তুমি যে একটা ভণ্ড ভেকধারীকে ব্রাহ্মণ বলিয়া খাড়া করিবে ও ধর্ম্মক দিয়া তাহার পাদোদক পান করাইবে, সে চেষ্টা তোমার সফল হইবে কেন? চোখ-রাঙ্গানিতে ভয় করিবার দিন কি আর আছে? ব্রাহ্মণ তাঁহার স্বীয় ক্ষমতায় তমসাচ্ছন্ন নরকুলকে অভিভূত করিবেন;

কাহারই এমন শক্তি থাকিবে না যে, তাঁহার নেত্র-জ্যোতির আয়ত্বাধীন থাকিয়া কেহ কুপথ-গামী হয়! নচেৎ মিথ্যাবাদী, ভণ্ডাচারী, সঙ্কীর্ণ-মনা, শাস্ত্র-মীমাংসায় পর্য্যন্ত উৎকোচগ্রাহী, ধর্ম্মবিচারে পর্য্যন্ত শঠ, দেবপূজাদি কার্য্যে পর্য্যন্ত ফাঁকিদার,—এমন একটা কিম্ভূত কিমাকার পদার্থকে ত্রিদণ্ডী গলায় লাগাইয়া যদি সাধারণের নিকট হাজির কর, আর সকলকে বল,—"হিন্দুধর্ম্মের অপূর্ব্ব চূড়া সর্ব্বসমক্ষে হাজির"; তাহাহইলে পাঁচ জনে তখনই তোমার মুখের উপর কহিবে—"চিনি উহাঁকে, উনি কলির ব্রাহ্মণের আদর্শ, উহাঁকে দূর হতে দণ্ডবৎ!" এ উত্তরে তুমি রাগই কর, আর অভিমানই কর, নাচার! তুমি মাঝে মাঝে কক্ষ-বাদ্য করিয়া বল, যে ব্রাহ্ম ও খ্রীষ্ট-সংস্কারক প্রভৃতি সম্প্রদায় হিন্দুর আর বড় একটা কিছু করিতে পারিতেছে না, তাহাদের অসারতা পরিস্ফুট হইতেছে, তাহাদের তিরোধান অতি নিকট। স্বীকার করি যে, সমাজে কতকটা পরিবর্ত্তন হইয়াছে, একটা প্রতিঘাতের (Re-action) রেখা দেখা দিয়াছে; যে সকল চটকে সংস্কারকেরা মনগড়া সমাজের আবাহন করিতেছিলেন, সে সকলের মনোহারিত্ব অন্তরিত হইয়াছে। কিন্তু, তুমি কি বিশ্বাস কর, তোমার সমাজ শত পাপাচার-স্বত্বেও, জরদ্গবের মত অলস, কার্য্যবিমুখ ও উদাসীন থাকিলে, সেই সমাজ লোকে মাথায় করিয়া নাচিবে! তোমার সমাজের পক্ষে যে অনুকূল বায়ু বহিয়াছে, তাহাকে আশ্রয় করিয়া এই বেলা আত্ম-সংস্করণে মন দাও; নিজের ভাল নিজে করিতে শিক্ষা কর।

তোমার সমাজ মূর্খ পাণ্ডাদিগের দ্বারা চালিত। মাঝে মাঝে তোমাকে বলিতে শুনি, সমাজ-শাসন কসিয়া আসিয়াছে। কিন্তু সেটা ভুল, শাসনের অযথা-প্রয়োগেই সমাজ জরজর! তাই কখন কখন সে শাসন, অদৃষ্টে ভর করিয়া, লোকে ঠেলিয়া থাকে। যেখানে পাঁচঘর বাঙ্গালী, সেইখানেই দলাদলী—কি বিদেশ, কি স্বদেশ! এ সকল দলাদলীর শাসন বড় কম নয়! কিন্তু যদি তথ্য অনুসন্ধান কর, তবে প্রায় দেখিবে, দুঁদে বদমায়েস দ্বারা উভয় দলই পরিচালিত হইতেছে। উক্ত দলপতিদিগের কোন গূঢ় অভিসন্ধি বা চির-শত্রুতা হইতে সাধারণে ক্লেশভোগ করিতেছে। সে পরোক্ষ কারণ লোকে বুঝিলেও, এমন একটী অকিঞ্চিৎকর প্রত্যক্ষ কারণ খাড়া আছে যে, তাহার উপর কথা কহিবার যো নাই—দলপতিদের ভয়ে! স্ব স্ব দলে দলস্থদিগের কত শত কঠোরতর পাপাচার অবাধে সহ্য হইয়া যাইতেছে; কিন্তু কাহার ঘাড়ে এমন মাথা যে, সে সকল উত্থাপন করে? এ শোচনীয় ব্যাপারের কারণ আর কিছুই নহে; যে ব্রাহ্মণ-কুল ধর্ম্মরক্ষক, তাঁহারাই পাপ-পুণ্যের বিচার ভুলিয়াছেন, এবং গোঁজা-মিলনে সিদ্ধহস্ত হইয়াছেন। এদিকে সাধারণ বাঙ্গালী অতীব নিরীহ; সকলেরই মূল মন্ত্র—"দুর্জ্জনকে দূরে পরিহার"; সকলেরই মনোভাব—"কে বল দুঁদে লোককে চটাইয়া বাহিরের শত্রু ঘরে আনে? পাঁচ জনেরও যে গতি, আমারও তাই।" এমন ঔদাসীন্যের আমলে কাজেই 'পাজির পাথরে পাঁচ কিল!' দণ্ডের অপব্যবহারে সমাজের যে কিছু পরিণাম অবশ্যম্ভাবী, তাহা কিরূপে নিবারিত হইতে পারে? এমন সমাজ লইয়া, সংস্কারের নিষ্প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করিতে অগ্রসর হওয়া আধিক্যতা-মাত্র। যে কোন পরামর্শ প্রদান করিতে লোভ হয়, অগ্রে সে পরামর্শোচিত কার্য্য করিয়া কি ফল হইয়াছে, তাহা সাধারণকে দেখান উচিত।

"ইংরাজী লেখাপড়া ছাড়িয়া দেওয়া হউক"—বলিয়া একটা পরামর্শ আজকাল গোঁড়াদের মুখে খুব শোনা যায়। যেন যতকিছু সর্ব্বনাশ ইংরাজী পড়িয়াই হইয়াছে! বেশ কথা! কিন্তু

ইংরাজী না পড়িলে ত চূড়ান্ত হিন্দু ও চূড়ান্ত উন্নত হওয়া যায়? তবে তোমার সংস্কৃত-ব্যবসায়ীদিগের আদর্শ লইয়াই চলিতে হইবে বোধ হয়! টোলধারী বিদ্যাদিগ্‌গজ শ্রাদ্ধ-সভায় পদব্রজে চলিলেন; নিকটস্থ হইয়াই একটী শকটারোহণে কর্ম্মকর্ত্তার বাটীতে উপস্থিত—প্রচুর পাথেয় প্রাপ্তি-হেতু! এই কি তোমার আদর্শ চরিত্র নাকি? স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য দুই টাকার উপর পাঁচ টাকা অধিক হইলেই প্রায়শ্চিত্য বিধি উল্টাইয়া দিলেন! এইটাই অনুকরণীয় নাকি? তর্ক-সিদ্ধান্তের দল শাস্ত্র-মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইলেন; প্রশ্নোত্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে সমস্বরে শ্লোক-পটলোদ্গারে দশদিক অভিভূত করিয়া জিজ্ঞাস্যের তিরোধান করিলেন; এইটাই শিক্ষণীয় নাকি? শুদ্ধ সংস্কৃত-চর্চ্চায় বাঙ্গালার কি উন্নতিই বা কখন হইয়াছিল, আর কোন উন্নতিই বা সম্ভব; বুঝাইয়া দাও; তারপর পরামর্শ দেওয়া ভাল। দেশকালপাত্র বুঝিয়া কার্য্যে অগ্রসর হইলেই ভাল হয় না?

তাই বলি আপাততঃ—"শুক বলে আমার কৃষ্ণ জগতেরি গুরু। শারি বলে আমার রাধা বাঞ্ছা-কল্পতরু॥"—এইরূপ শুকশারি-সম্বাদ ছাড়িয়া দিয়া, কার্য্যতঃ উন্নতির চেষ্টা হওয়া উচিত। হিন্দু-ধর্ম্ম, হিন্দু-সংসার, হিন্দু-বিবাহ, হিন্দু-আচার সকলি ভাল বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস হইতেছে; কিন্তু সে আদর্শ হিন্দু, ভাই, আজকাল কয়জন মিলে? বর্ত্তমান বঙ্গসংসারে হিন্দুর নামটা আছে, ঠাটখানা আছে; কিন্তু ভিতরে মাখাল-ফল। এখন এই ঠাটখানা রাখিয়াই, ক্রমে ক্রমে অন্তস্তল সংস্কৃত করিয়া লইতে হইবে; এবং যতদিন না তাহা ঘটিয়া উঠে, ততদিন শত্রু-দলকে উত্তেজিত করিয়া ভিতরের কথা বাহির করিতে হইবে না। হিন্দু-শব্দের যত রকম সংজ্ঞাই প্রস্তুত করা হউক না কেন, সে লক্ষণাক্রান্ত পাত্র অতি অল্পই মিলিবে; কিন্তু হিন্দু বলিয়া স্বীকার করিবার লোক ঢের আছে! তবে তাহাদের লইয়া ঘর ঠিক করিয়া লওয়াই ত ভাল! কিন্তু ঐ ঠিক করিবার কথাতেই গোলমাল! কারণ, উহা বাক্য-মাত্রে সিদ্ধ হইবে না—উহাতে কাজ চাই। আর একটা কথা, উহার পূর্ব্বে ঘরে যে কিছু বেঠিক আছে, তাহা মানিয়া লইতে হইবে। কিন্তু এইখানেই সর্ব্বনাশ!

যে বকাবকির কাল পড়িয়াছে, তাহাতে কথাচ্ছটায় আপন দোষগুলি ঢাকিবার চেষ্টাই ষোল আনা! কি সংস্কারক, কি কুসংস্কারক, সকলেই এইদলে! এ শোচনীয় কায়দা যত শীঘ্র যায়, ততই ভাল।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অনেক আন্দোলন দেখিয়াই এতটা বকিতে হইল। এখন বিদায়!

শ্রী—মধ্যস্থ।

আমাদের দুরবস্থা ও তাহা নিবারণের উপায়।

(১)

কিছুদিন পূর্ব্বে শিক্ষিতগণের মনে সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, আমাদের দেশের দিনদিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। প্রত্যেক গ্রামেই বড় বড় রাস্তা, স্কুল, ডিস্পেন্সারি, হাট-বাজার হইতেছে, সমস্ত দেশই রেল-ওয়ে, টেলিগ্রাফ প্রভৃতিতে আচ্ছন্ন হইতেছে, সমস্ত লোক বিবিধ বেশভূষায় সজ্জিত, শিক্ষিত ও স্বাধীন হইতেছে, ভাবিয়া, তাঁহারা মনে করিতেন, অচিরে আমরা স্বর্গ-সুখলাভ করিব। কিন্তু এক্ষণে অনেকেরই সে সুখ-স্বপ্ন ভাঙ্গিয়াছে। অনেকেরই বদন এক্ষণে নীলিমাময়। দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়াও এক্ষণে অনেকের উদরান্নের সংস্থান হয় না। বিএ, এম এ, পাস করিয়াও অনেকে উদর-চিন্তার দায় হইতে নিস্কৃতি পান না। অনেকেই এক্ষণে পূর্ব্ব-কালের সহিত তুলনা করিয়া, 'হা হতোহস্মি' বলিয়া রোদন করেন। সন্তানগণের

ভাবী অবস্থা চিন্তা করিয়া অনেকেই একান্ত ব্যাকুল হয়েন। বাস্তবিক পূর্ব্বের অবস্থার সহিত এক্ষণকার অবস্থার তুলনা করিলে শরীর শিহরিয়া উঠে।

অধিক দিন নয়, ২৫। ৩০ বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যক্তিবর্গও অনেক সুখে ছিলেন। তখন কাহাকেই এরূপ নিয়ত অর্থ-চিন্তায় মগ্ন থাকিতে হইত না। তখন সকলেই আমোদ-প্রমোদ করিবার অবসর পাইতেন, নিজে ভোজন করিয়া ও পরকে ভোজন করাইয়া সুখী হইতেন, ও পরস্পর পরস্পরের উপকার করিতেন। সকলেই পিত্রাদি তিন পুরুষের একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ করিতেন, পুত্র-কন্যার জাত-কর্ম্মাদি সকল প্রকার সংস্কার-ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেন, এবং অবস্থানুসারে পূজা-পার্ব্বণাদি করিতেন। সকল কার্য্যেই, যাঁহার যেমন অবস্থা, সেইরূপ ব্রাহ্মণ, কুটুম্ব, প্রতিবেশী ও দরিদ্রদিগকে ভোজন করাইতেন, ও দরিদ্রদিগকে অর্থদান করিতেন। ব্রতাদিতেও সকলে অল্প ব্যয় করিতেন না। ইচ্ছা-ভোজও কম হইত না। আম্রের সময় আম্র, শীতকালে পিষ্টক খাওয়াইবার জন্য সকলেই পরস্পরকে নিমন্ত্রণ করিতেন। এতদ্ভিন্ন, অতিথি-সেবা ও ভিক্ষাদানেও লোকে মুক্তহস্ত ছিলেন। তখন লোকের পরিবারও কম ছিল না; ভ্রাতা, ভ্রাতষ্পুত্র, ভাগিনেয়, দৌহিত্র প্রভৃতিকেও তখন প্রতিপালন করিতে হইত। এত খরচ করিয়াও তখন লোকে কাতর হইত না। সকলেই যথা-সময়ে ক্রীড়া-কৌতুক ও গীত-বাদ্য করিয়া আমোদ করিত। সকল গ্রামেই অন্ততঃ একটী গৃহস্থের বাটীতে ক্রীড়াদির আড্ডা থাকিত। পল্লীস্থ সকলে তথায় সমবেত হইয়া নানাপ্রকার ক্রীড়া করিতেন; গৃহস্থও অকুণ্ঠিত-চিত্তে তাঁহাদের অভ্যর্থনা ও পান-তামাকাদি দিতেন। প্রতি বৎসর বৈশাখাদি মাসে হরি-সঙ্কীর্ত্তনের দল হইত; সকলে সমবেত হইয়া তাহাতে অর্থ দিতেন ও গান করিয়া আমোদ করিতেন। ফলতঃ যখন যেরূপ আমোদ ও উৎসব করিবার ইচ্ছা হইত, তাহাই সম্পন্ন করিয়া তাঁহারা সুখী হইতেন।

লোকের বিপদেও তখনকার লোকে আন্তরিক ব্যথিত হইতেন, ও যথা-সাধ্য বিপন্নের উপকার করিতেন। কাহারও পীড়া হইলে, সকলেই তাহাকে দেখিতে যাইতেন, ও যাহাতে সত্বর আরোগ্য-লাভ করেন, তাহার উপায়-বিধান করিতেন; আত্মীয়গণ ডালিম, মিছরি প্রভৃতি পথ্য প্রেরণ করিতেন। কাহারও মৃত্যু হইলে, সমস্ত প্রতিবেশীই তাঁহার গৃহে আগমন করিতেন, ও কেহ মৃতদেহ-সৎকার করিতে যাইতেন, কেহ বা শোকসন্তপ্ত গৃহবাসীগণের শোকাপনোদণের চেষ্টা করিতেন, কেহ রন্ধনাদি করিয়া তাঁহাদিগকে খাওয়াইতেন। এরূপ দুই-এক দিন নহে, যতদিন তাঁহাদের শোক মন্দীভূত না হইত, ততদিনই প্রতিবেশীগণ তাঁহাদের শুশ্রূষা করিতেন। এই সমস্ত করিতে কাহারও অবসরের অভাব হইত না। কিন্তু, "তে দিনো দিবসাগতাঃ", এক্ষণে আমাদের আর সেদিন নাই! এক্ষণে তিন পুরুষের শ্রাদ্ধ করা দূরে থাকুক, পিতার বাৎসরিক শ্রাদ্ধই প্রায়ই কেহ করেন না; অতিথি-সেবা দূরে থাকুক, ভিক্ষুককে এক মুষ্টি দিতে কাহারও মন সরে না; আত্মীয়-প্রতিপালন দূরে থাকুক, দু টাকা কর্জ্জ দিয়া সাহায্য করিতেও কেহ রাজি নহেন। ক্রীড়া-কৌতুক গীত-বাদ্যাদি আমোদ করিবার ত সময়ই নাই! অর্থ উপার্জ্জন করিতে সময়েরই সঙ্কুলান হয় না! দিবারাত্রি খাটিয়াও কাহারও অভাব মিটে না। আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্ত সকলেই এখন দিবারাত্রি অর্থ-চিন্তা করেন। উকীল, ডাক্তার প্রভৃতি যাঁহাদের নিয়ত ভূরি ভূরি অর্থ উপার্জ্জন হইতেছে, তাঁহাদেরও আমোদ করিবার অবসর নাই।

পরের উপকার এক্ষণে কেবল মুখে মুখে সম্পন্ন হইয়া থাকে। পথে দেখা হইলে আত্মীয়-বন্ধুদিগকে জিজ্ঞাসা করা হয় 'ভাল আছেন' তো!' উত্তরে প্রায়ই সকলে 'হাঁ ভাল আছি' অথবা 'একরূপ চলিতেছে' বলিয়া থাকেন। কিন্তু হয়ত তাঁহার উনানে হাঁড়ি চড়ে নাই, অথবা পরিবারস্থ সকলেই রোগ-যন্ত্রণায় অস্থির, কিম্বা দেনার দায়ে তিনি ভিটাচ্যুত হইতে বসিয়াছেন জানেন, সে সম্বাদ আত্মীয়-বন্ধুকে দিলে কোন লাভ নাই, তাহা দ্বারা কিছুমাত্র সহায়তা হইবে না, বৃথা কেন পরিচয় দিয়া লঘু হইব ও বৃথা সময়-নষ্ট করিব। অর্থ-সাহায্য এক্ষণে কেহই করিতে রাজি নহেন। যিনি ঐরূপ সাহায্য-প্রার্থী, তিনি অশিক্ষিত নামে পরিচিত হয়েন, বন্ধুবর্গ তাঁহার সহিত মিশিতেই চাহেন না। পীড়া হইলে এখন আর কেহ কাহাকে দেখেন না। তবে যাঁহাদের মন-রক্ষা করিলে উপকার হইবে আশা আছে, তাঁহাদেরই পীড়া হইলে, দেখিবার ছলে বিরক্ত করিয়া থাকেন মাত্র। বড়লোক পীড়িত হইলে দর্শকের জ্বালায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন। ফলতঃ এখন সকলেই মনে মনে বলেন, 'চাচা আপন বাঁচা'—অথচ বাহ্য দেশ-হিতৈষিতার বক্তৃতায় গগন ফাটাইয়া দেন। উদ্দেশ্য কেবল অর্থ—কিন্তু সুখ কাহারই মনে নাই।

কিন্তু কেন এরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে? দিবানিশি এত চেষ্টা করিয়াও কেন লোকে সুখী হইতেছে না? আর কেনই বা পূর্ব্বে সামান্য চেষ্টা করিয়া সুখভোগ করিত? এখন ত উপার্জ্জনের অনেক পন্থা বৃদ্ধি হইয়াছে! চাকরির সংখ্যা অজস্র পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছে; তদ্ভিন্ন, মুদ্রাযন্ত্র, ঔষধালয়, পুস্তকের দোকান, ষ্টেসনারি, পারফিউমারি, টেলার-সপ, সংবাদপত্র, মাসিক পত্র, পুস্তক প্রণয়ন, থিয়েটর, সার্কেস প্রভৃতি শত শত প্রকার নূতন জীবনোপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। যুতা বিক্রয় পর্য্যন্তও করা হইতেছে। তথাপি লোকের অভাব মিটে না কেন? ইহার কারণ কি কেহ চিন্তাকরিয়াছেন? করিয়াছেন বৈ কি? আজিকালি সকলেরই যে ইহার কারণ স্থির করা আবশ্যক হইয়াছে! সকলেই দুঃখ-মোচনে ব্যস্ত হইয়া উহার কারণানুসন্ধানে ব্যাকুল হয়েন; এবং যাঁহার যেমন বিদ্যা-বুদ্ধির দৌড়, তিনি সেইরূপ কারণও স্থির করিয়াছেন। শিক্ষিতাভিমানীদল বলেন,—এক্ষণে আমাদের সমাজ-বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছে। বিপ্লবের প্রথম অবস্থায় লোকের কষ্ট হইয়া থাকে; এই কষ্ট সহ্য করিয়া বিপ্লব কাটাইতে পারিলেই, ভবিষ্যতে সুখ হইবে। সেই আশায় তাঁহারা বিপ্লব-কার্য্যে আরও যোগ দিতে বলেন। কিন্তু যে ভিত্তির উপর আমাদিগের সুখ স্থাপিত, তাহা তাঁহারা দেখিতে পান না। আমাদের এই প্রাচীন সমাজের মূল ভিত্তি সুখমূলের সহিত সম্পূর্ণ অভিন্ন। সুতরাং সমাজ-ভিত্তির বিনাশ হইলে সুখভিত্তিও যে বিনষ্ট হইবে, তাহা তাঁহারা একবারও চিন্তা করেন না। কিন্তু আর স্থির থাকিলে চলিতেছে না। দেশের যে ভয়ানক দুরবস্থা উপস্থিত, এখনও যদি তাহার প্রতিকারের উপায় না হয়, তাহা হইলে অচিরে ভারত-সমাজ এককালে ধ্বংশ হইয়া যাইবে।

কবিতা ও গান।

অশ্রু-হারা।

আর আমি পারি না রহিতে,
হেথা এই পাপের ধরায়।
আর আমি পারি না কাঁদিতে
ঝ'রে ঝ'রে নয়ন শুকায়॥
আমার বলিতে ছিল যাহা—
একে একে গিয়াছে সকল।

ছিল অশ্রুবিন্দু অভাগার—
হতাশের পরাণ-সম্বল ॥
একি কোন বিভীষণ তাপে—
সেটুকুও মিশাল কোথায়।
হৃদয়ের স্তরে স্তরে মেঘ—
শুধু 'হাহাকার' হায় হায়!!
বিষাদের সেই মেঘগুলি—
চারিদিকে পড়ে ছড়াইয়া।
শুধু উঠে ভীম গরজন—
দশ দিশি যেন কাঁপাইয়া ॥
নিশ্বাস ফেলিতে নাহি পারি—
হৃদয়ের শ্বাস পুরে আর।
চারিদিকে প্রলয়ের ছায়া—
আঁধারে আঁধারে একাকার ॥
গিয়াছে প্রাণের শান্তিসুখ—
প্রাণের আশা ত হ'ল ছাই।
অশ্রুকণা করিয়া সহায়—
ছিলাম "তাহার" পানে চাই ॥
নীরবে উঠে যে মেঘগুলি,—
যদি তা' না অশ্রু হ'য়ে পড়ে!
কেমনে কেমনে ওগো, তবে—
র'ব এই ধরার মাঝারে ॥
বিজনে বসিয়া দুই দণ্ড—
কাঁদিতেও পাব না কি ছাই!
জগতে এ বিষম বন্ধন—
সকলেই করে খাই খাই!!
অষ্টে-পৃষ্টে বাঁধা এসংসারে—
কোলাহল চারিধারে উঠে।
"দাও, দাও" এই রব শুধু
অনন্ত উচ্ছ্বাসে সদা ছুটে ॥
প্রাণ খুলে কাঁদিবার তরে—
যদি যাই 'বিজন' কুটীরে।
কোথাকার ভাবনার ঢেউ—
ফেলে দেয় পাপের সংসারে ॥
প্রাণ-পুরে কাঁদা নাহি হয়—
খুঁটি-নাটি কত র'য়ে যায়।
পরাণের পরতে পরতে—
ঢাকে শুধু ঘোর কালিমায় ॥
উপাধানে মায় রাখি কাঁদা—
সে কান্নায় বাড়ে হাহাকার।
এমন করিয়া র'ব হেথা?
হেথা ত হ'ল না কাঁদা আর ॥
অশ্রুহীন, সেত শুধু ভাই—
মেঘেদের ঘোর গরজন।
অশ্রুহীন, সে ত শুধু ভাই—
শত্রুর শিবিরে আগমন ॥
অশ্রুহীন, সে ত শুধু ভাই—
ছটফট্ করা হুতাশনে।
অশ্রুহীন দুর্ব্বল পরাণ—
কে যেন অন্তর হ'তে টানে!!
একে ত গিয়াছে শান্তি মোর—
আবার এ অশ্রুহারা হ'য়ে।
কত দিন, কত দিন আর—
রব এই ধরায় শুইয়ে ॥

শেষ।

কি হ'লো—কি হ'লো!
দেখাবার হ'তো যদি, দেখাতাম এই হৃদি,
অনল জ্বলিছে কোথা—
কতদূর আছে ব্যথা—
কতখানি অন্ধকার—কতখানি আলো!
কি হ'লো—কি হ'লো!

প্রেম-সুখ হাসি কথা—
কি বাসনা ছিল সেথা—
কতখানি আছে—আর কতখানি গেলো।
এ জ্বালা হ'য়েছে যার,
সংসার শ্মশান তার
এ জ্বালা জানে না যে, সেই আছে ভালো!
হি হ'লো—কি হ'লো!

His Highness the Maharajah of Mysore.

গান।

ছায়ানট—একতালা।

কেন মেঘের আড়ালে সই রে! আমার
ডুবে গেল হৃদয়-চাঁদ,
আমি প্রাণ দিয়ে তারে ভালবাসি বোলে
তাই কি এমন বাদ?
ওলো, তার কথা আমি মনে মনে ভাবি,
গোপনে কবিতা গাঁথি,
স্মরি মধুর মিলন মধুময় প্রেম,
আপনা-আপনি মাতি।
তবে কেন লো আড়ালে, কার কাছে বসে
আমি কি করেছি দোষ?
হবে দু'দিনে এমন, না জানি কখন—
এত প্রেমে এত রোষ।

দাঁড়াও—দাঁড়াও!

রাক্ষসের এই রাজ্যে—ভীষণ এ প্রেতপুরে,
ফেলিয়া আমায় দেবী, কোথা যাও, যাও!
একেলা এ মরুমাঝে, পাপের এ কোলাহলে—
পারি না রহিতে আর, দাঁড়াও, দাঁড়াও!!
সংসারের কুহেলিকা—কে বুঝিবে, ক্ষুদ্র আমি—
দুর্ভেদ্য রহস্য তার, বুঝে উঠা দায়!
আঁধারেতে ঢাকা প্রাণ, নেত্রে বহে অশ্রুজল,
হৃদয়ে অনন্ত-স্রোত, ওই ভাসি যায়॥
কে দেখিবে, কে দেখাবে সম্মুখের ওই পথ,
ধীরে ধীরে হাতে ধ'রে, কেবা যাবে ল'য়ে!
কে সিঞ্চিবে শান্তি-বারি—হৃদয় মাঝারে মোর,
কে বা দিবে অন্তরের এ কালিমা ধুয়ে॥
সম্মুখে পশ্চাতে ওই—বিভীষণ অন্ধকার!
কেমনে চলিবে বল দৃষ্টি মাঝে তার।
আঁধারের শূন্যস্তম্ভ করিয়া আশ্রয় আমি
কেমনে যাইব, কোথা, ভাবি বারেবার॥
দূরে হেরি মরীচিকা, বিষের মায়ার বশে—
আসিয়া প'ড়েছি আজ বহু দূরে—দূরে।
যে সূত্র ধরিয়া আমি চলিনু গো এত পথ,
কালের বাত্যায় তাহা গিয়াছে যে ছিঁড়ে॥
বড় ক্লান্ত, বড় শ্রান্ত—না চলিতে পারি আর
ভীষণ সংসার-রণে প্রাণে বড় ভয়।
চারিদিকে কত শত্রু ঘুরিছে ফিরিছে হায়!
ধর ধর জননী গো, দাও মা অভয়॥
এ কি গো মা, মা হইয়ে, পাষাণে বাঁধিয়ে বুক—
অধম সন্তানে ফেলে আগে কোথা যাও!
কোথায় কণ্টক কত—বিঘ্নবাধা শত শত
কিছুই না জানি, দেবী, দাঁড়াও—দাঁড়াও॥

বিরহ।

একবার কাছে এসে,
একবার পাশে ব'সে,
আমার এ মুখ-পানে যদি গো চাহিত সে।
তাহলে ফুটিত হাসি
আমার এ আঁখি-জলে,
জাগিত হরষ-কণা
তা'হলে এ দীর্ঘ-শ্বাসে।
জাগিয়া উঠিত প্রাণ,
গাহিয়া উঠিত গান,
হৃদয় ভরিয়া যেত সে মধুর সুখাবেশে।
চেতন পাইত হিয়া
তাহার পরশ নিয়া,
মধুর মিলনে তবে কি জানি কি হ'তো শেষে।

বন্ধু বটে!

(সামাজিক চুট্‌কী গল্প।)

অনেক দিন হইতেই বিলাস বাবুর বাড়ী আসা হয় নাই। টিক্‌টিকি-পুলিসের* চাকুরী—দিন-রাত্রি ২৪ঘণ্টারই চাকর—ছুটি তো নেই-ই; সাহেব তায় বড়ই কড়া! কাজেই, "আসি আসি" করিয়াও, "এই ছুটি পাইব—দরখাস্ত করিয়াছি, এই অমুকদিন বাড়ী যাইব"

* টিক্‌টিকি পুলিস—ডিটেক্‌টিভ পুলিসের (Detective Police) ডাকনাম। কলিকাতায়, টিক্‌টিকি থানা, টিক্‌টিকির পেয়াদা প্রভৃতি যথা এই অর্থেই প্রচলিত।

এই বলিয়া বরাবরই মনকে প্রবোধ দিয়াও, আজ চারি বৎসর তাঁহার বাড়ী যাওয়া হয় না।

বাড়ীতে আর কেই বা তাঁর? এক পরিবার, আর এক বিধবা ভগ্নী-মাত্র! তা' সে ভগ্নীও—তাহার শ্বশুর-বাড়ীতে কোন কার্য্যোপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া গিয়া—আজ ছয় মাস যাবৎ তথায় পীড়িত! বাড়ীতে কাজেই এখন তাঁহার পরিবার, আর তাহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটী দাসী মাত্র! একবার দিন-কয়েকের ছুটী পাইলেই, তিনি বাড়ী আসিয়া—যেমন হউক দেশের বিষয়াদির একরূপ বন্দোবস্ত করিয়া—পরিবারাদিকে কর্ম্মস্থানে লইয়া আসিবেন, এই তাঁহার ইচ্ছা! কিন্তু পোড়া চাকরীর গতিকে তাঁহার ছুটীও আর হয় না; বাড়ী হইতে পরিবারাদিকেও আর কর্ম্মস্থলে আনা হয় না! যখন দেশে যাইবেন স্থির করেন, তখনই একটা না একটা বিঘ্ন—তখনই হয় একটা খুনী-মকর্দ্দমা হাতে পড়িয়াছে, নয় আর একটার তদারকে বিদেশে যাইতে হইতেছে!

মনে তাই বড়ই কষ্ট! বিশেষ, স্ত্রীটি আবার দ্বিতীয়-পক্ষের স্ত্রী বলিয়া! অনেক খরচ-খরচা করিয়া বিবাহটা করিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, সংসারী হইয়া একদিনও সুখী হইতে পারিলেন না! অনেক দিন হইতেই বিলাস বাবুর বাড়ী আসা হয় নাই। বিশেষ, পত্রাপত্রে যাই খোঁজ-খবর পাউন, জ্ঞাতিদিগের প্রতি তাঁহার একবিন্দুও বিশ্বাস নাই! কিসে কখন কি হয়, সদাই তাঁহার এই ভয়!

তবে এক বিশ্বাস ও ভরসা-স্থল, তাঁহার বন্ধু নরহরি বাবু। দেশের মধ্যে এক নরহরি বাবুকেই তিনি বিশ্বাস করেন, ভাল-বাসেন, ও বন্ধু বলিয়া জানেন। সে বিশ্বাস—সে ভরসা তাঁহার এতদূর যে, এত জ্ঞাতি-কুটুম্ব-আত্মীয়-স্বজন থাকিতেও, তিনি তাঁহারই উপর বিশ্বাস করিয়া, তাঁহারই হস্তে সংসার-পরিবারাদি সমস্তই অর্পণ করিয়া আসিয়াছেন; আসিবার সময় বলিয়াছেন—এখনও প্রতি পত্রেই বলিয়া থাকেন,—"দেখো ভাই, রহিল আমার পরিবার! যাহা করিতে হয়, ক'রো তুমি! আমি আর কি বলিব?" এমনই বিশ্বাস—এমনই প্রাণের আকাঙ্ক্ষা! খরচ-পত্রও নরহরি বাবুর নিকট পাঠান; দেশের বিষয়াদির আদায়-তহশীলের ভারও নরহরি বাবুর উপর!

বিলাস বাবুর স্ত্রীর নাম সোহাগিনী। আদর করিয়া তাঁহার মা-বাপ তাঁহাকে সোহাগী বলিয়া ডাকিত। তদবধি সোহাগী বলিয়াই সে পরিচিত! সোহাগীর বয়স আন্দাজ আঠার-উনিশ; দেখিতে সোহাগী বড়ই সুন্দরী—যৌবন-স্রোতে রূপ-রাশি টল-টল! সঙ্গে সঙ্গে মনোবেগও ঢল-ঢল! সংসারারণ্যে স্ত্রীলোকের এমন সময়ই তো হিংস্র শত্রু! এই শত্রুর গ্রাস হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই, স্ত্রীলোক অগ্নি-সংস্কৃত স্বর্ণবৎ প্রতিভান্বিত হন! নহিলে, এই শঙ্কট-সময়েই তাঁহাকে শত্রু-গ্রাসে জীবন দিতে হয়! যাহা হউক, সোহাগীর এমনই বয়স—এমনই অবস্থা—এমনই মনোবেগ! সে গতি কে রোধ করিবে? সে বেগে যে আবর্জ্জনা-রাশি সম্মিলিত হইবে, কাহার সাধ্য আর তাহার অন্তরায় ঘটায়!

সোহাগীর চঞ্চল, চিত্ত, কি লোমহর্ষক—কি অঘটন, এ জিনিসটী সে জিনিসটির পর, ক্রমে সেই নরহরি বাবুর উপর পড়িল! নরহরি বাবুরও পূর্ব্বে যে ধারণা ছিল, এখন তিনি দেখিলেন—তা'র চেয়ে 'সুরাহা!' কাজেই, অন্তরে একটী দীর্ঘনিশ্বাস চাপিয়া, তিনি একটু হাসিলেন। সোহাগী যেন হাতে স্বর্গ পাইল। উভয়ে মুখোমুখী কতই আলাপ—কতই ভালবাসা—যেন কতই প্রণয়ের সূত্রপাত!

দুইদিন, চারিদিন, দশদিন, এইরূপেই কাটিয়া যায়। মুখের ভালবাসা, মুখের প্রেমা-

লাপ, মুখের আদর-আপ্যায়িত—ক'দিন এমনই চলিল! কিন্তু অবশেষ—সেই শেষ-প্রতিজ্ঞার দিন, নারকী সোহাগী বলিল,—"আজ ক'-দিনই বলিয়া যাইতেছ—রাত্রে আসিব; কিন্তু কই আসো-না! যাইহোক, আজ রাত্রিটীও তোমার অপেক্ষা করিব; আজ যদি নিতান্তই না আস, তবে তুমি আর আমার আশা ক'রো না! আমি পূর্ব্ব-সঙ্কল্প-মত নবীনের সঙ্গেই কাল কলিকাতা চ'লে যা'ব। নবীন বলেছে, সেখানে গেলে—তার বোনের দ্বারায়, আমার রাজার হাল করে দেবে! তবে তোমায় ভালবাসি, তাই তোমার অনুরোধ এড়াতে না পেরে এতদিনও র'য়ে গিয়েছি! কিন্তু কাল আর থাক্‌বো না?"

"সোহাগী, রাগ কর কেন? আমি বাস্তবিকই তোমারই—তোমা বই আমি বাস্তবিকই আর কিছুই জানি না। কাল মার ব্যারামটা বড়ই বেড়ে উঠ্‌লো, তাই আস্‌তে পারি-নি! আচ্ছা, আজ আমি নিশ্চয়ই আস্‌বো! তোমার দিব্বি, আমি আজ আস্‌বোই। যতই রাত্রি হোক, তুমি আজ বৈঠকখানায় থেকো—দুয়ারটা খুলেই রেখ—এসে যেন আর ডাক্‌তে না হয়!"—এই বলিয়াই, "তবে এখন আমি আসি—ডাক্তারকে নিয়ে যেতে হবে" বলিয়া, নরহরি বাবু চলিয়া গেলেন। যাবার সময়, সোহাগী হাত ধরিয়া আবার দিব্বি করাইয়া লইল,—"তবে তুমি আমার গা ছুঁয়ে বল্‌চো, আস্‌বে!"

দিন আর কাটে না! প্রভাতের পর দ্বিপ্রহর, তৎপরে সন্ধ্যা! দেখিতে দেখিতে, সময় গণিতে গণিতে, ক্রমে সেই সন্ধ্যাদেবী, আপনার প্রাণপতিকে লইয়া, সংসার-অট্টালিকার দ্বার রুদ্ধ করিলেন। কাজেই অট্টালিকা-অভ্যন্তরে দারুণ অন্ধকার দেখা দিল। সঙ্গে সঙ্গে অট্টালিকার অভ্যন্তরস্থ এক একটী গৃহ-বাসীরাও, স্ব স্ব প্রিয়জনসহ আপনাপন গৃহদ্বার রুদ্ধ করিয়া, বিশ্রাম-জন্য ব্যস্ত হইলেন। সোহাগীও দিনমান আসার আশায় থাকিয়া—কেবলই রাত্রি গণিতে গণিতে, রাত্রি পাইয়া, বড়ই উল্লসিত হইল! বিলাস বাবুর বাহিরের বৈঠকখানা বরাবরই সাজান ছিল। তিনি বাড়ী না থাকায়, আজকাল যদিও তাহা একটু শ্রীহীন হইয়া আসিতেছিল, সোহাগী এই কয়দিনে তাহার আবার জীর্ণ-সংস্কার করিয়া রাখিয়াছে। দেওয়ালের ছবিগুলি ঝাড়িয়াছে; আয়নাটী পরিস্কার করিয়াছে; চিরুণীগুলিও গুছাইয়া আনিয়া রাখিয়াছে। ক্রমে, যেমন হোক এক রকম আহারাদি সারিয়া, একটী বাতীর আলো হাতে করিয়া, সোহাগী বাহিরের ঘরে প্রবেশ করিল। বাড়ীর দাসীর তখন এতই ঘুম যে, তাহার কাছে তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর! সে সকাল সকাল খাইয়াই, ঘুমাইয়াছে।

আলোটী রাখিয়া, সোহাগী তখন একবার নিজের পরিধান-বস্ত্র প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টি করিয়া লইল। তারপর, মাথার খোপাটী, পায়ের আলতাটুকু, গায়ের বডিটি—এক-একবার তাকাইয়া দেখিয়া লইতে লাগিল—যদি বা কোথায় কোন ত্রুটী থাকে! এইরূপে, এক-একবার এক-একটীর প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করে, আর সেটীর কোন দোষ থাকিলে, তাহা সুধরাইয়া লয়। সম্মুখেই আয়না—চিরুনিও হাতে-হাতে! কাজেই, মাথার সম্মুখের দিকের চুল যা' দু'এক গাছা ঝুলিয়া পড়িয়াছিল, চিরুণী দিয়া তাহাও ঠিক করিল। তার পর, "এই আসে—এই আসে!" একটু কিছু শব্দ হইয়াছে, আর অমনি সোহাগী চমকিয়া দুয়ারের দিকে তাকাইয়াছে! কিন্তু, পরক্ষণেই, কাহাকেও না দেখিয়া, সে ক্ষুব্ধ হইয়াছে।

এইরূপে রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইয়া গেল। বঁধু তখনও আসিল না! সোহাগী

বড়ই ব্যথিত হইল—'এই আসে, এই আসে' করিয়া একেবারেই তাহাকে হতাশ গণিতে হইল। সে তখন, 'আর কি হইবে' বলিয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, আলোটী নিভাইয়া দিল। কিন্তু তখনও আশা, যদি আসে! ঘুম আসে তো আসে না; চমক ভাঙ্গে তো ভাঙ্গে না!

এইরূপেই রাত্রি প্রায় শেষ! তখন, ধীরে ধীরে কে যেন দরজা ঠেলিল! সোহাগী কি এ স্বপ্ন দেখিতেছে? না—না, তা'তো নয়! ধীরে ধীরে কে যেন ঘরে প্রবেশ করিল! চমকিয়া, সোহাগী বলিল,—"এলেন নরহরি বাবু! এত রাত্রি হলো কেন? এ আপনার বড়ই অন্যায়!" এই বলিয়াই, কতকটা রাগ ও কতকটা অভিমান-ভরে, সোহাগী, দিয়াশলাই লইয়া, আলোটা জ্বালিয়া দিল। আলো জ্বালিয়াই—এ কি এ প্রহেলিক!—এ কি এ ভৌতিক কাণ্ড!—সোহাগী দেখিল, সম্মুখেই তাহার স্বামী বিলাস বাবু! তাহার মস্তক ঘুরিয়া গেল! আর সোহাগী মুখ তুলিতে পারিল না! আর কথাটিও কহিবার ক্ষমতা তাহার রহিল না! সঙ্গে সঙ্গে নরহরি বাবুও সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিলেন,—"বিলাস বাবু, এই লউন আমার মা'কে! আমি অনেক করিয়া আজিও উহাঁকে স্থির রাখিয়াছি। কিন্তু আজ আপনাকে যদি না আনিতে পারিতাম, তবে, ঐ জিজ্ঞাসা করিয়া জানুন, কিছুতেই রাখিতে পারিতাম না।"

এই বলিয়াই, নরহরি বাবু, সোহাগীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"মা আপনি আমার! আপনার সহিত আমি যে প্রতারণা করিয়াছি; যেরূপ কৌশলে আপনাকে কুপথ হইতে এতদিনও প্রতিনিবৃত্ত রাখিয়াছি ও বিলাস বাবুর হস্তে আপনাকে সমর্পণ করিতে পারিয়াছি; সে জন্য—যদি আমার কোন দোষ হইয়া থাকে, আপনি আমায় মার্জ্জনা করুন। আমার শত দোষ সত্বেও—আপনার সহিত সহস্ররূপে প্রতারণা করা সত্বেও, আমার বিশ্বাস, আমি আপনার যে ধর্ম্ম রক্ষা করাইয়াছি, তুলাদণ্ডের ওজনে, আমি নিশ্চিতই তজ্জন্য সকল পাপ লইতে নিস্কৃতি পাইব। এখন মা, আপনি আমায় আশীর্ব্বাদ করুন—আমি যাঁহার জিনিস তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়া চলিলাম।"

এই বলিয়াই, নরহরি বাবু সে ঘর হইতে বহির্গত হইবার উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু বিলাস বাবু তাহাতে বাধা দিয়া বলিলেন,—"দাঁড়াও—একটু দাঁড়াও!"

"আর না, বন্ধু—আর বলো-না! আমি এজগতে এসে যে পাপ করিলাম, এখন তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে চলিলাম। মায়ের সহিত আমায় যে সকল ব্যবহার করিতে হইয়াছে, বন্ধু, তাহার প্রায়শ্চিত্ত কোথায়? এখন আমি তাই চাই! যদি পার, কর তুষানল—দেও আমায় তাহাতে নিস্কৃতি! নহিলে, আমি আর কিছু চাহি না—আর কিছু শুনিবও না, সেই পাপ-হারিণী গাঙ্গিনীর জলে ডুব দিব!" এই বলিতে বলিতেই, পাগলের প্রায় ছুটিতে ছুটিতে, নরহরি সেই নৈশ-অন্ধকারে মিশিয়া গেলেন। বাস্তবিকই যেন 'নরে হরি' মিলিত হইলেন!

তা'র পর? তা'রপর আজিও আর তাঁর কোনই সন্ধান নাই। তিনি বাস্তবিকই মরিলেন, কি কোথায় গেলেন, কেহই বলিতে পারে না।

এদিকে সোহাগী! হত-ভাগিনী সোহাগীর কি হইল, কি তাহার প্রায়শ্চিত্ত, পাঠক, তাহা কি আর শুনিতে চাও? সে সেই যে মুখ নীচু করিল, সে মুখ জীবনে আর তাহার উঠিল না; সেই যে সে চোক লুকাইল, আর সে তো চোক মেলিয়া চাহিল না! দারুণ অনুতাপে—অনুশোচনায় তাহার প্রাণ যেন ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। সরমে, আত্মগ্লানিতে, বিষাদে, সে একরূপ জীবন্মৃত হইয়া

রহিল। এইরূপ অবস্থায় সোহাগী আর তিন দিন মাত্র জীবিত ছিল। অন্ন-জল সকলই পরিত্যাগ করিয়া—কেবলই হা-হুতাশ ও আত্মগ্লানি-বিষে জর্জ্জরিত হইয়া, তিন দিনের দিন, সে ইহ-জীবন ত্যাগ করে। ইতিমধ্যে সে আর কোন কথাও কয় নাই—কোন স্থানে নড়িয়া বসেও নাই—যেমনই ছিল, সেই ভাবেই তাহার পরলোক প্রাপ্তি হয়।

আশ্চর্য্য ঘটনা! এরূপ অদ্ভুত মৃত্যুও অতি অল্পই দেখা যায়। এ তিন দিনের মধ্যে সোহাগীর যেন আর কোন সংজ্ঞা-চেতনাই ছিল না; যেন বিষম-বিকারে তাহাকে আক্রমণ করিয়া, ক্রমে জরজর করিয়া ফেলিল! শেষ দিন—যেদিন সোহাগীর জীবন-দীপ চির-তরে নির্ব্বাপিত হয়, সেই দিন—তাহার একটু যেন সংজ্ঞাবোধ হইয়াছিল। তাহাকে দেখিবার জন্য বিলাস বাবু একবার গৃহে প্রবেশ করিয়াছেন, এমন সময়ই, সে একবার কাতর-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"স্বামীন্, অভাগীকে এখনও ক্ষমা করুন—মোহ-বশে ভুলিয়া যে কার্য্য করিয়াছি, তাহার প্রায়শ্চিত্ত এখনও আমার হউক, আপনি এই আশীর্ব্বাদ করুন। আর এ যন্ত্রণা—ওঃ—কি কষ্ট!" এই পর্য্যন্ত বলিতে বলিতেই, সোহাগীর সোহাগী-দেহের পতন হইল।

বিলাস বাবুরও এই অবধি মন একেবারে ভাঙ্গিয়া যায়। সংসারের জন্য যতটা না হউক, নরহরি বাবুর জন্যই তিনি বড়ই কাতর হইয়া পড়েন। তিনি তাঁহার জন্য কেন জীবন দিলেন, তিনি এখন কোথায় গেলেন, সদাই তাঁহার মনে এই ভাবনা। এই ভাবনায় ক্রমে তিনি এতদূর অস্থির হইয়া পড়িলেন যে, চাকরী ত্যাগ করিয়া, তাঁহারই অনুসরণে, কি জানি কোন্ দিকে, কি জন্য কি আশায়, নিরুদ্দেশ হইয়া চলিয়া গেলেন। পড়িয়া রহিল তাঁহার সংসার—পড়িয়া রহিল তাঁহার বিষয়-বিভব।

অনুসন্ধান-সমিতির বিবরণী।

প্রতারণা-প্রবঞ্চনা।

সন্দেহজনক বিজ্ঞাপন,

পুস্তক অপেক্ষা ঔষধের বাজারেই আজকাল অধিক। ধরিবার-ছুঁইবার যো নাই—বলিবার-কহিবার ক্ষমতা নাই; কাজেই, প্রতারকগণ অনেকেই ঔষধের ব্যবসাই আজকাল অনেক আরম্ভ করিয়াছে। ঔষধের মধ্যে প্যাটেণ্ট ঔষধ—প্যাটেণ্ট ঔষধের বিজ্ঞাপনের মধ্যে সাহেবী-নাম—এগুলিই আমাদের সমূহ সন্দেহজনক। তাছাড়া, ঔষধের মধ্যে দুই-রোগ সকলের ঔষধেই (মেহের ঔষধ, শালসা ইত্যাদিতে) আমাদের আরও সন্দেহ। এই ত্রিগুণাত্মক যেখানে, সেইখানেই 'ত্র্যম্পর্শ যোগ' বলিয়া আমাদের মনে হয়। প্যাটেণ্ট ঔষধ, সাহেব-কোম্পানীর নামে, বিশেষ ঐ সকল রোগের সম্বন্ধে—এ কয়টী গুণের প্রতিই সকলেই দৃষ্টি রাখা উচিত। আরও এই সম্বন্ধীয় একটী বিশেষ বিধির প্রতি লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য যে,—ভুঁই-ফোঁড়গুলাই উহাদের মধ্যে অধিক অবিশ্বাসের পাত্র। ২।৪ বৎসরের চলতি কারবারের বিজ্ঞাপিত জিনিসের প্রতি ততটা সন্দেহ হইবার কারণ তবুও নাই।

কএকটী সন্দেহজনক বিজ্ঞাপন।

১। জি, বারওয়েল এণ্ড কোং, ১৯ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা; ২। ডব্লিউ রিচার্ড এণ্ড কোং, ১৭।২ নং চাঁপাতলা সেকেণ্ড লেন, কলিকাতা; ৩। এ, কে, হালদার, ১৭।৭ নং চাঁপাতলা দ্বিতীয় গলি; ৪। পি, লেজার্স, ১২ নং আড়পুলি লেন, কলিকাতা। এ সকল বিজ্ঞাপনগুলিই বাঙ্গালীর। মধ্যের দুইটী একজনেরই আবার! এইরূপ আরও অনেক দোকান আছে। সে সকলের পরিচয়, ও আবশ্যক হইলে উহাদেরও বিস্তারিত বিবরণ, পরে প্রকাশিত হইবে।

অনুসন্ধান।

অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিকপত্র।

৫ম খণ্ড] ২৯এ অগ্রহায়ণ, ১২৯৮। [৯ম সংখ্যা।

সাধন-সঙ্গীত।

(রামপ্রসাদী সুরভাঙ্গা।)

মন! কেন, সাধন্ করনা?
ভবে নাই কিছু ধন সাধন বিনা॥
যে ধন লাগি মহর্ষিগণ, বিসর্জিয়ে স্বজন স্বধন,
(ওরে) নয়ন মুদে বসে বনে,
করে সদা ধ্যান-ধারণা॥
পার্থিব ধন স্বজন সবে, মৃত্যু পরে প'ড়ে রবে।
আর কিছু (ই) না সঙ্গে যাবে,
আরাধ্য ধন ধর্ম্ম বিনা॥
চুস্ কাগজে যথা মসী, রাখয়ে স্বগাত্রে চুসি,
(সেরূপ) মন চুসে মার নাম-পীযূসি,
মন কেনরে চুসে নে-না॥
পিত্তদুষ্ট রসনাতে মিঠেও যেমন তিক্ত বটে;
সেরূপ বিষয়-দুষ্ট রসনাতে
লাগে আগে আরাধনা॥
শেষে সে দোষ সারে যখন, সাধক স্বর্গ লভে তখন্।
(ওরে) ভবার্ণবের পারে যেতে
পারে কিরে সে ধন বিনা?।
বিষয়-বাসনা ছাড়, গুরু-মন্ত্র সার কর,
নশ্বর সংসার-অনলে পুড়ে ভস্মসার হয়ো না॥
সর্ব্বক্ষণ যে ঘুরে সমন, কভু কি তা ভাবরে মন!
সে দুর্জ্জন যে অনিবার্য্য, সমন-দমনী বিনা॥
রোহিণী কয়, ওরে ও মন!
সেব, শিবানীর শ্রীচরণ।
ভক্তিতে ভাবিলে যাঁহা,
ভোগে না আর ভব-যাতনা॥

অদৃষ্ট।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ভবিতব্যের ছায়াপাত।

এইরূপ নানা কারণে জয়গোপালের যত উন্নতি হইতে লাগিল, আমার ক্রমে ক্রমে সেইরূপ অবনতি হইতে লাগিল। ভাবিয়া-চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া মহামায়াকে জিজ্ঞাসিলাম,—"এখন উপায় কি?" মহামায়া পরামর্শ দিল,—জয়গোপালদিগের বাটী যেদিকে সেইদিক ত্যাগ করিয়া আর যে কোন স্থানে ইচ্ছা তথায় গিয়া আমি ডাক্তারি করিতে পারি। কিন্তু পূর্ব্বে পূর্ব্বে দুঃখের সময় মহামায়া যেরূপ আগ্রহ-সহকারে পরামর্শ দিত, বাটীর কাজকর্ম্ম-সম্বন্ধে যত যত্ন করিত, এক্ষণে যেন সে সমস্ত বিষয়ে সে অত্যন্ত শিথিল হইয়া উঠিল। এখন তাহার ভাব-ভঙ্গি, আচার-ব্যবহার ও কথা-বার্ত্তায় বোধ হইতে লাগিল, যেন মহামায়া আর সে পূর্ব্বের মহামায়া নয়। শ্বশুর-মহাশয় আমাকে যেরূপ বাক্য-যন্ত্রণা দিয়াছিলেন, তাহা তাহার নিকট সবিস্তারে বর্ণনা করিলাম; শুনিয়া, আগ্রহ-সহকারে কোনই কথা কহিল না। আমি পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করিলাম,—"মহামায়া, তোমার কি কোন অসুখ হয়েছে?" মহামায়া কহিল,—"কিছুই না।" মহামায়াকে জিজ্ঞাসিলাম,—"মহামায়া, তুমি

কি বাপের বাড়ী যাইতে চাও ?” উত্তর দিল,—“বাপের বাড়ী কি আমার আছে ? এই কুঁড়ে ঘরেই আমি যতদিন বাঁচিয়া থাকি, থাকিব ; মরণ উপস্থিত হইলে মরিব।” মহামায়ার ভাবগতিক দেখিয়া আমার অত্যন্ত চিত্ত-চাঞ্চল্য হইল। আর সে মুখে সেরূপ হাসি নাই, আর পূর্ব্ববৎ উৎসাহ নাই ; সংক্ষেপতঃ পূর্ব্বের ন্যায় আর কিছুই নাই—দুইটী বিষয় ছাড়া, একটী আমার মাতাকে যত্ন করা, আর একটী হরিপদ অর্থাৎ আমাদিগের পুত্রকে লালন-পালন করা।

মহামায়াকে যখন জিজ্ঞাসা করি যে, কেন তাহার এরূপ চরিত্র-পরিবর্ত্তন হইল, সে তখনই কোন-না-কোন কার্য্য-উপলক্ষে স্থানান্তরে চলিয়া যায় ; আমার কথা আর পূর্ব্বের ন্যায় যত্ন-পূর্ব্বক শুনে না। তাহার নিজের প্রার্থনানুযায়ী আমি ইতিপূর্ব্বে একছড়া সোণার ডায়মণ্ড-কাটা সাতনহর ফরমাইস্ দিয়াছিলাম। সেকরারা ‘আজ দিই, কাল দিই’ করিয়া কত দেরী করে, তাহা সকলেই জানেন। মহামায়া প্রথমতঃ যেদিন দিবার কথা থাকিত, সেইদিনই লোক পাঠাইত। ক্রমে ক্রমে যখন তাহার সকল বিষয়ে শৈথিল্য হইতে লাগিল, তখন আর লোক পাঠাইত না। কিন্তু আমি অবকাশ পাইলেই তাগাদা করিতাম। পরিশেষে একদিবস অপরাহ্নে সাতনহর ছড়াটী পাইয়া আহ্লাদিত-চিত্তে বাটী আসিয়া নিজ-হস্তে মহামায়ার গলায় পরাইয়া দিলাম। বহুকালের পর মহামায়া একটু হাসিল। কিন্তু সে হাসি আহ্লাদের হাসি নহে। সে হাসি দেখিয়া আমার বোধ হইল যেন সে হাসি বলিতেছে,—“হা ভ্রান্ত জীব ! তিন দিন তোমার জীবন ! এই তিন দিনের জন্য এত হাঙ্গাম-হিজ্যোৎ, এত দ্বন্দ্ব কেন ?” মহামায়ার হাসি দেখিয়া আমি কহিলাম,—“মহামায়া, আমি হার-ছড়া আনিয়া দিলাম, আমাকে একবার প্রণাম কর।” আমার কহিবার পূর্ব্বে মহামায়া অঞ্চল গলায় দিয়াছিল, এবং আমার কথা ও তাহার প্রণাম একসময়েই সমাসাধিত হইল। প্রণাম করিয়া যখন দাঁড়াইল, তখন মহামায়ার চক্ষে অশ্রু-বিন্দু দেখা দিল। আমি কারণ জিজ্ঞাসা করিব, এমন সময়, হরিপদ দৌড়িয়া আসিয়া তাহার মাতার গলায় সাতনহর দেখিয়া কহিল,—“মা, ওটা আমাকে দে, ওটা আমি নেবো, ওটা আমার।” এই কথা শুনিয়া, মহামায়া সাতনহর-ছড়া খুলিয়া হরিপদর গলায় পরাইয়া দিল। পরাইয়া দিয়া, সে কালের ন্যায় একবার আনন্দের হাসি হাসিল। আমি সে হাসি দেখিয়া যে কি পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট হইলাম, তাহা বলা যায় না। আহা ! সে মধুর হাসি এখনও আমার স্মরণ হইতেছে ! এজন্মে আর কি সে হাসি দেখিব ?

পাঠক ! বিরক্ত হইবেন না ! নিজের কথা বলিতে হইলে এরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বলিতে হয়। এরূপ কথার যেন আর শেষ নাই, ইহার বিন্দুবিসর্গ যেন ফেলিয়া দিবার নহে, তুচ্ছ করিবার নহে।

মহামায়ার মনোবৃত্তি যেরূপ শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার শরীরও দেখিতে দেখিতে সেইরূপ হইয়া আসিল। তাহার অন্নে অরুচি হইল, শরীর কাহিল হইল, ও মুখ-চক্ষু যেন রক্তহীন হইয়া পড়িল। কি হইয়াছে জিজ্ঞাসা করিলে কিছুই বলে না। কখন কখন বলে,—“কি হইবে ? কিছুই হয় নাই।” অধিক সময় এরূপ কথা হইলে তথা হইতে চলিয়া যায়। আমার অন্নবস্ত্রের কষ্ট অদ্যাপি হয় নাই। আমার যেরূপ মিতব্যয় ছিল, তাহাতে হইবারও সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু তাই বলিয়া, কেন না আর কিঞ্চিৎ অধিক অর্থ উপার্জ্জন করিয়া, আরও কিঞ্চিৎ ভাল না থাকিব ? বিশেষতঃ চিরকাল কাজকর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়া এক্ষণে অলসভাবে বাটী বসিয়া থাকিতে ইচ্ছা

হয় না। এজন্যই আমার স্থানান্তরে যাইয়া কার্য্য করিবার ইচ্ছা। কিন্তু মহামায়াকে পীড়িত অবস্থায় রাখিয়া কি প্রকারে বাটী হইতে চলিয়া যাই ? আজ-কাল করিয়া প্রায় মাসাবধি কাটিয়া গেল। তথাপি মহামায়া পূর্ব্ববৎ রহিল, বরঞ্চ মন্দ ভিন্ন ভাল নহে। নানাবিধ ঔষধ দিলাম, কিন্তু কিছুতেই কিছু ফল দর্শিল না। হায় ! তখন জানিতে পারি নাই যে, যত ঔষধ দিতাম, তাহার এক বিন্দুও মহামায়া খাইত না ! কিন্তু এ কথা অনেক পরে জানিতে পারিলাম। আপাততঃ আমার ঔষধে মহামায়ার কোন উপকার না হইয়া বরঞ্চ ক্রমে অপকার হইতে লাগিল দেখিয়া, আমি যে ডাক্তারখানায় কর্ম্ম করিতাম তথাকার ডাক্তার-বাবুকে পত্র লিখিব এইরূপ মনে মনে স্থির করিলাম। কিন্তু আমি যে ডাক্তার-বাবুর অধীনে কাজ করিতাম, সে ডাক্তার-বাবু আর এক্ষণে তথায় নাই—স্থানান্তরে প্রেরিত হইয়াছেন ; এবং তাঁহার পরিবর্ত্তে সেস্থানে আর একজন ডাক্তার আসিয়াছেন। এজন্য, প্রথমে কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিলাম যে, ইঁহাকে লেখা উচিত কি না ! পরে বিবেচনা করিলাম, আমার লেখায় কোন দোষ হইতে পারে না—তিনি জবাব দেন আর নাই দেন। এই স্থির করিয়া, মহামায়ার অবস্থা আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিয়া তাঁহাকে এক সুদীর্ঘ পত্র লিখিলাম। পত্র ডাকঘরে দিলে, হঠাৎ আমার মনে হইল যে, আমি প্রথমতঃ বারাকপুরে যে ডাক্তার-বাবুর নিকট কাজকর্ম্ম শিখিয়াছিলাম, তাঁহাকেও একখানি পত্র লিখিলে ভাল হইতে পারে। অতএব তাঁহাকেও একখানি পত্র লিখিলাম। এ পত্রখানিতেও মহামায়ার অবস্থা পূর্ব্ব-পত্রে যেরূপ বর্ণনা করিয়াছিলাম, সেইরূপ করিলাম। অধিকন্তু, বারাকপুর পরিত্যাগের পর আমার অদৃষ্টে যখন যাহা ঘটিয়াছে, সে সমস্ত বিষয়ও লিখিয়া দিলাম।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

জয়গোপাল ব্যাকুল।

আশার ইয়ত্তা নাই। যাহার যত আছে, সে ততই অধিক আকাঙ্ক্ষা করে। জয়গোপালের প্রথম অবস্থা তাদৃশ ভাল ছিল না বটে ; কিন্তু এক্ষণে তাঁহার প্রচুর অর্থ হইয়াছে, ভূমি-সম্পত্তিও প্রচুর হইয়াছে, বলিতে হইবে। কিন্তু তথাপি তাঁহার আশা কমিতেছে না। তিনি নিজের গ্রাম খরিদ করিয়াই তাহার জরিপ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার বাটীর নিকটে তাঁহার খুড়ার কয়েক কাঠা জমী ছিল ; সে জমী হইতে তাঁহার খুড়ার বিশেষ কোন উপসত্ব ছিল না, কিন্তু সে জমীটুকু জয়গোপাল পাইলে তাঁহার বাড়িটী অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত করিয়া প্রস্তুত করিতে পারিতেন। কিন্তু খুড়া-মহাশয় কোন ক্রমে সেটুকু জয়গোপালকে দিলেন না। জয়গোপাল সে জমীটুকুর পরিবর্ত্তে অন্য একস্থানে তাহার তিনগুণ পরিমাণ জমী দিতে চাহিলেন ; কিন্তু জয়গোপালের খুড়া তাহাতেও শুনিলেন না। এক্ষণে জয়গোপাল গ্রাম জরীপ করিয়া দেখিলেন যে, কেবল সেটুকু নয়, তদ্ভিন্ন অপরাপর স্থানেও কয়েক কাঠা জমী অন্যায়-পূর্ব্বক ভোগ-দখল করিতেছেন। এরূপ দেখিয়াই, তিনি সে সমস্ত জমী খাস করিয়া লইলেন। তখন তাঁহার খুড়া যে দুঃখ করিতে লাগিলেন, তাহা বর্ণনাতীত। তিনি কহিলেন,—“আমার অংশের জমী যদি মাপে অধিক হইয়া থাকে, তবে তোমারও অধিক আছে ; কারণ, যত জমী ছিল, তাহার ন্যায্য অংশের অধিক তো এক ছটাকও পাই নাই !” কিন্তু এক্ষণে একথা বলিবার ফল কি ? অপর কেহ জমিদার হইলে জয়গোপালের নিকট হইতে বেশী জমীর খাজানা লইত, অথবা ঐ জমী খাসে করিয়া লইত। কিন্তু জয়গোপাল নিজেই যেস্থলে

জমীদার, সে স্থানে যত জমী ইচ্ছা ততই নিজে রাখিতে পারেন।

জরীপ করিতে করিতে প্রকাশ হইল, শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তিরও দলিলে যত জমী লেখা আছে, তাহা অপেক্ষা তিনি অধিক ভোগ-দখল করিতেছেন। কিন্তু, তখনি সে বিষয়ে কোন কথাবার্ত্তা না কহিয়া, রাত্রিকালে জয়গোপাল নিজে শিবচন্দ্রের বাটীতে গেলেন। শিবচন্দ্র অতি সামান্য গৃহস্থ। তাঁহার জমা-জমী হইতে যে কিঞ্চিৎ আয় হয় তাহাতেই তাঁহার সংসার কষ্টে-শ্রষ্টে একরূপ চলিয়া যায়। তিনি কাহারও নিকট দায় জানান না, কাহারও নিকট কর্জ্জ করেন না। জয়গোপাল ধনী হইয়া সকলকেই তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিতেন; কিন্তু শিবচন্দ্র দরিদ্র, তথাপি তাঁহাকে সর্ব্বদা মান্য করিয়া চলিতেন। অপরাপর কাহারও সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে হইলে তাহাদিগকে পেয়াদা দিয়া ডাকাইয়া আনিতেন। কিন্তু শিবচন্দ্রের বাটী তিনি নিজে চলিয়া গেলেন। কি কারণে জয়গোপাল শিবচন্দ্রের প্রতি এরূপ পৃথক ব্যবহার করিতেন, তাহা পাঠকবর্গ যথাসময়ে জানিতে পারিবেন। আপাততঃ জয়গোপাল শিবচন্দ্রের বাটীতে গেলে, শিবচন্দ্র যে পিঁড়িতে (কাষ্ঠাসনে) বসিয়া ছিলেন, তাহার নিকটে আর একখানি কাষ্ঠাসনে জয়গোপালকে বসিতে বলিয়া, নিজে তামাক সাজিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। তাঁহার পিঁড়ির নিকট একটা মৃত্তিকা-পাত্রের এক খোপে খানিক তামাক আছে, আর এক খোপে খান-কয়েক টীকা, এবং তৃতীয় এক খোপে চকমকী-পাথর ও একখণ্ড সোলা রহিয়াছে। শিবচন্দ্র তামাক সাজিতে উদ্যত হইলে, জয়গোপাল কহিলেন,—"আপনি কেন কষ্ট কচ্চেন? আমাকে দেন, আমি তামাক সাজ্‌চি।" শিবচন্দ্র কহিলেন,—"তুমি পার্‌বে না; তোমার কি এসব অভ্যাস আছে বাপু! পরমেশ্বরের কৃপায় তোমরা বড়-মানুষ হয়েছ, পাল্লেও এ সমস্ত কাজ তোমাদের করা উচিত নয়। যে কাজ ক'রে একজন লোক তোমাদ্বারা প্রতিপালন হবে, সে কাজ তুমি কল্লে, গরিব এক ব্যক্তি কি করিয়া খাইবে?" এই বলিয়া শিবচন্দ্র চকমকি ঠুকিয়া আগুণ বাহির করিয়া টীকা ধরাইতে লাগিলেন। জয়গোপাল ইত্যবসরে একটু তামাক লইয়া কলিকাতে টুকরা টুকরা করিয়া স্থাপন করিতে করিতে বলিলেন,—"বড় মানুষই বলুন, আর যাই বলুন, সে সমস্তই তো আপনার পাদপদ্ম-প্রসাদাৎ। আপনি না কৃপা করিলে কেই বা আমাকে চিনিত, কেই বা আমাকে মানিত! পিতা আমাকে জীবন-দান করিয়াছেন মাত্র, আপনি আহার দিয়া সেই জীবন বাঁচাইয়া রাখিয়াছেন। আপনার কৃপা না থাকিলে আমার জীবনে আর আমার কি ফল হইত? আপনার তামাক সাজিব না তো কাহার তামাক সাজিব? আশীর্ব্বাদ করুন, চিরকালই যেন আপনার তামাক সাজিয়া এ জীবন কাটাইয়া দিই।"

শিব।—তবে কি আমি তোমা অপেক্ষা অধিক দিন বাঁচিব, ভাবিয়া রাখিয়াছ নাকি?

জয়।—কেন বাঁচবেন না? আপনার বয়স কি? এই ৩০।৩২ হয়েছে বৈত নয়! তবে আপনার কাশরোগ আপনাকে একটু বুড়ো করে ফেলেছে। তা দেখুন, এই শীতকাল গেলেই আপনি পূর্ব্ববৎ হবেন।

শিব।—না বাপু, তা কি কখন হয়? আমার বয়স তো ত্রিশ-বত্রিশ নয়, চল্লিশ-বিয়াল্লিশ। যাইহোক বাপু, বাঁচিতে আর সাধ নাই। এক্ষণে আমি গেলেই বাঁচি। ভাবনার মধ্যে এই, ছোঁড়াটাকে যদি একটু বড় দেখিয়া মরিতে পারি, তাহা হইলেই আর আমার মরিতে দুঃখ থাকিবে না।

ছোঁড়াটা শিবচন্দ্রের পুত্র।

জয়।—আপনার পুত্রের জন্য আপনার ভাবনা কি? যদি আমার পুত্র একমুঠা অন্ন পায়, তবে কি আপনার পুত্র উপবাসী থাকবে?

শিব।—চিরজীবী হয়ে থাক বাপু! কাজটাই যে এত বেশী, তা নয়! তোমার অন্নে কত লোক প্রতিপালিত হচ্চে। কিন্তু তোমার মিষ্ট কথাই ক্ষির-কাঁঠাল। বাপু, চিরজীবী হও, ধনে-পুত্রে লক্ষলাভ হউক।

ইতিমধ্যে তামাক সাজা হইয়াছে। সাজা হইলে, শিবচন্দ্র প্রথমতঃ হুঁকাটী জয়গোপালের হস্তে দিয়া কহিলেন,—"ধরাও বাপু!" জয়গোপাল কহিলেন,—"সে কি হয়? আপনি অগ্রে খান।" তখন শিবচন্দ্র দুই-চারি টান দিয়া, হুঁকাটী জয়গোপালের হস্তে দিলেন। জয়গোপাল হুঁকাটী লইয়া একটু আড়ালে গিয়া তামাক টানিয়া আসিয়া, হুঁকাটী পুনরায় শিবচন্দ্রের হস্তে অর্পণ করিলেন। হুঁকা দিয়া কহিলেন,—"মহাশয়, আপনার নিকট একটি প্রস্তাব করিতে আসিয়াছি; আপনি বোধ হয় অবগত আছেন যে, এ গ্রামখানি খরিদ করা অবধি জরীপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এবং সেই জরীপে অনেক তক্ক বাহির হইয়া পড়িতেছে। আমার বাটীর নিজ পূর্ব্বদিকে আমার খুড়া-মহাশয়ের তিন কাঠা জমী আছে। এই তিন কাঠা জমী পাইলে, আমার বাটীটি সু-ঢপ হইতে পারে; কিন্তু তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, আমাকে সেটুকু দেবেন না। আমি তাহার পরিবর্ত্তে অন্য স্থানে নয় কাঠা জমী দিতে চাহিয়াছিলাম। তথাপি তিনি সম্মত হইলেন না। এক্ষণে জরীপ করিয়া দেখা গেল যে, খালি ও তিন কাঠা নয়—অন্যান্য স্থলে আরও কয়েক কাঠা বিনা-দলীলে ভোগ-দখল করিয়া আসিতেছেন। সে সকল সম্বন্ধে আমি অবশ্য কিছুই বলি নাই; কিন্তু আমার বাটীর নিকট তিন কাঠা আমি লইয়াছি। ইহাতে খুড়া-মহাশয় আমাকে যৎপরোনাস্তি গালি দিতেছেন ও তিরস্কার করিতেছেন। অতএব এ বিষয়ে

অপনার পরামর্শ কি?" শিবচন্দ্র খক্‌ খক্‌ করিয়া খানিক কাশিয়া কহিলেন,—"বাপু, ও সমস্ত অনেক কথার কাজ। তবে মোটামুটী এই বলি যে, এ গ্রামে—এ গ্রামেই বা কেন, সকল স্থানেই এমন কেহ বিত্তভোগী নাই যে, দলিলে যাহা লেখা আছে, তাহার অধিক দুই এক বিঘা বা দুই এক কাঠাও জমী ভোগ-দখল করিতেছে না। বৎসর চার হইল, যখন নীলকরেরা আমাদের গ্রাম পত্তনি লয়, তখন জরীপে বাহির হইয়া পড়িল যে, তোমার পিতা দলিলের অতিরিক্ত দেড় বিঘা জমী দখল করিতেছেন; এবং আমারও কিঞ্চিৎ দলিলের অতিরিক্ত জমী বাহির হইয়া পড়িল। কিন্তু কি করি, বিনা-চেষ্টায় পৈতৃক-সম্পত্তি ত্যাগ করা কাপুরুষতা মনে করিয়া, তোমার পিতা ও আমি আমিনকে কিছু কিছু দিয়া আমাদিগের জমী অল্প করিয়া মাপাইয়া দিলাম। অতএব এই উপস্থিত জরীপে তোমার খুড়ার জমী যে বৃদ্ধি হইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? মাপিয়া দেখিলে, বোধ হয়, আমারও জমীতে বৃদ্ধি দেখা যাইবে।"

জয়।—আমারও মহাশয়ের নিকট সেই নিমিত্তে আসা। আপনার দলিলের অতিরিক্ত পোনের কাঠা জমী বাহির হইয়া পড়িয়াছে। এবিষয়ে আমার প্রস্তাব এই, আপনার জমাজমী-সম্বন্ধে আমার কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিবার বাসনা নাই, করিবও না; কিন্তু খুড়া-মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলে অনুগ্রহ করিয়া বলিবেন যে, আপনাকেও অতিরিক্ত জমীর দরুণ খাজানা দিতে হইবে।

শিব।—বাপু, সে কাজটী আমা দ্বারা হইবে না। আমি বিয়াল্লিশ-তেতাল্লিশ বলিতেছিলাম, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমার বয়ঃক্রম এক্ষণে পঁয়তাল্লিশ বৎসর। সত্তর বৎসর আজকাল মানবজীবনের পরিমাণ। সে হিসাবে আমার আর পঁচিশ বৎসর মাত্র পরামায়ু আছে। এই

ভাবিয়া-চিন্তিয়া এক্ষণে আমি আর কাহারও বাটী যাই না; প্রায় যাচিয়া কাহারও সহিত কথা-বার্ত্তাও কহি না। আজকাল যেরূপ রীতি-নীতি প্রচলিত হইয়াছে দেখিতেছি, তাহাতে পাঁচ জনের সঙ্গে আলাপ করিলেও তাহার শাস্তি আছে; দলাদলী মামলা-মকর্দ্দমা কথায় কথায় উপস্থিত হইতেছে। কাহারও সহিত দুকথা কহিলে অথবা কাহারও বাটীতে দু'দণ্ড বসিলে,হয় তো পাঁচ সাত দিন পরেইআদালতে একটা না একটা সাক্ষী দিতে হয়। আমি তা চাই না; সুতরাং কাহারও বাটীতে যাই না।

জয়গোপাল কাতরস্বরে কহিলেন,—"আমি আপনাকে যাহা করিতে অনুরোধ করিতেছি, তাহা হইলে তো আর আপনাকে সাক্ষী দিতে হবে না! আপনি কেবলমাত্র বলিবেন যে, অতিরিক্ত জমীর জন্য আপনিও খাজানা দিতেছেন। বিবেচনা করিয়া দেখুন, তাহা না বলিলে আমি খুড়ার নিকট হইতে আমার প্রয়োজনীয় তিন কাঠা পাই না। বিশেষতঃ সে তিন কাঠায় তাঁহার কোনই লাভ হইতেছে না; কিন্তু আমার সমূহ লোকসান হইতেছে।

শিব।—আমি খাজানা না দিয়া কি প্রকারে বলিব খাজনা দিতেছি?

জয়।—মহাশয়ই তো ক্ষণেক অগ্রে কহিলেন যে, আপনি নীলকরের জরীপের সময় কিঞ্চিৎ অর্থ দিয়া জমীর মাপ কম করাইয়া লইয়াছিলেন। সেটী পারিলেন, তবে এটীও তো সেই সম্বন্ধেরই কথা?

শিব।—বাপু, ও সমস্ত আমরা বুঝি। তুমিই যে একাকী বোঝ, তাহা নয়। তোমার পিতা গত বৎসর ৺কাশীধামে গিয়াছিলেন। প্রত্যাগমন-কালে তোমার জন্য ও আমার জন্য যে দশ ভরির হিসাবে কয়েক টাকার আফিং আনিয়াছিলেন, তাহা কি তোমার স্মরণ নাই? অবশ্যই আছে। আচ্ছা, তাঁহাকে কেন এখন সাক্ষী মান না? তিনি তো বলিতে পারেন যে, আমি তাঁহাকে অতিরিক্ত জমীর খাজানা দিয়া থাকি? বাপু, তুমিও একজন কৃতবিদ্য। হঠাৎ যদি তোমাকে কেহ মিথ্যাবাদী বলে, তবে তুমি তাহাকে কি বলিয়া জবাব দিবে? সে দিন সেই মোক্তারটী যখন জিজ্ঞাসা করিল যে, সাক্ষীকে কি বলাইতে হইবে, তখন তুমি তাহাকে কি বলিয়াছিলে তা তো তোমার স্মরণ আছে! আর, এ বিশ বৎসর তুমি যে ধর্ম্মপথে চলিতেছ, তাহাও কি তুমি ভুলে গেলে?

জয়গোপাল।—(ভীত হইয়া) আজ্ঞে, ওসব কথা আর মনে কর্‌বেন না। নীলকরদিগের জরীপের কথাটা হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে বাহির হ'য়ে পড়েছে। (পরে শিবচন্দ্রের পা-দুখানি ধরিয়া) আমার ঘাট হইয়াছে; আমাকে মার্জ্জনা করুন। আমি মহাশয়ের নিকট কীটানুকীট। (ক্ষণেক বিলম্বে) বলুন, আমাকে মাপ করলেন!

শিব।—(পা-দুখানি মোচন করিয়া লইয়া) মাপ করেছি বৈ কি? আমি তো তোমার কিছু অনিষ্ট করি নাই! তবে কি না 'খাজানা দিয়া থাকি' একথাটা আমার মুখ দিয়ে বাহির হওয়া উচিত নয়। এ কলিকাল, একালে ধর্ম্মাধর্ম্মের বিচার নাই। যদি আমার মুখে পাঁচ জনে একথাটী শুনিয়া আমাকে সাক্ষী মানে, কিম্বা (একটু হাসিয়া) যদি তুমিই তাহাদিগকে আমার বিপক্ষে সাক্ষী মান, তখন কি হ'বে বল দেখি?

জয়গোপাল কহিলেন,—"আমি বলিতেছিলাম যে, আপনিই যে একটী কথা বলিবেন, তাহা নহে; দাখিলা দিবার সময় আমিও বেশী করিয়া লিখিয়া দিব।"

শিব।—সেই ত আরও খারাপ! মনে কর, আজকাল চেকে দাখিলা দেওয়া হয়; আর তার একটা নকল থাকে। কিন্তু যদি আমি পীড়িত হইয়া পড়ি, অথবা অন্য কোন কারণে অশক্ত হই, কিম্বা মরণ-বাঁচনের কথা তো কেহ বলিতে পারে না, যদি আমি মরিয়া যাই, তাহা হইলে ছোঁড়াটাকে তো অধিক দিতে হইবে, তার তো ভুল নাই? না বাপু, ওসব কাজের কথা নয়। আমার বাড়ী জরীপ করিয়া কিঞ্চিৎ জমী বাহির হইয়া পড়িয়াছে। যখন তুমি জরীপ করিবার প্রথম প্রস্তাব কর, তখনি আমি জানিতে পারিয়াছিলাম, কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত জমী বাহির হইবে। এক্ষণে তাহার যে বিবেচনা হয়, তাহাই কর। যদি আমাকে ঠিক সাবেক আঁকে লিখিয়া দেও, ভালই; যদি না দেও, তবে ইহার মধ্যে যে কর্ত্তব্য, অবশ্যই তাহা করিতে হইবে। আমার ভদ্রাসনের যে যার কাঠা বাহির হইয়া যাইবে, ইহা আমি কোন মতেই বরদস্ত করিতে পারিব না; থালাখানা, ঘটিটা, বাটীটা যাহা আছে, বন্দক দিয়া অথবা বিক্রয় করিয়া, মকর্দ্দমা করিতে হইবে। আর, একবার আমি মকর্দ্দমায় প্রবৃত্ত হইলে, কোথাকার জমী কোথায় যাইবে, কার জমীদারী কার হইবে, তাহা বলা বড় কঠিন হইয়া উঠিবে। তুমি যে এত বড় পণ্ডিত, তুমিও বলিতে পারিবে না।

জয়।—মহাশয়, পদানত ব্যক্তিকে কি প্রহার করা উচিত? আপনি তো আমাকে একবার মাপ করিয়াছেন? আমার যে অপরাধ হয়েছে, তাহা আমি স্বীকার করিতেছি। এক্ষণে আপনি যাহা বলিবেন, সেই অনুসারে আমি কার্য্য করিব; যদি না করি, পরমেশ্বর মাথার উপর আছেন—তিনি যেন এই মুহূর্ত্তে বজ্রাঘাতে আমার প্রাণনষ্ট করেন।

শিব।—ছি, ছি, এমন কথা কৈতে আছে; চিরজীবী হয়ে থাক। তুমি আমাদের গ্রামের শ্রী। তোমার নামে আমরা পাঁচ জন পরিচিত। আমাদের কে চেনে? সেদিন সহরে গিয়েছিলাম; আমার নিবাস কোথায় জিজ্ঞাসা করিল। আমাদিগের গ্রামের নাম

করিলাম; তাহাতে চিনিতে পারিল না। পরে যখন তোমার নাম করিলাম, তখন অনায়াসে চিনিতে পারিল। তোমার পিতাকে পর্য্যন্ত চিনিল, এবং অনায়াসে তাঁহার নাম করিয়া ফেলিল। তাই বলি, তুমি আমাদের গ্রামের মুখোজ্জ্বল করেছ। সার্থক এ গ্রাম, তোমার জন্ম হইয়াছিল; সার্থক তোমার মাতার জীবন, সার্থক তোমার পিতার জীবন। আমরা অপর পাঁচ জন তো তোমারই দোহাই দিয়া খাই, তোমারই দোহাই দিয়া চলিয়া ফিরিয়া বেড়াই।

জয়গোপাল যে একজন বিশিষ্ট ব্যাকুব, তাহা যদি পাঠকবর্গ না জানিতে পারিয়া থাকেন, তবে তাঁহার এই জবাবে জানিতে পারিবেন। তিনি কহিলেন,—"হাঁ, সে বিষয়ে আপনি যে আজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা যথার্থ বটে। আমার নামে যে আপনাদিগের পাঁচ জনকে লোকে চিনে, তাহার আর ভুল কি? বলিতে হাসি পায়, আপনিও না হাসিয়া থাকিতে পারিবেন না, গত বৎসর আমার ঠাকুর আমার কার্য্য-স্থলে গিয়াছিলেন। আপনি জানেন, আমি কত মত চেষ্টা করিয়াছি, তথাপি তাঁহাকে ভাল কাপড়ও পরাইতে পারি নাই, এক জোড়া জুতাও পরাইতে পারি নাই। একদিন এক-জন নীলকর মক্কেল ঘোড়ায় চড়ে এসে কর্ত্তাকে আমার চাকর মনে ক'রে বলিল,—'পাকৃড়াও, পাকৃড়াও, হামারা ঘোড়া পাকৃড়াও।' কর্ত্তা ত কখন ঘোড়ায় চড়েনও-নি, ঘোড়ার কাছেও যান-নি; বোধ হয়, দুয়ের এক করিলে, সাহেবের ঘোড়াটী ধরিতে পারিতেন। কিন্তু না ধরায়, সাহেব তাঁহাকে চাবুক মারিতে যায় আর কি, এমন সময়, আমি বাহিরে আসিয়া, বৃত্তান্ত অবগত হইয়া, কহিলাম,—'I say Phillips let the old man alone.' তার মানে 'সাহেব বুড়াকে প্রহার করিবার দরকার নাই।' তখনই আমার সহিসকে ডাকিয়া ঘোড়াটা

ধরিতে বলিলাম। সহিস ঘোড়া ধরিল। সাহেব-লোক কেমন তো জানেন, গ্যাড-ম্যাড করিয়া আসিয়া আমার সহিত সেক-হ্যাণ্ড করিয়া ঘরের ভিতর বসিল। বোধ হয়, আমি উপস্থিত না থাকিলে, সেদিন আমাকে গলায় কাচা পরিতে হইত। সাহেবের চাবুক গাছি ত সামান্য চাবুক নয়!"

শিবচন্দ্র অতি কষ্টে হাসি সম্বরণ করিয়া কহিলেন,—"হাঁ বাপু, সে বেশ করেছিলে, বেশ করেছিলে। তুমি ওরূপ না কল্লে তোমার বাপের বুড়ো হাড় আর আস্ত থাক্‌তো না। আমাদের তো মার খাওয়া কতকটা অভ্যাস আছে। যখন পাঠশালায় লিখ্‌তাম, তখন কত যে বেত খেয়েছি, তার ঠিক নেই। আর সে বেত খেয়েই বা কি ফল হলো? শিখবার মধ্যে নামটা দস্তখত, আর চিঠিপত্রখানি লেখা! তোমার ঠাকুর কখনও পাঠশালায় যান নাই, কখনও বেতও খান নাই; কিন্তু তাঁর কি ক্ষতি হয়েছে? তিনি নাম দস্তখত করিতে পারেন না বটে, চিটি লিখ্‌তেও পারেন না বটে, তাতে তার লোকসান কি? তুমি যেরূপ সুবোধ বিদ্যান পুত্র হয়েছ, তাতে তোমার পিতার লেখা-পড়া না শেখায় কোন ক্ষতি হয় নাই। যেমন তাঁহার হয়ে তুমি চিঠিপত্র লিখে দাও, তেমনি তুমি যদি সেই মহেন্দ্র-ক্ষণে না আসিয়া পৌঁছিতে পারিতে, তাহা হইলে তোমার পিতার, যাহা বলিয়াছ, তাহাই হইত। মুখে আনিতে নাই, বোধ হয়, তোমাকে কাচা পরিতেই হইত।"

ক্ষণকাল উভয়ে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। রাত্রি ক্রমে অধিক হইল। উভয়েই অহিফেন-সেবী, উভয়েরই প্রথম রাত্রে নিদ্রা হয় না। কিন্তু বাটীর অন্যান্য ব্যক্তির তো হয়! এইজন্য, জয়গোপালের বাটী হইতে লণ্ঠন-হাতে এক ভৃত্য জয়গোপালকে ডাকিতে আসিল। জয়গোপাল ঘড়ী খুলিয়া দেখিলেন, —১১টা। তখন গাত্রোত্থান-উপলক্ষে শিব-চন্দ্রকে জিজ্ঞাসিলেন,—"মহাশয়, উপস্থিত বিষয়ের পরামর্শ কি?"

শিবচন্দ্র কহিলেন,—"বাপু, আমার কথা যদি শোন, তবে আপনা-আপনির মধ্যে কলহ-বিবাদের দরকার নাই। তোমার খুড়ার জমী-টুকু ছাড়িয়া দাও। ঈশ্বর তোমাকে অনেক অর্থও দিয়াছেন, অনেক জমা-জমীও দিয়াছেন; যদি বিশেষ ভাল করিয়া বাটী প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে সাবেকী জমী ত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া কোন স্থানে বাটী কর। এক্ষণে সমস্ত গ্রামই তো তোমার!"

জয়।—আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য। অদ্য চলিলাম। কল্য সন্ধ্যার সময় আবার আসিব। যাহা বক্তব্য থাকে, তখন নিবেদন করিব।

এই বলিয়া জয়গোপাল গাত্রোত্থান করিলেন। শিবচন্দ্রও বাটীর ভিতর চলিয়া গেলেন।

সোণার পাথর-বাটী।

সভ্যতা শিক্ষা-সাপেক্ষ; সুতরাং আমরা যতই শিক্ষিত হইতেছি, ততই সভ্যতার উচ্চ সিঁড়িতে পা বাড়াইতেছি। আজকাল পাশ্চাত্য-শিক্ষার তরঙ্গে ভারত আলোড়িত বিলোড়িত; সুতরাং আমাদিগের সভ্যতাও পাশ্চাত্য-ছাঁচে গঠিত। এপ্রকার পরিবর্ত্তন উন্নতির পরিচায়ক, কি অবনতির পথপ্রদর্শক, তাহা চিন্তা করিবার আমাদিগের অবকাশ নাই। পেটের দায়ে পাশ্চাত্য-শিক্ষা অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছে, আর সভ্যতা তাহার অবশ্য-ম্ভাবী ফল; সুতরাং অঙ্গ-ঝাড়া দিয়া কাহাকেও ফেলিবার উপায় নাই। প্রাচ্য হিন্দু-সমাজের অবশ শরীরে পাশ্চাত্য-হাওয়া লাগাতে বাহিরে বিলক্ষণ বর্ণ-বৈচিত্র্য ও চাকচিক্য লক্ষিত হয় সত্য; কিন্তু আমাদিগের অভ্যন্তর যে দিনদিন

ফোঁপরা হইতেছে, তাহা কি আর কাহারও জানিতে বাকি অছে? যে জানে না, সে সুখে আছে; কারণ, মন্দটার অজ্ঞতাই ভাল —"It is folly to be wise where ignorance is bliss." আমরা জানি সবই, বুঝিতেও সবই পারি; কিন্তু কেমন যে আমরা হুজুগে জাতি, হুজুগ কিছুতেই ছাড়িতে পারি না; তাহাতে প্রাণ থাকে, ভালই; না থাকে, নাচার। আমরা প্রথম-শ্রেণীর নকলনবীশ; সুতরাং সম্মুখে যাহা দেখিব, তাহাই অনুকরণ করিয়া বসিব, ভালমন্দ বিচার আবার কিসের? বাহিরে যাহা চক্‌চকে, ইংরাজ এখন আমাদিগের পক্ষে তাহারই নমুনা—আমরা উপযুক্ত গুরুর উপযুক্ত শিষ্য! বসন-ভূষণ, পান-ভোজন, শয়ন-স্বপন, প্রতিদিন ও প্রতি মুহূর্ত্তে আমরা যাহা কিছু করি, সমস্তই ইংরাজী ছাঁচে ঢালা—ইংরাজ আমাদিগের মরণ-কাঠি জীবন-কাঠি। একটু অনুসন্ধান করিলেই দেখা যায় যে, আমরা এক নূতন জীবে পরিণত হইতেছি—আমাদিগের পৌণে ষোল আনা ইংরাজী। যদিও পুরাতনের ছায়া আমরা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিতে পারি নাই, তথাপি পুরাতনে নূতনে মিশিয়া যে অদ্ভুত আকার ধারণ করিয়াছে, তাহা, বিকট হইলেও, এক নূতন সামগ্রী। এই নূতন স্রোতে আমরা এখন সম্পূর্ণরূপে অঙ্গ ঢালিয়া দিয়াছি, এবং অন্তঃপুরের দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া দিয়া গৃহলক্ষ্মী-দিগকেও ভাসাইয়া তুলিয়াছি। আমরা চুলার সামগ্রী, চুলায় যাই, তাহাতে বড় একটা আসে-যায় না; কিন্তু কুলমহিলাগণ যে সেই চুলার ছাই মাখিয়া সং সাজিতেছে, ইহার অধিক আর বিড়ম্বনা কি? কুক্ষণে আমরা সাম্যের শ্রাদ্ধ করিতে শিখিয়াছি! কুক্ষণে মিলের সপিণ্ডকরণের ভার আমাদিগের স্কন্ধে পড়িয়াছে! কুক্ষণে মেয়ে-স্কুল স্থাপিত হইয়াছে! আমরা ত ডুবিয়াছি; কিন্তু তাহাতেই নিস্তার নাই—আমাদিগের অমানুষী প্রতিভার গুণে স্ত্রী-পরিবারগণও হাবুডুবু খাইতেছে। পাশ্চাত্য-সমাজে (দুই একটা ছাড়া) সকল বিষয়েই নরনারীর সমান অধিকার দেখিলাম; তাহার উপর ইংরাজ দার্শনিক পণ্ডিত বলিলেন যে, স্ত্রী-পুরুষে শারীরিক ও মানসিক কোনপ্রকার প্রভেদ নাই; সুতরাং আর কি আমরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি? আমরা অমনি মহিলাগণকে গাড়ী চড়াইয়া গড়ের মাঠে হাওয়া খাইতে ছাড়িয়া দিলাম, এবং আপনারা ঘোম্‌টা টানিয়া বাটনা বাটিয়া হাঁড়ী ধরিলাম। ইহার ফল কি হইল, তাহা একবার বাহ্য ও অন্তর-চক্ষে চাহিয়া দেখ দেখি? একদিকে পড়া পোষা পাখীটী শিকল কাটিল, আর অন্যদিকে মাছের ঝোলের ফেন গালিতে আঙ্গুল ফুলিয়া কলাগাছ হইল।

হালের নূতন আইনে, বকেয়ার বুকে পাথর চাপাইয়া, আমি আর আমি নই, তিনিও আর তিনি নহেন—এখন তিনি হইয়াছেন আমি, আর আমি হইয়াছি তিনি, আর আমি তাঁহার সেমিজ-ধরা নন্দ-দুলাল! ইংরাজী ব্যাকরণ-খানারও একটা নূতন সংস্করণ আবশ্যক হইয়াছে; কারণ, স্ত্রী-পুরুষে একটা বিষম পাল্‌টা বদল করিতে হইবে—এখন আমি হইয়াছি she, আর তিনি হইয়াছেন he! কেবল ইহাই নহে—অপরম্বা কিং ভবিষ্যতি! অর্থাৎ এমনও সম্ভাবনা আছে যে, কিছুদিনের মধ্যে আমাকে neuter হইতে হইবে, এবং দাম্পত্য আইনের ধারামতে পুরুষকে স্ত্রীর ইচ্ছাধীন অস্থাবর সম্পত্তিতে পরিণত হইতে হইবে,—moving or moveable property at the absolute disposal of the wife. এখন আমি বাটনা বাটি, রন্ধন করি, জল তুলি, বাসন মাজি, পান সাজি, বিছানা করি, সলিতা পাকাই, ছেলে আঁচাই ইত্যাদি ইত্যাদি; আর তিনি, বড়ি আঁটিয়া, আল্‌বাট কাটিয়া,

সভা-সমিতিতে যান ও তাঁহার বন্ধু-বান্ধবদিগের সহিত দেখা-শুনা visit return করেন। এই সকল কাজ করিয়া সংসারের দিকে ফিরিয়া চাহিতে তাঁহার অবসর হয় না ; হইলেও, চাহিয়া দেখেন না ; কারণ, নূতন অধিকার-লাভের সঙ্গে সঙ্গে তিনি পুরাতনকে একেবারে পরিহার করিয়াছেন। বিশেষতঃ রন্ধনাদি কার্য্য এখন ঘৃণিত ও বাবুর্চির জিম্বা, সন্তান-পালন দাসীর জিম্বা, গৃহস্থালী দাসদাসীর জিম্বা, ধর্ম্মকর্ম্ম সমাজের আচার্য্যের জিম্বা। যদি আমার অবস্থা মলিন হইল অর্থাৎ উপার্জ্জন সামান্য হইল, তাহাহইলে ধর্ম্মকর্ম্ম ছাড়া অপর সকল কর্ম্মই আমার জিম্বা হইল। স্বাভাবিক নিয়মে শারীরিক ও মানসিক পার্থক্য-অনুসারে মনুষ্য-সমাজের জন্মদিন হইতে যাহা আবহমান-কাল স্ত্রীজাতির অধিকৃত ছিল, আজ বিজ্ঞানের আলোকে সভ্যতার প্রভাবে, তাহা পুরুষের স্কন্ধে অর্পিত হইল ; সুতরাং আমার স্ত্রীত্ব প্রাপ্তি হইল ভিন্ন আর কি বলিব ? সন্তান-ধারণ ও প্রসব আজ পর্য্যন্ত যদিও আমাকে করিতে হয় নাই, তথাপি সকল বিষয়েই এখন আমি স্ত্রীত্ব-প্রাপ্ত হইয়াছি। আমার সাবেক বলবীর্য্য, সাহস-বিক্রম এখন আর কিছুই নাই, কার্য্যকরী active ক্ষমতা সকল পঞ্চত্ব পাইয়াছে, এবং তৎপরিবর্ত্তে সহনশীল passive ক্ষমতা বৃদ্ধি হইয়াছে। কার্য্যতঃ স্ত্রীর সকল কাজই আমাকে করিতে হয় বটে ; কিন্তু গাধা পিটিলে ঘোড়া হয় না, এবং শিং ভাঙ্গিলেও বাছুরের দলে মিশা যায় না ; সুতরাং আমি হইয়াছি বেগুণ গাছে কুষ্মাণ্ড, আর তিনি হইয়াছেন কাঁটালের আমসত্ব। আমার সন্তান-পালন, রন্ধন প্রভৃতি গৃহকর্ম্ম যেমন নৈপুণ্য-সহকারে সম্পাদিত, তাঁহার পুরুষ সাজিয়া বক্তৃতা করা, ঘোড়া চড়া প্রভৃতি কার্য্যও তেমনই নৈপুণ্য-সহকারে সম্পাদিত হইতেছে। হিন্দুগৃহের এই অভাবনীয় সংস্করণ reform হইতে যে ফল উৎপন্ন হইতেছে, তাহা আমিও জানি, এবং তিনিও জানেন ; কিন্তু জানিলে হইবে কি ? গোয়ালের বাঁধা গরু দড়ি ছিঁড়িলে যেমন লম্ফ ঝম্ফ দিয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটী করে এবং লোকের গাছপালা নষ্ট করে, তাঁহার এখন সেই অবস্থা হইয়াছে ; তিনি কি এখন সহজে ধরা দিবেন ? তাহার উপর আবার আমাদিগের হুজুগ আছে—তাঁহারা ছুটাছুটী করিলে আমরা বড় একটা অসন্তুষ্ট হই না, বরং সাধ করিয়া সোহাগভরে সাধের সীমন্তিনিকে সাহেবিনি সাজাই ও সমাজে ছাড়িয়া দিই ; কিন্তু যখন বাড়া-ভাতে ছাই পড়ে, তখন অসঙ্গত সাধে বিষাদ ঘটে, এবং হাঁ করিয়া কাঁদিতে হয়—যেন মাথায় ঠোকর মারিয়া মুখের মিঠাই কাকে কাড়িয়া লইয়া গিয়াছে ! পোষা পাখীকে উড়িতে শিখাইবার জন্য শিশু যেমন তাহাকে বাটীর বাহিরে লইয়া গিয়া অল্প অল্প করিয়া উড়াইয়া আনন্দ অনুভব করিতে করিতে পাখীটী উড়িয়া উধাও হইলে কাঁদিতে কাঁদিতে শুধু হাতে গৃহে ফিরিয়া আসে, আমাদিগকেও সময়ে সময়ে তেমনই বিড়ম্বিত হইতে হয়। কিন্তু তথাপি কি তোমার দৃষ্টান্তে আমার শিক্ষা হয় ? অবশ্য প্রবলাগণ (সেকালের অবলা) এখন অনেক সময়েই বাগ মানেন না, বাগ মানাইবার চেষ্টা করিলে চক্ষু রাঙ্গাইয়া উঠেন, এবং ঢিল্‌টী মারিলে আস্ত এগার ইঞ্চি খানি প্রহার করেন ; তথাপি আমরা আর জ্বলন্ত অগ্নিতে ফুৎকার দিয়া এবং ধূনা জ্বালিয়া মনসা নাচাই কেন ?

মহা-মহোপাধ্যায় দার্শনিক পণ্ডিত মিল্ সাহেব যতই কেন বলুন না যে, স্ত্রী-পুরুষে শরীর ও মানস-গত কোন প্রভেদ নাই ; আমরা কিন্তু বিনা-দর্শনের সাহায্যেই সহজ চর্ম্ম-চক্ষে উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ দেখিতে পাই। স্ত্রীজাতির জরায়ু স্তনাদি যন্ত্র সকল দেখিলেই শরীর-গত প্রভেদ বুঝিতে পারা যায় ; এবং স্ত্রী-দেহে যে পুরুষের মত বল ও ক্লেশ সহিষ্ণুতা নাই, তাহা কোন্ সবলা স্ত্রী অস্বীকার করেন ! স্ত্রীজাতি শরীরে যেমন দুর্ব্বলা, মনেও তেমনই অবলা—শরীর দুর্ব্বল ও কোমল হইলে মতিও যে তরল হইবে, তাহা জ্যামিতির স্বতঃসিদ্ধবৎ সহজ। তাহাদিগের প্রগাঢ় চিন্তা-শক্তি নাই, এবং এক বিষয়ে তাহাদিগের মন কখন স্থির নহে—এই জন্যই স্ত্রী-জাতির নাম চঞ্চলা। শাস্ত্রের কথা ছাড়িয়া দিতেছি—কেন-না, পুরুষের লেখা বলিয়া উহা পক্ষপাত-দোষে দূষিত হইতে পারে—মোটা কথাতেই বলা যাইতে পারে যে, স্ত্রীজাতির সর্ব্বতোভাবে পুরুষের অধীনে থাকা কর্ত্তব্য—তাহার স্বতন্ত্রতা ও স্বাধীনতা তাহার নিজের ও সমা[illegible]নের গোড়া। স্ত্রীজাতির স্তন, গর্ভাশয় প্রভৃতি যন্ত্রসকল তাহার নিজের কোন উপকার-সাধনের জন্য নহে, কেবলই সন্তান-ধারণ ও পালনের জন্য উহাদিগের সৃষ্টি ; বিশেষতঃ সন্তান-জন্মের বিষয়ে ধারণ করাই স্ত্রীজাতির একমাত্র কার্য্য। পুরুষের এপ্রকার ধারণ করিবার যন্ত্রাদি নাই—কেবল সম্প্রদান করাই তাহার কার্য্য। সন্তানের পালনোপযোগী যন্ত্রও কেবল স্ত্রীজাতির আছে—পুরুষের নাই। সুতরাং হাল আইনে আমার উপর সে ভার দিলে চলিবে কেন ? আমরা একখানা নূতন সংহিতা লিখিতে বসি নাই ; সুতরাং অধিক বলিতে চাহি না। তবে ইহা নিশ্চিত যে, সৃষ্টিগত স্ত্রীজাতি পুরুষের অধীন—পুরুষ আশ্রয়, স্ত্রী আশ্রিতা ; পুরুষ বলবান, স্ত্রী অবলা ; পুরুষ স্বাধীন, স্ত্রী পরাধীনা ; পুরুষ তরু, স্ত্রী লতা।

স্বভাবের নিয়মে মন শরীরের অধীন—যাহার যেমন শারীরিক গঠন, তাহার মনেরও তেমনই আয়তন ! যখন স্ত্রীজাতি শরীরে পরাধীনা, দুর্ব্বলা ও অসম্পূর্ণা, তখন মনেও তাহার সেই অবস্থা—এখন খোঁড়াইয়া পুরুষের সমান হইতে গেলে চলিবে কেন ? সৃষ্টির দিন হইতে যে আইন চলিয়া আসিতেছে, আজ এক আধখানা আকাশকুসুম নজীরের দোহাই দিয়া তাহার বিপর্য্যয় করিতে যাওয়া কেবল বিড়ম্বনা-মাত্র। মহিলাগণ ! তোমরা হক্ কথায় চটিয়া উঠিও না ; কিন্তু বল দেখি, পুরুষের সহিত সমান অধিকার লইবার দাবী কেবল কি অসার আব্‌দার নহে ? সমান অধিকার পাইলে তোমরা কি সে অধিকার বজায় রাখিতে পারিবে ? যদি আজ বল যে পারিবে, তবে জিজ্ঞাসা করি যে, যদি তোমরা পুরুষের অধীন নহ, তবে এতদিন তাহার আশ্রিতা হইয়া আছ কেন ? তোমার যদি বাস্তবিকই বল আছে, তবে পুরুষের আশ্রয়ে এতদিন আছ কেন ? যে বলবান, সেই দুর্ব্বলকে দমন করিয়া রাখে ; সুতরাং পুরুষ যদি তোমা অপেক্ষা বলবান না হইবে, তবে এতকাল তাহার অধীনতা করিয়া আসিতেছ কেন ? আসল কথা এই যে, শরীরে ও মনে কিছুতেই তোমরা পুরুষের মত বলবান নহ—আর দুর্ব্বলা বলিয়াই স্বাধীনা নহ। সুতরাং আজ স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিলে সমাজে একটা যে বিষম গোলযোগ বাধিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আশ্রয় ও আশ্রিত লইয়া সমাজ ; কিন্তু সকলেই যদি আশ্রয় হইতে চাহে, তাহা হইলে কি সমাজ চলে ? তাহার পর, আমাকে যদি আশ্রিত করিতে চাহ, তাহা হইলে তোমার সে ইচ্ছাও পূর্ণ হইবে না ; কেন-না, আমি স্বভাবতঃ পুরুষ, কখনও স্ত্রী হইতে পারিব না। তোমার পুরুষ ও আমার স্ত্রী হইবার চেষ্টাতে সমাজে না-পুরুষ না-স্ত্রীর উৎপত্তি হইবে ; সুতরাং মুড়ি-মিছরি এক দামে বিক্রীত হইলে যেমন গোলযোগ হয়, সমাজেও তাহাই হইবে।

তোমার চিত্ত অতি লঘু এবং সংসারের

বিবিধ প্রলোভনে তুমি অধিক মুগ্ধ; সুতরাং নিত্য নূতনে তোমার বাসনা! এমত অবস্থায় তুমি একাকী সংসারে বিচরণ করিলে পদে পদে ভ্রমে পড়িবে, এবং ধর্ম্মপথ হইতে সরিয়া গিয়া অসতী হইবে। সমাজে স্ত্রী অসতী হইলে সমাজ চলে না; সুতরাং তুমি এবং আমি উভয়েই পথে বসিব। যে স্বাধীনতার জন্য তুমি লালায়িত, তাহা স্বভাবতঃই তোমার উপযোগী নহে; নতুবা তুমি আমার সাত রাজার ধন, তোমার মনে ক্লেশ দিয়া তোমাকে অন্তঃপুরে আবদ্ধ রাখিব কেন? বিভীষিকাময় সংসার তোমার পক্ষে সুখের নহে; সুতরাং আমার পক্ষেও নহে—সেইজন্যই তোমাকে স্বাধীনতা দিতে আমার এত অনিচ্ছা। তোমার স্বজাতির সুধা তোমার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে—সে স্বাধীনতার রঙ্গস্থল অন্তঃপুর—যাহার নিকট আমি অধীন ও অবনত-মস্তক, এবং যাহাকে আমি পবিত্র-জ্ঞানে সম্মান করি। পুরুষের উপর তোমার আধিপত্যই বা কম কিসে? কেবল চাবুক হাতে করিয়া চক্ষু রাঙ্গাইলেই আধিপত্য হয় না—তোমার স্নেহ, ভক্তি, প্রেম এ সকলের নিকট কোন্ ক্ষমতা মাথা তুলিতে পারে? তোমার নিকট যদি এমন দৃঢ় বন্ধনের রজ্জু না থাকিত, তাহা হইলে আমি এতদিন কোথায় মাধ্যাকর্ষণ-শূন্য নক্ষত্রের ন্যায় ছুটিয়া পড়িতাম, তাহার স্থিরতা নাই। আর শিক্ষা? ইহাই কি তোমাকে দিই না? গাড়ী চড়িয়া কালেজে গিয়া দুইখানা সাহিত্য বা বিজ্ঞান না পড়িলে কি শিক্ষা হয় না? তোমার প্রকৃত শিক্ষা অন্তরের, আর অন্তঃপুর সেই শিক্ষার কেন্দ্র। তোমার সন্তান-পালন, গুরুজনের সেবা, রন্ধন, গৃহস্থালী, দান, পূজা ইত্যাদির নিকট কোন্ শিক্ষা, কোন্ শিল্প আছে? অর্থোপার্জ্জন তোমার পক্ষে নহে; কেন-না, তাহা বলসাপেক্ষ; এইজন্য আমি মাথায় মোট বহিব, তুমি গৃহে বসিয়া তাহার সদ্ব্যয় করিবে। তবে তোমার নিজ-ব্যয়ের কিছু আবশ্যক, তাহা স্বীকার করি; কেন-না, তোমার দান-ধ্যান আছে, দেবতা-ব্রাহ্মণ আছেন; কিন্তু তাহার জন্য আমি কি ব্যবস্থা করি না? শাস্ত্রেও তোমার হাতে ন্যায্য অর্থ দিবার বিধি আছে। প্রকৃত প্রস্তাবে তোমার সকলই আছে—যাহাতে সমাজে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়, এমনই ভাবে তোমার সমস্তই আছে; কেবল তোমার সীমা এক, আমার সীমা অন্য। আমার সীমা সুখের মনে করিয়া তাহার সহিত বিনিময় করিলেই বিপর্য্যয় উপস্থিত হয়; কারণ, যাহার যেমন শক্তি ও সাধ্য, তাহার সীমা তেমনই ভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সকল কথা তলাইয়া বুঝিয়া আমার মিনতি শোন. আর আমাকে স্ত্রী সাজাইতে চেষ্টা করিও না, সাজিও না, কারণ, তাহাতে তুমি কখনই পুরুষ হইবে না, এবং আমিও স্ত্রী হইব না। কেবল-মাত্র তাহার ফল হইবে—কাঁঠালের আমসত্ত্ব অথবা সোণার পাথর বাটী।

সন্ন্যাসীর জীবনী।

চতুর্থ অধ্যায়।

ঠাকুরাণী যে ঘরে শয়ন করেন, সে ঘরটী একটু ভালরূপ সজ্জিত। দেওয়ালে মুখ দেখিবার বড় আয়না, ও ছবির আয়না। মেঝেটী সূক্ষ্ম মাদুরে মোড়া। এক পাশে এক জোড়া স-মশারী ও স-বিছানা সুন্দর খাট। অপর পাশে ছোট একটী শ্বেত পাথরের টেবিল ও তাহার উপর 'ওয়ার্ক বক্স্।' টেবিলের নিকট দু'খানি ভাল চেয়ার, এবং উহা হইতে অনতিদূরে একটী ছোট হারমনিয়াম্।

বিলাসী বাঙ্গালী বাবুর শয়ন-গৃহের শয্যা সচরাচর এইরূপই হইয়া থাকে। ইংরেজি চালে চলিতে গেলে, হারমনিয়ম, ওয়ার্ক বক্স্, টেবিল, চেয়ার, ছবি, আয়না—এ সকল 'ড্রইং রুমেই' শোভা পায়। যাহা হউক, ঠাকুরাণীর পীড়া হইলে, তিনি খাটে শয়ন করিতেন না। মাদুরের উপর তাঁহার বিছানা হইত। আমাকে সেই বিছানার এক পাশে বসিতে হইত।

দুই-একদিন নিরাপদে গেল। কিন্তু তাহার পর ওরূপ বিছানায় বসা আমার সর্ব্বনাশের কারণ হইল। আগে মনে করিতাম, ঠাকুরাণী পীড়ার যাতনায় ছটফট করিয়া আমাকে জড়াইয়া ধরেন, এবং সেইজন্যই বস্ত্রাদি অসাবধানে সরিয়া যায়। কিন্তু শেষে সকলই বুঝিলাম। শুধু বুঝিলাম না—মজিলাম। এইবার পাপের আস্বাদ ইচ্ছা-পূর্ব্বক প্রথম গ্রহণ করিলাম। পাপ যে এত মধুর, এত মিষ্ট, আগে অনুভব করিতে পারি নাই। এখন মনে হইল—ইহার শেষ নাই। ইংরেজদের আদি মাতা (ইভ্) এ সুখে বঞ্চিত হন নাই বলিয়া, তাঁহার সন্তানগণ বলেন,—এ পাপ (অরিজিনাল সিন্) হইতে তাঁহারা নির্ম্মুক্ত হইতে অক্ষম। কিন্তু হায়, আমাদের আদি মাতা ত সতীর সতী—পবিত্রার পবিত্রা—দয়ার দয়া! তবে তাঁহার সন্তানগণ কেন আজ কলুষিত হয়? তাহাদের ত (অরিজিনাল সিন্) মায়ের পাপ নাই!—তিনি ত শুদ্ধ—শুদ্ধ হইতেও শুদ্ধ!

একবার পাপ করিলে, আর একবার করিতে সহজেই প্রবৃত্তি হয়। স্ত্রীলোক একবার নষ্ট হইলে মনে করে,—সতীত্ব যখন গিয়াছে, তখন পরকে দেহ উৎসর্গ করিতে আর বাধা কি! পুরুষদের মধ্যেও অনেকে মনে করেন,—"একেন পাপং শতেন পাপং।"

আমিও সেইরূপ ভাবিতেছিলাম। মোহ যতদিন না ছাড়ে, ততদিন অশুদ্ধ-চিত্ত মানব-মানবী আমারই মতই ভাবে। যাহা হউক, একবার বিষ ভক্ষণ করিয়া বিরত হই নাই। ইহার তল-দেশ কত দূরে—কোথায় ইহার শেষ—কোথায় ইহার ক্ষণি-কোথা গেলে এ মধুর বিষ প্রাণ ভরিয়া পান করিতে পাইব, তাহাই অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। একদিন দিবা দুই প্রহরের সময় ঠাকুরাণীর পীড়া হইয়াছে; সুতরাং আমি নিকটে রহিয়াছি। তথায় আর দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই। আমরা কি অবস্থায় আছি, বলিবার আবশ্যক নাই। ঠাকুরাণী আমার মুখে, গালে ও ললাটে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিতে লাগিলেন,—"মদন!" আমার নাম মদন নহে; কিন্তু তাঁহার চক্ষে আমি রূপে মদন, তাই তিনি আমায় মদন বলিয়া আদর করিয়া ডাকিতেন; কখন বা "ভ্রমর", "প্রাণের ভ্রমর"ও বলিতেন। যাহা হউক, বলিতে লাগিলেন,—"মদন,বেশী দিন এভাবে চলিলে সন্দেহের ও নিন্দার কারণ হইবে; তাই মনে করেছি, য'াতে লোকে সন্দেহ না করে, তার একটা উপায় করি।" আমি বলিলাম,—"কি উপায় স্থির করেছ?"

তিনি বলিলেন,—"কেন, জুঁই তোমায় ভাল বাসে—বিশেষ তার বয়েস হয়েছে—তার সঙ্গে তোমার বিয়ে দিয়ে সন্দেহের ও ভয়ের পথ বন্ধ করিব।" শুনিয়া, আমার হৃদয়ে বড় আঘাত লাগিল; মনে মনে ভাবিলাম,—"সর্ব্বনাশ! একি হইল!"

আমাকে নীরব দেখিয়া, তিনি আবার বলিলেন,—"কেন, ভাবনা কি? এরূপ কি হয় না? দোষ কি! দোষ মানুষের কাছে—সমাজের কাছে। ঈশ্বরের কাছে ইহা দোষ নয়! তিনি যাহা করেন, তাই আমরা করি। যদি ইহা দোষের হইত, তবে আমাদের এ প্রবৃত্তি হইত না। দেখ, মানুষেই কি কেবল পাপ-পুণ্যের ফলাফল ভোগ করিবে—অপর জীব-জন্তু কি ঈশ্বরের সৃষ্ট নহে? কে বলিতে পারে, তাহাদের সমাজ নাই—সামাজিক কাজ নাই! তাহাদেরও ত আমাদের মত সন্তান-স্নেহ, প্রিয়জনের প্রতি ভালবাসা, কাম, ক্রোধ,

মদ, মাৎসর্য্য আছে—তবে কেন তাঁদের মধ্যে পিতায়-কন্যায় ও পুত্রে-মাতায় যৌবন উপভোগ করে? আমার বিবেচনায় সমাজের চক্ষে ধুলি দিয়া চলিলে, ঈশ্বর কখনই অসন্তুষ্ট হন না। তুমি এখনও বালক; কিছুই বুঝিতে পার না। ঈশ্বর পিতা, জগতের সমস্ত নরনারী ভ্রাতা-ভগিনী। হিন্দুরাও এ মত সমর্থ করিয়া বলেন,—'যত জীব, তত শিব; যত নারী, তত গৌরী।' অর্থাৎ পৃথিবীর সকল পুরুষই শিব, এবং সকল স্ত্রীলোকই গৌরী। সুতরাং শিব-গৌরীর যে সম্পর্ক, সে সম্পর্ক, সকল নরনারীর মধ্যে সংস্থাপন করিতে কোনই বাধা নাই। তুমি আমার প্রিয়; আমাকে সুখী কর—সন্তুষ্ট কর—বলিয়া কি জুঁইকেও সুখী ও সন্তুষ্ট করিবে না! আমার গর্ভে হইয়াছে বলিয়া কি সে অপরাধ করিয়াছে?"

কথাগুলি আমার কর্ণে প্রবেশ করিতেছিল বটে; কিন্তু, জুঁয়ের নাম ও তাহার সহিত বিবাহের কথা শুনিয়া, আমি তাহার রূপ, তাহার যৌবন, তাহার ঢল ঢল নয়ন, তাহার মধুর স্বর—একে একে ভাবিতেছিলাম। প্রবৃত্তি একবার নীচগামী হইলে, ক্রমে নীচের দিকেই ধাবিত হয়। ঠাকুরাণীর প্রস্তাব আমার যুক্তিপূর্ণ ও মধুময় বলিয়া বোধ হইল। বলিলাম,—"যুক্তি ভাল! আমি জুঁইকে বিবাহ করিলে তোমার ভালবাসায় আর সন্দেহের কারণ থাকিবে না—শাশুড়ী জামাইকে ত চিরদিনই ভালবাসিয়া থাকে! কিন্তু, একটু অসুবিধা—"

"কি অসুবিধা?"

"জুঁই ত ছেলে-মানুষ নয়!"

"তার জন্য ভাবনা কি?"

"ভাবনা নয়ই বা কেন?"

"সে কি বাধা দিবে?"

"সে বাধা দিবেন ত দিবে কে?"

"আমি তাকে স্কুলের বোর্ডিংএ রাখিয়া দিব।"

"কত দিন থাকিবে?"

"যত দিন বি, এ, পাশ না করিবে?"

* * * *

এইরূপে আমাদের কথোপকথন হইতেছে; ঘণ্টার পরে ঘণ্টা বাজিয়া চারিটায় উপনীত হইয়াছে; কিন্তু আমাদের সংজ্ঞা নাই! তখন, হঠাৎ মল্লিকা স্কুল হইতে আসিয়া দাঁড়াইল। আমরা দাঁতে জিব কাটিয়া তাড়াতাড়ি উঠিলাম। মল্লিকার বুদ্ধি হইয়াছে; সে আমাদের আগেই লজ্জায় সরিয়া গিয়াছে—উঠিয়া আর তাহাকে দেখিতে পাইলাম না। আমি বলিলাম,—"ছি-ছি! কি হইল!" ঠাকুরাণী হাসিয়া বলিলেন,—"ইহারই নাম কমলে কণ্টক?"

মল্লিকা বহুদূরে যায় নাই। সে বড় লজ্জিতা ও অভিমানিনী। [illegible] ও কোমল, আবার তেমনই কঠিন ও ক্রোধশীল। মল্লিকা গৃহের বাহিরে আসিয়া, হাতের পুঁথি দূরে নিক্ষেপ করিয়া, দেওয়ালে পিট দিয়া, ক্রোধে, লজ্জায় ও অভিমানে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে। তাহার ক্ষীণ তনু ক্রোধের তরঙ্গে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। বিশাল লোচন স্ফীত হইয়া তাহা হইতে রক্ত ও অগ্নি ছুটিয়া বাহির হইতেছে। তাহার শারদীয় পূর্ণচন্দ্র-সম শীতল—শুভ্র বদন রক্তপদ্ম হইয়াছে। বিপুল কেশরাশি সবুজ রেসম-ফিতার বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া শত শত কৃষ্ণসর্পের ন্যায় ফণা বিস্তার করিয়া ক্রোধ-তরঙ্গের আবর্ত্তে উদ্বেলিত হইতেছে।

আমি গৃহের বাহির হইয়া ঐ তেজোময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া একেবারে স্তম্ভিত—ত্রাসিত—লজ্জিত ও ভীত হইলাম। মল্লিকা তীব্রনয়নে আমার পানে একবার তাকাইয়া দুই হস্তে আপনার মুখ ঢাকিল—এ পাপ বদন যেন আর দেখিবে না! আমি লজ্জায় মুখ ফিরাইলাম। দেখিলাম, ভূপতিত পুঁথিগুলির সহিত মহাত্মা কেশবচন্দ্রের "ফটোগ্রাফ" পড়িয়া রহিয়াছে—সেই ধীর, গম্ভীর, শান্ত, জ্যোতি-ফুল্ল বদন হাসিতেছে! "দেব! তুমি কি এ পাপীর হৃদয় দেখিয়া হাসিতেছ! আর হাসিও না—অভিসম্পাত কর—ভস্ম হই—ছারখার হইয়া যাই—তোমার কুশিষ্যের দল অধঃপাতে রসাতলে যাক্।"—এই ভয়ঙ্কর ভাবনা—এই ভয়ঙ্কর ভিক্ষা চাহিয়া বহির্দ্দেশে গমন করিলাম।

মল্লিকা কখনও স্কুল হইতে আসিয়া হঠাৎ মাতৃ-গৃহে যায় না। আজি বহুদিনের জলখাবার পয়সা সংগ্রহ করিয়া আচার্য্যের ছবি কিনিয়াছিল; তাই, ফুল্লমুখে—অতি উৎসাহে আগেই মার কাছে—মাকে ঐ ছবি দেখাইবে বলিয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাহা হইল না—কলুষিত হস্ত পবিত্র-চিত্র স্পর্শ করিতে পাইল না!

* * * *

প্রতিদিন সন্ধ্যার পরে মল্লিকা আমার কাছে পড়িতে আসিত—আজ আসিল না। আমি তাহার ঘরে যাইয়া—দেখিতে পাইলাম, সে তাহার বহি, কাপড়, দোয়াত, কলম ও শেলাই করিবার সাজ-সয্যা গুছাইয়া একটা ট্রাঙ্কে পুরিতেছে, এবং তাহার চক্ষে অবিরল জলধারা বহিয়া পড়িতেছে। একপাশে তাহার মা দাঁড়াইয়া মৃদু হাসিতেছেন—তাঁহার মুখে যেন (ট্রায়াম্ফ) রণজয়ের আনন্দ-ঘোষণা করিতেছে। তিনি আমাকে দেখিয়াই হাসিয়া বলিলেন,—"মল্লিকা কাল থেকে বোর্ডিংএ থাকিবে—এখানে পড়া-শুনা ভাল হয় না।" আমি দেখিলাম, মল্লিকা একথা শুনিয়া নীরবে আরো অধিক কাঁদিতে লাগিল। আমি নিজগৃহে যাইয়া, অদৃষ্ট ও অবস্থার পরিবর্ত্তন ভাবিতে লাগিলাম।

রজনীতে আমরা সকলে একত্রে বসিয়া আহার করি। আমাদের সাধারণ নিয়ম, আহারে বসিয়া ভাত সম্মুখে করিয়া চক্ষু

মুদিয়া কিছুকাল উপাসনা করা। আহারের সময় হইলে ভৃত্য ডাকিয়া গেল—যাইয়া দেখি, যথারীতি কর্ত্তা-কর্ত্রী ও জুঁই চক্ষু মুদিয়া বসিয়া আছেন। আমার পদ-শব্দ শুনিয়া, কর্ত্রী চাহিয়া একটু হাসিলেন—জুঁইও একবার চাহিয়া একটু হাসিয়া চক্ষু মুদিল। কর্ত্তা চাহিলেন না—আমিও আমার আসনে বসিয়া চক্ষু মুদিলাম। ঈশ্বর ভাবিতে চাই, কিন্তু আসিয়া পড়ে—জুঁই জুঁএর মা! আবার জুঁই জুঁএর মাকে ছাড়িয়া মল্লিকাকে ভাবিতে চাই, তাহাতেও আবার জুঁই জুঁএর মা—মল্লিকাকে দেখিতে পাই না! কি আশ্চর্য্য! ঈশ্বর ত দূরের কথা, তিনি ত নাকি নিরাকার—হাত নাই, পা নাই, কিছুই নাই—তাঁহাকে ভাবনায় না পাওয়াই সম্ভব; কিন্তু মল্লিকার সবই আছে—তাকে ত সারাদিন দেখি—তবে নয়ন মুদিয়া দেখিতে পাই না কেন?

কেন, তা'কি বলিতে হইবে? মল্লিকা স্বর্গীয় ফুল—ফুলময়ী ফুল্ল-মল্লিকা পবিত্রা—যেখানে একটুও পবিত্রতার নাম-গন্ধ আছে, সেখানে কলুষিত চিন্তা প্রবেশ করিতে অক্ষম।

কর্ত্তা না চাহিলে, কাহারও মুদিত নয়ন চায় না। কর্ত্তা চাহিলেন, আমরাও শশব্যস্ত হইয়া অন্নের থালায় হাত দিলাম। কিন্তু খাইতে পারি কৈ—মল্লিকা আসিতেছে না! মল্লিকা বালিকা হইলেও, ভাতের আসনে বসিয়া চক্ষু মুদিত করে না। সে আপনার ঘরে কঠিন মেঝেতে নতজানু হইয়া করজোড়ে বসিয়া থাকে, নয়ন-ধারায় চক্ষের বসন তাহার প্লাবিত হয়। পথের বাদ্যোদ্যম, বিবাহের সজ্জিত লোকগণের আনন্দ-ধ্বনি, ইংরেজি বাদ্য, বা মেঘগর্জ্জন-বজ্রপাত কিছুতেই তাহার যোগভঙ্গ হয় না। আজি তাহার হৃদয়-ভার বেশী—তাহার যোগভঙ্গ হইতেছে না।

গৌণ দেখিয়া, কর্ত্তা কহিলেন,—"মল্লিকাকে

TORN PAGES

ডাকিয়া আন!" জুঁই ডাকিতে গিয়া চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

আমরা তাড়াতাড়ি যাইয়া দেখিলাম,—মল্লিকা নিস্পন্দ, তাহার শ্বাস বহিতেছে না,—নাড়ী চলিতেছে না—নতজানু করজোড়ে অঙ্কিত ছবির ন্যায় রহিয়াছে—অধরে হাসি, নয়নে অশ্রু বহিতেছে—একি!

কর্ত্তা ক্রোড়ে টানিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ডাকিতে লাগিলেন,—"মা-মা—তুমি কি দেখিয়া হাসিতেছ, কি দেখিয়া কাঁদিতেছ—আমায় দেখাও মা—তোমার বাবাকে দেখাও!"

যোগ ও যোগানুষ্ঠান।*

যোগিপ্রধান মহেশ্বর তন্ত্রশাস্ত্রের বহুস্থানেই যোগশাস্ত্র বলিয়াছেন। এই প্রবন্ধে সামান্য প্রকরণে শিবসংহিতার নাম-মাত্র করা হইয়াছে। এস্থানে উপতন্ত্র হইতে কথঞ্চিৎ মাত্র প্রদর্শিত হইতেছে।

গৌতমীয় তন্ত্রে মহর্ষি গৌতম নারদ মুনির নিকট যে অষ্টাঙ্গ-যোগ শ্রবণ করিয়াছেন, তাহা-মাত্র পরিগৃহীত হইল। নারদ বলিয়াছেন,—"ঐক্যং জীবাত্মনোরাহুর্যোগং যোগবিশারদাঃ। তবস্নেহাৎ সমাখ্যাতা যোগবিঘ্নকরাস্ত্বিমে॥ কামক্রোধলোভমোহমদমাৎসর্য্যসংজ্ঞকাঃ। যোগাঙ্গৈরেভির্নির্জ্জিত্য যোগিনো যোগমাপ্নুয়ুঃ॥"

অর্থ,—জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্যের নাম (সংযোগের নাম) যোগ বলিয়া যোগবিশারদগণ বলিয়াছেন। হে গৌতম, আমি তোমার স্নেহবশংবদ হইয়া বলিতেছি, যোগবিষয়ে বক্ষ্যমাণ ষড়রিপু বিঘ্নকর জানিবে। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য এই ছয় রিপুকে যোগাঙ্গ কার্য্য দ্বারা, পরাজয় করিয়া, যোগিগণ যোগ (জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য) প্রাপ্ত হয়। প্রসঙ্গতঃ এই স্থলে, 'প্রবোধ-চন্দ্রোদয়' নাটকের একটী কবিতা প্রদর্শন করিতেছি; তদ্দ্বারাই কামাদির যোগবিঘ্নকারিতা বিশেষরূপে প্রমাণিত হইবে। মহামোহের প্রধান সেনাপতি কাম সগর্ব্বে বলিয়াছেন,—"অহিংসা কৈব কোপস্য ব্রহ্মচর্য্যাদয়োমম। লোভস্য পুরতঃ কেমী সত্যাস্তেয়াপরিগ্রহাঃ॥"

কাম বলিয়াছেন, যোগাঙ্গ যমাদি কিরূপে আবির্ভাব হইতে পারে? ক্রোধের নিকটে অহিংসা কোথায় থাকে? ও আমার (কাম) নিকট ব্রহ্মচর্য্যাদি কি অবস্থিতি করিতে পারে? এবং লোভের নিকটে সত্য, অস্তেয় ও পরিগ্রহ কোথায় থাকিতে পারে? ফলেও কাম-ক্রোধাদির নিকট যমনিয়মাদি কোনরূপেও থাকিতে পারে না।

"যমনিয়মাবাসনং প্রাণায়ামস্ততঃপরং।
প্রত্যাহারং ধারণাখ্যং ধ্যানং সার্দ্ধং সমাধিনা॥
অষ্টাঙ্গান্যাহু বেতানি যোগিনাং যোগসাধনে॥

অর্থ,—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি, যোগিগণের যোগ-সাধনে এই অষ্টাঙ্গ যোগ উক্ত হইয়াছে।

"অহিংসাসত্যমস্তেয়ং ব্রহ্মচর্য্যং দয়ার্জ্জবং।
ক্ষমাধৃতির্মিতাহারঃ শৌচং চেতি যমাদশ॥"

অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, দয়া, সরলতা, ক্ষমা, ধৃতি, পরিমিত ভোজন, শৌচ, এই দশ প্রকার যম জানিবে। স্মৃতি-শাস্ত্রকার মহর্ষি অত্রিও স্বীয় সংহিতায় যম দশ প্রকার বলিয়াছেন। যথা,—

"আনৃশংস্যং ক্ষমাসত্যমহিংসাদানমার্জ্জবং।
প্রীতিঃ প্রসাদো মাধুর্য্যমার্দ্দবঞ্চ যমাদশ॥"

অনৃশংসতা, ক্ষমা, সত্য, অহিংসা, দান, সরলতা, প্রীতি, প্রসন্নতা, বাক্য ও স্বভাবের মধুরতা, মৃদুতা, এই দশ প্রকার যম।

* পূর্ব্ব-সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর।

"তপঃসন্তোষ আস্তিক্যং দানং দেবস্যপূজনং।
সিদ্ধান্ত শ্রবণঞ্চৈব হ্রীমতিশ্চজপোহুতং॥
দশৈতেনিয়মাঃ প্রোক্তা যোগশাস্ত্রবিশারদৈঃ।

তপস্যা, সন্তোষ, আস্তিকতা, দান, দেবার্চ্চন, বেদান্তাদির সিদ্ধান্ত শ্রবণ, লজ্জা, ঈশ্বরবিষয়িণী বুদ্ধি, প্রণবাদি জপ, হোম, যোগশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিতগণ এই দশ প্রকার নিয়ম বলিয়াছেন।

অত্রি-সংহিতায়ও দশ প্রকার নিয়ম উক্ত আছে। যথা,—

"শৌচমিজ্যা তপোদানং স্বাধ্যায়োপস্থনিগ্রহঃ।
ব্রতমৌনোপবাসাশ্চ স্নানঞ্চ নিয়মা দশ॥"

শৌচ, যজ্ঞ, তপস্যা, দান, বেদাদি অধ্যয়ন, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, ব্রত, মৌন, উপবাস, বৈধস্নান—এই দশ প্রকার নিয়ম।

এই মতদ্বয়ের পরস্পর কথঞ্চিৎ বিভিন্নতা থাকিলেও, এই মতদ্বয়ে যম ও নিয়ম দশ প্রকার দর্শনই মুখ্যোদ্দেশ্য। "আসনান্যুক্তানি" সিদ্ধাসন পদ্মাসনাদি পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

"ইড়য়াকর্ষয়েদ্বায়ুং বাহ্যং ষোড়শমাত্রয়া।
ধারয়েৎ পূরীতং যোগী চতুঃষষ্ট্যাচমাত্রয়া॥
সুষুম্না মধ্যগংসম্যক দ্বাত্রিংশন্মাত্রয়াশনৈঃ।
নাভ্যা পিঙ্গলয়াশ্চৈব রেচয়েদ্যোগবিত্তমঃ॥"

অর্থ,—বাহ্য বায়ুকে ১৬শ মাত্রায় বামনাসিকাস্থ ইড়া নাম্নী নাড়ী দ্বারা আকর্ষণ করিয়া, ৬৪ মাত্রায় পূর্ণিত বায়ুকে মধ্যস্থ সুষুম্না নাড়ীতে ধারণ করিবেক, এবং ৩২ মাত্রায় ধীরে ধীরে ঐ বায়ুকে দক্ষিণ নাসাস্থ পিঙ্গলা নাড়ী দ্বারা যোগশাস্ত্রজ্ঞগণ ত্যাগ করিবে।

"প্রাণায়ামমিমংপ্রাহুর্যোগশাস্ত্রবিশারদাঃ।
ক্রোদভ্যাসতঃপুংসো দেহে স্বেদোদ্গমোহধমঃ
মধ্যমঃকম্পসংযুক্তো ভূমিত্যাগোহপরোমতঃ।

অর্থ,—যোগশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ পূর্ব্বকথিত বিষয়ের নাম প্রাণায়াম বলিয়াছেন। এইরূপে ক্রমে প্রাণায়ামের অভ্যাসে ঘর্ম্মোদয় হইলে, অধম প্রাণায়াম সিদ্ধ হয়, এবং শরীর-কম্প দ্বারা মধ্যম ও পৃথিবী-ত্যাগ দ্বারা উত্তম প্রাণায়াম সিদ্ধ হইয়া থাকে।

"জপধ্যানাদিভিযুক্তং সগর্ভংতংবিদুবুধাঃ।
তদপেতং নিগর্ভঞ্চ প্রাণায়ামং পরং বিদুঃ॥"

অর্থ,—জপধ্যানাদিযুক্ত প্রাণায়াম সগর্ভ ও তদ্রহিত প্রাণায়াম নিগর্ভ বলিয়া যোগী পণ্ডিতগণ জানেন।

"ইন্দ্রিয়ানাং বিচরতাং বিষয়েষুনিবর্গলং।
বলাদাহরণং তেভ্যঃ প্রত্যাহারো বিধীয়তে॥

অর্থ,—ইন্দ্রিয়ার্থ বিষয়-সমূহে অবাধে বিচরণকারি ইন্দ্রিয়দিগের বলক্রমে আহরণের নাম প্রত্যাহার বলে।

"অঙ্গুষ্ঠোগুল্‌ফজানূরুধমনীলিঙ্গনাভিষু।
হৃদ্‌গ্রীবাকণ্ঠদেশেষু লম্বিকায়াং তথানসি।
ভ্রুমধ্যে মস্তকে মূর্দ্ধি, দ্বাদশান্তে যথাবিধি॥
ধারণং প্রাণ মরুতো ধারণেতি নিগদ্যতে॥"

অর্থ,—অঙ্গুষ্ঠযুক্ত গুল্‌ফে, জানু, উরু, নাড়ী, লিঙ্গমূল, নাভিদেশ, হৃদয়, গ্রীবা, কণ্ঠপথ, জিহ্বা, নাসিকা, ভ্রুমধ্যদেশ, এবং মস্তকস্থ সহস্রার পদ্ম, এই দ্বাদশ স্থানে প্রাণবায়ুর ধারণের নাম ধারণা। ("দেশবন্ধ চিত্তস্য ধারণা" এই পাতঞ্জল-দর্শনের সহিত চিত্ত ও প্রাণবায়ুগত ভেদ থাকিলেও আধ্যাত্মিক দেশ-সম্বন্ধ উভয় মতে তুল্য।)

"সমাহিতেন মনসা চৈতন্যান্তরবর্ত্তিনা।
আত্মন্যভীষ্ট দেবানাং ধ্যানাদ্‌ধ্যানমিহোচ্যতে॥

অর্থ,—চৈতন্যমধ্যবর্ত্তী সমাহিত মনদ্বারা আত্মাতে অভীষ্ট দেবতার ধ্যানকেই ধ্যান কহে।

"সমত্ব-ভাবনা নিত্যং জীবাত্মপরমাত্মনোঃ।
সমাধিমাহুর্মুনয়ং প্রোক্তমষ্টাঙ্গলক্ষণং॥"

অর্থ,—জীবাত্মা ও পরমাত্মার অনবরত একত্ব-ভাবনার (অভেদ-জ্ঞানের) নাম মুনিগণ সমাধি কহেন। এই অষ্টাঙ্গ যোগের লক্ষণ উক্ত হইল।

ইতিহাস-প্রধান মহাভারতের স্থানে স্থানেই যোগশাস্ত্র প্রকাশ পাইয়াছে। তন্মধ্যে ভীষ্ম-পর্ব্বান্তর্গত শ্রীভগবদ্গীতাতে বিবিধ-যোগ প্রকটিত আছে। যথা,—দ্বিতীয় অধ্যায়ে সাংখ্য-যোগ, তৃতীয় অধ্যায়ে কর্ম্মযোগ, চতুর্থ অধ্যায়ে জ্ঞানকর্ম্মন্যাস যোগ, পঞ্চম অধ্যায়ে সংন্যাস যোগ, ষষ্ঠ অধ্যায়ে ধ্যান যোগ, সপ্তম অধ্যায়ে বিজ্ঞান যোগ, অষ্টম অধ্যায়ে ব্রহ্ম যোগ, নবম অধ্যায়ে রাজগুহ্য যোগ, দশম অধ্যায়ে বিভূতি যোগ, দ্বাদশ অধ্যায়ে ভক্তিযোগ, ত্রয়োদশ অধ্যায়ে গুণত্রয় যোগ, পঞ্চদশ অধ্যায়ে পুরুষোত্তম যোগ, সপ্তদশ অধ্যায়ে আচার-বিবেক যোগ, অষ্টাদশ অধ্যায়ে মোক্ষ যোগ। এতদ্ভিন্ন, শ্রীমদ্ভবদ্গীতার স্থানে স্থানে অষ্টাঙ্গ যোগও উক্ত হইয়াছে। ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ৮ম ও ৯ম শ্লোক দ্বারা যমনিয়ম, ষষ্ঠাধ্যায়ের ১০,১১,১২,১৩.১৪, ১৫,১৬,১৭ শ্লোকে আসন প্রাণায়াম ও প্রাণায়ামের নিয়ম, দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৫৮ শ্লোকে প্রত্যাহার, ষষ্ঠে ধারণা ও ধ্যান, এবং দ্বিতীয়াধ্যায়ে সমাধি উক্ত হইয়াছে। ভগবদ্গীতা সর্ব্বত্র সুলভ ও সর্ব্বদৃশ্য বলিয়া বর্ণনে বিরত রহিলাম।

শ্রীমদ্ভাগবতের ১১শ স্কন্ধের ২০শ অধ্যায়ে ত্রিবিধ যোগ উক্ত হইয়াছে। যথা,—১ম জ্ঞান-যোগ, ২য় কর্ম্মযোগ, ৩য় ভক্তিযোগ। ভগবান উদ্ধবকে কহিয়াছেন,—

"যোগস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া।
জ্ঞানংকর্ম্মচ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোস্তিকুত্রচিৎ।

অর্থ—হে উদ্ধব! আমি মনুষ্যদিগের মঙ্গলেচ্ছু হইয়া ত্রিবিধ যোগ বলিয়াছি। ১। জ্ঞান যোগ, ২। কর্ম্মযোগ, ৩। ভক্তিযোগ। এই যোগত্রয় ব্যতীত আর অন্য সদুপায় নাই।

"নির্ব্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহকর্ম্মসু।
তেষ্বনির্ব্বিণ্নচিত্তানাং কর্ম্মযোগস্তু কামিনাং॥"

অর্থ,—যাঁহাদিগের চিত্ত নিবৃত হইয়াছে (অর্থাৎ বিষয়-বাসনা-রহিত হইয়া চিত্ত শান্ত হইয়াছে) ও যাঁহারা কর্ম্মজনিত ফলাভিসন্ধি বা কর্ম্ম-সকল ত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে জ্ঞানযোগ, এবং বিষয়াকৃষ্ট সকামী ব্যক্তিদিগের সম্বন্ধে কর্ম্মযোগ উক্ত হইয়াছে। এই ক্রিয়া-যোগেই জ্ঞান-যোগের সাধক হয়। "অয়মেব ক্রিয়াযোগো জ্ঞানযোগস্য সাধকঃ। কর্ম্মযোগং বিনাজ্ঞানং কস্যচিন্নোপপদ্যতে।"—ইতি মলমাসতত্ত্ব-ধৃতস্মৃতি। নকুলীশ পাশুপত দর্শনে যোগ দ্বিবিধ উক্ত হইয়াছে; যথা,—"যোগো-দ্বিবিধঃ ক্রিয়ালক্ষণঃ ক্রিয়ো পরমলক্ষণশ্চ ক্রিয়ো পরমলক্ষণঃ সম্বিদ্গত্যাদি।" যোগ দ্বিবিধ,—(১) ক্রিয়া-লক্ষণ, ক্রিয়াযোগ বা কর্ম্ম-যোগ; (২) ক্রিয়োপলক্ষণ (ক্রিয়াত্যাগ-লক্ষণ) সম্বিৎ (জ্ঞান) গতি (প্রাপ্তি) অর্থাৎ জ্ঞান-যোগ জানিবে। কর্ম্মযোগ দ্বিবিধ;—সকাম কর্ম্মযোগ, এবং নিষ্কাম কর্ম্মযোগ। ধন, ধান্য, পুত্র, পৌত্র, মহৈশ্বর্য্য প্রভৃতির নিমিত্ত যে ক্রিয়া অনুষ্ঠান করা হয়, তাহার নাম সকাম কর্ম্ম। ইহা অজ্ঞ প্রথমাধিকারীর নিমিত্তে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যাহারা ক্রিয়াফল-ব্যতীত ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত না হয়, সেই অজ্ঞ বিমূঢ় ধর্ম্মবাণিজিক-দিগের নিমিত্ত সকাম কর্ম্মকাণ্ড বেদে কথিত হইয়াছে। তাহাদের রোচক ফলশ্রুতি হয়। "রোচনার্থাঃ ফলশ্রুতিঃ"; অপিচ "ধর্ম্মবাণিজিকা-মূঢ়াঃ ফলকামাঃ নরাধমাঃ। অপ্নুবন্তি জগন্নাথং তে কামনোপ্নুবন্ত্যথ।"—ইতি তিথিতত্ত্ব-ধৃত স্মৃতিঃ। ফলে ইহাদিগকে প্ররোচনা দ্বারা ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত করাইয়া ক্রমে নিষ্কাম কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইবে—এই শাস্ত্রের অভিপ্রায়। মলমাসতত্ত্বান্তর্গত মুমুক্ষু-প্রকরণে এবিষয়ের বিশদ মীমাংসা রহিয়াছে। এস্থলে তাহার একটি মাত্র দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করাইতেছি। যথা,—

"পিবনিম্বং প্রদাস্যামি, খলুতে খণ্ডলড্ডুকান্।
পিত্রৈব মুক্তঃ পিবতি নফলন্তাব দেবন্তু॥"

অর্থ,—দূষিত-পিত্তাদি রুগ্ন বালককে মিষ্ট-লাড়ু প্রদানের প্ররোচনা দেখাইয়া পিতা যেমন নিম খাওয়ায়, সেইরূপ বেদফল শ্রুতি প্ররোচনায় অজ্ঞকে ক্রিয়ায় প্রবৃত্ত করাইয়া ক্রমে নিষ্কাম কর্ম্মে প্রবৃত্ত করায়। রোগ-নিবৃত্তিতে লড্ডুক-ভক্ষণ যেমন সৎফল প্রদান করে না, কেবল আপাতঃ রমণীয়, সকাম কর্ম্মও সেইরূপ পুষ্পিত বিষলতার ন্যায় আপাততঃ রমণীয়। রোগ-নিবৃত্তিতে যেমন নিম্বভক্ষণই প্রয়োজক, সংসারানল নিবৃত্তিতেও সেইরূপ নিষ্কাম কর্ম্মই প্রয়োজক। এই নিমিত্তই ধর্ম্মশাস্ত্রকার-গণ স্থানে স্থানেই নিষ্কাম কর্ম্ম সকল প্রশংসার সহিত প্রকাশ করিয়াছেন। ঈশ্বর-প্রীত্যর্থ কর্ম্মানুষ্ঠানের নামই নিষ্কাম কর্ম্ম। "অকামো বিষ্ণুকামো বা" ইত্যাদি শাস্ত্র, নিষ্কামে যাঁহার প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে, তৎসম্বন্ধে।

"তন্নিষ্ঠা তদ্গতধিয়স্তৎকর্ম্মাণস্তদাশ্রয়ঃ।
তদ্দৃষ্ঠয়স্তন্মনসঃ সর্ব্বস্মিন্ স ইতি স্থিতঃ॥"

অগ্নিপুরাণে।

নিষ্কাম ক্রিয়া-যোগানুশীল সাধকের সেই পরমেশ্বরে ঐকান্তিকী নিষ্ঠা হয়, সেই পরমেশ্বরানুগতা বুদ্ধি জন্মে, সেই পরমেশ্বর-প্রীতি-উদ্দেশে কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি হয়। সেই পরমেশ্বর আশ্রয়, সেই পরমেশ্বরে দৃষ্টি, সেই পরমেশ্বরে মন, এবং সর্ব্ববিষয়েই পরমেশ্বরের অবস্থান জ্ঞান হয়। ঈদৃশ ক্রিয়া-যোগীই অচিরে জ্ঞান-যোগ লাভ করিতে শক্ত হয়।

"যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ননির্ব্বিণ্ণো নাতিশক্তো,ভক্তিযোগোঽস্যসিদ্ধিদঃ॥"

ভাগবত, ১১শ স্কন্ধ।

যেমন মানব যাদৃচ্ছিক-ক্রমে ঈশ্বর কথাদিতে শ্রদ্ধাবান হইয়া উঠে, অথচ সেই ব্যক্তির বিষয়-বাসনাও নিবৃত্তি হয় নাই, বিষয়েও অতিশয় আশক্তি নাই, ঈদৃশ মানবের ভক্তিযোগই সিদ্ধিপ্রদ বটে।

"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ননির্ব্বিদ্যেতযাবতা।
মৎকথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধাযাবন্নজায়তে॥"

যাবৎকাল পর্য্যন্ত ঈশ্বরে স্বাভাবিক শ্রদ্ধার বিদ্যমানতা নাই কিম্বা ঈশ্বরের কথা শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা না জন্মে, তাবৎকাল পর্য্যন্তই কর্ম্মানুষ্ঠান করিবেক।

"অস্মিল্লোকে বর্ত্তমানঃ স্বধর্ম্মস্থোঽনঘঃশুচিঃ।
জ্ঞানং বিশুদ্ধমাপ্নোতিমদ্ভক্তিঞ্চ যদৃচ্ছয়া।"

যেই ব্যক্তি ইহলোকে বর্ত্তমান থাকিয়া স্বধর্ম্মস্থ ও নিষ্পাপ এবং পবিত্রভাবে অবস্থিতি করেন, তিনি বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করেন, এবং যাদৃচ্ছিক-ক্রমে ঈশ্বর-ভক্তিও প্রাপ্ত হয়েন। এতদ্ভিন্ন, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ১২শ অধ্যায়ে ভক্তি-যোগ অতীব বিশদরূপে বর্ণিত আছে; বিস্তৃতি-ভয়ে বিকাশে বিরত রহিলাম। ফলে পূর্ব্বোক্ত অষ্টাঙ্গ-যোগে অনভ্যস্ত বা অনধিকারী ব্যক্তিও, কেবল ভক্তিযোগ-বলে অনায়াসে ভববন্ধন মুক্ত হয়।

ভক্তি এমনই মহার্ঘ পদার্থ, ভক্তি এমনই অনির্ব্বচনীয় বস্তু, তাহার নির্ব্বাচন অতীব কঠিন। সোহাগায় যেরূপ সুবর্ণকে জলবৎ তরল করে, বিশুদ্ধচেতার হৃদয়কে ভক্তি সেইরূপ গলায়। প্রদীপ্ত হুতাসন যেমন সুদৃঢ় লৌহকে নম্র করে, নিতান্ত পাষণ্ডের লৌহবৎ সুকঠিন হৃদয়ে ঈশ্বরভক্তি ও ঈশ্বরপ্রেম উদয় হইলে নম্র হইয়া পড়ে। অধিক কি, দস্যু-প্রধান রত্নাকর ঈশ্বর-প্রেমে বদ্ধ হইয়াই পূর্ব্ব-ধর্ম্ম দস্যুতা ত্যাগ করিয়া কালে মহর্ষি বাল্মীকি নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। ত্রিলোকে ভক্তের অসাধ্য কিছুই নাই। (ক্রমশঃ)

কেন?

(সত্য-ঘটনা-মূলক প্রশ্ন-গল্প!)

(১)

সংসারে স্বামীর ভালবাসা যাহার নাই, তাহার আবার কিসের সুখ? কোলে সোণার পুতলী বৎস, কৌশল্যার-মত শ্বাশুড়ির কন্যার-অধিক স্নেহ-যত্ন;—তবুও মনের আগুণ নেভে না! মা ত ছেলের দেখা পাইলেই বৌয়ের পক্ষ হইয়া তাঁহাকে নানারূপে বুঝান, বিনাইয়া

বিনাইয়া আমার প্রতি তাঁহার করুণার উদ্রেকে সচেষ্ট হন, আবার সময়ে সময়ে লাঞ্ছনা-গঞ্জনা দিতেও ছাড়েন না! কিন্তু ইহাতে যে বড় সুফল দর্শে, তাহা নহে; বরঞ্চ অনেক সময় বিপরীত ঘটিয়া থাকে। এমনিতে তবু দিনান্তে একবার করিয়া প্রায় বাড়ী আসেন; কিন্তু, শ্বাশুড়ি বকাবকি করিলে, দু'চার দিন একেবারে অদৃশ্য হইয়া পড়েন। স্বামী যে ভালবাসেন না, পোড়া প্রাণে তাহাও সয়; কিন্তু তাঁহার এই আদর্শন সহে না। নিয়মিত সময়ে তাঁহার যেদিন দেখা না পাই, সেদিন প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা উপস্থিত হয়; মনে হয়, স্বামী আসিয়া আমাকে যদি এখন পাদুকাঘাত করেন, ত ইহার তুলনায় তাহাও সুখ। নেশা গো নেশা! সময়ে অহিফেন বা সুরা না পাইলে নেশাখোরের যে দুর্দ্দশা, ইহাও সেই-রূপ এক প্রকার নেশা! সমস্ত বুঝি, তবু এ নেশা তাড়াইতে পারি না। কাজেই, শ্বাশুড়ির শুভ-উদ্দেশ্যে তাঁহাকে ধন্যবাদ না দিয়া, মনে মনে তাঁহার অদূরদর্শিতার নিন্দাবাদ করি।

দিন পনের প্রায় হইল, এবার উনি ঘরে আসেন নাই। 'সেখানে' লোকের উপর লোক যায়; ফিরিয়া আসিয়া বলে,—'বাড়ী বন্ধ গো, বাবু বাগানে গেছেন।' শ্বাশুড়ি ভাবিয়া-চিন্তিয়া অস্থির; আর আমার আহার-নিদ্রা ত একরূপ বন্ধ বলিলেই হয়! খোকার মুখের দিকে চাহিয়া, আর ভগবানকে প্রাণ-মনে ডাকিয়া, কোনরূপে দিনটা কাটিয়া যায় মাত্র! একদিন সারারাত কাঁদিয়া কাঁদিয়া শেষ-রাতে একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছি। স্বপ্নে দেখিলাম—আকাশ ফাটিয়া চারিদিক জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিল; সেই জ্যোতির মধ্যে স্বর্ণ-সিংহাসনে উপবিষ্টা এক দেবীরূপা রমণী আমাকে একটি জবাফুল ফেলিয়া দিয়া বলিলেন,—"এই নে, মাথায় পর, স্বামী ভাল-বাসিবে।" আমি ফুলটি ধরিলাম। অমনি ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু, কই সে দেবী, আর কোথায়ই বা সে ফুল!

তখনো ভাল করিয়া রাত পোহায় নাই; আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া শ্বাশুড়িকে জাগাইয়া আমার স্বপ্নটি তাঁহাকে বলিলাম। তিনি বলিলেন,—"জবাটি পাইয়াছ?" আমি বলি-লাম,—"না।" তিনি বলিলেন,—"বাছা, কালী-ঘাটে যাও; কালী তোমাকে ঐ অপরূপ বেশে দেখা দিয়াছেন। সেখানে গিয়া তাঁহার ফুল পরিয়া এস—মন-ক্লেশ দূর হইবে।"

(২)

আমাদের বাড়ী ভবানীপুর, কালীঘাট নিকটেই। আগেও অনেকবার কালীঘাটে আসিয়াছি, দেবীদর্শন করিয়া তাঁহাকে দুঃখ জানাইয়াছি; কিন্তু আজ প্রাতঃকালে তাঁহার দ্বারে আসিয়া যখন দাঁড়াইলাম—বলি-রক্ত-স্রোতের পার্শ্ব দিয়া লোলজিহ্ব, কৃপাণ-হস্ত, নৃমুণ্ডধারিণী ভীমরূপা কালীর সম্মুখে আসিয়া যখন দাঁড়াইলাম, তখন কেমন মাথা ঘুরিয়া উঠিল। স্বপ্নের সেই করুণারূপিনী, প্রসন্না, হাস্যময়ী, অনুপমা, অপরূপা, প্রাণ-মোহিনী দেবীমূর্ত্তির সহিত ইহাঁকে এক ভাবিতে পারি-লাম না। তাঁহাকে দেখিয়া প্রাণ আশাযুক্ত সুশীতল হইয়া উঠিয়াছিল; ইঁহাকে দেখিয়া ভয়-শিহরিত, নিরাশ-কম্পিত হইয়া দ্বারদেশেই বসিয়া পড়িলাম। সঙ্গে উমি দাসী ছিল; সে ভয় পাইয়া বলিয়া উঠিল,—"ওমা, বৌমার আমাদের কি হ'লো গা!" সেখানকার একজন পূজারি, তিনি আমাদের চিনিতেন, তিনি, তাড়াতাড়ি কালীর কোষাকুষি হইতে খানিকটা জল আমার মাথায় দিয়া, উমীকে বলিলেন,—"এখানে লোকজন আস্‌ছে, বৌমাকে ধরে ঐ গাছতলায় নিয়ে বসাও।" আমি উমিকে ধরিয়া মন্দিরের বাহিরে একটি নির্জ্জন গাছতলায় বসিলাম। গাছতলায় আর একজন রমণী বসিয়া ছিল; উমি তাহার

সহিত গল্প ফাঁদিয়া বসিল। বলিল,—"বৌ-ঠাকুরুণকে নিয়ে আথান্তরে পড়েছিলুম! ভির্‌মি গো ভির্‌মি! হ্যাঁগা, তুমি কোথায় থাক গা?"

রমণী বলিল,—"আমি অনেক দূরে থাকি গো, আমায় চিনবেনা; তোমরা কোথা থেকে আসচ?"

দাসী।—আমরা এই ভবানীপুরেরি লোক, প্রাণনাথ বাবুর নাম শুনে থাকবে কি? এক-কালে ছিল ভাল, এখন ভেঙ্গে পড়েছে—

রমণী।—উনি তাঁর কে হন?

দাসী।—স্ত্রী গো স্ত্রী! তা বলব কি দুঃখের কথা, ত্যজা হলেন কমলিনী, কুব্জা এখন পাট-রাণী! একবার মুখখানে চেয়ে দেখে-নাগো দেখে না, মনোদুঃখে শরীরটা পাত কর্‌ছে! একবার বেটীকে পাই ত দেখিয়ে দিই—ডাইনি বেটির একটু মায়া-দয়া নেই! এমন লক্ষ্মীর এই দশা করলি? তবু শুনতে পাই নাকি, ভদ্র-ঘরের মেয়ে ছিল, পোড়াকপাল অমন——

আমি তখন ভাল হইয়া উঠিয়াছি; আমি বলিলাম,—"উমি, তা'কে গাল দিস্ কেন? আমার অদৃষ্টে ভগবান সুখ লেখেন-নি; তা'র কি দোষ?"

ইহার পর অপরিচিতা নিকটে আসিয়া বলিল,—"সত্যিই লক্ষ্মীস্বরূপা! এমন স্ত্রীকে স্বামী নেয় না!"

দাসী বলিল,—"শুধু নেয় না! দেখনা, গায়ে একখানা গহনা পর্য্যন্ত রাখেনি! এদিকে ত বাবু বাড়ী থাকেন না; কেবল যখন গহ-নার দরকার হয়, তখন রাতবাস কর্‌তে আসেন! আমরা এত করে বলি,—'বৌমা দিওনা গো, স্বামী গেছে যাক, গহনাগুলো দিওনা।" তা যখন দুটো মিষ্টি কথা বলে বাবু বিপদ জানায়, তখন ওর কি আর বুদ্ধিসুদ্ধি থাকে? মা সেদিন গহনার জন্য বাবুকে এমন ত গঞ্জনা দেয়-নি! বল্লে, ছাড়িয়ে আন-তেই হবে! সেই অবধি আর বাবুর দেখা নাই! আর দেখ না, বৌমা ভেবে খুন হচ্ছে!" আমি বলিলাম,—"কি বকিস্ উমি, চুপ কর!"

রমণী বলিল,—"তা ত সত্যি কথা! আমরা হলে অমন স্বামীর মুখ দেখিনে! দিদি তোমার ভাল হবে, এমন লোকের দুঃখ চিরকাল থাকে না।"

রমণীর নয়নে করুণা-জ্যোতি বিভাসিত হইল। সে আমার নিকটে আসিয়া হাত ধরিয়া বিকম্পিত-স্বরে বলিল,—"এ পুণ্যবতীকে যে আদর করিতে জানে না, তাহার নিতান্তই দুর্ভাগ্য। দিদি, তোর দুঃখ আমাকে দে, মা-কালী যেন তোকে সুখী করেন।"

তাহার সমস্ত মূর্ত্তিতে এক অমানুষী সৌন্দর্য্য প্রদীপ্ত হইল; আমার স্বপ্নের দেবীকে মনে পড়িল।

(৩)

সেইদিন দুপুর বেলা একজন অপরিচিতা বৃদ্ধা আসিয়া হাঁকিল,—"ওগো মা-ঠাকুরুণ্‌রা, এই গহনা নেও গো! বাবু আমার ঠাঁই বাঁধা রেখেছিল; টাকা দিয়ে বল্লে, বাড়ী দিয়ে এস। বুঝে সুঝে সব নেও।"

মা (শ্বাশুড়ি) ত আহ্লাদে নির্ব্বাক! উমি বলিল,—"মা-কালী বাবুর এই সুমতি দিয়ে-ছেন! বৌমা এদিকে এসগো—"

মা গহনা দেখিয়া লইতে লাগিলেন; আমি আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কবে টাকা দিয়েছেন?" জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য, কবে তাঁহার সহিত দেখা হইয়াছে—আর একজন তাঁহাকে দেখিয়াছে শুনিলেও মনটা ঠাণ্ডা হয়!

বৃদ্ধা বলিল,—"এই আজকেরি—মরুকুগে—এই ক'দিন হ'লো দিয়েছে; তা' কাজে-কর্ম্মে আসতে পারিনি।"

মা বলিলেন,—"ছেলে কবে বাড়ী আস্‌বে, তা কি কিছু জান?"

বৃদ্ধা রাগিয়া বলিল,—"তা বাছা, আমি কি

করে জানব? এখন ত গহনা পেলে, আমি চন্নু।" আমার ইচ্ছা করিতেছিল, বৃদ্ধাকে বসাইয়া ভাল করিয়া দু'এক কথা জিজ্ঞাসা করিব! কিন্তু তাহা হইল না, বৃদ্ধা এমনই হঠাৎ চলিয়া গেল।

(৪)

সেইদিন সন্ধ্যা-বেলা স্বামীও বাড়ী আসিলেন। বাড়ীর সকলেরি মহানন্দ। মা তাঁহাকে খাওয়াইতে বসিয়া বলিলেন,—"বাছা, গহনা সব পেয়েছি। কিন্তু বিধাতা যে এতদিনেও তোর সুমতি দিয়েছেন, তাহাতেই আমার বেশী আহ্লাদ!"

স্বামী আশ্চর্য্যভাবে তাঁহার দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"কি গহনা?"

"কেন, বৌয়ের গহনা! যাকে বাঁধা দিয়েছিলি, সেই বুড়ি মাগী আজ দিয়ে গেল; বল্লে, তুই টাকা দিয়েছিস্।"

স্বামী একটুখানি দম লইয়া বলিলেন,—"ওঃ!"

আহারান্তে তিনি ঘরে আসিয়া আমাকে বলিলেন,—"গহনা দিয়ে গেছে; কই দেখি?" আমি তাঁহাকে আনিয়া দিলাম। তিনি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার মুখ আজ পূর্ব্ব হইতেও বিষণ্ণ! গহনাগুলি দেখিবার পর আরও ম্রিয়মান হইয়া পড়িলেন!

তাঁহার ভাব দেখিয়া আমার মন বড় খারাপ হইয়া গেল। আমি বলিলাম,—"তোমার কি গহনার আর দরকার আছে? থাকে ত নেওনা!"

স্বামী কষ্টের স্বরে বলিলেন,—"না।" কিছু পরে তিনি অন্য দিনের মত চলিয়া গেলেন। আমি তাঁহার সেই বিষণ্ণ মুখখানি ভাবিতে ভাবিতে, খোকাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া, ঘুমাইয়া গেলেম। অনেক রাত্রি এমন গভীর নিদ্রা হয় নাই। সকাল বেলা খোকা উঠিয়া 'বা—বা' করিয়া হাত-পা ছুড়িয়া খেলা করিতেছে; আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। জাগিয়া মনে করিলাম,—একি, এখনো স্বপ্ন দেখিতেছি! বিস্ময়ে চক্ষু-মর্দ্দন করিয়া আবার চাহিলাম; দেখিলাম, স্বপ্ন নহে—সত্যই স্বামী পার্শ্বদেশে দাঁড়াইয়া আমাদের দেখিতেছেন! তাঁহার মুখ বিষাদ-গম্ভীর, হৃদয়ে যেন মহা-বিপ্লব! আমি চমকিয়া বলিলাম,—"তুমি! কি হইয়াছে?" স্বামী কথা না কহিয়া শয্যায় বসিলেন। খোকা 'বা—বা' করিয়া হাসিয়া উঠিল। তিনি তাহাকে তুলিয়া বুকে ধরিলেন; তাঁহার নেত্র দিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল। আমি কাতর হইয়া বলিলাম,—"স্বামি, প্রভু, সর্ব্বস্ব তোমার! কি হইয়াছে, আমাকে খুলিয়া বল; আমি প্রাণ দিয়া তোমার দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা করিব।"

স্বামী খোকাকে বিছানায় রাখিয়া আমাকে বুকের মধ্যে টানিয়া বলিলেন,—"তুমি আমাকে মার্জ্জনা করিতে পারিবে? আমার আর কিছু চাহিবার নাই?"

অশ্রুতে আমার নয়ন ভাসিয়া গেল। আমি আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম। তেমন সুখ আমার জীবনে কখনো হয় নাই; পৃথিবীতে যে স্বর্গ আছে, আত্মা যে শরীরের মধ্যে থাকিয়াও মুক্তির আনন্দ লাভ করিতে পারে, সেইদিন আমি জানিয়াছিলাম।

* * * *

সেইদিন হইতে স্বামী একেবারে পরিবর্ত্তিত, স্ত্রী-পুত্র লইয়া তিনি এখন গৃহবাসী। কিন্তু সহসা এই পরিবর্ত্তনের কারণ কি? এ কৌতূহল আমার কখনো মিটিল না। স্বামী এ কথার উত্তর দিতে চাহেন না। একবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি কষ্টের স্বরে বলিয়াছিলেন,—"ওকথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না, আমার এই অনুরোধটি রাখিও।" সেই অবধি তাঁহার কাছে আর একথা তুলি নাই; আপন মনেই সর্ব্বদা এই প্রশ্ন করি—

'কেন?' কিন্তু এ পর্য্যন্ত কোন একটা স্থির মীমাংসাতে আসিতে পারি নাই; তাই আজ তোমাদের জিজ্ঞাসা করিতেছি—বলিতে পার —কেন?*

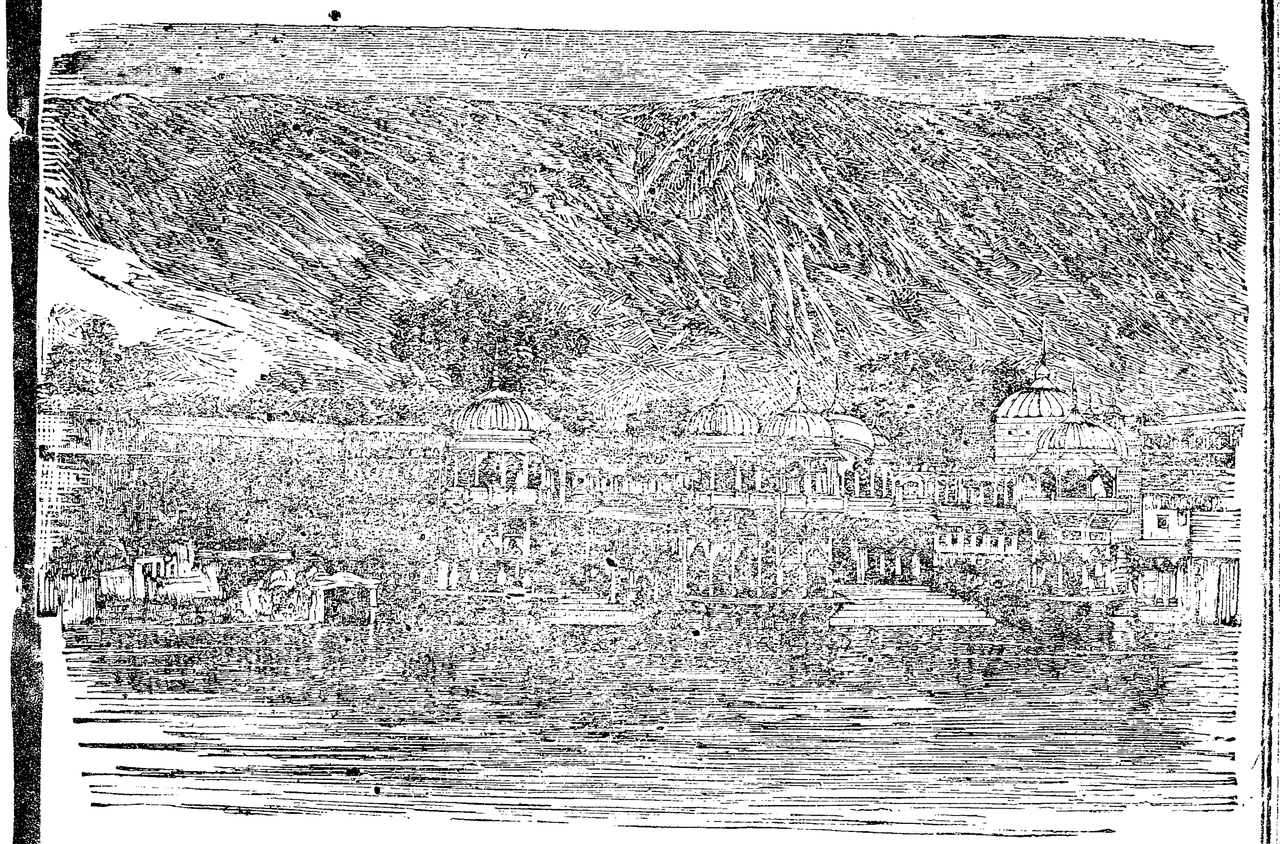

পুষ্কর-তীর্থ।

পুষ্কর তীর্থ হিন্দুর এক পরম পবিত্র তীর্থ-স্থান। শুধু তীর্থ-স্থান বলিয়াও নহে, এমন মনোরম শোভাময় স্থান অতি বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। একদিকে তীর্থ-স্থান বলিয়া, অন্যদিকে এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়া, সাধক-ভক্ত সকলেই মোহিত হয়েন। পুরাণাদিতেও এই স্থানের মনোরমত্ব-সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, এক সময় ব্রহ্মা স্বয়ং এই স্থানীর মনোহারিত্ব দেখিয়া মোহিত হইয়াছিলেন, এবং এই স্থানকেই তাঁহার যজ্ঞভূমি বলিয়া মনোনীত করিয়াছিলেন। আর তদবধিই এই স্থানের মাহাত্ম্য।

আজমীরের ৯ মাইল পশ্চিমে এই পুষ্কর-নগরী স্থাপিত। এখানে একটী সুদৃশ্য হ্রদ আছে—তাহাকে পুষ্কর হ্রদ বলে—সেই হ্রদই পবিত্র তীর্থ। হ্রদটি ডিম্বাকৃতি, তাহার চতুস্পার্শে বালুকাস্তূপ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভগ্ন পর্ব্বত-শিখর আছে। এই হ্রদে স্নানাহ্নিক ও তর্পণাদি করিয়াই ভক্ত হিন্দু আপনাকে পবিত্র জ্ঞান করেন।

* 'ভারতীতে' এই গল্পটী প্রথম প্রকাশিত হয়। কিন্তু তাঁহারাও জানেন না যে, 'কেন' এমন হইয়াছিল। গল্পের যিনি নায়িকা, তাঁহার স্বামীও সত্যসত্যই একথা আর কাহাকেও ভাঙ্গেন নাই। কিন্তু তিনি আমাদের একজন বড়ই বন্ধু-লোক; অনেক পীড়াপীড়ি করিয়া ধরায়ও আর কাহাকেও বলিব না বলিয়া দিব্বি-পর্য্যন্ত করায়, তিনি সেদিন ইহার রহস্য আমাদের বলিয়াছেন। কিন্তু সে রহস্য এতই রসাল যে, আমরা আর তাহা হজম করিয়া যাইতে পারিলাম না। আগে তাই প্রশ্ন—কেন? পরে বলিব—কেন!

রাজপুতানার অনেক সমৃদ্ধিশালী ব্যক্তিই পুষ্কর তীর্থে মন্দিরাদি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। হ্রদের চতুষ্পার্শ্বে আজকাল অনেক রাজারই মন্দির দেখা যায়। মন্দিরগুলি সকলেই সুচারু নির্ম্মিত। অধিকন্তু 'রামজীর মন্দির' নামীয় একটী আধুনিক মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। চারিদিকে মন্দির ও অট্টালিকা-শ্রেণীর শোভায় হ্রদটী আরও শোভাময়—এমন সুন্দর দৃশ্য বুঝি বা আর নাই!

এখানে ব্রাহ্মণের বাসই অধিক। ব্রাহ্মণেরাই প্রথমে এস্থানে বসবাস আরম্ভ করেন। এক্ষণে অনেক সন্ন্যাসী-মোহান্তও এখানেও বাস করিয়া থাকেন। তদ্ভিন্ন, রাজপুতানার অনেক রাজার বাস-বাটীও আজকাল এখানে হইয়াছে। ফলতঃ কি তীর্থস্থান বলিয়া, কি প্রাকৃতিক দৃশ্যে, পুষ্কর তীর্থ অদ্বিতীয়। হিন্দুর এ তীর্থ দেখিবার ও দেখাইবার জিনিস বটে। রাজপুতানার চারিদিকে মরুভূমি—মধ্যস্থলে এই সুন্দর জনপদ। তাহাতে আরও শোভা বাড়িয়াছে।

অনুসন্ধান-সমিতির বিবরণী।

প্রতারণা-প্রবঞ্চনা।

সন্দেহজনক বিজ্ঞাপন।

আজকাল অনেকই। কিন্তু তাহার পনের আনা উনিশ গণ্ডা বিজ্ঞাপনদাতাই এমন সাবধানী যে, ধরিবার ছুঁইবার বা বলিবার-কহিবার যো নাই! আর, তাহারাই লোককে ঠকায় বেশী। কিন্তু এগুলি আবার আরও ভয়ানক। বিজ্ঞাপনের নীচেয় ঠিকানা ও নাম আছে,—

"জি, ব্যারওয়েল এণ্ড কোং,
১৯নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।"

অথচ না আছে, তার দোকান; না আছে সাহেবরূপী বা কালাচাঁদ-রূপী যে কোনরূপী ব্যারওয়েল; না আছে কিছু সাজ-সরঞ্জাম। আছে কেবল চটকদার বিজ্ঞাপন—আছে কেবল লোক-ভুলান মন-মজান বোল-চাল—আর আছে কেবল, যোগাড়যন্ত্র করিয়া ডাকঘর হইতে মফঃস্বলের মনি-অর্ডারগুলা আত্মসাৎ করা! ঠিকে সবই ঠিক আছে; অথচ আসলে সবই ভুয়া! যাউক বিজ্ঞাপনের মত একটা দ্রব্য—লওয়া হউক, পার্শ্বেলে আঁটিয়া সুধা-কি-গরল যা'হয় একটা পাঠাইয়া, টাকা; কিন্তু কিছুতেই এ সকল বিজ্ঞাপনকে বা বিজ্ঞাপন-দাতাকে প্রশ্রয় দেওয়া যায় না।

একটীর নাম করিলাম। কিন্তু অনেকই আজকাল এইরূপ। নামটা আজকাল অনেকেরই সাহেবী। কাহারও বা একটা প্রকাশ্য আড্ডা আছে—কাহারও বা সেটুকুও নাই—তাঁরা চান ষোল আনাই ফাকি দিতে! বঙ্গবাসী, সহযোগী, সুধাকর প্রভৃতি অনেক পত্রেই আজকাল এই শ্রেণীর নানা বিজ্ঞাপন বাহির হয়। বিজ্ঞাপন ছাপিয়া, সংবাদপত্র-পরিচালকগণও (অবশ্য সকলেরই কথা বলিতেছি না) অবশ্য অনেক সময়ই ঠকিয়া থাকেন। কিন্তু সেস্থলে বুঝিতে পারেন না বলিয়াই বলিতে হইবে আর কি! নহিলে, ঠকিবেন কেন? এরূপ ভ্রমে পড়িয়া সময়ে সময়ে আমরাও যে না ঠকিয়া থাকি, তাহা নহে। জুয়ারীর ধাঁধায়—সাবধানতা কতক্ষণ!

যাহাই হউক, কিন্তু চাল-চুলা কিম্বা আড্ডা পর্য্যন্তও নাই—অথচ এরূপে এক ঠিকানায় বসিয়া সাত ঠিকানায় লোক ঠকাইব, এরূপ কিন্তু বড়ই ভয়ানক কথা। গতবারে এইরূপ কতকগুলির নাম আমরা করিয়াছিলাম। এবার সে সম্বন্ধে কোন বিজ্ঞ সম্পাদক আবার আমাদিগকে এইরূপ লিখিয়াছেন,—

"সুধাকর-আপিস।
কলিকাতা, ২৩এ অগ্রহায়ণ, ১২৯৮।

মহাশয়, আপনারা জুয়াচোর-দমনে সিদ্ধ হস্ত। কিন্তু কলেজ ষ্ট্রীটের কতকগুলি নূতন জুয়াচোরের সম্বন্ধে কোনই ব্যবস্থা করিতেছেন না কেন? বি, কে, ঘোষ, পি, লেজার্স, জি, ব্যারওয়েল এই সকল অস্তিত্ববিহীন জুয়াচোরদিগকে দমন করিবার কোন ঔষধ কি আপনাদের নিকট নাই? ইহাদের দোকান নাই, অথচ ডাকঘর হইতে মনি-অর্ডারগুলি পায় কিরূপে? ডাকঘরের বিরুদ্ধে কিছু করুন না কেন?

নিঃ শ্রী—'সুধাকর-সম্পাদক।"

'সুধাকরের' সম্পাদক মহাশয় এ বিষয় লিখিবার পূর্ব্বেই আমরা অবশ্য চেষ্টিত ছিলাম। চেষ্টাও অবশ্য হইতেছে। কিন্তু আপাততঃ প্রথম উপায় কি? এ সকল বিজ্ঞাপন, একটু জানিয়া-শুনিয়া প্রকাশ করাই কি কর্ত্তব্য নহে! এজন্য অবশ্য সংবাদপত্রের ক্ষতি হয় বটে—এ উপায় অবলম্বন করিয়া আমাদিগকেও ক্রমে ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হইতেছে ঠিক—কিন্তু এই উপায়ই প্রথম ও ঠিক উপায় মনে করি। তারপর অন্য উপায়! কিন্তু এ কথা শুনিয়া, স্বার্থহানি কে করিবেন? যাহা হউক, এসকল সম্বন্ধে আমরা যাহা করিতেছি, তাহা অবশ্য পরে সকলেই জানিতে পারিবেন। কিন্তু এখন স্মরণে সাবধান!

অনুসন্ধান।
অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র।

৫ম খণ্ড] ১৫ই পৌষ, ১২৯৮। [১০ম সংখ্যা।

ভক্তি-সঙ্গীত।

(সুরট—একতালা।)

ও মন! সতত সেবনা তারে।
ছাড়ি দেহ মমতারে, দেহ-মমতারে,
দেহ মমতারে যে তারে॥

বাঁধি সমসুরে হৃদয়-সেতারে,
সদা গুণ গাও সেতারে সেতারে,
সে তারে সে তারে যেবা ভজে তারে,
আর কেবা তারে দুস্তারে॥

শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি-তারে,
যতনেতে বাঁধি রাখ সমতারে,
গাও সদা গাও জগত-ধাতারে,
কভু ভুলো না সেতারে॥

রাধিকা-রমণ ভকত-নেতারে,
তিনিই ভকত-পিতারে—মাতারে,
তিনিই ভকত-সুহৃদ—ভ্রাতারে,
লহরে শরণ তারে॥

ত্যজি কীর্ত্তি-দম্ভ-মান-শঠতারে,
লহরে শরণ অভয়-দাতারে,
যেবা ভজে তারে, সেও ভজে তারে,
গাও সদা তারে তারে॥

হিন্দু-রমণীর কর্ত্তব্য।

এসম্বন্ধে ভগবান মনু বলিয়াছেন,—"স্ত্রীলোক সর্ব্বদা প্রসন্ন-চিত্তে থাকিবেন, এবং সুচারুরূপে গৃহকর্ম্ম-সম্পাদন, মনোযোগের সহিত গৃহস্থিত দ্রব্যের তত্ত্বাবধান ও পরিমিত-ব্যয় করিবেন।" এই সম্বন্ধে সকলেরই প্রায় একমত। বহ্নিপুরাণে স্ত্রীলোকের গৃহকর্ম্ম-সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন; যথা,—

"সা শুদ্ধা প্রাতরুত্থায় নমস্কৃত্য পতিং সুরং।
প্রাঙ্গনে মণ্ডণং দদ্যাৎ গোময়েন জলেন বা॥
গৃহকৃত্যং চ কৃত্বাচ স্নাত্বা গত্বা গৃহং সতী।
সুরং বিপ্রং পতিং নত্বা পূজয়েদ্গৃহদেবতাং॥
গৃহকৃত্যং সুনির্ব্বর্ত্ত্য ভোজয়িত্বা পতিং সতী।
অতিথীন পূজয়িত্বাচ স্বয়ং ভুঙক্তে সুখং সতী॥"

ইহার ভাবার্থ,—রমণী শুদ্ধা হইয়া প্রাতে শয্যা হইতে পতিকে প্রণাম করিয়া উঠিবেন। তৎপরে জল ও গোময় দ্বারা, প্রাঙ্গনে মণ্ডণ করিবেন। গৃহকার্য্য সমাধা করিয়া স্নান করিবেন; পরে দেবতা-ব্রাহ্মণ ও পতিকে প্রণাম করিয়া গৃহ-দেবতার পূজা করিবেন। তৎপরে রন্ধন ইত্যাদি গৃহকার্য্য সম্পন্ন করিয়া স্বামীকে ভোজন করাইবেন, এবং অতিথিকে যত্নের সহিত আহার করাইয়া তৎপরে নিজে ভোজন করিবেন।

এসমস্ত কার্য্য ভিন্ন রমণীদের আরও অনেক কর্ত্তব্য কার্য্য ছিল। রমণীরা সর্ব্ব-বিষয়ে পাপশূণ্যা হইবেন; পিতা-মাতা, শ্বশুর-শ্বাশুরী ইত্যাদি গুরুজনের সেবা, দেবাদির প্রতিপালন; দেবতা, দ্বিজ, অতিথি, ভৃত্য, এমন কি গৃহপালিত বিড়াল-কুকুরটীর পর্য্যন্ত রীতিমত তত্ত্বাবধান করিবেন। প্রাচীনা রমণীদের প্রধান শিক্ষণীয় ও কর্ত্তব্য বিষয় ছিল, পতি-সেবা; দ্বিতীয়তঃ, গৃহকার্য্য, সন্তান-পালন ইত্যাদি। এসম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাবু নীলকণ্ঠ মজুমদার মহোদয় বিষ্ণুপুরাণ হইতে সুন্দর একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা সংগ্রহ করিয়াছেন। যথা,—

"অথ স্ত্রীণাং ধর্ম্মাঃ—

(ক) ভর্ত্তুঃ সমানব্রতচারিত্বং।—অর্থাৎ স্বামী যে ব্রত বা নিয়ম অবলম্বন করিবেন, স্ত্রীও তাহাই করিবেন। এইরূপ কার্য্য করিলে পতিপত্নী ধর্ম্ম-শৃঙ্খলে সংবদ্ধ হইবেন। পাঠক, এস্থলে রঘুবংশের দিলীপ ও সুদক্ষিণার কথা স্মরণ করিবেন।

(খ) শ্বশ্রুশ্বশুরগুরুদেবতাতিথিপূজনঃ।—অর্থাৎ গুরুজনের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিয়াও দেবদ্বিজে ভক্তি করা।

(গ) সুসংস্কৃতোপস্করতা।—পবিত্র উপকরণ সংগ্রহ করিয়া স্বামীর ও পরিবারের পূজার আয়োজন বা সাহায্য করিবেন।

(ঘ) অমুক্তহস্ততা।—সাবধান হইয়া ব্যয়াদি করিবেন।

(ঙ) সুগুপ্তাভাণ্ডতা।—ধন-সম্পৎ অতি গোপনে রক্ষা করিবেন।

(চ) মূলক্রিয়াস্বমভিরিভিঃ।—স্বামীকে বশ করিবার জন্য কদাপি কোনপ্রকার যাদু মন্ত্র বা ঔষধ (মূলাদি) ব্যবহার করিবেন না।

(ছ) মঙ্গলাচারতৎপরতা।—সর্ব্বপ্রকার মাঙ্গলিক আচারে যত্নবান হইবেন। অর্থাৎ সর্ব্বদা পরিবারের মঙ্গল-চিন্তায় কালযাপন করিবেন, এবং মঙ্গলোদ্দেশ্যে নানাবিধ সৎ-কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন।

(জ) ভর্ত্তরি প্রবাসিতেহপ্রতিকর্ম্ম ক্রিয়া।—ভর্ত্তা প্রবাসে গমন করিলে নিজ-শরীরশোভা-বৃদ্ধি-বিষয়ে উদাসীন হইবেন।

(ঝ) পরগৃহেস্বনভিগমনং।

(ঞ) দ্বারদেশগবাক্ষকেস্বনবস্থানং।

সাধ্বী স্ত্রীর পক্ষে বাড়ী বাড়ী ভ্রমণ করা, অথবা দ্বারদেশে বা গবাক্ষ প্রভৃতি স্থানে দণ্ডায়মান, নিষেধ।

(ট) সর্ব্বকর্ম্ম-অস্বতন্ত্রতা।—বাল্যে পিতার, যৌবনে পতির ও বার্দ্ধক্যে পুত্রের বশবর্ত্তিনী ...া উচিত।

(ঠ) মৃতে ভর্ত্তরি ব্রহ্মচর্য্যং তদন্বারোহণং বা।—স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীর হয় ব্রহ্মচর্য্য, নয় সহগমন করা উচিত।

(ড) নাস্তি স্ত্রীনাং পৃথক যজ্ঞো ন ব্রতো নাপ্যুপোষিতং পতিং শুশ্রূষতে যত্ত তেন স্বর্গে মহীয়তে।—স্ত্রীদিগের পক্ষে স্বতন্ত্র যজ্ঞ, ব্রত, বা উপবাস নিষিদ্ধ। কেবল পতি-শুশ্রূষা দ্বারাই তাঁহারা অক্ষয় স্বর্গের অধিকারিণী হন।

অর্থাৎ রমণীগণ বিনয়, বশ্যতা, সারল্য, স্নেহ, দয়া, সহিষ্ণুতা, কোমলতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ-বিভূষিতা হইয়া অনন্যমনে পতিসেবা করিবেন; সর্ব্বদা গার্হস্থ্য-কর্ম্মে মনোনিবেশ করিবেন; এবং দেবতা, ব্রাহ্মণ, অতিথি প্রভৃতির যথোচিত সমাদর করিবেন। বিদ্যা-শিক্ষা, একজামিন্ দেওয়া, অথবা চাকরী করা, স্ত্রী-গণের পক্ষে নিষিদ্ধ। কেন-না, ঐ সমস্ত কার্য্য দ্বারা তাঁহাদের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য (পতি-সেবা, সন্তান লালন-পালন, গৃহকর্ম্ম ইত্যাদি) বিনষ্ট হইতে পারে। সংসারের ভীষণ সংগ্রামে প্রবিষ্ট হইলে নারীর স্বাভাবিক সদ্‌গুণ সমস্ত বিনষ্ট হইয়া যায়। হিন্দু-শাস্ত্র-কারগণ নারী-জীবনের যে উদ্দেশ্য ও কর্ত্তব্য অবধারণ করিয়াছেন, তাহাই যে সর্ব্বাংশে শ্রেয়স্কর, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। নারীগণ কখনই পুরুষোচিত গুণ-সমস্ত লাভ করিতে পারিবেন না। তাঁহাদের শরীরের গঠন, মস্তিষ্কের আয়তন, মাংস-পেশীর কোমলতা প্রভৃতি এবিষয়ে তাঁহাদের প্রধান অন্তরায় হইবে।"

রমণীদের পতিব্রতা-ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম-সম্বন্ধে মহাভারতের বনপর্ব্বে দ্রৌপদী-সত্যভামার যে সমস্ত আলাপ হইয়াছিল, পাঠক-পাঠিকাদের মনযোগ-আকর্ষণের জন্য, সংক্ষেপে নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল। বর্ত্তমান-সময়ে এ সকল পূণ্য-কথা কি শিক্ষিতা রমণীদের মুখে শুনা যায়?

"সত্যভামা ও দ্রৌপদীর পরস্পর সাক্ষাৎ হইল, সত্যভামা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দ্রুপদ-নন্দিনী! তোমার বীরপুঙ্গব লোকপাল-সদৃশ পঞ্চস্বামী এরূপ বশতাপন্ন হইলেন কিরূপে? মন্ত্র, ঔষধ, ব্রত, জপ, হোম, যাহাই হউক না কেন, তুমি যাহার প্রভাবে স্বামীগণকে এমন বশ করিয়াছ, তাহা আমাকে বলিতে হইবে।" তখন পতিব্রতা দ্রৌপদী বলিলেন,—"হে সত্যভামে! তুমি অসৎ স্ত্রীদিগের আচার আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছ; এরূপ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না। মন্ত্র ও ঔষধে কদাচ পতি-বশ হয় না; যে স্ত্রী মন্ত্র ও ঔষধ দ্বারা পতির ভালবাসা প্রার্থনা করেন, পতি ইহা জানিতে পারিলে, গৃহস্থিত সর্পের ন্যায় সেই স্ত্রীকে পরিত্যাগ অথবা সদা শশঙ্ক থাকেন। অনেক অসতী স্ত্রীলোক ঔষধ করিয়া পাতর নানাবিধ রোগ-সঞ্চারও করিয়া দেয়। রমণী-গণ অনেকেই এই কার্য্য করিতে গিয়া, নিজ নিজ স্বামীকে জলোদরী, শ্বিত্রী, শুক্ল কেশ, ক্লীব, জড়, অন্ধ বা বধির করিয়া ফেলিয়াছে।" অনন্তর দ্রৌপদী, "আপনি যে কর্ম্ম করিয়া স্বামি-গণের মনোহরণ করিয়াছিলেন, এবং সৎ স্ত্রী-মাত্রেরই যাহা কর্ত্তব্য, তাহাই বলিতে লাগিলেন।

"ভর্ত্তার ভোজন না হইলে, আমি ভোজন করি না; ভর্ত্তা শয়ন না করিলে, আমি শয়ন করি না; ভর্ত্তার স্নান না হইলে, আমি স্নান করি না। ভর্ত্তা কেন, ভৃত্যগণেরও ভোজনাদি না হইলে আমি ভোজনাদি করি না। পতি, ক্ষেত্র বন বা গ্রাম হইতে গৃহে আসিলেই, আমি তৎক্ষণাৎ অভ্যুত্থিত হইয়া, পদ-প্রক্ষালনের জল ও বসিবার আসন প্রদানে আনন্দ-প্রকাশ করি। আমি গৃহোপকরণ সমুদয় বেশ মাজিয়া রাখি; অন্ন পরিষ্কার করিয়া প্রস্তুত করি; যথা-সময়ে ভোজন করিতে দেই; স্বয়ং সংযত-ভাবে থাকি; ধান্যাদি সাবধানে রাখি। কখন কাহাকে ভৎর্সনা করি না; মন্দ নারীর সংসর্গে থাকি না; কোন কার্য্যই অন্যায় করি না; সদাই অনুকূলভাবে অবস্থিতি করি। বিনা পরিহাসে হাস্য, বারংবার দ্বারে অবস্থিতি, আমি ভালবাসি না; গৃহের নিকটবর্ত্তী উপ-বনেও অনেকক্ষণ আমি থাকি না। হাস্যের সময়ও আমি অধিক হাস্য করি না, অধিক ক্রোধ করি না; যাহাতে পতির ক্রোধ হয়, এমন কার্য্যও আমার দ্বারা হয় না। আমি সর্ব্বদাই ভর্তৃগণের সেবায় তৎপর থাকি। পারিবারিক কোন কার্য্যোপলক্ষে ভর্ত্তা যখন প্রবাসে থাকেন, তখন আমি মাল্যানুলেপন পরিত্যাগ করিয়া ব্রতাচরণে কালযাপন করি। আমার স্বামী যাহা পান করেন না, যাহা ভোগ করেন না, বা যাহা ভোজন করেন না, আমিও তাহা পরিত্যাগ করি। ভিক্ষা-দান, বলি-কর্ম্ম, শ্রাদ্ধ, পর্ব্বে পর্ব্বে স্থালী-পাক, মান্য ব্যক্তি-দিগের সম্মান-পূজা প্রভৃতি যে সকল গৃহস্থ-কর্ত্তব্য আমার বিদিত আছে, আমি নিরালস্যে সেই সকল কার্য্য অনুষ্ঠান করি। আমি স্থির করিয়াছি, রমণীগণের সনাতন-ধর্ম্মের পতিই আশ্রয়; পতিই রমণীদিগের দেবতা। তিনিই গতি, গত্যন্তর নাই; কোন রমণী এহেন পতির অপ্রিয় করিতে পারে? আমি স্বামিগণের

উপর কোন কথা বলি না, তাঁহাদের অপেক্ষা উত্তম ভোজন বা উত্তম বেশভূষা করি না। আর সর্ব্বদা সংযত-ভাবে থাকি। শ্বশ্রূনিন্দা কদাচ করি না; আমি দেবী কুন্তীকে অন্নজল-বস্ত্রাদি প্রদান-পূর্ব্বক নিত্য পরিচর্য্যা করি। আমি শ্বশ্রূর বসনাদি অপেক্ষা উত্তম বসন-ভূষণ বা ভোজন করি না। সত্যভামে! আমি প্রতিদিন ভর্ত্তার পূর্ব্বে জাগরণ করি, শেষে শয়ন করি—ইহাই আমার পতি-বশীকরণ। সত্য-ভামে! সমুদয় লোক-মধ্যে—এমন কি দেবগণ মধ্যেও, পতির ন্যায় দেবতা আর নাই। স্বামী প্রসন্ন হইলে, সমস্ত অভিলষিত বস্তু পাওয়া যায়; আর, তিনি ক্রুদ্ধ হইলে, সংহার পর্য্যন্ত করিতে পারেন। ভর্ত্তা দ্বারে উপস্থিত হইলে, তাঁহার স্বর শ্রবণ করিবামাত্র, গৃহমধ্যে দণ্ডায়-মান হইয়া থাকিবে। তাহার পর, তিনি গৃহ-প্রবিষ্ট হইলে, সত্বর পাদ্য ও আসন দ্বারা তাঁহার সম্মাননা করিবে। পুরুষ-সমক্ষে মত্ততা ও প্রমাদ পরিত্যাগ করিয়া মৌনাবলম্বন-পূর্ব্বক নিজভাব সংযত রাখিবে। প্রদ্যুম্ন ও শাম্ব তোমার পুত্র বটে, কিন্তু নির্জ্জন স্থানে তাহাদের নিকটেও কালযাপন করিবে না।"

স্ত্রীজাতির যে যে কর্ত্তব্য, তাহা দ্রৌপদী পরিস্কাররূপে বলিয়াছেন। হিন্দু-সন্তান! আজকাল শিক্ষিতা হিন্দু-রমণীদের মধ্যে ঐ সকল সদ্‌গুণগুলি—ঐ সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম-সমূহ দৃষ্ট হয় কি?

এখন সেই হিন্দু-রমণীর পতিব্রতা-ধর্ম্ম, কর্ত্তব্য কর্ম্ম প্রায় নাই বলিলেই হয়। অনেক স্থলে সম্পূর্ণ বিপরীতই হইয়াছে! বর্ত্তমান-কালে যাঁহারা দু'একটা "পাস" করিতে পারেন; যাঁহারা স্বাধীনভাবে ইতস্ততঃ ভ্রমণ ও পর-সংসর্গ করিতে ভালবাসেন; যাঁহারা পতিকে নিজের সম্পূর্ণ বসে রাখিতে সক্ষম; যাঁহারা গৃহকর্ম্মে প্রায় উদাসিনী; যাঁহারা আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবদিগকে অবহেলা করেন; যাঁহারা শ্বশুর-শাশুরী প্রভৃতি গুরুজনদিগকে উপেক্ষা করেন; যাঁহারা একমাত্র নিজের সুখ খুঁজিয়া বেড়ান; যাঁহারা সংসারের উন্নতির জন্য অতি অল্পই চিন্তা করিয়া থাকেন;—তাঁহারাই বর্ত্তমান কালের শিক্ষিতা ও সভ্যা বলিয়া পরিচিতা। প্রাচীনকালের রমণীদের যে সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও মহৎ গুণ ছিল, এখনকার উচ্চদরের শিক্ষিতা রমণীদের মধ্যে তাহার একটি গুণও কি দেখা যায়? এদিকে আমাদের দেশের কতিপয় হত-ভাগ্য লোক বর্ত্তমান-প্রণালীর শিক্ষা যাহাতে বাহুল্য-রূপে প্রচলন হয়, তাহার জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করিতেছেন। হিন্দু-সন্তান! এখন সাবধান হউন! প্রলোভনে পড়িয়া সমাজকে ছাড়খার করিবেন না। হিন্দু-রমণীকে এম. এ বিএ, পাস করাইতে চেষ্টা না করিয়া প্রাচীন নিয়মে শিক্ষা দিতে চেষ্টা করুন। যে এম. এ বিএ, পাস করিয়া আর্য্য-রমণীর একটি সদ্‌গুণ কেহ লাভ করিতে সক্ষম হইল না (বিগত শতাব্দির ফল দেখিলেই ইহা স্পষ্টাক্ষরে প্রমাণিত হইবে।) সেরূপ বিদ্যা হিন্দু-রমণীগণকে কখনই শিক্ষা প্রদান করা কর্ত্তব্য নহে। ফলতঃ যাহাতে হিন্দুরমণীগণ সেই প্রাচীন কালের ন্যায় পতিব্রতা-ধর্ম্মে ও কর্ত্তব্য-কর্ম্মে শিক্ষালাভ করিতে পারেন, প্রত্যেক আর্য্যবংশধরের সেরূপ চেষ্টা করা একান্ত কর্ত্তব্য।

অদৃষ্ট।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

জয়গোপালের গুপ্তকথা।

শিবচন্দ্র বাটীর ভিতর গমন করিলে, তাঁহার স্ত্রী একটী ছোট নিদ্রিত ছেলেকে কোলে করিয়া শয়ন-গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কহিলেন,—"তবু ভাল—এতক্ষণের পর মনে পড়লো, ঘর-সংসার আছে! ছেলেটা ধর্ত্তে দেড়েক ঘুমিয়ে পড়েছে; কোথায় শোয়াই,

কি করি, ভেবে পাইনে। এক-সংসারের কাজ পড়ে আছে—রাঁধা-বাড়া হলো না, শীতকেলে রাত, এখন করি কি?"

শিবচন্দ্র।—এখনও রান্না হয়-নি, তবে খাব কখন?

গৃহিণী।—কেমন করে রাঁদি। ছেলে-টীকে কেউ না নিলে তো আর রাঁধতে পারি-নে? (ক্ষণেক চুপ করিয়া থাকিয়া) কি এত কাজ ছিল যে, এতক্ষণ তাই নিয়ে ঘোঁট-মঙ্গল কচ্ছিলে? আজ যে কার মুখ দেখে উঠেছিলে, বলা যায় না। জয়গোপাল বাবু সশরীরে তোমার বাটীতে উপস্থিত!

শিব।—গরজ না থাকলে কি কেউ কারু বাড়ী আসে? গরজ পড়েছে বলে এসেছে?

গৃহিণী।—কি এমন গরজ? আর বাবু তোমার পা ধরে কি বল্‌ছিলেন? উনি কখনও কারুর বাড়ি যান না; আর, তোমার পা ধরে বসেছিলেন কেন?

শিব।—তোমাকে কে বল্লে যে, বাবু আমার পা ধরেছিলেন?

গৃহিণী।—কেন, আমি কি দেখি-নি? সেই যে সেদিন তুমি কি একখানা বৈ পড়ে বলেছিলে যে, হাজার লুকান যায়গায় কেন মেয়ে-মানুষকে রেখে দাওনা, নূতন লোক এলে তাকে দেখ্‌বেই দেখ্‌বে—নূতন একটা কথা হলে শুন্‌বেই শুন্‌বে। তা' সে কথা কি মিথ্যা? বলি, সত্যি করে বল না কেন, তোমার পায় ধরেছিল?

শিব।—আমি ওর বাপের বোইসি; আমার পা ধর্‌লে ওর লজ্জাই বা কি, অপমানই বা কি?

গৃহিণী।—কিছুই না, তা আমি জানি; কিন্তু ধর্‌লে কেন, সেটা তো বল!

শিব।—সে একটা সামান্য কথার জন্য। জয়গোপালের কাকার অংশে কাঠা-কয়েক জমী জরীপে অতিরিক্ত বাহির হইয়া পড়িয়াছে, আমারও কয়েক কাঠা ঐরূপ বাহির হইয়াছে, তাহারি বিষয় কথা-বার্ত্তা হচ্ছিল।

গৃহিণী।—ওসব কথা আমি শুন্‌তে চাইনে। যদি তোমার জমী বেশী হয়ে থাকে, তবে তুমিই তো পায় ধর্‌বে! সে কেন ধর্‌বে? কোন-না-কোনরূপে ও তোমার হাতে আছে, তা না হলে কখনও এরূপ হয় না।

শিব।—আমার হাতে আর জয়গোপাল কেমন করে থাকবে? সে হ'লো গ্রামের জমী-দার, আমি তার একজন প্রজা বল্লে হয়, সে কেন আমার হাতে থাক্‌বে?

গৃহিণী।—ওসব কথা যে বিশ্বাস করে, তাকে গিয়ে বল; আমি ওসব শুন্‌তে চাই-নে, আমাকে আসল কথা বল্‌তে হবে।

এই বলিয়া ছেলেটীকে বিছানায় রাখিয়া দিলেন। রাখিয়া দিলেই, সে একটু কাঁদিয়া উঠিল; তাহাকে আবার ঘুম পাড়াইবার জন্য গৃহিণী তাহার পার্শ্বে শয়ন করিলেন। শয়ন করিয়া "যাদু ঘুম যায়, গোপাল যায়, সোণা ঘুম যায়" ইত্যাদি ঘুন ঘুন করিয়া গাইতে লাগি-লেন। শিবচন্দ্র এই অবকাশে বিছানার এক ধারে বসিয়া ব্রাহ্মণীকে কি বলিয়া ফাঁকি দিবেন, সেই কথা ভাবিতে লাগিলেন। বালক নিদ্রিত হইলে, রন্ধনাদি করিবার জন্য ব্রাহ্মণী উঠিয়া, পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এখন, কথাটা কি বল, শুনে যাই।"

শিবচন্দ্র তখনও কি বলিবেন, ঠিক করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তিনি উত্তর করিলেন,—"আর কতবার বোল্‌বো? একবার তো বলেছি।"

ব্রাহ্মণী।—যেখানে বসে আছ, সেইখানে বসে বোল্‌ছো?

শিবচন্দ্র 'হাঁ' বলিবেন, এমন সময়, তাঁহার পার্শ্বে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া ছেলেটীকে দেখিয়া, সেটী যে সেই বিছানায় আছে—এই কথা মুহূর্ত্তে উপলব্ধি করিয়া, কহিলেন,—"রাম রাম, সাট সাট, না না, তা নয়।"

ব্রাহ্মণী।—তবে কি বল! বোল্‌তেই হবে, আমি না শুন্‌লে এখান থেকে নড়্‌ছি-নে।',

শিবচন্দ্র উপায়ান্তর না দেখিয়া সত্য কথাই কহিলেন। বলিলেন,—"ও পাড়ার বাঁড়ুয্যেদের বাড়ী জয়গোপাল নামে একটী ছেলে ছিল—তা তোমার মনে আছে?"

ব্রাহ্মণী।—তা আর মনে থাক্‌বে না? সে ত সেদিন মরে গেল! আহা, ছেলেটী বড় ভাল ছিল!

শিবচন্দ্র।—সেদিন বটে; কিন্তু হিসেব কল্লে, সেও ষোল-সতর বৎসর হয়ে গিয়েছে। সেই জয়গোপাল বাল্যকালে সর্ব্বদা পীড়িত থাকিত। সুতরাং আমাদের জমীদার জয়গোপাল যখন স্কুল থেকে এন্‌ট্রান্স পাশ করেন, তখন সে নীচের ক্লাসে পড়িত। বয়স কিন্তু উভয়েরই একরূপ। সে জয়গোপাল এন্‌ট্রান্স দিয়েই পাঁচ বৎসর মধ্যে বি এল্‌ হ'লো, ; আর আমাদের জমীদার বৎসর দুই ফেল হতে লাগলেন, অবশেষে তাঁহার পিতা আর খরচ কুলাইতে অপারক হইয়া উঠিলেন। তখন জয়গোপালকে চাকরীর চেষ্টা দেখিতে কহিলেন। এমন সময়, ওপাড়ার জয়গোপালের সেই বাল্যব্যাধি প্রবল হইয়া, মৃত্যু হইল। তখন আমাদিগের জমীদার মহাশয় কহিলেন,—যদি আমি যোগাড় করিয়া তাহার পাশের সার্টিফিকেটটী আনিয়া দিতে পারি, তাহা হইলে তিনি আমাকে ১০০্‌ শত টাকা ও সেই জয়গোপালের পিতাকে ২০০্‌ শত টাকা দিবেন। আমি তো নিজে কিছু লইলাম না; জয়গোপালের পিতাও, টাকার প্রস্তাব শুনিয়া, 'ছি ছি' করিতে লাগিলেন। কহিলেন,—'এমন সোণার ছেলে গেল; তবে তার সার্টিফিকেটে আমার ফল কি? এই নিয়ে যাও সার্টিফিকেট—যে চায়, তাকে দাও গিয়ে। আর টাকার কথা ব'লো না। কোথায় আমার সর্ব্বস্বধন কৃতবিদ্য পুত্র, আর কোথায় দুই শত টাকা? ছি ছি! আমি তাঁহার কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। কিন্তু দুঃখ করিয়া আর তো কোন ফল নাই। আমি কহিলাম,—'মহাশয়, আপনি যাহা বলিলেন, সে আপনার ন্যায় মহাশয় ব্যক্তিরই যোগ্য বটে। আমাকে এক শত টাকা দিতে চাহিয়াছিলেন, আমি তাহা তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া ফেলিয়া দিয়াছি।'

গৃহিণী।—আহা, সেই এক-শো টাকা যদি নিতে, তাহলে কি এত দুঃখ থাক্‌তো? আর মনে কোল্লে ও দু'শও নিতে পার্‌তে। আনায়াসে বল্লেই হতো, জয়গোপালের বাপ নিয়েছে।

শিব।—ছি! একথা তোমার মুখ দিয়ে বেরুবে, তাও আমি মনে করি-নি!

গৃহিণী।—(লজ্জিত হইয়া) না না, আমি তা বল্‌ছি না; তবে কিনা, এমন অবস্থায় আর কেউ ছাড়ে না। এখন, তারপর!

শিব।—তারপর, আমি সেইখানে খানিক ব'সে থেকে বোল্লাম,—'ম'শায়, আর একটী নিবেদন আছে। যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তিনি দুঃখে ও লজ্জায় নিজে আস্‌তে পারেন-নি; আমাকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছিলেন—মহাশয় যদি কৃপা করে সার্টিফিকেটখানা দেন, তা হলে যেন একথা কাহারো নিকট প্রকাশ না হয়।' শুনিয়া, মৃত জয়গোপালের পিতা কহিলেন,—'ছি ছি, একথা কি কেহ প্রকাশ করে? বিশেষ, আইনে ইহাতে উভয়েরই সমান দণ্ড। আইনে থাক আর না থাক, গোপাল বোল্‌তো—বাবা, পরীক্ষার সময় যে বলে দেয়, আর যে সেই বলা কথা লেখে, উভয়কেই তাড়াইয়া দেয়।' তখন আমি কহিলাম,—'মহাশয়, আমার আর এক শেষ নিবেদন আছে। যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, তিনি আমাকে আপনার নিকট বলিতে বলিয়াছেন, যে,—একঘর ব্রাহ্মণ স্থাপন করিলে ও তাহাদিগকে পুরুষানুক্রমে

ভরণ-পোষণ দিলে যে পুণ্য হয়, আপনার ঠিক তাহাই হইবেক। আর তিনি বলিয়া দিয়াছেন যে,—তিনি চিরকাল আপনাকে পিতৃবৎ স্নেহ করিবেন; এবং ভিক্ষাস্বরূপ চাহিয়াছেন, আপনি যেন তাঁহাকে একটু স্নেহের চক্ষে দেখেন।' জয়গোপালের পিতা উত্তর করিলেন,—'হাঁ, হাঁ, ভাল, ভাল!' ইহার পর আমি সার্টিফিকেটখানি আনিয়া জয়গোপালকে দিলাম, এবং সেই সহ তিন শত টাকাও ফিরিয়া দিলাম। জয়গোপাল উহা পাইয়া, আহ্লাদে গদগদ হইয়া, আমার পায়ে গড়াইয়া পড়িলেন। সমস্ত কথাই তো কহিলাম; খবরদার, ইহা যেন প্রকাশ না হয়!

গৃহিণী চিবুকে মুষ্টি সংলগ্ন করিয়া কহিলেন,—"আ আমার পোড়া কপাল! এরি নাম পাশ দেওয়া, আর এরি নাম উকীল হয়ে রোজগার করা! আর এরি জন্য ওর মায়ের এত গরিমা, এরি জন্য ওর বৌয়ের পাতে বড়-মাছখানা দেওয়া? ছি, ছি, আমার ছেলে যেন অমন পাশ না হয়। কিন্তু তুমি বোকা, কিছু বোঝ না; আমি হ'লে মাসে মাসে ওর কাছ থেকে টাকা নিতাম, আর নিজে কিছুই করতাম না।"

শিবচন্দ্র।—অত চেঁচিও না। একথা যেন কোনরূপে প্রকাশ না হয়।

গৃহিণী।—হ্যাঁ, আমি তোমার মতন বোকা কি না, যে একথা লুকিয়ে রাখবো? আমি বোল্‌বোই বোল্‌বো।

তখন শিবচন্দ্র নানাবিধ মিনতি করিয়া গৃহিণীকে চুপ করাইলেন। গৃহিণী কি তথাপি শুনেন? তিনি নানাবিধ পূর্ব্ব-কথা স্মরণ করিয়া, তাহার উপর টীকা-টিপ্পনী করিতে লাগিলেন,—"আ আমার গয়না! এমন গয়নার মুখে ছাই। আ আমার বেনারশী চেলি।" ইত্যাদি। পরিশেষে যখন ব্রাহ্মণী চুপ করিলেন, তখন কহিলেন,—"এটা ঠিক কাল আমার এককড়ী যে গল্প পড়িতেছিল, ঠিক তারি মতন।"

শিব।—কোন গল্প?

গৃহিণী।—ঐ সেই ময়ূরপুচ্ছ, আর একটা কাকের গল্প।

শিব।—এ ঠিক তাই বটে। কিন্তু খবরদার, একথা যেন প্রকাশ না হয়। একথা যতদিন নিজের পেটে থাকে, ততদিনই জোর থাকে; প্রকাশ হলে আর জোর থাকে না। মনে কর, এখন আমি জয়গোপাকে যা বলিব, সে তাই করিবে—একবার প্রকাশ হলে তো আর সেরূপ করবে না?

গৃহিণী।—একথা কি আর কেউ জানে না, যে আমি প্রকাশ না কোল্লে গোপনীয় থাক্‌বে?

শিব।—জান্‌বার মধ্যে দুই জয়গোপালের পিতা, আর আমি; আর আজ তুমি জান্‌লে, খবরদার প্রকাশ ক'রো না।

গৃহিণী।—না, আমি প্রকাশ ক'রবো না। আমার প্রকাশ করায় ফল কি! আর কারই সঙ্গে বা প্রকাশ ক'রবো? কখনও লোকালয়ে যাই-নে; যাবার মধ্যে পুকুর-ঘাট, আর বাড়ী। আর কি কোন যায়গায় যাবার যো রেখেছ যে যাব?

শিবচন্দ্র টের পাইলেন,—একথা গহনার কথায় পরিণত হইবে! তখন তিনি কহিলেন,—"আবার সেই পুরাণ কথা পাড়্‌লে, যা নিয়ে এত হ্যাঙ্গম-হুজ্জুত হয়ে গেল?"

গৃহিণী।—না-না, তা আর পাড়্‌বো না। তবে মনে করে দেখ দেখি, লক্ষ্মী বেটী কি কাণা? কাকে দেয়, কাকে না দেয়, একবার চোক মেলে দেখে না?

শিব।—আচ্ছা যাও, এখন রাঁদো গিয়ে।

"যাই, রাঁদি গিয়ে,—রাঁদ্‌তে তো হবেই। রাঁধবার জন্যে পৃথিবীতে জন্ম, রেঁধে রেঁধে মৃত্যু। দেখো, যেন ছেলেটা না জাগে।"

—এই বলিয়া গৃহিণী তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

গুপ্তকথা।

পৃথিবীতে এরূপ কোন পদার্থ দেখা যায় না, যাহার সহিত অন্যান্য অল্প বা অধিক সংখ্যক পদার্থের সংশ্রব নাই। একটা সামান্য দ্রব্য প্রস্তুত করিতে হইলেই, আর পাঁচ সাতটা অথবা ততোধিক দ্রব্যের প্রয়োজন হয়। তাহার আবার এক একটা কোথা হইতে আইসে, কোন পথে আইসে, ও আসিবার সময় কত কত লোকের সংসর্গ ভোগ করে, তাহা ভাবিয়া দেখিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়। মানব-জীবন সর্ব্বাপেক্ষা সংশ্রব-জালে জড়ীভূত। ভাবিয়া দেখিতে গেলে, একটীমাত্র মানব-জীবনের সহিত, অপর কত মানব-জীবনের, অন্যান্য প্রাণীগণের জীবনের, উদ্ভিদ-জীবনের ও অচেতন পদার্থের সংশ্রব আছে, তাহা গণনা করিয়া বলা যায় না। বিবেচনা করিয়া দেখ, সামান্য শাকান্ন আহার করিতে হইলে কত জীব ও নির্জ্জীবের আশ্রয় লইতে হয়। প্রথমতঃ জমী আছে, তাহার সার আছে, হলাকর্ষণ আছে, লাঙ্গল-নির্ম্মাতা কর্ম্মকার আছে, লোহার খণি আছে, খণি হইতে লৌহ উঠাইবার লোক আছে, জাহাজে করিয়া সে লৌহ আনা চাই, সে জাহাজ কত লোকে প্রস্তুত করে, কত লোকই বা তাহাকে সমুদ্রে পরিচালন করে? বোধ হয়, হাজার লোকের সাহায্য-ব্যতীত একথালা শাকান্ন প্রস্তুত হয় না। আচ্ছা, অন্যান্য সমস্ত কথা ছাড়িয়া দেও। কেবল মাত্র ইহাই বিবেচনা করিয়া দেখ, বাল্য-কাল হইতে যৌবনকালে আরূঢ় হইতে কত শত মনুষ্যের সহিত সংশ্রবে আসিতে হয়? বাল্য সঙ্গী, পাঠশালার সঙ্গী অপরাপর কত সঙ্গীর সঙ্গে থাকিতে হয়। অতএব, রেলওয়ে-ভ্রমণ মানব-জীবনের একটী ক্ষুদ্র উপমাস্থল বলা যাইতে পারে। দশজনে এক ষ্টেসনে উঠিল। এক এক জন করিয়া এ-ষ্টেসন ও-ষ্টেসন ক্রমে ক্রমে নামিয়া পড়িয়া নানাবিধ পথে চলিয়া গেল। শেষে কেবলমাত্র দুই জন রহিল। হয় তো তাহারও মধ্যে এক জন তোমার শেষতম ষ্টেসনে পৌঁছিবার অব্যবহিত পূর্ব্বের ষ্টেসনে নামিয়া পড়িল। এদিকে ঐ ট্রেণে আসিতে আসিতে অন্যান্য ষ্টেসনে যাহারা আরোহণ করিয়াছে, এবং যাহাদিগের সহিত তোমার অল্প-বিস্তর আলাপ হইয়াছে, তাহাদিগকে রাখিয়া তুমি তোমার আপন ষ্টেসনে নামিয়া পড়িলে। গাড়িতে তোমার যে কয়েক জনের সহিত আলাপ হইয়াছিল, তাহারা দু'এক ষ্টেসন পর্য্যন্ত তোমার কথা কহিল; বলিল,—এ লোকটী বড় ভাল, অথবা বড় মন্দ। ক্রমে ক্রমে তাহারা নামিয়া গেলে, তোমাকে কখনও দেখিয়াছে বা চিনিয়াছে, এমন কোনই লোক রহিল না।

মনুষ্য-দেহ ভবসাগরে ভাসিয়া যাইতেছে। বড় ছোট, জানিত অজানিত, অধিক-জানিত বা অল্প-জানিত, সকলেই সেই স্রোত-বেগে চলিতেছে। ইহলোকে যাহাদিগের সহিত পরস্পর দেখা হয় নাই, পরলোকেও হইবে না। সে অর্ণবে যে আগে পড়িয়াছে, সে আগে ভাসিয়া যাইবে; যে পরে পড়িয়াছে, সে পরে ভাসিয়া যাইবে। প্রথম জোয়ারে যে কাষ্ঠখণ্ড ভাসিয়া গিয়াছে, তাহার সহিত শেষ জোয়ারে ভাসমান কাষ্ঠখণ্ডের কি কখনও সাক্ষাৎ হইতে পারে? বেদব্যাস কত অগ্রে ভবসাগরে দেহ ঢালিয়া দিয়াছেন। কালিদাস শকুন্তলায় ভর দিয়া তাহার কত পরেই সেই সাগরে ঝাঁপ দিয়াছেন। এই দুই মহা মনীষির কি কখনও পরস্পর সাক্ষাৎ হইবেক? বাঙ্গালা উপন্যাস-লেখকেরা কি স্কটকে জোরে সাঁতার দিয়া ধরিতে পারিবেন, না করিবা আর কালিদাসকে ধরিতে পারিবেন?

আমার জীবনী লিপিবদ্ধ করিতে গিয়া অন্যান্য অনেক লোকের জীবনীর অল্প-বিস্তর লিপিবদ্ধ করিতে হইয়াছে। যাহার জীবনের সহিত যে সময়ে আমার জীবনের সংশ্রব আছে, তাহার জীবনের সেইটুকু মাত্র পরিগৃহীত হইয়াছে। প্রত্যেক জীবনের আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিতে হইলে, একজনের পরমায়ুতে কুলায় না। কাহার সহিত কোন্ দিবস কোন্ ঘটনা-উপলক্ষে সংশ্রবে আসিয়াছি, তাহা বলা যায় না। এরূপ ঘটনাও হইয়াছে যে, কোন কোন লোক—যাহাদিগের সহিত আমার চাক্ষুস-সম্বন্ধও হয় নাই—তাহাদিগের কথাও লিখিতে হইয়াছে। এ সমস্ত অবশ্যই পরের মুখে শুনিয়া লেখা। লিখিবার প্রয়োজন এই যে, সে সমস্ত না বুঝিলে, আমার নিজ-জীবনের অনেক অংশ বোঝা কঠিন হইয়া উঠিবে। শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত আমার কখনও সাক্ষাৎ হয় নাই। তাঁহার নাম-মাত্র আমি অবগত আছি। কিন্তু তাঁহার মুখ কখনও আমি দেখি নাই। কিন্তু জয়গোপালের সহিত আমার সংশ্রব থাকায় এবং জয়গোপালের সহিত শিবচন্দ্রের সংশ্রব থাকায়, শিবচন্দ্রের কথা লিখিতে হইল। না লিখিলে জয়গোপালের জীবনী বুঝা যাইত না। জয়গোপালের জীবনী না বুঝিলে আমার জীবনী বুঝা কঠিন হইত। কাহার জীবনের কোন্ ঘটনায় অপরাপর কত লোকের জীবনের পরিবর্ত্তন হয়, তাহা কাহার সাধ্য বলে? গ্রহ-উপগ্রহগণের দৃষ্টিতে মানবের শুভাশুভ ঘটনা হয়। কোথায় বা সেই গ্রহ-উপগ্রহ, আর কোথায় বা এ ক্ষুদ্র মনুষ্য-জীবন। যদি শত শত যোজনান্তে থাকিয়া সেই নির্জ্জীব গ্রহ-উপগ্রহ মনুষ্যের শুভাশুভের কারণ হইতে পারে, তবে যে মনুষ্য-মণ্ডলীতে আমরা বাস করি, তাহাদিগের

কার্য্যকালে আমাদিগের স্ব স্ব কার্য্য পরিবর্ত্তিত বা রূপান্তরিত হইবে না কেন? ডাইন তো মনুষ্য? তাহার দৃষ্টিতে আমাদিগের শুভাশুভ ঘটে, তবে আমাদিগের দৃষ্টিতে বা কার্য্যগুণে রাম-শ্যামের, অথবা রাম-শ্যামের দৃষ্টিতে বা কার্য্যগুণে আমাদিগের, শুভাশুভ ঘটিবে না কেন? যাহাই হউক, এ সমস্ত গুহ্য রহস্য পর্য্যালোচনা করা আমার আপাততঃ উদ্দেশ্য নহে। তবে কথায় কথা ওঠে, এইজন্য এ স্থানে এ অপ্রাসঙ্গিক কথার উল্লেখ করা গেল।

শিবচন্দ্র যখন জয়গোপালের গুহ্য কথা নিজ-স্ত্রীকে বলিলেন, তখন মনে করেন নাই যে, সে কথা প্রকাশ হইয়া পড়িবে। তাঁহার ইচ্ছাও ছিল না যে, তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে; কারণ, তাঁহার হাতে যতক্ষণ সে গুহ্য কথা থাকিবে, ততক্ষণ তিনি তাহার ফল পাইবেন—ততক্ষণ ইন্দ্রের হস্তস্থিত বজ্রের ন্যায় অথবা রাবণের মৃত্যুশরের ন্যায় এগুহ্য তাঁহারই উপকার করিবে। তিনি সেই বজ্রের বা বাণের ভয় দেখাইয়া, যখন যাহা ইচ্ছা তাহাই, জয়গোপালের দ্বারা সাধিত করিয়া লইতে পারিবেন। কিন্তু দশ জনে জানিতে পারিলে, তাহাদিগের প্রত্যেকেই তাহার ফল-ভোগ করিতে চেষ্টা করিবে; পরে সকলে জানিতে পারিলে, তাহাতে আর কোন ফল ফলিবে না। এক ব্যক্তির যে দ্রব্য আছে, তাহাতে যদি অপরের প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে সে ব্যক্তি যে মূল্যে ইচ্ছা, সেই মূল্যে বিক্রয় করিতে পারে। শিবচন্দ্র মনে করিয়াছিলেন, এই গুহ্য কেবলমাত্র তাঁহার হস্তে থাকায়, তিনি অপর পাঁচ জনের হিতের জন্য সে গুহ্যের আশ্রয় লইবেন; তদ্দ্বারা তাঁহারও উপকার হইবে, এবং অপর পাঁচ জনেরও উপকার হইবে। সে গুহ্য অনেকের হস্তগত হইলে কাহারও কোন উপকার হইবে না। যেমন

বাহু বিনা লোকের প্রাণরক্ষা হয় না, কিন্তু সে বাহু এত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় যে, তাহার কোনই মূল্য নাই।

কিন্তু শিবচন্দ্রের পত্নী এ সমস্ত কথা বুঝিবেন কি প্রকারে? তিনি জয়গোপালের পিতাকে তাঁহারই ন্যায় দরিদ্র অবস্থায় দেখিয়াছেন, জয়গোপালের বাল্যাবস্থায় ও পঠদ্দশায়ও তাঁহাদিগকে সেইরূপ দেখিয়াছেন। ইদানীং হঠাৎ তাঁহাদিগকে বড়-মানুষ দেখিয়া তাহার হিংসা বড় কমও হয় নাই। এত কালের পর, তাঁহাদিগের বড়-লোক হইবার গুহ্যকথা তাঁহার হস্তগত হওয়ায় তিনি যে সে কথা গোপনে রাখিবেন, ইহা কোন মতেই সম্ভবপর নহে। পরদিবস প্রাতে পুখুরঘাটে গিয়া, নিয়ত যেরূপ হইয়া থাকে, সেইরূপ অদ্য অপরাপর পাঁচ জন স্ত্রীলোকের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। কথাটা সমস্ত রাত্রি যে কিরূপে হজম করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহা বলা যায় না। কারণ, তাহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ হইলেই, কহিলেন,—"ও দিদি, আর এক নূতন কথা শুনেছিস্?"

সকলে ব্যগ্র হইয়া কহিল,—"কি নূতন কথা ভাই! আমরা আর কোথা থেকে নূতন কথা শুন্‌বো? কি ভাই, বল-না?"

"না ভাই, আমি তা বোল্‌বো না। কিন্তু কথাটা নূতন বটে, আমাকে মাথার দিব্বি দিয়ে বারণ করে দিয়েছে।"

কিন্তু সকলকেই অত্যন্ত ব্যগ্র দেখিয়া এবং সকলেই মাথার দিব্য দেওয়ায়, শিবচন্দ্রের স্ত্রী প্রথমতঃ তাঁহাদিগকে প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইলেন যে, কেহই সে কথা প্রকাশ করিবেন না। তাঁহারা যথাবিধি দিব্য করিলে, শিবচন্দ্রের স্ত্রী স্বামীর মুখে যাহা শুনিয়াছিলেন, সে সমস্ত সালঙ্কৃত করিয়া বর্ণনা করিলেন। কন্যা-দান করিবার সময় সালঙ্কৃত দান করিতে হয়, এরূপ দান করা শাস্ত্রের বিধান। গুপ্তকথা দান করিতে হইলেও, সকলে অলঙ্কার দিয়া দান করিয়া থাকে। পুরুষেরাও এরূপ করিয়া থাকেন; স্ত্রীলোকেরা ত সর্ব্বদা অলঙ্কারের কথা লইয়াই থাকে! সুতরাং তাহারা যে দুই-একখানা অধিক অলঙ্কার দিবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? শিবচন্দ্রের স্ত্রী অপরাপর অলঙ্কারের মধ্যে এই একখানি দিলেন যে,—জয়গোপালের খুড়া অতি অল্প দিনের মধ্যেই নিজের জমী তো লইবেনই লইবেন, অধিকন্তু জয়গোপালের নামে নালিশ করিয়া তাঁহাকে জেলে দিবেন।

কথাটী গোপনে রাখিবেন প্রতিজ্ঞা করা সত্ত্বে, রমণীগণ গৃহে প্রত্যগত হইবামাত্রই নিজ-নিজ স্বামীকে সে কথা জানাইলেন। বোধ হয়, ভাবিলেন,—স্বামী স্ত্রীর অর্দ্ধ-অঙ্গ মাত্র, সুতরাং তাঁহাদিগকে একথা বলায় তাঁহাদিগের প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ করা হইল না।

যোগ ও যোগানুষ্ঠান। *

পূর্ব্বোক্ত পরিচ্ছেদ-সকল দ্বারা যোগশাস্ত্রের যথাযথরূপে পর্য্যালোচনা করা হইয়াছে। সম্প্রতি ভক্তিযোগোল্লিখিত ভক্তি যে উৎকৃষ্ট পদার্থ, তদ্বিষয়ের সমালোচনার্থে এ অধ্যায়ের অবতারণা করা হইতেছে।

ভক্তি-শব্দের অর্থ, সাধারণতঃ ধাত্বর্থ দ্বারা সেবা-মাত্রই প্রতীতি হয়। গারুড়ের ২৩১ অধ্যায়ে লিখিত আছে,—

"ভজইত্যেষবৈধাতুঃ সেবায়াং পরিকীর্ত্তিতিঃ।
তস্মাৎ সেবাবুধৈঃ প্রোক্তা ভক্তিঃ সাধনভূয়সী॥"

অর্থ,—'ভজ' এই ধাতু সেবার্থ কথিত হয় (যথা—ভজশৃঙ্গসেবায়াং গণঃ); অতএবই পণ্ডিতগণ ভক্তিকে সেবা কহেন। সেই সেবা ঈশ্বরের বিবিধপ্রকার সাধনাত্মিকা জানিবে।

* পূর্ব্ব-সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর।

"সত্ত্ব এবৈক মনসো বৃত্তিঃ স্বাভাবিকীতুযা।
অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী॥"

কাপিলেয় তন্ত্র, ৩৬।

অর্থ,—সত্ত্বগুণে যে মুনের স্বাভাবিক বৃত্তি হয়, তাহাই অহৈতুকী (নিষ্কামা) ঈশ্বর ভক্তি-রূপে পরিণতা হয়। সেই ভক্তি, সিদ্ধি হইতেও গুরুতরা বটে।

"দেবতায়াঞ্চ মন্ত্রেচ তথামন্ত্রপ্রদে গুরৌ।
ভক্তিরষ্টবিধাযস্য তস্য কৃষ্ণঃ প্রসীদতি॥"

গৌতমীয় তন্ত্রে।

অর্থ,—ঈশ্বরে ও ঈশ্বরের সাঙ্কেতিক সঙ্গীতে (মন্ত্রে বা প্রণবাদিতে) এবং ঈশ্বরোপদেষ্টা গুরুতে যাঁহার নিম্নলিখিত ৮ প্রকার ভক্তি জন্মে, তাঁহাতে ঈশ্বর প্রসন্ন হয়েন।

"তদ্ভক্তজনবাৎসল্যং পূজায়াঞ্চানুমোদনং।
সুমনা অর্চ্চয়েন্নিত্যং তদর্থে দম্ভবর্জনং।
তৎকথাশ্রবণেরাগস্তদর্থে চাঙ্গবিক্রিয়া।
তদনুস্মরণং নিত্যং যস্তন্নাম্নোপজীবতি।
ভক্তিরষ্টবিধাহ্যেষা যস্মিন্ ম্লেচ্ছেপিবর্ত্ততে।
সমুনিঃ সত্যবদিচ কীর্ত্তিমান্ সভবেন্নরঃ॥"

গৌতমীয় তন্ত্র।

অর্থ,—ঈশ্বর-পরায়ণের প্রতি অকৃত্রিম দয়া, ঈশ্বরের গুরুতর প্রতিক্রিয়াতে (পূজায়) অনুমোদন, নিবিষ্টমনা হইয়া প্রতিদিন ঈশ্বর-পূজন (প্রীতিজনক কার্য্য-করণ), ঈশ্বরের নিমিত্তে দম্ভবর্জন, ঈশ্বর-কথা শ্রবণে অনুরাগ, ঈশ্বরার্থে শারীরিক বৈকৃত্য (অষ্টাঙ্গ প্রণামার্থ শরীর-চালনা), ঈশ্বরের অনবরত অনুস্মরণ, এবং ঈশ্বর-নামের উপর নির্ভর করিয়াই প্রাণ-ধারণ করা—এই আটপ্রকার ভক্তি যদি সর্ব্বাচারবিহীন ম্লেচ্ছেও বিদ্যমান থাকে, তবে সেই ম্লেচ্ছই মননশীল মুনি, সত্যবাদী এবং কীর্ত্তিমান হয়, সন্দেহ নাই।

অদ্বৈতবাদীদিগের মতে, ভক্তিসাধ্য ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার হইলেই, অভেদজ্ঞান দ্বারা অদ্বিতীয় জ্ঞান ('সোহং' ভাব) সমুদিত হয়। তৎকালে পরব্রহ্ম ও জীবাত্মাতে আর সেব্য-সেবক ভাব থাকে না। আরাধ্য ব্রহ্ম ও আরাধক জীব এক হইয়া পড়ে। ইহাকেই নির্ব্বাণ বা সমাধি বলে। এই মতের পোষক পরমকারুণিক মহেশ্বর শঙ্কর হইতে পরজন্মা শঙ্করস্বামী পর্য্যন্ত সম্প্রদায়-প্রবর্ত্তক মহাত্মাগণ।

দ্বৈতবাদে নির্ব্বাণাদি মুক্তিকে উপেক্ষা করিয়াও ঈশ্বর-সেবাকেই পরম পুরুষার্থ জ্ঞান করে। এই মতে, সেব্য-সেবক-ভাব বিরাজিত থাকিয়াও, নিত্যসিদ্ধাবস্থাই নির্ব্বাণের প্রকারতা-ভেদমাত্র বোধ হয়। ভগবান কৃষ্ণ, শুক, নারদ প্রভৃতি হইতে রামানুজ স্বামী পর্য্যন্ত এই মতের পরিপোষক। উভয়মতে পরস্পর বাদানুবাদও চিরপ্রসিদ্ধ রহিয়াছে। অদ্বৈতবাদে শত-দূষণাত্মক "শতদূষণী" গ্রন্থকে শঙ্করাচার্য্য "সহস্র দূষণী দ্বারা" তন্নতন্নরূপে খণ্ডন করিয়া অদ্বৈতবাদ স্থাপন করিয়াছেন। উভয় মতের বিরোধ-প্রদর্শন এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। ভক্তির প্রাধান্য লিখিতে হইলেই, দ্বৈতবাদীর মতের অনুস্মরণ না করিলে সুচারুরূপে তাহা সম্পন্ন করা যাইতে পারে না; অতএব তন্মতাবলম্বন করিয়াই প্রবন্ধের পূরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ভাগবতে সপ্তম-স্কন্ধে প্রহ্লাদোক্তিতে নববিধা ভক্তি উক্ত হইয়াছে,—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনং।
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়তে ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেধীতমুত্তমং॥"

অর্থ,—ঈশ্বর-কথা শ্রবণ; ঈশ্বর-নামকীর্ত্তণ; ঈশ্বরের স্মরণ (ধ্যান); ঈশ্বরের চরণ সম্বাহণ-ভাবন; ঈশ্বরপূজন (প্রীতিজনক কার্য্যকরণ); ঈশ্বরোদ্দেশে নমস্কার; ঈশ্বরের দাসভাব মনন; ঈশ্বরে সখ্যভাব; ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ। পুরুষ-কর্ত্তৃক কথিত নববিধ ভক্তি ঈশ্বরে অর্পিতা হইলে ঈশ্বরে সুপ্রসন্ন বর্ত্ত করা হয়, এবং

তাঁহারই ঈশ্বর-বিষয়ে প্রকৃত অনুশীলন। 'পদ্মপুরাণে' উক্ত আছে,—

"শ্রবণং কীর্ত্তনঞ্চাস্য স্মরণং মহতাং গতেঃ।
সেবেজ্যাবনতির্দ্দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনং ॥"

অর্থ,—সেই মহাত্মাদিগের গতিস্বরূপ পরমেশ্বরের শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, সেবন, পূজন, নমস্কার, দাসতা, সখ্যভাব, এবং আত্মনিবেদন, এই নয় প্রকার ভক্তি জানিবে।

পদ্মপুরাণের কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যের যম-ধূম্রকেতু সংবাদে উক্ত হইয়াছে,—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং পূজা সর্ব্বকর্ম্মার্পণং স্মৃতিঃ।
পরিচর্য্যা নমস্কারঃ প্রেমঃ স্বাত্মসমর্পণং ॥"

অর্থ,—শ্রবণ, কীর্ত্তন, পূজা, ঈশ্বরে কর্ম্ম-সমর্পণ, স্মরণ, পরিচর্য্যা, নমস্কার, প্রেম, আত্মসমর্পণ, এই নববিধা ভক্তি।

ভক্তির লক্ষণ।—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু সন্দর্ভে উত্তমা ভক্তির লক্ষণ উক্ত হইয়াছে। যথা,—

"অন্যাভিলাসিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতং।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥"

অর্থ,—অন্যাভিলাষশূন্য অর্থাৎ আরাধ্য দেবাতিরিক্ত দেবতায় কিম্বা আরাধ্যের প্রীতি ব্যতীত অন্য কামনায়, বাঞ্ছারাহিত্য জ্ঞান (অদ্বৈতভাব) ও কর্ম্ম (সকাম কর্ম্মাদি) দ্বারা অনাবৃত এবং অনুকূলভাবে (প্রতিকূলভাবে আসুরিক অনুষ্ঠান হয়) ঈশ্বরে অনুশীলনই উত্তমা ভক্তি। (এই শ্লোকের অর্থ রসামৃত সিন্ধুর টীকাতে বহুবিস্তৃত ও দুরূহভাবে বর্ণিত আছে; বাহুল্য ও বৈরস্য-ভয়ে ত্যক্ত হইল।) নারদ-পঞ্চরাত্রে উক্ত আছে,—

"সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলং।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ সেবনং ভক্তিরুচ্যতে ॥"

অর্থ,—সর্ব্বোপাধি-বিবর্জ্জিত অর্থাৎ অন্যাভিলাষশূন্য ও অন্যবাঞ্ছারাহিত্য, ঈশ্বরপরত্বে নির্ম্মল অর্থাৎ জ্ঞানকর্ম্মাদি দ্বারা অনালিঙ্গিত এবং ইন্দ্রিয় দ্বারা ইন্দ্রিয়াধীশ্বরকে সেবা করাই ভক্তি বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

শ্রীভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—

"অহৈতুক্যব্যবহিতা যাভক্তিঃ পুরুষোত্তমে।
সালোক্য সার্ষ্টি সামীপ্য সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত ॥
দীয়মানং নগৃহ্ণন্তি বিনামৎসেবনং জনাঃ ॥"

অর্থ,—অহৈতুকী অন্যাভিলাষশূন্যা, অব্যবহিতা জ্ঞান-কর্ম্মাদ্যনাবৃতা যে ভক্তি পরমেশ্বরে অর্পিত হয়, তদ্ভক্তিযুক্ত জনকে, সালোক্য (দেবলোকগমিতা) সার্ষ্টি (দেবসমানগতি) সারূপ্য (দেবসমানরূপতা) সামীপ্য (দেবসান্নিধ্যগমন) একত্ব (দেবের সহিত ঐক্য) ঈদৃশ মুক্তি প্রদত্ত হইলেও তাঁহারা ঈশ্বর-সেবন ব্যতীত ঐ মুক্তি ইচ্ছা করেন না।

ভক্তিপ্রভেদ।—পূর্ব্বোক্ত লক্ষণাক্রান্ত উত্তমা ভক্তি ষড়বিধা। যথা,—

"ক্লেশঘ্নী শুভদামোক্ষলঘুতাকৃৎ সুদুর্ল্লভা।
সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণীচসা ॥"

অর্থ,—ক্লেশঘ্নী, শুভদা, মোক্ষলঘুতাকৃৎ, সুদুর্ল্লভা, সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা, শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণী—এই ৬ প্রকার ভক্তি জানিবে।

"ক্লেশাস্তু পাপং তদ্বীজং অবিদ্যাচেতিতস্ত্রিধা।'

ক্লেশঘ্নী ভক্তি প্রদর্শিত হইতেছে। পাপ, পাপের কারণ, অবিদ্যা (অজ্ঞান) ভেদে ক্লেশ তিন প্রকার। এই ত্রিবিধ ক্লেশ-বিনাশিনীর নাম ক্লেশঘ্নী।

"শুভানি প্রীণনং সর্ব্বজগতামনুরক্ততা।
সদ্‌গুণাঃ সুখমিত্যাদীন্যাখ্যাতানি মণীষিভিঃ ॥"

শুভদা ভক্তি; যথা,—সমুদয় জগতের প্রীতিজনন, সর্ব্বানুরক্ততা কিম্বা ঈশ্বরানুরাগ এবং সদ্‌গুণ-সকলকে, মনস্বীগণ সুখ বলেন। এই তিন সুখপ্রদায়িনী ভক্তিকে শুভদা বলে।

"মনাগেব প্ররূঢ়ায়াং হৃদয়ে ভগবদ্রতৌ।
পুরুষার্থাস্তচত্বার স্তৃণায়ন্তে সমন্ততঃ ॥"

মোক্ষলঘুতাকৃৎ ভক্তি; যথা,—হৃদয়ে ঈশ্বরভাবে প্ররূঢ়া (আবির্ভূতা) ঈশ্বর-বিষয়া রতি হইলে, যে ভক্তির বলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ এই পুরুষার্থ চতুষ্টয়কে তৃণতুল্য জ্ঞান হয়, সেই ভক্তির নাম মোক্ষলঘুতাকৃৎ।

"সাধনৌঘৈরনাসঙ্গৈরলভ্যা সুচিরাদপি।
হরিণা চাশ্বদেয়েতি দ্বিধাসা স্যাৎ সুদুর্ল্লভা ॥"

সুদুর্লভা ভক্তি দ্বিবিধা প্রদর্শিত হইতেছে। অনাসঙ্গ, বিষয়াদি ও জ্ঞান-কর্ম্মাদিতে অনালিঙ্গিত সাধন (ইন্দ্রিয় ও প্রীতিকর কর্ম্ম-সমূহ দ্বারা চিরকাল পরেও অলভ্যা); এবং ঈশ্বর-কর্ত্তৃক সহসা অদেয়া (অর্থাৎ বহুসাধনের পরে প্রসন্ন ভগবান্ সে ভক্তি প্রদান করেন)—এই দুই প্রকার সুদুর্লভা ভক্তি জানিবে।

"ব্রহ্মানন্দো ভবেদেষ চেৎপরার্দ্ধগুণীকৃতঃ।
নৈতিভক্তিঃ সুখাম্ভোধেঃ পরমাণুতুলামপি ॥"

সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা ভক্তি; যথা,—ব্রহ্মানন্দকে পরার্দ্ধ সংখ্যায় গুণ করিলেও যেই ভক্তি-সুধা-সাগরের পরমাণুর তুলনা-লাভ করিতে পারে না, তাহার নাম সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা। (ইহা গোস্বামী প্রভুর পক্ষপাত)।

"কৃত্বাহরিং প্রেমভাজং প্রিয়বর্গসমন্বিতং।
ভক্তিবর্শীকরোতীতি শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণী চ সা ॥"

ঈশ্বরপ্রিয়বর্গের সহিত ঈশ্বরকে প্রেমভাগী করিয়া, যে ভক্তি ঈশ্বরকে বশীভূত করে, তাহার নাম শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণী ভক্তি। (ঈশ্বর-সম্পর্কে যে যে স্থানে কৃষ্ণ বিষ্ণু শিব দুর্গা প্রভৃতি নাম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, সেই সেই স্থানে উক্ত নাম-সকল আরাধ্য দেবতার উপলক্ষণ হইয়া স্বমত পোষণ করে; ইহা সর্ব্ব-সম্প্রদায় সিদ্ধান্ত, সুতরাং নাম-নির্দ্দেশাদি দোষাবহ নহে।)

পূর্ব্বোক্ত ষড়বিধা ভক্তি, (১) সাধনভক্তি, (২) ভাবভক্তি, (৩) প্রেমভক্তি-ভেদে ত্রিধা। যথা,—"সাভক্তিঃ সাধনংভাবঃ প্রেমচেতি ত্রিধোদিতা।"

তন্মধ্যে সাধন-ভক্তির লক্ষণ প্রদর্শিত হইতেছে; যথা,—

"কৃতিসাধ্যাভবেৎসাধ্য ভাবাসা সাধনাভিধা।
নিত্যসিদ্ধস্যভাবস্য প্রাকট্যং হৃদিসাধ্যতা ॥"

অর্থ,—ঈশ্বরের সাধনক্রিয়া-সম্পাদনকারিণী ও সাধ্য-ভাবাত্মিকা ভক্তির নাম সাধন-ভক্তি। হৃদয়ে নিত্যসিদ্ধ ভাবের প্রকটতার নাম (বিস্তারের নাম) সাধ্যভাব জানিবে।

"শুদ্ধসত্ত্ব বিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশু সাম্যভাক্।
রুচিভিশ্চিত্তমাস্থণ্য কৃদসৌভাব উচ্যতে ॥"

অর্থ,—যে ভক্তি শুদ্ধ সত্ত্বগুণ বিশেষাত্মিকা ও প্রেম-সূর্য্যের কিরণ-সদৃশ প্রদীপ্তা, এবং যে ভক্তির রুচি (দীপ্তি) দ্বারা চিত্তের নিতান্ত নির্ম্মলতা জন্মে, তাহার নাম ভাবভক্তি জানিবে।

"সম্যঙ্মসৃণিতস্বান্তো মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ।
ভাবঃসএব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমাণিগদ্যতে ॥"

অর্থ,—যে ভাব মনের নিতান্ত নির্ম্মলতা-কারক এবং যে ভাব ঈশ্বর-মমতায় অতিশয় চিহ্নিত হয়, সেই ভাবই যৎকালে নিবীড়ানন্দ-স্বরূপে প্রকাশ পায়, তৎকালে তাহাকে প্রেম-ভক্তি বলে। পূর্ব্বোক্ত ষড়বিধ ভক্তিকে সাধনাদি ভক্তিত্রয় দ্বারা ভেদ করিলে, ভক্তি অষ্টাদশ প্রকার হয়; সুদুর্ল্লভা ভক্তির দ্বিবিধ ভেদ ধরিলে একবিংশতি প্রকার ভক্তি জানিবে।

"কেন?"—তবে শোন!

(সত্যঘটনা-মূলক গল্পোত্তর।)

(১)

সে তখন আমার কোলের কাছে শুইয়া। আমরা দু'জনেই ঘুমাইয়া আছি। এমন সময়, সে হঠাৎ চমকিয়া উঠিল,—"আগুণ—আগুণ! জ্বলে ম'লাম—জ্বলে ম'লাম! জ্বলন্ত লৌহময় পুরুষ—বুক জ্বলে গেল—জ্বলে গেল! ঐ সাপ—ঐ বিছে! ঐ খেলো! নরক—নরক!"

ঘুম-ঘোরে সে তখন এমনই চেঁচাইতেছে। সে চীৎকারে আমারও ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। শশব্যস্তে, আশ্বাস দিয়া, আমি অমনি বলিয়া উঠিলাম,—"ভয় কি—ভয় কি মানদা! এই যে—এই আমি!"

মানদা চমকিয়া উঠিল,—"মা কালী! মা—মা! কই মা! তবে আমার কি হবে মা! তোর চরণে কি স্থান দিবি মা!"

এই বলিতে বলিতে, কি জানি কাহার, চরণ ধরিতে গেল। কিন্তু, পরক্ষণেই, এক দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, কঠোর অগ্নি-দৃষ্টিতে আমার পানে চাহিতে চাহিতে বলিল,—"তুমি!—তুমি! এখানেও তুমি! তুমিই আমার সর্ব্বনাশ করিলে! তুমিই আমার যম—তুমিই আমার নরক!"

এই বলিতে বলিতেই, ঘুম-ঘোরে আবার তাহার চক্ষু বুঁজিয়া আসিল; একটী পাশ ফিরিয়াই, আর একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়াই, সে যেন আবার ঘুমাইয়া পড়িল।

আমি ভাবিলাম,—"অনেক রাত্তির জেগেছে; তাই গরমে অমন হয়ে থাকবে!" এদিকে আমারও চক্ষু তখন ঘুমে ঢুলু-ঢুলু! কাজেই, আর কিছু ভাবিবার বা বলিবার অবসরই পাইলাম না। আমি আবার ঘুমাইয়া পড়িলাম। সে ঘুম ভাঙ্গিতে আমার অবশ্য একটু বেলাই হইয়াছিল।

ঘুম ভাঙ্গিলেই কিন্তু দেখিয়াছিলাম,—মানদা আমার পাশে নাই।

(২)

বাড়ীওয়ালীর নাম বামী। বামী এতদিন আমায় বড়ই আদর করিত। আগে আগে সে কালীঘাটে বা গঙ্গা-স্নানে যাইলে, আসিবার সময়, এটা-ওটা-সেটা কিছু-না-কিছু আমার জন্য আনিতই আনিত। কিন্তু আজ মানদার সঙ্গে সে যখন কালীঘাট হইতে কালী-দর্শন করিয়া আসে, তখন আর আমার সহিত কোন কথাই কহে নাই। একবার একটুখানি সময় ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া, দু'জনে কি ছাই একটু ফুস্-ফুস্ পরামর্শ করিয়াই, তাড়াতাড়ি অমনি প্রসাদের সরাখানা লইয়া, কি জানি কোথায়, সে তখন চলিয়া যায়—বলে,—"কালীঘাটে গিয়ে ও-পাড়ার দাসেদের বড়-গিন্নীর মুখে শুন্‌লেম, আমার বোন-পোর বড়ই ব্যায়ারাম; তাই যাই, একবার দেখে আসি-গে, আর প্রসাদটাও দিয়ে আসি-গে।" মানদা তখন, শরীরটা অসুখ অসুখ করিতেছে বলিয়া, বামীর ঘরের ভিতরই খিল-বন্ধ করিয়া শুইয়া পড়ে। শুনিতে পাই, সে যেন যাতনায় কাঁদিতেছে! তবে তো দেখিতেছি, তাহার বড়ই অসুখ! তবে কি সে আমার বাঁচিবে না? কিন্তু তাহাকে ডাকি, সে উত্তর দেয় না—আমি ডাকিলে আরও কাঁদিয়া উঠে।

এম্‌নি সময়ই বামী ফিরিয়া আসিল। আমি তাহাকে মানদার অসুখের কথা কিছু বলিতে যাইব, মনে করিতেছি, এমন সময়ই হঠাৎ বুঝিলাম,—আমার প্রতি সে যেন বড়ই চটিয়াছে—আমার প্রতি তাহার বড়ই বিরাগ! সে বলিল,—"টাকা-কড়ি তুমি দেবে কি না বল! কুসি আজ (নাম তার কুসুম—বামীর বোন আর কি!) হিসেব করে বল্‌লে,—গহনার চেয়ে সুদ ছাপিয়ে পড়ছে! তা'ছাড়া, যা' শুনে এলাম আজ, তা'তে এখণ যে তুমি কখনও শুধ্‌তে পার্‌বে, তা তো আমার মনেই হয় না! যাই-হোক্ বাপু, অনেক ভাঁড়াভাঁড়ি স'য়েছি; কিন্তু আজ তার টাকা চাই-ই!"

আমার যেন মাথা কাটিল! বামী আমায় আড়ালে যা বলে বলুক, কিন্তু মানদার সাম্‌নেই আজ এই অপমানের কথা! মানদা জানিত না যে, আমার পয়সা নাই—আমি আমার স্ত্রীর গহনা বন্ধক দিয়া তাহার কাছে বড়-মানুষী দেখাই; কিন্তু আজ সে তো সকলই জানিল! হায় হায়, বামী কেন আমায় আড়ালে ডেকে বল্লে না! তাতে যদি আমায় ধরে দু'ঘা জুতোও মার্‌তো, তা হলেও তো আমার এমন অপমান বোধ হোত না!

"কথাগুলো সব আমি শুনি-নি; তবু যেটুকু আমি দেখ্‌লাম্, তাতেই আমার কান্না এল! আহা, এমন ঘর-সংসার, এমন স্ত্রী—আরে মলো যা, কি বল্‌তে কি বল্‌ছি ছাই—যেমন করেই হ'ক, টাকাগুলি আজ আমায় কিন্তু দিতেই হ'চ্চে! আজ আর আমি কোনই ওজোর শুন্‌বো-না।"—এইরূপ বকিতে বকিতে, কতই যেন রাগ-ভরে, সে আমার নিকট বারম্বারই টাকার তাগাদা করিতে লাগিল। আমি অধোমুখে, কান্না-কান্না চোখে, প্রমাদ গণিতে লাগিলাম।

সঙ্গে সঙ্গে মানদাও আমায় তিরস্কার করিতে লাগিল। বলিল,—"তবে তুমি আমায় আর ক'দিন রাখ্‌তে পার্‌বে? তোমার সবই দেখ্‌ছি, প্রতারণা! এই ক'দিনেই যখন তোমার এমন অবস্থা, তখন আমি আর কিসের ভরসা করি? এক নিমেষ-মাত্র দেখেছি—আহা, আর কি সে দেবী এ পাপিনীকে দেখা দিবেন!—বামা-মা আমায় একদণ্ডখানি মন্দিরের পেছনের সেই মন্‌সা-তলায় দাঁড় করিয়ে রেখে, ঘরভাড়া-দক্ষিণে চুকিয়ে দিতে গিয়েছিলো—সেই একটুমাত্র সময়ে, সেই নিমেষ-মধ্যে আমি যে দেবীকে দেখিয়াছিলাম, আর কি কখনও তাঁর দেখা পাব? তুমি গিয়েছ—তুমি মরেছ—তোমার আর কিছুই সম্বল নেই যে, আর আমায় রাখ্‌তে পার! এখন সেই দেবী—সেই সতী-শিরোমণী পতিব্রতা মা আমার—তিনিই যদি আমায় রক্ষা করেন! নিমেষ-মাত্র দেখা দিয়া—পাপিনী বলিয়া, ছলনা করিয়া—তিনি কোথায় গেলেন, জগত্তারিণি!"

মানদার মুখ-মণ্ডলে তখন এক অপূর্ব্ব জ্যোতি। চক্ষু দিয়া যেন অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছে—'হর-কোপানলে কাম পড়িলা যেমতি!' আমার চক্ষু ঝলসিয়া যাইতে লাগিল। আমি আর সে জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তির দিকে তাকাইতে পারিলাম না।

বামা বলিল,—"যদি এখনও ভাল চাও, যদি এখনও মানদাকে নিয়ে সুখী হতে চাও, তবে টাকাগুলি পত্রপাঠ চুকিয়ে দাও।"

বড়ই মর্ম্ম-যাতনায় আমি বলিলাম,—"গহনা-গুলো বেচেও তো টাকা নিতে পারেন! তা'র জন্য আর এত কেন?"

বামা একটু রুক্ষ-স্বরে বলিল,—"কার গহনা কা'কে বেচ্‌বো? সে পুণ্যবতীর এক বিন্দু চক্ষের জলে আমাদের নরকেও যে স্থান হবে না! তুমি টাকা নিয়েছ বাপু—টাকা দেও। আমি এত ঝঞ্ঝাটে যেতে চাইনে।"

আমি আকাশ-পাতাল ভাবনায় পড়িলাম। ভাবনার কুল-কিনারা নাই। বামা এসব এ বলে কি? টাকাই বা আমি পাব কোথায়? একটী পয়সা পা'বার উপায় থাক্‌তে, আমি তো ঘরে যাওয়া ছাড়ি-নি! স্ত্রীর হাতের নোয়া-গাছটি পর্য্যন্তও (অবশ্য সোণা কি রূপা-বাঁধান।) এনে যে আমি বাঁধা দিয়েছি! এখন আর বামাকে তবে কি করে টাকা দেব? মা?—মা'তো আমায় কিছুতেই দেবে না! সে একেই তো আমার স্ত্রীকে দিন-রাত্রি বকে,—"বৌমা, দিও না গো, স্বামী গেছে যাক, গহনা-গুলো দিও না।" তবে আমি কি করি? স্ত্রী কি কোন রকম ক'রে দিতে পারবে না? এই বার দিলে, আমি আর কখনও কিন্তু চাইবো না! এদায়টা এবার উদ্ধার হ'লে এই নাকে-কাণে খত!

এইরূপ ভাবিতেছি, বেলা প্রায় শেষ! বামা তখন আবার বলিল,—"ভাব্‌ছ আর কি ছাই? মায়ের হাতে তো ঢের টাকা আছে; গয়নাগুলো দেবে বলে, তাঁর কাছ থেকেই কিছু নিয়ে এস-না কেন? তারপর, গয়না-গুলো তাঁকে দিলেও তো হতে পারে! তবু তো তিনি সন্তুষ্টি থাকেন?"

আমি আর সে বাক্য-বাণ সহ্য করিতে পারিলাম না। মানদাও আমার প্রতি আর

কোনই সহানুভূতি দেখাইল না। বরং আমায় যেন তখনকার-মত বিদায় করিতে পারিলেই সে বাঁচে। কাজেই, অবোধ আমি, আমি বুঝিলাম,—তারও যেন মনোভাব—আমি মার কাছ থেকে টাকা এনে বামিকে চুকিয়ে দিই। কাজেই, মানদার যখন এই ইচ্ছা, আমায়ও তাহাতেই স্বীকৃত হইতে হইল।

আমি টাকা আনিতে ভবানীপুরে চলিলাম। প্রতিজ্ঞা করিলাম,—টাকা না আনিতে পারিলে আর এ মুখ দেখাইব না।

(৩)

রসিক ভায়া ও আমি এক ক্লাশেই পড়িতাম। দু'জনে বড়ই আলাপ। সে আমাদের বাড়ি আসে, আমি তাদের বাড়ি যাই। পড়ায়ও তখন আঁট খুব। কিন্তু ও-পাড়ার ব্রাহ্ম-সমাজই আমাদের সে পড়ায় কাল হইয়াছিল। ছকু-বাবুর বাজারের উপর-তালাতেই তখন 'সমাজ' বসে। বড়ই ধুম! গান, বাজনা, সঙ্গৎ, সঙ্কীর্ত্তণ—লুচি, সন্দেশ, কমলা—সমাজে এসবের তখন বড়ই প্রলোভন! ছেলে-বেলা থেকেই, কি জানি কেন, রসিক ভায়ার একটু একটু 'ব্রাহ্ম-টেণ্ডেন্সি' ছিল; সঙ্গে পড়িয়া, আমিও সেপক্ষে তত উদাসীন ছিলাম না। মাঝে মাঝে তাহার সহিত আমিও সমাজে যাইতাম। অবশ্য উপাসনা করার জন্য আমার ততটা ঔৎসুক্য ছিল না; খাওটা-আসটা, গানটা-সঙ্গৎটাতেই আমার যতটা যা আগ্রহ! বিশেষ, স্ত্রী-কণ্ঠের গান—তাতেই আমি মুগ্ধ ছিলাম।

এই সব কারণেই সেবার আমরা 'ফেল' হই। সঙ্গে সঙ্গে ভবানীপুরের 'লণ্ডন মিস-নারী স্কুল' ছাড়িয়া কলিকাতার কোন এক ব্রাহ্ম-কলেজে পড়াই আমাদের সাব্যস্ত হয়। বাড়ি হইতেই যাতায়াত করি। আর বছর এমনি সময়েই মানদার বিবাহ হইয়াছিল। রসিক ভায়ার পিতা ও মানদার স্বামী এইবার ঠিক এক সময়েই—এই দশ-প'নের দিনের আগু-পাছুতেই—ইহলোক পরিত্যাগ করেন। আগে অবশ্য মানদার স্বামী, পরে অনেকটা জামাতার শোকেই, রসিক ভায়ার পিতার পরলোক-প্রাপ্তি হয়।

পিতার মৃত্যুর পরই, রসিক ভায়া একজন পুরা ব্রাহ্ম! শ্রাদ্ধের দশ রাত্রির মধ্যেই পৈতা ফেলিয়া দেন; আরও কত কি রকমের সমাজ-সংস্কারে প্রবৃত্ত হন। অবসর বুঝিয়া, এই সময়ই, ধর্ম্মধ্বজীগণ বাল-বিধবা মানদার উদ্ধারের জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন। সোণায় সোহাগা আর কি! রসিকের যোগাযোগে, তাহাদের চেষ্টায়, মানদা ক্রমে সমাজে আনীতা হয়। চেষ্টা হইতে থাকে, বিধবা মানদার বিবাহের জন্য। কিন্তু অনেকেই বিবাহার্থী—সমস্যা, কাহার সহিত তাহার বিবাহ দেওয়া যায়!

এই সময়ই একটি চাকরি-উপলক্ষ করিয়া রসিক ভায়া শিলংএ চলিয়া যান। পূর্ব্বে আমি 'ওসব' ঘটনার বিন্দু-বিসর্গও জানিতাম না। কিন্তু কর্ম্মস্থলে যাইবার পূর্ব্ব-দিন, রসিক ভায়া যখন আমায় সকল কথা খুলিয়া বলিলেন, তখন আমি একেবারে চমকিত! যাইহোক, তাঁহার কথামত দুই-একবার মানদাকে দেখিতে যাইতে আরম্ভ করিলাম। আমারও তখন অনেকটা ব্রাহ্ম-ভাব—ভ্রাতারা আমায়ও তখন দীক্ষিত করিবার আশা রাখেন। কাজেই, মানদার সহিত দেখা-শুনা করিতে, আমার আর কোনই বাধা ছিল না। শেষে এমনই হইয়াছিল, আমি মানদাকে পড়াইতে (বিনা-বেতনে কিনা, তাই কেহ কোন দ্বিধা করিত না!) যাইতাম।

তাহাই আমার কাল! ছেলে-বেলাই আমার পিতার কাল হয়। সেই অবধি আমিই সমস্ত বিষয়ের অধিকারী। মাতার নামে কেবল হাজার-কয়েক টাকার কোম্পানীর কাগজ আর বসত-বাটীখানা। তা'ও, তিনি মরিলেই

আমি পাইব—এমনই উইল। সুতরাং আমায় এখন আর পায় কে? লোক-জনও আমার তাই এখন অনেক—নাম-ডাকও আমার যথেষ্ট! হাতে পয়সা-কড়িও ঢের! কাজেই, অবসর বুঝিয়া, সমাজ হইতে উপসনান্তর (অবশ্য রাত্রি তখন ৯টা) বাসায় আসিবার সময়, সেই গাড়িতেই, মানদাকে লইয়া আমি সরিয়া পড়িলাম। খোঁজ, খোঁজ, খোঁজ! দিনকতক বড়ই ধুম! কিন্তু কে কারে খুঁজিয়া পায়?

(৪)

ঠিক সন্ধ্যার সময় বাড়ি পৌঁছিলাম। আজ কেন বাড়ির এমন ভাব! আমি অবাক! মা বলিলেন,—"বাছা, গহনা সব পেয়েছি।" কি গহনা? কে দিল? কোথা থেকে এল? আমি ত ভাবিয়াই আকুল! মা আবার বলিলেন,—"যাকে বাঁধা দিয়েছিলি, সেই বুড়ি মাগি আজ দিয়ে গেল; বল্লে, তুই টাকা দিয়েছিস্।"

আমি আকাশ হইতে পড়িলাম। মা কি বিদ্রূপ করিতেছেন? অথবা সত্য সত্যই—না, না, তাও কি হ'তে পারে!—আমি তো কই টাকা দিই-নি! যাইহোক, খানিক দম লইয়া বলিলাম,—"ওঃ!" অর্থাৎ যেন আমার টাকা দেওয়ার কথা মনে পড়িল, অথবা যেন আমি বুঝিতে পারিলাম, মা আমায় বিদ্রূপ করিতেছেন—আমার মুখ দিয়া এমনই স্বর নির্গত হইল,—"ওঃ!" আমি কিন্তু বড়ই দুঃখের সহিত-বলিয়াছিলাম,—"ওঃ!" একই-বারও তখন ভাবি নাই যে, মা তাহা হইতে ভাবিবেন—অন্যরূপ।

অন্যদিন অপেক্ষা মা'র নিকট আজ আমার বড়ই আদর। মা বলিলেন,—"বিধাতা যে এত-দিনেও তোর সুমতি দিয়েছেন, তাহাতেই আমার বেশী আহ্লাদ!" আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কাজেই 'না রাম না গঙ্গা!"

আহারান্তে, ঘরে আসিয়াই, কতকটা বিদ্রূপ-স্বরে, আমার স্ত্রীকে বলিলাম,—"গহনা দিয়ে গেছে; কই দেখি?" স্ত্রী সত্য-সত্যই যে গহনা আনিয়া দিল! মা কি তবে সব জান্‌তে পেরেছেন? জান্‌তে পেরে, টাকা দিয়ে, তাই গহনা-গুলো খালাস করে এনেছেন! বামীর গালা-গালি-বকুনি সবই তিনি তবে শুনেছেন! কে তাঁকে এসে এসব বল্লে? বামীর মনে এতটা ছিল—সে আমায় এমন ক'রে অপমানটা কর্‌লে? এ যদি আগে জান্‌তাম—

এমন সময়ই, আমার বিষণ্ণ বদন দেখিয়া, প্রাণের সহানুভূতি দেখাইয়া—আহা, তেমন সহানুভূতি জগতে আর কোথায়—আমার স্ত্রী বলিল,—"তোমার কি গহনার আর দরকার আছে? থাকে তো নেও-না!" একথায় আমি আরও ম্রিয়মান হইয়া পড়িলাম। গহনা খালাসের বিষয়—মা ই যে টাকা দিয়া খালাস করিয়া আনিয়াছেন, এ বিষয়ে—আর আমার কোনই সন্দেহ রহিল না। আমি কষ্টের স্বরে, লজ্জিত হইয়া, অধোমুখে, বলিলাম,—"না।"

মন বড়ই ব্যাকুল হইল। একজন কেবলই বলে,—'দেও দেও;' আর একজন কেবলই বলে,—'দরকার থাক তো নেও-না!' আমি কি পাষণ্ড! আমি কি ভ্রান্ত!

কিন্তু একটু পরেই সেই যে-কে-সে! নেশা গো নেশা! আমি আর বাড়িতে থাকিতে পারিলাম না। টাকা যখন দেওয়া হয়েছে, তখন আর ভাবনা কি? বিশেষ, বামীর প্রতি মনে তখন বড়ই রাগ হইল—আর তাহার বাড়িতে থাকিব না, সে আমায় এমন অপমান করে, এবার মানদাকে নিয়ে নতুন বাসা করে থাক্‌বো—তাই তখনই চলিয়া গেলাম। স্ত্রী আমার মুখপানে তাকাইয়া রহিল—তাঁহার চোখে তখন অশ্রু পড়িবার উপক্রম হইল। আমি কিন্তু আর ফিরিয়াও চাহিলাম না।

(৫)

রাত্রি আন্দাজ দশটার সময়, আমি 'সেখানে' দিয়া পৌঁছিলাম। ডাকের উপর ডাক! কড়া-নাড়ার উপর কড়া-নাড়া! কিন্তু কোনই সাড়া-শব্দ নাই। এরা সব গেল কোথা? ডাকা-ডাকিতে ক্রমে পাড়ার লোকেরাও সব বিরক্ত হইয়া উঠিল। রাগ-ভরে আমি ভাবিলাম,—এরা সব ম'লো নাকি? অনেকক্ষণ পরে, গিস্-গিস্ করিতে করিতে আসিয়া, বামী দরজা খুলিল। বলিল,—"তোমাদের জ্বালায় জ্বলে গেলেম যে! তিনি হ'লেন এক রকম, আর তুমি হলে বাছা, আর এক রকম! তা'এতে কি আর বনি-বনাও হয়? সে আর সইবে কেন—তারও তো চোক-মুখ ফুটেছে? তা'কে আর ঘরে রাখি, আমার সাধ্য কি?—তুমি যাওয়ার পরই, সেও তাই কোথায় চ'লে গিয়েছে!"

আমি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসিলাম,—"বামা—বামা! একি বল্‌ছো? আমি তো এর কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছি-নে! মানদা—মানদা! কই সে? কোথা সে?"

বামা, হাত-মুখ-নাড়া দিয়া, আরও একটু রুক্ষ-স্বরে বলিল,—"আমি তবে মিছে কথা বল্‌ছি? বটে! বোনের পাখি পিঁজরেয় পোরা কতক্ষণ থাক্‌তে পারে? শিক্‌লী কেটেছে কি পালিয়েছে! পালান পাখির আশা করা আর বৃথা! আহা, সে সাধ্বী—সে পুণ্যবতী—মা কালী তাই তাকে চরণে স্থান দিয়েছেন। এখন যাও বাছা—যাও, তুমি তোমার ঘরে যাও! এমন স্ত্রী—এমন ঘর-সংসার ফেলে, সামান্যা একটা বেশ্যার মায়ায় কেন মজেছিলে?"

আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। এমন সময় বামী আমার হাতে একখানি চিঠি প্রদান করিল। দেখিলাম, সে চিঠি মানদার হাতের লেখা। চিঠিখানি দিয়াই, বামী বলিল,—"যাও—যাও, আর আমায় বিরক্ত ক'রো-না! এত রাত্রেও কি একটু ঘুমুতে পাবো-না ছাই! তুমি যাও তো বাপু এখন—কাল আবার না হয় এসো, যদি কোন কথা থাকে।"

আমি বলিলাম,—"মানদা—মানদা কই?"

"মানদা মরিয়াছে!"—বামী বড়ই রুক্ষ স্বরে বলিল,—"মানদা মরিয়াছে!"

আমার বাস্তবিকই কান্না আসিল। তবুও একবার-মাত্র সেই ঘরের দিকে চাহিয়া দেখিলাম, যদি ঘরে মানদা থাকে! কিন্তু সে তো নাই? কাজেই, বামীর কঠোর বাক্য আর সহিতে পারিলাম না। সেই পত্রখানি হাতে করিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে, দরজার বাহির হইলাম। বামী ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিল।

পত্রখানা কি? দেখিতে বড়ই ঔৎসুক্য হইল। রাস্তার ধারে, একটী গ্যাসের আলো—সেখানে দাঁড়াইয়া সেই চিঠিখানি পড়িতে লাগিলাম। উঃ! কি লোমহর্ষক—কি ভয়ানক

* * * *

"তুমিই আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছ; না বুঝিয়া এতদিন যে পাপ করিয়া আসিয়াছি এখন তাহার প্রায়শ্চিত্ত কোথায় পাইব—তাহারই অন্বেষণে চলিলাম। আমার যাহা হইবার তাহা তো হইয়াছে; কিন্তু তুমি এখনও সাবধান! এতদিন হীরকে ফেলিয়া তুচ্ছ কাচে ভুলিয়াছিলে; পবিত্র গঙ্গাজল ফেলিয়া, চণ্ডাল স্পৃষ্ট তুচ্ছ কুপোদক পান করিতেছিলে। কি সাবধান—এখনও সাবধান! তোমার স্ত্রী—আহা লক্ষ্মী-স্বরূপিণী—তোমা বই আর তিনি কিছুই জানেন না। তাঁকে ফেলিয়া, আমাকে লইয়া—একি তোমার, একি কুপ্রবৃত্তি! সে সতী-সাধ্বীর এক বিন্দু অশ্রু-জলে এতদিন আমি ভস্মিভূত হই নাই কেন? তা হ'লে তো আমায় এত অনুতাপ সহিতে হইত না।

উঃ-হু, কি জ্বালা—কি যন্ত্রণা! আর সহিতে পারি না, তাই চলিলাম—কোথায় এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত, একবার দেখিব তাই! তুমি এখনও এখনও সাবধান—যদি বাঁচিতে চাও, তবে এখনও এপথ পরিত্যাগ কর। আমার আশা আর করিওনা—এজগতে আমায় আর মিলিবে না। যাও তুমি, গৃহে যাও—সেই দেবী-প্রতিমার নিকট পরামর্শ লও—যদি একবিন্দুও আমায় ভালবাস, তবে একবারও তাঁহার নিকট আমার উদ্ধারের প্রার্থনা করিও। নহিলে, সে কোপানলে জ্বলিলাম—পুড়িলাম—মরিলাম।"

(৬)

অশ্রুজলে আমার বক্ষ ভাসিয়া গেল। হতাশে, বিষাদে, বিস্ময়ে, আমার প্রাণ চমকিয়া উঠিল। কিন্তু, আর কোথায় যাই? চক্ষের জলে বক্ষ ভাসাইতে ভাসাইতে, ধীরে ধীরে, তখন গৃহাভিমুখেই প্রস্থান করিলাম। সংজ্ঞা নাই—জ্ঞান নাই যে, রাত্রি তখন শেষ হইয়াছে!

আমার ঘরে প্রবেশ করিতেই, বুঝিলাম—তখন সকাল-বেলা! খোকা উঠিয়া 'বা—বা' করিয়া হাত-পা ছুড়িয়া খেলা করিতেছে; আমার মুখ বিষাদ-গম্ভীর, হৃদয়ে যেন মহা-বিপ্লব! স্ত্রী যেন স্বপ্ন-ঘোরে চমকিয়া উঠিল,—"তুমি! কি হইয়াছে?" আমি কথা না কহিয়া শয্যায় বসিলাম। খোকা 'বা—বা' করিয়া হাসিয়া উঠিল। আমি তাহাকে তুলিয়া বুকে লইলাম; আমার নেত্র দিয়া অশ্রু পড়িতে লাগিল। স্ত্রী আবার কাতর-স্বরে বলিল,—"স্বামী, প্রভু, সর্ব্বস্ব তোমার! কি হইয়াছে, আমাকে খুলিয়া বল; আমি প্রাণ দিয়া তোমার দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা করিব।"

এ কথায় আমার প্রাণে যে তখন কি গভীর আন্দোলন উপস্থিত হইল, তাহা আর বলিবার নহে। আমি তখন, খোকাকে বিছানায় রাখিয়া, আমার স্ত্রীকে বুকের মধ্যে টানিয়া লইয়া, বলিলাম,—"তুমি আমাকে মার্জ্জনা করিতে পারিবে? আমার আর কিছু চাহিবার নাই!"

অশ্রুতে আমার নয়ন ভাসিয়া গেল। আমি আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম। তেমন সুখ আমার জীবনে কখনো হয় নাই; পৃথিবীতে যে স্বর্গ আছে, আত্মা যে শরীরের মধ্যে থাকিয়াও মুক্তির আনন্দ লাভ করিতে পারে, সেইদিন আমি জানিয়াছিলাম।

... ...

সেইদিন হইতেই আমি একেবারে পরিবর্ত্তিত—স্ত্রীপুত্র লইয়া আমি এখন গৃহবাসী।

সাধু তুলসীদাস।

সাধু তুলসীদাস একজন মহাপুরুষ ছিলেন। কোথাও কোথাও, তাঁহার ভক্তির গুণে, তিনি 'রামচন্দ্রের অবতার' বলিয়াও উল্লিখিত হইয়াছেন। যাহাই হউন, অন্যান্য সাধু পুরুষদিগের ন্যায় তাঁহার জীবনীও গভীর তমসাচ্ছন্ন—কোথাও কিছু বিশ্বাস-যোগ্য প্রমাণ খুঁজিয়া পাইবার উপায় নাই। অন্যান্য মহাত্মাদিগের ন্যায় তাঁহার জীবনীও নানা অলৌকিক ঘটনায় পরিপূর্ণ। জীবনী-সম্বন্ধে যাহাই হউক, তুলসীদাসের 'দোঁহাবলীই' তাঁহাকে জগতে অমরত্ব-প্রদান করিয়া গিয়াছে। তাঁহার রচিত দোঁহা—সেই দোঁহা হইতেই তিনি সর্ব্ব-পরিচিত।

উত্তর-পশ্চিম প্রদেশস্থ হস্তিনাপুর-নগরে এক কনজীয় ব্রাহ্মণের ঘরে তুলসীদাস জন্ম-গ্রহণ করেন। দিল্লীশ্বর আকবরের রাজত্ব-সময়ে, আন্দাজ ষোড়শ শতাব্দির শেষ-ভাগেই, তুলসীদাস ইহজগতে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতার নাম আত্মারাম। আত্মারাম পুণ্যবান্ এবং ধর্ম্মশীল ছিলেন। তিনি মোগল-সম্রাট্ আকবর সাহার একজন কর্ম্মচারী ছিলেন। অতিশয় বুদ্ধিমান জানিয়া, আকবর

তাঁহাকে অনুগ্রহ করিতেন। তিনি নবজাত শিশুর জাতকর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া, তাঁহাকে তুলসীদাস এই আখ্যা প্রদান করিলেন।

দিনদিন তুলসীদাস বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার উপনয়ন-কার্য্য সমাধা হইল। তিনি দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালন করিয়াছিলেন। সন্ধ্যা-বন্দনা ও বেদাধ্যয়ন করিতে শিখিলে, ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রম-কালে, তাঁহার উদ্বাহ-কার্য্য সম্পন্ন হয়। যখন নবদম্পতির বাল্যকাল অতিবাহিত হইয়া যাইল; যখন তাঁহারা যৌবনে পদার্পণ করিলেন; তখন তাঁহারা উভয়ে উভয়ের উপর এমনই আসক্ত হইলেন যে, কেহই কাহারও বিচ্ছেদ সহ্য করিতে পারিতেন না। তুলসীদাসের বনিতার নাম মমতা দেবী। তিনি অনন্যভাবে পাতিব্রত্য-পালনপূর্ব্বক সর্ব্বদাই পতি-সেবায় রত থাকিতেন।

পত্নী হইতে যে অনেক সময় পতির মোক্ষ-প্রাপ্তির পথ পরিস্কৃত হয়, তুলসীদাসের জীবনী তাহার এক জাজ্জ্বল্য দৃষ্টান্ত। কথিত আছে, পত্নীর উপদেশ-চেষ্টাতেই তুলসীদাসের মন একেবারে ঈশ্বরাসক্ত হইয়া পড়ে, এবং তিনি এক আদর্শ-পুরুষে পরিণত হয়েন। তুলসীদাস তাঁহার পত্নীকে বড়ই ভাল-বাসিতেন; এমন কি, একদণ্ডও তাঁহার বিচ্ছেদ সহ্য করিতে পারিতেন না। এজন্য পত্নীকে কখনও পিত্রালয়ে পাঠাইতে তাঁহার মন সরিত না—তিনি কিছুতেই পত্নীকে চক্ষের অন্তর করিতেন না। কিন্তু এক সময়, তাঁহার শ্বশুর-মহাশয়, তাঁহার অলক্ষিতে, তাঁহার পত্নীকে পিত্রালয়ে লইয়া যান; এবং, রাত্রে গৃহে আসিয়া পত্নীকে না দেখিতে পাইয়া, তিনিও ব্যাকুল হইয়া তদনুসরণে সেই রাত্রেই শ্বশুরালয়ে গমন করেন।

এই স্থলটীতে সাধুপ্রবর বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের চিত্ত-পরিবর্ত্তনের ঘটনার ন্যায়, তুলসীদাসেরও চিত্ত-পরিবর্ত্তনের কারণ হয়। ঠিক সেই আখ্যায়িকার ন্যায়ই, কাষ্ঠ-ভ্রমে শব-দেহাবলম্বনে নদী-পার, রজ্জু-ভ্রমে সর্পাবলম্বনে প্রাচীর-উল্লঙ্ঘন, এবং অবশেষে ঐ সকলের ভ্রম অপনোদন—এক্ষেত্রেও ঐরূপ সকল ঘটনার উল্লেখ আছে। হইতে পারে, তাহা কবি-কল্পনা কিন্তু, এইরূপে রাত্রে শ্বশুরালয়ে যাইয়া, স্ত্রী সহিত সাক্ষাৎ করায়, তিনি স্বামীকে কি উপদেশ দেন; বলেন,—"স্বামীন, অভাগিনী দাসী আপনার! কিন্তু এ দাসীর প্রতি আপনার যে ভালবাসা, এ ভালবাসা আপনি যদি সেই ইষ্ট-দেব রাজ-রাজেশ্বর শ্রীরামচন্দ্রের চরণে অর্পণ করেন, তবে আপনার কত ভাল হয় ভাবুন দেখি!" এই কথাতেই নাকি তুলসীদাসের মন ফিরিয়া যায়! সেদিনই তিনি অমন স্ত্রীকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে, প্রেমমায়া বিসর্জ্জন করিয়া "রাম রাম" বলিতে বলিতে গৃহ হইতে বহির্গত হয়েন।*

ইহার পর তুলসীদাসের সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক ঘটনারই উল্লেখ আছে। ভগবানে যেমন সকল কীর্ত্তিকলাপ উল্লিখিত আছে, ভগবদ্ভক্ত সাধু তুলসীরও সম্বন্ধে সেইরূপ নানা অলৌকিক কাহিনী আছে। কিন্তু বিস্তৃতি-ভয়ে সে সকল প্রকাশে আপাততঃ বিরত রহিলাম।

তবে তুলসীদাসের সন্ন্যাসাবলম্বন-সম্বন্ধে আমাদের দেশে কিন্তু আর একপ্রকার প্রবাদ প্রচলিত আছে। কথিত আছে যে, তুলসীদাস এক মুদীর দোকানে কাজ করিতেন। কোন দ্রব্যাদি ওজন করিবার সময় মুদি যেমন দাঁড়ি-পাল্লা লইয়া "একে রা দু'য়ে রাম" ইত্যাদি করিয়া যাইত; এই শুনিতে শুনিতে, একদিন "তেরে (তের) রা শুনিয়া, তিনি চমকিয়া উঠেন। এবং অম

* দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় লিখিত 'ভ বিজয়' নামক এক প্রাচীন গ্রন্থে যে যে ঘটনাবলী আছে, এস্থলে তাহাই আমাদের অবলম্বন।

"তেরে রাম" অর্থাৎ "হে রাম আমি তোমারই" বলিতে বলিতে, মুদির দোকান ত্যাগ করিয়া, পাগলের মত তিনি ছুটিতে লাগিলেন। মুদি দেখিয়া স্তম্ভিত হইল; লোকজন সকলে জড়বৎ অবাক্ হইয়া রহিলেন। তুলসী ছুটিয়া অমনি অদৃশ্য হইলেন; আর তাঁহাকে তখন কেহই দেখিতে পাইলেন না—ধরিয়া, তাঁহাকে গৃহে ফিরাইতেও আর কাহারও সামর্থ্য হইল না।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তুলসীদাসের জীবনীর আর কিছু না থাক, তুলসীদাসের আছে—দোঁহা। সে দোঁহা হইতেই তাঁহার অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন তপোনিষ্ঠ ঋষিদের আপ্তবাক্য—তাঁহাদের মহত্ত্বের পরিচায়ক, তুলসীদাসের দোঁহাও তদ্রূপ। সম্ভবতঃ সন্ন্যাস-অবস্থায় তাঁহার মুখ দিয়া যে সকল উপদেশ-বাক্য বাহির হইয়াছে, তাহাই তাঁহার দোঁহা—তাহাই তাঁহার পরিচায়ক। তুলসীদাস কিরূপ উদার-প্রকৃতি ছিলেন, সকলকে তিনি কিরূপ সমভাবে দর্শন করিতেন, ও সকলের কিরূপ সম্মান-রক্ষা করিতেন; একটি দোঁহায় তাহা তিনি এইরূপ বলিতেন,—

"তুলসী জগৎমে আইয়ে,
সব্‌সে মিলিয়া ধায়।
না জানে কোন্ ভেকসে,
নারায়ণ্ মিল্ যায়্॥"

অর্থাৎ,—তুলসীদাস জগতে আসিয়া সকলের সহিত মিলিয়া চলিতেছেন; কারণ, তিনি জানেন না যে, নারায়ণ কোন্ ভেকে অর্থাৎ কোন্ ছলে আসিয়া দর্শন দেন।

পুত্র-সম্বন্ধে কে সৎ ও কে অসৎ, তুলসীদাস নিম্নলিখিত দোঁহায় তাহা নিরূপিত করিতেন,—

"এক রাহমে হোতে হেঁয়,
তুলসী মূত্ আউর পুত্।
রাম ভজে তো পুতহিঁ,
নহি তো মূত্‌কা মূত্॥"

অর্থাৎ,—হে তুলসী! মূত্র ও পুত্র এক পথেই বহির্গত হয়; তবে যে পুত্র ভগবান রামচন্দ্রের ভজনা করে, সেই পুত্র; নতুবা অধার্ম্মিক মূর্খ পুত্র মূতেরও মূত্ অর্থাৎ মূত্ হইতেও অপকৃষ্ট।

কেবল ফাঁকা 'নামে' কোন ফল দর্শে না। ভক্তি ও প্রেম-সহকারে নাম জপিতে পারিলেই উদ্ধার হওয়া যায়—তুলসীদাস কেবল ইহাই ব্যক্ত করিতেন। যথা,—

"রাম্ রাম্ সব কোই কহে,
ঠক্ ঠাকুর্ ক্যা চোর।
বিনা প্রেম্‌সে রীঝৎ নহি,
তুলসী নন্দ-কিশোর্॥"

অর্থাৎ,—হে তুলসীদাস! কি দুষ্ট, কি শিষ্ট, কি চোর, সকলেই 'রাম, রাম' বলিয়া থাকে, সত্য; কিন্তু তাহাতে তাহাদের তাদৃশ ফললাভ হয় না; যেহেতু, প্রেমভক্তি বিনা নন্দ-কিশোর শ্রীকৃষ্ণ কখনও প্রসন্ন হন না।

তুলসীদাস নিজে বড়ই কৃপালু-হৃদয় ছিলেন। লোকের কষ্ট দেখিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না। তাই দয়াতেই যে ধর্ম্ম আশ্রিত, তাহা তিনি সার বুঝিয়াছিলেন। তিনি তাই সদাই বলিতেন,—

"দয়া ধরম্‌কি মূল্ হেঁয়,
নরক্ মূল্ অভিমান্।
তুলসী মৎ ছোড়িয়ে দয়া,
যও কণ্ঠাগত জান॥"

অর্থাৎ,—ধর্ম্মের মূল দয়া, এবং নরকের মূল অভিমান। অতএব হে তুলসীদাস্! তুমি কণ্ঠাগত প্রাণ থাকিতেও দয়া প্রবৃত্তিকে পরিত্যাগ করিও না।

মন্‌কে জয় না করিতে পারিলে কোন সাধনই সম্ভবে না। অজীত মন্ লইয়া ঈশ্বর-ধ্যানে বসিলে, উহাতে বিষয়ই প্রতিফলিত হয়, ঈশ্বর প্রতিফলিত হয় না। তজ্জন্যই তিনি বলিতেন,—

"রাজা করে রাজ্য বশ্,
যোদ্ধা করে রণ জই।
আপনা মন্‌কো বশ্ করে যো,
সব্‌কো সের ওই॥"

অর্থাৎ,—রাজ্যবশ করিলে রাজা, রণজয় করিলে যোদ্ধা বীরপুরুষ বলিয়া গণ্য হয়; কিন্তু যিনি আপন মনকে বশীভূত করিয়াছেন, তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হন।

যাহাতে হরির স্মরণ হয়, সেই অবস্থা প্রার্থনীয়। সেইজন্য ভক্তেরা বিপদের প্রার্থনা করিতেন। যেখানে তাঁহাদের নিন্দা ও অনাদর হয়, সেইখানে তাঁহারা যাতায়াত করিতেন—এরূপ উদাহরণও অনেক পাওয়া যায়। তুলসীদাসও এইরূপ ছিলেন। তিনি বলিতেন,—

তুলসী উহাঁ যাইয়ে
যাহাঁ আদর্ না করে কোই।
মান ঘাটে মন্ মরে
রাম্‌কো স্মরণ হোই॥"

অর্থাৎ,—হে তুলসীদাস! যেখানে তোমাকে কেহ আদর না করে, তুমি সেইস্থানেই সর্ব্বদা গমন করিবে; যেহেতু, তথায় মানের লাঘবতা ও মনের মৃত্যু-জন্য অবশ্যই একবার জগদীশ্বরকে স্মরণ হয়। (ক্রমশঃ।)

অনুসন্ধান-সমিতির বিবরণী।

প্রতারণা-প্রবঞ্চনা।

একখানি পত্র।

"মহাশয়—বর্ত্তমান 'অনুসন্ধানে' প্রবঞ্চনার হেডিং-মধ্যে জি. বারওয়েল এণ্ড কোং(G. Berwell & Co) নামীয় যে প্রবঞ্চনা-মূলক বিজ্ঞাপনের কথা উল্লেখ করিতেছেন, তাহারই অর্থাৎ সেই লোকটার কিছু পরিচয় নিম্নে দিতেছি। যে ঐ বিজ্ঞাপন বাহির করিতেছে, তাহার বয়স আন্দাজ ২১ বৎসর হইবে। খুলনা-জেলায় সাতক্ষিরা পোষ্টাপিসের অধীন 'ছয়ঘরিয়া' গ্রামে তাহার বাড়ী। এখানে স্কুলে পড়ে। উহার নাম সেখানে বি. বি. ঘোষ। ঐ নামে, উহার বাড়ীর ঠিকানা দিয়াও, '৮ বৈদ্যনাথ ধাম,' 'স্বপ্নে প্রাপ্ত মেহরোগের ঔষধ', 'বিনামূল্যে বিতরিত'—এই সকল হেডিংএ নানা বিজ্ঞাপন বাহির করিয়া থাকে। তা'ছাড়া, সময় সময় আরও কত কি বিজ্ঞাপন বাহির করিয়াই থাকে। ঐ লোকটাই উহার ঘোষের Gকে G, আর নামের Bকে ব্যারওয়েল করিয়াছে। অধিক কি লিখিব? অনেক কাগজেই ইহার বিজ্ঞাপন আছে। সকলকে সাবধান করিয়া দিবেন।"

এই পত্রখানির প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এই আর একখানি পত্র পাই। যথা,—

"মহাশয়,—আপনার 'অনুসন্ধান' পত্রে বিজ্ঞাপন দিতে ইচ্ছা করিয়াছি। বিজ্ঞাপনটী মাসিক একবার বাহির হইবে। অদ্য টাকা ও বিজ্ঞাপন পাঠাইলাম। আগামী সপ্তাহ হইতে বিজ্ঞাপনটী প্রকাশে বাধিত করিবেন। টাকা (আরও) মাসে মাসে দিব। বিজ্ঞাপন যেন বন্ধ না হয়, নিবেদন।

আপনার বাধিত্ বি, বি, ঘোষ।
সাতক্ষিরা পোঃ, ছয়ঘরিয়া গ্রাম, জেলা খুলনা।"

এমনই ব্যাপার! অনুসন্ধানটা তলে তলে জানিতে পারিয়াই, ঘোষজার বিজ্ঞাপন দিয়া আমাদের ভুলাইবার চেষ্টা! তাহাতেও আবার এক রহস্য প্রকাশ—বিজ্ঞাপন আসিতেছে, খুলনা-জেলা হইতে, পত্রের উপরে ও ভিতরে হাতের লেখায় খুলনা জেলারই ঠিকানা আছে; অথচ তাহা পোষ্ট হইয়াছে—কলিকাতার বহুবাজার হইতে। সুতরাং আর কি বলিব? এবার এই পর্য্যন্তই! এমন না করিলেই নয় কি?

স্বায়ত্ত-শাসনের সংস্কার আবশ্যক।

"অনুসন্ধান"-পত্রে বিস্তর বিষয়েরই অনুসন্ধান হইয়া থাকে; একারণ, স্বায়ত্ত-শাসন-বিষয়ের মূলগত কোন কোন দোষ ও অভাব অনুসন্ধান করিতে আমাদের ইচ্ছা হইয়াছে। এই ব্যাপার, যেরূপ উত্তারোত্তর গুরুতর দোষাশ্রিত হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে "অনুসন্ধান" পত্রেই ইহার আলোচনা হওয়া সঙ্গত বলিয়া মনে করিয়া, উহার পাঠকবর্গের সমক্ষে এই বিষয়ের গূঢ় রহস্য উপস্থিত করিলাম। এই প্রস্তাবে আমরা যথার্থ অবিচার ও অযোগ্য বিচারকের প্রকৃত চিত্র অঙ্কিত করিতেছি।

কি সহরে, কি মফঃস্বলে স্বায়ত্ত-শাসনের ত্রুটির কথা প্রায়ই শোনা যাইতেছে। অদ্য আমরা মফঃস্বলের স্বায়ত্ত-শাসনের দোষা-দোষের অনুশীলন করিয়া দেখাইব, অন্ততঃ স্থলবিশেষে অবস্থা-ভেদে উহার আমূল সংস্কার প্রয়োজনীয়। পল্লীগ্রামে নিরপেক্ষ লোক পাওয়া যায় না, এরূপ উক্তি প্রকাশ করা আমাদের অভিপ্রায় নয়। কিন্তু পাওয়া গেলে কি হইবে? অনেক স্থলে প্রায়ই শুনিতে পাইতেছি, অহরহঃ দেখিতেছি, ঐপ্রকার লোকেরা ঐ অবৈতনিক বাজে কাজে লিপ্ত থাকিতে রাজি নহেন। তাহার হেতু-নির্দ্দেশ-কালে তাঁহারা বলিয়া থাকেন,—"সুবিচার করিলেও, নিকৃষ্ট লোকের নিকট হইতে শাপ-সংবাদ হইতে নিষ্কৃতি নাই। অতএব উহাতে সংস্পৃষ্ট না থাকাই ভাল।"

কেহ কেহ হয় তো ভাবিবেন, আমরা একটা আজগুবি কথা বানাইয়া লিখিতে বসিলাম। যাঁহাদের মফঃস্বলের কিছুমাত্রও অভিজ্ঞতা আছে, তাঁহারা আমাদের উক্তিতে সায় দিতে বাধ্য হইবেন। আমরা কলিকাতা হইতেও ইহার এক উদাহরণ দেখাইতেছি। কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী ও প্রসিদ্ধ পুণ্যাত্মা রাধাকৃষ্ণ বসাকের পুত্রকে গবর্ণমেণ্ট, অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেট মনোনীত করিলে, পুত্র, পিতাকে উক্ত সমাচার বিজ্ঞাপন করেন। করিবামাত্র পিতা বাধা দিলেন ও বলিলেন,—"দেখ, তুমি চাক্ষুষ যাহা দেখ্‌বে না, তার বিচার কেমন ক'রে কর্‌বে, বল দেখি?" এই আপত্তির জন্যই তাঁহার পুত্র, ঐ সম্মানজনক ও মহা-লাভজনক পদবী গ্রহণ করিয়া মনস্বী ও যশস্বী বলিয়া সভ্যসমাজে খ্যাত হইতে পারিলেন না, ইহা কি কম মনস্তাপ! এইরূপ ধর্ম্মজ্ঞান কয় জনের আছে, এই প্রশ্ন উঠিবে, তাহা আমরা জানি। যাহারা ভাল লোক, তাহার সংখ্যাই বা কত, ইহাও প্রশ্ন-কারিগণের স্মরণ রাখা আবশ্যক। সুতরাং বলিতে হয়, অবৈতনিক মেজিষ্ট্রেটের দলে ভাল-লোক অতি কম। সে যাহা হউক, উৎকৃষ্ট লোকেরা সচরাচর অনাবশ্যক বলিয়া প্রতীত ঝন্‌ঝাট সহ্য করিতে নারাজ বলিয়া, অনেক সময় অনেক স্থানে অনেক অনুৎকৃষ্ট লোকই অবৈতনিক মাজিষ্ট্রেটের পদ গ্রহণ করিয়া বিচারাসন কলঙ্কিত, আপনাদের পাপ প্রবৃত্তি চরিতার্থ ও দেশে নীতির গতি মন্থর ও কলুষিত করিয়া দিতেছে, এই কথা আমরা বলিতেছি। স্বায়ত্ত-শাসনের পক্ষপাতী, অদূরদর্শীরা বলিবেন, আমাদের স্বদেশীয়দের দ্বারা বিচার-ভূমি সুশোভিত হইয়া থাকে।

পল্লীগ্রামে কোন কোন মাজিষ্ট্রেট্ স্বাধীন হইয়া বিচার করিতে অধিকার পাইয়াছে। উহাদের কাহারও কাহারও আবার দ্বিতীয়-শ্রেণীর ক্ষমতা। আমরা বলি, না না প্রস্তাব করি—উহাদিগকে অচিরেই প্রথম-শ্রেণীর ক্ষমতা দেওয়া হউক। তাহা হইলেই উহারা সত্বর ধর্ম্মের ন্যায়-ধ্বজা উড্ডীন করিয়া ধরাকে সরাজ্ঞান করিবে। উহাদের গুণ একমুখে কত ব্যক্ত করিব? বিচার-কালে উহারা ইংরেজী ভাষার সঙ্গে বঙ্গ-ভাষার বিবাহ দেয়। সাক্ষীর জোবানবন্দি, বাদী ও প্রতিবাদীর এজেহার লিখিবার কালেই ঐ সঙ্কর-বিবাহ ঘটিয়া থাকে। বিবাহের নমুনা, পাঠক দেখুন। যথা,—

"Where I am মাতুলের বিষয়ে প্রতিপালিত।" এমন মনোহর পরিণয় না দিলেই কি নয়? এমন সঙ্কর-পরিণয়ের পৌরোহিত্য করিয়া নিজেদের সঙ্কর-বর্ণে উৎপত্তির পরিচয় না দেখাইলে কি হাকিমি করা চলে! অজ্ঞ লোকে জয়ী হইয়া বলিবে, আহা হাকিম কি কম লোক,

কত ইংরেজী জানে! আমরা বলি, কত মত, যেমন তেমন ইংরেজী উহাদের পেটে আছে।

বিচারক মহোদয়গণের ধর্ম্মভীরুতার কথা পাঠকগণ অবহিত-মনে শ্রবণ করুন। বাদী প্রতিবাদী বা সাক্ষীর জোবানবন্দি লিখিয়া তাহাদিগকে পড়িয়া শোনান হয় নাই, অথচ ধর্ম্মাবতার অম্লান-বদনে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির হইয়া লিখিলেন,—"Read over and admitted correct" অর্থাৎ পড়িয়া শোনান হইল ও ঠিক বলিয়া স্বীকার করিল। ইহা অপেক্ষা দিবা-প্রহরে ডাকাতি বেশি গুরুতর দুষ্কর্ম্ম নয়। কেহ কেহ বা ইংরেজিতে "রায়" লেখেন। যাঁহার ভাষাবোধ নাই, কোন্ পদের সঙ্গে কোন্ পদের সম্বন্ধ ইত্যাদি কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞানাভাব, সেরূপ লোকে কি সাহসে, কেবল বাটী হইতে বাঁদি গৎ অভ্যাস করিয়া আসিয়া, কখন বাদীর, কখন বা প্রতিবাদার মাথা খায়! ভবিষ্যতে কার সর্ব্বনাশ হইবে, কার পৌষ হইবে, তার তাহা দেখিবার দরকার নাই। কি কথা বলিলে উত্তরকালে কাহার কি পরিমাণে ক্ষতি হইবে, তাহাও ঐ সকল হস্তি-মূর্খ—বুঝিতে চায় না। মাজিষ্ট্রেটের দেওয়ানীর যে দলিল দেখিবার সামর্থ্য নাই, সে দলিল দেখিতে চাইবে। দেখিয়াও, প্রত্যার্পণ করিবে না, ফাইল করিবে। অথচ ফাইল্ করিবার সময় বা ফেরৎ দিবার সময়ও কোন চিহ্ন-প্রয়োগ করিবে না। তবে ফাইল্ করা কেন?

স্থল-বিশেষে উকীলদিগকে অনরারি মাজিষ্ট্রেট্ করা হইয়াছে। যাহারা উকীল নয়, অথচ অনরারি মাজিষ্ট্রেট হইয়াছে, তাহাদিগকে বুঝি গবর্ণমেণ্ট আনাড়ি মনে করেন? আমাদের মতে সকলেই আনাড়ি। অনরারি মাজিষ্ট্রেটদিগকে আমাদের কোন কোন বন্ধু ব্যঙ্গ করিয়া "অনাহারী" সংজ্ঞা দিয়াছেন। ঐ সংজ্ঞা নিতান্ত বেঠিক নয়! যে উপবাসী, সেই অনাহারী। অনরারি মাজিষ্ট্রেটগণও বেতন পায় না; সুতরাং তাহারা ও বিষয়ে অনাহারী, তাহার সন্দেহ কি? যদি অনরারি হইতে অনাহারী হইল, তবে আনাড়ি কথাটাও উহা হইতে উৎপন্ন হউক না; উহাতে বাধা দিয়া কাজ কি? উহাদের কার্য্যে তো দেখিতেছি, উকীল-শ্রেণীভুক্ত অনরারি মাজিষ্ট্রেটই হউক, থুড়ি অনাহারী মাজিষ্ট্রেটই হউক, অন্যরূপ অনাহারী মাজিষ্ট্রেটই হউক, সকলেই আনাড়ী। কার্য্যেই তাহা সপ্রমাণ হইতেছে। সাদৃশ্য-মূলক শব্দতত্ত্ব অর্থাৎ Philology দ্বারা আমরা এই উপাদেয় মত পাইলাম।

উকীলদিগকে মাজিষ্ট্রেট্ করায় কি দোষ, তাহা লিখিয়া অদ্য আপাততঃ এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। উকীলদের সঙ্গে বাধ্য-বাধকতা লোকের প্রায়ই থাকে। অতএব উহাদিগকে বিচারক করায়, প্রচুর ক্ষতি দেখিতেছি। যে উকীল, দুই দণ্ড পূর্ব্বে হুজুর হইয়াছিলেন, তিনিই আবার দুই দণ্ড পরে অন্যকে লক্ষবার হুজুর হুজুর করিতেছেন, ইহা যেমন বিসদৃশ, তেমনই হানিকর। ইহাদিগকে অনুরোধ করা চলে। অতএব বলিতেছি, যদিই একান্তপক্ষে উকীলদিগকে ঐ পদ দিতে হয়, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্টের উচিত, নিরপেক্ষ অথচ কার্য্যদক্ষ উকীলকেই ঐ পদে নির্ব্বাচিত করা; অন্যথা পদে পদে বিচার-বিভ্রাটের সম্ভাবনা। আর যত বড়, যত ভাল উকীলই হউক না কেন, উহাদিগকে স্বাধীনভাবে অর্থাৎ একাকী বিচার করিতে দিবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। আমরা স্বায়ত্ত-শাসনের বিরোধী নহি, কিন্তু তাবৎ বিভ্রাটের বিরোধী, ইহা মুক্তকণ্ঠে সর্ব্ব-সমক্ষে ঘোষণা করিয়া বলিতেছি ও চিরকাল বলিব। স্বায়ত্ত-শাসনের অভাব-মোচন-সম্বন্ধে অদ্য আমরা এই পর্য্যন্ত বলিয়াই নীরব হইলাম। আবশ্যক বুঝিলে, বারান্তরে ইহার দীর্ঘ সমালোচনা করিব। এই সন্দর্ভে যাহা যাহা লিপিবদ্ধ করা গেল, প্রকৃত ঘটনা দৃষ্টি করিয়া, আদালতের কাগজ স্বচক্ষে দেখিয়া, পত্র ও চিঠি-পত্র পাঠ করিয়া, প্রবন্ধটি পত্রিকাস্থ করিয়াছি। যদি কাহারও সামর্থ্য থাকে, 'অগ্রসর হউন, প্রমাণ-প্রয়োগ করিয়া লেখনী ধারণ করুন। নতুবা বৃথা বাগ্‌জাল বিস্তার করিলে, তাহাতে সমাজের উপকার হইবে না; সুতরাং বলা বাহুল্য—আমরাও সেই নিষ্প্রয়োজন প্রতিবাদের উত্তর দিব না।—শ্রীমঃ—

অনুসন্ধান

অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র

৫ম খণ্ড] ৩০এ পৌষ, ১২৯৮। [১১শ সংখ্যা।

সাধক-সঙ্গীত।

(রাগিণী বিভাস—তাল আড়া।)

হৃৎকমলে চিন্তা কর বরাভয়-কর শিবা।
বৃথা বিষয় ভাবিয়ে, বল তব ফল কিবা॥
যাঁর কৃপাকণা-বলে, দুর্ল্লভ জনম লভিলে,
উচিত কি নয় তাঁর ধ্যান করা নিশি-দিবা॥
নিদ্রারূপা যাঁর কোলে, সুখে নিশি পোহাইলে,
চৈতন্যরূপিণীর কৃপায় পুন প্রাতে চেতন পেলে;
এহেন পরম ধনে, মানসিক আয়োজনে,
ভক্তিভাবে দৃঢ় মনে, কর মূঢ় তাঁর সেবা॥
সমাগতপ্রায় শমন, করিবে মহাশয়ন,
আর কি এদেহে, চেতন পেয়ে, কর্ব্বে তাঁর কীর্ত্তন।
বিষয়-মদে সদা মত্ত, দ্বিজ জগদ্বন্ধুর চিত্ত,
কালী নাম কর পথ্য, পুনঃ ভবে না ফিরিবা॥

অদৃষ্ট।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

মহামায়া শয্যাগত।

অপরের কথা লইয়া ব্যস্ত থাকা মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ। আমরা পাঁচজনে একস্থলে বসিয়া অপরাপর লোকের দোষগুণের পর্য্যালোচনা করি; মনে করি, আমরা যেন মনুষ্য নই এবং তাহাদিগের সহিত যেন আমাদের কোন সম্পর্ক নাই—তাহারা যে অভিপ্রায়ে যে আশয়ে কাজকর্ম্ম করে, আমরা যেন সে অভিপ্রায়ের সে আশয়ের আয়ত্বাধীন নই। আর, যদিও বলিয়াছি যে, আমরা পরের দোষগুণের পর্য্যলোচনা করি; কিন্তু, ভাবিয়া দেখিলে, আমরা পরের দোষেরই পর্য্যালোচনা করিয়া থাকি—গুণের নহে; এবং আমরা যে পাঁচজনে বসিয়া আছি, তাহার মধ্যে কাহারও কোন দোষ নাই, সমস্তই গুণ। উকীল ডাক্তারকে বলিতেছেন, অমুক দিবস আমাকে অমুক ঔষধ দ্বারা যে কত উপকার করিয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারি না। ইঞ্জিনিয়ার বলিতেছেন, আপনি ছিলেন বলিয়াই ঐ মকর্দ্দমাটিতে জয়লাভ করিয়াছিলাম—অপর কাহারও উপর ভার দিলে আমি কোন মতেই জয়ী হইতে পারিতাম না। আবার ডাক্তার, উকীল ও ইঞ্জিনিয়ার উভয়কেই, কোন না কোন কার্য্য করিয়াছেন বলিয়া অথবা কোন না কোন কার্য্য হইতে বিরত হইয়াছেন বলিয়া, ধন্যবাদ দিতেছেন। কিন্তু এ তিন জনেই একবাক্যে কহিতেছেন যে, অমুক ডাক্তার কোন কাজের নয়, অমুক উকীল দু'পক্ষ হইতেই টাকা লয়, এবং অমুক ইঞ্জিনিয়ার পাঁচ টাকার কার্য্য করিতে হইলে ছয় টাকা আত্মসাৎ করে। আমরা এপাড়ায় বসিয়া এরূপ বলিতেছি ও কহিতেছি, আবার ওপাড়ায় ঠিক ঐ ঐ মতন ব্যক্তি ঠিক ঐরূপ বলিতেছে ও কহিতেছে।

আমরা পরস্পরের গুণগান করিতেছি, তাহারাও পরস্পরের গুণগান করিতেছে; আমরা তাহাদিগকে নিন্দা করিতেছি, তাহারাও আমাদিগকে নিন্দা করিতেছে। কিন্তু ইহাতে তামাসা এই যে, আমাদিগের মধ্যে যিনি আগে উঠিয়া যান, তিনিও ওপাড়ার হইয়া পড়েন; অর্থাৎ আমরা উপস্থিত বক্রী কয়েক জনে মিলিয়া তাঁহারও নিন্দা করিতে আরম্ভ করি—তিনি ডাক্তারই হউন, আর ইঞ্জিনিয়ারই হউন, উকীলই হউন, আর যেই হউন। ওপাড়ার লোকেও ঠিক এইরূপ করিতেছে। তাহারাও, সকলে একত্রিত হইলে, আমাদিগের পাড়ার লোকের নিন্দা করিতেছে; এবং তাহাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি উঠিয়া গেলে, তাহারও নিন্দা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে। অতএব, অপরের বিষয়ই যদি আমাদিগের কথোপকথনের মূল হইল, তবে যে আমিও সেই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া আমার নিজের কথা ভুলিয়া যাইব, তাহার আর আশ্চর্য্য কি?

ইতিপূর্ব্বে বলিয়াছি, মহামায়ার শরীর দুর্ব্বল, চোক-মুখ রক্তশূন্য এবং অন্নে অরুচি হইয়াছিল; এবং কিরূপে, অথবা কোন ঔষধ সেবন করাইলে, এই পীড়ার উপকার হইতে পারে, তাহা জানিবার জন্য দুইজন ডাক্তারকে চিঠি লিখিয়াছিলাম। যথাসময়ে সে চিঠি-দু'খানির প্রত্যুত্তর পাইলাম। উভয় লেখকই একপ্রকার ঔষধের তালিকা পাঠাইয়াছিলেন; এবং আমিও ঠিক সেই ঔষধই এতদিন সেবন করাইতেছিলাম। কিন্তু যতই সেবন করাই, পীড়ার হ্রাস হওয়া দূরে থাকুক, ততই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পরিশেষে, মহামায়ার পা ফুলিয়া উঠিল, শরীর আরও কৃশ হইল, এবং অন্নে এত অরুচি বাড়িল যে, খাওয়া দূরে থাকুক, আহার্য্য দ্রব্য দেখিলেই তাহার বমী হইবার উপক্রম হইত। দুই এক দিবস অন্তে প্রকৃত বমীও কখন কখন হইতে লাগিল।

এতকাল পর্য্যন্ত মহামায়া নিজেই রন্ধনাদি করিয়া আসিতেছিল। সে যখন অত্যন্ত কাহিল হইয়া পড়িল, তখনও রন্ধন-কার্য্য হইতে বিরত হয় নাই। একদিবস প্রাতঃকালে মাতা হরিপদকে লইয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় মহামায়া তাঁহাকে ডাকিয়া কহিল,—"মা, আজ আমি রাঁধ্‌তে পার্‌বো বোধ হচ্চে না। আপনি গোপালের মাকে ডেকে পাঠান; কাল তার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে, আমি যদি না পারি তাহলে সে এসে চাট্টি রেঁধে দেবে।"

মা কহিলেন,—"বাছা, একথা আমি অনেকদিন থেকে বলে আস্‌ছি যে, কারুকে ডাকি; কিন্তু তা তুমি শুন্‌বে না! খেটে খেটে একেবারে শরীরের মাংস দড়ী হয়ে গেছে, তবু আমার কথা শুন্‌বে না! কথা কি না, যে রাঁধবে, সে চাট্টি খাবে—এও তোমার বরদাস্ত হবে না?"

মহামায়া কহিল,—"মা, যতদিন নিজে পারি ততদিন কেন পরকে ডেকে খেতে দেব? যখন নিজে না পারি, তখন আলাদা কথা। আজ আমি কোন মতে বিছানা থেকে উঠতে পাচ্ছি-নে; আমি পাল্লে কি আর কারুর খোসামোদ করি?"

মাতা।—বাছা, তুমি খেটে খেটে একেবারে কি হয়ে গিয়েছ, তা ত দেখ্‌তে পাওনা? চুপ করে শুয়ে থাক; আমি হরিপদকে নিয়ে গোপালের মাকে ডেকে আনি।

এই কথা বলিয়া, মাতা তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

আমি প্রাতঃকালে একটী পাঁঠার অনুসন্ধানে গিয়াছিলাম। মহামায়া আহার করিতে পারে না, এইজন্য ভাবিলাম,—যদি একটু পাঁঠার ঝোল ঔষধ বলিয়া খাওয়াইতে পারি, তাহা হইলেও এক পোয়া চালের ভাত খাওয়ার যা হইবেক। পাঁঠাও একটি পাইয়াছিলাম; কিন্তু একাকী একটী পাঁঠার মূল্য দিই, এরূপ ক্ষম

কালে আমার না থাকায়, আমি আর তিন চারি জন ভাগী জুটাইয়াছিলাম। পাঁঠাটী বাড়ী আনিয়াছি—অবিলম্বে কাটিব; কিন্তু ভাবিলাম, কাটিবার পূর্ব্বে একবার মহামায়াকে দেখিয়া আসি। গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, মহামায়া শয্যায় একবার এপাশ একবার ওপাশ করিতেছে। আমাকে দেখিয়া কহিল,—"এতক্ষণ কোথায় ছিলে? আজ কি তোমার কাজে বেরোবার দিন?" আমি যেজন্য গিয়াছিলাম, তাহা গোপন করিলাম—পাছে মহামায়া জানিতে পারিলে মাংসের ঝোল না খায়! আমি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছি দেখিয়া, মহামায়া কহিল,—"মা গোপালের মাকে ডাক্‌তে গিয়েছেন, তিনি কি এসেছেন?" আমি কহিলাম,—"মাকে তো দেখ্‌তে পাচ্ছি-নে; তিনি গোপালের মাকে ডাক্‌তে গেলেন কেন?"

মহামায়া কহিল,—"আজ আর আমি রাঁধবে পার্‌বো না, আমার আজ আর উঠবার শক্তি নেই, এইজন্য গোপালের মাকে ডাক্‌তে বল্লাম—সে এসে তোমাদের জন্যে সকাল সকাল চাট্টি রেঁদে দেবে।"

আমি কহিলাম,—"মহামায়া, একথা তো আমিও অনেক দিন থেকে বলে আস্‌ছি, মাও বল্‌চেন; তবু তুমি কোন মতে শুন্‌বে না! যদি এতদিন নিজে পরিশ্রম করে কাজকর্ম্ম না কর্‌তে, তা'হলে এতদিনে আরাম হ'তে পার্‌তে।"

মহামায়া।—আমার কি আরাম হবার ব্যাম যে, আরাম হবো? আমি কি কিছু জান্‌তে পারিনে, না টের পাইনে? আমার এ আরাম হবার ব্যাম নয়। এতদিন রাঁধবার জন্য অপর কারুকে আন্‌তে দিই-নি, তার কারণ এই যে, যে আস্‌বে, সেই তো চারটী খাবে; অথচ আমি আরাম হবো না; তবে এ লোকসানের দরকার কি? আজ আন্‌তে বল্লাম, কারণ আজই আমার মৃত্যু হ'বে। আমার হাত-পা অবশ হয়ে আস্‌চে। বাঁচবার আর আমার অধিকক্ষণ নাই।

আমি বলিলাম,—"ছি ছি, অমন কথা মুখে এন-না! ওসব কথা কি মুখে আন্‌তে আছে? তোমার হয়েছে কি, তুমি কেন বাঁচবে না?"

মহামায়া।—আর ওসব কথায় কোন কাজ নেই। তুমি যদি যথার্থ বুঝতে না পেরে থাক, তবে একবার আমার হাতটা ধরে দেখ?

আমি দেখিয়াই ভীত হইলাম। আমার মুখ শুখাইয়া গেল। গা-হাত-পা ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল, কপালে ঘর্ম্ম দেখা দিল। মহামায়ার হাতে নাড়ী নাই, কিন্তু তথাপি তরতর করিয়া কথা কহিতেছে! মহামায়ার হাত দেখিয়া আমি বাকশূন্য হইয়া অমনি দাঁড়াইয়া আছি! এক্ষণে বোধ হইতেছে, আমি তখন দুই এক মিনিট কাল চৈতন্যশূন্য হইয়াছিলাম। মহামায়া আমার চেহারা দেখিয়া আমার অবস্থা বুঝিতে পারিল। পারিয়া কহিল,—"বোস, বোস, এই বিছানার ধারে বোস; কত কাল যে আর তোমার সহিত সাক্ষাৎ হ'বে না, তা বলা যায় না। এখনও সময় আছে, দুএকটা কথা বলে-কয়েও যাই—শুনেও যাই।" এই বলিয়া, আমার হস্ত ধরিয়া, বিছানার পার্শ্বে বসাইল; কহিল,—"আমার তো শেষ-কাল উপস্থিত, তার দারুণ তুমি দুঃখ ক'রো না। তোমার হাতে পরমেশ্বর আমাকে দিয়াছিলেন বলিয়া, আমার যে কত সুখ হয়েছে, তাহা বলিতে পারি না। রাজা-উজীরের সহিত বিবাহ হলেও আমার এরূপ সুখ হ'ত না। আমি যে এই পীড়ায় মরিব, ইহা আমি আগে থেকে জান্‌তাম। সেইজন্য, তুমি যত ঔষধ দিয়েছিলে, তার এক বিন্দুও আমি খাই-নি। ঐ আমার পেটরায় দেখ, সমস্তই মজুত আছে। তোমরা ভাবী কথা টের পাও কি না পাও বল্‌তে পারি না; কিন্তু সতী স্ত্রী ভবিষ্যতের কথা বল্‌তে

পারে। আমি যেই জানিতে পারিলাম যে, আমি আর বাঁচবো না, অমনি ঔষধ ত্যাগ কর্‌লাম! আমার এ সংসারে যার-পর-নাই সুখ হয়েছে; আমার সে বিষয়ে কোন দুঃখ নাই। তোমাকে ছাড়িয়া যাইতেছি, তাহাতেও আমার দুঃখ নাই; বরঞ্চ সুখই আছে। হরি-পদকে তো রাখিয়াই যাইব—সকলেরই কামনা পুত্রকে রাখিয়া যায়! আমার এক দুঃখ এই যে, আমার শ্বাশুড়ীর যত্নের ত্রুটী হ'বে। আমার নিজের বাপ-মা আমাকে বহুকাল ত্যাগ করেছেন। তোমার মাই আমার মা। পাছে ওঁর কষ্ট হয়, এই আমার দুঃখ।"

মহামায়ার কথা সহ্য করিতে না পারিয়া আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম; কহিলাম,—"মহা-মায়া, আর কষ্ট দিওনা! আমার বুক কি পাষাণ দিয়ে গড়া, যে এ সব সবে?"

মহামায়া।—আমি জানি, তোমার এসব কথা শুন্‌লে কষ্ট হবে; কিন্তু না বোল্লেও তো নয়? পরকালে তোমার সঙ্গে দেখা হবেই হবে; কিন্তু যেন সেটা শিগ্‌গির না হয়! সেইজন্যই কতকগুলো কথা বলছি—মনো-যোগ করে শোনো।

আমি কহিলাম,—"কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দেবে, দেও—বলবে, বল?"

মহামায়া।—একবার আমার বাপকে ও মাকে ডেকে দাও,—তোমার শ্বশুর আর তোমার শ্বাশুড়ীকে! কিন্তু তুমি নিজে যেও না। বোধ হয়, আমার এ হাল শুন্‌লে, তাঁরা অবশ্যই আস্‌বেন।

মহামায়ার কথা-ক্রমে আমি রামের মাকে সত্বর আমার শ্বশুর-বাটী পাঠাইয়া দিলাম! রামের মা প্রথমতঃ আমার শ্বাশুড়ী-ঠাকুরাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল। তিনি, আমার স্ত্রীর অবস্থার কথা শুনিয়া, সেই দণ্ডেই আমা-দিগের বাটীতে আসিবেন মনে করিলেন; কিন্তু কর্ত্তার বিনা অনুমতিতে আসিতে পারেন না, এইজন্য কর্ত্তাকে ডাকিয়া আনি বার জন্য রামের মাকে পাঠাইলেন। জয় দুর্গা এসময়ে পিত্রালয়ে ছিলেন; সুতরা জয়গোপালও এসময় শ্বশুরালয়ে উপস্থিত কর্ত্তা-মহাশয় জয়গোপালের সহিত শাস্ত্রে ও আইনের আলাপ করিতেছিলেন! সুতরা রামের মাতা গিয়া ডাকিবার অন্তত: অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে তাঁহার মনে হইল যে, বাটী ভিতর হইতে তাঁহাকে ডাকিতে আসিয়া ছিল। একথা স্মরণ হওয়ায়, তিনি আস্তে ব্যস্তে হরি-নামাঙ্কিত দেহ অন্তঃপুর অভি মুখে পরিচালন করিলেন। অর্দ্ধপথে জয় দুর্গার সহিত সাক্ষাৎ হইল। জয়দুর্গা কহি লেন,—"তোমার বড়-কন্যা ডেকে পাঠিয়েছেন এখানে যখন ছিলেন, তখন দুদ-মাছ চুরী ক'রে খেতেন; কিন্তু নিজের বাড়ীতে তত দুধ বা কোথায় পাবেন, তত মাছই বা কোথা পাবেন! তাই বোধ হয়, একটু কাহিল হ'য়ে ছেন, আর সেইজন্য আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন—তাঁহার মনের ভাব বোধ হ এই যে, আপনি গিয়ে দেখে-শুনে তাঁকে মাসে মাসে কিছু দেন।"

কর্ত্তা কহিলেন,—"এইজন্যে এত ডাক এইজন্যেই কি তোমার গর্ভধারিণী আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন?"

জয়দুর্গা।—আমার বোধ হয় এই! কি তবু একবার তাঁর সঙ্গে গিয়ে দেখা করুন চলুন, আমিও যাচ্চি।

অতঃপর উভয়ে অন্তঃপুরে গিয়া দেখি লেন, গৃহিণী নিঃশব্দে অশ্রুপাত করিতেছেন স্বামীকে দেখিয়া তিনি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদি কহিলেন,—"মহামায়া বুঝি এতকালের প আমাকে ফাঁকি দিল! আহা, বাছা আমা বড় কষ্ট পেয়েছে, বড় দুঃখ সয়েছে; কি যত কষ্ট হোক, যত দুঃখ হোক, কা কাহাকেও জানায়-নি। সে সাধারণ ক

কথা কখন বলিয়া পাঠায়-নি! আমার ন বড় খারাপ হয়েছে; বিশেষ, কাল রাত্রে মি বড় একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি! আমার চ্ছা করিতেছে, আমি যদি পাখী হতাম হলে এখনই উড়ে গিয়ে বাছাকে কোলে ইয়ে আমার বুক শীতল কর্‌তাম। মি কি ভাবছ? কেন এত দেরী কর্‌ছ? ছা আমার সহজ কষ্টে এরূপ খবর াঠায়-নি। চল, এখনই চল; দেরী রিলে, বোধ হয়, আর মহামায়ার সহিত দেখা হবে না!"

কর্ত্তা রাগত হইয়া কহিলেন,—"তোমার কি একবিন্দুও বুদ্ধি-সুদ্ধি নেই? দেখতে াচ্ছ না, গরিব লোকে টাকার জন্যে কত ময় কত ফিকির করে! তা ত তুমি বোঝ া! তুমি কেবল—"

কর্ত্তার কথা শেষ হইতে না হইতেই জয়-দুর্গা কহিলেন,—"বাবা, সেই কথাটা মাকে বুঝিয়ে বলুন! আজ ভোর-বেলা অবধি, 'মহামায়া মহামায়া' ক'রে, বাড়ী-শুদ্ধ লোক-গুলোকে পাগল করে তুলেছেন! ওঁর বিবে-চনায়, আমিও কেউ না, আর কেউও কিছু নয়, ওঁর মহামায়াই সর্ব্বস্ব! কিন্তু এতদিন ওঁর মহামায়া বাপ-মার জন্যে কি কল্লে, তা তো দেখতেও পেলাম না, শুন্‌তেও পেলাম না!"

এই মিষ্ট কথাগুলি শ্রবণ করিয়া, গৃহিণী কহিলেন,—"জয়দুর্গা, মা, থাম! আমি তোমাকে কিছু বল্‌ছি-নে! আমি তাহাকেও গর্ভে ধরেছিলাম, তোমাকেও গর্ভে ধরে-ছিলাম; তোমরা বড়-মানুষই হও, আর গরিবই হও, আমার কাছে তোমরা দুই-ই সমান! আমার কড়ে আঙ্গুলটী কাট্‌লেও যেরূপ কষ্ট, বুড় আঙ্গুলটী কাট্‌লেও সেইরূপ কষ্ট! আমি কর্ত্তাকে বলছি—ইচ্ছে হয়, চলুন; না হয়, আমি নিজে চলে যাব।"

এই বলিয়া, গৃহিণী গাত্রোত্থান করিয়া, যাইতে উদ্যত হইলেন।

জয়দুর্গা কহিলেন,—"যাও যাও, আমিও বাড়ী চল্লাম।" ভাবিলেন, এই ভয়-প্রদর্শন করাইলে, তাঁহার মাতা কখনই যাইতে পারিবেন না। কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোককে কেহ ফিরাইতে পারে না। গৃহিণী, ক্ষিপ্তের ন্যায় গৃহ পরিত্যাগ করিয়া, জামাতার বাটী যাইবার রাস্তা অবলম্বন করিলেন। কর্ত্তা ও জয়দুর্গা পরস্পর মুখাবলোকন করিতে লাগি-লেন। ক্ষণকাল নিঃশব্দে থাকিয়া জয়দুর্গা কহিলেন,—"দেখ্‌লে বাবা, মায়ের আচরণটা? আমি কেউ হ'লাম না, আর কেউ কিছু হলো না! একটা অতিথি বাড়ী এলে লোকে যে যত্ন করে, মা আমাদের জন্যে তেমনও কল্লেন না।"

কর্ত্তা একদৃষ্টে মাটীর দিকে তাকাইয়া আছেন। জয়দুর্গা যাহা কহিলেন, হয় তাহা শুনিতে পাইলেন না, অথবা শুনিতে পাইয়াও কোন উত্তর করিলেন না। বোধ হইল, রক্তের নিকট অর্থ পরাজিত হইল। স্বভাবের কাছে শিল্প হার মানিল। তাঁহার একবার মহামায়ার আজন্ম-বৃত্তান্ত স্মরণ হইল—তাহার জীবনে কখন কোন দোষ দেখিতে পাইলেন না। তাঁহারও মনে হইল, একবার যাইয়া মহামায়াকে দেখিয়া আইসেন, অথবা তাহাকে নিজ-বাটীতে আনয়ন করেন।

পিতাকে নিস্তব্ধ দেখিয়া জয়দুর্গা কহিলেন, "বাবা, তুমিও কি মার মত পাগল হ'লে? কি ভাব্‌ছ? দিদির কি যথার্থ ব্যায়রাম হয়েছে, মনে করছ? তাহলে কি কম্পাউণ্ডার বাবু আস্‌তেন না? রামার মা আস্‌বে কেন? বুঝ্‌তে পাচ্ছ না, চাকরি গিয়েছে বলে কষ্ট হয়েচে! তুমি সে কষ্ট দেখ্‌লে, থাক্‌তে পার্‌বে না, কিছু-না-কিছু দেবেই; সেইজন্য এ ডাক! যে মাছ চুরী করে খায়, দুদ চুরি করে খায়,

তার তো বাপ-মায়ের উপর বড়ই ভক্তি! আমার একথা বলা উচিত নয়, কিন্তু না বোল্লেও থাকতে পারা যায় না। যদি ইচ্ছে হয়ে থাকে, এই দণ্ডেই গিয়ে দেখে আসুন। কিন্তু বাড়ীতে কুটুম্ব আছে, সে কথাও যেন মনে থাকে।"

লৌহ উত্তাপে নরম হয়, দ্রবও হইয়া যায়। শীতল হইতে আরম্ভ হইলেই কঠিন হইতে থাকে। কর্ত্তার লৌহ-হৃদয় প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ নরম হইয়াছিল, জয়দুর্গার কথায় এক্ষণে পুনরায় লৌহবৎ হইল। মন্ত্রের ফল ফলিতেছে দেখিয়া, জয়দুর্গা আরও দু'এক কথা বলিলেন। যখন দেখিলেন, তাঁহার ইচ্ছানুরূপ ফল ফলিতেছে, তখন তিনি চুপ করিলেন। কর্ত্তাও, ঈষৎ হাস্য করিয়া, বৈঠকখানার দিকে যাইতে উদ্যত হইলেন। তখন জয়দুর্গা পুনরপি কহিলেন,—"এখন মার জন্যে কি করা যায়? তিনি বোধ হয়, এতক্ষণ গিয়ে সেখানে পৌঁছিয়েছেন। কারুকে কি পাঠিয়ে দেওয়া ভাল হয় না?"

কর্ত্তা।—এখন কাকে পাঠিয়ে দিই, কেই বা যাবে?

জয়দুর্গা।—কেন, বাবুর সঙ্গে যে চাকর এসেছে, সে তো সে বাড়ী চেনে? তাকে পাঠালে কি হয় না?

কর্ত্তা।—ঠিক, ঠিক বলেছ! আমি সত্বর গিয়ে তাকেই পাঠিয়ে দিচ্ছি।

এই বলিয়া কর্ত্তা বহির্বাটী গমন করিলেন। জয়দুর্গাও আপন পুত্রটীকে বেশভূষা করাইয়া তাহার পিতার নিকট পাঠাইয়া দিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

মাতৃ সম্ভাষণ।

বোধ হয়, স্বপ্নে সকলেই কোন না কোন সময়ে দৌড়িয়াছেন। সে দৌড়ান কেমন ও তাহাতে কিরূপ কষ্ট হয়, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। গৃহিণী বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যতই মহামায়ার কথা ভাবিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার দ্রুতবেগে দৌড়াইতে ইচ্ছা হইতে লাগিল। দৌড়িয়া দৌড়িয়া নদী-তীরে আসিয়া দেখিলেন, নৌকা অপর পারে রহিয়াছে। রামের মাতা গৃহিণীর সঙ্গে সঙ্গেই আসিতেছে। সে কহিল, সে নিজে ওপারে গিয়া নৌকা আনয়ন করিবে। গৃহিণীর তত বিলম্ব বরদাস্ত হইল না। তিনিও রামের মাতার সহিত পদব্রজে নদী পার হইলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, নদীতে বর্ষাকাল ভিন্ন অন্য সময়ে অতি অল্পই জল থাকিত। সুতরাং সে নদী পার হইতে কাহারও কোন ভয় হইত না।

নদী পার হইয়া মুহূর্ত্তেক-মধ্যে গৃহিণী গিয়া কন্যার বাটীতে উপস্থিত হইলেন। অনেক দিন অবধি তিনিও, কনিষ্ঠা কন্যার পরামর্শানুসারে, জ্যেষ্ঠা কন্যার প্রতি জননীর যেরূপ উচিত, সেরূপ স্নেহ করেন নাই। মহামায়াকে শেষ-দশাপন্ন দেখিয়া, এই সমস্ত কথা, চিত্রপট-দর্শনের ন্যায়, তাঁহার মনে এককালে উদিত হইল। তিনি মহামায়ার শয্যা-পার্শ্বে গিয়া, মহামায়ার গলা ধরিয়া, কাঁদিয়া উঠিলেন; কহিলেন,—"মহামায়া, আমি বুড়া-মানুষ, আমি হিতাহিত ভালমন্দ সমস্তই ভুলিয়া গিয়াছি। কিন্তু তা বলিয়া তোমারও কি উচিত যে, তুমিও হিতাহিত ভুলিয়া যাইবে? আমি তোমাদিগকে রাখিয়া চলিয়া যাইব, তোমরা হায় হায় করিবে—কাঁদিবে, এই ত ভাবিয়াছিলাম! কিন্তু, তা না করিয়া, তুমিই আমার আগে চলিয়া যাইতেছ, এ দুঃখ আমি কোথায় রাখিব? মহামায়া, লোকের কথায় ভুলিয়া তোমাকে আমি বিস্তর কষ্ট দিয়াছি; সেই সমস্ত কি তুমি একেবারে এইরূপে শোধ দিলে?"

মহামায়ার চক্ষু কপালে উঠিয়াছে! আমি তাহার বিস্তর অনুরোধ-ক্রমে এতক্ষণ তাহার নিকট বসিয়া ছিলাম। কিন্তু এই

সমস্ত কথা শুনিয়া, তথায় আর থাকিতে না পারিয়া, স্থানান্তরে যাইবার উপক্রম করিলাম। প্রদীপ যেরূপ নির্ব্বাপিত হইবার পূর্ব্বে দুই-চারিবার বড় হইয়া জ্বলিয়া উঠে এবং পরক্ষণেই হীনতেজ হইয়া যায়, সেইরূপ মহামায়ার মনোবৃত্তি সকল এক-একবার উত্তেজিত ও এক-একবার তদ্বিপরীত হইতে লাগিল। আমার চলিয়া যাইবার উপক্রম দেখিয়া ও তাহার মাতার ক্রন্দন শুনিয়া, তাহার মনোবৃত্তি যেন হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া উঠিল। আমার দিকে তাকাইয়া কহিল,—"এখন কোথায় যাইতেছ! আর কতক্ষণ তোমার সহিত এসংসারে বাস করির? আমি একটা কথা বলি, শোন! মা, তুমিও শোন! তুমি আমাকে বড় ভালবাস বলিয়া যে আমি এই শেষকালে ডাকাইয়া পাঠাইয়াছি, তাহা নহে। তোমার সহিত একটী বিশেষ কথা কহিবার প্রয়োজন আছে; সেইজন্যই তোমাকে ডাকা। বাবাকেও ডাকিয়াছিলাম; কিন্তু আমি কম্পাউণ্ডারের স্ত্রী বলিয়া তিনি ঘৃণা করিয়া আসিলেন না! আমি কম্পাউণ্ডারের স্ত্রীই হই, আর যারই স্ত্রী হই, আমি ত স্বয়ম্বরা হইয়াছিলাম না! আপনারা যেমন ভাল বুঝিয়াছিলেন, সেইখানেই আমার বিবাহ দিয়াছিলেন। ইহাতে আমার দোষ কি? যদি ইহাতে কাহারও কোন দোষ থাকে, সে দোষ আপনাদেরই! ছোট কন্যাকে বড় ঘরে বিবাহ দিয়াছেন, সুতরাং ছোট কন্যা ও ছোট জামাই আপনাদের শিরোমণি হইয়াছেন!" মহামায়া এতদূর বলিলে, হঠাৎ যেন মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। তদ্দর্শনে, গৃহিণী উচ্চৈস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন; কহিলেন,—"মহামায়া, আমার ঘাট হয়েছে, আমাকে মাপ কর! হাজার হলেও আমি তোমার মা, আমাকে আর কষ্ট দিও না!"

একটু পরেই মহামায়া পুনরায় কহিলেন,—"আমার রাঁধা তরকারিতে কে নুন-ঝাল বেশী করিয়া দিত, তাহা একরূপ নিশ্চয় জানিয়াছি; কিন্তু আমার মনে দুঃখ রহিয়া গেল যে, কে আমার পাতে চুরী করিয়া মাছ রাখিয়া দিত, তাহাকে ধরিয়া দিতে পারিলাম না। মা, মরিবার সময় লোকে মিথ্যা কথা কহে না; আমিও অতি অল্পক্ষণের মধ্যে মরিব; কিন্তু আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি কখনও তোমাদের বাড়ীর একটুকরা আঁইসও চুরী করিয়া খাই নাই।" এইকথা বলিতে বলিতে মহামায়ার চক্ষু হইতে জল পড়িতে লাগিল। আমি কহিলাম,—"তুমি কি পাগল হইলে, যে এমন সময় এমন কথা বলিতেছ? তুমি মরবে, কে বল্লে? অবশ্য তুমি দুর্ব্বল হইয়াছ; কিন্তু তাহার কি ঔষধ নাই?"

ইতিপূর্ব্বে আমার শ্বাশুড়ী-ঠাকুরাণী উপস্থিত থাকিলে মহামায়া আমার সহিত কখনও কথা কহে নাই। কিন্তু অদ্য আমার উল্লিখিত কথা শুনিয়া, আমার দিকে তাকাইয়া, কহিল—"পীড়ার ঔষধ আছে; কিন্তু যমে ধরিলে তাহার কি ঔষধ আছে? তুমি একটু কাছে এস, আমার একটা কথা আছে।" এই কথা শুনিয়া, আমি একটু অগ্রসর হইলাম। অগ্রসর হইলে, আমার হাত-দু'খানি ধরিয়া নিজের মস্তকে সংস্থাপন করিয়া, মহামায়া কহিল,—"আমি তোমাকে বলিতেছি যে, আমি মরিলে তুমি পুনরায় বিবাহ করিও। কিন্তু হরিপদকে আমি যেরূপ প্রতিপালন করিয়া আসিয়াছি, তুমি সেইরূপ করিবে। উহার প্রতিপালনের ভার আর কাহারও হাতে দিবে না। মাতা যতদিন আছেন, ততদিন হরিপদর জন্য তোমাকে কোন কষ্ট করিতে হইবে না। কিন্তু মাতা আর অধিক দিন টিকিবেন না; আমি যেখানে যাইতেছি, তিনিও সত্বর সেইখানে যাইবেন। তাহার পর-হরিপদর ভার তোমার উপর রহিল। বিধাতা আমাকে দুই দ্রব্যে যৎপরোনাস্তি সুখী করিয়াছেন;—বোধ হয়, আমার স্বামীর ন্যায় স্বামী

কোন রাজরাণীরও হয় নাই,আমার পুত্রের ন্যায় পুত্রও কাহারও কখন হয় নাই, হইবেও না।"

আমি কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলাম, "মহামায়া, কি বলিতেছ, ! একেবারে পাগল হয়ে গিয়েছ নাকি ? এখানে মা বসে আছেন।" মহামায়া কহিল,—"আমি সেইজন্যই বলিতেছি,উনি একবার জন্মের মত আমার মনের কথা শুনিয়া নেন্। তুমি উকীলও নও, হাকিমও নও, জমীদারও নও, বাদসাও নও ; তথাপি তোমার হাতে পড়িয়া যেরূপ সুখী হইয়াছি, রাজরাণী হইলেও আমার এরূপ সুখ কখনও হইত না। আমার পিতা যতদিন দরিদ্র ছিলেন, ততদিন এসমস্ত বুঝিতেন, আজকাল বড়মানুষ হইয়া এসমস্ত কিছুই বুঝিতে পারেন না।" পরে তাহার মাতার দিকে তাকাইয়া কহিল,—"মা, একথাগুলি বাবাকে বোলো ; আর একটু পায়ের ধূলা আমার মাথায় দাও। আর কথা কহিতে পারি না, আমার দম বন্ধ হইয়া আসিতেছে।" এই বলিয়া, মহামায়া চক্ষু মুদ্রিত করিল। অমনি কণ্ঠশ্বাস উপস্থিত হইল ; মহামায়া সে চক্ষু আর খুলিল না। আমি ও শাশুড়ী-ঠাকুরাণী উভয়ে ধরাধরি করিয়া তাহাকে বাহিরে আনিলাম। মহামায়ার জীবনের শেষ অঙ্ক সমাপ্ত হইল।

যোগ ও যোগানুষ্ঠান।*

ভক্ত-ভাব।—'ভক্তি-রসামৃত-সিন্ধুতে' ভক্তি-ভক্তের বিবিধ ভেদ ও উদাহরণ-সমূহ বহু-বিস্তৃতরূপে বর্ণিত রহিয়াছে। বাহুল্যভয়ে, তদ্বিবরণে বিরত হইয়া, পূর্ব্বোক্ত ভক্তিযুক্ত ব্যক্তিদিগের বিস্পষ্ট লক্ষণ প্রদর্শনার্থে এ প্রবন্ধ প্রকটিত হইতেছে। পদ্মপুরাণের উত্তর খণ্ডে ১০১ অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে,—

"প্রেম্না সংজতয়াভক্ত্যা তনুমুৎপুলকান্বিতঃ।
বিভর্ত্ত্যলৌকিকংভক্তো বদেদ্ধসতি নৃত্যতি।
পরমানন্দযুক্তোঽসৌ ক্বচিদ্রায়তি নন্দতি।
ক্রন্দত্যচ্যুতভাবেন গদ্গাদেন পুনঃপুনঃ।
অনুশীলয়তি ভজেৎ গোবিন্দমনুমোদতে।
তরেদেবং বিষ্ণুমায়াং দুস্তরাং মুনিমোহিনীং।
সর্ব্বত্রেশ্বর বুদ্ধ্যাযো ভজেদীশং সনাতনং।
সতত্ত্ববাদীভক্তশ্চ সর্ব্বভূতসুহৃত্তমঃ॥"

অর্থ,—ঈশ্বরপরায়ণ ব্যক্তির প্রেমানুগ ভক্তি দ্বারা ঈশ্বর-কথা-মাত্রেই শরীরে রোমা হয়, এবং অলৌকিক ভাবের উদয় হয়। সে ভক্ত কখনও বা হরিগুণ গায়, কখন বা হা কখন কখন নৃত্য করে, কখন বা গদ্গাদভা বারবার ক্রন্দন করে, কখন বা ঈশ্বরানুশীল করে, কখন বা ভজনা করে, এবং কখন গোবিন্দ-বিষয়ে অনুমোদন করিয়া থাকে। এই রূপেই ভক্ত দুস্তরা মুনিজন-মোহিনী বিষ্ণু মায়া হইতে নিস্তার পায়। অপিচ সর্ব্বত্র ঈশ্বর-বুদ্ধি দ্বারা যিনি সনাত পরমেশ্বরকে ভজন করেন, তাঁহাকে সর্ব ভূতের সুহৃদ্বর তত্ত্ববাদী ভক্ত জা বেন। ভক্তেরও উত্তমাধম-মধ্যম-ভে ত্রিবিধ ভেদ আছে। ভক্তি-প্রকা প্রবন্ধে অনাবশ্যক বলিয়া উপেক্ষি হইল।

ভক্তি-মাহাত্ম্য।—ভক্তির মাহাত্ম্য প্রকা শাস্ত্রক প্রমাণ-সমূহে কোন-না কোনপ্রকা দেবতার নাম নির্দ্দেশ প্রায়শঃই দেখা যায় সেই সেই দেবতাগণ স্বীয় আরাধ্য দেবতা উপলক্ষণ বলিয়া, পণ্ডিতগণ মীমাংসা করি থাকেন। সুতরাং সাকার দেবগণ নিরাকার পর ও নিরাকার দেবপদও সাকার দেবপ হইতে বাধা নাই। সর্ব্ব-সম্প্রদায়েই এই মীমাংসা প্রসিদ্ধা রহিয়াছে। অতএব প্রামাণ্য বচনস্থ দেবপদ সকল উপলক্ষণ করিয়া এই স্থলেও সমন্বয় করিতে হইবে। মহাভারতে অন্তর্গত শ্রীভগবতী গীতাতে (১৫শ অংশে) উক্ত হইয়াছে,—

* পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের শেষ।

নাৎ সংজায়তে মুক্তির্ভক্তিজ্ঞানস্য কারণং।
ৎ সংজায়তে ভক্তি ধর্ম্মো যজ্ঞাদিকোমতঃ॥"

অর্থ,—যেই জ্ঞান হইতে মুক্তি জন্মিয়া ক, সেই জ্ঞানের কারণ ভক্তি, ধর্ম্মানুষ্ঠান া ভক্তি জন্মে, যজ্ঞাদি কর্ম্মানুষ্ঠানকেই ধর্ম্ম য়া জানিবে। ইহা দ্বারা প্রমাণ হইতেছে পরম পুরুষার্থ মুক্তিও (নির্ব্বাণাদি) ভক্তি তীত হয় না। ভক্তিরূপ কারণ ব্যতীত মুক্তি া কার্য্যের উৎপত্তি বলিলে কারণ ব্যভিচারী হয়, অর্থাৎ কারণ ব্যতীত কার্য্যোৎপত্তি বিমত-বিরুদ্ধ। অতএব জ্ঞান-কারণীভূত ক্তির প্রাধান্য প্রকাশ হইল। অপিচ তত্রৈব, হিমালয়ং প্রতি ভগবত্যা বাকং। যথা,—

"কিন্তে তদ্দুর্ল্লভং তাত! মদ্ভক্তিবিমুখাত্মনাং।
অতোভক্তিঃপরাকার্য্যা ময়ি যত্নাম্মুমুক্ষুভিঃ॥"

অর্থ,— হে পিতঃ হিমালয়! ঈশ্বর-ভক্তি-বিমুখ ব্যক্তিদিগের পূর্ব্বোক্ত আত্মসাক্ষাৎকার ও নির্ব্বাণ দুষ্প্রাপ্য বলিয়া জানিবে। অতএব মুমুক্ষুগণ ঈশ্বরে (আমাতে) যত্নক্রমে পরমা-ভক্তি করিবেক। ইহা দ্বারা ভক্তি ব্যতীত মুক্তি বা ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার না হওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ হইতেছে। শ্রীমদ্ভাগবত গীতাতে উক্ত আছে,—

নাহং বেদৈর্ন তপসা নদানেন নচেজ্যয়া।
শক্য এবং বিধোদ্রষ্টুং দ্রষ্টবানসি মাং যথা॥
ভক্ত্যাত্বনন্বয়া শক্যো হ্যহমেবং বিধোর্জ্জুন।
জ্ঞাতুংদ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥"

গীতা, ১১শ অধ্যায়। ৫৩। ৫৪ শ্লোক।

অর্থ,—বিশ্বরূপ প্রদর্শন-প্রসঙ্গে ভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—হে অর্জ্জুন! (বিশ্বরূপ দর্শন-প্রসঙ্গে) তুমি আমাকে যে রূপী দর্শন করিলে, ঈদৃশ রূপ-দর্শন, বেদানুশীলন, তপস্যানুষ্ঠান, দান এবং যজ্ঞাদি কর্ম্মাচরণ-জনিত পুণ্য দ্বারা কদাপিও হইতে পারে না। হে পরন্তপ অর্জ্জুন! ঈশ্বরৈক নিষ্ঠা ভক্তি দ্বারাই বিশ্বরূপী আমাকে যথার্থতঃ জ্ঞান ও দর্শন এবং আমাতে প্রবেশ করিতে সমর্থ হয়।

ইহা দ্বারা সম্পূর্ণ প্রমাণ হইতেছে,দৃঢ়া ভক্তি ব্যতীত ঈশ্বর-জ্ঞান, ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার ও ঈশ্বরে প্রবেশ (নির্ব্বাণ) কদাপিও সম্ভবে না। প্রত্যুতঃ ভক্তিই জ্ঞানের কারণ, ভক্তিই ঈশ্বর-সাক্ষাৎকারের কারণ, এবং ভক্তিই মুক্তির কারণ। অতএব ঈশ্বর আরাধনাতে ভক্তি অন্তরঙ্গ উপায়। এই অভ্রান্ত সত্য সকল ধর্ম্মেই দেদীপ্যমান রহিয়াছে। ভক্তিহীন উপাসনা করিতে কোনও ধর্ম্মে উপদেশ নাই। 'গঙ্গা-ভক্তিতরঙ্গিনীতে' উক্ত আছে,—"ভক্তি বিনা করে যোগ, মিছামিছি কর্ম্ম-ভোগ, ভগীরথের ভক্তি অতিশয়।" ইত্যাদি।

শ্রীভাগবতের একাদশ স্কন্ধে উক্ত আছে,—"ন সাধয়তিমাংযোগে নসাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব!
নস্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথাভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥"

অর্থ,—হে উদ্ধব! ঈশ্বরে প্রতিষ্ঠিতা সুদৃঢ়া ভক্তি আমাকে (ঈশ্বরকে) যেরূপ বশীভূত করে, সেইরূপ যোগানুষ্ঠান (ষট্‌চক্রাদিভেদ দ্বারা যোগসাধন), সাংখ্য (সম্যকপ্রকার বস্তু-তত্ত্বজ্ঞান), ধর্ম্ম (সদাচারাদি), সাধ্যায় (বেদাধ্যয়নাদি), তপ (চান্দ্রায়ণাদি) এবং ত্যাগ-দানাদিও আমাকে (ঈশ্বরকে) বশ্য করিতে পারে না। অপিচ, হরিভক্তি-সুধোদয়ে উক্ত হইয়াছে ; যথা,—

"ভগবদ্‌ভক্তিহীনস্য জাতিঃ শাস্ত্রংজপস্তপঃ।
অপ্রাণস্যেব দেহস্য মণ্ডনং লোকরঞ্জনং॥"

অর্থ,—যেমন প্রাণরহিত শরীরের (কাষ্ঠ পুত্তলাদির) আভরণ-সজ্জা লোকের রঞ্জনার্থ মাত্র হয়, সেইরূপ ঈশ্বরে ভক্তিহীন ব্যক্তিরও জাতি (সৎকুল-জন্ম), শাস্ত্র (পাণ্ডিত্য), জপ, মন্ত্র বা প্রণব-পাঠ এবং তপ-চান্দ্রায়ণাদি সমুদায়ই লোকরঞ্জক মাত্র ; সুতরাং ভক্তিহীন অনুষ্ঠান দ্বারা কোনও প্রকার সৎফল লাভ হয় না। অপিচ, তত্রৈব,—

"শুচিঃ সদ্‌ভক্তিদীপ্তাগ্নির্দগ্ধদুর্জ্জাতিকল্মষঃ।
শ্বপাকোপি বুধৈঃ শ্লাঘ্যোনবেদজ্ঞোপিনাস্তিকঃ॥"

যে সদাচারী ব্যক্তি, প্রশস্ত ভক্তিরূপ অগ্নি দ্বারা স্বীয় নিকৃষ্ট জাতি-প্রাপ্তরূপ পাপ কাষ্ঠকে ভস্মসাৎ করিয়াছে, সেই চণ্ডালও বুধগণ কর্ত্তৃক শ্লাঘনীয় বটে; কিন্তু বেদজ্ঞ হইয়াও নাস্তিক (ঈশ্বরে অভক্ত) ব্যক্তি কদাপি শ্লাঘ্য নহে।

শ্রীভগবদ্‌গীতাতে উক্ত হইয়াছে; যথা,—

"অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যক্ ব্যবহিতোপিসঃ॥"

অর্থ,—ঈশ্বর ভক্তদিগের অবিতর্কণীয় প্রভাব প্রদর্শন করাইতেছেন;—হে অর্জ্জুন! অত্যন্ত দুরাচার ব্যক্তিও যদি আমাকে (ঈশ্বরকে) একাগ্রচিত্তে (দৃঢ় ভক্তিভাবে) ভজন করে, তবে তাঁহাকে সাধু বলিয়া জ্ঞান করিবে। যেহেতু, সেই দুরাচার ভক্তও শোভন অধ্যবসায় করিতেছে। অপিচ,—

"মাংহিপার্থব্যপাশ্রিত্য যেপিস্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়োবৈশ্যাস্তথাশূদ্রা স্তেপিযান্তিপরাংগতিং॥
কিংপুণব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমংপ্রাপ্যভজস্বমাং॥"

গীতা, ৯ অঃ, ২২।২৩।

অর্থ,—হে পার্থ! স্বাচারভ্রষ্ট মদ্ভক্তিযুক্ত জনকে ঈশ্বর (আমার) ভক্তিই পবিত্র করে। এবিষয়ে কিছুই আশ্চর্য্য জ্ঞান করিও না। যেহেতু, ঈশ্বর-ভক্তি দুস্কৃল-অধিকারীদিগকেও সংসার-বন্ধন হইতে মোচন করে, এই বিষয়ের প্রমাণ দর্শন করাইতেছি। হে পার্থ অর্জ্জুন! ঈশ্বরকে (আমাকে) অনন্যা ভক্তি দ্বারা যদি কোন পাপ-জন্মা অন্ত্যজ জাতিগণ, ও কৃষি-বাণিজ্যাদিমাত্র-নিরত বৈশ্যগণ, ও সংসার-ব্যাপারাসক্তা স্ত্রীগণ, এবং অধ্যয়নাদি-রহিত শূদ্রগণ, আশ্রয় করে (অর্থাৎ ভক্তিভাবে ঈশ্বর-ভজনা করে), সেই ব্যক্তিগণও পরমা গতি লাভ করে, সন্দেহ নাই। ঈশ্বরভক্তি-প্রভাবে পাপযোনি ব্যক্তিগণও যদি পরমা গতি লা
করিতে সমর্থ হয়, তবে পুণ্যশীল ব্রাহ্মণ ও ভ
রাজর্ষিগণ সম্বন্ধে আর বিশেষ করিয়া কি
বলিব? তাঁহারা যে সদ্‌গতি লাভ করিবে
তদ্বিষয়ে আর কথা কি? অতএব হে অর্জ্জুন
এই রাজর্ষিরূপ দেহধারী তুমি, সংসারের অনি
ত্যতা ও অসুখ সকল পর্য্যালোচনা করি
সত্বর ঈশ্বরে (আমাকে) ভক্তির সহিত ভজ
কর, আর বিলম্ব করিও না।

প্রমাণ দ্বারা ভক্তির মাহাত্ম্য প্রকাশ ক
হইল। ভক্তি ব্যতীত কদাপিও ঈশ্বর-প্রসন্নত
ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার এবং ঈশ্বরে একতা-লা
করা যায় না। অতএব সাধকমাত্রেরই ঈশ্ব
দৃঢ়তরা ভক্তি সর্ব্বথা কর্ত্তব্যা।

উপসংহার।

যোগশাস্ত্র-সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রকটি
হইল, নিখিল যোগশাস্ত্রেরই ইহাতে স
সংগ্রহ করা হইয়াছে। কারণ, যোগশা
সম্বন্ধে আর্য্যদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে মতদ্বৈধ দৃষ্ট হ
না। তবে এইমাত্র প্রভেদ যে, কোনও মহা
মহর্ষি ক্রিয়া-যোগ বলিয়াছেন, কেহ বা ক্রিয়
যোগের অন্তর্গতই ধৌতি প্রভৃতি কার্য্য প্রদ
করাইয়াছেন। কেহ বা অষ্টাঙ্গ-যোগান্তর্গ
যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, এ
পাঁচকেও ক্রিয়াযোগের মধ্যেই নিবেশ করি
ছেন; এবং জ্ঞান-যোগে ধারণা, ধ্যান ও সম
নিবিষ্ট হইয়াছে। ভক্তিযোগ, ক্রিয়া ও জ্ঞ
এই দুই যোগেই অব্যভিচারী; উভয়েই ইহ
(ভক্তির) সর্ব্বদা থাকার আবশ্যকতা স্বী
করেন। ভক্তি-ব্যতীত যাহা কিছু অনুষ্ঠি
হউক, তাহাই সৎফল-প্রসবকারক নহে
এই নিমিত্তই ভগবান সর্ব্বোপরি ভ
প্রশস্তাসন অর্পণ করিয়াছেন। যথা,—

"তপস্বিভ্যোঽধিকোযোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি
মতোধিক
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকোযোগী তস্মাদ্যোগীভবার্জ্জু

গিনামপিসর্ব্বেষাং মদ্‌গতেনান্তরাত্মনা।
বান ভজতে যোমাং সমেযুক্ততমোমতঃ॥"

গীতা, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ৪৬-৪৭ শ্লোক।

অর্থ,—কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণাদি তপোনিষ্ঠ তপস্বি-হইতে যোগীগণ অধিক শ্রেষ্ঠ; এবং শাস্ত্রজ্ঞানবান্ জ্ঞানী হইতেও যোগীগণ অধিক শ্রেষ্ঠ—ইহাই আমার (ঈশ্বরের) অভিমত জানিবে। এবং কর্ম্মানুষ্ঠায়ীগণ (যোগাদি ক্রিয়াপর) হইতেও যোগিগণ শ্রেষ্ঠ। অতএব, হে অর্জ্জুন, তুমি যোগী হও। অতঃপর, যম-নিয়মাদি অষ্টাঙ্গ-যোগানুশীলগণ হইতেও ঈশ্বর-ভক্তগণের শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করিতেছেন;—আমাতে (ঈশ্বরে) আসক্তমনা হইয়া আমাতে শ্রদ্ধাযুক্ত হওতঃ (ভক্তিভাবে) যে ভজন করে, সেই ভক্ত ব্যক্তি যোগযুক্ত ব্যক্তিগণ হইতেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া আমার সম্মত। অতএব, তুমি ঈশ্বরভক্ত হও।

এইস্থানে পূর্ব্ব-শ্লোক দ্বারা যোগানুষ্ঠাতাদিগের (যোগিদিগের) শ্রেষ্ঠতা প্রদর্শন করাইয়া, পর-শ্লোকে যোগিগণ হইতেও ঈশ্বরের প্রকৃত ভক্ত ব্যক্তির প্রধানতা প্রদর্শন হইয়াছে। ফলেও, ভক্তির মাহাত্ম্য যোগাপেক্ষায় সমধিক বলিয়া যুক্তিতঃও অনুভব হয়। অভক্ত যোগিকে ও অ-যোগসাধক ঈশ্বর-ভক্তিযুক্ত ব্যক্তিকে ধর্ম্মতুলে পরিমাণ করিতে হইলে, ভক্তই অধিক হইবে। ঈশ্বরে দৃঢ়তা, ঈশ্বরের প্রীতিসাধন প্রভৃতি ভক্তির কার্য্য, অষ্টাঙ্গ যোগের প্রথম পঞ্চাঙ্গ অভ্যাসাদি সাপেক্ষ। অভ্যাস ঈশ্বর-প্রাপ্তির প্রধান কারণ হইলে, বাজীকরদিগের ঈশ্বরলাভ কোন দিন হইয়া যাইত! সুতরাং তাহাতেও (যোগানুষ্ঠানেও) দৃঢ়া ভক্তির আবশ্যকতা আছে।

একাগ্রভক্ত ঈশ্বরনিষ্ঠ ব্যক্তি যদি যোগী হয়, তবে "মণিকাঞ্চন যোগের ন্যায়" অতীব মনোজ্ঞতা লাভ করিবে, ইহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন? অনেক সাধক হইতেই যোগী শ্রেষ্ঠ; কারণ, যোগ-সাধন ও দৃঢ়তরা ঈশ্বর-ভক্তি এই দুইটি লক্ষণই যুগপৎ যাঁহাতে বিরাজিত আছে, তিনিই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ কি হইতে পারে? অতএব, আর্য্যদিগের ধর্ম্ম-শাস্ত্রে যোগ ও ভক্তি হইতে আর অধিকতর সার পদার্থ দেখা যাইতেছে না। ইহা দ্বারা সকল সুফল লাভ করা যাইতে পারে। পীতগুণ-সমন্বিত হরিদ্রা বিশুদ্ধ শুক্লবর্ণ চূর্ণের মিশ্রণে যেরূপ রঞ্জক বর্ণান্তর প্রাপ্ত হয়, সেরূপ যোগ ও ভক্তির সামঞ্জস্যে হৃদয় এক অনির্ব্বচনীয় রসে আপ্লুত হইয়া পড়ে। পদার্থদ্বয়ের সংযোগে যে আশ্চর্য্য শক্তি জন্মে, তাহা অনেকেরই প্রত্যক্ষসিদ্ধ আছে। কোন কোন স্থলে বিরুদ্ধ পদার্থদ্বয়ের সামঞ্জস্যে ঘৃত-মধু-সংযোগের ন্যায় মন্দফলপ্রদ হয়। কিন্তু এস্থলে, যোগ ও ভক্তি পরস্পর অবিনাভাব-সম্বন্ধে এক সূত্রে গ্রথিত থাকাতে, উভয়ের সামঞ্জস্যে মিশ্রিত রসানুভব হয়; যেমন দধি ও গুড়ের মিশ্রণে উভয় রসের বহির্ভূত রস জন্মে না। এই নিমিত্তই ষড়বিধ রাজযোগে ভক্তিযোগ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব, সাধক-মাত্রেরই যোগ ও ভক্তির সামঞ্জস্য-পূর্ব্বক উপাসনা করাই একান্ত কর্ত্তব্য।

সন্ন্যাসীর জীবনী।

পঞ্চম অধ্যায়।

মল্লিকার পীড়া চারি-পাঁচ দিন পরে ভাল হইল; ভাল হইলে, তাহাকে বোর্ডিংএ পাঠাইয়া দেওয়া হইল। যেদিন মল্লিকা বোর্ডিংএ চলিয়া গেল, সেইদিন বেলা তিন-টার সময় আমি বেড়াইতে বাহির হইলাম। আমি কালিঘাট হইতে জগু বাবুর বাজার পর্য্যন্ত যাইয়া সেয়ারের গাড়ির জন্য দাঁড়াইয়া আছি। ঠিক্ সেই সময় একটী যুবক আমার

কাছে আসিয়া বলিল,—"কি, ভাল আছ?" আমি দেখিয়া বিস্মিত হইলাম, গগণ। গগণের উচিত ছিল, লজ্জা করা; কেন-না, সে অন্যায় করিয়া আমার প্রতি চুরির অপবাদ দিয়াছিল! কিন্তু আমিই তাহাকে দেখিয়া লজ্জিত হইলাম; সে বরং বেশী আত্মীয়তা দেখাইয়া আমার সহিত আলাপ করিতে লাগিল। আলাপে জানিতে পারিলাম,—তাহার বিবাহ হইয়াছে, তাহার অবস্থাও একরূপ মন্দ নহে—সে এখন প্রচারকের পদে নিযুক্ত হইয়াছে। আমি মনে মনে ভাবিতেছিলাম, চুরি করিয়া ও জেলে যাইয়া গগণের অবস্থা ফিরিয়াছে—পাপেরই সর্ব্বতোভাবে জয়! এই সময়, একজন গাড়োয়ান "বৌবাজার দুই জন" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। আমি সেই গাড়িতে উঠিলাম। গগণও আমার সঙ্গে সেই গাড়িতেই উঠিয়া বলিল,—"বেশ হইল; বৌবাজারেই আমার বাসা—তোমাকে আমার বাসায় লইয়া যাইব।" নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিলাম না, না করিবার বিশেষ কারণও ছিল। উপযুক্ত সময়ে বহুবাজারে আসিলাম। গগণ তাহার বাসা দেখাইয়া বলিল,—"এই যে,চল?" উভয়ে প্রবেশ করিলাম। প্রবেশ করিবার সময় সে বলিল,—"ভাই, আমার অপরাধ ক্ষমা করিবে। আমার স্ত্রী যেন, আমার চুরির অপরাধে জেল হইয়াছিল, তাহা শুনিতে না পায়।" আমি বলিলাম,—"দোহাই ধর্ম্মের—আমি কখনও সে কথা মুখের বাহির করিব না।" আমরা গৃহে প্রবেশ করিলে, সারা পাইয়া, গগণের স্ত্রী তাড়াতাড়ি দৌড়িয়া পলাইল। কি আশ্চর্য্য!—খাটে সেই দীর্ঘশ্মশ্রু স্থূলকায় চিকিৎসক (যিনি আমাদের বাসায় ঠাকুরাণীর চিকিৎসার জন্য নিত্য যাইতেন) বসিয়া আছেন! তিনি একবার আমার প্রতি কটাক্ষ করিলেন—যেন চিনিতে পারিলেন না! গগণের পানে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"আজ এঁকে কিছু ঈশ্বরের প্রেম ও শান্তি-বিষয়ে উপদেশ দিলাম। এঁর যেরূপ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি,বিশ্বাস ও ধর্ম্মভাব,তাহাতে শীঘ্রই যে ইনি একজন নারীকুলের বরণীয়া হইবেন,তাহার সন্দেহ নাই।"

চিকিৎসক এই কথা বলিতে বলিতে, চটি পায় দিয়া, নধর নাচাইয়া, করি-শিশুর ন্যায়, ধীরে ধীরে চলিলেন। চিকিৎসক যাইলে, গগণ আমাকে বসিতে বলিয়া, গৃহিণীকে আমার কাছে আনিতে চলিয়া গেল। আমি এই সময়ে মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম,—"গগণ চোর হোক,ডাকাত হোক, আমার চেয়ে শতগুণে ভাল। গগণ বিবাহ করিয়াছে, গগণ ব্যাভিচার করে না। গগণ মামার ঘড়ি-চেন নিয়াছিল, এই পাপ; কিন্তু আমার শরীরে শত শত পাপ—মনে কেবল পাপের চিন্তা! এই যে গগণ কত আহ্লাদ করিয়া স্ত্রী আনিয়া আমায় দেখাইবার উদ্যোগ করিতেছে—সরল মনে আমাকে বন্ধু-বোধে বিশ্বাস করিয়াছে; আমি কিন্তু কত পাপের কথাই ভাবিতেছি! গগণের স্ত্রী খুব রূপসী—খুব রসিকা—গগণের স্ত্রী আমাকে ভাল-বাসিবে—(চুপ করিয়া) আমায় আসিতে বলিবে! ছিঃ ছিঃ! আমি কি মানুষ!—আমি ভাল ভাবিতে পারি না—"

এই সময়ে গগণ ও তাহার স্ত্রী আসিয়া দাঁড়াইল। আমিও ফিরিয়া চাহিয়া দাঁড়াইলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য্য!—গগণের স্ত্রীকে দেখিয়া, আমার সমস্ত শরীর চমকিয়া উঠিল, হৃদয় কাঁপিতে লাগিল! গগণের স্ত্রীরও আমায় দেখিয়া ঠিক তাহাই হইয়াছে! গগণ আমাদের অবস্থা দেখিয়া একটু অপ্রস্তুত হইল; এবং তাহার স্ত্রীকে বলিল,—"ইনি আমার পরম বন্ধু!" বলিবা-মাত্রই রূপসী একটু মৃদু হাসিয়া হাত বাড়াইলেন; আমিও হাত বাড়াইয়া কর-মর্দ্দন করিলাম। কর-মর্দ্দন-কালে গগণের স্ত্রী আমার হাতে অঙ্গুলি দ্বারা একটা সঙ্কেত করিলেন। বোধ হয়, তাহার অর্থ,—"সাবধান;

গগণ যেন আমার পূর্ব্ব-কাহিনী টের্ না পায়!"

পাঠককে বোধ হয় বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না যে, ইনি সেই শ্রীমতী সু—দেবী! যিনি গর্ভ আমার স্কন্ধে নিক্ষেপ করিবার জন্য রজনীতে আমার শয্যায় যাইয়া আমাকে প্রথম পাপ শিক্ষা দিয়াছিলেন—যাঁহার সহিত আমার বিবাহ হইবে এরূপ কথা ছিল—যাঁহার ভয়ে আমি পলায়ন করিয়াছিলাম—সেই দেবী ইনি! যাহা হউক, এখন আর আমার ভয় নাই।

গগণের অল্প আয়, দাস-দাসী রাখিতে পারে না, আপনারাই সকল কাজ-কর্ম্ম করে। একটীমাত্র ঝি—তা' সেও আজ আসে নাই! সুতরাং গগণ নিজেই আমার জন্য কিছু খাবার আনিতে গেল। বলিয়া গেল,—"তোমরা উভয়ে আলাপ কর; আমি এখনি আসিতেছি।"

গগণ যাইবামাত্র, শ্রীমতী সু— হাসিয়া বলিলেন,—"এতদিন পরে শিকুলি কাটা পাখী ধরেছি।"

আমি বলিলাম,—"পাখী আপনি ধরা দিয়েছে।"

"তা' বেশ ত, বেঁধে রাখ্‌ব এখন"!

"শিকুলি যে কাটা, কি দিয়ে বাঁধ্‌বে!"

"কাটা শিকল কি জোড়া যায় না?"

"আগের মত সুন্দর হয় না।"

"না হোক্, আগেকার চেয়ে তশক্ত হয়!"

"তাকি আর হয়! টান লাগ্‌লেই জোড় খসে যায়!"

"কারিকর যদি ভাল হয়, তবে অন্য যায়গা ছিঁড়ে যায়—তবু জোড় খসে না!"

"তা' যাক্। তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।"

"আমার আরও বেশী আছে—কিন্তু আজ নয়!"

"কেন?"

"এসে পড়্‌বে—তোমার ঠিকানাটা কি শীঘ্র বল?"

তৎপরে আমি ঠিকানা বলিলাম।

সু—দেবী তাড়াতাড়ি লিখিয়া লইলেন। একটু পরেই গগণ আসিয়া দাঁড়াইল।

* * * *

আমি ও গগণ এক থালায় খাইতে লাগিলাম। গগণ তাহার স্ত্রীকেও একত্রে খাইবার অনুরোধ করিল; কিন্তু তিনি স্বীকৃত হইলেন না।

আমরা আহার করিতে করিতে গগণ তাহার মাতুল, মাতুলানী ও মল্লিকার কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। কিন্তু আশ্চর্য্য, একবারও জুঁইর কথা মুখে আনিল না! আমি মনে ভাবিলাম,—"জুঁই আমাকে ভালবাসিয়া রক্ষা করিয়াছিল, এবং গগণের প্রতি অশ্রদ্ধা ও ঘৃণার ভাব প্রকাশ করিয়াছিল, তাই বুঝি গগণ তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে না।"

আহারাদি ও কথোপকথন করিতে করিতে প্রায় সন্ধ্যা হইল। আমি, গগণ ও তাহার পত্নীর নিকট বিদায় লইয়া, বাসায় রওয়ানা হইলাম।

বাসায় আসিতে কিছু রাত হইল। আসিয়া দেখি, কর্ত্তা-কর্ত্রী প্রভৃতি আহারের জন্য আমার প্রতীক্ষা করিতেছেন। গগণ কোথায়, কি অবস্থায় আছে, তাঁহারা জানেন না; আমি সবিস্তার কহিলাম। ইহাতে কর্ত্তা-কর্ত্রীর মুখে সন্তোষ বা অসন্তোষের কোন চিহ্ন দেখিলাম না। কেবল জুঁইএর মুখে একটু চিন্তার চিহ্ন দেখিলাম।

আহারান্তে শয়ন করিয়াছি; কিন্তু নিদ্রা যাই নাই। নিদ্রা না যাইবার বিশেষ কারণ আছে। কর্ত্রী-ঠাকুরাণী এখন প্রায় বারটার পর হইতে সমস্ত রজনীই আমার কাছে থাকেন। কর্ত্তা কেন ইহাতে কিছু বলেন না, সেটা আমিও ভাবিয়া স্থির করিতে পারি না—অনেক সময়

এটি একটী গুরুতর সমস্যা বলিয়া বোধ হয়। কর্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলে হাসেন, এবং কখন কখনও বা বলেন,—"আমার একখানি সোণার ও একখানি রূপার লাঠি আছে; সোণার লাঠি তাঁর শরীর স্পর্শ করিলে তিনি জাগেন, এবং রূপার লাঠি স্পর্শ করিলে অচৈতন্য হয়েন।"

আজ রাত বারটা বাজিয়া গিয়াছে। তথাপি কর্ত্রী আসিতেছেন না কেন, আমি তাই ভাবিতেছি। হঠাৎ মৃদু-পদশব্দ শুনিয়া, চাহিয়া দেখি, আমার শয্যা-প্রান্তে জুঁই। জুঁইর মুখে হাসি নাই। সে সুন্দর মুখ আজ চিন্তাপূর্ণ, কোমলতা ও লাবণ্য-শূণ্য। সে সেতার-নিন্দিত স্বরেও আজ মধু নাই—ভয়ে ভয়ে মৃদুস্বরে বলিল,—"তুমি কি ঘুমিয়েছ?"

"না!"

"গগণের বাসায় গিয়েছিলে?"

"হাঁ!"

"আমার কথা কিছু বলিল?"

আমি একথার ঠিক উত্তর না দিয়া হাসিয়া বলিলাম,—"বলিল বৈকি?"

"কি বলিল?"

"বলিল যে,—তুমি জুঁইকে কবে বিয়ে কর্‌বে?"

"মিথ্যা কথা!"

"কেন?"

"বিয়ের প্রস্তাব গগণ আদৌ জানে না।"

"তুমি আমাকে ভালবাস, তা'ত জানে?"

"একটা পোষা কুকুরকে ভালবাসিলেই কি বিয়ে কর্ত্তে হয়?"

জুঁইর কথা শুনিয়া আমার শরীর রাগে জ্বলিয়া উঠিল। ক্রোধের আবেগে কাঁদিয়া ফেলিলাম—ক্রোধে হিতাহিত বিবেচনা থাকে না। দাঁড়াইলাম—জুতা-চাদর লইলাম—আর একমুহূর্ত্ত তথায় থাকিতে ইচ্ছা হইল না—যাইবার জন্য পা বাড়াইলাম। আমনি জুঁই আমার হাত ধরিয়া বলিল,—"কোথায় যাও?"

"কোথা যাই, তোমার শুনিয়া কাজ নাই—ছেড়ে দাও!"—এই বলিয়া, বলে তাহার হস্ত-মোচন করিয়া, যাইতে অগ্রসর হইলাম। এবারে জুঁই আমার কোমর আঁটিয়া ধরিয়া বলিল—"যেতে দেব না!" আমি কাঁদিয়া বলিলাম,—"জুঁই, ছেড়ে দেও—কুকুর স্থানান্তরে যাক্।"

নারী যতই কঠিনা হউক, কোমল কথায় তাহাদের প্রাণ গলিয়া যায়। সোণাকে পাষাণে ত গলাইতে পারে না; কিন্তু সোহাগা-স্পর্শেই সোণা জল হয়! জুঁইয়ের কঠিন প্রাণ গলিল—জুই কাঁদিল—নত-জানু হইয়া আমার পা ধরিয়া বলিল,—"আমায় ক্ষমা কর—অপরাধ ক্ষমা কর।"

হঠাৎ এই সময় কর্ত্রী-ঠাকুরাণী আসিয়া উপস্থিত! জুঁই ভয়ে—লজ্জায় জড়সর ও স্তম্ভিত হইল। কর্ত্রী-ঠাকুরাণী বিস্মিত হইলেন—আমারও এখন ক্রোধ যাইয়া হাসি পাইল।

সাধু তুলসীদাস।*

পূর্ব্বোক্ত একটী দোঁহাতে তুলসীদাস বলিয়াছেন যে, যেখানে লোকে আমাকে আদর করে না, সেইখানে যাওয়া উচিত। কারণ, তথায় মনের গৌরবের লাঘব হওয়ায় ভগবানের স্মরণ হয়। কিন্তু, তাই বলিয়া যেখানে গুণের (ঈশ্বরের) উপযুক্ত সম্মান রক্ষা হয় না, তাঁহার মতে সেইস্থান পরিত্যজ্য; কারণ, সে নিশ্চয়ই অসৎসঙ্গ। তাঁহার নিজের অনাদর হউক, অথচ তথায় গুণময় ঈশ্বরের আদর হউক,—এরূপ স্থানই তাঁহার প্রার্থনীয়। তাই তিনি বলিতেন,—

"তুলসী তাঁহা নাযাইয়ে,
যাঁহা নহি বরণ-বিবেক।

* পূর্ব্ব-সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের শেষ।

রাং রূপা, রুয়া—ভুয়া,
শ্বেৎ অশ্বেৎ সব্ এক্॥"

অর্থাৎ,—হে তুলসীদাস্! যেখানে গুণের বিচার নাই, সেস্থানে তুমি কদাচ গমন করিও না; যেহেতু, সদসৎ বিচারাভাবে তথায় রাং রূপা, নিরেট্ ফাঁপ, শ্বেত অশ্বেত, সবই একদরে বিক্রয় হয়। সুতরাং সেখানে পাত্র-যোগ্য মান-লাভের সম্ভাবনা নাই।

ইহজগতে ধনসম্পত্তি-লাভের জন্য সকলেই লালায়িত। কিন্তু ভক্তজন উচ্চ ও উদার ভাবকেই, প্রয়াস-পূর্ব্বক লাভের উপযোগী রত্ন বলিয়া গণ্য করেন। তুলসীদাস তাই বলিতেন,—

"তুলসী ইয়ে সংসারমে,
পাঁচো রতন্ হেয় সার।
সাধুসঙ্গ, হরিকথা,
দয়া, দীন, উপকার॥"

অর্থাৎ,—হে তুলসীদাস্! এই জগতে পাঁচটী মাত্র সারভূত রত্ন আছে। প্রথম সাধুসঙ্গ, দ্বিতীয় হরিকথা, তৃতীয় দয়া, চতুর্থ দীনতা, পঞ্চম পরোপকার।

অর্থের লালসা, রমণীর লালসা এবং উদর-পূরণের লালসাতেই মনুষ্য ব্যতিব্যস্ত; ভক্তি কোথা হইতে হইবে? তুলসীদাস তাই ঐ পদার্থ-ত্রয়কে ভক্তির প্রধান বিঘ্নস্বরূপ বলিয়া ব্যক্ত করিতেন,—

"তুলসী ইয়ে সংসারমে,
কাহাঁ সো ভক্তি ভেট্।
তিন্ বাত্‌সে নট্‌পটি হেয়,
দাম্‌ড়ি চাম্‌ড়ি পেট্॥"

অর্থাৎ,—হে তুলসীদাস্! এই সংসারে কিরূপে ভক্তি-দেবীর সহিত সাক্ষাৎ হইবে—যখন অর্থ, শিশ্ন ও উদর লইয়াই সকলে ব্যতিব্যস্ত!

ভক্তি ও জ্ঞান উভয়ই একাধারে থাকা আবশ্যক। বেদাদি পাঠ করিলেই যে প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হয়, এরূপ নহে; কারণ, তত্ত্ব-জ্ঞান-রহিত বেদাধ্যায়ীও মূর্খ বলিয়া পরিগণিত হয়। আত্মতত্ত্ব-চিন্তনকারীই যথার্থ জ্ঞানের অধিকারী হয়। পরমাত্মায় বিলীন হওয়াই ধর্ম্মের সারমর্ম্ম। ভক্তশ্রেষ্ঠ তুলসীদাসও ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন,—

"চৌসহ চার্ আঠার হো,
পড়ে-শুনে ক্যা হোয়্।
তুলসী আপন্ রাম্‌কো,
যব্ লগ্ লখে নকোয়্॥"

অর্থাৎ,—হে তুলসীদাস্! চতুর্দ্দশ শাস্ত্র, চতুর্ব্বেদ এবং অষ্টাদশ পুরাণ পঠন ও শ্রবণ করিয়াও যদি আপন রামে না লাগিতে পারে, তাহাহইলে সে পড়া-শুনাই বিফল; যেহেতু, জ্ঞান-প্রভায় আত্মারামের স্বরূপ অবেক্ষণই বেদ-বেদাঙ্গ পঠন ও শ্রবণের উদ্দেশ্য।

প্রাজ্ঞেরা বিষয়ে আসক্ত হন না; কারণ, উহার দ্বারাই পতন হইয়া থাকে। তাই, যে যে বিষয়ের লালসা চলিয়া যায়, সেই সেই বিষয়ে সিদ্ধি হইয়াছে, ইহাই উক্ত হয়। সমস্ত সিদ্ধি যখন আসিয়া পড়ে, অর্থাৎ সমস্ত বিষয়-বাসনা যখন পরিত্যক্ত হয়, তখনই মন ও বুদ্ধি একাধারে অর্থাৎ ভগবানকেই অবলম্বন করিয়া থাকে। তখন সেই সন্ন্যাসী, কৌপীন-মাত্র ধারণ করিয়াও, ইন্দ্রত্বকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন; কারণ, সেই ভক্ত তখন নিজ-হৃদয় মধ্যে যে রত্ন রক্ষা করেন, উহার তুলনা ত্রিসংসারে কিছুই নাই; তাই তাঁহার অন্য পদার্থে আর তাকাইতে ইচ্ছা হয় না। তুলসীদাসেরও ঠিক এইরূপ অবস্থা হইয়াছিল। তিনি সর্ব্বদাই তাই বলিতেন,—

"তিনটুক্ কপীন্‌কো,
আউর ভাজি বিন' লোন্।
তুলসী রঘুবর উর বসে,
ইন্দ্র বা পুর কোন্॥"

অর্থাৎ,—হে তুলসীদাস্ ! যদি রামচন্দ্র হৃদয়ে বাস করেন ও যথা-সময়ে তিনটুকু কৌপীন ও লবণ-ব্যতীত ভাজি পাওয়া যায়, তাহা হইলে পুরন্দরই বা কোন ছার ?

সংসারে যাহার কিছু নাই, তাহাকে 'দীন' কহিয়া থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি, তাঁহার সমস্ত থাকিলেও, মনে মনে ভগবদুদ্দেশে সমস্তই ত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে আপনাকে "দীন" জ্ঞান করেন। সেই ব্যক্তির ঈশ্বর-সেবাই জীবনের ব্রতরূপ হয়। তুলসীদাস তাই বলিতেন,—

"কাহুঁকো ধন-ধাম্ হেয়,
কাহুঁকো পরিবার।
তুলসী অ্যায়্সে দীনুকো,
সীতারাম্ আধার।"

অর্থাৎ,—কোন ব্যক্তির বিপুল ধন ও অট্টালিকাদি আছে, কাহারও বা স্ত্রী-পুত্রাদি পরিবার আছে; কিন্তু, তুলসীদাস, দীনজনের কেবল সেই সীতারাম একমাত্র আধার অর্থাৎ অবলম্বন-স্বরূপ।

এই সংসারে নাই কি ? দারা, পুত্র, কন্যা, বন্ধু, স্বজন, সুখ, ভোগ, সম্মান, মর্য্যাদা, খ্যাতি, ঐশ্বর্য্য, যশ ইত্যাদি সকলই রহিয়াছে। কিন্তু ভক্তের কাছে সমস্তই যেন ফাঁকা! তুলসীদাস তাই বলিতেন,—

"গঙ্গা যমুনা সরস্বতী,
সাত্ সমুন্দর্ ভর্পুর্।
তুলসী চাতককে মতে,
সোঁয়াৎ বিনে সব্ ধুর্॥"

অর্থাৎ,—গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, ও সপ্ত-সমুদ্র জলে পরিপূর্ণ রহিয়াছে'; কিন্তু চাতকরূপ তুলসীদাসের মতে ঘনবারি ভিন্ন অন্য বারি ধূলিময় বলিয়া বোধ হয়। নির্ম্মল বারিদ-জল ভিন্ন চাতক যেমন অন্য জলের ইচ্ছা করে না, ভক্ত-জনের পক্ষেও সেইরূপ হরি-পাদপদ্ম ভিন্ন বিষয়ে আকৃষ্ট হওয়া অসম্ভব।

ঈশ্বর-তত্ত্ব অবগত হইলে, আর ভেদ-জ্ঞান থাকে না। তুলসীদাসেরও অবশেষে এইরূপ হইয়াছিল। তিনি তাই বলিতেন,—

"সব্ বন তুলসী ভেয়ো,
সব্ পাহাড়্ ভেয়ো শাল্গেরাম।
সব্ পানি গঙ্গা ভেয়ো,
যেস্ ঘট্মে বিরাজে রাম্॥"

অর্থাৎ,—যাঁহার ঈশ্বর-বোধ হইয়াছে, অর্থাৎ যে ব্যক্তি পরমেশ্বরকে সর্ব্বগ, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বসাক্ষী ও সর্ব্বভূতাত্মা বলিয়া জানিয়াছেন, তাঁহার সম্বন্ধে সকল বনই তুলসীবন্, সকল প্রস্তরই শালগ্রাম, এবং সকল জলই গঙ্গাজল বলিয়া বোধ হয়।

আর্য্য-ঋষিদিগের ন্যায় তুলসীদাসও কর্ম্মের আশ্চর্য্য ক্ষমতা স্বীকার করিতেন। তিনি বলিতেন,—

"সব জীবনকো কর্ম্ম হয়
প্রচণ্ড জগমাহিঁ।
নর-কিন্নর-দেবাদিকে ছাড়ত
কানু নাহিঁ॥"

অর্থাৎ,—সকল জীবের এমন কি দেবতা-গণের সম্বন্ধেও কর্ম্মই প্রধানরূপে নিয়ামক হইয়াছে; উহা কাহাকেও ছাড়ে না।

আজকাল লোকে, জাতি পাপাত্মাই হউক অথবা কদাচারী হউক, বিএ এম্ এ পাশ করিলেই, বিদ্যান বলিয়া পরিগণিত হয়। কিন্তু পুরাকালে এরূপ হইত না। যে ব্যক্তি কাম-ক্রোধাদি জয় করিতে যত্নশীল হইত না, তাহা-রাই মূর্খ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইত। তুলসীদাসও এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি তাই বলিতেন,—

"কাম্ ক্রোধ্ মদ্ লোভ্ কি,
যব্ লাগ্ মনুমে খান্।
তব্ লগ্ পণ্ডিত্ মূরখৌ
তুলসী এক সমান্॥'

অর্থাৎ,—পণ্ডিত ব্যক্তির রমণীর প্রতি ঔৎ-ক্যর বিনাশ করা কর্ত্তব্য; যেহেতু, ইহার া নরক-ভোগ অনিবার্য্য।

সঙ্গ-দোষে লোকে সর্ব্বনাশ হয়। কিন্তু সঙ্গ ভয়ানক ভবসাগর হইতে উদ্ধার করিয়া ক। তুলসীদাস তাই বলিতেন,—

"এক ঘড়ি আধি ঘড়ি,
আধি হুমে আধ্।
তুলসী সঙ্গত্ সন্তকি,
হরে কোটি অপরাধ॥'

অর্থাৎ,—একমুহূর্ত্ত, অর্দ্ধ মুহূর্ত্ত, কিম্বা র্দ্ধ মুহূর্ত্তের সাধু-সঙ্গও কোটি কোটি রাধ হরণ করে।

উদ্ধারাভিলাষী ব্যক্তি রমণীর কুহক হইতে ত্রাণ পাইবার জন্য সদাই যত্নশীল হন। সীদাস তাই বলিতেন,—

'মেরে মায়া মায়া প্রবল হয়,
যুবতী-রূপ জগমাহি।
দেখহুঁ তাকো অপূর্ব্ব বল তেহিঁ,
কেউ পাওত নাহিঁ॥
দিগ্বিজয়ী যো শূর হয় বহুগুণ-
সাগর তাঁহি।
ভ্রূকটাক্ষ মো করত হয় তাকো
পদতল মাহি॥"

অর্থাৎ,—স্ত্রীস্বরূপা যে আমার মায়া, র অপূর্ব্ব বল সকলে নিরীক্ষণ কর। লবান দিগ্বিজয়ী পুরুষকেও ভ্রূকুটীর কটাক্ষ স্ত্রীগণ স্বীয় পদতলে উপবিষ্ট করায়। ীর প্রতি বিরাগ জন্মাইবার নিমিত্ত তিনি ও বলিয়াছেন,—

"জয়সে পুতলি কাঠকো পুতলি
মাসময় নারী।
অস্থি-নাড়ি-মল-মূত্রময়
যন্ত্রিত নিন্দিত ভারি॥"

অর্থাৎ,—যেমন কাষ্ঠের নির্ম্মিত পুত্তলি, সেইরূপ মাংসময় অস্থি-নাড়ি-মল-মূত্র-ক্রিমি-প্রচুর অতিনিন্দিত যন্ত্রের ন্যায় স্ত্রীগণের শোভা কিছুমাত্র নাই, যাহা অবিবেকীদিগকে মোহিত করিয়া থাকে।

'নাম'-জপ জীবাত্মা ও পরমাত্মার যোগ-নিমিত্তক। তুলসীদাস যে এই পরম যোগে যুক্ত হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহার বক্ষ্যমান্ দোঁহাতে প্রকাশিত হইয়াছে,—

"রামনাম মনিদীপ ধরুজীহ
দেহরি দ্বার্।
তুলসী ভিতর বাহিরো যো
চাহসি উজীয়ার্॥"

অর্থাৎ,—যেমন ঘরের দ্বারে প্রদীপ রাখিলে ঘরের ভিতর ও বাহিরে অন্ধকার থাকে না, সেইরূপ শরীরের দ্বারস্বরূপ জিহ্বা-মূলে রামনাম-স্বরূপ প্রদীপ ধরিলে ভিতরের (অর্থাৎ দেহাভ্যন্তরের) ও বাহিরের (অর্থাৎ বাহ্যজগতের) অন্ধকার নষ্ট করিয়া জ্ঞানা-লোকে আলোকিত হয়।

তুলসীদাস পূর্ব্বে অতি হীন ও কামুক পুরুষ ছিলেন। তিনি কামাদি রিপুকে বশে রাখিয়া সাধু-জীবন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভগবচ্চরণ-সন্নিধি-মাত্রে সকল কলুষ বিনষ্ট হয়, ইহা তাঁহার জীবন হইতে আমরা শিক্ষা প্রাপ্ত হই। তিনি দয়া-দাক্ষিণ্যাদি গুণে ভূষিত ছিলেন। 'নামে রুচি ও জীবে দয়াকেই' তিনি সার জানিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের সকল ঘটনায় পরম ভক্তি প্রকাশ পাইত। তিনি পরম বৈষ্ণব ছিলেন। অমৃত-তুল্য তাঁহার দোঁহাবলি অদ্যাবধি পাঠক-বর্গের হৃদয় আকর্ষণ করিয়া রহিয়াছে।

হাইকোর্টের জজ মহামান্য গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

পাঠক! উপরে যে মহাত্মার প্রতিকৃতি দেখিতেছেন, উনিই কলিকাতা-হাইকোর্টের সেই স্বধর্ম্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ-বিচারপতি ডাক্তার শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

উচ্চ-শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া, উচ্চতম পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও, সম্পূর্ণরূপে আপনার পিতৃ-ধর্ম্ম (হিন্দুধর্ম্ম) বজায় রাখিয়া চলিতে পারেন, বাঙ্গালায় এরূপ লোক আজকাল বিরল। কিন্তু, কলিকাতা-হাইকোর্টের ঐ মহামান্য বিচার ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রবহমান প্রথার ব্যতিক্রম ঘটাইয়াছেন— দূর উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াও, এরূপ উচ্চ অধিষ্ঠিত হইয়াও, এখনও সম্পূর্ণরূপে হি ধর্ম্ম-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া, তিনি সম এক অপূর্ব্ব শিক্ষা প্রদান করিতেছেন,— সমাজ, দেখ! শিক্ষিত হইয়াও, উচ্চপদ

াও, কিরূপে আপনার ধর্ম্ম রাখিয়া চলিতে য়!" ধন্য তিনি! আর সহস্র গুণ বা পদবী-র্য্যাদা থাকিলেও এইজন্যই যে তিনি চির-দনই বরণীয় থাকিবেন, তাহা বলা বাহুল্য। রূপ ব্যক্তির দর্শনেও পুণ্য আছে; তাই আজ াদরে, সাধারণের সাধু-দর্শন-প্রবৃত্তির চরিতার্থ-তার জন্য, পূর্ব্ব-পৃষ্ঠায় তাঁহার ঐ প্রতিচ্ছবি প্রদান করিলাম। যাঁহারা তাঁহাকে না দেখিয়া-ছেন, একবার তাঁহার সেই স্থির-গম্ভীর-প্রশান্ত র্ত্তি দেখিয়া, পুলকিত হউন—এখনও সাবধান হউন—দেখিয়া-শুনিয়াও এখনও স্বধর্ম্মে আস্থাবান হউন, এই বাসনা।

ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনী অনেক সুশিক্ষায় পরিপূর্ণ। আমাদের ইচ্ছা ছিল, তাঁহার এ প্রতিকৃতির সহিত তাঁহার সে জীবন-চরিতেরও কিছু-না-কিছু পরিচয় দিই। কিন্তু জীবিত ব্যক্তির জীবন-চরিত প্রকটন রীতি-বিরুদ্ধ—বিশেষ, সে বিষয়ে তাঁহারও সম্পূর্ণ অমত, বুঝিলাম। সুতরাং, কিয়ৎ পরিমাণে তাহা সংগ্রহ করিয়াও, আপাততঃ তদ্বিষয়ে বিরত রহিলাম। এক্ষণে, ঈশ্বরের নিকট এইমাত্র প্রার্থনা যে, ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া—এই তমসাচ্ছন্ন দেশের আচারভ্রষ্ট জীবনের সৎশিক্ষার পক্ষে সম্যক সহায়তা করিতে থাকুন;—সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সে সদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া, পাষণ্ড-ধর্ম্মভ্রষ্ট-গণও পবিত্র হউক।

দরিদ্রতা।

"দরিদ্রতা" শব্দ অতি ভয়ঙ্কর। শ্রুতিমাত্রে যেন গাত্র শিহরিয়া উঠে। যে মনুষ্য দরিদ্র, সে বুঝিতে পারে, দরিদ্রতার কি কষ্ট এবং দরিদ্রতায় কি লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। দরিদ্র ব্যক্তির কোথাও সম্মান নাই; যেখানে যায়, সেইখানেই অনাদর। এ সংসারে অর্থ না থাকিলে কেহ সমাদর করে না। অর্থের আদর সর্ব্বত্রই দেখা যায়। কিন্তু মনুষ্য অর্থশূন্য হইলে, লোকের নিকট আদর পায় না, লোকসমাজে তাহার সম্মান থাকে না, সময়ে সময়ে তাহাকে মিথ্যাবাদী হইতে হয়, এবং কখন কখন বা নীচ কার্য্যেও প্রবৃত্ত হইতে হয়। দরিদ্রের বুদ্ধির বিপর্য্যয় ঘটে। এস্থলে একটি সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত করা গেল; ইহা পাঠ করিয়া পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন যে, দরিদ্রতা হইতে কিনা উৎপন্ন হইতে পারে!

"দরিদ্রো হ্রিয়মেতি হ্রীপরিগতো প্রভ্রশ্যতে তেজসো।
নিস্তেজাঃ পরিভূয়তে পরিভবান্নির্ব্বেদমাপদ্যতে॥
নির্ব্বিন্নো শুচমেতি শোকপিহিতো বুদ্ধ্যাপরিত্যজ্যতে।
নির্ব্বুদ্ধি ক্ষয়মেত্যহো নিধনতা সর্ব্বাপদামাস্পদং॥"

দরিদ্র হইলেই লোকে লজ্জা পায়, লজ্জিত লোক তেজোভ্রষ্ট হয়, নিস্তেজ হইলে সকলের নিকট পরিভূত হইতে হয়, পরিভব হইতে নির্ব্বেদ (আত্মাবমাননা) উপস্থিত হয়। নির্ব্বিন্ন লোকে শোক প্রাপ্ত হয়, শোকাচ্ছন্ন হইলে বুদ্ধিলোপ হয়, নির্ব্বোধেরা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। সুতরাং নিধনতাই সমুদয় বিপত্তির মূল।

অর্থ থাকিলে মনুষ্যের একরূপ ভাব দেখা যায়, আর অর্থশূন্য হইলে আর একরূপ ভাবান্তর হয়। যথা,—

"তাণীন্দ্রিয়াণ্যবিকলানি, তদেবনাম
সা বুদ্ধিরপ্রতিহতা বচনং তদেব।
অর্থেষ্মনা বিরহিতঃ পুরুষঃ সএব
অন্যঃ ক্ষণেন ভবতীতি বিচিত্রমেতৎ॥"

সেই অবিকল ইন্দ্রিয় সকল, সেই নাম, সেই প্রখরা বুদ্ধি, সেই বাক্য—এ সমস্ত সত্ত্বেও পুরুষ ধনহীন হইলে কিছু দিবসের মধ্যে তাঁহার ঐ সকল কিছুই থাকে না, তিনি যেন ভিন্ন প্রকৃতির লোক হইয়া পড়েন,—ইহা বড়ই বিচিত্র।

যতদিন মনুষ্যের অর্থ থাকে, ততদিন তাহার তেজ থাকে, মানসিক বল থাকে,

সমাজে সম্মান থাকে; কিন্তু দৈবনিবন্ধন অর্থ-শূন্য হইলে তাহাকে একেবারে ভিন্ন প্রকৃতির লোক বলিয়া বোধ হয়। তাহার সেরূপ তেজ থাকে না, মানসিক বল থাকে না, প্রফুল্লতা থাকে না, সম্মান থাকে না। সমাজে বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়স্বজন প্রভৃতিও তাহাকে অবহেলা করে। ধনহীন জীবন লইয়া বন্ধু-বান্ধবদিগের মধ্যে অবস্থান করিতে তাহার কষ্ট বোধ হয়,—

"বরং বনং ব্যাঘ্রগজেন্দ্রসেবিতং
দ্রুমালয়-পক্কফলাম্বুভক্ষণং ॥
তৃণানি শয্যা পরিধানবল্কলং
নবন্ধুমধ্যে ধনহীনজীবনম ॥"

ব্যাঘ্রহস্তী-পরিবৃত অরণ্য ভাল, বৃক্ষের আশ্রয় ভাল, পক্ক ফল ভক্ষণ ও জলপান ভাল, তৃণশয্যা ও বল্কল পরিধান ভাল; কিন্তু বন্ধুবান্ধবদিগের মধ্যে ধনহীন জীবন ভাল নয়।

দরিদ্র হইলে মনুষ্যের যে কিরূপ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়,তাহা নিম্নের শ্লোকে প্রকটিত হইল। যথা,—

"মাতা নিন্দতিনাভিনন্দতি পিতা ভ্রাতা ন সম্ভাষতে
ভৃত্যঃকুপ্যতি নানুগচ্ছতি সুতঃ কান্তাচ নালিঙ্গতে।
অর্থপ্রার্থনশঙ্কয়া ন কুরুতেহপ্যালাপমাত্রং সুহৃৎ
তস্মদর্থমুপার্জ্জনং কুরু সখে! অর্থেন সর্ব্বেবশাঃ ॥"

মাতা নির্ধন পুত্রকে নিন্দা করেন, পিতা তাহাকে অভিনন্দন করেন না, ভ্রাতা সম্ভাষণ করেন না, ভৃত্য নির্ধন প্রভুর উপর রাগ করে, পুত্র নির্ধন পিতার অনুগমন করে না (অর্থাৎ তাঁহার বাধ্য হয় না), স্ত্রী নির্ধন স্বামীকে সাদর-সম্ভাষণ করে না, বন্ধু-বান্ধবগণ অর্থ-প্রার্থনার আশঙ্কায় তাঁহার সহিত আলাপ পর্য্যন্ত করে না। হে সখে! তজ্জন্য অর্থ উপার্জ্জন কর, অর্থেই সকলে বশ হয়। মাতা বল, পিতা বল, ভ্রাতা বল, ভৃত্য বল, পুত্র বল, স্ত্রী বল, বন্ধু-বান্ধব বল, সকলেই অর্থের বশ।

"কিঞ্চান্যৈর্কুলাচারৈঃ সেব্যতামেতি পুরুষঃ।
ধনহীনো স্বপত্যাপি ত্যজ্যতে কিম্পুনঃ পরৈঃ ॥"

মনুষ্য দরিদ্র হইলে, তাঁহার সৎবংশে জন্ম, কুলমর্য্যাদা, ও অশেষ গুণ থাকিলেও, জনসমাজে তিনি আদৃত হন না। মনুষ্য ধনহীন হইলে স্বীয় পত্নী তাহাকে ত্যাগ করে, অপরের কথা দূরে থাকুক! অপর লোক ত দরিদ্র ব্যক্তিকে ত্যাগ করিবেই; কিন্তু আপনার পত্নীও দরিদ্র স্বামীকে ত্যাগ করিয়া থাকেন।

"ত্যজেৎ ক্ষুধার্ত্তা মহিলাপি পুত্রং
খাদেৎ ক্ষুধার্ত্তা ভুজগী স্বমণ্ডম্।
বুভুক্ষিতঃ কিংন করোতি পাপং
ক্ষীণা নরা নিষ্করুণা ভবন্তি ॥"

ক্ষুধার্ত্তা মহিলা পুত্রকেও ত্যাগ করে, ক্ষুধার্ত্তা ভুজঙ্গিনী নিজ অণ্ড খাইয়া থাকে, ক্ষুধার্ত্ত জন কিনা পাপ অর্থাৎ অনিষ্টকর কার্য্য করে! দরিদ্র ব্যক্তিরা নির্দ্দয় হইয়া থাকে।

"নিধননির্ধনয়ো বরমপি নিধনং ন নৈর্ধন্যং।
নিধনে সতি পুনর্ননিধনং নৈর্ধন্যেতু পদেপদে নিধনং ॥"

নিধন (বিনাশ-মৃত্যু) এবং নির্ধন (ধনহীন দরিদ্র) এই উভয়ের মধ্যে নিধনই (মৃত্যুই) প্রিয়, নির্ধন (দরিদ্র) ভাল নয়। কারণ, নিধন (মৃত্যু) হইলে, পুনরায় আর নিধনের (মৃত্যুর) সম্ভাবনা নাই; কিন্তু নৈর্ধন্যে (দরিদ্রতায়) পদে পদে নিধন (মৃত্যু) হয়।

কবি কালিদাস কুমারসম্ভবে লিখিয়া গিয়াছেন,—

"অনন্তরত্ন প্রভবস্য যস্য হিমং ন সৌভাগ্য বিলোপি যাতং।
একোহিদোষো গুণসন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দোরিব কিরণে-
ষিবাঙ্কঃ ॥"

হিমালয় অনন্ত রত্নের আকর; কিন্তু সেখানে বড় শীত। সে শীত-বশতঃ হিমাদ্রির কোন গৌরবের হানি হয় না। কারণ, অনেক গুণ থাকিলে একটি দোষ চন্দ্রের কলঙ্কের ন্যায় লয় প্রাপ্ত হয়। চন্দ্র অশেষ গুণের আকর; তাহাতে

একটিমাত্র দোষ আছে; কারণ চন্দ্রে কলঙ্ক বিদ্যমান আছে। কিন্তু সেই কলঙ্কে চন্দ্রের গৌরবের কোন হ্রাস হয় না। হিমাদ্রিরও সেইরূপ। অনন্ত রত্নের আকর হইয়া হিমালয়ের শীতরূপ দোষ, দোষের মধ্যেই গণ্য হয়। অশেষ গুণ থাকিলে, একটিমাত্র দোষ, দোষের মধ্যেই গণ্য হয় না, দেখা যায়।

কিন্তু অন্য এক কবি কালিদাসের উপরোক্ত শ্লোকের বিরুদ্ধে এই লিখিয়াছেন,—

"একোহি দোষো গুণসন্নিপাতে
নিমজ্জতীন্দোরিতি যো বভাষে।
তেনন দৃষ্টং কবিনাপি তেন
দারিদ্র্যদোষো গুণরাশিনাশী ॥"

অনেক গুণ থাকিলে একটি দোষ লয় প্রাপ্ত হয়—ইহা যে কবি বলেন,তিনি সম্যক্ বিবেচনা করিয়া দেখেন নাই। কারণ, দারিদ্য-দোষ অশেষ গুণ নষ্ট করে। বাস্তবিক পক্ষে দেখা যায় যে, দরিদ্র লোকের অশেষ গুণ থাকিলেও সে ব্যক্তির সমস্ত গুণই নষ্ট হয়, গুণের প্রকাশ পায় না।

যে ব্যক্তি উন্নত অবস্থা হইতে দৈবনিবন্ধন দারিদ্রতায় পতিত হইয়াছেন, তাঁহার যে কি মনোকষ্ট তাহা বর্ণনা করা কঠিন। যদ্যপি তাঁহাকে আবার কাহারও নিকট যাচ্ঞা করিতে হয়, তখন প্রথমে তাহার মনের কিরূপ ভাব হয়, যিনি কখনও দৈবদুর্ব্বিপাকে পতিত হইয়া তাহা অনুভব করিয়াছেন,তিনিই বুঝিতে পারেন।

"নবানদীনভাবস্য যাচমানস্য মানিনঃ।
বচো জীবিতয়োরাসীৎ পুরো নিঃসরণে রণঃ ॥"

যে ব্যক্তি নূতন দরিদ্র হইয়াছেন, সেই মানী ব্যক্তি যদ্যপি যাচ্ঞা করিতে বাধ্য হন, তাহা হইলে, যাচ্ঞা করার পূর্ব্বে,তাঁহার বাক্য ও জীবন এই উভয়েই অগ্রে বাহির হইবার জন্য রণে প্রবৃত্ত হয়। অর্থাৎ মানী দারিদ্র্য-ভাবাপন্ন ব্যক্তির যাচ্ঞা-বাক্য প্রয়োগ করার পূর্ব্বে, তাঁহার ইচ্ছা হয় যে,জীবন ত্যাগ হইলে ভাল হয়।

"সুখংহি দুঃখান্যনুভুয় শোভতে ঘনান্ধকারেষিব
দীপদর্শনং।
সুখাত্তু যো যাতি নরো দরিদ্রতাম ধ্রুবঃ শরীরেণ
মৃতঃস জীবতি ॥"

অত্যন্ত অন্ধকারবিশিষ্ট স্থানে দীপালোক যেরূপ শোভা পায়, সেইরূপ দুঃখ অনুভব করিয়া সুখ শোভা পাইয়া থাকে। অর্থাৎ সংসারে দুঃখের পর সুখ ভোগ করা বড়ই প্রীতিকর। কিন্তু যে ব্যক্তি সুখভোগ করিয়া দরিদ্রতা প্রাপ্ত হয়, সে ব্যক্তি শরীর ধারণ করিয়া মৃতের ন্যায় অবস্থিতি করে। দুঃখের পর সুখভোগ বড়ই তৃপ্তিকর, কিন্তু বহুবিধ সুখভোগ করিয়া দরিদ্র হইলে সেই ব্যক্তির জীবন ধারণ করা একপ্রকার বিড়ম্বনা।

ভাল অবস্থা হইতে দরিদ্রাবস্থায় পতিত হইলে যে কি কষ্ট হয়, তাহা সংস্কৃত মৃচ্ছকটিক নাটকে বিশেষঃ বর্ণিত আছে। চারুদত্ত ঐ নাটকের নায়ক। এক সময় তাহার অবস্থা অত্যন্ত ভাল ছিল, কিন্তু কালের কুটিল-চক্রে সে অবস্থার বিপর্য্যয় ঘটে, সুতরাং চারুদত্তের আর পূর্ব্বভাব রহিল না। সে তেজ, সে হাস্য, সে প্রফুল্লতা, সে উদ্যম, সমস্তই অর্থের সহিত ফুরাইল। মৃচ্ছকটিক অতি উৎকৃষ্ট নাটক। সংস্কৃতাভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেরই ইহা পাঠ করা উচিত। মৃচ্ছকটিক হইতে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত করা গেল। যথা,—

"শূন্যমপুত্রস্য গৃহং চিরশূন্যং নাস্তি যস্য সমিত্রম।
মূর্খস্য দিশঃশূন্যাঃ, সর্ব্বং শূন্যংদরিদ্রস্য।"

যাহার পুত্র নাই, তাহার গৃহ শূন্য; যাহার সৎমিত্র নাই, তাহার গৃহ চিরশূন্য; মূর্খের সবদিকই শূন্য; দরিদ্রের সকলি শূন্য।

"দারিদ্র্যান্মরনাৎ বা মরণং মম রোচতে ন দারিদ্র্যম্।
অল্পক্লেশং মরণং দারিদ্র্যমনন্তকং দুঃখং ॥"

দারিদ্য এবং মরণ এ উভয়ের মধ্যে মরণ আমার ভাল লাগে; কিন্তু দরিদ্রতা ভাল লাগে না। কারণ, মরণ অল্প-ক্লেশসাধ্য, কিন্তু দরিদ্রতায় অনন্ত ক্লেশ সহ্য করিতে হয়।

"সত্যং নমে বিভবনাশ কৃতান্তি চিন্তা।
ভাগ্যক্রমেণ হি ধনানি ভবন্তি যান্তি।
এতৎ তু মাং দহতি নষ্টধনাশ্রয়স্য।
যৎ সৌহৃদাদপি জনাঃ শিথিলীভবন্তী॥"

ধনসম্পত্তি নাশ-হেতু সত্যই আমার কোন চিন্তা নাই। কারণ, ধন ভাগ্যক্রমে উপার্জ্জন হয়, এবং ভাগ্যক্রমেই আবার নষ্ট হয়। কিন্তু ধনহীন যে আমি, আমায় এই বিষয় বড়ই অনুতাপ দিতেছে যে, দরিদ্র হইলে লোকে বন্ধুভাব রাখে না।

"দারিদ্র্য! শোচামি ভবন্তমেব-মন্যচ্ছরীরে সুহৃদিত্যুষিত্বা
বিপন্নদেহে ময়িমন্দভাগে মমেতি চিন্তাক্বগমিষ্যসি ত্বম॥"

হে দরিদ্রতা! তোমার জন্য আমার এই খেদ যে তুমি বন্ধুভাবে আমার দেহে থাকিয়া, —হতভাগ্য আমি—আমার মৃত্যু হইলে আবার কোথায় যাইবে! এই চিন্তাই এইক্ষণে আমার মনে উদয় হইতেছে—আবার কোন হতভাগ্য ব্যক্তি তোমার জন্য আমার মতন কষ্ট পাইবেক!

"দারিদ্র্যাৎ পুরুষস্য বান্ধবজনো বাক্যেন সন্তিষ্ঠতে।
সুস্নিগ্ধা বিমুখীভবন্তি সুহৃদঃ স্ফারীভবন্ত্যাপদঃ।
সত্বং হ্রাসমুপৈতি, শীলশশিনঃ কান্তি পরিম্লায়তে।
পাপং কর্ম্ম চ যৎ পরৈরপি কৃতং তৎ তস্য সম্ভাব্যতে॥"

দরিদ্রতা-নিবন্ধন মনুষ্যের বন্ধু-বান্ধবেরা তাহার বাক্য শ্রবণ করেন না, প্রিয় বন্ধুগণও বিমুখ হন, আপদ-বিপদ বর্দ্ধিত হইয়া উঠে, তেজের হ্রাস হয়, তাহার উত্তম কান্তি ম্লান হয়, এবং অন্যকৃত অনিষ্টকর কার্য্য-সকল তাহার দ্বারাই কৃত, লোকে এই অনুমান করে।

"অহোরে! দীনতে তে কিমনির্ব্বাচ্যা সমর্থনং।
যল্লোকেঽঘটনীয়ং তৎ সুসাধ্যং তব শক্তিতঃ॥
তয়া মূর্খায়তে ধীরো মান্যো হীনায়তেঽচিরাৎ।
সুবুদ্ধিরপি দুর্ব্বোধ, প্রিয়োপ্যপ্রিয়তাং ব্রজেৎ॥
তব শাসনতঃ পুত্রস্তাতমপ্যবমন্যতে।
ন চ সম্ভাষতে প্রীত্যা জায়াপি পতিজীবিতা॥
ত্বয়াভিভূতা যে লোকা দুরদৃষ্টবশাদিহ।
বিনা মৃত্যুং নহি সুখং তেষাং ভাবি কদাচন॥"

হে দরিদ্রতা! তোমার কি অপূর্ব্ব শক্তি! পৃথিবীতে যাহা অঘটনীয়, তাহা তোমার শক্তি-প্রভাবে সুসাধ্য হয়। তুমি ধীর (বুদ্ধিমান লোককে মূর্খ করিয়া তোল; মাননী লোককে শীঘ্র মানহীন কর; সুবুদ্ধিসম্প লোককে দুর্ব্বোধ করিয়া তোল; প্রিয়ব্যক্তি তোমার প্রভাবে শীঘ্র অপ্রিয় হইয়া উঠে তোমার শাসনে পুত্র পিতাকে অবমান করে, পতিপ্রাণা স্ত্রী প্রীতির সহিত স্বামী সম্ভাষণ করে না। এ জগতে দুরদৃষ্ট বশ যে ব্যক্তিরা তোমার দ্বারা অভিভূত হ তাহাদের মৃত্যু ভিন্ন কদাচ আর সুখ হয় না।

মণিপুর-যাত্রীর দিনলিপি।*

(১)

নিয়ত-পরিবর্ত্তনশীল কালচক্রের অপ্রতিহ গতি-প্রভাবে মণিপুরের ভাগ্যাকাশ আজ ঘো তমসাচ্ছন্ন—উহার সৌভাগ্যলক্ষ্মী চিরদিনে জন্য নির্ব্বাসিতা। কি কুক্ষণে স্বর্গীয় গ্রিমউ সাহেবের সহিত মণিপুর-বীর টীকেন্দ্রজিতে অকপট সখ্য স্থাপিত হইয়াছিল; কি কুক্ষ দুর্ভেদ্য ষড়-যন্ত্র-বলে স্বর্গীয় রাজা সুরচ রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন; দারুণ দুর্বুদ্ধি-বশে প্রবল প্রতাপ ইংরা রাজের প্রতিনিধি কুইণ্টন বাহাদুর সদ নরপিশাচ মণিপুরীর হস্তে নিহত হইয়াছিলে এই অভাবনীয় ঘটনাবশে মণিপুর-রাজ্য অ

* আমাদিগের একজন বন্ধু, আপনার কেরাণিগি কর্ম্ম-উপলক্ষে, মণিপুর-যুদ্ধের সময়—তথায় উপস্থি থাকিয়া, স্বচক্ষে সেখানকার যাহা দেখিয়াছেন, ও স্বক সেখানকার বিবরণ যাহা শুনিয়াছেন, তাঁহার এ দি লিপিতে' তাহাই লিপিবদ্ধ আছে। 'অনুসন্ধানে' ক্রম যত সংক্ষেপ অথচ সার-কথায় সম্ভব, তাহাই প্রকা হইবে। এ দিনলিপি আজকালকার অনেক 'আদম লিপি' হইতে যে সমধিক প্রীতিপ্রদ হইবে, তাহা বাহুল্য। মণিপুর-আন্দোলনের সময়ই তিনি এস কাহিনী লিখিয়া সকলকে চমকিত করিতে পারিতে কিন্তু তিনি চাকরীপ্রাণ বাঙ্গালী—ভয় ছিল, পাছে সময় সে সব কিছু লিখিলে চাকরিটি যায়! এখন, চুকিয়া-বুকিয়া গিয়াছে; তাই তিনিও, আমাদের অ অনুরোধে, লিখিতে আরম্ভ করিলেন।

শানে পরিণত—মণিপুরের একটী নগণ্য জশিশু আজ প্রতাপবান ইংরাজ-রাজের সাদ-ভিখারী! বিধিলিপি অখণ্ডনীয়; বিধি-শে মণিপুরের আজ এই বিষম দশা সমুপ-স্থিত। এখন আর সে সুরচন্দ্র-টীকেন্দ্রজিৎ াই,—বৃদ্ধমন্ত্রী টঙ্গাল জেনারেল নাই,—কুল-ন্দ্র-অঙ্গসেনাও নাই; কেহ বা অনন্ত শান্তির সুস্নিগ্ধ ক্রোড়ে চিরদিনের জন্য শায়িত, কেহ া পরাধীনতা-শৃঙ্খলের মুমূর্ষু-পেষণে চির-জীবনের জন্য নিষ্পেষিত! সকলই গিয়াছে; কিন্তু অতীতের পূর্ব্বস্মৃতি এখনও মানুষের মনে জাগ রহিয়াছে। সেই স্মৃতির কুহকে এখন কত লোকে কত কথাই বলিতেছে;—"মণিপুরের ইতিহাস" বাহির হইতেছে, "মণিপুর প্রহে-লিকা" প্রকাশিত হইতেছে, বিবি গ্রিমউডও স্বদেশে গিয়া মণিপুরের পূর্ব্বস্মৃতি দেশ-বিদেশে ব্যক্ত করিতেছেন। এই মণিপুর-ব্যাপারে আমরাও ভুক্তভোগী; কেরাণী-গিরির কঠোর শাসনে কর্ত্তব্যানুরোধে স্বজনত্যাগী। মণিপুরে রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে আমা-দিগেরও 'মাথার টনক নড়িল'; পিতামাতা বন্ধুবান্ধব প্রাণের প্রিয় পরিজনবর্গকে পরিহার করিয়া প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ অপরিচিত প্রদেশে মণিপুরাভিমুখে ছুটিতে হইল। যাইতে যাইতে কি দেখিলাম, কি শুনিলাম—অনেকেই জানিতে সমুৎসুক; সকলকে পৃথগ্‌ভাবে শুনাইবার অবকাশ নাই—তাই আজ 'অনু-সন্ধানের' দ্বারস্থ। 'অনুসন্ধানে' অনুসন্ধান করিলে সকলেরই ঔৎসুক্য পূর্ণ হইবে। কিন্তু ইহাতে যেন বেশী কিছু প্রত্যাশা না করেন;—কেরাণীর ক্ষীণ মস্তিষ্কে রাজনৈতিক সূক্ষ্মতত্ত্ব প্রবেশ-লাভই করিতে পারে না—করিলেও, তাহা অপ্রকাশ্য; আর, অলৌকিক বা অশ্রুত-পূর্ব্ব ঘটনাও পরাধীনের নির্দ্দিষ্ট দৃষ্টিসীমার অতীত। সুতরাং সহৃদয় পাঠকবর্গ আমাদি-গের এই ক্ষুদ্র কাহিনীতে এইরূপ কোন উদ্ভট ব্যাপার প্রত্যাশা করিবেন না। নগ্নদৃষ্টিতে যে সকল দৃশ্য প্রতিভাত হইয়াছে, লোক-লোচনের সমক্ষে তাহাই অননুরঞ্জিত-ভাবে ধারণ করিব। নিরবচ্ছিন্ন মণিপুরের আভ্যন্ত-রিক বিবরণ জানা ভিন্ন, মণিপুর-যাত্রার অবা-ন্তর দৃশ্যও পাঠকবর্গ ইহাতে দেখিতে পাইবেন —এই ক্ষুদ্র কাহিনীর ইহাই অন্যতম উদ্দেশ্য।

১২৯৭ বঙ্গাব্দের ২১এ চৈত্র, ইংরাজি ৩রা এপ্রেল, শুক্রবার, পূর্ব্বাহ্ণ ৮॥ ঘটিকার সময়, আমরা আসামের রাজধানী শিলং-শৈল পরি-ত্যাগ করি। বঙ্গে তখনই নৈদাঘ-বায়ু ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু শৈলশিখরে তখনও শৈত্যের প্রবল প্রকোপ! প্রাতঃসমীরণের সুশীতলতা অন্তর্ভেদ করিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে রণভেরীর অস্ফুট কাল্পনিক রবও দুর্ব্বল বাঙ্গালী-প্রাণে দারুণ ভীতিসঞ্চার করিল। ইতিপূর্ব্বে কখনও বাটীর বাহির হই নাই, শান্তি-রসাস্পদ জননীর সুস্নিগ্ধ স্নেহ-ক্রোড় হইতে কখনও দূরে যাই নাই,—এখন, চাকরির অঙ্কুরেই পরীক্ষার চরম সঙ্গমস্থল। একদিকে মার সকরুণ নিষেধ-বাণী, অপর-দিকে অন্নদাতা প্রভুর অবিচলিত কঠোর আজ্ঞা,—কোন্ দিক্ রাখি, ভাবিয়া ব্যাকুল। সঙ্গে সঙ্গে, সৌভাগ্যক্রমে, হৃদয়ে একটু কর্ত্তব্যজ্ঞানের ছায়া পড়িল; কাপুরুষতার কলঙ্করেখাও ধীরে ধীরে ঘৃণার সঞ্চার করিতে লাগিল; ভাবিলাম, যখন সংসারযাত্রা নির্ব্বা-হের জন্য পরের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছি, তখন তন্নিহিত সুখদুঃখের তারতম্য ভাবিলে কি হইবে?—আর যদি প্রাণের ভয়ে এই প্রবল পরীক্ষাস্থলে পশ্চাৎপদ হই, তবে ইংরা-জের ইতিহাসে বাঙ্গালীর কাপুরুষত্ব উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর বর্ণে বর্ণিত হইবে। ভাবনার ফল—দৃঢ়প্রতিজ্ঞা; জীবনের ক্ষণভঙ্গুরত্ব, আত্মার অবিনশ্বরত্ব—প্রভৃতি তত্ত্বকথালোচনে, কখন বা আশার মনোমুগ্ধকর প্রলোভনে, কখন

সাহসের স্ফুলিঙ্গ-বিকীরণে, জননীর মন ক্রমশঃ স্থির করিতে চেষ্টা করিলাম; এবং অন্তিমে, তাঁহার চরণ-ধূলিরূপ অক্ষয় কবচ ধারণ করিয়া, দুর্গতিহারিণী দুর্গার অভয়-নাম স্মরণ করিয়া, বন্ধু-বান্ধবের সহিত আলিঙ্গন-অভিবাদনাদি সমাপন করিয়া, অশ্বযানে আরোহণ করিলাম। ঘর্ঘর রবে রথ কামরূপ-উদ্দেশে ছুটিল। স্বদেশ-যাত্রাকালে এই রথধ্বনি হৃদয়ে কত আনন্দ-বর্দ্ধন করিত, আজ কিন্তু তাহা বিকটরবে বিষম ব্যাকুলতা সঞ্চার করিতে লাগিল। যাহা হউক, সায়াহ্নে যথাকালে আমরা গৌহাটী পৌঁছিলাম, এবং পরদিবস প্রত্যূষে জলপথে যাত্রা করিলাম। (ক্রমশঃ)

অনুসন্ধান-সমিতির বিবরণী।

প্রতারণা-প্রবঞ্চনা।

জুয়াচুরি কিরূপ,

একবার দেখুন। আজকাল 'বঙ্গবাসী', 'প্রকৃতি', 'বঙ্গনিবাসী' প্রভৃতি প্রায় সকল সংবাদপত্রেই এই বিজ্ঞাপনটী বাহির হইয়া থাকে,—

"পকেট ষ্টিক (ছড়ি)।

জর্জ্জ ওয়েল্‌ড সাহেবের আবিষ্কৃত। ইহা দেখিতে যেরূপ তৃপ্তিকর, অনুপাতে তদপেক্ষাও বিশেষ কার্য্যকারী। যদি বাবুগিরি ও আপদ-বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ছড়ি ব্যবহার হয়, তাহা হইলে অনর্থক পয়সা ব্যয় না করিয়া এই আশ্চর্য্য জর্ম্মাণ সিলভারের 'পকেট ছড়ি' ক্রয় করুন; আবশ্যক-বিশেষে ছড়ি হস্তে করিয়া স্প্রিং ঘুরাইলে ষ্টীক বাহির হইবে। মূল্য প্রত্যেকের ৪৲ টাকা; প্যাকিং ৵০ আনা।

বি, কে, ঘোষ।
১০০নং কলেজ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।"

এই তো বিজ্ঞাপন! কিন্তু ইহার পরিচয়টা একবার শুনুন। আমাদের কোন সন্ধানদাতা (Informer) এসম্বন্ধে আমাদিগকে যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহা দেখুন, এই,—

"মহাশয়,—গত দুই সংখ্যক 'অনুসন্ধানে' জিঃ ব্যারওয়েল এণ্ড কোং নামীয় যে প্রবঞ্চনা-মূলক বিজ্ঞাপনের বিষয় আন্দোলন করিতেছেন, সেই লোকটা এখন প্যাটেণ্ট ঔষধের ব্যবসায় বন্ধ রাখিয়া, এই নূতন ধরণের জুয়াচুরী আরম্ভ করিয়াছে। অর্থাৎ, সেই লোকটা একখানি ছড়ির (যাহা মুরগীহাটায় ১৷৷০ কি ২৲ টাকা মূল্যে বিক্রয় হয়, তাহা ক্রয় করিয়া আনিয়া) ঐরূপ 'পকেট ষ্টীক' নাম দিয়া ৪৲ টাকা মূল্যে বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন জারি করিতেছি। বি, কে, ঘোষ, ১০০নং কলেজ ষ্ট্রীট ঠিকানা হইতে 'বঙ্গবাসী' প্রভৃতি সংবাদপত্রে ঐ মনোমুগ্ধকর বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া মফঃস্বলস্থ সরল-প্রকৃতির লোকদিগকে ঠকাইতেছে। এক্ষণে, ঐ বিষয়টী 'অনুসন্ধানে' প্রকাশ করিয়া সাধারণকে সাবধান করিয়া দিবেন; এবং ভবিষ্যতে যেন ঐরূপ বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে না পারে, তাহার চেষ্টা করিবেন।"

এবিষয়ে আমরা আর অধিক কি বলিব? সাধারণে, বিজ্ঞাপনের বোলচাল দেখিয়াই, লোকগুলাকে চিনিতে পারেন, এই আমাদের ইচ্ছা। তাহা হইলে প্রথমেই সকলে সাবধান হইতে পারেন।

* * * *

আর এক জুয়াচুরী।

আজকাল অনেক সংবাদপত্রে (১৮ই পৌষের বঙ্গ-নিবাসীর ৪র্থ পৃষ্ঠায় দেখুন) এই এক বিজ্ঞাপন বাহির হইতেছে,—

"ভারতে নূতন আসিল।
অদ্ভুত ভেল্কী! আশ্চর্য্য ভোজবিদ্যা!
নয়নান্দকারী ইন্দ্রজাল-মহিমা!

ঘরে বসিয়া ম্যাজিক কৌশল শিখিতে অনেকেই ইচ্ছুক, কিন্তু উপযুক্ত যন্ত্রাভাবে কাহারও মনোরথ সিদ্ধ হয় না। বাজারে পুস্তক পড়িয়া ম্যাজিক শেখা যে অসম্ভব তাহা জানিতে কাহারও বাকী নাই, আমি এই অভাব দূর করিবার অভিপ্রায়ে বিলাত হইতে অর্ডার দিয়া নূতন ম্যাজিক শিখিবার নানাবিধ আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য দ্রব্য আনয়ন করিয়াছি। সামান্য পয়সা ব্যয় করিয়া ইহার যে কোনটী সাধারণে পরীক্ষা করেন, এই প্রার্থনা।

ব্রাড্‌লা তাস।

এই তাসের ১ খানিতে সামান্য আঘাত করিবামাত্র একটী সুন্দর গোলাপফুল পরিণত হইবে। মূল্য ৸০ আনা।

এলাবাষ্ট ম্যাজিক বুক।

এই পুস্তকের মধ্যে একটুকরা কাগজ দিয়া একটী চাপ দিলেই ম্যাজিকের অদ্ভুত কৌশলে ১টী টাকা হইবে। মূল্য ১৲ টাকা অর্ডার দিলে দ্রব্যের সহিত ব্যবস্থা-পত্র পাঠাইয়া থাকি।

শ্রীরামচন্দ্র বসু
৪৭ নং নিমতলাঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা।"

বিজ্ঞাপনটী কিন্তু সম্পূর্ণই জুয়াচুরীমূলক। স্থানাভাবে এবার আর ইহার সম্যক পরিচয় দিতে পারিলাম না। এখন কেবল এইমাত্র বক্তব্য,—সাবধান!—ঠকিবেন না!

অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র।

৫ম খণ্ড] ১৫ই মাঘ, ১২৯৮। [১২শ সংখ্যা।

তত্ত্ব-সঙ্গীত।

(১)

(বাউলের সুরে)।

আহা! কি সুন্দর হরি নাম!
হরিনামের গুণ এমি বটে॥ ১
নামে শুষ্ক হৃদে শান্তি আসে,
মরা মানুষ বেঁচে উঠে। ২
সুধা-মাখা এই নামের জোরে,
দেবতা হ'তে পারে নরে;
ভবে স্বর্গ হয়, দূরে যায় ভয়,
সমন তারে পূজা করে॥ ৩
হরি-নামে এক উঠিছে পবন,
এই পবনে জীবের জীবন;
এই জীবনে গায় হরি-নাম,
এই নামে অমৃত উঠে॥ ৪
হরি-নামে এক উঠিছে দয়া,
সেই দয়াতে জীবের কায়া;
তার মাঝে ভাই শান্তি-ছায়া,
সেই ছায়াতে জগত বাঁচে॥ ৫
সচ্চিদানন্দ হরি ব'লে,
নাচ দু'টি বাহু তুলে;
হীন-বাসনার সংসার ছেড়ে,
দিব্য-ধামে চল ছুটে॥ ৬

(২)

(কীর্ত্তন-মিশ্র বাউল)

সখা হে! তোমার মত আমার
আপনার কে আছে?।১
(যখন আমায়) বিশ্ব-সংসার সবাই ছাড়ে,
তখন তুমি থাক কাছে॥ ২
(অনন্ত কালের বন্ধু)।
চন্দ্র গগণ, তারা-তপন,
এসব তোমারি গুণ, গায় অনুক্ষণ,
হায় হে।
ও নাথ! যত আনন্দ তোমার কাছে,
এত আনন্দ আর জগতে কি আছে?।৩
চেয়ে দেখ্‌লে আমার হৃদয়-মাঝে,
দেখ্‌তে পাই হে, তুমি আছ কাছে,
হায় হে।
আবার ডাক্‌লে তুমি, দেও হে সাড়া,
সাড়া দিয়ে বল,—'আমি আছি কাছে'॥৪
পুত্র-কন্যা আদি যত, এসব তোমারিত,
হায় হে।
আমি যারে দেখি, তারই হৃদে
তোমার প্রেমের জ্যোতি আছে॥ ৫
কেঁদে ডাক্‌লে দীনবন্ধু ব'লে,
এসে অমনি তুমি নেওহে কোলে,
হায় হে।
(তুমি কি রইতে পার হে তাকারমত ডাক্‌লে)
আমার চক্ষের জল দেও মুছা'য়ে
তোমায় দেখ্‌লে কত ভরসা আসে কাছে॥৬
(অসহায় সংসারে)

অদৃষ্ট।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

মহামায়ার সম্বন্ধে শেষ-কথা।

আমার এ ইতিহাস সম্বাদপত্রের ন্যায় নহে, যে, প্রত্যহ যেরূপে হয়, কাগজখানি পূরণ করা চাই—ইহাতে পাঠকগণ পড়ুন, আর নাই পড়ুন। ইহা ডাক-গাড়ির ন্যায়ও নহে। ডাক-গাড়ি নিয়মিত সময়ে ছাড়িবে, এবং নিয়মিত সময়ে আসিয়া পৌঁছিবে—চাই তাহাতে আরোহী থাকুক, আর নাই থাকুক। সুতরাং নিত্য নিত্য যে সমস্ত ঘটনা সঙ্ঘটিত হয়, তাহা দ্বারা এ পুস্তক এতদূর পূরণ করি নাই ও করিবও না। সে সমস্ত পাঠে লোকের কোন ফল দর্শিবার সম্ভাবনা নাই। সকলেই নিত্য নিত্য শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করে, স্নানাদি করে, পরে রজনী সমাগত হইলে শয়ন করিয়া নিদ্রায় সে রজনী যাপন করে। এরূপ কথা লেখা পাগলের কাজ। কিন্তু যদি নিত্য-ক্রিয়া সমূহের সহিত কোন বিশেষ ঘটনার সংশ্রব থাকে, এবং যদি সেই সংশ্রবের বিষয় না জানিতে পারিলে সম্যক গ্রন্থ বুঝিবার ব্যাঘাত জন্মে, তাহা হইলে সে গুলিকে যতদূর পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করা যায় ততই ভাল। মহামায়ার মৃত্যুর পর কোনই ঘটনা এরূপ ঘটে নাই, যাহা, অন্যান্য লোকের মৃত্যু হইলে, তত্তৎ পরিবারে না ঘটিয়া থাকে। অন্যান্য লোক মরিলে যেরূপ জীবিতেরা কাঁদে, দুঃখ করে, হায় হায় করে, সমস্তই সেইরূপ হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং সে কথা বলিয়া পাঠককে কেন বিরক্ত করিব? মহামায়ার মৃত্যুর অনেক দিবস পরে আমি এই গ্রন্থ লিখিতেছি। সুতরাং তখন পাঠকের সহিত দেখা হইলে বোধ হয় যেরূপ বলিতাম, এখন আর সেরূপ বলিতে ইচ্ছা হইতেছে না। যে কোন ব্যক্তি হউক না কেন, জীবিতাবস্থায় তাহার দোষই অধিক দেখা যায়, তাহার কোন গুণ আছে কি জনিতে পারা যায় না। কিন্তু মৃত্যু হইলে তাহার দোষের কথা আর মনে পড়ে না সেই-ই মনে পড়িয়া থাকে। বাস্তবিক কোন বিষয়ের দোষগুণ বিবেচনা করিতে হইলে, বিষয় অবলোকন করিবার পরক্ষণেই, হঠাৎ সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে। কি মহামায়া অনেক দিন লোকান্তরিত হইয়াছে এক্ষণে তাহার দোষগুণের বিষয় আমি নি পেক্ষ হইয়া বিচার করিতে পারি। পাঠ যদি আমার সে বিবেচনার ফল অনুসন্ধা করেন, তবে আমি তাঁহাকে বলিতে প্র আছি যে, এ সংসারে নির্দ্দোষ কোন পদা নাই। নির্দ্দোষ শব্দে আবার এস্থলে দুইরূপ অ আমার মতে যাহা ভাল হয়, আমি তাহাকে বলি; কিন্তু হয় তো অপর পাঁচজনে তাহা গুণ বলিয়া মানিবেন। সর্ব্বপ্রকার প্রশং আত্ম-প্রশংসা মাত্র। তোমার নিকট যে চে রাটী ভাল লাগিল, তুমি তাহাকে ভাল বলি তোমার নিকট কোন এক পুস্তকের যে অং ভাল বোধ হইল, তুমি তাহাকে প্রশংসা করি তোমার নিকট যে গানটী বা যে সুরটী লাগিল, তুমি তাহাকেও প্রশংসা করিবে; আর এক জনের রুচি তোমার রুচির বিরু তুমি যেখানে ভাল দেখিতেছ, সে সেখানে দেখিতেছে। অতএব পরের প্রশংসা আত্ম-প্র নয় কেন? লোকের মন সর্ব্বদা সমান অব থাকে না। যাহার যেরূপ ভাবনা, তাহার সেইরূপভাবে অবস্থিত থাকে। যে দুঃ কথা ভাবিতেছে, তাহার বীর-রসের গীত কালে বড় মধুর বোধ হয়। যাহার মন করু রসাভিষিক্ত, সে সেই সময় করুণা-রসের গী মোহিত হয়। অতএব কোন স্থানে গীত যাত্রা শুনিতে যাওয়া যাত্রিদিগের পক্ষে অ হস্তী-দর্শন সদৃশ। অন্ধেরা হস্তীর গায়ে স্থানে হাত বুলাইয়া যেরূপ অনুভব, করি

হাদের নিকট হস্তীর আকার সেইরূপই হইল। যাত্রা শুনিতে গিয়াও যাহার টুকু ভাল লাগিল, সে সেইটুকুই প্রশংসা রিল। মহামায়ার সম্বন্ধে আমি এক্ষণে হা বলিতেছি, তাহা অনেক বিবেচনার পর লিতেছি। তাহার দোষ ছিল বটে, কিন্তু সমস্ত চন্দ্রের কলঙ্ক-স্বরূপ ও নীলজলে ক্তোৎপল স্বরূপ। কলঙ্ক না থাকিলে বা দে নীলজল না থাকিলে যেরূপ চন্দ্রের অথবা ক্তোৎপলের শোভার ব্যাঘাত হইত, সেইরূপ টী একটী দোষ না থাকিলে মহামায়ার গুণ-লি তাদৃশ দেদীপ্যমান হইত না। কিন্তু স দোষ গুলি কি, শুনিলে, পাঠকবর্গ তাহাকে াপ করিবেন। বস্তুতঃ অপর কেহ তাহাকে দোষ বলিয়া মনে করিবেন কি না সন্দেহ। কারণ, সে দোষে কখন কাহারও কোন অনিষ্ট য় নাই। চন্দ্রের কলঙ্ক থাকা প্রযুক্ত কোন্ থিক দিশাহারা হইয়াছেন?

এস্থানে বা অন্য কোন স্থানে আর মহামায়ার কথা উল্লেখ করিব না। এই তাহার নামের শেষ উল্লেখ। অতএব এ অধ্যায়েরও এই স্থানে শেষ হইল।

ষষ্ঠত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

মহামায়ার মৃত্যুর পর মাতা আর অধিক দিবস বাঁচিয়াছিলেন না। প্রথম প্রথম তিনি হরিপদকে কোলে করিয়া গৃহের অভ্যন্তর হইতে বাহির-বাটী আনিতে পারিতেন। কিন্তু এ শক্তিও প্রত্যহ হ্রাস হইয়া আসিতে লাগিল। আর, যতই হ্রাস হইতে লাগিল, ততই হরিপদর প্রতি তাঁহার স্নেহ বাড়িতে লাগিল। অগ্রে কোন বেয়াদবি করিলে আমি হরিপদকে তাড়না করিতাম। তাড়না করিলে, সে তখনি মহামায়ার নিকট যাইত; আবার মহামায়া কোন কারণে তাড়না করিলে আমার নিকট আসিত। এক্ষণে সে মহামায়ার পরিবর্ত্তে আমার মাতার নিকট যাইতে আরম্ভ করিল। মাতা তাহাকে যেরূপ আদর করিতে আরম্ভ করিলেন, বোধ হয়, মহামায়া বাঁচিয়া থাকিতেও তাহাকে কখন সেরূপ আদর করে নাই। এক্ষণে আমি হরিপদকে তাড়া দিলে, মাতা যথার্থই রাগ করিতেন। কোন কোন দিবস এরূপ রাগের দরুণ আমার সহিত সমস্ত দিন-রাত্রি কথা কহিতেন না। কোন কোন দিন বা অনাহারে দিবা-রাত্রি যাপন করিতেন। যে দিবস তিনি অনাহারে থাকিতেন, সে দিবস আমারও আহার হইত না। এই সময় আমাদিগের গ্রামের উত্তরপাড়ার একটী বিধবা স্ত্রীলোক অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগের জন্য চারিটী রন্ধনাদি করিয়া দিতেন। তাঁহার ঠিক নাম কি, তাহা আমি অদ্যাপি জানি না; কিন্তু সচরাচর লোকে তাঁহাকে ভব-ঠাকুরুণ বলিয়া ডাকিত। তাঁহার চিত্তের ন্যায় দয়ার্দ্র চিত্ত অতি অল্পই দেখা যায়। মাতার ন্যায় তিনিও একাহারী। মাতার যে দিবস আহার হইত না, সে দিবস তিনিও রন্ধনাদি করিতেন না; জানিতেন, মাতা আহার না করিলে আমিও আহার করিব না, সুতরাং তাঁহারও আহার করা কর্ত্তব্য নহে।

ক্রমে ক্রমে মাতা শয্যাগত হইলেন। সে শয্যাগত হওয়া কেবল বার্দ্ধক্য-নিবন্ধন; নতুবা তাঁহার কোন অসুখ বা পীড়া হয় নাই। তাঁহার স্মরণ-শক্তি একেবারে তিরোহিত হইয়া গেল। ক্রমে আর কাহাকেও চিনিতে পারিতেন না; আর এরূপ বধির হইলেন যে, নিকটে গিয়া উচ্চৈঃস্বরে কথা কহিলেও শুনিতে পাইতেন না। ইতিপূর্ব্বে তাঁহার একবার কাশ-রোগ হইয়াছিল; তখন তিনি আর হরিপদ একত্র এক বিছানায় শুইয়া থাকিতেন। যখন মাতা কাশিতেন, তখনই হরিপদ বলিত,—"ঠাকুর-মা, আমার হাতে ফেলুন; আমি পিকদানিতে ফেলিয়া দিব।" কিন্তু এবার যখন মাতা শয্যাগত হইলেন, তখন হরিপদ তাঁহার

নিকটেও যাইত না। যদি ভব-ঠাকুরুণ কিম্বা আমি বলিতাম, "হরিপদ, তোমার ঠাকুরমার কাছে যাও না কেন", তখন হরিপদ বলিত, "আমি ডাক্তার না কবিরাজ? আমার যাওয়ার ফল কি?"

পাঁচ-সাত দিবস পরে মাতা-ঠাকুরাণীর ৺ প্রাপ্তি হইল। পিতার মৃত্যুর সময় দাদা যে ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ হওয়ায়, আমি তাঁহাকে মাতার পীড়ার বিষয় কি মৃত্যু-বিষয়ে কোন সংবাদ দিলাম না। কিন্তু তাহাতেও আমার দোষ হইল। আমি ভাবিলাম যে, আমার পক্ষে এ সমস্ত সংবাদ দেওয়া না দেওয়া বিধবার একাদশী অপেক্ষাও গুরুতর। বিধবা একাদশী না করিলে পাপ, কিন্তু করিলে কোন পুণ্য নাই। কিন্তু আমার পক্ষে সংবাদ দিলেও পাপ, না দিলেও পাপ। অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া, তাই একখানি পত্র লিখিয়া দিলাম। তৎপরে শ্রাদ্ধের কি উপায় ভাবিতে লাগিলাম। যখন আমার পিতার মৃত্যু হয়, তখন আমার অবস্থা অত্যন্ত মন্দ ছিল। কিন্তু মন্দ অবস্থাসত্ত্বেও আমি তাঁহার দেহ ত্রিবেণীর ঘাটে দাহ করিয়াছিলাম। এক্ষণে আমার অবস্থা অনেক উন্নত; সুতরাং ত্রিবেণীর ঘাটে যে দাহ করিব, ইহা কৃতসঙ্কল্প হইলাম। এবার সে বিষয়ে আর কাহারও নিকট পরামর্শ লইতে হইল না। কিন্তু একটা নূতন আশঙ্কা হৃদয়ে উত্থিত হইল। সেটী এই,—মৃত-দেহ অতি সত্বর পচিয়া যায় এবং সেই কারণে দেহটী দুর্গন্ধময় হইয়া পড়ে; পাছে মাতার মৃত-দেহ হইতে দুর্গন্ধ বাহির হয়, তাহা হইলে লোকে আমাকে নিন্দা করিবে! দ্বিতীয়ত, যদি সেই দুর্গন্ধ বিস্তার হওয়া-নিবন্ধন কাহারও পীড়া জন্মে, সেও আমার এ অবিবেচনার ফল বলিয়া পরিগণিত হয়। বাঙ্গালায় একটা কথা আছে,—"পাগলের মনে সদাই সুখ।" ইংরাজিতেও আছে,—"Where ignorance is bliss, it is folly to be wise." পিতার মৃত্যুর সময় আমি এ সমস্ত কথা জানিতাম না, আর জানিলেও তাহা বুঝিতাম না। কিন্তু কয়েক বৎসর ডাক্তারখানায় চাকরি করিয়া আমি এ সমস্ত এসময়ে বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলাম। কিন্তু কি করা কর্ত্তব্য, তাহা ভাবিয়া ঠিক্ করিতে পারিলাম না। কাহার নিকট পরামর্শ লইব, কেই বা আমাকে অকপটে পরামর্শ দিবেন? গ্রামের প্রায় সমস্তই আমার বিপক্ষ। শ্বশুর-বাটী নিকটে বটে; কিন্তু ভাবিলাম,—"কোথায় বা সেই সূর্য্যসম্ভূত বংশ, আর কোথায়ই বা আমার স্বল্পবুদ্ধি! যদি তাঁহারা অবজ্ঞা করিয়া আমার সহিত কথা না কহেন, তবে আমার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে পড়িবে।" এইরূপ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া চিন্তা করিতেছি, এমন সময়ে দৈব আসিয়া আমার চিত্ত-চাঞ্চল্য দূরীভূত করিয়া দিল। অর্থাৎ হঠাৎ আমাদিগের গুরুঠাকুর আমাদিগের বাটীতে আগমন করিলেন। আমাদিগের গ্রামে তাঁর আরও কয়েক ঘর শিষ্য ছিল। এ সকলের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা ধনী, তিনি তাঁহাদিগের বাটীতেই যেরূপ বৎসর বৎসর আসিতেন, সেইরূপ এবারও তাঁহারই বাটীতে পদার্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ক্ষণকাল পরেই, আমার মাতার মৃত্যু-সংবাদ শুনিয়া, তিনি আমাদের বাটীতে পদার্পণ করিলেন। ভাবিলাম, "ইনি ভিন্ন আর আমাকে কে সৎপরামর্শ দিবে?" এই ভাবিয়া, তাঁহাকে মতামত জিজ্ঞাসা করিতে উদ্যত হইলাম। কিন্তু আমার মুখ হইতে কথা নিঃসৃত হইবার পূর্ব্বেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মৃত-দেহ অবশ্যই তো ত্রিবেণীতে দাহ করা হইবেক?"

আমি কহিলাম,—"মহাশয়, নানা কারণবশতঃ আমি ইতস্ততঃ করিতেছিলাম যে, ত্রিবেণীতে দাহ করিব কি না?"

শুনিয়া, গুরুঠাকুর মহাশয় কহিলেন,—

"আমি তোমার গুরু, তুমি আমার শিষ্য, অতএব আমি যে বিষয়ে যে উপদেশ দান করি, তাহা তোমার লঙ্ঘন করা উচিত নহে। লোকে যে যাহা বলে বলুক, কিন্তু আমি যাহা বলিব, তাহা তোমার শিরোধার্য্য করা উচিত।" আমি আর দ্বিতীয় কথা না কহিয়া ঠাকুর-মহাশয়কে প্রণাম করিয়া ত্রিবেণীর ঘাটে মাতার মৃতদেহ লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিলাম। কিন্তু এমন সময় এক নূতন আপত্তি উপস্থিত হইল। মাতা যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন ভব-ঠাকুরুণ আমাদের বাটীতে থাকিতে কোন আপত্তি করেন নাই। ততদিন হরিপদকে কখন কখন মাতা ও কখন কখন বা ভব-ঠাকুরুণ কোলে করিয়া লইয়া বেড়াইতেন। তদ্দরুণ হরিপদ ভব-ঠাকুরুণেরও বিলক্ষণ অনুগত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু, এক্ষণে মাতার মৃত্যু হওয়াতে, ভব-ঠাকুরুণ আর আমাদিগের বাটীতে থাকিতে চাহিলেন না। তিনি কহিলেন,—"আমি চলিয়া যাইতেছি; কিন্তু তুমি ইহাতে অসন্তুষ্ট হইও না। আমি একাকিনী তোমার বাটীতে থাকিলে, দশ জনে দশ কথা কহিবে। কিন্তু, খোকা আমার অত্যন্ত নেওটা হইয়াছে, এইজন্য আমি এই বলি যে, খোকাকে আমাদের বাটীতে লইয়া গিয়া আমি প্রতিপালন করিব। আমরা গরিব মানুষ; সুতরাং তোমার অবস্থার অনুরূপ বালককে খাওয়াইতে পরাইতে পারিব না। আমার মত এই যে, বালকটীকে একবার হউক কি দুবার হউক প্রত্যহ দেখাইয়া লইয়া যাইব! তুমি উহার দরুণ প্রত্যহ খাবার দ্রব্যাদি পাঠাইবে।"

আমি তাহাতেই সম্মত হইলাম। পরন্তু কহিলাম যে,—"তবে খোকাকে এইক্ষণেই লইয়া যাও। নতুবা শব-বন্ধন প্রভৃতি দেখিলে সে অত্যন্ত ভীত হইবে।" আমার কথা শুনিয়া, ভব-ঠাকুরুণ হরিপদকে লইয়া তাঁহার নিজের বাটী যাইবার উদ্যোগ করিলেন। তদ্দর্শনে হরিপদ এরূপ চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল যে, তিনটী পাঠশালার বালক এককালে বেত্রাঘাৎ খাইলেও এরূপ চীৎকার করিয়া কাঁদে না। তদ্দর্শনে গুরুঠাকুর কহিলেন, যে,—"ওসব পরামর্শ খাটিবে না। বালকটী তোমার অত্যন্ত অনুগত—এ অবস্থায় তুমি যদি উহাকে একাকী ফেলিয়া যাও, তাহা হইলে কোন না কোন অশুভ ঘটিবার সম্ভাবনা। অতএব, তুমি বাটীতেই একটা দেশলাই জ্বালিয়া মুখাগ্নি করিয়া, অপর তোমার যে বন্ধু-বান্ধব আছেন, তাঁহাদিগের দুই এক জনকে শবের সহিত পাঠাইয়া দিয়া, দাহকার্য্য সমাধা করিয়া লও।"

গুরু-ঠাকুর মহাশয়ের আদেশক্রমেই কার্য্য করা হইল। পরে যথা-সময়ে শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করা হইল!

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

নূতন সঙ্কল্প।

যিনি যেরূপ কষ্টে পড়ুন না কেন, এবং যিনি যেরূপ আপনার দুরাদৃষ্ট মনে করুন না কেন, অনুসন্ধান করিলে, তাঁহা অপেক্ষাও অধিকতর কষ্টে পতিত এবং অধিকতর দুরদৃষ্টে নিমগ্ন লোক সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। মাতার মৃত্যুতে আমি যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইলাম। মনে করিলাম,—আমাপেক্ষা দুঃখী ব্যক্তি এ দুনিয়ায় আর নাই! বাটীতে একটী শিশু ও একটী ভৃত্য বই আর কেহই নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে, শিশুটী আবার ভৃত্যের নিকট থাকিতে চাহে না। আমি যদি বালকটীকে লইয়া সমস্ত দিবা-রাত্রি গৃহে থাকি, তবে যে কয়েক টাকা খাজানা পাইতাম, তাহাও আদায় হইবে না। অথচ তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে পারি না। এই অবস্থায় আমার হঠাৎ একটী উপায় মনোমধ্যে উদ্ভাবিত হইল।

মনে করিলাম,—"ডাক্তার বাবুর কন্যা সুলোচনা আমাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। তাঁহারা ধনী ব্যক্তি, বিশেষতঃ সুলোচনা পতি-পুত্রবিহীনা; অতএব, তিনি বালকটীকে পদতলে স্থান দান করিলেও করিতে পারেন।" এইরূপ পরামর্শে কৃতসঙ্কল্প হইয়া বাটী হইতে যাইবার দিনস্থির করিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্য-ক্রমে যাইবার পূর্ব্বদিন ভয়ানক এক প্রতি-বন্ধক উপস্থিত হইল।

সন্ন্যাসীর জীবনী।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

যাহা পূর্ব্ব অধ্যায়ে ঘটিয়াছে, তাহাতে আমার কোন ভয়ের কারণ নাই। ভয় ও লজ্জা উভয়ই জুঁইর হইয়াছিল। অবশেষ তাহার ফল এই হইল যে, জুঁইর মা জুঁইকে আমার সহিত বিবাহ দিতে স্থিরসঙ্কল্প করি-লেন, এবং কর্ত্তাকেও জুঁইর চরিত্র-বিষয়ে বুঝাইয়া কথাটা পাকা করিয়া লইলেন।

যখন ইহা একপ্রকার অবধারিত হইল যে, বিবাহ অনিবার্য্য; তখন জুঁই ভয়ঙ্কর আপত্তি উপস্থিত করিল; বলিল,—বল-পূর্ব্বক এ বিবাহ দিলে সে বিষ খাইয়া মরিবে। আমি এতদিন জানিতাম, জুঁই আমাকে ভালবাসে; কিন্তু সে রজনীর ব্যবহারে এবং এখন এবিবাহে আপত্তি করাতে আমার মনেও সন্দেহ হইল; ভাবিলাম,—এ বিবাহ সুখের হইবে না। সুতরাং আমিও উহাতে অস্বীকার করিলাম। কিন্তু কর্ত্রী-ঠাকুরাণীর ইচ্ছা তাহা নহে; তিনি এ বিবাহ দিবেনই দিবেন! অবশেষ বিবাহের দিনও স্থির হইয়া গেল।

নির্দ্দিষ্ট দিবসের দুই দিন পূর্ব্বে বেলা চারি-টার সময় (সেদিন রবিবার) আমি বেড়া-ইতে বাহির হইয়াছি। বেড়াইতে যাই-লেই, আমি প্রায় ডাকঘরে পোষ্ট-মাষ্টার বাবুর নিকট যাই। তাঁহার সহিত আমার বিশেষ প্রণয়। পোষ্টমাষ্টার বাবু বড় লেখা-পড়া জানেন না; মাঝে মাঝে তাঁহার চিঠি-পত্রাদিও লিখিয়া দিই; এজন্য আমার প্রতি তাঁহার বিশেষ যত্ন ও বিশ্বাস। অদ্যও বেড়াইতে গিয়া তাঁহার টেবিলের নিকট বসিয়াছি। টেবিলে অনেকগুলি চিঠি রহি-য়াছে; এখনও সর্ট করা হয় নাই। হঠাৎ সেই চিঠিগুলি একখানি একখানি করিয়া কৌতূহল-পরবশ হইয়া দেখিতে দেখিতে, গগণের শিরোনামে জুঁইর হাতের লেখা একখানি চিঠি দেখিতে পাইলাম। মনে দারুণ সন্দেহ হইল—জুঁই গগণের ঠিকানা কিরূপ জানিল! এইসময়ে পোষ্টমাষ্টার বাবু একজন হরকরার প্রতি তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে-ছিলেন। আমি অবসর বুঝিয়া, চিঠিখানি সাবধানে কোর্টের বুকের পকেটে পূরিলাম। কার্য্যসিদ্ধ হইল—বাসায় চলিয়া আসিলাম। আসিয়া দেখিলাম, জুঁই ও তাহার পিতা মাতা কেহই বাড়ী নাই; তাঁহারা সমাজে গিয়া-ছেন। সুতরাং চিঠি পড়িবারও বিলক্ষণ সুবিধা হইল। আমি যে ঘরে শয়ন করি, সেই ঘরে যাইয়া, দরজা বন্ধ করিয়া ও জানালা খুলিয়া দিয়া, চিঠি পড়িতে প্রবৃত্ত হইলাম। পত্রের মর্ম্ম এই,—

"প্রাণের গগণ!

স্কুলের পরে তোমার কাছে যাইতাম; তাহা কি তুমি ভাল বাস না? তাহাকে বাসায় লইয়া গিয়াছিলে কেন? আমার সঙ্গে তোমার দেখা হয়, এ কথাত বল নাই? আমার বিবাহ, কাহার সঙ্গে, বোধ হয়, অনুমান করিয়া লইতে পারিবে। পিতা-মাতার বড় জিদ্ হইয়াছে—কর্ত্তব্য কি লিখিবে? যদি বিবাহের আগে, তোমার পত্র না পাই, তবে একটা কল্পনা করিয়াছি—সে বড় ভয়ানক কল্পনা—অগত্যা তাহাই করিব। তোমাকে না দেখিয়া থাকিতে পারি না—দেখো—তুমি যেন পায় ঠেল না! যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, তাহা যেন স্মরণ থাকে। মা বড় অসাবধান, তাহা তুমি তো জানই;—আমি তাঁহার চাবি চুরি করিয়া নগদ ও নোটে আড়াই হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি। তুমি নিজের শত্রু পথ হইতে ধরিয়া বাসায় আনিয়াছিলে—এখন সে ক্রমে 'উরিয়া হিপ'* হইয়া দাঁড়া-ইতেছে। কিন্তু সে দোষ আমার নহে! আগামী কল্য চারিটার সময় আমাদের স্কুলের নিকট থাকিও—নিশ্চয় থাকিও—নৈরাশ করিও না। আমি আর তোমার বাসায় যাইব না। পত্রের উত্তর লিখিতে বলিয়াছি; কিন্তু লিখিও না। পত্র 'উরিয়া হিপের' হাতে পড়িতে পারে।

তোমার 'বকের' জুঁই।"

পত্র পাঠ করিয়া বিস্মিত হইলাম। মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম, এখন কর্ত্তব্য কি! অবশেষ ঠিক করিলাম, কর্ত্রী-ঠাকু-রাণীকে পত্র দেখাইব।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা আগত হইল; জুঁই-দের গাড়ি আসিয়া লাগিল। জুঁই ও কর্ত্তা-কর্ত্রী নামিলেন; সেই সঙ্গে অবগুণ্ঠনবতী আর একটী স্ত্রীলোকও নামিল। আমাদের আহারের সময় হইলে, দেখিলাম,—নবাগত স্ত্রীলোকটী যুবতী, এবং সুন্দরী। তাহার মুখ দেখিয়া বোধ হইল,—কোথাও বা দেখিয়া থাকিব। আহারান্তে, উপযুক্ত সময়ে, বারটা বাজিয়া গেল—আমি চিঠিখানি হাতে লইয়া ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলাম। একটু পরে মথা-রীতি কর্ত্রী আসিলেন। আমি চিঠিখানি তাঁহার হাতে দিয়া আদ্যোপান্ত কহিলাম। তিনি, চিঠিখানি দুইতিনবার ভাল করিয়া পড়িয়া, প্রথম একটু হাসিলেন; পরে গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়া বলিলেন,—"কাল চারটা?—আচ্ছা, তা দেখা যাবে!"

* ডিকেন্সের "উড়িয়া হিপকে" সকলেই চিনেন।

আমি বলিলাম,—"জুঁইকে আমার বিবাহ করিবার খুব ইচ্ছা ছিল, কিন্তু এখন আর কিছুতেই বিবাহ করিতে পারি না।"

"আমিও নিষেধ করি।"

"জুঁই তবে কাহাকে বিবাহ করিবে?"

"বিবাহ করিবে না!"

"তবে কি করিবে?"

"বেশ্যা হইবে!"

আমি দেখিলাম, কর্ত্রী-ঠাকুরাণীর চক্ষু দিয়া টস্‌টস্ করিয়া জল পড়িতেছে!

* * * *

পরদিন প্রাতঃকালে কর্ত্রী-ঠাকুরাণী জুঁইকে ডাকিয়া বলিলেন,—"আজ থেকে তোমাকে আর স্কুলে যেতে দিব না। বিবাহ হ'লে, তোমার স্বামীর ইচ্ছানুসারে আবার ভর্ত্তি করিয়া দিব। যাহার সঙ্গে বিবাহ হওয়ায় তোমার আপত্তি, অর্থাৎ রাত ১২টার সময় যাহার ঘরে যাইয়া পায় ধরিয়াছিলে, তাহার সহিত তোমার বিবাহ হইবে না—সে জন্য চিন্তা নাই।"

জুঁই সকল কথার উত্তর না দিয়া মৃদুভাবে কহিল,—"স্কুলে না যেতে দাও, যাব না! কিন্তু, আজ একবার যেতে হবে—ক্লাশ-ফ্রেণ্ডদের সঙ্গে দেখা করে বিদায় নিয়ে আসি গে।" কর্ত্রী বলিলেন,—"তোমার সঙ্গে যে যে মেয়ে পড়ে, তা'দের নামের তালিকা দাও; আমি গাড়ী পাঠাইয়া তোমার বিবাহের দিন সকলকে আনিব—তোমার যাইবার প্রয়োজন নাই।"

তথায় আর কেহ ছিল না—কেবল আমি ছিলাম। জুঁই বিরক্ত হইয়া একবার আমার মুখপানে তাকাইল—আবার মায়ের মুখপানে তাকাইল। কর্ত্রী একটু তীব্র হাসি হাসিয়া বলিলেন,—"জুঁই, আমি তোর চেয়ে চালাক্—তুই ভেবেচিস্ কি?"

জুঁই এবারে ক্রোধে অধীরা হইল—অবনত মুখ উচ্চ করিল—গ্রীবা সোজা করিল—তাহার

পর বলিতে লাগিল,—"তুমি চালাক্ হ'লে আমি এত আহাম্মুক হ'তেম না! তোমার কার্য্য—তোমার ব্যবহার আমি কি জানি না! তুমি যা দেখাও, তাই করি—যা শিখাও, তাই শিখি। তুমি আজ আমাকে শাসন করিবে—কিন্তু তোমার সে শক্তি কোথায়? তুমি কি অভিপ্রায়ে একে (আমাকে দেখাইয়া) আমার স্বামী করিতে চাও, তাকি জানি না! কি অভিপ্রায়ে মল্লিকাকে স্কুলে রাখিয়াছে, তাকি জানি না! কি জন্য পীড়া হ'তো, কি জন্য সেই বকধার্ম্মিক পাষণ্ড ডাক্তার আসিত, তাও কি জানি না! আর, এখন কি জন্য এক জন পথের পথিক আসিয়া এত প্রিয় হ'লো, তাও কি জানি না! যাই, আমি এখনই যাইয়া বাবাকে সকল বলিয়া দি—"

এই বলিয়া, তড়িৎবেগে সে প্রস্থান করিল। কর্ত্রী অত্যন্ত রাগিলেও হাসিতেন। তিনি ভয়ঙ্কর একটা হাসি হাসিয়া বলিলেন,—"জুঁই পাগল হয়েছে।" তৎপর আমাকে বলিলেন,—"ভয় নাই!—সেই চিঠিখানা দাও।" আমি চিঠি দিলে, তিনিও চলিয়া গেলেন—আমি বিস্মিত হইয়া আপন শয়ন-কক্ষে আসিয়া কত কি ভাবিতে লাগিলাম।

* * * *

কর্ত্রী ধীরে ধীরে কর্ত্তার নিকট যাইয়া দেখিলেন, জুঁই তথায় নাই। তাঁহার সাহস হইল। তিনি জুঁইর লিখিত পত্রখানি তাঁহাকে পড়িতে দিলেন। কর্ত্তা যথার্থই সরল-প্রকৃতির লোক, এবং বড়ই ভাল-মানুষ। তিনি, কিছুকাল মাথায় হাত দিয়া ভাবিয়া, অবশেষ বলিলেন,—"আমার অদৃষ্টে যে এ কেলেঙ্কারি লেখা ছিল, স্বপ্নেও ভাবি নাই—তোমার গর্ভে জন্মিয়া সে এতদূর অপদার্থ কেন হইল, ইহাই আশ্চর্য্য!"

কর্ত্রী বলিলেন,—"তাত হ'লো—এখন উপায় কি?" কর্ত্তা "ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলং" একটু জোরে উচ্চারণ করিয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িলেন। কর্ত্রী বলিলেন,—"ঐ করেইত তুমি গেলে—এখন একবার স্বীয় 'বুদ্ধি-হি কেবলং' না কল্লে ত চলে না! 'ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলং- এ' যতদূর হবার, তা হ'য়েছে। এখন উপায় কি, তাই বল?"

কর্ত্তা একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—"সহ্য কর, বিশ্বাস কর—ধ্রুব-প্রহ্লাদ অনেক সহিয়াছিলেন! এখন থেকে চাবিটা সাবধানে রাখ্‌বে; আর, টাকাটা শীঘ্র হাত করে ফেল। বুঝলে?"

কর্ত্রী অতিশয় ঘৃণা-ভাবে বলিলেন,—"সহ্য কর্‌ব—বিশ্বাস কর্‌ব—ধ্রুব হব—প্রহ্লাদ হব—আবার চাবি সাবধানে রাখব ও টাকাটা শীঘ্র হাত করব—তুমি ত সহজে এক নিশ্বেসে বলে ফেল্লে! এখন, এক দমে যে আমি এত হ'তেও পারি না—এত করতেও পারি না! সোজা করে বল, কি কর্‌তে হ'বে, আমি তাই করি। আর, না হয়, তুমিই যা ভাল বুঝ, কর?"

কর্ত্তা বলিলেন,—"আচ্ছা, তবে আমি যা ভাল বুঝি, তাই করি!" এই বলিয়া, জুঁইকে ডাকিলেন। দুই-তিনবার ডাকিলে, জুঁই আসিয়া উপস্থিত হইল।

কর্ত্তা ও কর্ত্রীকে এক যায়গায় দেখিয়া জুঁই ভীত ও স্তম্ভিত হইল।

কর্ত্তা বলিলেন,—"জুঁই, আমি তোমার পিতা। আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিব, সত্য বলিও। দোষ করিয়াও সত্য বলিলে, আমি মাপ করিব। কিন্তু মিথ্যা কহিলে, আমি কিছুতেই ক্ষমা করিব না।"

জুঁই সাহস পাইয়া অতি নম্রভাবে ধীরে ধীরে বলিল,—"বাবা, তোমার কাছে মিথ্যা কথা কহিব না।"

তখন কর্ত্তা প্রশ্ন করিতে লাগিলেন,—"বল, গগণকে পত্র লিখেছ কি না?"

"লিখেছি।"

"গগণের সঙ্গে গোপনে দেখা কর কি না?"

"করি।"

"তুমি তাকে ভালবাস?"

"সে আমার মহাশত্রু!"

"বাক্স ছ'তে টাকা তুমি নিয়েছ?"

"নিয়েছি।"

"গগণের জন্য?"

"না।"

কর্ত্তা তথাপি শান্ত, তথাপি সুধীর; ধীরে ধীরে চিঠিখানি জুঁইর হাতে দিয়া কহিলেন,—"এ চিঠি কে লিখিয়াছে?"

জুঁই একটু বিস্মিত হইয়া পরে বলিল,—"আমি লিখিয়াছি।"

"তবে সে তোমার শত্রু কি করিয়া হইল?"

জুঁই নীরবে ভাবিতে লাগিল।

কর্ত্তা পুনরায় বলিলেন—এখনও গম্ভীর, এখনও প্রশান্ত, কেবল তাঁহার মুখ একটু লাল হইয়াছে—বলিলেন,—"জুঁই, তোমার চরিত্র অতি ঘৃণাজনক। তোমাকে উপযুক্ত শাসন করা উচিত। কিন্তু কি শাসন করিব! শাসন করাও অসাধ্য! গোল হইবে—লোকে জানিবে—স্ত্রীশিক্ষার মূলে কুঠার পড়িবে—যত্ন করিয়া কি এইজন্য তোমাকে শিক্ষা দিতেছি? তুমি আমাকে আর বাবা বলিও না; তুমি আমার কন্যা না হইয়া শত্রু হইয়াছ! আমি কাল যাকে পাই, তারই সঙ্গে বিবাহ দিয়া, তোমাকে আমার চক্ষুর অন্তরাল করিব।"

জুঁই কাঁদিতে লাগিল।

কর্ত্তা পুনরায় বলিলেন,—"টাকাগুলি আনিয়া দাও।"

জুঁই বলিল,—"টাকা আমার হাতে এখন নেই। টাকা নষ্ট হবে না—সাত দিন পরে আমি নিশ্চয় দিব।"

"কর্ত্তা বলিলেন,—"তোমার হাতে নেই?"

"না।"

"কাকে দিয়াছ?"

"তা এখন বলিব না।"

কর্ত্তা অবাক্ হইয়া কর্ত্রীর মুখপানে চাহিলেন। জুঁই নীরবে ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। কর্ত্রী কর্ত্তাকে বলিলেন,—"দেখ্‌লে!"

"দেখ্‌লাম"—এই বলিয়া, "ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলং" উচ্চারণ-পূর্ব্বক, একটী দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া, তকিয়ায় পিট দিয়া, কর্ত্তা চিৎ হইয়া পড়িলেন।

মৃত্যু-চিন্তা।

এজগতে যত কিছু ভয়াবহ পদার্থ আছে, তন্মধ্যে মৃত্যু-চিন্তাই সর্ব্বপ্রধান। জীবের জীবনে এতদপেক্ষা ভয়ঙ্কর পদার্থ আর নাই। কি অতুল যশ-সম্পত্তিশালী রাজাধিরাজ মহারাজ, কি ভিক্ষোপজীবি অন্নের কাঙ্গালী দীন-দরিদ্র—মৃত্যু-চিন্তার নিকট সকলেই পরিত্রস্ত। মৃত্যুর যে কি এক প্রলয়ঙ্করী ঘোরা তামসী মূর্ত্তি, মৃত্যুর যে কি সেই করাল অগ্নি-উচ্ছ্বসনকারী ভীষণ প্রহেলিকাময় দৃশ্য—সকলকেই তাহার নিকট পরাভব মানিতে হয়। মেদ-মাংস-অস্থি-নির্ম্মিত অল্পভোগী মানুষ—সে তো মৃত্যুর নিকট স্বতঃই নত-শির থাকিবে; কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা—মৃত্যু-চিন্তার কি সম্মোহিনী শক্তি—তাহার নিকট সেই কেবলমাত্র অনুভবময়, আকার-বিহীন, অনবলম্বনীয় ইন্দ্রিয়-আদিও পরাভূত! চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা, ত্বক প্রভৃতি পঞ্চেন্দ্রিয়—দর্শন, শ্রবণ, আস্বাদন, ঘ্রাণ ও স্পর্শন প্রভৃতি তাহাদের কার্য্য-পরম্পরা—অহো, কি সৃষ্টি-কৌশল—মৃত্যু তাহাদেরও অধিপতি! বাস্তবিকই, বলিতে কি, মৃত্যুর এতই প্রকোপ যে, এ দেখিয়া এমনও কখনও কখনও মনে হয় যে, সেই সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্ব-স্রষ্টা—তিনিও বুঝি উহার আয়ত্বাধীন—উহাকে এমনই কি এক অসীম ক্ষমতায় ক্ষমতান্বিত করিয়াছেন!

সহৃদয় পাঠক-পাঠিকে! আজ এক গুরু-

শিষ্যের উদাহরণে আপনাদিগের নিকট সেই এক মৃত্যু-রহস্য ভেদ করিব।

কিছু দিবস অতীত হইল, বাঙ্গালার পূর্ব্ব-সীমায় এক অতুল সম্পত্তি-বিক্রমশালী নৃপতি বাস করিতেন। যেমন বিভব-ঐশ্বর্য্য, তেমনি তাঁহার যশ-খ্যাতি। সাধু-পুরুষেরও তিনি অগ্রণী ছিলেন; তাঁহার দান-ধ্যান, কীর্ত্তি-কলাপ ও সাধুতার গুণে তিনি একরূপ প্রাত-স্মরণীয় হইয়াছিলেন।

তাঁহার গুরুদেবও তেমনই এক মহাপুরুষ। সর্ব্বদাই যেমন গুরু-সেবায় তিনি সম্যক উদ্যোগী থাকিতেন, গুরুদেবও তেমনি তাঁহাকে সন্তানের ন্যায় সদুপদেশে লালন-পালন করিতেন।

এইরূপেই বহুদিন কাটিয়া যায়। নৃপতিও স্বীয় গুরুদেবকে আপন আশ্রয়ে আনয়ন করিয়া—পিতৃপরায়ণ সন্তানের পিতৃ-সেবার ন্যায়—দিবারাত্রি তাঁহার সেবা-শুশ্রূষায় ব্যাপৃত আছেন। যেখানে যে সু-খাদ্যটি পান, যেখানে যে মূল্যবান বস্ত্রখানি দেখেন, সংগ্রহ করিয়া আনিয়া, আপন গুরুদেবের সেবায় নিয়োগ করেন। আর, গুরুদেবও, নৃপতিকে আপন সন্তানবৎ ধর্ম্মশিক্ষাদি প্রদান করেন।

এইরূপে, একদিন, গুরুদেবের নিকট হইতে ধর্ম্ম-উপদেশ পাইবার কালে, নৃপতি, কোন এক কারণে কৌতূহল-পরবশ হইয়া, আপন গুরুদেবকে জিজ্ঞাসিলেন,—"প্রভু! আজ আমার মনে বড়ই এক সংশয়-প্রশ্ন উপস্থিত। আপনি যদি অনুগ্রহ করিয়া আজ আমায় সে প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া করিয়া দেন, তবে বড়ই উপকৃত হই।"

প্রাজ্ঞ-মূর্ত্তি তাপসবর, নৃপতির ঈদৃশ প্রশ্ন-বাক্য শ্রবণ করিয়া, বাৎসল্যভাবে উত্তর করিলেন,—"বল বৎস, তোমার কি প্রশ্ন? যদি আমার সাধ্যাতীত না হয়, আমি অবশ্য তাহার পূরণ করিয়া দিব।"

নৃপতি বলিতে আরম্ভ করিলেন,—"গুরু-দেব! আজ কয়দিন হইতেই আমার মনে এই এক প্রশ্ন উপস্থিত হইতেছে যে, আপনিই বা এত সংযমী হইলেন কিরূপে; আর, হতভাগ্য আমি, আমিই বা এখনও কেন আমার সেই উচ্ছৃঙ্খল রিপুগণকে দমন করিতে পারিলাম না? দেব! উল্লেখে কেবলমাত্র পাপের ভাগী হওয়া, কিন্তু না বলিলেও নয়! না বলিলে, না জানিলে, মনে আমার আর শান্তি পাইতেছি না; তাই দেব, ক্ষমা করিবেন, সে পাপ-কথাও আজ মুখে আনিতে হইল। দেব! আমার সে পাপ-প্রশ্ন এই,—আপনি আর আমি, আজকাল আমরা দুইজনেই এ রাজপুরের কর্ত্তা। বরং আমার নিজের অপেক্ষাও আপনাকে অধিক স্বাধীনতা দিয়াছি। আহারে বলুন, ঐশ্বর্য্য বা বিলাসের দ্রব্যে বলুন, কিছুতেই আজকাল আমি আর আপনার 'উপরে' যাই না। বরং সকল বিষয়ই আপনার অপেক্ষায় আমি কমাইয়া আনিয়াছি; আর, সকল সুখ-সমৃদ্ধিও আপনাকেই ভোগ করিতে দিয়াছি এই ধরুণ,—ঘৃত, দুগ্ধ, দধি, মিষ্টান্ন প্রভৃতি যা কিছু সারবান সুখাদ্য আছে, তাহার সকলই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে আজকাল আপনাকে খাওয়াইয়া থাকি; আর আমি একবেলামাত্র বহুদিনের পুরাতন তণ্ডুলের একমুঠা অন্নমাত্র আহারে জীবন-ধারণ করি। এভিন্ন, আজকাল আহার বিলাস আর আমার কিছুই নাই। অথচ আপনার কোন বিষয়েই কোন ত্রুটী রাখি নাই। যা' কিছু সু-আহার, আজকাল তাহা সকলই আপনার; যা' কিছু সু-পরিচ্ছদ, আজকাল তাহা সকলই আপনার। আর আমি, যা' নহিলে নয়, তাহাই-মাত্র লইয়া আছি। কি দেব! তবু আমি কেন এত উচ্ছৃঙ্খল—আমার মন কেন এখনও এত কলুষিত? আর আপনি —এত ভোগৈশ্বর্য্যের অধিকারী থাকিয়াও কেমন করিয়া দেব, এমন নির্লিপ্ত-উদাসী

আপনার নিকট এত সুশিক্ষা-উপদেশ পাইয়াছি—এত চিত্ত-রোধের উপায়ও শিখিয়াছি; তবু দেব, বলিতে ঘৃণা হয়, এখনও কেন একটী সুন্দরী স্ত্রীলোককে দেখিলে আমি চঞ্চল-চিত্ত হই—একটি লোভের সামগ্রী দেখিলে আমি প্রলোভিত হই? আর আপনি, এমন আহারে—এমন বেশ-ভূষায় থাকিয়াও, বলুন দেখি দেবতা, কিরূপে এত নিস্পৃহ? এত সুন্দরী শোভাময়ী রাজ-অন্তঃপুরনারী নিয়ত আপনার পরিচর্য্যায় রত; এত ষোড়শী রূপসী রাজকন্যা নিশি-দিন আপনার সেবা-তৎপর, তবু দেব—তবু কেন—আপনি এত অচঞ্চল! আপনার বিলাস-সুখ তৃপ্তির জন্য আমিও কত সময়ে কত অলোক-সামান্যা সুন্দরীকে আপনার পরিচর্য্যায় পাঠাইয়াছি—ভাবিয়াছি, আপনি কোন বিষয়েই কোন কষ্ট না পান! কিন্তু দেব, একি আপনার—একি সংযম-শিক্ষা! বলুন আমায়—বলুন প্রভু—কিরূপে আপনি এ সঙ্কট-শিক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন? এ অভাগা শিষ্য আপনার,—তার কি সে শিক্ষার কোন উপায় নাই?"

এই বলিতে বলিতেই, অশ্রুজলে নৃপতির বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল। গুরুদেবের চরণ-প্রান্তে পড়িয়া, উপায়-প্রার্থী হইয়া, তিনি কাঁদিতে লাগিলেন। শিষ্যবৎসল গুরুদেব তখন, নৃপতির হস্ত-ধারণ-পূর্ব্বক, তাঁহাকে উঠাইয়া বসাইলেন; বলিলেন,—"বৎস! চিন্তা নাই। একাগ্র-চিত্ত থাকিলে, অবশ্যই তুমি সংযম-শিক্ষা করিতে পারিবে। কিন্তু বৎস, সে বিষয়ে এখন আর তোমায় কোন মৌখিক উপদেশ দিতে ইচ্ছা করি না; সে উপদেশ অনেকদিন হইতেই তুমি পাইয়াছ। এখন একবার কার্য্যতঃ তোমায় দেখাইব যে, কিরূপে তুমি আমার মত হইতে পার! বৎস! চলিত কথায় বলে,—'দেখে শেখা, আর ঠেকে শেখা।' মুখে আর কিছু বলিব না; 'ঠেকে শেখা' আর 'দেখে শেখা' কি, মনস্থ করিয়াছি, এখন তাই একবার তোমায় দেখাইব ও শিখাইব।"

অতঃপর গুরুদেব আবার বলিলেন,—"বৎস! তবে এক কাজ কর। তোমার রাজ্য-মধ্য হইতে সর্ব্বাপেক্ষা বীর্য্যবান কোন এক ব্যক্তিকে ধৃত করিয়া আন। আনিয়া, তোমার যে প্রমোদ-উদ্যান আছে, সেই উদ্যানের একটী-গৃহ, মধ্যে তাহাকে বাস করিতে দেও। তদ্ভিন্ন, খাদ্য দ্রব্যাদিও—ঘৃত-সর-নবনী প্রভৃতি যাহা কিছু বীর্য্যবর্দ্ধক ও উপাদেয়—প্রচুর পরিমাণে তাহাকে প্রদান করিতে থাক। অধিকন্তু তাহার বিলাসের উপযোগী পরিচ্ছদাদিতেও যেন কোন ত্রুটী না হয়। এইরূপে প্রায় মাসাধিক অতীত হইলে, একদিন তাহাকে সম্পূর্ণ-রূপে ঐ উদ্যানের মধ্যে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে দেও। তারপর, সেই দিবস রাত্রে, তাহার আবাস-গৃহ সম্যক সুসজ্জিত ও আলোক-মালায় বিভূষিত করিয়া রাখিয়া, রাজ-অন্তঃপুরের যে কোন শ্রেষ্ঠ ষোড়শী সুন্দরীকে তাহার নিকট প্রেরণ কর; আর, তাহাতে সে যেন স্পষ্টই বুঝে যে, তাহার উপভোগের জন্যই ঐ সুন্দরীকে পাঠান হইয়াছে। ইহার পর আর যাহা যাহা করিতে হয়, সে ভার আমার উপর। যুবতী যেরূপে প্রেমালাপ করিবে, আমি তাহাকে শিখাইয়া দিব—তাহার বিহার-সম্বন্ধীয় অন্যান্য বিষয়েরও শিক্ষার জন্য আমিই দায়ী থাকিব! সেজন্য তোমার কোনই চিন্তা নাই। যাহাকে হৌক, রাজ-অন্তঃপুর হইতে নিশঙ্কচিত্তে সেদিন তুমি পাঠাইও; কিন্তু, যেই যাইবে, সাবধান, যাইবার পূর্ব্বে যেন একবার আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যায়।"

নৃপতি প্রথমতঃ একটু আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। ভাবিলেন,—গুরুদেব তাঁহাকে কি এ বিদ্রূপ করিতেছেন! কিন্তু কি করেন? গুরুর আজ্ঞা—কাজেই শিরোধার্য্য বলিয়া মানিতে হইল।

* * * *

বন্দোবস্তও সেরূপই হইল। একমাসও অতীত হইল। যে সুন্দরী সেই যুবকের সহিত প্রমোদ্যানে বিহারার্থ গমন করিল, তাহার প্রতিও যাহা কিছু বক্তব্য, গুরুদেব বলিয়া দিলেন।

* * * *

যে দিনের ঘটনা বলিতেছি, সেদিন আকাশ নির্ম্মল—স্বচ্ছ। পূর্ণিমার চাঁদ ধীরে ধীরে আকাশ-পটে শোভমান হইয়াছেন। কোকিলের কুহুস্বর, ভ্রমরের গুঞ্জনে চারিদিক বীণা-নিনাদিত হইতেছে। প্রমোদ-উদ্যানের পুষ্প সৌরভে, আহা মরি, কি মধুরিমাই ছড়াইতেছে! এমনই সময়, সুচারু-বেশে সুসজ্জিতা হইয়া, সুচারু-মোহন হাবভাব দেখাইয়া, হেলিতে দুলিতে, এক সুযোবন-সম্পন্না সুদর্শনা রাজ-পুরনারী সেই যুবকের নিকট উপস্থিত—হাসি হাসি মুখে, আধ আধ কথায়, তাহাকে মোহিত করিবার জন্য অগ্রসর! মত্ত-মাতঙ্গের গতি অথবা যৌবনোন্মাদিনী চঞ্চলগামিনী কলনাদিনী তটিনীর খর-বেগ—সে সকলও রোধ করা যায়। কিন্তু এ গতি রোধিবে কে? যুবতীকে দেখিয়াই, যুবক অমনি যেন লাফাইয়া উঠিলেন; দ্রুত-পদে অগ্রসর হইয়াই, যুবতীকে সকাম-আলিঙ্গন জন্য, উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। এত মেদ—এত বীর্য্য কে রোধিতে পারে? সাধ্য কার—তখন আর সে যুবতীকে রক্ষা করেন!

কিন্তু অমনি—একি অপরূপ সম্মোহন মন্ত্র—যুবক একেবারে নিশ্চল। যুবতী যেই বলিলেন,—"আর কেন মিছা! রাজা যেজন্য তোমাকে এখানে এনেছেন, আহা, কেমন ক'রে—কোন পাষাণে বুক বেঁধে—তা' বলি তোমায়? কাল মা-জগদম্বার পূজায় তোমায় বলি দেওয়া হ'বে; রাজা তাই বল্‌তে পাঠালেন—'তুমি কালকের জন্য প্রস্তুত হও।'" যুবক অমনি নিস্তব্ধ! "কি! কি! কি বল্লে? কাল আমায় মা-জগদম্বার কাছে বলি দেওয়া হবে—আমি তারই জন্য প্রস্তুত হব—তাই তুমি আমাকে বল্‌তে এলে!" এই পর্য্যন্ত বলিতে বলিতেই, যুবক একেবারে অচৈতন্য। সে বিষাদ-দৃশ্য—সে শোক-কথা, আহা, বর্ণনা আর কি করিব, পাঠক-পাঠিকে, একবার মনে মনেই ভাবিয়া দেখুন!

* * * *

গুরুদেব তখন, নৃপতিকে সম্বোধন করিয়া, বলিলেন,—"দেখিলে বৎস—দেখিলে! বুঝিলে বৎস—বুঝিলে, আমি কিরূপে এত সংযমী! দেখ বৎস, এত মেদ-বীর্য্যবান পুরুষকেও একবারমাত্র মৃত্যুকে স্মরণ করিতে হওয়ায়, নিশ্চল হইতে হইল! আর আমি, বৎস, দিনরাত্রি কেবল সেই মৃত্যু-চিন্তায় কালাতিপাত করিতেছি—সদাই ভাবিতেছি,—ঐ 'মৃত্যু! ঐ আসে! কিন্তু কই, এখনও তো ভগবানকে ডাকা হ'ল না! বেলা গেল, তবে তাঁকে আর কখন ডাক্‌বো?' বৎস! এই ভাবনাই আমার নিশিদিন! তবে বল দেখি, কেমনে আমি, অসংযমী বা চঞ্চল-চিত্ত হই? যে মৃত্যু-চিন্তা একবারমাত্র করিতে হইলে, মানুষ জ্ঞানশূন্য—অচৈতন্য—দিশেহারা হইয়া পড়ে, আমি দিবারাত্রি সেই চিন্তাতেই মগ্ন! তবে, বল-বল, বল দেখি বৎস!—তবে আমার আর চাঞ্চল্য কিরূপে হইবে? তাই বলি, বৎস, এখন যদি ঈশ্বরকে পাইতে চাও, তবে এখনও সংযমী ও স্থিরচিত্ত হও। এখনও ভাব,—'দিন তো ফুরায়ে এল, ডাকা হলো না!' শিওরে শমন বসিয়া, ভাবিবারও আর সময় নাই; এখনও মন প্রাণ-ভরে ডাক। এখনও সময় আছে—এখনও একবার তাঁরে ডেকে নেও।' বৎস! এই চিন্তাই ভবসংসার-পারের একমাত্র উপায়—ইহাতেই সংযমী ও স্থিরচিত্ত হওয়া যায়—ইহাতেই

উদ্ধারের পন্থা প্রশস্তা হয়। অধিক আর কি বলিব? বৎস! এখনও সর্ব্বদাই সেই সর্ব্ব-সন্তাপহারিণী মৃত্যু-চিন্তার, আশ্রয় অবলম্বন কর—এখনও উপায় হইবে। জীবের এই এক গতি-মুক্তিই সমীচিন।"

মিশনী-সম্প্রদায়।

এদেশে "মিশনী" অর্থাৎ খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারিকা ও তাহাদের এদেশের চেলাগণ (ভায়ার দল) দ্বারা হিন্দু-রমণীর যে সর্ব্বনাশ হইতেছে, তাহা অনেকে বুঝিয়াও বুঝিতে পারিতেছেন না। পবিত্র হিন্দুর গৃহে মিশনীগণ যে মহান্ অনিষ্ট ঘটাইতেছে, তাহার জন্য দোষ সম্পূর্ণ আমাদের। আমাদের বিকৃত-মস্তিষ্ক কুলাঙ্গারদিগের উত্তেজনায় ও উৎসাহেই তাহারা হিন্দুর পবিত্র গৃহে প্রবেশ করিতে সাহসী হইতেছে। সম্প্রতি গত অক্টোবর মাসের "নাইটিন্থ সেঞ্চুরিতে" বিলাতী বিবি "লিন লনটন" মহোদয়া বিলাতের স্ত্রী-সমাজের ভয়ানক দুরবস্থা ও ভারতের মিশনী-সম্প্রদায় সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তিনি তাঁহার দেশের উচ্ছৃঙ্খল-বৃত্তি-পরায়ণা, স্বেচ্ছাচারিণী, স্বাধীনা রমণীদের সম্বন্ধে যে সকল নিগূঢ় তত্ত্ব লিখিয়াছেন, তাহা হিন্দুমাত্রেরই পাঠ করা একান্ত কর্ত্তব্য। ঐ প্রবন্ধে হিন্দু-সন্তানের শিক্ষার ও উপদেশ পাইবার অনেক কথা আছে। বর্ত্তমান সময়ে ভায়ার দল যেরূপ ভাবে ভগিনীদের আলোতে নেওয়ার চেষ্টা করিতেছেন, তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থা ও পরিণাম ফল ঐ প্রবন্ধ-পাঠে বিশেষরূপে অবগত হইতে পারা যাইবে। যাহাহউক, বিবি লিন লনটন মহোদয়া ভারতের মিশনীদের সম্বন্ধে যে সকল কথা লিখিয়াছেন, আমরা সংক্ষেপে নিম্নে 'বঙ্গবাসীর' অনুবাদ হইতে উদ্ধৃত করিলাম। তিনি লিখিয়াছেন,—

"আমরা যখন একটা জাতিরূপে ধর্ত্তব্য হই নাই, তাহার শত শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে যাহাদের মধ্যে অন্তঃপুরচারিতা প্রতিষ্ঠিত হইয়া বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত প্রচলিত রহিয়াছে; যাহারা ধর্ম্মের জন্য মরিতে পারে, প্রেম-প্রণয়কে তুচ্ছ জ্ঞান করে, বিধর্ম্ম-সংস্রবতা-ভয়ে যাহারা সদাই সঙ্কুচিত; সেহেন ভারতীয় জাতির অন্তঃপুরচারিণীদিগকে অন্তঃপুরচারিতার বিরুদ্ধে উত্থিত হইবার জন্য, এই সকল বর্ব্বরা মিশনী উত্তেজিত করিয়া থাকেন। হিন্দু-পরিবারের পবিত্রতা ও সতীত্ব চিরপ্রসিদ্ধ; ইহা অন্তঃপুরচারিতারই শুভ ফল। কিন্তু আমাদের বর্ব্বরা মিশনীরা দলে দলে ঝাঁকে ঝাঁকে ভারতে উপস্থিত হইয়া, হিন্দুদিগকে আপনাদের মত উদ্ধত, অশান্ত এবং সংক্ষোভিত করিয়া তুলিয়াছেন। ভারতীয় সমাজে বিশৃঙ্খলা উত্তেজিত করাইবার জন্য এই সকল অবাধ্যা ও অস্থিরচিত্তা মিশনীকে ভারতে প্রেরণ করা, মহাভ্রম ও রাজনীতি-বিরুদ্ধ।"

"সবাই যে এমন, তাহা নহে। এমনও কেহ কেহ আছেন যে, তাঁহারা প্রকৃতই পবিত্রহৃদয়া, সচ্চরিত্রা, ঈশ্বর-প্রেমানুরাগিণী। তাঁহারা পরার্থে আত্মবিসর্জ্জন করিতে পারেন। কিন্তু বর্ব্বরা বিপ্লবকারিণী "মিশনীর" ভাগই অধিক। তাহারা আত্ম-সংযমে অক্ষম, বিধি-ব্যবস্থায় অবশ, তাহাদের নখের মুড়িটীতে পর্য্যন্ত বিপ্লব-বৃত্তি বিসর্পিত, তাহারা অন্যান্য রমণী-মণ্ডলীকে আপনাদের মতন অশান্ত ও আত্মপ্রসাদ-শূন্য করিতে চাহে।"

"এই সকল বর্ব্বরা বিপ্লবকারিণী মিশনী, উত্তরের মিহাণী-বায়ুজাত সামাজিক প্রণালী-গুলি, ভানুকর-তাপ-তাপিত প্রাচ্যদেশে প্রবর্ত্তিত করিতে চাহেন। ইয়র্ক শায়ারের সামাজিক অবস্থা-ব্যবস্থা ভারতের অন্তঃপুরে প্রবেশিত করাও তাহাদের উদ্দেশ্য।"

বিবি লিন লনটন মহোদয়া ভারতের

মিশনীদিগের চরিত্র-সম্বন্ধে যে সকল কথা লিখিয়াছেন, ইহার উপরে আমাদের কোন কথাই বলিবার নাই। আমরা এত অপদার্থ হইয়াছি, পাশ্চাত্য-শিক্ষায় আমাদের মস্তিষ্ক এত বিকৃত হইয়াছে যে, আমরা নিজেরাই নিজের পায় কুঠার নিক্ষেপ করিতেছি। আমরা যদি ঐ সকল বর্ব্বরা মিশনীদের কার্য্যে উৎসাহ ও যোগ না দিতাম,তবে কি আজ মিশনীগণ হিন্দুর পবিত্র গৃহে অশান্তির আলয় করিতে সক্ষম হইত। ধিক আমাদিগকে! বিলাতে একটী বিধর্ম্মিণী যে সকল কথা বুঝেন, আর আমরা তাহা বুঝিতে পারিতেছি না! হিন্দু-রমণীকে শিক্ষা দিতে পারে, খৃষ্টান মিশনীর এমন কি ক্ষমতা আছে? যে দেশের অসংখ্য অসংখ্য রমণী অর্দ্ধটুকুরা রুটির জন্য শরীরের পবিত্রতা পথে পথে বিক্রয় করিতেছে—অমূল্য সতীত্ব-রত্ন ব্যভিচারের অতল-স্পর্শে নিক্ষেপ করিতেছে, হায়, সে দেশের রমণীগণ, পবিত্রতার জলন্ত আদর্শ। হিন্দু-রমণীর শিক্ষাদাতা!

বিবি লিন লনটন মহোদয়া লিখিয়াছেন,—"সবাই যে এমন, তাহা নহে; এমত কেহ কেহ আছেন যে, তাঁহারা প্রকৃতই পবিত্র-হৃদয়া, সচ্চরিত্রা ও ঈশ্বর-প্রেমানুরাগিনী। তাঁহারা পরার্থে আত্ম-বিসর্জ্জন করিতে পারেন।" কিন্তু এই সকল মহাত্মা রমণীরা তাঁহাদের স্বদেশের পতিতা রমণীদের উদ্ধারের চেষ্টা করেন না কেন? আগে ঘর ঠিক করিয়া ত পরের জন্য ভাবা উচিত! এসকল সম্বন্ধে বিলাতের নারী-সভায় শ্রীযুক্ত উমেদরাম দেশাই মহোদয় যে একটি বক্তৃতা করিয়াছিলেন, আমরা 'জন্মভূমি' হইতে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম। দেশাই মহোদয় বিলাতের মেয়ে-সভাতে বলিয়াছিলেন,——

"ইংলণ্ডাদি ইউরোপীয় অধিকাংশ দেশ অপেক্ষা হিন্দুস্থানে স্ত্রীজাতির অবস্থা অশীতি-লক্ষ গুণে উৎকৃষ্ট। অতএব তাঁহাদের জন্য আপনাদের উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই; বরং তাঁহারাই (হিন্দুরমণীরাই) মহাশয়াদিগের মঙ্গলের জন্য আগ্রহান্বিতা হইলে অধিকতর যুক্তিসঙ্গত হয়; কারণ, আপনাদের এখানে নারীজাতির অবস্থা যেমনতর শোচনীয়, যেমনতর লজ্জা ঘৃণা এবং কষ্টকর, এমনতরটী—আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি,—আর কোথাও নাই। আপনারা নিশ্চয় জানিবেন যে, হিন্দুস্থান-সম্বন্ধে আপনারা যাহা কিছু শুনেন ও যাহা কিছু শুনিয়াছেন, তাহা সমস্তই ভুল; সর্ব্বৈব মিথ্যা—তাহার একটী কথাও আসল কথা নহে। অতএব আপনারা এতদূরে থাকিয়া যাহা শুনিবেন, তাহা যে নেহাত বেয়াড়া-বিকৃত সংবাদ হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? তা ইহাতে ফলটা দাঁড়াইয়াছে কিন্তু অতি বিপরীত। ফলটা দাঁড়াইয়াছে এই যে, আপনারা আমাদের সামাজিক প্রণালী-পদ্ধতিকে যেমনতর অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দৃষ্টি করেন, আপনাদের সামাজিক প্রণালী-পদ্ধতিকে আমাদের স্কুল-কলেজওয়ালা অতি বড় উৎসাহী বাবুরা তেমনিই অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে অবলোকন করেন—যেন আপনারা কতই পবিত্রাদপি পবিত্র, আর আমরা নেহাত অশুচি! কিন্তু, দেখুন, আমার ত আপনাদের বিষয় কিছুই অবিদিত নাই—আমি ত আপনাদিগকে ভাল করিয়াই চিনিয়াছি—অষ্টপ্রহরই আপনাদের অবস্থা দুই চক্ষু মেলিয়া দেখিতেছি—চক্ষু দেখিতে যতটা সমর্থ, ততটা সবই দেখিতেছি! আপনারা মনে করেন এবং মনে করিয়া ঘরের "মটকায়" দাঁড়াইয়া চীৎকার করেন যে, ইংলণ্ডে ইরাজিনী যেমনতর সুখ ও স্বাধীনতা সম্ভোগ করেন, তেমনতরটী পৃথিবীর আর কোথাও নারীজাতির ভাগ্যে ঘটে না। ইহাতে বোধ হয় যে, আপনারা আমাদের স্বজাতীয় স্ত্রীলোকদিগের বিষয় ততটার অর্দ্ধেকও

জানেন না—যতটা অপর-দেশীয়া রমণীদিগের বিষয় আপনারা জানেন বলিয়া কল্পনা করেন।

"হায়! নারীজাতির প্রতি কি নৃশংস ব্যবহার! অবলার প্রতি এরূপ পাশব, এরূপ পৈশাচিক ও পাপপূর্ণ ব্যবহার এক ইংলণ্ড ভিন্ন জগতের আর কুত্রাপি নাই! হা ধিক! হা ঘৃণা, লজ্জা, কাপুরুষার্থ!

"মাননীয়া মহিলাবর্গ! ধিক্ আপনাদের দেশকে, ধিক্ আপনাদের দেশবাসী জনগণকে, ধিক্ আপনাদের সভ্যতাকে, ধিক আপনাদের সমুন্নত সভা-সমিতিকে! ! ! ধিক্, ধিক্, শত ধিক্—এই সমৃদ্ধিশালিনী, সভ্যতা-অভিমানিনী ইংলণ্ডভূমিকে—যে ইংলণ্ডে দৈনিক উদরান্ন উপার্জ্জনের জন্য স্ত্রীলোকদিগকে 'হামার' পিটিতে পিটিতে প্রাণান্ত হইতে হয়!

"এই ঘৃণিত, অপমানিত, দারুণ দুঃখ-দারিদ্রের ফলও হইয়াছে—হায়—অতি শোচনীয়। ব্যভিচারে বিলাত প্লাবিত হইতেছে। জীবিকা-নির্ব্বাহের মর্ম্মান্তিক দুর্গতি সহিতে না পারিয়া, অসংখ্য রমণী অর্দ্ধটুকরা রুটীর জন্য শরীরের পবিত্রতা পথে পথে বিক্রয় করিতেছে—অমূল্য সতীত্ব-রত্ন ব্যভিচারের অতলস্পর্শ গর্ভে নিক্ষেপ করিয়া বাজারে বাজারে বেশ্যাবৃত্তির স্রোত প্রখর হইতে প্রখরতর করিতেছে! হায়, প্রতি মুহূর্ত্তে কতই রমণী আশ্রয়ের অভাবে—জঠরানলের দুঃসহ দহনে—ঐ পুতিগন্ধময় স্রোতে আজন্মের তরে ঝাঁকে ঝাঁকে ঝাঁপ-দিতেছে! ঐ দেখ, অগণিত গণিকায় তোমাদের "পিকাডলি"—চারিংক্রস (কোন স্থানই বা নয়?) পূর্ণ-প্লাবিত!—রজনীর নিশীথ সময় পর্য্যন্তও তোমাদের সভ্য (?) সমাজ-সৃষ্ট শঙ্খিণীরা শরীর-বিনিময়ে এক গ্রাস আহার্য্য উপার্জ্জনের জন্য অপেক্ষা করিতেছে! ধিক এই জাতীয় জীবনকে—ধিক্ ইহাদের সাম্য, স্বাধীনতা, সভ্যতাকে! ছি ছি, কি লজ্জা! কি ঘৃণা! নারীজাতির কি দুর্গতি, হে লণ্ডন, তোমার বক্ষের উপর! ধিক্ তোমার জীবনে! ধিক্ তোমার সমাজকে!

"মান্যা মহিলাগণ! আপনাদের সমাজ-পদ্ধতির—আপনাদের স্ত্রী-স্বাধীনতার, দাম্পত্য-ভঙ্গের এবং পৌনঃপুনিক বিবাহের—বিষময়-বিষ্ঠাময় পরিণাম আমি স্বচক্ষে সর্ব্বদাই দেখিতেছি—চক্ষুষ্মানমাত্রেই দেখিতেছেন! অতএব শুনুন, মেমসাহেবগণ—আমি উচ্চকণ্ঠে প্রচার করিতেছি—আমরা হিন্দুসন্তান, তোমাদের ঐ সকল কলুষিত রীতি চাই না। মিষ্টার মালবারিগণ এবং মিসেস্ ম্যানিংগণ চাহিতেছেন—চাউন; কিন্তু আমরা চাই না। আমাদিগকে অনুগ্রহ-পূর্ব্বক তোমাদের উপকার হইতে অব্যাহতি দেও। পারসীরা তোমাদের পাপ-প্রথা অবলম্বন করিয়াই অধঃপাতে যাইতেছে।"

মিষ্টার দেশাই মহোদয়ের এই সকল কথার উপরে আমাদের কোন কথাই বলিবার নাই। হে আর্য্যসন্তান! একবার আর্য্যজাতির প্রাচীন গৌরব-রক্ষার জন্য উত্থিত হও। মোহমায়ায় মুগ্ধ হইয়া থাকিয়া সমাজকে ছাড়খার করিও না। এখনও সময় আছে। এখনও সাবধান হইলে সমাজ রক্ষা হইতে পারে।

বন্দে মাতর্গঙ্গে!

(কবিবর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-বিরচিত।)

"হরিপদ-সংহৃতা ত্রিলোক-বিরাজিতা ধীর সমুন্নত বিবিধ তরঙ্গে,
ব্রহ্মকমণ্ডলু- জঠরবিঘাতিনি শূন্যবিহারিণি সহস্র ভঙ্গে,
চন্দ্রশেখরশির- মৌলিবিলাসিনি কেলিকুতূহলা সুরবালা সঙ্গে,
বন্দে মাতর্গঙ্গে!

বহুবলধারণ সুরেন্দ্রবারণ দর্পবিনাশন তব ভ্রূভঙ্গে,
শৈলনিবাসিনি বহুভাষভাষিণি তুষারচর্চ্চিত হিমাচলশৃঙ্গে,
নির্ম্মলসলিলে ত্রিভুবন-অখিলে পিতৃতর্পণ মা গো তব উৎসঙ্গে,
বন্দে মাতর্গঙ্গে!

স্বচ্ছতটশালিনি সু-অটবিমালিনি স্বর্গস্রোতস্বতি ক্ষিতিতল-অঙ্গে,
শশাঙ্করহারা শীতল শ্বেতধারা সাগরগামিনি বহুবিধ রঙ্গে,
সুরনর-অর্চ্চিতা অবনি-আবির্ভূতা ভারতভূষণ ভগবতি গঙ্গে,
বন্দে মাতর্গঙ্গে!

ধরণি মনোহরা ফলশস্যে ভরা নীরধারা তব যেস্থানে, জননি,
বনরাজিমণ্ডিত উভকূলশোভিত গভীর অক্ষয় প্রবাহধারিণি,
জয় জয় অন্নদে শুভদে মোক্ষদে ভারতজনগণ- ক্ষুধাসংহারিণি,
বন্দে মাতর্গঙ্গে!

বেদে প্রকট নাম পুরাণে গুণগ্রাম কত যুগ মা গো আরাধ্যা জগতে,
ঋক্-সামন্-ঋষি হর্ষপীযূসে ভাসি স্তোত্র গাঁথিলা তব ছন্দস্ গীতে,
বাল্মীকি ব্যাস পরে ঐ পদ ধ্যান করে কি মধুর গুঞ্জিত পদ-তরঙ্গে,
বন্দে মাতর্গঙ্গে!

তুই মা জাহ্নবি আর্য্যমহিমাচ্ছবি উজ্জ্বল উন্নত যত ইহ ভুবনে
তোমারি নীরধারে যুগ যুগান্তরে হৈল প্রকাশিত ভারত-জীবনে,
রাজ্য বাণিজ্য দেশ দুর্গ পুরি অশেষ অস্ত উদয় কত হেরিলে অপাঙ্গে,
বন্দে মাতর্গঙ্গে!

ধন্য ভাগীরথি পতকিজন-গতি দুষ্কৃতিবারিণি তীর তরঙ্গে,
কিবা নিরুপমা তব ধৃতি ক্ষমা সমূষ ভারত- পাপ ধর অঙ্গে
আর্য্যভুবনবাসী অন্তিমে তটে আসি- অস্থি নিমজ্জয় তব উৎসঙ্গে,
বন্দে মাতর্গঙ্গে!

ধীরাজ মহীপাল ধনাঢ্য কি রাখাল পশ্বাদি প্রাণিগণ অভেদ ও নীরে,
কি ঋষি-ব্রাহ্মণ চৌর-দস্যুজন নাহি নিবারণ একই প্রাণীরে,
সর্ব্ব-পাতকিদেহ অঙ্কে তুলিয়া লহ দেহ মুক্তিদান কীটপতঙ্গে,
বন্দে মাতর্গঙ্গে!

মাতর্জাহ্নবি ঐ তব পদ সেবি পূর্ব্ব পিতৃ যত গত কালে কালে,
বংশাবলী কত এখন হবে গত তব কোলে মাতঃ পূত সলিলে,
ভবজনতারণ পাপবিমোচন সমাধিস্থান হেন কোথা মহী-অঙ্গে,
বন্দে মাতর্গঙ্গে!

গঙ্গে অঙ্কে তব অন্তে কি স্থান পাব দেহ মিলাব মা গো তব পুণ্য তোয়ে,
ভ্রান্ত নিতান্ত মা দিও পদছায়া তাপতপ্ত কায়া ষড়রিপুরঙ্গে,
সর্ব্বপাতকহরা গঙ্গে রুদ্রশেখরা স্বর্গসরিদ্বরা লৈও মা সঙ্গে,
বন্দে মাতর্গঙ্গে!"

লয়।

"সোঽহং—মানুষ সেই, মানুষ সেই পরব্রহ্ম। মানুষ পরব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নয়। তবে মানুষ মানুষ কেন? এই জন্য যে, মানুষ জীবরূপে আপনাকে এবং ব্রহ্মাণ্ডকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া অনুভব করে। মানুষ যতক্ষণ এইরূপ অনুভব করে, ততক্ষণ সে মানুষ। যখন সে আর এরূপ অনুভব না করে, তখন সে মানুষ নয়; তখন সে মুক্ত, তখন সে ব্রহ্ম—তখন সে ব্রহ্মে পরিণত! সে পরিণতি কিরূপ—যাহার সে পরিণতি হইয়াছে, কেবল সেই তাহা জানে, সেই তাহা বলিতে পারে। আর, যে সেই পরিণতির পথে প্রবেশ করিয়াছে, সে অতি অস্পষ্টভাবে অতি অল্পমাত্রায় অনুভব করিয়াছে—বুঝাইয়া দিতে পারে কি না বলিতে পারি না। কিন্তু বুঝাইয়া দিলেও, সে পথের পথিক না হইলে, বুঝাও বড় কঠিন। প্রহ্লাদের সেই আশ্চর্য্য পরিণতি হইয়াছিল। তাহা ভাবিয়া দেখিবার জিনিষ। পিতার আজ্ঞায় জলধিতলে বক্ষে পর্ব্বত ধারণ করিয়া দৈত্যপুত্র স্তব* করিতেছেন,—

"হে পুণ্ডরীকাক্ষ! হে পুরুষোত্তম! হে সর্ব্বলোকাত্মন্! তোমাকে নমস্কার। তুমি তীক্ষ্ণ চক্র ধারণ করিয়া থাক, তোমাকে নমস্কার। তুমি ব্রহ্মণ্য-দেব, গো-ব্রাহ্মণের হিতকর ও জগতের মঙ্গল-সম্পাদক গোবিন্দ, তোমাকে পুনঃপুনঃ নমস্কার। তুমি ব্রহ্ম-স্বরূপে সৃষ্টি করিয়া থাক, (বিষ্ণুরূপে) স্থিতিতে পালন করিতেছ, এবং কল্পান্তে রুদ্রমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া থাক; তুমি ত্রিমূর্ত্তি, তোমাকে নমস্কার। দেবতা যক্ষ অসুর সিদ্ধ নাগ গন্ধর্ব্ব কিন্নর পিশাচ রাক্ষস মনুষ্য পশু পক্ষী পিপীলিকা সরীসৃপ (স্থাবর) ভূমি জল আকাশ বায়ু শব্দ স্পর্শ রস রূপ গন্ধ মন বুদ্ধি আত্মা কাল ও সত্ত্বাদি গুণ, হে অচ্যুত, তুমিই এতৎ সমুদায়ের কারণ ও এই সমুদায় পদার্থ তোমারই স্বরূপ। তুমি বিদ্যা, তুমি অবিদ্যা, তুমি সত্য, তুমি অসত্য, তুমি বিষ, তুমি অমৃত, তুমি বর্ত্তমান ও অতীত সমুদায় বেদোক্ত কর্ম্মস্বরূপ। হে বিষ্ণো! তুমি সমস্ত কর্ম্মের ফলভোক্তা ও সমস্ত কর্ম্মের উপকরণ, এবং তুমি সকল কর্ম্মের ফল। প্রভো! তুমি আমাকে, অন্য সকলকে এবং এই বিশ্ব সমুদায় ব্যাপিয়া আছ। তোমার এই ব্যাপ্তি দ্বারা সামর্থ্যাতিশয় ও সত্যসংকল্পতাদি গুণ-সমুদায় সূচিত হইতেছে। যোগীরা তোমাকে চিন্তা করেন, যাজ্ঞিকেরা তোমার উদ্দেশেই যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। একমাত্র তুমিই হব্য ও কব্যের ভোক্তা, এবং তুমিই পিতৃলোকস্বরূপ ও তুমিই দেবদেহ ধারণ করিয়া আছ। এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড তোমার মহৎ রূপ। এই জগৎ তাহা অপেক্ষা সূক্ষ্ম। নানা-প্রকার জীব-জন্তু তদপেক্ষাও সূক্ষ্ম, এবং এই জীব-জন্তুগণের যে অন্তরাত্মা আছে, তাহা তৎসর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম। এতৎ সমুদায় তোমারই রূপভেদ। এই অন্তরাত্মা হইতেও উৎকৃষ্ট সূক্ষ্মাদি বিশেষণের অবিষয়ীভূত তোমার পরমাত্মস্বরূপ কোন এক অচিন্ত্য রূপ আছে; তোমার সেই পুরুষোত্তম নামক রূপকে নমস্কার করি। হে সর্ব্বাত্মন্! সর্ব্বভূতমধ্যে তোমার ত্রিগুণাশ্রিত অন্য এক জড়শক্তি আছে। হে সুরেশ্বর! সেই নিত্যশক্তিকে নমস্কার। যাহা বাক্য-মনের অগোচর, যাহা জাতিগুণাদি-বিশেষণ-শূন্য, এবং যাহাকে আত্মার প্রাদেশিক জ্ঞান নিরূপণ করিতে সমর্থ হয়, তোমার স্বরূপভূতা সেই পরম-চিৎশক্তিকে নমস্কার করি। কোন পদার্থ যাঁহা হইতে স্বতন্ত্র নহে, কিন্তু

*বিষ্ণুপুরাণ; প্রথম অংশ, ১৯শ অধ্যায়, ৬৪ হইতে ৮৬ শ্লোকে এই স্তব লিখিত আছে। এ স্থলে কেবলমাত্র পণ্ডিত শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কলঙ্কার মহাশয়ের বাঙ্গালা অনুবাদ-মাত্র প্রকটিত হইল। যিনি মূল ও স্তব দেখিতে চান, তিনি 'বিষ্ণুপুরাণের' ঐ অংশটি দেখিবেন। বাহুল্য-হেতু তাহা আর এস্থলে প্রদত্ত হইল না।

যিনি সকল পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র, সেই ভগবান বাসুদেবকে সর্ব্বদা নমস্কার করি। যাঁহার নাম ও রূপ নাই, কেবল অস্তিত্বমাত্রে যাঁহার উপলব্ধি হইয়া থাকে, সেই মহাত্মাকে ভূয়োভূয় নমস্কার করি। দেবগণ যাঁহার সূক্ষ্ম-রূপ নেত্রগোচর করিতে না পারিয়া অবতার-রূপকে অর্চ্চনা করেন, সেই মহাত্মাকে নমস্কার করি। যিনি সকলের অন্তরে অবস্থান করিয়া শুভাশুভ সমুদায় পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, সেই সর্ব্বসাক্ষী পরমেশ্বর বিষ্ণুকে নমস্কার করি। এই জগৎ যাঁহা হইতে অভিন্ন, সেই বিষ্ণুকে নমস্কার। তিনি সকলের ধ্যেয় ও জগতের আদি। তিনি অব্যয় পুরুষ। তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। যাঁহাতে মহত্তত্ত্বাদিরূপে অক্ষয় অব্যয় এই বিশ্ব ওতপ্রোত হইয়া রহিয়াছে, যিনি সকলের আধার, সেই হরি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। যাঁহাতে সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত রহিয়াছে, যাঁহা হইতে সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হইয়াছে, যিনি সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ, যিনি সমুদায় ব্রহ্মাণ্ডের আধার-স্বরূপ, সেই বিষ্ণুকে নমস্কার। তাঁহাকে বারবার নমস্কার করি। সেই অনন্ত পুরুষ সর্ব্বগামী, সুতরাং তিনিই আমি। আমা হইতে সমুদায় উৎপন্ন হইয়াছে, আমিই সমুদায়, আমাতেই সমুদায় আছে, এবং আমিই নিত্য ও অক্ষয়। পরমাত্মাতেই আমার আশ্রয়। আমি অক্ষয় অব্যয় ব্রহ্ম। আমি সৃষ্টির পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলাম, এবং মহা-প্রলয়ের পরেও বিদ্যমান থাকিব। আমিই পরম পুরুষ।”

এ অতি বিষম পরিণতি। এ পরিণতি ভাবিয়া উঠা যায় না। এই যে তুমি আমি—পৃথিবীতে কীটাণু হইতে বড় বেশী বোধ করিতেছি না, রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ এই সব লইয়া মোহকর মহানিষ্টে জড়াইয়া রহিয়াছি, মোহরূপা মর্ত্ত্যলোক হইতে মন সরাইতে মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা অনুভব করিতেছি, ভগবানের কথা মনে করিতে হইলে অভিভূত হইয়া পড়িতেছি—এই তুমি আমি—মোহজাল ছিঁড়িয়া ফেলিয়া, রূপরসাদি উড়াইয়া দিয়া, মর্ত্ত্যলোক অকিঞ্চিৎকর বুঝিয়া, কীটানুর ক্ষুদ্রত্ব ভুলিয়া, অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের শক্তি ধরিয়া—ব্রহ্ম হইয়াছি, ব্রহ্ম হইয়া কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিতেছি, কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড পালন করিতেছি, কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস করিতেছি—কি বিরাট পরিণতি! এ পরিণতি কি তোমার আমার কল্পনায় আসে? এ পরিণতি পুরুষশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদের হইয়াছিল। ঐ স্তবটি বারম্বার ধ্যান করিয়া দেখ—দুই বৎসর ধরিয়া, দশ বৎসর ধরিয়া ধ্যান করিয়া দেখ—দেখিবে, উহা পাগলের প্রলাপ নয়, দর্পীর দর্প নয়, মূর্খের মদোদ্গীরণ নয়—দেখিবে, উহাতে মায়ামোহমলামলিনতামুক্ত সাত্ত্বিকতারূপা সাধকপ্রধানের সমস্ত সাধনা সিদ্ধ হইয়া গিয়াছে—দেখিবে, উহাতে মায়ামোহমলামলিনতামুক্ত সাত্ত্বিকতারূপী সাধকপ্রধান সাধিয়া সাধিয়া স্বয়ং ধ্যেয় হইয়া পড়িয়াছেন—দেখিবে, উহাতে স্বষ্ট জীব সাধনা দ্বারা সৃষ্টিরহস্য ভেদ করিয়া, সেই রহস্য-রসে আত্মসংস্কার সম্পূর্ণ করিয়া, সৃষ্টিকর্ত্তা হইয়া উঠিয়াছেন। দেখিবে, ইহাতে দম্ভের লেশমাত্র নাই, কারণ, যেখানে দম্ভ, সেখানে এ সাধনায় প্রবৃত্তি হয় না, সুতরাং এ সিদ্ধি ও পরিণতি একেবারেই অসম্ভব। দেখিবে, যেখানে জীবের আত্মহীনতার পূর্ণ উপলব্ধি ও ব্রহ্মত্বের গৌরবজ্ঞান উদ্দীপিত, সুতরাং ব্রহ্মত্বলাভের তৃষ্ণা অপরিমেয়, কেবল সেইখানেই এই সাধনা, এই সিদ্ধি, এই পরিণতি। আর দেখিবে, এই পরিণতি যেমন বিরাট, এই সাধনাও তেমনি বিরাট। জীবের জীবত্ব এবং ব্রহ্মের ব্রহ্মত্বের মধ্যে ব্যবধান যেমন বিরাট, যে সাধনায় সে বিরাট ব্যবধান বিনষ্ট করিতে হয়, সে সাধনাও তেমনি বিরাট। নহিলে সেই বিরাট ব্যবধান কেমন করিয়া

বিনষ্ট হইবে? সে বিরাট সাধনায় কত জন্ম, কত শতাব্দী, কত যুগ অতিবাহিত হইয়া যায়, তাহার ঠিকানা নাই। হয় ত কাহারো অদৃষ্টে সৃষ্টিতে আরম্ভ হইয়া সংহারেও সেই সাধনার শেষ হয় না। এই যে জীবন এখন যাপন করিতেছি, এ জীবনের প্রারম্ভে সে সাধনার প্রারম্ভ নয়, এ জীবনের শেষেও সে সাধনার শেষ নয়। এ জীবনের কত পূর্ব্বে সে সাধনা আরম্ভ হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই, এ জীবনের কত পরে সে সাধনা শেষ হইবে, তাহারও ইয়ত্তা নাই। তুচ্ছ তোমার জন্ম, তাহাতেই বা তোমার কি আরম্ভ হয়; তুচ্ছ তোমার মৃত্যু, তাহাতেই বা তোমার কি শেষ হয়! জন্ম-মৃত্যুর কথা ছাড়িয়া দেও, জীবিতকালের কথা ছাড়িয়া দেও—অনন্ত জন্মের কথা ধর, অনন্ত কালের কথা ধর, অনন্ত পথের কথা ভাব। এ পথের পথিক হইতে হইলে আগাগোড়া এই পথের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, এই পথের ভাবনায় ভোর হইয়া, এই পথের কথা সার করিয়া পথ চলিতে হইবে। এ রঙ্গ তামাসার কাজ নয়, প্রজাপতি-পতঙ্গের মতন একবার এপথের এপাশে একবার এপথের ওপাশে স্ফূর্ত্তি করিতে গেলে চলিবে না। আগাগোড়া এই বিরাট পথের এই বিরাট উদ্দেশ্যের কথা মনে রাখিয়া এই পথ চলিতে হইবে—জন্মে, অন্নপ্রাশনে, বিদ্যারম্ভে, বিবাহে, বিহারে, শয়নে পানে, ভোজনে, মরণে—জীবনের প্রত্যেক কাজে এই বিরাট পথের এই বিরাট উদ্দেশ্যের কথা মনে রাখিয়া এই পথ চলিতে হইবে। এত করিলে, যদি এই বিরাট পথে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইতে পারা যায়! মনে যে উদ্দেশ্য তাহা এত বৃহৎ, চলিতে হইবে যে পথে তাহা এত দীর্ঘ, সাধন করিতে হইবে যে পরিণতি তাহা এত বিরাট! আমরা বড় নির্ব্বোধ, তাই তুচ্ছ ধনসঞ্চয় করিতে হইলে মনে করি যে, সকল কাজেই অর্থসঞ্চয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক; আর, এই বিরাট পরিণতি সাধন করা সম্বন্ধে মনে করি যে, জীবনের সকল কাজে এই বিরাট উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা অনাবশ্যক! এক হিন্দুধর্ম্ম ভিন্ন আর কোনও ধর্ম্মে এমন বিরাট পরিণতির কথাও নাই, এমন বিরাট পথের কথাও নাই, এমন বিরাট সাধনার কথাও নাই। আর প্রহ্লাদের স্তবের ন্যায় স্তবও হিন্দু ভিন্ন অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বীর মুখে শুনিবার যো নাই। কারণ, হিন্দুধর্ম্ম ভিন্ন আর কোন ধর্ম্মে এমন কথা নাই যে, জীবের চরম পরিণতি ব্রহ্ম, সৃষ্টের শেষ মূর্ত্তি সৃষ্টিকর্ত্তা, জীবের আদিতেও সোঽহং অন্তেও সোঽহং।

হিন্দুর লয়-তত্ত্বে তাহার মানসিক প্রকৃতির কি পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা একবার বুঝিয়া দেখা আবশ্যক। হিন্দুর লয়ের মোটামুটি অর্থ,—জীবত্বের বিশাল জড়ত্ব ও সেই বিশাল জড়ত্ব হইতে উদ্ভূত বিষম মোহ-ভোগাসক্তি প্রভৃতির বিনাশ-হেতু জীবের ব্রহ্মত্ব-প্রাপ্তি বা ব্রহ্মে পরিণতি। জড়ত্ব ও ব্রহ্মত্বের মধ্যে যে ব্যবধান, তাহা একরকম অসীম বলিলেই হয়। সেই অসীম ব্যবধান বিনাশ করিতে যে সময়ের আবশ্যক, তাহাও একরকম অসীম, যে সংযম, যে আত্মশাসন, যে সাধনা আবশ্যক, তাহাও এক রকম অসীম। যে সময় আবশ্যক, তাহাতে কত বর্ষ, কত জন্ম, কত যুগ থাকিতে পারে, তাহা কে বলিবে? আর, যে সংযম, যে আত্মশাসন, যে সাধনা আবশ্যক, তাহা যে কত কষ্টকর, কত কঠিন, কত কঠোর হইবে, তাহাই বা কে বলিবে? সে সময়েরও সীমা নাই; সে কষ্ট, সে কঠিনতা, সে কঠোরতারও সীমা নাই। জন্মের পর জন্ম, শতাব্দীর পর শতাব্দী, যুগের পর যুগ, কঠিন কষ্টকর কঠোর সাধনা করিয়া যাই-

তেছি; পথ আর ফুরায় না—কবে চলিতে আরম্ভ করিয়াছি তাহা মনে নাই, মনে করিতে গেলে আত্মহারা হইয়া যাই—কবে চলা শেষ হইবে, ভাবিয়া ঠিক করিতে পারি না; ভাবিতে গেলে অভিভূত হইয়া পড়ি। আর, সে পথের কষ্টই বা কত! পথের এপাশে ওপাশে মোহন দৃশ্য, মোহন স্বর, মোহন মূর্ত্তি, মোহন মোহ! অ-হ-হ কি কষ্ট! আমি মোহাচ্ছন্ন, আমার কি কষ্ট! সব ছাড়িয়া, সব ছুঁড়িয়া ফেলিয়া, সব ছিঁড়িয়া ফেলিয়া, চলিতেছি—অবিরাম চলিতেছি, অনন্তকাল চলিতেছি! তাই কি কাহারও, তাই কি কোথাও, একটু দয়ামায়া, একটু কৃপাকরুণা আছে যে, একটি যবপরিমিত পথ, একটি মুহূর্ত্ত-পরিমিত কাল কমিয়া যাইবে! যাঁহাতে মিশিবার জন্য এত কষ্ট করিয়া যাইতেছি, তাঁহাতেও ত দয়ামায়া নাই, কৃপাকরুণা নাই! তিনি যে স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছেন,—তোমাতে কণামাত্র জড়ত্ব থাকিতে আমি তোমাকে গ্রহণ করিব না; আমি তোমাকে গ্রহণ করিতে পারিব না। কেহ যে মধ্যস্থ হইয়া, কেহ যে মুরুব্বি হইয়া, আমার পথ একটু কমাইয়া দিবে, আমার কষ্ট একটু কমাইয়া দিবে, সে উপায় নাই, সে আশা নাই। যত পথই চলিতে হউক, সবই আমাকে চলিতে হইবে; যত কষ্টই স্বীকার করিতে হউক, সবই আমাকে সহ্য করিতে হইবে—কি পথ, কি কষ্ট, কিছুরই কিঞ্চিন্মাত্র রেহাই পাইব না!—আমি ক্ষুদ্র জীব, কীটাণুকীট, আমাকে এই বিরাট কষ্ট সহ্য করিয়া এই বিরাট পথ চলিয়া যাইতে হইবে!

এখন, একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে,—যে এই কথা বলে, যাহার বিশ্বাস এইরূপ, তাহার মানসিক বল অপরিসীম, তাহার মানসিক শক্তি অপরিসীম, তাহার সাহস অপরিসীম, তাহার সহিষ্ণুতা অপরিসীম, তাহার আধ্যাত্মিকতা অপরিসীম। তাহার আধ্যাত্মিকতা ও মানসিক শক্তি অপরিসীম না হইলে, সে এমন বিরাট পথের কথা মনেও আনিতে পারিত না, এমন বিরাট সাধনার কথা ভাবিয়াও উঠিতে পারিত না, দয়ামায়া-কৃপাকরুণার এত প্রত্যাশাশূন্য হইয়া এমন কঠোর ব্রতে ব্রতী হইবার কথা কল্পনায়ও ধারণ করিতে পারিত না। সে ভিন্ন পৃথিবীতে আর কেহ এমন পথের কথা, এমন সাধনার কথা, এমন দয়ামায়া-শূন্যতার কথা মনে করিতে পারে নাই। এসিয়ায় বল, ইউরোপে বল, আমেরিকায় বল—আর কোথাও কেহ মনে করিতে পারে নাই। আধ্যাত্মিকতায় ও মানসিক বলে পৃথিবীতে তাহার সমান কেহই নাই—তাহার তুলনায় সকলেই বালক। ইউরোপবাসী বল, আমেরিকাবাসী বল, এ বিষম পথের কথা—এ কঠোর সাধনার কথা মনে করিলে সকলেরই হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, সকলেই ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়ে। তাহারা কৃপাকরুণার জন্য লালায়িত, তাহারা নতজানু হইয়া যোড়হাত করিয়া ঊর্দ্ধমুখে কাঁদিয়াই আকুল, বলহীন ও কষ্ট সহিতে অসমর্থ বলিয়া তাহারা সর্ব্বদাই মুরুব্বি ও মধ্যস্থের পদতলে লুণ্ঠিত। মানসিক বলহীনতায় তাহারা বালক, আধ্যাত্মিক দুর্ব্বলতায় তাহারা ননীর পুতুল। তাহারা রক্তমাংসের ভাবনা ভাবিয়াই আকুল। তাহাদের আত্মায় রক্ত-মাংসই বেশী, অস্থি বড় কম। এখানকার দুই মুহূর্ত্তের জ্বালা-যন্ত্রণা ঘুচাইবার জন্যই তাহারা পাগল। ক্ষুধায় অন্ন একমুঠা পাইলে, তৃষ্ণায় জল একগণ্ডূষ কম পাইলে, শীতে একখানি কম্বল কম হইলে, চায়ের বাটিতে এক ফোঁটা চিনির অভাব হইলে, স্নান করিয়া একখানি বুরুশ না পাইলে, বেশ-বিন্যাসে একটি আল্‌পিন কম হইলে, তাহারা কাঁদিয়া

াগিয়া চেঁচাইয়া মহাপ্রলয় করিয়া তোলে। আর, তাহাদের সভ্যতা যত বাড়িতেছে, তাহারা ইগুলির জন্যই তত ব্যস্ত তত ব্যাকুল হইয়া ঠিতেছে, এবং তাহাদের আত্মার অস্থিও তত রম হইয়া যাইতেছে। তাই তাহারা ভারতের পস্বীকে বিদ্রূপ করিয়া উড়াইয়া দেয়, ভারতের নিরম্বু একাদশীর কথা শুনিলে শিহরিয়া উঠে, ভারতের বৈধব্যকে বর্ব্বরের নির্ম্মমতা বলিয়া ালি দেয়। তাহারা কষ্ট সহিতে পারে না, এমন নয়—তাহারা খুবই কষ্ট সহিতে পারে; কিন্তু সে প্রায়ই পার্থিব সুখসম্পদ সঞ্চয় করিবার জন্য! পার্থিব সুখসম্পদ সঞ্চয় করিবার জন্য কষ্ট সহ্য করাকে—অনাহার-অনিদ্রা-হিমতাপাধিক্য প্রভৃতি কষ্ট সহ্য করাকে —তাহারা কতই যে বাহাদুরী মনে করে, তাহা বলিয়া উঠা যায় না। কিন্তু পরকালের নিমিত্ত, ধর্ম্মসঞ্চয়ের নিমিত্ত কষ্ট সহ্য করাকে —উপবাস, জাগরণ, হিমতাপাধিক্য প্রভৃতি কষ্ট সহ্য করাকে—তাহারা নিষ্ঠুরতা ও অসভ্যতা মনে করিয়া থাকে! হিন্দুর সহিত তাহাদের তুলনা করিতে নাই। হিন্দুর মন বিরাট মন, হিন্দুর আধ্যাত্মিকতা বিরাট আধ্যাত্মিকতা, হিন্দুর মানসিক শক্তি বিরাট শক্তি, হিন্দুর সাহস বিরাট সাহস। তাই হিন্দু সেই বিরাট পথে, সেই বিরাট কষ্ট সহ্য করিয়া, সেই বিরাট সাধনার দ্বারা, কৃপাকরুণার প্রয়াসী না হইয়া, সেই বিরাট পুরুষে মিশিতে যায়—এই পৃথিবী টাকে অনন্ত পথের একটা মুহূর্ত্তমাত্রের আড্ডা ভাবিয়া, ইহার কথাকে সেই অনন্ত পথের কথাতে ডুবাইয়া দিয়া, সেই অনন্ত পথ-ভ্রমণের উপযোগী সমাজ ও জীবন-প্রণালী অবলম্বন করিয়া, সেই বিরাট পুরুষে মিশিতে যায়। তাই হিন্দুর সেই বিরাট সাধনায় যে কঠোরতা দেখিতে পাই, তাহার সমাজ ও জীবন-প্রণালীতেও সেই কঠোরতা দেখিতে পাই। হিন্দু যথার্থই কিছু কঠোর, কিছু কঠিন, কিছু নিষ্ঠুর। কিন্তু তাহার সেই বিরাট উদ্দেশ্য সাধন করিতে হইলে, কিছু কঠোর হইতেই হয়, কিছু কঠিন হইতেই হয়, কিছু নিষ্ঠুর হইতেই হয়। সে যদি কেবল এই পৃথিবীটার ভাবনা ভাবিত, তাহাহইলে তাহাকে কঠোরও হইতে হইত না, কঠিনও হইতে হইত না, নিষ্ঠুরও হইতে হইত না। বালককে যদি চিরকালই বালক করিয়া রাখিতে হয়, তবে তাহাকে শাসন করিতেও হয় না, শাস্তি দিতেও হয় না। হিন্দু অনন্তকালের ভাবনা ভাবে বলিয়াই, কিছু কঠোর কঠিন ও নিষ্ঠুর। মানুষকে সেই সচ্চিদানন্দ হইতে হইবে বলিয়াই, সে মানুষের প্রতি কিছু কঠোর কঠিন ও নিষ্ঠুর। বলিলে যদি অপরাধ না হয়, তবে বলি,—হিন্দুর কঠোরতা, কঠিনতা ও নিষ্ঠুরতা সেই সচ্চিদানন্দের কঠোরতা, কঠিনতা ও নিষ্ঠুরতার অনুরূপ। মনের মধ্যে হিন্দুর মন বিরাট মন, মনুষ্য মধ্যে হিন্দু বিরাট মনুষ্য। বিরাটত্ব ও বিরাটত্ব-প্রিয়তা হিন্দুর লয়ের একটি প্রধান অর্থ, এবং হিন্দুত্বেরও একটি প্রধান লক্ষণ।

হিন্দুর প্রকৃতিগত যে কঠিনতার কথা বলিলাম, হিন্দুর হিন্দুত্ব বা বিশেষত্বের তাহা একটি প্রধান উপাদান। অন্যান্য উপাদানের ন্যায় এই উপাদানের গুণেও, হিন্দু ধর্ম্ম-সম্বন্ধে এত উন্নতি ও এত মহত্ত্ব লাভ করিতে পারিয়াছিল। বস্তুতঃ কষ্টসহিষ্ণু না হইতে পারিলে এবং কষ্ট দেখিয়াও কঠিন হইতে না পারিলে, ধর্ম্ম হইতে নিকৃষ্ট বিষয়েও উন্নতিলাভ করা যায় না। পার্থিব সম্পদের জন্য অন্যান্য জাতি সকল কষ্ট সহ্য করে এবং কষ্ট সহ্য করিতে দেখিয়া কাতর হয় না বলিয়া তাহাদের পার্থিব সম্পদ আজ এত বেশী। পার্থিব অধিকার বৃদ্ধি করিবার জন্য কত জাতিকে কত লোকক্ষয় করিতে হইতেছে; কত বীরপুরুষকে, কত সৈন্য-সামন্তকে মৃত্যুমুখে প্রেরণ করিতে হইতেছে। এত

শোণিতপাত, এত অকাল-মৃত্যু, এত লোকক্ষয় দেখিয়া, তাহারা যদি কাতর হইত, তাহা হইলে তাহাদের পার্থিব সম্পদ বৃদ্ধি করা হইত না। যে কোন বিষয়েই হউক, জয়ী হইতে হইলে, কঠিন হইতেই হয়, শক্ত হইতেই হয়। মনের শক্তি মনের মাঝা ব্যতীত উন্নতি অসম্ভব। হিন্দুর মনের শক্তি মনের মাঝা এত বেশী বলিয়া, ধর্ম্মজগতে তাহার উন্নতি ও প্রতিপত্তি অতুলনীয় হইয়াছিল। হিন্দুর এই অসীম কঠিনতাই হিন্দুকে হিন্দু করিয়াছিল। এই কঠিনতার জন্যই হিন্দুর হিন্দুত্ব। এইরূপ কঠিনতার গুণেই এক একটা জাতির জাতীয়তা হয়, ও জাতীয় উন্নতি ও শ্রেষ্ঠত্ব হয়। এ কঠিনতা গেলে, হিন্দুত্বের একটা প্রধান লক্ষণ তিরোহিত হইবে, হিন্দুত্বের একটা উৎকৃষ্ট উপাদান নষ্ট হইয়া যাইবে, হিন্দুর জাতীয়তা সঙ্কটাপন্ন হইবে। বোধ হইতেছে, যেন ইউরোপের সংস্পর্শে আমাদের এই কঠিনতা কমিয়া যাইতেছে, আমাদের মনের অস্থি নরম হইয়া পড়িতেছে। অতএব, যাহাতে আমাদের এই জাতীয় কঠিনতা রক্ষা হয়, প্রাণপণ করিয়া আমাদের সকলের সেই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।"—সাহিত্য।

মণিপুর-যাত্রীর দিনলিপি।

(২)

ব্রহ্মপুত্রের অবিশ্রান্ত তরঙ্গে গা ঢালিয়া বাষ্পপোত ঊর্দ্ধমুখে কামরূপ হইতে ডিব্রুগড়াভিমুখে ধাবমান। এই কামরূপে হিন্দুর পবিত্র তীর্থ কামাখ্যা দেবীর পীঠস্থান; শক্তি-পূজক কত শত সাধকবর্গ প্রতিনিয়ত এই মহাতীর্থ-সন্দর্শনের নিমিত্ত সমুৎসুক হইয়া দেশ-দেশান্তর হইতে এস্থলে আসিয়া থাকেন। ভূত-ধরিত্রী ভগবতীর যোনিভাগ এইস্থলে নিপতিত হওয়ায়, ইহা পীঠশ্রেষ্ঠ বলিয়া পূর্ব্বাপর প্রসিদ্ধ; মহাভাগবতকার এসম্বন্ধে স্পষ্টই বলিয়াছেন,—

"যোনিঃ পতিষ্যতে যত্র তত্র পীঠোত্তমং পরং॥"

কামাখ্যা-দর্শন-লোলুপ তীর্থ-যাত্রীগণ ঊর্দ্ধশ্বাসে উমানন্দ, ব্রহ্মকুণ্ড, পাণ্ডুনাথ ও গৌরী-শিখর—এই পঞ্চতীর্থে স্নানপূজাদি সমাপনান্তে যোনিপীঠ দর্শন ও অর্চ্চন করিতে গিয়া থাকেন। গৌরীশিখরের শিখরদেশেই পুণ্যময়ী কামাখ্যা-দেবীর মন্দির বিরাজিত। উক্ত পঞ্চতীর্থের মধ্যে উমানন্দেরই প্রসিদ্ধি অধিক; সুপ্রসিদ্ধ বারাণসীক্ষেত্রে অন্নপূর্ণা-বিশ্বেশ্বর-দর্শনের সঙ্গে কেদারেশ্বর দর্শন না করিলে কাশীদর্শন যেমন অপূর্ণ থাকিয়া যায়; যোনি-পীঠ দর্শনের পূর্ব্বে উমানন্দ দর্শন না করিলে কামাখ্যা-দর্শনও সেইরূপ অপূর্ণ হইয়া থাকে। প্রত্যুত, উমানন্দই কামাখ্যা-পীঠ-ভৈরব—ইহাঁর মন্দির নদরাজ ব্রহ্মপুত্রের বিশাল বক্ষস্থলে অবস্থিত; প্রবল নদ ব্রহ্মপুত্র অবিচলিত তরঙ্গে প্রবহমান, তাঁহার বক্ষস্থল ভেদ করিয়া উচ্চচূড় উমানন্দ-শৈল সমুত্থিত—প্রকৃতির এই সুন্দর বিনোদক্ষেত্র, ভক্ত কি, ঘোর অভক্তের হৃদয়েও ভক্তি-উদ্দীপন করিয়া থাকে। উমানন্দ শৈল গৌরী-শিখরাপেক্ষা অনেকাংশে ক্ষুদ্র; উমানন্দের মন্দির ও নাটমন্দির, এবং পাণ্ডাদিগের ২।১টী গৃহ ব্যতীত ইহার উপরে অপর কিছুই নাই। গৌরী-শিখরের অপর নাম নীলাচল; গৌরী-শিখরের নামকরণ নির্ণয় করা নিতান্ত সহজ—জগন্মাতা গৌরীর গুহ্যাতিগুহ্য যোনীপীঠ ইহার শিখরদেশে বিরাজিত বলিয়াই এই শৈলের 'গৌরী-শিখর' নাম সাধিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার 'নীলাচল' নাম কেন হইল, নির্ণয় করা দুরূহ। কালিকাপুরাণে মহাদেব বলিয়াছেন,—

"মদ্রূপধারী শৈলস্তু নীল ইত্যুচ্যতে তথা।"

শিবাঙ্গ শুভ্র; তদ্রূপধারী শৈলের শ্বেতাচল নাম না হইয়া, 'নীলাচল' কেন হইল, পুরাণকারই যখন তাহার সমস্যা-ভেদ করিতে পারেন নাই, তখন ইদানীং আমাদিগের পক্ষে সে চেষ্টা ধৃষ্টতা মাত্র। বস্তুতঃ, আমাদিগের ন্যায় অভক্তের নগ্ননেত্রে তাহার শ্বেত বা নীল কোনরূপ বর্ণভেদ উপলব্ধি হয় না। এখানকার একটী ক্ষুদ্র জলাশয়ের নাম "সৌভাগ্য-কুণ্ড";—বারাণসীক্ষেত্রে যেরূপ মণিকর্ণিকায়

ন-তর্পণাদি-সমাপনান্তে বিশ্বেশ্বর-অন্নপূর্ণা র্শন বিধেয়, নীলাচলে যোনিপীঠ-দর্শনের পূর্ব্বে সইরূপ এই সৌভাগ্য-কুণ্ডে স্নান-তর্পনাদি র্ত্তব্য। নিতান্ত দুর্ভাগ্য না হইলে, কিন্তু ার এ সৌভাগ্যকুণ্ডে স্নান করিতে হয় না; পাপাচারী যাত্রীর পাপপঙ্কে মণিকর্ণিকার জল রূপ আবিলতাময় ও পূতিগন্ধপূর্ণ হইয়া থাকে, সৌভাগ্য-কুণ্ডের জল ততোধিক আবিল ও র্গন্ধময়। কাশী-বৃন্দাবন প্রভৃতি পুণ্যক্ষেত্রে ত্রৈলঙ্গ স্বামী, ভাস্করানন্দ স্বামী প্রভৃতি সাধুগণ ধ্যেও কপটাচারী কামাসক্ত নরপিশাচগণ রূপ বিচরণ করিয়া থাকে, বিশ্বেশ্বর কামাখ্যাদি দেবমূর্ত্তির পার্শ্বেও, বোধ করি, মণির্ণিকা-সৌভাগ্যকুণ্ডাদি জলাশয়গুলি সেই রূপ পূতিগন্ধ বিকীরণ করে; সরলপ্রাণ তীর্থ-যাত্রীগণ তীর্থভূমির এই দুইরূপ অপবিত্রতা হইতে দূরে থাকেন—ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা। নীলাচলে নারিকেল বৃক্ষ যথেষ্ট পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়; আসামের অন্যত্র নারিকেল বৃক্ষ কদাচ দৃষ্টিগোচর হয়,—প্রত্যুত, ভদ্র-পরিবারের প্রমোদ-উদ্যানে যত্নরোপিত দুই একটী বৃক্ষ-ব্যতীত আসামে নারিকেল আদৌ জন্মে না; এরূপ অবস্থায়, কামাখ্যা-শৈলে এই সুফলের কিরূপে উৎপত্তি ও স্থিতি সংঘটিত হইল, বলা দুরূহ—জগন্মাতার জয়াশীষই ইহার একমাত্র সঞ্জীবনী শক্তি বোধ হয়। কামাখ্যার মন্দির মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক দেবদেবীর মূর্ত্তি নয়নগোচর হয়; এসমস্ত অতিক্রম করার পর যোনিপীঠ দর্শন লাভ হইয়া থাকে। এ স্থানটী দিবাভাগেও ঘোর তমসাচ্ছন্ন, দীপালোক ভিন্ন তথায় গমন বা দর্শন-অর্চ্চনাদি দুঃসাধ্য। এ স্থানে দেবীর কোনরূপ মূর্ত্তিময়ী প্রতিমা নাই; কেবল, অবিরাম-সলিলোদ্গারক সুগভীর গহ্বর-বিশিষ্ট বৃহৎ শিলাখণ্ড আছে। এই শিলাখণ্ডে পাণ্ডাগণ সিন্দুর-বিলেপন দ্বারা দেবপ্রভা সমুজ্জ্বল করেন, এবং এই গহ্বরেই যোনিমুদ্রা-জ্ঞানে যাত্রীগণ অঞ্জলি প্রদান করিয়া থাকেন। আমাদিগের ভাগ্যে এ যাত্রা অঞ্জলি-প্রদান বা যোনিপীঠ দর্শন ঘটিল না; অন্তরীক্ষে জগন্মাতার উদ্দেশে অভিবাদন করিয়া, জলযানে আরোহণ করিলাম।

ইংরাজরাজের কল্যাণে, পূর্ত্তবিভাগের যত্নে, আসামে পথঘাটের নানারূপ 'সুসার' ঘটিয়াছে সত্য; কিন্তু ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র দুই এক স্থল ব্যতীত লৌহবর্ত্মের অবতারণা আজি পর্য্যন্ত ঘটে নাই।* সুতরাং আসাম-পরিভ্রমণের নিমিত্ত জলপথ অপেক্ষা সুগম উপায় নাই। এবং বাষ্পপোতেই এ পথের প্রকৃষ্ট যান। এই বাষ্পপোতেও পূর্ব্বে যাতায়াতের বড় কষ্ট ছিল;—সুবৃহৎ পোত-সকল অগণ্য আরোহী ও পণ্যদ্রব্যে পরিপূরিত হইয়া মন্থরগমনে গতায়াত করায়, আসামের সমগ্র সীমা সন্তরণ করিতে মাসাধিক কাল পর্য্যবসিত হইত। কিন্তু এখন আর তাদৃশ ক্লেশ নাই—ডাকবিভাগের কঠোর চেষ্টায় দ্রুতগামী পোতের গতিবিধি ঘটিয়াছে—একাদশ দিবসের মধ্যে গোয়ালন্দ হইতে ডিব্রুগড় অনায়াসে যাতায়াত করা যায়। ইহাতে ভ্রমণকারীরও কষ্টের লাঘব, দূর-প্রবাসীর পক্ষে গৃহের সম্বাদ পাইবারও সম্পূর্ণ সুযোগ। ব্যবসায়-বাণিজ্যের বন্দোবস্তই বিচিত্র;—পূর্ব্বে এই আসাম গমনাগমনের পথে দুই দল ব্যবসায়ী পৃথগ্‌ভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা-সহকারে বাষ্পপোত চালাইতেন, তাহাতে আরোহীর অসচ্ছল ব্যয়-সংক্ষেপ ঘটিত; ভদ্রসন্তানগণ অল্পায়াসে আপনাপন 'ইজ্জৎ' বাঁচাইয়াও চলিতে পারিতেন। কিন্তু লভ্যাংশে ব্যাঘাত বুঝিয়া, এখন এই দুইদল সমসূত্রে জড়িত হইয়াছেন; সঙ্গে সঙ্গে সাধারণের ব্যয়ের মাত্রাও কিছু বর্দ্ধিত হইয়াছে। একপক্ষে কিঞ্চিৎ উন্নতিও সংসাধিত হইয়াছে। পূর্ব্বে ডাক-জাহাজে দুইটী-মাত্র শ্রেণী ছিল; এখন এই যুগল কোম্পানীর আয়োজনে একটী মধ্যম শ্রেণীর সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাতে সুবিধা এই,—মধ্যবিৎ ভদ্রসন্তানকে ইতর আরোহীর সহবাস-যন্ত্রণা সহ্য করিতে হয় না; অথচ অধিক অর্থব্যয় দ্বারা শ্বেতাঙ্গদিগের সংসর্গজনিত লাঞ্ছনা হইতেও পরিত্রাণ পাওয়া যায়। কিন্তু, দেশীয় লোকের

* সম্প্রতি সরকার বাহাদুরের ব্যয়ে একটী নূতন রেলপথের সূত্রপাত হইয়াছে। গৌহাটী হইতে লামডিং পর্য্যন্ত রেল-বিস্তারের জন্য পূর্ত্ত-কর্ম্মচারীগণ কঠোর পরিশ্রম করিতেছেন; কতদিনে ইহার কার্য্য শেষ হইবে, সে তথ্য এখন সাধারণের অজ্ঞাত।

দুর্ভাগ্যক্রমে, এই দ্বিতীয় শ্রেণীর বর্ত্তমান অবস্থা বড়ই শোচনীয়; ইহার নিমিত্ত পৃথক্ কোন স্থান নির্দ্দিষ্ট নাই, শৌচাদি-সাধনের জন্যও পৃথক কোনরূপ বন্দোবস্ত নাই, অবস্থারও আকৃতি-গত বিশেষ কোন অঙ্গসৌষ্ঠব নাই—নিম্ন-শ্রেণীর সঙ্গে সমভাবেই কষ্ট সহ্য করিতে হয়। উন্নতির মধ্যে 'পর্দ্দানশিনী' অবস্থা—সহসা দেখিলে 'পিঞ্জরাবদ্ধা বিহঙ্গিনী' বা সমর-সন্ত্রাসিতা সীমন্তিনীর বাসস্থান বলিয়াই ভ্রম জন্মে! উন্নতির অপর নিদর্শন—এক ক্যাম্বি-শাচ্ছাদিত কোমল-কঠোর খট্টাঙ্গ! মাশুলের হার কিন্তু তৃতীয়-শ্রেণীর দ্বিগুণ। ব্যয়ের সঙ্গে বাসবিধির অনুপাত কতদূর ন্যায্য, এবং ভদ্র-পথিকের কতদূর প্রীতিপ্রদ, তাহা পাঠকবর্গ সহজেই অনুভব করিতে পারেন। (ক্রমশঃ)

কংগ্রেস-রহস্য।*

(১)

If done any fault by mistake,
First occasion judge can forsake.
But as often it would be thence,
Penalty for that negligence.
So we need and be punctual,
As any such cause never shall.

(২)

† বাহুল্য আমার কথা পুনশ্চ বুলাই।১
কায পাই যদি, হাত চরণে বুলাই॥২
কন্‌গ্রেস সভ্য হ'য়ে যদি গা ফুলাই।
গৌরাঙ্গ উপাধি দিবে ধীমান উলাই॥৩

* যশোহর—চাঁচড়ার রাজা শ্রীল শ্রীযুক্ত জ্ঞানদাকান্ত রায় চৌধুরী বাহাদুর কংগ্রেশ-বিষয়ক এই ক্ষুদ্র কবিতাটি 'অনুসন্ধানে' প্রকাশার্থ প্রেরণ করিয়াছেন। কংগ্রেশ বিষয়ে তাঁহার যাহা মনোভাব, ইহাতেই ব্যক্ত হইয়াছে। যাহা হউক, রাজা বাহাদুরের বাঙ্গালা-ভাষার প্রতি অনুরাগ দর্শন করিয়া আমরা বাস্তবিক আহ্লাদিত হইয়াছি।

† ১। বুলাই—বলা। ২ বুলাই—বুলান। ৩ ধীমান উলাই—উলার পাগল। ৪ চুলাই—চোঁয়ান। ৫ চুলাই—উনান, আকা। ৬ তুলাই—তুলার মত ফুরফুরে পাতলা। ৭ কুলাই—কুলান। ৮ মুলাই—মুলা। ৯ তুলাই—উৎপাটন করা, গর্ব্ব-গুড়ে যত হ'বে মাদক চুলাই।৪
রাখিতে আধার তার হইবে চুলাই॥৫
বাঙ্গালী কাঙ্গালী অতি বুদ্ধি ত তুলাই।৬
ভাবেনা কেমনে শেষ ও-কোপে কুলাই॥৭
করিছে ব্যবসা এরা কেবল মূলাই।৮
সেই কয়দিন ভাল, না হয় তুলাই॥৯
স্বচ্ছ স্নেহ-বারি সাধে কেনই ঘুলাই।
কেনই ভাবনা-গিরি সূত্রেতে ঝুলাই॥
কেন ও বৃথা আনন্দে শরীর ফুলাই।
এখনো কমান ভাল সক্কাকে নুলাই॥
জ্ঞানদা কহিছে-মন, ওতে না শূলাই।১১
তাই ভাল, যা'তে পারি কাজ উশুলাই॥১২
আমি তো স্বীকার করি, দু'কান মলাই।
মশুরের হড়হড়িতে চেপটা কলাই॥১৩

অনুসন্ধান-সমিতির বিবরণী।

প্রতারণা-প্রবঞ্চনা।

জুয়াচুরী ব্যবসায় সর্ব্বত্রেই।

পুস্তকের বাজারে, কেমিকেল সোণার গহনার বাজারে, তাড়িৎ অঙ্গুরী অনন্ত ও আংটির কারবারে, হোমিওপ্যাথিক ঔষধের দোকানে, প্যাটেণ্ট ঔষধের বিজ্ঞাপনে—আজকাল প্রায় সর্ব্বত্রেই জুয়াচুরী। মফঃস্বল-বাসী, যে কোন একটা বিজ্ঞাপনে মুগ্ধ হইয়া, সহসা না প্রতারিত হয়েন, এই একান্ত ইচ্ছা। যদি কোন বিজ্ঞাপন-সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ হয়, রিপ্লাই কার্ডে পত্র লিখিলে, 'অনুসন্ধান-সমিতি' হইতে তাহার বিস্তারিত বিবরণ সকলকে জানান হয়।

'পৃথিবী'

পত্রিকার অনেক বিজ্ঞাপন সন্দেহজনক। সাধারণের সে বিষয়ে সতর্কতা আবশ্যক।

তোলা।১০ নুলাই—নোলা।১১ না শূলাই—ইচ্ছা নাই।১২ উশুলাই—উদ্ধার করি।১২ মশুরের হড়হড়িতে চেপটা কলাই—জাঁতার ভিতর কলাইয়ের হড়হড়িতে যেমন কলাইকেই চেপ্‌টা হইতে হয়, তেমনই ইংরাজের শাসন-জাঁতার মধ্যে থাকিয়া হড়হড় করিলে নিজেদেরই চেপ্‌টা হইতে হয়।

অনুসন্ধান।
অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র।

৫ম খণ্ড } ২৯এ অগ্রহায়ণ, ১২৯৮। { ১৩শ সংখ্যা।

সাধন-সঙ্গীত

(স্পষ্ট হসন্ত চিহ্ন ভিন্ন সমস্তই অজন্ত উচ্চারিত হইবে।)

মহড়া—তেওট।

"মধুর্ হরিনাম্—কৈবল্য ধাম্!
এ ভব ঘোরে, সে অকুল পাথারে,
বল আর কেবা তারে? মনঃ রে!
সে নাম্-তরী বৈ রবে কিসে পরিণাম? ১।

পর মহড়া—তেওট।

কালীয় গঞ্জন্, বিপদো ভঞ্জন্, ভক্ত মনোরঞ্জন, সেই রাঙা চরণ!
ও তাই বলি মন্—কর রে হৃদয়ে ধারণ্!

দশকুশি।

মুখেরো বচনে শুধু, পাবি না সে বিমল বিধু, রে!
বাক্য মনে ঐক্য ক'রে, হ'বে ডাকিতে—চা'ও যদি চাঁদ ধরিতে!

মেল্‌তা—তেওট।

সে যে প্রাণের ধন্, প্রাণ বিনে নয় পূর্ণকাম! ২।

পঞ্চম সওয়ারি।

হৃদয় কুঞ্জ মাঝে, এসো হে সেই বাঁকা সাজে—
ধড়া-চূড়া যেমন্ ছিল ব্রজে!
বামে ল'য়ে রাই কিশোরী, দাঁড়াবে সেই ভঙ্গী করি,
বাঞ্ছা, ভৃঙ্গ রূপো ধরি, মজিব পদ-সরোজে।

লোফা।

দয়া কর দয়াসিন্ধু, দীনোজনে দীনবন্ধু, সুমতি সুগতি দিয়ে দান্!
(ওহে অধম-তারণ) ডাকিতে না জানি হরি, মায়ার ঘোরে মিছে ঘুরি,
নিজ গুণে তারিতে হ'বে হে শ্যাম্! (ওহে পতিত পাবন)

চৌতাল।

দীনের দিন্ যতই শেষ্, ততই ক্লেশ্, কাল্ ভয়ে বিশেষ!
কেবল্ ভরসা অন্তের ধন্, অভয় চরণ্ যেন মন্ বিস্মরণ হয় না হৃষীকেশ!

মেল্‌তা।

যেন রসনা জপে তারক ব্রহ্ম রাম!

সাধু-বেশের অসীম মহিমা।

সাধু-সহবাসে-অমৃত ফল, সাধু-সঙ্গে অনন্ত মোক্ষ—একথা সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন ; বেদ-উপনিষদ, পুরাণ-উপপুরাণ—সকল ধর্ম্মগ্রন্থেও একথার ভূয়োভূয়ঃ প্রত্যক্ষীভূত প্রমাণ প্রকটিত আছে। আমরা সে কথা মনে রাখি বা না-রাখি, আমরা সে উপদেশ-বাণী স্মরণ রাখিয়া কার্য্য করি বা না করি ; কিন্তু আমরা শৈশব হইতেই এ সাধু-সহবাস-মহিমা জ্ঞাত বা শ্রুত হইয়া আছি। এইরূপ সাধু-বাক্য, সাধু-আচার, সাধু-কার্য্য সাধু-বেশ—সাধু-পুরুষদিগের এসকল সাধু-চিত ব্যবহার-বেশাদির গুণাগুণও আমরা কিছু-না-কিছু অবগত আছি। হিন্দু-শোণিত-শুক্রের সংযোগ-পোষণের সহিতই, কি জানি কোন্ অলক্ষ্য গতিতে, এ সকল শাস্ত্রতত্ত্ব আমাদের শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে, প্রবেশিত হইয়াছে—পরিস্ফুট-চেষ্টও সততই। কিন্তু কি কাল-মাহাত্ম্য, যতই তাহাদের স্ফূরণাশা, ততই তাহাতে বিপর্য্যয়! বার্দ্ধক্যে শোণিত-শুক্রের পরিপুষ্টির সহিত কোথায় আমরা সে সকল সাধু-পন্থায় সবলে অগ্রসর হইব, তা-না ততই আমরা—কতকটা কলি-শাসিত সমাজের সংস্রব-দোষেই—বিপথে পরিচালিত হইতেছি! কি আক্ষেপ! কি মর্ম্ম-বেদনা।

আজকাল আমরা জানিও-না সকল ; —জানিয়া, মনে রাখি-না ও কিছু। অধিক কি, আমাদের পিতৃপুরুষগণ আমাদিগকে যে সকল তত্ত্ব জানাইয়া গিয়াছেন ; ক্রোড়ে ধরিয়া, যত্ন করিয়া, যে সকল কার্য্য আমাদিগকে শিখাইয়া গিয়াছেন ; আজকাল সে সকলও আমাদের কাছে 'গল্প'! যে সকল প্রত্যক্ষ ঘটনা—এখন আমরা মনে করি, অদ্ভুত অলৌকিক গল্প! এই ধরুণ, এক সাধু-সঙ্গের কথা! নব্য-বাবুরা হয় তো বলিবেন,—"ড্যাম সাধু-সঙ্গ! আপনি ঠিক হ'লেই সব! বেশ্যালয়ে থাকিয়াও ঈশ্বর-আরাধনা হইত পারে।" এইরূপ, সাধু-বেশের কথা পাড়িলে,তাঁহারা তো বিদ্রূপ করিয়াই উড়াইয়া দিবেন! কিন্তু, কি তাহার মহিমা, কি তাহার আকর্ষণী শক্তি, সাহস করিয়া বলিতে পারি, বিজ্ঞানও সে তত্ত্বের অবিস্কারে হারি মানে!

সাধু-সঙ্গের কথা দূরে থাকুক, সহৃদয় পাঠক-পাঠিকে, আজ সামান্য একটী সত্য-ঘটনায়, সাধু-বেশেরও যে কি অপার মহিমা, আপনাদিগের নিকট তাহাই বর্ণনা করিব।

এক রাজ-পরিবার ও তাঁহাদের রাজ-সংসারের এক নীচতম ভৃত্য। ভৃত্য প্রতি-দিনই, প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়াই, সেই রাজপুরে গমন করে ; এবং যথাবিধি আপনার দৈনিক কার্য্য সমাপনান্তে গৃহে প্রত্যাগত হয়। বার-মাসই—আজীবনই সে এই কাজ করিয়া আসিতেছে। কিন্তু একদিন—একদিন তার আর গৃহে ফিরিতে মন চায় না! তার মন যেন কেবলই বলে—"চোখ, চেয়ে দেখ—চেয়ে দেখ!" চোখও আর ফিরিতে চাহে না—পলকও আর পড়ে না। রাজ-ভৃত্যের কিছুকাল এমনই ভাব! তারপর, সে ততো-ধিক বিমর্ষ! একটী দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া, সে মনে মনে বলিল,—"যদি তাঁকে পাই, তবেই এজীবন রাখ্‌বো ; নহিলে, এই পর্য্যন্তই সব শেষ!" এই ভাবিয়াই, ধীরে ধীরে—তার পা যেন আর সরে না, তার মন যেন আর মানে না—অতি ধীরে ধীরে অগত্যা তাহাকে গৃহাভিমুখে ফিরিতে হইল। আজ তার ঘরে ফিরিতে, অন্যদিন অপেক্ষা অবশ্য অনেক বেলাই হইয়াছিল।

ঘরে আসিয়াও, তার আজ তেমনই বিমর্ষ ভাব! স্ত্রী জিজ্ঞাসা করে,—"আজ তুমি কেন অমনতর হয়ে রয়েছ! অত বিমর্ষ কেন! শরীর তো আছে ভাল!" কিন্তু উত্তর নাই। একবার, দুইবার, তিনবার! স্ত্রী বারবার ঐরূপ জিজ্ঞাসা করে ; অথচ কোনই উত্তর নাই। এদিকে বেলাও তৃতীয় প্রহর অতীত-প্রায়। স্ত্রী তখন, পায়ে ধরিয়া—তাহার নিজের বা কোন অপরাধের দরুণ তাহার স্বামী অমন চটিয়াছেন ভাবিয়া—যোড়-করে আবার বলিল,—"স্বামী, প্রভু! তোমার কি হয়েছে, বল! আমার যদি কোন দোষ হয়ে থাকে, আমায় ক্ষমা কর। অথবা তোমার জন্য যদি কিছু কর্‌তে হয়, বল, আমি প্রাণ দিয়েও তা কর্‌তে রাজী আছি।"

"প্রাণ দিয়েও তা করতে রাজী আছ?" —স্বামী আবার বলিল,—"তুমি প্রাণ দিয়েও তা কর্‌তে রাজী আছ!"

"হাঁ! হাঁ! আমি সত্যই বল্‌ছি!"—এই বলিয়াই, রাজ-ভৃত্যের সেই স্বাধ্বী স্ত্রী আবার বলিল,—"বল তবে! বল তোমার জন্যে আমায় কি কর্‌তে হ'বে! আমি প্রাণ দিয়েই তা কর্‌তে রাজী আছি।"

স্বামী, একান্ত বিষাদ-স্বরে, আবার বলিতে লাগিল,—"পার্‌বে তুমি—পার্‌বে! তবে শোন! আজ আমি রাজ-অন্তপুরে, আমার নিত্য-কর্ম্ম কর্‌তে গিয়ে, যাঁকে দেখেছি, একবার তাঁ'কে না পেলে আমি আর এ জীবন রাখ্‌বো না! সেই রাজকন্যা—আহা সেই আলোকসামান্য রূপ—আর কি কখনও তাঁকে দেখ্‌তে পাবো? প্রিয়ে, আমার একান্ত প্রতিজ্ঞা, আর একবার তাঁ'রে আমি দেখ্‌তে চাই! সে রূপ—সে সৌন্দর্য্য, আমায় পাগল করেছে, আহা! তাঁকে আমি আর একবার না পেলে, আমার এ প্রাণ আর রাখ্‌বো না। শুন্‌লে!—শুন্‌লে আমার কথা! এখন, পার তো তাঁ'রে দেখাও ; নইলে, এই চল্লেম্—এই আমি জন্মের মতই চল্লেম।" এই বলিতে বলিতে, পাগলের মত, সে যেন পলাইবার জন্য চেষ্টিত হইল।

সে চেষ্টায় স্ত্রীকেও কিন্তু বিষম ভাবনায় পড়িতে হইল। স্ত্রীর মনে প্রথমতঃই উদিত হইয়াছিল,—"এ কি দুরাশা! তিনি রাজকন্যা, আর আমরা তত্তুলনায় কীটানুকীট রাজ-ভৃত্য! কি ক'রে এ কাজ সম্ভবপর? প্রাণ দিলেও তো এ হবে না!" যাইহোক, পর-ক্ষণেই, মনে মনে কি ভাবিয়া, অন্ততঃ তখন-কার সে উদ্বেগে বাধা দিবার জন্যও, সে বলিল,—"আচ্ছা, তাই হ'বে! রাজ-কন্যাকেই আমি এনে দেব! এখন তো তুমি স্থির হও! তারপর, আমি যা' যা' কর্‌তে বলি, তাই ক'রো—অবশ্যই রাজ-কন্যাকে পা'বে!"

"তুমি যদি বাস্তবিকই তা' ক'রে দিতে পার, তবে তুমি যা' বল্‌বে, আমি তাই-ই কর্‌তে রাজী আছি।"—স্বামী এই বলিয়া, স্ত্রীর সেই কথায় যেন বড়ই আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল।

স্ত্রী তখন, প্রথমতঃ স্বামীকে একটু সুস্থ করিয়া, অনেক ভাবনার পর, এই এক অপূর্ব্ব কৌশল বাহির করিল। বলিল,—"তবে পর—এই গেরুয়া ; মাথায় দেও—এই জটা ; গায় মাখ—এই ভস্ম ; ধর—এই চিম্‌টে। তা'র পর, চল—আমার সঙ্গে ; চল, সেই শ্মশানে—চতুর্দ্দিকে শব-বেষ্টিত হইয়া—কৃত্রিম ঈশ্বর-আরাধনায় ব্যাপৃত হ'বে। খবরদার, কারুর সঙ্গে কথা ক'য়ো না ; খবরদার, কারুর দিকে ফিরে চেও না। দেখি, কার্য্যসিদ্ধি হয় কি না! এ'তে—তুমি লালাইত হওয়া তো দূরের কথা—দেখি, সেই রাজকন্যা এসে তোমার চরণে আত্ম-সমর্পণ করেন কি না! যদি না করেন, যদি তোমায় তাঁকে না দিতে পারি, তবে আমার বৃথা জন্ম—বৃথা পতি-সেবা—বৃথা ক্রিয়া-কাণ্ড!"

স্বামী হর্ষোৎফুল্ল-স্বরে বলিল,—"ভাল—ভাল! আমি তা'তেই রাজি আছি। তুমি যা বল্‌বে, আমি তাই-ই কর্‌বো।"

স্ত্রী আবার বলিল,—"আর একটা কথা, দেখো, খাওয়া-দাওয়া-সম্বন্ধে কোনই ভ্রূক্ষেপ ক'রো-না। কেউ মুখে তুলে দেয়, খেও; না দেয়, ক্ষতি নেই। রোজ রাত্তিরে আমি গিয়ে তোমায় খাইয়ে আস্‌বো। সাবধান, এর একটী কথাও যেন ভুলো-না!"

স্বামী তাহাতেই স্বীকৃত। তাহার কতই আহ্লাদ! যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইল! ক্রমে অনুষ্ঠানও সেরূপ চলিল। যথাবিধি বেশ-ভূষায় সাজাইয়া, যথাবিধি উপদেশ দিয়া, সেদিন রাত্রে, স্ত্রী তাহাকে সেই নগরের অনতিদূরস্থ একটী শ্মশান-ক্ষেত্রে রাখিয়া আসিল।

... ...

এক মাস, দুই মাস, তিন মাস—কতদিন এইরূপেই কাটিয়া যায়। স্ত্রী কতই কায়-ক্লেশে, একরূপ ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াই, নিজের ও স্বামীর জীবন ধারণ করিতে থাকে। অবশেষে, ক্রমে একে একে নগরের লোকের সেই সন্ন্যাসীর প্রতি দৃষ্টি পড়িল। আজ এ আসিয়া বলে,—"শ্মশানে এক অপরূপ সন্ন্যাসী আসিয়াছে।" কাল আর একজন আবার তাহাতে একটু মাত্রা চড়াইয়া বলে,—"আহা, সন্ন্যাসীর কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা! অমুকের অমুক রোগটা অম্‌নি সেরে দিলে!" ক্রমে নগরে এমনি কত-কি কথাই উঠিল। হয়ত স্বভাবের গুণে, সেই উপলক্ষে, কত লোকের কতই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইতে লাগিল; অথচ সকল বিষয়েই সন্ন্যাসীর এমনই সুযশ! তখন, নগরের কতই লোক সেই সন্ন্যাসীকে দেখিতে যায়; কত লোক বা তাঁহার উদ্দেশে কত কি মানস করিয়া আসে! কত অপুত্রক বা তাঁহার নিকট পুত্র-কামনা করিয়া যায়; কত রোগী বা নিরোগ-কামনায় তাঁহার চরণ-ধূলি মস্তকে গ্রহণ করে। দিন-কতক নগরের এমনই ভাব! ক্রমে রাজা ও রাজ-অন্তপুরেও সন্ন্যাসীর এ আগমন-বার্ত্তা পৌঁছিতে বাকি রহিল না। তাঁহারাও, নাগরিকদিগের মুখে সন্ন্যাসীর নানা অলৌকিক মহিমার কথা শুনিয়া, বিস্মিত হইতে লাগিলেন; অধিক কি, ক্রমে তাঁহাদের সে সন্ন্যাসী-দর্শন-স্পৃহা বলবতী হইল। রাজা ও রাজ-পুরনারীগণও ক্রমে ক্রমে সেই সন্ন্যাসীকে দর্শন করিতে আরম্ভ করিলেন।

ক্রমে সেই রাজ-কন্যা! কি আশ্চর্য্য বিধাতার লীলা—বাস্তবিকই রাজ-পুরনারীগণের সহিত ক্রমে সেই রাজকন্যাও সেই সন্ন্যাসী-সমীপে উপস্থিত হইলেন। সকলে যেমন সন্ন্যাসীর চরণ-প্রান্তে পড়িয়া ইচ্ছানুরূপ বর-প্রার্থনা করেন, আজ রাজকন্যাও সেইরূপ তাঁহার পদতলে! যাঁহাকে একবার দেখিবার জন্য রাজ-ভৃত্য প্রাণ-পর্য্যন্ত পণ করিয়াছিল, বাস্তবিকই সেই অলোকসামান্যা রাজকন্যা আজ সেই সন্ন্যাসী-বেশী রাজ-ভৃত্যের পদতলে! বিধাতার কি এ অপূর্ব্ব লীলা!

... ...

সন্ন্যাসী-বেশী রাজভৃত্যের স্ত্রী তখন, স্বামীর চরণ-প্রান্তে বসিয়া, তাহাকে বলিল,—"তবে এস এখন ঘরে যাই! যা'র জন্য যা', তা'ত হ'লো! তবে কেন আর? যে রাজকন্যাকে একবার দেখ্‌বার জন্য তুমি প্রাণ-পর্য্যন্তও পণ ক'রেছিলে, আজ অনায়াসে সেই তোমার পদতলে লুণ্ঠিত! তবে এস—এস আমরা ঘরে যাই। আমি তো আমার প্রতিজ্ঞা পালন করেছি; এখন এস—তুমি তোমার কর্ত্তব্য-রক্ষা কর।"

কিন্তু সন্ন্যাসীর তখন অন্য ভাব! আর তখন তাহাকে পায় কে? রাজ-ভৃত্যে তখন প্রকৃতই সন্ন্যাসীত্ব। সে তখন বলিল,—"আর কেন প্রিয়ে! এ বেশ আর তো আমি ছাড়বো-না! প্রিয়ে, সকল বেশের উপর রাজ-বেশ—কিন্তু এ বেশ যে তা'র চেয়েও কোটি-গুণে শ্রেষ্ঠ। রাজা এ বেশের নিকট পদানত; সূর্য্যস্পর্শ্যা রাজপুরনারীগণ—যোগীন্দ্র-মুনীন্দ্রগণও সহস্র যুগ ধ্যান করিয়া যাঁহাদের দর্শন পান না—এবেশ তাঁহাদিগকেও পদানত করিয়াছে। প্রিয়ে, এমন বেশ জগতে আর কি আছে? এ শ্রেষ্ঠ বেশ—এ সুন্দরতম বেশ, তবে বল দেখি প্রিয়ে, আমি কেমনে ত্যাগ করি? তাই আর আমার গৃহেও যাইতে ইচ্ছা নাই—সংসারী হইতেও সাধ নাই—কিছুই আর আমি চাই-না। প্রিয়ে, যে বেশ আমায় দিয়েছ, যে পথ আমায় দেখিয়েছ, আমি এখন এই বেশে—এই পথেই চলিব। তদ্ভিন্ন, আর আমার গতি-মুক্তি-উপায় নাই। বেশ পেয়েছি—পথ পেয়েছি; এখন প্রিয়ে, সেই অকূল পথের কাণ্ডারীকে কোথায় পাইব, সদাই এই ভাবনা। রাজকন্যাকে দেখিয়েছ, 'রাজ-পথ' দেখিয়েছ, এখন যদি পার, সেই পথের কাণ্ডারীকে একবার দেখাও। নহিলে, আর আমি কিছুই চাহি না। আজ আমায় জন্মের মত বিদেয় দেও। আমি তাঁহাকে একবার খুঁজে দেখ্‌বো—দেখ্‌বো, তিনি এ পাপ-জন্মা অভাগাকে পার করেন কি না! প্রিয়ে, যাও তুমি গৃহে যাও—তুমি আমার যে উপকার করিয়াছ, তাহাতে তোমার আর উদ্ধারের কোনই ভাবনা নেই—এখন, দেখি একবার, যদি সেই সর্ব্ব-সন্তাপহারী শ্রীহরি আমার এ মনস্তাপ দূর করেন!" এই বলিতে বলিতেই, প্রেমাশ্রু-জলে সন্ন্যাসীর বক্ষঃস্থল ভাসিয়া গেল। তাহার স্ত্রীও, আর সে শোকাবেগ সম্বরণ করিতে পারিল না।

স্বামী-স্ত্রী তাহারা দুইজনেই তদবধি উদাসী। স্বামীও সেই অবধি আর গৃহে ফিরে নাই; তাহার স্ত্রীও আর তদবধি সংসারে যায় নাই। সেই হইতেই, তাহারা দুইজনেই দুইদিকে ঈশ্বরারাধনায় চলিয়া যায়। দুইজনেই খুঁজিতে থাকে,—কোথায় সেই শ্রীমধুসূদন, ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্পতরু শ্রীনারায়ণ!

সাধু-বেশের এমনই মহিমা! কে বলে বেশ-ভূষার সহিত ধর্ম্মের সংশ্রব নাই? সাধু-বৈষ্ণবের সেই হরিনামাঙ্কিত নামাবলী-রচিত দেহ, শৈব-সন্ন্যাসীর সেই জটা-বল্কল-ভস্ম, অথবা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের সেই তুলসী-মালা বা মস্তকের শিখা—কে বলিল, এ সকলের সহিত ধর্ম্মের কোন সংশ্রব নাই? আচার-ভ্রষ্ট বা কদাচারী হইয়া আমরা তাহার যেরূপই কেন কু ব্যবহার করি না, কিন্তু বাস্তবিকই ঐ সকল প্রক্রিয়ার একটী না একটী উদ্দেশ্য আছেই আছে। আমরা অপব্যবহারকারী, কিন্তু তাহাতে সে সকল অনুষ্ঠান-পরম্পরার দোষ কি? বুঝিতে না পারিয়া, আমরা মিছা-মিছি তাহাতে দোষারোপ করি বৈ ত নয়! নহিলে, বেশ-ভূষার বাস্তবিকই একটা আকর্ষণী শক্তি আছে—যাহাতে মানুষের মনকে টানিয়া লইয়া থাকে। এই সাদা-সিদে কথাতেই ধরুন না কেন, হ্যাট-কোর্ট-বুট 'হাঁকড়াইয়াই' বা আমাদের মনোভাব কিরূপ তমোভাবাপন্ন হয়; আর সামান্য চটি-জুতা পায় দিয়া, সামান্য চাদর-মাত্র গায়ে দিলেই বা মনে কিরূপ নিরীহ ভাবের উদয় হয়? তাই বলি, সাধু-সহবাস, সাধু-বেশ—সাধু-সম্বন্ধীয় সকল বিষয়েরই অমৃত-ফল! ভ্রান্ত আমরা, তাই হেলায় সে ফল হারাইয়া থাকি।

অদৃষ্ট।

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

অভাবনীয় ঘটনা।

ইতিপূর্ব্বে একদিবস রাত্রে জয়গোপাল শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাটীতে গিয়াছিলেন। সেখানে যে সকল কথা-বার্ত্তা হয় তাহা পূর্ব্বে বর্ণনা করা হইয়াছে। অধিকন্তু, শিবচন্দ্র এ সমস্ত গুহ্য কথা তাঁহার স্ত্রীর নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন; এবং তাঁহার স্ত্রী পরদিবস

প্রাতে নিজে আত্মীয়-স্বজনের নিকট সেই সমস্ত কথা,বাড়াইয়া ভিন্ন কমাইয়া নহে,প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই কথা জয়গোপালের খুল্লমাতা-ঠাকুরাণী শ্রবণ করিয়া, সহাস্যে বাটী গমন করিয়া নিজ কৃতদাসকে কহিলেন, —"তুমি যেমন ব্যাকুব, এমন ব্যাকুব আর দুনিয়ায় নেই। তোমার যদি বুদ্ধি থাক্‌তো, তা হলে কি তোমার একবিন্দু জমী কেউ কেড়ে নিতে পার্‌তো?" এই কথা যখন কহিলেন, তখন খুল্লমাতা-ঠাকুরাণীর মুখখানি ধূপ-ছায়া বা ময়ূরকণ্ঠী চেলীর ন্যায় দেখাইতে লাগিল, অর্থাৎ ক্ষণেক রাগের ভাণ, ক্ষণেক হাস্যরসের অভিনয় করিতে লাগিলেন। যখন তাঁহার অন্তরে যেরূপ ভাবের উদয় হইতে লাগিল, তাঁহার ক্রীতদাসের মুখে যুগপৎ সেই রসের ভাব লক্ষিত হইল। ক্ষণেক ঠাট্টা, ক্ষণেক রাগ, ক্ষণেক কিঞ্চিৎ ভালবাসার লক্ষণ ও অন্যান্য রসসংযুক্ত কথা,মেঘমালে ইন্দ্রধনুকের সদৃশ, পর্য্যায়ক্রমে পরস্পরের মধ্যে উত্থিত ও অন্তর্হৃত হইতে লাগিল। তখন, আগ্রহ-সহকারে সমস্ত বৃত্তান্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবগত হইয়া, রাগে তাঁহার দন্ত কড়মড় করিতে লাগিল; এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন,—এ পাষণ্ড-কুলাঙ্গারকে অতি শীঘ্রই পরের জমা-জমী কাড়িয়া লওয়া কেমন তাহা দেখাইয়া দিব। দুর্ভাগ্যবশতঃ জয়গোপাল সে সময় শ্বশুরালয়ে ছিলেন, এবং শ্বশুরকে প্রত্যহ মনুসংহিতা ও দায়ভাগের কথা বুঝাইয়া দিতেন; এবং গ্রামে এমন বিদ্যান, বুদ্ধিমান ও সুলোক জামাই আর কাহারও না থাকায়, প্রত্যহই, আজ ইহার বাটী, কাল উহার বাটী, নিমন্ত্রণ খাইয়া বেড়াইতেন। 'যত হাসি তত কান্না, বলে গেছে রামশর্ম্মা'—অতি অল্পদিনের মধ্যেই জয়গোপালকে এই কথার উপলব্ধি করিতে হইল।

অনেক লোক এক ব্যবসা আরম্ভ করিলে তাহাদিগের মধ্যে প্রায়ই ঈর্ষা জন্মিয়া থাকে। জয়গোপাল অতি অল্পদিনের উকীল হইয়া যাহারা বহুকালের উকীল তাহাদিগের অপেক্ষা উপার্জ্জন করিতেন। পূর্ব্বে যখন তাঁহার খুড়া জয়গোপালের নামে নালিশ করিতে গিয়াছিলেন, তখন জয়গোপালের অবস্থা এক্ষণকার ন্যায় উন্নত ছিল না। এজন্য অন্য কোন উকীল তাঁহার মকর্দ্দমা লন নাই। এক্ষণে সে প্রতিবন্ধক না থাকায়, বিনা "ফিজে" বড় বড় উকীলেরা তাঁহার মকর্দ্দমা লইলেন। মকর্দ্দমার বিবরণ শুনিয়া, উকীলদিগের ঘরে হাসির ঢেউ উঠিয়া গেল। কেউ বলিতে লাগিল,—"ও ঘুঘু!" কেহ বলিল,—"ময়ূরপুচ্ছে আবৃত কাক!" কেহ বা "সিংহের চর্ম্মে আবৃত গাধা"—এই সমস্ত জয়গোপালের পক্ষে সুশ্রাব্য বচন বাহির হইতে লাগিল। জজ-সাহেব মকর্দ্দমার হাল শুনিয়া, ভ্রূ-যুগল কুঞ্চিত করিলেন, এবং অবিলম্বে গ্রেপ্তারি ওয়ারেণ্ট তাহার নামে জারি করিলেন।

অদ্য অম্বুবাচী। ঝুপ ঝুপ করিয়া অনবরত তিনচারি দিবস বৃষ্টি হইতেছে। পল্লীগ্রামে এ সময়ে আম্র পাওয়া যায় না। অনেকেই আমচুর চিবাইয়া শাস্ত্ররক্ষা করেন। কিন্তু জয়গোপাল কলিকাতার উইল্‌সনের দোকান হইতে চল্লিশটী আঁব দেড় মণ বরফের অভ্যন্তরে রাখিয়া শ্বশুরবাটী আনয়ন করিলেন। তাঁহার পিতা-মাতা আমচুর চিবাইয়া অম্বুবাচী পালন করিতেছেন; কিন্তু জয়গোপালের শ্বশুরবাটীতে আজ মহাধুম উপস্থিত হইয়াছে! পাড়ার সমস্ত লোক নিমন্ত্রিত হইয়াছেন। তাঁহারা, নিমন্ত্রণে আসিয়া, জয়গোপালের ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা করিতেছেন। জয়গোপাল 'লঙ্কা পায়রার ন্যায়' গরদের কোট গায় দিয়া, অর্দ্ধ-ইংরেজী অর্দ্ধ-বাঙ্গালা ভাষায় সকলের সহিত দুই-একটা কথা কহিতেছেন। একবার কহিলেন,—"কি পিটি (pity), চল্লিশটার বেশী ম্যাঙ্গো(mangoe) গ্রেট ইষ্টারণে (Great Eastn) পেলাম না! যদি ইংলণ্ড হ'তো, তবে ারপুল-ম্যান্‌চেষ্টার যে অতি দূরের কণ্ট্রি ন (country town) তাহাতেও রাশি শ ম্যাঙ্গো (mangoe) পাওয়া যাইত।"

গৃহাভ্যন্তরে জয়দুর্গা সপ্তমীর সুসজ্জিত তমার ন্যায় শোভা পাইতেছেন। যতগুলি না ছিল, সমস্ত-গুলি পরিধান করিয়া, রুণু-শব্দে এঘর-ওঘর বেড়াইয়া বেড়াইতেছেন। তে আসিতে জয়গোপাল তাঁহাকে দেখিতে ন, সেইরূপ স্থানে উপবেশন করিয়া আছেন। দুর্গা কোনই কাজ-কর্ম্ম করিতেছেন না; ন্তু তথাপি এঘর-ওঘর করিতেছেন; এবং গোপালের সহিত একটু মুচকি হাসি সিতেছেন। এইজন্যই তাঁহার আসা-য়া, এবং তাঁহার অভিলষিত দ্রব্যই এই। র্ব্বে বলা হইয়াছে যে, জয়গোপালকে জয়দুর্গা মীর ন্যায় ভাল বাসিতেন না; পোষা পাখী পোষা কুকুরের ন্যায় তাঁহাকে দেখিতেন। নি এঘর-ওঘর যাইবার আসিবার সময়, হার সহিত নিজের চক্ষু মিলিত হইলে, ন তাঁহার নিজের চক্ষুদ্বয় বলিত—"পড় স্মারাম, পড়।"

সকলেই এইরূপ প্রসন্ন ও প্রফুল্ল আছেন; এমন সময়ে আহারের ডাক হইল। সকলেই ঠিয়া আহার করিবার স্থানে গমন করিলেন। এমন সময়ে, একজন কন্‌ষ্টেবল্ উক্ত বাটীতে উপস্থিত হইল; এবং "জয়গোপাল—জয়গোপাল" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া উঠিল। বাহিরে গাড়ু-গামছা লইয়া একজন ভৃত্য বসিয়াছিল; সে কন্‌ষ্টেবলের অসম্মান-সূচক কথা শুনিয়া বাবুর নিকট গিয়া নিবেদন করিল,—"কোথাকার একটা গোঁয়ার চাপরাসী আসিয়াছে; সে 'জয়গোপাল জয়গোপাল' বলিয়া ডাকিতেছে। আর বেটা যেন ঘোড়ায় জিন দিয়ে এসেছে, তার একবিন্দুও দেরী সয় না!" জয়গোপাল শুনিয়া কহিলেন,—"একথা সত্য বটে, ছোট-লোকে ভদ্রলোককে তো সম্মানসূচক কথা কহিতে জানে না! বোধ হয়, এ তলপ জজ-সাহেব করেছেন। বেটা রোজই বলে,—"তুমি নিশ্চিন্দি-পুরের সদরয়ালা হ'য়ে যাও। সে জায়গাটা অত্যন্ত (important) ইম্পর-ট্যাণ্ট। যে কয়জন সেখানে সদরয়ালা হইয়া গিয়াছেন, তাহার কেহই স্যাটিস্‌ফ্যাকটরিলি (satisfactorily) কাজ করিতে পারে নাই।' এইজন্য, এ জজ বেটা আজ ছ'মাস ধরে আমাকে খোসামোদ করিতেছে; কিন্তু বেটা ভাবিয়া দেখে না যে, আমায় প্রথমতঃ থার্ড গ্রেডের (third grade) জজ (on six hundred rupees) হইতে হইবে; কিন্তু ওকালতিতে আমি এট প্রেজেণ্ট (atpresent) টুয়েল্‌ভ হণ্ড্রেড (twelve hundred) পাইতেছি। বিশেষ,এক্ষণে আমি ইণ্ডিপেন্‌ণ্ডেণ্ট, (independent); চাকরি লইলে এই ইণ্ডিপেন্‌ডেন্স (independence) কোথায় রহিবে?"

অনন্তর কন্‌ষ্টেবল্ ঘনঘন উচ্চরবে চীৎকার করায় এবং সকলের পাতে চিড়ে-দই না পড়ায়, জয়গোপাল কহিলেন,—"যাই, আমি গোলমালটা চুকাইয়া দিয়া আসি।" এই বলিয়া, বাহিরে আসিয়া কহিলেন,—"কাহেকো এত্‌না চিল্লাতা হায়?" কন্‌ষ্টেবল্ কহিল,—"তোমারি নাম জয়গোপাল?"

জয়গোপাল।—তোম্ তো বড়ি গোস্তাক, হাম্ দেখ্‌তা হায়?

কন্‌ষ্টেবল্।—আচ্ছা, মাপ কিজিয়ে হুজুর, আপি-কা নাম জয়গোপাল?

জয়গোপাল।—হাঁ, কাহেকো?

কন্‌ষ্টেবল্।—এই এক্‌ঠো চিঠি হায়, আপ্‌কো নাম্‌মে; মেহের বাণী কর্‌কে দেখিয়ে।

এই বলিয়া ওয়ারেণ্টখানি তাঁহার হস্তে দিয়া, কন্‌ষ্টেবল বিনীতভাবে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। জয়গোপাল বাবু ওয়ারেণ্ট-

খানি পড়িয়া বাতাহত কদলীর ন্যায় মৃত্তিকায় বসিয়া পড়িলেন; এবং সমস্ত পৃথিবী যেন সরিষার ফুলের ন্যায় দেখিতে লাগিলেন। এই অবকাশে কনষ্টেবল্ নিজের ব্যাগের অভ্যন্তর হইতে এক জোড়া পরিমার্জ্জিত ও পুনঃপুনঃ ব্যবহারে উজ্জ্বলিত হাতকড়ি নিষ্কাশিত করিয়া তাঁহার হস্তে সংলগ্ন করিয়া দিল। আমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ তাঁহার প্রত্যাগমনে বিলম্ব দেখিয়া কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন,—"আসুন, আমরা আহারে প্রবৃত্ত হই।" তৎশ্রবণে শ্বশুর মহাশয় কহিলেন,—"ন—না, তা হ'তে পারে না। উকীল বাবাজী অবিলম্বেই প্রত্যাগমন করিবেন। যদি আসিয়া দেখিতে পান যে, আমরা আহারে প্রবৃত্ত হইয়াছি, বোধ হয়, তিনি কষ্ট পাইবেন। বিশেষতঃ ধনে-মানে, কুলে-শীলে, লেখায়-পড়ায়, আর দ্বিতীয় লোক এ অঞ্চলে নাই।" এইরূপ ক্ষণকাল কথা-বার্ত্তা হইতেছে; কিন্তু তথাপি জয়-গোপাল দর্শন দিতেছেন না। একজন হঠাৎ কহিলেন,—"আচ্ছা, যদুকে বলা হয় নাই কেন?" শ্বশুর-মহাশয় উত্তরে বলিলেন,—"এখন ত তাহার প্রত্যহই অম্বুবাচীর অরন্ধন; তাহার পক্ষে এরূপ অরন্ধন কিছু নূতন নহে। উননে প্রায়ই হাঁড়ি চড়ে না; মেয়েটাকে হাত-পা ধরিয়া জলে ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। বাছা আমার এক দিবসও সুখে কাল যাপন কর্‌তে পারে নাই!" এইরূপ আরও ক্ষণকাল কথা-বার্ত্তা হইল। পরে শ্বশুর-মহাশয় কহিলেন, —"বোধ হয়, বাবাজীকে অবিলম্বে গমন করিয়া জজিয়তি করিতে হইবে। নহিলে, আহার করিতে আসিতে এত বিলম্ব হইবে কেন? অন্যান্য দিবস বাবাজী ঠিক দশটার সময় আহার করেন; কিন্তু অদ্য প্রায় এগারটা বাজিয়াছে, তথাপি তিনি কার্য্যান্তরে আছেন। এরূপ ঘটনার অবশ্যই কোন না কোন কারণ আছে। আপনারা একটু অপেক্ষা করুণ; আমি অবিলম্বে অনুসন্ধান করিয়া ফিরি আসিতেছি।" অনন্তর রঙ্গভূমিতে উপস্থি হইয়া দেখিলেন, যশোদা যেরূপ ননীচোরা করে করে বন্ধন করিয়াছিলেন, সেইরূ কনষ্টেবল্ সার্টিফিকেট-চোরাকে করে ক বন্ধন করিয়া বসিয়া আছে। জয়গোপা ইত্যগ্রে তাঁহার স্ত্রীকে হাতে-পায়ে গলায় মাথায় অলঙ্কার দিয়াছিলেন; কিন্তু তি স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, কখন তাঁহাকে নি লৌহ-বলয় পরিধান করিতে হইবে! শ্বশু মহাশয় তদ্দর্শনে ভীষণ রবে চীৎকার করি উঠিলেন। সেই শব্দ শ্রবণ করিয়া নিমন্ত্রি ব্যক্তিগণ যে যত শীঘ্র আসিতে পারিল, কর্ম স্থলে আসিয়া উপস্থিত হইবার চেষ্টা করিল সর্ব্বাগ্রে আসিবার জন্য কাহারও কাহার মাথা চৌকাটে ধাক্কা লাগিয়া ফাটিয়া গেল রঙ্গভূমিতে আসিয়া ব্যাপারটা কি জানি পারিয়া যে যাহার আলয়ে প্রস্থান করিল পাছে পরে সাক্ষ্য দিতে হয়! সুন্দর ধ পড়িলে বিদ্যা যেরূপ বিলাপ করিয়াছিলে তদপেক্ষা অধিকতর বিলাপ করিতে আর করিলেন। এদিকে ভট্টাচার্য্য মহাশ বিকল্পে শ্বশুর-মহাশয় এরূপ অবস্থায় কর্ত্তব্য কর্ত্তব্য স্থির করিতে বসিলেন। কিন্তু এ সম বিষয়ের উল্লেখ তাঁহার বেদেও নাই, পুরাণে নাই। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে একজ বাটী হইতে আহার করিয়া আসিয়া কহিলেন, "এ সমস্ত কাজ আপনারও নয়, আমারও নয় গবর্ণমেণ্টের আইন-কানুনের কথা আম কিছুই জানি না। জয়গোপাল আইন জানে বটে, কিন্তু তাঁহার কোন উপায় উদ্ভাব করিবার শক্তি এক্ষণে তিরোহিত হইয়াছে সুতরাং এক্ষণ যদুকে ডাকাইয়া পাঠাও। বহুকাল সরকারি চাকরি করিয়াছে; জয়গোপা উকীল বই ত নন, তিনি গবর্ণমেণ্টের ম কথা কিরূপে জানিবেন? এ সমস্ত বি

রকার-বাহাদুরের অত্যন্ত সামান্য চাকরেরা ত জানে, বড় বড় পেট-মোটা উকীলও তত নেন না।" কিন্তু যদুকে কে ডাকিতে যাইবে? াহার কথাতেই বা তিনি আসিবেন?—এই প সাত-পাঁচ ভাবিয়া, অতঃপর ভট্টাচার্য্য হাশয় ওরফে শ্বশুর-ঠাকুর উপস্থিত ব্যক্তিগণের রামর্শ-অনুসারে নিজেই আমার বাটীতে াগমন করিলেন। কাজেই, আমাকেও াসিতে হইল; এবং এই কারণ-প্রযুক্তই খন ডাক্তার-বাবুর বাটী যাওয়া আর আমার ইল না।

পাপের প্রতিফল।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

হত্যাকাণ্ড।

অতি প্রাচীনকালে সৌরাষ্ট্রদেশে বীরনগর ামে এক প্রসিদ্ধ জনপদ ছিল। ঐ জনপদে আর্য্য ও অনার্য্য উভয় জাতীয় জনগণ বাস করিত। বাণিজ্য-ব্যপদেশে দূর-দূরান্তর হইতে নানা জাতীয় লোকে নগরটি সর্ব্বদা পূর্ণ থাকিত। নগরটি সৌরাষ্ট্র রাজের অধীনে এক-জন শাসনকর্ত্তা কর্ত্তৃক শাসিত হইত। বিদে-শীয় লোকদিগের জন্য নগরে অসংখ্য পান্থ-নিবাস। যাতায়াতের সুবিধার জন্য অসংখ্য শকট। ফলতঃ নাগরিকগণের সুখসচ্ছন্দের জন্য কোন অভাবই ছিল না।

জ্যৈষ্ঠ মাস। সূর্য্য অস্তগত হইয়াছেন। পৃথিবী শীতল হইতে আরম্ভ হইয়াছে। পূর্ব্ব-গগণে পূর্ণচন্দ্র উদিত হইয়া শীতল সুধাংশু, বিতরণে তাপিত জীবকুলকে শীতল করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। নগরের সম্ভ্রান্ত জনগণ দিনান্ত-সময়ে সান্ধ্য-সমীর-সেবনে শ্রান্তিদূর-মানসে কেহ বা নগরোপকণ্ঠস্থ কেহ বা নগর-মধ্যস্থ উদ্যান-নিচয়ে ভ্রমণে প্রবৃত্ত হইয়া-ছেন। এমন সময়ে কোন পণ্যজীবী শকটবান

তাহার শকট লইয়া নগরান্তর হইতে বীরনগরে আসিতেছিল।

রাত্রি প্রায় একপ্রহর হইয়াছে। এমন সময়ে নগর-প্রান্তস্থিত একটি শৌণ্ডিকালয়ের অদূরে রাজপথের পার্শ্বদেশে একটি যুবক পতিত রহিয়াছে। পার্শ্বে আর একটি যুবক দণ্ডায়মান। এমন সময়ে পূর্ব্বকথিত শকট-খানি সেইপথে উপস্থিত হইল। যুবক শকট-বানকে ডাকিয়া বলিলেন,—"তুমি কোতোয়া-লীর গলিতে যেতে পার্‌বে?"

শকটবান বলিল,—"আমার আড্ডাই ত কোতোয়ালীর কাছে!" এই বলিয়া সে গাড়ী রাখিল। তখন সেই যুবক ভূপতিত যুবকটিকে উত্তোলন করিলেন। তাহাকে তুলিবামাত্র সে মদোন্মত্ত স্বরে বলিল,—"তুমি!" উত্তোলন-কারী যুবকও সাশ্চর্য্যে—"তুমি!"—এই বাক্য বলিয়া তাহাকে সেইস্থানে রাখিয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

ঐ নগরে নিয়ম ছিল কোন শকটবান মদোন্মত্ত সংজ্ঞাহীন কোন ব্যক্তিকে কোতো-য়ালীতে উপস্থিত করিলে, অর্দ্ধমুদ্রা পারি-তোষিক পাইত। পুরস্কার-লোভে শকটবান ঐ যুবাকে শকট-মধ্যে উঠাইল। এমন সময়ে একজন যুবক ত্রস্তপদে তাহার পশ্চাতে উপস্থিত হইল।

শকটবান পশ্চাতে চাহিয়া দেখিয়া বলিল, —"আপনি এসেছেন?"

যুবক অল্পোচ্চস্বরে বলিল,—"হাঁ।"

শকটবান।—আপনিও তবে সঙ্গে যাবেন?

যুবক পুনরায় অল্পোচ্চস্বরে "হাঁ" বলিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

শকট চলিতে লাগিল। শকটবান পৌর্ণ-মাসী রজনীতে সুধালোকে পুলকিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে গান করিতে করিতে শকট চালনা করিতে লাগিল। শকট এক পথ হইতে অন্য পথে চলিতে চলিতে কিয়ৎক্ষণ পরে নগরমধ্যস্থ

রাজোদ্যান-সমীপে উপনীত হইল। তখন শকট-মধ্যস্থ যুবা বলিল,—"গাড়ী রাখ।"

গাড়ী থামিল। যুবক গাড়ী হইতে নামিয়া বলিল,—"মনে করেছিলাম সঙ্গে করে বাসায় পৌঁছে দিব। কিন্তু এখন একটু হুস্ হয়েছে; তাই আমায় সঙ্গে যেতে নিষেধ করচে। তুমি কোতোয়ালীর গলিতে নিয়ে যাও; সেইখানে এর বাসা।"

এই বলিয়াই, যুবক দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

রাত্রি প্রায় দেড় প্রহর হইয়াছে। এমন সময়, শকট কোতোয়ালীর গলীতে উপস্থিত হইল। শকটবান আপনার আসন হইতেই জিজ্ঞাসা করিল,—"মশাই, আপনার বাসা কোথায়?"

কিন্তু কেহ কোন উত্তর দিল না।

উত্তর না পাইয়া শকটবান ভাবিল, বুঝি আরোহী নিদ্রিত হইয়াছে। অতএব গাড়ী হইতে নামিয়া দ্বারদেশে আগমনপূর্ব্বক জিজ্ঞাসিল,—'মশাই, আপনার বাসা কোথায়?"

কোনই উত্তর নাই। কয়েকবার এইরূপ নিস্ফল ডাকাডাকির পর, অগত্যা আরোহীর গাত্রে হস্তার্পণ করিয়া ডাকাই যুক্তিযুক্ত ভাবিয়া, যেমন গাত্রে হস্তার্পণ করিয়াছে, অমনি দেহ স্থানচ্যুত হইয়া পতিত হইল। এ কি? আরোহী কি মদের প্রভাবে একেবারে সংজ্ঞাহীন? না! এই যে সর্ব্বাঙ্গ হিম—নাকে নিঃশ্বাস নাই! নিশ্চয়ই আরোহীর মৃত্যু হইয়াছে!

অদূরে কোতোয়ালী। শকটবান শকট লইয়া কোতোয়ালীর সম্মুখে উপনীত হইয়া প্রধান কোতোয়ালকে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বলিল। শকটবানের নাম ও আবাস-স্থানের ঠিকানার সহিত তাহার সমস্ত বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া তাহাকে সে রাত্রের মত বিদায় দেওয়া হইল।

মৃতদেহ কোতোয়ালীতেই রহিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিবরণী।

পরদিন প্রাতঃকালে বীরনগরের একটি ইষ্টক-নির্ম্মিত গৃহের এক প্রকোষ্ঠে একজন মধ্য-বয়েসী পুরুষ উপবিষ্ট আছেন। সম্মুখে একখানি কাগজে কি লেখা রহিয়াছে!

পুরুষটির দেহ কিছু খর্ব্ব! গঠন বলিষ্ঠ। মুখশ্রী নিতান্ত সুশ্রী নয়। বর্ণ শ্যাম। বয়স অনুমান চল্লিশ। তিনি অস্ফোচ্চস্বরে বলিলেন,—

—"এইত সম্মুখে কার্য্য-ক্ষেত্র! এখন কি হয়, দেখা যাক! গাড়োয়ানের বিবরণ-মত যে পর্য্যন্ত জানা গিয়াছে, তাতে যে অনুসন্ধান ক'রে কিছু ফল হবে এমন বোধ হয় না। কিন্তু চেষ্টার ত্রুটি করা হবে না। যদি কৃতকার্য্য হতে পারি, বুঝ্‌বো, এতদিনে আমার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হয়েছে। গাড়োয়ানের কথিত বিবরণটাই আর একবার ভাল করে দেখা যাক।" এই বলিয়াই, অস্ফোচ্চস্বরে তিনি পড়িতে লাগিলেন,—

"আমার নাম মঙ্গনদাস। পিতার নাম দুলাল দাস। আমার বয়স সাতাশ বৎসর। আমি গাড়ীর ব্যবসায় করি। আমার দুইখান গাড়ী আছে। একখানা আমি নিজে চালাই, আর একখানা আমার ভাইপো চালায়। আমার ভাইপো আমার বাড়ীতেই থাকে। তাহার পিতা জীবিত নাই। কাল সন্ধ্যার সময় আমি সৌরাঠ থেকে ফিরে আস্‌ছি, এমন সময়ে দেখ্‌লাম, রামদুলালের মদের দোকানের কাছে রাস্তার ধারে একজন মাতাল হয়ে পড়ে রয়েছে, আর একজন তার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। যে দাঁড়িয়ে ছিল, সে আমার গাড়ী দেখে আমায় ডেকে বল্লে,—'তুমি আমাদের দু'জনকে কোতোয়ালীর গলীতে নিয়ে যেতে পারবে?' আমি বল্লাম,—'কেন পার্‌বো না মশাই, আমার আড্ডাই তো কোতোয়ালীর কাছে।'

এই কথা বলে, আমি গাড়ী রাখ্‌লাম। সেই লোকটি মাতালটিকে তুল্‌তে গেল। মাতাল রেগে তার মুখের পানে কটমট করে চেয়ে বল্লে,—'তুমি!' তাইতে সে লোকটি তাকে সেই খানে ফেলে রেখে চলে গেল। মাতালটাকে আমি কোতোয়ালীতে আনবার জন্য নিজে নেমে গাড়ীতে উঠালাম; এমন সময় দেখি, সেই লোকটি আবার ফিরে এসেছে। আমি জিজ্ঞাসা কর্‌লাম,—'আপনি কি এঁর সঙ্গে যাবেন!' তাতে সে 'হাঁ' বলে গাড়ীতে উঠ্‌লো। আমিও গাড়ী চালিয়ে দিলাম। রাজবাগানের গলীর পথে আসবামাত্র সেই লোকটি বললে,—'গাড়ী রাখো। আমি মনে করেছিলাম একে বাসায় পৌঁছে দিব; কিন্তু এখন এর জ্ঞান হয়েছে, আমার আর সঙ্গে যাবার দরকার নেই। আমার বাড়ী ভিন্ন পথে, তুমি কোতোয়ালীর গলিতে একে নিয়ে যাও; সেই গলিতেই এর বাড়ী।' এই কথা বলে সে গাড়ী থেকে নেমে বাগানের ভিতর দিয়ে চলে গেল! আমি এই গলির মুখে এসে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম,—'মশাই, আপনার বাসা কোথা!' কিন্তু অনেক ডাকাডাকিতেও উত্তর না পেয়ে নেমে দেখি, মানুষটি মরে রয়েছে—মুখে একখানা কাপড় বাঁধা! তাই তাড়াতাড়ি তাকে এখানে এনেছি। আমি গরীব মানুষ; দিন আনি দিন খাই; এমন বিপদে কখনূ পড়ি-নি।"

গাড়োয়ান হত্যাকারীর চেহারা এইরূপ বর্ণনা করিল,—"গৌরবর্ণ! একহারা। অল্প অল্প গোঁফ আছে। সাদা পায়-জামা ও গোলাপী চাপকান পরা। মাথার পাগড়ী কতকটা দাড়ীর উপর দিয়া ঘুরাইয়া বাঁধা। বয়স পঁচিশ-তিরিশ হইবে।"

পাঠ সমাপ্ত হইলে, তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন,—"এই বর্ণনানুসারে ও লোক খুঁজে বার করা বড় সোজা কথা নয়। বীরনগরের বার আনা লোক আজকাল সন্ধ্যার সময় গোলাপী বা হলদে রঙের পাতলা চাপকান গায় দিয়ে বাহির হয়। আকৃতি যা বলেচে, তাতে আমার রঙ্ ফরসা হ'লে, আমিও 'ঐ' বর্ণনায় মিলতাম। এখন দেখা যাক, এইতে থেকেই যদি সূত্র পাওয়া যায়।" এই বলিয়া তিনি একাগ্রচিত্তে অনেকক্ষণ কাগজখানি দেখিলেন। দেখিয়া বলিলেন,—"হত্যাকাণ্ডে নিশ্চয়ই স্ত্রীলোকের সংস্পর্শ আছে। লোকটা কে? যে খুন কর্‌লে, তার খুন করায় স্বার্থ কি? যাই, এখন কোতোয়ালীতে গিয়ে দেখি, যদি হতব্যক্তির কাপড়-চোপড়ে বা সঙ্গে অনুসন্ধানের কোন সূত্র পাওয়া যায়। হয়ত মৃত ব্যক্তির আত্মীয়গণের কেউ না কেউ কোতোয়ালীতে এসেছে। আর বিলম্ব করা উচিত নয়।" এই বলিয়া ভৃত্যকে সাবধানে থাকিতে বলিয়া প্রস্থান করিলেন!

বাঙ্গালার বিবরণ।

ভূমিকা।

ইংরাজেরা যে প্রণালীতে স্বদেশ ও বিদেশের ইতিহাস লিখিয়া থাকেন, ঠিক সেই প্রণালীতে বাঙ্গালা-ভাষায় বাঙ্গালার ইতিহাস আজিও লিখিত হয় নাই। যদিও কেহ কেহ সম্প্রতি এবিষয়ে কথঞ্চিৎ মনোযোগী হইয়াছেন, তথাপি তাহা কখনই পর্য্যাপ্ত বলা যাইতে পারে না! স্বদেশীয় অপেক্ষা বিদেশীয়গণের এবিষয়ে অধিকতর অনুরাগ দেখিতে পাই। দৃষ্টান্ত-স্থলে 'হণ্টার' সাহেব প্রভৃতির নাম উল্লেখ-যোগ্য! তাঁহারা ভিন্ন-দেশীয় হইয়াও, আমাদের দেশের পুরাবৃত্ত-উদ্ধারের নিমিত্ত প্রাণপণে যেরূপ যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তাহার গুণানুবাদ না করিলে আমাদিগকে অকৃতজ্ঞতা-দোষে দূষিত হইতে হয়।

সে যাহা হউক, বিদেশীয়দিগের নিকট হইতে এই মহোপকার প্রাপ্ত হইয়া আমরা

আপনাদিগকে এক্ষণে যে লজ্জিত জ্ঞান করিতেছি,—ইহাও সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে। এবং সেই লজ্জার পরিণাম,—স্বাধীন-ভাবে স্বদেশীয়-তত্ত্বের গবেষণা ও ইতিহাস লিখিবার প্রবৃত্তি!

পাশ্চাত্য সুধীগণের মধ্যে, হণ্টার সাহেব আমাদের পরম উপকারক; সুতরাং অধিকতর কৃতজ্ঞতা-ভাজন। তিনি অশেষ যত্নে, ভারতের ইতিহাস সংগ্রহ করিয়াও ক্ষান্ত হন নাই। বঙ্গদেশের প্রত্যেক জেলা, প্রত্যেক অজ্ঞাত পল্লীর বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিতে প্রাণপণে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। কিন্তু, বিদেশীয় বলিয়া, অনেক বিষয়ের অনুসন্ধানে তাঁহার অনেক অসুবিধা ঘটিয়াছিল। আমরা যথাসাধ্য তাঁহার সেই অসুবিধা পরিপূরণ-স্বরূপ অনেক বিষয় নূতন লিখিব, কোন কোন বিষয় বা তাঁহার বর্ণনার উপর সংযোজন করিব, আর স্থল-বিশেষে বা তাঁহার অনুসরণ করিব।

আমাদের অবলম্বিত ব্রত যেরূপ গুরুতর, তাহাতে একেবারে সমস্ত বর্ণনা কেহ প্রত্যাশা করিতে পারেন না। সম্প্রতি আমরা 'বর্দ্ধমান'-জেলার প্রসঙ্গ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

বর্দ্ধমান।

হণ্টার সাহেব বলিয়াছেন, ১৫৭৪ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমানের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মুসলমানদের ইতিহাসে উহা প্রথম উল্লিখিত হইয়াছিল। ঐ সময় যুবরাজ দাউদ, বর্দ্ধমানে পলায়ন করেন। তথায় তিনি আকবরের সৈন্য কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন।

হণ্টার সাহেবের ঐ পর্য্যন্তই সীমা। কিন্তু আমরা সন্ধান পাইয়াছি; ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দের বহু পূর্ব্বেও বর্দ্ধমানের অস্তিত্ব ছিল। কেন-না, ঐ সময়েই উহার অধীনস্থিত খানাকুল কৃষ্ণ-নগরে সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। যখন অধীনস্থ স্থানের সত্তা নিরূপিত হইতেছে, তখন তাহার মূলভূমি বর্দ্ধমান-প্রদেশের অস্তিত্ব ছিল না, কেমন করিয়া বলিব? ইহার বিচার কিছু দীর্ঘ হইবে। অতএব স্বতন্ত্র প্রস্তাবে বিস্তারিত ভাবে তাহার আলোচনা করিব।

(ক) ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে পঞ্জাবের অধিবাসী আবু রায়, বাণিজ্যোপলক্ষে আসিয়া বর্দ্ধমানে বাস করেন। এসংবাদ, রাজপরিবারের নিকট হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। আবু রায়ের পুত্র বাবু রায় সম্রাটের সম্মতিক্রমে বর্দ্ধমানের করধার্য্য করিয়া লন। এই সময় হইতে উক্ত স্থানের আধিপত্য, তাঁহার করায়ত্ত হইয়াছিল। বাবু রায়ের তনয় ঘনশ্যাম। তাঁহার সময়ে উক্ত প্রদেশের কোন উন্নতির কথা শুনিতে পাই নাই। ঘনশ্যাম-নন্দন কৃষ্ণরাম রায় ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে ঔরঙ্গজীবের সকাশ হইতে 'ফরমান' প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বর্দ্ধমান অঞ্চল, মুসলমান বাদশাহ ও নবাবের করায়ত্ত থাকে। বর্দ্ধমানের রাজগণ, তখন তাঁহাদের শাসনায়ত্ত ছিলেন। ১৭৬০ খৃষ্টিয় সালে উহা 'ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির' অধিকার-ভুক্ত হয়। তখন বর্দ্ধমানের সীমার ভিতর বাঁকুড়া ও হুগলী এই প্রদেশ-দ্বয়ও অনুভুক্ত ছিল। তৎকালে বাঁকুড়ার নামান্তর "পশ্চিম বর্দ্ধমান" ছিল। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে হুগলী স্বতন্ত্র জেলায় পরিগণিত হইতে থাকে। বর্দ্ধমান অঞ্চল কত বড় ছিল, তাহা দেখাইবার জন্য একটি কথা বলিতে চাই। হুগলী-প্রদেশ পৃথক হইয়া গেলেও, বর্দ্ধমানের পরিমাণ পূর্ব্বাপেক্ষা ৩২২ ক্রোশ বাড়িল। পূর্ব্বে ১৪৩২ ক্রোশ ছিল; তৎপরে ১৭৯৪ ক্রোশ হইয়া গেল। ঐরূপ বৃদ্ধি কোথা হইতে হইল, এই প্রশ্ন হইতে পারে। মানভূম, বাঁকুড়া ও হুগলী জেলার পরিত্যক্ত কোন কোন ভূভাগ সংযোজিত হওয়ায়, উহার আয়তন বাড়িয়া উঠিয়াছিল।

(খ) খৃষ্টিয় ১৪২৮ শাকে সাজাহান বাদশা

বর্দ্ধমান অবরোধ করেন। ইতিহাসে বর্দ্ধমানের এই দ্বিতীয়বার উল্লেখ।

(গ) ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে 'আইন আকবরিতে' বর্দ্ধমান নির্দ্দেশিত হইয়াছে। ঐ পুস্তকে "সরকার সরিফাবাদের পরগণা" বা "মহাল" নামে উহা অখ্যাত হইয়াছে। উহাতে লিখিত আছে, বর্দ্ধমানের উত্তর সলিমাবাদ গ্রাম।

(ঘ) ১৭২২ খৃষ্টির অব্দে বর্দ্ধমান, নবাব জাফর খাঁর করতল-গত হয়। জাফর খাঁর নাম অনেকের অপরিচিত থাকা বিচিত্র নয়। কেন-না, তাঁহার সর্ব্বসাধারণ জ্ঞাত আখ্যা মুর্শিদকুলি খাঁ। তিনিই প্রথমে বর্দ্ধমানকে "চাকলে" সংজ্ঞায় নির্দ্দেশ করেন।

বর্দ্ধমান-প্রদেশের চতুঃসীমার বর্ণনা করিয়া আমরা অন্যান্য বিষয়ে মনোযোগ করিব।

বর্দ্ধমান-প্রদেশের উত্তর-সীমায় সাঁওতাল-পরগণা, বীরভূম-জেলা, মুর্শিদাবাদ-জেলা ও অজয় নদী; পূর্ব্ব-সীমায় নদীয়া-জেলা ও ভাগীরথী; দক্ষিণ-সীমায় নদীয়া ও হুগলী-জেলা; পশ্চিম-সীমায় বাঁকুড়া ও মানভূম জেলা, বরাকর ও দামোদর নদী।

বর্দ্ধমান-প্রদেশ, ভাগীরথীর পশ্চিমদিকে অবস্থিত। বর্দ্ধমান চাকলের অধীনে অনেক উত্তম উত্তম গ্রাম ও ছোট-বড় নগর আছে। ইহার প্রধান সহর বর্দ্ধমান। তথায় তত্রত্য রাজ-পরিবারের বসতি-স্থান নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। কাটোয়া, কাল্না, কাঞ্চন-নগর, বুদ্-বুদ, চম্পাই, বনপাশ, খানাকুল-কৃষ্ণনগর ইত্যাদির নাম উল্লেখ-যোগ্য। এক্ষণে কাঞ্চন-নগর ও বনপাশ, ছুরি, কাঁচি, কুলুপ প্রভৃতি লৌহময় অস্ত্র-শস্ত্রের নিমিত্ত খ্যাত। পূর্ব্বে কাঞ্চননগরে পিত্তল ও কাঁসার বাসন প্রস্তুত হইত। তজ্জন্য উহা প্রসিদ্ধ ছিল। চম্পাই গ্রামে চাঁদ সওদাগরের নিবাস ছিল। নিজ বর্দ্ধমানে রাজ-পরিবারের নির্ম্মিত বিস্তর দেব-দেবীর মন্দির রহিয়াছে। বর্দ্ধমানের "সর্ব্ব-মঙ্গলার" মন্দিরের প্রশংসা সর্ব্বজন-জ্ঞাত। এখানকার পুষ্করিণী, দীর্ঘিকা, সায়র ইত্যাদি জলাশয় যেমন সুদৃশ্য, তেমনই স্বচ্ছ সলিল-বিশিষ্ট ও তেমনই স্বাস্থ্যকর। তত্রত্য বাঁকা নদীর জল, লোকের বড়ই উপকারী; সুতরাং প্রিয় ছিল। মেলেরিয়ার উপদ্রবে ১২৭৭ সাল হইতে তাহার সে গৌরব বিনষ্ট হইয়াছে। ঐ কারণে সংক্রামক রোগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। এখানকার উদ্যানও অল্প প্রশংসনীয় নয়। এখানে উত্তম চিত্রশালিকা আছে। 'গোলাপ বাগ' একটী দর্শনীয় বস্তু! "গোলোক ধাঁধাঁ" দেখিয়া ধাঁধাঁ ভোগ করিতে না হয়, এমন দর্শকের সংখ্যা নিতান্ত বিরল। বর্দ্ধমানই বঙ্গীয় কবি-কেশরী ভারত-চন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের রঙ্গভূমি। সেজন্যও ইহা বিখ্যাত বটে। সময়ান্তরে সে সকল রহস্যও উদ্ঘাটিত হইবে।

বর্ণমালা-রহস্য।

"সংস্কৃত-বর্ণমালার পরিপাটী যেমন আশ্চর্য্য, তেমনি মনোহর। আমি অন্য-অন্য বর্ণমালা যতদূর জানি, তাহার কোন বর্ণমালাতেই সুপরিপাটী ত দূরে থাকুক, আদৌ কোন ক্রম-নির্ণয় আছে বলিয়া বিবেচনা হয় না। ইংরেজী, ফরাসী প্রভৃতি অনেকগুলি ইউরোপীয় ভাষাতে যে বর্ণমালার প্রয়োগ হয়, তাহা রোমক বর্ণমালা। সে বর্ণ-মালার আদ্য-অক্ষর—"এ" বা "অ"; দ্বিতীয় অক্ষর "ব"; তৃতীয় "স" বা "ক";—ইত্যাদি। গ্রীক-বর্ণমালাতে প্রথমে "অ" বা "আ"; তাহার পর "ব"; তাহার পর "গ";—ইত্যাদি। আরবী, ফার্সী, হিব্রু প্রভৃতি বর্ণমালাতেও ঐরূপ অ, ব, প, ত,—ইত্যাদি। কোন বর্ণমালাতেই কোন নৈসর্গিক ক্রম পরিলক্ষিত হয় না;—এমন কি, স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণের পৃথক্ পৃথক্ সমাবেশ পর্য্যন্ত নাই। আধুনিক ভাষায় যাহাকে বিজ্ঞান

বলে, বর্ণমালার এইরূপ ক্রম-হীনতা-দোষকে সে ভাষাতে বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ বলিতে হয়। কেবল সংস্কৃত-বর্ণমালাতেই সে দোষ নাই। ইহা গৌরবের কথা, সুতরাং আনন্দের কথা।

সংস্কৃত-বর্ণমালার ক্রম-সজ্জাতে আশ্চর্য্য নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। কি হেতু যে এরূপ ক্রম-ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহা নিশ্চয় জানি না। আমি যে হেতু নির্দ্দেশ করিব—তাহা আমারই কল্পিত। শব্দ-শাস্ত্রের পারদর্শী পণ্ডিতেরাই বিবেচনা করিতে পারিবেন যে, আমার কৃত হেতু-নির্দ্দেশ বাস্তবিক শাস্ত্র-সঙ্গত বটে কি না। যদি শাস্ত্র-সঙ্গত হয়, তাহা হইলে আমি আমাকে পরম সৌভাগ্যশালী বলিয়া বিবেচনা করিব।

কিন্তু বিষয় বড় নীরস। এমন প্রসঙ্গ কয়জন পাঠকের ভাল লাগিবে, জানি না। ফলত দুইচারি জনেও ইহার যদি আলোচনা করেন, তাহা হইলে আমার পরম সুখের বিষয় হইবে।

বলিয়াছি যে, সংস্কৃত-বর্ণমালায় নৈসর্গিক পরিপাটী আছে। ইহার অর্থ এই যে, বাগ্‌যন্ত্রের গঠন-অনুসারে যে ধ্বনির পর যে ধ্বনি উচ্চারিত হইতে পারে, সংস্কৃত-বর্ণমালায় ঠিক সেই ধ্বনির পর সেই ধ্বনি সাজান আছে। আবার ভাষাতে ঠিক যতগুলি ধ্বনির প্রয়োজন হয়, বর্ণসংখ্যাও ঠিক ততগুলি! অভাব নাই, আধিক্য নাই, অক্রম নাই। কথাটা পরিষ্কার করিয়া বুঝাইবার জন্য, বাগ্‌যন্ত্রের একটু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক।

কণ্ঠনালীর যে স্থানে জিহ্বামূল সংযোজিত আছে, সেইস্থান হইতে ওষ্ঠপ্রান্ত পর্য্যন্ত বাগ্‌যন্ত্রের স্থান। এই স্থানটী বক্রগাত, ইহা বলাই বাহুল্য; অর্থাৎ কণ্ঠনালী হইতে তির্য্যগ্‌ভাগে কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধগামী হইয়া ক্রমশঃ ঊর্দ্ধে যাইতে যাইতে, তাহার পর ক্রমে আবার অধোমুখ হইয়া, খিলানের মত হইয়া আছে। উদানবায়ু কণ্ঠনালী হইতে পরিচালিত হইয়া, এই স্থান দিয়া নির্গত হইলে, যে স্ফুট ধ্বনিসকল উচ্চারিত হইতে পারে, একটী বর্ণ সেই সেই ধ্বনির দ্যোতক। কিন্তু উদানবায়ু, সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে অথবা একেবারে যেমন ওষ্ঠপ্রান্ত দিয়া নির্গত হইতে পারে, সেইরূপ সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে ওষ্ঠপ্রান্তে না আসিয়া নাসা-গহ্বরের মূলদেশে প্রবেশ করিয়া ঘুরিয়া আসিতে পারে। যথাস্থানে একথা আরও স্পষ্টতর করা যাইবে।

এই যে, কণ্ঠনালী হইতে ওষ্ঠ পর্য্যন্ত স্থানের পরিচয় দিয়াছি,—ঐ স্থানের মধ্যে নানাপ্রকার অভিঘাত-জন্য ধ্বনির প্রভেদ হইয়া থাকে। জিহ্বার সাহায্যেই সেই অভিঘাত হয়। অর্থাৎ উদানবায়ুকে হয় অবাধে নির্গত হইতে দেওয়া হয়, নচেৎ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে জিহ্বার সাহায্যে বাধা দিয়া অভিহত করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন রূপ করা হয়। ধ্বনিভেদের ইহাই কারণ।

এই অভিঘাত-স্থান পাঁচটী। প্রথম অভিঘাত কণ্ঠে; দ্বিতীয় অভিঘাত তালুতে; তৃতীয় অভিঘাত—ঐ যে খিলানের কথা বলিয়াছি, ঐ খিলানের মাথায় অর্থাৎ মূর্দ্ধায়। চতুর্থ অভিঘাত-স্থান,—দন্তে বা দন্তমূলে। পঞ্চম ওষ্ঠে। বিশেষ প্রণিধান করিয়া দেখুন, এই পঞ্চাতিরিক্ত অভিঘাত-স্থান হইতেই পারে না। তাহা হইলেই বুঝা গেল যে, সমুদায় স্ফুটধ্বনি পাঁচ শ্রেণীতেই বিভক্ত। এই শ্রেণীকে সংস্কৃত-ভাষায় বর্গও বলে। অর্থাৎ উৎপত্তি-স্থান বা অভিঘাত-স্থান বিবেচনা করিলে, স্ফুটধ্বনি পাঁচ-জাতীয় হইতে পারে;—কণ্ঠ্য, তালব্য, মূর্দ্ধন্য, দন্ত্য, এবং ওষ্ঠ্য। যাহা ধ্বনি, তাহারই দ্যোতক-চিহ্নের নাম বর্ণ। সুতরাং বর্ণও ঐ পাঁচপ্রকার হইল,—কণ্ঠ্য, তালব্য ইত্যাদি।

এখন আর একভাবে দেখুন, ধ্বনি দুই প্রকার। প্রথম প্রকার—স্বয়ংসিদ্ধ স্ফুটধ্বনি। অর্থাৎ অভিঘাতস্থানে উদানবায়ুকে ঐ-অভিঘাতস্থান-সম্ভব-মূর্ত্তি দিয়া নির্গত করিলে এ

প্রকার স্ফুটধ্বনি শ্রোতার শ্রুতিগোচর হয়। এই স্বয়ংসিদ্ধ ধ্বনিগুলিকে এবং তদ্যোতক বর্ণগুলিকে স্বর বলে। আর একপ্রকার অভিঘাতে যে ধ্বনি সম্ভবে, তাহা স্বরবর্ণের সাহায্য-ব্যতীত স্ফুট হইতে পারে না। যতক্ষণ তাহাতে স্বর-সংযোগ না করা যায়, ততক্ষণ সে ধ্বনি অভিঘাত-স্থলে আবদ্ধ হইয়া থাকে। স্বরের সাহায্য পাইবামাত্র স্ফুটমূর্ত্তিতে শ্রুতিগোচর হয়। এই সকল বর্ণকে ব্যঞ্জন বর্ণ বলে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে, ধ্বনি ও বর্ণ অভিঘাত-স্থানভেদে পাঁচ জাতীয়। এখন দেখিবেন, স্বরও পাঁচ জাতীয়, ব্যঞ্জনও পাঁচ জাতীয়। অর্থাৎ কতকগুলি স্বর কণ্ঠ্য, কতকগুলি তালব্য, কতক মূর্দ্ধন্য ইত্যাদি। ব্যঞ্জন বর্ণও ঐরূপ।

প্রথমে ধরুন, স্বর। অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৠ ঌ ৡ, এ, ঐ, ও, ঔ, ং, ঃ,—সংস্কৃত বর্ণমালায় এই ষোলটী স্বরবর্ণ আছে।

অ, কণ্ঠ্য স্বর। দুঃখের বিষয় এই যে, বাঙ্গালীরা ইহার প্রকৃত উচ্চারণ করেন না। স্বভাবতঃ কণ্ঠ হইতে অবাধে যে ধ্বনি উৎপন্ন হইয়া উচ্চারিত হয়, তাহাই অ। হিন্দুস্থানীরা, 'যব্' 'তব্' ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণ করিলে যে স্বর-ধ্বনি শ্রুতিগোচর হয়, তাহাই অকারের প্রকৃত উচ্চারণ। ইংরেজীতে But শব্দে u বর্ণের যেরূপ উচ্চারণ, তাহাই অকারের প্রকৃত উচ্চারণ। অবিকারে কিঞ্চিৎ মুখব্যাদান করিয়া, অল্পমাত্র কণ্ঠধ্বনি করিয়া দেখুন, যে স্ফুটধ্বনি হইবে, তাহাই অ। আমরা যে ভাবেতে অকারের উচ্চারণ করি, তাহাতে ঈষৎ ওষ্ঠ-প্রদেশের সাহায্য লইতে হয়; নহিলে অমন অকারের উচ্চারণ করা যায় না। বোধ হয়, এইজন্যই বাঙ্গালা অকারের তুল্য উচ্চারণ ইংরেজীতে লিখিতে হইলে a w কিংবা a u কিংবা o u ইত্যাদি বর্ণ সংযোগ করা হইয়া থাকে। u এবং w ওষ্ঠ্য বর্ণ। আরও এক পরিচয় দিলে সংস্কৃত অকারের প্রকৃত-উচ্চারণ বুঝিতে পারা যাইবে। স্বরগুলি মাত্রাভেদে হ্রস্ব দীর্ঘ হয়। অর্থাৎ স্বল্প সময়ে উচ্চারণ শেষ করিলে যে ধ্বনি হয়, তাহা হ্রস্ব ধ্বনি। এই উচ্চারণ-কালকে মাত্রা বলে। সুতরাং হ্রস্ব স্বর হইল একমাত্র। দ্বিগুণ সময় দিয়া সেই স্বরকে উচ্চারণ করিলেই স্বর দীর্ঘ হয়। তবেই দীর্ঘ স্বর দ্বিমাত্র হইল। হ্রস্ব স্বর উচ্চারণ করিতে যতটুকু সময় লাগে, আর ততটুকু সময় পর্য্যন্ত সেই স্বরের উচ্চারণ বজায় রাখিলে তাহাই দীর্ঘ স্বর হইয়া পড়ে। এখন দেখুন,—অকারের দীর্ঘ আ। আ দ্বিমাত্র। আকারকে একমাত্র করুন, প্রকৃত সংস্কৃত অকার উচ্চারিত হইবে। বাঙ্গালীর ছেলেরা স্বরসন্ধিতেও যে বিব্রত হয়, তাহার এক মাত্র কারণ এই যে, তাহাদিগকে অকারাদির প্রকৃত উচ্চারণ শিখান হয় না। বালকদিগকে জোর করিয়া বলিয়া দেওয়া হয় যে, "অকারের পর অকার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া আকার হয়" ইত্যাদি। অকারে-অকারে আকার ভিন্ন যে আর কিছু হইতেই পারে না, এটুকু তাহাদিগকে দেখাইয়া দেওয়া হয় না—বুঝাইয়াও দেওয়া হয় না।

এখন আমরা দুইটী কণ্ঠ্য স্বর প্রথমে পাইলাম—অ, আ,।

কণ্ঠের পরেই দ্বিতীয় অভিঘাত-স্থান তালু। তালব্য স্বর,—ই; তাহাই দ্বিমাত্র করিলে,—ঈ হইল। পাইলাম অ, আ, ই, ঈ।

ইকার উচ্চারণের স্বরূপ স্পষ্ট করিয়া বুঝানও একটু কঠিন। নিজে মনোযোগ দিয়া ইকার-উচ্চারণ-কালে অভিঘাতের প্রতি লক্ষ্য করিলেই ইহা বুঝা যায়। অবিকারে ওষ্ঠাধর বিশ্লেষ করিয়া জিহ্বার মধ্যস্থল তালুতে আলগ্নভাবে রাখিয়া জিহ্বাগ্র নিম্ন করিয়া ধ্বনি নির্গত করিলেই ইকার উচ্চারিত হয়। জিহ্বাকে তালুতে অলগ্ন করিবার সময় জিহ্বা বিস্তার অবশ্যই অধিকতর হয়, এবং জিহ্বাগ্রও কিয়ৎ পরিমাণে কুঞ্চিত হইয়া থাকে। ইহার অধিক লিখিয়া প্রকাশ করিতে আমার ক্ষমতা নাই।

তাহার পর তৃতীয় অভিঘাত-স্থান মূর্দ্ধা। মূর্দ্ধায় জিহ্বাগ্র অলগ্ন করিয়া উদান-বায়ুকে নিঃসারিত করিলে হসন্ত র-কারের ন্যায় ধ্বনি উৎপন্ন হয়। শিশুদের কাণে আমরা যে কখন কখন "কাৃ-কুরু" দিই, তাহা প্রকৃত পক্ষে ঋ-কারেরই প্লুত উচ্চারণ। অর্থাৎ দুই মাত্রার অধিক কাল ব্যাপিয়া ক্রমিক ঋ-কারের উচ্চারণ হয় মাত্র। ছাগলকে ডাকিবার সময়ও "আর্‌র্‌র্ আয়" করিয়া যে ধ্বনি করা হয়, তাহাও কতকটা ঋকারে প্লুত উচ্চারণ। এই ধ্বনিকে হ্রস্ব অর্থাৎ একমাত্র করিয়া উচ্চারণ করিলেই ঋ-কারের স্বরূপ জানিতে পারা যায়।

চতুর্থ অভিঘাত-স্থান দন্তমূল। জিহ্বাগ্র দন্তমূলে আলগ্ন করিয়া ধ্বনি করিলেই ঌকার উৎপন্ন হয়। ইরেজীতে able, particle প্রভৃতি শব্দে লকারের যে উচ্চারণ, তাহাই ঌকারের প্রকৃত উচ্চারণ। উহারই হ্রস্ব-দীর্ঘ-ভেদে,—ঌ, ৡ।

পঞ্চম বা শেষ অভিঘাত-স্থান ওষ্ঠ। ওষ্ঠদ্বয় কুঞ্চিত করিয়া ধ্বনি করিলেই,—উ হইল। তাহাই একমাত্র-দ্বিমাত্রভেদে,—উ, ঊ হইল।

এখনও অনেকগুলি স্বর বাকি। কিন্তু সে গুলির কথা বলিবার পূর্ব্বে উকার-সম্বন্ধে যে একটু ক্রম-ভঙ্গ হইয়াছে, তাহার কারণ নির্দ্দেশ করা উচিত। সংস্কৃত বর্ণমালায় অকারের পর ইকার, তাহার পর, ঋকার, ঌকার, না হইয়া,—উকার। উকারের পরে, তবে ঋকার ঌকারের স্থান হইয়াছে। এমন হইল কেন?

স্বর-ধ্বনির লক্ষণ করিবার সময় বলিয়াছি,—যে অভিঘাত-স্থানে উদান-বায়ুকে ঐ অভিঘাত-স্থান-সম্ভব-মূর্ত্তি দিয়া যে স্বয়ংসিদ্ধ ধ্বনি উচ্চারণ করা যায়, তাহাই স্বর। স্বরের আরও এক বিশেষ এই যে, স্বর সুখ-সাধ্য হইলেই শ্রেষ্ঠ হয়। কষ্ট-সাধ্য হইলে তাহা স্বর হইয়াও নিকৃষ্ট। এখন অনুধাবন করিয়া দেখুন, ঋকার ঌকারের উচ্চারণ-কালে জিহ্বার নর্ত্তন হইয়া থাকে। নর্ত্তনে অভিঘাত-বাহুল্য আছে। সুতরাং উচ্চারণে কষ্ট-সাধ্যতা। উকারে এ ক্লেশ নাই। উকার সরল এবং সুখ-সাধ্য। সুতরাং স্বরের মধ্যে ঋকার ঌকার অপেক্ষা উকার শ্রেষ্ঠ। এই নিমিত্ত উকার ওষ্ঠ্যবর্ণ হইয়াও মূর্দ্ধন্য বর্ণের এবং দন্ত্য বর্ণের পূর্ব্বে স্থান লাভ করিয়াছে।

এইবার অ, ই, উ, ঋ, ঌ হ্রস্ব-দীর্ঘ-ভেদে দশটী স্বর যথাক্রমে পাওয়া গেল। এই দশটী স্বর অমিশ্র বা শুদ্ধ। অতঃপর মিশ্র স্বরের কথা বলা যাইতেছে। এ, ঐ, ও, ঔ—সন্ধ্যক্ষর, অর্থাৎ দুইটী স্বরের সন্ধিতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহাদিগকে সঙ্কর স্বরবর্ণও বলা যাইতে পারে। অকার, ইকারে উপগত হইয়া একার উৎপন্ন করে। একারের প্রকৃত উচ্চারণ করিতে হইলে কণ্ঠ্য-অভিঘাতের সহিত তালব্য-অভিঘাতের মিশ্রণ হয়। অকারের পর ইকার সংশ্লিষ্টভাবে উচ্চারণ করিলে, যে ধ্বনি উচ্চারণ হয়, তাহাই প্রকৃত একার। ব্যাকরণের সন্ধিসূত্রেও একথা ধরা আছে—অকারের পর ইকার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া একার হয়। মনে রাখা উচিত যে, বৈয়াকরণ মহাশয়ের শাসনেই যে এরূপ হয়, তাহা নহে; নৈসর্গিক নিয়ম-বশেই এরূপ হইয়া থাকে। এইরূপ অকারে-একারে মিলিয়া ঐকার, অকারে-উকারে মিলিয়া ওকার, অকারে-ওকারে মিলিয়া ঔকার উৎপন্ন হয়;—ইহা বেশ বুঝা যাইতেছে। মূল বর্ণের নৈসর্গিক নিয়ম-মাত্র আমরা দেখাইলাম।

এ, ঐ, ও, ঔ, সন্ধ্যক্ষর। ইংরেজীতে এরূপ অক্ষরকে dipthong বলে। সন্ধ্যক্ষরের উচ্চারণে,—স্বরদ্বয়ের পৃথক্ পৃথক্ উচ্চারণ না করিয়া, অবশ্য সংশ্লিষ্ট উচ্চারণই করিতে হয়। কিন্তু আমরা বাঙ্গালায় তাহা করি না। ঐকার ঔকার বলিবার সময় ও+ই এবং ও+উ এইরূপ উচ্চারণ করিয়া [illegible] এরূপ উচ্চারণ করা যে ভুল, ইহা বলাই বাহুল্য। উচ্চারণ ঠিক না থাকাতেই ব্যাকরণের সন্ধি-প্রকরণে বালকদের কষ্ট বোধ হইয়া থাকে।

আর সন্ধ্যক্ষর নাই কেন? তাহারও কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। সন্ধ্যক্ষরে প্রকৃত-পক্ষে বিশুদ্ধস্বরের লক্ষণ স্থির থাকে না। কেন-না, সন্ধ্যক্ষরে দুই স্বরের মিশ্রণ হইয়া থাকে। তবে শাস্ত্রানুসারে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়ের মধ্যে যেমন ব্রাহ্মণের বিশেষ সম্মান আছে, সেইরূপ আদ্যস্বর "অ" বর্ণও বর্ণমধ্যে শ্রেষ্ঠ। "অ" বর্ণকে অন্যস্বরে উপগত হইতে দিয়া উপরি-লিখিত চারিটী সন্ধ্যক্ষরকে স্বরবর্ণে স্থান দেওয়া হইয়াছে। এ, ঐ, ও, ঔ—এই চারি বর্ণের মূলেই "অ" বর্ণ আছে। "অ" বর্ণেরই এই বিশেষ অধিকার; অন্য বর্ণের ইহা নাই।

আর দুইটী বর্ণের কথা বলিলেই স্বর-প্রকরণ শেষ হয়। একটী অং অপরটী অঃ। অনুস্বার এবং বিসর্গ-সম্বন্ধে বৈয়াকরণদিগের মধ্যে কিছু মতদ্বৈধ আছে। প্রাচীনেরা এই দুইটীকে স্বরবর্ণ বলিয়া স্বীকার করেন, নব্যেরা করেন না। কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্রানুসারে ইহারা স্বরবর্ণ। দৈবাদি কর্ম্মে ইহারা স্বরেরই কার্য্য করে। সুতরাং অনুস্বার এবং বিসর্গকে স্বরের মধ্যে স্থান দেওয়াই প্রশস্ত কল্প। স্বরান্তরের সহযোগ ভিন্ন অনুস্বার বিসর্গের যে উচ্চারণ একেবারেই হয় না, তাহা নহে। সুপরিস্ফুট উচ্চারণ হয় না বটে, কিন্তু অর্দ্ধস্ফুট উচ্চারণ হয়। উদানবায়ুকে নাসারন্ধ্র মূলে আবদ্ধ করিয়া নিঃসারণ করিলেই অনুস্বারের উচ্চারণ পাওয়া যায়। অকারের আশ্রয় দিলে উচ্চারণ সুপরিস্ফুট হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অকারের বিশেষ সম্মান আছে।

অনুস্বার-সম্বন্ধে নাসারন্ধ্র মূলের যে উল্লেখ করিয়াছি, বিসর্গ-সম্বন্ধে সেইরূপ একটী বিশেষ কথা [illegible] উচ্চারণের প্রয়োজন আছে।

সে বিশেষ কথা এই,—উদানবায়ুকে বিশেষ বলসহকারে নিঃসারণ না করিলে যেরূপ সহজ স্বর পাওয়া যায়, বিশেষ বলপ্রয়োগ করিলে আর সেরূপ স্বর পাওয়া যায় না, অন্যবিধ ধ্বনি পাওয়া যায়। আমরা যখন ঈষৎ বিরক্তির ভাব প্রকাশ করি, তখন এই ধ্বনি শ্রুতি-গোচর হয়। যেমন, "অঃ কর কি,—" বলিবার সময় অঃ উচ্চারণে যে ধ্বনিটী উদিত হয়, সহজ অ বলিলে সেটুকু হয় না। ঐ যে অর্দ্ধস্ফুট মহাপ্রাণ ধ্বনি, তাহাই বিসর্গ। পরিস্ফুট করিবার জন্য অকারের আশ্রয় দিয়া বিসর্গের সামান্য পরিচয় হইয়া থাকে। ফলত অং, অঃ স্বরবর্ণমধ্যে পরিগণিত হইলেও অবিশুদ্ধ এবং নিকৃষ্ট স্বর। সেইজন্য স্বর-পর্য্যায়ের প্রান্ত-ভূমিতেই ইহাদিগকে স্থান দেওয়া হইয়াছে।

এইবার ব্যঞ্জনবর্ণ-গুলির স্থাননির্ণয় করিতে হইবে। ব্যঞ্জনবর্ণ সম্বন্ধে এই এক সাধারণ তত্ত্ব বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, স্বরের সংযোগ ব্যতীত ব্যঞ্জন একেবারেই শ্রুতিগোচর হইতে পারে না। ব্যঞ্জন-ধ্বনির উপক্রম করিয়াও যদি তাহাতে কোন স্বরবর্ণের সহযোগ না দেওয়া যায়, তাহা হইলে, সেই উপক্রমেই তাহার অবসান হইয়া পড়ে, অর্দ্ধস্ফুট ধ্বনি পর্য্যন্ত শ্রুতিগোচর হইতে পারে না। ককারের ধ্বনিতে অকারের সহযোগ আছে, সেই 'অ'-টুকু একেবারে বাদ দিলে, 'ক' সেই জিহ্বা-মূলেই পর্য্যবসিত হয়। মুখ-গহ্বরের বাহিরে আসিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে পারে না। সুতরাং সকল ব্যঞ্জনেই স্বর-সহযোগের নিতান্ত প্রয়োজন, এবং স্বর-সহযোগ-ব্যতীত ব্যঞ্জনের পরিচয় অসম্ভব হইয়া পড়ে। অতএব স্বরবর্ণ অপেক্ষা ব্যঞ্জনবর্ণ জাতিতে নিকৃষ্ট হইল। সেইজন্য প্রথমে স্বরবর্ণের স্থান, তাহার পরে ব্যঞ্জন-বর্ণের স্থান। ইংরেজীতে যেমন ছাব্বিশ বর্ণ,—যে যেখানে পায়, সেই সেখানে বসিয়া

যায়;—ar পর b, br পর c, cr পর d, dr পর e ইত্যাদি;—সংস্কৃতে সেটী হইবার যো নাই; আমাদের বর্ণমালাতেও বর্ণ-বিচার আছে।

এইবার ব্যঞ্জনবর্ণগুলির স্থান-সমাবেশের ক্রম দেখুন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, ধ্বনি নিঃসারণের প্রথম অভিঘাত-স্থান কণ্ঠ, তাহার পর তালু, তাহার পর মূর্দ্ধা, তাহার পর দন্ত, তাহার পর ওষ্ঠ। এখন বলাই বাহুল্য, কণ্ঠ-তালু প্রভৃতি অভিঘাত-স্থানের ক্রম-অনুসারেই ব্যঞ্জনবর্ণগুলির স্থান-সমাবেশ হইবে।

প্রথমে দেখুন, কণ্ঠে জিহ্বামূলে স্পর্শ করাইয়া অভিঘাত করিলে, স্বর-সাহায্যে যে সহজ ধ্বনি হয়, তাহা—ক। আরও বল প্রয়োগ করিয়া অর্থাৎ মহাপ্রাণ করিয়া উচ্চারণ করিলে সেই "ক"ই 'খ' হয়। কণ্ঠধ্বনি গদ্গদ করিয়া বলিলে, সেই "ক"ই 'গ' হয়। আবার ঐ "গ"কে মহাপ্রাণ করিলেই 'ঘ' হয়।

ঐ যে "গদ্গদ" করা আমরা বলিলাম, তাহা একটু বুঝাইবার চেষ্টা করিলে ক্ষতি নাই। যখন মন ব্যাকুল, নয়ন বাষ্পাকুল, কণ্ঠস্বর অবরুদ্ধ হইয়া আসিতেছে, তখনি গদ্গদ ভাব হয়। বালক যদি কাঁদিতে-কাঁদিতে বলে, "আমি কাঁদি নাই"; তখন আমরা শুনিতে পাই, বালক যেন বলিতেছে, আমরা "গাঁদি" নাই। বায়ু রুদ্ধ করিয়া, কণ্ঠ স্ফীত করিয়া, ঐ যে ধ্বনির উচ্চারণ, তাহাকেই গদ্গদ উচ্চারণ বলিতেছি।

এই উচ্চারণ করিবার প্রকারভেদে প্রথম বর্গের প্রথম চারিটী বর্ণ আমরা পাইলাম। সহজে—ক, তাহাই আবার মহাপ্রাণে—খ, গদ্গদে—গ, তাহাই আবার মহাপ্রাণে—ঘ। আর সেই জিহ্বামূলের অভিঘাত জন্য কণ্ঠ্য-ধ্বনিকে নাসারন্ধ্র-মূলে অবরুদ্ধ করিয়া নিঃসারণ করিলে ঙ হইবে। এই গেল—ক, খ, গ, ঘ, ঙ। এই হইল, প্রথম অথবা কণ্ঠ্যবর্গ।

ইহার পরেই দ্বিতীয় অর্থাৎ তালব্য বর্গের উপরি উক্ত নিয়মানুসারে চ, ছ, জ, ঝ, ঞ পাওয়া যাইবে। জিহ্বার প্রায় মধ্যভাগ তালুদেশে স্পর্শ করাইয়া, সেই অভিঘাতের ফলে যে ধ্বনি উচ্চারিত হয়, তাহাই তালব্য ধ্বনি,—এ কথা বোধ হয় আর না বলিলেও চলে।

তৃতীয় বর্গ—মূর্দ্ধন্য বর্ণ। জিহ্বাগ্র মূর্দ্ধাতে স্পর্শ করাইতে হয়, এবং সেই অভিঘাতে মূর্দ্ধন্য ধ্বনি হয়। কণ্ঠ্য বর্ণে যেমন "ক"কার, তালব্যবর্ণে যেমন 'চ'কার, মূর্দ্ধন্য বর্ণে সেইরূপ "ট"কার ভিন্ন সম্ভবে না। আর, উচ্চারণ-ভেদের যে নিয়ম পূর্ব্বে বলিয়াছি, তদনুসারে মূর্দ্ধন্য বর্ণে ট, ঠ, ড, ঢ, ণ—এই পাঁচ অক্ষর পাওয়া যায়।

তাহার পর দন্তে ঐরূপ জিহ্বা স্পর্শ করাইয়া তদভিহত ধ্বনিতে পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে ত, থ, দ, ধ, ন পাওয়া যায়।

আর ওষ্ঠদ্বয়ের স্পর্শাভিঘাতে যে ধ্বনি পাওয়া যায়, তাহাই পঞ্চম বা ওষ্ঠ্য বর্ণ। ইহাতে পাওয়া যায়, প, ফ, ব, ভ, ম। এই পাঁচ বর্গের ব্যঞ্জন বর্ণ ব্যতীত আরও ব্যঞ্জন আছে। সেগুলি কিন্তু স্পর্শাভিঘাত জন্য নহে।

স্পর্শাভিঘাতে জন্মে না, অথচ স্বরবর্ণে স্বরবর্ণে সন্ধ্যক্ষর হইলেও চারিটী সন্ধ্যক্ষর ব্যঞ্জনমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। সেই চারিটী য, র, ল, ব। তালব্য-স্বর—ইকার, অকারে উপগত হওয়াতে, 'য' উৎপন্ন হইয়াছে। মূর্দ্ধন্য-স্বর 'ঋকার' ঐরূপ অকারে উপগত হওয়াতে 'র' উৎপন্ন হইয়াছে। দন্ত্য-স্বর—ঌকার, অকারে উপগত হইয়া 'ল' উৎপন্ন হইয়াছে। এবং ওষ্ঠ্য-স্বর—উ, ঐরূপ অকারে উপগত হওয়াতে, ব-কার উৎপন্ন হইয়াছে। বুঝিলাম যে, প্রথমে য, তাহার পর র, তাহার পর ল, তাহার পর ব উৎপন্ন হইল। কিন্তু স্বরবর্ণে স্বরবর্ণে সন্ধি হইয়া যে বর্ণ উৎপন্ন

হইয়াছে, তাহা স্বরবর্ণের পর্য্যায়ে স্থান না পাইয়া ব্যঞ্জন-বর্ণের মধ্যে কেন আসিল, তাহা এখন বুঝিতে হইবে।

একবার ইঙ্গিতে বলিয়াছি যে, আমাদের বর্ণমালাতেও জাতিবিচার আছে। সন্ধ্যক্ষর-গুলি য, র প্রকৃত পক্ষে সঙ্কর বর্ণ। একার ওকার সঙ্কর বর্ণ; ল, ব-ও সঙ্কর বর্ণ। অকারে ইকারে মিশিয়া যেমন একার; ইকারে অকারে মিশিয়া তেমনি যকার; অথচ এ,—স্বরবর্ণ, আর য,—ব্যঞ্জনবর্ণ। এরূপ হইবারও কারণ আছে। শাস্ত্রানুসারে উচ্চবর্ণ নিম্নক্ষেত্রে উপগত হইলে, অনুলোম-সম্বন্ধ বলে; কিন্তু নিম্নবর্ণ উচ্চবর্ণে উপগত হইলে প্রতিলোম বা বিলোম সঙ্কর উৎপন্ন হয়। একারাদি স্বর সঙ্কর-বর্ণ হইলেও অনুলোম সঙ্কর, সুতরাং শ্রেষ্ঠ জাতি; তাহারা স্বরধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু যকারাদি প্রতিলোম সঙ্কর; সুতরাং চণ্ডাল-সদৃশ অধম। সেইজন্য স্পর্শাভিঘাত-জন্য বিশুদ্ধ ব্যঞ্জনের পরে য, র, ল, ব স্থান পাইয়াছে। একটা বাজে কথা এইখানে বলিয়া রাখিলে ক্ষতি নাই;—সুশিক্ষার অভিমান করিয়া যে হিন্দু-সন্তান বর্ণবিচার করেন না, আমার বোধ হয় যে, ভাল করিয়া তাঁহার বর্ণপরিচয়ও হয় নাই।

আরও ব্যঞ্জনবর্ণ আছে। তাহারা বিশুদ্ধ স্পর্শাভিঘাত-জন্য নহে, সন্ধ্যক্ষর ব্যঞ্জনও নহে, অথচ তাহারাও এক একপ্রকার ধ্বনি সিদ্ধ করে। সন্ধ্যক্ষরগুলি অবশ্য তাহাদের অপেক্ষা উচ্চস্থানীয়, এইজন্য তাহারা অন্তঃস্থ বর্ণ বলিয়াও পরিচিত। বিশুদ্ধ ব্যঞ্জনের পর এবং সেই প্রান্তবাসী ব্যঞ্জনের পূর্ব্বে অন্তঃস্থ বর্ণ—য, র, ল, ব—স্থান পাইয়াছে।

সেই প্রান্তবাসী ব্যঞ্জনগুলি উষ্ম বর্ণ। ছোট লোক কি না, একটু গরম মেজাজ, একটু কড়া-কড়া ভাব—কিছু বায়ু-বিকারে বিকৃত,—প্রান্ত-ভূমিতেই ত ইহাদিগকে স্থান দেওয়া উচিত। কিন্তু এই জাতীয় পাঁচটী বর্ণের দুইটীকে আমরা খুঁজিয়া পাই না। বোপদেব বলিয়াছেন, কপৌ-মুন্যৌ, বোধ হয়, কালসহকারে সেই দুই বর্ণ লোপ পাইয়াছে। সেইজন্য আদ্য অর্থাৎ কণ্ঠ্য বর্গের উষ্ম বর্ণ এবং অন্ত্য অর্থাৎ ওষ্ঠ্য বর্গের উষ্ম বর্ণ দেখিতে পাওয়া যায় না। এখন পাওয়া যায় কেবল, তালব্য-বর্গের উষ্মবর্ণ অর্থাৎ শ, তার পর মূর্দ্ধন্য-বর্গের উষ্ম বর্ণ অর্থাৎ ষ, তার পর দন্ত্যবর্গের উষ্মবর্ণ অর্থাৎ স।

বাকী আছেন,—হ। ঐ যে মহাপ্রাণের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তিনি পরিস্ফুট হইতে গেলেই হ হইয়া থাকেন। যেখানে বিসর্গের আলোচনা করা গিয়াছে, সেই স্থানটা দেখিলেই হ-কারের স্বরূপ বুঝিতে পারা যাইবে। মহাপ্রাণ ধ্বনি অকারে উপগত হইয়া ব্যঞ্জনভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহা এখন বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারিবেন।

তন্ত্রশাস্ত্রে অপর একটী ল আছেন। তিনি ইদানীন্তন সুশিক্ষিত সভ্যসমাজে সম্পূর্ণ অপরিচিত, সেইজন্য এ আসরে তাঁহাকে টানিয়া আনিলাম না।

আর একটী যুক্তাক্ষর—ক্ষ—ব্যঞ্জন-বর্ণের সঙ্গে বরাবরই চলিয়া আসিতেন। ইনি কেন আইসেন, তাহা জানি না; কিন্তু বিবেচনা হয় যে, এইটী না থাকিলে, বর্ণমালাই হইত না। ক্ষ যেন বর্ণমালার মেরু। আবার মালা গাঁথিতে হইলে সূত্রের দুই মুখ একত্র করিতে হয়। অকার হইতে হকার পর্য্যন্ত সূত্রে গাঁথা গিয়াছে বটে, কিন্তু মালা গাঁথিতে হইলে সূত্রের দুই প্রান্ত একত্র করিয়া বাঁধিতে হয়। কিন্তু স্বরে-ব্যঞ্জনে বাঁধা যায় না, আবার একটু সূত্রাগ্রভাগ অর্থাৎ 'ফুঁপি' না রাখিলেও বাঁধা যায় যায় না; সেইজন্যই, স্বরবর্ণ-গুলিকে বাহিরে রাখিয়া, আদ্য ব্যঞ্জন "ক" ও সর্ব্বোচ্চ উষ্মবর্ণ মূর্দ্ধন্য "ষ" একত্র করিয়া গ্রন্থি বাঁধিয়া বর্ণমালা সাঙ্গ করা হইয়াছে।

সংস্কৃত-বর্ণমালা সম্বন্ধে আমি যেরূপ কল্পনা করিয়াছি, তাহা বলিলাম। সংস্কৃত-বর্ণমালার কেমন সুন্দর কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ, কেমন চমৎকার ক্রম-পরিপাটী, তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিলাম। মূলে যাহার এই সৌন্দর্য্য, এই বৈজ্ঞানিক পারিপাট্য, তাহার অন্তস্তলে প্রবেশ করিতে জানিলে যে, পরমানন্দ-লাভের সম্ভাবনা আছে; তাহা তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিই কেবল বুঝিতে পারেন। কিন্তু কালধর্ম্মবশে দুর্ভাগ্য এবং মোহ আমাদিগকে সমাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। অমৃতভাণ্ড চূর্ণ করিয়া বিষপাত্রের জন্য আমরা ছুটাছুটি করিয়া মরিতেছি। অতুল সম্পদের অধিকারী আমরা ভাণ্ডারপূর্ণ মণিমাণিক্য অবহেলা করিয়া কাচখণ্ড কুড়াইবার জন্য কতই না কাতরতা প্রকাশ করিতেছি!

দেখিবে না ভাই!—একবার কি ফিরিয়া চাহিয়া দেখিবে না!" *

তিনখানি ছবি।

(কবিবর শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন বিরচিত।)

(১)

"মরি, কি সুন্দর! দ্বিতীয়ার শশী
সোণার পুতলি শিশুটী ওই!
হেলিয়া দুলিয়া, নাচিয়া নাচিয়া;
কোথায় বসন? ভূষণ কই?
হেম হিমাদ্রির কাঞ্চন-শৃঙ্গেতে
সোণার উদ্যানে সুবর্ণালয়;
শিশুটী বেড়ায় কাঙ্গালের মত;
সে যেন উহার কিছুই নয়।

ধন-অভিমান নাহি শিশু-মুখে,
ধন-আভরণ অঙ্গেতে নাই।
পাগলের মত যাইছে চলিয়া
কি যেন ভাবিছে, কি যেন চাই।
আপনা-আপনি কহিতেছে কথা,
আপনার মনে আপনি হাসে।
সরলতা-মাখা সে ক্ষুদ্র মু'খানি
সরলতা ক্ষুদ্র অধরে ভাসে।
হৃদয়টী ক্ষুদ্র দয়ার নিঝর
পর-দুঃখে ক্ষুদ্র ধারায় বয়।
ফুটিছে অস্ফুট কি উচ্চ উচ্ছ্বাস!
শিশুটী যেন বা ধরার নয়।
বসি অন্তরীক্ষে কহে ভাগ্য-দেবী,
"এতই প্রসাদ করিনু দান,
"নাহি অভিমান, রহিলি উদাস,
"কত উচ্চ তোর দেখিব প্রাণ!"

(২)

নীল সিন্ধু-নীরে শ্বেতদ্বীপ-তীরে
বসিয়া যুবক কে?
আশার অঙ্কেতে হইয়া শায়িত
কি স্বপ্ন দেখিছে সে?
হৈম হিমালয়-শৃঙ্গে, হৈম অট্টালিকা-অঙ্কে
সুখের মুরতি যুবা বসি।
প্রথম যৌবনোচ্ছ্বাসে কি গৌরব পরকাশে!
আজি শিশু অষ্টমীর শশী।
দেখিতেছে ভবিষ্যত— যেন স্বচ্ছ ছায়াপথ—
কীর্ত্তির তারকা-ঝলসিত,
যশের সৌরভ বাসি আকাশে যাইছে ভাসি
পুণ্য সমীরণে প্রবাহিত।
পাগল শিশুটী আজি হইয়াছে শান্ত স্থির,
পবিত্র হৃদয়-নির্ঝরিণী
হইয়াছে মাতোয়ারা জগতের দুঃখরাশি
যুড়াইতে, সন্তাপহারিণী।
কি বিরাট শব্দ ওই! হইল কি বজ্রাঘাত
অকস্মাৎ? যুবা চমকিল,—

সেই সম্পদের শৃঙ্গ, সেই স্বর্ণ-অট্টালিকা
বিচূর্ণিত, আকাশ ছাইল!
গগন হইতে যুবা পড়িল ভূতলে যেন,
সম্মুখে বিপদ পারাবার,—
নাহি অন্ত, নাহি কূল, কি তরঙ্গ সমাকুল!
সে পুরীর চিহ্ন নাহি আর।
ভাগ্যদেবী শূন্যে বসি, কহে খল খল হাসি—
"এখন কেমন, বাছা মোর!
পড়িল না এ ঐশ্বর্য্যে একটী কলঙ্করেখা?
"সে উচ্চ হৃদয় কোথা তোর?"
কোথায়?"—নির্ভয়ে যুবা কহে বক্ষ দেখাইয়া—
"পাষাণি রে! দেখ্ সে হৃদয়।
ঢাল্ ঝড় বজ্র তোর, উচ্চ পুণ্যপথ হতে
"এ হৃদয় টলিবার নয়।
ওই স্বর্ণরাজ্য, পুরী পিতার স্বজন মম,
"আমি সেই পিতার সন্তান;
তাঁর পুণ্য-পদ-ছায়া হৃদয়ে করিয়া ধ্যান,
"কটাক্ষেতে করিব নির্ম্মাণ।
স্বর্ণ-পুরী শ্রেষ্ঠতর, পুণ্যেতে পবিত্র ভিত্তি
"স্থাপন করিয়া দৃঢ়তর—
ধর্ম্মচূড়া সুদর্শন করিবে স্বর্গ-চুম্বন
"নীল নভে যেন শশধর।
পবিত্র ছায়ায় তার তাপিত পাইবে শান্তি,
"তৃষাতুর—নীর সুশীতল;
স্বদেশের স্বধর্ম্মের, সেই চূড়া সুদর্শন
"হবে অবলম্বন প্রবল।
বিদীর্ণ বোমের মত দেখিব কেমনে তুই
"উড়াইবি সে পুরী আমার।
দিনু ঝাঁপ,—নাহি ভয়; বুকে উচ্চ আশা, শিরে
"বিপদ-ভঞ্জন হরি যার।"

(৩)

সিন্ধু-পূর্ব্ব-তীরে স্বর্ণ-শেখর-মালায়
কিবা পূর্ণচন্দ্র আজি, মরি! শোভা পায়!
ক্রমে দ্বিতীয়ার শশী, চন্দ্র অষ্টমীর,
পূর্ণ-চন্দ্রে পরিণত! নীল-সিন্ধু-নীর
কি আনন্দে প্রতিবিম্ব করিয়া ধারণ,
তরঙ্গে তরঙ্গে তাহা করিছে চুম্বন!
পর-দুঃখ-কাতরতা হৃদয়ে তাহার
চন্দ্রের কলঙ্ক মত শোভার আধার।
দয়ার কৌমুদিরাশি অজস্র ঝরিয়া
তৃষিত তাপিত প্রাণ যায় যুড়াইয়া।
পদে সম্পদের রাশি শৈলমালা মত
চরণে ঠেলিয়া তাহা হতেছে উন্নত।
সরলতা—উচ্চতায়, স্নেহে সুশীতল,
হৃদয় দায়ার উৎস পূর্ণ ঢল ঢল।
অঙ্কে মুক্তকেশী ওই রোহিনী বসিয়া,
মুক্তকেশরাশি চন্দ্র-বক্ষ আঁধারিয়া।
শিশুর জীবনাভাস, যৌবন স্বপন,
বিপদের সে প্রতিজ্ঞা—হয়েছে পূরণ।
কহে ভাগ্যদেবী, মুখে প্রীতি সমুজ্জ্বল—
"কে বলে বীরত্ব নর-হত্যায় কেবল?
"উত্তাল বিপদার্ণব করিয়া লঙ্ঘন
"যে যায় সুখের পার—বীর সেই জন।
"পশুত্ব, দেবত্ব,—দুই সম্পদের ফল।
"ধরাতলে পশুত্বই দেখিবে কেবল।
"যে পারে দলিতে পদে পশুত্ব এমন,
"বৎস! সে প্রকৃত ধনী, দেবতা সে জন।"

পুষ্পাহার।

হায় মা! দিয়াছ তিনখানি ছবি,
কি দিব তোমায় আর?
তিনখানি ছবি দিলাম আঁকিয়া
লও বিনিময়ে তার।
জান মা, কবিরা দরিদ্র জগতে;
তা'দের সম্পদ সার—
মুক্তকেশী ওই প্রকৃতি জননী,
পূর্ণচন্দ্র কণ্ঠহার।
মাতা—বন-ভূমি; তুলি বন-ফুল
গাঁথিলাম এই মালা।
মাঝখানে তার তিনখানি ছবি
জগত করিয়া আলা।
অর্পিলাম করে এ দরিদ্র-মালা;
পর গলে একবার,

---

* সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধি পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (বি, এ, বি-এল) মহোদয়ের এই "বর্ণমালা-রহস্য প্রথমতঃ জন্মভূমিতে প্রকাশিত হয়। এবিষয়ে আমাদেরও কিছু নূতন বক্তব্য আছে। তাই এবার এটী প্রকাশ করিলাম; বারান্তরে আমাদের যাহা বক্তব্য, তাহাই বলিব।

কল্পনা-নয়নে হৃদয় ভরিয়া
দেখি শোভা, মা! তোমার।
আশীর্ব্বাদ করি, ওই পূর্ণচন্দ্র—
হৃদয়েতে, মা! তোমার,
ক্ষুদ্র তারা-গুলি অঙ্ক উজ্জ্বলিয়া
শোভে যেন অনিবার।
আপনি, মা! তুমি আকাশের মত
পবিত্র শান্তির ছবি,
বিরাজ, মা, স্নেহে আবরি জগত,
আশীর্ব্বাদ করে কবি।
ওই শিশুগুলি, নক্ষত্র তারকা,
অঙ্কে তব অনুপম;—
এই তিন-খানি ছবি, মা, তাদের
দেখাইও অনুক্ষণ!
দেখাবে শৈশবে, দ্বিতীয়ার চন্দ্র—
শিশু-ছবি মনোহর;
দেখাবে কৈশোরে, অষ্টমীর চন্দ্র—
মেঘাচ্ছন্ন ঘোরতর!
পূর্ণ-চন্দ্র ছবি দেখাবে যৌবনে
মহিমা গৌরবাধার!
বহু পূর্ণ-চন্দ্রে যেন একদিন
ঝলসে অঙ্ক তোমার।
আবার আবার আশীর্ব্বাদ করি—
সীতা সাবিত্রীর মত,
সংসার-মরুতে অমৃত ঢালিয়া
সাধ, মা! রমণি-ব্রত!"

অমৃত-রেণু।

পরমহংস দেবের উক্তি।

—ভ্রমান্ধ মৃগগণ যেমন নাভিতে গন্ধ থাকিতেও বন-অন্বেষণ করে: তদ্রূপ মায়া-বদ্ধ জীব সকল, নিকটে পরমানন্দ-স্বরূপ থাকিতেও, ইতস্ততঃ অন্বেষণ করে।

—রত্নাকর সমুদ্রে বহু রত্ন আছে; কিন্তু তাহাতে জগতের কোনই উপকার হয় না। সেইরূপ, পাপীদের মধ্যেও ঈশ্বর আছেন বটে; কিন্তু তাহাতে জগতের কোনই উপকার হয় না। অনন্ত সমুদ্রের অনন্ত জল-রাশিতে রত্নাদি যেরূপ আচ্ছন্ন, তাহাদের অনন্ত পাপ-রাশির মধ্যে ঈশ্বরও সেইরূপ আচ্ছন্ন—তাঁহার জ্যোতি আর কিরূপে প্রকাশ পাইবে?

—মায়াবদ্ধ জীব যেন গুটিপোকা। গুটি কাটিলেই সে যেমন সুন্দর প্রজাপতি হয়, মনুষ্যও সেইরূপ মায়া কাটিতে পারিলেই পরমানন্দ-স্বরূপ ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হয়।

—যে যখন যে রঙের চসমা চোখে দেয়, সে তখন জগৎকে সেই রঙ্-বিশিষ্টই দেখে। সেইরূপ, মনুষ্য যখন যে ভাবের ভিতর থাকে, ঈশ্বরকেও সেইরূপ সাকার-নিরাকার ভাব-বিশিষ্ট দেখে।

—ধনীদের ধনাগারের ভৃত্য-সকল যেমন অনেক ধন লইয়াই নাড়া-চাড়া করিয়া থাকে, অথচ তাহা তাহাদের কোনই উপকারে লাগে না। ঈশ্বরে বিশ্বাসহীন প্রচারকও সেইরূপ; তিনি ঈশ্বরকে লইয়া সর্ব্বদাই নাড়াচাড়া করেন সত্য—সর্ব্বদাই ঈশ্বর-কথা কহেন সত্য, কিন্তু তাহাতে তাঁহার পরকালের কোনই উপকার হয় না।

—ঈশ্বরে বিশ্বাস-বিহীন প্রচারক সেইরূপ —যেরূপ হাতা-বেড়ী-খুন্তি-হাঁড়ি-সড়া প্রভৃতি অর্থাৎ হাতা-খুন্তি প্রভৃতি যেমন সর্ব্বদাই সুস্বাদু অন্ন-ব্যঞ্জন লইয়া নাড়াচাড়া করিয়া থাকে, অথচ আস্বাদাদির ফললাভ তাহাদের কিছুই নাই; সেইরূপ, ঈশ্বরে বিশ্বাস-বিহীন প্রচারকও সর্ব্বদা ঈশ্বর-কথা লইয়া নাড়াচাড়া করিয়া থাকেন সত্য, কিন্তু সে সেইমাত্রই—তাহাতে ফলাশা তাঁহার কিছুই নাই।

—ঘুরঘুরে পোকা, পাঁকাল মাছ—ইহারা পাঁকের মধ্যে থাকিয়াও, আপনাপন গাত্র পরিষ্কার রাখে। সেইরূপ, তত্ত্বপিপাসু নবীন সাধক!—তোমাকে যদি সংসারের মধ্যে থা

রিতে হয়, দেখিও, মন পরিষ্কার রাখিতে ভুলিও না।

—হিন্দুস্থানী কোন কোন স্ত্রীলোকেরা কলসীর উপর কলসী দিয়া স্বচ্ছন্দে দূর হইতে জল আনয়ন করে; উঁচু নীচুতে পা ফেলে; রাস্তার লোকের সঙ্গে গল্প করে;—অথচ তাহার লক্ষ্য থাকে,—কলসিটী যেন না পড়িয়া যায়। সেইরূপ, তত্ত্বপিপাসু সাধক! তুমিও লক্ষ্য রাখিও—যেন ঈশ্বরের পথ হইতে দূরে না পড়িয়া যাও; অর্থাৎ সর্ব্ব-কার্য্যে ও সর্ব্ব-সময়েই অমৃত-প্রাণ ঈশ্বরে নির্ভর রাখিও।

—একটি কলসী হস্তে ধরিয়া,উত্তাল তরঙ্গ-মধ্যেও ভাসিতে পারা যায়! কিন্তু যদি সেটী কোনরূপ ছিদ্রবিশিষ্ট বা ফাটা হয়, তখন আর তাহা কোনই ভার লয় না। সেইরূপ, সংসার-সমুদ্রেও বিশ্বাস-রূপ কলসীর আশ্রয় নিলে, অনায়াসেই ভাসিতে পারা যায়! কিন্তু সাবধান, তোমার বিশ্বাসের কলসী যেন কোনরূপ ছিদ্রবিশিষ্ট বা ফাটা না হয়।

—বানর-শিশু যেমন আপনার মাকে কিছুতেই ছাড়ে না; বিশ্বাসী সাধক!—তুমিও স্বজননী মাকে কিছুতেই ছাড়িও না।

—কাচ-পোকার সহবাসে অন্য পোকা-সকল সেই রূপবিশিষ্ট হয়। মানুষও তদ্রূপ ঈশ্বরের সহবাসে অনন্ত-প্রাণ হরির স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হয়।

—সংসারের মধ্যে কামিনী আর কাঞ্চন—এ দু'টীতে আসক্ত হইলে, মানুষ পশু হইয়া যায়; আর, অনাসক্ত হইলে, মানুষ দেবতা হয়।

—শ্রান্ত পথিকগণ যেমন ছায়া পাইলেই একটু বিশ্রাম করিয়া থাকেন; সেইরূপ, তত্ত্ব-জ্ঞানের উদয় হইলে, মানুষও সাধুসঙ্গ-হরিকথায় একটু বিশ্রাম করিয়া থাকে।

—স্পর্শমণির সহবাসে ধাতুমাত্রেই যেমন স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়; তদ্রূপ, লীলা-রসময় হরির সহবাসে আর ভেদাভেদ থাকে না—তখন সকলেই নমস্য, সকলেই পূজনীয়।

—যেমন চিনির পুতুলের যেখানেই খাওনা কেন, সেইখানেই মিষ্টি; সেইরূপ, ভগবানের বিষয় যেরূপেই আলোচনা কর না কেন, সর্ব্ব-ক্ষণই তাহা অমৃতপ্রদ।

—অন্ধ যেমন হস্তীর যে অঙ্গে যখন হস্তার্পণ করে, তখন হস্তীকে সেরূপই মনে করিয়া থাকে; ভেদ-বাদীর ঈশ্বর-দর্শনও সেইরূপ। সেও যখন তাঁহার যে রূপ-গুণের পরিচয় পায়, তখনই ভাবে,—ঐরূপ বা ঐ গুণই বুঝি বা ঈশ্বর। কাজেই একান্তমনা না হওয়ায়, তাহার সর্ব্বদাই অন্ধের হস্তী-দর্শন-সদৃশ বিড়ম্বনা ঘটিয়া থাকে।

—কোন জাহাজের একজন খালাসীকে প্রত্যহই জাহাজের শিক্‌লিগুলিকে জলে ফেলিতে হইত, আবার তুলিতে হইত; তাহাতে তাহার হাত-দু'টিও সেইরূপ শিকলের মত শক্ত হয়। এইরূপ, যাহার সঙ্গে আমরা যেরূপ ব্যবহার করি, আমাদিগকেও সেইরূপ হইতে হয়। পাপ ও পুণ্য—এ দুই ভাবের সহিত কঠোর ও সরল যেরূপ ব্যবহার করিবে, তেমনই হইতে পারিবে। অর্থাৎ যদি পাপের সহিত শত্রুবৎ কঠোর ব্যবহার কর, এবং পুণ্যের সহিত বন্ধুবৎ সরল ব্যবহার কর, তবেই পাপকে দূরে রাখিয়া—পুণ্যেরই আশ্রয় পাইবে!

—দেখিও, সংসারের পথ অত্যন্ত পিচ্ছিল; কদাচ ঈশ্বরের মঙ্গল-হস্ত ছাড়িও না। তাহাতে স্বতঃই পিছলাইয়া পড়িবার সম্ভাবনা!

—এক সোলা-বিক্রেতার মাথায় সোলার আটি; হাতে পয়সার থলি। সে নদী পার হইবে। কিন্তু নদীতে প্রবল স্রোত ও সাঁতার জল। নদীর অর্দ্ধেক অগ্রসর হইয়াছে, এমন সময়ই সে বুঝিল,—বিষম বিপদ, আর প্রাণ বাঁচে না—পয়সার থলির ভারে তাহাকে ডুবাইবার প্রায় করিয়া তুলিয়াছে। তাহাকে তখন, প্রাণরক্ষার দায়ে, কাজেই পয়সার থলিটি জলে ফেলিয়া দিতে হইল। সঙ্গে সঙ্গে,সোলার আটির ভাসমান-ক্ষমতায়, ভাসিতে ভাসিতে সে পারে আসিয়া প্রাণ বাঁচাইল। হে সংসারী মানব! এসংসার-সমুদ্রে তোমারও হইয়াছে, তাই। এখানে, তোমার সেই আসক্তির থলিটি বড়ই ভারি; আর, বিশ্বাসের আটিটি অত্যন্ত হালকা। তাই বলি,—এখনও সে আসক্তির থলি ছেড়ে দেও, এখনও

সেই বিশ্বাসের আটি অবলম্বন কর—অবশ্যই পর-পারে ঈশ্বরের কাছে যেতে পারবে।

—একই স্বর্ণ, অলঙ্কার-ভেদে, বহু-প্রকার রূপ ধারণ করে; তদ্রূপ, সেই লীলা-রসময় হরিও ভক্তের অন্তরে অনন্ত-রূপ ধারণ করিয়া আছেন। তাই তাঁহার অনন্ত রূপ। যিনি যে ভাবে তাঁহার পূজা করেন, ভক্তপ্রাণ ভগবানও সেইভাবেই তাঁহার হৃদয়ে উপনীত হয়েন।

—'হরি'-নামে যাঁহার নয়নে প্রেমাশ্রু পতিত হয়, তাঁহার আর ভজন-সাধন কিছুরই প্রয়োজন করে না।

বসন্ত-বর্ণনা।

ব-কারের বাড়াবাড়ি।

বসন্ত-বৈঠক বসিয়াছে। বিপুল বিশ্ব বিচিত্র বিভবে বিভূষিত। বিকসিত বেল-বকুলে বন বিভোর। বসন্ত-বাতাস বাস বিলাইতেছে। বাগানে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষে বসিয়া বিবিধ বর্ণের বিহঙ্গম বেণু-বাদ্য-বিনিন্দিত বুলি বলিতেছে। বিভাবরী-বল্লভের বিমল বিভায় বিশাল ব্যোম বিধৌত। বাপীবক্ষে বিকচ বারিজে বিস্ময় বাড়াইতেছে। ব্রততীবৃন্দ বিক্রম বহনে বিনম্রা। বিভাবরীতে বাতায়নে বসিয়া বিষণ্ণ-বদনা বধূ বঁধুর বিষয়ে বিলীনা। বনিতা-বিরহিত বিরহিবর্গ বিচ্ছেদ ব্যারামে ব্যাহত। বিষমায়ুধ বিষম বিশিখ-বর্ষণে বিরহিনীর বক্ষ বিঁধিতেছেন। বিলাসী ব্যক্তির বাসন্তি বর্ণের বস্ত্রের বড়ই বাহার! বিলাসিনীবৃন্দ বিলাতী বেশে বাগানে বাতাসে বেড়াইতেছেন। বিশেষতঃ বাবুদের বেজায় বসন্ত-বোধ। বাহারের বিচিত্রতা বলিহারি! বিনোদিনী-বেষ্টিত বিনোদ বাবু বৃক্ষ-বাটিকায় বোতল-বাসিনী বারুণীর বিনাশে বিশেষ ব্যগ্র। বন্ধু-বর্গ ব্রেভো ব্রেভো বলিতেছে। বৈঠক-বাসে বিপিনবিহারী বাবুর বেতর বেয়াদবিতে বিধু-বদনী ব্যাকুল। বিলাস বাবুর বোটের বাছে বিভাবরী বিভোর। বাস্তবিক বাবুদের বেয়াদবি বর্ণনার বাহির। বসন্তে বেড়াতে বড়ই বাহার; বৃক্ষ, ব্রততী, বিহঙ্গম বিস্ময় বাড়ায়। বসন্তে বেড়াইলে, ব্যাধি বিদূরিত, বৃত্তি বিস্ফুরিত, বক্ষঃ বিস্ফারিত, বাসনার বৃদ্ধি. বিবিধ বিনোদন বাড়ে। বিশ্বের বিমোহিনী বিভা বিরসের বুকেও বিঁধিয়া বসে!

বসন্ত-বাহারে বাবু বিলাস-বিহ্বল,
বিলাসিনী বিনোদিনী বিভ্রমে বিকল।
বিষম বিরহ-বিষে বধূরা ব্যথিত,
বিভাবরী বঁধু বিনে বিশেষ বঞ্চিত।
বসন্তের বৃক্ষ, বল্লী বিনোদ বাড়ায়,
ব্যোমে বসি বিধু বিভা বাহারে বিলায়।
বিশ্ব-বিভা বিলোকনে বিস্ময় বর্দ্ধিত,
বিদগ্ধ ব্যক্তির বন্ধু বসন্ত বর্ণিত।

বেজায় বকা।

অনুসন্ধান-সমিতির বিবরণী।

প্রতারণা-প্রবঞ্চনা।

ঔষধের বিজ্ঞাপনে

যে জুয়াচুরী বেশী, তাহা আর বলিবার নহে। জিনিসটা অবশ্য তাহারা দেয়, কিছু-না-কিছু; কিন্তু তাহা ফলপ্রদ কি না, ভগবান জানেন। অনেক সময় ঔষধে তাই রোগের আরোগ্য-সাধন না হইয়া অপকারই হইয়া থাকে। বিশেষতঃ অনেকগুলা বিজ্ঞাপনে অনেক গুহ্য ব্যায়ারাম-আরোগ্যের যে সকল কথা থাকে, তাহাতে আরও সন্দেহ হয়। তাই ঔষধের—বিশেষতঃ প্যাটেণ্ট ঔষধেরই কথা বলিতে হয়—বিজ্ঞাপনে সাধারণের বিশেষ সতর্ক থাকা আবশ্যক। কারণ, উহাতে ভাল কি মন্দ কিছুই বলিবার যো নাই।

সাহেবী নামে,

ঐ সকল বিজ্ঞাপন, বিশেষতঃ সাহেবী-নামে আমরা আরও সন্দেহ করি। আর, রোডাস, পি, লেজার্স, এল, কুরি, প্রভৃতি ঐ ধরণের সাহেবী-নাম-সম্পন্ন প্রায় বিজ্ঞাপনেই আমাদের সন্দেহ হয়। পাঠকগণ, সতর্ক থাকিবেন।

বিনামূল্যে বিতরিত,

বিশেষতঃ ঔষধের বিজ্ঞাপনে—কেবলমাত্র ডাকমাশুল লইয়া—সে সকল বিজ্ঞাপনও সন্দেহজনক। নাম করায় আর প্রয়োজন নাই; সাধারণে বিজ্ঞাপনের বোল-চাল গুলা অতঃপরও একটু চিনিতে শিখুন, এই বাসনা। "অতি লোভে তাঁতি নষ্ট" এই উপদেশটা যেন সকলেরই মনে থাকে।

অনুসন্ধান
অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র

৫ম খণ্ড } ১৫ই ফাল্গুন, ১২৯৮। { ১৪শ সংখ্যা।

তু' বিনে তোহে জানিতে নাহি এক।

(কীর্ত্তনের সুরে)।

সুন্দর রূপ হরি, নাম-সুন্দর তব,*
সুন্দর প্রেম অপার।
কোটি কল্প ধরি, বিহি যদি বর্ণয়ে,
তবহুঁ না পাওয়ে ত পার ॥১
আকাশ-পত্র পরি, সিন্ধুসি পাত্র করি,
কল্প কল্প জগ-জনে জনে লিখ;
এক বরণে তুয়া, জগত ভরল হে,
তাক না পাওয়ে দিখ ॥২
বারি-বিন্দু অত, ধরণী ধূলি যত,
কো যদি গণইতে পারে;
সো তব তত্ত্বক, অন্ত না পাওয়ে,—
সিন্ধু পার, এ অপার ॥৩
অযুত নয়ন ধরি, আদি অন্ত হেরি,
হোয় হোয়ব জন দেখ;
বিশ্ব অশেষ কণ্ঠ, তাহে অনিপুণ,
বিশ্ব-বাণী করি এক ॥৪
জগতে যত, অন্তর আছয়ে,
চিন্তা-জ্ঞান করি এক;
সো যদি ধ্যান-সমাধি আলাপয়ে,—
হিম-অচলে তৃণ-রেখা ॥৫
অন্ত নাহি তব, অন্ত নাহি তব,
অনন্ত দেখ, তু অদেখ;
এ অধম কহয়ে, হে হরি,
তু' বিনে তোহে জানিতে নাহি এক ॥৬

* হে হরি! তোমার রূপ সুন্দর, তোমার নাম [সুন্দ]র, তোমার অপার প্রেমও সুন্দর। স্বয়ং বিধাতাও কোটি কল্প ধরিয়া তোমার সে সকলের বর্ণনা করেন, [তথাপি]ও তাহার শেষ হয় না। ১॥ আকাশকে যদি লিখন-[পত্র] করিয়া লওয়া হয়, জগতের সমগ্র মহাসমুদ্রকে যদি [মস্যা]ধারপাত্র করিয়া লওয়া হয়, হে হরি, তোমার নামের [এক]টি বর্ণে জগৎ ভরিয়া যায়—তবুও তাহার পূরণ [হয়] না। ২॥ জগতে যত বারি-বিন্দু আছে, এই ধরণীতে [যত] ধূলি-কণা আছে, এসকলেরও যদি গণনা করা সম্ভব [হয়], হে হরি, তবু তোমার সে অনন্ত তত্ত্বের কিছুতেই পাওয়া যায় না—মহাসমুদ্রও যদি পার হওয়া সম্ভব [হয়], কিন্তু তোমার সে অন্ত অপার। ৩॥ জগতে যত [লোক] জন্মিয়াছে ও জন্মিবে, তাহাদের প্রত্যেকেরই যদি অযুত নয়ন হয়, এবং তাহারা জীবনের আদি-অন্ত ধরিয়া যদি তোমার দর্শন করে; হে সচ্চিদানন্দ হরি, তবু তোমার আদি-অন্ত কেহই দেখিতে পায় না। এই বিশ্ব-সংসারে যত কিছু শব্দ বা বাক্য আছে, এই বিশ্ব-সংসারের সমগ্র প্রাণী-কণ্ঠ যদি তাহাতেও তোমার বর্ণনা করে, হে হরি, তবুও তোমার বর্ণনায় কেহই সক্ষম হয় না। ৪॥ এইরূপ, জগতে যত অন্তর আছে, তাহাদের সকলের চিন্তা ও জ্ঞান একত্র করিয়া যদি তোমার ধ্যান-সমাধিতে নিয়োগ করা হয়, হে হরি, তবুও তোমার বর্ণনা হয় এইরূপ—যেমন, হিম-অচলে তৃণ-রেখা; অর্থাৎ এত করিয়াও হিমাচল-পৃষ্ঠে ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র তৃণ-রেখার ন্যায় মাত্র তোমার বর্ণনা করা হয়। ৫॥ হে হরি, তোমার অন্ত কিছুতেই পাওয়া যায় না; অনন্তেরও যদি অন্ত পাওয়া সম্ভব হয়, হে হরি, তবু তোমার অন্ত কিছুতেই পাওয়া যায় না। তবে তুমি দয়া করিয়া নিজে যদি কাহাকেও জানাইয়া দেও, হে হরি, সেই তোমায় জানিতে পরে। নতুবা অন্য পরে কা কথা। ৬॥

হিন্দু-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা।

হিন্দু-ধর্ম্ম আকাশ হইতেও অনন্ত, সমুদ্র হইতেও গভীর। ক্ষুদ্র ইংলণ্ড, ক্ষুদ্র রোম, ক্ষুদ্র গ্রীস, ক্ষুদ্র ফ্রান্স,—এই বিশাল হিন্দু-ধর্ম্মের মর্ম্ম ইহারা কি বুঝিবে? প্রায় চারি হাজার বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপে একখানি ধর্ম্ম-পুস্তক প্রচারিত হইয়াছিল; আজিও সেই ধর্ম্ম পুস্তকখানি ইউরোপীয় ধর্ম্মমালার প্রধান ও একমাত্র অবলম্বন। কিন্তু ভারতের ধর্ম্মমালার ও ধর্ম্ম-পুস্তকের গণনা করা যায় না। চতুর্ব্বেদ, অষ্টাদশ পুরাণ, আগম, নিগম, তন্ত্র, গীতা প্রভৃতি কত শতশত ধর্ম্ম-পুস্তক ভারতে পঠিত, সমাদৃত ও পূজিত হয়, তাহা কে বর্ণনা করিতে পারে? ইউরোপে ধর্ম্ম-পুস্তকের উন্নতি নাই; কিন্তু ভারতে প্রত্যেক শতাব্দীতে ধর্ম্ম-গ্রন্থের উন্নতি ও বিস্তৃতি সম্পাদিত হইয়াছে। যেখানে "ধর্ম্মই" মানব-জীবনের একমাত্র সার বস্তু, তথায় ধর্ম্মের উন্নতি, বিস্তৃতি, অবশ্যই বাহুল্যরূপে হইয়া থাকে। ইউরোপে বিজ্ঞান, দর্শন ইত্যাদি সম্বন্ধে শত সহস্র মতভেদ হইতেছে; কিন্তু ধর্ম্ম-সম্বন্ধে ইউরোপের মতভেদ অতি অল্প; কারণ, ইউরোপের ধর্ম্মভাব নির্জ্জীব।

সকল মানুষের মন এক উপাদানে সংগঠিত নহে। সুতরাং এক প্রকার ধর্ম্ম সকল মানুষের মনে সমান আধিপত্য লাভ করিতে পারে না। কেহ জ্ঞান-সূর্য্য প্রকাশিত করিয়া ঈশ্বরকে পাইতে চেষ্টা করিয়া থাকেন; কেহ বা ভক্তি দ্বারা তাঁহাকে পাইতে চেষ্টা করেন, কেহবা করুণার পক্ষপাতী; কেহ বা "কর্ম্ম" দ্বারা তাঁহাকে লাভ করিতে যত্ন করেন। এইরূপে, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির মনে ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তি প্রবল বেগে কার্য্য করিয়া থাকে। একরূপ ধর্ম্ম ইহাদের সকলকে তৃপ্তি দান করিতে পারে না। সুতরাং প্রাচীন ঋষিগণ, যাহার যেরূপ ধর্ম্ম লাভের ক্ষমতা, তাহাকে তদনুরূপ ধর্ম্ম আলোচনা করিবার উপদেশ দিয়াছেন। যাঁহারা বল, বীর্য্য, শৌর্য্য প্রভৃতির পক্ষপাতী, তাঁহারা প্রেমের অর্থ কি বুঝিবেন? তবে তাঁহাদের জন্য কি ধর্ম্ম নাই? তোমার খৃষ্টান মহাশয়েরা বলিবেন—"না"। যাঁহার প্রাণে প্রেম নাই, তাঁহার ধর্ম্মে অধিকার নাই। কিন্তু হিন্দু-আচার্য্য বলিবেন,—"আইস বৎস! আমি তোমার প্রকৃতি ও রুচি অনুযায়ী ধর্ম্ম প্রদান করিতেছি। ঐ দেখ, দুর্গা-মূর্ত্তি, তোমার সম্মুখে দশদিক বিস্তার করিয়া রহিয়াছেন। ঐ দেখ মাতা কিরূপে শিষ্ট-পালনার্থ অসুরদিগকে বধ করিতেছেন? ইনিই তোমার দেবতা। ইহাঁকে মনে রাখিয়া ঐ ভাবে দুষ্টদমন ও শিষ্টপালন করিবে।" ভক্ত অবনত মস্তকে দেবীকে প্রণাম করিয়া বলিবে,—"গুরুদেব! আপনি আমাকে প্রকৃত পথ দেখাইয়াছেন। হে দেবী শক্তি-রূপিণী! আমাকে তোমার কৃপা দান কর। মাতঃ! আমি যাহাতে দুষ্টদমন ও শিষ্ট পালন করিতে পারি, এরূপ আশীর্ব্বাদ দান কর।" এদেশের শিবজী, মানসিংহ, ভীমসিংহ প্রভৃতি এ শ্রেণীর উপাসক ছিলেন। এইরূপ, যাঁহার চিত্তে যে ভাব প্রবল, হিন্দু গুরু তাঁহাকে সেই ভাবেই তাঁহার ইষ্ট-দেবতার আরাধনা করিতে উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। এ সংসারে কেহই যেন ধর্ম্ম হীন হইয়া জীবনযাপন না করেন। এই জন্যই, দেখা যায় যে, হিন্দু-সমাজে যাঁহারা একমাত্র সেই চিন্ময় পরম-ব্রহ্মের উপাসনা করেন, তাঁহারাও হিন্দু বলিয়া পরিচিত; আবার যাঁহারা বৃক্ষ, শিলা ইত্যাদিকে দেবতা-জ্ঞানে পূজা করেন, তাঁহারাও হিন্দু বলিয়া পরিচিত হইয়া থাকেন। যাঁহার যতটুকু ক্ষমতা, ধর্ম্ম-জগতে তিনি ততটুকু জ্ঞান লাভ করেন,—ইহাই হিন্দু-শাস্ত্রের একমাত্র আদেশ। বলা বাহুল্য, এই জন্যই হিন্দু-ধর্ম্ম অন্যান্য ধর্ম্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিয়াছে।

উপাসনা, আরাধনা, স্তব-স্তুতি প্রভৃতি ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ; আর, নীতিশিক্ষা, নীতি-প্রচার, হিতোপদেশ প্রভৃতি ধর্ম্মের গৌণ অংশ বলিয়া সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। খৃষ্ট-ধর্ম্ম অপেক্ষা সহস্র গুণে উন্নত নীতি, হিন্দু-শাস্ত্রের কত স্থানে অলক্ষিতভাবে ছড়ান রহিয়াছে। খৃষ্টীয়-শাস্ত্রে যে কয়টি নীতিমালা আছে, তাহা হিন্দু-শাস্ত্রে কেন, চাণক্য-শ্লোক, নীতিসার প্রভৃতি শিশুপাঠ্য গ্রন্থ সমস্তেও পাওয়া যায়। খৃষ্টানদিগের নীতিমালা এইরূপ,—

"১। পরদার করিও না।

"২। চুরি করিও না।

"৩। হত্যা করিও না।

"৪। তোমার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে মিথ্যা-সাক্ষ্য দিও না।

"৫। পিতা মাতাকে ভক্তি করিও।

"৬। তোমার প্রতিবেশীর গৃহ দেখিয়া লোভ করিও না। তাহার স্ত্রীকে দেখিয়া লোভ করিও না। তাহার চাকর চাকরাণী, গরু, বলদ প্রভৃতি দেখিয়া লোভ করিও না।"

চাণক্য শ্লোকের দুই-একটি কবিতা হইতেই উপর্য্যুক্ত নীতিমালা কয়টি সংগৃহীত হইতে পারে। যথা;—

"মাতৃবৎ পরদারেষু, পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ।
আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি, স পণ্ডিতঃ॥"

কিম্বা,—

"পরদারং পরদ্রব্যং পরীবাদং পরস্যচ।
পরিহাসং গুরো স্থানে চাপলঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥"

এবং,—

"একেনাপি কুবৃক্ষেণ কোটরস্থেন বহ্নিনা।
দহ্যতে তদ্বনং সর্ব্বং কুপুত্রেণ কুলং যথা॥"

পরদার করিবে না, কেবল ইহা নহে; পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ জ্ঞান করিবে। কেবল যে পরদ্রব্য লইবে না, তাহা নহে; পরের দ্রব্যকে লোষ্ট্রবৎ জ্ঞান করিবে। এইরূপ খৃষ্টীয় শাস্ত্রে যে সকল হিতোপদেশ আছে, তাহা অপেক্ষা অতি উৎকৃষ্ট হিতোপদেশ হিন্দু-শাস্ত্রের সামান্য সামান্য পুস্তকেই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

হিন্দু-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতার অন্যতম প্রধান কারণ এই যে, হিন্দু-ধর্ম্মে নিষ্কাম উপাসনার ব্যবস্থা রহিয়াছে। যদিও সকাম উপাসনা ও নিষ্কাম উপাসনা উভয় বিধিই হিন্দু-ধর্ম্মে আছে, তথাপি সকাম উপাসনাকে নিকৃষ্ট উপাসনা বলিয়া সর্ব্বত্রই উল্লেখ আছে। কিন্তু অন্যান্য ধর্ম্ম-শাস্ত্রে নিষ্কাম উপাসনার বিধি দৃষ্ট হয় না। ইহকালের ও পরকালের সুখ, অথবা স্বর্গ লাভ ইত্যাদি কামনাই অন্যান্য ধর্ম্ম-শাস্ত্রের উপদেশ। নিষ্কাম উপাসনা, অর্থাৎ কোন কামনা শূন্য হইয়া ঈশ্বর-প্রীত্যর্থে উপাসনা হিন্দু-শাস্ত্রের সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। ভক্ত প্রহ্লাদ একজন বিখ্যাত নিষ্কাম উপাসক ছিলেন। তাঁহার জীবনের কতিপয় অংশ আমরা শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের 'ধর্ম্মতত্ত্ব' হইতে উদ্ধৃত করিলাম, পাঠক এরূপ উন্নত ধর্ম্ম ও ভক্তিবাদ আর কোন্ ধর্ম্মে দেখাইতে পারেন?

"প্রহ্লাদ আবার বিষ্ণু-ভক্তির উপদ্রব করিতেছেন জানিয়া, হিরণ্যকশিপু তাঁহাকে বিষপান করাইতে আজ্ঞা দিলেন। বিষেও প্রহ্লাদ মরিল না। তখন দৈত্যেশ্বর পুরোহিতগণকে ডাকাইয়া অভিচার-ক্রিয়ার দ্বারা প্রহ্লাদকে সংহার করিতে আদেশ করিলেন। তাঁহারা প্রহ্লাদকে একটু বুঝাইলেন; বলিলেন—'তোমার পিতা জগতের ঈশ্বর, তোমার অনন্তে কি হইবে?' প্রহ্লাদ 'স্থিরমতি'; প্রহ্লাদ তাঁহাদিগকে হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। তখন দৈত্য-পুরোহিতেরা ভয়ানক অভিচার-ক্রিয়ার সৃষ্টি করিলেন। অগ্নিময়ী মূর্ত্তিমতী অভিচার-ক্রিয়া প্রহ্লাদের হৃদয়ে শূলাঘাত করিল। প্রহ্লাদের হৃদয়ে শূল ভাঙ্গিয়া গেল। তখন সেই মূর্ত্তিমান অভিচার, নিরপরাধ

প্রহ্লাদের প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছিল বলিয়া অভিচারকারী পুরোহিতদিগকেই ধ্বংস করিতে গেল। তখন প্রহ্লাদ,—'হে কৃষ্ণ! হে অনন্ত! ইহাদের রক্ষা কর' বলিয়া সেই দহ্যমান পুরোহিতদিগের রক্ষার জন্য ধাবমান হইলেন। ডাকিলেন,—'হে সর্ব্বব্যাপিন, হে জগৎ স্বরূপ, হে জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, হে জনার্দ্দন! এই ব্রাহ্মণগণকে এই দুঃসহ মন্ত্রাগ্নি হইতে রক্ষা কর! যেমন সকল ভূতে সর্ব্বব্যাপী, জগদ্‌গুরু বিষ্ণু তুমি আছ, তেমনই এই ব্রাহ্মণেরা জীবিত হউক! বিষ্ণু সর্ব্বগত বলিয়া যেমন অগ্নিকে আমি শত্রুপক্ষ বলিয়া ভাবি নাই, এ ব্রাহ্মণেরাও তেমনি—ইহারাও জীবিত হৌক। যাহারা আমাকে মারিতে আসিয়াছিল, যাহারা বিষ দিয়াছিল, যাহারা আমাকে আগুনে পোড়াইয়াছিল, হাতির দ্বারা আমাকে আহত করিয়াছিল, সাপের দ্বারা দংশিত করিয়াছিল, আমি তাহাদের মিত্রভাবে আমার সমান দেখিতেছিলাম; শত্রু মনে করি নাই, আজ সেই সত্যের-হেতু এই পুরোহিতেরা জীবিত হউক।' তখন ঈশ্বর কৃপায় পুরোহিতেরা জীবিত হইয়া, প্রহ্লাদকে আশীর্ব্বাদ করিয়া গৃহে গমন করিল।"

এমন আর কখন শুনিব কি? ইহার অপেক্ষা উন্নত ভক্তিবাদ, ইহার অপেক্ষা উন্নত ধর্ম্ম, অন্য কোন দেশের কোন শাস্ত্রে কেহ দেখাইতে পারেন কি?

"পরে, হিরণ্যকশিপু পুত্রের প্রভাব দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তোমার এই প্রভাব কোথা হইতে হইল?' প্রহ্লাদ বলিলেন,—'অচ্যুত হরি যাহাদের হৃদয়ে অবস্থান করেন, তাহাদের এইরূপ প্রভাব হইয়া থাকে। যে অন্যের অনিষ্ট চিন্তা করে না—কারণাভাব বশতঃ তাহারও অনিষ্ট হয় না। যে কর্ম্মের দ্বারা, মনে বা বাক্যে পর-পীড়ন করে, তাহার সেই বীজে প্রভূত অশুভ ফলিয়া থাকে। কেশব আমাতেও আছেন, সর্ব্বভূতেও আছেন, ইহা জানিয়া আমি কাহারও মন্দ ইচ্ছা করিয়া, কাহাকেও মন্দ বলি না। আমি সকলের শুভ চিন্তা করি, আমার শারীরিক বা মানসিক, দৈব বা ভৌতিক অশুভ কেন ঘটিবে? হরি সর্ব্বময় জানিয়া সর্ব্বভূতে এইরূপ অব্যভিচারিণী ভক্তি করা পণ্ডিতের কর্ত্তব্য।'"

ইহার অপেক্ষা উন্নত ধর্ম্ম আর কি হইতে পারে? আজ কালকার বিদ্যালয়ে এ সকল না পড়াইয়া, পড়ায় কি না, মেকলে-প্রণীত ক্লাইব ও হেষ্টিংস-সম্বন্ধীয় পাপপূর্ণ উপন্যাস। আর সেই উচ্চশিক্ষার জন্য আমাদের শিক্ষিত মণ্ডলী উন্মত্ত।

"হিরণ্যকশিপু ক্রুদ্ধ হইয়া প্রহ্লাদের বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিলেন, এবং প্রহ্লাদকে নাগ-পাশে বদ্ধ করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিতে অসুরগণকে আদেশ করিলেন। অসুরেরা প্রহ্লাদকে নাগ-পাশে বদ্ধ করিয়া সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া পর্ব্বত চাপা দিল। প্রহ্লাদ তখন জগদীশ্বরের স্তব করিতে লাগিলেন। কিন্তু ঈশ্বরের কাছে আত্মরক্ষা প্রার্থনা করিলেন না; কেননা, প্রহ্লাদ নিষ্কাম। প্রহ্লাদ ঈশ্বরে তন্ময় হইয়া, তাঁহার ধ্যান করিতে করিতে তাঁহাতে লীন হইলেন। প্রহ্লাদ যোগী। তখন তাঁহার নাগ-পাশ খসিয়া গেল; সমুদ্রের জল সরিয়া গেল; পর্ব্বত সকল দূরে নিক্ষেপ করিয়া, প্রহ্লাদ গাত্রোত্থান করিলেন। তখন প্রহ্লাদ আবার বিষ্ণুর স্তব করিতে লাগিলেন। কিন্তু কখনই আত্মরক্ষার জন্য নহে—নিষ্কাম হইয়া স্তব করিতে লাগিলেন। বিষ্ণু তখন তাঁহাকে দর্শন দিলেন; এবং ভক্তের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে আদেশ করিলেন। প্রহ্লাদ "সন্তুষ্টঃ সততং" সুতরাং তাঁহার জগতে প্রার্থনীয় কিছুই নাই। অতএব তিনি কেবল কহিলেন যে,—'যে সহস্র যোনিতে আমি পরিভ্রমণ করিব, সকল জন্মেই যেন তোমার প্রতি আমার অচলা ভক্তি থাকে।'"

ভক্ত ভক্তিই প্রার্থনা করে, ভক্তির জন্য ভক্তি প্রার্থনা করে, মুক্তির জন্য বা অন্য ইষ্ট-সাধনের জন্য নহে।

"ভগবান বলিলেন,—'তাহা আছে, ও থাকিবে। অন্য বর দিব, প্রার্থনা কর।' প্রহ্লাদ দ্বিতীয় বার প্রার্থনা করিলেন,—'আমি তোমার স্তুতি করিয়াছিলাম বলিয়া, পিতা আমার যে দ্বেষ করিয়াছিলেন, তাঁর সেই পাপ ক্ষালিত হউক।' ভগবান তাহাও স্বীকার করিয়া, তৃতীয় বর প্রার্থনা করিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু নিষ্কাম প্রহ্লাদের জগতে আর তৃতীয় প্রার্থনা ছিল না। কেন না, তিনি,—সর্ব্বারম্ভ পরিত্যাগী—হর্ষ, দ্বেষ, শোক, আকাঙ্ক্ষাশূন্য, ও শুভাশুভ পরিত্যাগী। তিনি আবার চাহিলেন,—'তোমার প্রতি আমার ভক্তি যেন অব্যভিচারিণী থাকে।' বর দিয়া, বিষ্ণু অন্তর্হিত হইলেন।"

ইহার অপেক্ষা উন্নত ধর্ম্ম আর কি হইতে পারে! পাঠক! ইহার অপেক্ষা উন্নত ভক্তিবাদ, ইহার অপেক্ষা উন্নত ধর্ম্ম আর কোন দেশের কোন ধর্ম্ম শাস্ত্রে আছে কি?

অদৃষ্ট।

একোনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা।

প্রতিহিংসার ন্যায় প্রীতিকর ফল কখন পৃথিবীতে ফলে না। শ্বশুরের আগমনে সেই ফল অদ্য আমি হস্তে পাইলাম, কিন্তু আমি তাহা গ্রহণ করিলাম না। কোন উদার-চরিত্র লোকে ত কখনও তাহা গ্রহণ করেনই না। ধনী হইলেও হয় না, দীন হইলেও হয় না; যাহার যেরূপ বাল্য-শিক্ষা, যাবজ্জীবন তাহার স্বভাব সেইরূপই থাকিয়া যায়। এক্ষণে শিক্ষা কি, তাহা স্থির করা আবশ্যক।

শিক্ষা ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই আরম্ভ হয়। সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলেই কাঁদিয়া উঠে, মাতা তাহাকে স্তন্য পান করান। শিশু শিখিল,—কাঁদিলেই দুগ্ধ পাওয়া যাইবে। মাতা শিশুকে ক্রোড়ে লইয়া তাহার মুখের নিকট নিজ মুখ লইয়া গিয়া আদরের হাসি হাসেন। শিশু তাহাতে শিখে যে,—যে ব্যক্তি তাহার নিকট আসিয়া হাসিবে, সে কখনও তাহার কোন অনিষ্ট করিবে না। ভ্রূকুটী করিয়া তাহার নিকট গেলেই কাঁদিয়া উঠিবে। সন্ধ্যা সমাগত হইলে প্রত্যহই প্রদীপ জ্বালা হইয়া থাকে। যদি কোন কারণ-বশতঃ তাহা না হয়, তাহা হইলে শিশু কাঁদিতে থাকে। শিক্ষা যাহাকে বলে, তাহা এই। বয়োবৃদ্ধি হইলে পাঠশালায় গিয়া যাহা শিখে, সে শিক্ষা—'রোগী যেন নিম খায় মুদিয়া নয়ন।'

ইত্যগ্রেই বলা হইয়াছে যে, আমার পিতা আমাকে বলিয়াছিলেন যে,—'জ্ঞান-গর্ভ পাঠগুলি পড়িয়া মুখস্ত করিয়া রাখিলেই হইবে না, তদনুরূপ কার্য্য করিতে হইবে।' ডাক্তার বাবু বাটী হইতে আমি যে পলায়ন করিয়াছিলাম, সেও এই শিক্ষার ফল। অদ্য আমার শ্বশুর ও জয়গোপাল দুঃখে পড়িয়া কষ্ট পাইতেছেন, এবং সেই কষ্টের কথা শুনিয়া আমি যে কোনরূপ আহ্লাদ প্রকাশ করিলাম না, তাহাও সেই শিক্ষার দরুণ। পাঠক মনে করিবেন না যে, এই পুস্তকের প্রারম্ভে যে আখ্যায়িকার কথা লেখা হইয়াছে, সেই টুকুই আমাকে শিখাইয়া আমার পিতা নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। তিনি আমাকে সমগ্র চাণক্যের শ্লোক ও অন্যান্য জ্ঞান-গর্ভ পাঠও শিখাইয়াছিলেন; এবং তদনুরূপ কার্য্য করিতেও শিখাইয়াছিলেন। এ সমস্ত শিখানই শিক্ষা। যে যাহা অভ্যাস করে, সে যদি সেই শিক্ষানু-

রূপ কার্য্য না করে, তাহা হইলে তাহার সে শিক্ষা শিক্ষাই নয়।

আমি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটীতে আগমন-পূর্ব্বক জয়গোপালের দুর্দ্দশা দেখিয়া যথার্থই অত্যন্ত আন্তরিক বেদনা পাইলাম। বড়কে ছোট দেখিলে কাহার না চিত্ত-বিকার জন্মে? রাবণ মৃত্যুশর দ্বারা আহত হইয়া যখন ভূমি-সাৎ হইয়াছিলেন এবং আর্ত্তস্বরে রাম-লক্ষ্মণের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন; সে স্থান পাঠ করিবার সময় কোন্ পাঠকের চিত্ত না দুঃখার্দ্র হয়? আমি জয়গোপালের এ উপস্থিত দুরবস্থার পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত কিছুই জানিতাম না; জয়গোপালও আমাকে দেখিয়া অধোবদন হইয়া বসিলেন। আমি তদ্দর্শনে পাছে তাঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করিলে তিনি লজ্জিত হন, এজন্য পার্শ্বস্থ এক জন প্রতিবেশীকে জনান্তিকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া তাঁহার নিকট হইতে সমস্ত বিবরণ অবগত হইলাম। পুনরায় জয়গোপালের নিকট আসিয়া কহিলাম,—"দুরদৃষ্ট-ক্রমে যাহা হ'বার, তা'ত হয়ে গিয়েছে; পূর্ব্ব ঘটনার বিষয় দুঃখ করিয়া আর কি হইবে! এক্ষণে ভবিষ্যতে কি কর্ত্তব্য, তাহাই চিন্তা করা উচিত। আমি উকীল নয়, সুতরাং মকর্দ্দমার বিষয় কিছু জানি না। কিন্তু আমার মোটা মুটী এ সংস্কার আছে যে, এ বিষয় ওয়ারেণ্ট-জারির যোগ্য বটে; কিন্তু জামিনেতে খালাস হইতে পারে। আপনার কি বিবেচনা? এই নয় কি?" জয়গোপাল ক্ষণকাল অধোবদনে চিন্তা করিয়া কহিলেন,—"আমি বই না দেখিয়া সেটা ঠিক করিয়া বলিতে পারি না।" অনন্তর সকলেই চারি পাঁচ মিনিটের জন্য চুপ করিয়া থাকিলেন। তখন জয়গোপাল কহিলেন,—"দাদা, আপনি ত সমস্তই জানেন। এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য হয়, আপনি অনুগ্রহ করিয়া করুন। আমি শত শত অপরাধে আপনার নিকট অপরাধী আছি। কোন্ ছোট ভাই বড় ভাইয়ের বিপক্ষে অত্যাচার না করে? বিবেচনা করিয়া দেখুন, আমি তো ছোট ভাই বই নই। আপনার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও আপনার প্রতি অনেক নির্দ্দয় ব্যবহার করিয়াছেন। আপনি তাহাতে কোনই রাগ প্রকাশ করেন নাই। তিনি ত বড় ভাই; আমি ছোট ভাই হইয়া যে কিছু অপরাধ করিয়াছি, তাহা কি আপনি মার্জ্জনা করিবেন না? আপনি ভিন্ন আমার আশ্রয়স্থল আর এখানে কে আছে? শ্বশুর মহাশয় প্রাচীন বটেন; কিন্তু তিনি যাবজ্জীবন পল্লীগ্রামে বাস করিয়া আসিতেছেন; আদালত বা ফৌজদারির নাম শুনিলে চমকিয়া উঠেন। তাঁহা দ্বারা আমার বর্ত্তমান অবস্থার কোন আনুকূল্য হইবে না। অতএব আমার জীবন-মৃত্যু উভয়ই আপনার হস্তে। আপনি মারিলেও মারিতে পারেন, বাঁচাইলেও বাঁচাইতে পারেন। যাহাতে এক ঘর গৃহস্থ বজায় থাকে, তাহার চেষ্টা করুন। আমার পিতা বৃদ্ধ; তিনি আমার এই দুর্দ্দশার কথা শুনিলেই শোকে প্রাণত্যাগ করিবেন। দেখ্‌বেন দাদা, যেন এককালে দুটো ব্রহ্মহত্যা হয় না!" এই পর্য্যন্ত বলিয়া, জয়গোপাল অধোবদন হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আমার চক্ষুও অনার্দ্র রহিল না।

কিঞ্চিৎ পরে শোকাবেগ সম্বরণ করিয়া আমি কহিলাম,—"ভাই এ কাঁদা-কাটার সময় নয়। এক্ষণে যাহাতে ভবিষ্যৎ রক্ষা হয়, তাহারই তদ্বির করা উচিত। এ বিষয়ে আমা দ্বারা যতদূর উপকার হইতে পারে, তাহার ত্রুটী হইবে না। আমি তোমার উপর ভাই কখন রাগ করি নাই। তুমিও আমার কোন অপ্রীতিকর কার্য্য কর নাই। তবে মনুষ্যের মন সর্ব্বদাই একভাবে থাকে না। কখন কখন বিরক্ত হইয়া অপরের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু তোমার উপর

কখন নয়। অতএব আমি অবিলম্বেই ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে যাইতেছি। কষ্টের মধ্যে ছেলেটীকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাইতে হইবে। চাকরটীকে সঙ্গে লইয়া যাইতে পারি না; তাহাকে লইয়া গেলে, আমার বাড়ী-ঘর রক্ষণাবেক্ষণ করিবার অপর লোক কেহই নাই। তাহাকে না লইয়া গেলেও আমার দ্বারা কোন কার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই; কারণ, একটী ছেলে কোলে করিয়া লইয়া আদালত, ফৌজদারী বা কোন উকীলের বাড়ী যাইতে পারিব না। যত শীঘ্র পারি, অপর একটী চাকর নিযুক্ত করিয়া তাহার উপর বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়া, আমি অবিলম্বে পুরাতন চাকরটীকে সঙ্গে লইয়া চলিয়া যাইব। হরিপদও তাহার অত্যন্ত অনুগত; সে কাছে থাকিলে, হরিপদ আর আমার জন্য তাদৃশ ভাবিবে না।"

শ্বশুর মহাশয় এই কথা শুনিয়া কহিলেন,—"কেন হরিপদকে এখানে রাখিয়া গেলেও ত চলিতে পারে? আমরা ত তাহার পর নই! আমরা অবশ্যই তোমার প্রত্যাগমন-পর্য্যন্ত তাহাকে লালন-পালন করিতে পারিব।" তিনি যখন এই কথা বলিলেন, তখন আমরা রোয়াকে বসিয়া আছি; ঐ রোয়াক হইতে গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার দ্বার আছে; তাহার একটী কবাট বন্ধ করিয়া, শাশুড়ী ঠাকুরুণ তাহার অন্তরালে দাঁড়াইয়া, অর্দ্ধবদন বিকাশিত করিয়া, অনতি-অস্ফুটস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে এবং নাসার অগ্রভাগে অঞ্চলের বস্ত্র সংলগ্ন করিয়া কহিলেন,—"আমিও ত তাই বলি! আমার কাছে মহামায়ার ছেলেও যেমন, জয়দুর্গার ছেলেও তেমন। অল্প বয়সে বাছা আমাকে ছেড়ে চলে গেল; সে শূল ত আমার বুকে বিঁধে আছেই আছে! সে জ্বালা আমার চিতেয় না গেলে আর জুড়ুবে না। আমি কি আমার মহামায়ার ছেলেকে পালন করতে পারবো না! না কখন পারি নি!" আমি কহিলাম,—"আপনারা তাহাকে প্রতিপালন করিতে পারিবেন না ত কে পারিবে? কিন্তু সে এবাড়ীতে এত অল্প আসিয়াছে যে, কাহাকেও চেনে না। যখন আপনার কন্যার মৃত্যু হয়, তখন ত জানেন আপনি এত চেষ্টা কর্‌লেন, তবু সে আপনার সহিত আসিল না; আর এখন যে আসিবে, তাহাও বিশ্বাস হয় না। কিন্তু ইহা অপেক্ষা একটা সোজা কাজ আছে, তাহা করিলে সমস্ত বিষয় সুবিধা হইবে। আপনাদের বাটীতে অনেক ভৃত্য আছে; তাহার মধ্য হইতে যদি এক জনকে রাত্রিকালে আমার বাটীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে হরিপদ ও আমি আমাদিগের পুরাতন ভৃত্যটীকে লইয়া এক্ষণেই চলিয়া যাইতে পারি।" সকলেই এ মত সর্ব্বোৎকৃষ্ট মনে করিলেন; এবং এই বন্দোবস্তে জয়গোপালও স্বীকৃত হইলে, হরিপদ, আমি ও ভৃত্য সেই রাত্রে আদালতে যাইবার জন্য যাত্রা করিলাম। কিন্তু শ্বশুর-বাটী হইতে প্রত্যাগমন করিবার সময় শাশুড়ী-ঠাকুরুণ দুটী আম্র আনিয়া আমার হস্তে দান করিয়া কহিলেন,—"এই দুইটী আঁব লইয়া যাও। একটী তোমার জন্য, আর একটী আমার দাদার জন্য।" কিন্তু এতকাল কতরূপ ভালমন্দ জিনিস আসিয়াছে; তখন তাঁহার দাদাকে মনে ছিল না, ও আমি যে গরিব জামাই, আমারও কথা মনে ছিল না।

এ পরিচ্ছেদ ও পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদের অধিকাংশ কথা জয়গোপাল ধৃত হইলে আমি অপরের নিকট শুনিয়া লিখিলাম।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

ওকালত-নামা।

আমি আদালতে উপস্থিত হইয়া একটী সুদক্ষ উকীল নিযুক্ত করিলাম। তিনিও বি এ

বি এল। ইতি পূর্ব্বেই জয়গোপালের দুর-দৃষ্টের কথা সেখানে প্রচার হইয়াছিল; কিন্তু কেহ কেহ বিশ্বাস করিত, কেহ কেহ করিত না। আমার নিকট সবিস্তার শুনিয়া কেহ কেহ আন্তরিক ও কেহ কেহ মৌখিক দুঃখ প্রকাশ করিলেন। যে সমস্ত উকীল অনেকদিন হইতে ওকালতী করিতেছেন এবং যাঁহাদিগের উপার্জ্জন জয়গোপালের উপার্জ্জন অপেক্ষা অধিক, তাঁহারা যে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিলেন, সে দুঃখ যে আন্তরিক, তাহা তাঁহাদের চেহারা হইতেই জানিতে পারা গেল। কিন্তু যাঁহারা জয়গোপালের অপেক্ষা দুই তিন বৎসর অধিক ওকালতী করিতেছেন, অথচ তাঁহাদিগের আয় জয়গোপালের আয় অপেক্ষা অল্প, তাঁহারা মৌখিক দুঃখ প্রকাশ করিলেন বটে, কিন্তু চেহারায় তদনুরূপ প্রকাশ হইল না। যাহা হউক, আমি যাঁহাকে জয়-গোপালের তরফ হইতে উকীল নিযুক্ত করিলাম, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আপনি কত টাকা লইবেন?" তিনি একজন বিজ্ঞ ও প্রাচীন উকীল। আমি যখন প্রথমে উকীল নিযুক্ত করিতে যাই, তখন দশ বার জন লোক আসিয়া আমাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। কেহ বলে,—'এ উকীলের কাছে যাও;' কেহ বলে—'ও উকীলের কাছে যাও;' কেহ বলে—'সে উকীলের কাছে যাও।' পরস্পর সকলেই কহিতে লাগিল,—'আমার উকীল যেমন বিজ্ঞ, ও যত অল্প টাকায় কাজ করেন, ওরূপ বিজ্ঞ হইয়া অত অল্প টাকায় কেহই কার্য্য করেন না।' বস্তুতঃ আমার চতুষ্পার্শ্বে এত লোক সমবেত হইতে লাগিল যে, কালীঘাটে একশত টাকার পূজা দিতে গেলেও তত লোক সমবেত হয় না। কিন্তু কাহাকে ওকালত-নামা দেওয়া উচিত, তাহা আমি জয়গোপালের নিকট হইতে জানিয়া গিয়াছিলাম। সুতরাং অপরা-পরের কথা না শুনিয়া, তাঁহারই নিকটে গিয়া, তাঁহারই নামে ওকালত-নামা দিলাম। উপযুক্ত ষ্টাম্পে ওকালত-নামা লেখা হইল।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আপনি কত টাকা লইবেন?" তিনি কহিলেন,—"জয়-গোপালের মোকর্দ্দমায় আমি আর কি লইব? প্রথমতঃ আমরা উভয়ে এক ব্যবসায়ী; দ্বিতী-য়তঃ, জয়গোপাল আমাকে 'কাকা কাকা' বলিয়া ডাকিতেন; এমন অবস্থায়, তাঁহার নিকট হইতে টাকা লওয়া কি আমার উচিত? তবে যদি আমাকে নিতান্ত জিদ্ কর, তবে যা' তোমার অভিরুচি, তাই দেও।" এই বলিয়া, দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ করিলেন ও কহিলেন,—"মোহ-রারদিগের জন্যও ত কিছু চাই, এবং আমলা-খরচও কিছু আছে! তা এ সব কথা জয়-গোপালকে বলিলেই তিনি বুঝিতে পারিবেন। আহা! বাবাজীর এত অল্পদিনের মধ্যে যে এরূপ দুর্ঘটনা ঘটিবে, তাহা কাহার মনে ছিল। ছেলে-মানুষ কিনা, স্বভাবতঃ উদ্ধত, এই জন্যই এ সব বিপদ-ঘটনা হয়।" তাঁহার হস্ত এতাবৎ প্রসারিতই আছে। আমি এক দুই করিয়া পোনর টাকা সেই হস্তে গণিয়া দিলাম। গণনা সমাপন হইলেই, উকীল বাবুর একজন মোহরের, যেন জনান্তিকে আমাকে বলিলেন এই ভাণ করিয়া, আমাকে কহিলেন,—"আরে তুমি পাগল নাকি? বাবুকে পোনর টাকা দিলে? উনি পঞ্চাশ টাকার কমে যে কখন মকর্দ্দমা নেন না? পোনর টাকা কি বিবেচনায় দিলে?" একথা বাবু বিলক্ষণ শুনিতে পাইলেন, এবং শুনিয়া একটু কাষ্ঠ হাসি হাসিলেন। তখন আমি মোহরীর দিকে চাহিয়া কহিলাম,—"আমাকে কি পাগল পেয়েছ? আমি কি জানি না যে, বাবু পঞ্চাশ টাকার কম নেন না? আমার কাছে নগদ পোনর টাকার বেশী নাই; বাকী টাকার নোট দিচ্চি।" অবিলম্বে আমি একখানি বিশ টাকার, একখানি দশ টাকার ও একখানি পাঁচ টাকার নোট

পকেট হইতে বাহির করিয়া দিলাম। নগদে ও নোটে পঞ্চাশ টাকা পাইয়া বাবুর কাষ্ঠ-হাসি মিষ্ট-হাসির রূপ ধারণ করিল।

আমাদের অকাল বার্দ্ধক্যের কারণ কি?

একথা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন যে, আমরা যতই আধুনিক সভ্যতা-স্রোতে গা ঢালিয়া দিতেছি, ততই অকাল বার্দ্ধক্যের প্রভাব আমাদের উপর খরতর বেগে বিস্তার হইতেছে। আমাদের চতুর্দ্দিকেই ইহার জ্বলন্ত প্রমাণ রহিয়াছে, একটু অনুধাবন করি-লেই স্পষ্ট দেখা যাইবে। আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ অপেক্ষা আমরা ক্রমেই অল্পায়ু, রুগ্ন, অকাল-বার্দ্ধক্য-পীড়নে পীড়িত হইতেছি। পূর্ব্ব-পুরুষদিগের সহিত তুলনায় কাজ নাই; পল্লিগ্রাম-বাসী ও নিম্নশ্রেণীর লোকের সহিত আধুনিক সভ্যতা-প্রাপ্ত ব্যক্তির আয়ু, দৈহিক-শক্তি ও স্বাস্থ্য, কোন রূপেই তুলনা হয় না। এইরূপ হইবার কি কি প্রধান কারণ আছে, আমরা নিম্নে সংক্ষেপে তাহারই আলোচনা করিব। স্বদেশহিতৈষীগণ এসম্বন্ধে একবার চিন্তা করিয়া দেখেন ইহাই একমাত্র প্রার্থনা।

১। অত্যল্প বয়সে কঠোর মানসিক শ্রম।—ইংলণ্ড, জর্ম্মাণি, ফরাসী প্রভৃতি দেশের বালকগণ বাল্যকাল হইতে শ্রম করিয়া থাকে, আমাদের দেশে পূর্ব্বে টোলে ও পাঠশালায় ছাত্রগণ যথেষ্ট শ্রমের সহিত বিদ্যা উপার্জ্জন করিতেন। ইউরোপের বিদ্যালয়-সমূহে, কি পূর্ব্বে আমাদের দেশে, কোন বালকের স্বাস্থ্য নষ্ট হইত না। আজ কাল ইংরেজী-বিদ্যালয়ে বালকগণের দেহ-মন চিরকালের জন্য নিস্তেজ হইতেছে। ইহার কারণ কি? পূর্ব্বে বালক-গণ নিজ নিজ জাতীয় ভাষা অধ্যয়ন করিত। জাতীয় ভাষা বাল্যকালে অভ্যাস করা তত কঠিন বোধ হয় না; এ ভিন্ন, তাহাতে তত শ্রম ও আয়াশ করিতে হয় না। আজকাল অতি শৈশবকাল হইতেই বালকগণ বিজাতীয় ভাষায় ব্যুৎপন্ন হইতে প্রাণপণে চেষ্টা করে। বিদ্যালয়ের কঠোর শ্রম, বিজাতীয় ভাষা অভ্যাস, খাদ্যের অপূর্ণতা ইত্যাদি নানা কারণে শরীর শীঘ্রই ভঙ্গ হইয়া যায়। যে বয়সে দেহের গঠন ও বর্দ্ধন পূর্ণ হইবার প্রয়োজন, যে বয়সে পূর্ণ আহার গ্রহণের একান্ত প্রয়োজন, যে সময় বয়স-অনুরূপ পরিমিত শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন, যে বয়সে দেহ-গঠনের পূর্ণতা-জন্য উপযুক্ত সুনিদ্রার প্রয়োজন; সেই বয়সে বালকগণ বাটী ছাড়িয়া বৃহৎ কোন নগরের একটী হোটেলে অথবা বাসাতে বাস করিতে আরম্ভ করে, কোন রূপ অসার অপূর্ণ আহারে দিন কাটাইতে থাকে, আহার গ্রহণ করিয়া পরিপাকের জন্য বিশ্রাম নাই, নিদ্রা নাই, শরীরের চালনা নাই, অথচ তাহার উপর অতি কঠোর বিজাতীয় ভাষা একমনে এক ধ্যানে অধ্যয়ন করিয়া থাকে। ১৬ অথবা নিতান্ত অল্প বয়সে এণ্ট্রেন্স পাশ করিতে হইবে, নতুবা ভবিষ্যত-জীবনের উন্নতি নাই, এইরূপ নানা-কারণে বালকগণ অতি অল্প বয়স হইতেই কঠোর মানসিক শ্রম করিতে বাধ্য হইয়া থাকে। মাসিক পরীক্ষা, ত্রৈমাসিক পরীক্ষা, বাৎসরিক পরীক্ষা, তৎপরে এণ্ট্রেন্স, এল এ, বি এ, এম এ, বি এল পরীক্ষা ইত্যাদির ত্রাস, উৎসাহ, নিরুৎসাহ, দুশ্চিন্তা, অপমান, বিষাদ, রাত্রিজাগরণ, অপূর্ণ-আহার, ইত্যাদি কারণে অল্প বয়স্ক বালক ও যুবকগণের শরীরে ও মনে বিশাল বিপ্লব জন্মা-ইয়া, মন ও শরীরকে চিরকালের জন্য নিস্তেজ ও অকর্ম্মণ্য করিয়া দেয়। পূর্ব্বকালে এ দেশে এ সকল ত্রাসোৎপাদক পরীক্ষার নিয়ম ছিল না। ছাত্র সদ্বিদ্যাশালী হইলে, গুরু উপযুক্ত উপাধি প্রদান পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিয়া ছাত্রকে

বিদায় দিতেন। ষোড়শ বৎসর যে ব্যক্তি টোলে নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া উপাধি প্রাপ্ত হইতেন, তিনি প্রায় বিদ্বান-বিজ্ঞ হইয়া সংসারে প্রবেশ করিতেন। কিন্তু, যিনি ২৬ বৎসর বর্ত্তমান বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রথানুযায়ী বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া উপাধি প্রাপ্ত হন, তিনি রুগ্ন, উৎসাহশূন্য ও ধর্ম্ম-নীতি-বিহীন কেমন এক বিকৃত শরীর ও মন লইয়া সংসার-ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন। ইঁহাদের হৃদয়ে সাহস নাই, শরীরে রস নাই, চক্ষে জ্যোতি নাই, কেমন কেমন এক বিকৃত ভাব। এ ভিন্ন, ইহাঁদের ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়েও কোন দৃঢ় ভিত্তি দেখা যায় না। ভারতের পণ্ডিতেরা এই সকল নানা কারণেই কম্পিটিটিভ্ সিস্টম (competetive system) প্রথা প্রচলন করেন নাই। বর্ত্তমান-সময়ে ম্যালেরিয়া, ডাক্তারী চিকিৎসা, সুরাপান ইত্যাদি কারণেও এদেশ-বাসীগণের যেরূপ স্বাস্থ্য হানি হইতেছে, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রণালীতেও ক্রমশঃ আমাদিগকে সেইরূপ স্বাস্থ্য-বিহীন করিতেছে। ভয়, উৎসাহ, নিরুৎসাহ ইত্যাদি কারণে মানসিক বৃত্তি গুলি উত্তেজিত ও অবসাদ হইয়া থাকে; এবং এই সকল কারণে বালক ও যুবকগণ ক্রমে হতবুদ্ধি এবং কর্ত্তব্য-সাধনে ক্ষমতাহীন হয়। অতি অল্প বয়স হইতে কঠোর মানসিক পরিশ্রম করাতে এদেশের বালক ও যুবকগণের স্বাস্থ্য দিন দিন গুরুতররূপে হানি হইতেছে। কিন্তু শীঘ্রই ইহার প্রতিকার আবশ্যক।

২। বিদ্যাশিক্ষার সময়।—পূর্ব্বে প্রাতঃকালে ২।৩ ঘণ্টা এবং বৈকালে ২।৩ ঘণ্টাকাল ছাত্রগণ বিদ্যা অধ্যয়ন করিত। মধ্যাহ্নকাল আহার ও বিশ্রামে ক্ষেপণ করিত। এ দেশ উষ্ণ-প্রবল বিধায় মধ্যাহ্ন কালে কঠোর মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রম অত্যন্ত কষ্টকর ও স্বাস্থ্য হানিকর। এসময়ে বিশ্রাম ও সহজ কার্য্য ভিন্ন কঠোর কার্য্য স্বাস্থ্যপ্রদ নহে। মধ্যাহ্নকালের পূর্ব্বে ১০ দণ্ডের সময় (অনুমান ১০টা) আহার করা এদেশের নিয়ম এবং এদেশীয়দিগের পক্ষে স্বাস্থ্যকর; এ সময়ের আহারই আমাদিগের প্রধান আহার। রাত্রিতে লঘু আহার করা এদেশের প্রচলিত প্রথা। বিলাতে (হিম-প্রধান দেশে) প্রাতঃকাল ও সায়ংকাল অত্যন্ত কষ্টকর; শীতে লোক প্রায় জড়সড় হইয়া থাকে, এসময় পরিশ্রম করা কি গৃহের বাহির হওয়া অত্যন্ত ক্লেশকর। মধ্যাহ্নকাল হিম-প্রধান দেশে কার্য্যোপযোগী সময়। প্রাতঃকালে লঘু আহার 'ব্রেকফাষ্ট' করিয়া বিদ্যার্থিগণ বিদ্যালয়ে ও কার্য্যার্থিগণ কার্য্যালয়ে গমন করে; সায়ংকালের পূর্ব্বে বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া কিয়ৎকাল বিশ্রাম করে। সায়ংকাল ইহাদের 'ডিনার টাইম' অর্থাৎ প্রধান আহারের সময়। এদেশের বালক ও যুবকগণের যে সময় পাকাশয় মধ্যে আহার্য্য পরিপাক হইতে থাকে, সেই সময় অঙ্ক-শাস্ত্রের পর্য্যালোচনায়, ভূগোল-বৃত্তান্তের তত্ত্বাবধারণে, বিজাতীয় সাহিত্য-শাস্ত্রের বিবৃতি-করণে বা অন্য কোন কঠোর মানসিক পরিশ্রমে নিযুক্ত থাকে। মন ও শরীর উপযুক্ত বিশ্রাম না পাওয়ায় আহারীয় পদার্থ উপযুক্তরূপে পরিপাক হয় না। এইরূপে পাকাশয়ের ক্লান্তি জন্মে। প্রতিদিন এই ক্লান্তির জন্য ক্রমে অগ্নিমান্দ্য হয় ও আহার কমিয়া যায়। ক্রমে অল্পাহার জন্য বালকের শারীরিক শক্তির হ্রাস হয়; মাথা ঘোরা, দৃষ্টি হীনতাও বুদ্ধিহীনতা ইত্যাদি উপস্থিত হয়। বালক, বিদ্যালয়ে যতই উন্নত হইতে থাকে, ততই অকাল বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইয়া পড়ে।

৩। শারীরিক পরিশ্রমের অভাব।—অতি শৈশবকাল হইতে এদেশের বালকগণ একমাত্র বিজাতীয় ভাষায় কৃতবিদ্য হওয়ার জন্য সর্ব্বদা মানসিক চিন্তা করিয়া থাকে। শারীরিক পরিশ্রম করেই না; অথবা শারীরিক পরিশ্রম করিতে যথেষ্ট সময়ও প্রাপ্ত হয় না। শারীরিক পরিশ্রমের অভাবে স্বাস্থ্য ক্রমে ক্রমে হীন হইয়া হইয়া পড়ে। শরীরে বল না থাকিলে, উৎসাহ, স্ফূর্ত্তি, ইত্যাদি কিছুই থাকে না। এভিন্ন, শরীর ক্রমশঃ রুগ্ন ও নানা কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া পড়ে।

৪। অবৈধ ইন্দ্রিয়-সেবন।—পাশ্চাত্য সভ্যতা যতই খরতর বেগে অগ্রসর হইতেছে, ততই লোক-লজ্জা, সমাজ-বন্ধন, প্রাচীন নিয়ম ইত্যাদির মাথা খাইতেছেন। অবৈধ ইন্দ্রিয়-সেবনের ফলে এদেশের যে কি মহান্ অনিষ্ট হইতেছে তাহা প্রকাশ করিয়া বলা অসাধ্য! যে দেশে কালাকাল, পাত্রাপাত্র, সময়-অসময়, বিবেচনা না করিয়া লোক ক্ষণস্থায়ী নরকবৎ ইন্দ্রিয়-সেবন-জন্য অনুক্ষণ লালায়িত, সে দেশের লোক যে মহা জরাগ্রস্ত বা একেবারে বিনাশ প্রাপ্ত না হইয়া কেবল জরাদেহে জীবিত আছে, ইহাই করুণাময় ঈশ্বরের অশেষ দয়া-গুণই বলিতে হইবে। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ "পুত্রের জন্য ভার্য্যার প্রয়োজন" কথা শাস্ত্র-সম্মত করিয়া যান, ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, পূর্ব্বে বংশ রক্ষা হইলেই যথেষ্ট হইত। কিন্তু হায়! আজকাল আমরা অজ্ঞতার মোহে মুগ্ধ হইয়া অণুক্ষণ পাশব সুখ-ভোগকেই 'বিবাহের প্রয়োজন করিয়া তুলিয়াছি। এ দেশের বালক ও যুবকগণ নানা কুৎসিত কুসংসর্গে পতিত হইয়া যে সকল উপায়ে অবৈধ ইন্দ্রিয়-সেবন করিয়া থাকেন, তাহা অনেকে "সুরুচির" বিরুদ্ধ বলিয়া উপেক্ষা করেন, কিন্তু এ দিকে বালক ও যুবকগণের এই একমাত্র কারণে সর্ব্বনাশ হইতেছে। বালক ও যুবকগণের অবৈধ উপায়ে ইন্দ্রিয়-সেবনের ফলে তাহাদের শরীর শীর্ণ, মস্তিষ্ক দুর্ব্বল, মাথা ঘোরা, দৃষ্টিহীনতা, ইত্যাদি নানা প্রকার কঠোর পীড়া জন্মিতেছে।

৫। বিলাসিতা।—আধুনিক সভ্যতার একটী প্রধান অঙ্গ বিলাসিতা। বিলাসিতা পাপে আমাদের দেহ বিশেষরূপে নষ্ট হয়, বা অকাল বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হয়। যান ভিন্ন না চলিলে ক্রমে মনুষ্য গতি-শক্তিহীন হইতে থাকে। ফলতঃ পূর্ব্বাপেক্ষা কত বিষয়ে যে আমাদের দেশের বালক, যুবা, বৃদ্ধ ও স্ত্রীজাতির বিলাসিতা বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহার নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। আধুনিক সভ্যতার কত মহিমা আছে, আমরা কয়টাই বা জানি, আর যাহা সামান্য জানি, তাহাই বা লিখিবার স্থান কোথায়! বিলাতী টাইটকোট, কম্ফটার প্রভৃতি; বিলাতী লেবেণ্ডার, ওয়াডিকলন প্রভৃতি সুগন্ধি-দ্রব্য; বিলাতী নানারূপ খাদ্য; বিলাতী রেলগাড়ী ইত্যাদি; বিলাতী শিক্ষা; বিলাতী আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি, হাব-ভাব প্রায় প্রত্যেক বিষয়েই ভারতবাসীর সর্ব্বনাশ করিতেছে। এই যে আলোর জন্য আমরা কেরোসিন তৈলের প্রদীপ জ্বালাইয়া থাকি, ইহার ধূম নাসিকাতে গ্রহণ করিলে স্বাস্থ্যের যে কত অনিষ্ট হয়, তাহা বর্ণনাতীত। বিলাতী এক একটা দ্রব্যের গুণাগুণ ও আমাদের শারীরিক প্রকৃতি যদি সম্যকরূপে দেখা যায়, তবে দেখান যাইতে পারে যে, বিলাতী প্রত্যেক দ্রব্য আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে ন্যূনাধিক পরিমাণে অনিষ্ট করিয়া থাকে।

৬। নৈরাশ্য, দরিদ্রতা, মানসিক উদ্বেগ।—আমরা যতই পাশ্চাত্য সভ্যতার সহিত ঘনিষ্টতা করিতেছি, ততই নূতন নূতন দ্রব্য ব্যবহার ও নূতন নূতন কৃত্রিম সুখ-সেবার ইচ্ছা আমাদের প্রবল হইতেছে, বাসনা কিছুতেই মিটিতেছে না; এবং বাসনা মিটাইবার জন্য দেশত্যাগী, পরিবার স্বজনের অন্তরে থাকিয়া মনের উদ্বেগে নিরাশায় দিন কাটাইতেছি। "অঋণী, অপ্রবাসী, মধ্যাহ্নে শাকান্ন ভোজী" এই শ্রেণীস্থ লোক আজকাল ক্রমশঃই বিরল হইতেছে। ফলতঃ বিলা-

চিন্তার নানা কারণে এদেশে দুঃখীর সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি হইতেছে। দুঃখীর স্বাস্থ্য-রক্ষা ভালরূপ হয় না, নানাবিধ চিন্তায় ক্রমে আয়ু-নাশ ও দেহ-ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। অল্প বয়স হইতে দুঃখের সহিত মিত্রতা করিলে, দেহ কদাচও পূর্ণ হইতে পারে না; সুতরাং অকালেই বার্দ্ধক্য উপস্থিত হয়। এভিন্ন, রাজনৈতিক নানা কারণেও এদেশে ক্রমে দরিদ্র হইতেছে। পূর্ব্বে এ দেশের লোকের খাওয়া-পরার বড় ভাবনা ছিল না। এখন নানা কারণে সকলেরই "অন্ন চিন্তায়" দিবা রাত্রি কঠোর পরিশ্রম করিতে হয় ও কি উপায়ে পরিবার প্রতিপালন করিব এই চিন্তায় সর্ব্বদা অস্থির। নৈরাশ্য, দরিদ্রতা মানসিক-উদ্বেগে আয়ু-নাশ, স্বাস্থ্য-নষ্ট, ও দেহ অকালে পতন হয়, ইহা স্থির সত্য। কি কি উপায় অবলম্বন করিলে, এদেশের লোকের দরিদ্রতা দূর হইতে পারে, ইহা স্বদেশ-হিতৈষী প্রত্যেক মহাত্মারই চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত। এদেশের দরিদ্রতা দূরীভূত করিতে না পারিলে অন্যান্য উন্নতিও যেমন অসম্ভব, স্বাস্থ্যের উন্নতিও সেরূপ অসম্ভব।

৭। প্রাচীন রীতি-নীতি পরিত্যাগ।—প্রাচীন রীতি-নীতি পরিত্যাগ করিয়া আমাদিগকে যে কত প্রকারে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইতে হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। শাস্ত্র সম্মত প্রাচীন রীতিনীতি গুলি সমস্তই আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যন্ত হিতকারী ছিল। প্রাচীন মহর্ষিরা বহুচিন্তা ও দূরদর্শন করিয়া আমাদের মঙ্গলের জন্য যে সকল রীতি-নীতি প্রচলন করিয়া গিয়াছেন, আমরা সে গুলিকে কুসংস্কার বলিয়া উড়াইয়া দিতেছি। অথচ আমরা দিব্য চক্ষে দেখিতেছি যে, আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ ঐ সকল রীতি-নীতি পালন করিয়া দীর্ঘজীবী, বলিষ্ঠ ও নিরোগী ছিলেন। এখনও যাঁহারা প্রাচীন নিয়মগুলি পালন করেন, তাঁহারা যুবক-গণের অপেক্ষা অনেক পরিমাণে নিরোগী ও বলিষ্ঠ আছেন। ফলতঃ এদেশবাসী লোক-দিগকে অকাল বার্দ্ধক্যের হস্ত হইতে পরিত্রাণ করিতে হইলে আমাদের সর্ব্বাগ্রে প্রাচীন রীতি-নীতিগুলি দৃঢ়ভাবে পুনরায় সমাজে প্রচলন করা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক।

৮। বিলাতী ঔষধ বাহুল্যরূপে ব্যবহার।—বিলাতী তেজস্কর ঔষধ বাহুল্যরূপে আমরা ব্যবহার করায় আমাদের স্বাস্থ্য গুরুতরভাবে নষ্ট হইতেছে। আমরা গ্রীষ্ম-প্রধান দেশবাসী, ও আমাদের প্রকৃতি সম্পূর্ণরূপ শীত-প্রধান দেশবাসীদের হইতে ভিন্ন। শীত-প্রধান দেশ-বাসী লোকের শরীরের পক্ষে উপকারী ও পরী-ক্ষিত ঔষধ আমাদের কখনই স্বাস্থ্যকর হইতে পারে না। বর্ত্তমান সময় শিশুদিগের জন্মের দিন হইতেই সেই সকল তেজস্কর ও সুরা-ঘটিত ঔষধ প্রয়োগ করান হইয়া থাকে। অনেক সময় সামান্য সামান্য ব্যারামে অতিরিক্ত ঔষধ সেবনেও বিশেষ অনিষ্ট হইতেছে। যে সকল পীড়ায় সামান্য গাছ গাছড়া ব্যবহার, কি একটু নিয়ম পালন করিলেই আরাম হইতে পারে, আমাদের আজকাল সেই সকল পীড়াতে অনেক সময়ই বিলাতী ঔষধ বাহুল্যরূপে ব্যবহৃত হইতে থাকে। ফলতঃ যে সকল ব্যাধি ডাক্তারী-চিকিৎসা ভিন্ন সহজে আরাম হইবার সম্ভাবনা নাই, সে সকল পীড়াতে বাধ্য হইয়াই আমাদিগকে ডাক্তারী ঔষধ ব্যবহার করিতে হয়। কিন্তু যে সকল পীড়া অতি সহজে আরাম হয়, ও দেশীয় সামান্য সামান্য ঔষধ কি আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসায় আরাম হওয়ার সম্ভব, সে সকল পীড়াতে ডাক্তারী-চিকিৎসা করা নিতান্ত অসঙ্গত। সকলেরই এক কথা মনে রাখা উচিত যে, ডাক্তারী চিকিৎসা আমাদের প্রকৃতির বিরুদ্ধ ও তেজস্কর ঔষধ। প্রায়তপক্ষে সেই বিরুদ্ধ-প্রকৃতির ও তেজস্কর ঔষধ ব্যবহার করা স্বাস্থ্য-রক্ষার নিয়ম বিরুদ্ধ। যাহা হউক আজকাল ডাক্তারী তেজস্কর ও সুরা-ঘটিত ঔষধ বাহুল্যরূপে ব্যবহার করা, অকাল বার্দ্ধক্যের অন্যতম কারণ বলিয়া আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি। যাহাতে ডাক্তারী-চিকিৎসা আমাদের মধ্যে বাহুল্যরূপে প্রচলন হইতে না পারে, তাহার চেষ্টা স্বদেশ-হিতৈষী গণের করা একান্ত কর্ত্তব্য।

মোহ-মুদ্গর। *

(মূল ও পদ্যানুবাদ)

মূঢ়! জহীহি ধনাগমতৃষ্ণাম্
কুরু তনুবুদ্ধে! মনসি বিতৃষ্ণাম্।
যল্লভসে নিজকর্ম্মোপাত্তম্
বিত্তং তেন বিনোদয় চিত্তম্ ॥১।

অরে মূঢ়! ধনলাভস্পৃহা পরিহর,
ধনেতে বিরাগ মনে আনয়ন কর;
আপনার কর্ম্মফলে লভিবে যে ধন,
তাহাতেই কর নিজ চিত্ত বিনোদন।

কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ
সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ।
কস্য ত্বং বা কুত আয়াতঃ
তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ ॥২।

কেবা তব কান্তা আর কে তব কুমার!
অতীব বিচিত্র এই মায়ার সংসার!
কোথা হ'তে আসিয়াছ তুমি বা কাহার!
অতএব ভাব ভাই! এই তত্ত্ব সার।

নলিনী-দল-গত-জলমতি-তরলম্
তদ্বজ্জীবন মতিশয় চপলম্।
বিদ্ধি ব্যাধিব্যালগ্রস্তম্
লোকং শোকহতঞ্চ সমস্তম্ ॥৩।

পদ্মপত্রে বারিবিন্দু যেমন চঞ্চল,
জীবন তেমন হয় অতীব চপল;

* ভগবান শঙ্করাচার্য্যের উপদেশ রাশি এক এক পূর্ব্ব জিনিস। "মোহমুদ্গর" তাহারই অন্যতম। স্থলে তাঁহার সেই "মোহমুদ্গরের" মূল ১৬টী শ্লোক ও তাহার পদ্যানুবাদ মাত্র প্রদত্ত হইল। যাহা সুন্দর, তাহা সর্ব্বত্রই সুন্দর। সুতরাং যেরূপ ভাবেই হউক, ইহাতে সকলেই পরিতৃপ্ত, তাহা বলাই বাহুল্য।

জানিও করেছে গ্রাস ব্যাধি বিষধর,
সমস্ত সংসার তাই শোকে জর জর।

অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডম্
দন্তবিহীনং জাতং তুণ্ডম্।
করধৃত-কম্পিত-শোভিত-দণ্ডম্
তদপি না মুঞ্চত্যাশা-ভাণ্ডম্ ॥৪।

ধবল বরণ কেশ, শরীর গলিত,
বদন দশন হীন, দেখিতে ঘৃণিত;
চলিয়া যাইতে যষ্টি কাঁপে সদা করে,
তবু আশা-ভাণ্ড নর নাহি ত্যাগ করে।

দিনযামিন্যৌ সায়ং প্রাতঃ
শিশিরবসন্তৌ পুনরায়াতঃ।
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ুঃ
তদপি ন মুঞ্চত্যাশা-বায়ুঃ ॥৫।

দিবস যামিনী আর সায়াহ্ন প্রভাত,
শিশির বসন্ত পুনঃ করে যাতায়াত;
এইরূপে খেলে কাল, ক্ষয় পায় আয়ু,
তথাপি মানব নাহি ছাড়ে আশা-বায়ু।

অষ্টকুলাচল-সপ্ত-সমুদ্রাঃ
ব্রহ্ম-পুরন্দর-দিনকর-রুদ্রাঃ।
ন ত্বং নাহং নায়ং লোকঃ
তদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ ॥৬।

অষ্টকুলাচল আর সপ্ত রত্নাকর,
ব্রহ্মা, পুরন্দর কিম্বা রুদ্র দিনকর;
তুমি, আমি, এই বিশ্ব, সকলি স্বপন,
তবে কেন শোকে তুমি হও হে মগন।

যাবজ্জননং তাবন্মরণম্
তাবজ্জননী-জঠরে শয়নম্।
ইতি সংসারে স্ফুটতর-দোষঃ
কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ ॥৭।

যাবৎ জনম হয় তাবৎ মরণ,
জননীর জঠরেতে আবার শয়ন;
এসংসার এইরূপ দুঃখের আগার,
তবে কেন হে মানব সন্তোষ তোমার।

সুর-মন্দির-তরু মূল-নিবাসঃ
শয্যা ভূতলমজিনং বাসঃ।
সর্ব্ব-পরিগ্রহ-ভোগ-ত্যাগঃ
কস্য সুখং ন করোতি বিরাগ ॥৮।

দেবের মন্দিরে কিম্বা তরু তলে বাস,
ভূতলে শয়ন আর মৃগচর্ম্ম বাস ;
সমুদয় পরিজন ভোগ পরিহার,
এ হেন বিরাগে সুখ নাহি হয় কা'র।

বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্তঃ
তরুণস্তাবৎ তরুণী-রক্তঃ।
বৃদ্ধস্তাবৎ চিন্তামগ্নঃ
পরমে ব্রহ্মণি কোঽপি ন লগ্নঃ ॥৯।

খেলায় আসক্ত যত বালকের দল,
তরুণীতে অনুরক্ত তরুণ সকল,
সংসার চিন্তায় মগ্ন বৃদ্ধ সমুদয়,
পরম ব্রহ্মেতে লগ্ন কেহই ত নয়!

যাবদ্ বিত্তোপার্জ্জন-শক্তঃ
তাবন্নিজ-পরিবারো রক্তঃ
তদনু চ জরয়া জর্জ্জর-দেহে
বার্ত্তাং কোঽপি ন পৃচ্ছতি গেহে ॥১০।

যতদিন করে নর ধন উপার্জ্জন,
ততদিন বশে থাকে নিজ পরিজন ;
পরে যবে বৃদ্ধকালে জীর্ণ হয় দেহ,
ডেকেও জিজ্ঞাসা করে নাহি করে কেহ।

অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যম্
নাস্তি ততঃ সুখ-লেশঃ সত্যম্
পুত্রাদপি ধন ভাজাং ভীতিঃ
সর্ব্বত্রৈষা কথিতা নীতিঃ ॥১১।

অর্থ অনর্থের মূল ভাব সদা মনে,
বাস্তবিক লেশমাত্র সুখ নাহি ধনে ;
তনয় হ'তেও হয় ধনশালী ভীত,
সর্ব্বত্রই এই নীতি আছয়ে কথিত।

মা কুরু ধন-জন-যৌবন-গর্ব্বম্
হরতি নিমেষাৎকালঃ সর্ব্বম্।
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা
ব্রহ্ম-পদং প্রবিশাশু বিদিত্বা ॥১২।

ধন জন যৌবনের ত্যজ অহঙ্কার,
নিমেষে কৃতান্ত করে সকলি সংহার ;
পরিহর এসংসার ঘোর মায়াময়,
জানি ব্রহ্মপদ শীঘ্র করহ আশ্রয়।

শত্রৌ মিত্রে পুত্রে বন্ধৌ
মা কুরু যত্নং সমরে সন্ধৌ।
ভব সমচিত্তঃ সর্ব্বত্র ত্বম্
বাঞ্ছস্যচিরাৎ যদি বিষ্ণুত্বম্ ॥১৩।

শত্রু, মিত্র, পুত্র, বন্ধু, সন্ধি কিম্বা রণ,
এসব বিষয়ে নাহি করিও যতন ;
সর্ব্বভূতে সমভাব ভাব নিরন্তর,
বিষ্ণুপদ বাঞ্ছা যদি করহ সত্বর।

ত্বয়ি ময়ি চান্যত্রৈকো বিষ্ণুঃ
ব্যর্থং কুপ্যসি ময্যসহিষ্ণুঃ।
সর্ব্বং পশ্যাত্মন্যাত্মানম্
সর্ব্বত্রোৎসৃজ ভেদজ্ঞানম্ ॥১৪।

তোমাতে, আমাতে, সর্ব্বজীবে একহরি,
বৃথা কেন কর ক্রোধ ধৈর্য্য পরিহরি ;
আপন আত্মায় হের আত্মা সবাকার,
সর্ব্বভূতে ভেদজ্ঞান কর পরিহার।

কামং ক্রোধং লোভং মোহম্
ত্যক্ত্বাত্মানং পশ্য হি কোঽহম্।
আত্মজ্ঞান-বিহীনা মূঢ়াঃ
তে পচ্যন্তে নরক-নিগূঢ়াঃ ॥১৫।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ করি পরিহার,
'কে আমি' তা 'আপনারে' দেখ একবার
আত্মজ্ঞান পরিহীন যত মূঢ় জন,
দুস্তর নরকে ডুবি পচে অনুক্ষণ।

তত্ত্বং চিন্তয় সততং চিত্তে
পরিহর চিন্তাং নশ্বর-বিত্তে।
ক্ষণমিহ সজ্জন-সঙ্গতিরেকা
ভবতি ভবার্ণব-তরণে নৌকা ॥১৬।

পরমাত্ম-তত্ত্ব সদা করহ চিন্তন,
অনিত্য ধনের চিন্তা করহ বর্জ্জন ;
ক্ষণকাল সাধুসঙ্গ কেবল সংসারে,
একমাত্র তরি ভবসিন্ধু তরিবারে।

ষোড়শ-পজ্ঝটিকাভিরশেষঃ
শিষ্যাণাং কথিতোভ্যুপদেশ ॥
যেষাং নৈষ করোতি বিবেকম্
তেষাং কঃ কুরুতামতিরেকম্

পজ্ঝটিকা ছন্দে শ্লোক ষোড়শ রচিত,
শিষ্য উপদেশ তরে হইল কথিত ;
ইহাতেও না হইবে বিবেক যাহার,
কেবা আর উপদেশে কি করিবে তা'র।

মা ব্রহ্মময়ী, আমায় একবার কোলে লও।

মা ব্রহ্মময়ী, আমায় কোলে লও। আর কেন মা, এইবার কোলে লও। আর আমি কাঁদিতে পারি না। মা, অনেক কাঁদিয়াছি, এখনও কি তোমার তৃপ্তি হইল না? যে দিন কর্ম্ম-সূত্রে বাঁধিয়া অদৃষ্টের তাড়নায় কর্ম্ম-ভূমিতে ফেলিয়া দিয়াছ, সেইদিন হইতে কাঁদিতেছি, আর আজিও থামিতে পারিলাম না। মা, আর পারি না, আর আমি কাঁদিতে পারি না। একবার আমায় কোলে তুলিয়া লও, একবার আদর করিয়া চক্ষু মুছাইয়া দাও, তাহার পর ইচ্ছা হয়, আবার ভাল করিয়া মাটিয়া বাঁধিয়া ফেলিয়া দিও ; কিন্তু এবার আর কাঁদিতে পারিতেছি না, কাঁদিয়া কাঁদিয়া এবার আমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছে,—মা, একবার কোলে লও।

তুমি কি তেমনি মা? তুমি কি উপরোধ-অনুরোধ শুনিবার মেয়ে? নহিলে এত সাধিতেছি, এত কাঁদিতেছি, তাহা কি শুনিতে পাইতেছ না? পাইলে কি হইবে? হয়ত এ সাধনা এ কান্না তোমার কর্ণে স্থান পাইবার উপযুক্ত হইতেছে না! মা ইচ্ছাময়ী, তোমার মত পাগ্‌লী কি আর আছে মা? যদি এ সাধনা এ কান্না কাণেই না তুলিবে, তবে এরূপ সাধাইতে, এরূপ কাঁদাইতে তোমায় কে বলিল? সেই যদি সাধাইলে, সেই যদি কাঁদাইলে, তবে যাহা তোমার গ্রাহ্য হইতে পারে সেইরূপ সাধনা সাধাইলে না কেন, সেইরূপ কান্না কাঁদাইলে না কেন? তুমি ত সব পার মা!

মা, তুমি যে সব পার তা'ত আমি জানি, আর ধ্রুব-প্রহ্লাদ রামপ্রসাদও তা'রই সাক্ষী আছে! মা, একস্থানে নয়, একজনের সঙ্গে নয়, সকলেরই সঙ্গেই তোমার ক্ষেপামী! শিশু, বালক, যুবা, বৃদ্ধ, মুমূর্ষু,—কেহই তোমার পাগলামীর হাত এড়াইতে পারে না। তোমার মত ক্ষেপা মেয়ে আর দেখিতে পাই না মা! তা' না হ'লে, ৫ বৎসরের শিশু ধ্রুব, তাহাকে লইয়া কি রঙ্গই না করিয়াছ? রাজার ছেলে—তা'কে সামান্য কারণে বনে পাঠাইয়াছিলে, সামান্য কারণে শুদ্ধ "পদ্মপলাশলোচন! তুমি কোথায়?" এই কথাটি মাত্র সম্বল করিয়া দিয়া শিশু বয়সেই মায়ের কোল ছাড়া করিয়াছিলে, পদ্মপলাশলোচন কি তাহাও তখন তাহাকে বুঝাও নাই, কত ক্লেশে ফেলিয়া শেষে নারদকে দিয়া বুঝাইয়াছিলে, তবু কি তোমার তৃপ্তি হইয়াছিল?—সেই দুধের বালক—তাহাকে পদ্মপলাশলোচনের জন্য বনে বনে ঘুরাইয়া কতই না কাঁদাইলে? পরে তাহাকে দিয়াই ঊর্দ্ধপদে; হেঁটমুণ্ডে পঞ্চতপা করাইয়াছিলে! এতটা করাইয়া, শেষে তাহাকে "পদ্মপলাশলোচন" দেখাইয়াছিলে বটে; এ কি তোমার বিষম ক্ষেপামী নয়? সেই ত শেষে তা'কে পদ্মপলাশলোচন দেখাইলে, তাহাই একটু আগে কি দেখাইতে পারিতে না—কাঁদাইবার আগে তাহাকে পদ্মপলাশলোচনের জন্য পাগল করিতে পারিলে, তারে আর দেখাইতে পারিতে না? রাজার ছেলেকে কি রাজ্যছাড়া, মায়ের কোল-

ছাড়া না করিয়া, পদ্মপলাশলোচন দেখাইতে পারিতে না? যদি না পারিতে, তবে বলিকে বামনরূপ দেখাইলে কিরূপে? শুম্ভনিশুম্ভ-রক্তবীজাদিকে তোমার করালিনী কালীমূর্ত্তি দেখাইলে কিরূপে?

মা, প্রহ্লাদের কথা একবার স্মরণ কর দেখি? প্রহ্লাদ বালক, তাহার কোন শিক্ষাই হয় নাই; ষণ্ডামার্ক তাহাকে প্রথম বর্ণ "ক" শিখাইতে গেল, অমনি তুমি তাহাকে লইয়া খেলা আরম্ভ করিয়া দিলে! সে দুগ্ধপোষ্য বালককে "ক"-য়ে "কৃষ্ণ" দেখাইলে; কৃষ্ণনাম কি, তাহা তখনও তাহাকে বুঝাইলে না, তবু 'ক'য়ে কৃষ্ণনাম দেখাইয়া তাহাকে প্রেমে ভাসাইলে, কাঁদাইলে! শেষে, সেই প্রহ্লাদকে সেই কান্নার দায়ে হস্তিপদতলে, শিলাতলে, জলে, ফেলাইলে, তবু তোমার তৃপ্তি হইল না, তাহার নামের জন্য কান্নাও থামাইলে না। তার পর বিষ দিলে; কিন্তু বিষ দিয়া নিজেই আবার গোপালরূপে সেই বিষ খাইলে; তবু কৃষ্ণ দেখাইলে না বা তাহার কান্না থামাইলে না! আবার সেই কান্নার দায়ে তাহাকে আগুনে ফেলিলে। তবুও তৃপ্তি নাই। পুনরায় তাহাকে সেই নামের দায়ে কাঁদাইতে কাঁদাইতে হিরণ্যকশিপুর খড়্গের মুখে উপস্থিত করিলে! এতটা অত্যাচার যখন সেইটুকু ছেলের উপর করিতে পারিলে, তখন কাজেই, প্রথমে তাহার মুখ দিয়া বলাইয়া শেষে নিজেই স্ফটিক-স্তম্ভ বিদারণ করিয়া নৃসিংহ-মূর্ত্তিতে বাহির হইলে! কিন্তু তাহাতেই বা তাহার কি করিলে, সে কৃষ্ণ দেখিল সত্য, কিন্তু তাহার পিতাকে যে হারাইল! মা, তোমার এ বিট্‌কেল ক্ষেপামী বুঝা ভার। কেন মা, তুমি এত না করিয়া হিরণ্যকশিপুর মন ফিরাইতে (বা আরও মূল কারণ অনুসরণ করিলে, প্রথমতঃ—"আমরা বিষ্ণুর দ্বারী"—জয় বিজয়ের এই অহঙ্কার নাশ বা তৎপরে বিষ্ণু-দর্শনলোলুপ সনকের ক্রোধ-শান্তি বা ক্রোধের উৎপত্তি না করিতে) পারিতে না? কিন্তু তা করিবে কেন? করিলে, তোমার খেলা চলে না। তোমার বড় সাধের সৃষ্টি "মোহ" বেচারী তাহা হইলে দাঁড়ায় কোথায়? 'অঘটন-ঘটন-পটীয়সী "মায়াকে" যে তাহা হইলে নিরাশ্রয়া হইয়া মহামায়ায় বিলীন হইতে হয়! কাজেই তাহা হয় নাই। তাই বলিয়াই কি মা, আমি এখনও কাঁদিতেছি, আর তুমি শুনিয়াও শুনিতেছ না?

মা, তুমি রামপ্রসাদকে তোমার মনের মত করিয়াই কাঁদাইয়াছিলে; তা'ই তা'র কান্না শুনিয়া ছুটিয়া আসিয়া তা'র বেড়া বাঁধিয়া দিয়া গিয়াছিলে! তুমিই তা'কে তোমার মনের মত সাধনা সাধাইয়াছিলে, তা'ই তুমি তা'কে তোমার খাস তালুকের নাতোয়ান প্রজা করিয়াছিলে, তুমিই তা'কে কালী-তারা নামের গণ্ডি দিতে শিখাইয়াছিলে, তা'ই তুমিই তা'র যমের ভটাকে তাড়াইয়াছিলে। তুমি তা'কে কালীনাম দিয়া তা'র জাতি মারিয়াছিলে, তা'ই যা'তে শমন তা'কে ছুঁ'তে না পারে, তা'র উপায় করিয়াছিলে। তুমিই তা'কে তোমার তবিলদারী দিয়াছিলে, তা'ই তা'কে তোমার চরণ-ধূলার অধিকারী করিয়া, তা'কে হরের সঙ্গে বোঝা-পড়া করাইয়াছিলে! কিন্তু মা, আমার এ কি করিলে? আমায় কাঁদাইলে, আমায় সাধাইলে; অথচ, এ কান্না—এ সাধনা তোমার মনে ধরিল না, কাণে পোঁছিল না?

মা, মনে পড়ে, দারুণ পাপী অজামিলকে কেমন সামান্য কৌশলে উদ্ধার করিয়াছিলে? তাহাকে দিয়া বেশ্যা রাখাইলে, বেশ্যার অন্ন খাওয়াইলে, ব্রাহ্মণ-কুলে জন্ম দিয়াও শূদ্রের উপযুক্ত আচারের অপেক্ষাও হীনাচারী করিলে, যাহাকে লোকে পাপ বলিয়া থাকে, তাহার কোন কার্য্যই তাহাকে দিয়া করাইতে বাকী রাখিলে না; অথচ তাহার ঔরস-জাত বেশ্যা-

পুত্রের নাম নারায়ণ রাখাইলে, আর তাহার মুমূর্ষু অবস্থায় তুমিই তাহাকে দিয়া সেই বেশ্যাপুত্রের নাম ধরিয়া ডাকাইয়া তাহাকে যোগিজনেরও দুষ্প্রাপ্য 'বৈকুণ্ঠে' পাঠাইয়া দিলে, অজ্ঞানে "নারায়ণ" নাম উচ্চারণ করাইয়াও নামোচ্চারণের ফল দিলে; অথচ মা, আমাকে তিন সন্ধ্যা 'মা' বলাইয়া ডাকাইতেছ, কিন্তু সে ডাক শুনিতেছ না। মা, হয়ত আমি তোমায়, তোমার শুনিবার মত করিয়া ডাকিতে জানি না; কিন্তু যেরূপে ডাকিতেছি, তাহাও ত তুমিই বলাইতেছ; তবে কেন মা! শুনিতেছ না? অথবা যেরূপে "মা" বলিলে, তোমার কর্ণে 'মা' স্থান পাইবে, সেইরূপেই ডাকাইতে শিখাও। মা, আর কতকাল কাঁদিব? মা, তোমার এ বিষম খেলায় পড়িয়া, আমি আর কতকাল কাঁদিব?

মা, আমি এত 'মা, মা' বলিয়া কাঁদিতেছি, ডাকিতেছি; আর তুমি ততই কর্ণে যেন তুলা দিয়া বসিতেছ! মা, রোরুদ্যমান সন্তানকে একবার কোলে লও। মা, আমা হইতে আমার মোহ কি তোমার নিকট এত প্রিয় যে, তাহাকে আদর করিয়া আমার শরীর হইতে দূর করিতেছ না? মা, এ শরীর তুমি দিয়াছ; মতি, বুদ্ধি, জ্ঞান, গতিও তুমিই দিয়াছ, সুতরাং আমার যে মোহ জন্মে, তাহার জন্য কাহাকে দোষী করিব মা? মা, সন্তান মন্দ হইলে লোকে তাহার বাপ-মার ঔরস-গর্ভের দোষ দিয়া থাকে; কিন্তু মা, তুমি কি বলিয়া সে নিন্দার হাত এড়াইতে চাও? তুমিইত মা জীবের মনে প্রবৃত্তিরূপা,—তবে কর্ম্মদোষে আমায় কেন ভোগাও, আমায় কেন কাঁদাও? মা, একবার কোলে লও, একবার চক্ষু মুছাইয়া দাও; আমি তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কি সাধনা করিব মা? তুমি সাধনার ভাব প্রাণে না জাগাইলে, আমার সাধনা আসিবে কেন? তুমি প্রাণে ভক্তি না দিলে, আমি ভক্তি কোথায় পাইব? তুমি কর্ম্ম-সূত্রে বাঁধিয়া রাখিলে, আমি মোহ-পাশ ছিঁড়িব কি দিয়া?

তাই বলি মা, একবার আমায় কোলে লও, একবার আমার চক্ষুজল মুছাইয়া দাও। ত্রাহি ব্রহ্মময়ী।

"যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
যা দেবী সর্ব্ব-ভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু তৃষ্ণারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শ্রদ্ধারূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥
যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥"

মা, তবে বল দেখি, আমার নিজের কৃতিত্ব কোথায়? আমি নিজে কি করিতে পারি? তুমি আমার চেতনা, বুদ্ধি, শক্তি, আশা, শ্রদ্ধা—সবই তুমি। তার পর আমার যে ভ্রম হয়, তাহাও তুমি। তবে আর আমি কি? তুমি মা সকলের মা, আমারও কি মা নও? মা আমার একবার কোলে লও।

হতাশের প্রলাপ।

১

হৃদয়—হৃদয়—এ দগ্ধ আমার
হ'ল শূন্যময়—
অসম্পূর্ণ—সব ধূ—ধূ—
সব মরুময় :—
সময়ের গুণে (হায়!) কোথা
হ'তে এত দিনে...
বহিল পাগল-প্রাণে ভীষণ প্রলয়!

২

যতনে, প্রাণের কোণে
পুষেছিনু সাধে
দারুণ কুহকে প্রাণ-ভরা আশা—
* * * * *
মিটিল না আকাঙ্ক্ষার ক্ষর হুতাশন,—
যুড়িল না অভাগার আধ-ভাঙা মন,—
রহিল অতৃপ্ত ঘোর প্রাণের পিয়াসা।

৩

কোথা হ'তে এসেছিল,
কোথায় চলিয়া গেল,—
কে বুঝে এ মহা তথ্য?—কে বুঝা'বে মোরে?
এল যদি, গেল কেন?—
কোরকে কঠিন হেন
দারুণ পাষাণ দিয়া কে গঠিল তা'রে?

৪

শাস্ত্রে শুনি হেন বাণী—
কৌমার-যৌবন-জরা,
এই দেহে পরম্পরা,
আসে যায় নিতি-নিতি—ক্রমিক নিয়ম-ধরা;
জন্ম-মৃত্যু-অবস্থান,
হ্রাস-বৃদ্ধি-তিরোধান,
সেইরূপ ক্রম-সূত্রে প্রকৃতি-নিয়মে ঘেরা।— *
অনুদয়ে অন্তর্দ্ধান,
বিধির এ কি বিধান,
মম ভাগ্যে বিধাতার কঠিন নূতন ধারা!

৫

—অথবা, সে বিধাতার
অপূর্ব্ব সৃজন—
শরদিন্দু নিছনিয়া,
কুসুম-কলিকা দিয়া,
ননির পুতলি সেই গ'ঠেছিল বিধি—
স্বর্গের সামগ্রী সেই
পাপে ভরা ধরা এই
পুণ্য-নেত্রে না করিল কভু নিরীক্ষণ।

৬

—বিধাতার লীলাভূমি এ ভব সংসার—
সৃষ্টি-স্থিতি-লয়—
মহা কার্য্য ত্রয়—
ক্রীড়নক তাঁর;—
মায়ার শিকলে
বাঁধিয়া সকলে
মায়াময় মায়া-ক্ষেত্রে করেন বিহার।
তুমি-আমি হীন প্রাণী
কিবা বুঝি, কিবা গণি,
রচনা-রহস্য-লীলা কি বুঝিব তাঁ'র?

৭

—স্মৃতি-ভরে ভেঙে যায় কাঠিন্য প্রাণের!—
মরমের মাঝখানে,
কি এক অস্ফুট তানে,
হৃদয়ের ছিন্ন তন্ত্রী বেজে ওঠে শত খানে!—
জীব নাই,—জড় নাই,
—মরি, মরি কি বালাই!—
স্মৃতির চেতনা তবু কাঁদায় পাগল প্রাণে।
এ স্মৃতি নিভে না কেন?
কিসের লাগিয়া হেন
ধিকি-ধিকি জ্বলে প্রাণে জ্বালা মরমের?

৮

মনে পড়ে আবছায়া
সেই সে মোহন কায়া;—
কই ত কিছুই নাই—কেবল মোহের মায়া।
অনন্তে উধাও হ'য়ে,
কল্পনারে সঙ্গে লয়ে,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মাঝে ঘুরিয়া বেড়াই,—
সচেতন, অচেতন,
জড় জীব অগণন,
সকলি র'য়েছে—সুধু সে আমার নাই!
"আঁখি ত সকলি হেরে,
সকলি কি মনে ধরে?"—
আমি সুধু একবার সে মুখ চুমিতে চাই;—
নহে সে প্রতিমাখানি
রাখিয়া ঘরের কোণে
অনিমিষ আঁখে হেরি হৃদয় জুড়াই।
—কে বলে এ প্রতিমারে
ফেলে দিতে অন্ধকারে?
বড়ই কঠিন সেই—হৃদয় তাহার নাই।

---

* দেহিনোঽস্মিন্, যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা
তথা দেহান্তর প্রাপ্তিঃ——————"
গীতা। ২। ১৩

সত্যের লক্ষণ কি?

এ সম্বন্ধে ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির, মহাত্মা ভীষ্মদেবকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন এবং তদুত্তরে ভীষ্মদেব, ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠিরের সমীপে যে সকল অমূল্য কথা বলিয়াছিলেন, আমরা মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব হইতে সেই অংশ উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার প্রদান করিতেছি।

"যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে পিতামহ! দেবগণ, দ্বিজগণ, ঋষিগণ ও পিতৃগণ সত্যধর্ম্মকে প্রশংসা করিয়া থাকেন। অতএব আমি সত্যধর্ম্ম শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি, আপনি আমাকে তাহাই বলুন। সত্যের লক্ষণ কি, কি প্রকারে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং সত্য প্রাপ্ত হইলে কি হয়, আপনি তাহা বর্ণনা করুন। ভীষ্ম কহিলেন হে ভারত! ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়ের মধ্যে ধর্ম্মশঙ্কর প্রশস্ত নহে, সর্ব্ব বর্ণের মধ্যে অবিকারিতম সত্যই শ্রেষ্ঠ। সাধুগণের সন্নিধানে সত্যধর্ম্মই সতত আদরণীয়। সত্যই সনাতন ধর্ম্ম; সকলে সত্যকে সংকার করিবে, সত্যই পরম গতি। তপস্যা ও যোগসাধন সত্যধর্ম্ম, সত্যই সনাতন ব্রহ্ম, সত্যই পরমোৎকৃষ্ট যজ্ঞ বলিয়া উক্ত হন, সমুদয় বস্তুই সত্যে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সত্যের আকার ও লক্ষণ কি প্রকার, তাহা আমি যথাক্রমে আনুপূর্ব্বিক কহিতেছি এবং যে প্রকারে সত্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাও কীর্ত্তণ করিতেছি, তুমি তাহা শ্রবণ করিবার যোগ্যপাত্র। হে ভারত! সমস্ত লোক মধ্যে সত্য ত্রয়োদশ-বিধরূপে বিখ্যাত। হে রাজেন্দ্র! সত্য, সমতা, দম, অমাৎসর্য্য, ক্ষমা, লজ্জা, তিতিক্ষা, অনসূয়া, ত্যাগ, ধ্যান, ধৃতি, আর্য্যত্ব, সর্ব্বভূতের প্রতি সতত দয়া ও অহিংসা এই ত্রয়োদশ প্রকার সত্যের আকর। তন্মধ্যে অব্যয় ও অবিকারী নিত্য পদার্থের নাম সত্য, সর্ব্ব ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ যোগ দ্বারা তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইচ্ছা, দ্বেষ ও কাম ক্রোধের উপশম হইলে আপনার ও বৈরীর ইষ্ট ও অনিষ্ট-বিষয়ে তুল্য দর্শনকে সমতা কহে। ইন্দ্রিয় বিষয়ে স্পৃহা রাহিত্যকে দম বলে; দমগুণ থাকিলে ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য, অভয় ও রোগোপশম হয়; জ্ঞান প্রভাবে ইহা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। দান ও ধর্ম্ম বিষয়ে সংযমকে পণ্ডিতেরা অমাৎসর্য্য কহেন; পুরুষ নিয়ত সত্য পথে অবস্থিত থাকিলে মাৎসর্য্য-শূন্য হন। অক্ষমা ও ক্ষমার বিষয়ে প্রিয় ও অপ্রিয় পদার্থ সকলকে যে শক্তিদ্বারা শিষ্ট ও সাধু ব্যক্তি ক্ষমা করেন, তাহাকে ক্ষমা বলে; সত্যবাদী ব্যক্তি সুন্দররূপ এই শক্তি প্রাপ্ত হন। প্রশান্ত-চিত্ত, সংযত-বাক্য বুদ্ধিমান ব্যক্তি যে শক্তিদ্বারা নিরতিশয় কল্যাণকর কর্ম্ম সাধন করিয়া থাকেন, এবং কোন স্থলেও গ্লানিযুক্ত না হন, তাহাকেই লজ্জা বলে, ধর্ম্ম হইতে এই শক্তি প্রাপ্ত হয়। ধর্ম্ম ও অর্থের নিমিত্ত লোক সংগ্রহার্থ ক্ষমা করাকে তিতিক্ষা বলা যায়, ধৈর্য্য দ্বারা তিতিক্ষা লাভ হয়। ক্ষমতা ও বিষয়বাসনা ত্যাগ করার নাম ত্যাগ, রাগ-দ্বেষ-বিহীন ব্যক্তিই ত্যাগশীল হন, অন্যে নহেন। প্রযত্ন সহকারে জীবগণের শুভকার্য্য সম্পাদন করাকে আর্য্যতা বলে। যদ্দ্বারা সুখে ও দুঃখে বিকৃতি না হয়, তাহাকে ধৃতি বলে, যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি আপনার ঐশ্বর্য্য ইচ্ছা করেন, তিনি সতত

ধৃতির বশবর্ত্তী হইবেন। মনুষ্য নিয়ত ক্ষমাশীল ও সত্য পরায়ণ হইবেন, যিনি হর্ষ, ভয় ও ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়াছেন সেই পণ্ডিত ব্যক্তিই ধৃষ্টি লাভে সমর্থ হন। বাক্য, মন, কর্ম্মদ্বারা সর্ব্বভূতে অদ্রোহ, অনুগ্রহ ও দান করা সাধুগণের সনাতন ধর্ম্ম। হে ভারত! এই ত্রয়োদশ প্রকার পৃথক্ পৃথক্ গুণ একত্রিত হইলে সত্য হয়, ইহলোকে সাধুগণ সত্যের সেবা করতঃ বর্দ্ধিত হন। রাজন্! সত্যের গুণ সমুদয়ের অন্ত বলিতে পারা যায় না; এই জন্যই পিতৃগণ ও দেবগণের সহিত বিপ্রগণ সত্যের প্রশংসা করিয়া থাকেন। সত্য অপেক্ষা পরম ধর্ম্ম আর কিছুই নাই, মিথ্যা হইতে পরম পাতক অন্য কিছুই নহে। সত্য হইতে দান, সদক্ষিণ যজ্ঞ, অগ্নিহোত্র, বেদসমুদয় ও ধর্ম্ম নিশ্চয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। সহস্র অশ্বমেধ পর্ব্ব ও একমাত্র সত্য, তুলাদণ্ডে ধৃত হইলে সহস্র অশ্বমেধ হইতে একমাত্র সত্য বিশিষ্ট হয়।"

"যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ ভরত শ্রেষ্ঠ! কাম, ক্রোধ, শোক, মোহ, বিধিৎসা, অকার্য্যে পরবশতা, মাৎসর্য্য, মদ, ঈর্ষা, কুৎসা, অসূয়া, কৃপা ও ভয় যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, আপনি আমার নিকটে তাহা প্রকৃত রূপে কীর্ত্তন করুন।

"ভীষ্ম কহিলেন, ধর্ম্মরাজ! এই ত্রয়োদশটী প্রাণিগণের প্রবল শত্রু; ইহারা মানবদিগকে সর্ব্বতোভাবে সেবা করিয়া থাকে, ইহা মানবগণের সতত অবগত থাকা উচিত। রাজন! এই সকলের উৎপত্তি, স্থিতি ও নিবৃত্তির বিষয় তোমার নিকট কীর্ত্তন করিব। এক্ষণে অগ্রে ক্রোধের উৎপত্তির বিষয় প্রকৃতরূপে কহিতেছি, তুমি অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। লোভ হইতে ক্রোধ উৎপন্ন হয়, এবং তাহা পরদোষ দ্বারা উদ্দীপ্ত হইয়া ক্ষমা দ্বারা নিবদ্ধ ও নিবৃত্ত হইয়া থাকে। সঙ্কল্প হইতে কাম জন্মে, তাহার যত সেবা করা যায় সে ততই বর্দ্ধিত হয়। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি কাম হইতে বিরত হইলে তাহা তৎক্ষণাৎ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ক্রোধ ও লোভের মধ্য হইতে অসূয়ার আবির্ভাব হয়; সর্ব্বভূতে দয়া দ্বারা তাহার নিবৃত্তি হয়। বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের অন্তঃকরণে অনিষ্ট বস্তু দর্শন দ্বারাও ইহার উদয় হয় এবং তত্ত্বজ্ঞান হইতে নিবৃত্তি হইয়া থাকে। মোহ, অজ্ঞান হইতে সমুৎপন্ন হইয়া পুনঃপুনঃ পাপাচার দ্বারা প্রবৃদ্ধ হইয়া থাকে; সৎসংসর্গ বশতঃ তাহা বিনষ্ট হইয়া যায়। হে কুরুকুলধুরন্ধর! যাহারা বিরুদ্ধ শাস্ত্র সকল দর্শন করে তাহাদিগের বিধিৎসা অর্থাৎ কার্য্যারম্ভে ব্যগ্রতা জন্মে; তত্ত্ব-জ্ঞান হইতে তাহার নিবৃত্তি হইয়া থাকে। প্রণয়াস্পদ পুত্র প্রভৃতির বিয়োগ বশতঃ শরীরীদিগের শোক সমুদ্ভূত হয়; প্রিয় ব্যক্তি বিযুক্ত হইলে, যখন শোক করিয়া তাহার পুনঃ প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই ইহা বিদিত হয়, তৎকালেই শোক শান্তি হইয়া থাকে; ক্রোধ, লোভ ও অভ্যাস নিবন্ধন অকার্য্য-পরতন্ত্রতা জন্মে, সর্ব্ব ভূতে দয়া ও নির্ব্বেদ হেতু তাহার নিবৃত্তি হয়। সত্য পরিত্যাগ ও অনিষ্ট বিষয় সেবাদ্বারা মাৎসর্য্য হইয়া থাকে; সাধুগণের সংসর্গ করিলে ক্ষয় হয়। কুল মর্য্যাদা, ঐশ্বর্য্য ও বিদ্যা হইতে মদ জন্মে; ঐ সকলের যাথার্থ্য বিদিত হইলেই উহা তৎক্ষণাৎ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। কাম ও হর্ষ হইতে ঈর্ষা জন্ম পরিগ্রহ করে; ইতর প্রাণিগণের প্রজ্ঞা দর্শন দ্বারা তাহা প্রনষ্ট হয়। রাজন্! সমাজচ্যুত লোকদিগের বিভ্রম বশতঃ দ্বেষ্য ও অসম্মত বাক্যদ্বারা কুৎসা জন্মিয়া থাকে, শিষ্টাচার দর্শন দ্বারা তাহার শান্তি হয়। যাহারা বলশালী অপকারকের প্রতিকার করিতে সমর্থ নহে, তাহাদের তীক্ষ্ণতর অসূয়া জন্মিয়া থাকে; কারুণ্য বশতঃ তাহার নিবৃত্তি হয়। দুঃখী ব্যক্তিদিগকে সর্ব্বদা দর্শন করিলে কৃপা জন্মে; ধর্ম্মনিষ্ঠা বিদিত হইলে তাহার

নিবৃত্তি হইয়া থাকে। জীবগণের অজ্ঞান হইতে লোভ উৎপন্ন হইয়া থাকে; বিষয় সকলের অনৈশ্বর্য্য দর্শন ও জ্ঞান হইলে তাহা নিবৃত্ত হয়। প্রাচীনেরা কহিয়া থাকেন, শান্তি-দ্বারা এই ত্রয়োদশ দোষকে পরাজয় করা যায়। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণের এই সমস্ত দোষ ছিল, তুমি সত্যাভিলাষী হইয়া তাহাদিগকে জয় করিয়াছে।"

"যুধিষ্ঠির কহিলেন, হে ভারত! আমি সতত সাধুগণের সহবাস বশতঃ অনৃশংসতা অবগত আছ, নৃশংস ও তৎকার্য্যের বিষয় অবগত নহি! ভীষ্ম কহিলেন, নৃশংস ব্যক্তিগণ কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত ও কুৎসিৎ কার্য্য করিতে অভিলাষী হয়, উহারা স্বয়ং জন-সমাজে নিন্দনীয় হইয়াও সতত পরের নিন্দা করে এবং আপনাদিগকে সকলের নিকট বঞ্চিত বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকে। উহাদের ন্যায় ক্ষুদ্র নীচাশয় আর কেহই নাই। উহারা অভিমান, অসৎসঙ্গ ও আত্মশ্লাঘা নিরত হইয়া আপনার বদান্যতা প্রকাশ করে, কৃপণ ও মূর্খের ন্যায় সকলকেই শঙ্কা করিয়া থাকে, নিজ সম্প্রদায়ের প্রশংসা এবং আশ্রমবাসী ঋষিদিগের প্রতি দ্বেষ করে, সতত পরহিংসায় প্রবৃত্ত থাকিয়া দোষ গুণের বিবেচনা করে না, বহু অলীক বাক্য বলে, অশান্ত চিত্তও লুব্ধ হইয়া নিষ্ঠুর কার্য্য করিয়া থাকে, ধর্ম্মশীল গুণবান্ ব্যক্তিকে পাপী বলিয়া নিশ্চয় করে, আপনার চরিত্র প্রমাণ দ্বারা অন্য ব্যক্তিকে বিশ্বাস করে না, পরের দোষ দেখিলেই তাহা গোপন ভাবে প্রকাশ করে, অন্যের দোষ নিজ দোষের তুল্য হইলে জীবিকা নির্ব্বাহ নিমিত্ত তাহা অপ্রকাশ রাখে, উপকারী ব্যক্তিকে কেবল বঞ্চিত বলিয়া বিবেচনা করে, সময়ানুসারে উপকারীকে ধন দান করিয়া পরে সন্তাপ করিয়া থাকে। উপাদেয় ভক্ষ্য-পেয় প্রভৃতি ভোজ্য বস্তুর ভোজন কালে অপরে তাহা অবলোকন করিয়া থাকিলেও যে ব্যক্তি একাকী ভোজন করে, তাহাকেও নৃশংস বলে।

তত্রৈব রমতে হরিঃ।

বিষ্ণুভক্তির্যথা সাক্ষাজ্জীবনিস্তারকারিণী।
গৃহিণী রাজতে যত্র তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥১॥

সর্ব্বজীব নিস্তারিণী গৃহিণী যথায়,
বিরাজে সাক্ষাৎ যেন বিষ্ণুভক্তি প্রায়;
গৃহস্থ-আশ্রম সেই পুণ্যনিকেতন,
নিত্য বিরাজেন তথা দেব নারায়ণ ।১।

পুণ্যব্রতো গৃহীযত্র গৃহিণী চ পতিব্রতা।
পিতৃভক্তাশ্চ সন্তানাস্তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥২॥

যে গৃহে গৃহস্থ সদা পুণ্যকর্ম্মে রত,
পতিমাত্র গৃহিণীর জীবনের ব্রত;
পিতৃভক্ত গুণবান্ যে গৃহে সন্তান,
তথায় করেন হরি নিত্য অধিষ্ঠান ।২।

আতিথ্যং গুরুভক্তিশ্চ পাতিব্রত্যং দয়ার্জ্জবম্।
সত্যং শৌচং ক্ষমা যত্র তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥৩॥

সতীত্ব, আতিথ্য, দয়া, ভক্তি গুরুজনে,
সত্য, শৌচ, সরলতা, ক্ষমা, যে ভবনে;
সে গৃহ ধর্ম্মের ক্ষেত্র শান্তির আধার,
শ্রীহরি তথায় নিত্য করেন বিহার ।৩।

অরিষড়্বর্গদমনং দীনোপগত রক্ষণম্।
সর্ব্বভূতাভয়ং যত্র তত্রৈব রমেত হরিঃ ॥৪॥

যে ভবনে ছয় রিপু নিত্য বশে রয়,
অভ্যাগত দীন হীন লভয়ে আশ্রয়;
যথা আসি, সর্ব্বজীবে লভয়ে অভয়,
বিহরেন নিত্য তথা হরি দয়াময় ।৪।

পিতা মাতা গুরুঃপত্নী জ্ঞাতয়ো বান্ধবাস্তথা।
যত্রৈতে নিত্যসন্তুষ্টাস্তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥৫॥

পিতা, মাতা, গুরু, পত্নী, পুলকিত মনে,
লভয়ে অতুল তৃপ্তি নিত্য যে ভবনে;

জ্ঞাতি বন্ধুগণে যথা সদানন্দে রয়,
বিহরেন হরি তথা সদানন্দময় ।৫।

মোদন্তে শিশবো যত্র মোদন্তে চ গৃহেহঙ্গনাঃ।
তির্য্যক্ষেতাহপি প্রমোদন্তে তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥৬॥

যে ভবনে শিশুগণ প্রফুল্ল বদন,
প্রফুল্ল বদন যথা কুলনারীগণ ;
যে ভবনে পশু পক্ষী প্রফুল্ল বদন,
শ্রীহরি সদাই তথা করেন রমণ ।৬।

শ্রদ্ধান্নং গৃহিণা দত্তং ভুঞ্জতে সর্ব্বজন্তবঃ।
প্রীত্যা যত্র গৃহে নিত্যং তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥৭॥

যে গৃহে গৃহস্থ নিত্য ভক্তিপূর্ণ মনে,
অন্নদান মহাদান করে জীবগণে ;
সকলে আনন্দে তাহা করয়ে আহার,
সে গৃহে শ্রীহরি সদা করেন বিহার ।৭।

অহো তৃপ্তোহস্মি জীবানামিতি নিত্যং প্রবর্ত্ততে।
যত্রানন্দরবো গেহে তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥৮॥

'আহা ! হইলাম তৃপ্ত'—এ আনন্দ-রবে,
যে গৃহ করয়ে পূর্ণ জীবগণ সবে ;
জীবের শান্তির স্থান ধন্য সে ভবন,
নিত্য বিরাজেন তথা শ্রীমধুসূদন ।৮।

অদ্বৈত ভক্তিসূত্রেণ যত্র গৃহেজনাঃ।
সর্ব্বেহভিন্নমনঃ প্রাণাস্তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥৯।

পতি, পত্নী, পুত্র, ভৃত্য আদি পরিজনে,
অদ্বৈত ভকতি-সূত্রে বদ্ধ যে ভবনে ;
সবার একই মন, একই পরাণ,
শ্রীহরি করেন তথা নিত্য অধিষ্ঠান ।৯।

যত্র নির্লিপ্তভাবেন সংসারে বর্ত্ততে গৃহী।
ধর্ম্মং চরতি নিষ্কামং তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥১০॥

নিষ্কাম নির্লিপ্তভাবে গৃহস্থ যথায়,
সংসারে থাকিয়া ধর্ম্মে জীবন কাটায় ;
ধরাধামে একমাত্র ধন্য সে ভবন,
নিত্য বিরাজেন তথা দেব নারায়ণ ।১০।

গৃহী যত্রাখিলক্লেশান লীলয়া সহতে স্বয়ম্।
হরত্যাশ্রিতসন্তাপং তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥১১॥

অশেষ ক্লেশের ভার গৃহী যে ভবনে,
আপনি করিয়া সহ্য অম্লানবদনে,
প্রাণপণে আশ্রিতের হরে দুঃখভার,
নিত্য তথা নারায়ণ করেন বিহার ।১১।

পরিশ্রমো মিতাচারো যত্র ধর্ম্মেণ জীবিকা।
দেবাতিথি গুরুশ্রদ্ধা তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥১২॥

পরিশ্রম, মিতাচার, ধর্ম্মপথে আয়,
দেবতা-অতিথি-গুরু-অর্চ্চনা যথায় ;
পরম পবিত্র সেই গৃহস্থ ভবন,
নিত্য বিরাজেন তথা দেব নারায়ণ ।১২।

প্রযত্নলালিতা যত্র ধেনবো নিত্য দুগ্ধদাঃ।
সুপুষ্পফলবা বৃক্ষাস্তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥১৩॥

যতনে লালিত হ'য়ে যথা ধেনুগণ,
সুধাসম ক্ষীরধারা করে বিতরণ ;
দিব্য ফল পুষ্প যথা দেয় তরুগণ,
সে গৃহে সতত হরি করেন রমণ ।১৩।

সুসংস্কৃতে সুসংমৃষ্টে যদগৃহে সর্ব্বতঃ শুচৌ।
বিশুদ্ধান্যন্নপানাদি তত্রৈব রম্যতে হরিঃ ॥১৪॥

পরিস্কৃত পরিচ্ছন্ন নিত্য যে ভবন,
পবিত্র পানীয় শয্যা অশন বসন ;
অশুচি দ্রব্যের যথা নাম গন্ধ নাই,
বিহরেন সেই স্থানে শ্রীহরি সদাই ।১৪।

সর্ব্বং যত্রান্নপানাদি গৃহী বিষ্ণুনিবেদিতম্।
পরিবারৈর্বৃতো ভুঙ্‌ক্তে তত্রৈব রমতে হরিঃ ॥১৫॥

অন্নপান সমস্তই গৃহী যে ভবনে,
ভক্তিভাবে নিবেদন করে নারায়ণে ;
পশ্চাত সকলে মিলি করয়ে আহার,
সে গৃহে শ্রীহরি সদা করেন বিহার ।১৫।

সতীত্ব।

এই সংসারে "সতীত্ব" রমণীদের পরমধন। যে রমণী এ সতীত্ব-রত্নে বঞ্চিতা, তাহার জীবন-ধারণ করা বিড়ম্বনা মাত্র। তাহার মানসিক বল, হৃদয়ের শান্তি, হৃদয়ের প্রফুল্লতা কদাচ থাকে না। যদিও বাহিরে তাহার প্রফুল্লভাব দেখা যায়, বস্তুতঃ তাহা তাহার হৃদয়ের প্রকৃত ভাব নহে। অসতী রমণীর মনে সদাই অশান্তি বিরাজ করে। তাঁহার মনে যে সন্তাপাগ্নি জ্বলে, তাহা সহজে নির্ব্বাণ হওয়া কঠিন। আমাদের হিন্দু-শাস্ত্রে "সতীত্ব" সম্বন্ধে যে কি চমৎকার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। সতী রমণীর পতিই একমাত্র গতি। পতি ভিন্ন অন্য ব্যক্তি তাঁহার হৃদয়-পটে অঙ্কিত হয় না। চাণক্য একস্থলে বলিয়াছেন,—"* * * "নারীণাং ভূষণং পতি" পতিই নারীর অলঙ্কার স্বরূপ। স্ত্রীরা গৃহকে উজ্জ্বল করেন। স্ত্রীরা গৃহের শ্রী-স্বরূপা, স্ত্রীতে আর শ্রীতে কিছুই বিশেষ নাই।

রমণীর চরিত্র যতদিন ভাল থাকে ততদিন তিনি গৃহের লক্ষ্মীস্বরূপা, তাহার সহস্র অপরাধ থাকিলেও মার্জ্জনীয়া। কিন্তু রমণীর চরিত্র একবার দূষণীয় হইলে, এবং রমণী একবার বিশ্বাস-ঘাতিনী হইলে, তাহার আর মঙ্গল নাই। জন্মের মতন তাহার পবিত্র নামের লোপ হয়। এমন কি প্রাণসমা পত্নী বিশ্বাসঘাতিনী হইলে, স্বামী তাহাকে বিষ নয়নে দেখেন। এরূপ ঘটিলে স্ত্রীর আর নিস্তার নাই।

"নামৃতং ন বিষং কিঞ্চিদেকাং মুক্ত্বা নিতম্বিনীম্
সৈবামৃতলতা রক্তা বিরক্তা বিষবল্লরী।"

রমণীই অমৃত বা বিষ-পদ বাচ্যা। রমণী ব্যতীত অমৃত বা বিষ কিছুই লক্ষিত হয় না। সেই রমণী যখন পতির প্রতি আসক্তা তখন তিনি অমৃত-লতিকা, আর যখন তিনি পতির প্রতি অনাসক্তা, তখন তিনি বিষ-লতিকা। যে রমণী "সতীত্ব পরম নিধি" এই বাক্যের মর্ম্ম বুঝিয়াছেন, তিনিই যথার্থ শিক্ষিতা। যে স্ত্রী এ ধনে বঞ্চিতা, সে পিশাচী ও রাক্ষসী, তাহার অসাধ্য কিছুই নাই। যে স্ত্রী এ ধনের মাহাত্ম্য বুঝিয়াছেন তিনিই ধন্যা, তিনিই সংসারের লক্ষ্মীস্বরূপা। তিনিই স্বামীর আদরের ও সোহাগের পাত্রী। পত্নী স্বামীর সহধর্ম্মিণী হইবেন, সহকর্ম্মিণী হইবেন, ও সহভোগিনী হইবেন। যদি পত্নী অন্য পুরুষে আসক্তা হন, তাহা হইলে তিনি ভোগ-বিষয়ে ব্যভিচারিণী হইলেন; ভোগ বিষয়ক ব্যভিচারই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর মন্দ; কেন না ইহা হইতে পাপ ও অপবিত্রতা উৎপন্ন হইয়া ব্যভিচারীকে ধর্ম্ম হইতে পতিত করিয়া রাখে। যদি স্ত্রী অন্য পুরুষকে আসক্ত চিত্তে দর্শন বা ধ্যান করেন, তাহা হইলে তিনি মানসিক ব্যভিচার-দোষে দূষিত হইলেন।

স্বামী বিদেশস্থ হইলে স্ত্রীর কি রূপ সংযত ভাবে কাল কাটান উচিত, তাহা পুরাকালে বিশেষ রূপ বিধিবদ্ধ ছিল। এক্ষণে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও শিক্ষার প্রভাবে, বিজ্ঞ মহর্ষিগণ প্রদত্ত উপদেশসকল আমরা অগ্রাহ্য করিয়া থাকি। তাই আমাদের এতদূর অবনতি। প্রোষিত ভর্তৃকা স্ত্রী (যাহার স্বামী বিদেশস্থ) নিয়ম লিখিত নিয়মে কাল যাপন করিতেন—

"ক্রীড়াং শরীর সংস্কারং সমাজোৎসবদর্শনম্।
হাস্যং পরগৃহে যানং ত্যজেৎ প্রোষিতভর্তৃকা ॥"

ক্রীড়া (দ্যূতক্রীড়া,) শরীরসংস্কার, নৃত্য-গীতাদি শ্রবণ ও দর্শন, হাস্য, অপরের বাটীতে গমন, এই সকল প্রোষিত ভর্তৃকারা ত্যাগ করিবেন।

পতিব্রতার লক্ষণঃ—

"আর্ত্তার্ত্তে মুদিতে হৃষ্টা প্রোষিতে মলিনা কৃশা।
মৃতে ম্রিয়েত যা পত্যৌ সা স্ত্রী জ্ঞেয়া পতিব্রতা ॥"

পতি কাতর হইলে যিনি কাতরা হন,

মুদিত হইলে প্রফুল্ল অন্তরা হন, পতি প্রবাসে যাইলে সদা মনো দুঃখে রহেন, পতি মরিলে যিনি জীবন দেন, তাহাকেই পতিব্রতা (সাধ্বী) কহে।

বর্ষ-শেষে।

(১)

কে আছ হে জরা ধরার ভিতর
নেহার প্রকৃতি পানে।
পড়িছে ঝরিয়া জরা জীর্ণ যত
বরষের অবসানে॥
ঝরিয়া পড়িছে একে একে একে
পাদপের শুষ্ক পাতা।
ধীরে ধীরে ধীরে শুখাইয়া যায়
ধরণীর জীর্ণ লতা॥
তিল তিল করি শুখাইছে নীর
হের ওই সরোবরে।
নয়ন ব্যাপিয়া দিবস রজনী
জরা জীর্ণ শুধু ঝরে॥
ঘেরিয়া তোমায় দাঁড়ায়ে সংহার
তোল আঁখি একবার।
কি ব্যাধি হইতে চাহ পরিত্রাণ
ধর তুলি আগে তার॥

(২)

হায়রে নিয়তি, ধরিত সে যদি
বরষে নূতন বেশ!
অমনি করিয়া ঝরিয়া পড়িত
প্রাণীর কতই ক্লেশ!
বরষে বরষে মানব-জীবনে
ফুটিত রে মধুমাস!
হৃদয় ভরিয়া উঠিত উথলি
বসন্তের ফুলবাস!
সুখ দুখ নাহি রহিত ধরায়
এ দারুণ বেশ ধরি,
বরষে বরষে হাসিত সংসার
ধরণী উজ্জ্বল করি!
সে বৈষম্য যদি নাহিরে নিয়তি
শেষ ভিক্ষা কর দান,
ধরায় বসন্ত না আসিতে যেন
ঝরে পড়ে জীর্ণ প্রাণ।

অনুসন্ধান সমিতির বিবরণী।

প্রতারণা-প্রবঞ্চনা।

বাঙ্গালীর কারবার,

অথচ সাহেবী নাম। আজকাল এমনই অনেক। লোকের চোখে সত্বরই ধাঁধাঁ লাগে। এই ধরুণ, 'বি. ব্রাউন এণ্ড কোং' এরূপ নাম শুনিলে কে না ভাবে যে সাহেবের কারবার? কিন্তু বাস্তবিক-পক্ষে এ সকল বাঙ্গালীর কারচুপী। এইরূপ, ডক্টর পি, ম্যটিন; পি, নেজার্স; কে, স্মিথ এণ্ড কোং; হেরি এণ্ড কোং—এ সকলই বাঙ্গালী, অথচ নাম সাহেবী। লোকে সহসা ভাবেন যে, "সাহেব কোম্পানীর দোকান বা কারবার; অবশ্য ভাল জিনিসই পাইব।" এ ভাবনা বাস্তবিকই যাঁহারা ভাবেন, তাঁহারা অতঃপর জানিবেন, এ সকল প্রায়ই বাঙ্গালীর ব্যাপার—নামটা কেবল সাহেবী। জানি না এসব লোক ভুলাইবার জন্য কি না!

পেটেণ্ট ঔষধেই

ছাই যত সাহেব্—যত সাহেবী নাম! জ্বালাতন আর কি?, যাইহোক, সাহেবী নাম দেখিলেই সাহেব ভাবিবেন না, এই সাধারণের প্রতি অনুরোধ।

বটতলার বই,

যত দাম লেখা থাকে, তার বার আনা চোদ্দ আনা খাদ—বাকী দু'—আনা চার—আনা ঠিক। জুয়াচোরেরা বিজ্ঞাপন দিয়া ঐ সকল 'বই' পূরামূল্যে বিক্রয় করে। লোকে ভাবে বাস্তবিকই বা ঐ সকল পুস্তকের দাম—ঐরূপ। কিন্তু তাহা নহে। এ সম্বন্ধেও সাধারণের সতর্কতা আবশ্যক।

অনুসন্ধান
অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র
[illegible]ম খণ্ড} ৩০এ ফাল্গুন, ১২৯৮। {১৫শ সংখ্যা।

সাধক-সঙ্গীত।

(বাউলের সুরে।)

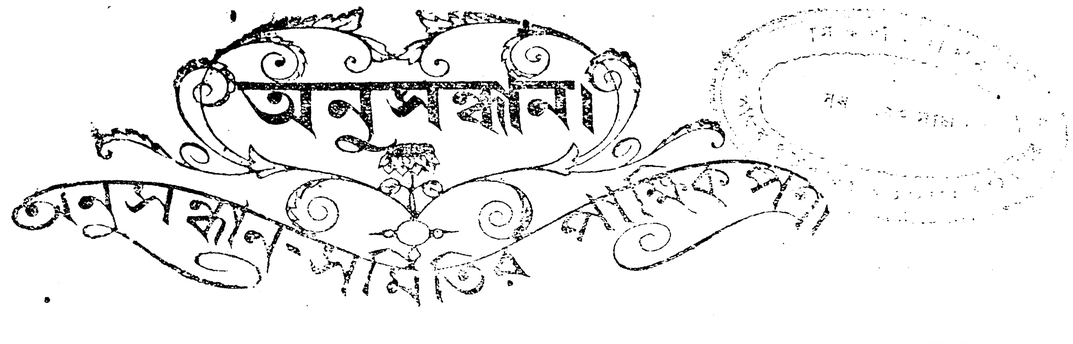

[illegible]-কমলে কর পূজা, সে রাঙা চরণ।
[illegible] যাতনা, আর তো রবে না,
কর্‌লে সে রূপ—ওরে ও মন!॥
[illegible]খি-জলে গঙ্গাজল কর্‌রে সে পূজায়।
[illegible]ন-পূজন সকল্ চেয়ে, তুষ্ট যে মা তায়॥
[illegible]রও এক কাজ,—পূজ্‌বি যদি মায়।
[illegible]ঃ চিরে, রক্ত নিয়ে, মাখা(ও) রাঙা পায়॥
([illegible]র) রাঙা রঙ্ (তায়) গাঢ় হ'বে
—গাঢ় হলেই 'কালী।'
[illegible] কালীতে, ও ভোলা মন, ঘুঁচ্‌বে
মনের কালী॥
[illegible]ক্ত-জবা—রক্ত-চন্দন, তাকেই বলা যায়।
[illegible]জন-পূজন, তার কাছে (আর), আছে বা
কোথায়!।
[illegible]ই বলি মন, কর এমন, যদি পূজ্‌তে চাও।
[illegible]ল-জল-চন্দনে মায় এমনে সাজাও॥
[illegible]বেই গতি, তবেই মুক্তি, তবেই পাবে—
সে রাঙা চরণ!
(কর্‌লে সেরূপ—ওরে ও মন!।)

আমার বিবাহ।

(পারিবারিক সত্য ঘটনা।)

"আমায় পাগলই বলুন, আর যা'ই বলুন, আমি কিন্তু পাগল নই। পাগল হ'তে পার্‌লে আমি যে সেই এক পাগলামী নিয়েই সব ভূলে থাক্‌তে পার্‌তেম্। কিন্তু মন যে তা' কিছুতেই ভুল্‌তে পার্‌ছে না! ছাই মাখি, ভস্ম মাখি, মল-মূত্র ঘাঁটি—কিন্তু কই, কিছু-তেই তো তা'র কথা ভুল্‌তে পারি-নে! মনে করি, পাগল হই; মনে করি, সব ভুলে যাই; কিন্তু কেন আবার সে সব কথা মনে আসে? ঘর ছেড়েছি, সংসার ছেড়েছি, পিতা মাতা ছেড়েছি, অতুল সম্পদ-সুখের মায়াও ত্যাগ ক'রেছি; কিন্তু কেন—কেন আমি আজিও তার কথা ছাড়্‌তে পার্‌লেম্ না!"—এই বলিতে বলিতে, পাগল কাঁদিয়া ফেলিল।

উগ্রমূর্ত্তি সন্ন্যাসী আরও রুক্ষ-স্বরে বলি-লেন,—"তবে ব'নে এসেছিস্ কেন? শিষ্য হ'তে চাস্ কেন? যা' বাপু, যা,—আমায় আর বিরক্ত করিস্-নে! আমি কোথায় একটু শান্তি পা'ব ব'লে, এই বনে এসে, সেই দীন-বন্ধুর শরণ লয়েছি, তুই কোথা-থেকে, বেটা পাগল, আমায় জ্বালাতে এলি!"

"জ্বালাতে তো আসি-নি! জ্বলছি কেবল

—যদি সে জ্বলন নিবাতে পারি, তাই এসেছি! কিন্তু এতই কি তার তাপ, যে, আপনিও তা'তে জ্বালা পান! হা অদৃষ্ট! হা ভাগ্য! হা পিত!—কেন তুমি আমায় এমন বিষ খাওয়ালে।"—এই বলিতে বলিতে পাগলের আবারও সেইরূপ ক্রন্দন।

কিন্তু, কি জানি কেন, এবার একটু সন্ন্যাসীর তাহাতে কৌতূহল জন্মিল। তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা একটু মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসিলেন,—"তোমার পিতা তোমায় বিষ খাওয়া'লেন কিরূপ? আর 'তার কথা ছাড়্‌তে পার্‌লেম না' যে ব'ল্‌ছ; কিন্তু সে 'তারা' কার? এই সব আবোল তাবোল বক্‌ছ বলেই তো তোমায় পাগল মনে কর্‌ছি! অথচ বুঝ্‌ছি তুমি পাগল নও। তাই জিজ্ঞাসা করি, বল দেখি, ব্যাপার খানা কি? এই বয়েস; কেন তুমি তবে এমনতর হ'লে!"

"সে সব অনেক কথা! আপনি আর তার কি শুন্‌বেন? বিশেষ, শুন্‌লে, কষ্ট বই আপনার সুখ তা'তে তো কিছুই হ'বে না! জ্বালাতন আরও যে হ'বেন!"

"তা' হই হ'ব! তুমি বল। যদি কোন উপায় কর্‌তে পারি, অবশ্যই তা' কর্‌বো। যা'তে তোমার মন শান্ত হয়, তার জন্যও অবশ্যই চেষ্টা পা'ব!"

পাগল তখন বলিতে লাগিল,—"বল্‌লে যাতনার অনেকটা উপশম হয়; তাই আমি বলবো! আপনি তবে শুনুন! ১৬ বৎসর বয়সের সময় আমার বিবাহ হয়; তার বয়েস তখন ১২ বৎসর। তার পর, এই ২০ বৎসর চলে গেল। কিন্তু আজও কেন তা'রে ভুল্‌তে পার্‌লেম না! বিবাহের বাসর ঘরে একদিন; তার পর পাঁচ বৎসর তা'রে আর দেখি-নি! পাঁচ বৎসর পরে, শেষ দিন-আষ্টেক তার সঙ্গে দেখা-শুনা!—তাও প্রাণ পূরিয়া নহে—কেবলই ভয় ছিল, পিতা পাছে জান্‌তে পারেন! ভগ্নীর কন্যার বিবাহের সময়, সে আমায় নিমন্ত্রণ ক'রে নিয়ে যায়! সেই কয়দিন, পিতাকে লুকিয়ে, ভগ্নী আমার, তা'কে একবার এনে-ছিল! সেই যা' দু'জনে দেখা-শুনা! কিন্তু তা'তেও সদাই ভয় ছিল, পিতা পাছে জান্‌তে পারেন! ভগ্নীও সদাই সেই ভয়ে শশঙ্কিত ছিল; আমিও সেই ভাবনায় অস্থির ছিলাম; 'সেও' সেই ভাবনায় কাঁপিত। কিন্তু, হা অদৃষ্ট, সেই আট দিনের অধিক আর তা'রে দেখ্‌তে পেলেম না! যদি আমার ভগ্নী এত-দিন বেঁচে থাক্‌তেন, তবুও বা কোন-না-কোন অছিলায় তা'কে দেখাতে পার্‌তেন। কিন্তু হা অদৃষ্ট, কন্যার বিবাহ দিয়েই, সেই বৎসরই তিনি পরলোক গমন করেন। কাজেই আমারও 'তার' সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ সেই শেষ! দেখা-সাক্ষাৎ তো অনেক দিনই ঘুরি-য়েছে; কিন্তু, কেন, আজও তা'রে ভুল্‌তে পারলেম-না।"

সন্ন্যাসী, পূর্ব্বাপেক্ষা যেন আরও কিঞ্চিৎ আগ্রহান্বিত হইয়া আরও কিঞ্চিৎ মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"পাগল তুমি, তুমি যে কি ব'ল্‌ছ, তা'র কিছুই তো বুঝ্‌তে পার্‌ছি না! কথা গুলো সব খোলসা ক'রেই বল!" প্রশ্নের সহিত, সন্ন্যাসীর আগ্রহাধিক্য, করুণভাব ক্রমশঃই যেন বিকাশ পাইতে লাগিল। সন্ন্যাসী বলিলেন,—"সব খোলসা করেই বল-না কেন! তা'হলে তোমার একটা উপায়ের অবশ্যই আমি চেষ্টা পাব।"

"দারুণ মেঘ-গর্জ্জনের পর বৃষ্টিই ধরণীকে সুশীতল করে। আপনারও দেখিতেছি তাই! আপনি আগে তো আমায় 'দূর-দূর-পাগল' বলেই তাড়িয়ে দিচ্ছিলেন! কিন্তু তার পর কেন আবার এমন সদয়-ভাব!"

"বৎস! এতক্ষণে বুঝ্‌লেম, তুমি পাগল নও। তাই জিজ্ঞাসা করি, বল—তোমার কি মনোকষ্ট! পারি তো, অবশ্যই আমি তা' দূর কর্‌বো।"—এই বলিয়া, সন্ন্যাসী, যতই পা

লের কথা শুনিতে লাগিলেন, ততই অনিমিষ-লোচনে তাহার দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

পাগল বলিতে আরম্ভ করিল,—"তবে শুনুন! আমি একজন বিশিষ্ট কুলীন-ব্রাহ্মণের সন্তান। 'মুখ্যি' কুলীন যা'কে বলে, আমরাও তাই। বিবাহে আমাদের বড়ই সম্মান—বড়ই দান-পণ। ছেলে-বেলা থেকেই, এমন কি পৈতা হ'বার আগে থেকেই, আমারও তাই কতই বিবাহের সম্বন্ধ আসিতে থাকে। কেউ হাজার টাকা পণ দিতে চান, কেউ ঘড়ি-চেন-রূপার-বাসন দিতে চান; কেউ বা আমায় কল্‌কাতায় রেখে পড়াবার ভার-শুদ্ধ নিতে চান। এমনি যে কতই সম্বন্ধ কত যায়গা থেকে আস্‌তে থাকে, তা' আর বল্‌বার নয়। অবশেষে অনেক কসামাজা-দরদস্তুর করিয়া, ১৬ বৎসর বয়সের সময়, পিতা আমার বিবাহ দেন। গহনা-পত্রে সর্ব্বসমেত তা'তে আমরা প্রায় তিন-চার হাজার টাকা প্রাপ্ত হই। যিনি আমার শ্বশুর হন, তিনি একজন সামান্য তালুকদার মাত্র ছিলেন। কিন্তু একমাত্র কন্যা বলিয়া, কন্যার বিবাহে তিনি আর কিছুই কার্পণ্য প্রকাশ করেন নাই। আমাদিগের দেয় পণ-দান ছাড়া, বিবাহের উৎসবাদিতে তাঁহার হাতের নগদ টাকা একরূপ সমস্তই প্রায় ব্যয় হইয়া যায়। অধিক কি, সকল ব্যয় তাহাতেও কুলান করিতে না পারায়, শেষ নাকি, বাড়ীর পরিবারের গহনাদি বন্ধক দিয়াও কয়েক শত টাকা তাঁহাকে কর্জ্জ করিতে হইয়াছিল। যাহাহউক, ইহাতেও শেষে তিনি কুলাইয়া উঠিতে পারেন নাই। আর, শ'দুই-চার টাকার জন্যই অবশেষে তিনি অপমানিত হইয়াছিলেন। আমাদের স্বগণ-বিদায়ের শ' দুই টাকা, আর প্রণামীর থান-ষাটেক কাপড় (অবশ্য বাড়াবাড়ি ধরিয়াই)—এটা আর তিনি শেষে দিয়ে উঠ্‌তে পারেন না! পিতাকে বলেন,—'মহাশয়,—এ টাকাটা এক মাসের মধ্যেই আমি পরিশোধ কর্‌বো; আপাততঃ আমার মাপ করুন। বরং আমি এর দরুণ একটা 'খত' লিখে দিতেও প্রস্তুত আছি।' কিন্তু কুলীন পিতা আমার—তাহা শুনিতে রাজী হইলেন না; বরং কতকটা রুক্ষ স্বরেই বলিলেন,—'তুমি যে শেষটা এ রকম চালাকী খেল্‌বে তা আমি পূর্ব্বেই জানি। যাইহোক আজি আর ওসব চালাকী শুন্‌ছিনে; এখনই টাকা দেবে কি না, বল!' শ্বশুর-মহাশয় বিনয়-নম্র বচনে বলিলেন,—'মহা-শয়, বাস্তবিকই আমি বড়ই লজ্জায় পড়েছি। আপনি দিন-পনের অন্ততঃ অপেক্ষা করুন। আমি যা বলেছি, তা' দেবই। তা' ছাড়া আমার যখন এই কন্যা-মাত্র ভরসা তখন আমার যা' কিছু আছে সবই তো আপনার পুত্রেরই। তবে কেন আর আমায় এখন লজ্জা দেন!' কিন্তু পিতা তাহাতে উত্তর করিলেন,—তো'দের বংশটাই এইরূপ। ফাকি দিতে পার্‌লে আর ছাড়িস্‌নে। ফল কথা, টাকা আমা-দের আজই চাই। না দিস্ তবে রইল ঐ তোর মেয়ে। আমি আবার আমার ছেলের বিয়ে দেব!'—এই বলিয়া, পিতা আমাদের সকল-কেই উঠিতে বলিলেন; আরও বলিলেন,—'পেচ্ছাপ ফিরে দিই বেটার বাড়ীতে! বেটা এত বড় জুয়োচোর! বেট পচা ছুরিত্তির—বেটা কুলীনের মান কি জানবে? চল সব খাওয়া-দাওয়ার আর দরকার নেই—পচুক বেটার ভোজ!"

"বাসি বিয়ের ভোজের দিন, আহারে বসিবার পাত হইতেছে, এমন সময়ই, এই গোলযোগ! বরযাত্র কেহই আর আহারে বসিলেন না। সকলেরই মুখে—'পেচ্ছাপ করে দিই বেটার বাড়ীতে।' কিন্তু তখনও আমার শ্বশুর মহাশয় সকলেরই পায়ে ধরিতেছেন। বলিতেছেন,—'মহাশয়রা আমায় ক্ষমা করুন। নাগাদ আজ রাত্রি, আমি

যেখানে পাই, ঘর-বাড়ি বিক্রী করেও, আপনাদের টাকা এনে দেবো। আপনারা দয়া ক'রে এখন আহারে বসুন। আমার ঘরে আর একটা পয়সা থাক্‌তে—এক খানা গহনা থাক্‌তে, আমি এমন কচ্ছিনে। আমার যা' কিছু ছিল, সর্ব্বস্বই এই বিয়েই ব্যয় হ'য়ে গিয়েছে। যাহাহোক, আমি যা' দেব বলেছি তাই দেবই; আজ রাত্রেই দেব। আপনারা আমায় ক্ষমা করুন।' কিন্তু, সে কথা তখন আর শোনে কে? সকলেই বলেন,—'পেচ্ছাপ করে দিই তোর কথায়! তো-বেটাদের বংশটাই ঐরূপ জুয়াচোর!' এইরূপ বলিয়া, আরও কত কি পিতৃ মাতৃ উচ্চারণ করিয়া, আমার শ্বশুর-মহাশয়কে সকলেই গালাগালি দিতে লাগিলেন। গালি দিতে দিতে, সকলেই বাটীর বাহির হইলেন। অপমানে, ক্ষোভে, বিষাদে,—শ্বশুর-মহাশয়ের যে তখন কি অবস্থা, তাহা আর বলিবার নহে! তিনি কাঁদিতে লাগিলেন, আমরা সকলেই সে বাড়ীর বাহির হইয়া পড়িলাম। "ঘাটের ধারেই আমাদের নৌকা বাঁধা ছিল; অমনি, সকলে উঠিতেই, নৌকা ছাড়িয়া দিল। পিতা বলিলেন,—'এ গ্রামে আর জলস্পর্শ করাও হ'বে না।' বলা বাহুল্য, যাহার সহিত আমার বিবাহ হইয়াছে, অর্থাৎ আমার স্ত্রী—আহা, সে অভাগিনী—সেইখানেই পড়িয়া রহিল। পিতা, তাহাকেও লইয়া আসিলেন না। বরং বারম্বার আমায় সান্ত্বনা দিয়া বলিতে লাগিলেন,—'ভাবনা কি বাছা! কালই আবার তোমার বিয়ে দিয়ে দেবো!' আমি তো অবাক! বিশেষ, আমি তখন ছেলে-মানুষ—পিতার কথার উপর আমার আর কি কথা আছে? কাজেই, বিষন্ন মনে, সেই কথাতেই সায় দিতে হইল। কিন্তু মনে যে মর্ম্মবেদনা পাইলাম, তাহা আর আপনাকে কি বলিব? তখন একদিন মাত্র বাসর ঘরে তার সেই স্নেহ-মাখা হাসি হাসি মুখ খানি দেখেছি—কিন্তু কি বিধাতার লীলা—তা'তেই তা'র কথা মনে হ'লেই আমার কান্না আস্‌তে লাগ্‌লো! আহা সে অভাগিনী—সে তো কোন দোষেই দোষী নয়—তবে তার প্রতি কেন এ দারুণ শাস্তিশেল! এ যাতনা আমি তো আর এজীবনে ভুল্‌তে পারবো-না! এর কি আর শান্তি আছে?"—এই বলিতে বলিতে, পাগল আবার কাঁদিয়া ফেলিল। আর যেন কিছু বলিতে তার জিহ্বা অবসন্ন হইল।

সন্ন্যাসী এতক্ষণ একাগ্র-চিত্তে এই সকল কথা শুনিতেছিলেন; আর এক দৃষ্টে সেই পাগলের প্রতি তাকাইয়া ছিলেন। শেষ যখন পাগলা কাঁদিয়া ফেলিল, দেখিলাম, তারও চোখে তখন বারি ধারা। তাড়াতাড়ি তিনি অমনি চক্ষু মুছিয়া, আবার পাগলকে বলিলেন,—"বৎস! কাঁদ কেন? তার পর—তারপর কি হলো, আমায় বল!"—এই বলিয়া আপন বস্ত্রাঞ্চল দিয়া, তিনি পাগলের চক্ষু মুছাইয়া দিলেন।

পাগল আবার বলিতে লাগিল,—"তার পর—পাঁচ বৎসর তা'রে আর দেখি-নি! পিতা এর মধ্যে আমার বিবাহ দেবার জন্য কতই চেষ্টা করেছেন; কত যায়গায় কতই পাত্রী স্থির ক'রে এসেছেন! কিন্তু আমি একটা না একটা অছিলা ক'রে, তাঁকে পাঁচ বৎসর থামিয়ে রেখেছিলেম। আজ অসুখ, কাল স্কুলের পরীক্ষা,—এইরূপ কত কি কথাতেই যে তাঁকে স্থির রেখেছিলাম, তা' আর বলবার নয়। শেষ, এই পাঁচ বৎসর পরে, আমার ভগ্নীর বাড়ীতে তার সঙ্গে দেখা। আমার ভগ্নীর কন্যাটীর যেবার বিবাহ হয়, সেইবার লুকিয়ে লুকিয়ে তিনি তাহাকে এনেছিলেন। কিন্তু পিতা তার বিন্দু-বিসর্গও জান্‌তে পারেন-নি! সেই দেখাতেই কিন্তু আমি আরও মজিয়াছি! আহা, সেরূপ, সে

গুণ, সে ভাল-বাসা,—আর কি কোথাও আছে? তা' কি কখনও আর ভুল্‌তে পারি? কিন্তু, আহা, আর একবারও যদি তারে পেতেম—" এই বলিতে বলিতে, এবারও পাগলের কান্না কান্না মুখ। সন্ন্যাসী আবার বাধা দিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—'তারপর?'

"তারপর তো আর তার সঙ্গে দেখা হলো-না! ভগ্নি বলেছিলেন,—'মাস খানেক পরে আর একবার তারে আনাবেন।' কিন্তু মাস-খানেকও তো আর গেল না! সেই সাক্ষাতের ১৫ দিন পরেই, হঠাৎ বিসূচিকা রোগে, আমার ভগ্নীর পরলোক প্রাপ্তি হয়। সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও সকল আশা-ভরসাই ঘুচিয়া যায়। আর, সেই আমার এ পাগল হওয়ার সূত্রপাত। কিন্তু তখনও আমি এমন বদ্ধ পাগল হই-নি! তখনও মনে আশা ছিল, একদিন-না-একদিন তারে পা'বোই পা'বো। কিন্তু তারপরও প্রায় বৎসর-খানেক কাটিয়া গেল। হঠাৎ আমি একদিন আমার নিজ শিরোনামে একখানি পত্র পাইলাম,——

'আর যাতনা সইতে পারছি-নে! এখনও একবার আমায় দেখা দেন। দেখা পেলেই, আমার মৃত্যু হইবে। আর মর্‌তে পার্‌লেই, এখন আমি এ যাতনার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাই। নহিলে, উহু-হু কি কষ্ট! কি যন্ত্রণা! তাই বলি, দোহাই আপনার—দয়া করে একবার—অন্ততঃ এক নিমেষের জন্যও আমায় দেখা দিয়ে যাবেন!' পত্রের এইটুকু মাত্র পড়িতে পারিলাম। আর কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। ক্রমেই অক্ষরের টান গুলো যেন জড়িয়ে এসেছে বলে বোধ হ'লো! লিখ্‌তে লিখ্‌তে হাত কেঁপে গেলে যেমনতর লেখা বার হয়, এও ঠিক তেমনই বোধ হ'লো। পরক্ষণেই শুন্‌লাম,—আমার শ্বশুর-মহাশয়ের কাছ থেকে আমার পিতার কাছেও ঐরূপ এক খানা পত্র এসেছে। তা'তে তিনি লিখেছেন,—"আপনার পুত্র-বধূ নীরোদার বড়ই ব্যায়রাম। এই 'এখন যায়, তখন যায়' এমনই ভাব! কিন্তু, সে কেবলই বিকারের দোষে, আপনার পুত্র সুরেশের নাম করে ডাক্‌ছে, আর বল্‌ছে,—'তুমি এখনও এলেনা! তবে তো আমার মরণ হলো না! তবে তো এ কষ্ট গেলো-না!' তাই আমার একান্ত অনুরোধ, দয়া ক'রে সুরেশকে নিয়ে আপনি একবার এক দণ্ডের জন্যও এখানে আস্‌বেন! তুচ্ছ টাকা! আমি এখন আমার সর্ব্বস্বই আপনাকে দিয়ে যাব। আস্‌বার জন্য, পথ খরচ ইত্যাদি বাবদ ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা আপাততঃ পাঠাইলাম। অনুগ্রহ ক'রে সুরেশকে নিয়ে আস্‌বেন—আস্‌বেনই একবার! মর্‌বার সময়ও যেন সে একবার সুরেশকে দেখ্‌তে পায়।"

"কিন্তু, চিঠিখানা পড়িয়াই, পিতা বলিলেন,—'দেখ্‌লে বেটার ভণ্ডামি! বেটা এখন ফাকি দিয়ে জামাই নিয়ে যেতে চায়? থা'ক, এর উত্তরও দেবো না।' অথচ ডাকের টাকা পঞ্চাশটি হস্তগত করিতে ভুলিলেন না। এইরূপে ২।৩ দিন কাটিয়া গেল। ৪র্থ দিবসে পিতার নামে এক টেলিগ্রাম আসিল। তাহার মর্ম্ম এই যে,—'নীরোদাকে তুলসী-তলায় বার করা হইয়াছে। অথচ তার সেই বুলি। এখনও সুরেশকে পাঠাইলে ভাল হয়। নইলে, তার সে যাতনা কিছুতেই সইতে পার্‌চ্ছিনে।' পিতা তখন মনে মনে কি ভাবিলেন; ভাবিয়া, বলিলেন,—'হয় তো সত্যি সত্যি হ'তে পা'রে! এখন না গেলে, জিনিসগুলো পাছে আবার হাত-ছাড়া হয়!' এইরূপ মনে মনে কি বলিয়াই, তিনি যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। আমাকেও বলিলেন,—'চল সুরেশ, ব্যাপারখানা একবার দেখেই আসা যাক্।'"

"কাজেই চলিলাম। কিন্তু, যাইবার সময় পিতা আমারে অনেক করিয়া বুঝাইতে লাগিলেন,—'যদি সত্যিই হয়, তা' এক রকম মন্দ

কি ? ২৬এ যে দিনটে আছে, সেই দিনেই তা হ'লে, শ্রীপুরের বিপিন বাবুর মেয়েটির সঙ্গেই তোমার বিয়ে দিয়ে দেবো। বিপিন বাবুদের আজ-কাল সময় ভাল—তাঁরা জমীদার লোক ; বিশেষ, মেয়েটিও দেখ্‌তে শুন্‌তে মন্দ নয়। সেইটিই তোমাকে আমি জুটিয়ে দিচ্ছি। ভাবনা কি ? বিশেষ টাকাকড়িও তাঁরা বেশ দেবেন !' কিন্তু আমার তখন অন্য ভাব ! আমার প্রাণে তখন দারুণ যন্ত্রণা ! আমার কি আর সে কথা কানে স্থান পায় ? আমার অন্তর তখন 'ধূ ধূ' করিয়া জ্বলিতেছে। আমি একবার নিতান্তই যেন উপরোধে পড়িয়া, উত্তর দিলাম,—'হাঁ,' কিন্তু হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইতে লাগিল। যাহা হউক, ক্রমে আমরা পরদিন বেলা অপরাহ্ন সময়ে আমার শ্বশুরবাড়ীর গ্রামে গিয়া পৌঁছিলাম। কিন্তু বাটীতে প্রবেশ করিতেই, শুনিলাম,—দারুণ ক্রন্দন-কোলাহল। শুনিয়া আমার পা আর কিন্তু সরে না ; অথচ পিতার তখন বড়ই তাগিদ ! 'চল—চল—একটু চলে চল' বলিয়া তিনি আমায় বড়ই বিরক্ত করিতে লাগিলেন। কিন্তু তখনও জানি নাই, কেন তাঁহার এত তাড়াতাড়ি। পরে, আমরাও গিয়া পৌঁছিলাম, আমার সেই হতভাগিনী স্ত্রীও চক্ষু মুদিল। একবার আমার পানে তাকাইয়াই 'এসেছ—এস—এস—আমার মাথার উপর তোমার পা-দু'খানা একবার দেও' —কেবল এই গুটি-দুই-তিন কথা বলিয়াই, সে চক্ষু বুঁজিল ! আর চাহিতে পারিল না, আর কথাও কহিতে পারিল না। কিন্তু দেখিলাম, তখনও তাহার চোখে জল। দেখিয়া আমারও অশ্রু অনিবার্য্য হইয়া আসিল ; আমিও কাঁদিয়া ফেলিলাম,—'নীরোদা ! নীরোদা ! কই তুমি, কোথা গেলে ! সঙ্গে সঙ্গে তাহার মা বাপ সকলেই কাঁদিতে লাগিলেন !"

"কিন্তু পিতা আমার—আহা কি পাষণ্ড তিনি—তখনও স্থির নাই ! তিনি তখনও আমার শ্বশুরকে ডাকিয়া বলিতেছেন,—'বেহাই একবার বৌমাকে জিজ্ঞাসা কর দেখি, তাঁর গয়নাগুলো সব কোথায় রেখেছেন !' ছি ! ছি ! কি ঘৃণা ! কি লজ্জা ! পৃথিবী মা, তুমি তখন কেন দ্বিধা হ'লে না ! তা হ'লে তো তখনই শান্তি পেতেম !"—এই বলিতে বলিতে পাগল আবারও কাঁদিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে, কি জানি কেন, সন্ন্যাসীও কাঁদিয়া ফেলিলেন।

"তারপর হইতেই আমি এই বদ্ধ পাগল। শ্বশুর মহাশয়ও, আর দ্বিরুক্তিটি না করিয়া, গহনাগুলি আনিয়া পিতাকে অর্পণ করিলেন। পিতা ও আমি দুই জনে দুই পথে বহির্গত হইলাম। পিতা আমায় বলিলেন,—'সুরেশ ! তুমি তবে এই পথে বাড়ী যাও। আমি একবার এই যাত্রাতেই শ্রীপুরের বিপিন বাবুদের বাড়ীর সম্বাদটা পাকা করে আসিগে।' আমি বলিলাম,—'যে আজ্ঞে !' কারণ তখন তাঁকে ছাড়িতে পারলেই আমি যেন বাঁচি ! সেই মত পিতা শ্রীপুরে দিকে চলিয়া গেলেন আর আমিও এই পাগল—এই বনের দিকেই চলে এসেছি ! এখনও আশা, যদি আমি এখনও নীরোদাকে পাই ! কিন্তু কই সে আমার—কোথায় সে ! তার পরও এই পনের বৎসর চলে গেল ; জীবনের পরপারে যেতে বস্‌লেম ! কিন্তু, কই, এতদিনেও তো তারে পেলেম না ! এখনও তো তারে ভুল্‌তে পারলেম না ! অনাহার, অনিদ্রা, রুক্ষ-কেশ, জীর্ণ-বেশ—এত আরাধনা করিয়াও কই সে তো আমায় দেখা দিলে না।"—এই বলিতে বলিতে, পাগলও কাঁদে, সন্ন্যাসীও কাঁদেন। একি এ অপরূপ ব্যাপার।

ক্রমে কাঁদিতে কাঁদিতে সন্ন্যাসী বলিতে লাগিলেন,—"বৎস ! তোমার সে হতভাগ্য পিতাকে এখনও তুমি ক্ষমা কর ! সে পাপে, নরকেও যে সে স্থান পাবে না ! যে যন্ত্রণায়—যে নীরয়-কীট-দংশনে—তা'কে দিন রাত্রি

অস্থির রেখেছে, বৎস, এখনও তার উপায় কর। পুত্র তুমি, হাজার অপরাধী হউন, তবু তিনি তোমার পিতা—তোমার সেই হতভাগ্য পিতাকে এখনও তুমি ক্ষমা কর—এখনও তুমি নিষ্কৃতি দেও। আর এ যন্ত্রণা সে যে সহিতে পার্‌ছে-না ! উঃ ! বড়ই অসহ্য ! কি কষ্ট ! কি যাতনা ! প্রাণ জ্বলে গেল ! পুত্র ! বাঁচাও—বাঁচাও—রক্ষা কর !'—এই বলিতে বলিতেই, সন্ন্যাসীর হঠাৎ মূর্চ্ছা উপস্থিত হইল। একে বৃদ্ধ-শরীর, তায় কতদিনের অনাহার, তায় এমন মর্ম্মভেদী বাক্য-বাণ—শোক-স্রাব ! এতে কি আর তিনি স্থির থাকিতে পারেন ?

পাগলেরও তখন হঠাৎ জ্ঞান-সঞ্চার ! "পিতা ! পিতা ! কোথা গেলে !—কই তুমি ! —ওঠ—ওঠ ! অবোধ পুত্র আমি, আমায় ক্ষমা কর—ক্ষমা কর ! আর আমায় অধিক পাপে ডুবিও না।"—এই বলিতে বলিতে, পাগল তখন সন্ন্যাসীর মুখমণ্ডলে ব্যজন করিতে লাগিল। আর, হা-হতাশে কাঁদিতে লাগিল।

দণ্ড-খানেক পরে, জলসেক ও ব্যজন করিতে করিতে, সন্ন্যাসীর কিঞ্চিৎ জ্ঞানোদয় হইল। তিনি পুত্রকে বক্ষের উপর ধারণ করিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন,— "বৎস ! তোমার অপেক্ষাও যে, আমি অল্প কষ্টে আছি, তাহা নয়। আমারও যে মনোকষ্ট—আমারও যে যন্ত্রণা, তাহা আর বল্‌বো কি ? বৎস ! সেই তোমাকে বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েই, আমি তো শ্রীপুরের সম্বন্ধ স্থির ক'রে আসি। সেখান থেকে কিঞ্চিৎ টাকাও অগ্রিম নিয়ে এসেছিলাম। বিবাহের দিনস্থিরও তিন দিন পরেই ঠিক হয়েছিল। কিন্তু বাড়ী এসে যখন দেখ্‌লেম, তুমি বাড়ী আস-নি, এদিকে গৃহিণীর ব্যায়রাম—তখন আমার প্রাণ শুকিয়ে গেল ! তোমার খোঁজ নিই, না গৃহিণীর ঔষধ-পথ্যের ব্যবস্থা করি, না বিবাহের আয়োজন করি—কিছুই তখন ঠিক ক'রে উঠ্‌তে পার্‌লেম না। যাইহোক তোমায় খুঁজবার জন্যে চারিদিকেই লোকজন পাঠালেম—চারিদিকেই তত্ত্বতল্লাস নিতে লাগ্‌লেম। কিন্তু সকলই বৃথা ! তোমার কোনই খোঁজ-খবর পেলেম না ! অধিকন্তু, একে তোমার অদর্শন, তায় সুচিকিৎসার অভাব—৪ দিনের জ্বরে গৃহিণীও প্রাণত্যাগ করিলেন ! কোথায় তার আগের দিন তোমার বিবাহ দিব, তা' না' এই বিভ্রাট। এদিকে, শ্রীপুরের বাবুরা বিবাহের দিন পাত্র লইয়া উপস্থিত না হওয়ায়, কতকটা বা তোমার প্রথম বিবাহ ও তাঁহাদের সহিত আমার সেই সকল দুর্ব্যবহারের কথা শুনিয়া, আমার নামে ফৌজদারীতে এক নালিশ জুড়িয়া দিলেন। সৎকার-কার্য্যের জন্য যেদিন গৃহিণীর সেই শবদেহ গঙ্গাতীরে লইয়া যাওয়া হয়, সেই দিনই, শ্মশান-ক্ষেত্রে আসিয়া, আমার ভৃত্য আমায় সংবাদ দিল,—'বাবু ! পালান—পালান ! কোম্পানীর লোক-জন পরোয়ানা নিয়ে এসে আপনাকে খুঁজ্‌চে।' প্রাণের দায়ে, অপমানের ভয়ে, বৎস, আমি সেই পলাইয়াছি। সেও আজ পনের বৎসর ! জানিনা তারপর গৃহিণীর সৎকারের কি হ'ল ! জানিনা তারপর সাধের সংসার কোথায় গেল ! জানিনা, সে পিশাচ-বৃত্তির টাকাই বা কোথায় কার ভোগে লাগ্‌বে ! বাছা, নিজের দোষে নিজে মজেছি ; আর পাঁচ জনকে মজিয়েছি ; নিজে মর্‌ছি আর পাঁচজনকে মার্‌ছি ; এখন, বল-বল, বল দেখি, আমার উপায় কি ? পুত্র তুমি, অভাগা পিতা আমি তোমার, যদি পার বৎস, এখনও আমায় বাঁচাও !"—এই বলিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে, সন্ন্যাসীর আবার সেইরূপ মূর্চ্ছা !

কিন্তু এবার বড়ই ভয়ানক মূর্চ্ছা। এবার তো কই তিনি আর জেগে উঠ্‌লেন্ না ! হাজার শুশ্রূষা করেও এবার তো কই তাঁর পুত্র তাঁরে আর জাগাতে পার্‌লেন-না ! সঙ্গে

সঙ্গে পাগলেরও আবার একি ভাব! মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বেই, আসন্নশায়ী রোগীর নাড়িতে যেমন কিঞ্চিৎ বল-সঞ্চয় হয়, পাগলেরও সেইরূপ কিছুক্ষণ জ্ঞানোদয় হইয়াছিল! কিন্তু পরক্ষণেই আবার সেই যে-কে-সে! সে আবার সেই পাগল। এখন, সে আনন্দে করতালি দিয়া, বলিতে লাগিল,—"মর!—মর!—মর! তুমি মর!—মা মরুক!—নীরোদা মরুক!—আমি মরি! সব্বাই মরি! মর!—মর!—মর! তুমি মর!—মা মরুক!—নীরোদা মরুক!—আমি মরি! সব্বাই মরি!"

অদৃষ্ট।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

সুলোচনা-সন্নিধানে।

আমি ওকালত-নামা দিয়া আমার তথায় থাকা নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়া, আমি ডাক্তার-বাবুর বাটী যাত্রা করিলাম। কিন্তু যাইবার পূর্ব্বে, সমস্ত বিষয় বর্ণনা করিয়া, জয়গোপালকে একখানি সুদীর্ঘ চিঠি লিখিয়া গেলাম। সমভিব্যাহারে হরিপদ; সে চলিতে অক্ষম, আর আমি যে তাহাকে সমস্ত পথ কোলে করিয়া লইয়া যাই, তাহাও পারি না। অতএব একখানি গরুর গাড়ি ভাড়া করিয়া সেই গাড়িতে পিতা-পুত্রে উভয়ে গমন করিলাম। আজ-কাল যেরূপ প্রায় সকল স্থানেই রেল-গাড়ি হইয়াছে, সে কালে তদ্রূপ ছিল না। আমি একেলা হইলে, যে রাস্তা একদিনে চলিয়া যাইতে পারিতাম, গরুর গাড়ি করিয়া যাইতে সেই রাস্তায় তিন দিন লাগিল। আমাকে বিধির বিপাকে ডাক্তার-বাবুর বাড়ী যাইতে হইয়াছিল; একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সুলোচনা আমাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। মনে করিয়াছিলাম, যদি তিনি ছেলেটাকে পদতলে স্থান দেন, তাহা হইলে আমি অন্যত্র গিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায় উদ্ভাবন করিতে পারি। যখন আমি প্রথমে গরুর গাড়ি আরোহণ করিলাম, তখন মনোমধ্যে একটু আহ্লাদের সঞ্চার হইল। দ্বিতীয় দিবসও মনের অবস্থা সেইরূপ ছিল। তৃতীয় দিবস অপরাহ্ণে, ডাক্তার বাবুর বাটী হইতে তিন-চারি মাইল থাকিতে, আমার হৃদ্‌পিণ্ড ধক্‌ধক্ করিতে লাগিল। প্রথমতঃ ভাবিলাম,—ডাক্তার বাবুর বাটীর সকলে ভাল আছেন কি না? দ্বিতীয়তঃ—সুলোচনা অদ্যাপি জীবিতা আছেন কি না? তৃতীয়তঃ—আমাকে অনুগ্রহ করিয়া স্থান দান করিবেন কি না? পূর্ব্বাপেক্ষা যদিও আমার অবস্থা অনেক উত্তম, এবং অপরের আশ্রয় না লইলেও কষ্টে-শ্রেষ্টে এক্ষণে আমার সংসার চলিতে পারিত; কিন্তু হরিপদকে ছাড়িয়া আমার এক পদও চলিবার যো ছিল না; সুতরাং জমা-জমী থাকা-না-থাকা আমার পক্ষে উভয়ই সমান হইয়া উঠিয়াছিল। অদৃষ্টে যাহা হ'বার, তাই হ'বে—এই ভাবিয়া, সাহসে ভর করিয়া, ডাক্তার বাবুর বাটীর বহির্দ্বারে পৌঁছিলাম। গাড়ি হইতে অবতরণ করিয়া কাহাকে দেখিলাম? সেই সোণার পুতলী সুলোচনা বহির্দ্বারে দাঁড়াইয়া আছেন। তাঁহার সে প্রফুল্ল মুখমণ্ডল নাই, তাঁহার সে চেহারায় লাবণ্য নাই, তাঁহার সেই মুখমণ্ডলে ঈষৎ মধুময় হাসি নাই। সংক্ষেপতঃ তিনি যেন অপর এক জন ব্যক্তি হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু আমি দেখিবামাত্র তাঁহাকে চিনিতে পারিলাম। কিন্তু তিনি আমাকে অপরিচিত এক ব্যক্তি মনে করিয়া মাথায় ঘোমটা দিতে গেলেন। আমি তদ্দর্শনে তাঁহার নিকটে গিয়া বিনীতভাবে দাঁড়াইলাম; তখন তিনি মুহূর্ত্তেকে আমাকে চিনিলেন। চিনিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"যদু-দা না?" আমি উত্তর করিলাম,—"হাঁ, আমিই সেই হতভাগ্য।" সুলোচনা কহিলেন,—"কোথায়, আমাদের হরিপদ কোথায়?" আমি বিস্মিত হইয়া ভাবিলাম,—"ইনি এসমস্ত বৃত্তান্ত কি প্রকারে জানিতে পারিলেন?" সুলোচনা অত্যন্ত বুদ্ধিমতি, এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আমাকে বিস্ময়াপন্ন দেখিয়া তিনি কহিলেন,—"যদু-দা, তুমি আমাদের খবর রাখ না; কিন্তু আমি তোমাদের খবর রাখিয়া থাকি। হরিপদ হয়েছে, তাও জানি; তোমার বউ মরেচেন, তাও জানি; শেষে তোমার মার মৃত্যু হয়েছে, তাও জানি। দুঃখের বিষয় তুমি আমাদের কথা কিছুই জান না।"

আমি কাতর-স্বরে উত্তর করিলাম,—"আপনারা বড়-মানুষ, আপনারা কত স্থান হ'তে কত খবর পান, সেরূপ ত আমাদের পাবার সম্ভাবনা নাই! তবে এখন আপনারা কেমন আছেন, বলুন!" সুলোচনা একটু হাসিয়া কহিলেন,—"আবার আপনি আপনি ধরেছ যদু-দা?" আমি উত্তর করিলাম,—"আমার মতন লোক আপনাকে আর কি বলে সম্ভাষণ কর্‌তে পারে?"

সুলোচনা কহিলেন,—"আমার অবস্থা ত তুমি স্বচক্ষে দেখ্‌তে পাচ্চ; কিন্তু বাবার অবস্থা আমা অপেক্ষাও খারাপ। তিন বছর হ'ল আমার মা মরেচেন; সেই অবধি সুখ কাকে বলে, তা জান্‌তে পারি-নি। বাবারও সেইরূপ দুর্দ্দশা ঘটেছে। তুমি মনে ক'রো না যে, তোমা অপেক্ষা আমরা অধিক সুখে থাকি। যদু-দা, টাকা-কড়িতে যদি সুখ হত, তা'হ'লে আমি সুখী না হই, অন্ততঃ বাবা হতেন। কিন্তু টাকায় ত সুখ নাই। সুখ মনে, কিন্তু সে সুখ আমারও নেই, বাবারও নেই।"

সুলোচনার কথা শুনিয়া আমার অকৃত্রিম দুঃখ হইল। আমি কি বলিব, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না। এমন সময় ডাক্তার-বাবু, নিজে একখানি সাদা-ধুতি পরিয়া ও গায় একটী বেনিয়ান দিয়া ও এক গাছি ছড়ি হাতে করিয়া, বাহিরে আসিলেন। আসিয়া, আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কে, যদু না?"

আমি বিনীতভাবে কহিলাম,—"আজ্ঞে, আমিই আপনার সেই পুরাতন ভৃত্য।"

ডাক্তার বাবু কহিলেন,—"ভাল ভাল! তুমি যে এতদিন আমাদের মনে করে রেখেছ, সেও ভাল।" এমন সময় আমার গাড়িতে প্রত্যাগমন করিতে বিলম্ব দেখিয়া হরিপদ নিজের ব্রহ্ম-অস্ত্র পরিত্যাগ করিল, অর্থাৎ কাঁদিয়া উঠিল।

ডাক্তার-বাবু কহিলেন,—"গাড়ীতে ছেলে-মানুষের গলার শব্দ শোনা যাচ্চে, ও কে।"

এ সমস্ত বিষয় স্ত্রীলোকে যত বুঝে, পুরুষ তত বুঝিতে পারে না। সুলোচনা বালকের ক্রন্দন-ধ্বনি শুনিয়া কহিলেন,—"গাড়িতে বুঝি হরিপদ আছে?" এ কথা সমাপ্ত করিতে না করিতে, তিনি দৌড়াইয়া গাড়ীর নিকটে গিয়া, হরিপদকে কোলে করিয়া আনিলেন।

তাহার মাতার মৃত্যু অবধি হরিপদ আমারই দ্বারা লালিত পালিত, এবং আমার বাটীতে যে সমস্ত বন্ধু-বান্ধব আসিতেন, তাঁহাদিগেরই সহিত কথা-বার্ত্তা কহিত। স্ত্রীলোকের মুখ কখন দেখিতে পাইত না। কালে-ভদ্রে আত্মীয় বা অপর যদি কোন স্ত্রীলোক তাহাকে কোলে করিতে চাহিত, তাহা হইলে কাঁদিতে কাঁদিতে দৌড়িয়া আমার কোলে আসিয়া বসিত। কিন্তু সে, সুলোচনাকে, দেখা দূরে থাকুক, তাহার নামও কখন শুনে নাই। সুলোচনা যখন তাঁহাকে কোলে করিলেন, সে হাসিতে হাসিতে প্রফুল্ল চিত্তে আমরা যেখানে দাঁড়াইয়াছিলাম, তথায় আসিল।

চুম্বকের যেরূপ লৌহ-আকর্ষণ করিবার ক্ষমতা আছে, সেইরূপ বালকদিগেরও ভাল-মন্দ লোক নির্ব্বাচন করিবার ক্ষমতা আছে।

সুলোচনা যখন পুত্রটী, ডাক্তার বাবু ও আমি যেখানে দাঁড়াইয়া ছিলাম—সেইখানে, কোলে করিয়া আনিলেন, ডাক্তার বাবু তাহাকে দেখিয়া তাহার মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন,—"যদু, এটী যে তোমার ছেলে, একথা বলিয়া দিবার দরকার নাই। আমি বিদেশে দেখিয়া, কাহারও নিকট কোন কিছু না শুনিয়া, বলিয়া দিতে পারিতাম যে, এ তোমারই পুত্র। বস্তুতঃ ছেলেটী যেন তোমারই ফটোগ্রাফ হইয়াছে।" পরে হাস্য-মুখে সুলোচনার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন,—"কেমন সুলোচনা ছেলেটীকে প্রতি-পালন কোরতে পারবি?"

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

হরিপদ কোথায়?

ডাক্তার-বাবুর বাটী হইতে পূর্ব্বে যখন বিদায় লইয়া গিয়াছিলাম, তখন তাঁহাকে যেরূপ দেখিয়াছিলাম, এক্ষণে পুনরায় তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইল, যেন ইনি সে ডাক্তার-বাবু নন। তাঁহার কেশ প্রায় সমস্ত শুভ্র হইয়া গিয়াছে; মস্তকে টাক পড়িয়াছে; চেহারা অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়াছে; যখন যেখানে যান, বিনা-ছড়ি-অবলম্বনে যাইতে পারেন না। আমাকে তিনি জলযোগ করিতে আদেশ করিয়া বাহিরে গিয়া বসিলে, আমি সর্ব্বাগ্রে তাঁহার ডাক্তার-খানায় গমন করিলাম। ডাক্তার-বাবু ও সুলোচনা আমাকে যে এতাদৃশ আদর করিবেন, তাহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। এক্ষণে, ডাক্তার-খানার কম্পাউণ্ডার বাবুরা আমাকে আদর করুন বা না করুন, সে বিষয়ে আমার কোনই ভাবনা হইল না; সুতরাং আমি নির্ভয়ে ডাক্তার-খানায় গমন করিলাম। সেখানেও সকলে আমাকে সমা-দরে আহ্বান করিলেন। তাঁহাদিগের মুখ দেখিয়া বোধ হইল, যেন সত্য সত্যই আমাকে বহুকালের পর দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। আমিও তাঁহাদিগকে দেখিয়া আহ্লাদিত হইলাম। এইরূপে কথা-বার্ত্তায় ও শিষ্টাচারে রাত্রের আহারের সময় পর্য্যন্ত অতিবাহিত হইল। রাত্রে আহারের সময় আমাদিগের ডাক হইলে, আমি, হরিপদ কোথায় আছে, জিজ্ঞাসা করিলাম। কিন্তু কেহই কিছু বলিতে পারিল না। তখন আমি নিজে ডাক্তার-বাবুর আপন বাসস্থানে গিয়া হরিপদর অনুসন্ধান করায়, একজন দাসী আসিয়া কহিল,—"সুলোচনা তাহাকে আহারাদি করাইয়া ক্রোড়ে লইয়া শয়ন করিয়া আছেন।" আমি এই অভূত-পূর্ব্ব ব্যাপার শুনিয়া অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। যে হরিপদ আর কাহারও সঙ্গে খায় না, কাহারও সহিত শোয় না, এবং যে স্ত্রীলোকের নাম শুনিলেই দৌড়িয়া পলাইয়া যায়; সে কেন অদ্য সুলোচনার সহিত শয়ন করিল? ইহাতে আমার আহ্লাদও হইল, দুঃখও হইল। আহ্লাদ হইল এই হেতু, যে, এখন অবধি আমি হরিপদকে কোন না কোন ব্যক্তির নিকট রাখিয়া নিজকার্য্যে গমন করিতে পারিব। কিন্তু দুঃখ হইল যে, যে হরিপদকে আমি তাহার মাতার ন্যায় প্রতিপালন করিয়া আসি-তেছি, যে আর কাহারও নিকট যায় না, কাহা-রও সহিত আহার করে না, কাহারও সহিত শয়ন করে না, এবং যে আমা ভিন্ন আর কাহাকেও নিজের মনের কথা বলে না, সেও আমার পর হইতে চলিল! পর ভাবিলেম,—'এরূপ চিন্তা করার ফল কি? বিধি-লিপি অবশ্যই ঘটিবে।' অনন্তর আমি ফিরিয়া আসিয়া অন্যান্য সকলের সহিত বহির্ব্বাটীতে আহার করিয়া আমার পূর্ব্ব-শয্যায় শয়ন করি-লাম। কিন্তু, প্রথমতঃ স্থান-পরিবর্ত্তন-হেতু, দ্বিতীয়তঃ হরিপদকে পার্শ্বে না পাইয়া, আমার আর ঘুম হইল না। অপর সকলে নাসিকা-ধ্বনি করতঃ অকাতরে নিদ্রা যাইতে লাগিলেন।

ডাক্তার-খানায় আরা-জেলা নিবাসী কুর্ম্মী-জাতীয় এক ব্যক্তি চাকর ছিল। সে অন্যান্য ভৃত্য অপেক্ষা আমাকে কিঞ্চিৎ অধিক খাতির করিত। তাহার কারণ এই যে, আমি যখন ঐ ডাক্তার-খানায় চাকরি করিতাম, তখন পাল-পার্ব্বণে তাহাকে দুই-এক আনা করিয়া দিতাম, ও হুলির সময় একখানি ধুতি ও এক-খানি চাদর দিতাম। আহারান্তে সকলেই নিদ্রিত হইলে, আমাকে জাগ্রত দেখিয়া, সে এক কলিকা তামাক দিয়া আমার পদসেবা করিতে প্রবৃত্ত হইল। আমি মনে করিলাম,—যদিও এ ব্যক্তি আমাকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক সম্মান ও সমাদর করিতেছে না, তথাপি আমার বোধ হইল যে, কোন না কোন গূঢ় কথা সে আমাকে বলিবে, এই জন্যই এরূপ করি-তেছে। কথাটা কি জানিবার জন্য আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"গণপৎ তোমার ছেলে-পিলে ভাল আছে ত?"

সে কহিল,—"হুজুর, আপনার আশীর্ব্বাদে সকলেই ভাল আছে।"

গণপৎ হিন্দিও কহিত না, বাঙ্গালাও কহিত না; কিন্তু উভয় ভাষা মিশ্রিত করিয়া এরূপ মিষ্টি কথা কহিত যে, তাহা শুনিতে সকলেই আনন্দ অনুভব করিত। চিনিও খাইতে বিশেষ ভাল নয়, ছানাও ভাল নহে। কিন্তু উভয়ে মিশ্রিত হইয়া সন্দেশে পরিণত হইলে কাহার না ভাল লাগে? অনন্তর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"বাবুর বাড়ীর সমস্ত কেমন আছে?"

গণপৎ কহিল,—"বাবু, ও কথা আর কহিবে না, আপনি তো জানে, মা-জী মরিয়া গিয়াছে। দিদি-জীর সেই অবধি যে কত তক্‌লিফ হয়েছে, তা আমি বোল্‌তে পারে না। যে তিনটা ছোট ছোট বাবু ছিল, তাদের ছকলেরই ছাদি হয়েছে। বউ-জীরা ছকলেই বড়া বড়া আছে, লেকেন কাম কিছু না করে, খালি পান বানায় ও নিদ্ যায়। দিদি-জীকা ছব কোর্‌তে হোয়। কাম কর্‌তে কর্‌তে দিদি-জী বহুৎ দুবলা হয়ে গিয়েছে, হামার দেখলে তো কান্না পায়।"

এতদূর শুনিয়া আমার অত্যন্ত কষ্ট বোধ হইল; কিন্তু সবিশেষ কিছুই জানিতে পারি-লাম না। গণপৎ যাহা কহিল, তাহা সত্য হইতেও পারে, না হইতেও পারে। মনে করিলাম, প্রাতে ইহার সবিশেষ জ্ঞাত হইব। এইরূপ আর দুই চারি কথা কহিতে কহিতে আমার নিদ্রাকর্ষণ হইল। আমি দিন কয়েক হইতে নানাবিধ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায়, অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম। অনন্তর ডাক্তার-বাবুর বাটীতে আসিতে সেই পরিশ্রমের পর অপর আর এক পরিশ্রম উপস্থিত হইল। এই উভয়ের একত্র মিলন হওয়ায় আমার নিদ্রা এরূপ গাঢ় হইল যে, পরদিন আট্‌টার পূর্ব্বে আমার সে নিদ্রা ভঙ্গ হয় নাই। গাত্রোত্থান করিয়া চারি দিকে চাহিয়া দেখিলাম, বিলক্ষণ রৌদ্র উঠি-য়াছে। ইহাতে মনে মনে লজ্জিত হইয়া আমি বাহিরে উঠিয়া আসিব মনস্থ করিতেছি, এমন সময় হরিপদকে কোলে করিয়া সুলো-চনা সেই ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

প্রাচীন কবি

কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার।

"সদ্ভাব-শতক' খণ্ডকাব্য বাঙ্গালা-ভাষার এক অমূল্য রত্ন। পঠদ্দশায়, মাইনার-ছাত্রবৃত্তি-শ্রেণীতে, একবার 'সদ্ভাব-শতক' পড়িয়াছিলাম; কিন্তু 'সদ্ভাব-শতকের' কথা মনে পড়িলে, এখনও আবার তাহা পড়িতে আকাঙ্ক্ষা হয়—পড়িয়া, প্রতি পত্র প্রতি ছত্র 'মুখস্থ' করিয়া রাখিতে ইচ্ছা হয়। 'সদ্ভাব-শতক' এমনই

এক উপাদেয় জিনিস। 'সদ্ভাব-শতকের' 'দুরাশা' নামক প্রথম কবিতাটিই এই ঃ—

"নেত্র নাই, বাঞ্ছা হেরি, বিধুর-বদন।
কর্ণ নাই, চাই শুনি, ভ্রমর-গুঞ্জন॥
নাসা নাই, আশা করি, সুবাস গ্রহণে।
রসনা-বিহীন, সুধা, বাসনা রসনে॥
কর নাই, করীর বন্ধনে আকিঞ্চন।
অচল-লঙ্ঘনোৎসুক বিফল চরণ॥
আতর সঞ্চিত নাই বঞ্চিত সাঁতারে।
মানসে মনন যেতে পয়োনিধি-পারে॥
প্রেম নাই প্রিয়-লাভ আশা করি মনে।
হাফেজের মত ভ্রান্ত, কে ভব-ভবনে॥"

এইটি প্রথম কবিতা। এ ছাড়া, বাঙ্গালার উপমা-স্থল অনেক কবিতাই 'সদ্ভাব-শতকে' আছে। দুইটি নমুনা; যথা,—

(১)

"চির-সুখী জন, ভ্রমে কি কখন,
ব্যথিত বেদন বুঝিতে পারে!
কি যাতনা বিষে, বুঝিবে সে কিসে,
কভু আশীবিষে দংশেনি যারে॥"

(২)

"যে জন দিবসে, মনের হরষে,
জ্বালায় মোমের বাতি।
আশু গৃহে তার, দেখিবে না আর,
নিশীথে প্রদীপ ভাতি॥"

এইরূপ, ঈশ্বর-তত্ত্ব-বিষয়কগুলিও আরও সুন্দর। দুই-একটী, যথা,—

(১)

"ওহে স্রোতস্বতি, ত্বরিত-গতি,
আছে তব দেশ-বিদেশে গতি।
ব্যাকুল হয়েছি দেখিতে যাঁরে—
দেখ যদি তুমি কোথাও তাঁরে;
জিজ্ঞাসিবে আমি কতই আর,
কাঁদিয়া বেড়াব বিরহে তাঁর!
করিবেন তিনি করুণা কবে,
কবে তাঁর সনে মিলন হবে!"

(২)

"বল হে ভূধর, তুলিয়া শির,
কারে নিরীক্ষণ করিছ ধীর!
ব্যাকুল হয়েছি দেখিতে যাঁরে;
দেখিছ—দেখিছ, তুমি কি তাঁরে!
বল, কোথা তিনি, কোথায় যাব।
কোথা গেলে তাঁরে দেখিতে পাব।"

'সদ্ভাব-শতকের' সর্ব্বত্রেই এমনই ভাব—এমনই সৌন্দর্য্য। তুলিতে গেলে, পুস্তকখানি সবই তুলিতে হয়। কিন্তু তত স্থানাভাব; এবার আর তাই আর কিছুই তুলিতে * পারিলাম না। ফলতঃ এরূপ মনোহর কবিতাতেই —'সদ্ভাব-শতক' পূর্ণ।

অদ্যকার আলোচ্য 'প্রাচীন কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার' মহাশয়ই এহেন 'সদ্ভাব-শতক' প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা—এই হতভাগ্য বঙ্গভূমির এক জন ভাগ্যহীন কবি।

যশোহর-জেলার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থিতি কালে, একবার ঐ প্রাচীন কবি মহোদয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার বাসনা বলবতী হয়। অনুসন্ধান লইতে লইতে হঠাৎ একদিন সন্ধান পাই—"তিনি যশোহরের ভোলানাথ চক্রবর্ত্তী নামক এক ব্যক্তির 'হোটেলে' অবস্থিতি করেন; এবং যশোহর-জেলা স্কুলের প্রধান পণ্ডিতের কার্য্যে ব্রতী আছেন।"

সন্ধান পাইয়াই, অমনি উদ্‌গ্রীব হইলাম; খুঁজিতে খুঁজিতে ঐ হোটেলে গিয়া উপস্থিত হইলাম। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল। কিন্তু সাক্ষাতে যাহা দেখিলাম, ভাগ্যহীন আমি, বাস্তবিকই তাহাতে

* সময়ান্তরে এই কবির অন্যান্য পুস্তকের আলোচনা-চ্ছলে সঙ্গে সঙ্গে পাঠককে অন্যান্য ২।৩ টি বিষয়ও দেখাইবার বাসনা রহিল।

আমার কান্না আসিল। দেখিলাম, হোটেলের (মফঃস্বলের বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের হোটেল; সুতরাং তাহা হইতেই বুঝিয়া লউন, হোটেলটি কিরূপ!) অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র পর্ণকুঠীরে (চলিত ভাষায় 'কুঁড়ে ঘর' বলিলেও হয়) কৃষ্ণবর্ণ, শীর্ণ-দেহ, রুক্ষ কেশ—যেন আসন্ন-শয্যাশায়ী—একটী বৃদ্ধ। একখানি ছিন্ন কন্থার উপর, সেইরূপ একখানি ছিন্ন বস্ত্র গায়ে দিয়া, শুইয়া আছেন। শরীর অবসন্ন, মুখ-মণ্ডল মলিন ও দারুণ জরা-চিন্তাপূর্ণ। প্রথমতঃ তাঁহাকে দেখিয়াই মনে হইয়াছিল,—ইনি বুঝি তিনি নহেন, কোন আসন্ন-শায়ী রোগী; তাই ইহাঁকে এমন ভাবে রাখা হইয়াছে। কাজেই, একবার ফিরিয়া আসিলাম। কিন্তু পরক্ষণে, আবারও যখন পরিচয় পাইলাম, —"না, উনিই কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, ডাকুন না, ডাকিলেই সাড়া পাইবেন।" অমনি, আবার সঙ্কুচিত-ভাবে তাঁহার নিকট গমন করিলাম। অপরিচিত আমাকে সে কুঠীর-মধ্য প্রবেশ করিতে দেখিয়া, তিনিও অমনি উঠিয়া বসিলেন; এবং আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি কে?" আমি বলিলাম,—"আমি অনুসন্ধান" পত্রিকার কার্য্যালয়ের একজন প্রতিনিধি-কর্ম্মচারী। মহাশয়কে দর্শন করিতে আসিয়াছি; এবং এই কয়েক খণ্ড 'অনুসন্ধান' আপনাকে উপহার-স্বরূপ প্রদান করিতে আসিয়াছি।" আরও, সেই সঙ্গে সঙ্গে আমি জানাইলাম যে,—"আপনার রচিত দু'একটা কবিতা যদি পাই, আমাদের বড়ই ইচ্ছা আমরা তাহা 'অনুসন্ধানে' মুদ্রিত করি; আরও 'অনুসন্ধানে' প্রকাশ করিবার জন্য আপনার একটী সংক্ষিপ্ত জীবন-চরিত সংগ্রহ করিবার ইচ্ছা; যদি তাহাতেও কিঞ্চিৎ সহায়তা করেন, তবেও বড়ই বাধিত হই।"

তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন,—"আপনাদের 'অনুসন্ধান' বেশ লব্ধ-প্রতিষ্ঠ পত্রিকা; আপনাদের দ্বারা দেশেরও অনেক উপকার হইতেছে। পত্রিকায় অনেক সদ্বিষয়েরই আলোচনা হইয়া থাকে; কিন্তু, তাহাতে আমার মত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ব্যক্তির জীবন-চরিত প্রকাশে কেন অকারণ স্থান নষ্ট করিবেন?" তারপর, আরও বলিলেন,—"আপনাদের পত্রিকা পড়িবার আমার ইচ্ছা বটে; কিন্তু, সে সুখে যে আমি বঞ্চিত! অত ক্ষুদ্র অক্ষর, চসমার সাহায্যেও, আমি তো আর পড়িতে পারি না! স্কুলের ছাত্রদের পড়াই বটে; সে দেব-নাগর অক্ষর—এর চেয়ে অনেক বড়; কিন্তু সেও অনেক কষ্টে। আমার তো এ পত্রিকা পড়িবার ক্ষমতা হইবে না। বিশেষ, যদিও অপর কাহাকেও দিয়া পড়াইয়া শুনিবার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু দাম তো দিবার আমার ক্ষমতা নাই! আমি যে বড়ই গরিব!"

এ কথায় আমার যে কি কষ্ট হইল, তাহা আর কি বলিব? যদি আমার অন্য কোন ক্ষমতা থাকিত, তবে এমন ইচ্ছা হইল যে,—আমিই তাঁহার সে অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটাই! কিন্তু ক্ষুদ্র আমি—আমি আর কি তাঁহাকে সাহায্য করিব? যাহা হউক, আমি, ব্যথিত অন্তঃকরণে উত্তর করিলাম,—"এ কাগজের তো আপনার দাম লাগিবে না। আমাদের বাবুরা এ কাগজ আপনাকে অমনি দিতে বলিয়াছেন; আর এখন হইতে বরাবরই আপনি ইহা অমনি পাইবেন!" এই বলিয়া আবার আমি তাঁহার সেই জীবনী-সংগ্রহের কথা তুলিলাম।

তিনি তাহাতে একটী গল্প বলিতে আরম্ভ করিলেন। বলিলেন,—"কোন এক পারস্য-গ্রন্থে একটী গল্প পড়িয়াছিলাম। সে গল্পটীর মর্ম্ম এই যে, ধনুর্ব্বাণ দ্বারা এক লক্ষ্য-ভেদ করিবার জন্য কয়েক সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক ছিল। যাহার বাণ সেই লক্ষ্য ভেদ করিতে পারিবে, সেই ঐ মুদ্রা প্রাপ্ত হইবে। কিন্তু

কেহই সে লক্ষ্য ভেদ করিতে পারিল না। মহা মহা ধনুর্ব্বিদ্যা-পারদর্শীগণও তাহাতে অকৃতকার্য্য হইলেন। অতঃপর, কৌতুক-চ্ছলে, একটী বালক তৎপ্রতি একটী বাণ প্রয়োগ করায়, কি দৈব-ঘটনা, সেই লক্ষ্যটি ভেদ হইয়াছিল। কিন্তু যেই লক্ষ্যটি ভেদ হইল, বালক অমনি তাহার ধনুর্ব্বাণ জলে ফেলিয়া দিল। এবং লোকে তাহার ধনুর্ব্বাণ জলে নিক্ষেপ করার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, সে উত্তর দিল,—"দৈবাৎ একটা লক্ষ্য ভেদ হইয়া গিয়াছে বলিয়া আমি তো আর ধনুর্ব্বিদ্যা-পারদর্শী হই নাই! আমার ছেলে খেলার যন্ত্রে কেন আর লোকের নিকট হাস্যাস্পদ হইব; তাই উহা ফেলিয়া দিলাম।" এই গল্পটি বলিয়াই, তিনি বলিলেন,—"আমারও হইয়াছে তাই। দৈবাৎ 'সদ্ভাব-শতকটা' একটু ভাল হইয়াছে বলিয়া, আমি তো আর একটা দিগ্‌গজ পণ্ডিত হই নাই যে, আমার জীবনে নানা গৌরব-গরিমার কথা পাইবেন? তা' ছাড়া, আমি একজন দরিদ্র; সুতরাং আমার যে কোন দান-ধ্যানেরও পরিচয় পাইবেন, তাহাও নহে! তবে আর কেন? আমার এ দারিদ্র্যময় নীরস জীবন লোকের পড়িতে কষ্ট বই সুখ তো কিছুই হইবে না। এরূপে কেন পাঠকদের বিরক্ত করিবেন?"

আমি বলিলাম,—"সে বিষয়ে আপনার কোনই ভাবনা নাই। বাঙ্গালার কবি বা কোন ব্যক্তিরই কোন পরিচয় বা জীবন-বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না। তাই, অন্ততঃ সে হিসাবেও, আপনার জীবনের স্থূল স্থূল বৃত্তান্তও স্মারকচিহ্ন স্বরূপ লিখিয়া রাখিতে ইচ্ছা হইয়াছে। কারণ, আর দু'দিন পরে—আপনার পরলোকান্তে এ সকল আর কোথায় পাইব?"

অনেক অনুরোধ-বিনয়ের পর, তিনি তখন সংক্ষেপে তদ্বিবরণ বলিতে লাগিলেন। আমিও সেই সঙ্গে সঙ্গে লিখিয়া লইতে লাগিলাম। যাহা লিখিয়া লইলাম, সংক্ষেপতঃ তাহা এই,—

"খুলনা-জেলায় সেনহাটী গ্রামে আমার জন্ম হয়। আমরা জাতিতে বৈদ্য। আমার পিতার নাম ৺মাণিকচন্দ্র মজুমদার। যদিও আমাকে এখন এরূপ জীর্ণ-শীর্ণ-মৃতপ্রায় দেখিতেছেন, কিন্তু আমার বয়স এত বেশী নহে। নানারূপ রোগে, শোকে, দুশ্চিন্তায়, দুঃখেই আমাকে এমন বার্দ্ধক্য-দশায় আনয়ন করিয়াছে। নহিলে আমার বয়ঃক্রম এখন ৫৫।৫৬ বৎসরের অধিক নয়। অথচ আমায় দেখিয়া আপনার হয় তো মনে হইতেছে—'শত্‌কের কোটা পার!' কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। সন ১২৪১, কি ৪২ সালে আমার জন্ম হয়। আমার বয়স যখন ৬ মাস মাত্র, সেই সময়ই আমার পিতৃ-বিয়োগ হয়। তখন আমরা দুই ভাই ছিলাম। আমার যিনি জ্যেষ্ঠ, তাঁহার বয়স তখন ১০।১১ বৎসর মাত্র ছিল। কিন্তু, পিতার মৃত্যুর এক বৎসরের মধ্যেই, আমার জ্যেষ্ঠেরও কাল হয়। পিতা সম্পত্তি কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই; জীবিত-কালে তিনি যাহা কিছু উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহার সমস্তই তিনি ব্যয় করিয়া যান। কাজেই, পিতার মৃত্যুর পর হইতেই আমরা বিষম সাংসারিক কষ্টে পতিত হই। কি করিয়া আমাদের মানুষ করিবেন, আমার মাতা-ঠাকুরাণী এই ভাবনাতেই বিশেষ চিন্তিত হইয়া পড়েন। কিন্তু আমার পিতার মাতামহ বরিশাল—কীর্ত্তিপাশার জমীদার ৺ রাজারাম সেন মহোদয়, অনুগ্রহপূর্ব্বক, এই সময়, তাঁহাদের জমীদারী হইতে আমাদের কিছু কিছু বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দেন। তাহাতেই, একরূপ কষ্টে-সৃষ্টে আমাদের জীবন-ধারণ চলিত। এইরূপে পাঁচ বৎসর বয়সের সময়ই আমার যথারীতি হাতে খড়ি দেওয়া হইয়াছিল; এবং আমি গ্রাম্য পাঠশালে গুরু মহাশয়ের নিকট পড়িতাম, ও লিখিতাম। মধ্যে মধ্যে কীর্ত্তিপাশার

জমীদার মহাশয়দের বাড়ীতে থাকিয়াও তত্রত্য পাঠশালায় পড়িয়াছিলাম। ইহার পর, ১০।১২ বৎসর বয়সের সময়, আমাদের পুরোহিত ৺ পীতাম্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট আমি 'কলাপ ব্যাকরণ' পড়িতে আরম্ভ করি। তদ্ভিন্ন মধ্যে মধ্যে অপর কোন কোন পণ্ডিতের নিকটও ব্যাকরণের পাঠ বলিয়া লইতাম।

ইহার পূর্ব্বেই রাজারাম সেনের পরলোক প্রাপ্তি হয়। অধিকন্তু, প্রবাদ আছে, এই সময়ে বিষ-প্রয়োগে, রাজারামের পৌত্র রাজকুমার সেনের মৃত্যু হয়। তাই, তৎপুত্র (রাজকুমার সেনের পুত্র) প্রসন্নকুমার সেন না-বালক অবস্থায় 'কোর্ট-অব্-ওয়ার্ডের' অধীনে বরিশালে পড়িবার জন্য গমন করেন। সঙ্গে সঙ্গে, অবসর বুঝিয়া, আমিও তাঁহার সঙ্গ লইয়াছিলাম; এবং তাঁহারই বাসায় আহারাদি করিয়া, তাঁহারই ব্যয়ে, পারশী ভাষা অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করি। এ সময় আমার বয়স ১৪।১৫ বৎসর। ৺ বরদাচরণ সেন, ৺ চন্দ্রকান্ত সেন, ৺ কৃষ্ণকুমার গুহ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ, তৎকালে আমাকে পারশ্য-ভাষা শিক্ষা দিতেন।

কিন্তু এই সময়, অপর কতকগুলি সহ-পাঠীর কুপরামর্শে পড়িয়া, আমি একটা বড় কুকাজ করিয়া ফেলি। তাহাদের সহিত যোগ করিয়া, লেখা-পড়া ত্যাগ করিয়া, কাহাকেও কিছু না বলিয়া, আমরা কলিকাতায় পলাইয়া যাই। ইহাই আমার লেখা-পড়ার প্রথম অন্তরায়। হায়! কেন তখন আমি এমন কুকর্ম্ম করিয়াছিলাম! আজ-কালকার অনেক বালকও, এইরূপ দেশ দেখিবার আশায় বা অন্য কোন প্রলোভনে, বিদেশে পলাইয়া যায়; কিন্তু, সাবধান, তাহাদিগকেও অবশেষ এইরূপ আমার মত অনুতাপ করিতে হইবে! ফলতঃ তখন হইতে যদি পড়া-শুনায় বাধা না পড়িত, তবে আমার, পরে আর এমত কষ্ট পাইতে হইত না। চলিত কথাতেই তো আছে—'কাঁচায় না নোয় বাঁশ, পাকলে ক'রে ক্যাঁচ ক্যাঁচ।' ছেলে-বেলায় পড়াশুনায় অমনোযোগী হইলে, শেষে তাহার যে কি কষ্ট, ভুক্তভোগী আমি—আমিই তাহা বুঝিয়াছি! আর ভুক্তভোগী যাঁহারা, তাঁহারাই বুঝিতে পারেন!

যাহাই হউক, অবশেষে, কলিকাতায় কালীঘাটে গিয়া আমরা ধরা পড়ি। কীর্ত্তিপাশারই একজন আত্মীয় ধরিয়া আমাদিগকে বাড়ী পাঠাইয়া দেন। কিন্তু লজ্জায় আর আমি এ সময় বরিশালে যাইতে পারিলাম না। কাজেই, পড়াশুনায় একরূপ বাধা পড়িল। তবে বাড়ী বসিয়া, ৺ দুর্গাশঙ্কর দাস নামক আমার এক জ্ঞাতির নিকট, যা'কিছু মধ্যে মধ্যে, আবার পার্শি পড়িতে লাগিলাম। এ সময় আমার বয়স ১৭।১৮ বৎসর হইবে।

এই সময় প্রসন্ন বাবু বরিশাল হইতে ঢাকায় গমন করেন—অবশ্য 'কোর্ট অব্ ওয়ার্ডের' তত্ত্বাবধানে থাকিয়াই। কি জানি কি ঈশ্বরের অনুগ্রহ বলিতে হইবে, সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্ব লজ্জা-সরম ভুলিয়া গিয়া, আমিও আবার তথায় উপস্থিত হই। এই বারই আমার বাঙ্গালা-ভাষার প্রতি প্রবল অনুরাগ হয়; পারশী ভাষা শিক্ষা করা ভিন্নও, আমি এসময়ে বাঙ্গালা-ভাষার সম্যক আলোচনায় প্রবৃত্ত হই। এ সময় 'প্রভাকর', 'ভাস্কর', 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকা প্রভৃতি আমাদের বাসায় আসিত; এবং আমি মনোযোগের সহিত ঐ সকল পাঠ করিতাম, ও মধ্যে মধ্যে দু'একটী কবিতা প্রভৃতিও লিখিতে অভ্যাস করিতাম। 'প্রভাকরে' আমার 'কবিতা' প্রথম প্রকাশিত হয়; ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহোদয় সে বিষয়ে আমার বিশেষ উৎসাহ দিতেন।

এই সময়, গভর্ণমেণ্ট হইতে, বাঙ্গালা-শিক্ষা প্রদানের বিশেষ চেষ্টা হইতে থাকে।

উড্রো সাহেব ইন্‌স্পেক্টার নিযুক্ত হইয়া আসেন; এবং তাঁহার অধীনে দুই জন 'ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টার' নিযুক্ত হয়েন। বাঙ্গালা-স্কুলের উন্নতি-কল্পে উদ্যোগী হইয়া, তাঁহারা এই সময় পণ্ডিত-নিয়োগের এক পরীক্ষা লইতে থাকেন; এবং কৃষ্ণধন গুহ নামক এক ব্যক্তির আগ্রহে, আমিও এই সময় ঐ পণ্ডিতের পরীক্ষা প্রদান করি। পরীক্ষায় উত্তীর্ণও হইয়াছিলাম, অবশ্য; কিন্তু তৃতীয় বিভাগে। যাহাহউক, তাহাতে ১৫৲ টাকা বেতনের একটী 'সার্কেল পণ্ডিতের' পদ প্রাপ্ত হই; এবং মনে কিঞ্চিৎ আশার সঞ্চার হয়। আর, সেই আশা-স্ফূর্ত্তির সহযোগেই, এই সময় হইতেই 'সদ্ভাব-শতক' লিখিতে আরম্ভ করি। তখন আমার বয়স আন্দাজ ২১।২২ বৎসর।

ইহার পরই, ঢাকা নর্ম্মাল-স্কুলের অন্তর্গত মডেল স্কুলের পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়াছিলাম। বেতন কিন্তু ১৫ টাকাই ছিল। তবে এখন দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীতে পর্য্যন্ত পড়াইতাম; এবং অবশেষে, এমন কি, এই সময়, নর্ম্মাল-স্কুলের প্রধান পণ্ডিত ৺ অভয়াচরণ রায় মহাশয়ের পরলোক প্রাপ্তি-হেতু, আমিই কিছুদিন যাবৎ তাঁহারও কার্য্য করিয়াছিলাম। কিন্তু, পরে, কলিকাতা হইতে নকুলেশ্বর রায় নামক অন্য এক ব্যক্তি আনীত হওয়ায়, আমার সে কার্য্য ছাড়িয়া পূর্ব্ব কার্য্যেই নিযুক্ত হইতে হয়। এই সময় মধ্যে মধ্যে ঢাকা-কলেজের জুনিয়ার পণ্ডিতের 'এক্‌ষ্টিনি' কার্য্যও করিতাম। ফলতঃ এসময় কোন কোন মাসে আমার ৩০।৪০৲ টাকাও প্রাপ্য হইয়াছিল।

এই সময় সর্ব্বমান্য ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় নর্ম্মাল-স্কুলে পণ্ডিত নিযুক্ত করিবার জন্য এক পরীক্ষা গ্রহণ করেন। আমিও সে পরীক্ষা দিই। কিন্তু কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় নামক একটী ছাত্রই সে পরীক্ষায় আমার উপরে উত্তীর্ণ হন, ও তন্নিমে আমি প্রতিষ্ঠিত হই। সুতরাং প্রথম যে পদ খালি হয় তিনিই তাহা প্রাপ্ত হন। এবং পরে যশোহর-নর্ম্মাল স্কুলের জন্য আমি এক নিয়োগ-পত্র প্রাপ্ত হই।

কিন্তু, এই সময়ই আমার আর একটী কর্ম্ম জুটিয়া যায়। ঢাকা হইতে 'ঢাকাপ্রকাশ' নামক যে পত্রিকা খানি বাহির হইয়া থাকে, এই সময়ই সেই পত্রখানির প্রথম প্রকাশ আরম্ভ হয়। সঙ্গে সঙ্গে আমিই তাহার সম্পাদক নিযুক্ত হই—প্রথম 'ঢাকাপ্রকাশ' আমার হাত হইতেই বাহির হইতে থাকে। 'ঢাকাপ্রকাশের' সম্পাদন-কালে প্রথম বেতন ২৫৲ টাকা পাইতাম; কিন্তু, যশোহর নর্ম্মাল স্কুলের নিয়োগপত্রে ৩০৲ টাকা বেতন নির্দ্দিষ্ট হওয়ায়, উক্ত পত্রের অধিকারীগণ এই সময় আমার ৩৫৲ টাকা বেতন ধার্য্য করিয়া দেন। কাজেই, আমি আর নর্ম্মাল-স্কুলের কার্য্য গ্রহণ না করিয়া, ঐ 'ঢাকা প্রকাশের' সম্পাদন-কার্য্যেই ব্রতী থাকি। তখনকার 'ঢাকাপ্রকাশের' পরিচালকগণের মধ্যে ব্রজসুন্দর মিত্র, দীনবন্ধু মৌলিক, ঈশ্বরচন্দ্র বসু, এবং চন্দ্রকান্ত বসু প্রভৃতিই প্রধান ছিলেন। তাঁহারা সকলেই আমাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা করিতেন। কাজেই, গভর্ণমেণ্টের কার্য্য ত্যাগ করিয়াও, আমি তখন ঐ কর্ম্মেই নিযুক্ত থাকি। বিশেষ, আমি যেন ভালও বাসিতাম—ঐ কাজ। এই সময়ই 'সদ্ভাব-শতক' প্রথম ছাপা হয়। 'সদ্ভাব-শতক' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে, 'কবিতা-কুসুমাঞ্জলী' নামক একখানি পদ্যময়ী মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলাম; 'সদ্ভাব-শতকের' অধিকাংশ কবিতাই উহাতে বাহির হইয়াছিল। আমি, হরিশ্চন্দ্র মিত্র, এবং প্রসন্নকুমার সেন—এই তিন জনে ক্রমে, 'কবিতা-কুসুমাঞ্জলী' প্রকাশ করিতে আরম্ভ করি। বৎসর-খানেক উহা আমি চালাইয়াছিলাম; তৎপরে হরিশ-বাবু বৎসর দুই চালান; তৎপরে প্রসন্ন বাবুও

কিছুদিন উহা রাখিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পর হইতেই ঐ পত্রিকা বন্ধ হইয়াছে। 'সদ্ভাব-শতক' যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন আমার বয়স আন্দাজ ৩০ বৎসর। অর্থাৎ আন্দাজ ১৮৬০।৬১ খৃষ্টাব্দে উহা প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল।

এই সময় ঢাকা বালীয়াটীর বাবু গিরীশচন্দ্র সাহা মহাশয় ঢাকায় আর একটী প্রেস স্থাপনা করেন; এবং "বিজ্ঞাপনী" নামক একটী কাগজ বাহির করেন। তিনি এখন, ৫০৲ টাকা বেতন দিয়া, 'ঢাকাপ্রকাশ' হইতে ছাড়াইয়া, আমায় ঐ কাগজ ও প্রেস চালাইবার ভার দেন। "বিজ্ঞাপনীও" প্রথম আমার হাত হইতেই বাহির হয়। এই কার্য্য আমি দেড় বৎসর যাবৎ করিয়াছিলাম।

কিন্তু এই সময় আমার যে মতিচ্ছন্ন হইয়াছিল, তাহাই আমার কাল! ভগবান কেন আমার সে মতি দিয়াছিলেন? আমি এখন, সঙ্গ-দোষে, সুরাপানে বড়ই আসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। দেশেও তখন সুরার বড়ই প্রকোপ; বড়-লোকের চিহ্ন ছিল তখন—সুরাপান! ভাগ্য-দোষে, মতিহীন আমি, আমিও তাহাতে মজিয়াছিলাম! আর, তাহারই ভোগ, আজিও ভুগিতেছি। জানি না, ভগবান আরও কতদিন ভোগাইবেন? সংসর্গ-দোষে, যুবা-বয়সে একবার যে মতিচ্ছন্ন হইয়াছিল, এতদিনে—এত কষ্টের পর, তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার প্রারম্ভেই, কেন আমার এমন হইয়াছিল? ইহাই কি ভাগ্য?

যাইহোক্, এইবারই আমি মজিলাম—ডুবিলাম—এইবারই আমার সর্ব্বনাশ হইল! বন্ধুগণ বলিতেন,—"পোলাও-কালিয়া ভাল খাবার খেতে হ'লে মদ খাওয়া চাই-ই; নহিলে, শরীর টেকে না—অতিসারে মারা যেতে হয়!" কাজেই, আমিও প্রথমে বুঝিয়াছিলাম, তাই। এই প্রলোভনে, ক্রমেই তাহা নেশায় পরিণত হইয়াছিল; আর, তাহাতেই আমার সর্ব্বনাশ! শেষ, ইহাতেই, ঝগড়া করিয়া আমার কাজ যায়; আমি পরিবারাদি লইয়া বাড়ী চলিয়া আসি।

কিন্তু, খাইব কি? কাজেই, সর্ব্বনাশের এক এক স্তরে পদার্পণ করিতে থাকিলাম। সম্পত্তির মধ্যে আমার 'সদ্ভাব-শতক' পুস্তকখানা—পেটের দায়ে প্রথমেই সেখানার স্বত্বটাকে বিক্রয় করিয়া নিশ্চিন্ত হই। বাবু নন্দকুমার গুহ নামক ঢাকার এক ব্যক্তি আন্দাজ দেড়-শ' কি দু'-শ' টাকায় (ঠিক স্মরণ হয় না) উহার স্বত্ব কিনিয়া লয়েন। তার পর, 'মোহ-ভোগ' নামক আর একখানা পুস্তক লিখিয়াছিলাম; তাহারও স্বত্ব বাবু প্রসন্নকুমার ভৌমিক ও বাবু রাধিকারমণ বসাক নামক দুই ব্যক্তিকে ১০০৲ টাকায় বিক্রয় করিয়া ফেলি। অধিকন্তু, 'ইতিবৃত্ত' নামক আর একখানা পুস্তক, প্রায় ১৫০৲ শত টাকা ব্যয় করিয়া, এই সময় ছাপাইয়াছিলাম; কিন্তু আমার অবহেলায় ৩০।৪০৲ টাকা মাত্র তাহা হইতে উঠিয়াছিল; বাকী সবই লোকসান যায়। এরূপেই, তখন আমি, আমার নিজের পায়ে কুঠার মারিয়াছিলাম! এখন যদি 'সদ্ভাব-শতক' প্রভৃতি পুস্তক আমার নিজের স্বত্বে রাখিতে পারিতাম, তবে কি আমার এখন এমন দশা হইত? ঐ পুস্তকের আয়ে অন্যে এখন সমৃদ্ধ উন্নতিশালী, আর আমি—তাহার রচয়িতা—এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত! সকলই কর্ম্ম-দোষে! হায়! কেন তখন আমার এমন দুর্ব্বুদ্ধি হইয়াছিল?

যাহাইহউক, কর্ম্ম ছাড়িয়া, এইরূপে, আমি কেবলই দুরবস্থার চরম সীমায় উপনীত হইতে থাকি। এমন কি, ক্রমে যতই সাংসারিক কষ্ট বাড়িয়াছে, আমিও ততই পাগলের মত হইয়া পড়িয়াছি। এইরূপে, আমায় পাগলের মত হইতে দেখিয়া, আমার কোন আত্মীয় আমায় কাঁড়িপাশায় লইয়া যান। এবং

তাঁহারা নানারূপে আমার চিত্ত-সংস্কারেরও চেষ্টা পাইতে থাকেন। এই সময় মদটাও আমার আর তত জুটিত না; ক্রমে আমিও একটু স্থির হইতে থাকি। অধিকন্তু, 'শিব-বিবাহ' নামক একখানি গানের পুস্তক এবং পারশী, উর্দ্দু, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত এই ভাষা চতুষ্টয়ে আমার পূর্ব্বতন শিক্ষকগণের গুণ-বর্ণনা নামক একখানি পুস্তক লিখিয়া, আমার মতি অনেকটা ফিরিয়া যায়। এই সময়ই আমার মাতা-ঠাকুরাণী আমায় কীর্ত্তিপাশা হইতে বাড়ী আনিতে যান। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চরণ স্পর্শ করিয়া আমিও প্রতিজ্ঞা করি.—"আর কখনও এমন কোন দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইব না।" বেশীর ভাগ, বাড়ীর তাৎ-কালিক দুর্দ্দশা দেখিয়াও আমার মনে বড়ই ঘৃণা জন্মে। এখন আমার বয়স ৪০।৪১ বৎসর।

বাড়ী আসিয়া, ২।৩ বৎসর কাজ কর্ম্ম আর কিছুই যোটে না।, বড়ই কষ্টে দিনপাত হইতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে দেনাই বাড়িতে আরম্ভ হয়। শেষ, কয়েক মাস দৌলতপুরের স্কুলের পণ্ডিতের একটিনি কার্য্য প্রাপ্ত হই-য়াছিলাম। এই সময় ঢাকার রামশঙ্কর সেন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় আমাদের বাড়ীতে, সম্ভবতঃ আমার পুস্তকাদি পড়িয়াই, আগমন করেন; এবং আমার এই শোচনীয় অবস্থার বিষয় অবগত হইয়া আমার একটী চাকরীর জন্য সুপারিশ করেন। এখন জগৎ বাবু ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টার ছিলেন—তিনি পিলজঙ্গ—নপাড়ার এণ্ট্রেন্স-স্কুলে আমার একটী কর্ম্ম প্রদান করেন। সেখানে এক বৎসর কার্য্য করার পর, যশোহর জেলা-স্কুলের প্রধান পণ্ডি-তের পদ খালি হয় ও আমি সেই পদ প্রাপ্ত হই। এই কার্য্য পাইয়া ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট কি সেপ্টেম্বর মাসে, আমি যশোহরে আসি। প্রথমে ২৫ টাকা বেতনে এখানে আসি, এক্ষণে ৪০ টাকা পাইতেছি। মধ্যে এক বৎস ১৩০ টাকা, কি জানি কোন্ গুণে, আ পারিতোষিকও পাইয়াছিলাম।

শ্রীযুক্ত বাবু জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় এ সম যশোহর জেলা-স্কুলের হেড মাষ্টার ছিলেন। তি বরাবরই আমার প্রতি সহানুভূতি দেখাইতে কিন্তু, আমার মতিবিভ্রম-বশতঃ মধ্যে তাঁহা সহিত কোনরূপ অসদ্ব্যবহার করি; এ তাহাতে ৬ মাস সস্পেণ্ড ছিলাম। পরে আমারই দোষ বুঝিতে পারায়, ও ক্ষম প্রর্থনা করায়, তিনি আবার আমায় পূর্ব্বের স্নেহ-চক্ষে দেখিতে থাকেন। ইদানীং তিনি আমায় অনেক সদুপদেশ দিতেন। যশোহরে অবস্থিতি-কালে 'কৈবল্য-তত্ত্ব' নামক একখানি পুস্তক ছাপাইয়াছিলাম; এবং 'দ্বৈভাষিকী' নামক বাঙ্গালা-সংস্কৃত ভাষায় একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করিয়াছিলাম, কিন্তু, ঐ পুস্তক ছাপাইয়াও এবার কিঞ্চিৎ লোকসান গিয়াছে; এবং ঐ পত্রিকা বাহির করাতেও গোটা কুড়ি টাকা লোকসান গিয়াছে। তাই, এক বৎসর, চালাইয়া, ঐ পত্রিকাও বন্ধ করিয়াছি। গ্রাহক-দিগের নিকট পত্রিকার দাম বা উৎসাহ পাওয়া যায় না, তাই বন্ধ করিয়াছি। যশো-হরে আসিয়া, কুমারখালির 'গ্রামবার্ত্তা-প্রকাশি-কায়, নড়াইলের 'আচার্য্য' নামক পত্রে, এবং 'সংস্কৃত চন্দ্রিকায়' প্রবন্ধাদি লিখিয়াছিলাম। কিন্তু ঐ সকল কাগজও এখন নাই, লিখিবার তেমন ক্ষমতাও নাই; তাই আর লিখিও না। আর কিছু লিখিলেও ছাপাইবার সামর্থ্য নাই। নহিলে, এখনও উদয়নাচার্য্য-প্রণীত সংস্কৃত 'কুসুমাঞ্জলীর' ব্যাখ্যা, 'শিবপঞ্চাশৎ' নামক আর একখানি নিজরচিত সংস্কৃত কবিতা-পুস্তক এবং 'নীতি-স্তবক' নামক এক বাঙ্গালা নীতি-কবিতা-পুস্তক লেখা আছে। কিন্তু ছাপাইবার সামর্থ্য কই? আর, ছাপাইলেই বা এ দেশে উৎসাহ কই? তা'ছাড়া, যা বেতন পাই, সংসার

তিপালনেই কুলাইতে পারি না। তা' ছাড়া, না আছে; পিতামাতার বার্ষিক শ্রাদ্ধ-শান্তি গার্হস্থ ক্রিয়া-কলাপাদি আছে। সুতরাং াইব আর কিরূপে?

সম্প্রতি আমার পুত্র একটী, কন্যা চরিটি। টি বরিশালের 'ব্রজমোহন কলেজের' ট্রান্স ক্লাসে পড়িতেছে। কন্যার একটীর বাহ দিয়াছি। বাকী বিবাহ দিতে তিনটী। জেই আমার এই দশা। প্রথম হইতে য়া চলিলে, অবশ্য বয়স-কালে তেমন ল না হইলে, এতদিন হয় তো আমার লই হইত। কিন্তু কি গ্রহ!

এখন, আজ বাদে কাল আমার হয় তো ১০ টাকা পেন্সন লইয়াই কর্ম্মত্যাগ করিতে হইবে—চোখে না দেখিলে, কানে না শুনিলে, জ আর কিরূপে চালাইব? কাজেই, আর ই চারি দিন পরেই যে আমার আরও কি কষ্ট হইবে, তাই সদাই ভাবিতেছি। জানি না, শ্বরের মনে আরও বা কত কি আছে?"

এই বলিয়াই, তিনি বারবার দুঃখ করিতে লাগিলেন। তখন, সান্ত্বনা-বাক্যে আমি তাঁহার র্ম্মমতটি একবার জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা রিলাম। তাহাতে তিনি বলিলেন,—"এখন তো বুঝিতেছেনই! তবে ঢাকায় যখন ছিলাম, খানে তখন বড়ই ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের আন্দোলন; আমারও তখন যৌবনোচ্ছ্বল প্রবৃত্তি! কাজেই, তখন সেইরূপ ভাবেই ছিলাম। পরেই এই ভাব!" বলা বাহুল্য, দেখিয়া বুঝিলাম, খন তাঁহার সম্পূর্ণই সাত্ত্বিক হিন্দুর ভাব! অধিকন্তু, প্রাতেই দেখিলাম,—ঘরে ফুল-বিল্ব-পত্র ও গঙ্গাজলের আয়োজন। কাজেই আর কিছুই জিজ্ঞাসা করিলাম না!

অতঃপর 'অনুসন্ধানের' জন্যও মধ্যে মধ্যে তিনি কিছু লিখিবেন বলিয়াও স্বীকৃত ইলেন।

আমিও বিষাদিত-মনে ফিরিয়া আসিলাম। তখন, আমার মনে কেবলই মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রভৃতি কবিগণের শেষ-জীবনের সহিত—কষ্ট পাইয়া হাসপাতাল প্রভৃতি স্থানে অস-হায়ে প্রাণত্যাগ করার সহিত—তুলনা করিয়া, যে কি কষ্ট হইতে লাগিল, তাহা আর কি বলিব? সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী কবি গ্রে রচিত এলিজির (Elegy) এই কয় ছত্র মনে পড়িয়া আরও কষ্ট হইতে লাগিল,—

"Full many a gem of purest ray serene
The dark unfathom'd caves of ocean bear:
Full many a flower is born to blush, unseen
And waste its sweetness in the desert air."

অর্থাৎ উৎসাহ পাইলে এখনও যে ইহাঁর নিকট হইতে কতই সুমধুর কবিতা প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে; আর, ইহাঁরই ন্যায়, উৎসাহ না পাইয়া, বঙ্গে এখনও যে কত শক্তির-বিলোপ হইতেছে,—ইহাই ভাবিতে ভাবিতে আমার কান্না আসিতে লাগিল।*

কবিতা ও গান।

শ্মশান।

বহিছে সাঁজের বায়,
নীরবে লহরী লয়ে
কত খেলা করে;

---

* দেশের লোক এখনও এই কবিকে কিছু-না-কিছু সাহায্য করেন, এই বাসনা। অন্ততঃ তাঁহার হিন্দুধর্ম্ম-মূলক 'কৈবল্যতত্ত্ব' পুস্তক খানি (দাম ॥০ আনা মাত্র) এবং 'দ্বৈভাষিকী' পত্রের এক বৎসরের সংখ্যাগুলি (যাহার ২।১০ সেট এখনও তাঁহার ছাপা আছে, দাম ১॥০ টাকা মাত্র)—এ দুটি জিনিস ক্রয়-চ্ছলেও কেহ তাঁহাকে সাহায্য করেন—এই অনুরোধ। তাঁহার ঠিকানা—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, হেড্-পণ্ডিত, জেলা স্কুল—যশোহর।

তাঁহারা নানারূপে আমার চিত্ত-সংস্কারেরও চেষ্টা পাইতে থাকেন। এই সময় মদটাও আমার আর তত জুটিত না; ক্রমে আমিও একটু স্থির হইতে থাকি। অধিকন্তু, 'শিব-বিবাহ' নামক একখানি গানের পুস্তক এবং পারশী, উর্দ্দু, বাঙ্গালা ও সংস্কৃত এই ভাষা চতুষ্টয়ে আমার পূর্ব্বতন শিক্ষকগণের গুণ-বর্ণনা নামক একখানি পুস্তক লিখিয়া, আমার মতি অনেকটা ফিরিয়া যায়। এই সময়ই আমার মাতা-ঠাকুরাণী আমায় কীর্ত্তিপাশা হইতে বাড়ী আনিতে যান। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার চরণ স্পর্শ করিয়া আমিও প্রতিজ্ঞা করি—"আর কখনও এমন কোন দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইব না।" বেশীর ভাগ, বাড়ীর তাৎকালিক দুর্দ্দশা দেখিয়াও আমার মনে বড়ই ঘৃণা জন্মে। এখন আমার বয়স ৪০।৪১ বৎসর।

বাড়ী আসিয়া, ২।৩ বৎসর কাজ কর্ম্ম আর কিছুই যোটে না, বড়ই কষ্টে দিনপাত হইতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে দেনাই বাড়িতে আরম্ভ হয়। শেষ, কয়েক মাস দৌলতপুরের স্কুলের পণ্ডিতের একটিনি কার্য্য প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। এই সময় ঢাকার রামশঙ্কর সেন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মহোদয় আমাদের বাড়ীতে, সম্ভবতঃ আমার পুস্তকাদি পড়িয়াই, আগমন করেন; এবং আমার এই শোচনীয় অবস্থার বিষয় অবগত হইয়া আমার একটী চাকরীর জন্য সুপারিশ করেন। এখন জগৎ বাবু ডেপুটী ইন্স্পেক্টার ছিলেন—তিনি পিলজঙ্গ—নপাড়ার এণ্ট্রেন্স-স্কুলে আমার একটী কর্ম্ম প্রদান করেন। সেখানে এক বৎসর কার্য্য করার পর, যশোহর জেলা-স্কুলের প্রধান পণ্ডিতের পদ খালি হয় ও আমি সেই পদ প্রাপ্ত হই। এই কার্য্য পাইয়া ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট কি সেপ্টেম্বর মাসে, আমি যশোহরে আসি। প্রথমে ২৫৲ টাকা বেতনে এখানে আসি, এক্ষণে ৪০৲ টাকা পাইতেছি। মধ্যে এক বৎস ১৩০৲ টাকা, কি জানি কোন্ গুণে, আ পারিতোষিকও পাইয়াছিলাম।

শ্রীযুক্ত বাবু জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় এ সং যশোহর জেলা-স্কুলের হেড মাষ্টার ছিলেন। তি বরাবরই আমার প্রতি সহানুভূতি দেখাইতেন কিন্তু, আমার মতিবিভ্রম-বশতঃ মধ্যে তাঁহা সহিত কোনরূপ অসদ্ব্যবহার করি; এ তাহাতে ৬ মাস সস্পেণ্ড ছিলাম। পরে আমারই দোষ বুঝিতে পারায়, ও ক্ষম প্রার্থনা করায়, তিনি আবার আমায় পূর্ব্বের স্নেহ-চক্ষে দেখিতে থাকেন। ইদানীং তিনি আমায় অনেক সদুপদেশ দিতেন। যশোহরে অবস্থিতি-কালে 'কৈবল্য-তত্ত্ব' নামক একখানি পুস্তক ছাপাইয়াছিলাম; এবং 'দ্বৈভাষিকী' নামক বাঙ্গালা-সংস্কৃত ভাষায় একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করিয়াছিলাম, কিন্তু, ঐ পুস্তক ছাপাইয়াও এবার কিঞ্চিৎ লোকসান গিয়াছে; এবং ঐ পত্রিকা বাহির করাতেও গোটা কুড়ি টাকা লোকসান গিয়াছে। তাই, এক বৎসর, চালাইয়া, ঐ পত্রিকাও বন্ধ করিয়াছি। গ্রাহকদিগের নিকট পত্রিকার দাম বা উৎসাহ পাওয়া যায় না, তাই বন্ধ করিয়াছি। যশোহরে আসিয়া, কুমারখালির 'গ্রামবার্ত্তা-প্রকাশিকায়, নড়াইলের 'আচার্য্য' নামক পত্রে, এবং 'সংস্কৃত চন্দ্রিকায়' প্রবন্ধাদি লিখিয়াছিলাম। কিন্তু ঐ সকল কাগজও এখন নাই, লিখিবার তেমন ক্ষমতাও নাই; তাই আর লিখিও না। আর কিছু লিখিলেও ছাপাইবার সামর্থ্য নাই। নহিলে, এখনও উদয়নাচার্য্য-প্রণীত সংস্কৃত 'কুসুমাঞ্জলীর' ব্যাখ্যা, 'শিবপঞ্চাশৎ' নামক আর একখানি নিজরচিত সংস্কৃত কবিতা-পুস্তক এবং 'নীতি-স্তবক' নামক এক বাঙ্গালা নীতি-কবিতা-পুস্তক লেখা আছে। কিন্তু ছাপাইবার সামর্থ্য কই? আর, ছাপাইলেই বা এ দেশে উৎসাহ কই? তা'ছাড়া, যা বেতন পাই, সংসার ত্তপালনেই কুলাইতে পারি না। তা' ছাড়া, না আছে; পিতামাতার বার্ষিক শ্রাদ্ধ-শান্তি গার্হস্থ ক্রিয়া-কলাপাদি আছে। সুতরাং াইব আর কিরূপে?

সম্প্রতি আমার পুত্র একটী, কন্যা চরিটি। ত্রটি বরিশালের 'ব্রজমোহন কলেজের' ট্রান্স ক্লাসে পড়িতেছে। কন্যার একটীর বাহ দিয়াছি। বাকী বিবাহ দিতে তিনটী। জেই আমার এই দশা। প্রথম হইতে ঝয়া চলিলে, অবশ্য বয়স-কালে তেমন ল না হইলে, এতদিন হয় তো আমার লই হইত। কিন্তু কি গ্রহ!

এখন, আজ বাদে কাল আমার হয় তো ১০ টাকা পেন্সন লইয়াই কর্ম্মত্যাগ করিতে হইবে—চোখে না দেখিলে, কানে না শুনিলে, জ আর কিরূপে চালাইব? কাজেই, আর ই চারি দিন পরেই যে আমার আরও কি কষ্ট হইবে, তাই সদাই ভাবিতেছি। জানি না, শ্বরের মনে আরও বা কত কি আছে?"

এই বলিয়াই, তিনি বারবার দুঃখ করিতে লাগিলেন। তখন, সান্ত্বনা-বাক্যে আমি তাঁহার র্ম্মমতটি একবার জানিবার জন্য জিজ্ঞাসা রিলাম। তাহাতে তিনি বলিলেন,—"এখন তো বুঝিতেছেনই! তবে ঢাকায় যখন ছিলাম, খানে তখন বড়ই ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের আন্দোলন; মারও তখন যৌবনোচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তি! জেই, তখন সেইরূপ ভাবেই ছিলাম। পরেই ই ভাব!" বলা বাহুল্য, দেখিয়া বুঝিলাম, খন তাঁহার সম্পূর্ণই সাত্ত্বিক হিন্দুর ভাব! ধিকন্তু, প্রাতেই দেখিলাম,—ঘরে ফুল-বিল্ব-ত্র ও গঙ্গাজলের আয়োজন। কাজেই আর কিছুই জিজ্ঞাসা করিলাম না।

অতঃপর 'অনুসন্ধানের' জন্যও মধ্যে মধ্যে তিনি কিছু লিখিবেন বলিয়াও স্বীকৃত ইলেন।

আমিও বিষাদিত-মনে ফিরিয়া আসিলাম। তখন, আমার মনে কেবলই মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রভৃতি কবিগণের শেষ-জীবনের সহিত—কষ্ট পাইয়া হাসপাতাল প্রভৃতি স্থানে অসহায়ে প্রাণত্যাগ করার সহিত—তুলনা করিয়া, যে কি কষ্ট হইতে লাগিল, তাহা আর কি বলিব? সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজী কবি গ্রে রচিত এলিজির (Elegy) এই কয় ছত্র মনে পড়িয়া আরও কষ্ট হইতে লাগিল,—

"Full many a gem of purest ray serene
The dark unfathom'd caves of ocean bear:
Full many a flower is born to blush, unseen
And waste its sweetness in the desert air."

অর্থাৎ উৎসাহ পাইলে এখনও যে ইহাঁর নিকট হইতে কতই সুমধুর কবিতা প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে; আর, ইহাঁরই ন্যায়, উৎসাহ না পাইয়া, বঙ্গে এখনও যে কত শক্তির-বিলোপ হইতেছে,—ইহাই ভাবিতে ভাবিতে আমার কান্না আসিতে লাগিল।*

কবিতা ও গান।

শ্মশান।

বহিছে সাঁঝের বায়,
নীরবে লহরী লয়ে
কত খেলা করে;

---

* দেশের লোক এখনও এই কবিকে কিছু-না-কিছু সাহায্য করেন, এই বাসনা। অন্ততঃ তাঁহার হিন্দুধর্ম্ম-মূলক 'কৈবল্যতত্ত্ব' পুস্তক খানি (দাম ॥০ আনা মাত্র) এবং 'দ্বৈভাষিকী' পত্রের এক বৎসরের সংখ্যাগুলি (যাহার ২।১০ সেট এখনও তাঁহার ছাপা আছে, দাম ১॥০ টাকা মাত্র)—এ দুটি জিনিস ক্রয়-চ্ছলেও কেহ তাঁহাকে সাহায্য করেন—এই অনুরোধ। তাঁহার ঠিকানা—শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার, হেড্-পণ্ডিত, জেলা স্কুল—যশোহর।

শীতল জলে, দলে দলে, খেল্‌ছে হাঁসের মালা।
"সক্‌ড়ি বাসন," কর্‌তে মাজন, আস্‌ছে
কুলবালা॥
ঠোক মারিয়ে, জল ফিরিয়ে; হাঁসের
ছানা গুলি।
খাবার নিয়ে, সুখি হয়ে, যাচ্ছে সবে চলি॥
ঢেউ উঠ্‌লো, বায়ু বইলো, রোদ্দ উঠ্‌লো রেগে।
শান্তি গেল, চিন্তা এলো, মানবের ভাগ্যে জেগে॥
একি ধরণ, না যায় বুঝন, বিশ্ব-পিতার ধারা।
যে বুঝেছে, সেই মজেছে, আত্ম তত্ত্ব হারা॥

মণিপুর-যাত্রীর দিনলিপি।

(৩)

বাষ্পপোতে গমনাগমনে আর এক কষ্ট, হিন্দু আরোহীর আহারের পক্ষে। ইংরাজ-বাহাদুরদিগের জন্য "কোপ্তা-কোর্ম্মা, কারি-কাট্‌-লেট্‌" প্রভৃতি আহারের বিলক্ষণ আয়োজন হইয়া থাকে, নগণ্য 'নেটিভের' জন্য কিন্তু চিপিটকই চূড়ান্ত বন্দোবস্ত। ইংরাজি-ভাবাপন্ন বা ইদানীং সাম্যবাদী সভ্যগণ অবশ্য 'বাট্‌লারের বাঁটলুয়ে' প্রায়ই প্রসাদ পাইয়া থাকেন; কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই তাহা সাহেব-বাহাদুরদিগের উচ্ছিষ্টের সারাংশ। এই আশঙ্কায় অনেক নিষ্ঠাবান্ মুসলমানও ঐ মহা-প্রসাদ-সেবনে সঙ্কুচিত হয়েন; আমাদিগের সহযাত্রী, জনৈক লব্ধপ্রতিষ্ঠ মুসলমান অর্থের সচ্ছলতা-সত্বেও সদাশয় 'বাট্‌লারের' সহিত আহারের বন্দোবস্ত করিলেন না। আমরা 'সে কালের লোক'—মনের মলিনতা ঘুচে নাই, সংকীর্ণতার বাহিরে এখনও অগ্রসর হইতে শিখি নাই, সকলের নিকট সমভাবে প্রসাদ পাইতেও অভ্যস্ত হই নাই—জাহাজে সুতরাং প্রায় অনাহারেই যাইতে হয়! দুর্ভাগ্যক্রমে, আরোহীদিগের মধ্যে, আমাদিগের ন্যায় অসভ্যের সংখ্যাই কিছু অধিক। বাষ্পপোতের কর্ত্তৃপক্ষগণ এই অসভ্য-সমাজের পরিত্রাণের কি কোন সদুপায় করিতে পারেন না?

যাহা হউক, আমাদিগের কষ্টের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, বাষ্পপোত আপন গন্তব্য-পথে অগ্রসর হইতে লাগিল; এবং যথাকালে, শনিবার সায়াহ্নে, তেজপুর-ঘাটে পৌঁছিল! এই তেজপুর আসাম-প্রদেশস্থ কারাগৃহ-সমূহের কেন্দ্রস্থল, এবং এই স্থানেই এ অঞ্চলের বাতুলাশ্রম। কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত কয়েদী মাত্রকেই এখানকার কারাগৃহে কিছুদিনের জন্য শাস্তিভোগ করিতে হয়। কালক্রমে মণিপুরাধীশ্বর কুলচন্দ্রকেও যে এই কঠিন পরীক্ষায় পেষিত হইতে হইবে—মণিপুর-যাত্রাকালে এ চিন্তা ক্ষণেকের জন্যও মনোমধ্যে উদিত হয় নাই। তখন নিজের প্রাণের চিন্তাই প্রবল,—কৃষ্ণ-দশমীর দারুণ অন্ধকার দশদিক্ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল; আমার অন্তরাকাশও ঘোর তমসাচ্ছন্ন করিয়া তুলিল। অনন্ত নৈশাকাশে নক্ষত্ররাজির ক্ষীণালোক যেমন সেই প্রাকৃতিক অন্ধকারের ভীষণতা অপহরণ করিতেছিল, আশার সূক্ষ্ম-রেখাও তদ্রূপ আমার অন্তরের বিষণ্ণতা অল্পে অল্পে অপসৃত করিতেছিল। এইরূপ শান্তি ও অশান্তির, আশা ও নিরাশার, মধ্য দিয়া সে রাত্রি অতিবাহিত হইয়া গেল; দুশ্চিন্তানাশিনী শ্রান্তিহারিণী নিদ্রাদেবী অলক্ষ্যে কখন্ আমাকে অভয় ক্রোড়ে স্থান দিয়াছিলেন—স্মরণ নাই; প্রাতঃসূর্য্যের নির্ম্মল রশ্মি বাষ্পপোত আলোকিত করায় আমার চেতনা হইল; তখন, গাত্রোত্থান-পূর্ব্বক, যথাসম্ভব প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে, প্রভুর আদেশ-পালনে ব্যাপৃত হইলাম।

ক্রমে শীলঘাট, পানপুর অতিক্রম করিয়া বাষ্পপোত বিশ্বনাথ-ঘাটে পৌঁছিল; শুনিলাম, অদূরে 'বিশ্বনাথ' মহাদেবের পীঠস্থান বারাণসীর বিশ্ববিমোহন সুবর্ণমন্দিরে 'বিশ্বেশ্বর বিরাজ করিতেছেন, আর আসামের বিজন বনে 'বিশ্বনাথ' ধূলিশয্যায় * বিশ্বলীলার অস্ফুট স্মৃতি উদ্দীপন করিতেছেন। বিশ্বনাথের অচিন্ত্য লীলা মূঢ় প্রাণী আমরা কি বুঝিব? —অন্তরীক্ষে তাঁহার উদ্দেশে প্রণিপাত পুরঃসর, জলপথে অগ্রসর হইতে থাকিলাম। ইহার পরেই তিনটী ঘাটের নাম, যথাক্রমে,—বেহালী, মুখ, ধনেশ্বরীমুখ এবং লোহিতমুখ। বেহালী-ধনেশ্বরী ও লোহিতা নাম্নী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কল্লোলিনী ব্রহ্মপুত্রের সহিত মিলিতা হওয়ায়, তৎপার্শ্বস্থিত ঘাটগুলির ঐরূপ নাম হইয়াছে। আসামের বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়া প্রবল নদ ব্রহ্মপুত্র অবিচলিত তরঙ্গে প্রবহমান; পথিমধ্যে ঐরূপ কত ক্ষুদ্র নদীই তাঁহার সেই মহাতরঙ্গে আত্মোৎসর্গ করিয়াছে; এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানের প্রাধান্য-হেতু তত্তৎ নদীর মুখ বলিয়া ঘাট সংস্থাপিত হইয়াছে। উল্লিখিত তিনটী ঘাট অতিক্রম করিয়া আমরা সায়াহ্নে শীকারী-ঘাটে পৌঁছিলাম। এই স্থানে আমাদিগের জলপথেরও অবসান হইল। সূর্য্যদেব তখনও একেবারে অদৃশ্য হয়েন নাই,—তাঁহার অস্তোন্মুখী রশ্মিমালা ব্রহ্মপুত্রের' লহরমালার সহিত ক্রীড়া করিতেছিল; প্রকৃতির এই চিত্তবিনোদন মোহন দৃশ্য অবলোকন করিতে করিতে আমরা কোম্পানীর বাষ্পপোত হইতে অবতরণ করিলাম। মহাযজ্ঞের মহায়োজন এই স্থান হইতেই আরম্ভ হইতেছিল; প্রভুগণ আবশ্যকমত, তাহার কিঞ্চিৎ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া, সান্নিহিত সরকারী পোত "সোণামুখীতে" আশ্রয়লইলেন; আমরাও পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাহাতে আরোহণ পূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করিলাম এবং অবিলম্বে পুনরায় তীরে অবতরণ করিয়া জঠরাগ্নি জুড়াইবার চেষ্টায় নিযুক্ত হইলাম। বলা বাহুল্য, সে রাত্রি 'সোণামুখীর' অভ্যন্তরেই আমাদিগের শয়নকার্য্য সমাপিত হইল।

সরকারী কার্য্যের সরঞ্জাম স্বতন্ত্র;—লোকলস্কর কার্য্য-পরতন্ত্রতায় প্রতি-নিয়ত এতদূর লঘু-হস্ত যে অন্যের পক্ষে যাহা এক সপ্তাহে সম্ভব নহে, সরকারী বন্দোবস্তে তাহা এক-দিনেই সম্পন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু এই মহা-যজ্ঞের আয়োজনে তথাপি কিঞ্চিৎ বিলম্ব ঘটিল,—৬ই হইতে ১০ই এপ্রিল পর্য্যন্ত, আয়োজনের অসম্পূর্ণতা নিবন্ধন, আমাদিগকে শীকারিঘাটেই অবস্থান করিতে হইল। কেরাণীর পক্ষে ক্বচিৎ লেখাপড়ার কিঞ্চিৎ কারুকার্য্য ভিন্ন অপর কর্ম্ম ছিল না,—ব্রহ্মপুত্রের বিশাল বক্ষে বিশ্রাম করিতে থাকিলাম এবং নদ-সলিলে সূর্য্য-রশ্মির সুন্দর বীচিক্রীড়া দেখিয়া মুগ্ধ হইতে লাগিলাম। মণিপুরের তদানীন্তন অধীশ্বর কুলচন্দ্র নিজ দুষ্কৃতির ফলাফল অনুমান করিয়া ভয়ে ও ভক্তিতে বড়লাট বাহাদুরের নিকট তার-যোগে যে সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন, পাঠকবর্গ অনেকেই তদ্বৃত্তান্ত অবগত আছেন; শীকারি-ঘাটে অবস্থান কালে—৭ই এপ্রিল তারিখে--সেই তার-সংবাদ আমাদিগের সাহেব-বাহাদুরের হস্তগত হয়। সংবাদে কি ভাব অভিব্যক্ত ছিল, তাহা অবশ্য আমাদিগের অজ্ঞাত; সুতরাং তৎসমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া নিষ্প্রয়োজন।

১১ই এপ্রিল, শনিবার, প্রত্যূষে, প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে আমরা শীকারিঘাট পরিত্যাগ করিলাম। এই স্থান হইতে জলপথ ঘুচিয়া স্থলপথ আরম্ভ হইল:—এ পথে গো-

* বিশ্বনাথের কোনপ্রকার মন্দির নাই। ইনি প্রায় ছয়মাস ব্রহ্মপুত্র-গর্ভে নিমগ্ন থাকেন। (পূর্ব্বে) রাজা বিশ্বকেতু এইস্থানে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত কই শিবমূর্ত্তি সংস্থাপন করেন এবং শিবের নাম বিশ্বনাথ রাখিয়া এইস্থানকেও সেই আখ্যা প্রদান করেন।"—উদাসীন সভাশ্রবার আসাম ভ্রমণ ৫৭ পৃষ্ঠা।

শকট বা অশ্বপৃষ্ঠ ব্যতিরেকে অপর কোন সুখকর যান নাই,—সাহেবেরা অনায়াসে অশ্বপৃষ্ঠে যাইতে লাগিলেন, সাধারণ পথিকের জন্য গো-শকটই বিধি, তবে আমাদিগের জন্য হস্তীর বন্দোবস্ত হইয়াছিল; কিন্তু তৎপৃষ্ঠে দেহ-যষ্টি বন্দি-ভাবে অণুক্ষণ বিলম্বিত করিয়া রাখা বিড়ম্বনা বোধে, সাধ্যানুসারে পদব্রজেই যাইতে লাগিলাম। কিন্তু ইহাতে বিড়ম্বনার বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস ঘটিল না; কিয়দ্দূর গমনের পরেই দৈববশে অকস্মাৎ চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন করিয়া মূষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হইল, সুতরাং বলা বাহুল্য, তাহাতে সর্ব্বাঙ্গ জলসিক্ত হইয়া গেল,—হৃদয়াকাশেও একখানা ঘন মেঘ পরিব্যাপ্ত হইয়া প্রাণটা আকুল করিয়া তুলিল,—ভাবিলাম, প্রবাসীর প্রথম পর্য্যটনেই এই দারুণ পথ-ক্লেশ, না জানি পরিণামে আরও কি বিষম দুর্দ্দৈব প্রচ্ছন্ন আছে। কবিরা, শুনিয়াছি, প্রাবৃটে বিলক্ষণ বিরহাশঙ্কা করিয়া থাকেন; দাম্পত্য-প্রেমের অঙ্কুর এখনও হৃদয়-ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হয় নাই, সুতরাং প্রণয়িনীর বিচ্ছেদে প্রাবৃটের ধারা কিরূপ যাতনা সঞ্চার করে তাহা অনুভূতির অতীত। কিন্তু প্রিয়-জন-বিরহ যে উহাতে বর্দ্ধিত হয়, এই নৈদাঘ বর্ষণেই তাহার বিলক্ষণ প্রতীতি জন্মিল;—মাতা-পিতা, ভাই-বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন কোথা, আর এই দুরন্ত বৃষ্টির ধারা মস্তকে বহন করিয়া আমি কোন অজানিত স্থানে গমন করিতেছি ভাবিয়া বড়ই অধীর হইলাম। কিন্তু এ অধীরতায় সহানুভূতি প্রকাশের কোন পাত্র সন্নিকটে নাই, অগত্যা মনের ভাব মনেই বিলীন করিয়া অবস্থার অবশ্যম্ভাবী পরিণামে আত্মনির্ভর করিলাম। সৌভাগ্যের বিষয় এ কষ্ট বড় অধিকক্ষণ সহ্য করিতে হইল না,—অপরাহ্ণ এক ঘটিকার সময় আমরা গোলাঘাট পৌঁছিলাম। বলা বাহুল্য, যথাসম্ভব আহারাদির বন্দোবস্ত সেখানে গিয়াই করা হইল। এ স্থানটী শিবসাগর জেলার অন্তর্গত একটী প্রধান মহকুমা—সরকারী বে-সরকারী অনেক লোক-জনের বাস ও গতিবিধি আছে, বাঙ্গালীও কয়েক জন আছেন, অতএব অত্যল্প কাল এখানে যাহা অবস্থান করিতে হইয়াছিল, তাহা নিতান্ত অসুখে কাটিল না।

(ক্রমশঃ)

অনুসন্ধান-সমিতির বিবরণী।

প্রতারণা-প্রবঞ্চনা।

মফঃস্বলের ভদ্রলোকদিগের নামে

আজকাল নানারকম বিজ্ঞাপনের প্যাকেট যাইয়া উপস্থিত হয়। সে সকল বিজ্ঞাপনে যে কতই রকমের প্রলোভন, তাহাও আর বলিবার নহে। অথচ, আমরা দেখিতে পাই, এসকল বিজ্ঞাপন-প্যাকেটের অধিকাংশই প্রায়, সন্দেহ মূলক। উহার মধ্যে ঔষধের বিজ্ঞাপন ও অনেক আছে। সাধারণে মোটামুটি এসকল বিজ্ঞাপনের বিষয়ে সতর্ক থাকেন এই বাসনা।

'সুধারস'

নামক একটি ঔষধের বিজ্ঞাপন 'সোমপ্রকাশ' প্রভৃতি পত্রিকায় বাহির হয়। কিন্তু তাহার মূল্য এক টাকা পাঠাইয়া কেহ কেহ ঔষধ পাইতেছেন না, এইরূপ অভিযোগ পাওয়া যায়। টাকা পাঠানর পর, ২।৩ খানা পত্র ও দিয়াও বিজ্ঞাপন-দাতার আর সংবাদ পাওয়া যায় না, এইরূপই অভিযোগ। ডাঃ এম, সি, দে বা ডাক্তার মহেশচন্দ্র দে নামক এক ব্যক্তিই ঐ ঔষধের বিজ্ঞাপন-দাতা। কিন্তু, কেন তিনি এ প্রকার দুর্নাম কিনিতেছেন।

নকল ঔষধের

আজকাল বড়ই বাড়াবাড়ি। টি গুপ্ত বা সুধা-সিন্ধুর তো নকল হইতেই পারে; অধিকন্তু যে কোন ঔষধের আজকাল একটু কাটতি হয়, তারই নকল আরম্ভ হইয়াছে। এইপ্রকার মাগুরার ডাক্তার ভুবানন্দ চক্রবর্ত্তি মহাশয়ের ২১ পুরিয়া (জ্বর নাশক) তাহারও কতই জাল! এইজন্য দুই জনের মেয়াদও হইয়াছে। ফলতঃ আসল-নকল চেনা দায়! সাধারণের তাই নকল সম্বন্ধেও সাবধানতা প্রয়োজন!

অনুসন্ধান

অনুসন্ধান-সমিতির মাসিক পত্র।

৫ম খণ্ড। ১৫ই চৈত্র, ১২৯৮। ১৬শ সংখ্যা।

কৃষ্ণ-কীর্ত্তন।

(বাউলের সুর।)

বাসিয়ে মন, সুখে, মন-শুকে,
শিখাও কৃষ্ণ-নামাবলী।
শুকের এক সুগুন আছে, শুন মোর কাছে,
যা বল্‌বে, তাই বল্‌বে বুলি।
শৈশব্‌কাল গেলে চলি, লয় না বুলি,
শেষে সে ভাব্‌ যায় সে ভুলি।
সদা কাল রয়্‌ চঞ্চল, অতি খল,
বন্‌ চলিতে হয় কৌশলী।
কাটিয়ে পাও শিকলি, কুতুহলী,
বন্‌ জঙ্গলি যায় সে চলি।
পোষ নিলে হয়না তাহা, বল্‌বে যাহা,
শুন্‌বে তাহা, ধরলে বুলি।
গেলেও কখন ছুটে, অম্‌নি উঠে,
আস্‌বে নিজ-আস্‌বাব্‌ বলি।
সদা কাল থাকুবে সুখে, মনে মুখে
বল্‌বে রাধা-কৃষ্ণ-কালী।
শুনিয়ে, প্রাণ্‌ জুড়াবে, পাপ দূরাবে,
জীবন হবে সফলি।
তাই বলি, বল্‌ সদাকাল, সকাল বিকাল,
শুক্‌কে সুখে "সেই সুবুলি।"
অন্তে অনন্ত পদ, সুসম্পদ
পাবে, বিপদ্‌ যাবে চলি।
রোহিণী কয় চরমে, নাম্‌ পরমে
বল্লে হবে, সব সফলি।

অশ্রু মাহাত্ম্য।

চক্ষের জল অতি পবিত্র জিনিস। দেশ-কালপাত্রভেদে একবিন্দু চক্ষের জলে যে কত মহা মহা কার্য্য সংসাধিত হইতে পারে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহার প্রভাবও অতুলনীয়। প্রেমে ইহার উৎপত্তি, উচ্ছ্বাসে ইহার বিকাশ। কাঠিন্যকে কোমলে পরিণত করিতে, অসদ্বৃত্তিকে ধর্ম্মপথে আনয়ন করিতে ইহার অমোঘ প্রতাপ পরিদৃষ্ট হয়। তুমি বরং চোরকেও বিশ্বাস করিও, তথাপি যে জীবনের মধ্যে, কস্মিন-কালে, যে-কোন ঘটনায় অন্ততঃ একবারও না কাঁদিয়াছে, একবিন্দুও অশ্রুজল না ফেলিয়াছে, তাহাকে বিশ্বাস করিও না। আজ একটি সামান্য দৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া, আমরা এই "অশ্রু-মাহাত্ম্য" বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

একদা এক পরী সুন্দরী, কোন কারণবশতঃ শাপগ্রস্তা হইয়া, স্বর্গভ্রষ্টা হইয়াছিল। স্বর্গ-ভ্রষ্টা হইয়া তাহার আর দুঃখের অবধি ছিল না। সে, প্রতিনিয়তই মলিনবেশে—রুক্ষকেশে, অনাহারে, পাগলিনীর ন্যায় ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইত এবং শিরে করাঘাত করিয়া রোদন ও বিলাপ করিত। এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইল।

তাহার কাতরতা দেখিয়া, একদিন স্বর্গী-

ধিপতি, তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"দেখ, তুমি আবার স্বর্গধামে অবস্থিতি করিতে পার, যদি একটি কাজ কর।"

অভিশাপ হইতে মুক্তিলাভ করিবার উপায় আছে শুনিয়া, দুর্ভাগ্যবতী পরী, দেহে প্রাণ পাইল। আশ্বস্ত হৃদয়ে, ব্যাকুলভরে কহিল,—"দেব, কি কর্ম্ম করিতে হইবে বলুন; আমি প্রাণ দিয়াও তাহা করিতে প্রস্তুত আছি।"

স্বর্গের অধীশ্বর কহিলেন,—"দেখ, সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বস্তু যদি তুমি লইয়া আসিতে পার, তবে তোমার পুনরায় স্বর্গলাভ হইবে; নচেৎ ইহজীবনে তোমার বাসনা পূর্ণ হইবে না।"

এই কথা শুনিয়া, পরী, ছল ছল চক্ষে, কম্পিত-কণ্ঠে কহিল,—"সর্ব্বোৎকৃষ্ট বস্তু? সর্ব্বোৎকৃষ্ট বস্তু এ পৃথিবীতে কি আছে বলিয়া দিন, আমি যেরূপে—যেমন করিয়া পারি, আনিয়া দিব।"

স্বর্গাধিপতি ঈষৎ হাস্যে উত্তর করিলেন,—"না,—তা, হইবে না; সর্ব্বোৎকৃষ্ট বস্তু কি, বলিয়া দিব না। সেইটি সংগ্রহ করাই তোমার কার্য্য এবং এই নির্ব্বাচনটুকুই তোমার পরীক্ষা।"

অভাগিনী পরী, অনেক অনুনয়-বিনয় করিল; পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বস্তু কি, জানিতে অনেক কাকুতি মিনতি করিল; কিন্তু তাহার সকল চেষ্টাই বিফল হইল। ত্রিদিবেশ্বর কহিলেন,—"পরী, কেন তুমি বৃথা অনুনয়-বিনয় করিতেছ? নিরর্থক কালহরণ করিয়া কর্ত্তব্যকর্ম্মে উদাসীন থাকিলে, তোমারই সমূহ ক্ষতি। অতএব যাও,—সংসারের প্রত্যেক-স্থান তন্ন তন্ন করিয়া দেখ,—সর্ব্বোৎকৃষ্ট বস্তু কি; এবং বিধিমতে তাহার পরীক্ষা কর। অতঃপর সফল মনোরথ হইয়া, সুখে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে।"

পরী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—"পরীক্ষা ত আপনি গ্রহণ করিবেন। কোন্ স্থানে আপনাকে—"

স্বর্গাধিপতি বাধা দিয়া কহিলেন,—"আমাকে পরীক্ষা দিতে হইবে না। এই স্বর্গ-দ্বারই তোমার পরীক্ষা গ্রহণ করিবে।"

কথা শুনিয়া পরী, বিস্মিতার ন্যায় চাহিয়া রহিল। ত্রিদিবেশ্বর কহিলেন,—"আশ্চর্য্য হইতেছ? হাঁ,—তুমি সংসারের সার বস্তু আনয়ন করিলেই এই স্বর্গদ্বার আপনি উদ্ঘাটিত হইবে; অন্যথা, সহস্র চেষ্টায়ও তুমি সফলকাম হইতে পারিবে না,—কিছুতেই এ পুণ্যদ্বার খুলিবে না।"

বৃথা বাক্য-ব্যয়ে কিছু হইবে না বুঝিয়া, পরী, বিধাতাপুরুষের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিল। স্বর্গ প্রাপ্তির আশায়, প্রাণপণে ঐকান্তিক যত্নে, দেশ দেশান্তর পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। এইরূপে একে একে গ্রাম, নগর, দেশ, জনপদ, অরণ্য, প্রান্তর—সর্ব্বস্থান অন্বেষণ করিতে লাগিল,—পৃথিবীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট সার বস্তু কোথায় মিলিতে পারে।

* * *

দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ একদিন এক গৃহস্থের বাড়ীতে আগুন লাগিয়াছে। প্রতিবাসী আত্মীয়-গণ সকলেই অগ্নি নির্ব্বাণের চেষ্টা পাইতেছে। কিন্তু প্রাণভয়ে, কেহ গৃহপ্রবেশ করিতে পারিতেছে না। সেই অগ্নিময় গৃহে, গৃহস্থের একটি শিশু-সন্তান নিদ্রা যাইতেছিল। শিশুটি মাতৃহারা। পিতাও কার্য্যোপলক্ষে স্থানান্তরে গিয়াছে। এঅবস্থায়,সকলেই মুখে 'হা—হুতাশ' করিতে লাগিল,—হায়, কিরূপে শিশুটির প্রাণ রক্ষা হইতে পারে! বারংবার এই কথা শুনিয়া, এক অসমসাহসী দয়াবান যুবা, প্রাণের মমতা ত্যাগ করিয়া, সেই প্রজ্জ্বলিত গৃহে প্রবেশ করিল এবং অনতিবিলম্বে নিদ্রিত শিশুকে, দগ্ধহীন অক্ষত শরীরে বাহিরে আনয়ন করিল। চারিদিক হইতে অমনি 'সাধু'

'সাধু' রব পড়িয়া গেল। কিন্তু হায়, সেই সাধুবাদের সঙ্গে সঙ্গে, মহা পরোপকারী, উদারহৃদয় যুবকের প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। জ্বলন্ত আগুনের তীব্র জ্বালাময় উত্তাপে দগ্ধীভূত হইয়া দেবচরিত্র যুবক প্রাণত্যাগ করিল। পরী অনতিদূরে দাঁড়াইয়া, এ দৃশ্য দেখিতেছিল। যাই যুবক মৃত্যুমুখে পতিত হইল, অমনি ব্যাকুল হৃদয়ে পরী তাহার আত্মা লইয়া অনন্তধামে চলিল। ভাবিল,—"পরার্থে যে আত্মোৎসর্গ করিতে পারে, তাহার তুল্য মহৎ আর কে আছে? অতএব এই যুবকের আত্মাই পৃথিবীর সার দ্রব্য।"

আনন্দিত হইয়া, পরী, গন্তব্যস্থানে উপনীত হইল। কিন্তু হায়, তাহার বাসনা পূরিল না,—স্বর্গদ্বার উদ্ঘাটিত হইল না।

পরী মনে মনে ভাবিল,—"একি! এমন মহাদ্রব্যের সংস্পর্শেও স্বর্গদ্বার উদ্ঘাটিত হইল না? দেখি, ইহাপেক্ষা আরও কি সারদ্রব্য পৃথিবীতে মিলিতে পারে?

* * *

আর একদিন পরী দেখিল,—এক মহা-শ্মশানে এক শবদেহ দাহ হইতেছে, পার্শ্বে আর একটী চিতা সজ্জিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে শব নাই। ক্ষণেকপরে চিতা অগ্নিপৃষ্ট হইল। অমনি, দেখিতে দেখিতে একটি অনুপমা মোহিনীমূর্ত্তি, সেই প্রজ্জ্বলিত চিতাকুণ্ডে আরোহণ করিল। অমনি চারিদিক হইতে মাঙ্গলিক শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। পতি বিরহে সতী, সহমরণে গমন করিল। পাতিব্রত্যের এ উদ্দামভাবপূর্ণ করুণ দৃশ্য দেখিয়া পরীর সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চিত হইল। ভাবিল, ইহাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্তু পৃথিবীতে আর কি হইতে পারে? অমনি সাগ্রহে, সানন্দ-চিত্তে, সেই সতী-নারীর পুণ্যাত্মা লইয়া, পরী, তাহার অভীপ্সিত পথে গমন করিল। কিন্তু একি,—এবারও যে স্বর্গদ্বার উদ্ঘাটিত হইল না। পরী ক্ষুণ্ণ হইয়া মনে মনে কহিল,—"একি বিধাতা-পুরুষ আমাকে ছলনা করিলেন নাকি? এমন অনুপমা পতি-প্রেমও কি পৃথিবীর সার বস্তু নহে?"

* * *

আর একদিন আর এক দৃশ্যে, পরী আশ্বাসিতা হইল। ভাবিল, এইবার নিশ্চয়ই তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। দেখিল, * * * দেশে সমরানল জ্বলিয়াছে। শত সহস্র যুদ্ধার্থী বীর-পুরুষ, প্রাণের মায়া-মমতা বিসর্জ্জন করিয়া স্ব-দেশ রক্ষার্থে ব্রতী হইয়াছে। বিপক্ষ-পক্ষও অমিত বল-বিক্রমে, যুদ্ধার্থে সম্মুখীন হইল। স্বদেশ রক্ষায়, সর্ব্ব প্রথমেই যিনি আত্মজীবন উৎসর্গ করিলেন, পরী, সেই মহাপুরুষের মহদাত্মা লইয়া গন্তব্যস্থানে পঁহুছিল। কিন্তু হায়, এবারও সে স্বর্গদ্বার উদ্ঘাটিত হইল না।

* * *

বারবার নিরাশা হইয়াও স্বর্গাভিলাষিণী পরী, পশ্চাৎপদ হইল না। এইরূপ এক এক করিয়া অনেক পরীক্ষা করিল; পৃথিবীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট সার দ্রব্য অন্বেষণে বহুপন্থার অনুসরণ করিল; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছে না।

* * *

একদিন, এক নগরোপকণ্ঠের এক নির্জ্জন পুষ্পোদ্যানে, গোধূলি সময়ে, পরী গালে হাত দিয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতেছে, এমন সময় দেখিতে পাইল, সুন্দর সরসীতীরে, সুস্নিগ্ধ শ্বেত প্রস্তর সোপানে বসিয়া একটি মনোহর বালক, নিমীলিতনেত্রে নিবিষ্টচিত্তে, বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া ভগবানের ধ্যান করিতেছে; আর তার অনতিদূরে এক অশিতীবর্ষের পক্ককেশ-শ্মশ্রু-বিশিষ্ট বৃদ্ধ সে দৃশ্য দেখিয়া, প্রেমে পুলকিত হইয়া মনে মনে কহিলেন,—"আহা, এ দুগ্ধ-পোষ্য শিশুর হৃদয়ে ভগবান এত প্রেম দিয়াছেন, আর আমি বার্দ্ধক্য দশায় পতিত হই-

য়াছি, শমন, শিয়রে সমুপস্থিত, আমি সে পতিতপাবনকে ভুলিয়া আছি। দীননাথ, কতদিনে এ দীনের প্রতি সদয় হইবেন!"

এই কথা বলিতে বলিতে; বৃদ্ধের অশ্রু-কোণে একবিন্দু প্রেমাশ্রু বিগলিত হইল। এ দৃশ্য দেখিবামাত্র পরী ত্বরিতপদে তথায় উপনীত হইল এবং মায়াবলে, অলক্ষ্যে সেই প্রেমাশ্রু টুকু লইয়া গন্তব্যস্থানে গমন করিল।

হরি হরি!! পরী স্বর্গদ্বারে উপনীত হইবামাত্র, এবার সে স্বর্গদ্বার আপনা হইতে উদ্ঘাটিত হইল। অমনি শত শত স্ত্রী পুরুষ আসিয়া পরীকে অভ্যর্থনা করিতে লাগিল। চারিদিকে শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল; আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। স্বয়ং স্বর্গাধিপতি বিধাতাপুরুষ আসিয়া, হাসিমুখে, মহাসমারোহে, পরীকে স্বর্গধামে লইয়া গেলেন। কহিলেন,—"পরী, তুমি যে যে দ্রব্য আনিয়াছিলে, সকলই মূল্যবান্ বটে; কিন্তু "প্রেমাশ্রুর" তুল্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট সারবস্তু পৃথিবীতে আর নাই। কারণ, প্রেমিকের এক বিন্দু অশ্রুপাতে পৃথিবীতে মহাপ্রলয়ও ঘটিতে পারে!'

বস্তুতঃ প্রেমাশ্রুর তুল্য, মহার্ঘ, পবিত্র, পুণ্যময় তীর্থ আর নাই।

বাঙ্গালার বিবরণ।

বর্দ্ধমান।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

এবারে আমরা বর্দ্ধমান প্রদেশের রাজবংশের বর্ণনা করিব। এই বংশে এপর্য্যন্ত কয়জন রাজা হইয়াছেন, তাঁহারা কি নিয়মে ও কি উপায়ে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন, অদ্য তাহার আলোচনা করা যাইতেছে।

রাজবংশের ইতিবৃত্ত।

এই বংশীয় পুরুষগণের ইতিহাস লিখিবার পূর্ব্বে এক বংশ-তালিকা দিতেছি। তাহা দ্বারা বুঝিবার ও বুঝাইবার সুবিধা হইবে। সুতরাং তাহাতে পাঠেরও বিলক্ষণ সাহায্য করিবে।

১ সঙ্গম রায় ✓
২ বঙ্কবিহারী রায় ✓
৩ আবু রায় ১ ✓
৪ বাবু রায় ২ ✓
৫ ঘনশ্যাম রায় ৩ ✓
৬ কৃষ্ণরাম রায় ৪ ✓
৭ জগৎ রাম রায় ৫ ✓

৮ কীর্ত্তিচন্দ্র রায় ৬
৯ চিত্রসেন রায় ৭ (নিঃসন্তান)

৮ মিত্রসেন রায়
৯ তিলকচন্দ্র ৮
১০ তেজচাঁদ ৯
১১ প্রতাপচাঁদ

বাম ভাগের ১, ২, ৩ ইত্যাদি অঙ্ক বংশের পর্য্যায়-বোধক। দক্ষিণদিকের ! অঙ্কগুলি রাজার সংখ্যা-বোধক। অর্থাৎ কতজন রাজা হইয়াছেন, কে প্রথম রাজা এই সকল কথা উহাতে ব্যক্ত হইতেছে।

সঙ্গম রায় ও বঙ্কবিহারী রায়।—প্রাচীনকালে লাহোরের অন্তঃপাতী কোটলি গ্রামে ক্ষত্রিয়-কুল-সম্ভূত সঙ্গম রায়ের বসতি ছিল। তথাকার বাস ত্যাগ করিয়া বর্দ্ধমান নগরের অদূরে বৈকুণ্ঠপুরে বাস করিতে লাগিলেন। বোধ হয়, বাণিজ্যের বা কোন রাজকার্য্যের সুবিধার কারণ তিনি এ প্রদেশে আসিয়াছিলেন। যে সময় এই সদাশয় মহাপুরুষ জন্মস্থান ত্যাগ করিয়াছিলেন, তখন কি কেহ স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারিয়াছিল, তাঁহারই বংশধরেরা অচিরে বঙ্গের এক প্রধান রাজ-পরিবার বলিয়া লোকের নিকট আদৃত হইবে? তৎকালে তিনি তো নির্ব্বাসিতের ন্যায় নিঃশব্দে বিনা-আড়ম্বরে জন্মভূমির নিকট বিদায় লইয়াছিলেন। বঙ্কবিহারী রায় তাঁহার পুত্র। এই দুই পুরুষের বিস্তৃত জীবনী সাধারণের জানিতে কৌতূহল জন্মিতে পারে। কিন্তু তাহা সুপ্রাপ্য নয়; সুতরাং পাঠকগণের পাঠলালসা পরিতৃপ্ত করিতে পারিলাম না। বঙ্কবিহারীর তনয় আবু রায়।

১ আবু রায়।—সঙ্গম রায়, বর্দ্ধমান রাজগোষ্ঠীর যেমন প্রথম, আবু রায়ই রাজগণের সেই প্রকার প্রথম পুরুষ। তাঁহাকে পবিত্রাত্মা বলিতে হইবে। সামান্য পুণ্যবলে রাজা হইবার যো নাই। আমাদের শাস্ত্রে বলে—"অষ্টানাং লোকপালানাং বপুর্ধারয়তে নৃপঃ" ভূপতি, অষ্ট লোকপালের অংশে নির্ম্মিত। তিনি পিতামহ সঙ্গম রায় অপেক্ষাও ভাগ্যবান্ ও পুণ্যবান্, তাহার সন্দেহ কি? যাঁহার বংশ বহু বিস্তৃত হয়—কেবল বহু বিস্তৃত নয়—যাঁহার সন্তানগণ রাজপূজ্য হন, তিনি যদি ধর্ম্মশীল বলিয়া পরিচিত না হইবেন, তবে আর কাহাকে ধর্ম্মশীল বলিব? এই আবু রায় কাপুর ক্ষত্রিয়। ১৬৫৭ খৃষ্টাব্দে চাকুলা বর্দ্ধমানের ফৌজদারের অধীনে পেঁকেব, বাগনান প্রভৃতি গ্রামের চৌধুরী ও কোতোয়াল নিযুক্ত হন। বাবু রায় তাঁহার সন্তান। এই সন্তান ভিন্ন তাঁহার আর কোন সন্তান-সন্ততি থাকা না থাকার সংবাদ পাই নাই।

২ বাবু রায়।—তিনি বর্দ্ধমান পরগণা ও অপর তিনটি ষ্টেটের অধিকারী হইয়াছিলেন। কত বৎসর তিনি বাঁচিয়াছিলেন, জানা যাইতেছে না। তাঁহার পুত্রের নাম ঘনশ্যাম রায়।

৩ ঘনশ্যাম রায়।—বর্দ্ধমান নগরের মধ্যস্থলে "শ্যামশুন্দর" এই ঘনশ্যামের এক কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। "পুত্রে যশসি তোয়ে চ নরাণাং পুণ্য-লক্ষণং।" পুত্রে, যশে ও জলে লোকের পুণ্যকীর্ত্তির পরিচয় পাওয়া গিয়া থাকে। এইবংশে বাপী খননের ইনিই প্রবর্ত্তক। তৎসুত কৃষ্ণরাম রায়

৪ কৃষ্ণরাম রায়।—তিনি পৈত্রিক জমিদারীর উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন নূতন ষ্টেট অর্জন করিতেও সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি সামান্য লোক ছিলেন না। যিনি উদ্যোগ-বলে সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সদন হইতে সম্মানজনক ফরমান্ পাইতে পারেন, তাঁহাকে কি প্রকৃত মানব বলা যায়? তিনিই পিতৃ-দৃষ্টান্তে নিজ-নাম-খ্যাত "কৃষ্ণশায়র" দীর্ঘিকা-প্রতিষ্ঠাতা। ঐ সম্রাটের অধিকার কালে ১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমানের অঙ্গীভূত চেতো ও বরদার তালুকদার শোভাসিংহ সম্রাটের বিদ্রোহী হয়। সে পাঠান সর্দ্দার রহিম খাঁর সাহায্যে বর্দ্ধমান আক্রমণ করে। তাহাদের হস্তে কৃষ্ণরাম নিহত হন। শোভাসিংহ, বন্দীভূতা কৃষ্ণরাম-কুমারীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার ধর্ম্মনাশে উদ্যত হইলে, তাঁহারই অস্ত্রাঘাতে জীবনলীলা সাঙ্গ করে।

রহিম খাঁ নামে যে এক পাঠান সর্দ্দার উক্ত শোভাসিংহের সহকারী ছিল, সেও, বঙ্গের সুবাদার ইব্রাহিম খাঁর পুত্র জবরদস্ত খাঁর হস্তে প্রাণত্যাগ করে। কৃষ্ণরামাত্মজ জগৎরাম পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি ব্যতীত কেহ বাতি দিতে ছিল না। ঐ বিদ্রোহীদের সেনারা পরিশেষে হুগলী আক্রমণ করে। চুচুড়ার ওলন্দাজ গবর্ণরের চেষ্টায় তাহারা পরাভূত হইয়া ছত্রভঙ্গ হইল। এ স্থলে বলা অবশ্যক, শোভাসিংহের বিদ্রোহ জন্যই কলিকাতা, চুচুড়া ও চন্দননগর রীতিমত সঙ্গঠিত হইবার সূত্রপাত হইয়াছিল। সুতানুটিতে ইংরেজেরা, চন্দননগরে ফরাসিরা ও চুচুড়ায় ওলন্দাজেরা বিদ্রোহীদের উন্নতিতে ত্রস্ত ও চকিত হইয়া নবাব নাজিমের নিকট এই মর্ম্মে আবেদন করে যে, আমাদের কারখানা আছে, আমরা তাহা আত্মরক্ষার উপায়-সাধক করিতে প্রার্থনা করি। নবাব, অসম্মত না হওয়ায়, তাহারা দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

৫ জগৎরাম রায়।—পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তিনি ঢাকায় পলায়ন-পরায়ণ হইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার আমলেও অধিকৃত রাজ্যের সীমা বহুদূর প্রসারিত হয়। তিনিও সম্মান-প্রকাশক ফরমান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কোন বিশ্বাসঘাতকের হস্তে ১৭০২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রাণনাশ হয়। অশেষ হেতু বশতঃ তাঁহার নাম প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। কীর্ত্তিচন্দ্র ও মিত্রসেন এই দুই পুত্র রাখিয়া তিনি গতাসু হইয়াছিলেন।

৬ কীর্ত্তিচন্দ্র।— তিনিই পিতার অগ্রজ আত্মজ ছিলেন; এ কারণ তাঁহারই অদৃষ্টে ভাগ্য-লক্ষ্মী সদয়া হইলেন। তিনি পৈত্রিক ভূমি-সম্পত্তি অর্থাৎ জমিদারির অধিকারী হইলে, চেতো, বরদা, ভুরসুট, ও মনোহরসাহী পরগণাও জমিদারির সীমাভুক্ত হইয়াছিল। কীর্ত্তিচন্দ্র, সাহসী ও দুর্দ্ধর্ষ মানব। তিনি চন্দ্রকোণা পরগণার ও ঘাটালের সন্নিকটস্থ বরদা পরগণার রাজা চন্দ্রকেতুর সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া জয়যুক্ত হইয়া তাঁহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য অধিকার করিয়া লন, ইহা অল্প বিস্ময়ের বিষয় নয়। তারকেশ্বরের মন্দিরের বলঘরার রাজার জমিদারি আক্রমণ করিয়া উহাও অধিকারভুক্ত করিয়া ফেলেন। তৎপর তিনি মুরশিদাবাদের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তিনি তত্রত্য নূতন সম্পত্তির অধিকারী ইহা স্থিরতর হইল। বিষ্ণুপুরের তৎকালীন রাজা বাদ্যযমকে আক্রমণও তাঁহার এক কীর্ত্তি। ঐ রাজা, বঙ্গদেশে বাগ্‌দী রাজগণের প্রধান। যৎকালে মারহাট্টারা বঙ্গের পশ্চিমাংশ লুটপাট করিয়া কাটোয়ায় শিবির সন্নিবেশ করিয়াছিল, তখন ঐ পরাজিত বিষ্ণুপুরের রাজা, এই কীর্ত্তিচন্দ্রের সাহায্যকারী হইলে, নবাব বিলক্ষণ আনুকূল্য লাভ করিয়াছিলেন। তিনি স্বীয় গুণে অন্যকে মন্ত্রমুগ্ধ করিতে জানিতেন। অধিক কি, দিল্লীর যবন ভূপতিও, তাঁহার প্রতি তুষ্ট হইয়া "রাজা" উপাধি দিয়াছিলেন। উহা পুরুষানুক্রমে ব্যবহৃত হইবে, ইহাও সম্রাট আজ্ঞা দিয়াছিলেন। তিনি "বীর্য্য ও যশে অর্জ্জুন, ধর্ম্ম ও যুদ্ধে স্থিরতর বলিয়া যুধিষ্ঠির, দানে * * * কর্ণ।" তাঁহাকে "আশ্রয় করিয়া কমলা অচলা" হইয়াছিলেন। তাঁহার দানের অদ্ভুত ব্যাপার বর্ণনা করিব।

তিনি খানাকুল কৃষ্ণনগর প্রদেশ, উক্ত স্থানের পরাক্রান্ত চৌধুরীদিগকে শাসন করিতে দেন। যথাসময়ে করের টাকা আদায় না হওয়ায়, এই কীর্ত্তিচন্দ্র বাহাদুর নবাবের নিকট এক জন কার্য্যনিপুণ কর্ম্মচারী এই বলিয়া প্রার্থনা করেন যে, উক্ত চৌধুরীকে শাসন করিতে হইবে। নবাবের উজির রায় ভবানন্দ, আপন ভ্রাতি ভ্রাতা কৃষ্ণচন্দ্র রায়কে মনোনীত করিয়া রাজা কীর্ত্তিচন্দ্রের নিকট পাঠান। রাজা তাঁহাকে বিষ্ণুভক্ত অথচ ধার্ম্মিক ও কর্ম্মদক্ষ বুঝিয়া খানাকুল কৃষ্ণনগর প্রদেশে পাঠাইয়া দিলেন। তথায় তিনি রাজকার্য্য সমাধা করিয়া তত্রত্য ৺ গোপীনাথজিউ দেবতাকে ৩৬০ বিঘা জমির দান পত্র স্বরূপে সনন্দ লিখিয়া দেন। সনন্দে "কৃষ্ণচন্দ্র রায়" এই সাক্ষর "কীর্ত্তিচন্দ্র রায়" সদৃশ করিয়া লেখা হয়। কিছুকাল পরে যখন ঐ ভূমির অনুসন্ধান হইল, তখন ঐ সাক্ষর দেখিয়া কীর্ত্তিচন্দ্র কহিলেন, আমার কোন মিতে (মিত্র) উহা দান করিয়াছেন। দেবোদ্দেশে দান হইয়াছে বলিয়া তিনি তাহার আর কোন প্রতিবিধানই করিলেন না। মিতের অনুসন্ধানে জানিলেন, তাঁহার নিয়োজিত শিকদার কৃষ্ণচন্দ্র রায়ই তাঁহার মিতে। কাহার ভূমি কে দান করিল! এই কৃষ্ণচন্দ্র রায় মহাশয়, এই প্রবন্ধ-লেখকের পূর্ব্ব-পুরুষ। মৎপ্রণীত বংশাবলি গ্রন্থ হইতে এই ঘটনা গ্রহণ করিলাম। ১৭৪০ খৃষ্টাব্দে তনু ত্যাগ করিলে, কীর্ত্তিচন্দ্রের নন্দন চিত্রসেন তৎপদে অভিষিক্ত হন।

৭ চিত্রসেন।—তদীয় শাসন সময়ে গুলঘাট, অর্ষা, চন্দ্রকোণা পরগণা তাঁহার অধিকারে আইসে। তিনি দিল্লীর সম্রাট কর্ত্তৃক "মহারাজ" উপাধি বিভূষিত হইয়াছিলেন। চারি পাঁচ বর্ষ মাত্র রাজ্য ভোগের পর তিনি স্বর্গস্থ হন। তাঁহার পুত্র না থাকায়, তাঁহার পিতৃব্য মিত্র সেনের পুত্র তিলক চন্দ্র, রাজপাটে সমুপবিষ্ট হইলেন।

৮ তিলক চন্দ্র।—"এরূপ প্রবাদ আছে যে, যে ব্রাহ্মণের গৃহে মহারাজ তিলকচন্দ্রের প্রদত্ত ভূমিদানের লেখ্য পত্র (সনন্দ বা ছাড়্ চিঠি) নাই, তিনি ব্রাহ্মণগণের মধ্যে গণ্য নহেন।" ইহার তাৎপর্য্য এই—সুব্রাহ্মণ হইলেই তাঁহার দান পাইত। ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে তিনি, দিল্লীশ্বর আহম্মদ শা কর্ত্তৃক ফরমান্ প্রাপ্ত হইয়া সম্মানিত হইয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পরে তিনি "মহারাজাধিরাজ" ও "পঞ্চহাজারি" উপাধিদ্বয় পাইয়াছিলেন। শেষ উপাধির অর্থ পাঁচ হাজার সৈন্যের নেতা। এই সময় মারহাট্টারা বর্দ্ধমান আক্রমণ করেন। রাজস্বের টাকা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে দিতে অসমর্থ হইয়া মহারাজ তিলকচন্দ্র পত্র দ্বারা জানাইয়াছিলেন—এখানকার দুরবস্থায় কথা কি বলিব? তিন মাস ক্রমাগত এখানে তাহারা ছিল। এখানকার অধিবাসীরা পলাইয়া গিয়াছে। ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জীবনাবসান হইলে, তেজচাঁদ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তিনি "এই বর্দ্ধমান নগরে এবং ভাগীরথী তীরে অম্বিকা নামক গ্রামে বহুল দেবালয়, অতিথিশালা, বিবিধ বিদ্যামন্দির, বিপণি, বাপী, কূপ ও তড়াগ প্রভৃতি প্রভূত কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন।"

পাঁচ বৎসরের পর জমিদারীর শাসন ভার, তাঁহার নিকট হইতে তাঁহার জননী বিষণকুমারীর করতলগত হয়। ১৭৭৬—১৭৭৯ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজমহিষী কর্ত্তৃত্ব করিতে লাগিলেন। তৎপরে তেজচন্দ্র বাহাদুর পুনরায় কর্ত্তৃত্ব ভার গ্রহণ করিলেন।

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের ১ আইনের অধীনে বর্দ্ধমান প্রদেশ আসিল। এই সময় হইতে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সূত্রপাত হইতে থাকে। তিনি স্বীকৃত হইলেন, ৪,০১৫১০৯৲ টাকা বাৎসরিক রাজস্ব-স্বরূপ দিবেন ও ১৯৩৭২১৲ টাকা পুলবন্দির নিমিত্ত দিতে সম্মত হইয়াছিলেন। সুব্যবস্থা বিরহে ঐ অঙ্গীকৃত কর দিতে না পারায়, কোম্পানির নিকট বর্দ্ধমানরাজের বিস্তর ঋণ হইয়া উঠিল। অবশেষে রাজমাতা পুত্রের নিকট বিক্রয় কোবালা লিখিয়া লইলেন। এই সময়ে ৫—১০ বর্ষব্যাপী ইজারা দেওয়া হইত। ইজারাদারেরা ঋণ শোধ করিতে না পারিলে, জেলে দেওয়া হইত। তৎপরে কতিপয় বৎসর পরেই তাঁহারা কিস্তি মত টাকা দিবার অঙ্গীকার করিলেই, কারামুক্ত হইতেন। কিন্তু বর্দ্ধমানাধিপ, অর্থ পাইতেন না। মহারাজকে রেভিনিউ বোর্ডে উপস্থিত হইবার সমন হইল। অর্থ দিতে না পারিলে তাঁহার জমিদারি বিক্রীত হইবে, এই ভয়ও দেখান হইল। মুন্সী নবকৃষ্ণ দেব, কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইলেন; কোন ফলই ফলিল না। বর্দ্ধমানের কালেক্টরের অভিপ্রায়ে খণ্ডাংশ বিক্রয় করা স্থিরীকৃত হইল। ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে বিক্রয় আরম্ভ হইল। প্রধান ক্রেতাদের নাম লেখা যাইতেছে।

(১) সিঙ্গুরের দ্বারকানাথ সিংহ।
(২) ভাস্তাড়ার ছক্কু সিংহ।
(৩) জনাএর মুখোপাধ্যায়গণ।
(৪) তেলিনী পাড়ার বন্দ্যগণ।

এইরূপে বর্দ্ধমান ও হুগলী প্রদেশের সম্ভ্রান্ত ধনবান পরিবারের সূচনা হইল। তিন মাস অন্তর ঐ প্রকার বিক্রয় চলিতে লাগিল। তখন তেজচাঁদ, বেনামি করিয়া কতক কতক ক্রয় করিতে লাগিলেন। এই সময় রাজজননী মানবলীলা সংবরণ করিলেন। তেজচাঁদ

বাহাদুর, তখন স্থায়িরূপে পত্তনি দিতে লাগিলেন।

রাজপরিবার বদান্যতার নিমিত্ত চির-বিখ্যাত। পূজা, শ্রাদ্ধ, অন্নপ্রাশন, বিবাহ ইত্যাদি উপলক্ষে দান, নৃত্যগীতবাদ্য প্রভৃতি কতকত অর্থ ব্যয়িত হইত, তাহার কি সীমা আছে? তেজচাঁদ বাহাদুরই বর্দ্ধমান হইতে কাল্‌না পর্য্যন্ত বিস্তৃত পঞ্চদশ ক্রোশ পথ প্রস্তুত করিতে অজস্র অর্থ ব্যয় করেন। মগরায় সেতু নির্ম্মাণে যে প্রচুর মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল, তাহা কে না বুঝিতে পারেন? বর্দ্ধমানের শ্রীবৃদ্ধির সম্পাদন-কল্পে যাহা যাহা করা আবশ্যক, তিনি তাহা করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম প্রতাপচাঁদ। তাঁহার বিশেষ বিবরণ তৃতীয় প্রস্তাবে লিখিব।*

পাপের প্রতিফল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।†

অনুসন্ধান আরম্ভ।

কোতোয়ালীর একটী কক্ষে প্রধান কোতোয়াল বসিয়া আছে। তার মুখ চিন্তা বিষণ্ণ! হইবারই কথা—নগরের মধ্যে রাজপথের উপর হত্যাকাণ্ড! অপরাধী ধরা না পড়িলে লজ্জার সীমা নাই—বিষম অপদস্থ হইতে হইবে—হয়ত বর্ত্তমান কর্ম্ম হইতে স্থানান্তরিত হইতে হইবে। এই সকল ভাবিতে ভাবিতে তিনি অস্ফুট স্বরে বলিলেন,—"হায় পরের অধীনতা কি ভয়ানক! পরের মনস্তুষ্টি-সাধন কি কষ্টকর ব্যাপার! বর্ত্তমান বিষয়ে আমার অপরাধ কিছুই নাই—অথচ আমিই সকলের চেয়ে চিন্তিত! যেন এই ব্যাপারের সঙ্গে আমার ভাগ্যচক্র আবদ্ধ!" এই পর্য্যন্ত বলিয়াছেন, এমন সময়ে প্রকোষ্ঠের বাহিরে পদশব্দ শ্রুত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরেই প্রকোষ্ঠের দ্বারদেশে পূর্ব্ব পরিচ্ছেদের পরিচিত মূর্ত্তি!

তাঁহাকে দেখিয়া প্রধান কোতোয়াল বলিলেন,—"তবে বীর, কি ঠিক করলে?"

বীর বলিলেন,—"ঠিক আর কি করবো? প্রাণপণে অনুসন্ধান কর্‌তে হ'বে, তার পর যা'হয় হবে।"

প্রধান কোতোয়াল বলিলেন,—"দেখ বীর! বাল্যকাল হইতে তোমায় আমায় বন্ধুতা! এই সময় যথার্থ বন্ধুর কাজ কর!"

বীর বলিলেন,—"ভাই বলেন্দ্র, কার্য্যক্ষেত্রে তুমি আমার প্রভু হলেও আমরা বাল্য-বন্ধু, সে বন্ধুভাব আমি কোন দিন বিস্মৃত হই-নি, তুমিও বোধ হয় হও নাই। সুতরাং তোমার বিপদে আমার বিপদ—তুমি নিশ্চয় জেন। এই হত্যাকারীকে আমি নিশ্চয়ই ধর্‌বো তবে আমার নাম বীরেন্দ্র সিংহ।"

বীরেন্দ্র সিংহের সদর্প বাক্য শ্রবণ করিয়া বলেন্দ্র সিংহ বলিলেন,—"তোমার আশ্বাস বাক্যে তুষ্ট হইলাম। কিন্তু, বল দেখি ভাই, অনুসন্ধানের কি সূত্র পেয়েছ?"

বীরেন্দ্র।—আপাততঃ বিশেষ কোন সূত্র পাই নাই বটে, কিন্তু শীঘ্রই পাব—এমন আশা আছে। এখন চল দেখি, মৃত-দেহের বস্ত্রাদি পরীক্ষা করি গিয়ে। আর এক কথা, মৃত ব্যক্তির কোন আত্মীয় এসেছিল কি?

বলেন্দ্র।—এখনো কেউ আসে নাই। আমি প্রাতেই কয়েক জন ঘোষককে এই মর্ম্মে ঘোষণা দিতে প্রেরণ করেছি যে,—"কাল রাত্রে কোন ভদ্র-সন্তান নগর-মধ্যে কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে। কাহারও পরিবারস্থ কোন পুরুষ নিরূদ্দিষ্ট থাকিলে, কোতোয়ালীতে আসিয়া দেখিয়া যাইবেক—মৃত ব্যক্তি তাহাদের আত্মীয় কি না? তৃতীয় প্রহরের পূর্ব্বে

* Calcutta Review, Statistical Account of Bengal, প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালা ইতিহাস বর্দ্ধমান রাজবাটীর মহাভারত; মৎপ্রণীত বংশাবলী হইতে এই প্রবন্ধ সংগৃহীত হইল।

† এই বর্ষের ১২ সংখ্যার প্রকাশিত অংশের পর।

কেহ উপস্থিত না হইলে, ঐ দেহ সরকারী ব্যয়ে দগ্ধ করা হইবে।"

বীরেন্দ্র।—ভালই হয়েছে; এখন চল, মৃতদেহ দেখিগে।

"চল" বলিয়া, বলেন্দ্র তাহাকে লইয়া প্রকোষ্ঠান্তরে গমন করিলেন। ঠিক এই সময়ে একজন বৃদ্ধ কর্ম্মচারীও সেই গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন।

গৃহ মধ্যে মৃত-দেহটি একখানি আস্তরণোপরে পতিত, উপরে একখানি বস্ত্র আবৃত। বীরেন্দ্র সিংহ জনৈক প্রহরীকে আবরণ অপসারিত করিতে বলিলেন। বস্ত্র উত্তোলিত হইলে দেখিলেন, মৃত ব্যক্তির মুখ নীলবর্ণ। শরীরে কোন আঘাতের চিহ্নই নাই। দেখিলে বিষবংশ সম্ভূত বলিয়াই বোধ হয়। তাঁহারা মৃত-দেহ দেখিতেছেন, এমন সময়ে একজন প্রহরী আসিয়া বলিল,—"এক ব্যক্তি মৃত-দেহ দেখ্‌তে এসেছে।"

কোতোয়ালের আদেশে সেই ব্যক্তি আগমন-পূর্ব্বক মৃত-দেহ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বলিল,—"না, এ নয়!"

বীরেন্দ্র সিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আপনি যাঁর অনুসন্ধান কর্‌ছেন, সে আপনার কে?"

আগন্তুক। সে আমার কেউ নয়। কয়েক মাস হলো, সে আমার বাড়ীতে বাসা ক'রে রয়েছে। কিন্তু পরশু রাত্রি হ'তে তার আর কোন উদ্দেশ নাই। তার কাছে আমার আট দশ টাকা পাওনা রয়েছে।

বীরেন্দ্র।—এর পূর্ব্বে সে কখন্ বাসায় অনুপস্থিত থাক্‌তো?

আগন্তুক।—এর পূর্ব্বে সে কোন দিন রাত্রে অনুপস্থিত থাক্‌তো না। তবে কোন কোন দিন রাত্রি দুই প্রহর উত্তীর্ণ করেও বাসায় আস্‌তো।

বীরেন্দ্র।—সেকি স্বতন্ত্র পাক করে খেতো?

আগন্তুক।—না, আমার বাটীতেই খেতো। রন্ধন হয়ে গেলে তার খাবার দ্রব্য এনে তার ঘরে রেখে দিতাম। সে যখন আস্‌তো, খেতো।

বীরেন্দ্র।—আপনার বাড়ীতে তার জিনিষপত্র কি আছে?

আগন্তুক।—একটা বাক্স, আর বিছানা।

বীরেন্দ্র।—সে কি কাজ কর্‌তো?

আগন্তুক।—তা জানিনে। তবে প্রতিদিন প্রাতেই বাহির হয়ে যেতো; আর দুই প্রহরের সময় এসে আহারাদি করে ক্ষণেক বিশ্রাম কর্‌তো। তার পর, আবার বাহির হতো, রাত্রি এক প্রহরের পূর্ব্বে ফির্‌তো না। কোন কোন দিন বা দুই প্রহর রাত্রিও উত্তীর্ণ হয়ে যেতো।

বীরেন্দ্র।—আপনার টাকা দিত?

আগন্তুক।—নিয়মিত নয়। তবে একেবারে দিত না যে, তাও নয়। এই কয় মাসে সে ত্রিশ টাকা দিয়েছে; আর আট দশ টাকা আন্দাজ বাকী আছে।

বীরেন্দ্র।—তার নাম কি?

আগন্তুক।—বলদেব ত্রিবেদী।

বীরেন্দ্র।—কোথায় নিবাস?

আগন্তুক।—কান্যকুব্জ।

বীরেন্দ্র।—জাতি অবশ্য ব্রাহ্মণ। আপনিও ব্রাহ্মণ। আপনার নাম?

আগন্তুক।—বামদেব উপাধ্যায়।

শ্রবণ মাত্র বীরেন্দ্র ও বলেন্দ্র ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া বলিলেন,—"আপনি তবে আমাদের ভূতপূর্ব্ব রাজমন্ত্রীর পুত্র।"

বামদেব। হাঁ! পিতার মৃত্যুর পর রাজধানী ত্যাগ করে এখানে এসে বাস কর্‌চি।

বীরেন্দ্র। আপনি অনুগ্রহ করে একটী কাজ কর্‌বেন। আপনার বাড়ীতে যে ব্রাহ্মণটী থাকেন, তিনি যদি আবার ফিরে আসেন, তা হলে আমাদিগকে সম্বাদ দিবেন। আপনার টাকার জন্য আমরা তার অনুসন্ধান কর্‌বো—যতদিন না আপনি নিষেধ করে পাঠাবেন ততদিন ক্ষান্ত হব না। তার আকৃতি কিরূপ?

বামদেব। গৌরবর্ণ, একহারা, অল্প অল্প গোঁফ আছে, প্রায়ই সাদা পায়জামা আর গোলাপী চাপকান পরে থাকে। বয়স আন্দাজ ২৫।২৬ বৎসর। তবে, বাবু, এখন আসি; আমার টাকাটার যায় কিনারা হয়, করো।

এই বলিয়া ব্রাহ্মণ চলিয়া গেল।

বীরেন্দ্র, বলেন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া, বলিলেন,—"হয় ত এই বলদেব ত্রিবেদীই হত্যাকারী। হয়ত তার নাম বলদেবই নয়। যদি বল, পরশু হতে সে নিরুদ্দিষ্ট। বোধ হয়, সে পরশু হতেই হত্যা করবার যোগাড়ে ছিল। কাল কাজ শেষ করেই পালিয়েছে।"

বলেন্দ্র। হতে পারে।

উভয়ে সেই গৃহে বসিয়া এইরূপ নানা তর্ক করিতেছেন, বৃদ্ধ কর্ম্মচারীটীও একপার্শ্বে বসিয়া আছেন; এমন সময়ে একজন প্রহরী আসিয়া বলিল,—"একজন বৃদ্ধ মৃত-দেহটী দেখ্‌তে এসেছে।" কোতোয়াল তাহাকে আনিতে বলিলেন।

কিয়ৎক্ষণের মধ্যে বৃদ্ধ উপস্থিত হইল, এবং মৃত-দেহটী দেখিয়াই চেঁচাইয়া উঠিল,—"হায়! কে আমার এ সর্ব্বনাশ করলে?"

বীরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহাশয়, এ ব্যক্তি আপনার কে?"

বৃদ্ধ।—কেউ নয় অথচ সকলই। বাবু, বল্‌বো কি, এই ছেলেটির কৃপাতেই আমি এই বৃদ্ধ বয়সে বড়ই সচ্ছন্দে ছিলাম। প্রায় দুই বৎসর হ'লো, ছেলেটি আমার বাড়ীতে বাসা ক'রে রয়েছে; ছেলেটি, বড়-মানুষের ছেলে বোধ হয়। দুইজন চাকর, এক জন পাচক-ব্রাহ্মণ সঙ্গে আছে। আমি বুড়ো-মানুষ—এ-সংসারে 'আমার' বল্‌তে কেউ নাই। এই ছেলেটিকে পেয়ে, বড়ই সুখে ছিলাম। ছেলেটি আমায় খুড়ো-মশাই বলে ডাক্‌তো। ছেলেটি সব দিকেই ভাল ছিল, কেবল দোষের মধ্যে, একটু একটু মদ খেতো। তা পৃথিবীতে নিদ্দুষী মানুষই বা কে? এ ছেলে মানুষ, তায় বে-থা হয়-নি, তায় বিদেশে মাথার উপর শাসন কর্‌বার কেউ নাই! আমি এক একদিন বক্‌তাম; তা তাতে রাগ কর্‌তো না। বল্‌তো,—খুড়া-মশাই, আস্‌চে ফাল্গুন মাসে আমার বিয়ে হয়ে গেলে, আর মদ ছোঁবও না। আহা বাছা, তোর কপালে কি শেষে এই বয়েসে মরণ লেখা ছিল!

বৃদ্ধের চক্ষে জল দেখা গেল।

বীরেন্দ্র।—মহাশয়, এর নাম কি?

বৃদ্ধ।—ভূপলাল।

বীরেন্দ্র।—জাতি?

বৃদ্ধ।—ক্ষত্রিয়।

বীরেন্দ্র।—নিবাস কোথায়?

বৃদ্ধ।—কান্যকুব্জে।

বীরেন্দ্র।—এর বিবাহের কথা কোথায় হয়েছিল?

বৃদ্ধ।—হরদেব সিংহের কন্যার সঙ্গে।

বীরেন্দ্র।—আপনার বাড়ী কোথায়?

বৃদ্ধ।—দক্ষিণ ফটকের কাছে গিয়ে যাকে দুর্গালাল সিংহের বাড়ী জিজ্ঞাসা কর্‌বে, সেই দেখিয়ে দেবে।

বীরেন্দ্র।—আপনারই নাম তবে দুর্গালাল সিংহ?

বৃদ্ধ।—হাঁ।

বলা বাহুল্য, এই সকল কথোপকথন বীরেন্দ্র লিপীবদ্ধ করিয়া লইলেন; এবং বলেন্দ্রের নিকট বিদায় লইয়া নিজ আবাসে প্রস্থান করিলেন। বলেন্দ্র, বৃদ্ধ দুর্গালালকে ভূপলালের দেহের সৎকারের জন্য লোকজন সংগ্রহ করিতে বলিলেন। বৃদ্ধও বিদায় হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

হরদেব সিংহ।

হরদেব সিংহ বীরনগরের একজন প্রসিদ্ধ ধনী। বীরনগরের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সক-

লেই তাঁহাকে চিনে। তিনি দেখিতে মধ্যম আকার; বয়স পঞ্চাশ উত্তীর্ণ হইয়াছে। কিন্তু দেখিতে তাঁহাকে তত অধিক বয়স্ক বলিয়া বোধ হয় না। শরীর বেশ সতেজ। সংসারে একমাত্র কন্যা বই তাহার অন্য বন্ধন নাই।

হরদেব বহির্বাটীস্থ একটী বৃহৎ প্রকোষ্ঠে উপবিষ্ট আছেন; অপরাহ্ণে ভ্রমণার্থ বহির্গত হইবার জন্য সজ্জিত হইয়াছেন। অঙ্গে ঈষৎ হরিদ্রাভ পাতলা চাপকান। নিকটে একজন বৃদ্ধ উপবিষ্ট আছেন। বৃদ্ধটি আমাদের পূর্ব্ব-পরিচিত। পূর্ব্বে কোতোয়ালীতে তাঁহার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইয়াছে; কিন্তু তাঁহার প্রতি আমরা সে সময় লক্ষ্য করি নাই। বীরেন্দ্র, বলেন্দ্র, রামদেব, দুর্গালাল প্রভৃতিকে লইয়াই আমরা ব্যস্ত ছিলাম। এই বৃদ্ধ যে তাঁহাদের সমস্ত কথোপকথন লিপিবদ্ধ করিতেছিলেন, তাহা কেহই লক্ষ্য করে নাই। এই বৃদ্ধও বীরেন্দ্রের সমপদস্থ। কিন্তু ইনি কোন দিন কোন কর্ম্ম করিয়া যশস্বী হইতে পারেন নাই। এই হত্যা-সম্বন্ধে অনুসন্ধান জন্য এক্ষণে হরদেবের গৃহে উপস্থিত হইয়াছেন।

হরদেব হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"শোভনলাল! বহু দিনের পরে তোমায় আমার সাক্ষাৎ হলো! সেই বাল্য-কালের কথা মনে পড়ে কি?"

বৃদ্ধ।—সকলি মনে পড়ে। তবে অন্নের চিন্তায় সে সকল কথা ভাব্‌বার আর অবসর নাই। আর সেই অন্নের চিন্তাতেই—আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করাও ঘটে না।

হরদেব।—না ভাই, তোমার যে কালের কথা কিছুই মনে নাই! থাকলে, তুমি সেকালের মত আমায় তুমি, 'তোমার' বলেই সম্বোধন কর্‌তে।

বৃদ্ধ।—আপনাতে আমাতে এখন অনেক তফাৎ। আপনি রাজ-রাজেশ্বর, আর আমি ভিখারী।

হরদেব।—ও কথা বলো না। তুমি যে শোভনলাল, সেই শোভনলাল; আমিও যে হরদেব, সেই হরদেব। ভাই, তুমি এক কাজ কর—চাকরী ছেড়ে ব্যবসা আরম্ভ কর।

বৃদ্ধ।—আর এ বৃদ্ধ বয়সে ব্যবসা করে কি হবে? আর ব্যবসার মূলধনই বা কই? তা' সে কথা যা'ক। আমি যে কার্য্যের জন্য এসেছি, বলি, শুনুন।

হরদেব ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন,—"বলুন মহাশয়, আপনার কি বক্তব্য?"

বৃদ্ধ।—আপনি আমায় ওরূপ সম্বোধন কর্‌লে কুণ্ঠিত হই।

হরদেব।—সেটা উভয়তঃ।

এমন সময়, একজন দ্বারপাল আসিয়া বলিল,—"একজন ব্যক্তি আপনার সহিত সাক্ষাৎ কর্‌তে এসেছেন।"

হরদেব। আচ্ছা, এখানেই নিয়ে এস।

দ্বার পাল চলিয়া গেল।

হরদেব।—তবে শোভনলাল, বক্তব্য কি, বল?

শোভন।—এখন থাক।

এই সময়ে বীরেন্দ্র গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া হরদেবের পাদ-গ্রহণ করিল।

হরদেব।—তবে বীরেন্দ্র সম্বাদ কি?

বীরেন্দ্র।—কাল রাত্রে ভূপলাল নামে একটি লোক খুন হয়েছে। ঐ ভূপলাল কে? আপনি জানেন কি?

হরদেবের মুখ ঈষৎ বিবর্ণ হইল। তিনি বলিলেন,—"ভূপলাল খুন হয়েছে? কে তাকে খুন করেছে, কিছু সন্ধান পেয়েছো?"

বীরেন্দ্র।—এখনো কিছুই ঠিক হয় নাই। আপাততঃ—সে কে, কোথা হতে এখানে এসেছিল—এই সম্বন্ধে আপনি যা কিছু জানেন আপনার নিকট জান্‌তে এলাম। শুন্‌লাম, আপনি তার আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবরণ জানেন।

হরদেব।—তার আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিবরণ না জানি, তবে যত দূর জানি, তা বল্‌তে পারি। তার যথার্থ নাম ভূপলাল নয়। তার নাম বিক্রম-শক্তি। সে শৈশবে মগধরাজ বল্লভশক্তিদ্বারা পালিত হয়েছিল। শেষে যখন রাজগুরুর সাহায্যে—মগধরাজপুত্র চন্দ্র-প্রভ রাজা হন, তখন সে কিছুদিন কান্যকুব্জে বাস করে। শেষে, আজ দুই বৎসর হলো, এইখানে এসে উপস্থিত হয়েছিল। তার পিতা মাতা কে, কিছুই জানি না। তবে যখন মহারাজ বল্লভশক্তি তাকে পালন কর্‌তেন, তখন আভিজাত্য নিতান্ত মন্দ হবে না।

বীরেন্দ্র। আপনি এরূপ অজ্ঞাত-কুলশীল ব্যক্তিকে আপনার একমাত্র কন্যা দানে সম্মত হয়েছিলেন কেন?

হরদেবের মুখ আবার বিবর্ণ হইল। কিন্তু তিনি শীঘ্রই সে ভাব গোপন করিয়া বলিলেন,—"সে আমার ইচ্ছা! আমার কন্যা আমি যাকে তাকে বিবাহ দিতে পারি। সে সম্বন্ধে আমার জ্ঞাতিগণও কোন কথা জিজ্ঞাসা করতে পারেন না। আর তোমাকে কেই বা বল্‌লেন যে আমি তার সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিবার জন্য স্থির করেছিলাম।"

বীরেন্দ্র।—ক্ষমা করুন! ভাল তার চরিত্র কিরূপ ছিল?

হরদেব।—মৃতের চরিত্র সমালোচনায় ফল কি?

বীরেন্দ্র।—হত্যাকারীর অনুসন্ধানে কিছু সাহায্য হ'তে পারে।

হরদেব।—মনে কর, যখন আমি তাকে কন্যা দানে প্রস্তুত ছিলাম, বল বো তখন তার চরিত্র ভাল বলে জ্ঞান থাকাই সম্ভব।

বীরেন্দ্র।—তবে আমি এখন আসি।

হরদেব।—যেতে পার।

বীরেন্দ্র চলিয়া গেল।

হরদেব, শোভনলালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তবে শোভন? "তোমার জিজ্ঞাস্য কি?"

শোভন।—আমারও জিজ্ঞাস্য ঐ। তবে বীরেন্দ্র যে সকল প্রশ্ন করেছে, তার উপর আমার আর একটি প্রশ্ন আছে। আপনি কি কা'কেও হত্যাকারী বলে সন্দেহ করেন। হরদেব কি না কি! ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া, বলিলেন,—না আমি কাকেও সন্দেহ কর্‌তে পারি না। কন্তু তুমি যদি আমার সঙ্গে পূর্ব্বের ন্যায় বন্ধুভাবে কথা-বার্ত্তা কও তা'হলে আমি কান্যকুব্জ ও মগধ হ'তে তোমায় সম্বাদ আনিয়া দিতে পারি যে, কে কে ভূপলালের শত্রু ছিল।

শোভনলাল।—আপনার সঙ্গে বন্ধুতা, এখন আর আমার শোভা পায় না। আপনি সাহায্য কর্‌লে, আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকবো, সাহায্য না করেন, আমার কার্য্যই এই—আমি নিজেই—সে কার্য্য সম্পন্ন করবো।

হরদেব। ভাল, চলো একটু বেড়াইগে; তারপর,—বোঝা যাবে, বন্ধুভাব আবার হয় কি না?

এই বলিয়া, শোভনলালের হস্ত ধরিয়া বাটী হইতে বাহির হইলেন।

মণিপুর-যাত্রীর দিনলিপি।

(৪)

১২ই এপ্রিল প্রত্যূষেই আমাদিগকে পুনরায় যাত্রা করিতে হইল। এ দিন রবিবার—সাহেব-দিগের বিশ্রাম ও উপাসনার দিন; কিন্তু এই মহদ্ব্যাপারে আর বিশ্রাম নাই, অন্তরে উপাস্য দেবতাকে স্মরণ করিয়া সকলেই বহির্গত হইলেন, এবং, যত দিন গন্তব্য-স্থানে পৌঁছিতে না পারা যায়, এইরূপ অবিশ্রান্ত ও অবিচলিত ভাবে যাওয়াই স্থির করিলেন। পূর্ব্ব দিবস বৃষ্টি-ধারায় যেরূপ বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল, আজ আর সেইরূপ কোন গ্রহবৈগুণ্যের অধীন হইতে হইল না, বরং প্রাতঃসমীরণের সুস্নিগ্ধতা দেহ-মন পুলকিত করিয়া তুলিল। সুখের পর দুঃখ, আর দুঃখের পর সুখ—বিধাতার নিয়মচক্রের এই যে পর্য্যায়গত আবর্ত্তন, ইহা না থাকিলে সৃষ্টি চলিত না; পূর্ব্ব দিনের অবসাদের পর আজিকার এই প্রফুল্লতার উদ্রেক না হইলে আমরাও, বোধ হয়, অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারিতাম না। এখানকার পান্থনিবাস সকলের পরস্পর ব্যবধান ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; প্রাতে ৭ ঘটিকার সময় যাত্রা করিয়া অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকার সময় আমাদিগের পর্য্যটন সমাপ্ত হইল—তখন আমরা পৌঁছিলাম "বড় পাথারে।" স্থানটীর নাম শুনিয়া এই পথশ্রান্তির উপরেও আমার একবার প্রত্নতত্ত্ব উদ্ঘাটন করিতে বাসনা হইল;—বিজন অরণ্যসমাকীর্ণ দুস্তর পথ সম্মুখে প্রসারিত বলিয়াই কি পূর্ব্বতন পথি-কেরা ইহাকে "বড় পাথার" আখ্যা দিয়া গিয়া-ছেন? এই সময় আমার মনে নটপ্রবর গিরিশ-চন্দ্রের সেই মধুর সঙ্গীতটী উদিত হইল, যথা-সাধ্য প্রাণ খুলিয়া আমি একবার গাহিলাম—

"(যখন) আস্‌বে তুফান, ভাস'য়ে নে যা'বে।
এ যে অকুল পাথার, নাই (ক) সাঁতার,
কুল-কিনারা আর কি পাবে?
আগে ধীর তরল বয়,
তা'তে হেলে দুলে খেলে আশা-ভয়,
হয় কি না হয়, কতই হয় উদয়;—
ক্রমে জোর ব'য়ে যায়,
দু'কুল ভাসায়,
টানের টানে কে রবে?"

কোন ক্রমে এস্থানে রাত্রিযাপন করিয়া পরদিন আরও প্রত্যূষে, পাঁচটার সময়, আমরা পুনরায় যাত্রা করিলাম। আজ পর্য্যটনের অবসান হইল—অপরাহ্ণ ৫ই ঘটিকার সময়। এ পান্থনিবাসটীর নাম "বোকাজান"। এতদিন নিজের দৈহিক ও মানসিক সম্বাদ সংক্ষেপে পিতৃ-মাতৃ গোচরে পত্রের দ্বারা পাঠাইতে-

ছিলাম, আজ তাহাও বন্ধ হইল; অনতিবিলম্বে একেবারেই বন্ধ হইবে ভাবিয়া তজ্জন্য মনো-বেদনা প্রশমিত করিলাম। ক্রমশঃ আমরা ভীষণ হইতে ভীষণতর বনের অভ্যন্তর পথে প্রবেশ করিতে লাগিলাম;—১৪ই এপ্রিল প্রাতে, ছয় ঘটিকার সময়, "বোকাজান" পরি-ত্যাগের পরেই 'নন্তর বন' আমাদিগের নয়ন-গোচর হইল। আসামের সর্ব্বত্রেই ন্যূনাধিক জঙ্গল ও বনজন্তু সমাকীর্ণ, কিন্তু এই "নন্তর বন" অপেক্ষা ভীষণ ও বিপদশঙ্কুল অরণ্যানী, বোধ হয়, আর কোথাও নাই;—

"এ বন মাঝারে যে দিকে চাই,
সে দিকে তোমারে দেখিতে পাই!"—

কেবল বন—নিবিড়, নিস্তব্ধ, নিষ্কম্প—মধ্যে কেবল গো-শকট-গমনোপযোগী ক্ষুদ্র বর্ত্ম নিজ ক্ষীণ-তনু রেখাবৎ বিস্তীর্ণ করিয়া রহি-য়াছে, আর বৃক্ষপত্রের মর্ম্মর-ধ্বনি ক্বচিৎ নিস্ত-ব্ধতা ভঙ্গ করিয়া ভয়-বিহ্বল পথিকের মনে বনজন্তু সমাগমের ভীতি সমধিক বর্দ্ধিত করি-তেছে। একাকী এপথে বিচরণ করা অসাধ্য *; আমাদিগের সঙ্গে লোক-লস্কর, সাজ-সরঞ্জম বিস্তর, সুতরাং কোন বিপদের সম্মুখীন হইতে হয় নাই, তথাপি যতক্ষণ আমরা সেই বিজন অরণ্য-পথে থাকিলাম, প্রতিক্ষণেই বিপদের আতঙ্ক প্রাণকে ব্যাকুলিত করিয়া রাখিল,—সেই ব্যাকুলতার আবেগে মৃত মহাত্মা রাম মোহন রায়ের সুরে সুর মিলাইয়া নিরবে কাঁদিলাম—

"নাথ হে! কোথায় আনিলে—
আনিয়ে নিবিড় বনে, (বুঝি) প্রাণে বধিলে।"

* সম্প্রতি একজন সাহেব অনুচরবর্গ পশ্চাতে ফেলিয়া একাকী এই পথে আসিতেছিলেন, শুনিতে পাই, তাঁহার না-কি আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। মৃগয়ানুরোধে বনে প্রবেশ করিয়া আর বাহির হইতে পারেন নাই, কিম্বা পথেই হিংস্র জন্তুর করাল দংষ্ট্রা-ন্তর্গত হইয়াছিলেন—বলা দুরূহ।

যাহাহউক, ক্রমশঃ বন অতিক্রম করিয়া, দশটার সময় আমরা ভিমাপুর পৌঁছিলাম এবং তথায় যথাসম্ভব কিঞ্চিৎ আহারাদি সমাপনপূর্ব্বক পুনরায় মধ্যাহ্ন কালে যাত্রা করিয়া বেলা ৩॥ ঘটিকার সময় নিচুগারদে গেলাম। এই স্থানে আমাদিগের পর্য্যটনের দ্বিতীয় অঙ্ক পরিসমাপ্ত হইল। শীকারিঘাটে পোতবক্ষ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিলাম, এখানে পৌঁছিয়া হস্তি-পৃষ্ঠ হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম। অতঃপর পদব্রজে যাওয়াই বিধি;—নাগা-পাহাড়ের নিম্নতলে এই "নিচুগারদ" অবস্থিত, এস্থান হইতে ক্রমশঃ ঊর্দ্ধে উঠিতে হয়,—শকট গমনোপযোগী 'সড়ক' না থাকায় পদব্রজে যাওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই।* সাহেবেরা অবশ্য পার্ব্বতীয়-অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক ক্লেশের কতকটা লাঘব সাধন করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা সকলের ভাগ্যে সম্ভবে না এবং তদ্দ্বারা যাইতেও হয় সদা সশঙ্কিত ভাবে—অশ্বের কিঞ্চিৎ পদস্খলন হইলেই আরোহীর প্রাণান্ত পর্য্যন্ত সম্ভাবনা। ভিমাপুর এবং নিচুগারদে পূর্ত্ত-বিভাগের কয়েক জন কর্ম্মচারী আছেন, আর যেখানে একটু কর্ম্মস্থল—বিশেষতঃ কেরাণী-গিরির কির্ত্তিমন্দির—নিষ্কর্ম্মা বাঙ্গালীর গতি-বিধি সেইখানেই, অতএব সেই দূর নির্জ্জন প্রদেশে গিয়াও স্বদেশীয় লোকের মুখাবলোকন করিতে পাইলাম। বাঙ্গালী বিদেশীয় রাজার চক্ষে বড়ই ঘৃণিত পদার্থ বটে,—বাঙ্গালীকে নিস্তেজ, অকর্ম্মণ্য, কাপুরুষ আখ্যা দিতেও কেহ বড় ত্রুটী করেন না,—কিন্তু কেরাণীর কলম পরিচালনে বাঙ্গালীর সমকক্ষ, বোধ হয় কেহই নাই; কেবল রাজা বা রাজপারিষদ লইয়া সমগ্র রাজকার্য্য চলে না,—অধম কেরাণীকুল এই সেই রাজকার্য্য পরিচালনের অন্যতম অঙ্গ। কেরাণীর কর্ত্তব্যানুরোধে বাঙ্গালী রণক্ষেত্রে যাইতেও পশ্চাৎপদ নহে; ব্রহ্ম-সমরে, মিশর-যুদ্ধে বাঙ্গালী ব্যতিরেকে চলে নাই, আর এই মণিপুর হাঙ্গামাতেও বাঙ্গালী একবারে নির্লিপ্ত নহে—এই অধম লেখকই তাহার সম্যক নিদর্শন। যাহাহউক, বাঙ্গালীর সহিত আলাপ-পরিচয়ে এই বিষম পর্য্যটন-ক্লেশও কতকটা প্রশমিত হইল। সে রাত্রি সেই স্থানেই যাপন করিয়া, পরদিবস প্রাতে নয়টার মধ্যে কিঞ্চিৎ আহারাদি পূর্ব্বক আমরা নাগাপাহাড়ে উঠিতে আরম্ভ করিলাম। ইতিপূর্ব্বে ত্রয়োদশ সংখ্যক বঙ্গ-পদাতিক সৈন্য (13th Bengal Infantry) নিচুগারদে পৌঁছিয়া আমাদিগের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল, আজ তাহারাও আমাদিগের সহিত গন্তব্য-পথে অগ্রসর হইতে লাগিল।

নিচুগারদ হইতে নাগাপাহাড়ের সরকারী কার্য্যক্ষেত্র—কহিমা—ক্রোশ মাত্র; কিন্তু পথের উপলময়তা প্রযুক্ত এই টুকু যাইতে, সাধারণতঃ, ৩।৪ দিবস লাগে। আমাদিগের প্রয়োজনের, এবং তজ্জনিত আয়োজনের, পরাকাষ্ঠা সত্ত্বেও, দুই দিনের কমে আমরা পৌঁছিতে পারিলাম না;—১৫ই প্রাতে যাত্রা করিয়া ১৬ই মধ্যাহ্নে আমরা কোহিমা পৌঁছিলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কোহিমা নাগা-পাহাড়ের রাজধানী; ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের শেষ নাগা-যুদ্ধের পর এই পার্ব্বত্য প্রদেশে প্রবল-প্রতাপ ইংরেজ-রাজের জয়-পতাকা প্রোথিত হয়, সেই অবধি নাগার উৎপীড়নও অনেক পরিমাণে প্রশমিত হইয়াছে। নাগার উপদ্রবে ইংরেজ-রাজকে অনেক দিন পর্য্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইতে,—অধিক কি, তাহাদিগের হস্তে অনেক ধন-প্রাণও বিসর্জ্জন

* মণিপুর-যাত্রায় গমনাগমনের বিশেষ অসুবিধা ও অর্থনাশ দেখিয়া সরকার বাহাদুর সম্প্রতি এই নিচুগারদ হইতে মণিপুর পর্য্যন্ত শকট-গমনোপযোগী সুন্দর পথ প্রস্তুত করিতে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। শুনা যায়, কাল-ক্রমে এই পথ প্রসারিত হইয়া ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত যাইবে, তবে কতদিনে তাহা কার্য্যে পরিণত হইবে তাহা আমরা পরিজ্ঞাত নহি।

দিতে,—হইয়াছিল; শুনিতে পাই, এই নাগা-যুদ্ধে সহায়তা-সাধন করার জন্যই মণিপুর-রাজ্যের সহিত ইংরেজ-রাজের সখ্য সংস্থাপিত হয়। কাল-বিপর্য্যয়ে সেই মণিপুরই মিত্রভাব পরিহার করিয়া আজ ইংরেজের পরম-শত্রু হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। নাগা কিরূপ প্রকৃতির লোক—জানিতে, পাঠকের কৌতূহল প্রবল হইতে পারে; অতএব, আমাদিগের অত্যল্প-কাল অবস্থিতির মধ্যে তৎসম্বন্ধে যাহা কিছু জানিতে পারিয়াছি, এস্থলে তাহাও লিপি-বদ্ধ করিলাম।

কিম্বদন্তী আছে, সংস্কৃত 'নগ্ন' শব্দ নাগার নামোৎপত্তি ঘটিয়াছে। বস্তুতঃ, নাগারা সাধারণতঃ এরূপ দিগম্বর বেশে বিচরণ করে যে, এই নামকরণের তত্ত্বোদ্ঘাটন বড় বিচিত্র বোধ হয় না। ইংরেজ-সীমার সরকারী সড়কে গতায়াতকারী নাগারাই কিঞ্চিৎ কৌপীন ব্যবহার করিয়া থাকে, অন্যত্র বৃক্ষপত্রেই তাহাদিগের লজ্জা নিবারণ করে। শাঁখ, কড়ি, পুঁথি প্রভৃতি পদার্থ নির্ম্মিত হারে তাহাদিগের শোভা বর্দ্ধন করে, কর্ণরন্ধ্রে কঠিন প্রস্তর বা কাচখণ্ড অলঙ্কার-রূপে ধারণ করা হয় এবং জানুর নিম্ন-দেশে ও বাহুর উপরিভাগে বেত্রখণ্ড সজোরে বদ্ধ করিয়া থাকে। বড়শা, বন্দুক, বল্লম, ধনুর্ব্বাণ, প্রভৃতি সুতীক্ষ্ণ অস্ত্রব্যতিরেকে ইহারা পথ চলে না; এই সশস্ত্র সহজ মূর্ত্তি দর্শনেই দারুণ শঙ্কা উপস্থিত হয়,—না জানি, জিঘাংসা-পরবশ জটিল মূর্ত্তিতে আরও কি ভয়ঙ্কর বিভীষিকাই উৎপাদন করে।

মূর্ত্তি দর্শনে সহজেই অনুমিত হইবে, ইহাদিগের সহরে গতায়াত আছে, কাঠ আহরণের নিমিত্ত এই বিচিত্র ভূষণে বিভূষিত হইয়া দূর বন-প্রদেশে গিয়াছিল, এখন স্বস্থানে প্রস্থান করিতেছে। আসামের প্রায় সর্ব্বত্রই পাহাড়, সুতরাং বিস্তর পার্ব্বত্য জাতিরও বাস; মিস্‌মি, মিকির, কুকী, আকা, মিরি, নাগা, খাসিয়া, গারো, প্রভৃতি কত শ্রেণীই যে আছে, এবং তাহাদিগের প্রত্যেকের মধ্যেও কত সম্প্রদায় ভেদ, তাহা যথাযথ নির্ণয় করা দুরূহ; ইহাদিগের মধ্যে খাসিয়ারা সম্পূর্ণরূপে ইংরেজ-রাজের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে এবং ইংরাজের শিক্ষা ও দীক্ষা* গুণে অনেক পরিমাণে সভ্য-ভব্য হইয়াছে; গারো এবং নাগারাও অনেক পরিমাণে শান্ত-ভাব ধারণ করিয়াছে, কিন্তু বিশেষ চেষ্টা স্বত্ত্বেও শিক্ষা-দীক্ষা এখানে আশানুরূপ ফলোপধায়ক না হওয়ায় তাহাদিগের অসভ্যতা সম্যক্‌ভাবে ঘুচে নাই, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগের হিংসক প্রকৃতিরও সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। অন্যান্য জাতিরা এখনও সম্পূর্ণ অসভ্য এবং মধ্যে ২ প্রায়ই উপদ্রব-পরায়ণ হইয়া উঠে। নাগাদিগের মধ্যে বিস্তর সম্প্রদায় ভেদ থাকিলেও, ইংরাজ-রাজত্বে আসামী, রেঙ্‌মা এবং কচা এই তিন সম্প্রদায়ই প্রধানতঃ বাস করে; ইহাদিগের সমগ্র লোক-সংখ্যা নির্দ্ধারণ করা একরূপ অসম্ভব—আদম-সুমারি দ্বারা লোক-সংখ্যা নির্ণয় করিতে গেলে পুনরায় নূতন উপদ্রব উত্থাপিত হওয়ার সম্ভাবনা, সুতরাং সুবুদ্ধি ইংরাজ-রাজ তাহাতে হস্তক্ষেপ করেন না। বিগত ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে নাগা-পাহাড়ের তদানীন্তন ডেপুটী কমিশনার সাহেব আনুমানিক ৬৬,৫৩৫ জন নাগার বাসা স্থির করিয়াছিলেন †; সম্প্রতি আদমসুমারি উপলক্ষে এ সংখ্যা কতদূর পরিবর্ত্তিত হইয়াছে—আমরা জ্ঞাত নহি।

(ক্রমশঃ)

*খাসিয়াদিগের মধ্যে যাঁহারা সভ্য হইয়াছেন, তাঁহাদিগের অধিকাংশই খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী। বস্তুতঃ খৃষ্টান মিশনারী সম্প্রদায়ের যত্নেই উহাদিগের হৃদয়ে সভ্যতা ও জ্ঞানালোক বিকীর্ণ হইয়াছে।

† Hunter's Statistical Account of Assam, Vol. II.

কবিতা ও গান।

বসন্তে।

(১)

হের সই, এসেছে আবার!
আবার বরষ-পরে,
তেমনি ধরণী' পরে,
হরষের ডালি হাতে—বসন্ত-বাহার!
আবার ফুটিছে ফুল,
গুঞ্জরিছে অলিকুল,
ডালে ডালে ডাকে পিক, মঞ্জরিছে সহকার।
চারিদিকে তরুলতা
পরিছে নূতন পাতা,—
নবীন মুকুল-ফুলে আনন্দ অপার!
দুরন্ত শীতের ভয়ে
জানালা দরজা দিয়ে
ঘরের ভিতর শুয়ে জড়সড় আর
কেহই নহেক এবে;
উল্লসিত আজি সবে;—
কারার বাহিরে আসি খুলে দেছে বুক।
হের প্রিয়ে, চারিদিকে হাসি-ফোটা মুখ!

(২)

ফুটেছে মাধবী সৌরভে গরবী;—
করবী কেশব-প্রিয়া।
বসন্তের রবে প্রমুদিত সবে
দ্রুত আসে বাহিরিয়া।
লাজুক চম্পক ভাঙ্গিয়া চমক
সলাজ-বদনে চায়;—
আবেশ অধীরে চঞ্চল সমীরে
ঈষৎ কাঁপিছে কায়;
উজল সোনার তনুখানি তার,
লাবণ্যেতে ঢল ঢল;—
পাতার মাঝারে লুকাবারে নারে
মোহকর পরিমল!
বাতাবীর ফুল সৌরভে অতুল,—
পরাণ উন্মাদকর,—
চৌদিক ছাইয়া মরম ভরিয়া
অন্তর করিল তর!
সে সুরভি-বাসে মত্ত-মধু-আশে,
চঞ্চল মধুপ-দলে,
প্রেমেতে পাগল, আবোল-তাবোল
কত কি কবিতা বলে!
নির্গন্ধ শিমুল রক্তিম হিঙ্গুল
রাগে উন্মাদিনী-বেশে,
সেও রে ফুটিল, উলঙ্গ উঠিল
রূপের গরবে হেসে!
জাঁতি, যূথী, বেলা শ্বেতাঙ্গী সরলা
যেন কয় সহোদরা!
বঙ্কিম-রঞ্জিত দলনীর মত,
ক্ষুদ্র তনু প্রেমে ভরা!
কুন্দ রাশি রাশি দশন বিকাশি'
হাসির লহর তুলি'
অনিমেষে চায় পাগলের প্রায়
শত শত আঁখি খুলি'!
ভুঁই-চাঁপা-দল ফুঁড়িয়া ভূতল,
ব্যাকুল উঠিল ত্বরা,—
বিবসনা বালা, পুলক-উথলা,
প্রেম মদে মাতোয়ারা!
অলস-বিহ্বল ঈষৎ চঞ্চল
মধুর স্বপনাবেশে
গোলাপ-কলিকা প্রেমিক বালিকা
জাগিল মৃদুল হেসে!
যৌবন-চঞ্চল প্রফুল্ল কমল
মৃদুল দুলিছে নীরে;—
প্রেম-ভরা বুক লাজে-লাল মুখ
ভ্রমর চুমিছে ধীরে!

(৩)

কত বন-ফুল জাগিল ব্যাকুল,
মোহন মধুর রবে;
মধুর পবনে শিহরে সঘনে
অধীর আকুল সবে!

মদালস-ভরে অবশ-অন্তরে
কত শত ফুল-বালা
ব্যস্তে প্রাণ খুলে দিতেছে অনিলে
সে খেলে কতই খেলা!
কাহারে চুমিয়া, বাস উড়াইয়া,
উলটি-পালটি' কা'য়,—
দোলাইয়া লতা,— মর্ম্মরিয়া পাতা,—
'সর-সর' বলি' ধায়!
হাসিছে যামিনী, নাচিছে তটিনী,
আধ আধ ঘুম-ঘোর!
স্বপনের প্রায় কাল বহে যায়,
প্রেমালসে তনু ভোর!

(৪)

চৌদিকে ফুলের মেলা!
বসন্তে প্রেমের খেলা!
হের প্রিয়ে, বসিয়াছে প্রেমের বাজার!
মধুরে মলয়-বায়
উল্লাসে কোথায় যায়?—
ঘুমন্ত তটিনী-মুখ চুমিতেছে শতবার!
সে মধুর প্রেমোচ্ছ্বাসে
মধুরে সরত হাসে
তরল জোছনা-মাখা নীথর নদীর মুখে!
মৃদুল লহরী-ভঙ্গে
শিহরি' অলস ভাঙ্গে,—
ঘুমে পুলকিত, যেন মধুর স্বপন-সুখে!

(৫)

(সখি,) এমন নিঝুম রাতে
এমন বসন্ত-রাতে
এমন চাঁদিনী-তলে নীরব রহিবি কিরে!
এমন প্রেমের ঘোর,
তবুও ঘুমের ঘোর?
অনুরাগ-মাখা,—তবু সরম করিবি কি রে?
ওই শুন, সহচরী,
দিগন্ত প্লাবিত করি
তুলেছে স্বর-লহরী পাপিয়া কেমন!
পুলকে গায়িছে পিক,
জ্যোৎস্নায় হাসে দিক!
অজানা—অবশে সখি, উথলি' উঠিছে মন!
আয় সখি, কাছে আয়,
দ্যাখ্‌লো দখিণা-বায়
মরমের মাঝে পশি' তুলেছে কি তান!
কি রাগিণী বাজাইল,
কি সুরে ঝঙ্কার দিল,
বুঝিতে পারি না প্রিয়ে, ব্যাকুল হইল প্রাণ!
তুই (ও) সই, প্রাণ খুলে,
ঘুমন্ত মু'খানি তুলে,
বীণার সুস্বরে তোর গা' না লো প্রেমের গান!
সে মধুর গীতি-রবে
হৃদয় গলিয়া যাবে,
প্রেমেতে বিভোল হয়ে মিশে যাবো দুই প্রাণ!
আয় বালা, বুকে আয়,
আর (ও) কাছে স'রে আয়,
হৃদয় সহিতে নারে একটু বিচ্ছেদ তোর!
ওই প্রেমালসে, প্রিয়ে,
বাহুলতা গলে দিয়ে
একটী চুম্বন দে লো, ফুল্ল কুমুদিনী মোর!

(৬)

মাতা'য়ে মরম তল,
কাঁপাইয়া জল-স্থল
আবার শুনালো মোরে সে পীযূষ-গান!
অন্তর যাউক পূরে;
অবনী থাকুক দূরে;—
দোঁহে মিলি' চল যাই সুদূর বিমান!
এ যে লো কঠিন ধরা,
কুটিলতা-বিষে ভরা
কঠোর কটাক্ষে হেথা প্রণয় শুকা'য়ে যায়!
এমন সুন্দর নিশি,—
পুলকিত দশ দিশি!
আজ তুমি, প্রিয় শশী, নিয়ত থেকো হোথায়।
চারিদিক হ'তে, সখি,
গানের তরঙ্গ এ কি
দুলে দুলে নেচে নেচে আসি লাগিতেছে গায়!
প্রাণ মোর তোর সাথে,
গানের তানের সাথে,
মিশে মিশে,গলে' গিয়ে কি হোলো রে কোথা যায়!

(৭)

এ কি রে অপূর্ব্ব মিলন!
এ কি রে উদার সম্মিলন!

কোথায় যাই, হা রে!
এ সুখ যে ধরে না রে!
কোথা ছিল হেন আনন্দের সম্মিলন!
স্বপ্নময় মোহে হৃদি অবশ হইল!
সুখে ভেসে দুলে দুলে কোথায় চলিল?

(৮)

গেল গেল, ডুবে গেল,
হৃদয় তলিয়ে গেল,
তোর ওই মোহময় প্রেমের সাগরে!
প্রণয়-মদিরা-পানে হয়েছে সে ভোর!
পরাণে এসেছে তার ঘুম-ঘোর!

... ...

আহা! ঐরূপে তারে
আদরে বুকেতে ধরে,
স্নেহের আঁচলে ঢাকি একটু যতন করে'
র'চে দাও, ফুলময়ি, শয়ন ফুলের পরে।

* * *

বসন্ত—উৎসব।

(হোরী।)

(১)

(কালাংড়া-রামকেলী।—জলদ একতালা।)

চল সারি সারি, যত ব্রজনারী,
খেলিবারে হোরী, কালারি সঙ্গে।
সরস কুসুমে, গোলাপ-কুঙ্কুমে,
লালে লাল করি, মোহন অঙ্গে॥
ত্রিঠাম মুরারি, বাঁকা বংশীধারী,
বাজা'য়ে বাঁশরী, প্যারী-প্রসঙ্গে।
সব সখি মোরা, ল'য়ে মনচোরা,
গায়িব নাচিব, উল্লাস-রঙ্গে॥
যুগলে যুগল, বিলাসে বিহ্বল,
অতি নিরমল, প্রেম-তরঙ্গে।
আমরা গোপিনী, অন্য নাহি জানি,
মাতুয়ারা হ'ব সে রস-রঙ্গে॥

(২)

(পিলু।—যৎ।)

তুয়া সনে, বনে বনে, আজু বন্‌শীধারী,
সব সখিয়াঁ মিলি, খেলেঙ্গে হোরী।
বড়া তু কপট কালা, বাঢ়াওয়ে বিরহ জ্বালা,
অব না ছোড়ব তুঝে, রাখব রিঝ মাঝারি।
তুঁহ রে প্রাণের প্রাণ, ডারব হিয়া-খান,
প্রেম-তরঙ্গে তুঝ, আপনা পাসরি॥

অদৃষ্ট।

ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

সুলোচনা লজ্জিতা।

গাত্রোত্থান করিয়া, হরিপদ-ক্রোড়ে সুলোচনাকে দেখিতে পাইয়া, আমার চিত্ত অত্যন্ত প্রফুল্লিত হইল। প্রথমতঃ মনে করিলাম, অদ্যকার দিন অবশ্যই ভাল যাইবে। দ্বিতীয়তঃ, যদি অপর কেহ না আইসে, তবে সুলোচনার নিকট হইতে তাঁহাদিগের পারিবারিক বৃত্তান্ত সমস্তই অবগত হইতে পারিব। যাহা মনে করিলাম, অদৃষ্টক্রমে তাহাই ঘটিল। বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয় এই হইল যে, আমাকে সে বিষয়ে কোন কথা পাড়িতে হইল না। তিনি আপনিই আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"যদু দাদা, আজ কি তোমার কোন কাজ-কর্ম্ম আছে?" আমি কহিলাম,—"না।" তখন সুলোচনা কহিলেন,—"ভালই হয়েছে। আজ তোমাকে আমি গোটাকতক আমার দুঃখের পরিচয় দিব।" আমি কহিলাম,—"তোমার আর কিসের দুঃখ? তবে বিধাতা তোমাকে যে দুঃখ দিয়াছেন, তাহা ত আর কেহ ঘুচাইতে পারিবে না!"

সুলোচনা।—"সেতো আমার এক জন্মের পাপের ফল নয়! জন্ম-জন্মান্তরে কত যে পাপ করিয়াছি, তাহারও ঠিকানা নাই। আর কত জন্ম ধরিয়া যে সে পাপের ফল-ভোগ করিতে হইবে, তাহাই বা কে বলিবে?"

এই কথা বলিতে বলিতে সুলোচনার চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। কিন্তু, কি আশ্চর্য্যের বিষয়, হরিপদ এতক্ষণ প্রফুল্ল-চিত্ত ছিল। সুলোচনার কথা যে সম্যক বুঝিতে পারিয়াছিল, তাহাও নিতান্ত অসম্ভব; কিন্তু, সুলোচনার চক্ষু ছল ছল দেখিয়া, তাহারও চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল।

সুলোচনা হরিপদকে কোলে লইয়া নিকটবর্ত্তী একখানা তক্তপোষের এক পার্শ্বে বসাইয়া, কিয়ৎকাল নীরবে থাকিয়া একটী দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, জিজ্ঞাসিলেন,—"যদু দাদা, কত দিন হলো, তুমি এখান থেকে চলিয়া গিয়াছিলে?" আমি মুখে মুখে হিসাব করিয়া কহিলাম,—"প্রায় ১৫ বৎসর হইবে।"

সুলোচনা।—"না, তা' নয়; তার চাইতে অনেক বেশী হবে। তুমি যে বৎসর যাও, তার পর বৎসর মা মরেন। সেই যে ১৫ বৎসর হয়ে গেল।"

সুলোচনার মাতার কাল হইয়াছে, একথা আমি তখনও জানিতাম না। শুনিয়া, যেন আমি চমকিয়া উঠিলাম। পূর্ব্ব-রাত্রে চাকর গণপৎ যাহা বলিয়াছিল, ঘুমের ঘোরে ভাল করিয়া শুনি নাই, তাহাই যেন মনে আসিয়া পড়িল। আমি কিছুই বলিলাম না; যেন আমি একথা পূর্ব্বে হইতেই জানিতাম। কিন্তু সুলোচনা যে আমার সে চমকানি-টুকু লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তাহা আমি মনেও করি নাই। লক্ষ্য করিয়া, তিনি সবিস্ময়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মা মরেছেন, তা' কি তুমি শোন-নি?"

আমি, আর গোপনের চেষ্টা না করিয়া, কহিলাম,—"আমাকে কে খবর দেবে?"

সুলোচনা।—"তাও বটে, তোমাকে কে খবর দেবে! তোমার ঠিকানাও তো কেউ জান্‌তোনা! কিন্তু তুমি তো আমাদের ঠিকানা জান্‌তে!—তুমি কোন্ মাঝে মাঝে আমাদের খবর নিলে?"

আমি শুনিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইলাম। কিন্তু কথা না কহিলে নয়, এজন্য কহিলাম,—"আমি এখান থেকে যেরূপ চোরের মত চলিয়া গিয়াছিলাম, তার পরে কি আমার আর চিঠি লেখা শোভা পায়?"

সুলোচনা।—"আমাদের কথা মনে হত না বলেই লেখ-নি। আর, বিশেষ, তুমি এখান থেকে গিয়ে অবধি তো আর কষ্ট ভোগ কর-নি! কষ্টে না পড়্‌লে আর কারুর পুরান বন্ধু-বান্ধবের কথা মনে হয় না! সেই তোমার যাওয়া অবধি আমাদের যে কষ্ট তা' আর কি বোলবো! তাই যখন-তখন তোমার কথা মনে পড়তো। আর তোমার সংবাদও রাখ্‌তাম। আগে আমি কত আদরে ছিলাম, আর এখনই বা আমার কি দুর্দ্দশা হয়েছে? তুমি আমার জন্য যাহা করিয়াছিলে, তাহা কি আর আমি জন্মজন্মান্তরেও ভুলিতে পারি? আমি যে আজও বাঁচিয়া আছি, সে কেবল তোমারই যত্নে। তখনও ত পিতা মাতা উভয়েই বর্ত্তমান ছিলেন; কিন্তু আমি শুনিয়াছি যে, তুমি আমার জন্য যে কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলে, তাহা তাঁহারাও করিতে পারেন নাই। তুমি এখান হইতে চলিয়া গেলে যখন আমি তোমার ঐ সকল কথা শুনিতে লাগিলাম, ততই আমার তোমাকে দেখিবার জন্য মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। তুমিই আমার জীবন-দান করিয়াছিলে, এবং তুমিই আবার যখন আমার পিতার ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেলে, ইহাতে আমার মনে বিস্তর কষ্ট হইতে লাগিল। কোন কার্য্যে আর মন লাগিত না। তবু তখন মা ছিলেন, তখন কোন দুঃখ হলে তাঁর কাছে দুদণ্ড গিয়ে বোস্‌লেও মনটা কতক সান্ত্বনা পেত। এই রকম করে বছর খানেক যেতে না যেতেই মা মারা পড়্‌লেন, আর আমারও দুঃখের দশা উপস্থিত হ'লো। মার মৃত্যুর পরেই বাবা কেমন উদাস হয়ে প'লেন। তিনি দিন-কতক তো মোটে বাটী থেকে বেরুতেন না; সকল সময়েই কেবল বসে বসে ভাব্‌তেন, আর, তখন গ্রামেও তেমনি ব্যায়রাম আরম্ভ হলো। যখন তখন লোকে বাবাকে ডাক্‌তে আস্‌তো। তেমন ডাক আমি কোন বয়সে দেখি-নি। এই রকমে দিন কএক

গেল, বাবা বেরুতে লাগ্‌লেন; কিন্তু আমি দেখেছি যে, গাড়িতে উঠেই গাড়ির দরজা বন্ধ করে যেতেন। রোগী দেখিয়াই আবার তৎক্ষণাৎ বাড়ী ফিরিয়া আসিতেন। কাহারও সহিত নিজে কোন কথা-বার্ত্তা কহিতেন না। এই রূপে দিন-কতক কেটে গেলে, বাবা একটী একটী ক'রে ভাই-কটীর বিবাহ দিলেন। বউ-গুলিকে নিয়ে অনেক যত্নে এক রকম লালন-পালন করেছি বল্‌তে হবে। পিশি-মা ছিলেন, তিনিও মার মৃত্যুর পরেই কাশী-বাসী হই-লেন। সমুদায় সংসার আমার উপর পড়িল। রাঁদা-বাড়া করা, বউ গুলিকে খাওয়ান-দাওয়ান সমুদায়ই আমি করিতাম। কিছু দিন আরও এই রূপে গত হইলে, বউ-গুলি ক্রমে ডাগর হইয়া উঠিলেন। ক্রমে ক্রমে ছেলে-পিলের মা হলেন, এবং যে যাহার সংসার বুঝিয়া লইলেন। তখন আর আমি যেন কেউ না! আমি যে এত করে আমার ছোট ভাই-বৌ বলে যত্ন-আত্তি করেছিলাম, তাহা সমস্তই নিষ্ফল হইল। বিধাতা যখন যাকে কষ্ট দেন, তার সান্ত্বনা আর কোথাও নাই। দাদারাও আবার যে যার বৌয়ের কথা শুনে আমাকে আর শ্রদ্ধা করেন না। দিদি বলে মানা দূরে থাক, আমি তাদের চাকরাণীর সমানও হলেম না। বাবা এ সমস্ত জেনে শুনেও কিছু বলিতেন না, বলেনও না। আমার এখন এমনি হয়েছে, যদু দাদা, যে আর তিলার্দ্ধও এ সংসারে থাক্‌বার ইচ্ছা নাই। তবে বুড়ো বাবাকে ফেলে যেতে পারি-নে বলেই, এখনও আছি। তাঁরও বিশেষ দুর্দ্দশা ঘটেছে। তবে আমি আছি বলে, তিনি এখনও কষ্ট পান নাই। আমি যেমন তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছি, তিনিও তেমনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। বল্‌তে কি, যদু দা, আমার কষ্টের আর পরিসীমা নাই।"

এই কথা বলিতে বলিতে সুলোচনা কাঁদিয়া ফেলিলেন। হরিপদ, তাহার এতাদৃশী অবস্থা দেখিয়া, তাঁহার বুকে এক হাত ও পৃষ্ঠ-দেশে এক হাত দিয়া, "ও মা" এই কথা বলিয়া, তক্ত-পোষ হইতে তাহাকে ধরিয়া উঠিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া তাহার মুখের দিকে তাকাইল। সুলো-চনা তৎক্ষণাৎ ভ্রম-ক্রমেই যেন "কি বাবা, কিছু না, বস" এই কথা বলিয়া তাহাকে ক্রোড়ে বসাইলেন। বসাইবা-মাত্রেই, হরি-পদ কে, এই কথা স্মরণ হওয়ায়, সুলোচনা অত্যন্ত লজ্জিতা হইলেন; এবং তৎক্ষণাৎ,—"যদু দা আমি আসি, সংসারে কি হচ্ছে দেখিগে" এই বলিয়া, একটী সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া, তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

সুলোচনা চলিয়া গেলে, সুলোচনার শেষোক্ত কথা কয়টী পর্য্যালোচনা করিয়া, আমি স্বয়ং একটু কাঁদিলাম। ভাবিলাম,—'মহামায়া বাঁচিয়া থাকিলে, হরিপদ ইহা অপেক্ষা আর কি বেশী আদর পাইত? এবং এখানে তাহাকে রাখিয়া গেলে, হরিপদ যে মাতৃস্নেহে প্রতিপালিত হইবে, তাহার আর সংশয় নাই।' কাজেই মন কিঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিল। কিন্তু আবার ডাক্তার বাবুর বাড়ী ছাড়িয়া যাইবার পূর্ব্বের ঘটনা পর্য্যালোচনা করিয়া একটু লজ্জি-তও হইলাম। ফলতঃ সুলোচনা যে আমাকে আন্তরিক ভাল-বাসেন, তাহাও নিঃসন্দেহ। সুলোচনা আবার ইহাও স্বীকার করিয়াছিলেন যে, তাঁহার এত কষ্টেও হরিপদকে পাইয়া দুঃখের অনেক লাঘব হইয়াছিল। এই সকল ভাবিয়া-চিন্তিয়া, হরিপদকে সুলোচনাকে দিয়া যাইব এই স্থির করিয়া গৃহ হইতে বহিষ্কান্ত হইলাম।

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

সুলোচনার কষ্ট।

সুলোচনা এই অবধি প্রত্যহ একবার-না-একবার আমার সহিত দেখা করিতে আসি-তেন। প্রথমে প্রথমে যে সময়েই হউক না কেন, আমাকে একাকী দেখিলেই দৌড়িয়া আমার কাছে আসিতেন। যদ্যপি কোন কার্য্যেও ব্যাপৃত থাকিতেন, তথাপি, আমাকে দেখিলে তৎক্ষণাৎ তাহা ফেলিয়া, হরিপদকে ক্রোড়ে লইয়া আসিতেন। যে কাজ ফেলিয়া আসিতেন, তাহা আর কেহ করিত না। সুতরাং আমার নিকট হইতে ফিরিয়া গিয়া সেই সকল কার্য্য সমাধা করিয়া সকলের আহারাদি করাইতে অধিক বেলা হইয়া যাইত। এজন্য তিনি বিলক্ষণ তিরস্কারও খাইতেন, এবং তাঁহার ভ্রাতৃবধূরা যখন-তখন ঠাট্টা করিয়া বলি-তেন,—"এখন ঠাকুরঝির দেমাক হয়েছে, কোলে একটী ছেলে পেয়েছে; নিঃসন্তানের সন্তান হয়েছে, আদেকুলের ঘটী হয়েছে; এখন কি আর আমাদের কাজ কোরবে, না আমাদের ছেলে নেবে! এখন নিজেরই এক সংসার।" লেবু যেমন অধিক কসটাইলে তিক্ত হয়, সুলোচনা-সম্বন্ধেও তাহাই ঘটিল। সুলোচনাকে তাঁহারা যেরূপ তিরস্কার করিতেন, তাহাতে কাহারও মান থাকিবার কথা নহে। যে সকল জানোয়ার মানুষ দেখিলে পলাইয়া যায়, যদি তাহাদিগকেই মানুষে তাড়া করে, তাহা হইলে তাহারাই আবার আত্ম-রক্ষার যেরূপ চেষ্টা করে, তাহাতে মানুষের বাঁচা ভার হইয়া পড়ে। প্রকৃত পক্ষে সুলোচনা বধূগণকে ভয় করিতেন; এরূপ ভয় কর্‌বার বিশেষ কারণও আছে। পূর্ব্বে পূর্ব্বে ভ্রাতারা সুলোচনার কথামত চলিতেন। পরে, তাঁহা-দের মাতার মৃত্যু হইলে, তাঁহাদের পিতা আর সাংসারিক কোন কাজ-কর্ম্মে লিপ্ত থাকিতেন না। সেই সময় হইতে খরচ-পত্র সমুদয় ভ্রাতাদের হাতে আসিল। বধূগণ না আসা পর্য্যন্ত, সুলোচনা ভ্রাতাদের উপর বরং প্রভুত্ব করিয়া একরূপ সুখে কাটাইয়াছেন। কিন্তু বধূগণ বাটী আসিয়া স্বীয় স্বীয় স্বামীকে বুঝা-ইয়া দিল যে,—'সুলোচনা পর বই নহে তাঁহার স্বামী থাকিলে তো আর তিনি এ বাটী থাকিতেন না। বিশেষ গোত্র-পর্য্যন্ত আলা-হিদা হইয়া গিয়াছে। তবে যখন তাঁহার শ্বশুর-বাটীর লোকেরা তাঁহাকে লইয়া যায় না, এবং সে বিষয়ে যত্নও করে না, তখন ত তাঁহাকে রাঁধুনী ব্রাহ্মণীরমত রাখিয়া দিয়াছে।' বধূগণকে ভয় করিয়া চলিয়াও সুলোচনা যাহা ভাবিয়াছিলেন, তাহা ঘটিল না। তিনি যখন দেখিলেন যে, নিজের স্বাধী-নতা রহিল না, বরং রাঁধুনী ব্রাহ্মণীর মত তাঁহার সহিত ব্যবহার আরম্ভ করিল, তখন তাঁহার সে ভয় ঘুচিয়া গিয়া সাহস হইল। তিনি আর সেরূপ নম্র ভাবে থাকিতেন না। জানিতেন তখনও তাঁহার বাপ জীবিত আছেন। সুতরাং বধূগণ তাহার সহিত ঝগড়া করিবেন? এজন্য সুলোচনাও তাঁহাদের সহিত বাগবিতণ্ডা করিতে ত্রুটী করিতেন না। তবে সুলোচনা পতি-পুত্র-বিহীনা এজন্য তিনিই পরি-শেষে হার মানিতেন। তাঁহার ভ্রাতৃ-বধূগণ এক দফা তাঁহার সহিত ঝগড়া করিতেন, দুই দফা নিজ নিজ স্বামী বাটী আসিলে সেই সকল কথা আবার চতুর্গুণ অলঙ্কারের সহিত তাঁহাদিগকে লাগাইয়া তাঁহাদের মন ভারি করিয়া দিতেন। তিন দফা সেই সকল আবার সুলোচনার পিতার কর্ণে উঠাইতেন। সুলোচনা সে সময়ে নিজ পক্ষ সমর্থন করিয়া কিছু বলিলেও তিনি কাহারও পক্ষ হইয়া কোন কথাই বলিতেন না, সুতরাং পরিশেষে সুলোচনাকেই হার মানিতে হইত। সুলোচনার পিতা, পত্নীর মৃত্যু হওয়া অবধি এই সকল ব্যাপার শ্রবণ করিয়া বিলক্ষণ বুঝিয়া-ছিলেন যে, তাঁহার সংসার আর টিঁকিবেনা তবে যত দিন কাহাকে কিছু না বলিয়া একত্র চলে। তিনি যদি কোন পক্ষ সমর্থন করিতেন তাহা হইলে এত দিন ভাঙ্গিয়া যাইত, তথাপি তিনি এরূপ অবস্থায় সুলোচনার ভাবনায় আরও ভাবিত ছিলেন এবং যখন আর একত্র চলিবে না তখন সুলোচনাকে লইয়া তিনি আলাহিদা থাকিবেন মনে মনে এই ঠিক

করিয়া, বুদ্ধিমানের ন্যায় যত দিন চলে চালাইতে লাগিলেন। সময়ে সময়ে তাঁহার পুত্রেরা সুলোচনাকে কাপড়ের জন্য বিলক্ষণ কষ্ট দিতেন, এমন কি কাপড়ের অভাবে ময়লা কাপড় ধোলাই করিতে দিতে পারিতেন না। ক্ষারে কাপড় নিজে কাচিয়া পরিতে হইত এবং এই ক্ষারের মূল্যও সুলোচনাকে নিজ হইতে খরচ করিতে হইত। তাঁহার পিতা অবশ্য শুনিতে পাইলে আর পুত্রগণকে কিছু বলিতেন না এবং না বলিয়া নিজে সময়ে সময়ে সুলোচনাকে এক এক জোড়া কাপড় দিতেন। এই পিতার সাহসে ভর করিয়া তিনি ভ্রাতৃবধূদিগকে যথেচ্ছা তিরস্কার করিতেন। এই রূপ ক্রমশঃ বকাবকী হওয়ায় ও ক্রমশঃ অশেষ যন্ত্রণা পাওয়ায় সুলোচনা তিক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন সুতরাং তাঁহার আর কোন কার্য্যে গা ছিল না! বকুনী খাইবেন জানিয়াও তাহাতে তাঁহার ভয় ছিলনা। এবং এই ভয় ছিল না বলিয়াই তিনি যখন তখন কার্য্য ফেলিয়াও আমার নিকট আসিতেন।

এইরূপে দিন কয়েক অতীত হইলে সুলোচনা জানিতে পারিলেন যে আরও দিন কয়েক তাঁহাদের বাটীতে থাকিব এবং সেই অবধি আর যখন তখন আমার নিকট আসিতেন না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সমস্ত সংসারের ভার এখন সুলোচনার উপর। সুলোচনার উপর সংসারের ভার কি তাহা বোধ হয় পাঠক বুঝিতে পারিয়াছেন, অর্থাৎ সংসারে সমস্ত গুরুতর কার্য্যের ভারই তাঁহার উপর ছিল; আর সংসারের যে সকল কার্য্যে লোক সুখ মনে করে, অর্থাৎ টাকা কড়ি হাতে করিয়া খরচ পত্র করা, ব্রত নিয়ম করা, সকলের উপর প্রভুত্ব করা, নিজের ইচ্ছামত দান ধ্যান করা ইত্যাদি কোনটারও ভার তাঁহার উপর ছিল না। তাঁহার নিয়মিত কার্য্যের উপরও যদি কখন তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐরূপ কোন কার্য্যের ভার লইতে গিয়াছেন, তখনই তিনি তাহাতে তিরস্কার খাইয়াছেন। তাঁহার নিরূপিত কার্য্য ছিল গোবর ঝাইট দেওয়া, রন্ধন করা, ছেলে-পিলেকে স্নানাহার করান, সকলকে খওয়ান দাওয়ান ইত্যাদি আর তাঁহার ভ্রাতৃবধূগণের কার্য্য ছিল, পান সাজা, যাহা যখন দরকার হাতে করিয়া খরচ করা, সকলের উপর প্রভুত্ব করা, সকলের দোষানুসন্ধান করা ও আপন আপন বেশ ভূষা করা ইত্যাদি। সুতরাং সুলোচনার এই সমস্ত কার্য্য করিতে প্রায় দুই প্রহর অতীত হইয়া যাইত। সকলকে আহারাদি করাইয়া দিয়া তিনি নিজে চারিটী আহার করিতেন। তৎপরে সকলের বাসন লইয়া ঘাটে যাইতেন। বাসনগুলি মাজিয়া আনিয়া যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া একটী পান মুখে দিয়াই আমার সহিত দেখা করিতে আসিতেন। বাটীতে দুই জন ঝি ছিল, তাহারা যে যাহার কর্ত্রীর কাজেই ব্যাপৃত থাকিত। সুলোচনার কোন প্রকার সাহায্য করিবার সময় পাইত না এবং পাইলেও তাহাদের সে সমস্ত কার্য্য করার হুকুম ছিল না। তবে সুলোচনার দুঃখে দুঃখিত হইয়া যদি কখন গোপনে কোন কার্য্য করিত সে কথা আলাহিদা।

বাস্তবিক তাঁহার এই সকল কষ্ট দেখিয়া আমিও আন্তরিক বড় দুঃখিত হইলাম। প্রথমতঃ ডাক্তার বাবুর বাড়ী সেই চাকুরি করিতে আসা অবধি আমি সুলোচনাকে কি চক্ষে দেখিয়াছিলাম তাহা বলিতে পারি না। এতদ্ভিন্ন সুলোচনার বসন্ত হইলে আমি যে সুলোচনার জন্য কয়েক দিবস ধরিয়া কষ্টকে কষ্ট মনে না করিয়া, দিবা রাত্রি সমান জাগিয়া তাঁহার সুশ্রূষা করিয়া তাঁহার প্রাণদান দিয়াছিলাম সেই সুলোচনাকে এতাদৃশী অবস্থায় দেখিয়া আমার মনে দুঃখ না হইবে কেন? এবং তৎপরেও যখন নিজে পীড়া হইতে আরোগ্য হইয়া সুলোচনার প্রতি আমার প্রথম ভাবান্তর জানিতে পারিলাম, তখন আমি নিজের অতিশয় দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও অত্যন্ত দুর্দ্দশাপন্ন হইয়াও যে সুলোচনার দুর্নাম রটনা আশঙ্কায় এতাদৃশ আশ্রয় ত্যাগ করিয়া গিয়াছি আজি সেই সুলোচনাকে, নানা কারণে ও নানা রকমে তাড়িত হইতে দেখিয়া আমার মনে দুঃখ না হইবে কেন? ইহার উপর আবার আর একটী দুঃখ এই যে আমি ডাক্তার বাবুর বাটী আসা অবধি, হরিপদ সুলোচনার বড় নেওট হইয়াছিল। ছেলে বেলা অবধি স্ত্রীলোকের আদর না পাইয়া সে একরূপ ছিল, এক্ষণে স্ত্রীলোকের আদর উপভোগ করিয়া সে আর সুলোচনাকে কখনই পরিত্যাগ করিত না। শয়নে, স্বপনে, ভোজনে, উপবেশনে এমন কি পায়খানায় যাইতে হইলেও হরিপদ তাহার সঙ্গ ছাড়িত না। সুতরাং সুলোচনাকে এ ঘর ও ঘর করিয়া ও অন্যান্য কার্য্য বশতঃ যত পথ হাঁটিতে হইত হরিপদকেও তাহাই হাঁটিতে হইত। সুলোচনাকে যে কষ্ট লইতে হইত তাহাকেও সেই কষ্ট লইতে, হইত তবে কমের মধ্যে এই হরিপদকে সুলোচনার ন্যায় কায়িক পরিশ্রম করিতে হইত না। এতদ্ভিন্ন রন্ধনের সময় আগুনের তাতে থাকা, বাসন মাজিবার সময় রৌদ্রে থাকা ইত্যাদি সমস্ত কষ্টই হরিপদকে ভোগ করিতে হইত।

সুলোচনা যখনই আমার সহিত দেখা করিতে আসিতেন তখনই হরিপদকে কোলে করিয়া আসিতেন। আর উক্ত কার্য্য সকল সমাপন করিয়া আমার নিকট আসিতে সুলোচনার একটা দুইটা বাজিয়া যাইত। তাঁহার ভ্রাতৃবধূগণ আহারান্তেই যে যাহার শয়নাগারে স্বায় স্বায় পুত্রকে লইয়া গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিতেন কেহ কেহ বা পুত্রকন্যাকে ঘুম পাড়াইয়া নিজে একটু নিদ্রা যাইতেন, আর কেহ কেহ বা পুত্রকন্যাকে ঘুম পাড়াইয়া নিজেরা কাঁতা লইয়া সেলাই করিতে বসিতেন। অগ্রে সুলোচনা আহারান্তেও সময় পাইতেন না, তখন তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রগণকে লইয়া চৌকী অথবা খেলা দিতে হইত। হরিপদ এ বাটীতে আসা অবধি তাঁহার এ ভারটী কমিয়া গিয়াছিল। ভ্রাতুষ্পুত্রেরা অভ্যাস বশতঃ তাঁহার নিকট থাকিতে চাহিলেও এবং তিনি রাখিতে স্বীকৃত হইলেও তাঁহার ভ্রাতৃবধূগণ তাহাদিগকে আর তাঁহার নিকট থাকিতে দিতেন না। সেই অবধি বধূগণের নিকট, স্বীয় স্বীয় পুত্র-কন্যাগণকে তিরস্কার ইত্যাদি দ্বারা শিক্ষা দিবার ছলে, সুলোচনাকে বিলক্ষণ তিরস্কার খাইতে হইত। কিন্তু অগ্রেই বলিয়াছি যে সুলোচনা সে সকল আর গ্রাহ্য করিতেন না এবং তজ্জন্য এই সকল তিরস্কার শুনিয়াও কোন উত্তর করিতেন না।

এই অবধি সুলোচনা প্রায়ই একটা দুইটার পর আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন। প্রথমতঃ এ ও সে নানারূপ কথা-বার্ত্তা কহিয়া নিজের দুঃখ ও কষ্টের কথা পাড়িতেন। সর্ব্বাগ্রে নূতন নূতন প্রাত্যহিক যে সমস্ত বিবাদ হইত তাহাই বর্ণনা করিতেন। নূতনগুলি সমাপ্ত হইলে ক্রমে ক্রমে আবার পুরাতন অতীত বৃত্তান্ত বলিতেন। অতীত বৃত্তান্তও যাহা বলিতেন তাহা প্রত্যহই নূতন নূতন বলিতেন। ইহাতে আমি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে পূর্ব্বোক্ত ঘটনাগুলি তাঁহার হৃদয়ে শেলবৎ বিধিয়াছিল এবং আমাকে সম্মুখে দেখিলেই যেন আশ্রয় ভাবিয়া সাহস পাইয়া সেই সকল শেল একটী একটী করিয়া প্রত্যহই উদ্ঘাটন করিয়া হৃদয়ের যন্ত্রণার নিরাকরণ করিতেন। তিনি যখন ঐ সকল ঘটনা বিবৃত করিতেন আমি অবাক হইয়া শুনিতাম। সেই সকল বলিতে বলিতে তিনি পাগলের ন্যায় কখন কখন উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিতেন। আমার মনও ঠিক সুলোচনার মনের সহিত যাইত, অর্থাৎ সুলোচনা হাসির কথা বলিয়া যখন হাসিতেন আমিও মুখে না হউক মনে মনে হাসিতাম, সুলোচনা যখন রাগের কথা কহিতেন ও রাগ করিতেন আমিও তখন মনে মনে রাগ করিতাম, আবার তিনিও যখন দুঃখের কথা কহিয়া নিজে পাগলের ন্যায় কাঁদিয়া উঠিতেন আমিও তাঁহার সহিত কাঁদিয়া ফেলিতাম। এবং এই ক্রন্দনের সঙ্গে সঙ্গে আমি নিজে আবার সুলোচনার অবস্থার সহিত আমার অবস্থার তুলনা করিয়া আরও দুঃখিত হইতাম। অবশেষে স্থির করিলাম যে সুলোচনা আমারই জন্য এখন যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। সুলোচনা অগ্রে অবশ্য সুখী ছিলেন, কিন্তু যে অবধি আমার সহিত তাঁহার দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছে ও যে অবধি আমাকে ভালবাসিতে আরম্ভ করিয়াছেন সেই অবধি তাহার দুঃখ আরম্ভ হইয়াছে, সুতরাং আমি যে তাঁহার একমাত্র দুঃখের মূল তাহা বিলক্ষণ অনুভব করিতে পারিলাম। এই সকল

পর্য্যালোচনা করিয়া আমার পুরাতন কথা সব মনে উঠিতে লাগিল। তখন আমিই যে প্রকৃত দুর্ভাগা তাহাই সম্যক্ জ্ঞান হইল এবং এই দুর্ভাগার সংস্রবে পড়িয়া এইরূপ আরও কত লোক কষ্ট পাইয়াছে ও পাইতেছে তাহা অনুধাবন করিতে লাগিলাম। সুলোচনা আমার সাক্ষাৎ হইতে সরিয়া গেলেই আমি এইরূপ ভাবনায় নিযুক্ত থাকিতাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমার অবস্থা এক্ষণে আর তদ্রূপ শোচনীয় নাই, কিন্তু তথাপি আমি দুর্ভাগা বলিয়াই অপরাপর আমার সংস্রবের লোক কেহই সুখে নাই। প্রথমতঃ ভাবিলাম যে সুলোচনাকে ছাড়িয়া এখান হইতে দাদার বাটীতে আশ্রয় লইলাম। সেইখানে তাহাদের মধ্যে যে স্ত্রী-পুরুষের বিবাদ হয় তাহা আমারি জন্য। পরে আমি যাহার জন্য একটীং কমপাউণ্ডারগিরি করিতে যাই তাহার সর্পাঘাতে মৃত্যু হইল। তাহার পর মহামায়ার সহিত বিবাহ হওয়া অবধি শ্বশুর-ঠাকুরের মন আমার জন্যই সর্ব্বদা উত্তপ্ত থাকিত। মহামায়াও আমাকে বিলক্ষণ ভাল বাসিত কিন্তু তাহার হঠাৎ অকালমৃত্যু আমার সংস্রব বই আর কোন কারণেই হইতে পারে না। তৎপরে শেষ হরিপদ; সেও আমাকে ভিন্ন আর কাহাকে জানিত না এবং বোধ হয় সেই জন্যই সে মাতৃহীন হইল এবং এখানে আসিয়া সুখে থাকিবে বলিয়া যাহার নিকট লইয়া আসিলাম তাহার ত কষ্টের সীমা নাই বরং যাহাও কম ছিল এক্ষণে আবার আমার সংস্রবে আসিয়া তাহা চতুর্গুণ বৃদ্ধি হইল এবং হরিপদের ও সুলোচনার কষ্ট দেখিয়া এক প্রকার কষ্ট হইয়া দাঁড়াইল।

সুলোচনা আমার নিকট আসিয়া কষ্টের ও দুঃখের কথা বলিতে আরম্ভ করিয়া কান্না কাটিতে ব্যাপৃত থাকায় কোন কোন দিন তাঁহার দুই তিন ঘণ্টাও হইয়া যাইত। বলা বাহুল্য যে, তিনি সকল সময়েই হরিপদকে কোলে করিয়া আসিতেন। হরিপদ যে সমস্তক্ষণ আমার নিকট অথবা সুলোচনার নিকট থাকিত এমত নহে। একটু থাকিয়াই নিজে নিজে খেলা করিতে আরম্ভ করিত, পরে ক্রমশঃ ঘরের দরজা পর্য্যন্ত যাইয়া দরজা ধরিয়া অথবা দরজার উপর বসিয়া খেলা করিত, ক্রমে দুই একটী ছেলের দেখা পাইলেই ঘরের বাহিরে গিয়া তাহাদের সহিত খেলা করিত। এইরূপ দরজা লইয়া বা দরজার উপর বসিয়া খেলা করিতে করিতে কোন কোন দিন বা দরজা বন্ধ করিয়া খেলা করিতে যাইত। সে যে দরজা বন্ধ করিয়া যাইত তাহা আমরা কথাবার্ত্তায় অভিনিবিষ্ট থাকায়, না আমি, না সুলোচনা, কেহই টের পাইতাম না। সুলোচনা যে আমার সহিত এইরূপ কথা কহিতে আসিতেন, তাহা বধূগণ জানিতেন। এবং মাঝে মাঝে কার্য্য বশতঃ বাহিরে আসিয়া উঁকী মারিয়া এক এক বার দেখিতেন, সুলোচনা আমার সহিত কথা কহিতেছেন কি না।

একদিবস সুলোচনা যথা সময়ে আমার নিকট আসিয়া হরিপদকে ছাড়িয়া দিয়া দুঃখের কথা আরম্ভ করিয়াছেন। হরিপদ ক্রমে খেলা করিতে করিতে দরজাটী বন্ধ করিয়া বাহিরে গিয়াছে। আমরা কথায়-বার্ত্তায় অত্যন্ত অভিনিবিষ্ট ছিলাম বলিয়া হরিপদ কখন বা কতক্ষণ দরজা, বন্ধ করিয়া গিয়াছে জানিতে পারি নাই। হঠাৎ সুলোচনার একটী ভ্রাতুষ্পুত্র আসিয়া জোরে ধাক্কা দিয়া একবারে মুহূর্ত্তমধ্যে কপাট খুলিয়া ফেলিল। বালকটী কপাট খুলিয়া দিয়াই একটু মুচকে হাসিয়া ফিরিয়া গেল। আমরাও কপাটের শব্দে চমকিয়া যেমন বাহিরে তাকাইব অমনি দেখিলাম সুলোচনার বড় ভ্রাতৃবধূ উকী মারা কার্য্য সমাপন করিয়া দুম দুম শব্দে পদধ্বনি করতঃ চলিয়া যাইতেছেন। এই অবধি এইরূপ ঘটনা প্রায় মাঝে মাঝে হইত এবং বধূগণও যখন তখন, আমি কার্য্য বশতঃ বাটীর মধ্যে যাইতে আমাকে দেখিয়া তাকা তাকি করিয়া হাসিতেন। আমি তাহাদের এই রূপান্তর বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলাম এবং সুলোচনার নিকট হইতে শুনিলাম যে সেই অবধি বধূগণ আর তাহাদের পুত্রকন্যাগণকে সুলোচনাকে স্নানাহার করাইতে দিতেন না, সুলোচনাও তাহার জন্য আর বধূগণের খোসামোদ করিতেন না।

অনুসন্ধান

অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র।

৫ম খণ্ড } ৩০এ চৈত্র, ১২৯৮। { ১৭শ সংখ্যা।

ওঁ নমো শিবায়।

(স্তোত্রং।)

"শিবং শান্তং মহাদেবং লোকানুগ্রহকারকং।
শুদ্ধ-স্ফটিকসঙ্কাশং সহস্রাদিত্যবর্চ্চসং॥
খড়্গাশূলবরাভীতিং পঞ্চবক্ত্রং সুশোভনং।
সর্ব্বরোগ-বিনাশার্থং ভজেহং ভুবনেশ্বরং॥"

ওঁ-কাররূপিণে বিশ্বকারিণে সর্ব্বসাক্ষিণে।
ন-ভোবদ্ব্যাপ্ত-রূপায় শঙ্করায় নমো নমঃ॥
মঃ-সর্ব্বকর্ত্তা সর্ব্বেশঃ সর্ব্বমঙ্গলকারকঃ।
শি-রঃস্থিত জটা-গঙ্গঃ পাহিমাং পার্ব্বতীশ্বরঃ।
বা-ঙ্মনোহতীত মাহাত্ম্যঃ সর্ব্বদেব-প্রপূজিতঃ॥
য-জমানাদ্যষ্ট মূর্ত্তিঃ প্রসীদ ভগবান্ ভবঃ॥
ষড়ক্ষরমনুস্তোত্রং শ্রীশম্ভো যঃ পঠেন্নরঃ।
সংসার সাগর-ত্রাণে তদ্দয়ো গোষ্পদায়তে॥

জয়তি শঙ্করঃ চন্দ্রশেখরঃ,
সকল ভাস্বরঃ সর্ব্বসংহরঃ।
মদননশ্বরঃ শ্রেয়সাকরঃ,
সিত-কলেবরঃ পার্ব্বতীশ্বরঃ॥
জনন-গত-জনন জনগণ-ভরণ;
সকল-হরণ-হর পরতর-শরণ,
মদন-দলনকর তপনজ-দমন,
জয় জয় নরবর পরপদ-ভজন॥

আশুতোষ পশুপতে ভগবন্ ভক্তবৎসল।
নান্যঃ স্বার্থরক্ষার্থং দীনং মাং ত্রাহি সর্ব্বতঃ॥
শ্রুতৌ শ্রুতং ত্বমেবৈকঃ শিবঃ শান্তোপি শঙ্করঃ।
শম্ভুঃ প্রপন্নার্ত্তি-হরঃ প্রসীদ শ্রীপদাশ্রিতে॥

নাস্তিকের ঈশ্বর-ভক্তি।

মানুষের মনে, কিরূপে কখন্ কোন্ ভাবের উদয় হয়, তাহা কে বলিতে পারে? আজ আমি পরম পাষণ্ড; পিতামাতা-গুরুজন, কতই সদুপদেশে—কতই যত্ন-চেষ্টায়, আমাকে সুপথে আনিতে চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু কিছুতেই আমি তাঁহাদের সে শুভ-বাণী শুনিতেছি না—যেমন তেমনিই পাষণ্ড-দুরাচার রহিয়া যাইতেছি। অথচ, হয় তো এমন একদিন আসিতে পারে,—যেদিনের একটী সামান্য ঘটনায় বা সামান্য কথায় আমার সমূহ পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে। তাই বলিতেছিলাম, কিরূপে কখন্ কোন্ ভাবের উদয় হয়, তাহা কিছুতেই বলিতে পারা যায় না। নহিলে, অমন পাষণ্ড-নাস্তিক জগাই-মাধাই পরম হরিভক্ত বৈষ্ণব হইয়াছিলেন, কি প্রকারে? নহিলে, সামান্যা মেছুনীদের মুখে "বেলা গেল—ঘরে যেতে হ'বে" শুনিয়া, স্বর্গীয় লালা বাবু সংসারত্যাগী হইয়াছিলেন কেন? নহিলে, এহেন বেশ্যাসক্ত বিল্-মঙ্গল বেশ্যা চিন্তামণির মুখে—"আমায় যে ভালবাসা দিয়েছ, যদি ভগবানকে তা' দিতে"—এই কথা শুনিয়াই বা সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিলেন কেন? ফলতঃ, কি ক্ষণে, কি কথায়,

যে কি হইতে পারে, কেহই বলিতে পারেন না।

সহৃদয় পাঠক-পাঠিকে! একটি পরম পাষণ্ড-নাস্তিকের চরিত্রে, আজ আপনাদের নিকট এই এক ক্ষণ-রহস্য বিবৃত করিব। দেখুন, কি কথায়, কি ভাবে, মানুষের কিরূপ অবস্থা বর্ত্তিতে পারে!

একজন নৈয়ায়িক পণ্ডিত। ন্যায়-তর্ক-শাস্ত্রে তিনি সমূহ বুৎপন্ন। তাঁহার মনে সদাই এই তর্ক—ঈশ্বর আছেন কি না! এই তর্ক লইয়াই তিনি প্রায় জীবনপাত করিতে বসিয়াছেন। অথচ, আজিও তিনি মীমাংসা করিতে পারিলেন না যে, ঈশ্বর আছেন কি না! অধিকন্তু, ক্রমেই তাঁহার সে তর্কের ক্ষুরধারে ঈশ্বরের স্বত্বা অপ্রমাণিতই রহিয়া যাইতেছে। তিনি কেবলই এই প্রতিপন্নে উপনীত হইতেছেন যে,—ঈশ্বর নাই। কেহ তাঁহাকে তাহা বুঝাইতেও পারে না; কেহ তাঁহার নিকট ঈশ্বরের স্বত্বা-সাব্যস্থ্য করিতেও পারে না। তাঁহার সে তর্কচ্ছটায়—তাঁহার সে যুক্তি-জালে সকলের সকল কথাই আবৃত হইয়া যায়; তিনি তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইয়া দেন যে,—ঈশ্বরের কোনই স্বত্বা নাই, সুতরাং তাঁহাকে পূজা করিবার বা মানিবারও কোনই প্রয়োজন নাই।

এইরূপেই বহু বর্ষ কাটিয়া যায়। নৈয়ায়িক পণ্ডিত মহোদয়ের মন আর কিছুতেই ফিরে না। অধিকন্তু, তাঁহার শিষ্য-সেবক-ভৃত্যগণও ক্রমে সেই শিক্ষাই পাইতে থাকে।

পণ্ডিত মহাশয় একবার শিষ্যবাড়ী গিয়াছেন। সঙ্গে এক উৎকল-দেশীয় ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ তলপী-বাহককে তলপী-বাহক, আবার এদিকে রাঁধুনীকে রাঁধুনী। অর্থাৎ এই চলিত কথায় যেমন বলে,—"বাবাজীকে বাবাজী, তরকারীকে তরকারী।" এও ঠিক তাই। পণ্ডিত মহাশয়ের প্রায় সমস্ত কাজই ঐ ব্রাহ্মণের দ্বারা নির্ব্বাহ হয়। অধিকন্তু, মধ্যে মধ্যে—আর লোকজন না পাইলে, ব্রাহ্মণ-ঠাকুরের সহিত পণ্ডিত মহাশয়ের ঈশ্বর-বিষয়ক তর্কটা-আস্‌টাও চলিয়া থাকে। ব্রাহ্মণ-ঠাকুরটির নাম হলধর ত্রিবেদী। ত্রিবেদী-ঠাকুর, উৎকল-দেশীয় স্বভাবসিদ্ধ গুণেই হউক, আর যে কারণেই হউক, কিছু বোকা বোকা!

শিষ্য-বাড়ী আহারের প্রচুর আয়োজন। যা কিছু সুখাদ্য আছে, যা' কিছু ভাল তরকারী পাওয়া যায়, শিষ্য-মহাশয়, স্বীয় গুরুদেবের জন্য, তাহার প্রায় সকলই সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন। দধি-দুগ্ধ-মৎস্য প্রভৃতি গ্রাম্য বাজারে যাহা কিছু উপাদেয় দ্রব্য মিলিয়াছে, শিষ্য-মহাশয় সে সকলই তো সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন; অধিকন্তু, তৎসন্নিহিত সহর হইতেও নানা সুখাদ্য আনয়ন করিয়াছেন। সেই সকল সুখাদ্যের মধ্যে আনিয়াছেন—একটী 'বাঁধা কপি।' 'বাঁধা কপি' তখন সবে নূতন উঠিয়াছে; তাই, অনেক যত্ন করিয়া—বেশী দাম দিয়া, গুরুদেবের জন্য ঐরূপ একটী 'কপি' আনিয়া দিয়াছেন।

কিন্তু রন্ধনের ভার ত্রিবেদী-ঠাকুরের উপর। পণ্ডিত মহোদয় তাঁহার শিষ্যকে তত্ত্ব-কথা শুনাইতেছেন; আর, এদিকে রন্ধন-গৃহে বসিয়া ত্রিবেদী-ঠাকুর রন্ধনাদিতে ব্যাপৃত আছেন।

... ...

ক্রমে আহারের সময় উপস্থিত। গুরুদেব আহারে বসিয়াছেন। গণ্ডূষমাত্র করিয়াই, মুখের গ্রাস তুলিতেছেন; এমন সময়, হঠাৎ তাঁহার মনে হইল,—কপির তরকারী কই? সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শিষ্য-মহাশয়ও বলিয়া উঠিলেন,—"কই ঠাকুর, কপির তরকারী কই?"

ত্রিবেদী-ঠাকুর, স্বীয় স্বভাব-সুলভ চপল হাসি হাসিয়া, উত্তর করিলেন,—"ঠাকুর মশাই বল্‌তে ভুলেছি, ছি-ছি, কপিওয়ালা বেটা বড়ই ঠকিয়েছে।"

"সে কি? এ কি বলিস্?"—গুরু-শিষ্য দু'জনের মুখেই সবিস্ময়ে এই কথা।

ত্রিবেদী-ঠাকুর আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন,—'সত্যিই! সত্যিই বল্‌ছি! বেটা বড়ই ঠকিয়েছে।"

"আরে মলো যা! ঠকিয়েছে—ঠকিয়েছে কি? কথাগুলো খোলসা করেই বল্-না!"

ত্রিবেদী-ঠাকুরের মুখে তখনও হাসি। ঠাকুর তখনও বলিলেন,—"সত্যিই বল্‌ছি—সত্যিই বল্‌ছি—বেটা বড়ই ঠকিয়েছে।"

বারবার সেই একই কথায়, গুরু-শিষ্য দু'জনেই বিশেষ চটিয়া, ঠাকুরকে যেমন আক্রমণ করিতে উদ্যত; ঠাকুর তখন, কতকটা বুঝিতে পারিয়াই, বলিলেন,—"তাই-ই তো বল্‌ছি! সবই পাতা—সবই পাতা! বেটা তো কপি দেয়-নি; সবই কপির পাতা দিয়েছে। বল্‌বো কি, ঠাকুর মশাই, কপির যতই ছাড়াই, ততই পাতা—কপি আর তার ভেতর একটুও নেই—সবই পাতা—সবই পাতা। বেটা বড়ই ঠকিয়েছে—বড়ই ঠকিয়েছে।"

এই বলিতে বলিতে, ত্রিবেদী-ঠাকুর ক্রমে কপিওয়ালার পিতৃ-মাতৃ-উচ্চারণ আরম্ভ করিয়া দিল।

গুরু-শিষ্য দু'জনেই তখন বিশেষ চটিয়াছেন। বেশীর ভাগ, গুরুদেব, একবারে সপ্তমে চড়িয়া, বসিয়া উঠিলেন,—"বেটা আহাম্মুক্, বেটা উজ্‌বুক্, বেটা উল্লুক্! বেটা কপি কখনও তোর বাবার জন্মে দেখিস্-নি; তবে তুই কপি রাঁধ্‌তে গেলি কেন? যা' তুই দেখিস্‌নি, যা' তুই রাঁধ্‌তে জানিস্-নে, কেন, তা' তুই আমায় জিজ্ঞেসা করে নিস্-নি!" গুরুদেব এইরূপ গালি দেন, আর এক একবার তাঁহাকে মারিতে উদ্যত হয়েন! সঙ্গে সঙ্গে একটা বাটী ছুড়েই মারেন আর কি! এদিকে শিষ্যেরও সেইরূপ তাড়না!

গো-বেচারী ত্রিবেদী-ঠাকুর, ভয় পাইয়া, কাঁদিয়া ফেলিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"ঠাকুর-মশাই, আমায় মাপ করুন। আপনার কাছে থেকেই আমার এমন কুমতি হয়েছে। নইলে, নতুন কোন জিনিস রাঁধ্‌তে হ'লে, আগে আগে আমি তা' জেনে নিয়ে তবে রাঁধ্‌তেম। কিন্তু এই কয় দিন আপনার সংসর্গে থেকেই আমার এই দুর্ম্মতি হয়েছে।"

"সে কি! সে কি বলিস, হতভাগা!"—এই বলিয়া, গুরুদেব যেন আরও রাগভাব প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

ঠাকুরও কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন,—"সত্যি!—সত্যিই তাই! আপনার সংসর্গ-দোষেই আমার এমন হয়েছে। আপনি যেমন সকল শাস্ত্র ঘাঁটেন, সকল ধর্ম্ম-গ্রন্থ পড়েন, অথচ কোথাও ঈশ্বরের স্বত্বা পান না; আমারও ঠিক সেই দশাই হয়েছে। আমি কপির কেবলই পাতা দেখেছি—কপি দেখ্‌তে পাই-নি। আপনার ন্যায়, শাস্ত্রকে ভ্রান্ত ভাবিয়া—উহাতে ঈশ্বর নাই জানিয়া, 'কপিতেও' 'কপিকে' দেখিতে পাই নাই। তাই বলিতেছিলাম, আপনার সংসর্গে—আপনার দশাতেই আমাকে পাইয়াছে।" এই বলিতে বলিতে, ত্রিবেদী-ঠাকুর, আরও উচ্চ-চীৎকারে, ব্যাকুল-প্রাণে, কাঁদিতে লাগিলেন।

গুরুদেবেরও সেই হাতের গ্রাস হাতেই রহিল। অন্নমুষ্টি আর মুখে উঠিল না। তিনিও, ত্রিবেদী-ঠাকুরের ন্যায়, কাঁদিতে কাঁদিতে, অন্নত্যাগ করিয়া, পাগলের প্রায়, দাঁড়াইয়া উঠিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন,—"ঠিক! ঠিক! ঠিকই আমি তোমারই মত কপির পাতা হাঁটবাইতেছি,

অথচ 'কপি' যে কি, তাহা চিনিতে পারিতেছি না। শাস্ত্র, উপদেশ—সকলই দেখিতেছি; কিন্তু, বিশ্বাস ব্যতিরেকে, সকলই বৃথা হইতেছে। এই ঈশ্বর, ইহাতেই ঈশ্বর আছেন,—এ বিশ্বাস ব্যতীত, তাঁহাকে বাস্তবিকই কোথায় পাইব? কপির পাতা-ফেলার ন্যায়, শাস্ত্রের ধর্ম্ম-উপদেশ সকলে অবহেলা করিয়া, কোথায় তাঁহাকে পাইব? ঠাকুর! আজ তুমিই আমায় দিব্য-জ্ঞান দিলে!—তুমিই আমার পরকালের কাজ করিলে!—তুমিই আমার গুরুদেব! তোমার নিকট, আজ এতদিনে বুঝিলাম যে,—বিশ্বাস-ব্যতীত ভগবানকে পাওয়া যায় না—তর্কে তাঁহাকে কেহই পাইতে পারে না।"

বলা বাহুল্য, এই অবধিই গুরু-দেবের নাস্তিকতার অপনীত হয়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি একজন পরম ঈশ্বর-ভক্ত হইয়া, দিবানিশি ঈশ্বরের ধ্যান-ধারণায় নিযুক্ত হয়েন। এখন আবার তাঁহার উপদেশেও অনেক নাস্তিক-পাষণ্ড পরম সুচরিত্রবান হইয়া আসিতেছে। এখন তাঁহারই মুখে সদাই এই কথা,—"ঈশ্বরে বিশ্বাস কর, ঈশ্বরকে ভক্তি কর, তাঁহাকে পাইবে। তর্কে বা অন্য কোনরূপে তাঁহাকে কিছুতেই মিলিবে না। 'বিশ্বাসে মিলায় হরি, তর্কে বহু দূর'।"

তাই বলিতেছিলাম,—মানুষের মনে, কিরূপ কখন, কোন্ ভাবের উদয় হয়, তাহা কেহই বলিতে পারে না।

লিঙ্গায়িৎ বা বীরশৈব-সম্প্রদায়।

শাক্ত, বৈষ্ণব ও শৈব-সম্প্রদায়ের ন্যায়, ভারতভূমিতে অদ্যাবধি আর একটী সম্প্রদায় দৃষ্ট হয়; উহার নাম লিঙ্গায়িৎ-সম্প্রদায়। লিঙ্গায়িতেরা শিবলিঙ্গের উপাসক; কিন্তু ইহারা শৈব-সম্প্রদায় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। লিঙ্গায়িতের সন্তান জন্মাইবা-মাত্র উহার গলায়, একটু করা কাপড়ের দ্বারায় বন্ধন করিয়া, একটা শিবলিঙ্গ ঝুলাইয়া দেওয়া হয়; পরে, ঐ শিবলিঙ্গ, কেহ রূপার, কেহ বা সোণার, একটী ছোট বাক্সর ন্যায় নির্ম্মাণ করাইয়া, উহার ভিতর স্থাপন করতঃ, আজন্ম গলায় ঝুলাইয়া রাখে; এবং মৃত্যুর পর উহা মৃতদেহের সহিত গমন করে। যাহারা এইরূপ আজন্ম শিবলিঙ্গ নিজ-গলায় ধারণ করে, উহাদিগকেই লিঙ্গায়িৎ বা (শৈব হইতে পৃথক্‌রূপে জ্ঞাত করাইবার জন্য) বীরশৈব-সম্প্রদায় কহে। সন্তানের এই জাতকর্ম্ম সকলের করিবার অধিকার নাই; কেবল ইহাদের 'জঙ্গমই' (অর্থাৎ গুরু), তৎকালে উপস্থিত হইয়া, যথারীতি মন্ত্রপূত করতঃ শিবলিঙ্গ জাত-সন্তানের গলদেশে ঝুলাইয়া দেয়।

হিন্দুরা দীক্ষাকর্ত্তাকে গুরু বলেন; যেহেতু, গুরু অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যান্। লিঙ্গায়িতেরা দীক্ষাকর্ত্তাকে 'জঙ্গম' বলিয়া থাকেন। যেহেতু, 'জঙ্গম', স্থাবর হইতে পৃথক্ হওয়ায়, শ্বাসপ্রশ্বাস-লক্ষণযুক্ত আত্মাবান্‌কেই কহে; এবং আত্মাই যে প্রকৃত গুরু, এতদ্বারায় তাহাই লক্ষিত হয়। যদিও এই অর্থ লিঙ্গায়িতদের মধ্যে আজকাল প্রকাশ পায় না, তথাপি এই ধর্ম্ম-সংস্থাপয়িতার গুরুকে জঙ্গমাখ্যা প্রদান করায়, একমাত্র আত্মাকেই লক্ষ্য করা যে উদ্দেশ্য, তাহাতে কোন সন্দেহই নাই। ইহজগতে আত্মা ভিন্ন দ্বিতীয় উপাস্য আর কি আছে? যখন যখনই ধর্ম্মনাশের আশঙ্কা উপস্থিত হইয়াছে, তখনই কোন-না-কোন মহাত্মার আবির্ভাব ও তৎসহিত আত্মোপাসনার উদ্দীপন ও ধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইয়া গিয়াছে। লিঙ্গায়িতদের ইতিবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিলেও আমরা উহাই জ্ঞাত হই।

প্রায় ৮০০ বৎসর পূর্ব্বে বিজাপুর অঞ্চলের

এতদাকার মধ্যে, বিগ্‌ওয়াড়ি নগরে "বসাপ্পা" নামে কোন মহাত্মা জন্মগ্রহণ করেন। কেহ কেহ তাঁহাকে "বসান্না" বলিয়াও সম্বোধন করিত। বাঙ্গালা-ভাষায় যেরূপ সম্মানীয়কে মহাশয় বলে, কানারী ভাষায় সেইরূপ মান্য ব্যক্তিকে "আপ্পা" বা "আন্না" বলিয়া সম্বোধন করে; যেমন "এ আপ্পা", "এ আন্না"—অর্থাৎ "হে মহাশয়!" এইরূপ "বসাপ্পা" ও "বসান্না" শব্দের মহাশয়ার্থ্য "আপ্পা" ও "আন্না"-রূপ অংশ পরিত্যাগ করিলে, কেবল "বসা"-মাত্র অবশিষ্ট থাকে। কানারী ভাষায় "বসা"-শব্দে "বৃষভ" এই অর্থ ব্যক্ত করে। লিঙ্গায়িতেরা অদ্যাবধি "বসাপ্পাকে" মহাদেবের বাহন বৃষভের অবতার বলিয়া জ্ঞাপন করে। "বসাপ্পা" যে কানারা-মল্লুকের স্থানে স্থানে মহাদেবের গুণকীর্ত্তন এবং শিবলিঙ্গের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, আর ইহাই যে তাঁহাকে তদীয় বাহন বৃষের অবতারবাদ প্রদান করিয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তিনি বৃষের অবতারই হউন, আর নাই হউন, বাস্তবিক তিনি যে শিবের একজন পরম ভক্ত ছিলেন ও লিঙ্গোপাসনার বিস্তার করিয়া গিয়াছেন, ইহা স্থির।

সোলাপুর ও হাইদ্রাবাদের মধ্যবর্ত্তী "কল্যাণ"-নগরীতে "বিজ্জল" নামে একজন জৈন রাজা বাস করিতেন। "বসাপ্পা" যৌবনপদে পদার্পণ করিলে, তদীয় পিতা-মাতা তাঁহার বিবাহ-কার্য্যে সমুৎসুক হওয়ায়, তিনি তাঁহাদিগকে তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য সংক্ষেপে জ্ঞাপন করতঃ বিবাহ-বন্ধন হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইয়া, এই নৃপতির সন্নিধানে উপস্থিত হন। তথায় লোকের ধর্ম্মহীনতা-বিষয় রাজাকে জ্ঞাত করিয়া, উহার পুনরুদ্দীপনের বিষয় যত্নশীল হইতে তাঁহাকে অনুরোধ করিলে, তিনি বলিলেন,—"বসাপ্পা! হইতে পারে, আপনার উদ্দেশ্য অতি মহৎ; কিন্তু আপনি যে এই উদ্দেশ্য-পালনে সমর্থ, ইহা সপ্রমাণ না করিতে পারিলে, আমি বিশ্বাস করিতে পারি না।" তখন বসাপ্পা বলিলেন,—"রাজন! অমুক স্থানে ভূগর্ভে সমস্ত লিঙ্গপুরাণ নিহিত আছে; উহা আহরণ করিয়া, জনসমাজের মঙ্গলের পথ পরিষ্কৃত করুন।" ইহাতে রাজা উত্তর দিলেন,—"বসাপ্পা! হইতে পারে, আপনি কোন স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত, নিজে ঐ সকল গ্রন্থ লিখিয়া ভূগর্ভে নিহিত করিয়া, আমাকে এইরূপ অনুরোধ করিতেছেন! তবে যদি আপনি কোন স্থির প্রমাণ প্রদর্শন করিতে পারেন যে, এই সকল পুরাণ আদি ও অকৃত্রিম, তাহা হইলেই আপনার কথা বিশ্বাস-যোগ্য—নতুবা নয়।"

তখন 'বসাপ্পা', রাজসভার কিঞ্চিৎ দূরে কোন নির্জ্জন-প্রদেশে আসনগ্রহণ-পূর্ব্বক উপবিষ্ট হইয়া, অল্পে অল্পে নিজ মন ও বুদ্ধিকে তত্তৎ বিষয় হইতে আকর্ষণ-পূর্ব্বক, পরম পরাৎপর, শুদ্ধ, বুদ্ধ, অনাদি, অনন্ত আত্মায় লীন করায়, সংসার-চক্রের গতিরোধ হইল; সূর্য্যদেব স্থির রহিয়াছেন সকলে দেখিতে লাগিল; কথিত আছে, এই সময় ভাস্কর দুই দিবস একই স্থানে দৃষ্ট হইয়াছিলেন, অস্তমিত হইতে পারেন নাই। তখন জনসমাজে হাহাকার পড়িয়া গেল; জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ, মানব—সকলেই, সুষুপ্তি হইতে রমণোপভোগে বঞ্চিত হইয়া, একেবারেই অশান্ত ও অধীর হইয়া পড়িল; রাজ্য অচল হইল। রাজা তখন, প্রমাদ গণিয়া, সেই মহাত্মার শরণাপন্ন হইলেন; এবং কহিলেন,—"ভগবন্! আমি আপনাকে চিনিতে পারি নাই; আপনি নিজগুণে কৃপা করিয়া আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন। ভবাদৃশ মহতের শ্রীপাদপদ্মই মাদৃশ মূঢ়ের মুক্তির সোপান-স্বরূপ। আপনি আমাকে উদ্ধার করুন; এবং স্বয়ং এই সিংহাসনে

অধিরূঢ় হইয়া রাজ্য-শাসন ও ধর্ম্ম-সংস্থাপন করুন।”

এইরূপে অভিহিত হইয়া, ‘বসাপ্পা’ লিঙ্গোপসনার মাহাত্ম্য তাঁহাকে ব্যক্ত করিলেন; কিন্তু রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন না। তখন নৃপতি, তাঁহাকে প্রধান পাট্টা প্রদান করিয়া, নিজ-রাজ্য-মধ্যেই বাস করাইলেন। ‘বসাপ্পা’ সমস্ত লিঙ্গপুরাণের উদ্ধার করতঃ লিঙ্গোপাসনার বিস্তার করিতে লাগিলেন। অতঃপর তিনি কানারার স্থানে স্থানে ধর্ম্মপ্রচার করতঃ স্বীয় যশ বিকীর্ণ করিয়াছিলেন; তাই অদ্যাবধি লিঙ্গায়িতেরা মহাদেব হইতে অভেদ-জ্ঞানে তাঁহার অর্চ্চনা করিয়া থাকে। মহিশূর, চিত্তলদ্রুগ, গডগ্, হুব্‌লি, চারোয়ার, বেল্‌গাম্, সোলাপুর, হাইদ্রাবাদ, এবং কানারার অন্যান্য প্রদেশে বহুল পরিমাণে এই লিঙ্গায়িত সম্প্রদায়ের লোক বাস করে। পুনা, সাতারা ও বোম্বাই অঞ্চলেও আজকাল অনেক লিঙ্গায়িত দেখা যায়। ‘বসাপ্পা’ ইহাদের আদি ‘জঙ্গম’। ‘বসাপ্পা’, তিরোভাব-কালে, পাত্র বুঝিয়া, আর একটী ‘জঙ্গম’ করিয়া যান। এক জঙ্গমের মৃত্যুকালে এইরূপে দ্বিতীয় জঙ্গমের নিরূপণ হইয়া আসিতেছে। কিন্তু আজকাল জঙ্গমের ছড়াছড়ি। পূর্ব্বে জঙ্গমেরা বিবাহ করিতেন না; কিন্তু আজকাল কেহ কেহ বিবাহ করিয়া থাকেন। প্রবাদ আছে যে, চিত্তলদ্রুগ নগরীতে মূর্গাস্বামী নামে যে জঙ্গম আছেন, আজকাল তিনিই সর্ব্বপ্রধান। আধুনিক মহিশূর-রাজ এই মূর্গাস্বামীর শিষ্য।

মূর্গাস্বামীর পিতা (যিনি পূর্ব্বে জঙ্গম ছিলেন) বিবাহ করিয়াছিলেন। মূর্গাস্বামী তাঁহার জেষ্ঠ পুত্র; তটস্বামী মধ্যম, এবং কুমারস্বামী কনিষ্ঠ পুত্র। মনান্তর উপস্থিত হওয়ায়, তটস্বামী ও কুমারস্বামী চিত্তলদ্রুগ পরিত্যাগ করতঃ, স্ব স্ব অধিকার গডগ্ ও হুব্‌লিতে বিস্তার করিয়াছেন। এক্ষণে তটস্বামী ‘গডগের’ প্রধান জঙ্গম, এবং কুমারস্বামী হুব্‌লির প্রধান জঙ্গম। এতদ্ব্যতীত প্রতি গ্রামেই, অনেক জঙ্গম আছে। তন্মধ্যে কেহ বিবাহ করিয়াছেন, কেহ বা করেন করেন নাই। যাঁহারা করেন নাই, তাঁহারা এক এক মঠের অধিকারী; এবং যাঁহারা, করিয়াছেন, তাহারা দীক্ষা-প্রদান ব্যতীত অন্যান্য কার্য্যও করিয়া থাকেন। দেবকার্য্যের নিমিত্ত, জঙ্গমেরা, চাউল, ডাউল, প্রভৃতি অন্যান্য ধনসম্পত্তিও, যে পরিমাণে শিষ্যদের নিকট আনয়ন করিতে আজ্ঞা করিবে, শিষ্যেরা তাহা আনিতে বাধ্য। লিঙ্গায়িতদের মধ্যে জঙ্গমের আধিপত্য অস্মদ্দেশীয় গুরু অপেক্ষা অধিকতর বলিয়া বোধ হয়। এই সম্প্রদায়ের কোন-না-কোন লোকের সহিত হয়ত অন্যান্যের আহারাদি চলে না; কিন্তু মঠমধ্যে জঙ্গম আহ্বান করিলে, সকলেই এক পঙ্‌ক্তিতে আহার করিতে বাধ্য। তখন পরস্পরের মনোমালিন্য বিধৌত হইয়া যায়।

লিঙ্গায়িতেরা জীবহিংসা করে না। ইহাদের ধর্ম্মে মৎস ও মাংসাহার অতি পাপের কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হয়। ইহারা বলে,—অন্যের কি অধিকার যে, জীবের প্রাণসংহার করে? লিঙ্গায়িতেরা, যাহাদের গলায় শিবলিঙ্গ নাই, পারৎপক্ষে তাহাদের স্পর্শ করে না ও গৃহমধ্যে প্রবেশ করিতে দেয় না।

জঙ্গম-প্রদত্ত যে শিবলিঙ্গ গলায় ধরিয়াছে, লিঙ্গায়িতেরা প্রতিদিন উহা তিন বার, অর্থাৎ প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও সায়ংকালে, পূজা করিয়া থাকে। মধ্যাহ্ন-পূজা সমাপ্ত করিয়া তবে অন্ন-পানাদি গ্রহণ করে। কেহ কেহ দুই-তিন ঘণ্টা ধরিয়া ঐ লিঙ্গের অর্চ্চনা করে; কাহারও পূজা ৫ মিনিটে সমাপ্ত হইয়া যায়। যাহা হউক, এস্থলে বক্তব্য এই যে, ইহাদের মধ্যে অল্প লোকেই আজকাল শিবলিঙ্গোপাসনার প্রকৃত মর্ম্ম অবগত আছে। কাল-সহকারে, বোধ হয়, বসাপ্পার উপদেশ-

বাক্যের মর্ম্ম ইহাদের হৃদয় হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে সকলেই জঙ্গমের পাদোদক নিজগৃহে রক্ষা করে। গৃহে অপবিত্রতা হইলে, এই পাদোদক, তথায় ছড়াইয়া দিয়া উহার পবিত্রতা সমুৎপন্ন করা হয়; কেহ কোন পাপ কার্য্য করিলে, এই পাদোদক-পানই তাহার প্রকৃত প্রায়শ্চিত্ত বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

লিঙ্গায়িতদের মধ্যে ৪ হইতে ১২ বৎসর পর্য্যন্ত বিবাহ হইয়া থাকে। মৃত্যুর পর ইহাদের দেহ দাহ করা হয় না; কথিত শিবলিঙ্গের সহিত ভূগর্ভে নিহিত করা হয়। যোগীরা পুরাকালে ভূমিমধ্যে চিরকালের জন্য সমাধি লইতেন; লিঙ্গায়িতদের মৃত্যুর পর এইরূপ ভূমিমধ্যে দেহ-রক্ষা করা, বোধ হয়, উহারই বিকার-মাত্র; অথবা দাক্ষিণাত্যে মুসলমান-শাসনের ফল-বিশেষ। যাহাই হউক, কোন লিঙ্গায়িৎ মরিলে, তাহাকে অতি সমারোহের সহিত মাটি দিবার জন্য লইয়া যাওয়া হয়। প্রথমত, জঙ্গম একখানি কাগজে লেখে,—“ইহ শিবনু পর শিব।” অর্থাৎ “এই জগতের শিব, (আমি জঙ্গম) হইতে পর জগতের শিব;” অর্থাৎ, “আমি এই জগতের শিব পরজগতের শিবের নিকট এই ব্যক্তিকে প্রেরণ করিলাম।” পরে, এই জঙ্গম মহাশয়কে উত্তমোত্তম খাদ্য-দ্রব্য প্রদান করা হয়। জঙ্গম মহাশয় তখন মৃতব্যক্তির মস্তকে পদার্পণ করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া উহা উদরসাৎ করেন। তখন সেই আজ্ঞাপত্র শবদেহে বন্ধন করিয়া দেওয়া; হয় এবং উহাকে সুসজ্জিত করিয়া, বংশ-নির্ম্মিত ও নানা রঙ্গে চিত্রিত একটী ক্ষুদ্র কুটীরের মধ্যে উপবিষ্ট করাইয়া, উহাকে একখানি যোযানের উপর রক্ষিত করিয়া, সদ্‌গন্ধ বিস্তার পূর্ব্বক, বাদ্যোদ্যম ও আনন্দের সহিত লইয়া যাওয়া হয়।

লিঙ্গ-শব্দে চিহ্ন বা লক্ষণ বুঝায়। যাঁহারা শিব-স্বরূপ আত্মার লিঙ্গ অর্থাৎ চিহ্ন-সকল বিদিত হইয়া তদীয় সাধনায় প্রবৃত্ত হন, তাঁহারাই প্রকৃত লিঙ্গোপাসক। প্রাণ, অপান, নিমেষ, উন্মেষ, জীবন, মনোগতি, ইন্দ্রিয়ান্তর সঞ্চার প্রভৃতি, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, এই সকলই আত্মার বাহিরের চিহ্ন। সাধনা করিতে করিতে যখন ইহাদের কিছুই থাকে না, তখন জ্ঞান ও আনন্দ-স্বরূপ তদীয় লিঙ্গ অন্তরে ভাসমান হয়।

অদৃষ্ট।

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

আবার জয়গোপালের কথা।

আমি নিজের বৃত্তান্ত বলিতেই এতাবৎ বিব্রত ছিলাম। ফলতঃ শ্বশুরালয় হইতে আসা অবধি তাঁহাদের ও জয়গোপালের কোন খবর রাখি নাই। পাঠকবর্গ বোধ হয় জানিতে পারিয়াছেন যে, ডাক্তার বাবুর বাটীতে আসা অবধি নিজের ও সুলোচনার এবং হরিপদর ভাবনাতেই দিবারাত্রি নিযুক্ত ছিলাম। সম্প্রতি লোকমুখে জয়গোপালের ও শ্বশুর-মহাশয়দের আনুপূর্ব্বিক সমস্ত খবর জানিতে পারিয়াছি; সুতরাং আমিও যেমন যেমন শুনিয়াছি, যথাযথ পাঠকবর্গকে তাহাই অবগত করাইতেছি। আমি নিজের ভাবনায় ব্যস্ত ছিলাম বলিয়া, জয়গোপালের খোঁজ লইতে পারি নাই; কিন্তু পাঠকবর্গ তো আর সেরূপ নহেন! তাঁহারা অবশ্য আমার জন্যও যেরূপ ভাবিত হইবেন, জয়গোপালের জন্যও তদ্রূপ হইবেন, তাহার আর সন্দেহ নাই। সুতরাং আমার নিজের কথা লইয়া থাকা আর ভাল দেখায় না।

জয়গোপালকে শ্বশুরালয় হইতে লইয়া গিয়া যথাবিধি হাজতে রাখা হইল। আমি

মহকুমায় যাইয়া একজন সুদক্ষ উকীলকে টাকা দিয়া ওকালতনামা দেওয়াইয়াই, বারাকপুরে ডাক্তার বাবুর বাটীতে চলিয়া গিয়াছিলাম। অনন্তর, শ্বশুরমহাশয়, এই মকর্দ্দমার সমস্ত হাল অবগত হইয়া, স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন যে, ইহাতে বিলক্ষণ অর্থ ব্যয় হইবে। এজন্য তিনি, হাজতে গিয়া, জয়গোপালের সহিত পরামর্শ করিলেন যে, এত টাকা কি প্রকারে সরবরাহ হইবে। জয়গোপাল প্রথমতঃ জয়দুর্গার গহনা বিক্রয় করিতে বলিবেন, স্থির করিলেন; কিন্তু পর-ক্ষণেই ভাবিলেন যে, জয়দুর্গা ত আর মহামায়া নয়, যে, স্বামীর বিপদের সময় প্রাণ দিয়াও সাহায্য করিবে! জয়দুর্গা যে তাঁহাকে ভাল বাসিত না, তাহা তিনি জানিতেন; এবং গহনা চাহিলে, পাছে জয়দুর্গা না দেয়, এজন্য, তাঁহার খরিদা তাঁহার শ্বশুরবাটীর গ্রাম ও নিজগ্রাম এই দুইটী বিক্রয় করিতে বলিলেন। এ প্রস্তাবে শ্বশুরমহাশয় প্রথমতঃ আপত্তি করিলেন; কারণ, তাঁহার মনোগত ভাব এই যে, গ্রাম দুইটী বিক্রয় করিলে, তাঁহারই নিজের অন্ন-মারা যায়! এজন্য, তিনি, জয়-দুর্গার নানাপ্রকার সুখ্যাতি করিয়া, তাহারই গহনা বিক্রয় করিবার পরামর্শ দিলেন; কহিলেন,—"বাবা, তুমি ঈশ্বরের ইচ্ছায় ভালয় ভালয় খালাস হয়ে এস; আবার কত গহনা দিতে পার্‌বে।" শ্বশুর-মহাশয়ের কথা শুনিয়া, জয়গোপাল মনে মনে বড়ই কষ্ট পাইলেন; ভাবিলেন,—বিধাতা তাঁহার ভাগ্যে যে স্ত্রী দিয়াছেন, তাহা হইতে তিনি সুখী হইলেন না; তাঁহার শ্বশুর-মহাশয় যে প্রস্তাব করিয়াছেন, তাহাতে সে রাজি হইবে না। এজন্য, তিনি শ্বশুর ও শাশুড়ীর দোষ দিতে পারেন না; কারণ, মহামায়াও তো তাঁহা-দেরই কন্যা! মহামায়া স্বামীভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। এই সকল ভাবিয়া, তিনি, একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, কহিলেন,—"সে সমস্ত বিষয় এক্ষণে আমাকে জিজ্ঞাসা করা নিষ্প্রয়োজন। যেরূপে হয়, টাকার যোগাড় করিয়া, আমাকে খালাস করিবার চেষ্টা পাইবেন।"

অনন্তর জয়গোপালের শ্বশুর এ মকর্দ্দমায় কোন্ কোন্ উকীলকে নিযুক্ত করিবেন, জিজ্ঞাসা করিলেন। জয়গোপাল, এই কথার উত্থাপন শুনিয়া, যে যে ভাল ভাল উকীলের নাম করিতে লাগিলেন, আমার নিযুক্ত উকীল ছাড়া, তাহার আর সকল ভাল উকীলই কোম্পা-নীর তরফ হইতে নিযুক্ত হইয়াছেন শুনিয়া, বিমর্ষচিত্তে শ্বশুরমহাশয়কে কহিলেন,—"তবে দুই একজন ভাল ব্যারিষ্টার আনিবার চেষ্টা পাইবেন।" এই কথা বলিয়া, জয়গোপাল মস্তক অবনত করিয়া রহিলেন। শ্বশুর-মহাশয়, জয়গোপালের ঈদৃশ ভাব দেখিয়া, —"তবে আমি আসি, আমা দ্বারা যতদূর সম্ভব, যোগাড় হইবে"—এই বলিয়া, প্রস্থান করিলেন।

যতক্ষণ শ্বশুর-মহাশয় জয়গোপালের নিকট ছিলেন, ততক্ষণ জয়গোপাল নানা কথা-প্রসঙ্গে একরূপ ভাল ছিলেন। শ্বশুর-মহাশয় চলিয়া গেলে, তিনি নানা-প্রকার ভূত-ভবিষ্য-তের ভাবনায় নিযুক্ত হইলেন; এবং তাঁহার স্ত্রী ও মহামায়ার স্বামীভক্তি, এই উভয়ের তারতম্য অনুধাবন করিয়া বিশেষ দুঃখ পাইলেন।

এদিকে শ্বশুর-মহাশয় বাটী পৌঁছিয়া দেখিলেন, সকলে তাঁহার আগমন-প্রতীক্ষায় উৎসুক-হৃদয়ে বসিয়া আছে। গ্রামের দুই চারি জন ভদ্রলোকও, যাঁহারা মাঝে মাঝে জয়গোপালের আনীত সাধারণ দুর্লভ দ্রব্যাদি খাইয়া রসনা পরিতৃপ্ত করিতেন, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট জয়গোপালের বৃত্তান্ত শুনিবার জন্য, উৎসুক-হৃদয়ে বসিয়া আছেন।

এমন সময়ে, ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাটী আসিয়া উপস্থিত হইলেন; এবং "তামাক দে" বলিয়া মাথা ধরিয়া বসিয়া পড়িলেন। সকলে কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া, তামাক আসিলে, ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিজেই জয়গোপালের জন্য দুঃখ-প্রকাশ করিয়া, বলিতে লাগিলেন,—"বাবার আমার মুখ দেখে আজ আমি জ্ঞান-হারা হয়েছি। সে চেহারাও নেই, সে স্বরও নেই; কেবল বসে বসে 'কি হবে' এই ভেবে হাপুস্ নয়নে কাঁদ্‌ছেন। আমি বিস্তর সান্ত্বনা ও ভরসা দিয়ে, মকর্দ্দমার খরচ-পত্রের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। বাবা সমস্ত ভার আমাদের উপর দিয়াছেন; বল্লেন,—'আপনি ও পিতা-ঠাকুর মহাশয় ও পাড়ার অন্যান্য ভদ্র-লোকে যেরূপ বিবেচনা করিবেন, তাহাই আমার মত।' এক্ষণে, তিনি তো বলে খালাস! আমরা কি করি? বিষয়-আশয়গুলি কি আগে ঘুচান পরামর্শ হয়? আর, যদি আমরা তাই-ই করি, তবে পরিণামে এই একটা কথা হতে পারে যে, জয়দুর্গার গহনা থাক্‌তে বিষয়গুলি আগে ঘুচান হল কেন? আমারই মেয়ে; সুতরাং আমারই দোষটা বেশী হবে। আপনারা কি বোঝেন?"

এই কথা শুনিয়া, ভদ্রলোক দুই-একজন যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, সকলেই একবাক্যে কহিলেন,—"আপনি যা অনুমতি কচ্চেন, তা সত্য বটে। বিশেষ, আপনি পাড়ার মধ্যে প্রাচীন; আপনি যা বুঝ্‌বেন, এমন কি আর কেউ বুঝ্‌তে পার্‌বে? আরও একটা কথা এই যে, বিষয় একবার গেলে সে রকম আর একটা খুঁজিয়া মেলা কঠিন; কিন্তু গহনা-সম্বন্ধে যত গড় দেবে, তত মিষ্ট হবে। জয়দুর্গার যে গহনা আছে, জয়গোপাল খালাস হয়ে এসে, মনে করলে, তার চাইতেও ভাল গহনা গড়িয়ে দিতে পারেন! তা' এবিষয়ে আপনি যাহা মত করেচেন, আমাদেরও সেই মত।" এই বলিয়া, তাঁহারাও হুঁকাটি লইয়া দুই একটান দিয়া, যে যাঁহার বাটী চলিয়া গেলেন। তখন, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গৃহিণী ও জয়দুর্গা উভয়ে দাওয়ার উপর আসিয়া সমস্ত বিষয় পুঙ্খানু-পুঙ্খরূপে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। জয়-দুর্গার পিতা সমস্ত কথার উত্তর দিয়া পরিশেষে গহনা বিক্রয়ের কথা তুলিলেন। তাহা শুনিয়া, জয়দুর্গার মাতা দুঃখ-প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন, —"আহা, বাছার দু'চারখানা যা' আছে, তা' নিয়ে আগে টান কেন? কেন তাঁর কি অন্য কোন টাকা-কড়ি নেই! তবে যে শুনেছিলাম, তিনি তেজারতি কর্‌তেন! কেন, সেই টাকা কেন আগে খরচ কর-না গিয়ে!" এই কথা শুনিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় কহিলেন,—"সে টাকা লোকের কাছে থেকে আদায় কর্‌তে অনেক দেরী হবে; তার আশায় থাক্‌লে বাবার আর আমার খালাস হ'তে হবে না।"

জয়দুর্গা, এই কথা শেষ হইতে না হইতেই, রাগতস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"এতদিকে এত টাকা থাক্‌তে আমার ঐগুলির উপরই সক-লের দৃষ্টি! যদি খালাস না হয়, তবে আমারই বা উপায় কি হবে, আর ছেলেটারই বা উপায় কি হবে? এটা একবার কেউ ভেবে দেখ্‌লেন না। আমি ওগুলি হাত-ছাড়া কর্‌তে পার্‌বো না—এতে যিনি তুষ্টই হ'ন, আর রুষ্টই হ'ন!" এই বলিয়া, জয়দুর্গা, ছেলেটীকে সজোরে ক্রোড়ে লইয়া, দ্রুত-বেগে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়, অতঃপর, হুঁকাটি রাখিয়া, একটি তালপাতার আসনের উপর উপবিষ্ট হইয়া, উরু পর্য্যন্ত কাপড় তুলিয়া, গৃহিণীর নিকট তৈল চাহিলেন। গৃহিণী তৈল আনিয়া দিলে, তৈল মাখিয়া, নিকটস্থ নদীতে গিয়া স্নান-আহ্নিক সমাপন-পূর্ব্বক, ঠাকুরপূজা ইত্যাদি সমাধানান্তে, আহার করিতে বসিলেন। আহার করিতে বসিয়া, গৃহিণীর সহিত পরামর্শ করি-

লেন,—যখন জয়দুর্গা আহারান্তে পুত্র-ক্রোড়ে করিয়া শয়ন করিবে, সেই অবকাশে সিন্দুক হইতে জয়দুর্গার গহনা-গুলি সরাইয়া ফেলি-বেন, এবং পরে একদিন চুরী হইয়াছে বলিয়া সিন্দুক খুলিয়া রাখিবেন।

আহারান্তে ভট্টাচার্য্য মহাশয় নাক ডাকা-ইয়া ঘুমাইতেছেন ; তাঁহার গৃহিণীও নিম্নদেশে মেজের উপর একটী মাদুর পাতিয়া এ-ও-সে নানা-প্রকার ভাবিতে ভাবিতে নিদ্রাগত নিদ্রা-ভিভূত হইলেন। জয়দুর্গা, ইতিপূর্ব্বে পিতা-মাতার পরামর্শ জানিতে পারিয়া, পুত্রটীকে ঘুম পাড়াইয়া নানা কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। পরে, পিতা-মাতা উভয়েরই নাক ডাকিতেছে দেখিয়া, কোমর হইতে চাবির থলো খুলিয়া (পিত্রালয়ে আসিলে সমস্ত চাবি জয়দুর্গার নিকটই থাকিত) সিন্দুক উদ্ঘাটনপূর্ব্বক জয়গোপালের ক্যাস-বাক্স হইতে গহনাগুলি বাহির করিয়া লইয়া, সিন্দুক পূর্ব্ববৎ বন্ধ করিয়া, গহনাগুলি রান্না-ঘরের এক কোনে পুতিয়া রাখিলেন। অতঃপর, খিড়কী দিয়া বাটী হইতে বহির্গত হইয়া, প্রাঙ্গন ও বাটীর পিছনদিক দেখিয়া, কোন লোক দৃষ্টিপথে পতিত না হওয়ায়, হৃষ্টচিত্তে যাইয়া পুত্র-ক্রোড়ে করিয়া শয়ন করিলেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়, বৈকালে উঠিয়া, স্বহস্তে তামাক সাজিয়া ধূমপানে পরিতোষ লাভ করিয়া, ইতস্ততঃ ভাবিয়া চিন্তিয়া, জয়গোপালের পিতার নিকট গমন করিলেন। গৃহিণীকে বলিয়া গেলেন, তিনি আর সে রাত্রি বাটী আসিবেন না।

জয়গোপালের পিতা, রাত্রিকালে বৈবাহি-কের আগমনে বড়ই সন্তুষ্ট হইয়া, জয়গোপাল ও জয়দুর্গার কুশল জিজ্ঞাসিলেন। ভট্টাচার্য্য মহা-শয় সে কথায় কোন উত্তর না দিয়া বসিয়া পড়ি-লেন। ক্ষণকাল পরে, একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া "হায়, হায়, হায়," এই কথা বলিয়া, জয়গোপালের বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক সমুদায় বর্ণন করিলেন। এই কথা শুনিয়া, কথ… মধ্যে জয়গোপালের বৃদ্ধ পিতার চক্ষু কো… রুদ্ধ হইল ; এবং ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে… প্রস্তাব করিলেন, তিনি তাহাতেই স… হইলেন। সে রাত্রি তথায় অতিবা… করিয়া, পরদিন প্রত্যুষে ভট্টাচার্য্য মহা… জয়গোপালের বৃদ্ধ পিতার নি… বিদায় চাহিলেন। তখন বৃদ্ধ, কাতর… অবনতমস্তকে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দুখা… হস্ত ধরিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন,—"দোহাই মহাশয়, আপনাকে আর আ… কি বলিব ? জয়গোপাল আমার যেরূপ পু… আপনারও তেমনি। আপনার যদি কো… পুত্র থাকিত, তবেও তাহাকে জামাতা বলি… পারিতেন ; কিন্তু তাহা যখন নাই, তখন … আপনারও পুত্র। তাহার উদ্ধারের জ… আপনারও যাহা কর্ত্তব্য, আমারও তাহা… কর্ত্তব্য। সুতরাং বাটী-ঘর-দোর বিক্র… আমার সমস্ত বিক্রয় করিয়াও যদি জয়গোপা… খালাস হয়, তাহার চেষ্টা পাইবেন।" ভট্টা-চার্য্য মহাশয়—"সে কথা আপনাকে ব… কষ্ট পেতে হবে কেন ?"—এই বলিয়া, তাঁহা… নিকট হইতে বিদায় লইয়া, গৃহাভিমুখে গ… করিলেন।

পাপের প্রতিফল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

বীরেন্দ্রের শেষ সিদ্ধান্ত।

বীরেন্দ্র বরাবর ফিরিয়া আসিলেন ; তাঁ… আর ভ্রমণ করা হইল না। বাসায় আসি… নিজ-কক্ষের দ্বার বন্ধ করিয়া, শয্যার উপ… শয়ন করিয়া, কিয়ৎক্ষণ স্থির থাকিয়া, ব… লেন,—"নিশ্চয়ই হরদেব সিংহ স্বতঃ … পরতঃ ভূপলালকে খুন করেছে। নিশ্চয়… এ হত্যা-কাণ্ডে একটী গূঢ় রহস্য জড়ি… …ছে। নিশ্চই ভূপলাল কোন উপায়ে হর-দেবকে বাধ্য করেছিল ; এমন কি, সে বা' ব…ল্‌তো, হরদেবকে তাই করতে হতো ; সেই-জন্যই সে শত্রু নিপাত করেছে। কিন্তু, কি করে হরদেবের এই কার্য্য প্রমাণ করি !"

তৎপরেই ভাবিতে লাগিলেন,—"কিন্তু হর-দেবের বয়স যে শকটবানের কথিত বয়সের দ্বিগুণ ! তা'হলে কি হয় ? হরদেবকে দেখ্‌তে ঠিক ছোকরাটির মতই দেখায় ! সেই গৌরবর্ণ, সেই একহারা, সেই অল্প অল্প গোঁপ—ঠিক এই-ই বটে ! যদিও কাঁচা-পাকা চুল ; কিন্তু রাত্রে জোৎস্নার আলোকে তা কি আর চেনা যায় ! যাইহোক, অত সন্দেহেই বা দরকার কি ? একদিন জোৎস্না রাত্রে দেখ্‌লে, আমিই তো বুঝ্‌তে পারি যে,—তারে ছেলে-মানুষ বলে বোধ হয় কি না ? একদিন কেন,—আজই দেখ্‌বো !" ইহার পরই, আবার ভাবিতে লাগিলেন,—"তা' যেন হ'লো ! চেহারাও ঠিক যেন মিল্‌লো ! কিন্তু প্রমাণ ? এখন, দেখ্‌তে হবে, হরদেব কাল রাত্রে বাড়িতে ছিল কি না ?—কিম্বা কত রাত্রে বাটীতে এসেছিল ! তাতে যদি দেখি, সে বাহিরেই ছিল, তবে নিশ্চয়ই সেই খুন করেছে, তার আর সন্দেহ নেই। এখন, কোনরূপে একবার ফেল্‌তে পার্‌লে হয় ; তারপর, দেখি, কত ধানে কত চাল !"

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতেই, বীরেন্দ্র ব্যস্ত হইয়া দ্বারোদ্ঘাটন করিয়া বাহির হইলেন।

সূর্য্য অস্ত-গমন করিয়াছেন; সন্ধ্যা হইয়াছে ; এখনি চন্দ্র উদিত হইবেন। হরদেব সিংহের বহির্দ্বারে দ্বারবানগণ কেহ মুগুর ফিরাই-তেছে, কেহ কুস্তি করিতেছে, কেহ বা উচ্চ-কণ্ঠে অথচ নাকী-সুরে গান করিতেছে। এমন সময়, বীরেন্দ্র তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া, একজন দ্বারবান বলিল,—"কর্ত্তা মহাশয় বাটীতে নেই ; তিনি বেড়াতে গিয়েছেন।"

বীরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আস্‌বেন কখন ?"

দ্বারবান্‌।—তা জান্‌বো কেমন করে ? উঁর যেদিন যখন ইচ্ছা, আস্‌তে পারেন। এইত কাল রাত্রে মোটেই এলেন না ! কোন কোন দিন দুপুর উৎরেও যায়।

বীরেন্দ্র, আর কোন কথা না বলিয়া, সেখান হইতে ফিরিয়া চলিলেন।

হরদেবের বাটী নগরের এক প্রান্তে। বাটীর চারিদিকে উদ্যান। বহির্দ্বার হইতে বৃক্ষ-শ্রেণীর মধ্য দিয়া প্রশস্ত পথ বহুদূর পর্য্যন্ত আসিয়া রাজপথে মিলিয়াছে।

বীরেন্দ্র সেই পথ দিয়াই গিয়াছেন ; সেই পথ দিয়াই আসিতেছিলেন। তাঁহার মন দিয়া প্রবল চিন্তার স্রোত প্রবাহিত হইতে-ছিল। অন্যমনস্কে চলিতে চলিতেই তিনি সেই পথ অতিক্রম করিয়া রাজপথে আসিয়া-ছেন ; অথচ তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই।

অপর দিক হইতে চারিটি যুবা হাত ধরা-ধরি করিয়া আসিতেছিল ; বীরেন্দ্রের নিকট আসিয়া তাহারা হাত ছাড়িয়া দিল। বীরেন্দ্রও চাহিয়া দেখিলেন,—চারিজনেই একহারা, গৌরবর্ণ, গোলাপী চাপকান ও সাদা পায়জামা-পরিহিত। যুবক-চতুষ্টয় চলিয়া গেল।

বীরেন্দ্র অস্ফোটস্বরে বলিলেন,—"আজ কি আমায় ধাঁধা দিবার জন্য বীরনগরের সকলেই এক পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়েছে ! কিন্তু, তারা জানে না যে, আমি হত্যাকারীর অনুসন্ধান পেয়েছি ! এখন কেবল প্রমাণ সংগ্রহ করতে পার্‌লেই সে হয় !"

এমন সময়, শোভনলালের সঙ্গে হরদেব সিংহ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। বিমল চন্দ্রালোকে বীরেন্দ্র দেখিলেন,—"হরদেবকে প্রকৃতই ২৩।২৪ বৎসরের যুবা বলিয়া ভ্রম হয়। বীরেন্দ্রের মনে আর কোন সন্দেহ নাই। তিনি

হরদেবকে নমস্কার করিয়া, পথ-পার্শ্ব দিয়া, অন্যদিকে চলিয়া গেলেন।

হরদেব শোভনলালকে বলিলেন,—"কেমন শোভনলাল, এখন কি ?"

শোভনলাল বলিলেন,—"না ভাই! তোমার কাছে পারবার যো নেই! এই বুড়ো বয়েসে তোমার এতও আসে ?"

হরদেব বলিলেন,—"কিন্তু ভাই, তুমি অনুসন্ধান কর, কে আমার এই উপকার করেছে!"

শোভনলাল বলিলেন,—"প্রাণ-পণে তা' তো কর্‌বো। এ কার্য্যে আমারও স্বার্থ আছে!"

হরদেব।—তবে ভাই, এখন চল, আমার বাড়ীতেই আজ আহারাদি হবে।

শোভনলাল।—আজ থাক, আজ আমার একটু বিশেষ কাজ আছে। কাল প্রাতে তোমার ওখানে যাব। যা কিছু তোমার বলবার আছে, ব'লো। আমি এখন একবার কোতোয়ালিতে যাই।

এই বলিয়া, স্বতন্ত্র পথে প্রস্থান করিলেন। হরদেবও আপন আলয়াভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

শোভনলালের কর্ত্তব্য।

শোভনলাল, হরদেবের নিকট হইতে বিদায় হইয়া, বরাবর কোতোয়ালিতে গমন করিলেন। প্রধান কোতোয়াল বলেন্দ্র সিংহ বিমর্ষভাবে প্রাঙ্গনে পাদচারণ করিতেছিলেন; শোভনলালকে দেখিয়া বলিলেন,—"তবে ঠাকুর-দা, খবর কি, বল ? আজ বিকেলে যে আর এদিকে পদার্পণ হয় নি!"

শোভ।—আর দাদা! তোমার বিপদ দেখ্‌লে কি আমার স্থির থাকা উচিত! যদিও বুড়ো হয়েছি বটে, খুনটার অনুসন্ধান কর্‌তে পার্‌লে, তোমার যে কতকটা উপকার হবে, কি বুঝ্‌তে পারিনে!

বলেন্দ্র।—আর তোমার বুঝি কিছু উ কার হবে না!

শোভ।—আমার যে হবে না, এমন কথ বল্‌চিনে। তবে কিনা দাদা, বিয়ে হ'লে বয়ে ষোল আনা লাভ। তা' বলে, লুচি-মণ্ডা ভাগ্যে ফাঁক্ যায়, বল!

বলেন্দ্র।—তা' এখন কি ঠিক করে এ বল!

শোভন।—তোমার যে একেবারে ভ তাড়াতাড়ি দেখি! একেবারে ঠিক ? লাক্ না হলে কি বিয়ে হয়! কত সম্বন্ধ ফেরে, ঠিক হয়!

বলেন্দ্র।—তবু, কতদূর ?

শোভনলাল।—এই অল্প সময়ের ম এরূপ কার্য্য যতদূর হতে পারে, তার চে ঢের বেশী হয়েছে। আর যা হয়েছে, ফির্‌বার সম্ভাবনা নেই।

বলেন্দ্র।—তবু!

শোভনলাল।—ভূপলালের পূর্ব্ব-বৃত্ত জান্‌বার উপায় ঠিক হয়েছে; কাল সবই জান্‌তে পার্‌বো। তারপর, হয়ত ম পর্য্যন্তই বা যেতে হয়।

বলেন্দ্র।—আজ বিকালে ঘোষণা হয়ে —যে হত্যাকারীকে ধর্‌তে পার্‌বে, একহাজার টাকা পারিতোষিক পাবে; ধরবার সমস্ত ব্যয় রাজ-সরকার হতে পা যাবে। তুমি যদি ধর্‌তে পার—এমন তা'হলে কোষাগার থেকে একশ' টাকা পা নেও-গে যাও।

শোভনলাল।—কাল প্রাতে ভূপ সম্বন্ধে সমস্ত বিবরণ সংগ্রহ করে, তারপর পরিমাণে পাথেয় প্রয়োজন হবে, নেবো। এ বাড়ী যাই।

এই বলিয়া, শোভনলাল, কোতোয়ালী ত্যাগ করিয়া, গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

পথে যাইতে যাইতে তিনি বলিলেন,—"এখন কর্ত্তব্য কি ?—কিরূপে অনুসন্ধান-কার্য্য নির্ব্বাহ কর্‌বো ?—হরদেবের কাছে যেটুকু জান্‌তে পার্‌বো, তা'তে এ কার্য্যে কতটুকু সহায়তা হবে ?—হত্যাকারীকে ধর্‌তে পার্‌বো-না কি ? চির-জীবন রাজ-সরকারে কাজ কর্‌লাম; কিন্তু কোনদিন কোন কার্য্য দ্বারা বিশেষ কিছু লাভ হয়-নি। কিন্তু এই কার্য্যটা যদি সম্পন্ন কর্‌তে পারি, তাহলে কিছু লাভ হতে পারে। দেখি, বিধাতা যদি সুপ্রসন্ন হন, সকলি হতে পারে। ভাল, এক কাজ কর্‌লে হয় না—সদাশিব জোতিষ ঠাকুরের বাড়ীতে গিয়ে গণিয়ে দেখি, ধর্‌তে পার্‌বো কি না ? যদি তিনি বলেন—ধর্‌তে পার্‌বে, তাহলেই একাজে হাত দেবো; নইলে, এ বুড়ো বয়সে আর বৃথা ঘুরে মর্‌বো কেন ? এখনি যাব কি ? না!—সকাল বেলাই গণাবার সময়; কাল প্রাতে, গণক-ঠাকুরের বাড়ী হয়ে, তারপর হরদেবের বাড়ী যাব। সেই ভাল।"

এইরূপে, কর্ত্তব্য স্থির করিয়া, শোভনলাল বাটিতে আসিলেন। কিন্তু তাঁহার পশ্চাতে যে আর একটি লোক' আসিতেছিল, তিনি তাহা লক্ষ্য করেন নাই।

বাঙ্গালার বিবরণ।

বর্দ্ধমান।

তৃতীয় প্রস্তাব।

এবারে তেজচন্দ্র বাহাদুরের বৃত্তান্ত বলিয়া আগামী বারে, রাজা প্রতাপচাঁদের কথা কহিব। যদি আবশ্যক হয়, তৎসঙ্গে তেজচন্দ্রের বিষয় আরও কিছু লিখিতে হইবে।

৯ তেজচাঁদ।—তিনি যেমন বদান্য, তেমনই শিষ্টাচারী ছিলেন। তেজচাঁদের পিতামহ মিত্রসেনের জ্যেষ্ঠ সহোদর কীর্ত্তিচন্দ্রের মিতে কৃষ্ণচন্দ্র রায় যে, বর্দ্ধমান রাজগোষ্ঠীর অধীনে রাজ-কর্ম্মচারী অর্থাৎ শিক্‌দার নিযুক্ত হইয়াছিলেন, গতবারে পাঠক, তাহা জানিয়াছেন। তাঁহারই পৌত্র রামকান্ত, উক্ত তেজচাঁদ বাহাদুরের অধীনস্থ জমিদারীর পত্তনি লইয়াছিলেন। যথা-সময়ে রাজস্ব দিতে বিলম্ব হওয়ায়, রামকান্তে ও তেজচাঁদে অসম্প্রীতি ঘটে। রামকান্তনন্দন রাজা রামমোহন রায়, বর্দ্ধমান-রাজবাটীতে উপস্থিত হইয়া, একদা রাজা তেজচাঁদকে দুই একটা শক্ত কথা কহিয়াও অক্ষত শরীরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়াছিলেন! ইহাতে বর্দ্ধমান রাজের সহিষ্ণুতার একশেষ দেখা যাইতেছে। শুনিতে পাই, এই উপলক্ষে উভয়ের মধ্যে যে অসদ্ভাব-বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল, তেজচাঁদ বাহাদুরের নিজের চেষ্টাতেই নাকি তাহা দলিত হইয়া গিয়াছিল। এই ঘটনা সত্য হইলে, ইহাতেও তাঁহার উদার মনের আভাস পাওয়া যায়। রামমোহন রায়ের জীবনীতে আর একটি ঘটনার কথা শুনিতে পাইয়াছি। তাহা যদি সত্য হয়, তবে তদ্দ্বারাও তেজচাঁদের এক মহান্ গুণের পরিচয় হইতেছে। একদা কোন সূত্রে রাজা তেজচাঁদ ও অন্য একজন ভদ্র-লোক, রাজা রামমোহন রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন; আর, রামমোহন রায়, উভয়কে তুল্য সমাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজা সর্ব্বদেশেই সুসম্ভ্রান্ত ব্যক্তি; অথচ তিনি এই সমান সম্মানে বিরক্ত হন নাই। এ দেশের পক্ষে ইহা কিন্তু এক বিস্ময়কর ব্যাপার! এই ঘটনা, বোধ করি, পূর্ব্বোল্লিখিত বিরোধের পূর্ব্ব-ঘটনা। তৎপরে ঐ বিরোধ মিটিয়া গিয়াছিল, এই প্রবাদ কেহ কেহ রটাইয়াছেন। উহাতেও নাকি তেজচন্দ্রই উদ্যোগী হইয়াছিলেন। এই বৃত্তান্ত

কিন্তু আমাদের বিশ্বাস-যোগ্য বোধ হয় নাই; কেন, পর-প্রস্তাবে তাহার কথা লিখিব।

মহারাজ তেজচন্দ্র বাহাদুর সর্ব্ব-শুদ্ধ সাতটি বিবাহ করেন। তন্মধ্যে এক রাণীর নাম নানুকী রাণী। তাঁহারই গর্ভে প্রতাপচাঁদের উৎপত্তি হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন আর দুই রাণীর কথা উল্লেখ করিব। যাঁহাদের সঙ্গে আমাদের প্রবন্ধের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, তাঁহাদের কথাই আমাদের আলোচ্য। অন্যথা বহুবিবাহের তালিকা প্রস্তুত করা উপস্থিত ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক হইবে।

"মহারাজ তেজচন্দ্রের মধ্য-বয়সের একটা কথা বলি, তাহাহইলে তাঁহার চরিত্রের আর এক দিক্ দৃষ্ট হইবে। তিনি একদিন একটি দরিদ্র বালিকাকে পথে খেলিতে দেখিলেন। বালিকা পরমা সুন্দরী। মহারাজ তৎক্ষণাৎ তাহার পিতার সন্ধানে লোক পাঠাইলেন। লোক আসিয়া বলিল,—'পিতার নাম কাশীনাথ।* কাশীনাথ জগন্নাথ-দর্শনে যাইবে বলিয়া সপরিবারে লাহোর হইতে এখানে আসিয়াছে। সে ব্যক্তি জাতিতে ক্ষত্রিয়।' মহারাজের আর বিলম্ব সহিল না। দরিদ্রকে অর্থলোভ দেখাইয়া, কন্যাটিকে তিনি বিবাহ করিলেন। কন্যাটির নাম কমলকুমারী। তিনিই মহারাণী কমলকুমারী হইলেন।"

এইবার তেজচন্দ্র রাজার বৃদ্ধ-বয়সের আরও দুইটি কার্য্যের কথা বলিব।

১। পরাণ বাবুর "এক পরমা সুন্দরী কন্যা অবিবাহিতা ছিল। তিনি, অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া, সেই কন্যা, বৃদ্ধ রাজা তেজচন্দ্রকে সম্প্রদান করিলেন। লোকে অবাক্ হইল। কন্যার নাম বসন্তকুমারী। তিনিই মহারাণী বসন্তকুমারী নামে পরিচিতা।" ইনিই সাতরাণীর সর্ব্ব-কনিষ্ঠা। প্রতাপচন্দ্রের জননী কোন্ রাণী, অর্থাৎ প্রথমা, কি দ্বিতীয়া রাণী, অথবা কমলকুমারীই বা কোন্ রাণী হইয়াছিলেন, তাহা জানিতে চেষ্টা করি নাই; জানা তত আবশ্যকও মনে করি না।

২। "প্রতিদিন প্রাতে দেওয়ান, মোসাহেব ও অন্যান্য কর্ম্মচারীরা, অন্দর-মহলের দ্বারে আসিয়া, তেজচন্দ্র বাহাদুরের বহির্গমন প্রতীক্ষা করিতেন। তেজচন্দ্র, যথা-সময়ে, এক স্বর্ণ-পিঞ্জর হস্তে করিয়া, বহির্গত হইতেন। পিঞ্জরে কতকগুলি "লাল"-নামা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পক্ষী আবদ্ধ থাকিত। তিনি তাহাদের ক্রীড়া ও কোলল দেখিতে দেখিতে আসিতেন। সম্মুখবর্ত্তী হইবামাত্র, তাঁহাকে সকলে অভিবাদন করিত। মহারাজও হাসিমুখে তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতেন। এক দিন প্রাতে, তিনি পিঞ্জর-হস্তে অন্দর-মহল হইতে বহির্গত হইতেছেন, এমন সময়, এক জন প্রধান কর্ম্মচারী অগ্রসর হইয়া যোড় করে নিবেদন করিল,—'মহারাজ! হুগলীতে খাজনা দাখিল করিবার নিমিত্ত সে দিবস যে এক লক্ষ টাকা পাঠান হইয়াছিল, তাহা তথাকার মোক্তার আত্মসাৎ করিয়া পলাইয়াছে।' তেজচন্দ্র বিরক্ত হইয়া উত্তর করিলেন,—'চুপ্! হামারা লাল খবরাওয়ে গা।' এক লক্ষ টাকা গেল শুনিয়া তাঁহার কষ্ট হইল না, কিন্তু কথার শব্দে লাল পক্ষী ভয় পাইবে, এই জন্য তাঁহার কষ্ট হইল;—ইহা মনে করিয়া, কর্ম্মচারী বড় ব্যথিত হইলেন; এবং পাপিষ্ঠ মোক্তারকে সমুদায় টাকা উদ্গীরণ করাইব, নতুবা কর্ম্মত্যাগ করিব,—এই সঙ্কল্প করিলেন। মোক্তারের অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। কিছু কাল পরে সংবাদ আসিল যে, মোক্তার আপন বাটীতে বসিয়া পুষ্করিণী কাটাইতেছে, দেউল দিতেছে, আর যাহা মনে আসিতেছে তাহাই করিতেছে। কাজেই, তাহাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য রাজ-সরকার হইতে সিপাহী ও হাওয়ালদার বাহির হইল। কিন্তু রাজা তেজচন্দ্র তাহার কিছুই জানিতে পারিলেন না। কিছুদিন পরে মোক্তার ধৃত হইয়া রাজ-বাটীতে আনীত হইল। রাজা, মোক্তারকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি আমার এক লক্ষ টাকা চুরি করিয়াছ?"

মোক্তার।—না, মহারাজ! আমি চুরি করি নাই। আমি তাহা বাটীতে লইয়া গিয়াছি।

তেজচন্দ্র।—কেন লইয়া গেলে?

মোক্তার।—মহারাজের কার্য্যেই ব্যয় করিব বলিয়া লইয়া গিয়াছি। আমাদের গ্রামে একটিও শিবমন্দির ছিল না। কুমারীরা শিবমন্দিরে দীপদানের ফল পাইত না; যুবতীরাও শিবপূজা করিতে পাইত না। এক্ষণে মহারাজের পুণ্যে তাহা পাইতেছে। আর, একটি অতিথি-শালা করিয়াছি। ক্ষুধার্ত্ত পথিকেরা এখন অন্ন পাইতেছে।

তেজচন্দ্র।—তুমি কি সমুদায় টাকা ইহাতেই ব্যয় করিয়াছ?

মোক্তার।—'আজ্ঞে না—মহারাজ! আমাদের দেশে বড় জলকষ্ট ছিল; গো-বৎসাদি দুই প্রহরের সময় একটু জল পাইত না। আমি মহারাজের টাকায় একটি বড় পুষ্করিণী কাটাইয়াছি। মহারাজের পুণ্যে তাহার জল কিরূপ আশ্চর্য্য পরিষ্কৃত ও সুস্বাদু হইয়াছে, তাহা সিপাহীদিগকে জিজ্ঞাসা করুন।

তেজচন্দ্র।—পুষ্করিণীটি প্রতিষ্ঠা করিয়াছ?

মোক্তার।—আজ্ঞে না। টাকায় কুলায় নাই।'

তেজচন্দ্র।—এখন কত টাকা হইলে, প্রতিষ্ঠা হয়?

মোক্তার।—ন্যূনকল্পে আর দুই হাজার টাকা চাই।

তেজচন্দ্র।—কিন্তু দেখ, খবরদার, দুই হাজার টাকার এক পয়সা বেশী যেন না লাগে! তা'হলে আর আমি কিন্তু দিব না।

তাহার পর, পূর্ব্ব-কথিত কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া মহারাজ বলিলেন,—'আমি তো মোক্তারের কোন দোষ দেখিতে পাইলাম না। মোক্তার যাহা করিয়াছে, তাহাতে আমার টাকা সার্থক হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা আমি আর কি ভাল ব্যয় করিতাম?' কর্ম্মচারী নিরুত্তর হইল।"

তেজচাঁদ বাহাদুর মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আসিতেন; এ অঞ্চলের যাবতীয় প্রধান লোকের সহিত মিশিতেন; সকলে তাঁহাকে সম্মান করিতেন, তিনিও সকলকে ভাল বাসিতেন। অনেকের বাটীতে পর্য্যন্ত যাইতেন; মালিখার রাধামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈঠকখানায় মধ্যে মধ্যে গিয়া প্রমারা খেলিতেন*।

আমাদের দুরবস্থা।

রোগ স্থির না হইলে ঔষধের ব্যবস্থা ফলপ্রদ না হইয়া অনিষ্টকরই হইয়া থাকে। কিন্তু অগ্রে নিদান স্থির না করিলে প্রকৃত রোগস্থির হয় না। সুতরাং আমরা যে দুঃখ-রোগে আক্রান্ত হইয়াছি, তাহার নিদান অগ্রে স্থির করা আবশ্যক। এই নিদান স্থির করিতে গিয়া দেখিতে পাই যে, অভাবের আধিক্য ও অভাব-নিবারণের উপায়ের অজ্ঞতা—এই দুই কারণেই আমাদের ঈদৃশ যন্ত্রণাদায়ক দুঃখ উপস্থিত হইয়াছে। যে সংসারে আয় অল্প ও ব্যয় অধিক,

---

*এই ব্যক্তির এক পুত্র ছিল। তাঁহার নাম পরাণ। তিনিই ভবিষ্যতে পরাণ বাবু নামে খ্যাত হন। ভাগ্যক্রমে তিনি রাজ-পিতাও হইয়াছিলেন। পাঠক, সে বিবরণ পশ্চাৎ দেখিবেন

*রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত, মৎপ্রণীত বংশাবলি, বঙ্গদর্শন (১২৮৯), জাল প্রতাপচাঁদ প্রভৃতি পুস্তকের সাহায্যে এই প্রবন্ধ সঙ্কলিত হইল।

সে সংসারীর যে কত দুঃখ, তাহা কে না বুঝিতে পারেন! যে সংসারে উপার্জ্জনক্ষম লোক থাকেন, সে সংসারে ক্রমে ব্যয়াধিক্য হইতে থাকে। উপার্জ্জনের অল্পতা হইলে সংসারী দুঃখ-মগ্ন হয়। ঐ দুঃখ দূর করিতে হইলে, হয় আয়-বৃদ্ধি নয় ব্যয় অল্প করিতে হইবে। যিনি আয়-বৃদ্ধি করিতে না পারেন, তিনি যদি সুকৌশলে ব্যয় কমাইতে পারেন, তাহাহইলেও তিনি দুঃখ পান না। কিন্তু যিনি আয়-বৃদ্ধি না করিয়া ব্যয়-বৃদ্ধি করেন, তাঁহার দুঃখের ইয়ত্তা থাকে না। আমাদের অবস্থা ঠিক তাহাই হইয়াছে। পূর্ব্বকালে আর্য্য-মহাত্মাগণ অশেষ উৎসাহে নানাপ্রকার কার্য্য করিতেন—কৃষি, শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতির উন্নতি করিয়া আয়-বৃদ্ধির নানা পন্থা করিয়াছিলেন—তথাপি তাঁহারা ব্যয়-বিষয়ে সুনিয়মিত ছিলেন। ভোগ-লালসা তাঁহাদের অতিশয় অল্প ছিল। রাজাধিরাজেরাই বৃথা আমোদে অর্থ-ব্যয় করিতেন না। কালে উন্নতির পথ রোধ হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া, দিব্য-চক্ষু-সম্পন্ন আর্য্যগণ সকলেরই নির্দ্দিষ্ট জীবিকার পন্থা স্থির করিয়াছিলেন, এবং ব্যয়েরও সীমা নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। তদনুসারে চলিয়া, ভারত-বাসীগণ অধিক আয় করিতে না পারিলেও, পরিমিত আয় ও পরিমিত ব্যয়শালী ছিলেন; যে কোন প্রকারে নির্দ্দিষ্ট পৈতৃক বৃত্তি অবলম্বন করিয়া উপার্জ্জন করিতেন, ও অবস্থা-নির্দ্দিষ্ট চির-প্রথা-অনুসারে পরিমিত ব্যয় করিয়া সংসার চালাইতেন। কৃষক কৃষি-কার্য্য, তন্তুবায় বস্ত্র-বয়ন, কর্ম্মকার লৌহ-গঠন, ব্রাহ্মণ যজনাদি, বৈশ্য বাণিজ্যাদি দ্বারা আপনার আবশ্যক-মত উপার্জ্জন করিত, ও তাহা যথা-নির্দ্দিষ্ট নিয়মে ব্যয় করিয়া সুখে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিত। অধিকন্তু,আবশ্যক-মত ধর্ম্ম-কর্ম্ম, দরিদ্রাদিকে দান ও আত্মীয়-স্বজন-প্রতি-পালনও করিত। কাহারও কিছুরই অভাব হইত না। আপদ উপস্থিত না হইলে কেহই বৃত্ত্যন্তর গ্রহণ করিত না। সুতরাং কেহ কাহারও আয়ের পথে প্রতিবন্ধকতা করিত না। প্রত্যুতঃ পরস্পরের উপার্জ্জিত দ্রব্যের বিনিময়ে আপন আপন আবশ্যকীয় দ্রব্য গ্রহণ করিত। সুতরাং কাহারই অচল হইত না। কিন্তু, এক্ষণে সকলেরই আয় কমিয়াছে, অথচ ব্যয় বাড়িয়াছে।

সত্য বটে, এক্ষণে অনেক চাকুরি করিয়া মাসিক একশ' দুই শ' এমন কি কেহ কেহ তিন চারি হাজার টাকাও পাইতেছেন; অনেকে চিকিৎসায়,আইন-ব্যবসায়, দালালী, সম্বাদ-পত্র-সম্পাদন প্রভৃতি দ্বারাও ঐরূপ বা উহা অপেক্ষাও অধিক উপার্জ্জন করিতেছেন। কিন্তু অন্যদিকে সহস্র সহস্র লোক উপার্জ্জনাভাবে মৃতপ্রায় হইতেছে, এবং ব্যয়বৃদ্ধি হওয়ায় উপার্জ্জনক্ষম ব্যক্তিবর্গেরও অর্থ বাঁচিতেছে না।

পূর্ব্বে দেশের অর্থ দেশে থাকিত; সুতরাং লোকের ব্যয়-বৃদ্ধি হইলেও সে ব্যয়িত অর্থ দেশের লোকেই পাইত। সমাজের কেহ অল্প ও কেহ অধিক উপার্জ্জন করিলেও, বিনিময়-প্রথা ও দানাদি দ্বারা তাহা দেশের সকলেরই ভোগে আসিত। তখনকার ধনীরা যে সকল দ্রব্য ব্যবহার করিতেন, তাহা স্বদেশীয়গণের নিকট হইতেই লইতেন; সুতরাং স্বদেশীয় লোকেরাই সে অর্থ পাইত; এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সকল কেবল স্বদেশীয়েরাই পরস্পর বিভাগ করিয়া লইত। সুতরাং, তৎসমস্ত সুলভ হওয়ায়, সকলেরই ব্যয় অল্প হইত—অতিরিক্ত অর্থ অক্ষম দরিদ্রগণ প্রাপ্ত হইত। কিন্তু এক্ষণে প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি নানাদেশে যাইতেছে ও তাহার পরিবর্ত্তে অপ্রয়োজনীয় নানাবিধ দ্রব্য বিদেশ হইতে আসিতেছে। আমরা সেই অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলির বিনিময়ে প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি দিতেছি। কাজেই প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি অতিশয় দুর্ম্মূল্য হইয়া পড়িয়াছে—পূর্ব্বে মাসিক

দশ টাকা ব্যয়ে যে প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলি পাওয়া যাইত, এক্ষণে চল্লিশ টাকাতেও তাহা পাওয়া যাইতেছে না। সুতরাং এক্ষণে প্রয়োজনীয় দ্রব্য-সংগ্রহে চতুর্গুণ ব্যয় বাড়িয়াছে, বলিতে হয়। এতদ্ভিন্ন, ঐ অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলির জন্যও অর্থব্যয় করিতে হয়: তাহাতেও ব্যয় বাড়িয়াছে। অতএব, পূর্ব্বেকার ১০৲ টাকা ও এখনকার অন্ততঃ ৫০৲ টাকা আয় তুল্য। সুতরাং পাঁচ গুণ আয়বৃদ্ধি না হইলে পূর্ব্বের ন্যায় সচ্ছল অবস্থায় থাকিতে পারা যায় না। সকলেরই ৫ গুণ আয়বৃদ্ধি হওয়া সহজ কথা নহে। কতকগুলি লোকের আয় অবশ্য ৫গুণ অপেক্ষাও অধিক বৃদ্ধি হইয়াছে; কিন্তু অধিকাংশ লোকেরই আয় কমিয়াছে! কেন-না, আমাদের আর একটী উপসর্গ উপস্থিত হইয়াছে। বিদেশ হইতে কেবল অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যেরই আমদানী হইতেছে না; যে সকল শিল্পজাত দ্রব্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, তাহার অধিকাংশ দ্রব্যও এক্ষণে বিদেশ হইতে আসিতেছে—আর আমরা সেই সকল বিদেশীয় দ্রব্যের অনুরাগী হইয়াছি। পূর্ব্বে ঐ সকল দ্রব্য দেশীয়গণের নিকট হইতে লইতাম, এক্ষণে তৎসমস্ত বিদেশীয়দিগের নিকট হইতে লইতেছি। সুতরাং যে সকল লোক ঐ সকল শিল্প অবলম্বনে উপার্জ্জন করিত, এক্ষণে তাহাদের সে উপার্জ্জন-পথ রুদ্ধ হওয়ায় তাহারা অন্যান্য বৃত্তি অবলম্বন করিতেছে। সুতরাং সকলপ্রকার ব্যবসায়েরই দুরবস্থা হইয়াছে; এবং ঐ সকল অর্থ বিদেশে যাওয়ায়, [illegible] অর্থের অসদ্ভাব হইয়াছে। [illegible] গাড়, লবণ, চিনি, বিবিধ লৌহ দ্রব্য, সুবর্ণের অনুকরণ নির্ম্মিত দ্রব্য ও অন্য বহুতর দ্রব্য এক্ষণে রাশি রাশি বিদেশ হইতে আসিতেছে, আর আমরা তাহাই ব্যবহার করিতেছি। কাজেই, পূর্ব্বে যে সকল লোক ঐ সকল দ্রব্য প্রস্তুত করিত, এক্ষণে তাহারা অন্য বৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে। যে কার্য্যে যত লোক আবশ্যক, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক লোক সেই সকল কার্য্যে প্রবিষ্ট হওয়ায় তাহার আধিক্য হইয়াছে, ও সমস্তই অতিশয় অল্প-আয়কর হইয়া পড়িয়াছে। তাই আজি বি.এ পাস করিলেও যে লোকের চাকরি পাওয়া ভার, উৎকৃষ্ট পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশ করিয়াও অন্ন-সংস্থান হয় না, বড় বড় দোকান করিয়াও পেটে খাইতে কুলায় না। ডাক্তার, কবিরাজ, দালাল, চাকরী-প্রার্থী, দোকানদার এক্ষণে অলি-গলি। তুমি যদি বল—আমি দুই আনাতে দিব; আমি বলি—এক আনাতে দিব; আর একজন বলে—এক পয়সাতে দিব। এইরূপে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া পরস্পরের আয় কমায়। সুতরাং এক্ষণে আমাদের সকলেরই আয় অল্প হইতেছে। ইহার উপর ব্যয়াধিক্য উপসর্গ!

ব্যয় কত প্রকারে বাড়িয়াছে, দেখ! প্রথমতঃ বিলাতি অপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের ব্যবহার অতিশয় বাড়িয়াছে। সাবান, চুরুট, দিয়াশলাই, আয়না, চিরুনি, মোজা, রুমাল, জামা, ঘড়ি, চেন, লেবেণ্ডারাদি গন্ধ দ্রব্য, এক্ষণে সকলেই ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ এক্ষণে সকলকেই পুত্র-কন্যাদিগকে বিলাতি মতে শিক্ষাদান ও পীড়াদির চিকিৎসা করিতে হয়। পূর্ব্বে ব্রাহ্মণগণের বিদ্যা-শিক্ষা-ব্যয় আদৌ লাগিত না—যদিও বা লাগিত, তাহাও অতি অল্প; কিন্তু এক্ষণে একটী ছেলের বিদ্যা-শিক্ষাতে সহস্রাধিক মুদ্রা ব্যয় করিতে হয়। পূর্ব্বে সামান্য সামান্য রোগের চিকিৎসায় তো ব্যয় হইতই না; বড় বড় রোগেও প্রায় ৫০৲-৬০৲ টাকার অধিক ব্যয় হইত না। কিন্তু এক্ষণে একটী সামান্য রোগের চিকিৎসাও ৫০৲,৬০৲ টাকায় সম্পন্ন হয় না; অনেকে এক এক রোগে ৪।৫ হাজার টাকাও ব্যয় করেন। পূর্ব্বে

বিবাদ-বিসম্বাদ প্রায়ই জমীদারগণের বা সালীসীর দ্বারা মীমাংসিত হইত; সুতরাং তাহাতে কিছুমাত্র ব্যয় ছিল না বলিতে হয়। কিন্তু এক্ষণে নিয়তই পরস্পরের মধ্যে মকর্দ্দমা হইতেছে ও তাহাতে অজস্র ব্যয় হইতেছে। এক এক বিবাদে এক একজনের এখন লক্ষাধিক টাকা উড়িয়া যাইতেছে। আর একটী ভয়ানক উপসর্গ এক্ষণে উপস্থিত হইয়াছে। সে উপসর্গ,সাম্য-তত্ত্ব-মূলক। পূর্ব্বে যাহার যেমন অবস্থা, সে সেই-রূপে চলিত। কিন্তু এক্ষণে সকলেই উচ্চ চালে চলেন। সকলকেই ভোজে পোলাও প্রভৃতির আয়োজন করিতে হইবে, কন্যার বিবাহে সর্ব্বস্ব ব্যয় ও সুবর্ণালঙ্কার, ঘড়ি-চেন, দান-সামগ্রী, শতাধিক লোক-বাহ্য ফুল-শয্যা প্রভৃতি দিতে হইবে, নিমন্ত্রণে বস্ত্রাদি উপহার দিতে হইবে, ও পরিবারদিগকে স্বর্ণালঙ্কারে মণ্ডিত করিতে হইবে। তা' ছাড়া, এখন বসিবার ঘর আয়না-টেবিল প্রভৃতিতে সাজাইতে হয়; শাল-দোশালা-সার্ট-কামিজ, বিলাতি জুতা প্রভৃতি পরিতে হয়; সকলকেই ছেলে-মেয়েকে বিলাতি বিদ্যা শিখাইতে হয়। এইরূপ চাল যে কত বাড়িয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। কথায় যে বলে,—'ঘরে ছুঁচোর কীর্ত্তন, বাহিরে কোঁচার পত্তন'—ঠিক তাহাই হইয়াছে। আয় কিছু নাই—ব্যয় রাশি রাশি! ইহাতে আর লক্ষ্মী আসিবেন কি? এরূপ অবস্থাতেও যদি আমাদের দুঃখ না হইবে, তবে আর কিসে দুঃখ হইবে?

কবিতা ও গান।

উপহার।

জীবন-বসন্তাগমে, হৃদয়ের উপবনে
প্রতিদিন কত ফুল উঠিত ফুটিয়া;
সুখ-মণি পানে চেয়ে, হাসিত পাগল হয়ে,
আশা-বায়ু-সনে কত খেলিত নাচিয়া।
সেদিন গিয়াছে চলি, হৃদি এবে মরুস্থল,
যাতনা-তপন-তাপে সুষমা-বিহীন;
না ফোটে কুসুম তায়, নাহি বহে আশা-বায়ু,
মুখ-শশী চিরতরে হয়েছে মলিন।
নিদাঘ-দহনে জ্বলি', গিয়াছে বসন্ত চলি,
নাহি হ'তে তার অর্দ্ধকাল সমাপন,
সকলি গিয়েছে ছেড়ে, রয়েছে জীবন পড়ে
যাতনার মর্ম্মচ্ছেদী সহিতে দংশন।
গেছে সুখ, গেছে আশা, ফুরায়েছে ভালবাসা,
মাতেনা যশের লোভে অসাড় এমন,
কিছুই না'লাগে ভাল, ঘেরেছে বিষাদ-জাল,
মধু-শোভা-হীন-ফুল হয়েছে জীবন।
হেরিলে গগণে আর, পূর্ণচন্দ্র সুধাধার,
না'বহে উল্লাস-স্রোত জীবনে এখন,
জাহ্নবী যমুনা উরে, তরঙ্গের খেলা হেরে,
হরষ-তরঙ্গ হৃদে নাচে না তেমন।
সুখের বসন্তে হায়, বহিলে মলয়-বায়,
কি যেন কি ভাব হৃদে নাহি খেলে আর,
সরোবর-সোহাগিনী, প্রস্ফুটিতা মৃণালিনী
হেরিলে না' হয় হৃদে প্রীতির সঞ্চার।
সে সুগন্ধ, সেই শোভা, সে সৌন্দর্য্য মনোলোভা
প্রফুল্ল গোলাপে আর না থাকে এখন,
কম-কুসুমের হাসি, না বরষে সুধারাশি,
নাহি গায় পিক আর সুললিত গান!
জানি না ক'দিন আর, লয়ে এ জীবন-ভার,
লক্ষ্যশূন্য—আশাহীন—করিব ভ্রমণ;
সময়-সাগর-তীরে বেড়াই বিষাদে ফিরে,
আর যে সহিতে নারি যাতনা-দংশন।
প্রবাসে যাবার তরে, সময়-সাগর-ধারে
প্রস্তুত হইয়া আছি তরণীর আশে;
যেদিন আসিবে তরী, এসংসার পরিহরি
মহা-সুখে চলি যাব সুদূর-প্রবাসে।
হয়ত এ অনিত্য-ভবে, পুনঃ দেখা নাহি হবে
শেষ লেখা—এই লেখা অভাগ্য-জনম,
তাই ভাই, ধর, ধর, এই প্রীতি-উপহার
অভাগা-জনম-শোধ স্নেহ-নিদর্শনে!

আত্মীয়ের ব্যবহার, স্বজনের শিষ্টাচার,
জ্বালায়েছে যে অনল বুকের মাঝার,
সে আগুণে হৃদি মম, দহিতেছে অনুক্ষণ,
পুড়ে খাক্ হয়ে গেছে প্রাণের সুসার।
ঘুরে এ অনিত্য-ভবে, কাল-স্রোত ধুয়ে লবে,
অভাগার নাম, গন্ধ, বিষাদ, যাতন,
ভেব মনে সে সময়, সংসারের তাড়নায়,
অকালে ধরণী-বাস করি' সমাপন
অভাগা অনন্ত-কোলে শুয়েছে এ।

* *

বুঝিয়া না বুঝি?

(১)

বুঝি কায়া—সবই ছায়া,
বুঝি বিশ্ব—সবই মায়া,
নশ্বর জগৎ প্রতি তবু মন ধায়—
বুঝিয়া না বুঝি কেন বল' না আমায়?

(২)

প্রেমের প্রতিমা যেই,
মাটীর পুঁতুল সেই,
তার তরে কেন ভবে মরিবারে চাই?
ধুলার সংসারে যদি ধুলা বই নাই?

(৩)

যাতনার ভার সহি,
কলঙ্ক মাথায় বহি,
অকাতরে আজীবন কেন বা কাটাই?
কেন-রে পরের তরে বৃথা কষ্ট পাই?

(৪)

জানি সুখ—দুঃখ-মাখা
জানি দুঃখ—সুখ-ঢাকা,
মনের বিকার সব (ই) বুঝেছি অন্তরে;
তবু প্রাণ, কেন থাকে এ ঘোর বিকারে?

(৫)

জানি তুমি ভালবাস,
প্রাণের আঁধার নাশ,
কিন্তু মন নাহি বুঝে; পুন জিজ্ঞাসি তোমায়,
বুঝিয়া না বুঝি কেন, বল না আমায়?

কোকিল।

উঠিছে অমৃত জ্যোৎস্না ধীরে ধীরে ধীরে,
ডুবা'য়ে বিশাল বিশ্ব স্নেহ-পারাবারে,
লুটিয়া লহরী পড়ে দূরে নদী-নীরে,
বুক ভেঙ্গে প্রাণ যেন দিতে চায় তারে!
শ্যামল বাসন্তী সন্ধ্যা; বন উপবনে
হাসিতেছে শত শত কুসুম সুন্দর,
বহিছে মধুর বাস মেদুর পবনে,
আনন্দে ভাসিছে যেন দিক্-দিগন্তর!
কি দেখিয়া তুমি ইহা নিন্দা কর পিক,
'কু—উ' 'কু—উ' কোলাহলে ভরিয়া আকাশ;
কোথায় দেখিলে শোভা ইহার অধিক,
আতর-অমৃত-মাখা অধরের হাস?
কাল-রূপে মনে লয় শ্মশানের ছাই,
দেখিয়া এসেছ তাই এমন বড়াই!

* * *

শক্তি-সঙ্গীত।

(৺রামপ্রসাদী সুর।)

জীব্! এস, সংগ্রাম করি!
একবার দুর্গে চল, দুর্গা স্মরি।
(ওরে) বিপক্ষে নিয়েছে রাজ্য,
অনায়াশে বশ করি।
নিজ-প্রজা-পক্ষ, তারি পক্ষ,
তোর্ বিপক্ষ দল ভারি।
রসনা-বন্দুকে, ছড়া, কালী-নামের গুলি ভরি,
ক্রমশঃ ছাড়িতে থাক, প্রতিপক্ষ লক্ষ্য করি।
(ওরে) জয়্-পরাজয়্ পরের কথা,
দেখনা আগে যত্ন করি।
যত্নেতে কার্য্যসিদ্ধি হয়,
প্রমাণ আছে পৃথ্বী ভরি।
(ওরে) স্বপক্ষ বিপক্ষ হলে, সে হয় অত্যাচারী;
তাহা দেখায়েছে বিভীষণ, সবংশে রাবণে মারি।
(সেরূপ) মন্ বেটা তোর, আপন্ হয়ে,
কতই না করে চাতুরী!
তারে বদ্ধ কর্ত্তে পার্লে পরে,
সিদ্ধকাম হবে তোমারি।

(ওতোর) মন্‌কে করি সেনানায়ক,
ছয় জন্ রাখি সঙ্গী তারি।
বিপক্ষ পাপ্-রাজায়্ বাজায়্ ঐ শুন-না রণ-ভেরী।
রোহিণী! শ্রীগুরুর পদ পরম্ বল সঙ্গে করি,
চল রণ-রঙ্গে, দেখ্‌বো এবার্ সমর জিনে
সাধ্য কারি?

* * *

সাধু ও নীচ।

"ঘটে যদি সাধুর দীনতা অতিশয়,
আদর-গৌরব তাঁর কমিবার নয়।
নীচে যদি ধনী হয় কুবের সমান,
বাড়ে না কখন তার গৌরব-সম্মান।
পড়েছে যে মহামণি পঙ্কের ভিতরে,
বল তারে কোন্ জন অনাদর করে?
বায়ুস্থিত আকাশের ভস্ম-সমুদয়,
বল বল কার কাছে মাননীয় হয়?।"

মতামত।*

পুস্তক-সম্বন্ধে।

লালা গোলকচাঁদ।—পারিবারিক নাটক।—শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্র চন্দ্র বসু কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত।—এই নাটকখানির মূলতঃ ঘটনা এই;—পুলিন বিপিন দুই ভাই। উমেশচন্দ্র ডেপুটী। ডেপুটির যোগাযোগে, বিপিনের চেষ্টায়, একটা মিথ্যা মকর্দ্দমায়—পিতৃহত্যা-অপরাধে, গোবিন্দ প্রসাদ বানার্জ্জি নামক একটা আসামীর নামে, পুলিনের দীপান্তর-দণ্ড হয়। তারপর, পুলিনের বিষয়ের অধিকার, পুলিনের একমাত্র শিশু-পুত্রের হত্যা-চেষ্টা, স্ত্রীর সতীত্ব-নাশ-চেষ্টা—ইত্যাদি ইত্যাদি শোকোদ্দীপক ঘটনা ও তাহার আনুষঙ্গিক ক্রিয়া-কলাপে এই পুস্তকখানি পূর্ণ। অবশেষে অবশ্য, পুলিনের উদ্ধার, বিপিনের পতন—ধর্ম্মের জয় প্রভৃতি যেমন দেখান উচিত, তাহাই দেখান আছে। ১৩৫ পৃষ্ঠায় পুস্তকখানি পূর্ণ; সুতরাং অনেক লোকজন ও অনেক ঘটনারই ইহাতে অবতারণা আছে। তবে স্থূল বিষয় এইমাত্র,—দুই ভ্রাতার একজন পাষণ্ড, আর একজন নিরীহ; আর নিরীহের উপর পাষণ্ডের অত্যাচার। কাজেই, গল্পটা জমিয়াছে—ভাল; ঘটনার উপর ঘটনা-বৈচিত্র—শোকদৃশ্যের উপর আবার শোকচিত্র-অঙ্কন-চেষ্টা, অবশ্যই শোকোদ্দীপক। সুতরাং অভিনয়ে ইহা যে জমিবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি? অভিনয়ের জন্যই ইহা রচিত; সুতরাং সে উদ্দেশ্য যে অনেকটা সফল হইয়াছে, তাহা বলা বাহুল্য। তবে নাটক যে ইহা একখানি উচ্চশ্রেণীর হইয়াছে, তাহা কিছুতেই বলা যায় না। বিশেষতঃ এ নাটক চিত্র যে বাঙ্গালী-ঘরের চিত্র, তাহাও স্বীকার করিতে পারি না। নামগুলি বাঙ্গালীর, ভাষাটা বাঙ্গালা-মাত্র; নহিলে, বাঙ্গালীর পরিবার এখনও এত অধঃপাতে যায় নাই যে, তাহার এমন চেহারা-চিত্র আঁকিতে হইবে! বাঙ্গালীর ঘরের জেঠাই-মা কখনও এমন কথা মনেও আনিতে পারে না যে,—'এত বাসি দুধ দিচ্চি, তবু ছোঁড়া (শিশু দেবর-পুত্র) মর্ত্তে চায় না! * * * পেট ফেড়ে দিয়েছে, তবু তো মর্‌তে চায় না!" ফলতঃ ঘটনার বৈচিত্র দেখাইলেই নাটক হয় না; একটার পর একটা জমজমাট বাধাইলেই নাটকত্ব বর্ত্তে না। নাটকে যেমনটি তেমনটি দেখিলে যেমন আনন্দ হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না। কিন্তু, তেমন নাটক বাঙ্গালায় আর হইতেছে কৈ?

চারু-সাহিত্য।—প্রথম ভাগ।—জাহান্দি মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীব্রজনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। "কোমলমতি বালক-বালিকাদিগের" জন্যই এ পুস্তকখানি রচিত; এবং 'পাঠ্য-পুস্তক'-স্বরূপে ইহা পরিগণিত হয়, গ্রন্থকারের এমনই চেষ্টা। ছাপা ও কাগজ অবশ্য সেইজন্য বেশ ভালই দেওয়া হইয়াছে। যাইহোক, কোমলমতি বালকদিগের জন্য এই পুস্তকখানি রচিত, অথচ পুস্তকের এক পৃষ্ঠা উল্টাইয়াই দেখি,—"পিতৃদেব! শুনিতে পাইলাম, আপনার মৃত্যু ঘটনা অতি চমৎকার ব্যাপার! মৃত্যুর তিন প্রহর পূর্ব্বে স্বয়ং নাড়ি ধরিয়া, মরণের যে কাল নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, ঠিক সেই সময় উপস্থিত হইলেই পুনরায় নাড়ী ধরিয়া, তুলসীমূলে নিতে আদেশ করিলেন। * * * কিন্তু পিতঃ! আমি বড়ই হতভগা, অন্তিমকালে আপনার সেবা-শুশ্রূষা ও চরণ-কমল পূজা করিতে পারিলাম না! অহো! কি পরিতাপের বিষয়!!! জ্যেষ্ঠ সহোদরগণ! আপনারাই ধন্য! কনিষ্ঠ অখিল! তুমিও ধন্য! যেহেতু তুমিও পুত্র-কর্ত্তব্য পালন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছ। পিতাগো! সকল দুঃখই ভুলিতে পারিব, কিন্তু আপনি রোগশয্যায় শায়িত থাকিয়া, কোথায় ব্রজনাথ! কোথায় চন্দ্রনাথ! বলিয়া কাতর-কণ্ঠে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিয়াও যে হতভাগ্যদিগকে দেখিতে পান নাই, এ দুঃখ জন্মাবচ্ছিন্নে ভুলিতে পারিব না।" ইত্যাদি ইত্যাদি—আর কত তুলিব? এক্ষণে সন্দেহ, গ্রন্থকার কি বিকারগ্রস্ত? যাইহোক, আরও একটু দেখুন। গ্রন্থের 'নাবিক ও বানরের' গল্পের প্রথমেই এই,—"একদা একজন সাহেব বিক্রয় করিবার জন্য কতকগুলি উলের টুপি লইয়া, দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত এক অরণ্যে উপস্থিত হইলেন।" ঠিক কথা! অরণ্যে নহিলে টুপি বিক্রয়ের যায়গা আর কোথায়? ফলতঃ কত বলিব? গ্রন্থকারের মাথামুণ্ড কিছুই জ্ঞান নাই, অথচ তিনি ৪।৫ খানা পুস্তকের গ্রন্থকার!—একটা স্কুলের হেডপণ্ডিত! দেশের এম্‌নিই দুরবস্থা বটে!

নিশীথের অশ্রুধারা।—পরমার্থ বিষয়ক কবিতা।—শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বিরচিত। গ্রন্থকার বলেন,—'ছাপাইব মনে করিয়া একটী পদও লিখি নাই। অনিদ্রার সময় নানারূপ ভাল-মন্দ চিন্তা যখন মনে উঠিত, কোনক্রমে সময়-ক্ষেপণের জন্য, সেইগুলি লিখিয়া রাখিতাম।" যাহাই হউক, বাস্তবিক যাহা অশ্রুধারা, চিরকালই তাহা মর্ম্মস্পর্শী। কান্না, যেমন করিয়াই কাঁদ-না কেন, মন তা'তে ভিজেই ভিজে। বিশেষ, সেই আকুলি-ব্যাকুলি,—

"ধরি ধরি করি তায় ধরিতে না পারি হায়।
ছুঁইয়া প্রাণের তার কোথা যেন ভেসে যায়॥"

এ যে বোঝে, সেই মজে। কবিত্বে দরকার কি? অশ্রুতেই তো কবিতা!

উপদেশ-কথা।—ঐ রাজা বাহাদুর প্রণীত। উপদেশ কথা—যে ভাবেই হউক—মন্দ কি?

গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা।—১২৯৯ সালের। ৺ দুর্গাচরণ গুপ্ত মহাশয় 'গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার' প্রবর্ত্তক। তাঁহার পরোলোকান্তে তদীয় পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানচরণ গুপ্ত বি, এ, বি, এল মহাশয় এক্ষণে উহা প্রকাশ করিতেছেন। গণনাদির বন্দোবস্ত অবশ্য সকলই পূর্ব্বমতই আছে; অধিকন্তু ছাপাই প্রভৃতিরও অনেকটা

---

* অনেকদিন যাবৎ 'অনুসন্ধানে' কোন বিষয়েরই কোন 'মতামত' বাহির হয় নাই। এদিকে গ্রন্থকারগণ অকাতরে পুস্তক দিতেছেন; সাময়িক পত্র-সম্পাদকগণ পত্রাদি দিতেছেন; থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষগণও থিয়েটার দেখিবার জন্য 'পাশ' দিতেছেন; অথচ, অনেক দিন হইতেই, কাহারও বিষয় একটু টুঁ-শব্দও করি নাই। এত 'নিমক্‌হারামী' কি ভাল? তাই নববর্ষের শেষে, সকল জের মিটাইয়া দিতেছি। যাঁহার সম্বন্ধে যা' কিছু মনোভাব, তাহাই ইহাতে ব্যক্ত হইল।—শ্রী———'অনুসন্ধানের' সমালোচক মহাশয়।

ঊৎকর্ষ হইয়াছে। 'গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার' কাট্‌তি দেখিয়া আজকাল অনেক প্রতারক বড়ই জুয়াচুরী আরম্ভ করিয়াছে। 'গুপ্তপ্রেশ পঞ্জিকার' ন্যায় আকারের সব পঞ্জিকা বাহির করিয়া, কোনটার নাম দিতেছে,—"গুপ্ত যন্ত্রের পঞ্জিকা;" কোনটার বা নাম দিতেছে,—"গুপ্ত যন্ত্রের হিন্দু-পঞ্জিকা।" এমনই সব জুয়াচুরী! যাহাহউক, সাধারণে এসম্বন্ধেও সতর্ক থাকিবেন, এই নিবেদন।

লীলা।—প্রবন্ধময় পুস্তক।—শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীশচন্দ্র বসু প্রণীত। 'লীলা' গদ্য-কবিতা। প্রবন্ধ বটে, কিন্তু কবিত্বে-মাখা। কবিরা প্রায়ই 'ভুল' বকেন; দেখিলাম, এ লেখককেও সময়ে সময়ে সে দোষ বর্ত্তিয়াছে।

আদর।—সন্তানের প্রতি।—বর্দ্ধমান-নিবাসী শ্রীযুক্ত মদনলাল বর্ম্ম কর্ত্তৃক বিরচিত। সন্তানের প্রতি আদর—কে না করে? কিন্তু সে আদর—সকলের কি ভাল লাগে?

হিন্দু-বিজ্ঞান-সূত্র।—শ্রীবিশ্বনিন্দুক রায়, ওরফে বি, এন, রায় কর্ত্তৃক প্রণীত। পড়িতে ধৈর্য্য রহিল না; বুঝিতেও কিছু পারিলাম না। গ্রন্থকার তজ্জন্য মাপ করিবেন।

মেঘদূত।—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। কালিদাসের 'মেঘদূত' এক অপূর্ব্ব কাব্য। ইহা তাহারই পদ্যানুবাদ। অনুবাদ যেমন হয়, তেমনই অবশ্য হইয়াছে। সেই কটমট, সেই কষ্টবোধ্য, সেই ঘোড়ে-তারে মিল—অনুবাদের যেমনটি প্রকৃতি—ইহাতে তাহার একটিরও ব্যত্যয় দেখিলাম না। একই নমুনাই দেখুন না কেন,—

"মণ্ডল আকারে লীন উচ্চভুজ তরুবন পরি,
ঘননীল দেহে তব জবা-রক্ত সান্ধ্য তেজ ধরি,
হরনৃত্যে হবে তাঁর রক্তমাখা নাগাজিনখানি।
স্তিমিত প্রসন্ন দৃষ্টি ভক্ত পরে দিবেন ভবানী॥"

কিছু বুঝিলেন কি? না, ইহারও আবার 'টীকা-টিপ্পনি' চাই?

বক্তৃতা।—পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণ-প্রসন্ন প্রদত্ত।—প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড।—শ্রীযুক্ত ভূদেব কবিরত্ন কর্ত্তৃক সংগৃহীত। শ্রীকৃষ্ণ-প্রসন্নের মনোমুগ্ধকর মধুর বক্তৃতা যিনিই শুনিয়াছেন, তিনিই মোহিত হইয়াছেন। বক্তৃতার সকল কথাগুলি না হউক, তাহারই সারাংশ এই দুইখণ্ড পুস্তকে সংগৃহীত হইয়াছে। সুতরাং ইহার উপাদেয়ত্বে আর কি সংশয় থাকিতে পারে? তবে দুঃখের বিষয়, পুস্তক দু'খানিরই ছাপাটা বড়ই কদর্য্য।

গৌড়ীয় গীতা।—গীতা মূল ও ভাষ্য। প্রথম খণ্ড।—শ্রীমতী মহিষঘ্নী কৃষ্ণপদ দাসী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। "গীতা মূল ও ভাষ্য"—কিন্তু "মূল ও ভাষ্য" কই? নিজের পদ্য ও নিজ-কৃত তদ্ব্যাখ্যাই কি "মূল ও ভাষ্য"? যাইহোক, পুস্তকখানির ছাপা-টাপাগুলি কিন্তু বেশ পরিস্কার—হাতে করিলেই পড়িতে ইচ্ছা হয়। বিশেষ, জিনিসটিও পড়িবারই জিনিষ বটে!—'ভগবদ্গীতার' পদ্যানুবাদ ও তাহার ব্যাখ্যা! তবে দুঃখের বিষয় এই যে, এ অনুবাদেরও আবার অনুবাদ-ব্যাখ্যা চাই—নহিলে, বুঝা দায়! অধিকন্তু, সকল স্থলের অনুবাদও যে ঠিক মূলানুসারী হইয়াছে, তাহাও নহে। একটা-আধটা নমুনা; যথা:—মূলে আছে,—

"বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্,
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কং॥"

কিন্তু 'গৌড়ীয় গীতা'কার ইহার অনুবাদে লিখিতেছেন,—

"অব্যয়, অনাশী, নিত্য, অজ যেবা জানে,
হানিতে আদেশে কাকে, কারে আর হানে॥"

পাঠক! কিছু বুঝিলেন কি? আচ্ছা, আরও একটা দেখুন। মূলে আছে;—

"অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এবচ
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতন॥"

কিন্তু 'গৌড়ীয় গীতা'কার ইহার অনুবাদ করিতেছেন,—

"অচ্ছেদ্য, অদাহ্যাক্লিদ্য, অশোষ্য সে জন।
সর্ব্বগতাচল, নিত্য, স্থাণু, সনাতন॥"

বা! বা! যেমনটি মূল, ঠিক তেমনিই অনুবাদ নয় কি? আর এইজন্যই বোধ হয়, গ্রন্থকার পুস্তকের 'কভারেও' লিখিয়াছেন—"গীতা মূল ও ভাষ্য।"

দারগার দপ্তর। ১ম খণ্ড।—শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ইহাতে বনমালী দাসের হত্যা, যমালয়ের ফেরতা মানুষ, জুয়াচোরের বাহাদুরী এবং জালিয়াৎ যদু—এই চারিটি বিষয় আছে। এখন, এ পুস্তকের সুখ্যাতি করিব, না নিন্দা করিব? সুখ্যাতি করিলেও আত্ম-প্রশংসা করা হয়—আর নিন্দা করিলেও আত্ম-নিন্দা!—কারণ এ পুস্তকের অধিকাংশ অংশই 'অনুসন্ধানে' বাহির হইয়াছিল যে! তবেই তো দেখিতেছি, মুস্কিল—তবে এ পুস্তকের আর সমালোচনা হয় কি ক'রে? যাইহোক, সাদা কথা—বই-খানার বিক্রয় হওয়া উচিত—কিন্‌লে যে কেউ ঠক্‌বেন না, এটা আমরা শপথ করে বল্‌তে পারি। বইখানা সুখপাঠ্যও বটে।

শাস্ত্র-মহিমা।—শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। এই পুস্তকখানিতে বেদ, উপনিষদ্, পুরাণ প্রভৃতি ধর্ম্মগ্রন্থ-সমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যায়। শাস্ত্র-বিষয়ে 'হিন্দুসন্তানের' এরূপ একটা পরিচয়-জ্ঞান থাকাও অন্ততঃ প্রয়োজনীয়। এরূপ সকল পুস্তকের প্রচারে শাস্ত্রপাঠ-তৃষা বলবতী হইতে পারে।

* * *

সাময়িক পত্র-সম্বন্ধে।

সাহিত্য।—শ্রীযুক্ত বাবু সুরেশচন্দ্র সমাজপতি কর্ত্তৃক সম্পাদিত। সাময়িক পত্রের বাজারে, নূতন যে কয়খানি মাসিক পত্র বাহির হইতেছে, 'সাহিত্য' কাগজখানি তন্মধ্যের একখানি সুন্দর কাগজ। বা! বেশ ছাপা, বেশ কাগজ—চক্‌চকে-তক্‌তকে। এমনই তো চাই? অঙ্গসৌষ্ঠব-সম্বন্ধে বাস্তবিকই এখানি শ্রেষ্ঠ। তারপর, প্রবন্ধাদিও 'সাহিত্যে' বেশ সুমিষ্ট। হবে না কেন? চন্দ্রনাথ বাবু, নবীন বাবু—এঁরাই সব যখন সাহিত্যে লেখেন, তখন ভাল না হবার কথা কি? বিশেষ, সম্পাদক মহাশয়েরও কাগজখানিতে বড়ই যত্ন। ব্যবসায় তো তাঁর উদ্দেশ্য নয়?—ঘরের পয়সা ব্যয় করিয়া সুন্দর জিনিস লোকের চক্ষে ধরিবেন—তা' হবে না কেন? তাই তাঁহাকে আমাদের আরও একটা অনুরোধ যে, গ্রাহক-মহাশয়দিগের যেরূপ অনুগ্রহ, তা'তে দামটা না নিলেও ভাল হয়? ফলতঃ আমরা 'সাহিত্যের' শুভকামনা করি।

উগ্রক্ষত্রিয়-প্রতিনিধি।—মাসিকপত্র ও সমালোচন। শ্রীশ্রীশচন্দ্র তা কর্ত্তৃক সম্পাদিত। এখানিও একখানি নূতন কাগজ। লেখা-টেখা ধরণ-ধারণ মন্দ কি? তবে সন্দেহ,—এ তুফানে সাধারণের প্রতিনিধিরাই সব টল্‌টলায়মান—তখন এ কেবলমাত্র 'উগ্রক্ষত্রিয়ের প্রতিনিধি' কতক্ষণ হাল ধরিতে পারিবেন?

সাধনা।—শ্রীযুক্ত বাবু সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর-সম্পাদিত। প্রথম হইতে দু'-চারি-দশ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত উল্টাইয়াও বুঝিতে পারিলাম না যে, এখানা কি? ওহো, হঠাৎ মনে পড়িল, বিজ্ঞাপনে যে দেখিয়াছিলাম,—'সাধনা'—মাসিক পত্র! ভাল!—ভাল! বা!—বেশ কাগজখানি তো!—এক এক সংখ্যা যেন এক একখানি পুস্তক! কি সুন্দর ছাপা!—কি পুরু পুরু পরিষ্কার কাগজ! লেখকগণ আবার দেখি—সব্বাই 'ঠাকুর'! বা!—বেশ সারি-সারি সাজান তো! * * *

যাইহোক, বাস্তবিকই 'সাধনা' কাগজখানি

বেশ একটী 'সখের জিনিস' হইয়াছে। ঠাকুর-বাড়ীর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা—তাঁরাই সকলে এ কাগজখানিতে লেখেন; তাঁদেরই এটি 'সখের জিনিস।' সুন্দরই হইতেছে! প্রবন্ধও—ইস্তক বেদালোচনা নাগাদ মা-রি-গা-মা—শেষ রঙ্-তামাসা-চুট্‌কি-মজাদার—সবই রকম আছে। মন্দও আছে, ভালোও আছে—এই পাঁচ ফুলের সাজি আর কি? ফলতঃ বাঙ্গালা-সাহিত্যে এটিকেও একটি পরিপাটী জিনিস বলিতে হয়। বাস্তবিকই এটি লাগেও ভাল। আর, তাই আমরা অন্তরের সহিত ইহার স্থায়িত্ব-কামনা করি।

সাহিত্য ও বিজ্ঞান।—মাসিক পত্র ও সমালোচন।—শ্রীযুক্ত বাবু বীরেশ্বর দাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত। "শুধু হরি নয় গৌর হরি"—সাহিত্য ও বিজ্ঞান! আর কেন? এসব এখন আর চলিবার বাজার নয়! পাঠক কৈ? "সকলে বিক্রেতা হাটে, ক্রেতা মেলা দায়!"

হিতৈষিণী।—মাসিক পত্র ও সমালোচনী।—বাবু চারুচন্দ্র রায়, কার্য্যাধ্যক্ষ। টুপ্—টুপ্—টুপ্! কাগজ হয়, আর বন্ধ হয়! এসবও সেই শ্রেণীর কাগজ। এসব কাগজ যত শীঘ্র উঠিয়া যায়, ততই মঙ্গল। এই সব কাগজেই বাজার খারাপ করে আর কি?

প্রকৃতি।—বিজ্ঞান ও চিকিৎসা-প্রচারক মাসিক পত্রিকা ও সমালোচনী।—ফরিদপুরের স্কুল-সমূহের ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টার শ্রীযুক্ত বাবু প্রভাতচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক সম্পাদিত। এখানিও একখানি নূতন কাগজ। প্রথম দুই চারি সংখ্যা কাগজের প্রতি প্রবন্ধটিরই নীচের দেখি—'ক্রমশঃ'; অথচ দু'পাত একপাত এক একটী প্রবন্ধ! কাজেই, পড়িব কি? দু'চারি ইস্যু কাগজখানি তাই ছোঁয়াই হয় নাই। কিন্তু, এক্ষণে দেখিতেছি, কাগজখানির দুই একটী প্রবন্ধে বাস্তবিকই সম্পাদকের চিন্তাশীলতা ও সংগ্রহের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু, এরূপ নীরস কাগজ এ হতভাগ্য দেশের গ্রাহক-মহাশয়েরা মূল্য দিয়া লইবেন কি? কাজেই, ইহার স্থায়িত্ব-বিষয়ে সন্দেহ হয়!

চিকিৎসা-রত্ন।—হোমিওপ্যাথিক মাসিক পত্র।—ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল সুর কর্ত্তৃক সম্পাদিত। ডাক্তার মহাশয়ের এ ছেলে-খেলা কেন? "কত হাতি ঘোড়া গেল তল, এখন ফড়িং গিয়ে দেখায় বল!"

* * *

থিয়েটার-সম্বন্ধে।

সিটি থিয়েটার।—ষ্টার থিয়েটার হইতে একটী দল বহির্গত হইয়া আসিয়া এই 'সিটি থিয়েটারের' সৃষ্টি। এক্ষণে ইহাঁরা 'বীণা-রঙ্গালয়' ভাড়া লইয়া তথায় অভিনয়াদি করিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে ইহাঁদের নিজেরও একটা রঙ্গভূমির প্রতিষ্ঠা হইতেছে। যাইহোক, ইহাঁদের অভিনয়াদি দেখিয়া আমরা বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি। ইহাঁরা সর্ব্বথা উৎসাহ পান, এই বাসনা।

এমারেল্ড থিয়েটার।—এই রঙ্গালয়ের নূতন ম্যানেজার অতুল বাবু আবার ইহার পূর্ব্ব-প্রতিপত্তি-স্থাপনের জন্য যত্ন পাইতেছেন। ইতিমধ্যে ইহাঁর অমায়িক ব্যবহারে আমাদের প্রতিনিধি মহাশয় বড়ই সন্তোষ-প্রকাশ করিয়াছেন। অধিকন্তু, সেদিনের অভিনয়-পারিপাট্য দেখিয়াও তিনি তুষ্ট হইয়াছেন। আনন্দেরই কথা।

ষ্টার থিয়েটার।—কবিবর শ্রীযুক্ত বাবু রাজকৃষ্ণ রায় মহাশয় এখন 'ষ্টার থিয়েটারে' যোগ দিয়াছেন। তাঁহার নূতন নূতন পুস্তকে এখন দর্শকের সন্তুষ্টি-বর্দ্ধন করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে অমৃত বাবুর 'রাজা বাহাদুর' প্রভৃতি প্রহসনেও লোকের তৃপ্তি-সম্পাদন করিতেছে। 'ষ্টার থিয়েটারেরও' আবার সুশৃঙ্খলার চেষ্টা হইতেছে, ইহাতে আমরা সুখী হইলাম।

বেঙ্গল থিয়েটার।—বেঙ্গল থিয়েটারের বনেদি চাল—অটুট থাকে—সদাই এই ইচ্ছা। অধিকারীগণেরও অবশ্য তদ্বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য আছে।

অনুসন্ধান-সমিতির বিবরণী।

প্রতারণা-প্রবঞ্চনা।

সাবধান! সাবধান!

মিষ্টার উপেন্দ্রনাথ দাস
(ওরফে U. N. Dass Esqr.)
ও
তাঁহার "অমরাবতী"
বা
The Elysium Dramatic Company Ld.

আজ প্রায় একবৎসর ধরিয়া, বিলাত-প্রত্যাগত মিষ্টার উপেন্দ্রনাথ দাস যৌথ-কারবারে একটী থিয়েটার স্থাপনের চেষ্টা করিতেছিলেন। থিয়েটারের বাড়ীটি সর্ব্বাপেক্ষা সুদৃশ্য, সুপ্রশস্ত, সুখপ্রদ ও সুন্দর করিবেন—অভিনয়াদিও উচ্চশ্রেণীর হইবে—সুনিয়ম, সুব্যবস্থা, সুরুচি, এ সকলই তথায় সমভাবে রক্ষিত হইবে—এমনই তাঁহার অনুষ্ঠান-পত্রের বোল-চাল। তা ছাড়া, তাহাতে বলা হয় যে,—সকল যৌথ-কারবার অপেক্ষা, ইহাতে অংশীদারদিগকে যে বেশী লভ্যাংশ দিতে পারা যাইবে, তাহাও অসন্দিগ্ধরূপে প্রতিজ্ঞা করা যায়। এভিন্ন, অংশী বা সাহায্যকারীদিগকে নিয়ম-মত থিয়েটার দেখিতে পাশ দেওয়াও হইবে, এরূপও সব লোভানি ছিল। অধিকন্তু, তাহার সহিত আবার মহারাজা স্যর জ্যোতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, মহারাজা দুর্গাচরণ লাহা বাহাদুর, জষ্টিস্ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি বঙ্গের প্রায় প্রধান প্রধান লোকের নামমাত্র প্রশংসা-পত্র-স্বরূপে কতকগুলি পত্রও ঐ অনুষ্ঠান-পত্রে ছাপাইয়া, আরও উহাকে লোকের দৃষ্টি-আকর্ষক করা হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে অংশীদার ও সাহায্যকারীদিগের তালিকার মধ্যেও অনেক বড় বড় লোকের নামের তালিকা দেওয়া হইয়াছে। এমনই কাণ্ড-কারখানা! বলিব কি, অনুষ্ঠানপত্রখানিই ১৪ পৃষ্ঠা—খুব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইংরাজী অক্ষরে ছাপা। সুতরাং বুঝুন, তাহাতে কত কথাই আছে।

এইরূপ অনুষ্ঠান-পত্রই আমরা প্রথমে দেখিতে পাই; আর, মধ্যে মধ্যে দুই একজন জানিতে চাহেন যে,—"মহাশয়, বাস্তবিকই ব্যাপারখানা কি!" আমরাও কিন্তু প্রথমে তার বড় একটা কিছুই বুঝিতে পারি নাই; অথচ মনটা নিয়তই সন্দেহদোলায় দোলায়মান হইল। সঙ্গে সঙ্গে দুই একটা তত্ত্বও সংগ্রহ করিতেছিলাম। ইতিমধ্যে, আমাদের প্রতিনিধি মহাশয় এই পত্রখানি লেখেন,—

"বর্দ্ধমানে আসিয়া শুনিলাম, হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ দাসের পুত্র বাবু উপেন্দ্রনাথ দাস, বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া, যৌথ-কারবারে একটী থিয়েটার খুলিতেছেন। এখানে তাই তিনি চাঁদা-সংগ্রহের জন্য আসিয়াছিলেন। তাঁহার অনুষ্ঠানপত্র দেখিয়া এবং তাঁহার কথাবার্ত্তা-বোলচাল শুনিয়া, এখানকার অনেকেই তাঁহার যৌথ-কারবারের অংশ ক্রয় করিয়াছেন। কিন্তু, সেই অবধি ঐ সম্বন্ধীয় আর কোন বিশেষ খোঁজ-খবর না পাওয়ায়, অথচ উপেন্দ্র বাবুর বিরুদ্ধে নানা কথা শুনিতে পাওয়ায়, এখন তাঁহাদের সন্দেহ হইতেছে যে,—'বাস্তবিকই ওরূপ কোন থিয়েটার কলিকাতায় হইতেছে কিনা?' আর, তাই-ই তাঁহারা জানিতে চাহেন যে,—'ব্যাপারখানা কি?'

"এই সঙ্গে আরও দুই একটা রঙ্গের কথা শুনুন। বাবু গোবিন্দ প্রসাদ তেওয়ারী মহাশয় বর্দ্ধমানের একজন জমীদার, এবং একজন আনুষ্ঠানিক হিন্দু। অহিন্দু-চাল-চলন বা সাহেবী-খৃষ্টানী কায়দায় তিনি বড়ই বিতৃষ্ণ। তিনি গল্প করিলেন,—"বাবু উপেন্দ্রনাথ দাস যেদিন আমার নিকট আসিয়াছিলেন, সেদিন দেখিলাম—তিনি একজন পরম হিন্দু! আমার পায়ের ধূলা-গ্রহণ করা, এবং টেবিল-চেয়ারে না বসিয়া আমার বিছানার নীচে মাটিতে বসিতে চেষ্টা করা—এসব হিন্দুচিত ব্যবহার দেখিয়াই, তাঁহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার এই কথাগুলিতেও আমার আরও আস্থা হয়; তিনি বলিলেন,—'মহাশয়, বিলাত গিয়াছি বা ব্যারিষ্টার হইয়াছি বলিয়া, আমি ধর্ম্মনষ্ট করি নাই। তা'ছাড়া, আমার অন্নেরও কষ্ট নাই যে, সেইজন্যই আমি এই একটা ফন্দি করিয়াছি। বাস্তবিকই এরূপ একটা বিশুদ্ধ থিয়েটার করিয়া—হিন্দু-ধর্ম্মের ও রীতিনীতির উৎকর্ষ-সাধন করিব, কেবল এই-ই আমার ইচ্ছা; নহিলে আমার পিতা বাবু শ্রীনাথ দাস, আমিও একজন যেমন হউক ব্যারিষ্টার—আমার নিজের ভাবনা কি?' এইরূপ আরও নানা কথাতেই আমার মন ভিজে। বিশেষ, শ্রীনাথ বাবু আমাদের উকীল; তাঁহার পুত্র উনি—এইরূপ সাত-পাঁচ ভাবিয়াই, আমি একশ' টাকা দিয়াছি! কিন্তু এখন যাহা শুনিতেছি, উপায় কি? টাকাটা কি আমার বৃথাই গেল? শুনিতেছি,

তিনি শ্রীনাথ বাবুর ত্যজ্য পুত্র, ; শুনিতেছি, তিনি ব্যারিষ্টার-টার কিছুই নহেন ; শুনিতেছি, বিলাতেও তিনি নানা অপকর্ম্ম করিয়াছেন ; শুনিতেছি, অবশেষে এই এক ফন্দি বাহির করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন। এসব সত্য কি ?"

"ইহার পর, বর্দ্ধমানের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ ভট্টাচার্য্য এম, এ, মহাশয়ের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনিও প্রায় এরূপই নানা সন্দেহের কথা বলেন। তিনিও বলেন, চাঁদা দিয়াছেন। তাঁহার নিকট সাহেবী চাল-চলনই সম্পূর্ণ বর্ত্তমান ছিল। অধিকন্তু তিনি সন্দেহের আর একটা কথা বলেন যে,—'সেই অবধি আমার সন্দেহ বাড়িয়াছে, উপেন বাবু যাইবার সময় যখন বলিলেন যে, কোন স্ত্রীলোক বাহির হইয়া আসিলে, আমি যদি সংবাদ পাই, তবে তাহাকে 'রক্ষা' করিব। এ কেন ?'

"এইরূপ কত জনেই কত কথা বলিতেছে। এক্ষণে চাঁদাও তো দেখিলাম অনেকই আদায় হইয়াছে। প্রথম অনুষ্ঠান-পত্রেই উপেন বাবুও বলিয়াছেন,—"A fair portion of the capital has been already recovered." অর্থাৎ ইতিপূর্ব্বেই অনেক চাঁদা উঠিয়াছে। কিন্তু এখন, ব্যাপারখানা কি ? থিয়েটারের কতদূর ?'

এইরূপই পত্রখানির মর্ম্ম। পত্র পাইয়া সন্ধানও অবশ্য লইতেছিলাম ; কিন্তু দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে, তাহাতে থিয়েটারের অনুষ্ঠান-আয়োজনের কিছুই তো দেখিতে পাইলাম না! জমিজিরাতও কেনা হয় নাই ; ঘর-বাড়ীও তৈয়ার হইতেছে না ; ষ্টেজাদি তো দূরের কথা! অধিকন্তু, বর্দ্ধমানের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট আশু বাবু যাহার জন্য আশঙ্কা করিতেছিলেন, দেখিতেছি, তাহাতেই যে সর্ব্বনাশের সূচনা! নানাদিক হইতে নানা-রকমেরই তো অভিযোগ পাইতেছি! "কোন বৃদ্ধার দশম বৎসর বয়স্কা সুশীলা নাম্নী এক বালিকাকে থিয়েটার করাইবার নিমিত্ত আটকাইয়া রাখিয়াছেন। আরও একটী স্ত্রীলোক উপেন্দ্র বাবুর অন্যায় আচরণ ও অবৈধ অবরোধের কথা বলিয়াছেন।"

তারপর, আরও দেখুন, আজ দুইদিন হইল, এইরূপ আর একটা গুরুতর অভিযোগে উপেন বাবুকে আবার পুলিশ-সোপর্দ্দও হইতে হইয়াছে। গতকল্য, ২৯এ চৈত্র, রাত্রিতে কলিকাতার ডিটেক্‌টিভ পুলিশ হইতে সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট রবার্টসন সাহেব, ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, সবইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সকলে গিয়া উপেন বাবুকে গ্রেপ্তার করেন। উপেন বাবুর কিন্তু তাহাতে প্রথমটা বড়ই রাগ হইয়াছিল ; রাগভরে, সাহেবী মেজাজে, তিনি তাই পুলিশ-কর্ম্মচারীগণকে বলিয়া ফেলেন,—"জানেন, আমার পিতা বাবু শ্রীনাথ দাস একজন প্রসিদ্ধ অ্যাটর্ণি, আর আমার ভাই ('সময়'-সম্পাদক) বাবু জ্ঞানচন্দ্র দাস এম, এ, বি, এল একজন প্রসিদ্ধ উকীল! আপনারা আমার নামে কেস চালাইতে চান তো সমন করিবেন, যান!" কিন্তু ইহাতে হাসিয়া, ইন্‌স্পেক্টর যোগেন্দ্র বাবু উত্তর করিলেন,—"ঠিকই কথা! কিন্তু বাপের সঙ্গে যে মুখ-দেখা-দেখি নেই, তাও যে জানি! তাছাড়া, আমরা সমন-টমন বড় একটা করতে জানি-নে—এই রকমেই ধরে নিয়ে যাই।" তখন কাজেই, "তবে নিতান্তই নিয়ে যাবেন ? আচ্ছা, আচ্ছা"—বলিয়া, তাঁহাকে যাইতে হয়। যাইহোক, তাঁহার অপরাধটা কি, এখন শুনুন। হরিমতি নাম্নী একটা স্ত্রীলোক, আর তার উপপতি সীতানাথ, বর্দ্ধমান-জেলা হইতে বাহির হইয়া আসে ; কার্ত্তিক পণ্ডিত নামক একজন কুলীর আরকাঠি, ভুলাইয়া—চাকরী দিবার লোভ দেখাইয়া, তাহাদিগকে উপেন বাবুর কাছে লইয়া যায়। উপেন বাবু লোভ দেখাইয়া বলেন,—"তোমাদের ব্রাহ্মমতে বিবাহ দিয়া দিব।" অথচ কাজে উহাদের দু'জনকে একত্রে থাকিতেও দিতেন না ; স্ত্রী-লোকটিকে নিজের কাছে উপরে গানবাজনা শিখাইতেন, আর পুরুষটা নিচেয় একেলা থাকিত। এইজন্য, অনেক ষড়যন্ত্রে, তাহারা একদিন প্রাচীর টপ্‌কাইয়া দুইজনেই পলাইয়া যায়। অতঃপর একদিন, রাস্তায় দেখিতে পাইয়া, সীতানাথকে উপেন বাবু গ্রেপ্তার করেন ; এবং কৌশলে স্ত্রীলোকটাকেও ধরিয়া আনেন। উহাদের উপর নানা অত্যাচারও হইতে থাকে। একদিন রাত্রে তাই, স্ত্রীলোকটা, দড়ী টাঙাইয়া, উপরের ঘর হইতে ঝুলিয়া নামিবার চেষ্টা পায় ; আর তাহাতে, তাহার হাত-পা ভাঙ্গিয়া যায়। উপেন বাবু এক্ষণে মোচলেখা এবং জামিন দিয়া খালাস আছেন। স্ত্রীলোকটী হাসপাতালে বলিয়া, ২৬ এপ্রিল মকর্দ্দমা হইবে।

এই তো ঘটনা! মকর্দ্দমাও এখন বিচারাধীন। সুতরাং এখন আর কি বলিব?

অনুসন্ধান

অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র

৫ম খণ্ড } ১৫ই বৈশাখ, ১২৯৯। { ১৮-শ সংখ্যা।

পুরাতন ও নূতন বর্ষ।*

পুরাতন বর্ষ গেল, নূতন বরষ এল ;
কে গেল কে এল কিছু না পারি বুঝিতে।
যে গেল এই কি সেই, অথবা সে বেঁচে নেই,
নূতন বর্ষই এই—উদিত মহীতে ॥
যদি এ নূতন হয়, কেন ভাবান্তর নয়,
প্রকৃতির কৃতিচয়, সমান তাহার।
সেইরূপ চূত ফল, সেইরূপ কোলাহল,
রক্তকণ্ঠ পিকদল, করে অনিবার ॥
সেরূপ মলয়াচল সমীরণ অবিরল,
বহিছে দক্ষিণে বল, অচলে বিতরি।
সেইরূপ পুষ্পবন, সেই পুষ্পে সুশোভন,
মধু পিয়ে অলিগণ, সেরূপ গুঞ্জরি ॥
সেইরূপ তরুচয়, নবীন পল্লবময়,
সুচারু লতিকালয়, মুঞ্জরী মুঞ্জরে।
সেরূপ হরিদঙ্গনা, হরিদঙ্গ সুবসনা,
শতদল সুবদনা, জন-মন হরে ॥
আবার এ কোথা ছিল, কোথা হতে বাহিরিল,
কেবা এরে প্রসবিল, কে মাতা ইহার।
নাহি হেরি অবসর, তবু আত্ম-কলেবর,
বিস্তারিল ভূতিতর, কি কৌশল তার ॥
ফলে এ নূতন নয়, পুরাতন সুনিশ্চয়,
ভ্রমবশে লোকে কয়, নূতন বরষ।
একি কাল নানা-নামে, অখিল ত্রিলোকধামে
অবস্থিত অবিরামে, সদা অনলস ॥
ইহারই নামান্তর, ক্ষয় যুগ সম্বৎসর,
মাস পক্ষ পূর্ব্বপর, সন্ধ্যা দিন ক্ষণ।
নাহি আসে নাহি যায়, সদা স্থির তব কায়,
তপন মাথায়—তায় গতি দরশন ॥
বটে ক্রমে বৃদ্ধ হয়, কিন্তু জরাগ্রস্ত নয়,
নাহি এর মৃত্যু-ভয়, অনন্ত জীবন।
সকল জগতী যবে, প্রলয়ে বিনষ্ট হবে,
তখনো এ কাল রবে, যেমন তেমন ॥
অনাদি বিষণ যথা, অনন্ত শরীর তথা,
অকাল স্থানের কথা, কার শক্তি কয়।
কিন্তু কাল অচেতন, জ্ঞানহীন সর্ব্বক্ষণ,
নাই কোন শক্তিধন, তাই ঈশ নয় ॥
হলে সে চৈতন্যময়, হোত তাই সমুদয়,
অনলস যোগে রয়, তৃণ কি কখন।
চৈতন্য নাহিক যার, কোথা জ্ঞান লব তার,
চৈতন্যই জ্ঞানাধার, জ্ঞানের কারণ ॥
এই কাল নাশে সব, ভ্রান্তির যে জনরব,
দেহ-তাপে অনুভব, আলোকে যেমন।
মহাকাল গিবোদায়, ক্রমে সব লয় পায়,
বস্তু-প্রকৃতিও তায়, গ্রন্থের গণন ॥

* 'সদ্ভাবশতক' প্রভৃতি প্রণেতা প্রবীণ কবি শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার মহাশয়, অনুগ্রহ-পূর্ব্বক, 'অনুসন্ধানের' জন্য, কতকগুলি কবিতা পাঠাইয়াছেন। তাহারই একটিমাত্র এবার এস্থলে প্রকাশিত হইল। অবশিষ্টগুলিও ক্রমশঃ প্রকাশিত হইবে। ফলতঃ এরূপ একজন কবির সম্যক সহানুভূতি পাওয়ায় আমরা 'অনুসন্ধানকে' পরম সৌভাগ্যশালী মনে করি।

ছিল যেথা মহাবন, জনস্থান এইক্ষণ,
সেথায় কেবল জন, যতনের তরে।
চূর্ণ হয় বজ্রপাতে, গিরিকূট তাঘাতে,
কবিদের কল্পনাতে, কালে তাহা করে ॥
জ্বালে না কুসুম গন্ধে, চিত্র করে তার পরে,
ঋতুগণ কলেবরে, কালে না সাজায়।
প্রাবৃটে জলদগণ, সলিলের বরিষণ,
নাহি করে অনুক্ষণ, কাল-মহিমায় ॥
অতএব জানি সব, কারণ জগতী-ধব,
হৌক মন তাঁয় তব, একাগ্র-হৃদয়।
যেন কাল-বোধ-ভ্রমে, কালের ভকতি-তমে,
আচ্ছাদিত কোন ক্রমে, সে পদ না হয় ॥
বর্ষ-পরিবর্ত্তে যত, সুখ-হেতু সমুদ্গত,
সে কারণে অবিরত, পূজ পদ তাঁর।
হের হের সর্ব্বস্থানে, তাঁহার মহিমা, গানে
সদা সুমধুর তানে, কর তা প্রচার ॥
সজ্জিত পারগগণ, জড় যাই, সে কারণ,
নাহি করে সঙ্কীর্ত্তন তাঁর ভক্তিভরে।
অলি মধু-পান ক'রে, বৃথা গুঞ্জে কলস্বরে,
নাহি গায় মহেশ্বরে, অজ্ঞানতা-তরে।
পাদপগণের সম, নহ তুমি জড়তম,
অথবা ষট্‌পদোপম, নহ হীনজ্ঞান,
তবু পাদপের মত, কিম্বা যথা মধুব্রত,
রহ যদি অবিরত, ধিক্ তব মান ॥

বাণলিঙ্গ বা বাণেশ্বর শিব।*

বাণলিঙ্গ, এক অতীব আশ্চর্য্য জিনিস। তাৎকালিক্‌ ভূতত্ত্ববিদ্‌গণ যদি এহেন অদ্ভুত পদার্থ সম্যক্ পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন, তবে বোধ হয়, পৃথিবীতে অত্যাশ্চর্য্য পদার্থের সংখ্যা সাত না লিখিয়া আটই লিখিতেন, সন্দেহ নাই। প্রত্যুতঃ সুলক্ষণাক্রান্ত বাণলিঙ্গ, যথাবৎ পরীক্ষা করিয়া দেখিলে, উক্ত লিঙ্গ যে সাক্ষাৎ শিবেরই মূর্ত্তিবিশেষ, তদ্বিষয়ে অনুমাত্রও সন্দেহ হয় না। আমরা স্বচক্ষে অনেকস্থলেই ইহা পরীক্ষা করিতে দেখিয়াছি, এবং নিজ-হস্তেও দু'একবার যৎসামান্য পরীক্ষা করিয়া শরীর রোমাঞ্চিত করিয়াছি। বাণলিঙ্গ দুর্ঘট পদার্থ নহে; পরীক্ষা-প্রণালীও বহুতর শ্রমসাধ্য নহে—সকলেরই সাধ্যায়ত্ত। সুতরাং ইচ্ছা করিলে, সর্ব্ব-সাধারণেই এই অপূর্ব্ব পদার্থের অলৌকিকী মহিমা জানিতে পারিবেন! এইস্থলে ইহাও বলিয়া রাখা একান্তই আবশ্যক যে, নাস্তিক-ভাবাপন্ন বা অহিন্দু-মানবগণ, কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য, এই প্রত্যক্ষীভূত দেব-বিগ্রহের যেন অকারণ পরীক্ষা না করেন; তাহাতে সম্যক ব্যত্যয় আছে। তবে যাঁহারা পূজনার্থ বা স্থাপনার্থে এই লিঙ্গ গ্রহণ করিবেন, তাঁহারা, ভক্তিপূর্ব্বক, সাধারণ পরীক্ষা করিলে, অবশ্যই ততটা দোষ-ভাগী না হইতে পারেন। তবে শাস্ত্রে লিখিত আছে,—যে কোনরূপ লক্ষণেই হউক, বিশিষ্ট বাণলিঙ্গ বলিয়া স্থিরীকৃত হইলে, দেবতার রোষ-সম্ভবাধীন তদ্বিগ্রহ, পরীক্ষাদি ব্যতীতই, গ্রহণীয়।* বাস্তবিকও, বহুস্থলেই, অনুচিতরূপে দেববিগ্রহ-পরীক্ষাকারীদিগকে, নানামত উৎকট রোগগ্রস্ত হইতে দেখা যায়। একথা অনেকেই অলীক বলিয়া মনে করিতে পারেন; এবং ঐরূপ রোগের কারণও অকারণ দেব-বিগ্রহের পরীক্ষা নহে, ইহাও অনেকেরই মনে হইতে পারে। কিন্তু, যাঁহারা প্রকৃত হিন্দু, বৈদিক কার্য্য যাঁহারা বিশিষ্টরূপ অবগত আছেন, তাঁহাদের নিকট ঐরূপ কথা অবশ্যই অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইবে না, এই বিশ্বাসেই ঐ কথাটি বলিতে সাহসী হইলাম;

---

* লিঙ্গং শবন্য মূর্ত্তিবিশেষ ইতি।
—মেদিনীত্যাদি দর্শনাৎ।

* অত্রপ্রমাণং 'শিবাচ্চর্নদীপিকায়াং',—"বস্তুতস্তু যেন কেন চিহ্নচ্ছেন যল্লিঙ্গং জ্ঞেয়ং দেবাক্রোশসম্ভবাদ পরীক্ষ্য তৎসেব্যমিত্যাদি।"

নচেৎ, এহেন ঊনবিংশ শতাব্দিতে এহেন বিজ্ঞান-বিগর্হিত বাণী বলিবে কাহার সাধ্য?

যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতায় বাণলিঙ্গের বিশেষ পরীক্ষা বর্ণিত আছে। যথা,—

"নদ্যাং বা প্রক্ষিপেদ্ভূয়ো, যদাতদুপলভ্যতে।
বাণলিঙ্গং তদা বিদ্ধি নূনং সুখবিবর্দ্ধনং ॥"

ভাবার্থ,—নদ্যাদিতে প্রক্ষেপ করিলে যদি পুনর্ব্বার তাহা লাভ করা যায়, তবে সেই লিঙ্গকেই নিশ্চিত, সুখ-বর্দ্ধনকারী বাণলিঙ্গ বলিয়া জানিবে। এই বিধানানুসারে পরীক্ষিত হইয়া, আমাদের আত্মীয়বর্গ-মধ্যে অনেক বাণলিঙ্গ আনীত হইয়াছে। অনেকে একথায় আশ্চর্য্যান্বিত হইতে পারেন; কেহ বা হাস্য-পরিহাসের তরঙ্গ উঠাইতেও পারেন। কিন্তু, প্রকৃত পক্ষে, এটি আশ্চর্য্যেরই কথা; হাস্য-তরঙ্গে উড়িয়া যাইবার বিষয় নহে। বাণলিঙ্গ গ্রহণেচ্ছুকগণ, একান্তই পরীক্ষা করিতে হইলে, ভক্তিপূর্ব্বক বাণলিঙ্গকে নদীতীরে লইয়া চলুন; পরে স্বহস্তে অগাধ জলে নিক্ষেপ করিয়া, ফিরিয়া আসুন; এবং পর-দিবস প্রাতে প্রত্যক্ষে দেখিতে পাইবেন যে, আপন প্রক্ষিপ্ত লিঙ্গটি তৎতট-নিকটবর্ত্তী হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু যে লিঙ্গ প্রকৃতপক্ষে তাদৃশ উৎকট-লক্ষণবিশিষ্ট নহে, তাহা অবশ্যই প্রাপ্ত হওয়া দুর্লভ হইবে, সন্দেহ নাই। উপরোক্ত পরীক্ষায় ইহাও অনুমিত হয় যে, শম্বুক-শুক্তি ও কম্বুর ন্যায় বাণলিঙ্গেও অন্তর্নিবিষ্ট কোনরূপ ঐশী শক্তির বিদ্যমানতা রহিয়াছে; নচেৎ, নদ্যাদিতে প্রক্ষেপ করিলে, কিরূপে তাহা তৎপুলিনে আসিয়া পৌঁছিবে?

এভিন্ন, উৎকৃষ্ট বাণবিগ্রহ জ্বলন্ত হুতাশনে প্রক্ষেপণ করিলেও তাহা উত্তপ্ত হইবে না। ঐরূপ দুরূহ পরীক্ষা কিন্তু শাস্ত্রাদিতে ভূয়োভূয়ো নিষেধ আছে। আমরা কোন এক পরমহংসের অনুগ্রহে ঐ বিষয়টিরও বিলক্ষণরূপেই প্রত্যক্ষ পাইয়াছি। উৎকৃষ্ট শালগ্রামচক্র ঐরূপেও উত্তপ্ত হয় না, ইহাও প্রমাণসাধ্য।

তৎপর, বাণলিঙ্গের সমান ওজনে তণ্ডুল মাপিয়া, তাহার সহিত লিঙ্গ এক আধারে রাখিয়া দিয়া, তৎপর-দিবস আবার উভয় বস্তু ওজন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, হয়ত চাউল কিছু পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়াছে; অথবা, বাণলিঙ্গই ওজনে বাড়িয়াছে, এবং তণ্ডুল কমিয়া গিয়াছে। কখনও বা উভয় দ্রব্য সমানও থাকিয়া যায়। এরূপ স্থলে, তণ্ডুল অপেক্ষায় হ্রাস-ভূত বা সমভূত লিঙ্গই গৃহীদের গ্রহণীয়; বৃদ্ধিভূত, লিঙ্গ, উদাসীনাদির সেব্য।*

আরও একটি পরীক্ষা-প্রণালী দেখুন। 'সূতসংহিতায়' লিখিত আছে,—

"ত্রিপঞ্চবারং বস্যেব, তুলাসাম্যং নজায়তে।
তদাবাণংসমাখ্যাতং শেষং পাষাণসম্ভবং ॥"

অর্থাৎ অগ্রে বাণলিঙ্গকে তণ্ডুলাদির সহিত সহি করিয়া মাপিলে, যদি ওজনগত তুল্যতা না থাকে, অর্থাৎ অন্যতর পদার্থের ওজনে হ্রাস বা বৃদ্ধি হয়, তবে তাহাই বাণলিঙ্গ কথিত হয়; অন্যথা হইলে, পাষাণ-সম্ভব বলিয়া জানিবে।

এই বিধানানুসারে আমি নিজ-হস্তে পরীক্ষা করিয়া একটি বাণ গ্রহণ করিয়াছি; ওটি পাঁচ বার মাপার সময় ছয় রতিরও কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে হ্রাস হইয়াছিল।

এইরূপ, বহুবিধ পরীক্ষা দ্বারাই বাণলিঙ্গের অপূর্ব্বতা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। উহাতে যে কেবল অন্তর্নিবিষ্ট অত্যাশ্চর্য্যতাই অনুমিত

---

* অত্রাপি প্রমাণং 'শিবার্চ্চনদীপিকায়াং' শব্দকল্পদ্রুমেঽপি,—"অত্রাপি পূর্ব্বাহে শিবং (বাণেশ্বর লিঙ্গং) তণ্ডুলৈঃ সার্দ্ধং তোলয়িত্বৈক পাত্রে, স্থাপয়িত্বা, পরাহেঽগুণস্তয়োস্তোলনেপি যদি হ্রাসভূতং সমভূতং বা লিঙ্গং স্যাৎ তদা-গৃহিভিঃ সেব্যং বৃদ্ধিভূতস্তু উদাসীনৈঃ সেব্যমিত্যাদি।"

হয়, তাহা নহে ; বাণেশ্বরের বাহ্যিক সৌন্দর্য্যত্বেও সাধারণের মনাকৃষ্ট হইয়া থাকে।

বিশেষ লক্ষণান্বিত বাণলিঙ্গ প্রকারতা-ভেদে অষ্টাদশধায় বিভক্ত। যথা— (১) ঐন্দ্র, (২) আগ্নেয়, (৩) যাম্য, (৪) নৈঋত, (৫) বারুণ, (৬) বায়ু, (৭) কুবের, (৮) রৌদ্র, (৯) বৈষ্ণব, (১০) স্বয়ম্ভূ, (১১) মৃত্যুঞ্জয়, (১২) নীলকণ্ঠ, (১৩) কালাগ্নিরুদ্র, (১৪) ত্রিপুরারি, (১৫) ঈশান, (১৬) ত্রিলোচন, (১৭) অর্দ্ধনারীশ্বর, (১৮) মহাকালাখ্য।

বাণলিঙ্গের আকার সাধারণতঃ জলপদ্মের দানা, কুণ্ডল, পক্ক জামফল ও কুক্কুটাণ্ডবৎ হয়।*

এক্ষণে, ঐ অষ্টাদশ প্রকার লিঙ্গের সংক্ষিপ্ত লক্ষণ, সাধারণের অবগতি-জন্য, নিম্নে সন্নিবেশিত হইল। এতদ্দ্বারাই উহার বাহ্যিক সৌন্দর্য্যতার বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যাইবে। যথা,—

(১) ঐন্দ্রলিঙ্গ,—বিস্পষ্ট, বজ্রাদিচিহ্ন ও বহুনেত্র-বিভূষিত। উহার বিশেষ লক্ষণ 'দীপকলিকা' নামক গ্রন্থে বিবৃত আছে। (২) আগ্নেয় লিঙ্গ,—ঈষল্লোহিত্য, উক্ত লিঙ্গে উষ্ণতানুভূত হয়, উহা শুক্তিনিভ, অথবা শক্তিলাঞ্ছিত হয়। (৩) যাম্যলিঙ্গ,—দণ্ডাকার বা রসনার মত দৃশ্য হয়। (৪) নৈঋতলিঙ্গ,—খড়্গসদৃশ, কুর্ব্বরাদি প্রলিপ্ত, কুণ্ঠ, কুক্ষিযুক্ত,। (৫) বারুণলিঙ্গ,—বর্ত্তুল-সদৃশ, উহাতে পাশাঙ্ক দৃষ্ট হয়, ভ্রমরবৎ উজ্জ্বলবর্ণ। (৬) বায়ুলিঙ্গ,—কৃষ্ণধূম্রখণ্ডবৎ উক্ত লিঙ্গে পরিলক্ষিত হয়। (৭) কুবের লিঙ্গ,—কার্পাস বর্ণ গদার আকার। (৮) রৌদ্রলিঙ্গ,—অস্থি-শূলাঙ্কিত ও হিমকুণ্ডল-বর্চ্চস। (৯) বৈষ্ণবলিঙ্গ,—চতুর্বর্ণবিশিষ্ট, এবং শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম বিভূষিত ও বিষ্ণু-পদাঙ্কিত, শ্রীবৎস-কৌস্তুভাঙ্কলাঞ্ছিত। এই লিঙ্গ বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের পক্ষে প্রসস্ত। উহাতে গরুড় পক্ষীর প্রতিমূর্ত্তিও দেখা যায়। (১০) স্বয়ম্ভূ লিঙ্গ,—মধু ও পিঙ্গলবর্ণাভ, উহার উপরিভাগে কৃষ্ণকুণ্ডলিনী শক্তি, সর্পাকারে বিচিত্র ফণাবিস্তার করিয়া রহিয়াছে। (১১) মৃত্যুঞ্জয় লিঙ্গ,—নানাবর্ণ সমাকীর্ণ, ও জটা-শূল-সমন্বিত। (১২) নীলকণ্ঠলিঙ্গ,—দীর্ঘাকার, শুভ্রবর্ণ এবং কৃষ্ণবর্ণ বিন্দু-বিভূষিত। (১৩) ত্রিলোচনলিঙ্গ,—শুক্লাভ, শুক্ল-কেশ-সুশোভিত, ও ত্রিনেত্র-সমন্বিত। (১৪) কালাগ্নিরুদ্রলিঙ্গ,—স্থূলবিগ্রহ, সমুজ্জ্বল, কৃষ্ণবর্ণ, জটাজুটবিভূষিত। (১৫) ত্রিপুরারিলিঙ্গ,—মধুপিঙ্গলবর্ণাভ, শ্বেত যজ্ঞোপবীতধারী, শ্বেতপদ্মসমাসীন, চন্দ্ররেখা-বিভূষিত, এবং প্রলায়াস্ত্র সমাযুক্ত। (১৬) ঈশানলিঙ্গ,—পদ্মপরাগসন্নিভ ও অর্দ্ধচন্দ্র-বিভূষিত। (১৭) অর্দ্ধনারীশ্বর লিঙ্গ,—ত্রিশূল-ডমুরধারী, উহার অর্দ্ধভাগ শুভ্রবর্ণ, অপরার্দ্ধ রক্তিমাভ। (১৮) মহাকালাখ্য লিঙ্গ,—শুভ্রাভ, পিঙ্গলবর্ণ জটারাজি-বিভূষিত, সুন্দর নৃমুণ্ডমালাধারী, ঈষৎ রক্তময় কান্তিমান, স্থূল, দীর্ঘ, ও সমুজ্জ্বল।

এতল্লক্ষণাভিরিক্তও বহুবিধ লিঙ্গ দৃষ্ট হয় ; কোন কোন লিঙ্গের মধ্যে সেই রজতগিরিনিভ, পঞ্চবক্ত্র-ত্রিনেত্র, মহাদেবের প্রতিমূর্ত্তিও দেখা যায়। দুই একটি বাণলিঙ্গ আবার এমত উজ্জ্বল যে, তাহাতে, অন্ধকার রাত্রিতেও আলোক ব্যতীত সুন্দররূপে সকল পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। এহেন বাণলিঙ্গের প্রতি ধীর গম্ভীরভাবে যিনিই দৃষ্টি করিবেন, তিনিই উহার উপাদেয়তায় বিমোহিত হইবেন, সন্দেহ নাই। 'যাজ্ঞ-বল্ক্য-সংহিতায়' বাণ-পূজোৎকৃষ্টতা বর্ণিত আছে। যথা,—

"অন্যেষাং কোটিলিঙ্গানাং পূজনে যৎ ফলং লভেৎ।
তৎফলং লভতে দেবি! বাণলিঙ্গৈক পূজনাৎ॥"

অন্যান্য কোটি লিঙ্গ পূজায় যেই ফল হয়, একমাত্র বাণলিঙ্গ পূজা করিলেই মানবগণ তৎফলভাগী হইয়া থাকে।

* বাণলিঙ্গস্যাকারমাহ, 'বীর মিত্রোদয়ে',—"পঙ্কজস্য ফলাকারং কুণ্ডলস্য সমাকৃতিঃ। পঙ্কজস্যফলাকারং কুক্কুটাণ্ড সমাকৃতি ইত্যাদি।

'যোগসারে' পঞ্চম পরিচ্ছেদে লিখিত আছে,

"ব্রাহ্মে মুহূর্ত্তে চোত্থায়, যঃ স্মরেদ্বাণলিঙ্গকং।
সর্ব্বত্র জয়মাপ্নোতি সত্যং সত্যং ন সংশয়॥"

ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে সমুত্থিত হইয়া যে ব্যক্তি বাণেশ্বর স্মরণ করে, সে সর্ব্বত্র জয়লাভ করিয়া থাকে—এবিষয়ে কিছুমাত্রও সন্দেহ নাই। এহেন বাণলিঙ্গকে, আমরা কিনা আজকাল আমাদের দেবমন্দিরের শোভার জিনিস বলিয়া মনে করি!

প্রাচীন তত্ত্বদর্শীগণ বাণলিঙ্গের স্থাননির্ণয় করিয়াও গিয়াছেন, এইরূপ ; অর্থাৎ নিম্নলিখিত এই সকল স্থানেই বাণলিঙ্গ প্রাপ্ত হওয়া যায় ; যথা,—

নর্ম্মদা, কালিকাগর্ত্ত, কণ্যকাশ্রম, শ্রীশৈলশেখর, মহেন্দ্রপর্ব্বত, নেপালপ্রদেশ, ৺ বারাণসী ধাম প্রভৃতি।

পাপের প্রতিফল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

আবর্ত্তে।

পরদিন প্রাতে, শোভনলাল, সদাশিব জ্যোতিষীর বাটীতে উপস্থিত হইলেন ; এবং জ্যোতিষীকে প্রণাম করিয়া বলিলেন,—"আমি যাকে অন্বেষণ করি, তাকে পাব কি!" এই বলিয়া, একটি রজত-মুদ্রা তাঁহার সম্মুখে রক্ষা করিলেন। জ্যোতিষী, কিয়ৎক্ষণ মনে মনে কি ভাবিয়া, বলিলেন,—"পাইবে।"

শোভনলাল।—কোথায়?

জ্যোতিষী, কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর, বলিলেন,—"জলে।"

শোভনলাল পুলকিত হইয়া বলিলেন,—"কোন্‌দিকে?"

জ্যোতিষী, আবারও কিয়ৎক্ষণ চিন্তার পর, বলিলেন,—"পূর্ব্বদিকে।"

শোভনলাল বলিলেন,—"যদি পাই, আপনাকে আশাতীত পুরস্কার দিব।" এই বলিয়া, সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। পরে, অল্পোচ্চস্বরে বলিতে লাগিলেন,—"পূর্ব্বদিকে!—জলে! সম্ভবতঃ এখন নদীতে স্নান করবে, অথবা নৌকায় আছে। গিয়ে দেখি, যদি কোন লোক এখন জলে থাকে, তাহলে বুঝ্‌বো, সেই-ই একাজ করেছে। তারপর, হরদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, সমস্ত বিষয় অবগত হব।" এই বলিয়া, বরাবর পূর্ব্বদিকের রাস্তায় চলিতে লাগিলেন।

কল্য রাত্রে যে লোকটি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাঁহার বাটী পর্য্যন্ত গিয়াছিল, আজও সে তাঁহার অদূরে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আসিতে লাগিল।

ক্রমে তিনি নদীতটে উপনীত হইলেন। দেখিলেন,—জলে কেহই নাই ; কেবল একখানি তরণী। মনে মনে বলিলেন,—"বোধ হয়, এই নৌকাতেই আছে।" এমন সময়, তাঁহার পশ্চাতে যে লোকটি আসিতেছিল, সেও তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল।

লোকটি দীর্ঘকায়। বয়স অনুমান ৩৫।৩৬ বৎসর। মুখে নাতিদীর্ঘ শ্মশ্রু। বর্ণ ঈষৎ গৌর। দেহ বলিষ্ঠ। দেখিয়া সম্ভ্রান্তবংশীয় বলিয়াই বোধ হয়।

লোকটি তীরে আসিয়া ডাকিল,—"শ্রীদত্ত!"

তরণী-মধ্য হইতে কে যেন বলিল,—"কে ও, যশোবন্ত এলে? তারপর, সংবাদ কি?"

যশোবন্ত বলিলেন,—"সমস্ত মঙ্গল।" এই বলিয়া, তিনি তরণীর উপর আরোহণ করিলেন ; এবং শোভনলালকে বলিলেন,—"মহাশয় কি পরপারে যাবেন? যান তো আমাদের সঙ্গে আসুন ; কোন কষ্ট হবে না।"

শোভনলাল, কি ভাবিয়া, তরণীতে আরোহণ করিলেন।

যশোবন্ত নিজেই তরণী বাহিতে লাগি-

লেন। তরণী ক্রমে নদীর মধ্যস্থলে উপস্থিত হইল। এমন সময়ে, শোভনলাল জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এই নৌকায় আর কেউ নাই?"

যশোবন্ত বলিলেন,—"ভিতরে যান; আরও লোক আছে।"

শোভনলাল ভিতরে গমন করিলেন। দেখিলেন, সুশুভ্র শয্যার উপর দুইটি সুন্দর যুবক উপবিষ্ট। বৃদ্ধ শোভনলাল একদৃষ্টে তাঁহাদের রূপদর্শন করিতে লাগিলেন। যুবকদ্বয়, তাঁহাকে দেখিয়া, "আসুন মহাশয়, বসুন" বলিয়া, অভ্যর্থনা করিয়া শয্যায় বসাইলেন।

এদিকে যশোবন্ত তরণী চালনা করিতে করিতে দেখিলেন,—নৌকা স্রোতের টানে আপনিই চলিতেছে। তথাচ তিনি, নৌ-গৃহের সম্মুখে বসিয়া, উহার দ্বার বন্ধ করিয়া দিলেন।

একি?—ক্রমে স্রোতের টানে নৌকা কোন্ দিকে চলিতে লাগিল! সম্মুখে অত্যুচ্চ পর্ব্বত! একি! পর্ব্বতসম্মুখে যে ভীষণ আবর্ত্ত, একি!—একি?—নৌকা যে ঘুরিতে ঘুরিতে আবর্ত্ত-মধ্যে ডুবিয়া গেল!

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পরামর্শ!

মধ্যাহ্ন-সময়ে কোতোয়ালীর এক প্রকোষ্ঠে বীরেন্দ্র ও বলেন্দ্র কথোপকথনে ব্যস্ত ছিলেন। গৃহের দ্বার বন্ধ!

বীরেন্দ্র বলিলেন,—"হরদেব যে হত্যা করেছে, তাতে আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই!"

বলেন্দ্র বলিলেন,—"কিন্তু দুর্গালাল সিংহ বলেছিলেন যে, ভূপলালের সঙ্গে হরদেবের কন্যার বিবাহের সম্বন্ধ হয়েছিল?"

বীরেন্দ্র।—সম্বন্ধ হয় নাই! হরদেবের ইচ্ছাও ছিল না যে, ভূপলালের সঙ্গে তার কন্যার বিবাহ দেয়! বোধ হয়, ভূপলাল হরদেবের কোন গুহ্যতত্ত্ব জান্‌তো, আর সেই তত্ত্ব প্রকাশ করে দেবার ভয় দেখাইয়াই সে হরদেবকে কন্যাদানে সম্মত কর্‌বার চেষ্টায় ছিল। আর, তাই-ই বোধ হয়, হরদেব তাকে হত্যা করে [illegible] সে বিভ্রাট হতেও নিস্তারের চেষ্টা পেয়েছে।

বলেন্দ্র।—প্রমাণ!

বীরেন্দ্র।—দেখ,—যদি কেউ অর্থলোভে তাকে বধ কর্‌তো, তা'হলে হীরকাঙ্গুরী, অর্থ[illegible] পূর্ণ থলি প্রভৃতি কিছুই লয় নাই কেন? সুতরাং এই হত্যার উদ্দেশ্য, হত্যা করা বই আর কিছুই নয়।

বলেন্দ্র।—তা যেন হ'লো; কিন্তু তোমার নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিই যে হত্যা করেছে, সেপক্ষে প্রমাণ কৈ? হত্যাকারী অল্পবয়স্ক যুবা; কিন্তু তোমার কথিত ব্যক্তির বয়স পঞ্চাশেরও বেশী।

বীরেন্দ্র।—কিন্তু, তাকেও কথিত সজ্জায় জ্যোৎস্নালোকে যুবা বলিয়াই ভ্রম হ[illegible] বিশেষ, সে ব্যক্তি পরশ্ব রাত্রে ঐ সময়ে বাহিরে ছিল। আরও, আমি কাল বেশ ল[illegible] করে দেখেছি, যত বারই হত্যার কথা উঠেছে তত বারই তা'র মুখ বিবর্ণ হয়ে গিয়েছে।

বলেন্দ্র।—স্বীকার কর্‌লাম, সেই-ই হত্যাকা'রী; কিন্তু বিচারালয়ে প্রমাণ করা যাবে কি না,—তা আগে ভাল করে দেখা উচিত! কা[illegible] সে পদস্থ ব্যক্তি; হঠাৎ তা'র নামে এক[illegible] দোষারোপ ক'রে যদি প্রমাণ কর্‌তে না পা[illegible] যায়, তাহলে বিষম বিপদে পড়্‌তে হ'বে।

বীরেন্দ্র।—নিশ্চয়ই প্রমাণ কর্‌বো।

বলেন্দ্র।—তবে বিলম্ব কি? তোমার [illegible] নিয়োগ-পত্রই আছে! তাতেই তো স্পষ্টা[illegible] লিখিত আছে যে, ভূপলাল নামক ব্যক্তির হত্যাকারীকে তুমি সৌরাষ্ট্র-রাজের আদে[illegible] বন্দী করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইলে! [illegible] নিয়োগ-পত্র দেখাইয়া, তুমি অনায়াসে তা[illegible] বন্দী কর্‌তে পার্‌বে। তারপর, বিচারে [illegible] তাকে দোষী প্রমাণ কর্‌তে পার, তাহলে [illegible] হাজার টাকা তো পাবেই; অধিকন্তু, তো[illegible] পদ-বৃদ্ধিরও চেষ্টা কর্‌বো। কিন্তু, যদি প্র[illegible]

[illegible]তে না পার, তাহ'লে বড়ই বিপদ! তা'হলে, [illegible]ত চির-নির্ব্বাসন-দণ্ডেই দণ্ডিত হতে হবে। [illegible] বুঝে, যা' ভাল হয়, কর।

বীরেন্দ্র।—আচ্ছা, আজ আমি ভাল করে চিন্তা ক'রে, কাল যেমন হয়, কর্‌বো।

বলেন্দ্র বলিলেন,—"দেখ ভাই, সাবধান! খুব বুঝে সুঝে একার্য্যে প্রবৃত্ত হয়ো! প্রমাণের যেন অভাব হয় না!"

বীরেন্দ্র, কোন উত্তর না দিয়াই, বাহির হইলেন; এবং বরাবর নিজ-গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

কমলা।

পাঠক মহাশয়! এতক্ষণ আমি গল্পই করিতেছি; কিন্তু এখনও আপনার সহিত মিষ্টালাপ করা হয় নাই! মিষ্টালাপ করিব কি? আমার মূলেই যে মিষ্টত্ব নাই! গল্পের প্রায় অর্দ্ধেক লেখা হইল, অথচ, গল্পের নায়িকা দূরে থাকুক, এখনও একটা স্ত্রীলোকের নামও উল্লেখ হলো না; অথবা, গ্রন্থে নায়িকা কেহ আছেন কি না, তারও এখনও কোন স্থিরতা হলো না! যাই হউক, আর নিশ্চিন্ত থাকিলে, আপনি বিরক্ত হইতে পারেন, এই ভয়ে, এবার নায়িকাও একটা-আদটি আপনার সম্মুখে উপস্থিত করিলাম।

ঐ দেখুন, হরদেবের গৃহের একটি কক্ষে, একটি বালিকা উপবিষ্টা রহিয়াছেন; উনিই আমাদের এ গল্পের নায়িকা!—উহঁাকেই বিবাহ করিবার জন্য ভূপলাল আশান্বিত হইয়াছিল! কিন্তু, তাহার সে আশা প্রাণের সঙ্গে বাতাসে মিশিয়া গিয়াছে! পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের অধিকাংশ আশারই পরিণাম এই! এজগতে আপনিও কত আশা করেন, আমিও কত আশা [illegible]; কিন্তু কৈ, আমাদের কয়টা আশা পূর্ণ [illegible]? ভূপলালের আশাও তাই পূরে নাই; আপনিও তাহা বিলক্ষণই অবগত আছেন। তার পর, বৃদ্ধ শোভনলালের আশা—ভূপলালের হত্যাকারীকে ধরিয়া সে আশাতীত অর্থলাভ করিয়া বৃদ্ধকালে স্বচ্ছন্দে থাকিবে। আর, সেই আশার কুহকেই সে কি না করিল? সদাশিব জ্যোতিষীকে একটি টাকা দিল; শেষে, তাহার কথা মত 'জলে' হত্যাকারীকে অন্বেষণ করিতে গিয়া, সত্য-সত্যই নদীর অতল জলে নিমগ্ন হইল! আবার বীরেন্দ্র! হরদেব সিংহকেই হত্যাকারী নিশ্চয় করিয়া তাহাকে ধরিবার জন্য ব্যস্ত আছে; হৃদয়ে তার কত আশাই নৃত্য করিতেছে! আর ঐ যে বালিকা, আমাদের উপন্যাসের নায়িকা, উহঁার হৃদয়েই বা না জানি আশার কতই তরঙ্গ উঠিতেছে! এমন সময়, হরদেব গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

পিতাকে দেখিয়া বালিকা বলিল,—"বাবা! আজ সকালে দাদা এসেছিলেন; তোমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল কি?"

হরদেব।—"না মা! তুমি তোমার দাদাকে এখানে থাক্‌তে বল্‌লে না কেন?"

কন্যা।—বলেছিলাম বৈকি? তিনি বল্লেন, তাঁর অনেক কাজ আছে; আবার সন্ধ্যার সময় আস্‌বেন, বলে গেছেন।

হরদেব।—সন্ধ্যার সময় এলে, আজ আর তাকে যেতে দিও না! তোমার বিয়ের জন্য সে কোথায় পাত্র ঠিক করেছে বলে গেল, কিন্তু সেই পর্য্যন্ত তো তার আর কোন সংবাদ নেই! সে কি করে, কোথায় থাকে, কিছুই বলে না তো! দাদা মরবার সময় তাকে আমার হাতে হাতে সঁপে দিয়ে গিয়েছিলেন; আমিও তা'রে বহু-যত্নে বিবিধ বিদ্যায় পারদর্শী করলাম; কিন্তু, দুর্ভাগ্যক্রমে, সে সংসারী হলো না! তোমার বিয়ে হয়ে গেলেই, আমি তার, বিবাহ দিয়ে, তাকে সংসারী করে দিই, এমনই ইচ্ছা।

এমন সময়ে একজন ভৃত্য আসিয়া বলিল,

—"মহাশয়! একজন ভদ্রলোক এসে আপনাকে ডাকুছে।"

হরদেব বলিলেন,—"আচ্ছা, তাঁকে বৈঠকখানায় বসাও-গে; আমি যাচ্ছি।"

ভৃত্য চলিয়া গেল।

হরদেব বলিলেন,—"মা কমলা! তোমার কৃপাতেই তোমার এই বৃদ্ধ সন্তানটি আজও জীবিত রয়েছে। তোমাকে উপযুক্ত পাত্রে অর্পণ ক'রে, আমার সমস্ত বিভব তোমায় সমর্পণ ক'রে, আমি নিশ্চিন্ত হ'বো।"

কমলা লজ্জাবনত-মুখী হইলেন। হরদেব বহির্বাটীতে গমন করিলেন।

মণিপুর-যাত্রীর দিনলিপি।

(৫)

পূর্ব্বোল্লিখিত তিন-শ্রেণীর নাগার মধ্যে অঙ্গামী নাগারাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রতাপবান্। ইহারা, অসভ্য বর্ব্বর হইলেও, দেখিতে নিতান্ত কদাকার নহে; পার্ব্বত্য-জাতিসুলভ নাসিকার সমতলতা ভিন্ন ইহাদের আকৃতিতে আর কোনরূপ বিকৃতি লক্ষিত হয় না; বরং সবল ও সুদৃঢ় গঠন, দুর্দ্দম সাহসব্যঞ্জক বলিয়াই বোধ হয়। ইংরাজ-সীমায় ইহাদিগেরই গতিবিধি দৃষ্ট হয়; এবং ইহাদিগেরই অত্যাচারে ইংরাজ-রাজকে সময়ে সময়ে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছে। ইহারা পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গদেশে বাস করে; ইহাদের বাসভবনের অবশ্য কোনরূপ শৃঙ্খলা নাই—কোন কোন পল্লীতে সহস্র ঘরের বসতি আছে, আবার কোথাও বা বিংশতি ঘরের অধিক দৃষ্ট হয় না। কিন্তু, যেখানেই থাকুক ও যত অল্প-সংখ্যক লোকই বাস করুক, বিপক্ষের হস্ত হইতে আত্মরক্ষার্থ আপনাপন পল্লীর সীমা দৃঢ়ভাবে দুর্গবদ্ধ করিতে ইহারা ত্রুটী করে না; সীমার চতুর্ভিতে গভীর গহ্বর খনন করে, এবং তৎপার্শ্বে প্রস্তর নির্ম্মিত সুদৃঢ় প্রাচীর উত্তোলন বা তীক্ষ্ণাগ্র বংশখণ্ড সকল রোপণ করিয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে কোনরূপ আন্তর্জাতিক শাসন-প্রণালী নাই; জোর-জবরে আত্মসীমা সংরক্ষণ করা এবং প্রাণের জন্য প্রাণ লওয়াই ইহাদিগের শাসনের বা রাজনীতির মূলমন্ত্র। প্রত্যেক দলের এক বা ততোধিক দলপতি থাকে সত্য, কিন্তু তাহার প্রভুত্ব বিশেষ কিছুই লক্ষিত হয় না; ব্যক্তি-বিশেষের গুণগ্রাম-অনুসারেই লোক-সাধারণ কর্ত্তৃক এইরূপ দলপতি নির্ব্বাচিত হয়, এবং সেইরূপ লোক-সাধারণের অভিমতি-ক্রমেই তাহার প্রভুত্ব বিনষ্ট হইয়া থাকে। অসভ্য জাতি হইলেও, স্ত্রীজাতির সতীত্বের প্রতি ইহাদিগের সম্যক্ দৃষ্টি আছে; পরদারাসক্তি ইহাদিগের মধ্যে কোনরূপেই মার্জ্জনীয় অপরাধ নহে—পরদারোপগত পুরুষের প্রাণ না লইয়া কোনক্রমেই ইহারা নিরস্ত হয় না। ধর্ম্মজ্ঞান বা পরলোক সম্বন্ধে ইহাদিগের কোনরূপ ধারণা আছে বলিয়া বোধ হয় না; তবে শুনা যায়, কাহারও কাহার বিশ্বাস,—ইহজীবনে সদাচার-পরায়ণ হইলে মরণান্তে অনন্ত আকাশ-মণ্ডলে তাহাদিগের আত্মা নক্ষত্ররূপে জ্যোতি বিকীরণ করিবে। আর, কুপথগামী হইলে, প্রেতাত্মা, সপ্তযোনি পরিভ্রমণ করিয়া, মক্ষিকাকারে পরিণত হইবে। কেহ কেহ আবার বলে, জীবনান্তে এই ভৌতিক দেহ সমাধি-ক্ষেত্রে ধূলিরূপে পরিণত হইবে—মাটির শরীর মাটি হইয়া যাইবে—ইহা ভিন্ন আর কি? * প্রত্যুত, এ শ্রেণী আত্মা-সম্বন্ধীয় কোনরূপ বিশ্বাস নাই বলিলেই হয়।

প্রসঙ্গক্রমে, আমরা নাগার কাহিনী বর্ণনাচ্ছলে, মূল বিষয় হইতে অনেক দূরে আসিয়া

* *Vide* Hunters Satistical Account of Assam, Vol. II.

পড়িয়াছি। নাগা ও অন্যান্য পার্ব্বত্য-জাতির সম্যক্ কাহিনী বর্ণনা করিবার এ স্থান নহে; আর, অত্যল্প দিন কোহিমা-অবস্থান-কালে সকল বিষয় সংগ্রহ করিবার সুযোগও ঘটে নাই। ১৭ই হইতে ১৯এ এপ্রিল পর্য্যন্ত, সুখে দুঃখে কোন গতিকে, কোহিমাতে দিন কয়েকটা কাটিয়া গেল; এবং ২০এ মণিপুরাভিমুখে অগ্রসর হইবায় সমস্ত আয়োজন সুচারুরূপে সম্পন্ন হইল। কিন্তু, ক্রমেই মনের অবস্থা মলিন হইতে মলিনতর হইয়া উঠিল—মণিপুরের পথে ডাক বন্ধ, সুতরাং এই স্থান হইতে গৃহের সম্বাদ পাইবায় পথও একেবারে প্রতিরুদ্ধ হইল। কাল কাহারও আয়ত্বাধীন নহে—সুতরাং আমার মনোবেদনাও বুঝিল না, মণিপুরের ভবিষ্যদ্দশার প্রতিও ভ্রূক্ষেপ করিল না, ইংরাজ-রাজের অর্থ-নাশের আশঙ্কাও মনোমধ্যে স্থান দিল না—রবিবারের রাত্রি অবসান হইয়া গেল। ক্রমে, ২০এ এপ্রিল, সোমবার, প্রাতে, আহারাদি নিত্য-নৈমিত্তিক কার্য্য প্রণালী সমাধান করিয়া, সকলে "কুচ" করিতে প্রস্তুত হইলাম। বেলা ১১ ঘটিকার সময় যাত্রা আরম্ভ হইল।

এক্ষণে, এই মণিপুর-যুদ্ধের সমগ্র সৈন্য-সংখ্যা জানিতে পাঠকবর্গের কৌতূহল জন্মিতে পারে—এই বিশ্বাসে, নিম্নে তাহার এক তালিকা প্রদত্ত হইল,—

	ইংরেজ অফিসার।	দেশীয় অফিসার।	বীণা বাদক।	বন্দুকধারী।
গূর্খা সৈন্য—				
৪২ নং	১	৪	৪	২০০
৪৩ নং	৫	৮	৮	৪০০
৪৪ নং	৪	৯	৬	৩০০
বঙ্গ পদাতিক—				
১৩ নং	১	২	২	১০০
পুলিস সৈন্য	১	০	০	২০০
সর্ব্বসমেত	১৩	২৩	২০	১২০০

শেষোল্লিখিত পুলিস-সৈন্য আমাদিগের পূর্ব্বেই কোহিমা ত্যাগ করিয়াছিল। কোহিমার পরেই কিগুইমা, তৎপরে কুঝেমা। এই কিগুইমা ও কুঝেমার মধ্যে মেও-থানা অবস্থিত। এই মেও-থানা পর্য্যন্ত মণিপুরীর দৌরাত্ম্য প্রসারিত হইয়াছিল; এবং তজ্জন্যই, কাপ্তেন মার্কিণ্টায়র, পুলিস-সৈন্য-সহযোগে, ইতিপূর্ব্বেই তাহা প্রশমিত করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন; এবং তৎকার্য্য সমাধান-পূর্ব্বক, মণিপুরাভিমুখে অগ্রসর হইবার উদ্দেশে, আমাদিগের প্রতীক্ষায় কুঝেমায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। মঙ্গলবার, দশ ঘটিকার সময়, আমরা কুঝেমা পৌঁছিয়া ইহাঁদিগের সাক্ষাৎকার লাভ করি, এবং পরদিবস প্রত্যূষে একত্রে দলবদ্ধ হইয়া মৈতিকাম-অভিমুখে যাত্রা করি। সৈন্যগণের সুশৃঙ্খল সাজ-সজ্জা ও শ্রেণীবদ্ধ পদবিক্ষেপ, সঙ্গে সঙ্গে ঐকতান রণবাদ্যের গগণভেদী ধ্বনি, আমার পক্ষে অদৃষ্ট ও অশ্রুতপূর্ব্ব ব্যাপার! বাঙ্গালী-জীবনে রণসাজে সজ্জিত হইবার কোন আশা নাই—সখের সৈনিক সাজিবার সাধও সময়কায় বাহাদুর পূর্ণ করেন নাই; কিন্তু, এই কেরাণী-জীবনেই, আজ আমার সে রণ-যাত্রার রঙ্গ-রস অভ্যস্ত হইয়া গেল—দুরাশার মধ্য দিয়াও উৎসাহের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ অলক্ষ্যে জ্বলিয়া উঠিল। সায়াহ্ন পাঁচ ঘটিকায় সময়, আমরা সকলে মৈতিকাম পৌঁছিলাম; এবং পুনরায় পরদিবস প্রত্যূষে যাত্রা করিয়া যথাকালে কৈরঙ্গে উপস্থিত হইলাম। এতদিন আমরা পথে কোনরূপ উপদ্রবের লক্ষণ দেখি নাই—বিলাস-সুখের বশবর্ত্তী হইয়া বরযাত্রী যাইতেছি, কিম্বা প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত সমর-বাসনায় প্রাণ দিতে অগ্রসর হইতেছি, এতদিন তাহা বিশেষ বুঝিতে পারি নাই।

কিন্তু, ২৪এ এপ্রিল শুক্রবার, যখন আমরা কৈরঙ্গ হইতে ৬ মাইল দূরস্থিত মৈয়াংখাং-শিবিরে পৌঁছিলাম, বিপক্ষদলের ব্যবস্থাদি

তখনই কতক বুঝা গেল। আস-পাশ হইতে দুই-দশটা গোলা-গুলিও আমাদিগের উদ্দেশে ছুটিতে লাগিল; আত্মরক্ষার্থ এবং বিপক্ষের ভীতি-উদ্দীপনার্থ আমাদিগের পক্ষ হইতেও দুই পাঁচটা গুলি চলিল। কিন্তু, সৌভাগ্যক্রমে, উভয় পক্ষই তখন লক্ষ্যহীন ছিলেন—কাজেই সে গোলা-গুলিতে কাহারও গাত্রভেদ করিতে পারে নাই।

বাঙ্গালার বিবরণ।

বর্দ্ধমান—রাজা প্রতাপচাঁদ।

চতুর্থ প্রস্তাব।

রাজা প্রতাপচাঁদের বর্ণনা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে, তদ্বিষয়ে বিদেশীয় ঐতিহাসিক হন্টার সাহেব, প্রথমতঃ "কলিকাতা রিভিউ" ও তৎপরে তদীয় "ষ্ট্যাটিস্‌টিক্যাল একাউন্ট অব্ বেঙ্গল" নামক গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন, অগ্রে তাহাই প্রদর্শিত * হইতেছে। যথা,—

"Maharaja Tejchandra had a son, Pratap Chandra *whose name has already been mentioned in connection with the enactment, of the 'pattani' regulation,* but he died during the life-time of his father. Several years afterwards a pretender appeared, claiming the RAJ, but his claim, after a searching investigation was dismissed by the civil court. Several persons of the highest respectability *such as Babu Dwarkanath Tagore, Dr. Wise and others,* who had been subpœnaed to identify him, swore to his being an impostor. *The case created sensation and involved a far larger amount than the Tichborne trial.*" †

উক্ত অংশের তাৎপর্য্য এই;—মহারাজ তেজচাঁদের প্রতাপচাঁদ নামে এক পুত্র ছিলেন। পত্তনি আইন প্রবর্ত্তিত করিবার প্রসঙ্গে ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার নামকীর্ত্তন করা গিয়াছে। তিনি পিতার জীবদ্দশায় মৃত হন। বহু বৎসর পরে একজন 'প্রতারক', রাজা প্রতাপচাঁদ নামে সমাগত হয়; কিন্তু বিশেষ তদন্তে দেওয়ানী আদালতে তাহার স্বত্ব অপ্রমাণিত হয়। অনেক 'সম্ভ্রান্ত' লোক—**যথা বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর, ডাক্তার ওয়াইজ্ প্রভৃতি** *—তাঁহার সনাক্তে সন্দেহ করেন। ইহাতে তুমুল আন্দোলন হইয়াছিল। 'টিচ্‌বোরণ' বিচার অপেক্ষা ইহাতে প্রচুর বিত্ত ব্যয়িত হইয়াছিল।

তার পর, বর্দ্ধমান-রাজবাটীর প্রচারিত 'মহাভারতে' মহারাজ প্রতাপচাঁদ-সম্বন্ধে এইরূপ লেখা আছে,—

"প্রচণ্ডপ্রতাপ প্রতাপচন্দ্র তাঁহার (তেজশ্চন্দ্রের) পুত্র ছিলেন; যিনি অল্প বয়সে অতিশয় কৃতী হইয়া অষ্টম আইন প্রভৃতি সংস্থাপন করিয়া এই রাজ্য নিরুপদ্রব ও সুদৃঢ় করিয়াছেন! সেই অলোক-সামান্য গুণ-গুণান্বিত মহারাজ প্রতাপচন্দ্র অকালে অর্থাৎ অষ্টাবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে সুদারুণ রাহুরূপ জ্বররোগগ্রস্ত হইয়া মায়াময় কলেবর পরিহার করেন।"

হন্টার সাহেব অপেক্ষা অধিকতর সতর্ক হইয়া এখানে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাতেও তত্ত্বকথা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। কিন্তু "বঙ্গদর্শনে" ও "জাল প্রতাপচাঁদ" পুস্তকে বাবু সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহোদয় 'প্রতাপচাঁদ'-বিষয়ে যে

---

* উদ্ধৃত ইংরাজী অংশের ইটালিক অক্ষরে যাহা মুদ্রিত হইল, তাহা কেবল "কলিকাতা রিভিউ" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল; কিন্তু তৎপরবর্ত্তী "ষ্টাটিস্‌টিক্যাল একাউন্ট অব্ বেঙ্গল" পুস্তকে তাহা বাদ দেওয়া হইয়াছে।

† Calcutta Review, 1872. P. 22, and Statistical Account of Burdwan, Vol. IV, P. 142.

* বৃহদক্ষরে মুদ্রিত 'এই অংশটিও "ষ্টাটিসটিক্যাল একাউন্ট অব্ বেঙ্গল" পুস্তকে নাই। হন্টার সাহেব বোধ হয়, নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়াই পরবর্ত্তী পুস্তকে ইহা উল্লেখ করিতে নিরস্ত হইয়াছিলেন। কারণ, যদি বিপক্ষীয় সাক্ষী দ্বারকানাথ ঠাকুর 'সম্ভ্রান্ত' সাক্ষী হন, তবে নিঃস্বার্থ ডেভিড হেয়ার সাহেব যে 'সুসম্ভ্রান্ত' সাক্ষী, তাহার আর সন্দেহ নাই।

অত্যুৎকৃষ্ট প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহার ও অন্যান্য প্রবাদাদির সাহায্যে আমরা দেখাইব, প্রতাপচাঁদকে লোকে বিকৃতভাবে গ্রহণ করিয়া কিরূপ ভ্রান্ত হইয়াছিলেন! অতএব এস্থলে তাঁহার বৃত্তান্ত লিখিত হইতেছে।

প্রতাপচাঁদ।—১১৯৯ সালের কার্ত্তিক মাসে তাঁহার জন্ম হয়। বাল্যকালে তিনি অত্যন্ত দুষ্ট ছিলেন। অল্প বয়সে তাঁহার জননী নান্‌কী রাণীর মৃত্যু হইলে, তাঁহার পিতামহী বিষণ-কুমারীর আদরে তিনি প্রতিপালিত হইতেন। অতিরিক্ত সোহাগ পাওয়ায়, তাঁহার লেখাপড়া ভাল হয় নাই। তাঁহার বিমাতা কমলকুমারী ও তাঁহার ভ্রাতা পরাণ বাবু প্রতাপচাঁদের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না।

প্রতাপচাঁদ অপেক্ষাকৃত অল্প বয়স হইতেই জমীদারীর তদন্ত করিতে লাগিলেন। ইহাতে পরাণ বাবুর মনে কিন্তু বড়ই কষ্ট হইয়াছিল। তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রতাপচন্দ্রও ইহা বুঝিয়া, পিতার নিকট হইতে এক দানপত্র লেখাইয়া লন। ইহার পর হইতেই, কিছু দিন, বিশেষ যত্নের সহিতই, জমীদারীর কার্য্যাদি নির্ব্বাহ করিতে থাকেন। এই সময়, ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের অষ্টম আইন, তাঁহারই চেষ্টায় প্রবর্ত্তিত হয়; এবং ঐ আইন দ্বারা পত্তনিদারদিগের পত্তনিস্বত্ব নিলামের ব্যবস্থা করাইয়া লয়েন। *

প্রতাপচাঁদের হস্তে জমীদারীর ভার পড়ার পর হইতেই, প্রতাপচাঁদে এবং পরাণ বাবুতে ভিতর ভিতর বড়ই গোলযোগ চলিতে থাকে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, পরাণ-তনয়া বসন্তকুমারী, তেজচাঁদের বৃদ্ধ-বয়সের প্রেয়সী হইয়াছিলেন; ক্রমে, এ চক্রান্তে, ইহাই এক ফাঁদ হইয়া উঠিয়াছিল।

পূর্ব্ব হইতেই প্রতাপচাঁদের কিঞ্চিৎ পানদোষ ছিল। কিন্তু, কি তাঁহার দুরদৃষ্ট, এই সময় তাহা আরও বৃদ্ধি পাইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে অষ্টাবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম কালে (১২২৭ সালে) তিনি এক ভয়ানক মহাপাতকে পতিত হইলেন। এ সকল বিষয় ও ইহার ফলাফল, তাঁহার নিজের কথাতেই দেখুন,—

"বিমাতা মহারাণী কমলকুমারী (পরাণের ভগ্নী) আমার পরম শত্রু ছিলেন। আমার বয়স যখন ষোল কি সতর, তখন তিনি দুইবার আহারের সঙ্গে আমায় বিষ দেন। একবার আমি তাহা ফেলিয়া দিই, আর একবার তাহা একটা ইন্দুরকে খাইতে দিই; ইন্দুর তাহা খাইয়া তৎক্ষণাৎ মরে। সেই অবধি আমার অন্ন আমি স্বতন্ত্র পাক করাইতাম। পরাণ আর বসন্তলাল বাবু আমার সর্ব্বনাশ করিবার নিমিত্ত সহস্র ফাঁদ পাতিতেন, আমি তাহা হইতে কৌশলে উদ্ধার হইতাম। কিন্তু শেষে তাঁহারা আমার পিতার মন এমন ভার করিয়া দিলেন যে, আমি তাহায় আর কোন উপায় করিতে পারিলাম না। *

"আমি সেই অবধি অধঃপাতে গেলাম। ক্রমেই মদ অধিক খাইতে লাগিলাম। শেষে, অদৃষ্টদোষে গুরুতর পাপগ্রস্ত হইলাম। তখন

---

* সঞ্জীব বাবু কিন্তু ইহা বিশ্বাস করেন না। না করুন, কিন্তু ইহা প্রকৃত ঘটনা। প্রতাপচাঁদের চেষ্টাতেই যে এ আইন প্রবর্ত্তিত হয়, ইস্তক বর্দ্ধমান-রাজবাটীর 'মহাভারতে' নাগাদ 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রেও ইহা স্বীকৃত হইয়াছে। যথা,—(১) "যিনি অষ্টম আইন প্রভৃতি সংস্থাপন করিয়া এই রাজ্য নিরুপদ্রব ও সুদৃঢ় করিয়াছেন।"—বর্দ্ধমান-রাজবাটীর 'মহাভারতের' রাজবংশ-বিবরণ দেখ। (২) "The latter (Pratap) come down to Calcutta and suggested it to the Board. The Board at once recognised the propriety and feasibility of the plan."—*Vide* Calcutta Review, 1872, P 11.

* কথিত আছে,—এই সময়, মন বড়ই খারাপ হওয়ায়, প্রতাপচাঁদ, শ্যাম বাবু নামক এক জন পারিষদ এবং চিনারী নামক একজন চিত্রকর ভিন্ন, আর কাহারও সঙ্গে বাক্যালাপ পর্য্যন্তও করিতেন না। অধিকন্তু, এই সময়েই, ঐ চিত্রকর দ্বারা, তাঁহার এক আপাদমস্তক-প্রামাণিক চিত্রপট প্রস্তুত করাইয়া লয়েন।

কৃষ্ণকান্ত ভট্টাচার্য্যের নিকট স্বকৃত মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কি, জিজ্ঞাসা করায়, তিনি ব্যবস্থা দিলেন—'এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত তুষানল ; তাহা অশক্তে চতুর্দ্দশ বৎসর অজ্ঞাতবাস।' এই সঙ্গে আরও বলিয়া দিলেন যে, 'এরূপভাবে অজ্ঞাতবাস করিবে, যেন সকলেই জানে—তুমি মরিয়াছ।' এই অজ্ঞাতবাস কিরূপে আরম্ভ করিব, প্রথমে ঠিক অনুভব করিতে পারি নাই ; সুতরাং প্রথমে কাহাকেও না বলিয়া পলাইলাম। সেবার আমার পিতা আমাকে রাজমহল হইতে ধরিয়া আনেন। মুন্সি আমীর উদ্দিন তাঁহাকে আমার সন্ধান বলিয়া দেয়। আমি ফিরিয়া আসিলে, পিতা মহাশয় পরাণের অত্যাচার ও পীড়নের কথা জানিতে পারিলেন, এবং সেই অবধি পরাণের উপর তিনি হাড়ে চটিয়া গেলেন। আমাকেও অনেক বুঝাইলেন। কিন্তু আমার প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক, আমি আর অপেক্ষা করিতে পারিলাম না। এবার ভাবিলাম,—কেবল পলাইলে হইবে না ; যেরূপ ব্যবস্থাপত্র, সেইরূপ করা কর্ত্তব্য। আমি মরিয়াছি—সকলের জানা আবশ্যক। অতএব পীড়ার ভান করিয়া কাল্‌নায় গেলাম। কাল্‌নার ঘাটে কালীপ্রসাদ একখানি ভাউলিয়া আনিয়া রাখিবেন কথা ছিল ; আর তাঁহাকে বলা ছিল, ভাউলিয়া পৌঁছিলে তিনি শঙ্খধ্বনি করিবেন। আমি শয্যায় শুইয়া সেই সঙ্কেত শুনিলাম। তাহার পর ক্রমে বিকারের রোগীর ন্যায় ভ্রমবাক্য বকিতে লাগিলাম। সকলে আমায় পাল্কী করিয়া গঙ্গাতীরে লইয়া গেল। শেষে অন্তর্জ্জলি করিল। অন্তর্জ্জলির পর যখন রাজবাটীর অধিকাংশ লোক শীতে কাতর হইয়া তাঁবুর ভিতর গিয়া আশ্রয় লইল, কেবল দুই চারি জন মাত্র আমার নিকট থাকিল, সেই সময় আমি তাহাদিগকে শপথ করাইয়া জলে সরিয়া পড়ি। নিঃশব্দে সাঁতার দিয়া বজরায় উঠি। রাত্রিশেষে সেই বজরায় মুরশিদাবাদ যাত্রা করি।"

তারপর, তিনি এইরূপে পলায়ন করিয়া, কোথায় কোথায় কিরূপভাবে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, 'সুপ্রিম কোর্টে' তাঁহার স্বহস্ত-লিখিত যে দরখাস্তখানি দাখিল করা হয়, তাহা হইতেই দেখুন, তাহারই বা বিবরণ কিরূপ ;—

"কালনা হইতে পলাইয়া কালীপ্রসাদ আর আমি মুরশিদাবাদ ও ঢাকা হইয়া ব্রহ্মপুত্র নদে গিয়া তীর্থস্নান করি। তাহার পর চন্দ্রশেখরে যাই। সেখান হইতে অদ্দিনাথ দর্শন করিতে যাই। তথায় একবৎসর থাকি। তাহার পর যৈন্তেশ্বরী ও ত্রিপুরেশ্বরী দর্শন করিয়া বাণেশনাথ মহাদেবের নিকট এক বৎসর থাকি। সেখান হইতে পশ্চিমাঞ্চলে যাই। কাশী, প্রয়াগ, চিত্রকূট, অযোধ্যা, বৃন্দাবন, মথুরা, কুরুক্ষেত্র, পুষ্কর, প্রভাস, বদরিকাশ্রম, হরিদ্বার, হিঙ্গুলাক্ষ, জ্বালামুখী প্রভৃতি নানা তীর্থস্থান পর্য্যটন করি। পঞ্জাবে গিয়া লাহোর, অমৃতেশ্বর প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করি, শেষে কাশ্মীরে যাই। সেইখানে জেনারেল এলার্ডের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। কাশ্মীরে আমি ছয় বৎসর থাকি। তাহার পর, আবার হিন্দুস্থানে আসি। দিল্লীতে বিবি রামজে আমাকে দেখিয়া চিনিয়া ফেলেন। আমি ইতস্ততঃ যাইতাম, তাহাতে অনেকে আমায় চিনিয়াছিল। যেখানে আমার কথা লইয়া আন্দোলন হইত, আমি সেইস্থান তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করিতাম। প্রায়ই আমি যোগীদের সঙ্গে বেড়াইতাম। যখন যাঁহাদের সাক্ষাৎ পাইতাম, তখন তাঁহাদের সঙ্গ লইতাম। তাঁহারা একস্থানে স্থায়ী হইতেন না, সুতরাং আমি দীর্ঘকাল কাহারও সঙ্গে থাকিতে পাই নাই। আমার একখানি ইয়াদাস্ত বহি ছিল। যেদিন যেখানে গিয়াছিলাম, যেখানে যাহা আশ্চর্য্য দেখিয়াছি, তাহা সকলই সেই ইয়াদাস্তে লিখিয়া রাখিয়াছি। এলিয়ট সাহেব বাঁকুড়ায় যখন আমায় গ্রেপ্তার করেন, তখন সেই ইয়াদাস্তখানি হারায়। আমি

সেখানির নিমিত্ত মেজেষ্টার সাহেবের নিকট বিস্তর মিনতি করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা আর ফিরিয়া পাইলাম না ; মেজেষ্টার তাহার অনুসন্ধানের নিমিত্ত কোন হুকুমও দিলেন না। আমি বাঙ্গালায় প্রত্যাগমন করিয়া প্রথমে কালীঘাটে যাই। তাহার পর, বর্দ্ধমানে উপস্থিত হই ; সেখানে গোলাপবাগে আমাকে অনেকে চিনিয়া মহা আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল।

"যদি আমি বাস্তবিক মরিতাম, তাহা হইলে কি আমার ত্যক্ত সম্পত্তির কোন বন্দোবস্ত করিয়া যাইতাম না ? সামান্য লোকে সামান্য সম্পত্তির নিমিত্ত পোষ্যপুত্র লইবার অনুমতি দিয়া যায়, অথবা দানপত্র লিখিয়া যায়। কিন্তু আমার এত সম্পত্তি, আমি কি কোন একটা বন্দোবস্ত করিয়া যাইতে পারিতাম না ? আমি পীড়িত হইয়াও অনেকদিনই ছিলাম, আমার বাক্‌রোধও হয় নাই। আমায় গঙ্গাযাত্রা করিলেও ত আমি অনেক দিন কালনায় ছিলাম। যদি সত্যই আমি মরিব এরূপ হইত, তাহা হইলে আমি কি এই সময় মধ্যে পোষ্যপুত্রের অনুমতি দিয়া যাইতাম না ? অথবা একখানা দানপত্র কি উইল করিয়া যাইতাম না ? এ সকল করিবার সময় ত যথেষ্ট ছিল ?

"আর এক কথা ; আমি যাইবার সময় একখানি প্রমাণ ছবি রাখিয়া গিয়াছিলাম, তাহা এখানে আনা হইয়াছে। লোকে বয়সে কেহ স্থূল হয়, ক্লেশে কেহ শুষ্ক হয়, কেহ কাল হয় ; কিন্তু মাথায় কেহ ছোট হয় না, কেহ বড়ও হয় না। সেই ছবির মূর্ত্তি আমার সহিত প্রভেদ হয় নাই।

"এখন বিচারকর্ত্তা পরমেশ্বর, আর তাঁহার প্রতিনিধি আপনারা, অধিক বলা বাহুল্য।"

বস্তুতঃও প্রতাপচাঁদের নিরুদ্দেশের কারণ তখনকার লোকের যেরূপ বিশ্বাস ছিল, এবং এখনকার লোকেরও যেরূপ আছে, তাহা এই,—তিনি এক চতুরা অধার্ম্মিকার প্রলোভনে মহাপাতকে পড়িয়াছিলেন ! আর, সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত জন্য, চতুর্দ্দশ বৎসর অজ্ঞাতবাস করিয়াছিলেন। প্রকাশ্যে অজ্ঞাতবাসের চেষ্টা করায়, তিনি একবার রাজমহল হইতে ধৃত হন। সেইজন্যই, মৃত্যুর ভান করিয়া, কালনায় শব সাজেন।

পীড়ার ভান বা মৃত্যুর ভান সম্বন্ধে প্রতাপচাঁদ নিজেও বলেন,—"যে কোন পীড়ার আমি অনুকরণ করিতে পারি। মৃত্যুও আমি অনুকরণ করিতে পারি। কবিরাজেরা সে অনুকরণ ছন্দাংসে বুঝিতে পারিবে না।" এই কথার প্রতিপাদনার্থ, নানা স্থান হইতে প্রমাণ-প্রয়োগ উদ্ধৃত করিয়া, সঞ্জীব বাবুও বলেন,—"হট্‌যোগ প্রভৃতি অভ্যাস করিলে এসকল ভেল্কী অনায়াসেই দেখান যাইতে পারে। জাল রাজার তাহা অভ্যাস ছিল।"

যাইহোক, তাঁহার পীড়া ও মৃত্যুর ভান যেরূপে প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহাও শুনুন। ১২২৭ সালের পৌষ মাসের ১৫।১৬ ই তারিখের পর, এক দিন, প্রতাপচাঁদ "নূতন মহলে" স্নান করিবার ইচ্ছা করেন। তথায় প্রায় তিন ঘণ্টা স্নানের পর বহির্গত হইলেন। তখন তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় আরক্ত, সর্ব্বগাত্র কম্পমান। সেইদিনই অপরাহ্ণে রাষ্ট্র হইল,—ছোট রাজার সাঙ্ঘাতিক রোগ জন্মিয়াছে। ডাক্তার, কবিরাজ, হাকিম, সর্ব্বশ্রেণীর সর্ব্বজাতীয় চিকিৎসকের যাওয়া আসা চলিতে লাগিল। একদিন পরেই কালনার ঘাটে গঙ্গাযাত্রা করা হয়। এ ব্যবস্থা রোগী নিজেই করেন। বৃদ্ধ রাজা ভিন্ন আর কেহই সঙ্গে গেলেন না। পত্নী দুইটি যাইবার অনুমতি না পাওয়ায় যাইতে পান নাই। দুই চারি দিনের পর, তাঁহাকে শিবিকা করিয়া গঙ্গার ঘাটে লইয়া যাওয়া হইল ; 'কানাত' দিয়া ঘাট ঘেরাইয়া তন্মধ্যে ছোট রাজাকে রাখা হইল। তখন শীতকাল, রাত্রি

নিবিড় অন্ধকারময়। সামান্য আলো জ্বলিতেছিল। রাত্রি দুই প্রহরের সময়ে অন্ত্যেষ্টি হয়; তৎপরেই বৃদ্ধ রাজা বর্দ্ধমান-যাত্রা করিলেন। সন ১২২৭ সালের ২১ এ পৌষে এই ঘটনা ঘটে। পিতাপুত্রে কি কি কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, সাধারণ্যে তাহা প্রকাশ নাই।

১। ইহার দুই চারি দিন পরেই কিন্তু প্রচার হয়,—প্রতাপ মরেন নাই, পলাইয়াছেন। অধিকন্তু, এসময় এরূপও একটা রটনা হইয়াছিল যে,—"রাজবাটীর লোকেরা ঘাটে শব না পাইয়া গঙ্গায় জাল ফেলিয়া অনুসন্ধান করে।"

২। জনরবটি রাজাও শুনিলেন; কোন উত্তর করিলেন না।

৩। রাজবাটীর নিয়মানুসারে নূতন মন্দিরে মৃত ব্যক্তির ভস্ম রক্ষিত হয়। প্রতাপচাঁদের তাহা হয় নাই।

৪। তেজচন্দ্র বাহাদুরের মৃত্যুর পর, অর্থাৎ প্রতাপচাঁদের মৃত্যু বা অজ্ঞাত-বাসের ১২ বৎসর পরে, তাহা করা হইয়াছিল।

৫। বৃদ্ধ রাজাকে পোষ্যপুত্রের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেই তিনি অমত করিতেন। দ্বিতীয় বার অনুরোধের সময় তিনি স্পষ্টই বলেন,—"আমার প্রতাপ আসিবে।" তখন তাঁহাকে সকলে বুঝাইল,—"মহারাজ! আপনাকে পুত্রশোক হইতে রক্ষার নিমিত্ত লোকে প্রতাপচন্দ্রের অজ্ঞাতবাস রটাইয়াছে। যদি ফিরিয়া তিনি না আসেন, তবে রাজত্ব ইংরেজের আয়ত্ত হইবে।" এইসকল প্রবোধবাক্যেই রাজা পোষ্যপুত্র লয়েন।

রাজা রামমোহন রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদ রায়, সেই সময় বর্দ্ধমানে থাকিতেন। তাঁহাকেই প্রথমতঃ পোষ্যপুত্র লইবার কথা হয়। কিন্তু, সেরূপ কথা-বার্ত্তা হইলেও, অবশেষে, পরাণ বাবুর সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্রকেই মহারাজা পোষ্যপুত্র-স্বরূপ গ্রহণ করেন। "তাঁহার নাম কুঞ্জবিহারী কি নারায়ণবিহারী এমনি একটা ছিল—রাজপুত্র হইলে সে নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া মহাতাপচাঁদ রাখা হইল।"

ইহার পর, ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে (১২৩৯ সালে) অর্থাৎ প্রতাপচাঁদের কল্পিত মৃত্যুর দ্বাদশ বৎসর পরে, মহারাজ তেজচন্দ্রের মৃত্যু হয়। আর, তখন, সম্পূর্ণ পরাণ বাবুরই কর্ত্তৃত্বে, তাহার পুত্র শ্রীমান আফ্‌তাপচাঁদ বাহাদুরের নামেই রাজকার্য্য চলিতে থাকে। সকলেই নিষ্কণ্টক হয়েন আর কি?

... ...

তেজচন্দ্রের মৃত্যুর তিন বৎসর পরে অর্থাৎ ১২৪২ সালে (১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে) একজন সন্ন্যাসী বর্দ্ধমানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি রাজবাটীতে প্রবেশ করিলেন। গোলাপবাগের ফটকের নিকট বসিলেন। তথায় গোপীনাথ ময়রা দেখিয়াই তাঁহাকে চিনিল। সে বলিয়া উঠিল,—"আমাদের ছোট মহারাজ!" ক্রমে সহরের সর্ব্বত্র ঘোষণা হইল। রাণীরা, পুরাতন দাসী পাঠাইয়াও, ঐ কথা জানিতে পারিলেন। রাজবাটীর মুহুরী কুঞ্জবিহারী ঘোষও তাঁহাকে চিনিয়াছিল; এবং এই অপরাধের জন্যই তাহার চাকরী গিয়াছিল। যাইহোক, অবশেষে, পরাণের লোকে তাঁহাকে গোলাপবাগ হইতে তাড়াইয়া দিলে, তিনি কাঞ্চননগরে গিয়া থাকিলেন। তথায়ও জনতা বাড়িতে থাকায়, পরাণবাবুর লোকে তাঁহাকে একেবারে দামোদর পার করাইয়া দিল।

তিনি ইহার পর বিষ্ণুপুরে গিয়া উপনীত হইলেন। তত্রত্য রাজা ক্ষেত্রমোহন সিংহ তাঁহাকে মহারাজ প্রতাপচাঁদ বলিয়া চিনিলেন। তাঁহার পরামর্শে বাঁকুড়ার মাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন; কিন্তু বেশ-পরিবর্ত্তন করিলেন না। দেখা করিতে গিয়া, ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের বাটীর সম্মুখস্থ একটী গাছতলায় উপবেশন করিলেন। তাঁহার ইচ্ছা রহিল যে,—সাহেব

যেই বাহির হইবেন, অমনি তাঁহাকে আপনার দুঃখের কথা জানাইবেন ও তৎপ্রতিকারের প্রার্থনা করিবেন। কিন্তু, কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, সেখানেও তাঁহাকে দেখিতে কতকগুলি লোক জুটিল। আর, তাহাতেই,—তাঁহার ভাগ্যে, হিতে বিপরীত ঘটিল! ইতিপূর্ব্বে মানভূম-অঞ্চলে, 'আলোক সা' নামক একজন মুসলমানের অধিকনায়কত্বে, একটি বিদ্রোহ হইয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব, তাঁহাকেই আলোক সা মনে করিয়া, গ্রেপ্তার করিলেন। কলিকাতা হইতে তাঁহার হইয়া একজন ইংরেজ উকীলও গেলেন; কিন্তু, মাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে কোন কথাই জানিতে দিলেন না।

৮মাস পরে তাঁহাকে হুগলীতে পাঠান হইল। কৌন্সলি টার্টন, তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন। কিন্তু জজ তাঁহাকে কোন কথা কহিতে না দেওয়ায়, তিনি নিজামতে দরখাস্ত করিলেন; কিন্তু তাহাতেও কোনই ফল ফলিল না। বিচারে তাঁহার ছয় মাস কারাদণ্ডের হুকুম হইল। আর, সেই ছয় মাস পরে, সন্ন্যাসীর প্রশ্নের উত্তরে, জজ-সাহেব জানাইলেন,—"তোমার নাম আলোক সা। তুমি মহারাজ প্রতাপচাঁদ বলিয়া লোক জুটাইয়াছিলে; তাহাতে রাজ্যের শান্তিভঙ্গ হইয়াছিল।" ১৮৩৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি কারামুক্ত হইয়া কলিকাতায় বাবু রাধাকৃষ্ণ বসাকের বাটীতে থাকিলেন। *

* এই সময় হইতেই বাঙ্গালার অনেক হৃদয়বান্ গণ্যমান্য ব্যক্তি যখন বুঝিলেন যে, তিনি বাস্তবিকই প্রতাপচাঁদ, তখন যাহাতে তিনি তাঁহার পৈত্রিক সম্পত্তির অধিকারী হয়েন অনেকেরই এমন চেষ্টা হইল। কেহ বা অর্থ দ্বারা, কেহ বা লোক দ্বারা; এবং যাঁহারা তাঁহাকে বাস্তবিকই চিনিলেন, তাঁহারা সাক্ষ্য পর্য্যন্তও দিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। অধিকন্তু তাঁহার স্বরাজ্যস্থ যাঁহারা তাঁহাকে চিনিতে পারেন, তাঁহাকে একবার কালনায় ও বর্দ্ধমানে পাঠাইয়া, তাহাও সংগ্রহের চেষ্টা হইল।

১৮৩৮ সালের শীতকাল অতীত করিয়া, তিনি কাল্‌না হইয়া, বর্দ্ধমান-যাত্রার মানস করিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য,—যত বেশী লোকে তাঁহাকে রাজা প্রতাপচাঁদ বলিয়া চিনিতে পারে! কিন্তু, কি দুর্ভাগ্য, পথিমধ্যে পরাণবাবুর নিয়োজিত কর্ম্মচারী পিয়ারালাল বাবু, মহিবুল্লা দারোগাকে ও কাল্‌নার পাদরি আলেক্‌জাণ্ডর সাহেবকে * হস্তগত করিয়া, কালনায় জমিয়ৎবস্ত (বিদ্রোহ বা শান্তিভঙ্গ আর কি!) করায় অভিযোগে, প্রতাপচাঁদকে গ্রেপ্তার করাইলেন। অধিক কি, সেই সূত্রে, তাঁহার সহিত তাঁহার প্রধান প্রধান বন্ধু-বান্ধবগণকেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল।

এই স্থলে একটা রহস্যের কথা না বলিয়া আর থাকা যায় না। কথাটাকে রহস্যের কথা বলিতেছি বটে, কিন্তু কথাটার একদিকে যেমন ইংরাজ-বিচারকের 'মশা মারিতে কামান পাতা' দেখিয়া হাস্য-সংবরণ করিতে পারা যায় না, অন্যদিকে তেমনই অভাগা-অভাগিনীদিগের অকারণ কষ্টভোগের কথা স্মরণমাত্রেই কান্না আসে। প্রতাপচাঁদ যে সময় কাল্‌নায় গিয়া উপস্থিত হন, সেই সময়, তিনি কাল্‌না জয় করিতে আসিয়াছেন—এমনই একটা জনরব তুলিয়া দেওয়া হয়। পাদ্‌রি আলেকজেণ্ডারও সেই মর্ম্মেই মাজিষ্ট্রেটকে এক পত্র পাঠান। সঙ্গে সঙ্গে, বর্দ্ধমানের মাজিষ্ট্রেট ওগিলবিও তাই, আশঙ্কিত হইয়া, একদল সৈন্য লইয়া, ৯ই বৈশাখ (১২৪৫ সাল) রাত্রিতে কালনায় উপস্থিত হয়েন। লিটিল নামক একজন সাহেব সেই

* এই পাদরী সাহেবের প্রতি ম্যাজিষ্ট্রেটের বড়ই বিশ্বাস ছিল। আর সেই সুবিধায়, পাদরী সাহেবও, মধ্যে মধ্যে ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে, সংবাদ দিতেন যে,—'এখনও সাবধান, প্রতাপচাঁদকে দমন না করিলে বিদ্রোহের সম্ভাবনা। প্রতাপচাঁদ এই ছয় হাজার লোক জুটাইল—এই আট হাজার লোক জুটাইল',—এমন সকল সংবাদও প্রেরিত হইত।—

সৈন্যদলের পরিচাল কছিলেন। সৈন্যদলসহ, মাজিষ্ট্রেট সাহেব অবশ্য, গঙ্গার ধারেই—যেখানে প্রতাপচাঁদের বজরা প্রভৃতি বাঁধা ছিল, উপস্থিত হয়েন।

'রাত্রি তখন তৃতীয় প্রহর। নৌকার আলোক নিবিয়া গিয়াছে—সকল অন্ধকার, সকলে ঘুমাইতেছে, নৌকাও যেন ঘুমাইতেছে। মাঝিরা নৌকার ছাদে, ভদ্রলোকেরা নৌকার ভিতরে নিদ্রা যাইতেছে। এমন সময়, কাপ্তেন সাহেব, মেজেষ্টারের সহিত কি পরামর্শ করিয়া, ফায়ারের হুকুম দিলেন। ওগলবি সাহেব নৌকা দেখাইয়া 'মার, মার' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন; সঙ্গে সঙ্গে আপনার পিস্তলও ছুড়িলেন। অমনি গুড়্ গুড়্ করিয়া পণ্টনের বন্দুক গর্জ্জিয়া উঠিল। নৌকার ছাদে যাহারা নিদ্রিত ছিল, তাহাদের মধ্যে ১৮ জনের আর নিদ্রা ভাঙ্গিল না। অপর-মধ্যে কাহারও হাত ভাঙ্গিল, কাহারও পা ভাঙ্গিল, কাহারও বা দেহটা উল্‌টাইয়া জলে পড়িল। জালরাজা হঠাৎ উঠিয়া জলে ঝাঁপ দিলেন। পশ্চাতে বজরা হইতে আর একজন লাফ দিয়া গঙ্গায় পড়িলেন, তাঁহার নাম রাজা নরহরিচন্দ্র—নিবাস হরধাম। উভয়ে গঙ্গাপার হইয়া শান্তিপুরের উত্তরে একস্থানে লুকাইয়া থাকিলেন।"

তারপর, যুদ্ধের পরই আর কি, লুটতরাজ-গ্রেপ্তার! এসব বিষয়ে অবশ্যই কোনই ত্রুটি রহিল না। অধিক কি, ঐ ঘাটে কয়েকখানি তীর্থগামিনী স্ত্রীলোক-বোঝাই নৌকা ছিল; গ্রেপ্তারের সময়, সম্ভবতঃ বিদ্রোহীর সংখ্যা-বৃদ্ধি-জন্য, কি স্ত্রী—কি পুরুষ, তাঁহারাও সকলে গ্রেপ্তার হইলেন। সকলেরই পয়সাকড়ি 'যা'র সঙ্গে যা' কিছু ছিল, লুট-তরাজের সঙ্গে সঙ্গেই সে সব তো পূর্ব্বেই অপহৃত হইয়াছিল; অবশেষে, তাঁহারা ২৯৪ জন স্ত্রী-পুরুষ গ্রেপ্তার হইয়া, হাজতে প্রেরিত হইলেন। পরে, জাল রাজা এবং নরহরিচন্দ্রও শান্তিপুরের নিকট ধরা পড়েন। ইহার পর, আসামীদিগকে বর্দ্ধমানের হাজতে পাঠান হয়; কিন্তু কি জানি কেন, জাল রাজাকে হুগলীর জেলখানায় পাঠান হইয়াছিল।

"২রা মে (১৮৩৭) তারিখের ওগিলবি সাহেব রোবকারীতে সেই সকল হতভাগ্যদের নাম লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। দ্রবময়ী বেওয়া, সূর্য্যঃ গঙ্গামণি, অনু, চন্দ্রমণি, তুলসী, পদী গোয়ালিনী, কন্ন, পদ্ম ঠাকুরাণী, গয়া ঠাকুরাণী, ইত্যাদি। বৃদ্ধারা বর্দ্ধমানে চালান গিয়া নয় মাস প্রায় হাজতে আবদ্ধ ছিল। * * কালনা-গঞ্জের যে সকল বৃদ্ধ দোকানদার জাল রাজাকে চিনিয়াছে বলিয়াছিল, তাহারাও তীর্থ-যাত্রীদের সঙ্গে সঙ্গী হইয়াছিল। তথাকার কতকগুলি স্ত্রীলোকও সেই দশাপন্ন হইয়াছিল। মেজেষ্টার সাহেব তাহাদের সম্বন্ধেও পূর্ব্ব-কথিত রোবকারীতে লিখিয়াছেন যে,—"তারা আর গুণমণি জাল রাজার লোককে বাটীতে অন্নপাক করিতে দিয়াছিল। গৌরমণি তারার বাটীতে থাকে। গোবিন্দ সরকার আর নানু পাইক গুণমণির দোকানে চাকুরী করে। আর, তারাকে যখন গ্রেপ্তার করা হয়, তখন সেখানে কিশোরমণি উপস্থিত ছিল। সুতরাং এই সমস্ত লোকই গ্রেপ্তার যোগ্য।"

এই উপলক্ষে এইরূপ আরও কয়েকটা বড়ই কুকাণ্ডের অভিনয় হয়। পাঠক, এখন তাহাও একটু শুনুন। কালনায় পৌছিয়াই, জাল রাজা দুইজন মোক্তারকে বর্দ্ধমানে পাঠাইয়া দেন; বাসনা—তাঁহারা মাজিষ্ট্রেটের নিকট দরখাস্ত করিয়া একটা হুকুম আনেন যে, তিনি বর্দ্ধমানে যাইলে কোনরূপ চক্রান্তে যেন বিপদগ্রস্ত না হন! কিন্তু, কি সর্ব্বনাশ! মাজিষ্ট্রেট মোক্তারদিগকেও জেলে পুরিলেন! তারপর, ডবলিউ, ডি, সা (W. D. Shaw) নামক একজন ইংরাজ উকীলকেও ঐরূপ বিপদে ফেলা হইয়াছিল। রাজার সঙ্গে যাইবারই তাঁহার কথা ছিল; কিন্তু, সেরূপ

সুবিধা না হওয়ায়, বিদ্রোহের পরদিন যেই তিনি কালনায় পৌছেন অমনি গ্রেপ্তার হইয়া হাজতে প্রেরিত হয়েন! * এমনই সব কাণ্ড তখন হইতে আরম্ভ হইয়াছিল!'

কালনায় জমিয়ৎবস্ত-মকর্দ্দমার, সামুয়েল সাহেবের এজলাসে, হুগলীতে বিচার হয়। এই সামুয়েলই, ইতিপূর্ব্বে বর্দ্ধমানে ছিলেন। তিনি পরাণ বাবুর নিকট প্রতাপচাঁদ-বিষয়ে যাহা শুনিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার কাণ ভারি হইয়া ছিল।

এসকল কথার প্রমাণের জন্যও অবশ্য, অধিক আয়াস পাইতে হয় না। বিচারকের পবিত্র আসনে সমাসীন হইয়া, তুলাদণ্ডে বিচার-দান করিবার জন্য ধর্ম্মের নিকট—অন্ততঃ মহারাণী ভারতেশ্বরীর নিকটও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকিয়াও, আসামী প্রতাপচাঁদের প্রতি সুবিচারের জন্য তিনি কিরূপ চেষ্টা পাইয়াছিলেন, তাহা নিম্নোদ্ধৃত তাঁহার পত্রখানি হইতেই স্পষ্ট বুঝা যায়। তিনি বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুরকে লিখিতেছেন,—

"Hooghly, Sept. 4, 1883.

My dear Dwarkanath,

I was disappointed at your non-arrival, as I think you could speak more decidedly than any of the other witnesses to the the man's non-identity, but it is not of much consequence. I have no objection to make a bargain with you. I will let you off altogether, if you will procure me the names of half a dozen good respectable witnesses from Boranagore who know him as Kristolall. I dare say you could do this through Kali Nath Roy Chowdhery, Mothooranath Mookerji or any of your own servants. Let me know what you say to this. What scoundrel that Buddinath Roy is! If I had known his character, I would rather have gone without evidence altogether than have had his.

Remember I must have the evidence from Boranagore within a week or so. Persuade Mothooranath also to come. His *hoormut* and *izzut* shall be *hureck soorut se bahal.*

Yours truly

E. A. SAMUELLS."

পত্রখানির মর্ম্মানুবাদ এই:—

হুগলী, ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৮৩৮।

প্রিয় দ্বারকানাথ,

তুমি না আসায় আমি বড়ই হতাশ হইয়াছি। আমি বিবেচনা করি, অপর সকলের অপেক্ষা উহার সনাক্ত-সম্বন্ধে তোমার দ্বারাই বিশেষ সাহায্য হইবে। তবে তোমার পরিবর্ত্তে বরাহনগর হইতে যদি জন-ছয়েক সম্ভ্রান্ত সাক্ষী যোগাড় করিয়া দিতে পার—যাহারা উহাকে কৃষ্ণলাল বলিয়া জানে, তাহাতেও আমার আপত্তি নাই। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, যে, কালীনাথ রায় চৌধুরী, মথুরানাথ মুখোপাধ্যায় অথবা তোমার অন্য কোন কর্ম্মচারীর দ্বারা অবশ্যই তুমি এ কার্য্য করিতে পারিবে! যাহা হউক, এক্ষণে তোমার কি মত, আমায় জানাইবে। বদ্দীনাথ রায় কি বিশ্বাসঘাতক! আমি আগে যদি উহাকে ওরূপ প্রকৃতির জানিতাম, তাহা হইলে কখনও উহার সাক্ষী গ্রহণ করিতাম না।

স্মরণ রেখ,—সপ্তাহ-খানেকের মধ্যে যেন বরাহনগর হইতেই সাক্ষীর যোগাড় হয়। মথুরানাথকেও এখানে আসিতে বলিও।

(স্বাক্ষর) তোমারই ই, এ, সামুয়েল।

... ...

এবার আর স্থানাভাব। সুতরাং এবার প্রতাপচাঁদের কথা এই পর্য্যন্তই রহিল। আগামী বারে, বিচারের ফলাফল-সহ, ইহার উপসংহার করা যাইবে।

---

* যাইহোক, সা-সাহেব ইংরাজ বাচ্ছা—তাই তিনিও শেষে অল্পে, ছাড়েন নাই। 'সুপ্রিম কোর্টে' পর্য্যন্ত, তাঁহাকে ঐরূপে অবরোধ করার বিষয় উল্লেখ করিয়া মকর্দ্দমা চালানয় চিফ-জষ্টিসের বিচারে, ওগিলবি সাহেব বড়ই অপমানিত হইয়াছিলেন; এবং তাঁহার ২০০০্ হাজার টাকা জরিমানা হইয়াছিল।

অদৃষ্ট।

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়।

দুঃখের পর দুঃখ।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়, বৈবাহিকের বাটী হইতে বহির্গত হইয়া, জয়গোপালের জমীদারী-মহল পর্য্যটন-পূর্ব্বক, দুই প্রহর অন্তে 'নিজবাটী আসিয়া পদার্পণ করিলেন। আসিয়াই দেখিলেন, দুই জন চাপরাসধারী লোক তাঁহার দাওয়ায় উপবিষ্ট। ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে দেখিবা-মাত্র তাঁহাকে বাটীর কর্ত্তা জানিতে পারিয়া, জিজ্ঞাসা করিল,—"মহাশয়, আপনার নাম পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য?" ভট্টাচার্য্য মহাশয়, চাপরাস দেখিয়া সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেন বল দেখি, তোমরা কোথা হতে আস্‌চ?" তাহারা কহিল,—"আমরা আদালতের পিওন; আপনার নামে একখানি সমন আছে।" এই বলিয়া সমন খানি বাহির করিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহি চাহিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয়, সমন-পাঠে জয়গোপালের মকর্দ্দমায় আসামী-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন জানিতে পারিয়া, অবাক হইলেন, এবং সহি দিতে অস্বীকার করিলেন। তখন পেয়াদাদ্বয় সমনখানি গৃহদ্বারে লট্‌কাইয়া দিয়া প্রস্থান করিল।

অতঃপর ভট্টাচার্য্য মহাশয়, কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া, নিকটস্থ দুই-চারিজন ভদ্রলোককে ডাকাইয়া পরামর্শ লইলেন। তাঁহারা সকলেই এ মকর্দ্দমায় হাজির হইতে কহিলেন; এবং বিষয়-আশয় বিক্রয় করিয়া, যে গতিকে হয় ভাল ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করিয়া, মকর্দ্দমা চালাইতে পরামর্শ দিলেন। সকলে উঠিয়া গেলে, ভট্টাচার্য্য মহাশয় স্নানাহার সমাপন-পূর্ব্বক নিরূপিত শয্যায় শয়ন করিলেন। পরে গৃহিণীও আহারান্তে সেই গৃহে উপস্থিত হইলে, জয়দুর্গার গহনার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন গৃহিণী, সিন্দুকে গহনা নাই এবং গহনাগুলি যে জয়দুর্গা-কর্ত্তৃক অপহৃত হইয়া রান্না-ঘরের এক কোণে পুতিয়া রাখা হইয়াছে এবং তিনি যে তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন, সেই সমস্ত বিবৃত করিলেন। অনন্তর গৃহিণী যথা-নিয়মে নিদ্রিত হইলে, জয়দুর্গাও, গহনাগুলি রান্নাঘর হইতে উঠাইয়া যে গৃহে জয়দুর্গা ও তাঁহার পুত্র শুইয়া থাকিতেন, সেই গৃহের এক কোণে পুঁতিয়া রাখিলেন; এবং অবশেষে গোবর-জল দিয়া স্থানটীকে এরূপ পরিষ্কৃত করিলেন যে, এবার তাঁহার মাতা যেন জানিতে না পারেন যে, এ স্থান খোঁড়া হইয়াছে। গোবর-জল সমাপনান্তে জয়দুর্গা যখন বাহিরে আসিয়া হস্ত-ধৌত করিবেন, দেখিলেন,—পাড়ার একজন বৃদ্ধা ফুগীর কন্যা "কি গো ঠাকুরাণীরে সব, ঘুমিয়ে নাকি?" এই বলিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিবা-মাত্র, জয়দুর্গার প্রথমতঃ হৃদ্‌কম্প হইল, কিন্তু বুদ্ধিমতী জয়দুর্গা, তাহা চাপা দিয়া, কিয়ৎক্ষণ তাহার সহিত সদালাপ করিয়া, তাহাকে বিদায় করিলেন। অনন্তর যথা-নিয়মে পুত্র-ক্রোড়ে লইয়া একটু ঘুমাইলেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় গাত্রোত্থান করিয়া, বিরস-বদনে, দাওয়ায় বসিয়া তামাক টানিতেছেন ও কি করিবেন, তাহা ভাবিতেছেন। গৃহিণীও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দ্রুতপদে রান্না ঘরে গিয়া দেখিলেন, গহনাগুলি সেখান হইতে উঠান হইয়াছে। অনন্তর তিনি ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে আসিয়া এই সমাচার দিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় শ্রবণ করিয়া, রাগে ও দুঃখে ক্ষিপ্তের ন্যায় হইয়া বিষয়গুলি বিক্রয়ের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

দুই-একদিনের মধ্যেই ভট্টাচার্য্য মহাশয় খরিদ্দার স্থির করিয়া, রীতিমত কাগজে লেখা-পড়া করিয়া, স্বাক্ষরের নিমিত্ত "বৈবাহিকের নিকট গমন করিলেন। গিয়া দেখিলেন, বৈবাহিক শয্যাগত; এবং এ যাত্রা যে উদ্ধার পাইবেন, তাহার আর আশা নাই। অনেক দুঃখ-শোকের পর, অতি কষ্টে, বৈবাহিকের স্বাক্ষর লইলেন; এবং উপস্থিত বিপদের মর্ম্ম অবগত করাইয়া, তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করত, হাজতে জয়গোপালের নিকট উপস্থিত হইলেন। কিন্তু জয়গোপালকে স্বাক্ষর করিতে কহিবা-মাত্রই, জয়গোপাল বুঝিতে পরিলেন যে, জয়দুর্গা তাঁহার গহনা বিক্রয় করিতে দেয় নাই; সুতরাং জয়গোপাল একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বিনা-বাক্য-ব্যয়ে স্বাক্ষর করিয়া দিলেন। অনন্তর ভট্টাচার্য্য মহাশয়, নিজেও যে এই মকর্দ্দমায় আসামী-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন, তাহাও জয়গোপালকে জ্ঞাপন করাইয়া ও নানা প্রকার আশ্বাস দিয়া, তথা হইতে বাটী আসিলেন পরে, যথা-সময়ে দলিল রেজিষ্টরী করিয়া, খরিদ্দারের নিকট হইতে টাকা বুঝিয়া লইয়া, মকর্দ্দমার যথাবিহিত তদ্বির করিতে আরম্ভ করিলেন।

এদিকে জয়গোপালের পিতা, দলিলে স্বাক্ষর করিয়াই, 'সমস্ত বিষয়-আশয় গেল ও জয়-গোপালও গেল'—এই ভাবনায়, এতাদৃশ হীনবল হইয়া পড়িলেন যে, সেই দিবস রাত্রি দুই প্রহরের সময় তিনি মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়, এ খবর জানিয়াও, জয়-গোপালকে কিন্তু তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে দেন নাই।

অভাগিনীর আত্ম কথা।

(সত্য-ঘটনা অবলম্বনে)

প্রায় ১৫ বৎসর হইল, একদা, রাত্রে আহারান্তে, বসন্তপুরের কাছারী-বাটীর এক কামরায় আমি ও তথাকার পাচক-ব্রাহ্মণ হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় শয়ন করিয়া আছি। হরিদাসের বয়স ৩০।৩২ বৎসর, দেখিতে মন্দ নয়। বাসার আর আর সকলেও স্ব স্ব স্থানে নিদ্রা যাইতেছেন। হরিদাস, এমন সময়ে, মৃদুস্বরে আমার কাণের কাছে আসিয়া বলিল,—"মহাশয়, চলুন, রাত্রিও অধিক হয় নাই, একটু বেড়াইয়া আসি; শুনিয়াছি, আজ ৪।৫ দিন হইল, কলিকাতা হইতে এখানে একটী সুন্দরী রমণী আসিয়াছে—সে লেখা-পড়া জানে ও ভাল গান করিতেও নাকি পারে! চলুন, দেখিয়া আসি!"

আমিও একটু গান-বাজানা জানি; সুতরাং আমোদের খতিরে তাহার কথায় সায় দিলাম, ও ধীরে ধীরে দুই জনেই ঘর হইতে বাহির হইলাম। অনতিদূরেই বাজার ও বাজারের পার্শ্বেই কয়েকঘর বারাঙ্গনার বাস। কোন কোন ঘর হইতে তখনও আমোদের ফোয়ারা ছুটিতেছিল। কিন্তু, সে দিকে লক্ষ্য না করিয়া, আমরা নির্দ্দিষ্ট বাটীতেই যাইলাম। সামান্য দরমার প্রাচীর দিয়া বাটীখানা নূতন-ঘেরা। আমরা বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম,—একটী ঘরে টিপ্ টিপ্ করিয়া একটী প্রদীপ জ্বলিতেছে; আর একটী যুবতী খাটে শুইয়া কি পাঠ করিতেছে। নিকটে যাইয়া দেখিলাম,—বইখানা 'শকুন্তলা'। বলা বাহুল্য, ঠাকুর এই স্ত্রীলোকটীর কথাই বলিয়াছিল। আমাদিগকে দেখিয়া, শশব্যস্তে উঠিয়া, রমণী যথোচিত অভ্যর্থনা করিল। আমরা পার্শ্বের তক্তাপোষে উপবিষ্ট হইলাম। রমণীর প্রফুল্ল মুখভাব দেখিয়া ভাবিলাম,—হরিদাসের সহিত একটু পূর্ব্ব-পরিচয় আছে, আর হরিদাস তাহা আমার নিকট গোপন করিয়াছে। কিন্তু, কি জানি কেন, হরিদাস একদৃষ্টে যুবতীকে দেখিতে লাগিল! যুবতী কহিল,—"চিনিতে পারেন কি?" হরিদাস অধোবদনে বসিয়া রহিল; মুখে কথা নাই—যেন সকল আমোদ, সকল আকাঙ্ক্ষা একবার দর্শনেই তৃপ্ত হইয়াছে! রমণী দুই-একবার শারীরিক ও পারিবারিক কুশল জিজ্ঞাসা করিল; কিন্তু, ব্রাহ্মণকে নিরুত্তর দেখিয়া, তৎক্ষণাৎ উঠিল, ও একটা বাক্স হইতে কতকগুলি টাকা বাহির করিয়া একখানা রৌপ্য-রেকাবীতে হরিদাসের সম্মুখে রাখিল;

আর সঙ্গে সঙ্গে বলিল,—"নাথ, এখনও কি আমার সহিত কথা কহিতে আপত্তি আছে? এই গ্রহণ করুন, আমি আপনার টাকার কথা ভুলি নাই।" কিন্তু, কি আশ্চর্য্য, হরিদাস আর মুখ তুলিতে পারিল না কেন?—আর বসিতেও যে পারিল না! সে, এক লম্ফ দিয়া, অমনি ঘরের বাহিরে আসিল; আর মুহূর্ত্তের মধ্যেই অন্তর্ধান হইল। আমি এতক্ষণ প্রহেলিকা শুনিতেছিলাম; কিছুই বুঝি নাই। কিন্তু, অবশেষে, আমিও উঠিবার উদ্যোগ করিলে, স্ত্রীলোকটী কহিল,—'মহাশয়! আপনিও কি কুলীন ব্রাহ্মণ?" আমি বলিলাম,—"না, আমরা কায়স্থ।" তাহাতে রমণী কহিল,—"তবে আপনার বসিতে বাধা কি?"

আমি।—বাধা আর কিছুই নাই। তবে সঙ্গী চলিয়া গেলেন, আর তোমাদের আলাপ-ব্যবহারের রহস্যও কিছু বুঝিতে পারিলাম না। ও-সকল কি কথাবার্ত্তা বা ভাবভঙ্গী, যদি বলিতে বাধা না থাকে, শুনিতে ইচ্ছা করি।

রমণী।—বলিতেছি; তবে একটু বসুন।

আমি সেই ক্ষীণ দীপালোকে দেখিলাম,—রমণীর চক্ষু দিয়া টস্ টস্ করিয়া জল পড়িতেছে। তাহাতে আমার কৌতূহল সমধিক বৃদ্ধি পাইল। আমি পুনরায় বসিলাম। রমণী বলিতে লাগিল,—"মহাশয়, পোড়া কপালের কথা আর কি শুনিবেন!—ইনিই আমার স্বামী!" যুবতী আর বলিতে পারিল না—যেন তাহার কণ্ঠাবরোধ হইতে লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে শেষে বলিল,—"হতভাগিনীর পিতা দরিদ্র কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন। আমার তিন বৎসর যখন বয়স, তখন তাঁহার মৃত্যু হয়! সংসারে আর কেহ না থাকায়, আমার মাতা আমাকে লইয়া অকূল পাথারে পড়িলেন। হায়, তখন এ হতভাগিনীর কেন মরণ হইল না? সামান্য ২।১খানা অলঙ্কার যাহা ছিল, তাহা বিক্রয় করিয়া ও গ্রামের দুই একটী সদাশয় লোকের আনুকূল্যে, মাতা কোনমতে দিন কাটাইতে লাগিলেন। আমি, পাড়ার আর আর সমবয়স্কাদের সঙ্গে, গ্রামের বালিকা বিদ্যালয়ে লেখা-পড়া শিখিতে লাগিলাম। ক্রমে ১২।১৩ বৎসর বয়স হইল। বিবাহের বয়স হইল দেখিয়া, মাতার আহার-নিদ্রা গেল! কি উপায়ে আমাকে পাত্রস্থা করিবেন, এই চিন্তাই জপমালা হইল! আমার মাতুল * * * গ্রামের গোমস্তা; তাঁহার সাহায্যে ও পিতার কয়েক বিঘা ব্রহ্মোত্তর যাহা ছিল বিক্রয় করিয়া, ১৪ বৎসর বয়স-কালে ইহাঁরই সহিত শুভক্ষণে (?) আমার বিবাহ দিলেন! বিবাহের পর, তিন বৎসর চলিয়া গেল। মাতা সংবাদের পর সংবাদ দিয়া, একবার ইহাঁকে আনিলেন। কিন্তু, দুঃখের কথা কি বলিব, রাত্রে আমার নিকট স্বামী টাকা চাহিলেন; বলিলেন,—৫০৲ টাকা না দিলে আলাপ করিবেন না, জন্মের মত আমায় ত্যাগ করিয়া যাইবেন। মহাশয়, বহুদিন পরে স্বামীর সহিত এই এক আধ দিন মিলন-জন্য আমাদিগের কুলীন কন্যাদের কিছু কিছু সংস্থান করিয়া রাখিতে হয়, ও পরে তাহা স্বামীর দর্শনী-স্বরূপ দিতে হয়। কিন্তু, দুঃখের বিষয়, আমি সেরূপ উপায় করিতে সমর্থ হই নাই; আর, এই অপরাধেই স্বামী আমাকে গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক! আমি কাঁদিয়া কাঁদিয়া কহিলাম,—'নাথ, দেখিতেছেন ত আমরা খেতে পাই না!—মা কত কষ্টে সংসার চালাইতেছেন! আর স্ত্রীলোকে, স্বামীতে না দিলে, কোথায় পাইবে? আমার কে আছে, কে দিবে?' কিন্তু ইনি তখন উত্তর করিলেন,—কোথায় পাবি, আমি তা' জানি-না! এখন দিবি কি-না, বল!'

আমি পায়ে ধরিয়া বিস্তর কাঁদিলাম? কিন্তু কিছুতেই ইহাঁর পাষাণ মন গলিল না। ইনি লাথি মারিয়া আমায় দূরে ফেলিয়া দিলেন; এবং কয়েদীর ন্যায় রাত্রিটি কাটাইয়া প্রাতে প্রস্থান করিলেন। যাইবার সময়, মাতাকে পত্রদ্বারা

জানাইলেন না। কাজেই, আমি কিছু বা বলিয়াছি মনে করিয়া, মাতা আমাকে প্রথমতঃ তিরস্কার করিতে লাগিলেন! কিন্তু পরিশেষে, কাঁদিতে কাঁদিতে সকল কথা তাঁহাকে খুলিয়া বলিলে, তিনিও কাঁদিতে লাগিলেন। বলিলেন,—'বাছা, কি কর্‌ব, কুলীনের ঘরে জন্মেছিস্, সুখ পাবি কোথায়?" সঙ্গে সঙ্গে, কি কুক্ষণে, আমিও তখন মনে মনে ভাবিলাম,—'এইজন্যই কি কুলীনের এত আদর? কুলীন-কন্যাগণ চিরজীবন এইরূপে কাঁদিবে বলিয়াই কি তাহাদের পিতা এইরূপ কুলীন-জামাতার জন্য আকুল হন? ইহাই কি কুল-লক্ষণ? হা বিধাতঃ! তুমি এ পোড়া প্রথা কবে ডুবাইবে? নিরাশ্রয়া অবলাগণের এ কুল-লাঞ্ছনা কবে ঘুচাইবে?'

ইহার পরও প্রায় ১ বৎসর কাটিয়া গেল; কিন্তু স্বামীর আর দেখা নাই! মা, অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া, কতবারই সংবাদ দিলেন, কিন্তু এক দিনের তরেও স্বামী আর দেখা দিলেন না! এই সময় হইতে, সংসারের প্রতি আমার কেমনই এক ধিক্কার জন্মিতে লাগিল; মাতার দুঃখও আর সহ্য করিতে কষ্ট হইতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে মনে হইল,—'এমন কু-সন্তান হইলাম যে, মা আমার জন্য সুখী হওয়া দূরে থাক, অশেষ কষ্টভোগ করিতে লাগিলেন! আমি তাঁহার কি করিলাম! বরং আমি না থাকিলে, তাঁহার এত কষ্ট কখনও হইত না—এত চিন্তাও থাকিত না।'

এই সময়, গঙ্গাস্নানের একটী যোগ উপস্থিত হইল। পাড়ার আর আর সমবয়স্কাদের সাহায্যে আমিও সাজিলাম। হায়, কুক্ষণে তাহাদের সহিত বাসীর বাহির হইলাম! ৺ কালীঘাটে আমাদের বাসা হইল। ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম,—স্বামী আমার জনৈক ভদ্রলোকের আশ্রয়ে রন্ধনের কার্য্যে নিযুক্ত; সে বাবু বনকরের মধ্যে কাজ করেন, এবং মধ্যে মধ্যে সদরে কার্য্যোপলক্ষে আসিলে, এই কালীঘাটেই বাসা করেন। আমি তথায় চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম,—যদি ভাগ্যক্রমে দেখা হয়, আর একবার পায়ে ধরিয়া কাঁদিব ও সেই বাবুর রন্ধন-কার্য্য আমিই করিয়া স্বামীর সাহায্য করিব! কিন্তু হায়! সে আশা তো কই পূরিল না!—স্বামীর তো কই আর তখন দেখা পেলেম না! অধিকন্তু, কেন এ সময় আমার মন এত খারাপ হইয়াছিল?—কেন আমার বিবেক-বুদ্ধি এমনতর লোপ পাইয়াছিল?—কেন আমি এ ভীষণ পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইয়াছিলাম? মাতার কষ্টের কথা, আর স্বামীর দুর্ব্ব্যবহারের কথা—এই দুইটী কথা মনে করিয়াই, আমি তখন অধীর হইলাম; সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাস্নানে নিষ্পাপ হইতে আসিয়া, অগাধ নরকে পড়িলাম! আর আমার বাড়ী ফেরা হইল না! * * একজন ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ—তাঁহারই আশ্রয়ে রন্ধনের কার্য্যে থাকিয়া—ক্রমে তাঁহারই করে আত্মবিক্রয় করিলাম! কিন্তু হায়, তখন বুঝিলাম না যে, আমি আমার কি সর্ব্বনাশই করিয়া ফেলিলাম—হায়, এ পাপে কোন্ নরকে আমার ডুবিতে হইবে?

ইহার পর, মাকে মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু খরচ পাঠাইয়া দিতাম। কিছুদিন পরে, গঙ্গাস্নানে যাইয়া, তিনি একবার আমার সন্ধান লয়েন; এবং আমাকে পাইয়া, তথায় থাকিবার ইচ্ছা জানান। প্রথমে তিনি অবশ্য, আমার চরিত্রবিষয়ে সন্দিহান হন নাই; তাই, আমিও তাঁহাকে নিকটে রাখিয়া, সেবা করিয়া, মনের কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিতেছিলাম। কিন্তু, সম্প্রতি, হয়তো আমায় দুশ্চরিত্রা বুঝিতে পারিয়াই, গত আষাঢ় মাসে তিনি আমাকে ফেলিয়া স্বর্গধামে চলিয়া গিয়াছেন! সুতরাং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আমার সে শান্তিও নষ্ট হইয়াছে।

কিন্তু, এই সময় হইতেই, আমার মনে এই এক ভাবের উদয় হইয়াছে। আমি যে ঘোর পাপে ডুবিয়াছি, তাহার বিষয় এই সময় হইতেই সর্ব্বদাই আমার মনে জাগিতেছে। এই সময়

হইতেই আমি বুঝিয়াছি যে, স্বামীর ভালবাসায় বঞ্চিতা হইয়া আমি যার-পর-নাই ঘৃণিত কার্য্য করিয়াছি! আর সঙ্গে সঙ্গে প্রতিজ্ঞাও করিয়াছি যে, একবার তাঁহার নিকট হইতে জন্মের মত বিদায় গ্রহণ করিয়া এপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব। কিন্তু, তাঁহার কথা মনে হইলেই, সেই টাকার কথা সেই অপমানের কথা মনে পড়ে। সে কথা আমি কিছুতেই বিস্মিত হই নাই। শেষে তাই, মনে করিয়াছিলাম—'যাঁহারা টাকার বশ, তাঁহারা হৃদয়শূন্য, টাকাই তাঁহাদের সব, আমিও সেই টাকা দিয়াই তাঁহাকে একদিনের জন্যও বশ করিব ও এই দুঃখের কাহিনী বলিয়া বিশ্বেশ্বরের চিন্তায় দেহপাত দ্বারা পাপের প্রতিবিধান করিব।'

কয়েক মাস সন্ধানের পর, তাই জানিয়াছিলাম, তিনি তাঁহার আশ্রয়-দাতার সহিত এই বসন্তপুরে আসিয়াছেন। আমিও, আমার অধর্ম্মার্জ্জিত অলঙ্কার, অর্থ ও দ্রব্যাদি লইয়া এখানে কয়েক দিন আসিয়াছি। অদ্য স্বামীর দেখা পাইলাম বটে, কিন্তু কিছুই বলিতে তো পারিলাম না!" অভাগিনীর মনের দুঃখ মনেই যে রহিয়া গেল!"

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই, রমণী আবার কাঁদিতে লাগিল। আমি তাহাকে কি বলিয়া বুঝাইব, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলাম না। আস্তে আস্তে উঠিয়া, বাসার দিকে চলিলাম। মনে করিলাম,—ঠাকুরকে বিলক্ষণ তিরস্কার করিব। কিন্তু,বাসায় যাইয়া দেখি, ঠাকুর তখনও আইসে নাই। পরদিন শুনিলাম,'সে কোথায় চলিয়া গিয়াছে। অপরাহ্নে, রমণীও, তাহার দ্রব্যাদি লইয়া, নৌকা-যোগে কোথায় চলিয়া গিয়াছে, শুনিতে পাইলাম।

রমণীর মুখে এই সমস্ত শুনিয়া, আমি বাস্তবিক মর্ম্মাহত হইয়াছিলাম। ভাবিলাম,—সমাজের মধ্যে এমন কত চিত্রই আছে, কিন্তু কেহই সেদিকে একবারও দৃষ্টি করে না! কত ব্রাহ্মণ-তনয়ের বিবাহ হইতেছে না, কেহ কেহ বা সর্ব্বস্বান্ত হইতেছেন, আবার কত কুলীন-ললনা এরূপে জীবন-লীলা সাঙ্গ করিতেছে। *

অমৃত-রেণু।

পরমহংস দেবের উক্তি।

—কলিকালে হরি-নামই একমাত্র সাধন।

—ঈশ্বরের ধ্যান করিবে—কোণে, বনে, আর মনে।

—কাচে যেমন পারদ দিলেই মুখ দেখা যায়, তদ্রূপ, হৃদয়ে প্রেম থাকিলেই বিশ্বপিতা হরিকে দেখা যায়।

—যেমন শুষ্কপত্র প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকে কিছুতেই ঢাকা দিতে পারে না; তদ্রূপ, তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে, সংসার আর কিছুতেই ঈশ্বর হইতে মানুষকে দূরে ফেলিতে পারে না।

—সুর, লয়, সময়, সমাজ,সকল ভাল হইলেও, যেমন তাল না থাকিলে সঙ্গীতের সবই বৃথা; সাধনায়ও তদ্রূপ,আচার-অনুষ্ঠান সব থাকিলেও, মনের একাগ্রতা না থাকিলে সকলই বৃথা।

—চিনি হওয়ার চেয়ে চিনি খাওয়া ভাল। আমা হইতে ঈশ্বর অভিন্ন হইলেও, প্রেমামৃত সম্ভোগের জন্য, সম্ভোগ-শ্রেষ্ঠ ঈশ্বরকে সখা বা আত্মভাবে সম্ভোগ করিয়া থাকি।

—মাঠের জল, কেহ ব্যবহার না করিলেও, সূর্য্যকিরণে আপনিই শুখাইয়া যায়। মানুষও সেইরূপ, ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া পড়িয়া থাকিলে, তাঁহার দয়া-গুণে, পবিত্র হইয়া যায়।

---

* ঠিক এরূপই একটি ঘটনার কথা অনেক দিন হইতেই গল্পাকারে চলিয়া আসিতেছিল। কিন্তু সম্প্রতি যশোহর—বসুন্দিয়া-স্কুলের হেড মাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু বিধুভূষণ ঘোষ মহাশয়, একরূপ শপথ করিয়াই,লিখিয়া পাঠাইয়াছেন যে, এটি তাঁহার চাক্ষুস ঘটনা। যাহাই হউক,গল্পটিতে স্বামী-স্ত্রী উভয়শ্রেণীরই শিক্ষণীয় অনেক উপদেশ-কথাই আছে; এরূপ গল্পে দুই শ্রেণীরই চৈতন্যোদয় হয়, এইজন্যই ইহা প্রকটিত হইল।

—মেঘেতে যেমন সূর্য্যকে আবরণ করিয়া রাখে, মায়াতে সেইরূপ ঈশ্বরকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছে। মেঘ চলিয়া গেলে যেমন সূর্য্যকে দেখা যায়, মায়া দূর হইলে সেইরূপ ঈশ্বরকে দেখা যায়।

—ময়লা আয়নাতে সূর্য্যালোক প্রতিফলিত হয় না; কিন্তু স্বচ্ছতে হয়। মায়ামুগ্ধ ময়লা অপবিত্র হৃদয় ঈশ্বরের আভা দেখিতে পায় না, কিন্তু বিশুদ্ধ আত্মা তাহা দেখিতে পায়। অতএব, বিশুদ্ধ হইবার চেষ্টা কর।

—একদা এক অবধৌত পথিমধ্যে যাইতেছেন; এমন সময় দেখিলেন, অনতিদূরেই এক-জন ছিপ ফেলিয়া মৎস্য ধরিতেছে। দেখিয়াই, অবধৌত হাসিয়া বলিলেন,—"এই-ই ঠিক সংসারের চিত্র। এরূপেই দিন দিন অযুত অযুত নরনারীর মৃত্যু হইতেছে; অথচ সাংসারিক আশক্তি কাহারও কমিতেছে না—কেহ বা মৃত্যুর মুখ [হইতে] ফিরিয়াও আবার সংসারে পুনঃপ্রবিষ্ট হইতেছে।"

—দেখিয়াছ, মধুভাণ্ডের চতুষ্পার্শ হইতে মাছি পিঁপড়া প্রভৃতিতে মধুপান করিয়া থাকে; কিন্তু তন্মধ্যের যে ধার হইতে পান করে, সেই নিরাপদ,—আর যে পানাসক্ত হইয়া ভিতরে নামে, সে আর উঠিতে পারে না—মধুতে জড়াইয়া ক্রমে আত্মহারা হয়। সেইরূপ, মনুষ্য, এসংসারে তোমারও তাই। সাবধান, বিষয়ে আশক্ত বা লিপ্ত হইলেই মারা যাইবে! যদি এখনও পরমপিতা পরমেশ্বরকে পাইতে চাও, তবে নির্লিপ্তভাবে বিষয়োপভোগ কর।

—বৃক্ষের প্রথম অবস্থাতেই বেড়া দিয়া তাহাকে রক্ষা করিতে হয়; নতুবা ছাগ, গরু প্রভৃতি আসিয়া তাহা নষ্ট করিয়া ফেলে। কিন্তু বৃক্ষ একবার বড় হইলে আর সে ভয় থাকে না; শত শত গরু-বাছুর আসিয়া তখন তাহার তলায় আশ্রয়-লাভ ও তাহার পত্রে উদরপূর্ত্তি করে। সেইরূপ, সাধনার প্রথম অবস্থাতেই আপনাকে সংসার ও বিষয় প্রভৃতি হইতে রক্ষা করিতে হইবে, নতুবা সমুদয় ধর্ম্মভাব একেবারে বিনাশ পাইবে; কিন্তু একবার 'সিদ্ধ' হইলে, আর কোনই ভয় থাকিবে না—শত-সহস্র সংসারও আর তোমাকে বিনাশ করিতে পারিবে না।

—মনের একাগ্রতা না হইলে ধর্ম্মসাধন বৃথা। একদা শ্রীচৈতন্যদেব হরি-সঙ্কীর্ত্তন করিতে বহির্গত হইয়াছেন; সঙ্গে তাঁহার শিষ্য-সেবক ভগবদ্ভক্ত অনেকেই। সকলেই হরি-ধ্বনিতে মাতোয়ারা। এমন সময়, শ্রীচৈতন্যদেব দেখিলেন.—একটী ডোমের স্ত্রী একাগ্রমনে একখানি চেটাই বুনিতেছে; সে আর কোন দিকেই চাহিতেছে না—কেবল কতক্ষণে তাহার চেটাই বোনা শেষ হইবে, আর সে বাজার হইতে ফিরিয়া আসিলে তবে তাহার ছেলে-মেয়েরা খাইতে পাইবে, এই চিন্তাতেই মগ্ন আছে। এই দেখিয়া, এত ভগবদ্ভক্ত সাধু-সন্ন্যাসী সঙ্গে থাকিতেও, চৈতন্যদেব সেই ডোম-পত্নীর চরণ-তলে পতিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—"এ জগতে ইনিই আমার গুরু। আমি যখন হরি-নামানন্দ সম্ভোগ করিব, তখন, আমারও যেন এইরূপই একাগ্রতা আসে।"

—হাড়গিলা, শকুনি প্রভৃতি পক্ষীরা অতি ঊর্দ্ধেই উড়িয়া বেড়ায় বটে; কিন্তু তাহাদের মন স্বতঃই শ্মশান ভাগাড় প্রভৃতির প্রতি আকৃষ্ট হয়। সেইরূপ, ঈশ্বর-বিহীন জ্ঞানীরাও অতি উচ্চ উচ্চ শাস্ত্র-সকল অধ্যয়ন করেন সত্য, কিন্তু তাঁহাদের মন সর্ব্বদাই অসার পৃথিবীর সেই ধনমানাদির প্রতিই আকৃষ্ট হইয়া থাকে।

—জল ও দুগ্ধ একত্র রাখিলে, উভয়ে মিশ্রিত হইয়া যায়; দুগ্ধের আর বিভিন্নতা থাকে না। সংসারে সকলপ্রকার লোকের সহিত মিলিলে, ধর্ম্মপিপাসু সাধকও তেমনি, আপনার সমস্ত ধর্ম্মভাব হারাইয়া ফেলে—তাহার পূর্ব্বের বিশ্বাস-উৎসাহ কোথায় চলিয়া যায়, সে কিছুই জানিতে পারে না।

—জল ও দুগ্ধ মিশ্রিত হইয়া যায় বটে; কিন্তু দুগ্ধকে মাখনে পরিণত করিতে পারিলে আর জলের সহিত মিশ্রিত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। সেইরূপ সচ্চিদানন্দ হরিকে একবার হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে, শত সহস্র বদ্ধ-জীবের মধ্যে বাস করিলেও, আর তোমার বিশ্বাস ক্ষীণ হইবে না।

—কুকুরের গায়ে এক প্রকার মাছি থাকে; কুকুর জলে নামিলে তারা একটু দূরে যায়, আবার কুকুর জল হইতে উঠিলেই আসিয়া গায়ে বসে। সংসারী মানবেরও তাই। মানুষ যখন সাধু-সহবাসে বা হরি-কথায় মগ্ন থাকে, তখন তাহার পাপ-প্রবৃত্তিগুলিও একটু দূরে থাকে; কিন্তু আবার সংসারে আসিলেই সেই যে-কে-সে!

—যেমন স্ফটিকের দ্বারায় একই সূর্য্যের কতই প্রকার জ্যোতি দেখিতে পাওয়া যায়; তদ্রূপ, একমাত্র নির্ম্মল বিশ্বাস-রূপ স্ফটিকের দ্বারায় ঈশ্বরেরও অনন্ত অনন্ত প্রকার (সাকার নিরাকার প্রভৃতি) সৌন্দর্য্য-মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। আর, হৃদয়ে এ জ্ঞান জন্মিলেই, ভেদবাদীরও ভেদজ্ঞান তিরোহিত হয়।

—যেমন নদনদী সকল শত শত মুখে সমুদ্রে গিয়া মিলিত হয়; সেইরূপ, ধর্ম্ম-রূপ যত প্রকার নদনদী আছে, একমাত্র সচ্চিদানন্দ-সাগরেই তাহা মিলিত হয়। তখন, সমস্ত নরনারীর হৃদয়ের ভাব একমাত্র ঈশ্বরই গ্রহণ করেন।

—দুই ব্যক্তি পরস্পর ঘোর তর্ক আরম্ভ করিয়াছে। একজন বলিতেছে,—"অমুক উদ্যানে সুন্দর লালবর্ণের, একটী গিরগিটি আছে।" অপর একজন বলিতেছে,—"তোমার ভুল হইয়াছে; গিরগিটি লাল-বর্ণের নয়, নীল-বর্ণ-বিশিষ্ট।" তর্কের মীমাংসা না হওয়ায়, অবশেষে উভয়ে উদ্যান-রক্ষকের নিকট সমুপস্থিত হওতঃ প্রথম ব্যক্তি বলিল,—"কেমন হে উদ্যান-রক্ষক, তোমার এই উদ্যানে একটী লালবর্ণের গিরগিটি আছে?" উদ্যান-রক্ষক বলিল,—"আজ্ঞে হাঁ।" তখন, দ্বিতীয় ব্যক্তিও ঐরূপ জিজ্ঞাসিল,—"কি বলিলে! সেটী তো লাল নয়—নীল যে!" উদ্যান-রক্ষক তাহাতেও বলিল,—"আজ্ঞে, হাঁ।" বলা বাহুল্য, উদ্যান-রক্ষক জানিত যে, সে গিরগিটি বহুরূপী; তাই, যে যে বর্ণ বলিল, সে তাহাতেই 'হাঁ' বলিল। এইরূপ, সচ্চিদানন্দ হরিরও বহুরূপ। তিনি এক, তিনি অনন্ত, তিনি বিশ্বরূপী ভগবান! যে তাঁহাকে দেখে নাই, যে তাঁহার মর্ম্ম বুঝে নাই, সেই সাকার-নিরাকার লইয়া তর্ক করে। কিন্তু প্রকৃত ভক্ত বলেন,—"হাঁ, তিনি সাকার-নিরাকার সবই।"

—যাঁহারা ঈশ্বর-লাভের জন্য সাধন-ভজন করিতে চাহেন, তাঁহারা কোন প্রকারেই কামিনী-কাঞ্চনের সংস্রব রাখিবেন না। তাহা হইলে কস্মিন্ কালেও, কাহারও সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্তির উপায় নাই। যেমন,—

(১) খৈ ভাজিবার সময় যে খৈটি খোলার উপর হইতে ঠিক্‌রাইয়া বাহিরে পড়িয়া যায়, তাহার কোন স্থানেই দাগ লাগে না; কিন্তু খোলায় থাকিলে, তাপযুক্ত বালির সংস্রবে কোন স্থানে কৃষ্ণবর্ণ দাগ ধরিতে পারে।

(২) আবার তেঁতুল দেখিলে, অম্লরোগগ্রস্ত ব্যক্তিরও উহা আস্বাদন করিবার জন্য লোভ জন্মিয়া থাকে—যদিও সে জানে যে অম্ল ভক্ষণ করিলে তাহার পীড়ার বৃদ্ধিই হইবে। অর্থাৎ পদার্থগত ধর্ম্মের এমনই প্রবল প্রলোভন যে, কিছুতেই মনের আবেগ সম্বরণ করিতে পারা যায় না।

(৩) কাজল্‌কী ঘর্‌মে, যেত্তা সেয়ান্ হোয়ে, থোড়া বুঁদ্ লাগে পর্ লাগে। যুবতী কি সাত্‌মে সেত্তা সেয়ান্ হোয়ে, থোড়া কাম জাগে পর্ জাগে। অর্থাৎ, কাজলের ঘরে যতই সাবধান থাক না কেন, গায়ে কালীর দাগ লাগিবেই লাগিবে।

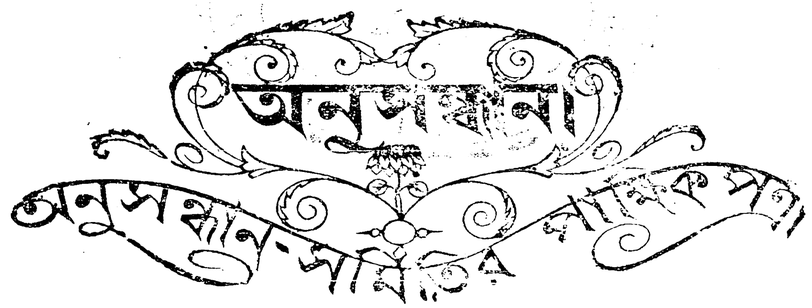

৫ম খণ্ড } ৩১এ বৈশাখ, ১২৯৯। { ১৯শ সংখ্যা।

বিবেক-বাণী।

(রামপ্রসাদী সুরে)।

মন! করি সতর্ক তোরে,—
(তোরে) সংসার-অরণ্য ঘোরে।
বাহিরে বাহিরে ফির,
যেওনারে ওর্ ভিতরে।

(তাহে) পাপ-রূপ, অপরূপ,
হিংস্রগণ সদা চরে।
তারা মহাবল, অতি খল,
বিদলিতে কেউ না পারে।
(একবার) যাকে দু'নয়নে হেরে,
সবংশে সংহার করে।
আছে বিষয়-রূপ, বিষতরু,
আপাততঃ মনোহরে।
(যে জন) ফলাস্বাদন করে তারি,
তার শতায়ু যায় প্রহরে।
আরও আছে, কণ্টকদল—
পরিজন বলে যারে।
বিঁধিলে গাত্রে তার আঁচর,
এজীবনে আর না সারে।
(তোরে) কামরূপ রাক্ষস,
সদা বিহরে সে বন-মাঝারে।
(তারা) যাহাকে পায়, তা'কে চিবায়,
কাহাকেও নাহি ছাড়ে।
(তাহে) ক্রোধরূপ, শূকরনিকর,
লোভ-লুলাপক ফিরে।
মত্ততা-মাতঙ্গ রঙ্গে জীব,
হিংসা সদা করে।
মোহ-মাৎসর্য্যাদি পিশাচ,
পৈশাচিকী ক্রিয়া করে।
(তারা) পেলে একবার, ছাড়ে না আর,
ওঝাও তার যায় না ধারে।
মন-রে! শ্রীগুরুপদ-পাদপ, আশ্রয় করে,
বস, শীতল ছায়ায়, শরীর জুরায়,
যা'বে না কেউ তাঁহার ধারে।

নাস্তিকের ঈশ্বর-ভক্তি।

(দ্বিতীয় প্রকার)

"তু বিনে তোহে জানিতে নাহি এক।"

হে পরমপিতা পরমেশ্বর! তোমার পবিত্র করুণা-ব্যতীত তোমায় আর কোন প্রকারেই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তুমি দয়া করিয়া যাহাকে দর্শন দেও, সেই তোমায় দেখিতে পায়। কি ধার্ম্মিক, কি নাস্তিক—যাহার প্রতি যখন তোমার করুণা-কণা পতিত হয়, সেই তখন তোমায় প্রাপ্ত হয়। নহিলে, প্রভু, অন্যরূপে তোমায় যে কেহ আর পাইবে—সাধ্য কি?

আজ এক পাষণ্ড-নাস্তিকের পাষাণ চরিত্রে, সহৃদয় পাঠক-পাঠিকে, দেখুন—কিরূপে তাঁহার করুণা কখন্ কাহার প্রতি পতিত হয়!

এক ঈশ্বরে অবিশ্বাসী নাস্তিক। সে তর্কে, বক্তৃতায়, সর্ব্বদাই ঈশ্বরের অনস্তিত্বের বিষয়ই সাধারণকে বুঝাইয়া থাকে। তাহার তর্কের নিকট কেহই আর ঈশ্বরের স্বত্তা প্রতিপন্ন করিতে পারেন না। সে সকলকেই বুঝাইয়া দেয় এবং সর্ব্বত্রেই প্রচার করে,—"ঈশ্বর নাই। সুতরাং ঈশ্বর বলিয়া কাহারও উপাসনা বা পূজা করা অনর্থক।"

এইরূপেই বহুদিন কাটিয়া যায়। কেহই আর তাহার সহিত তর্কে প্রতিপন্ন করিতে পারেন না যে,—ঈশ্বর আছেন। অবশেষে, সংসারের সকলকেই একরূপ তর্ক-যুদ্ধে হারাইয়া, তাহার মনে হইল,—"একবার তপস্বী-ঋষি-সন্ন্যাসীদিগকেও এই তর্কে হারাইব; এবং তাঁহাদিগেরও অকারণ ঈশ্বর-উপাসনা ঘুচাইব!"

এইরূপ স্থির করিয়া, একদিন প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়াই, সে এক গহন বনোদ্দেশে গমন করিল। সে পূর্ব্ব হইতেই জানিত যে, সেই বনে অনেক যোগী-তপস্বী ধ্যানমগ্ন আছেন। তাই সে, একমনে, সেই বনোদ্দেশেই গমন করিতে লাগিল। যাইতে যাইতে, অবশেষে, তাহার অন্বেষণের ফলও ফলিল; সে দেখিল, অদূরেই এক সন্ন্যাসী ধ্যান-স্তিমিত-নেত্রে ভগবানের আরাধনায় ব্যাপৃত আছেন। দেখিয়াই, সে সেই সন্ন্যাসীর সমীপস্থ হইল; এবং উচ্চৈঃস্বরে তাঁহাকে বলিতে আরম্ভ করিল,—"কেন আর ঠাকুর—ও কষ্ট কেন? ঈশ্বর কই—কোথায়? আপনি, ঈশ্বর বলিয়া, কাহার ধ্যানে মগ্ন আছেন? ঈশ্বর কি কেহ এ জগতে আছে? কখনই না। ঈশ্বরের স্বত্তাই নাই! কেন আপনি অকারণ আপনার অমন সোণার শরীর এইরূপে ভস্মবশে মাটি করিতেছেন? উঠুন—ঘরে চলুন। ভাবুন দেখি, কোথায়ই বা আপনার স্ত্রী-পুত্র পড়িয়া আছে; কোথায়ই বা আপনার আত্মীয়-স্বজন! তাই বলি, এখনও উঠুন—এখনও চলুন! আর ভালোয়-ভালোয় যদি তা না করেন, তবে আমার নিকট অগ্রে ঈশ্বরের স্বত্তা প্রমাণ করুন—আমায় তর্ক-যুক্তিতে বুঝাইয়া দেন যে, ঈশ্বর বলিয়া কেহ একজন আছেন, এবং তাঁহার উপাসনার প্রয়োজন! নহিলে, আমি আর কোন মতেই আপনাকে ঈশ্বর-পূজা করিতে দিব না। উঠুন—উঠুন—এখনও উঠুন। ভালোয়-ভালোয় না উঠিলে, জোর করিয়াই উঠাইয়া দিব! ভণ্ডামীর রাজত্ব কিছুতেই আর চালাইতে দিব না!"

কিন্তু সাধু নিরুত্তর! তিনি যেমনই ধ্যানে বসিয়া ছিলেন, তখনও তেমনিই বসিয়া রহিলেন। মুখে কোন কথাও নাই; কোনরূপ জ্ঞানোদয়ের লক্ষণও নাই। ঈশ্বরবিদ্বেষী নাস্তিকের কাজেই বড়ই ক্রোধ জন্মিল। "আমাকে অপমান! উত্তরটা পর্য্যন্ত দিল না।"—মনে মনে এইরূপ ভাবিয়াই, সে অমনি সাধুর প্রতি সজোরে অগ্রসর হইল; এবং তাঁহার হস্ত-ধারণ-পূর্ব্বক তাঁহাকে ধ্যান হইতে উঠাইবার চেষ্টা করিল। হরি-ধ্যানরত সাধু নাস্তিকের অপবিত্র শরীর-স্পর্শেই হউক, অথবা অন্য কোন কারণেই হউক, ধ্যানভঙ্গ হইল; তিনি অমনি চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। নাস্তিক তখন আবারও তাঁহাকে বলিয়া উঠিল,—"কেন ঠাকুর আর ভণ্ডামী? ঈশ্বর কোথায়? ঈশ্বরের স্বত্তাই যে নাই! আমায় তর্কে বুঝাও দেখি, ঈশ্বর বলিয়া কেহ আছেন কি না; তারপর, আমি বুঝিব যে তোমাদের ভণ্ডামী সার্থক। নহিলে, জানিও আমি আর কোন মতেই তোমাকে এরূপ রাজ্যের অমঙ্গল-বিধান করিতে দিব না। তোমাদের দৃষ্টান্তে সংসারের লোক যে সংসার ত্যাগ করিয়া ও স্ত্রীপুত্র ফেলিয়া বনবাসী হইবে, এ আমি কিছুতেই দেখিতে পারিব না। তবে যদি তুমি আমায় দেখাইতে পার যে ঈশ্বর বলিয়া কেহ আছেন, তাহা হইলে আমি অবশ্য অবনত-মস্তকে তোমার দাসত্ব স্বীকার করিব; এবং আমিও গৃহে ফিরিব না—তোমার মত আমিও ঈশ্বরের আরাধনায় নিযুক্ত হইব। নহিলে, ঠাকুর, জানিও, তোমায়ও আর ঈশ্বরের পূজায় ব্যাপৃত হইতে দিতেছি না; অপর কাহাকেও আর এরূপে সময়ের অপব্যয় করিতে দিব না।"

সন্ন্যাসী-সাধু এবার সকলই শুনিলেন। শুনিয়া, মনে মনে একটু হাসিলেন। সঙ্গে সঙ্গে, ক্ষণকাল কি জানি কি একটু চিন্তা করিয়াই, ভূমি হইতে একটুকু প্রস্তরখণ্ড উত্তোলন করিলেন; এবং, হাসিতে হাসিতে, সেই নাস্তিকের গাত্র লক্ষ্য করিয়া, সজোরে তাহা নিক্ষেপ করিলেন। প্রস্তর-খণ্ড বেগে তাহার গাত্রে গিয়া পতিত হইল; নাস্তিক "উ-হু—মাগো—গেলাম গো" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। সন্ন্যাসীও অন্যমুখে সেস্থান হইতে গমনোদ্যোগ করিলেন।

নাস্তিক, তাঁহাকে ডাকিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে আবার বলিতে লাগিল (এবার অবশ্য অনেকটা নরম হইয়াই),—"ঠাকুর! এ কেমন আপনার বিচার? এ কেমন আপনার ঈশ্বর-পূজা? আমি ঈশ্বর-সম্বন্ধে তর্ক করিতে আসিলাম বলিয়া আপনার এ কি ব্যবহার? আপনারই, অকারণ সময় নষ্ট হইতেছিল দেখিয়া, ভালোর জন্য আমি আসিলাম; আর আমায়ই এমন করিয়া কষ্ট দেওয়া? উ-হু! জ্বলে গেলাম—বড় বেদনা।"

সন্ন্যাসী তখনও মৃদুহাস্যে উত্তর করিলেন,—"কি—কি—বেদনা আবার কি? কৈ, কৈ বেদনা—কোথায় বেদনা? কৈ, বেদনাকে তো দেখ্‌তে পাচ্ছি-নে! তবে তুমি মিছামিছি 'বেদনা বেদনা' ক'রে চেঁচাচ্ছ কেন? কৈ, বেদনাকে একবার দেখাতে পার আমায়?"

নাস্তিক (পূর্ব্বাপেক্ষা আরও মৃদুভাবে)।—ঠাকুর, একি বিদ্রূপের সময়? বেদনাকে কি আর দেখা যায়? উ-হু! আমি জ্বলে মলেম—জ্বলে মলেম!

সন্ন্যাসী।—কি বল, বেদনাকে দেখা যায় না, তবে তা'র আর স্বত্তা হ'লো কি করে?

নাস্তিক।—ঠাকুর, সে কি বলেন? অনুভবই যে বেদনার স্বত্তা? উ-হু, জ্বলে গেলেম!

সন্ন্যাসী।—ভাল!—ভাল! কিন্তু বাপু, অনুভবে তবে ঈশ্বরের স্বত্তাটাও স্বীকার কর-না কেন? বেদনার সামান্য স্বত্তাটা যখন অনুভবে ঠিক করিয়া লইতে পারিতেছ, তখন একবার অনুভবই করিয়া দেখ দেখি,—'ঐ ঈশ্বর, ঐ পিতা—ঐ তিনি আমার সম্মুখে!' দেখ দেখি, তা'তে তাঁকে পাও কি না! দেখ দেখি একবার, তাতে কত আনন্দ!

বেদনার অশ্রু গিয়া, নাস্তিকের চক্ষে তখন প্রেমাশ্রুর উদয় হইল। সে গদ্গদচিত্তে বলিতে লাগিল,—"সাধু—সাধু আপনি! এতদিনে আজ আপনি আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দিলেন! ধন্য আপনি—ধন্য ঈশ্বরের কৃপা যে, তিনি আমার মত পাষণ্ডেরও এরূপে উপায়-বিধান করিয়া দিলেন!"

এইরূপ অনুতাপ করিতে করিতে, নাস্তিক আর গৃহে ফিরিল না। তদবধি, সেও সেই বনে, ঈশ্বরের আরাধনায় ব্যাপৃত হইল।

অদৃষ্ট।

সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

সুলোচনার প্রতি ভ্রাতা ও বন্ধুদের ব্যবহার।

সুলোচনা ও তাঁহার ভ্রাতৃবধূগণে কিরূপ সদ্ভাব, তাহার পূর্ব্বের এক অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। এক্ষণে যাহা যাহা হইতে লাগিল, তাহা তদপেক্ষাও গুরুতর। এক দিবস প্রাতে,

সুলোচনা, গোবর-ঝাঁটি সমাপন করিয়া, কয়লার উননে আগুণ দিয়া, স্নান করিয়া আসিয়াছেন। কয়লার উননে আগুণ দিলে তাহা ধরিতে প্রায় অৰ্দ্ধঘণ্টা আন্দাজ দেরী হয়। উনন ধরিতে ধরিতে, স্নানাহ্নিক সারিয়া আসিয়া, সুলোচনা রান্না চড়াইয়া দেন। অদ্যও তিনি পূর্ব্বোক্ত প্রথা-অনুসারে, ভাত চড়াইয়া দিয়া তরকারী কুটিতেছেন। এমন সময়, সুলোচনার বড়-ভ্রাতুষ্পুত্র তাহার ছোট-ভগ্নীকে সঙ্গে আনিয়া সুলোচনাকে কহিল,—"পিসিমা, বড়াই-এর জ্বর হয়েছে।" সুলোচনা উত্তর করিলেন,—"এর জ্বর কখন হল; এই ভাল মেয়ে খেলা কচ্চে, আর এই জ্বর হলো?" এই কথা বড়-বধূর কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র, তিনি উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন,—"ও সতে, সতে, বলি, কার জ্বর হয়েছে, বলছিস্?" বড়-বধূ অগ্রে ভাবিয়াছিলেন, হরিপদরই বুঝি জ্বর হয়েছে; এ কারণ উক্তরূপ ভাবে প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করিলেন। এখানে বলিয়া দেওয়া উচিত যে, সতীশ বড়-বধূর জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম ও বড়াই তাঁহার কন্যার নাম। বড়-বধূ সতীশকে যে প্রশ্ন করিলেন, তাহার উত্তরে, তাঁহার নিজেরই কন্যার জ্বর হইয়াছে শুনিয়া, আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। মনে মনে হিংসা হইল যে, হরিপদর জ্বর না হইয়া তাঁহার নিজেরই কন্যার জ্বর হইয়াছে। এজন্য সুলোচনাকে ঠেস্ করিয়া কহিতে লাগিলেন,—"জ্বর না হবে কেন? এত অনাচার কখনও সহ্য হয়? ওরা ত ছেলে-মানুষ, আমাদেরই ঘৃণায় ঘৃণায় অসুখ হ'বার যো হয়েছে! এরা ত চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেও দেখ্‌বে না!—এত করে বোল্লাম, তাও তো শুন্‌লে না! যখন ঠেক্‌বেন, তখনই জান্‌তে পার্‌বেন! একখানা কিছু না বাদলে ওদের আর আক্কেল হবে না, দেখ্‌চি! কেন, শ্বশুর-বাড়ী তো আছে, সেখানে তো পাঠিয়ে দিলে পারে; যাদের জাত, তারাই গিয়ে সামলাক!" বড়-বৌ এত দূর বলিয়াছেন; এমন সময়, সুলোচনা তাঁহাকে ঠেস্ দিয়া এই কথাগুলি হইতেছে শুনিয়া, কহিলেন,—"কেন, তুমি কার এত অনাচার দেখ্‌লে? রোজই বল, অনাচার, অনাচার! অনাচার হ'ল কিসে? তোমার অত চিড়িক চিড়িক কথা ভাল নয়। শ্বশুর-বাড়ী পাঠিয়ে দেবে? কেন? আমি তো আর পরের কাছে নেই? বাপের বাড়ী—বাপের কাছে আছি; আর বাবা যতদিন আছেন, আমিও ততদিন থাক্‌বো। যাদের না পোষায়, তারাই কেন তফাৎ হোক না? কিন্তু সে বড় শক্ত কথা? বাপের বাড়ী খাবার যো থাক্‌লে তো? সেখানে গেলে অত ভাতের গলা থাকেনা যে!" সুলোচনা এই কথা বলিয়া, রান্না-ঘরে ভাত দেখিতে আসিয়া, ভাতে কাটি দিয়া নাড়িয়া দিতেছিলেন। এমন সময়, বড়-বধূ, তাঁহার নূতন ঝিকে ডাকিয়া, কহিলেন,—"ও ঝি, পার তো বাপু একটু দুধ গরম করে এনে দেও দেখি?" ঝি, আজ্ঞা-মাত্রেই, দুগ্ধের বাটী হস্তে করিয়া লইয়া আসিয়া, সুলোচনাকে কহিল,—"হাঁড়ি নামিয়ে নেও; আমি এই দুধটুকু জাল দিয়ে নিই।" সুলোচনা কহিলেন,—"ভাত হব হব হয়েচে; এখন হাঁড়ি নামালে চল্‌বে কেন? তোমরা যে কাঠের উননে দুধ জাল দিতে, আজ কেন তা ধরাও-নি?" ঝি কহিল,—"অত নিকেস্ দিতে পারি-নে বাপু! এখন, তুমি উনন ছাড়্‌বে কি না, বল?" সুলোচনা, এই কথায়, একটু রাগত হইয়া কহিলেন,—"তুমি যে একেবারে ঘোড়ার উপর জিন দিয়ে এসেছ, দেখ্‌ছি! একটু দেরী সয়না? তোমাকে কি শিখিয়ে দিয়েছে নাকি?" ঝি ছোট-লোক; সুলোচনার কথার মর্ম্ম না বুঝিতে পারিয়া, 'ঘোড়ার উপর জিন দেওয়া' কোন একটা কুকাজ ভাবিয়া, একেবারে গরম হইয়া কহিল,—"আমরা বাপু, ওসব জানি-নে; কোন বেটা-

বেটীও আমাদের ওসব কথা বল্‌তে পারে না! এত কি? না হয় নাই রাখবে? জবাব দিলেই ত চলে যাই! আমরা অত পুরুষ-মানুষের সঙ্গে রাতদিন হাসি-তামাসা করি-নে যে, আমাদের কেউ একটা কথা বল্‌বে।" সুলোচনা, এই কথায় অতিশয় রাগান্বিতা হইয়া, একখানা আধ-পোড়া কাঠের চেলা হাতে করিয়া, সতেজে রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া, কহিলেন,—"তবে-রে হারামজাদি, ছোটলোক, তোর যত বড় মুখ নয়, তত বড় কথা? বের এখনি আমার বাড়ী থেকে! তোকে না বের করে, আমি ছাড়বো-না; দেখি, আজ তোরে কে এখানে রাখে?" সুলোচনার রাগ হইবার আগে হইতেই ঝি সুলোচনার নিকট হইতে বড়-বৌয়ের ঘরে যাইতেছিল; পিছন হইতে সুলোচনার ক্রোধ-বিস্ফারিত এই বাক্যগুলি শুনিয়া, অমনি দ্রুতপদে যাইতে লাগিল। এদিকে বড়-বৌ আবার ঝিকে ডাকিয়া কহিলেন,—"ঝি, একবার শুনে যাও; তোমায় আর দুধ গরম করতে হবে না।" পরে সুলোচনার প্রতি কহিলেন,—"অমন তেজ আমি ঢের দেখেছি; পথে হাগবেন, আবার চোকও রাঙ্গাবেন! আসুক আগে এরা বাড়ী! অমন রান্না-ভাত খাবার দরকার নেই! পারে ত বামুন রাখুক, আর না পারে ত আপনারা যেন রেঁদে খায়! আমি কিন্তু বাছাদের আর অমন অনাচারের ভাত খেতে দেব না।" সুলোচনা বড়-বধূর মুখনিঃসৃত এই কথাগুলি শ্রবণ করিয়া, তাঁহার ঝিও যে তাঁহারই দ্বারা শিক্ষিত হইয়া আসিয়াছিল তাহা সম্যক বুঝিতে পারিলেন; এবং তজ্জন্য, অত্যন্ত রাগত ও নিরতিশয় দুঃখিত হইয়া, কহিলেন,—"তবে থাক্‌লো তোমাদের হেঁন্‌সেল্! আমার এত করে রাঁধবার কি গরজ? যার জন্য করি চুরি, সেই বলে চোর?" এতদূর বলিয়া, নিজে আক্ষেপ করিতে করিতে, হরিপদকে একটু কাঁচা দুধ খাওয়াইয়া, নিজের শয়ন-গৃহে গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া, শুইয়া রহিলেন।

ভাত উননে চড়ানই আছে; ঐরূপ আর খানিকক্ষণ থাকিলেই পুড়িয়া যাইবে! বড়-বধূ-ঠাকুরাণীর কন্যার জ্বর; সুতরাং তিনি অদ্য রন্ধন করিতে পারিবেন না! এজন্য ছোট-বৌকে ডাকিয়া কহিলেন,—"ছোট-বৌ, লক্ষ্মী, আজকার মত চারটী রাঁধ তো ভাই! তারপর সব বাড়ী আসুক, যা হয় একটা বন্দোবস্ত করবো।" ছোট-বৌ কহিলেন,—"ঠাকুর-ঝিকে আর মন্দ কথা কি বলা হয়েছে যে, তিনি অত রাগ কর্‌লেন? যা করেন, তা বল্লেও আবার লোকে রাগ করে নাকি? কেন, মিছে কথা ত কেউ বলে-নি কিছু?"

বড়-বৌ।—শুন্‌লে ত ভাই সব! আমরাই মন্দ! উনি পথেও হাগবেন, আর চোকও রাঙ্গাবেন।

এই কথার পর, ছোট-বৌ রন্ধন-শালার একটিন্ গ্রহণ করিলেন। তাঁহার বকাবকি করা বড় অভ্যাস ছিল না; তবে মাঝে মাঝে যে এক একটী কথা বলিতেন, তাহা, সুলোচনার পক্ষে, বড়-বৌয়ের বকুনী অপেক্ষাও ক্লেশকর বোধ হইত। অদ্যকার ঘটনা যেরূপ হইয়া উঠিল, তাহাতে ছোট-বৌ দেখিলেন,—ঠাকুর-ঝি হাঁড়ি ত্যাগ করিলেই তাঁহার নিজের ঘাড়ে পড়িবে; কারণ, বড়-বৌয়ের আজকাল রাজ্যপাট! তাঁহার কন্যার অসুখ হইয়াছে; সুতরাং তাহাকে চৌকী দিবার জন্য, নিজের ঘর হইতে নড়িবারই যো নাই! এই সকল ভাবিয়াই, ছোট-বৌ অদ্য কোন কথাই কহেন নাই। তবে ঝগড়ার পরিণামে যখন দেখিলেন, রন্ধন-শালার ভার তাঁহারই উপর পড়িল, তখন, এই একটীমাত্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়া আসিয়াই, কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

রাঁধা-বাড়া হইয়া গেলে সকলেই যথা-সময়ে আহারাদি করিলেন। কিন্তু সুলোচনার

কেবল আহার হইল না। আমাকে একঘরে একবাড়া করিয়া দিয়াছিলেন। যখন খাইবার ডাক হয়, তখন গতিক-গাতাক সমস্ত দেখিয়া ভাবিলাম, হরিপদকে এই বেলা না ডাকিলে তাহারও আজ আহার হইবে না। এজন্য আমি, হরিপদকে ডাকিয়া লইয়া, যেমন জুটিল, চারিটি আহার করিলাম। একথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, অন্যান্য দিন সুলোচনা রন্ধনাদি করিয়া পরিবেশন করিতেন। সুতরাং আমার আহারটি যে ভালরূপই হইত, তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু অদ্য আর তাহা হইল না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ডাক্তার বাবু শোকে ও বয়সে একরূপ বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। তিনি এক্ষণে সকলের শেষে আহার করিতেন; এবং আহার করিতে বসিয়া, সকলের খাওয়া হইল কি না, এক এক করিয়া খোঁজ লইতেন। যথা-নিয়মে সকলের খোঁজ লইয়া, বড়-বৌকে ডাকিয়া তিনি জিজ্ঞাসিলেন, —"বৌ-মা, আজ যে সুলোচনাকে দেখ্‌চিনে? তার খাওয়া হয়েছে তো?" সুলোচনার আহার হয় নাই শুনিয়া পাছে শ্বশুর আহার না করেন, এজন্য, বড়-বধূ কথাটি কিরূপে গোপন করিবেন ভাবিতেছেন; এমন সময়, ডাক্তার বাবু পুনরায় ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন, বড়বধূ-ঠাকুরাণী, অর্দ্ধ অবগুণ্ঠনে আবৃতা হইয়া, আস্তে আস্তে দরজার নিকট আসিয়া—"হাঁ, এতক্ষণ তাঁর অর্দ্ধেক ঘুম হ'লো"—এইটুকু বলিয়াই, ঘরের বাহিরে আসিলেন; এবং নিজে নিজে কহিতে লাগিলেন,—"এক চোকো বুড়ো, কেবলই সুলোচনা, সুলোচনা! সুলোচনা সুলোচনা করেই মরেন, সুলোচনা যেন ওঁর পিণ্ডি দেবে! আমরা এত ক'রে খিচ্‌মোদ করি, একবার আমাদের নামও করেন না—দশ দিন পড়ে থাকলেও খোঁজ নেন না! কিন্তু রাত-দিনই মুখে—'সুলোচনা!' এক-চোকো আর কাকে বলে?" এই কথা বলিতে বলিতে, রাগে তাঁহার শরীর গিস্ গিস্ করিতে লাগিল; এবং পরক্ষণেই, নিজের ঘরের দরজা অভ্যস্ত-মত শব্দ-সহকারে বন্ধ করিয়া, পীড়িত কন্যাকে কোলে লইয়া শয়ন করিলেন। ডাক্তার বাবুও, আহারান্তে পান-তামাক খাইয়া, চাকরকে পাখা টানিতে বলিয়া, শয়ন করিলেন।

দুপুর-বেলা এইরূপে কাটিয়া গেলে, বৈকালে ছোট-বৌ নিজে আসিয়া রন্ধন-কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন। এবেলা আর তাঁহাকে কাহারও অনুরোধ করিতে হয় নাই। ডাক্তার বাবুর পুত্রেরা বাটী আসিলে যে যাহার ঘরে গিয়া জলযোগ করিলেন; এবং দিনের সমস্ত ঘটনা যে যাহার স্ত্রীর নিকট হইতে শুনিয়া আসিয়া বাহির-বাটীতে বসিলেন। আমিও বাহির-বাটীতেই বসিয়া ছিলাম! তাঁহারা এক সময়ে আমার নিকট পাঠ অভ্যাস করিতেন, এজন্য বিলক্ষণ খাতিরও করিতেন। অদ্য বহির্ব্বাটী বসিয়া কথা-বার্ত্তা কহিতেছেন বটে, কিন্তু, বারবার আমার মুখের দিকে তাকান দেখিয়া, তাঁহাদের মনোগত ভাব আমি বুঝিতে পারিলাম। বুঝিতে পারিয়া, ভাবিলাম,—এখানে আর থাকা নয়। আমি এখানে আসিতাম না; কিন্তু হরিপদর জন্যই আসিয়াছিলাম! যাহা ভাবিয়া আসিয়াছিলাম তাহা সফল হইল বটে; কিন্তু ভাবিতে লাগিলাম,—এ অবস্থায় তাহাকে রাখিয়া যাই কেমন করিয়া? সুলোচনা একে নিজের জন্য বিব্রত, তাহার উপর আবার হরিপদ! হরিপদ আসা অবধিই বধূগণের যে মুখ ভার, তাহা আমি জানিতে পারিয়াছিলাম। এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া, অবশেষে ঠিক করিলাম,—রাত্রি প্রভাত হইলেই, হরিপদকে লইয়া, আমি যেখাকার লোক, সেখায় যাইব। আমার সুখে আর কাজ নাই। এইরূপ ঠিক ক

রাই, আমি ডাক্তার বাবুর বড়-পুত্রকে কহিলাম,—"আমি তবে কাল প্রাতঃকালেই দেশে যাচ্চি; তোমাদের সঙ্গে আর দেখা হয় কি না! খাজানা-পত্র সবই পড়ে রইল; আর বসে থাকলে চল্‌বে কেমন করে? ভেবেছিলাম, হরিপদকে রেখে যাব; তাও দেখ্‌ছি, আর সুবিধে হয় না! সকলেই ব্যস্ত; বিশেষ, যে যাহার আপনার ছেলে-পিলে নিয়েই দেক্, তাতে কি আর পরের ছেলে রাখা পোষায়? আমিও তো দেক হয়ে রাখ্‌তে এসেছিলাম?" এই কথা শুনিয়া, ডাক্তার বাবুর পুত্র কহিলেন,—"হাঁ, তা যদি আপনার কাজ ক্ষতি হয়, তবে আর অনুরোধ করে রেখেই বা ফল কি! তবে হরিপদকে রাখবার কথা যা বল্‌চেন, তাও দেখচি, সুবিধে নেই। এক দিদি, তা নয় তো সকলেই ছেলে-পিলে নিয়ে ব্যস্ত! তাও দিদির আবার রান্না-বাড়া ও সংসারের অন্যান্য কাজ রয়েচে। তাঁকে এর ওপর আর কাজ দিতে গেলে, আবার একটী লোক না রাখ্‌লে আর চলে না।" বড়-বাবু এই পর্য্যন্ত বলিয়াছেন, এমন সময়ে তাঁহাদের আহারের ডাক হইল। আমার এবেলাও আর তাঁহাদের সঙ্গে আহার হইল না। কারণ, ছোট-বধূ রন্ধন করিয়াছেন। সুতরাং বাবুদের খাওয়া-দাওয়া হইয়া গেলে, আমাকে সকালের মত একঘরে একবাড়া করিয়া যে দিবেন, তাহা আমি পূর্ব্ব হইতেই জানিতে পারিয়াছিলাম। ডাক্তার বাবুর দুটি পুত্রই একসঙ্গে বসিলেন। তাঁহারাও বসিয়া আহারে প্রবৃত্ত হইলেন, ও দুই একটী কথা বলিতে লাগিলেন; এমন সময়, সুলোচনা, নিজ-গৃহের দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া আসিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে, প্রাতঃকাল হইতে যে যে ঘটনা হইয়াছিল ও ঝি তাঁহাকে যেরূপ গালি দিয়াছিল, সমস্ত বিবৃত করিলেন। তখন, সমস্ত ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া, বড় বাবু কহিলেন (কারণ, তাঁহারই ঝি ঐরূপ গালি দিয়াছিল),—"আমি সব্ শুনেছি, কি কি হয়েছিল! তোমাকে গালি দিয়েছে কি, যে, তুমি কেঁদে কেঁদে চোক ফুলিয়ে তুলেছ? ঝি তো আর খারাপ কথা কিছু বলে-নি! বলেছে —'কোন বেটীও আমাকে অমন কথা বল্‌তে পারে না!' তা' তুমি বেটী না ত কি বেটা-মানুষ? বেটী বলায় কোন গাল হয়-নি; বরং ও কথাটা ঠাট্টা ভেবে নেওয়া উচিত ছিল।" এই কথায়, সুলোচনার আরও অধিক দুঃখ হইল, এবং দরদর-ধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে কহিলেন,—"তা আচ্ছা, কিন্তু দাদা, ও ঠাট্টাই করুক, আর গালই দিক, ওকে তাড়িয়ে দেও; ওকে তুমি রাখ্‌তে পাবে না। তোমার যত কাজ ও করে দেয়, তা সব আমি করে দেব।" এই কথা শুনিয়া, বড়-বৌ-ঠাকুরাণী চীৎকার-শব্দে কহিলেন,—"বড় যে চুপ করে রইলে? ঝিকে তাড়িয়ে দেবে, দেও না! আমি কিন্তু কাজ ঠেল্‌তে পারবো না! যে তোমার কাজ করে দেবে, তাকে দিয়ে, বাড়ী বসে থেকে, করিয়ে নিও; আমি দেখ্‌তেও পার্‌বো না, শুনতেও পার্‌বো না। বেটী বলেছে, তাই বড় অপমান হয়েছে; আর বাইরে গিয়ে যখন সমস্ত দিন ইয়ারকি দেওয়া হয়, তখন বুঝি আর অপমান হয় না?" এই বলিয়া, এক ঘটি জল হাতে করিয়া লইয়া, দুম্ দুম্ পদধ্বনি করতঃ, নিজ-কক্ষের দ্বাররুদ্ধ করিলেন। বড়-বাবুও আহারান্তে উঠিয়া কহিলেন,—"ঝিকে এখন তাড়াতে পাচ্চি-নে; বিশেষ, মেয়েটার জ্বর হয়েছে। এখন কি তাড়িয়ে দিয়ে একটা মুন্যি কুড়োবো?" তখন, সুলোচনা, কপালে ঘা দিতে দিতে ও কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়া, পিতার নিকট উপস্থিত হইয়া, উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন—"ওগো, বাবা-গো, আমি আর বরদাস্ত কর্‌তে পারি-নে গো! আমাকে বড়-বৌ, যা ইচ্ছে তাই ব'লে, আবার ঝিকে দিয়ে অপমান করাচ্চে। আমার কপ

মন্দ বলে কি এত যন্ত্রণা দেয়! আমি আর সইতে পারি-নে; তুমি আমাকে নিয়ে আর কোথাও চল; নয় তো আমি এ বাড়ী আর থাকবো না!"

ডাক্তার বাবু, প্রিয়তমা কন্যার এইরূপ কাতর ক্রন্দন শ্রবণ করিয়া, মর্ম্মাহত হইলেন; এবং স্বয়ং কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন,—"মা, আর দু'চার দিন রও; আমি যা হয় তোমার একটা বন্দোবস্ত করে দিয়ে যাব। আমি আর এ সংসারে থাকিব না; তবে তোমার যাতে ভাল হয়, তুমি যাতে এজন্মে আর কষ্ট না পাও, তা' আমি সত্বর করে দিয়ে কাশী-বাসী হ'ব। তোমার ভাল না দেখে আমি যাচ্চি-নে। দু'এক দিন থাক মা—কি করবে আর বল? আমার উপর যদি তোমার বিশ্বাস থাকে, তবে তুমি ইহা নিশ্চয় জানিও, আমি তোমার কোন উপায় করে দেবই দেব; নতুবা আমার সঙ্গে তোমায় কাশী নিয়ে যাবো।" সুলোচনা কাতরস্বরে কহিলেন,—"তবে তাই ক'রো; আমি যেন তোমার পদসেবা ক'রে এ জন্ম কাটাইতে পারি।"

পাপের প্রতিফল।

দশম পরিচ্ছেদ।

বন্দী।

হরদেব বহির্ব্বাটীতে আসিয়া দেখিলেন, বীরেন্দ্র উপবেশনাগারে উপবিষ্ট আছেন। হরদেবকে দেখিয়াই তিনি উঠিয়া দাঁড়াইলেন; এবং তাঁহার হস্তে আপনার নিয়োগপত্র অর্পণ করিলেন।

হরদেব দেখিয়া হাসিলেন। একেবারে তাঁহার মুখে বিবর্ণতার চিহ্ন কিছুমাত্র নাই। হাসিয়া বলিলেন,—"অপরাধী স্থির হইয়াছে কি?"

বীরেন্দ্র অতি নম্রভাবেই বলিলেন,—"যতদূর প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে, তাতে আপনিই অপরাধী বলে নিশ্চিত হয়েছেন। এক্ষণে আপনি সৌরাষ্ট্ররাজের আদেশে বন্দী।"

হরদেব স্থিরভাবে বলিলেন'—"বীরেন্দ্র! তুমি বালক! একটু চেষ্টা কর্‌লেই তুমি বুঝ্‌তে পার্‌তে যে, তোমার সিদ্ধান্ত ভুল। কিন্তু আমি তোমাকে কিছুই বল্‌বো না। তুমি যখন রাজার নামে আমাকে বন্দী করচো, তখন আমি কথা-মাত্র উচ্চারণ না ক'রে বন্দী হ'লাম। তবে তুমি এখানে একটু বসো। আমি আমার কন্যাকে গোটা-দুই কথা বলে আসি।"

বীরেন্দ্র।—আপনার আর এখন আমার সম্মুখ হতে স্থানান্তরে যাওয়া উচিত নহে।

হরদেব।—ওঃ! তুমি মনে করেচো, আমি পালাবো! ভাল, আমি কোথাও যেতে চাই না। আমার যা বক্তব্য, তা আমি লিখে বাটীর মধ্যে পাঠিয়ে দিচ্চি। কিন্তু, এক কাজ কর; আমাকে যে বন্দী কর্‌লে, একথা আমার ভৃত্য-দের বল্‌বার আবশ্যক নাই।

এই কথা বলিয়াই, তিনি দুইখানি পত্র লিখিলেন, এবং একজন ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন,—"এই পত্র-দু'খানি কমলাকে দিয়ে এসো।" পরে বীরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"চল বীরেন্দ্র, কোথা যেতে হবে, চল।"

বীরেন্দ্র হরদেবকে সঙ্গে করিয়া কোতোয়ালীতে উপনীত হইলেন।

বলেন্দ্র হরদেবকে দেখিয়াই তাঁহার পদ-ধূলি গ্রহণ করিলেন, এবং বলিলেন,—"একি? আপনি এখানে?"

হরদেব।—বাপু, বল্‌বো কি দুঃখের কথা, বীরেন্দ্র স্থির করেছেন, আমি এই বৃদ্ধ-বয়সে দস্যুবৃত্তি আরম্ভ ক'রেছি। তাই তিনি, মহা-রাজের নাম করে, আমায় বন্দী করে এখানে এনেছেন। এখন, তোমার কোতোয়ালীর কারাগারের দ্বার খুলে দাও। আজ রাত্রে তো আমায় সেইখানেই থাকতে হবে!

বলেন্দ্র।—বীরেন্দ্র! তুমি এমন কি গুরুতর

প্রমাণ পেয়েছ যে, এঁকে বন্দী করে নিয়ে এসেছে?

বীরেন্দ্র।—প্রমাণ যথেষ্ট পেয়েছি।

হরদেব।—প্রমাণ পেয়ে থাক, ভালই; তাতে আমার কিছুমাত্র আপত্তি নাই। কিন্তু বিচার তো আর আজ রাত্রে হবে না! কাল বিচারালয়ে আমায় একবার ডেকে পাঠালেই তো আমি সেখানে উপস্থিত হ'তাম।

বলেন্দ্র।—মহাশয়! অপরাধ ক্ষমা করুন। বীরেন্দ্র যদি আপনাকে অপরাধী বল্‌তে চায়, বলুক। আপনি অদ্য গৃহে গমন করুন; কাল প্রাতে বিচারালয়ে উপস্থিত হবেন।

হরদেব।—তুমি আমায় এতদূর বিশ্বাস করচো; কিন্তু বীরেন্দ্র, আমার আসবার পূর্ব্বে, একবার আমার কন্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আস্‌তে দেয় নাই।

বলেন্দ্র।—বীরেন্দ্র অতি অন্যায় কাজ করেছে।

হরদেব চলিয়া গেলেন। বীরেন্দ্র বলি-লেন,—"হরদেব যদি দেশত্যাগী হয়, তা'হলে কিন্তু বড় ভাল হবে না।"

বলেন্দ্র, হাসিয়া বলিলেন,—"তাহাতে তোমার কোন ভয়ের কারণ নাই। তুমি অপ-রাধী ধরেছ বলে যে পুরস্কার পাবার কথা, তা নিশ্চয়ই পাবে; তবে আমি অপরাধী ছেড়ে দিয়েছি বলে, আমারই যা হবার হবে। বীরেন্দ্র, তুমি আজও কাজ শেখ নাই! তুমি যদি যথার্থই অনেক প্রমাণ পেয়ে থাক, ভালই; কিন্তু তবু তুমি কেন বিচারালয়ে তার নামে অভিযোগ উপস্থিত করে বিচারপতির দ্বারাই তাকে আহ্বান করালে না! তা যা করবার তা করেছই; এখন, তোমার যে সমস্ত প্রমাণ সংগৃহীত আছে, সমুদায় ঠিক্ করে রাখ-গে; কাল যে কি অনর্থ ঘট্‌বে, তার আর কিছুই বল্‌তে পার্‌ছি-নে। এখন, জগদীশ্বরের কাছে প্রার্থনা, যেন তোমার কোন অমঙ্গল না হয়।

বলেন্দ্রের কথায় বীরেন্দ্রেরও যেন একটু চিন্তার উদ্রেক হইল। তিনি, বলেন্দ্রের নিকট বিদায় লইয়া, নিজ-গৃহে গমন করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

পত্র।

নিজকক্ষে কমলা পিতার পত্রখানি পাঠ করিতেছিলেন। পত্রে লেখা ছিল,—

"মা কমলে, বিশেষ প্রয়োজনে বাধ্য হইয়া আমায় সত্বর স্থানান্তরে যাইতে হইল; বোধ হয় আসিতে দুই তিন দিন বিলম্ব হইতে পারে। যশোবন্ত আসিলে তাকে অপর পত্রখানি দিও। তাহার অর্থের প্রয়োজন হইলে তোমার অঙ্গের অলঙ্কার দিতেও কুণ্ঠিত হইও না।

এই পর্য্যন্ত পড়িয়াই, কমলা মনে মনে বলিলেন,—"এমন কি বিশেষ প্রয়োজন যে, দুই তিন দিনের জন্য বাটীতে আস্‌তে পার্‌বেন না, এবং যাবার সময় একবার বাড়ীর ভিতর আসবারও অবসর নাই! অথচ এত বড় দু'খানা চিঠি লিখ্‌বার অবসর হলো! ভাল, দাদার চিঠিখানা দেখ্‌বো কি!—এতে কি লেখা আছে? ভাইয়ের চিঠি বোনে দেখ্‌তে দোষ কি?"

এই ভাবিয়াই, অপর পত্রখানি খুলিলেন। কিন্তু দেখিলেন,—

"বৎস, আমি ভূপলালকে হত্যা করেছি এইরূপ সন্দেহ করে, আমাকে বন্দী করেছে; হয়ত আজ আমাকে কোতোয়ালীতে থাকতে হবে। তুমি কমলাকে রক্ষা ক'রো; আমি কাল-কের বিচারে নিশ্চয়ই অব্যাহতি পাব, এরূপ আশা করি। তবে অদৃষ্টের কথা বলা যায় না; হয়ত বা অকৃতাপরাধে প্রাণদণ্ডও হতে পারে!"

এই পর্য্যন্ত পড়িতে পড়িতেই কমলার দেহ অবশ হইয়া আসিল। এমন সময়, হরদেব দ্বারে আসিয়া ডাকিলেন,—"মা! কমলে!"

"বাবা—বাবা! তুমি এসেছ" বলিয়া

দৌড়িয়া গিয়া, কমলা পিতার চরণতলে পতিতা হইলেন।

হরদেব বলিলেন,—"মা, একি? তুমি এমন করে পড়্লে কেন?" এই কথা বলিয়া, কমলাকে ভূমি হইতে উঠাইলেন।

কমলা বলিলেন,—"বাবা, তারা তোমায় কেন ধরে নিয়ে গিয়েছিল?"

হরদেব বলিলেন,—"কৈ মা, আমায় কে ধরে নিয়ে গিয়েছিল? কেউ ত নিয়ে যায়-নি।"

কমলা।—তবে তুমি দাদাকে ও কথা লিখ্লে কেন?

হরদেব দেখিলেন, কমলাকে একথা জানিতে দেওয়া তাঁহার অভিপ্রেত না হইলেও, তাঁর অনবধানতায় কমলা সকলি জানিতে পারিয়াছেন। কাজে কাজেই তিনি বলিলেন,—"না মা, তারা আমায় ধরে নিয়ে যায় নাই। তাদের মনে সন্দেহ হয়েছে যে, আমি ভূপলালকে হত্যা করিয়াছি। তাই আমি তাদের বল্‌তে গিয়েছিলাম যে, তারা এমন সন্দেহ কর্‌লে কেন? তারা বল্‌লে,—অনেক প্রমাণ আছে, কাল সে সমস্ত বল্‌বে। আমি জানি, তারা যা বল্‌বে, সকলি মিথ্যা! সুতরাং আমি যে নির্দ্দোষী, তা প্রমাণ কর্‌তে বড় অধিকক্ষণ লাগ্‌বে না। আমি এখন আমার ঘরে যাই। তুমি তোমার দাদা এলে আমায় ডেকো"।

এই বলিয়া হরদেব চলিয়া গেলেন।

কমলা চিন্তা-সাগরে মগ্না রহিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

প্রমাণ-সংগ্রহ।

বীরেন্দ্র, গৃহে আসিয়া, নিজ-শয়ন-কক্ষে গিয়া শয়ন করিলেন। শয্যায় শয়ন না করিলে বীরেন্দ্রের চিন্তার সুবিধা হয় না।

বীরেন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন,—"যে সমস্ত প্রমাণ সংগ্রহ করেছি, তাতে যদি ঠিক্ প্রমাণ না হয়, এজন্য দুই একটা মিথ্যা-সাক্ষ্য সংগ্রহ করাতে দোষ কি? যখন দেখা যাচ্চে যে, হরদেব নিশ্চয়ই খুনী, তখন উপযুক্ত প্রমাণাভাবে যে সে নিস্তার পাবে, এত ঠিক্ কথা নয়! অন্ত এক সে যে গাড়ীতে উঠেছিল, এটা প্রমাণের জন্য একটা লোক সংগ্রহ কর্‌তে হবে। আর একটা লোক ঠিক্ কর্‌তে হবে—যে বল্‌বে,—সে হরদেবকে গাড়ী থেকে নেমে রাজার বাগানের ভিতর দিয়ে যেতে দেখেছে। তা হলেই ঠিক্ হবে। সেই ভাল! আজ রাত্রেই কিন্তু দু'জনকে ঠিক্ কর্‌তে হবে!"

অপরাহ্ণ এইরূপ চিন্তা করিয়াই, বীরেন্দ্র ত্রস্তভাবে শয্যা ত্যাগ করিয়া, বাহির হইলেন।

চন্দ্রিকালোকে জগত হাসিতেছে। এ সময় যে না হাসে, তাহার মত পাষাণ-হৃদয় কে?

এহেন সুখের সময়ে, দুঃখের ভারে হৃদয়কে কাতর করিয়া, বীরেন্দ্র দ্রুতপদে চলিতেছিলেন। ভারাক্রান্ত ব্যক্তি দ্রুত চলে কেন? না—তাহার ভার নামাইতে পারিলেই শান্তি। বীরেন্দ্রেরও তাই। তিনি ইচ্ছা করিয়াই গুরুভার স্কন্ধে লইয়াছেন, তাহা নামান সহজ নয়। ক্রমে বীরেন্দ্র নগর-প্রান্তে উপস্থিত হইয়া এক ইষ্টক-নির্ম্মিত একতল গৃহ-সম্মুখে উপনীত হইলেন। রাত্রি তখন প্রায় দ্বি-প্রহর; বীরেন্দ্র গৃহস্বামীকে ডাকিলেন না। একেবারে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

গৃহ-প্রাঙ্গন আবর্জ্জনা-রাশিতে পূর্ণ—বীরেন্দ্র অতি কষ্টে তাহা অতিক্রম করিয়া একটি প্রকোষ্ঠে উপনীত হইলেন। ঐ কক্ষে গৃহসজ্জার কিছুই নাই বলিলেই হয়। কেবল কতকগুলি অতি জীর্ণ আস্তরণ ভূপৃষ্ঠে পাতিত রহিয়াছে, আর তাহারই উপর পঁচিশ-ত্রিশ জন পুরুষ উপবিষ্ট। বীরেন্দ্রকে দেখিয়া তাহাদের একজন বলিল—"ওরে বীরু যে হে! কোথা থেকে বহুকালের পর কি মনে করে?"

বীরেন্দ্র।—"আর ভাই, বড় বিপদে পড়েছি!"

পূর্ব্ব-বক্তা বলিল,—"তাইত বলি, শুধু শুধু কি আর তোমার পদরজ মিলে?"

আর একজন অমনি সুর ধরিল,—

"বিপদে পড়িয়ে আজি লয়েছি তব শরণ।"

বীরেন্দ্র বলিলেন,—"আমার দুঃখের কথা শোনো আগে! ভূপলালের হত্যার কথা অবশ্য শুনেছ। কিন্তু, তোমরা কেউ তার মধ্যে রইলে না, অথচ তৃতীয় ব্যক্তি এসে এই সহরের মধ্যে এমন একটা খুন করে গেল! এ বড় আশ্চর্য্য কথা! যাইহোক, আমি অনেক অনুসন্ধানে জান্‌তে পেরেছি, হরদেব নিজে নিজ-হস্তে তাকে খুন করেছে। কিন্তু, সে যখন গাড়ীতে ওঠে এবং যখন গাড়ী থেকে নামে, তখন তাকে চিন্‌তে পেরেছে—এই কথা বলে, এমন কোন সাক্ষীই নাই। এখন, তোমাদের মধ্যে দুইজন যদি এই সাক্ষ্য দিতে পার, তা'হলে আমি তাঁদের দুইজনকে পঁচিশ টাকা কল্লে পঞ্চাশ টাকা দিতে পারি। তাই বীরচন্দ্র, দয়া করে ভাই, তোমাদের কারো এই কাজটি কর্‌তে হবে।"

বীরচন্দ্র।—ভাই, দয়া করে কে হাড়িকাটে মাথা দিতে চায়, বল! টাকার জন্য বরং এক দিন পারা যায়; কিন্তু পঁচিশ টাকায় কি একটা কাঁচা মাথা মেলে! পাঁচ-শ' করে হাজার হলেও বা এক দিনের কথা।

বীরেন্দ্র।—দেখ ভাই, যদি আমি কৃতকার্য্য হই, তা'হলে আমিই মোটে হাজার টাকা পাব। তার মধ্যে প্রায় পাঁচশ টাকা এরি মধ্যে খরচ হয়ে গিয়াছে; বাকি পাঁচ-শর মধ্যে এক-শ, টাকা তোমাদের দিতে পারি; এর বেশী আর পারি-নে!

বীরচন্দ্র।—দেখ, কেউ রাজী আছ? দুজনে পঞ্চাশ করে এক-শ পাবে, তা হতেই আড্ডার খরচ দিতে হবে। মাণিকচাঁদ কি বল? মাণিকচাঁদ।—মাণিকচাঁদ কোন্ কালে পরাজী! দুলাল ভায়া কি আমার সাথী হবে?

দুলাল।—হা, কিন্তু টাকাটা এখনি চাই?

বীরেন্দ্র।—টাকা ত সঙ্গে করে আনি-নি। তবে আমার সঙ্গে গেলে দিতে পারি।

মাণিকচাঁদ।—আচ্ছা, চল!

বীরেন্দ্র, মাণিকচাঁদ ও দুলালচাঁদকে সঙ্গে করিয়া, সেই বাটী হইতে বাহির হইলেন। তাঁহার প্রমাণ সংগৃহীত হইল।

বাঙ্গালার বিবরণ।

বর্দ্ধমান—রাজা প্রতাপচাঁদ।

পঞ্চম প্রস্তাব।

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বরে মকর্দ্দমা আরম্ভ হয়। আর, সম্ভবতঃ প্রমাণের সুবিধা না বুঝিয়াই—মকর্দ্দমা মুলতবী রাখিয়া, ৪ ঠা তারিখে দ্বারকানাথ ঠাকুরকে, সাক্ষী-সংগ্রহের জন্য, বিচারক বাহাদুর ঐ পত্রখানি লেখেন। পাঠক! গতবারে দেখিয়াছেন যে, কালনার জমিয়ৎবন্ত-অপরাধেই আসামীগণ ধৃত হইয়া হাজতে আছেন; কিন্তু, বিচারের দিন, সন্ন্যাসী-বেশ-ধারী আসামীকে, তাঁহার অপরাধের বিষয় বিচারক বলিলেন,—"তুমি আপনার নাম গোপন করিয়া অসৎ অভিপ্রায়ে মহারাজাধিরাজ প্রতাপচাঁদের নাম ব্যবহার করিয়াছ। সেইজন্য তোমাকে আসামী করা হইয়াছে।"

এই কথায় সকলকেই কিন্তু অবাক্ হইতে হইয়াছিল। * তারপর, জাল রাজার উকীল,

* এইস্থলে, একটা কথা বলিলেই বোধ হয়, এ রহস্যেরও উদ্‌ঘাটন হইতে পারে। কালনার সেই যুদ্ধ-কাণ্ডের পর, অসংখ্য নরনারীর হত্যাপরাধে, ওগিলবি সাহেব ইতিপূর্ব্বে একবার আসামী-শ্রেণীভুক্ত হয়েন। সা-সাহেবকে কয়েদ রাখার ইহাও এক অন্যতম ফল। এই মকর্দ্দমায়, কলিকাতার মাজিষ্ট্রেট ওহনলন সাহেব, জামিনে খালাস দিয়া, তাঁহাকে দায়রা-সোপর্দ্দ করেন; এবং 'সুপ্রিম কোর্টে' জজ গ্রাণ্ট সাহেবের এজলাসে ১৭ আগষ্ট (১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার বিচার আরম্ভ হয়। গবর্ণমেণ্ট, অবশ্য এ মকর্দ্দমার বাদ

মাজিষ্ট্রেট সামুয়েল্ সাহবকে, "এই মকর্দ্দমার ফরিয়াদী অর্থাৎ বাদী কে" জিজ্ঞাসা করায়, উত্তর পাইলেন,—"গভর্ণমেণ্ট ফরিয়াদী।" ইহাতে যে সকলকে আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইতে ইহয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য। সকলেই ভাবিতে লাগিলেন,—"কালনার জমিয়ৎবস্ত তবে কোন কাজের কথা নয়? প্রতাপের নাম-ব্যবহারে যাহাদের ক্ষতি, তাহারা ফরিয়াদী হইল না, অথচ গবর্ণমেণ্টের এত মাথা-ব্যথা কেন?"

যাইহোক, মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এজলাসে, আসামীদিগের বিরুদ্ধে এই তিন বিষয়ের সাক্ষী লওয়া হইল;—(১) জাল রাজার সনাক্ত, (২) প্রতাপচাঁদের মৃত্যু, (৩) জালরাজা গোয়াড়ীর

ছিলেন। সুতরাং মকর্দ্দমার তদ্বিরাদিও গবর্ণমেণ্ট-কর্ম্মচারীগণই করিয়াছিলেন। অধিক কি, প্রথমে এই সকল কথা লইয়া যখন সম্বাদপত্রে আলোচনা হইয়াছিল, পুলিশ-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাহাদুর, স্বয়ং ওগিলবির উপরই উহার তদারকের ভার দিয়াছিলেন! অর্থাৎ যেই আসামী সেই ফরিয়াদির তদ্বিরকারক—আর কি? যাহা হউক, অবশেষে যখন লা-সাহেব ও তাঁহার অপরাপর কৌসলী বন্ধুগণ যোগাড়-যন্ত্র করিয়া, কালনার পুলিসের রিপোর্টের নকলটা সংগ্রহ করিয়া লইয়া, গবর্ণমেণ্টে পেশ করেন; তখনই সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব দেখেন,—বড়ই বেগতিক; সুতরাং তিনি স্বয়ংই তখন বর্দ্ধমানে গিয়া গবর্ণমেণ্টে কি জানি-কি-একটা রিপোর্ট পাঠাইয়া দেন। কিন্তু, আশ্চর্য্যের কথা, এই সময়ই ওগিলবি সাহেব ছুটী পাইয়া বাড়ী যান! যাইহোক, অবশেষে, কৌসলীগণের বিশেষ চেষ্টায়, তাঁহার বিচার আরম্ভও হইয়াছিল। কিন্তু এ বিচারে ওগিলবি সাহেব নিষ্কৃতি পান। জুরিরা বলেন,—"ওগিলবি সাহেব নির্দ্দোষী।" কাজেই জজ সাহেবকেও রায় দিতে হয়,—"You now stand quite free from all charges and imputations" &c. অর্থাৎ "তুমি এখন সমস্ত অপবাদ হইতে মুক্ত।" ফলতঃ এইখান হইতেই যেন প্রমাণ হইয়া গেল,—কালনার জমিয়ৎবস্ত কিছুই নহে; সেখানে যেন খুন-জখম বা গোলমাল কিছুই হয় নাই। আর, সেই কারণেই বোধ হয়, সামুয়েল সাহেবও এ মকর্দ্দমার প্রথমতঃ সে সব চার্জ্জের উল্লেখ করিতে বা প্রমাণ লইতে পারিলেন না; চার্জ্জটা একরূপ 'যবেস্কেই' রাখিয়া দিলেন।

কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারী† কি না? সাক্ষ্য-গ্রহণের সময় এই তিন বিষয়েরই সাক্ষ্য লওয়া হইয়াছিল বটে; কিন্তু, অবশেষে, কি জানি কি মনে করিয়া, কালনায় জমিয়ৎবস্ত করার চার্জ্জটাও তাহাতে যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ফলতঃ সেটা যেন তিনি বিশ্বাস করিয়াও বিশ্বাস করেন নাই: অথবা কি তাঁহার মনোভাব, তাহা তিনিই জানেন। যাইহোক, এত আড়ম্বরের পর, তিন শত আন্দাজ আসামীর মধ্যে—অপর সকলকে ছাড়িয়া দিয়া, নিম্নলিখিত ৭ জন মাত্র আসামীকে দায়রা-সোপর্দ্দ করা হয়। যথা,—(১) জালরাজা, (২) রাধাকৃষ্ণ ঘোষাল (তাঁহার বর্দ্ধমানে প্রেরিত মেংক্তার-দের একজন), (৩) হাফেজ ফতে উল্লা, (৪) সাগরচন্দ্র ধর, (৫) কালীপ্রসাদ সিংহ, (৬) জুমন খাঁ, (৭) রাজা নরহরিচন্দ্র।

হুগলীতে জজ কার্টিসের এজলাসে, ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ২০ এ নবেম্বর, এই দায়রার দিন ধার্য্য ছিল। কিন্তু ১৯ এ নবেম্বরই দায়রার কার্য্য আরম্ভ হইল।

তখন, প্রতাপচাঁদের উপর নিম্নলিখিত তিনটি চার্জ্জ অর্থাৎ অপবাদ দেওয়া হয়।

(১) "আলোক সা ওরফে কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারী, মৃত মহারাজাধিরাজ প্রতাপচাঁদ বাহাদুরের নাম ব্যবহার করিয়াছে।

† আলোক সা নামক এক ব্যক্তি মানভূম-প্রদেশে বিদ্রোহী হইয়াছিল; জাল প্রতাপচাঁদকে সেই আলোক সা ভ্রমে ইতিপূর্ব্বে যে কষ্ট দেওয়া হইয়াছিল পাঠক তাহা জানিয়াছেন। এক্ষণে কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারীই বা কে, তাহাও একটু শুনুন। সে গোয়াড়ীর এক পূজারী ব্রাহ্মণের পুত্র; ভারি ধড়িবাজ। সে কোন বড় বড় চাকরীর উমেদারী করিয়া বেড়াইত; সাহেব সুবোর সঙ্গে মিশিত। মাঝে সে এক দারোগাগিরি কাজও যোগাড় করিয়াছিল; কিন্তু তাহার খুড়া ডাকাই এই অপবাদে পরদিনই তাহার চাকরী যায়। সেই দিন হইতেই সে নিরুদ্দেশ হয়। এই মকর্দ্দমার ৪।৫ বৎসর পূর্ব্ব হইতেই সে নিরুদ্দেশ হইয়াছিল। এ মকর্দ্দমায় প্রমাণের চেষ্টা হয় যে, এই আসামীই সেই কৃষ্ণলাল।

(২) সেই নাম ব্যবহার করিয়া ডেজারির দেওয়ান রাধাকৃষ্ণ বসাককে ঠকাইয়া তাঁহার নিকট টাকা লইয়াছে।

(৩) বে-আইনীরূপে কালনায় বিস্তর লোক জমিয়ৎবস্ত করা হইয়াছে।"

"আসামী নিরপরাধ বলিয়া জবাব দিল। সে দিবস আর কোন কার্য্য হইল না। এই স্থানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, জালরাজা একখানি লিখিত জবাব দিয়াছিলেন। দুই দিন পরে (২১এ নবেম্বর) সে সম্বন্ধে কথা উঠিল। জজ সাহেব বলিলেন,—'আমার বোধ হয়, জালরাজার একটা আপত্তি সঙ্গত। এই মকর্দ্দমা দেওয়ানির বিচার্য্য, ফৌজদারির নহে। অন্ততঃ জুরি কিম্বা আর একজন জজের সঙ্গে বসিয়া বিচার করা কর্ত্তব্য। কিন্তু আমি কি করিব? আমার আপত্তি আমি গবর্ণমেণ্টে জানাইয়াছিলাম, গবর্ণমেণ্ট তাহা শুনেন নাই। সুতরাং আমার উপর যেরূপ হুকুম, আমি তাহাই করিতে বাধ্য।'

"আর এক কথা। ডাক্তার হ্যালিডে বর্দ্ধমানে রাজবাটীর চিকিৎসক ছিলেন। তিনি অনেকবার প্রতাপচাঁদের চিকিৎসা করিয়াছিলেন। একবার তাঁহার উরুস্তম্ভ অস্ত্র করিয়াছিলেন। সুতরাং ডাক্তার হ্যালিডে আসামীর একজন প্রধান সাক্ষী। বিশেষতঃ বোর্ডের মেম্বার ট্রাওয়ার সাহেব মেজেষ্টারিতে জবানবন্দী দিয়াছেন যে, সেই ডাক্তার হ্যালিডে তাঁহার নিকট বলিয়াছিলেন,—'আসামী সত্যই প্রতাপচাঁদ।' অতএব তাঁহাকে হাজির করিবার নিমিত্ত আসামী সপিনা জারি করাইলেন। ডাক্তার সাহেব তখন কাশীতে থাকেন, তাঁহার আসিতে বিস্তর ব্যয় এবং বেতন-ক্ষতি; সুতরাং তিনি লিখিলেন যে, আমার খরচ অগ্রিম পাঠাইলে আমি যাইতে প্রস্তুত আছি। জালরাজার তখন এক পয়সার সঙ্গতি নাই, কেহ আর তাঁহাকে কর্জ্জ দেয় না। তিনি টাকা পাঠাইতে না পারিয়া জজ সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিলেন যে,—'ফৌজদারী আদালতের সাক্ষী অন্য মকর্দ্দমায় যেমন বিনা খরচে হাজির করা হইয়া থাকে, যেমন গবর্ণমেণ্টের পক্ষীয় সাক্ষীদের এ মকর্দ্দমায় হাজির করা হইতেছে, আমার পক্ষের এই সাক্ষীকে সেইরূপে হাজির করা হউক। ডাক্তার হ্যালিডে গবর্ণমেণ্টের চাকর, গবর্ণমেণ্ট হুকুম দিলেই তিনি আসিতে বাধ্য হইবেন।' জজ সাহেব সে দরখাস্ত গবর্ণমেণ্ট পাঠাইলেন; কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাহাতে মনোযোগী হইলেন না। নিজামতে দরখাস্ত করা হইল; সেখানকার জজেরাও তাহা শুনিলেন না। জালরাজা তখন নিরুপায় হইয়া প্রার্থনা করিলেন যে,—'আমার নৌকায় যে সকল দ্রব্যাদি ছিল, তাহা রাজকর্ম্মচারীরা কোম্পানিতে অবশ্য দাখিল করিয়া থাকিবেন। সেই সকল দ্রব্যাদির কিয়দংশ নীলাম করিয়া হ্যালিডে সাহেবকে পথখরচ পাঠান হউক।' এ প্রার্থনাতেও কেহ উত্তর দিলেন না। শেষে কমিসন দ্বারা ডাক্তার সাহেবের জবানবন্দী লইবার প্রার্থনা করা হইল; কিন্তু জজ সাহেব বলিলেন,—'কমিসন বাঙ্গালী সাক্ষীর নিমিত্ত, ইংরেজের নিমিত্ত নহে।'

"কোম্পানির পক্ষে সাক্ষীদের উপস্থিত করিবার জন্য সপিনায় লেখা থাকিত,—'যদি ধার্য্য দিনে কোন সাক্ষী উপস্থিত না হয়, তাহার এত টাকা দণ্ড হইবে।' কিন্তু জালরাজার সাক্ষীদিগকে হাজির করিবার জন্য ওরূপ দণ্ডের কোন কথা থাকিত না; কেহ অনুপস্থিত হইলে তাহাকে হাজির করিবার নিমিত্ত কোন উপায়ও করা হইত না। যাঁহারা আপনা হইতে উপস্থিত হইতেন, বরং জজ সাহেব তাঁহাদিগকে কটূক্তি করিতেন। বিষ্ণুপুরের রাজা সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত আপনি আসিয়াছিলেন। তাঁহাকে 'গাধা' বলিয়া গালি দেওয়া হইয়

ছিল। তেলিনীপাড়ার রাধামোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম সাক্ষীর তালিকায় ছিল। তিনি নিত্য হুগলিতে গাড়ি করিয়া বেড়াইতেন, কিন্তু সাক্ষ্য দিতেন না। জালরাজার উকিল তাঁহাকে অনুরোধ করায় তিনি বলিলেন,—'যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে সাক্ষ্য দিতে আমার সাহস হয় না। আমি এই জেলায় বাস করি, আমার জমীদারী—বিষয়-আশয় সমুদায় এই জেলায়, শেষে কি বিপদে পড়িব?' এইরূপ অনেকে ভয় পাইয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই উপস্থিত হইলেন না।"

২০এ নবেম্বর সাক্ষীর জবানবন্দী আরম্ভ হয়। এক্ষণে অগ্রে উভয় পক্ষীয় সাক্ষীর তালিকা প্রদান করিয়া, এ সম্বন্ধে যাহা বক্তব্য বলা যাইতেছে।

গবর্ণমেণ্টের পক্ষীয় সাক্ষী।

(১) ট্রাওয়ার সাহেব (বর্দ্ধমানের কলেক্টর)
(২) প্রিন্সেপ, „ (গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী)
(৩) প্যাটল „ (বোর্ডের মেম্বর)
(৪) হাচিনসন „ (সদর দেওয়ানীর জজ)
(৫) বিচর্ „ (হাউসওয়ালা)
(৬) ওভারবেক, „ (চুঁচুড়ার গবর্ণর)
(৭) দ্বারকানাথ ঠাকুর (স্বনামখ্যাত)
(৮) রাজা বৈদ্যনাথ (ঐ)
(৯) হারক্রুট্স্ সাহেব (হুগলীর সদর আমীন)
(১০) রাধাকৃষ্ণ বসাক (ট্রেজারির দেওয়ান)
(১১) রাধামোহন সরকার (পরাণবাবুর লোক)*
(১২) বসন্তলাল বাবু (পরাণ বাবুর কুটুম্ব)
(১৩) মোহনলাল বাবু (পরাণ বাবুর কর্ম্মচারী)
(১৪) ভৈরবনাথ বাবু (পরাণ বাবুর ভগ্নীপতি)
(১৫) নন্দলাল বাবু ইত্যাদি (পরাণ বাবুর কুটুম্ব)

প্রতাপের পক্ষীয় সাক্ষী।

(১) ডাক্তার স্কট (সৈনিক কর্ম্মচারী) †
(২) রিড্লি সাহেব। (৩) বিবি হোয়াইট ট্রাটিং
(৪) বিবি সফিয়া ক্রেন। (৫) জন মার্শল (মেজর)
(৬) ফ্রানসুয়া সুলিমান (ফরাসী ভদ্রলোক)
(৭) হাজি আবু তালেব (চুঁচুড়ার মোগল)
(৮) জুলিয়ান নাইটার্ড (ফরাসী ডাক্তার)
(৯) ফ্রেডরিক থিয়ার্শ (ফরাসডাঙ্গার মাজিষ্ট্রেট)
(১০) গোপালচন্দ্র ঘোষ (প্রতাপচন্দ্রের শিক্ষক)
(১১) গোপীমোহন পরামাণিক (বর্দ্ধমানের ময়রা)
(১১) রামধন বাগ্দী (ঘাট-মাজি)
(১৩) আমীর উদ্দিন আমেদ (একজন ছাত্র)
(১৪) আগা আব্বাস (প্রতাপচন্দ্রের বাল্যসহচর)
(১৫) ডেভিড্ হেয়ার্ (প্রসিদ্ধ নিঃস্বার্থ)
(১৬) রাজা ক্ষেত্রমোহন সিংহ (বিষ্ণুপুরের রাজা)
(১৭) রাজা জয়সিংহ (ঐ রাজ-বংশজ)
(১৮) হাকিম আলি উল্লা (প্রতাপের চিকিৎসক)
(১৯) কুঞ্জবিহারী ঘোষ (রাজবাটীর মুহুরী) *
(২০) পিটর এমার্। (২১) ফ্রেজার সাহেব ইত্যাদি।

এই তো সাক্ষীর তালিকা দেওয়া গেল। গবর্ণমেণ্টই এ মোকদ্দমায় বাদী। পাঠক দেখুন, গবর্ণমেণ্টের তরফের সাক্ষীরা অধিকাংশই গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারী, বা পরাণ বাবুর লোক; অবশিষ্ট দুই তিন জন মাত্র বাহিরের লোক। অথচ, আশ্চর্য্যের বিষয়, ইহাঁদের অনেকের সাক্ষ্যেও প্রতাপচাঁদের স্বপক্ষের অনেক কথা বাহির হইয়াছিল!

পাঠক! তবে এখন একবার গবর্ণমেণ্টের সাক্ষিগণের এজাহারে কি কি কথা বাহির হইয়াছিল, তাহাও বুঝিয়া দেখুন!

প্রথম সাক্ষী।—"অপর ঘরে যে ছবি † আছে, তাহা দেখিবামাত্র প্রতাপকে মনে পড়ে। কিন্তু এই আসামীকে দেখিলে প্রতাপকে মনে পড়ে না। * * ডাক্তার হালিডে প্রতাপের চিকিৎসা করিতেন। * * সেই হালিডে আমায় বলিয়াছিলেন যে, 'এই আসামী সত্যই প্রতাপচাঁদ।'" দায়রায় বলিলেন,—"আসামী কোন ক্রমেই রাজা প্রতাপচাঁদ নহে।"

দ্বিতীয় সাক্ষী।—"অপর ঘরে যে ছবি দেখিয়াছি, তাহা প্রতাপের। সে ছবির সঙ্গে এই ব্যক্তির কোন সাদৃশ্য নাই।" * * এই সাক্ষী দায়রায় বলেন,—"জেনেরল এলার্ড কাবুল হইতে ফিরিয়া আসিলে পর আমায় একদিন বলিয়াছিলেন, লাহোরের নিকট আসামীর সঙ্গে অনেক দিন হইল, তাঁহার একবার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। আসামী তখন 'ফকিরের' বেশে বেড়াইতেন।"

চতুর্থ সাক্ষী।—"এই আসামীর সঙ্গে প্রতাপের ছবির সাদৃশ্য নাই! তবে বুক হইতে উপরদিকে কতক মেলে।" এই সাক্ষীর দায়রায় জবানবন্দী নাই। কারণ, তখন তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

পঞ্চম সাক্ষী।—"এই ছবির সঙ্গে আসামীর সাদৃশ্য বিলক্ষণ আছে। মাপিয়া দেখিলাম, ছবির প্রতাপ আর আসামী প্রতাপ একই রূপ লম্বা।" দায়রায় এই সাক্ষীকে আর তলব করা হয় নাই।

ষষ্ঠ সাক্ষী।—"আমি এক্ষণে চুঁচুড়ায় থাকি। দিনামারের আমলে আমি চুঁচুড়ার গবর্ণর ছিলাম। আমি এই আসামীকে চিনি না।" তাহার পর অপর ঘরে প্রতাপের ছবি দেখিয়া আসিয়া বলিলেন,—"এখন আমি আসামীকে চিনিলাম, ইনি আমার পূর্ব্বপরিচিত ছোট রাজা। ছবির আকৃতি আর আসামীর আকৃতি স্পষ্ট একই রূপ।" দায়রায় এই সাক্ষী বলিলেন যে, "পূর্ব্বে জেলখানায় ও মেজেষ্টারিতে আমি এই আসামীকে দেখিয়াছি। আমি তখন ইহাকে জুয়াচোর মনে করিয়াছিলাম। আমি প্রতাপকে বিশেষ জানিতাম। তাঁহার মৃত্যুর কিছু পরে আমি শুনিয়াছিলাম যে, তিনি পলাইয়াছেন। তাঁহার দক্ষিণ চক্ষের বামভাগে মেহ্গনি রঙ্গের একটি ক্ষুদ্র দাগ ছিল; তিনি ঊর্দ্ধে চাহিলে সেটি দেখা যাইত। এই আসামীর ঠিক সেইখানে সেই দাগ আছে, তবে একটু যেন বর্ণের ঘোর কমিয়াছে। এরূপ দাগ আর কাহারও চক্ষে কখন দেখি নাই। শুনিয়াছি, একবার গবর্ণর জেনারেলের এক জন এজেণ্ট গবর্ণমেণ্টে লিখিয়াছেন যে, রাজা প্রতাপচাঁদ সেই রেসিডেন্সিতে বাস করিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট সে বিষয় রাজা তেজচাঁদকে লেখায় তিনি উত্তর করিলেন, 'আমি প্রতাপকে মরিতে দেখি নাই।' এই চিঠির কথা প্রকৃত কি না, তাহা গবর্ণমেণ্টের কাগজ খুঁজিলেই পাওয়া যাইবে।"

সপ্তম সাক্ষী।—"প্রতাপচাঁদের সঙ্গে আমার বড় বন্ধুতা ছিল। তিনি ওয়াটার্লুর যুদ্ধের পর, একবার কলিকাতায় রোসনাই দেখিতে আসিয়া আমার বাটীর নিকট কান্ত বাবুর বাটীতে ছিলেন। সেই সময় আমার সঙ্গে তাঁহার প্রথম আলাপ হয়। তিনি গবর্ণমেণ্ট হাউসে রোসনাই দেখিতে যান, আমি তাঁহার সঙ্গে যাই। প্রতাপ কখন কলিকাতার তাতি কি নেটিভের বাড়ী যান নাই। তিনি কেবল আপনার সমযোগ্য লোকের বাড়ী যাইতেন—রাজা গোপীমোহন আর আমার বন্ধু রামমোহন রায়ের বাটীতে যাইতেন। আমি এই আসামীকে চিনি না। এ ব্যক্তি নিশ্চয় প্রতাপ নহে। ওগিলবির মকর্দ্দমায় যখন এই আসামী সুপ্রিম কোর্টে সাক্ষী দিয়াছিল, তখন আমি ইহাকে দেখিয়াছিলাম। ঐ সময় আমাকে এই ব্যক্তি চিনিয়াছিল; কিন্তু এ ব্যক্তি আমাকে চিনিলে কি হইবে, আমি ত উহাকে চিনি নাই! ওয়াটার্লুর লড়াইয়ের সময় হইতে আমার চেহারার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া থাকিবে। তাহার পূর্ব্বে যে আমায় দেখিয়াছে, সেই আমায় চিনিতে পারে। মেজেষ্টার সাহেব আমায় যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার নকল কে চুরি করিয়া আনিয়াছে, আমি সে চোর ধরিতে বিশেষ চেষ্টা করিতেছি।" (চিঠি সম্বন্ধে কথাগুলি সাক্ষী, বিনা সওয়ালে বলিলেন।) দায়রায় আসিয়া বলিলেন,—"প্রতাপের যে ছবি এই আদালতে দেখিলাম, তাহার সঙ্গে এই আসামীর বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে। আমি ঠিক বলিতে পারি না যে, এ আসামী প্রতাপচাঁদ কি না। তবে আমার বোধ হয়, ইনি প্রতাপচাঁদ নহেন।"

নবম সাক্ষী।—"আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি না।" দায়রায় বলিলেন,—"এই আসামীকে মৃত প্রতাপচাঁদ অপেক্ষা এক ইঞ্চ লম্বা দেখায়।"

দশম সাক্ষী।—"আমি এই আসামীকে অনেক টাকা কর্জ্জ দিয়াছি। কত, তাহা হিসাব-নিকাশ না করিলে বলিতে পারি না। ষোল হাজার হইবে। ইহাঁকে সত্যই প্রতাপচাঁদ মনে করিয়া আমি টাকা দিয়াছি! ইহাঁকে আমি নিজে চিনিতাম না; কেবল লোকের কথায় বিশ্বাস করিয়া টাকা দিয়াছি। রাজা গোপীমোহন দেব বলিয়াছেন,—'ইনি নিশ্চয় প্রতাপচাঁদ।' গোপীমোহন এখন মরিয়াছেন। গোপীমোহন তাঁহার লোকের দ্বারা অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছিলেন যে, এ ব্যক্তি সত্যই প্রতাপচাঁদ। ডাক্তার হালিডে আমার নিকট বলিয়াছেন,—'এ ব্যক্তি নিশ্চয়ই প্রতাপচাঁদ।' তদ্ভিন্ন জেনারেল এলার্ডও ঐরূপ বলিয়াছেন। তাঁহার কথায় আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। তাঁহার সঙ্গে লাহোরে এই আসামীর সাক্ষাৎ হইয়াছিল। আমি একা ইহাঁকে টাকা কর্জ্জ দিই নাই; আরও অনেকে দিয়াছেন; দুই একজন ইংরেজও দিয়াছেন।" দায়রায় উপস্থিত হইয়া এই সাক্ষী বলিলেন,—"পূর্ব্বে রাজা বৈদ্যনাথের সঙ্গে এই আসামীকে হুগলির জেলে একবার দেখিতে আসিয়াছিলাম। আমি ছয় মাস ইহাকে কলিকাতায় আমার আপনার বাটীতে রাখিয়াছিলাম। সেখানে

* ইহার সঙ্গে একদল লাঠিয়াল পরাণ বাবু কালনায় পাঠান।

† Of 37th Madras Native Infantry.

* ইনি প্রতাপচাঁদকে প্রথমেই চিনিতে পারায়, পরাণ বাবু ইহাঁকে কর্ম্মচ্যুত করেন।

† পূর্ব্ব-সংখ্যায় বলা হইয়াছে যে, "চিন্নারী নামক একজন চিত্রকর দ্বারায় প্রতাপচাঁদ নিজের একখানি আপাদ-মস্তক-প্রামাণিক চিত্রপট প্রস্তুত করাইয়া লইয়াছিলেন। এই-ই সেই ছবি। আসামীর সহিত এই চিত্রের কতদূর সাদৃশ্য, তাহাই মিলাইবার জন্য ইহা আদালতে আনীত হইয়াছিল।

ডাক্তার হ্যালিডে একদিন আসিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন,—'ইনি যে নিশ্চয়ই প্রতাপচাঁদ, তাহার আর কোন সন্দেহ নাই।"

এতদ্ভিন্ন, প্রতাপচাঁদ সত্যই মরিয়াছেন, কি এখনও জীবিত আছেন, তাহার অবধারণার্থে রাধামোহন সরকার, বসন্তলাল বাবু, নন্দ বাবু, ভৈরব বাবু প্রভৃতি যে ১৫ পনের জন সাক্ষ্য দিলেন; তাঁহারা সকলেই রাজবাটীর অন্নদাস, পরাণ বাবুর আত্মীয়-কুটুম্ব। তাঁহাদের সাক্ষ্যের মর্ম্ম এই,—

১২২৭ সালের ২৭এ পৌষে দেড় প্রহর রাত্রির সময় কাল্‌নার ঘাটে প্রতাপচাঁদকে লইয়া যাওয়া হয়। মোহন বাবু তাঁহার পা জলে ডুবাইয়া ধরে, ঘামিরাম তাঁহার মুখাগ্নি করে। চন্দন ও বাবলা কাষ্ঠে তাঁহাকে দগ্ধ করা হয়।

এই সাক্ষীরা প্রতাপচাঁদের বৃত্তান্ত যেমন আদ্যোপান্ত বলিল, রাজা তেজচাঁদের বিবরণ তেমন বলিতে পারিল না। প্রতাপের মরণ বা অন্তর্ধানের ১২ বৎসর পরে তেজচন্দ্র বাহাদুর কলেবর ত্যাগ করেন, অথচ তাহা কোন সাক্ষীই বলিতে পারিল না।

এক্ষণে প্রতাপচন্দ্রের মানিত সাক্ষীদের এজাহার দেখুন, তাঁহারাই বা কিবলেন? *

প্রথম সাক্ষী।—"আমি ১৮১৫সাল হইতে ১৮১৭ পর্য্যন্ত বর্দ্ধমানে ছিলাম। আমি রাজা প্রতাপচাঁদকে ভাল চিনিতাম। তাঁহার সঙ্গে আমার বিশেষ বন্ধুতা ছিল। এই আসামী সেই প্রতাপচাঁদ। জেলখানায় গিয়া আমি ইহাঁর সর্ব্বাঙ্গের চিহ্ন বিলক্ষণ করিয়া দেখিয়াছি, সকল চিহ্নই মিলিয়াছে। ১৮১৭ সালে ইহাঁর গালের ভিতর একখানি ঘা হইয়া শোষ হয়, আমি তাহা ভাল করি। সে ঘার দাগ অদ্যাবধি রহিয়াছে। অন্য লোকে মুখে ঘার দাগ করিতে পারে সত্য, কিন্তু ঠিক সেই স্থানে সেইরূপ দাগ করিতে কেহই পারে না। প্রতাপচাঁদ শীতকালেও ঘামিতেন, আসামীও সেইরূপ ঘামেন। আর প্রতাপের মত ইহাঁর হাসি, কথা কহিবার পূর্ব্বে প্রতাপের মত কণ্ঠ পরিষ্কার করা ইহাঁর অভ্যাস। প্রতাপের মত ইহাঁর বসিবার ভঙ্গী। প্রতাপ আমার সঙ্গে ইংরেজিতে কথা কহিতেন, কিন্তু আসামী তেমন কহিতে পারিলেন না দেখিয়া আমি হেতু জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, 'আর অভ্যাস নাই।' তাহা হইতে পারে। আমি পূর্ব্বে বিলক্ষণ হিন্দী বলিতে পারিতাম, কিন্তু দুই বৎসর বিলাতে থাকিয়া আমি তাহা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। কেবল শুনিয়া কোন ভাষা শিখিলে এইরূপই হয়। পূর্ব্বের কথা আসামীকে দুই একটী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। কিন্তু তখনকার জজ মার্টিন সাহেবের নাম ব্যতীত আসামী আর কোন সাহেবের নাম ধরিতে পারিলেন না। আমি আপনার কথা জিজ্ঞাসা করিলাম যে, আমি কি করিয়া বেড়াইতাম? আসামী বলিলেন, 'একটি পিস্তল লইয়া পথে পথে কুকুর মারিয়া বেড়াইতে।' আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, এই সময় দেওয়ানী জেলে কি একটা গোলমাল হইয়াছিল? আসামী উত্তর করিলেন, 'বুলার সাহেব রঘুবাবুকে জেলে পাঠাইয়াছিলেন। রঘু বাবু তথায় বিষ খাইয়া মরিয়াছিলেন। তুমি তাহার দেহ চিরিয়া বিষের কথা বলিয়াছিলে' এ সকল কথাই সত্য। প্রতাপ, মেদেরা মদ খাইতেন। আমি সে কথা জিজ্ঞাসা করায় আসামী বলিলেন, 'আমি আর মদ খাইনা, তবে ব্রাণ্ডি এখনও ভালবাসি।' আমি যখন বর্দ্ধমানে ছিলাম, তখন সেখানে ট্রাওয়ার (Trower) সাহেব থাকিতেন। আমি তাঁহার পুত্রদের চিকিৎসা করিতাম। সেদিন আমি আপিসে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি আমাকে চিনিতে পারিলেন না। তাঁহার স্মরণশক্তি অতি সামান্য।"

তৃতীয় সাক্ষী।—"আমি প্রতাপচাঁদকে বিশেষরূপে চিনিতাম। আসামী নিশ্চয়ই সেই প্রতাপচাঁদ।"

চতুর্থ সাক্ষী।—"আমি প্রতাপচাঁদকে ভালরূপে জানিতাম। এই আসামী নিশ্চয়ই প্রতাপচাঁদ।"

দশম সাক্ষী।—"আমি কিছু দিনের নিমিত্ত ছোট রাজাকে ইংরেজি পড়াইয়াছিলাম। তাঁহাকে অনেকবার দেখিয়াছি; তাঁহাকে আমি চিনি। এই আসামী সেই ছোট মহারাজ। ছোট রাজা মরিয়াছেন, এ কথা আমি শুনিয়াছিলাম। আবার তাহার একমাস পরে শুনিয়াছিলাম যে, তিনি পলাইয়াছেন।"

চতুর্দ্দশ সাক্ষী।—(এ ব্যক্তি প্রতাপের ছায়ারূপে সঙ্গে থাকিত) "এই আসামী রাজা প্রতাপচাঁদ। সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।"

পঞ্চদশ সাক্ষী।—"আমি রাজা প্রতাপচাঁদকে চিনিতাম। ১৮১৭ কি ১৮১৮ সালে তিনি যখন কলিকাতায় ছিলেন, তখন ছয় সাত বার আমার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাঁহার সঙ্গে এই আসামীর সাদৃশ্য বিলক্ষণ আছে। পার্শ্বের ঘরে যে ছবি আছে, তাহা আমি দেখিয়াছি। সেই ছবির পার্শ্বে আসামীকে এক বার এদিকে একবার ওদিকে দাঁড় করাইয়া দেখিয়াছি, তাহার সঙ্গে আসামীর নাক, চোক, অবয়ব বিলক্ষণ মিলে। বিশেষতঃ ছবির বামদিকে আসামীকে দাঁড় করাইলে আরো মিলে—আসামীর চিবুক ও নিম্ন-ঠোঁটের নীচে যে গর্ত্তের মত আছে, তাহাও মিলে। আমি যখন আসামীকে প্রথম দেখিলাম, তখন তাঁহাকে প্রতাপ অপেক্ষা লম্বা বোধ হইয়াছিল। তাহার পর আমি তাঁহার নিকটে দাঁড়াইয়া দেখিলাম যে, আমার ভ্রম হইয়াছিল। আসামী ঠিক প্রতাপের মত উচ্চ। অদ্য প্রাতে জেলখানায় আসামীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সেই সময় আসামীর সহিত দুই এক বিষয়ে আমার কথাবার্ত্তা হয়। আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, রামমোহন রায়কে স্মরণ আছে কি? প্রথমে আমি রামমোহন রায়ের সঙ্গে প্রতাপচাঁদের সহিত আলাপ করিতে যাই, তাহা প্রথমে আসামীর স্মরণ হইল না, তাহার পর স্মরণ হইল। তখন তিনি আমাকে বলিলেন, 'তুমি সেই দিন একটা বন্দুকের মত বাক্স করিয়া একটা দূরবীণ লইয়া গিয়াছিলে, আর একটা খাঁচায় দুইটা পাখী লইয়া গিয়াছিলে। আমরা একত্রে ছাদে গিয়া কথা কহি।' এ সকল কথা প্রকৃত। দূরবীণ প্রায় ৪০ ইঞ্চ লম্বা ছিল, তাহাও আসামীর স্মরণ আছে। আমার বিশ্বাস যে, এই আসামী প্রতাপচাঁদ বটে। আমি আর একটিবার পানিহাটী গ্রামে একটা নাচের নিমন্ত্রণে গিয়াছিলাম; সেখানে আসামীকে দেখিয়াছিলাম। তখন ইহাঁর মুখের উপরিভাগ দেখিয়াই আমার বোধ হইয়াছিল যে, এ ব্যক্তিকে আমি চিনি। কিন্তু ঐ সময় ইহাঁর দাড়ি ছিল বলিয়া আমি ভাল চিনিতে পারি নাই।* তাহার পর ও বিলবির মকর্দ্দমায় ইহাঁকে আমি সুপ্রিম কোর্টে সাক্ষ্য দিতে দেখি; দেখিয়াই ইহাঁকে প্রতাপচাঁদ বলিয়া আমার বোধ হইয়াছিল। সেইখানেই এই কথা আমি কৌন্সলি লিত সাহেবকে বলি। আমি অনেক দিন জনরবে শুনিয়াছিলাম যে, প্রতাপের মৃত্যু-সম্বন্ধে কিছু সন্দেহ আছে।"

সাক্ষীদের জবানবন্দী প্রায় শেষ হইয়া আসিলে, হঠাৎ একদিন প্রতাপচাঁদের মাতুল আদালতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন! তিনি মেদিনীপুর-জেলার একজন রাজা ছিলেন।

* স্থানাভাবে দুই চারিটি মাত্র সাক্ষীর এজাহার প্রদত্ত হইল। ফলতঃ সকল সাক্ষীই প্রায় অসঙ্কোচে বলিলেন,—"ইনি নিশ্চয়ই সেই প্রতাপচাঁদ।"

জালরাজা তাঁহাকে দেখিবামাত্র আহ্লাদে জজ সাহেবকে বলিলেন,—"ঐ আমার মাতুল আসিয়াছেন; উহাঁর জবানবন্দী লওয়া হউক।' কিন্তু, প্রতাপচাঁদের সনাক্ত-সম্বন্ধে বিস্তর সাক্ষী লওয়া হইয়াছে এবং আর অধিক সাক্ষী অনাবশ্যক বোধে, জালরাজার পক্ষীয় উকীল সাহেব সে সাক্ষী আর লইলেন না। বলিলেন,—"দেওয়ানীতে এই সব লইব।" এইখানেই তাঁহার ভ্রম হইল। কারণ, তিনি পূর্ব্বেই জানিয়াছিলেন যে, কতকগুলি রাজকর্ম্মচারী পরামর্শ করিয়াছিলেন—জালরাজাকে কোন মকর্দ্দমায় ফরিয়াদী হইতে দিবেন না। সুতরাং এ সাক্ষীটা ছাড়িয়া দেওয়া ভাল হয় নাই।

প্রতাপচাঁদ, আপন পিসী তোতাকুমারী ও আপন দুই রাণীকে সাক্ষী মানিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রথমতঃ আদালতে উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্যদান করিতে অসম্মত হন। তজ্জন্য বিচারক প্রস্তাব করেন,—"বর্দ্ধমান-রাজের চুঁচুড়ায় যে রাজভবন আছে, তথায় রাণীরা কমিশনে সাক্ষ্য দিতে পারেন।" কিন্তু ইহাতেও রাণীরা অস্বীকৃত হইয়াছিলেন। এজন্য, রাণীদের ব্যবহারে ও চরিত্রে লোকে সন্দেহ করিতে লাগিল। তাহা অমূলক বোধ হয়। কারণ, তাঁহারা প্রথমেই পুরাতন দাসী পাঠাইয়া তত্ত্ব লইয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন, তাঁহাদের অসম্মতির কারণ, তাঁহারা বলিয়াছিলেন,—"আসামীকে যদি বাস্তবিক ছোট মহারাজ বলিয়া আমরা চিনিতে পারি, তথাপি সে কথা আমরা মুখে আনিতে পারিব না; আসামীকে স্বামী বলিয়া স্বীকার করিলে পোড়া লোকে বলিবে, বৈধব্য ঘুচাইবার নিমিত্ত রাণীরা মিথ্যা বলিয়াছে। হয় তো সেই কারণে জজসাহেবও আমাদের কথা গ্রাহ্য করিবেন না। সুতরাং আমরা স্বামী পাইব না। তবে কেন কলঙ্কের পসরা মাথায় লইব?" যাইহোক, এই ঘটনার কিছুদিন পরে অকস্মাৎ রাণীরা একদিন দর-

° এইস্থলে একটা কথা বলিয়া রাখি। যখন জাল-রাজার দাড়ী ছিল, তখন তাঁহাকে রাজা প্রতাপচাঁদ বলিয়া সহসা বুঝা যাইত না। অধিকন্তু, তাঁহার যে চিত্রপট প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহাতেও দাড়ী ছিল না। সুতরাং এই সুযোগ বুঝিয়াই রাজবাটী হইতে চিত্রপট প্রদত্ত হয়। কিন্তু সুচতুর প্রতাপচাঁদ, চিত্রপটখানি আদালতে আনীত হইবামাত্রই দাড়ী কামাইলেন। তখন তাঁহাকে সকলেই প্রতাপচাঁদ বলিয়া চিনিতে পারিলেন।

খাস্ত দেন,—"আমরা সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত আছি।" এবার প্রতিবাদী, আপত্তি করিলেন। প্রতিবাদী, তাঁহার উকীল সা-সাহেবকে বলিলেন,—"কাহার দ্বারা দরখাস্ত আসিয়াছে এবং সে ব্যক্তি কোথায় বাসা করিয়াছে, এই সকল তদন্ত করা আবশ্যক।" কিন্তু তদন্তে জানা গেল—'পরাণ বাবুর লোকে দরখাস্ত আনিয়াছে; পরাণ বাবুর মোক্তারের বাসায় সে অবস্থিতি করিতেছে।' এই সকল শুনিয়া, রাজা বলিলেন,—"এবার রাণীরা পরাণের অনুরোধে সাক্ষ্য দিতে সম্মত হইয়াছেন। সে অনুরোধের অর্থ, তাঁহারা আমাকে সনাক্ত না করেন। কিন্তু কি জানি, স্ত্রীজাতি! আমায় দেখিয়া যদি তাঁহারা সে অনুরোধ ভুলিয়া যান, তাহা হইলে, তাঁহাদিগকে পথে দাঁড়াইতে হইবে। আমার অদৃষ্টে যাহা ছিল, তাহা হইয়া গিয়াছে! আবার তাঁহাদের কপাল কেন ভাঙি? তাঁহারা সুখে আছেন, সুখে থাকুন। আমি তাঁহাদের সাক্ষ্য চাহি না।"

এক্ষণে, চার্জ তিনটীর ফলাফল আলোচ্য করা যাউক।

প্রতাপচাদকে অন্যায়-পূর্ব্বক আলোক সা প্রমাণ করিবার চেষ্টা ফলবতী হইল না। তৎপরে তাঁহাকে গোয়াড়ি-কৃষ্ণনগরের কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারী সাব্যস্থ করিবার উদ্যোগ করা হয়, তাহাও সফল হয় নাই। কেন-না, কাজি সাহেব রায় দিলেন,—"আসামী কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারী নয়। রামকৃষ্ণ খৃষ্টান সাক্ষীর কথাও অগ্রাহ্য। কারণ, সে বলিয়াছে, সে তিন চারি বৎসর কৃষ্ণলালের চেলা ছিল, অথচ তাহার পায়ের কয়টা অঙ্গুলি, তাহা বলিতে পারে নাই।"

এইরূপ, সাক্ষী রামচন্দ্র বিশ্বাস বলিয়াছিল,—"আসামীকে চিনি। ইহার নাম কৃষ্ণলাল। কৃষ্ণলালের পৃষ্ঠে বিলক্ষণ দাগ ছিল।" কিন্তু, পৃষ্ঠের কোন অংশে দাগ ছিল, জিজ্ঞাসা করায়, সাক্ষী বলিতে পারে নাই। তখন সেরেস্তাদার মনসারাম আপন পৃষ্ঠে হাত দিয়া সাক্ষীকে ইঙ্গিত করিলেন। বিচারক, এইজন্য, সেরেস্তাদারের দশ টাকা জরিমানা করেন।

সে যাহা হউক, সাক্ষীদের জবানবন্দীর পর, উভয় পক্ষীয় উকীলের বক্তব্য লিখিত হইয়া দাখিল হয়। পরে দায়রার কাজী সাহেব ফতওয়া দেন,—"সনাক্ত-সম্বন্ধে সরকারের পক্ষে যে সকল প্রমাণ দাখিল হইয়াছে, তাহা আসামীর প্রমাণ অপেক্ষা গুরুতর নহে। আসামী বাস্তবিক কে, তাহা ফরিয়াদির পক্ষ হইতে প্রমাণ হয় নাই। যতক্ষণ তাহাকে অপর ব্যক্তি বলিয়া প্রতিপন্ন করা না হয়, ততক্ষণ প্রতাপচাঁদের নাম ধারণ অপরাধে তাহাকে দণ্ড দেওয়া যাইতে পারে না।" কিন্তু, মত-ভেদ হওয়ায়, জজসাহেব নিজামতে লিখিলেন,—"প্রতাপচাঁদের নামধারণ অপরাধ সাব্যস্থ হইয়াছে। অতএব তাহার পাঁচ বৎসর অভাবে তিন বৎসর কারাদণ্ডাজ্ঞা দেওয়া হয়।"

কিন্তু, নিজামত আদালত, কাল্‌নার জমিয়ৎবস্ত জন্য প্রতাপচাঁদকে দণ্ড দিতে সাহসী হইলেন না। কেন না, ইতিপূর্ব্বেই হুগলীর জজ ওগিলবি, প্রতাপচাঁদের উকিল সা-সাহেবকে গ্রেপ্তার করায় সুপ্রিমকোর্টে দণ্ডিত হন, ও তদুপলক্ষে প্রধান বিচারক রায়ান্ লেখেন,—কাল্‌নায় শান্তিভঙ্গ হয় নাই। তবে প্রতাপচাঁদের নাম গ্রহণ করার নিমিত্ত তাঁহার দণ্ড হইবে! নিজামতের কাজি ফতওয়া দিলেন,—"মহম্মদীয় ব্যবস্থানুসারে মৃত ব্যক্তির নাম গ্রহণ করায় আসামী অপরাধী।"

তদুত্তরে প্রতাপচাঁদ জানাইলেন,—"মহম্মদীয় কোন গ্রন্থেই উহার বিধি নাই।"

যাইহোক, নিজামতের কাজী সাহেবের কথার উপর নির্ভর করিয়াই, নিজামতের জজেরা হুকুম দিলেন,—

"রাজা প্রতাপচাঁদের নাম ব্যবহার জন্য

আসামীর এক হাজার টাকা জরিমানা করা যায়। অনাদায়ে ৬ ছয় মাস কারাদণ্ড। অন্যান্য চার্জ হইতে আসামী খালাস।"

এই হুকুমের পর প্রতাপচাঁদ দরখাস্ত করিলেন,—"ঐ যে অপরাধটী কহিতেছেন, তৎসম্বন্ধে একটু প্রমাণ গ্রহণ করুন।"

কিন্তু, নিজামত হুকুম দিলেন,—"মকর্দ্দমার নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে; এখন আর এ বিষয়ে ওজর শোনা যাইবে না। দরখাস্তকারী প্রতাপচাঁদ বলিয়া দরখাস্ত করিলে, গ্রাহ্য হইবে না।"

এই হুকুম, তাঁহার পক্ষে বজ্রসদৃশ হইল। তিনি জজকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন,—"পরাণের আত্মীয়-কুটুম্বের কথায় নির্ভর করিয়া কেন আমার মাথা খাও? প্রতাপের মরণের সময় পরাণের কুটুম্ব, পরাণের আত্মীয়, পরাণের চাকর, পরাণের অন্নদাস ব্যতীত কি আর কেহ ছিল না? প্রতাপেরও তো কুটুম্ব, আমলা, চাকর, সকলই ছিল; কিন্তু, কৈ, তাহাদের একজনকেও তো ডাকা হয় নাই!"

কিন্তু, জজ সাহেব এ সকল কথায় কর্ণপাতই করিলেন না।

"জালরাজা কপাল ঠুকিয়া আর এক দরখাস্ত নিজামতে দাখিল করিলেন। দরখাস্তে নাম দিলেন না; নামের পরিবর্ত্তে লিখিলেন,—

"The humble petition of one who hath been sued at the instance of Government by the name of Aluck Shah, alias Rajah Protap Chand, alias Kristolal Brohmocharee."

দরখাস্তখানি অতি দীর্ঘ, রাগে ভরা, এবং ঠাট্টা-বিদ্রূপে পরিপূর্ণ। তাহার কিছু পরিচয় দিবার নিমিত্ত, কোন কোন অংশের মর্ম্ম উদ্ধৃত করা গেল।

১। "দরখাস্তকারীকে কখন আলোক সা বলিয়া, কখন কৃষ্ণলাল ব্রহ্মচারী বলিয়া দণ্ড দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু দেখা যাইতেছে, এখনও স্থির হয় নাই যে আদালত হইতে ভবিষ্যতে তাহার কি নাম কায়েমি রাখা হইবে। সুতরাং যে অবধি তাহা না রাখা হয়, সে অবধি দরখাস্তকারী কোম্পানি-আদালত ভিন্ন অন্য সর্ব্বত্র তাহার পূর্ব্ব-পরিচিত নামে পরিচয় দিবে। বে-আদবির ভয়ে সে নাম এখানে উল্লেখ করিতে পারিল না। কিন্তু, এখনও দরখাস্তকারী জানিতে পারে নাই যে, কেহ সে নাম উল্লেখ করিয়া দরখাস্ত করিলে হুজুর-আদালতের কি ক্ষতি হইবে।

২। "হুজুর আদালত হইতে যে নূতন অপরাধ আবিষ্কার হইয়াছে, তাহা (is a crime unknown to the English Law, as well as to the Codes of Law of civilized Europe, and was, till the gloss put upon it by your Court and its Mohammedan officer, unknown to Mohammedan Law, as it is still unknown to Regulation Law wide and sweeping as it is) কি বিলাতে, কি এদেশে কেহ জানিত না। অন্যের নাম ব্যবহার করাকে গুরুতর অপরাধ করিয়া তোলা হইয়াছে। কেন-না, মিথ্যা কথা ব্যবহার করা গুরুতর অপরাধ। কিন্তু হলপ করিয়া মিথ্যা কথা বলা ভিন্ন অন্য মিথ্যা কথার দণ্ড এ পর্য্যন্ত কখন হয় নাই।

৩। "এখন দরখাস্তকারী বুঝিয়াছে যে, প্রতাপচাঁদ নাম উল্লেখ করিয়া বর্দ্ধমান কি অন্য কোন মফঃস্বল আদালতে নালিস করিলে আবার তাহাকে এই মিথ্যা কথার অপরাধে ফেলিয়া দণ্ড দেওয়া হইবে। সুতরাং তাহার পক্ষে দেওয়ানীর দ্বার রুদ্ধ করা হইয়াছে।

৪। "এখন তাহার মানস যে, একবার ইংলণ্ডেশ্বরীর নিকট এ বিষয়ের আপীল করে, অতএব হুজুর আদালতের অনুমতি প্রার্থনা।"

যে কারণেই হউক, বিলাতে আর আপীল হয় নাই। এখানেও দেওয়ানী আদালতে আর কোন নালিস করা হয় নাই। তাহা করিবার পক্ষে যে ব্যাঘাত নিজামতের জজেরা দিয়াছিলেন,

তাহা ব্যতীত আরও এক ব্যাঘাত ঘটিয়াছিল। যাঁহারা জাল রাজাকে মকর্দ্দমা চালাইতে টাকা কর্জ্জ দিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলেরই ভ্রম হইয়াছিল যে,—"গবর্ণমেণ্ট, যে কোন কৌশলেই হউক, এ ব্যক্তিকে বর্দ্ধমানের সম্পত্তি অধিকার করিতে দিবেন না।" সুতরাং তাঁহারা হাত গুটাইলেন—কেহ আর টাকা কর্জ্জ দিলেন না। জালরাজার আশা-ভরসা সকলই ফুরাইল। তিনি যে সন্ন্যাসী ছিলেন, সেই সন্ন্যাসীই হইলেন।

জাল রাজার বিষয়ে তৎকালে অনেকের সিদ্ধান্ত এইরূপ হইয়াছিল।

১। কতকগুলি লোকে বলিল, জাল-রাজা জাল নহেন, তিনি সত্যই প্রতাপচাঁদ।

২। কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করিলেন, এ ব্যক্তি প্রতাপচাঁদই যদি না হইবে, তবে পরাণ বাবুর এত ভয় হইবে কেন?

৩। কেহ বা বলিল, যদি এ ব্যক্তি সত্যই জাল হইবে, তবে ইহার নিমিত্ত এত ব্যস্ত হইয়া গবর্ণমেণ্ট আপন ব্যয়ে পরাণ বাবুর মকর্দ্দমা চালাইবেন কেন?

মকর্দ্দমা ফুরাইবার পর তিনি প্রথমে কলিকাতা চাঁপাতলায় রহিলেন। এখানে রাজভোগে তিনি থাকিতেন। তৎপরে কলুটোলায় গোবিন্দ প্রামাণিকের বাটীতে দুই তিন মাস থাকেন। গোবিন্দ বাবুর ধারণা ছিল, তিনিই প্রতাপচাঁদ। তাঁহার কারণে তিনি যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াছিলেন। কলুটোলা হইতে শ্যামপুকুরে গিয়া থাকেন। এই সময় লাহোরে লড়াই উপস্থিত হয়। গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি তাঁহার উপর পড়িল। তিনি চন্দননগরে বোড়াইচণ্ডীতলায় ফরাসির আশ্রয়ে কয়েক বৎসর ছিলেন। তৎপরে শ্রীরামপুরে গমন করিয়া তথায় ৬। ৭ বৎসর ছিলেন। কারণ, তখনও শ্রীরামপুর ওলন্দাজদের অধীনস্থ ছিল। "জাল প্রতাপচাঁদ" পুস্তক প্রণেতা তাঁহাকে শ্রীরামপুরে দেখিতে যাইতেন। তথায় তিনি ঠাকুর সাজিয়া দিনযাপন করিতেন। প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে কুলটারা আসিয়া এক এক পঞ্চ-প্রদীপ আর ঘণ্টা লইয়া সকলে এক সঙ্গে তাঁহাকে আরতি করিত। তিনি ঠাকুরের মত সিংহাসনে বসিয়া দীপের নৃত্য দেখিতেন। তখন অত্যন্ত সমারোহ হইত।

ইহাতে অনেকের বোধ হইতে পারে, তাঁহার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছিল। কিন্তু, যাঁহারা তাঁহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা করিতেন, তাঁহারা বলিতেন, তাঁহার বুদ্ধিবিপর্য্যয় হয় নাই। কারণ,—

(১) তিনি ইংরেজি বাঙ্গালা সংবাদপত্র পাঠ করিতেন। (২) তিনি ফরাসি দেশীয় ও রুস দেশীয় রাজনীতি বিলক্ষণ বুঝিতেন ও অন্যকে তাহা হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিতে পারিতেন। (৩) বিলাতী রাজনীতিতেও তাঁহার অধিকার ছিল। (৪) তিনি রুসীয় রাজনীতির পক্ষপাতী ছিলেন। (৫) বেদান্তে তিনি সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন। (৬) যাঁহারা তাঁহার পূজা করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে স্ত্রীলোকই অধিক, পুরুষও অল্প ছিল না। অনেক বৈষ্ণব-বৈরাগীও তাঁহার দ্বারস্থ থাকিত। তাঁহাদের কর্ত্তৃক তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা প্রচারিত হইত। তাঁহাকে অনেকে সাক্ষাৎ দেবতা মনে করিত।

তাঁহার অনেক শিষ্য হইয়াছিল। হিন্দু ও পঞ্জাবীও তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইয়াছিল। তাঁহার দীক্ষাপ্রণালী স্বতন্ত্র প্রকার।

এই নূতন ধর্ম্ম দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে। ব্রাহ্ম সংখ্যাপেক্ষা তাঁহার শিষ্য-সংখ্যা অধিক। তাঁহার নাম "সত্যনাথ" হইয়াছিল। আজও লোকে তাঁহার ধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেছে; অথচ কেহই অবগত নয়, জাল রাজার ধর্ম্মে লোকে দীক্ষিত হইতেছে।

তাঁহার মূর্ত্তি যেমন প্রশান্ত ও সৌম্য ছিল, তাহা তেমনই গম্ভীর ও সারল্যময় ছিল। "সেই মূর্ত্তি ক্ষুদ্রচেতাঃ জুয়াচোরের নহে।"

১৮৫২ বা ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের প্রথমে, বরাহনগরে ময়রাডাঙ্গা পল্লীতে একটি সামান্য বাটীতে সামান্য দুই তিনটি লোক বেষ্টিত হইয়া, তিনি প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার যাত্রার সময় চক্ষের জল মুছিবার কেহই ছিল না।

তাঁহাকে প্রতাপচাঁদ মনে করিলে, তাঁহার এই শেষ অবস্থার নিমিত্ত চক্ষে জল আইসে। পরের দোষে তাঁহার এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল, এইজন্য আরও কষ্ট হয়।

"তাঁহাকে জাল রাজা মনে করিলেও তাঁহার প্রতি রাগ থাকে না। কেন-না, তিনি যথেষ্ট কষ্ট পাইয়াছিলেন।"

"তিনি প্রতাপচাঁদই হউন, আর জাল রাজাই হউন, অদ্বিতীয় লোক ছিলেন। তিনি কষ্ট পাইয়াছিলেন, এই নিমিত্ত আমরা তাঁহাকে ভালবাসি। তিনি হাস্যমুখে সেই কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন, এইজন্য আমরা তাঁহাকে ভক্তি করি।"

বিরাট বিবাহ!

(আরম্ভ।)

কন্যাদায় যার ঘটে, বিরাট ব্যাপার বটে,
বিবাহ জুটান সে কন্যার।
ধন-মান আয়ুপ্রাণ, একে একে অবসান,
কন্যা ঘরে জন্মেছে যাহার॥
সর্ব্বস্ব দিলেও হায়, কন্যাপার নাহি হয়,
কন্যাদায় সম নাহি দায়।
পিতৃমাতৃ-শ্রাদ্ধক্রিয়া, তিল-কাঞ্চনে সারিয়া,
তাহে উদ্ধার পাওয়া যায়॥
কষ্ট একি কন্যাদায়, প্রাণদানে নাহি যায়,
বিশেষতঃ দরিদ্রের ঘরে।
কন্যা আছে ঘরে যার, দহিছে সে অনিবার,
মৃতপ্রায় হ'য়ে চিন্তা-জ্বরে॥
আমার ঘরে ঘরে, এই দৃশ্য থরে থরে,
সাজান রয়েছে দেখ চাই।
গণনা বাহুল্যমাত্র, তথাপি একটি চিত্র,
আঁকিলাম—তাও দেখ ভাই॥

* * * *

(প্রথম দৃশ্য—বিবাহ-বাটী।)

বিরাট বিবাহ-সভা লেগে গেছে ধুম।
ঢাক্-ঢোল কাড়ানাড়া বাজে রুম্‌ঝুম্॥
সুর-ভেঁজে সানাইতে ধরিয়াছে পুঁ—উ।
তামাকের টিকেয় দিতেছে কেউ ফুঁ—উ॥
'আনো আনো' 'দেও দেও' চারিদিকে রব।
বড় বড় মণ্ডা কেউ গেলে টপ্ টপ্॥
কেউ বলে চাট্‌নি আন, কেউ লুচি চায়।
কারু পাতে দই-মণ্ডা গড়াগড়ি যায়॥
নেসার ঝোঁকেতে কেউ বমি করে পাতে।
উঠে যায় চটে কেউ, গালি দিতে দিতে॥
কেউ বা যাচিছে, —"চাই সন্দেশ, মশাই!"
চেয়ে নিয়ে পাতে কেউ ছড়াইছে তাই॥
গ্ল্যাস পুরে ক্ষির-দই নিয়ে কেউ চেয়ে।
ছাদের নর্দ্দামা দিয়ে দেয় গড়াইয়ে॥
সন্দেশ ছুড়িয়া কেউ মারে কারো গায়।
মদ খেয়ে পাতে কেউ গড়াগড়ি যায়॥
দু'তিন্‌খানা পাত কেউ টেনে নিয়ে কোলে।
ছড়াছড়ি করে সব খাই খাই বলে॥
রেখেছে কেউ বা জুতো পাতের তলায়।
ধরা প'লে, হেঁসে বলে,—"দই যে পালায়॥"
চারিদিকে গণ্ডগোল এরূপ সদাই।
অথচ কৃতির নিন্দা করিছে সবাই॥
কেউ বলে,—"মূর্খ বেটা, কিছু জ্ঞান নাই।"
কেউ বলে,—"দূর হোক, উঠে চল ভাই॥
ভদ্রলোকেদের বেটা, জানে না সম্মান।
কখনো তো পাত কারু পড়েনি দু'খান॥
এমন বেল্লিক বেটা, একি আগে জানি।
তা'হ'লে পেচ্ছাপ্ করে দিতাম তখনি॥"

(দ্বিতীয় দৃশ্য—কন্যা-সম্প্রদান-ক্ষেত্র।)

এদিকের এইতো ব্যাপার সমুদয়।
ওদিকে উঠেছে রোল,—'লগ্নভ্রষ্ট হয়॥'
সকলে ছুটিয়া যায় সেইদিকে তাই।
পাঠক-পাঠিকে! চল, আমরাও যাই॥
ওই দেখ, বিবাহের সভা সুশোভিত।
লগ্নভ্রষ্ট হয় ভেবে, সবে শশঙ্কিত॥
বরকর্ত্তা-সাথে দেখ বেধেছে বিরোধ।
বসেছেন বেঁকে তিনি করে মহা ক্রোধ॥
ফুরাণের ব্যত্যয় ঘটেছে কি কি নাকি।
তাই তিনি রেগে কন,—"এ কেমন ফাকি॥"
বন্ধ্যাঘটি কুলীন-সন্তান তিনি হন।
তাঁর সনে জুয়াচুরী এই বা কেমন॥
বিদ্যা-বুদ্ধি নাহি থাক—আছে তো সম্মান।
না জানুন গণনাঙ্ক—গণিতে তেমন॥

কিবা আসে-যায় তায়—এবিবাহে তিনি।
ওজনে লবেন মুদ্রা দাঁড়ি-পাল্লা আনি॥
পুত্রের ওজনে চান টাকার ওজন।
বন্দোবস্ত বিবাহের আছয়ে এমন॥
কিন্তু ইথে ঘটিয়াছে এবে ব্যাতিক্রম।
ওজনে না জুঠে টাকা তাঁর পুত্রসম॥

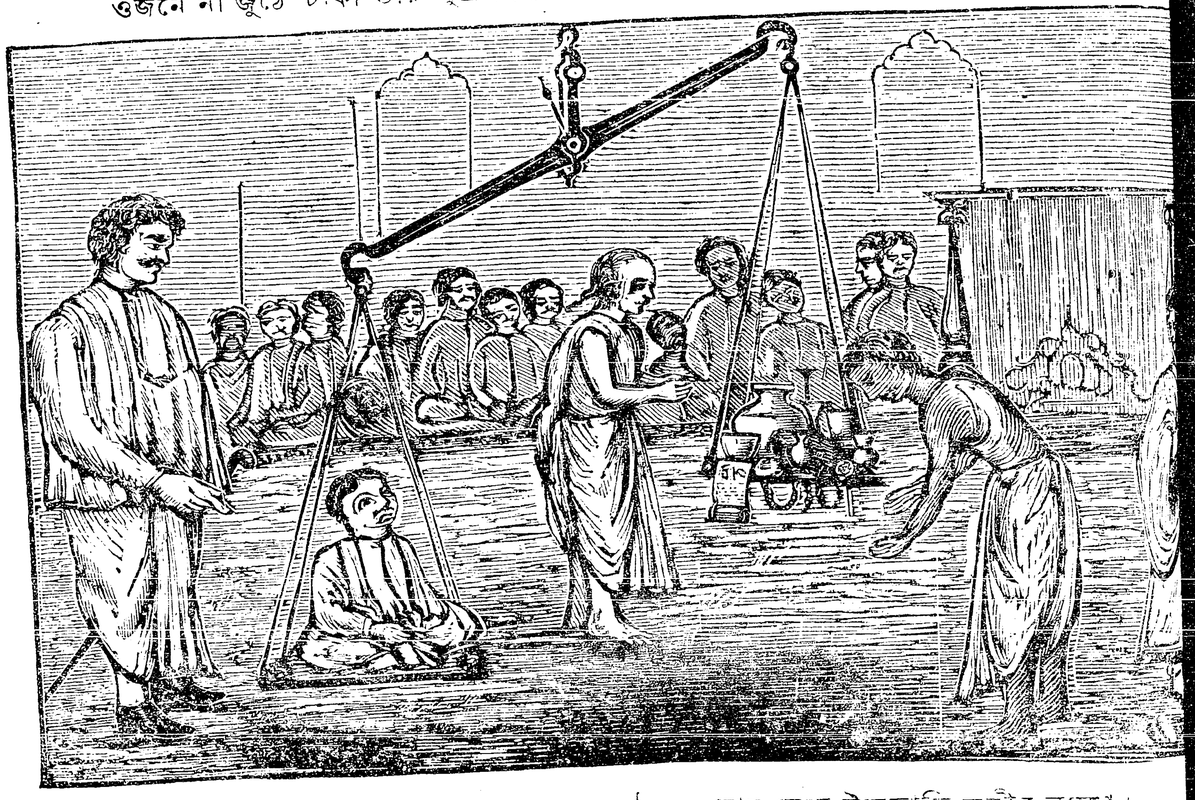

এখনো ওজনে কম রহিয়াছে ঢের।
সমান না হলে বিয়ে দেব না পুত্রের॥
গোণা-গাঁথা নাহি চাই, আগেই বলেছি।
এখন নূতন কথা, কেন বল ছি ছি॥
পুত্রের ওজনে টাকা—বিবাহের পণ।
হয়েছিল ধার্য্য কি না, বলতো এখন॥
এমন সোনার ছেলে পাবে কোথা আর।
লেখা-পড়া বিদ্যাবুদ্ধি আহা কি বাছার॥
একটু হ'লেই পাস হ'তো তো এবার।
নম্বরেতে কম ছিল সবে-মাত্র চার॥
পরীক্ষক বেটার নাহিক কোন জ্ঞান।
তাইতে করেছে 'ফেল' এমন সন্তান॥
আর বার পাশ হতো—এও তো নিশ্চয়।
তা'হলে দ্বিগুণ টাকা বল কোথা যায়॥
শূদ্র কায়েতের ঘরে বেহাই ম'শায়।
এর চেয়ে দান-পণ বেশী দে'য়া হয়॥
ঘড়ি-বাড়ী জুড়িগাড়ি আসবাব্-এসরাজ।
এইরূপ দেয় তারা আরো কত সাজ॥
অবশেষে গৃহের সামগ্রী ছিল যত।
একে একে তাও সব হয়েছে আনীত॥
তথাপি দেয় না কাঁটা সমান ওজন।
তাই তিনি এ বিবাহে সম্মত না হন॥
বরকর্ত্তা বলেন,—"আরও কিছু আন।
তবে পাত্র সভা হ'তে যাইবে উঠান॥
তার চেয়ে উচ্চজাতি কুলীন ব্রাহ্মণ।
তবু এত কম আমি লই দান-পণ॥
উপরোধে পড়ে শুধু বেহাই মশায়।
পুত্রে বিনিময় করি সমান টাকায়॥
এতেও আবার চাও কমজম দিতে।
পুত্র মোর পাতলা তবু আছে ওজনেতে।
কত করে খাইয়েছি খি-দুধ বাছায়।
তবুও হয়নি মোটা-দুরদৃষ্ট হায়॥
আশা ছিল, কিছুদিন রাখিলে যতনে।
পুত্র মোর মোটা কিছু হত আয়তনে॥
জানি না তা'হলে কিবা করিতে বেহাই!
সাধ্যাতীত তোমার যখন এই ভাই॥
যাইহোক, কাঁদাকাটি না চাই শুনিতে।
যা' আছে ঘরেতে তাই আনহ ত্বরিতে॥"
বরকর্ত্তা এত বলি রোষ প্রকাশিতে।
মুখুয্যে মশায় যান কি আছে আনিতে॥
মনেতে ধিক্কার দেন, কাঁদিতে কাঁদিতে।
"আর যে পারিনে হেন যন্ত্রণা সহিতে॥

খুদ-কুঁড়া গৃহে মোর যা'ছিল সম্বল।
কন্যাপার-হেতু তার দিয়াছি সকল॥
ঘটিবাটি-আসবাব যা'ছিল আমার।
সকলি দিয়াছি তবু নাহি কমে ভার॥
রাঁধিনি জলের ঘটি জল খাব বলে।
পিতলের প্রস্রজটিও দিয়াছি বদলে॥
ভিটা-মাটি বাঁধা দিয়া করিয়াছি ধার।
আর কিছু নাহি, কিসে হইব উদ্ধার॥
হায় হায়! একি বিধি তোমার লিখন।
কন্যা দিয়ে কেন বাদ সাধিলে এমন॥
যায়গাকো অসাতলে কেন এ সমাজ।
কেন সমাজের মুণ্ডে পড়েনাকো বাজ॥"
অধঃক্ষেপি কান্দিয়া হেন, কন্যাকর্ত্তা গৃহে।
'কি আর উপায়' তাই গৃহিণীকে কহে॥
গৃহিণী কান্দিয়া বলে,—"আর কি উপায়।
সর্ব্বস্ব দিয়াছি, আর কি আছে কোথায়॥
প্রাণমাত্র আছে মোর তাও দিতে পারি।
রাজি হন যদি তায়, বল, পায়ে ধরি॥"
এতেক বলিয়া কান্দি দু'জনে তখন।
করিলেন সভাস্থলে পুনঃ আগমন।
'প্রাণ দিতে পারি'—তাও বলিলেন তাঁয়।
কিন্তু কে শুনে সে কথা—কার কান তায়॥
বরকর্ত্তা ক্রোধেতে তখন এই কন।
"দূর—দূর—দূর বেটা, জোচ্চোর ব্রাহ্মণ॥
পেচ্ছাপ্ করিয়া দিই তোহার বাটীতে।
চলিলাম পাত্র নিয়ে এই এথা হ'তে॥
টাকা-কড়ি নেই যদি, তবে কেন তোরা।
মেয়ে ধরেছিলি পেটে, ওরে মুখপোড়া॥"
এই বলি, যাহা কিছু মিলিল সাক্ষাতে।
বরকর্ত্তা লাগিলেন পোঁটলা বাঁধিতে॥
তারপর ভৃত্যে ডাকি জিম্মা করি দিয়া।
বলিলা,—"তোলহ পাত্র, কাজ নাই বিয়া॥"
এত বলি পাত্র লয়ে চলে গেল সবে।
চারিদিক কম্পান্বিত হৈ হৈ রবে॥
ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী তথা চৈতন্যবিহীন।
গড়াগড়ি যান ভূমে যেন প্রাণহীন॥
হরি হরি বল সবে পালা হলো সায়।
সঙ্গে সঙ্গে স্বামী-স্ত্রীর গঙ্গা-যাত্রা হয়॥

* * *

(উপসংহার।)

এই কি বঙ্গের চিত্র—এই বঙ্গভূমি!
এই হিন্দু! এই কি সমাজনেতা তুমি!!
এই কি সে আর্য্যবংশ, একি সে গৌরব!
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই কি সে সব!!
এ তো নরকের-চিত্র—ইহা হতে আর,
নরকের চিত্র কিবা আছে ভয়ঙ্কর!!
এরা তো নীরয়-কীট! এর চেয়ে আর,
বিশ্বমাঝে হ'তে পারে কোন বস্তু ছাড়?।
বসুধা—মা! এদেখে এখনো কেন তুমি,
দ্বিধা হয়ে ডুবায়ে দিলে না বঙ্গভূমি?।
এই তো কলির এই অন্তিম-সময়।
এখনো না হয় কেন যুগ-বিপর্য্যয়!।
এখনো এলে না কেন, তুমি মহাকাল!
এস—এস, এখনো ঘুচাও এ জঞ্জাল॥
সূর্য্যদেব!
সহস্রলোচনে বঙ্গ দেও পুড়াইয়া।
সিন্ধু তুমি, বঙ্গভূমি দেও ডুবাইয়া॥
হোক বজ্রপাত, হোক দাবাগ্নি-প্রলয়।
নগর-নগরী সব হয়ে যাক লয়॥
ডুবে যাক—ঘুচে যাক এ বঙ্গ-কালিমা।
চারি পোয়া পাপ এই, নাহি দেখি সীমা॥

কর্ণগড়-রাজবংশ।

মেদিনীপুর-জেলার মধ্যে কর্ণগড়-রাজবংশ বিশেষ সম্মানিত ও যশস্বী। নিজ মেদিনীপুর, বাহাদুরপুর, মনোহরগড়, কেসিয়া-বাজার প্রভৃতি চারি পরগণা, যাহা বর্ত্তমান কালে নাড়াজোলাধিপতি রাজা মহেন্দ্রলাল খাঁয়ের দখলে আছে, এই বিস্তৃত ভূভাগ কর্ণগড়-রাজবংশের অধিকৃত ছিল। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথম ভাগে এই রাজবংশের শেষ রাণী শিরোণীর জীবন-বিনাশের সহ এই রাজবংশ নির্ম্মূল হইয়াছে। রাণী শিরোমণী রাজা অজিত সিংহের মহিষী। সুবিখ্যাত রাজা যশোমন্ত সিংহের পুত্রবধূ। রাণী শিরোমণী বহুকাল পর্য্যন্ত এই মেদিনীপুরে আধিপত্য করিয়াছিলেন। রাজা অজিতসিংহের মৃত্যুর পরে তাঁহার দুই মহিষী বর্ত্তমান ছিলেন। জ্যেষ্ঠা মহিষীর নাম রাণী ভবানী এবং কনিষ্ঠা মহিষীর নাম রাণী শিরোমণী। রাণী ভবানী অত্যল্প কাল আধিপত্য করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন। কিন্তু রাণী শিরোমণী প্রায় ৫০ বৎসর কাল এপ্রদেশ শাসন করিয়াছিলেন।

রাণী শিরোমণী যে সময়ে মেদিনীপুরের অধীশ্বরী, তৎকালে এপ্রদেশে ইংরেজ-শাসন-প্রভাব পূর্ণরূপে বিকাশ হয় নাই। তৎকালে এ প্রদেশে মহারাষ্ট্রীয় (বর্গীর) অত্যাচার এবং দস্যু তস্করের বিলক্ষণ অত্যাচার ছিল। বিশেষতঃ গোবর্দ্ধন দিকৃপতি নামক একজন চূড়ান্ত দস্যু তৎকালে এতদূর প্রবল হইয়াছিল, যে, তাহার অত্যাচারে এ প্রদেশ কম্পিত হইয়া উঠিয়াছিল। কর্ণগড়-রাজবংশ বহুদিনের প্রাচীন বংশ; বিশেষ, তৎকালে ধনশালী বলিয়া এপ্রদেশে প্রসিদ্ধ ছিল। প্রকৃতপক্ষে রাজ-ভাণ্ডার বিপুল অর্থ ও মণিমাণিক্য-হীরক আদি বহুমূল্য রত্ন পরিপূর্ণ ছিল। দস্যু-প্রধান গোবর্দ্ধন দিকৃপতি এই সুযোগে রাজ-ভণ্ডার লুণ্ঠন জন্য বহুবিধ প্রয়াশ পাইতে লাগিলেন।

কর্ণগড়-রাজভবন সুদৃঢ় দুর্গ-প্রাকারে পরিবেষ্টিত। বিশেষতঃ রাণীদিগের সৈন্যবলও কম ছিল না। কথিত আছে, কর্ণগড় রাজাদিগের এক সময়ে দ্বাদশ সহস্র সৈন্য ছিল। এইসকল সৈন্যগণ বেতনের পরিবর্তে জায়গীর ভূমি উপভোগ করিত। কিন্তু তৎকালে সৈন্যগণের মধ্যে এইরূপ প্রবাদ রাষ্ট্র হইল, ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট উহাদের জায়গীর জমি বাজেয়াপ্ত করিবেন। এই সকল কারণে সৈন্যদিগের মধ্যে অসন্তোষের সূত্রপাত হইল। অধিকাংশ সৈন্যগণ রাণীর অবাধ্য হইয়া পড়িল। এই কারণে রাণীদিগের মনে ভয়-সঞ্চার হইল। রাণীরা কর্ণগড়ে অবস্থান করা নিরাপদ জ্ঞান না করিয়া, বাসস্থান পরিত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিলেন। রাণীরা এইক্ষণ কি করিবেন, কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিবেন, এই চিন্তায় নিতান্ত বিব্রত হইয়া পড়িলেন।

রাণীরা কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিবেন? এমন আত্মীয়-স্বজন কে আছে? কোন্ ব্যক্তি তাঁহাদিগকে এই বিপদে রক্ষা করিবে? এইরূপ চিন্তা বলবতী হওয়াতে তৎকালে এইরূপ লক্ষ্য করিলেন——রাজা যশোমন্ত সিংহের মাতুল-পুত্র বাবু ত্রিলোচন খাঁকে একমাত্র কার্য্যদক্ষ এবং বিশ্বাসী লোক বলিয়া স্থিরতর করিলেন। অবিলম্বে রাণীদ্বয় ত্রিলোচন খাঁয়ের আশ্রয়-লাভ-জন্য নাড়াজোল-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এদিকে রাজা ত্রিলোচন খাঁ রাণীদিগের আগমন-বার্ত্তা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা জন্য অগ্রসর হইলেন। যে স্থানে ত্রিলোচন খাঁয়ের সহিত অজিত-মহিষীদিগের সাক্ষাৎ হয়, সেই স্থান "রাণী পাটনা" নামে অদ্যাপী বিখ্যাত আছে।

কর্ণগড় রাজাদিগের ইতিবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিতে হইলে, অনেক বিষয় শুদ্ধ জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিতে হয়।

মেদিনীপুরের পূর্ব্বতন কালেক্টর মিঃ বেলি সাহেব বাহাদুর এদেশের অনেক রাজা ও জমিদারদিগের ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিয়াছিলেন। মিঃ বেলির রচিত পুস্তকে উক্ত বিবরণ সংগ্রহ করিবার অনেক সাহায্য পাওয়া যায়। বিশেষতঃ কবিবর ৺রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য, তাঁহার প্রণীত "শিবায়ণ" গ্রন্থে কর্ণগড় রাজাদিগের বহু বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

কবিবর রামেশ্বর লিখিয়াছেন,——

"অজিত সিংহের তাত, যশোমন্ত নরনাথ,
রাজারাম সিংহের নন্দন।"
তস্য পোষ্য রামেশ্বর, তদাশ্রয়কারী হয়,
রচিলেন শিব-সঙ্কীর্ত্তন।"

স্থানান্তরে লিখিয়াছেন,——

"মধুক্ষর মনোহর, মহেশের গীত।
রচে রাম রাজারাম সিংহ প্রতিষ্ঠিত।"

বাঙ্গালার ইতিহাস লেখক মিঃ মার্শমেন সাহেব স্বীয় ইতিহাসে মেদিনীপুরের গবর্ণর রাজারাম সিংহের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। এ প্রদেশে তিনিই রাজারাম সিংহ নামে বিখ্যাত।

অনুসন্ধান
অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র

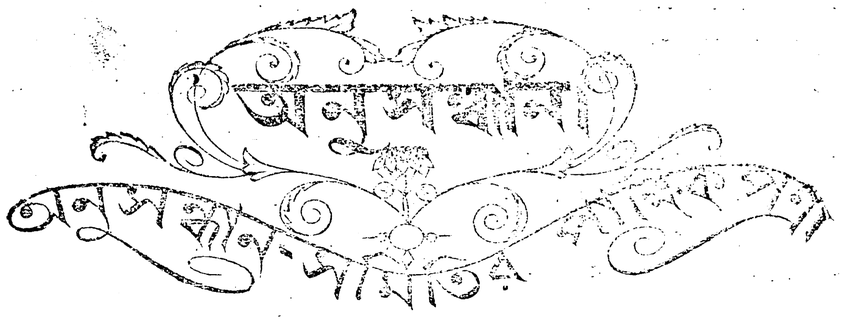

৫ম খণ্ড } ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৮। { ২০শ সংখ্যা।

শক্তি-সঙ্গীত।

(রামপ্রসাদী সুর)

মা! পড়েছি ঘোর বিপদে।
এখন স্থান পাব কি তোর শ্রীপদে?
যখন যে পদবি ধরি, বিপদ হেরি পদে পদে।
তবু হয় না গো জ্ঞান, বড়ই অজ্ঞান,
সদাই বিভোর বিষয়-মদে।
বিষয় যে মা মহা বিষম,
জেনেও তাই, জিদে জিদে।
করি অপকর্ম্ম, পাপ-ধর্ম্ম,
জাগে না মা, কখন হৃদে।
অকর্ত্তব্যে কর্ত্তব্য-জ্ঞান,
এই নাকি গুণ বিষয়-মদে?
এখন অভ্যাস-দোষ ছাড়তে নারি,
মন চলে না পরম-পদে।
বিশ্ব-সংসার সবই অসার,
জঙ্গল হেরি জনপদে।
কত মহাদেশ, হেরি মাগো,
পরিণত মহাপদে।
তবু মা মোর, চিত্ত-চকোর,
মজে না তোর চরণ-চাঁদে,
(সে যে) চায়, না চান্দ্রমসী সুধা,
পড়িয়েছে গোলক-ধাঁদে।
রোহিণীর প্রাণ-পশু,
বেঁধে নিবে সমন বাঁধে।
তারে রাখবে কে মা, ধরে বল,
স্থান না দিলে ঐ শ্রীপদে।

সংসার ও সন্ন্যাস।

সংসার ও সন্ন্যাস পরস্পরে কি বিপরীত সম্বন্ধ! একের প্রতি অন্যের কি ভয়ানক শত্রু-ভাব! যেন উভয়ের মধ্যে সংসার-সমাজের মত এক বিষম দলাদলি আবহমান-কাল ধরিয়াই চলিয়াছে; যেন উভয়েই আপনাপন দল-পুষ্টির চেষ্টায় এক একটি মানুষকে লইয়া আপনার দিকে চিরদিনই আকর্ষণ করিতেছে! দুই দলেই কি ভয়ানক প্রলোভন!—কি মনমুগ্ধকর বিষম আকর্ষণ! দুই দলেই এক-একজন এক-একটী যেন পূর্ণ সাংসারিক-সমাজপতি হইয়া বসিয়াছেন! যেই একদিকে মন একটু আকর্ষিত হয়, অপর দিক হইতে অমনি তাহাতে বাধা!—অমনি সেদিকের এক নূতন আকর্ষণে মনকে আলোড়িত করিয়া তোলে! আমি সন্ন্যাসী হইব—পূর্ণরূপে মনকে সন্ন্যাস-আশ্রমে নিয়োজিত করিব, এমনি মনেই উঠিয়া যায়। কে যেন আসিয়া অমনি বলে,—"ছি! ছি! কি করিতেছ? কেন সজ্জিত দেহে দিয়া ধর্ম-কর্মে জলাঞ্জলী দিতেছ? তোমার পরকালের উপায় এখনও একবার ভাব! এখনই একবার এখানে এস—এস সন্ন্যাসী হও; তাতে হাতে হাতে স্বর্গ.

পাবে—হাতে হাতে মোক্ষলাভ হবে।" এই-রূপে, যদি একবার মনকে কোনরূপে সন্ন্যাসের দিকে আগুয়ান করি, অমনি অপরদিক হইতে বাধা পড়ে; কে যেন আমায় বলে,—"একি, কি করিতেছ? এমন সুখ-সমৃদ্ধি, এমন সোনার সংসার—এমন প্রাণের পুত্রকন্যা-পরিবার ছাড়িয়া, কোথায় যাইতেছ?"

হায়! এইরূপ দু'টানা-টানিতেই আমি মারা গেলাম। একবার সংসার টানে, একবার সন্ন্যাস টানে! অহো, আমি কোন্ দিকে যাই? কে আমায় প্রকৃত পথ দেখাইয়া দিবে? এ দলাদলির আমলে দুই দিকেই সমান প্রলোভন; বুঝিতে যে কিছুই পারি না—কোন্ দিকে যাইলে প্রকৃত পথ পাইব?—কোন দলে আত্ম-সমর্পণ করিলে আমার এ দারুণ অধঃপতন হইতে আমি উদ্ধার পাইব?

এক গুরু-শিষ্যের মধ্যে অনেকদিন ধরিয়াই এইরূপ প্রশ্নোত্তর চলিতেছে। শিষ্য বলিতে-ছেন,—"গুরুদেব! সংসারের দলই পবিত্র দল। আহা, কি প্রেম, কি স্নেহ, কি সরলতা! এমন দয়া-মায়া-স্নেহ-প্রেম যেখানে, সেই তো ঈশ্বরের রাজ্য—চির-আনন্দ-স্বরূপ ঈশ্বর সেখানে নাই তো কোথায় আছেন? পত্নীর প্রেম, পুত্রের ভক্তি, পিতামাতার স্নেহ—এ সকলই তো স্বর্গীয় বস্তু! এর কাছে দেব, সন্ন্যাস কোথায় লাগে, বলুন দেখি?" শিষ্য, এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াই, সেই সঙ্গে সঙ্গে সংসা-রের প্রেম-প্রীতির উদাহরণ-স্বরূপও আবার বলিতে লাগিলেন,—"এই ধরুণ মহাশয়, আমি অনেক দিন হইতেই সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করিব বলিয়া স্থির করিয়াছি। কিন্তু, আমার প্রতি কি সকলের মমতা-মায়া, আমার এই কথায় তাহারাও আমার সহচারী হইতে চায়; বলে,—'আমাদেরও তবে সঙ্গে নিয়ে চলুন! সেখানে গিয়া আমরা আপনার সেবা-শুশ্রূষা করিয়া জীবন সার্থক করিব।' আমার জন্য, দেখুন দেখি, এমন সংসার-সুখ ত্যাগ করিয়াও, সন্ন্যাসের সেই বনবাস, ফলমূলাহারে জীবন-ধারণ, কষ্টের একশেষ প্রভৃতি তাহারা সহিতে চায়। তবে গুরুদেব! সংসার হইতে সন্ন্যাসকে কিরূপে বড় বলিব?"

গুরুদেব, একথায়, মনে মনে একটু হাসি-লেন। এবং বলিলেন,—"সংসার বড়, কি সন্ন্যাস বড়, তাহা অনেক কথার কথা। আজ আর তাহা বুঝাইবার সময় নহে। তবে বৎস, মোটামুটি এইটুকু জানিয়া রাখিও যে, কর্ম্ম-ফলই সর্ব্বত্রের নিয়ামক। একপক্ষে কর্ম্মফল-গুণে এ সংসারেও ভগবানের করুণাকণা অনা-য়াসেই লাভ করা যায়; আবার অপরপক্ষে, ফলমূলাহারে কঠোর সন্ন্যাস-জীবন ধারণ করি-লেও, তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বেও তোমাকে অনেক উপদেশ দিয়াছি,* সুতরাং আজ আর ও বিষয়ে কাল-ক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করি না। তবে বৎস, আজ একবার তোমায় সংসারের প্রকৃত সৌন্দর্য্য—যাহাতে তোমায় এত মুগ্ধ করিয়াছে—তাহারই রহস্য উদ্ঘাটন করিয়া দেখাইব। দেখাইব, সংসারের প্রীতিপ্রেম কত দূরে!—দেখাইব, সংসারে কে তোমার আপনার!—দেখাইব, সংসারের কে তোমার সুখে-সুখী, দুঃখে-দুঃখী! আর, সেইজন্যই বৎস, তোমাকে আজ আমি একটি কাজ করিতে পরামর্শ দিই। তুমি এক কাজ কর দেখি—আমার এই ঔষধের বটিকাটি অগ্রে সেবন কর। ইহাতে তোমার শরীরে সম্পূর্ণ জ্বরভাব দেখা দিবে; নাড়ি ছাড়িয়া যাইবে; লোকে বুঝিবে, তোমার মৃত্যুর আর বিলম্ব নাই। যাও বৎস, এই বটিকাটি সেবন করিয়াই তুমি গৃহে গমন কর; এবং আপন

* এই তত্ত্বের আংশিক প্রতিপাদন-মূলক একটি সুন্দর গল্প বিগত চতুর্থ বর্ষের ২২শ সংখ্যার "অনুসন্ধানে" (৪৮৫ পৃষ্ঠায়) প্রকাশিত হইয়াছিল। এতদ্মীমাংসা-জন্য সেরূপ প্রস্তাবই দ্রষ্টব্য।

শয্যায় গিয়া শয়ন করিয়া থাক। তারপর, আর যা' যা' করিতে হয়, আমিই তাহা করিব; তজ্জন্য তোমার কোনই চিন্তা নাই। তোমার বাড়ীর অপর সকলেও তো আমাকে বিশেষরূপে চেনেন; বিশেষরূপে মান্য করেন; এবং সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিয়াও থাকেন। তদ্ভিন্ন, আমার যোগক্রিয়া-বলে অপরের ব্যাধিমুক্তির বিষয়ও তাঁহাদের তো অবিদিত নাই! বিশেষ, ডাক্তার, বৈদ্য, হাকিম সকলে যখন তোমায় জবাব দিবেন—সকলেই যখন বলিবেন,—'তোমার আর বাঁচিবার আশা নাই'; তখন তুমি আমায় একবার ডাকিতে বলিও। তারপর, আর যাহা যাহা করিতে হয়, চিন্তা নাই, আমিই তাহা করিব। এখন, যাও বৎস, গৃহে যাও; যেরূপ বলিলাম, তাহাই কর-গে।"

"যে আজ্ঞা, আচ্ছা তাহাই করিতেছি।"—এই বলিয়া, ঠিক গুরুদেবের আদেশানুযায়ীই প্রস্তুত হইয়া, শিষ্য তখন, গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। এবং সেইমতই কার্য্যানুষ্ঠানও চলিতে লাগিল।

... ...

ডাক্তারের পর ডাক্তার, কবিরাজের পর কবি-রাজ, এইরূপ বিধিমতে তাঁহার চিকিৎসা চলিতেছে। কিন্তু বাঁচিবার আর আশা নাই। সকলেই বলিলেন,—"বাঁচিবার আর আশা নাই।" অবশেষে, শিষ্য-মহাশয়, ঠিক সময় উপস্থিত বুঝিতে পারিয়া, সকলকেই বলিলেন,—"তোমরা একবার আমার গুরুদেবকে আনয়ন কর। এখন, এ অন্তিম-সময়ে, তাঁহার চিকিৎসা ভিন্ন আর কিছুতেই আরোগ্য হইবার উপায় দেখিতেছি না। তিনি যদি বাঁচাইতে পারেন, তবেই বাঁচিব; নহিলে, হায়, এবার আর বাঁচিলাম না! কিন্তু তা'তে যদি নাও বাঁচি, তবু গুরুর চরণ-দর্শন করিতে করিতে মরিব, সেই ভাল। মরিলেও, তবু তো কতকটা পর-কালের কাজও হইবে?" একথায় অবশ্য পরি-বারের সকলের চক্ষেই অশ্রু দেখা দিল। সক-লেই তাঁহার জীবনের জন্য ব্যাকুল; সুতরাং গুরুদেবের নিকট সংবাদ যাইতেও আর বিলম্ব রহিল না। অচিরেই গুরুদেব শিষ্য-সমীপে আনীত হইলেন।

তখন, একি বিষম বিভ্রাট উপস্থিত!—একি নিদারুণ অগ্নি-পরীক্ষা! গুরুদেব তখন, শিষ্যের আত্মীয়-স্বজন, এবং পুত্রকন্যা-পরিবার সকলকেই সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"আমি ইহাঁকে বাঁচাইতে পারি নিশ্চিত! কিন্তু এ রোগের ঔষধ বড় গুরুতর। সে ঔষধ দিতে পারিবে, তেমন ক্ষমতাবান্ এসংসারে তো কই কাহাকেও দেখিতেছি না!"

গুরুদেবের এ কথায় প্রথমতঃ সকলেই বলিলেন—পুত্র-কন্যা-পরিবার সকলেই বলি-লেন,—"এমন কি গুরুতর ঔষধ—এমন কি দুষ্প্রাপ্য দ্রব্য—কেন দিতে পারিব না? আপনি বলুন; আমরা এখনই তাহা সংগ্রহ করিয়া আনিব। প্রাণ দিয়াও আমরা তাহা সংগ্রহ করিয়া আনিব—সে জন্য চিন্তা করেন কেন?"

গুরুদেব ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"প্রাণ দিয়াও সংগ্রহ করিয়া আনিবেন? আচ্ছা, ভালই! তবে উনিও যে আরোগ্য হইবেন, ইহা নিশ্চিত। নহিলে—আপনারা সে ঔষধ প্রদান করিলেও যদি আমি উহাঁকে বাঁচাইতে না পারি, তবে আমিও এইখানেই প্রাণ দিতে প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ হইলাম। এখন, তবে আপনারা ঔষধ দেন!"

"এই কাগজ-কলম লউন; কি কি ঔষধ, লিখিয়া দেন; এখনই আমরা তাহা সংগ্রহ করিয়া আনিতেছি। সেজন্য চিন্তা কি?"—সে শিষ্য-পরিবারভুক্ত সকলেরই মুখে এই কথা!

গুরুদেবও, পূর্ব্বমত ঈষদ্-হাস্যে ঔষধের বিষয় লিখিতে লাগিলেন; এবং একটু পরেই লেখা শেষ করিয়াই বলিলেন,—"এই নেন; এখন, ঔষধের ব্যবস্থা করুন। সত্বর ঔষধ না দিতে পারিলে, আমি কিন্তু রোগীকে আর বাঁচাইতে

পারিব না!” গুরুদেবের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া, সকলেই অমনি সাগ্রহে ঔষধের বিবরণ-পত্র পড়িতে গেলেন। কিন্তু, একটু পড়িতেই, একি বিপরীত দৃশ্য! একবার, দুইবার, তিন বার, কি আপার, সেই একই অক্ষর দেখা যায় যে! গুরুদেব এ কি লিখিলেন? “শিষ্য-পরিবারের কেহ বক্ষ চিরিয়া রক্ত দিতে পারিলে তবে তিনি বাঁচিবেন”—এ কি ভয়ানক ঔষধের ব্যবস্থা? কাজেই, সকলেরই যেন মূর্চ্ছাভঙ্গ! সকলেরই যেন বিরস অধোমুখ!

কিন্তু গুরুদেব তখনও ছাড়েন না। তিনি আবারও বলিতে লাগিলেন,—“আগেই তো বলিয়াছি, আপনারা ঔষধ দিতে পারিবেন না। কিন্তু জানিবেন, এ ঔষধ না পাইলে ইঁহার মৃত্যু নিশ্চিত।” এই বলিয়াই, শিষ্য-পুত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—“বৎস! উপযুক্ত পুত্র তুমি—তুমি নহিলে তোমার পিতাকে আর কে বাঁচাইবে? পুত্রের কার্য্যই তো এই! দেও তুমি—তোমার বক্ষের রক্ত। তোমার বক্ষের রক্ত পাইলেই আমি তোমার পিতাকে বাঁচাইতে পারিব। বৎস, ভাবনা কি? পিতার জন্য পুত্রের এমনই তো চাই!”

কিন্তু পুত্র নিরুত্তর। অনেকক্ষণ পরে বলিলেন,—“তাও কি হ’তে পারে? উনি বৃদ্ধ; উনি তো দু’দিন পরে মরবেনই; তবে আর উঁহার অমন একটা জীর্ণ জীবনের জন্য এমনতর আমার নূতন জীবনটা কেন খোয়াইব? না—না মহাশয়, ওকথা আর বলিবেন না।” কন্যা যিনি, তাঁহারাও প্রায় এই উত্তর। অধিকন্তু তিনি বলিলেন,—‘বেঁচে থাক আমার স্বামী-পুত্র—আমার আর কষ্ট কিসের?” এইরূপ অর্দ্ধাঙ্গিনী পত্নী যিনি, তাঁহারও সেই উত্তর। বেশীর ভাগ তাঁহার ক্রন্দনটা কিছু বেশী। “স্বামী! তুমি তবে চল্লে? কিন্তু আমার উপায়টা কি ক’রে গেলে? হায়-হায়! এ বয়সে তোমার যেমন ঘটিল, এ তো স্বপ্নেও কখনও ভাবি-নি! হা জগদীশ্বর, তোমার মনে কি শেষে এই ছিল? অভাগিনীর অদৃষ্টে কি একটুও সুখ লেখ-নি?”—এইরূপভাবেই তিনি খানিকটা কাঁদিতে লাগিলেন। এবং অবশেষে “বাছাদের আমার মঙ্গল হ’ক; বাছারা বেঁচে থাক, সেই আমার সুখ।”—এইরূপ নানা আশ্বাসে মনকে স্বস্থ করিতে লাগিলেন। স্ত্রী পুত্র-কন্যা—সে সংসারের সকলেরই তখন এই ভাব। একটু পূর্ব্বেই ঔষধ সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে বাঁচাইবার জন্য যাঁহাদের এত আগ্রহ ছিল; এখন, ঔষধের ব্যবস্থা শুনিয়াই—“বক্ষ চিরিয়া রক্ত দিতে পারিলে তবে তিনি বাঁচেন” এই কথা শুনিয়াই—তাঁহাদের সকলেরই এই ভাব!

... ...

গুরুদেব তখন, অপর একটা মুষ্টিযোগ প্রদানানন্তর, শিষ্যকে রোগমুক্ত করিয়াই কহিতে লাগিলেন,—“বৎস! দেখিলে! দেখিলে—এ সংসার কি? দেখিলে—কে তোমার সঙ্গের সাথী হ’তে চায়? বৎস! তুমি যে সদাই বলিতে—‘আহা! এসংসারে কি প্রেম, কি ভালবাসা, কি স্নেহ, কি ভক্তি—সকলি স্বর্গীয় বস্তু!’ বৎস! এই-ই কি তোমার সেই সংসার? বৎস! তুমি যে সদাই বলিতে—‘স্ত্রীপুত্রকন্যা সবাই তোমার সঙ্গে যেতে চায়, তোমার সঙ্গে কষ্ট সইতে চায়, তোমার সেবার জন্যই তারা লালায়িত!’ বৎস! এই কি তোমার সেই সংসার? প্রাণসম পুত্র তোমার, প্রিয়তমা কন্যা তোমার, প্রাণাধিকা প্রেয়সী তোমার—বৎস—তারাই কি এই? না-না, তারা কি এমন হতে পারে? তারা সঙ্গের সাথী হতে চায়, কষ্টের ভাগী হতে চায়, তোমার সেবা করবে বলে বনবাসে যেতে চায়—তারা কি এমন হতে পারে? তবে হয় তো পথভুলে এ কোন অন্য বাড়ী এসেছ! তবে বুঝি, কোন মোহিনীমন্ত্রে বিপথে এসে কোনও রাক্ষস-রাক্ষসীকে পুত্র-কন্যা-পরিণী জ্ঞানে, প্রতারিত হইয়াছ? ছি—ছি! বৎস! এখনও তোমার এত ভ্রম? এ স্বার্থপর সংসারে কা’র মায়ায় আবদ্ধ আছ? কে তোমার আর আপনার? বৎস,—

‘ভাই বন্ধু কেবা কার—কেবা পিতামাতা।
অসার সংসার-ডোর—সাংসারিক মায়া।’

এই কথাই সত্য। তাই বলি, বৎস, এখনও জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ,—

‘কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ
সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ।
কস্য ত্বং বা কুতো আয়াতঃ
তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাত॥’

শিষ্য নিরুত্তর। তাঁহার অশ্রুপূর্ণ লোচন বিরস বদন ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস!—যেন দারুণ অনুতাপানলে তাঁহাকে দগ্ধ করিতেছে! কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি, গুরুদেবের চরণপ্রান্তে পতিত হইয়া, অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিলেন,—“গুরু-দেব! এখনও তবে আমার উপায় করুন। তবে কোথায় এ অধমের উদ্ধার হবে? দেবতা! দেন—দেন এখনও আমার পথ দেখাইয়া দেন।”

বাঙ্গালা লেখা-পড়া।

বাঙ্গালা ভাষা অনেক দিনের। সংস্কৃত ভাষার মত পুরাতন নহে সত্য; কিন্তু ইহার জন্ম অনেক দিন হইয়াছে। কোন্ সময়ে বাঙ্গালা ভাষা সংস্কৃত ভাষা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা স্থির নির্ণয় করা দুঃসাধ্য, এবং কোনও একটা নির্দ্দিষ্ট সময়েও যে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাও সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। একদিনে ভাষার সৃষ্টি হয় না—তিল তিল করিয়া তাহা হয়। বাঙ্গালা ভাষার পক্ষেও সেই নিয়ম। যতদিনই ইহার জন্ম হউক না, ইহা যে এখনও বিশেষ সবল ও পরিপুষ্ট হয় নাই, তাহা নিশ্চিত। বিগত পচিশ বৎসরের কথা ছাড়িয়া দিলে সকলেই দেখিতে পাইবেন যে, বাঙ্গালা ভাষা বহুকাল একই আকারে ও একই ভাবে বিদ্যমান ছিল। দুই তিন শত বৎসর পূর্ব্বে ইহার কলেবর যে প্রকার জীর্ণ-শীর্ণ ছিল পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বেও ইহার সেই কলেবর দেখা যায়। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বের কোন পুস্তকের সহিত কীর্ত্তিবাসের রামায়ণ, কাশীদাসের মহাভারত বা কবিকঙ্কণের চণ্ডীর তুলনা করিলে বিশেষ কোন পার্থক্য লক্ষিত হইবে না—উভয় গ্রন্থকে একই সময়ে প্রস্তুত বলিয়া বোধ হইবে। বাঙ্গালা ভাষার যে কেন উন্নতি হয় নাই, তাহা স্থির করা নিতান্ত কঠিন নহে। বাঙ্গালীর মাতৃভাষা বাঙ্গালা হইলেও তাঁহাকে বাঙ্গালা ভাষার অনুশীলন করিতে দেখা যায় না। মুসলমানেরা আমাদিগের দেশের রাজা ছিলেন; সুতরাং তাঁহাদিগের পারশ্য ভাষাই আমাদিগের রাজভাষা ছিল। বিষয়-কর্ম্ম ও রাজকার্য্য সম্পন্ন করিবার জন্য সকলেই পারশ্য ভাষা শিক্ষা করিতেন; এমন কি, বাঙ্গালী আত্মীয়-বন্ধুকে পত্র লেখা ও বাটীর হিসাব-পত্র রাখা পর্য্যন্ত অনেক সময়ে পারস্য ভাষায় চলিত। ভূমি ও খাজানা-সম্বন্ধীয় সকল প্রকার কাগজ-পত্রই যে পারস্য ভাষায় লিখিত হইত, তাহা বলাই বাহুল্য। বাঙ্গালীর যতটুকু বাঙ্গালা না জানিলে একেবারে চলিত না, ততদূর অর্থাৎ দুই-একখানা পত্র লিখিতে ও পড়িতে এবং সামান্য হিসাব-পত্র রাখিতে জানা পর্য্যন্তই ইহার চরম সীমা ছিল। সেই মাত্রায় শিক্ষার উপযোগী করিয়াই বাঙ্গালা পাঠশালার সৃষ্টি। সামান্য গণিত-শিক্ষা এবং লিখিতে ও পড়িতে পারাই পাঠশালার সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর শিক্ষা। যাঁহারা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও শাস্ত্র-ব্যবসায়ী, তাঁহাদিগের পক্ষে এই সামান্য বাঙ্গালা শিক্ষার পরে সংস্কৃত চতুষ্পাঠীর দ্বার উন্মোচিত; আর যাঁহারা রাজসেবক, তাঁহাদিগের পক্ষে মুন্সী ও মৌলবীর ব্যবস্থা। যাঁহারা কাজী রহিলেন, তাঁহারা

কাশীরাম ও কীর্ত্তিবাসের সপিণ্ডন করিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতেন—সামান্য কৃষক এবং দোকানী-পশারীই এই শ্রেণীভুক্ত। আর যাঁহারা মূর্খ ভদ্রসন্তান অর্থাৎ সংস্কৃত বা পারস্য ভাষায় বিশেষ পারগ নহেন, তাঁহারাও অন্য দলে মিশিতে না পারাতে কাজেই এই দলে প্রবিষ্ট হইতে বাধ্য হইতেন। বাঙ্গালা ভাষায় উচ্চ শিক্ষার গ্রন্থ তখন আদৌ ছিল না; সুতরাং উচ্চ শিক্ষা সংস্কৃত ও পারস্য ভাষায় ব্যতিরেকে একেবারে অসম্ভব ছিল। এখনও সে অভাব দূর হয় নাই সত্য; কিন্তু এখন যেমন বিজ্ঞানের দুই-একখানা সারবান পুস্তক বা দুই-চারিটা প্রবন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়, তখন তাহাও ছিল না। ইহার উপর আর এক মহা অসুবিধা—মুদ্রাযন্ত্রের অভাব ও অল্প-ব্যবহার। তজ্জন্য বাঙ্গালা ভাষায় পুস্তক লিখিত হইলেও তাহার প্রচার লইয়া একটা মহা বিভ্রাট ছিল। পুস্তকাদি প্রচার সম্বন্ধে সংস্কৃত বা পারস্য ভাষারও বিশেষ সুবিধা ছিল না সত্য; কিন্তু এই দুই ভাষায় অধিকাংশ লোকের আস্থা ও প্রয়োজন থাকাতে নকল করা বিশেষ ভার-বোঝা ছিল না। বাঙ্গালা ভাষার প্রতি লোকের তাদৃশ আস্থা ও প্রয়োজন ছিল না; সুতরাং তৎভাষায়-লিখিত কোন পুস্তক সহজে কেহ নকল করিবার কষ্ট স্বীকার করিত না। যাহাতে লোকের আস্থা নাই, প্রয়োজনও নাই, এমন ভাষায় লিখিত গ্রন্থ প্রচার করিতে হইলে মুদ্রিত করিয়া সুলভ বা বিনামূল্যে লোকের দ্বারে দ্বারে যোগাইতে হয়; কিন্তু তৎকালে সে সুবিধা ছিল না। কাজে কাজেই বাঙ্গালা ভাষার কোন উন্নতি হয় নাই—কূপ-মণ্ডুকবৎ ইহা কোন মতে জীবিত ছিল মাত্র।

ক্রমে মুসলমানের রাজত্ব লুপ্ত হইল, এবং ইংরাজ-রাজ ব্যবসায়ের কুষ্ঠীকে বিচারের কাছারীতে পরিণত করিয়া পাকা হইয়া বসিলেন। পারস্য ভাষা বাঙ্গালার বিচারালয় হইতে অপসারিত হইল, এবং তাহার পরিবর্ত্তে বঙ্গদেশে বাঙ্গালা ভাষাকে স্থান দেওয়া হইল; সুতরাং পারস্য ভাষার প্রতি আর কাহারও বড় একটা আস্থা রহিল না। আবার পাশ্চাত্য-প্রণালীতে স্কুল-কলেজ স্থাপিত হইতে লাগিল; তাহাতে বাঙ্গালা ভাষাকে একটু আদর-অভ্যর্থনা করা হইল এবং বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নিম্ন স্তরে তাহাকে একটু স্থানও প্রদত্ত হইল; সুতরাং বাঙ্গালা ভাষার উন্নতির দিন আসিল। এদিকে শাস্ত্রব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের প্রতি পূর্ব্বকালের ভূস্বামী ও রাজন্যবর্গের যেমন সুদৃষ্টি ছিল, ইংরাজ-রাজত্বে তাহার অবসান হইল এবং জীবিকা-নির্ব্বাহ করা বিষম দায় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তাহার উপর ধর্ম্মলোপকারী পাশ্চাত্য-শিক্ষার গুণে ক্রিয়া-কর্ম্ম প্রায় লুপ্ত হইয়া আসিতে থাকায় শাস্ত্রের আর বিশেষ প্রয়োজন থাকিল না; সুতরাং তৎপ্রতি লোকের আস্থা লোপ পাইল। বিশেষতঃ ইংরাজী শিক্ষা ব্যতিরেকে যখন জীবিকা-নির্ব্বাহ কঠিন হইল, তখন আর সখ করিয়া সংস্কৃত অধ্যয়ন করে কে? সুতরাং সংস্কৃত শিক্ষার মস্তকে একপ্রকার বজ্রাঘাত হইল। আজ ইংরাজ-রাজ সংস্কৃত চতুষ্পাঠীতে দুই চারি টাকা সাহায্য করিতেছেন সত্য; কিন্তু তাহাতে আর ফল কি? তদ্দ্বারা যখন উদরান্নের সংস্থান হইল না, তখন উপবাস করিয়া কয়জন লোক সখের সাহিত্য-বিজ্ঞান শিক্ষা করিবে? সংস্কৃত ভাষা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে সম্মানিত সত্য; কিন্তু তাহাতেই বা ফল কি? যাহা রাজার ভাষা নহে এবং যে ভাষার রাজদ্বারে প্রবেশ নিষিদ্ধ, তাহার উন্নতির আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র। এখন ভারতে ইংরাজী ভাষাই ভাষা; এখন ইংরাজিরই আদর; এমন কি, আমাদিগের পিতা-মাতা আমাদিগের নামটা ইংরাজী নাম রাখেন নাই বলিয়া অনেক সময়ে তাঁহাদিগের উপর বিরক্ত হই! যে কারণেই হউক, সংস্কৃত শিক্ষা এক্ষণে কেবল সখের ও শিক্ষার জন্য—সাংসারিক ব্যবহার জীবনে তাহার প্রয়োজনীয়তা একেবারেই নাই বলিলে হয়। সংস্কৃত এখন মৃত—কেবল মৃত নহে, গলিত ও দলিত।

বাঙ্গালা ভাষার বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চস্তরে প্রবেশাধিকার না থাকিলেও আজকাল ইহার একটু সৌভাগ্য বলিতে হইবে; কারণ, ইহা বাঙ্গালীর মাতৃভাষা বলিয়াই হউক আর দয়া করিয়াই হউক, ইংরাজ-রাজ আদালতের কোন কোন গৃহে ইহাকে অদ্যাপি প্রবেশ করিতে দিতেছেন এবং বিদ্যালয়েও ইহার কথঞ্চিত শিক্ষা প্রদত্ত হইয়া থাকে। এই দুর্ল্লভ সুযোগ পাইয়া অতি অল্পদিনের মধ্যেই বাঙ্গালা ভাষা যথেষ্ট উন্নতি করিয়া ফেলিল। ইংরাজী শিক্ষার গুণে লোকের একটু স্বদেশানুরাগ বৃদ্ধি হইল বা নূতন জন্মিল; সুতরাং স্বজাতীয় ভাষার প্রতিও একটু অনুরাগ-সঞ্চার হইল; কারণ, আমাদিগের বিশ্বাস যে, স্বদেশানুরাগ ও স্বজাতীয় ভাষার অনুরাগের পরস্পর অতি নিকট সম্বন্ধ। এই সময়ে আবার মুদ্রা-যন্ত্র সুলভ ও সচ্ছল হওয়াতে পুস্তক দি প্রচার করা সহজ হইয়া পড়িল; সুতরাং বাঙ্গালা ভাষার উন্নতির পক্ষে বাস্তবিকই সুবাতাস বহিল। অন্যদিকে ভিন্ন ভিন্ন খ্রীষ্টান-সমাজ 'অন্ধকারাচ্ছন্ন বাঙ্গালীকে আলোকে আনিবার জন্য' বাঙ্গালা ভাষায় প্রচার-কার্য্য আরম্ভ করিলেন—তমঃ হরণ করিবার জন্য তমোহর নামক মুদ্রা-যন্ত্রের মুখ হইতে রাশি রাশি বাঙ্গালা পুস্তক-পুস্তিকা, পত্র-পত্রিকা প্রভৃতি বাহির হইয়া একেবারে অন্ধকার গগনকে তারকা-খচিত করিয়া তুলিল। তাহার দৃষ্টান্তে বিস্তর খ্রীষ্টান-সমাজ মুদ্রা-যন্ত্র স্থাপিত করিয়া ধর্ম্মপ্রচারে নিযুক্ত হইলেন—বাঙ্গালা ভাষার যুগান্তর উপস্থিত হইল। হিন্দুর শিরে তাঁহারা যথেষ্ট আঘাত করিয়াছেন সত্য; কিন্তু অতর্কিতরূপে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, বাঙ্গালা ভাষা তাঁহাদিগের নিকট অনেক পরিমাণে ঋণী।

এই সময়ে বাঙ্গালা ভাষার আলোচনা চলিতে লাগিল বটে, কিন্তু আর এক উপদ্রব আসিয়া হিন্দুসমাজকে উৎপীড়ন করিতে লাগিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার গুণে এবং স্কুল-কালেজে অধিক পরিমাণে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থের আলোচনা হওয়াতে হিন্দুধর্ম্মে একটু তরঙ্গ উঠিল, এবং পাশ্চাত্য রীতিনীতি ও আচার-ব্যবহার অনুকরণ করিবার প্রতি অনেকেরই একটু স্পৃহা জন্মিল। এই সুযোগে অনেক শিক্ষিত, অর্দ্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত হিন্দুসন্তান-দিগকে, খ্রীষ্টান-সমাজ খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া ফেলিল—সুপক্ক ফল পাইলে বালকে যেমন মর্দ্দিত করে, খ্রীষ্টান পাদরীগণ তাহাই করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু এ তরঙ্গও অধিক দিন সতেজে বহিতে পারে নাই। এই সময়ে লোকপূজ্য রামমোহন রায়ের অভ্যুদয় হয়—তিনি খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইলেন, এবং হিন্দুধর্ম্মের সারসংগ্রহ করিয়া প্রচার করিয়া এক নূতন কীর্ত্তি সংস্থাপন করিলেন! বিশেষতঃ ব্রাহ্ম-ধর্ম্মে অনেক প্রকার সুবিধাও দেখা গেল; সুতরাং খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের প্রতি লোকের অনেকটা আস্থা কম পড়িল। এই নব ধর্ম্ম প্রচার করিবার জন্য ও তৎকালের ভ্রান্ত মত-সকল সংশোধন করিয়া হিন্দু-সমাজের রীতি-নীতি সংস্কার করিবার জন্য তাঁহাকে বাঙ্গালা ভাষায় অনেক পুস্তক-পুস্তিকা লিখিতে হইয়াছিল। খ্রীষ্টান ধর্ম্ম-প্রচারকদিগের ন্যায় তিনিও লোক-শিক্ষায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। এবং বাঙ্গালা ভাষায় তদুপযোগী দুই-একখানা পুস্তকও প্রণয়ণ করিয়াছিলেন। তৎপরে তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আরও অনেক-গুলি চিরস্মরণীয় মহারথী বাঙ্গালা সাহিত্য-জগতের সংস্কারে ব্রতী হইলেন। এই সময়ে

অনেকগুলি পুস্তক বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইয়া প্রচারিত হইতে লাগিল। এবং বাঙ্গালা ভাষার সংবাদপত্রও দেখা দিল। তৎপূর্ব্বেও খ্রীষ্টান ধর্ম্ম-প্রচারকগণ সংবাদ-পত্রাকারে বাঙ্গালায় পত্রিকা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং তদ্দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের যে কোন উপকার হয় নাই, এমন নহে; কিন্তু সাহিত্যের স্থায়ী উপকার এই সময়েই প্রকৃত প্রস্তাবে আরম্ভ হইল; কারণ, যাহা বিজাতীয় ধর্ম্মপ্রচারে ব্যাপৃত, তদ্দ্বারা, বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি হইলেও, সাহিত্যের তেমন উন্নতি আশা করা যায় না।

এই সময়ে গদ্যে বাঙ্গালা লেখা আরম্ভ হয়। ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গালা কেবল পদ্যময়ী ছিল। পদ্যেই যাহা কিছু লিখিবার লেখা হইত; এমন কি, বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনকে পত্র লেখাও অনেক সময়ে পদ্যে চলিত। সকল ভাষারই প্রথমাবস্থা পদ্যময়ী—বাঙ্গালারও তাহাই ছিল; বিশেষতঃ তৎকালে (পারস্য ও সংস্কৃত সাহিত্যের দৃষ্টান্ত দেখিয়া) লোকের একটা বিশ্বাসই ছিল যে, পদ্য ভিন্ন সাহিত্যের বিকাশ অসম্ভব। সমাজের প্রথমাবস্থায় গদ্য সাহিত্যের উৎপত্তি হয় না—হয় কেবল গীতিময় হৃদয়োচ্ছ্বাসের। গীত-সকল কবিতাপূর্ণ ও নানাবিধ ছন্দ-বন্ধে আবদ্ধ; সুতরাং সকল আদিম ভাষাই প্রথমে পদ্যময়ী থাকে। কারণ, গীত ব্যতীত যাহা কিছু প্রথমে রচিত হয়, তাহাতেই গীতের ছায়া আসিয়া পড়ে। ক্রমশঃ হৃদয় ছাড়িয়া চিন্তা যখন বাহ্য জগতে ও সমাজে পতিত হয়, তখন আর রচনার পদ্যময়ী অলঙ্কার থাকে না; থাকিলেও, সে বেশে তাহাকে ভাল দেখায় না। কল্পনা লইয়াই কবিতা ও পদ্যের রাজ্য; কিন্তু কল্পনার সমাজ চিরদিন বিদ্যমান থাকে না, চিন্তা আসিয়া তাহাকে স্থানচ্যুত করে; সুতরাং কোমল কবিতা ও পদ্যের স্থান গদ্যের দ্বারা অধিকৃত হয়। যে দিন হইতে গদ্যের আদর হইল, সেইদিন হইতেই প্রকৃত বঙ্গভাষার উন্নতি আরম্ভ হইল। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, খ্রীষ্টান কবিগণ যে বাঙ্গালার সামান্য উপকার সাধন করিয়াছেন, তাহা নহে; কিন্তু বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতি গদ্য-লেখকগণ যে উন্নতির বক্ষস্থিত পাষাণ সরাইয়া দিয়াছেন, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। যাহা হউক, অনেক মহামান্য ও শিক্ষিত ব্যক্তি বঙ্গভাষার উন্নতিকল্পে তৎকালে ব্রতী না হইলে আজি ইহার উপস্থিত অবস্থা নয়নগোচর হইত না।

অতি অল্প সময়েই উন্নতির স্রোত খর-বেগে বহিতে লাগিল—এত অল্প দিনে কোনও ভাষা এত উন্নতিলাভ করিয়াছে কি না, তাহা বিলক্ষণ সন্দেহ-স্থল। দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য সকল বিষয়েই অনেকগুলি সারবান পুস্তক অল্প সময়ের মধ্যে লিখিত হইল। আবার দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক সংবাদ ও সাময়িক পত্রও বিস্তর পরিমাণে বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি করিল। বাঙ্গালায় যাহা ছিল না, তাহার অভাব, সম্পূর্ণ ও প্রকৃষ্টরূপে না হউক, অনেক পরিমাণে পূর্ণ হইল; এবং সেই অপ্রতিহত প্রভাবে যদি উন্নতি স্রোত চলিত তাহা হইলে বঙ্গভাষা আজ কত উন্নত ও পূর্ণায়তন হইত, তাহা বলা যায় না। কিন্তু এক্ষণে সে স্রোতের তেজ কমিয়াছে—মাইকেল, অক্ষয়কুমার দত্ত, বিদ্যাসাগর, ঈশ্বর গুপ্ত, মদনমোহন, দীনবন্ধু প্রভৃতি লেখকদিগের স্থান আর কেহই অধিকার করিতে পারিতেছেন না; এবং বর্ত্তমান অবস্থায় কেহ যে পারিবেন, সে ভরসাও বড় করা যায় না। ইহার সন্তোষজনক কোন কারণ দেখা যায় না; কিন্তু ফলে যে বঙ্গভাষায় আর তাদৃশ ভাল সামগ্রী জন্মিতেছে না, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার কারণ কি?

অদৃষ্ট।

অষ্টচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

বিষম বন্দোবস্ত!

ডাক্তার বাবু অগ্রে হইতেই সমাচার পাইয়াছিলেন যে, আমি পরদিবস প্রত্যূষে হরিপদকে লইয়া তাঁহার বাটী হইতে প্রস্থান করিব। সুলোচনা যাইয়া অনাহারে শয়ন করিলে পর, দেখিলেন,—পুত্রেরা ও পুত্রবধূরা যে যাহার ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া শয়ন করিলেন। সুলোচনার সমস্ত দিবস অনাহারে গিয়াছে এবং রাত্রিও যাইবে—এই সকল কষ্ট অনুধাবন করিয়া, তিনিও অনাহারে থাকিয়া নিজ-ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া কিয়ৎকাল শুইয়া ভাবিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল ভাবিয়া তাঁহার মন অত্যন্ত উদাস হইয়া উঠিল, এবং সংসারে ঘৃণা জন্মিল। তখন তিনি আমার ও সুলোচনার আনুপূর্ব্বিক ঘটনা-বৃত্তান্ত মনে মনে ভাবনা করিয়া দিব্য-চক্ষে সমস্তই দেখিতে পাইলেন। সুলোচনা বিবাহের পরই বিধবা হইয়াছিলেন; এবং সুলোচনা বসন্ত-রোগাক্রান্ত হইলে আমি তাঁহার যেরূপ সেবা-শুশ্রূষা করিয়াছিলাম, তাহা তাঁহার স্মরণপথে উদিত হইল; তখন, আপনা-আপনি কহিলেন,—"যদু তখন অবিবাহিত ছিল, সুতরাং বিদ্যাসাগরের মতে বিবাহ দিলেই ভাল করিতাম।" তৎপরে আমি আবার যখন দুরূহ রোগাক্রান্ত হই, তখন তিনি আমার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ করিয়া এক্ষণে মর্ম্মে ব্যথা পাইলেন; এবং সেইজন্যই যে আমি তাঁহার বাটী ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলাম, এই সকল ধারণা তাঁহার মনে উদিত হইতে লাগিল। তদ্ভিন্ন, সুলোচনার আমার প্রতি যেরূপ ভালবাসা ছিল, আমার পীড়ার সময় সুলোচনা যেরূপ গুপ্তভাবে আসিয়া আমাকে দেখিয়া যাইতেন, এই সকলও তাঁহার মনে উদিত হইতে লাগিল। সুতরাং তিনি অনুমান করিলেন যে,—"পাছে এই প্রণয় ক্রমে ক্রমে ঘনীভূত হয় ও প্রকাশ হইয়া পড়ে, এই ভয়েই আমি তাঁহার বাটী হইতে তখন প্রস্থান করিয়াছিলাম।" তখন তিনি মনে মনে আমাকে আমার ধীর বুদ্ধির জন্য প্রশংসা করিলেন। অতঃপর ডাক্তার বাবু বর্ত্তমানের ভাবনায় প্রবৃত্ত হইলেন। ভাবিলেন,—"যদু তখন এখান হইতে যাইয়া বিবাহ করে। সেই স্ত্রীর গর্ভে একটী পুত্রও হইয়াছে। সে স্ত্রী এখন বর্ত্তমান নাই। যদুও বিপদে ঠেকিয়া তাহার পুত্র হরিপদকে এখানে সুলোচনার নিকট রাখিতে আসিয়াছে। সুলোচনার নিকট রাখিতে আসার উদ্দেশ্য এই যে, অবশ্য সুলোচনা তাহার পুত্রকে ভাল-বাসিবে। এই সাহসে নির্ভর করিয়াই সেও এখানে আসিয়াছে। হরিপদর উপর সুলোচনার যেরূপ যত্ন, তাহাতেও দেখিতেছি, পুত্রাপেক্ষাও কিছু কম নহে। যদু যদি হরিপদকে সুলোচনার নিকট রাখিয়া যায়, তবে হরিপদর কোন কষ্ট হইবে না; বরং যদুও সুস্থমনে যাইয়া যথায় তথায় থাকিবে। এদিকে গৃহবিচ্ছেদ যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে সুলোচনাকে স্থানান্তরিত না করিলেও নয়। তবে হরিপদর উপর সুলোচনার যখন পুত্র-স্নেহ জন্মিয়াছে, তখন যদু ও সুলোচনাকে একত্র করিলে উহারা যে সুখে থাকিবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। তবে আর একটা বিঘ্ন আছে, সমাজ! সমাজ কখনও এ কার্য্যে অনুমোদন করিবে না। আমি জোর করিয়া এ কার্য্য করিলে, পুত্রদিগকে একঘরে হইতে হইবে। এখনও যতটুকু হিন্দুয়ানী আছে, তাহাতে বিধবা-বিবাহ চলিতে পারে না। বিশেষতঃ গাঁয়ের লোকগুলি যেরূপ কুটীল, তাহাতে যো পাইলে কি তাহারা পুত্রদিগকে সমাজচ্যুত না করিবে? তবে একটা প্রবোধ এই যে, যে টাকা রেখে যাচ্ছি, তাতে তাহাদের মহল্লে কিছু করিতে পারিবে না। ইচ্ছা হইলে, টাকা খরচ করিয়া, আবার তাহারা

সমাজভুক্ত হইতে পারিবে; অথবা বিদ্যাসাগরের মতে যাহারা বিবাহ করিয়াছে, সেহাতে পক্ষে তাহাদের লইয়াও এক সমাজভুক্ত হইয়া থাকিতে পারিবে।"

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ডাক্তার বাবু শুনিলেন, ঘড়ীতে একটা বাজিল। তখন শয্যায় আর শুইয়া থাকা তাঁহার ভাল লাগিল না। তখন তিনি আস্তে আস্তে উঠিয়া দ্বার উদ্ঘাটন-পূর্ব্বক নীচে আসিয়া আমি যে ঘরে শুইতাম, সেই ঘরের দরজা ঠেলিলেন। চতুর্দ্দিক নিঃশব্দ। বাহিরে জ্যোৎস্না ফুট ফুট করিতেছে। যে ঘরে আমি শুইয়া থাকি, তাহার সম্মুখে রোয়াক, ও সেই রোয়াকের পার্শ্বে সদর দরজা। এই স্থানটী এত অন্ধকার যে, কিছুমাত্র দৃষ্টিগোচর হয় না। এজন্য ডাক্তার-বাবু সদর দরজাটি খুলিয়া দিলেন। পূর্ব্বদিক হইতে চন্দ্র-রশ্মি আগমনে, যেস্থানে ডাক্তার-বাবু দাঁড়াইয়া ছিলেন, সেস্থানটী আলোকিত করিল। তখন তিনি বাহিরে দৃষ্টিপাত করিয়া চন্দ্রের এই বিমল রশ্মি দেখিয়া একটু শান্তিলাভ করিলেন। পরে, তিনি আবার আমার ঘরের দরজা ঠেলিলেন। বলা বাহুল্য, ডাক্তার বাবুর বাটী পূর্ব্বদ্বারি। দরজা দিয়া প্রবেশ করিয়াই দুই দিকে দুই রোয়াক। এই দুই রোয়াকের সংলগ্ন দুইটি কুঠুরী। দক্ষিণেরটি ডাক্তার বাবুর ডিস্পেন্সারি, এবং উত্তরেরটি তাঁহার বৈঠকখানা। এই বৈঠকখানাতেই আমি শয়ন করি। দরজা ঠেলিবা-মাত্র আমার নিদ্রা-ভঙ্গ হইল। প্রথমতঃ মনে নানা-প্রকার সন্দেহ হইতে লাগিল। দ্বিতীয়তঃ ভাবিলাম,—সুলোচনা দিবা-রাত্রি অনাহারে আছেন; তিনিই বা কোন কথা বলিবার জন্য আসিয়াছেন! এক্ষণে, দরজা খুলিয়া দিলে, যদি সুলোচনাই হন, তবে বড়ই অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। এই সকল ভাবিতেছি, এমন সময় ডাক্তার বাবু আমার নাম ধরিয়া ডাকিয়া পুনরায় দরজা ঠেলিলেন! তখন, ডাক্তার বাবুর গলার স্বর শুনিয়া আমি বড়ই ভীত হইলাম। ভাবিলাম, পুত্র-বধূরা বোধ হয় ত আমার কোন দুর্নাম করিয়া থাকিবে, এবং সেইজন্য ডাক্তার বাবু আমাকে দণ্ড দিবার জন্যই এত রাত্রে আসিয়াছেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে এই সকল ভাবিয়া আমার মুখ শুকাইয়া উঠিল, মাথা ঘুরিতে লাগিল; এবং ডাক্তার বাবুর ডাকে উত্তর দিই, এমন বাক্য নিঃসরণ হইল না। ভয়ে জড়সড় ও কম্পিত-কলেবরে উঠিয়া, দরজা খুলিয়া দিয়া, তাঁহাকে বিনীত-ভাবে কহিলাম,—"আপনি কি জন্য এখানে, এত রাত্রে? আপনাকে যদি কেহ কিছু লাগাইয়া থাকে, তবে সে সমস্তই মিথ্যা; এবং সেই ভয়েই আমি রাত্রি প্রভাত হইলেই এখান হইতে চলিয়া যাইব ঠিক করিয়াছি; হরিপদকেও লইয়া যাইব স্থির করিয়াছি। এবং দেখুন, তাহারা সে আমার কাছেই শুইয়া আছে। আমি সুলোচনাকে ভগীর ন্যায় স্নেহ করি, এবং আপনি ভিন্ন কখন তুমি বলি নাই।" এই পর্য্যন্ত বলিয়াই আমি ক্রন্দন করিতে লাগিলাম। ডাক্তার বাবু আমাকে সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন,—"যদু, আমি সেজন্য আসি নাই। তুমি একবার বাহিরে এস; তোমার সহিত অনেক কথা আছে। তুমি প্রাতে বাটী যাইবে শুনিয়াই, আর অপেক্ষা না করিয়া, তোমাকে এত রাত্রে জাগাইলাম।"

আমরা উভয়ে বাহিরে গেলে, ডাক্তার বাবু প্রথমেই আরম্ভ করিলেন,—"যদু, সুলোচনা তোমাকে ভালবাসে, এবং অগ্রেও যে ভালবাসিত, তাহা আমি জানি; আর, তুমিও যে সুলোচনাকে ভাল বাসিতে ও তজ্জন্য তাহার যথোচিত শুশ্রূষা করিয়া তাঁহাকে আরাম করিয়াছিলে, তাহাও আমি জানি। পরে, তুমি পীড়িত হইলে, আমি তোমাকে স্থান না দিয়া সংক্রামক-ভয়ে সহিসের ঘরে স্থান দিয়াছিলাম; সে সময়েও সুলোচনা তোমার কাছে যাইত ও

তোমার সেবা-শুশ্রূষা করিত, তাহাও আমি জানি।" ডাক্তার বাবুর মুখ হইতে এই সকল কথাগুলি নিঃসৃত হইবামাত্র আমি ডাক্তার বাবুর পদদ্বয় ধারণ করতঃ ক্রন্দন করিতে করিতে কহিলাম,—"ওকথা বলিয়া আর আমাকে কষ্ট দিবেন না। কারণ, পাছে আমি সুলোচনাকে ভালবাসি। কারণ, আমি তাঁহার শুশ্রূষা করিয়াছিলাম ও ডাক্তারে যেরূপ বলিয়াছিল, আমি তদ্রূপ নিয়ম প্রতিপালন করিয়া তাঁহাকে বাঁচাইয়াছিলাম। এই কথা প্রচার হয়, এবং তৎপরে আমি পীড়িত হইয়া একটু আরোগ্য হইলে সুলোচনাকে আমার শয্যাপার্শ্বে দেখিয়া তাঁহার এই ভালবাসা প্রকাশ হইবার ভয়ে আমি প্রাণোচ্ছাদনের ভাবনা না ভাবিয়াও, আপনার আশ্রয় ত্যাগ করিয়াছিলাম। এখন সে কথা আর আমাকে বলা বৃথা; আমি নিজেই সে বিষয়ে সাবধান হইয়াছিলাম। তবে এখন নিরুপায় ভাবিয়া, আপনার পত্নী জীবিতা আছেন এই বিশ্বাস করিয়া, ভাবিয়াছিলাম,—হরিপদকে এখানে রাখিয়া যাইব। কিন্তু এখানে আসিয়া যখন দেখিলাম, সকলই বিশৃঙ্খল, তখন আমার এ আশ্রয় লওয়া বৃথা। এই বিবেচনা করিয়াই, হরিপদকে সঙ্গে লইয়া প্রভাত হইলেই আবার স্বস্থানে প্রস্থান করিব,—এইরূপ মনস্থ করিয়া শুইয়াছিলাম। আপনি ডাকিতেছেন বলিয়াই উঠিয়াছি। আমার কোন দোষ নাই: ইহাতে আপনার যাহা বিবেচনা হয়, তাহাই করুন।" এই বলিয়া, আমি ডাক্তার বাবুর পদদ্বয় ছাড়িয়া দিয়া কোঁচা দ্বারা চক্ষুদ্বয় মুছিতে মুছিতে দণ্ডায়মান হইলাম। ডাক্তার বাবু কহিলেন,—"যদু, আমি তোমার কোন দোষগুণের বিচার করিতে আসি নাই; আমি যাহা বলিতেছি, ধীর মনে শ্রবণ কর। সুলোচনা আমার বড় কন্যা; তাহাকে সদ্বংশেই বিবাহ দিয়াছিলাম। কিন্তু আমারই দুর্ভাগ্য-বশতঃ সে স্বামীমুখ দর্শন না করিয়াই বিধবা হইয়াছিল। তাহার উপর আমাদের স্ত্রীপুরুষের যেরূপ যত্নমমতা, তাহা তুমি স্বচক্ষেই দেখিয়াছ। এক্ষণে পুত্রেরা বড় হইয়াছে, এবং বধূমাতাগণ সে সংসারের [illegible] বুঝিয়া লইয়াছেন। তাঁহারা আর সুলোচনাকে স্থান দিতে চাহেন না! আমি সুলোচনাকে লইয়া বিপদে পড়িয়াছি। গৃহিণী থাকিলে আমাকে এ সকল ভাবনা ভাবিতে হইত না, এবং সুলোচনারও এরূপ অনাদর হইত না। তোমার যাওয়ার বৎসরাধিক পরেই গৃহিণীর মৃত্যু হইয়াছে; সেই অবধি সুলোচনা আমাকে ভিন্ন আর কাহাকেও জানে না। আমি না দেখিলে আর কেহ তাহাকে দেখিবার নাই, এবং আমি না শুনিলে তাহার দুঃখ শুনিবারও আর কেহই নাই। তাহাও একরূপ বরদাস্ত করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু এক্ষণে বধূমাতাগণ তাহার উপর যেরূপ জুলুম করিতেছেন, তাহা আর বরদাস্ত হইয়া উঠিতেছে না। হয় ত মাসের মধ্যে ২০ দিনই সুলোচনার অনাহারে যায়। আমি পিতা হইয়া তাহার দুঃখ দেখিয়া কেমন করিয়াই বা থাকি? সুতরাং আমারও তাহারই দশা ঘটিয়াছে। এই সকল নিরাকরণার্থই, আমি অদ্য ভাবিয়া এই স্থির করিয়াছি যে, আমার আর কন্যা নাই, পুত্রেরা যাহা পারে করুক, তুমি যদি রাজি হও, বিধবা-বিবাহ-মতে সুলোচনার পাণিগ্রহণ কর। আর, তাহা হইলে, আমি একটী জমী ও গৃহ-নির্ম্মাণোপযোগী অর্থ ও আমার এখানকার সমস্ত পশার ক্রমে ক্রমে তোমাকে দিয়া যাইব। এইরূপ হইলে, তুমি সুলোচনাকে লইয়া দাম্পত্য-সুখে বসবাস করিতে পার কি না? আমি কেবল তোমার এই উত্তরের প্রতীক্ষায় আছি। তোমার যদি কোন আপত্তি থাকে অথবা সমাজ-বন্ধনের ভয় থাকে, বল। আমি তোমার কোন অনিষ্ট করিতে চাহি না; নতুবা আমি সুলোচনাকে লইয়া কাশীবাসী হই। সুলোচনাকে তোমাকে দিয়া গেলে আমি সুস্থ মনে যাইতে পারি;

নতুবা চিরকালই মনোকষ্টে কাটাইতে হইবে। আমি কেবল তোমার উত্তরের প্রতীক্ষায় আছি। তুমি যাহা বিবেচনা কর, আমাকে এখনিই উত্তর দাও। যদি সুলোচনাকে নিতে ইচ্ছা কর, তবে দু'চারি দিন থাকিয়া, তোমাদিগকে যাহা দিতে হয় বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া যাইব। নতুবা রজনী প্রভাতেই তুমিও যেমন হরিপদকে লইয়া বাহির হইবে, আমিও তেমনি সুলোচনাকে লইয়া ৺ কাশীধাম যাত্রা করিব—এইরূপ স্থির করিয়াছি।"

আমি এই প্রস্তাবে আর ইতস্ততঃ না ভাবিয়া, হরিপদর যে উপায় হইবে ও সে যে স্বচ্ছন্দে খাইতে পাইবে ও মনের সুখে থাকিবে—এই ভাবিয়াই, আমার মন আনন্দে পরিপূর্ণ হইল ও আনন্দাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। তাহাতে কহিলাম,—"আপনার প্রস্তাবে আমি স্বীকৃত আছি। বিশেষ, আমি হরিপদর জন্য বড়ই চিন্তিত আছি। আমি সমাজ গ্রাহ্য করি না যদি আমার হরিপদ ভাল থাকে।" ডাক্তার বাবু, এই কথা শুনিয়া, হৃষ্টচিত্ত হইয়া আমাকে শয়ন করিতে বলিয়া, নিজে উপরে চলিয়া গেলেন।

বাঙ্গালার বিবরণ।

বর্দ্ধমান।

ষষ্ঠ প্রস্তাব।

গতবারে প্রতাপচাঁদ বাহাদুরের বিষয় শেষ করা গিয়াছে। এইবার আমরা মহাতাপচাঁদ রাজার কথা কিছু কহিব। এস্থানে পাঠককে একটী কথা বলা আবশ্যক হইয়াছে। প্রতাপচাঁদের সঙ্গে সঙ্গেই এই রাজগোষ্ঠির ঔরসজাত সন্তানের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল। মহাতাপচাঁদ বাহাদুর হইতে পোষ্যপুত্র রাজার রাজত্বের সূত্রপাত। আর, এই সঙ্গেই বর্দ্ধমান-রাজবাটীর সহিত বাঙ্গালীর সম্বন্ধ অনেকটা ঘুচিল। প্রতাপচাঁদ পর্য্যন্ত বর্দ্ধমান-রাজবাটীর সঙ্গে বাঙ্গালীর ঘনিষ্ঠতর যে সংশ্রব ছিল, তাহা ক্রমশঃ অন্তর্হিত হইতে লাগিল।

মহাতাপচাঁদ।—মহাতাপচাঁদ যে সালে জন্মগ্রহণ করেন, বঙ্গের ইতিবৃত্তে সেই সাল, অতি শুভকর। ১২২৭ সালে তাঁহার জন্ম হয়। ঐ বৎসরেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয় কুমার দত্ত এই দুই স্বনামধন্য পুরুষ, বঙ্গের ক্রোড়ে ভূমিষ্ঠ হন। তদ্ভিন্ন, আর এক কথাও পাঠককে বুঝিতে হইবে। মহাতাপচাঁদ, পরাণ বাবুর চতুর্থ পুত্র ও অষ্টম সন্ততি। এ সকল শুভসংযোগের ফলেই তাঁহার ভাগ্যে রাজপাঠ ঘটিয়াছিল! ১২৩৯ সালে তেজচাঁদ বাহাদুরের পরলোক হইলে, তৎপর বৎসরে (১২৪০ সালে) মহাতাপচাঁদকে ইংরেজ-রাজ এক খেলাত পাঠাইয়া দেন। কীর্ত্তিচন্দ্র বাহাদুরের বিবাহিতা কমলকুমারী তখন রাণী হইলেন। * ইনি পরাণ বাবুর ভগ্নী; সুতরাং মহাতাপচন্দ্রের পিসী। তিনি আপন ভ্রাতা

* এই সময় ও ইহার পূর্ব্বেও, পরাণ বাবু রাজকর্ম্মচারী সকলের ও প্রজাপুঞ্জের নিতান্ত অপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহার কারণ,—

(১) রাণী কমলকুমারীর প্রতিনিধি হইয়া পরাণ বাবু যে সময় কর্ত্তৃত্ব করেন, তখন লোকে তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত না। কারণ, সকলেই তাঁহার পূর্ব্ব-বৃত্তান্ত জানিত।

(২) তিনি প্রতাপচাঁদের বিদ্বেষী।

(৩) প্রতাপের রাজত্বে ভাগ বসাইবার জন্য আপন বালিকা কন্যা বসন্তকুমারীর সহিত ৮০ আশী বৎসরের বৃদ্ধ রাজার বিবাহ দেন।

(৪) কৌশল-ক্রমে আপন পুত্রকে পোষ্যপুত্র লওয়াইয়াছিলেন।

পরাণ বাবু যে লোকের অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ নিম্নে দেখুন;—

"The present Zeminder is an infant and an adopted son of the late Raja Tejchand, still under the tutilage of his natural father Paran-Babu, whose administration of these vast possession has rendered the family unpopular in the extreme."—*Ogilyy's address to the Supreme Court.*

পরাণ বাবুকে দেওয়ান নিযুক্ত করিয়া রাজকার্য্য চালাইতে লাগিলেন; কেন-না, তখন মহাতাপচন্দ্র নাবালক ছিলেন।

১২৫০ সালে তেইশ বৎসর বয়সে প্রাপ্ত-বয়স্ক হইয়া মহাতাপচাঁদ বাহাদুর রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। ইহাতে তাঁহার গৌরব যথেষ্ট বাড়িয়াছিল। তিনি একজন সুশিক্ষিত জমীদার ছিলেন। তিনি বর্দ্ধমান-সহরে একটি উচ্চ-শ্রেণী উৎকৃষ্ট ইংরাজি ও বাঙ্গালা স্কুল স্থাপন করেন; তাহাতে ন্যূনাধিক ৫০০ শত ছাত্র অধ্যয়ন করিত। এখানে ইংরেজি, বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও পার্শি ভাষায় পাঠনা চলিত। তাঁহার যত্নে বর্দ্ধমান ও কাল্‌নায় অতিথিশালা ও চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের (১২৭২ সালের) দুর্ভিক্ষে, মহাতাপচাঁদ মুক্ত-হস্তে দান করিয়াছিলেন।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে (১২৬২ সালে) সাঁওতাল-বিদ্রোহে, মহারাজ, লোক ও অর্থ দ্বারা গবর্ণমেণ্টের আনুকূল্য করিয়াছিলেন।

তিনি, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, চন্দ্রশেখর দেব, শম্ভুচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতিকে সদস্যপদে নিযুক্ত করিয়া সুনিয়মে রাজ্য-পালন করিতে লাগিলেন। তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ও চন্দ্রশেখর দেব প্রভৃতি অতি সদ্বিদ্বান্ ও রাজা রামমোহন রায়ের সহচর ও অনুচর ছিলেন। অধিক কি, ইঁহাদেরই বন্দোবস্ত-মত অদ্যাপিও রাজবাটীর সব কর্ম্মকাণ্ড এবং হিসাবপত্র চলিয়া আসিতেছে। সে বন্দোবস্ত বড়ই পাকা বন্দোবস্ত।

সংস্কৃত মূল মহাভারতের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করা তাঁহার এক অন্যতম কীর্ত্তি। বর্দ্ধমান-রাজবাটীর মহাভারতের বিজ্ঞাপনে উল্লেখ* আছে,—

'মহাতাপ বাহাদুর, কাশীরাম দাস-প্রণীত পদ্য মহাভারত শুনিয়া পরিতৃপ্ত হইতেন না। তাহা পড়িতে পড়িতে স্বতঃই তাঁহার প্রণত মূলানুবাদ মহাভারত পড়িতে ইচ্ছা হয়। আর, এই কারণে, তিনিই, ১২৬৫ সালের বৈশাখে, তারকনাথ তত্ত্বরত্ন, জগন্মোহন তর্কালঙ্কার, রামতনু তর্কসিদ্ধান্ত, পদ্মলোচন ন্যায়রত্ন, শ্যামাচরণ তত্ত্বাগীশ, বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, সারদাপ্রসাদ জ্ঞাননিধি, নারায়ণ চট্টরাজ গুণনিধি, কেবারনাথ বিদ্যাবাচস্পতি, ব্রজেন্দ্রকুমার বিদ্যারত্ন, উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন ও অঘোরনাথ তত্ত্বনিধি—এই সকল উত্তম উত্তম সুপণ্ডিতগণের সাহায্যে সংস্কৃত মহাভারতের সহিত বঙ্গানুবাদ করাইতে প্রবৃত্ত হন।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে (১২৬৪ সালে) সিপাহী-বিদ্রোহের সময় মহারাজ বিস্তর আনুকূল্য করায়, গবর্ণমেণ্ট অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। তিনি বর্দ্ধমান, বীরভূম, কাটোয়া প্রভৃতি স্থানের পথ মুক্ত রাখিয়াছিলেন। রাজবাটীর গো-শকট ও হস্তী, গবর্ণমেণ্টের হস্তে অর্পিত হইয়াছিল। এই সকল ও অন্যান্য সৎকর্ম্মের পুরস্কার-স্বরূপ ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে (১২৮১ সালে) তিনি ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য মনোনীত হন। এই পদে তিনি তিন বৎসর সম্মান-সহকারে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বঙ্গদেশের মধ্যে তিনিই প্রথম সদস্য। তিনি এক ভাষা প্রস্তুত করিতেছিলেন। তাহা নিজ-নামে খ্যাত হইতেছিল। ভাষার নাম 'মহাতাপী ভাষা।' বর্দ্ধমানের কোন কোন স্কুলে তাহা পঠিত হইত।

১২৮৬ সালে ৫৯ বৎসর বয়সে মহাতাপচন্দ্র বাহাদুরের মৃত্যু হয়।

* কিন্তু এখানে একটি গুরুতর বিষয় উল্লিখিত হয় নাই। ইহার অনেক পূর্ব্বে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় পণ্ডিতপ্রবর বিদ্যাসাগর মহাশয় মহাভারত অনুবাদিত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তৎপরে, দেশহিতৈষী কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় কর্ত্তৃক মহাভারত অনুবাদিত হইয়াছিল। ইহার অনেক পরে বর্দ্ধমান-রাজবাটী হইতে মহাভারতের প্রচার আরম্ভ হইয়াছিল। আর, এই সর্ব্বজনবিদিত ব্যাপার ঐস্থলে কেন উল্লিখিত হয় নাই, তাহার কারণ অনুধাবন করা আমাদের বুদ্ধির অগম্য।

এদেশীয় লোকের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে তিনি আপন জন্মদাতা পিতার নিকট শিখিয়াছিলেন। তিনি নিজে বাঙ্গাল ; কিন্তু হিন্দুস্থানী ব[illegible] করিয়াছিলেন বলিয়া, পত্নীর সংসর্গে ও তাঁহার উপদেশে হিন্দুস্থানী পরিচ্ছদ-পরিধান ও তদুপযুক্ত আচার ব্যবহার করিয়া লইলেন। স্বয়ং ক্ষত্রিয় হইয়া বসিলেন ; অন্যকেও ক্ষত্রিয় সাজাইলেন ; 'কাপুর' প্রভৃতি ক্ষত্রিয়োচিত উপাধি পুনর্গ্রহণ করাইলেন। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ ছাড়িয়া সারস্বত ব্রাহ্মণের আমদানি করিলেন ; এত কাল যে নিয়মে নবান্ন চলিয়া আসিতেছিল, তাহা রহিত করিয়া তৎপরিবর্ত্তে হিন্দুস্থানী মতে নবান্ন প্রবর্ত্তিত করিয়া দিলেন।

পত্তনি-প্রথা প্রচলিত হওয়াও, ঐ সম্বন্ধ-ত্যাগের দ্বিতীয় কারণ। পত্তনির পর হইতে প্রজার সঙ্গে রাজার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ থাকে না। পত্তনিদারের সহিত তখন প্রজাবর্গের ঘনিষ্ঠতা ঘটে। কতকটা সে কারণেও মহারাজের বাঙ্গালী-সংস্রব ত্যাগ হইয়াছিল, বলিতে হইবে।

আফ্‌তাপচাঁদ।—মহাতাপচাঁদ বাহাদুরেরও কোন সন্তান-সন্ততি হয় নাই, সুতরাং তিনি আফ্‌তাপচাঁদকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। যে মহাভারতানুবাদ মহাতাপচাঁদের সময়ে আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা ইঁহারই জীবদ্দশায় সমাপ্ত হয়। আফ্‌তাপ বাহাদুরের দীর্ঘজীবন হয় নাই। তিনি অত্যন্ত বিলাসী হইয়া উঠিয়াছিলেন। ইঁহারও পুত্রাদি জন্মে নাই।

বিজয়চাঁদ মহাতাপ।—ইনিই এক্ষণে বর্দ্ধমানের রাজা। ইনি, আফ্‌তাপচাঁদের পোষ্যপুত্র ; এবং শ্রীযুক্ত লালা বনবিহারী কাপুরের ঔরস-পুত্র। শ্রীযুক্ত লালা বনবিহারী কাপুরের কর্ত্তৃত্বেই প্রধানতঃ এখন ইহার সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে। অল্প বয়সেই ইহার অনেক সৎকার্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা, ইনি দীর্ঘজীবি হইয়া কীর্ত্তির সহিত প্রজাপালন করিতে থাকুন।

বর্দ্ধমানের দর্শনীয় বস্তু।

১। বর্দ্ধমানের রাজবাটী।—ইহা যেমন সুদৃশ্য ও তেমনই সুশৃঙ্খলা-বদ্ধ। একত্র শ্রেণী-বদ্ধ হর্ম্ম্যরাজি দেখিয়া দর্শকের নয়ন-মনঃ-প্রাণ সার্থক হয়।

২। রাজোদ্যান—গোলাপবাগ।—এখানকার আর একটি প্রধান দ্রষ্টব্য বিষয়। অনেক সহরেও এপ্রকার উদ্যান নিতান্ত দুর্লভ।

৩। শিবালয়—এখানকার তৃতীয় দৃশ্য। যদিও কালনার মত এখানে শিব-মন্দির সংখ্যায় অধিক নাই, তথাপি যে কয়েকটি আছে, সেগুলিও যার-পর-নাই মনোরম।

৪। বর্দ্ধমানের প্রায় ১০ ক্রোশ অন্তরে, কস্তা-গ্রামের দক্ষিণে, অজয়ের নিকট এক সুন্দর মন্দির বর্ত্তমান থাকিয়া এখানকার শোভা বিস্তার করিতেছে। মন্দিরের নাম "মোহন মন্দির"। কথিত আছে, বিদ্যাসুন্দরের সময়ের চণ্ডী-দেবীরই এই মন্দির। যাহা হউক, সে বিষয় পরে আলোচিত হইবে।

৫। কৃষ্ণসায়ার, শ্যামসায়ার, রাণীসায়ার প্রভৃতি দীঘিগুলিও বর্দ্ধমানের দ্রষ্টব্য বিষয়। এত বড় বড় দিঘী বড়ই বিরল। বিশেষতঃ কৃষ্ণসায়ারটি ও ইহার পাড় প্রভৃতি আরও মনোরম।

৬। কালনার ১০৮ শিবমন্দির ও সা মজলিসের সমাধি, পীর বহুম খাঁর সমাধি, শের আফগানের সমাধি ও কুতব উদ্দীনের সমাধি—এইগুলিই এখানকার প্রাধান্য বিস্তার করিতেছে। সা মজলিস, একজন বিখ্যাত পয়গম্বর। এখানে যাত্রীর প্রচুর সমাগম হইয়া থাকে। পীর বহুম খাঁ, পারস্য-দেশীয় কবি। তিনি আগরা হইতে সিংহল যাইবার সময় ১৫[illegible]৪ খৃষ্টাব্দে এখানে পরলোক-গত হন। ইহার সমাধির নিকট আরও দুইটি সমাধি দৃষ্ট হয়। একটি, নুরজাহানের

প্রথম স্বামী শের আফগানের সমাধি ; এবং অপরটি, বাঙ্গালার তৎকালীন শাসনকর্ত্তা কুতবুদ্দীনের সমাধি—১৬১৬, খৃষ্টাব্দে উহা নির্ম্মিত হয়। শের আফগান এবং কুতবুদ্দীন দুই জনেই পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। কুতবুদ্দীন, সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের আজ্ঞাক্রমে গোপনে শের আফগান খাঁকে হত্যার চেষ্টা পান। বর্দ্ধমানের রেলওয়ে-ষ্টেশনের পূর্ব্বে [illegible]ধিনপুরে এই সকল দেখা যায়। বর্দ্ধমানের বড় মসজিদ, ঔরঙ্গজেবের পৌত্র আজিমওশান কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। ১৬৯৭—১৭০৪ খৃঃ পর্য্যন্ত তিনি বঙ্গের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। এই সময়ের মধ্যেই উহা সমাহিত হইয়াছিল।

নদী ও খাল।

এই সকল নদী বা খাল বর্দ্ধমানের সীমাভুক্ত।

টুনি খাল, কুন্নুর } অজয়ে মিলিত।

খড়ি—পশ্চিমে। বুদ্বুদের সীমাভুক্ত।

বাঁকা—ঠিক্ বর্দ্ধমানে।

মায়া—শাহাবাদে।

নুনিয়া, সিঙ্গারন্, তাম্‌লা নদী, কুকুই, ছোট ধনকিশোর বা কাণা নদী } দামোদরে মিলিত।

দামোদর—বর্দ্ধমান-জেলার পশ্চিম-সীমায়।

অজয় নদী—বর্দ্ধমান জেলার উত্তর-সীমায়।

ভাগিরথী (গঙ্গা)—বর্দ্ধমান-জেলার পূর্ব্ব-সীমায়।

প্রাচীনত্বের নিদর্শন।

এই প্রস্তাবের প্রথমেই আমরা বর্দ্ধমানের প্রাচীনত্বের বিষয় প্রকাশ করিয়াছি। এখানে তাহার কিছু পোষক প্রমাণ দিব।

(১) মেমারির রেলওয়ে-ষ্টেসনের কিয়দ্দূরে [illegible]র পরগণার অন্তর্গত কুলীনগ্রামের নিকট [illegible] দুর্গ ছিল।

(২) ভাটাকুল-পল্লীর সমীপে আজমৎসাহি পরগণায় "রামচন্দ্র গড়" নামে আর একটি দুর্গ বিদ্যমান ছিল।

(৩) অজয়-নদীর সন্নিধানে শারসর পরগণার সীমা-মধ্যে রাণীগঞ্জের উত্তরে দুই দুর্গের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে।

নানা কথা।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে বর্দ্ধমানে মেলেরিয়া রাক্ষসী প্রবিষ্ট হইয়া ইহাকে শ্রীভ্রষ্ট করিয়া দেয়। ইহার দুই বর্ষ পরে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের মে মাসে, ইহা মিউনিসিপালিটি ভুক্ত হওয়ায়, কিছুদিন ইহার স্বাস্থ্য উন্নত হইবার সূচনামাত্র হয়। এই সময়ের পর চারি বৎসর অতীত না হইতেই ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে আবার মেলেরিয়া রাক্ষসীর প্রকোপ ভীষণতর হইতে লাগিল। এই সময়টি মেলেরিয়ার যৌবন-দশা। পর বর্ষে (১৮৭০ খৃঃ) অত্রত্য কালেক্টর, গবর্ণমেণ্টের গোচরে লিখিয়া পাঠাইলেন,—৬ ছয় মাসের মধ্যে ৫০০০ পাঁচ সহস্র প্রাণী কালের করাল কবলে নিপতিত হইয়াছে। ইহাপেক্ষা ভীষণতম উগ্র মূর্ত্তি আর কি হইতে পারে!

বর্দ্ধমান-জেলার

পরিমাণ ফল।	লোকসংখ্যা।	গ্রাম সংখ্যা।
২,৬৮৭ বর্গ মাইল।	১,৪৭৭,৮৩৩।	৩,৭৯৪।

নগর ও গ্রাম সকল।

এক্ষণে, বর্দ্ধমান-জেলার প্রধান প্রধান নগর ও গ্রাম-সকলের তালিকা* প্রদান করিয়াই এ অংশের উপসংহার করা যাইতেছে। বর্দ্ধমান-

* এই প্রবন্ধের সূচনায় জাহানাবাদ-মহকুমার অন্তর্ভুক্ত খানাকুল-কৃষ্ণনগর প্রভৃতি কতকগুলি স্থানের নাম উল্লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু, পূর্ব্বে যদিও সেগুলি বর্দ্ধমান-জেলার অন্তর্নিবিষ্ট ছিল, এক্ষণে জাহানাবাদ-মহকুমা হুগলী-জেলার মধ্যে গণ্য হওয়ায়, ঐ সকল গ্রামও হুগলী-জেলার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। সুতরাং এ তালিকায় ঐ সকল নাম পরিত্যক্ত হইল ; পরে হুগলি জেলার আলোচনার সময় উহা আলোচিত হইবে।

জেলায় প্রধানতঃ এই সকল গ্রাম ও নগর গুলিই কিঞ্চিৎ প্রসিদ্ধ। যথা —

১। **বর্দ্ধমান** (সদর জেলা), (ক) ইদাস †, (খ) খন্দঘোষ †, (গ) সালিমাবাদ †, (ঘ) গাঙ্গুরিয়া †, (ঙ) সাহেবগঞ্জ †, (চ) মেমারি ‡, (ছ) শক্তিগড় ‡, (জ) সাতগেছে, (ঝ) চকদিঘী, (ঞ) কাঞ্চননগর, (ট) চম্পাই।

২। **কালনা** *, (ক) পূর্ব্বস্থলী †, (খ) মন্তেশ্বর †, (গ) ভাতুড়িয়া, (ঘ) চক-ব্রাহ্মণগড়িয়া, (ঙ) মাউগাছি-জাহানগর, (চ) সুমুদগড়িয়া, (ছ) কাইগ্রাম, (জ) নাদনঘাট।

৩। **কাটোয়া** *, (ক) মঙ্গলকোট †, (খ) কাটাগ্রাম † (গ) অগ্রদীপ, (ঘ) কাঁইহাট, (ঙ) শ্রীখণ্ড, (চ) রামজীবনপুর, (ছ) পাটুলি।

৪। **বুদ্‌বুদ** *, (ক) আউসগ্রাম †, (খ) মানকর ‡, (গ) গুস্কারা ‡।

৫। **রাণীগঞ্জ** *, (ক) কাকসা †, (খ) নিয়ামৎপুর †, (গ) বরাকর ‡, (ঘ) সীতারামপুর ‡, (ঙ) আসানসোল ‡, (চ) সিয়ারসোল ‡, (ছ) দুর্গাপুর ‡, (জ) শ্যামবাজার, (ঝ) তাপসী ‡, (ঞ) নিমচা ‡, (ট) মঙ্গলপুর ‡, (ঠ) বারাসোল ‡, (ড) আন্দাল ‡, (ঢ) পানাগড় ‡, (ণ) রাজবন্দ ‡।

এই সকল গ্রাম ও নগরগুলিই বর্দ্ধমান-জেলার মধ্যে একরূপ প্রধান। ইহা ছাড়াও অবশ্য ২।৪ টি থাকিতে পারে। যাহা হউক, ক্রমশঃ এসকলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ হইলে, সে সকলেরও উল্লেখ হইতে পারিবে। এক্ষণে,

সাধারণের প্রতি নিবেদন

এই যে, বর্দ্ধমান-জেলা ও তাহার অধীনস্থ ঐ সকল ও অন্যান্য গ্রামের বিষয়ে যাহা যাহা জানেন বা চেষ্টা করিয়া জানিতে পারেন, তৎসমস্ত আমাদের ('অনুসন্ধান'-কার্য্যালয়ে) লিখিয়া পাঠাইলে সাদরে গৃহীত হইবে; এবং তাঁহার নামও কৃতজ্ঞতা-সহকারে 'অনুসন্ধানে' লিখিত হইবে। নিম্ন "বর্দ্ধমান"-সম্বন্ধেও আমরা যাহা কিছু লিখিতেছি, তাহার অতিরিক্ত যাঁহার যাহা জানা আছে, তাহাও লিখিলে সাদরে গৃহীত হইবে। যে যে বিষয়ের বিবরণ লিখিতে হইবে, তাহা এই ;—

(ক) কোন্ থানার অধীনে কতগুলি গ্রাম আছে, তাহার সকলগুলির নাম।

(খ) গ্রামের প্রাচীনত্বের কোন নির্দ্দর্শন থাকিলে, তাহা প্রমাণের সহিত পাঠান আবশ্যক।

(গ) চতুঃসীমা ও পরিমাণ। লোকসংখ্যা।

(ঘ) জল-বায়ু-মৃত্তিকার গুণাগুণ।

(ঙ) দেবমন্দির, মজ্‌সিদ, গির্জা, ইত্যাদি।

(চ) কোন অলৌকিক ঘটনা বা গল্প।

(ছ) কোন্ কোন্ বর্ণের (ব্রাহ্মণাদি) লোক, গ্রামের অধিবাসী।

(জ) স্কুল, ডাকঘর, ধর্ম্মসভা, ইত্যাদি গ্রামের বর্দ্ধিষ্ণু বা প্রাচীন বংশের পরিচয়াদি।

---

* এইগুলি মহকুমা (Sub Division,)
† এইগুলিতে থানা আছে।
‡ এইগুলিতে রেলওয়ে ষ্টেসন আছে।

পাপের প্রতিফল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বিচার।

আজ হরদেব সিংহের বিচার! "ভূপলাল হত্যাকারী ধৃত হইয়াছে"—এসংবাদ বিদ্যুৎবেগে সমস্ত নগরে প্রচারিত হইয়াছে। দলে দলে লোক বিচার দেখিবার জন্য বিচারালয়ে উপস্থিত হইতেছে। বিচারালয় লোকারণ্য।

বিচারপতি বিচারাসনে উপবিষ্ট। স্বতন্ত্র আসনে হরদেব উপবিষ্ট; দূরে আসনে বীরেন্দ্র ও বলেন্দ্র উপবিষ্ট; সকলে দাঁড়াইয়া আছে।

কিয়ৎক্ষণপরে বিচারপতি গম্ভীর বলিলেন,—"বীরেন্দ্র! হরদেব সিংহের এই দোষারোপ করিয়া তাঁহাকে বিচারালয়ে আনয়ন করিবার পূর্ব্বে তোমার ভাল করিয়া বিবেচনা করা উচিত ছিল। এখনও বিবেচনা করিয়া দেখ, তাঁহার বিরুদ্ধে তোমার প্রচুর প্রমাণ আছে কি না? যদি প্রমাণ করতে না পার, তাহলে তোমাকে চিরজীবনের জন্য কারারুদ্ধ হয়ে থাকতে হবে।"

বীরেন্দ্র।—প্রমাণ যথেষ্ট সংগৃহীত হয়েছে।

বিচারপতি।—ভাল, তবে বিচার আরম্ভ হ'ক। বীরেন্দ্র, তোমার অভিলাষ ব্যক্ত কর।

বীরেন্দ্র।—গত মঙ্গলবার রাত্রে ভূপলাল নামক এক ব্যক্তি, একজন গাড়োয়ানের গাড়ীর মধ্যে, কোন অজ্ঞাতনিত ব্যক্তি কর্ত্তৃক নিহত হয়। অনেক অনুসন্ধান ও প্রমাণ-পরম্পরা দ্বারা আমি স্থির করেছি যে, এই নগরের প্রধান ধনী হরদেব সিংহই তাকে হত্যা করেছেন। সেইজন্য, তাঁহাকে সমস্ত সাক্ষীর সহিত এই বিচারালয়ে উপস্থিত করেছি। এক্ষণে, ধর্ম্মাধিকারের বিচারে যেরূপ হয়!

বিচারপতি।—মহাত্মা হরদেব সিংহ! আপনার যা কিছু বক্তব্য আছে, বলুন।

হরদেব।—আমি এসম্বন্ধে আপাততঃ অধিক কিছুই বল্‌বো না। কারণ, ধর্ম্মের গতি অতি সূক্ষ্ম! বিচারে সত্য আপনিই প্রকাশিত হবে। এক্ষণে, ধর্ম্মাধিকার অভিযোগকারীকে জিজ্ঞাসা করুন,—আমি কি প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য এই হত্যাকার্য্য করেছি! অনেকেই জানে, সেই ভূপলালের সঙ্গে আমার কন্যার বিবাহ হ'বার কথা ছিল।

বিচারপতি।—বীরেন্দ্র, এ প্রশ্নের উত্তর দাও।

বীরেন্দ্র।—ভূপলাল হরদেবের কন্যার অযোগ্য ছিল। সেইজন্য, তাহার সহিত তাঁর কন্যার বিবাহ দিবার ইচ্ছা ছিল না।

হরদেব।—সে ব্যক্তি আমার কন্যার অযোগ্য বলেই যে তারে হত্যা কর্‌তে হবে, এমন কিছু শাস্ত্রে লেখা আছে কি? সে অযোগ্য হলে আমি তাকে প্রত্যাখ্যান কর্‌তাম। আর, কেই বা বল্‌লে যে, সে অযোগ্য! বিদ্যাবুদ্ধি কোন অংশেই সে ন্যূন ছিল না; জাত্যংশেও সে নিতান্ত নিন্দনীয় নয়। কারণ, সে মৃত মগধ-রাজ বল্লভশক্তির পালিত পুত্র।

বীরেন্দ্র।—হয় ত সে আপনার কোন গুহ্য বৃত্তান্ত অবগত ছিল বলে আপনি তার বাধা ছিলেন; আর, সেই বাধা-বাধকতা দূর করবার জন্যই তারে হত্যা করেছেন।

হরদেব।—বীরেন্দ্র! তোমার কল্পনা-শক্তিকে সহস্র ধন্যবাদ! হরদেবের বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ চরিত্র বীরনগরের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা কাহারও নিকট অবিদিত নাই; কিন্তু তোমার চরিত্র আজ প্রকাশ হ'তে চল্লো। এখন বল, আমি কি উপায়ে তাকে হত্যা করেছি।

বীরেন্দ্র।—বিষ-প্রয়োগে!

হরদেব।—প্রমাণ?

বীরেন্দ্র।—বিশেষ প্রমাণ কিছু পাওয়া যায় নাই।

হরদেব।—আমি যে হত্যা করেছি, তার প্রমাণ?

বীরেন্দ্র।—মঙ্কনদাস!

মঙ্কনদাস উপস্থিত হইয়া তাহার বর্ণনা-পত্র ঠিক বলিল।

বিচারপতি।—মঙ্কন দাস বল্‌ছে, যে ব্যক্তি তার শকটে আরোহণ করেছিল, তার বয়স ২০।২২ বৎসর। কিন্তু হরদেবের বয়স যে তার দ্বিগুণেরও অধিক!

বীরেন্দ্র।—কিন্তু চন্দ্রালোকে তাঁকেও ২০।২২ বৎসরের যুবা বলেই বোধ হয়।

বিচারপতি।—ভাল মঙ্কনদাস, তুমি এঁকেই দেখেছিলে কি না বল দেখি?

মঙ্কন।—না, এঁকে কখনই না।

বিচারপতি।—কেন?—কিসে, উনি নন?

মঙ্কন।—না, সে উনি কখনই নন।

বিচারপতি।—কেন?

হরদেব।—এ প্রশ্নের উত্তর এখন থাক; আর কি কি প্রমাণ আছে, শ্রবণ করুন; তারপর মঙ্কনদাসের বাক্য শুনবেন।

বিচারপতি।—ভাল বীরেন্দ্র! তুমি বল দেখি, ইনিই যে গাড়ীতে উঠেছিলেন, তার প্রমাণ কি?

বীরেন্দ্র।—মাণিকচাঁদ!

মাণিকচাঁদ উপনীত হইল। মাণিকচাঁদ এখন কল্য রজনীর মাণিকচাঁদ নয়। তাহাকে দেখিলে বিশিষ্ট-কুলোদ্ভব বলিয়া বোধ হয়।

মাণিকচাঁদ।—ধর্ম্মাবতার! গত মঙ্গলবার রাত্রে আমি রামদুলালের মদের দোকানের মধ্য হতে বাহির হচ্চি, এমন সময় দেখ্‌লাম, ইনিই মঙ্কনদাসের গাড়ীর মধ্যে উঠ্‌ছেন।

বিচারপতি।—ইনিই যে উঠ্‌ছিলেন, তা তুমি কি করে চিনলে? গাড়োয়ান নিকটে থেকে দেখেছে, এবং বলচে যে, ইনি নন।

মাণিকচাঁদ।—তবে নাও হতে পারেন। আমি এঁকে দূর হ'তে দেখেছি,; আর সে সময় আমার মাথাও তত ঠিক ছিল না।

বিচারপতি।—তবে বীরেন্দ্রের মাথা খেতে এখানে এলে কেন?

মাণিকচাঁদ চলিয়া গেল।

বীরেন্দ্র বলিল,—"আমার আরও সাক্ষী আছে!"

দুলালচাঁদ আসিল।

বিচারপতি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কি জান?"

দুলালচাঁদ বলিল,—"ধর্ম্মাবতার, আপনি মা-বাপ, আপনার নিকট মিছে কথা বল্‌লে নরকে যেতে হবে। আমি এ সম্বন্ধে কিছুই জানিনে। আমি নিতান্ত গরীব; তাই বীরু-মশাই আমায় পাঁচটি টাকা দিয়ে বল্‌লেন,—তুই বলিস, আমি হরদেব সিংহ মশাইকে রাত্রে বাগানের মধ্যে দিয়ে যেতে দেখিছি। কিন্তু, কে জানে মশাই এখুনী মকর্দ্দমা। এই নিন পাঁচটা টাকা; বীরু-মশাইকে ফিরে দিন। আমি চলে যাই। আমি মনে করেছিলেম, যদি একটা মিথ্যা কথা বল্‌লে হরদেব সিংহ মশাইয়ের কোন উপকার হয়, তবে তা' করা উচিত। কিন্তু তা নয়—একে মিথ্যা কথা বলা, তায় তাঁরি সর্ব্বনাশ করা! না বাবা, একাজ আমা হতে হবে না!"

এই বলিয়া সে চলিয়া গেল।

হরদেব বলিলেন,—"মঙ্কন, বলত বাপু, আমি যে তোমার গাড়ীতে উঠি-নি, তার প্রমাণ কি?"

মঙ্কনদাস বলিল,—"আমি যে মশাই সে-দিন সন্ধ্যার সময় আপনাকে সৌরাঠের রাজ-বাড়ীতে রেখে এসেছিলাম!

বিচারপতি বলিলেন,—"বীরেন্দ্রকে বন্দী কর!"

বীরেন্দ্র বন্দী হইল।

বিচারপতি।—দেখ বীরেন্দ্র! তুমি যে পা-মন্ত্রণা-জাল বিস্তার করে সাধু হরদেবকে দণ্ডিত করতে ইচ্ছা করেছিলে, সে পাপের প্রতিফল তোমায় ভোগ করতে হবে। আমি মনে করে ছিলাম, তুমি শুধু অন্ধ-বিশ্বাসে হরদেবকে বন্দী করেছ; কিন্তু এখন দেখ্‌ছি, তা নয়,—তুমি তাকে দণ্ডিত কর্‌বার জন্য যথেষ্ট ষড়যন্ত্রও করেছিলে। কিন্তু ধর্ম্মের জয় অবশ্যই হয়, পাপের প্রতিফল অবশ্যই পেতে হয়। এই জন্য আমি তোমার চির-কারাবাস দণ্ডবিধান করলাম। বর্ত্তমান বর্ষে তুমি যবদ্বীপে নির্ব্বাসিত হবে।

নগরপালগণ বীরেন্দ্রকে কারাগারে লইয়া গেল। নগরবাসীগণ আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল। বিচারপতি হরদেবের হস্তধারণ করিয়া তাহাকে লইয়া নিজ-গৃহে গমন করিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

রহস্য-ভেদ।

হরদেব বিচারপতির সহিত উপবিষ্ট আছেন, এমন সময়ে একজন দ্বারপাল আসিয়া বলিল,—

"কোতোয়ালী হতে শোভনলাল সিংহ উপস্থিত হয়েছেন।"

বিচারপতির আদেশে শোভনলাল উপস্থিত হইয়া ভূমিষ্ট হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলে, তিনি তাঁহাকে বসিতে বলিলেন।

শোভনলাল উপবিষ্ট হইলে, বিচারপতি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"শোভনলাল, এ দুদিন কোথায় ছিলে?'

শোভনলাল।—কোথায় যে ছিলাম, তা কিছুই জানি না। যে দুদিন ছিলাম, বাহিরে যেতে পাই নাই; কাজেই বল্‌তে পারি না, সে কোন্ স্থান। যারা আমায় নিয়ে গিয়েছিল, তারাও যে কে, তাও জানি না। যাইহোক, তারা আমায় এই পত্রখানি দিয়েছে; এখানি আপনার পত্র—গ্রহণ করুন।

বিচারপতি সাগ্রহে পত্রখানি গ্রহণ করিয়া দেখিলেন, অমরপত্তন-রাজবাটী হইতে উহা আসিয়াছে। পত্রখানি এই,—

"শ্রীযুক্ত বীরনগরের প্রধান বিচারপতি

মহাশয় শ্রীচরণেষু,

"মহাত্মন্, শুনিলাম, মহাত্মা হরদেব সিংহ ভূপলাল নামক জনৈক ব্যক্তির হত্যাপরাধে বিচারাধীন হইয়াছেন; কোন কুচক্রী লোক তাঁহার উচ্ছেদ-সাধনের জন্য বদ্ধ-পরিকর হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক মহাত্মা হরদেব সিংহ কোন অংশে দোষী নহেন। এই কার্য্য কে করিয়াছে এবং কেন করিয়াছে, তাহা আমার অবিদিত নাই। এবং কি উপায়ে তাহাকে হত্যা করিয়াছে, তাহাও জানি। সমস্তই নিম্নে লিখিতেছি।

প্রথমে শ্রবণ করুন, ভূপলাল কে?—এই দুরাত্মার কথা লিখিয়া আমাকে লেখনী কলঙ্কিত করিতে হইল, ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট কষ্টকর। এই দুরাত্মা মৃত মগধরাজ বল্লভশক্তির পালিত পুত্র। এর যথার্থ নাম বিক্রমশক্তি। পাপী ভুচ্ছ রাজ্য-লোভে পিতৃ-প্রাণনাশেও কুণ্ঠিত হয় নাই। সেই পাপের প্রতিফল-স্বরূপ সে মগধরাজের ঔরষ-পুত্র চন্দ্রপ্রভের বন্ধু শ্রীদত্তের হস্তে নিহত হয়েছে; মর্ম্মস্থানে বিষাক্ত সূচীবেধ দ্বারা তার প্রাণ নষ্ট করা হয়েছে! এক্ষণে নিরপরাধী হরদেবের প্রতি পাছে কোন অত্যাচার হয়, এই ভয়ে এই তত্ত্ব প্রকাশিত হলো। নচেৎ এক জগদীশ্বর ব্যতীত আর কেহই এ সংবাদ জানিতে পারিবার সম্ভাবনা ছিল না। এক্ষণে, যাহাতে নির্দ্দোষী অব্যাহতি পাইয়া দোষী শাস্তি পায়, তাহার উপায় করুন।

(স্বাক্ষর) অমরপত্তনেশ্বরের কনিষ্ঠ পুত্র।"

পত্র সমাপ্ত করিয়া বিচারপতি শোভনলালকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি অমরপত্তন হতে কবে বহির্গত হয়েছ?"

শোভনলাল বলিলেন,—"আজ প্রাতে। কাল রাত্রে তাঁরা সংবাদ পেলেন যে, হরদেব বন্দী হয়েছেন; তাই শুনেই তাঁরা আমায় নৌকায় ক'রে নদীতীরে রেখে গেলেন।"

বিচারপতি।—অতি আশ্চর্য্য কথা! বীরনগর হতে অমরপত্তন পর্য্যন্ত এত সহজ পথ আছে—তাত জান্‌তাম না! তুমি সেখানে গিয়েছিলে কবে?

শোভনলাল।—গত পরশ্ব প্রাতে।

বিচারপতি।—যাহা হউক, তুমিই প্রতিশ্রুত পারিতোষিক প্রাপ্ত হ'বে।

* * * *

ইহার পরে, সন্ধানে সন্ধানে, প্রকৃত হত্যাকারীও ধৃত হইয়া রাজদ্বারে আনীত হয়। এবং প্রমাণাদি গ্রহণের পর, বিচারে তাহার করা-দণ্ডের আজ্ঞা হইল। 'পাপের প্রতিফল 'অবশ্যই ঘটে; আজ হোক, কাল হোক, তাহাতে কোন ক্রমেই নিষ্কৃতি নাই। যেরূপেই হউক, 'পাপের-প্রতিফল' একদিন না 'একদিন পাইতেই হইবে —এই-ই সত্য।

কবিতা ও গান।

নীতি-কবিতা।

১। ত্যাগেই কুকার্য্যের মুক্তি।

ভাল-মতে নহে যার শিক্ষিত হৃদয়।
সকল কুকার্য্যে তার বিরতি না হয়॥
কিন্তু সে যে কুকার্য্যের করে অনুষ্ঠান।
কুকার্য্য বলিয়া তায় হয় তার জ্ঞান॥
কুতর্কের-প্রসবিনী বুদ্ধির ঘর্ষণে।
সুকার্য্য করিতে তাহা যত্ন পায় মনে॥
কিন্তু কুতর্কের বলে না হয় কখন।
তামসী-তিমির অতি উজ্জ্বল কিরণ॥
কেহ কেহ স্বধর্ম্মী করিয়া অন্য জনে।
যত্ন পায় নিজকৃত কার্য্যের শোধনে॥
বুঝেনা যে স্বধর্ম্মী যদ্যপি কেহ হয়।
তবু তার কুকার্য্যতা ঘুচিবার নয়॥
জগত ভরিয়া যদি ব্যবহার হয়।
কুকার্য্যের কুকার্য্যতা তথাপিও রয়॥
নীলে যদি শ্বেত কয় জগত সকল।
নাহি হয় নীল তায় কখন ধবল॥

২। লজ্জা-ভয়।

অনলে মানব লভে বহুল মঙ্গল।
অকুশল হয় তায় আবার পুষ্কল॥
সুবুদ্ধি পুরুষ সদা অবধান বলে।
অবিরল কুশল লভেন সে অনলে॥
তথা লজ্জা-ভয় মানসিক গুণদ্বয়।
ভালমন্দ উভয়ের দ্বন্দ্ব কক্ষ হয়॥
যে ভয়-লজ্জায় লোকে কুকর্ম্মে ফিরায়।
কৈতবে অমৃত-রবে লিপ্ত করে তায়॥
পুরুষ-কুঞ্জর সর্ব্ব-কুকর্ম্ম-বর্জ্জনে।
লজ্জা-ভয়-কুফল না লভেন জীবনে॥

৩। সদোষ সজ্জন।

এমন পুরুষ প্রায় নাই এভুবনে।
দোষের কারণ কিছু নাই যাঁর মনে॥
এমন সরসী নাই কোথাও ভূতলে।
একটুক মলকণা নাহি যার জলে॥
সুবিদ্যের মনেও আছয়ে দোষ-বীজ।
লাঞ্ছন-নির্ম্মুক্ত তনু নহে সরসিজ॥
কিন্তু কৃত নিজ-দোষ বুঝিলে সজ্জন।
অনুতাপ-হুতাসন দহে তাঁর মন॥
করেন যে দোষ তিনি ভ্রমে একবার।
আবার না ঘটে কভু সে দোষ তাঁহার॥
কিন্তু যদি তিনি অতি সজ্জনতা-তরে।
হেরেন সে দোষ অতি তুচ্ছরূপে পরে॥
তুচ্ছ-দোষী বলিয়া গণেন দোষী সবে।
নির্দ্দোষীর মধ্যে তিনি গণ্য নন তবে॥
ক্রমে ইথে হয় তাঁর অবশ হৃদয়।
আবার সে দোষে হয় ইচ্ছা-কুধোদয়॥
সমুদয় তরি-ছিদ্র রুদ্ধ না হইলে।
অবশ্যই ডুবে তরি সরসী-সলিলে॥

*   *   *

শুকতারা।

চাঁদিম বিলুপ্ত-প্রায়, নিশী হেসে সরে যায়,
সুনীল গগণ-গায়, কে তুমি গো বালা?
প্রভাতে প্রভাতি গানে, কোকিল কাকলি তানে,
গাইছে ব্যাকুল প্রাণে, সেধে সেধে গলা।
তোমারে শুনায় নাকি, পল্লব-আড়ালে থাকি,
উষার কিরণ মাখি জগত ভুলিয়া?
তুমি বড় ভাগ্যবতী, উষার কিরণ-ভাতি,
ফোটে দেখ নিতিনিতি, তোমারে দেখিয়া।
প্রত্যহ নিশির শেষে, ব'স এসে হেসে হেসে,
ভুবন-মোহিনী বেশে, কাহার আশায়?
রূপসী তোমার ন্যায়, দেখিনে তো এধরায়,
জিজ্ঞাসি তোমারে তায়, বল না আমায়!
সুরবালা যদি হবে, একাকিনী কেন তবে,
আরো কত সাথী রবে, সঙ্গেতে তোমার।
স্ত্রী-স্বাধীনতা-রীতি, অমর-আলয় প্রতি,
এখনো বিলম্ব যাতি, বহু দূর তার!
দেবের তনয়া যদি, কেন তবে নিরবধি,
বহাও শোকের নদী, শিশিরের ছলে?
কি দুঃখে বলনা তারা, কেঁদে কেঁদে হও সারা,
একাকিনী এসে ধরা, বসিয়ে নিরলে?

হবে বুঝি বঙ্গনারী, বৈধব্য-শোকের ঝারি,
দগ্ধ বঙ্গভূমি'পরি ঢালিতেছ বসে?
কিম্বা কুলীনের মেয়ে, বিবাহে বঞ্চিত হ'য়ে,
এসেছ আকাশে ধেয়ে, কেঁদে কেঁদে শেষে?
পরিয়া কিরণমালা, বিরহ-বিধুরা বালা,
বলিতে হৃদয়-জ্বালা, এসো নিতি নিতি?
অসার সংসার এই, হৃদয় কাহারো নাই,
হে বালা, জাননা, তাই, কাকুতি-মিনতি!
তোমার স্বপ্নের ঘরে, আলো দিয়ে নিত্য যারে,
সেবিতে যতন ক'রে, সে গেল যখন;
আর কেহ নাই আর, এ সংসার অন্ধকার,
তাই ধ'রে তারাকার, হয়েছ এমন?
অথবা ভারত-লক্ষ্মী, সরোজ-কুসুম-অক্ষি,
ভারত-গৌরব-সাক্ষী, দেখিতেছ এসে?
তা যদি হয়লো তারে! তবে লো আকাশ'পরে,
মিছা সে মেঘের ধারে, থাকিওনা বসে।
কি আর দেখিবে বল? বিদেশে সকলি গেল,
যা কিছু সম্বল ছিল, বঙ্গের শেষের!
ধনরত্ন ছিল যাহা, আগেই ত গেছে তাহা,
আচার-পদ্ধতি আহা! গেল যে দেশের!
তাই তারা, বলি তোরে, পরিচয় দেনা মোরে,
কে তুই আকাশ'পরে, হ'স্‌লো উদয়?
কার জন্য নীরবেতে, কি দেখিস্ অবনীতে,
বসিয়া উদাস-চিতে, প্রভাত সময়?
এতক্ষণে শুকতারা, বুঝিনু তোমার ধারা,
কুসুম-ভূষণ-পরা, তুমি উষা-দূতী।
জগতের জীব-প্রাণে, স্বপন-কুহেলী গানে,
নবীন জীবন-দানে, কর শান্তমতি।

*   *   *

ভক্তের গান।

(কীর্ত্তন-মিশ্র কানেড়া-একতালা।)

অভয়-বারণ, পাপ তাপ-নাশন—
মুরারে! নারায়ণ নীরদবরণ।
মুরলীধারী, বনমালী, কেশীমর্দ্দন।
হের ভব-কারাগার, বড়ই আঁধার,
আকুল অন্তরে চাই, পথ নাহি পাই।
দিয়ে চরণ-তরী, ওহে হরি! দুর্গতি হর।
ভাসি পাপসাগরে, দয়া-ভিক্ষা চাই।
কমল পতি, কর মোর গতি,
সাধ বুঝি মোর পূরিল না হে!
দুঃখময় ভবে, শুধু ভেবে ভেবে,
ক্ষীণদেহ বুঝি অন্ত হলো হে!
(হরি হে, আমার প্রাণের হরি!)
হরিনাম-গান সাধ মিটিল না হে!
কোথায় আছ হে পদ্মপলাশ-লোচন!
একবার হৃদিমাঝে দেখা দাও নারায়ণ॥

অদ্ভুত জামাই-ষষ্ঠী।

জামাই-বাবুরা সব সাবধান! আগামী ১৯এ জ্যৈষ্ঠ, মঙ্গলবার, আপনাদের একটা মহা আনন্দের দিন! সম্ভবতঃ ঐদিন আপনারা সকলেই শ্বশুর-বাড়ী যাইতেছেন! বিশেষ, নূতন জামাই-মহাশয়েরা—আপনারা তো সেদিন যাবেনই! আরে, মাথার দিব্বি যে!

ভালই তো! যাবেন বই কি? কিন্তু একটু সাবধান!—একটু দেখে-শুনে যাবেন!

সন ১২৯৭ সাল এই গত বৎসর! জ্যৈষ্ঠ মাস, ষষ্ঠী তিথি—ঠিক এই সময়ই আর কি! হরিভূষণ বাবু কাছারীতে যাইবার মত বেশ-ভূষা পড়িতেছেন—আয়নার সম্মুখে দাঁড়াইয়া দাড়িটা আঁচড়াইতেছেন। এমন সময়ই, ডাক-পিওন তাঁহার হস্তে একখানি পত্র প্রদান করিল। পত্রের শিরোনামার মোহরটি দেখিয়াই, চুল-আঁচড়ান স্থগিত রাখিয়া, তিনি সেই পত্রখানি খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে, যদি আড়াল হইতে আড়-নয়নে পড়িতে পারেন, পাঠক মহাশয়গণও একবার তাহা পড়িয়া লউন।

"দীর্ঘায়ু নিরাপদেষু,"

হরি, অনেক দিন তোমার কোন সংবাদ পাই নাই। তজ্জন্য বড়ই চিন্তিত আছি। আমার শরীর মধ্যে বড়ই অসুস্থ হইয়াছিল;

তজ্জন্য, পরিবারাদি সঙ্গে লইয়া, কলিকাতায় আসিতে হইয়াছে। কিন্তু, ঈশ্বর-কৃপায় একরূপ আরোগ্য হইয়া উঠিতেছি; শীঘ্রই যে সম্পূর্ণরূপ আরোগ্য হইব, এরূপই আশা আছে। আর, সেইজন্যই, আরও কিছুদিন কলিকাতায় থাকিতে হইতেছে।

যাইহোক, এক্ষণে, আগামী ১৬ই জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার, ষষ্ঠী-উপলক্ষে তোমার এখানে একবার আসার বড়ই প্রয়োজন হইয়াছে। বাড়ীর পরিবারেরা তো তোমাকে আনিবার জন্য বড়ই ব্যগ্র হইয়াছে; বিশেষ, আমারও একবার তোমায় দেখিবার ইচ্ছা। যেরূপে হৌক, তুমি আসিবে, আমার একান্ত অনুরোধ।

আমার কলিকাতার বাসার ঠিকানা—বাবুরাম ঘোষের লেন, ৮ নং বাটী। তা সেজন্য তোমার তত চিন্তা নাই; কি জানি, আপিসের পর সন্ধ্যার ট্রেনে আসিলে, পাছে রাত্রিতে বাসা চিনিতে না পার, এইজন্য, রামবকস্ নামক একজন হিন্দুস্থানী বেহারাকে ষ্টেসনে তোমার জন্য অপেক্ষা করিবার বন্দোবস্ত করা গেল। সে, ঠিক ট্রেন আসিয়া থামিবার সময়, গাড়ির নিকট গিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে; তুমি তাহার নাম ধরিয়া ডাকিলেই, সে তোমাকে গাড়ি করিয়া বাসায় লইয়া আসিবে। ফলতঃ বৃহস্পতিবার রাত্রি ১০টার সময় যে ট্রেন কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিবে, ঠিক সেই ট্রেনেই আসিও; লোক প্রস্তুত থাকিবে। কোন-মতে যেন অন্যথা না হয়। ইতি তারিখ ১৩ই জ্যৈষ্ঠ, সন ১২৯৮ সাল।

আশীর্ব্বাদক
শ্রীচন্দ্রকিশোর শর্ম্মা।"

পত্রখানি পড়িয়াই হরিভূষণ বাবু একটু কি-যেন-কি ভাবিলেন। পরক্ষণেই মনে মনে বলিলেন,—"তা' তাই ভাল! কালই যাওয়া যাবে। আর কাজকর্ম্মও তো তেমন হাতে নেই! সোমবার নাগাদ না হয় ফিরে আসা যাবে।" এই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনে আরও কতই ভাবনা আসিল। কত দিন যে তিনি সরোজাকে দেখেন নাই, কতবার যে সে যাবার জন্য পত্র দিয়াছে—আর কাজের ঝঞ্ঝাটে তিনি যাইতে পারেন নাই,—এই সকল কথা একে একে তাঁহার মনে হইতে লাগিল। তারপর শ্বাশুড়ী-ঠাকুরাণীর জবানীও এক চিঠি পাইয়াছেন। সুতরাং আর কি থাকিতে পারেন? বিশেষ, অনেক দিন যাবৎ না যাওয়াতে, সরোজা বড়ই অভিমান করিয়া আছে—অভিমানে সে আজ মাস-খানেক পত্রই দেয় নাই! সুতরাং আরও কিনা যাইয়া থাকিতে পারেন? বিশেষ, নিজ-শ্বশুর-বাড়ীর গ্রামে হইলে, তাঁহার যাওয়া হইত কি না, সন্দেহ। কলিকাতার যাতায়াতের অনেকটা সুবিধা বলিয়াও, তিনি তাহাতে আর আপত্তিটি করিলেন না। তদ্ভিন্ন, অনেকদিন হইতে শ্বশুর-মহাশয়ের পীড়ার কথা শুনিতেছেন; অথচ একবার দেখা করাও হয় নাই। তাই যাওয়ার সেও একটা কারণ ধরিয়া লইলেন। কাজেই, তাঁহার যাওয়াই ঠিক হইল। সঙ্গে সঙ্গে বিপিনচন্দ্র চাকরকে ডাকিয়া বলিলেন,—"আজ একবার সেকরা-বেটার কাছে যাওতো বাপু! আজ যদি সে অনন্ত-বোড়াটী না দেয়, তবে সোনাটা ফেরত নিয়ে আস্‌বে—কাজ নেই আর গহনায়! ফল কথা, কাল আমায় সেখানে যেতেই হচ্ছে; এবারও ওটা না নিয়ে গেলে আর মুখ দেখাব কেমন করে?" বিপিনচন্দ্রও "যে আজ্ঞা" বলিয়া সেকরাবাড়ী বাহির হইল; সঙ্গে সঙ্গে তিনিও কাছারী রওয়ানা হইলেন। বলা বাহুল্য, কাছারীর তাড়াতাড়িতে আজ আর তাঁর চুল-টুলের তত 'কেয়ারি' হইল না!

হরিভূষণবাবুর বাড়ী ফরিদপুর-জেলায়। তিনি, যেমন হৌক একজন, জমীদারের ছেলে; অথচ লেখাপড়াও শিখিয়াছেন। গত বৎসর বি, এল পাশ করিয়া, এক্ষণে, নদীয়া-জেলায় ওকালতি করিতেছেন। অবশ্য পসার-টসার এখনও তাঁর তেমন হয় নাই; বাড়ী হইতে টাকাকড়ি আনিয়াই এখনও খরচপত্র চালান। তাহার শ্বশুর-বাড়ী যশোহর-জেলায়; শ্বশুরেরাও বেশ বর্দ্ধিষ্ণু বংশ।

... ...

১৭ই জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, রাত্রি ৯টা। দেয়ালদহ ষ্টেসনে ট্রেন আসিয়া, "পুঁ—উ—উ" করিয়াই, থামিল। হরিবাবু ডাকিলেন,—"রামবক্স! রামবক্স!" রামবকস্ প্রস্তুতই ছিল; অমনি, "আইয়ে মহারাজ" বলিয়া, তাঁহাকে ট্রেন হইতে নামাইল। এদিকে ঘোড়-গাড়িও প্রস্তুত; সুতরাং আর বিলম্ব হইল না। কতই আশায়, কতই আশ্বাসে, হরি বাবু শ্বশুর-বাড়ী চলিলেন! উপলক্ষ—জামাই-ষষ্ঠী!

ক্রমে গাড়ি আসিয়া একটী গলির সম্মুখে থামিল। যেখানে গাড়িখানি থামিল, সেখান হইতে ৮নং বাড়ীখানি প্রায় ২।৩ রসি অন্তরে অবস্থিত। ঠিক সেখানটিতে গাড়ি যাইবার রাস্তা নাই। সে গলিটি বড়ই অপ্রশস্ত। সুতরাং হরিভূষণ বাবুকে গাড়ি হইতে নামিতে হইল; রামবকস্ তাঁহাকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল। তাঁহার সঙ্গের 'পোর্টম্যাণ্টটি' সেই লইয়া চলিল। গাড়োয়ানকেও সেই ভাড়া দিয়াছিল; সুতরাং, উহাঁদের নামাইয়া দিয়া, গাড়োয়ানও চলিয়া গেল।

ক্রমে হরিভূষণ বাবু শ্বশুর-বাড়ীতে উপনীত! বাড়িটি দ্বিতল; বাহির হইতে দেখিতে বেশ সুছন্দ-সই বলিয়াই বোধ হয়। বাড়ীর দরজা তখন বন্ধ ছিল; রামবকস্ ডাকিতেই, ভিতর হইতে একজন দরজা খুলিয়া দিল। দরজায় একটী আলো জ্বলিতেছিল।

তাঁহারা দরজায় প্রবেশ করিতেই, বাহিরে যে বেহারা ছিল, তাহাদের একজন অমনি ছুটিতে ছুটিতে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল; এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে "জামাইবাবু আসিয়াছেন—জামাইবাবু আসিয়াছেন" বলিয়া বাড়ীর ভিতরও

এইরূপ একটা 'সোরগোল' উঠিয়া গেল। তাড়াতাড়ি অমনি ঝি উপর হইতে আলো লইয়া নামিয়া আসিল; বলিল,—"আসুন জামাইবাবু, উপরে আসুন। মা-ঠাক্‌কুরুণ ডাকছেন।" কাজেই, জামাইবাবুও ঝির সঙ্গে উপরে গমন করিলেন।

ঝি তখন, তাঁহাকে একটি ঘরে কাপড়-চোপড় ছাড়িতে বলিয়া, "মা-ঠাক্‌রুণ, জামাইবাবু উপরে এসেছেন" বলিতে বলিতে, যেন তাঁহাকেই ডাকিতে গেল। হরিভূষণ বাবু ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

ঘরটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। সুন্দর সাজান। তোফা খাট-গদি-মশারির বিছানা! পরিষ্কার আলোতে ঘরটি সুশোভিত। তা'ছাড়া ছবি, আয়না, ঘর সাজাইতে যা' কিছুর আবশ্যক, তাহার কিছুরই ত্রুটী দেখা গেল না। হৃষ্টমনে, পায়ের জুতা-যোড়াটী খুলিয়া, হরিবাবু সেই বিছানায় উপবেশন করিলেন।

এইরূপ কিছুক্ষণই বসিয়া আছেন। ভাবিতেছেন,—"এইশ্বাশুড়ী-ঠাকুরাণী আসিতেছেন! এই শ্বশুর-মহাশয় আসিতেছেন! এই সরোজা আসিতেছে!" একটু কোনরূপ শব্দ হয়, আর তাঁহার মনে ঐরূপ ভাবনার উদয় হয়। কিন্তু, কই, কেহই তো আর আসেন না! বেহারার হাতে 'পোর্টমেণ্ট' ছিল; সেও তো আর উপরে আসিল না—সে 'পোর্টমেণ্টই' বা কই? এইরূপই সাতপাঁচ তিনি ভাবিতেছেন। কিন্তু, সেই সঙ্গে সঙ্গে সেই সরোজার মুখখানি মনে পড়িতেছে, অমনি আবার অন্যমনস্ক হইতেছেন। এইরূপেই অনেকক্ষণ গেল। অবশেষে, কাজেই, তাঁহাকে ডাকিতে হইল,—"ঝি—ঝি—ও ঝি!—বেহারা—বেহারা—ও বেহারা!" কিন্তু সবাই নিরুত্তর!—কোনই সাড়াশব্দ নাই! অধিকন্তু, এই সময়ই, বাহিরের দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ শুনিতে পাইলেন।

এদিকে রাত্রিও অধিক হইয়াছে। কাজেই

তাঁহার মনে একটু ভাবনার উদ্রেক হইল। "শ্বশুর-মহাশয় কৈ? শাশুড়ী-ঠাকুরাণী কই? ঝি বা কই? কেউ তো আমায় অভ্যর্থনা করিল না?"—এইরূপ সাত-পাঁচ ভাবনাতেই ক্রমে তিনি চঞ্চল হইতে লাগিলেন। এদিকে 'পোর্টমেণ্টটাও' তো কই আসিল না? এইরূপই ভাবেন, আর "ঝি—ঝি! বেহারা—বেহারা" বলিয়া ডাক দেন।

এমন সময়ই একি বিভ্রাট! গোটা-দুই-তিন ষণ্ডামার্ক মুসলমান-গুণ্ডা সেই ঘরে প্রবেশ করিল। তাহাদের প্রত্যেকের হস্তেই এক-একখানি ছোরা! কি তাহাদের ভয়ানক চেহারা—কি ভয়ানক দৃশ্য! তাহারা আবার বলিতে লাগিল,—"বেটা, শ্বশুর-বাড়ী এস!—এস শ্বশুর-বাড়ী! ওকালতি-বুদ্ধি কি আর সব যায়গায় খাটে? যাক, এখন বাপের সুপুত্র হ'য়ে ভালোয় ভালোয় যদি কথা শুনিস্, তবে ভাল! নইলে, দেখ্‌ছিস্—এই ছোরা! যদি ভাল চাস্, তবে ঘড়ি, ঘড়ির চেন, টাকাকড়ি যা কিছু নগদ আছে, এখনই দে। নইলে, বুঝেছিস্ কি না! 'পোর্টমেণ্ট' বা তার মধ্যে যা-কিছু ছিল, সে সব তো পেয়েছিই; এখন, তোর সঙ্গে যা আছে, দে বল্‌টি।"

হরিভূষণবাবু তো অবাক! কি করেন? কিই বা বলেন? বলিলেই বা শোনে কে? রাত্রিও অনেক হইয়াছে; চেঁচাইয়া উঠিলেও কেহ শুনিতে পাইবে না; অথচ, তাহাতে প্রাণ-হানির সম্ভাবনা! কাজেই, হরিভূষণবাবুর সঙ্গে যাহা কিছু ছিল, তাহার সকলই জুয়াচোর-দিগকে দিতে হইল। বলা বাহুল্য, 'পোর্টমেণ্ট' এবং তাহার ভিতর সরোজার জন্য যে নূতন অনন্ত-জোড়াটি আনিয়াছিলেন, তাহা তো তাহারা পূর্ব্বেই লইয়াছিল; এক্ষণে, তাঁহাকে একখানি গামছা পরাইয়া, তাঁহার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইল। সঙ্গে সঙ্গে একজন, বাড়ীর পশ্চাৎদিক দিয়া, তাঁহাকে বাটীর বাহির করিয়া দিয়া আসিল।

সেদিক হইতে ঘুরিয়া সদর রাস্তায় যাইতে অন্ততঃ আদ-পোয়া পথ। সেখানে তেমন ভদ্রলোকেরও বসবাস নাই—আর অত রাত্রেই বা কে জাগিয়া আছে? বিশেষ, তাঁহাকে সে পথ দেখাইয়া দিতে গেল, সেও বলিতে লাগিল,—"চেঁচালেই মুণ্ডু যাবে—খবরদার!"

কাজেই হরি বাবু আর কোন কথাই কহিতে পারিলেন না। নীরবে তাহাকে সকলই সহ্য করিতে হইল; নীরবে কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি প্রাণ বাঁচাইয়া সদর-রাস্তায় আসিয়া পৌঁছিলেন।

এতক্ষণে তাঁহার 'ধড়ে প্রাণ' আসিল! তিনি রাস্তায় আসিয়াই দেখিলেন,—জন-দুই পাহারওয়ালা! কাজেই তাহাদের নিকট বৃত্তান্ত সকল বলিতে গেলেন। কিন্তু, তিনি বলিবেন কি, তাহারাই তাঁহাকে—"বদ্‌মাইস্ মাতোয়ারা তোম্ চোট্টা আদ্‌মি হ্যায়—চল্ বেটা, থানামে চল্"—বলিয়া, গলা ধাক্কা দিতে দিতে থানায় লইয়া গেল। জানি না—মাতাল কি চোর-অপবাদে, সে রাত্রি তাঁহাকে থানাতেই গারদ-ঘরে রাত্রিবাস করিতে হইল।

অবশেষে, পরদিন প্রাতে, থানার ইন্‌স্পেক্টার মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, তিনি আনুপূর্ব্বিক আপনার পরিচয়াদি প্রদান করিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। তখন তিনি আপনার বন্ধু-বান্ধবদিগের বাসায় গিয়া কাপড় ছাড়িতে পান। আর, সঙ্গে সঙ্গে, তাঁহার কথিত-মত তদারকও আরম্ভ হয়। কি জুয়াচোরদের আর পায় কে? পরদিন প্রাতে দেখা গেল, সেই বাড়ীর দরজায় লেখা "To let." অর্থাৎ এই বাড়ী ভাড়া দেওয়া হইবে। অধিকন্তু, সন্ধানে জানা গেল, বাড়ী আজ দুই মাস যাবৎ ঐরূপ খালি পড়িয়া আছে।

হরি বাবু তাহাতে আরও হতাশ্বাস হইলেন, মনে মনে আক্ষেপ করিতে লাগিলেন,—"হায় একেই বলে ষষ্ঠী-বাটা!"

তাই আমরাও বলি—জামাই-বাবুরা, সাবধান! একেবারে উন্মত্ত হইয়া শ্বশুর-বাড়ী ছুটিবেন না!

অনুসন্ধান

অনুসন্ধান-সমিতির মাসিক পত্র

৫ম খণ্ড } ৩২এ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৮। { ২১শ সংখ্যা।

শক্তি-সঙ্গীত।

(রাগিণী—কিঁঝিট।)

এ কে রামা, শোভিছে শ্যামা?
গলে দোলে মুণ্ডমালা, এলোকেশী নিরুপমা।
কটিতট-আঁটা নর, বহুবাহু থরে থর,
বিকট দশনরাজি, রাজিত মুখ, নিকামা।
স্রবনী ক্ষরিত ধারা, রুধিরে বহে দু'ধারা,
শোনিত পিয়িছে মাতি, অতি অসীমা।
তাহে কর্ণদ্বয়ে দুয়, শোভে শব অতিশয়,
শবাসনা, বিবসনা, কে জানে তাঁহারি সীমা?
নীলাঞ্জনচয় প্রায়, শোভিতেছে তারকায়,
ডাকিনী-যোগিনীগণ সঙ্গিনী ভীমা!
খড়্গ বামোর্দ্ধ করে, দৈত্যশিরশ্ছেদ করে,
ধরেছে তদধ করে, খণ্ড মুণ্ড, ভীমতমা।
দক্ষিণ উপর করে, অভয় প্রদান করে,
অধ করে বরদান, ভকতে, বামা।
নাচিছে সমর-রঙ্গে ভৈরব-ভৈরবী সঙ্গে,
হুঙ্কারিছে ঘন ঘন, পরিমার নাহি সীমা।
মহাকাল আলিঙ্গিত, রোম-রাজি পুলকিত,
চকিত বদনে আহা কত সুষমা!
নবরস সমাবেশ, একত্র হেরি বিশেষ,
ত্রিনয়ন শোভে, নভে যেন নবীন অর্য্যমা।
দক্ষিণ কালিকা ইনি, মনে হেন অনুমানি,
চতুর্ব্বর্গ-প্রদায়িণী দেবী পরমা।
শ্রীচরণে এই চাই, (যেন) "অন্তে পদপ্রান্ত পাই,"
রোহিণীর এ মিনতি, রেখ হর-মনোরমা!

বাঙ্গালা লেখা-পড়া।

যে ভাষায় কোন জাতি জন্মাবধি কথাবার্ত্তা কহে ও লিখিয়া মনের ভাব প্রকাশ করে, তাহাকে জীবিত ভাষা বলে, এবং তাহাই সেই জাতির মাতৃভাষা। জন্মিয়াই শিশু যেমন মাতাকে দেখে এবং মাতার সহিত তাহার যেমন নিকট-সম্বন্ধ, আমরা তেমনই কথা কহিবার পূর্ব্ব হইতেই মাতার নিকট মাতৃভাষা শুনি এবং মাতৃভাষার সহিত আমাদিগের তেমনই নিকট সম্বন্ধ। আমরা বাঙ্গালী—বাঙ্গালা আমাদিগের মাতৃভাষা। আমরা সকল কথার পূর্ব্বেই "মা" শব্দ (বাঙ্গালা) উচ্চারণ করি। প্রথমে সকলেই মাতার নিকট লালিত-পালিত হইয়া থাকে; কিন্তু একটু স্বাধীন হইলে তাঁহার সহিত আর তেমন সম্বন্ধটুকু থাকে না। পশু-পক্ষীর এ প্রকার তারতম্য হইতে পারে; কিন্তু মনুষ্য-সমাজে এই পশুর বিধি কেন প্রচলিত হইতেছে, তাহা বুঝিতে পারি না। হিন্দু-সমাজে এ ভাব প্রবেশ করাতে আমরা বড়ই মর্ম্মাহত হইয়াছি। যে কারণেই হউক, আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে, স্বাধীনতার সহিত মাতার সহিত সম্বন্ধের তারতম্য হইতেছে; আর, যখন মাতার সহিতই সম্বন্ধের তারতম্য হইতেছে, তখন যে মাতৃভাষার সহিত হইবে, ইহা বড় আশ্চর্য্য নহে। প্রথমে বাঙ্গালাই অবশ্য আমাদিগের সম্বল; কিন্তু যখনই একটু ইংরাজী শিখিলাম (?), তখন হইতেই বাঙ্গা-

লার সহিত আমাদিগের সম্পর্ক উঠিল; এমন কি, তাহাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে লাগিলাম—অধিকাংশ ইংরাজ যেমন ভারতের অন্নে লালিত-পালিত হইয়াও ভারতকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। যাঁহারা রীতিমত ইংরাজী শিখিয়াছেন, তাঁহাদের বাঙ্গালার সহিত সম্পর্ক ত্যাগ করা তত ক্ষোভের বিষয় নহে; কিন্তু না শিখিয়াও যে লোকে মাতৃভাষার সহিত সম্পর্ক তুলিয়া দিতেছেন, ইহা বড়ই লজ্জার বিষয়! আবার আমাদিগের দুর্ভাগ্য-বশতঃ এই দলের সংখ্যাই অধিক। যিনি ইংরাজী বুঝিতে পারেন না ও লিখিয়া মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারেন না, তাঁহাকেও ইংরাজীতে পত্রাদি লিখিতে হইবে, ইংরাজীতে হিসাবপত্র রাখিতে হইবে, ইংরাজীতে কথা কহিতে হইবে ও ইংরাজী চালে চলিতে হইবে! এমন হইলে আর অভাগিনী বাঙ্গালা ভাষা দাঁড়ায় কোথা? "ক্ষীণা, দীনা, পিঁচুটী-নয়না" বাঙ্গালা-ভাষার সজিনা-গাছে গলায় দড়ি দিয়া মরাই কর্ত্তব্য।

বাঙ্গালা আমাদিগের বাল্যকালের মাতৃ-ভাষা। মাতৃ-ভাষা হইলেও দেখা যাইতেছে যে, বয়সে তাহার সহিত সম্বন্ধের প্রভেদ হয়। যদিও, যাহাতে অস্থি-মজ্জা, যাহাতে শোনিত-মাংস এবং যাহাতে নাড়ী-কাটা, তাহার সহিত কোন দিনই সম্বন্ধ-চ্ছেদ হইতে পারে না, তথাপি আমি যদি কুপুত্র হইয়া জননীকে একমুষ্টি অন্ন না দিই, তাহা হইলে ভিক্ষা ভিন্ন তাঁহার আর উপায় কি? বঙ্গভাষারও এখন ভিক্ষার দিন—ইহা যে আজও জীবিত আছে, ইহাই আশ্চর্য্য! বাঙ্গালা-ভাষা এখন ষোল আনা পরিমাণেই পরমুখাপেক্ষী। যদিও সংস্কৃত হইতে তাহার উৎপত্তি, তথাপি কোনকালেই তাহাকে এত পরমুখাপেক্ষী হইতে হয় নাই; বিশেষতঃ ইংরাজীর নিকট তাহাকে যেমন হাত পাতিতে হইয়াছে, অন্য ভাষার নিকট তেমন করিতে হয় নাই প্রথমেই ত কতকগুলি যাবনিক পারশ্য শব্দ তাহাতে প্রবেশ করিয়াছে; এখন আবার ইংরাজী ভাব পর্য্যন্ত বাঙ্গালা ছাঁচে ছাপা হইতেছে; অপরম্বা কিং ভবিষ্যতি ভাবিয়া আমরা কূল-কিনারা পাইতেছি না। যে সকল শব্দ বাঙ্গালায় নাই, তাহা অন্য ভাষা হইতে লওয়াতে (যদি বাঙ্গালা ভাষায় তাহার সৃষ্টি করা অসম্ভব হয়) বিশেষ ক্ষতি দেখা যায় না; কিন্তু বিদেশীয় ভাব ও চিন্তা যে প্রবল বেগে ইহাতে প্রবেশ করিতেছে, ইহাও কি তোমার বাঞ্ছনীয়? যদি তাহাই হয়, তবে আর বাঙ্গালা অক্ষর কয়টার দোহাই দিয়া ইহাকে স্বতন্ত্র ভাষা বল কেন? বৈদেশিক তরঙ্গে সম্পূর্ণরূপে ঘা ঢালিয়া দেওয়াই ত সকল প্রকারে সুবিধা-জনক!

কিছুদিন পূর্ব্বে অর্থাৎ বাঙ্গালা-ভাষায় কতকগুলি আবশ্যকীয় ও সৎসাহিত্য-বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশিত হইলেও, ইংরাজী-শিক্ষিত বাঙ্গালীর বাঙ্গালার প্রতি যে প্রকার ঘৃণা ও বিদ্বেষ-ভাব ছিল, এক্ষণে তাহার তেজ অনেক কম পড়িয়াছে। 'বাঙ্গালায় আর আছে কি যে বাঙ্গালা পড়িব' বলিয়া লোকে যেমন বাঙ্গালাকে অশ্রদ্ধা করিতেন, এখন আর তেমন করেন না। অনেক সুশিক্ষিত ব্যক্তিও এবম্প্রকার কথা বলিতেন; কিন্তু তাঁহাদিগের জানা উচিত যে, যাহাতে কিছু নাই, তাহাকে না দিলে কোথা হইতে পাইবে? 'যে পুত্রবতী হয় নাই, তাহাকে আর প্রসব করাইব কি'—সক্রেতিশের মাতার ন্যায় এবম্প্রকার বাক্য প্রয়োগ করিলে কি হইবে? 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা' বলিয়া, কেহ কি পুত্রবতী হইলে তাহার পরে ভার্য্যাগ্রহণ করেন? বাঙ্গালায় যাহা নাই, তাহা উৎপন্ন কর; "নাই", "নাই" বলিয়া সকলেই তাহার নিকট হইতে ঊর্দ্ধমুখে পলায়ন করিলে আর কোথা হইতে আসিবে? আজকাল এপ্রকার ভাবের অনেক অভাব হইয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয় যে, অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি আজকাল বাঙ্গালা লেখেন ও পড়েন। আমাদিগের কিন্তু একটা ধারণা হইয়াছে এবং অনেক দিন যাবৎ বাঙ্গালা-সাহিত্যের গতির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বিশ্বাস দাঁড়াইয়াছে যে, বাঙ্গালা-পাঠক অপেক্ষা লেখক-সংখ্যা অনুপাতে অনেক বেশী। যাহাই হউক, এক্ষণে অনেকে যে বাঙ্গালা পড়েন ও লেখেন, তাহা বাঙ্গালা পুস্তক এবং সংবাদ ও সাময়িক পত্রিকার অবস্থা দেখিলেই বলা যাইতে পারে। উপস্থিত সংখ্যা যদিও অধিক নহে; কিন্তু শূন্য অপেক্ষা একের ভগ্নাংশও ভাল, এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দেওয়া কর্ত্তব্য। দুই-একখানা সংবাদপত্রের পাঠক সংখ্যায় কিছু অধিক হইতে পারে, এবং আমরা সে প্রকার সাহিত্যের কথা বলিতেছি না; যাহা সারবান ও সৎসাহিত্য অর্থাৎ যদ্দ্বারা বাঙ্গালা-সাহিত্যের উন্নতি হইতে পারে, আমরা সেই সকলের কথাই বলিতেছি।

ইংরাজীর দিকে ঝোঁক কম পড়িলেও এখনও বিস্তর শিক্ষিত ব্যক্তি বাঙ্গালা-লেখা স্পর্শ করেন না—স্পর্শেও যেন পাপ আছে এমনই মনে করেন! আমরা এমন অনেক লোককে জানি, যাঁহারা কোন কারণ-বশতঃ বাঙ্গালা সংবাদ বা সাময়িক পত্রের গ্রাহক; কিন্তু পত্রের মোড়কটি পর্য্যন্ত খুলেন না। তবেমন্দের ভাল এই যে, কোন কোন শিক্ষিত ব্যক্তি বাঙ্গালা পড়েন ও লেখেন—বিষয়-কর্ম্মের অনুরোধ-ব্যতীত ইংরাজী লেখেন না, এমন লোকও দেখা যায়; কিন্তু লেখার বেলাও যেমন, পাঠের বেলা তেমনই, তাহা কৈ দেখিতে পাই না! বোধ হয়, বাঙ্গালায় পাঠোপযোগী সামগ্রী তেমন নাই বলিয়াই এপ্রকার করিয়া থাকেন। কিন্তু, বাঙ্গালায় যে সে অভাব মোচন হইবে, এমন আশাও দুরাশা!

বাঙ্গালায় আমাদিগের অভাব মোচন না হইবার অনেকগুলি কারণ আছে; অদ্য আমরা কয়েকটি কারণ উল্লেখ করিব। সেই সকল কারণেই বাঙ্গালা-সাহিত্যের আর বড় বেশী

উন্নতির আশা নাই; এবং যে সকল ভাল ভাল সামগ্রী বাঙ্গালায় উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার অধিক আর উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনাও অল্প; এমন কি, বর্ত্তমান অবস্থায় আর আদৌ উৎপন্ন হইতে পারে না, আমাদিগের এমনই আশঙ্কা।

১। ইংরাজী এক্ষণে অর্থকরী বিদ্যা, ইংরাজী আলোচনা না করিলে উদর চলে না; সুতরাং এমত অবস্থায় অর্দ্ধাশনে থাকিয়া বাঙ্গালা-সাহিত্যের আলোচনা সম্ভবে না। অনেকেই এপ্রকার বলিয়া থাকেন এবং কাজেও করেন যে,—যতক্ষণ বাঙ্গালা পড়িব বা লিখিব, ততক্ষণ ইংরাজী আলোচনা করিলে বা বিষয়-কর্ম্ম-সম্বন্ধীয় (যাহা সমস্তই ইংরাজীতে লিখিত) পুস্তকাদি পাঠ করিলে কাজ হইবে—বাঙ্গালা আলোচনা করা, কেবল সময় নষ্ট করা মাত্র। বস্তুতঃ কথাটা যে একেবারে উড়াইয়া দিবার কথা, তাহা নহে—এখন সাড়ে পনরো আনা লোকে উদরান্নের জন্য লালায়িত, বাকী অর্দ্ধ আনা ইংরাজের তোষামোদে ও বিলাসে ব্যাপৃত। কাজেই পূর্ব্বোক্ত কথাটায় অনেকটা সত্য আছে বলিতে হইবে। শান্তি ব্যতিরেকে সাহিত্য সম্ভবে না; কিন্তু উদরান্নের জন্য যদি সদাই অশান্তি বিরাজ করিতে থাকে, তবে আর সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি কি প্রকারে হইবে? ঠিক যে সময়ে বাঙ্গালার একটু উন্নতি হইয়াছিল, সে সময়ে উদরের অশান্তি এখনকার মত প্রবল প্রতাপান্বিত হইয়া উঠে নাই এবং যাঁহাদিগের দ্বারা ইহার উন্নতি হইতেছিল, তাঁহাদিগের সামাজিক অবস্থা অনুসন্ধান করিলে জানা যায় যে, অন্নের জন্য তাঁহারা সকলেই বড় একটা কাতর ছিলেন না। সাহিত্যের আলোচনায় এদেশে পেট ভরে না; সুতরাং বিষয়-কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া কেবল সাহিত্যের আলোচনায় জীবন-যাপন করেন, এমন লোক এখানে তিষ্ঠিতে পারে না।

২। অধ্যয়ন করা, যে কারণেই হউক,

আমাদিগের জাতীয় অভ্যাস নহে। স্কুল কলেজ ত্যাগ করিলেও সরস্বতীর সহিত যে সম্পর্ক রাখিতে হয়, তাহা আমরা জানি না; যিনি বড়ই জানেন, তিনি হয় ত একখানা ইংরাজী সংবাদপত্র হাতে করিয়া নিদ্রা-দেবীকে আহ্বান করেন; আর যিনি বড়ই বাঙ্গালা প্রিয়, তিনি একখানা সুকুমার সাহিত্য-পুস্তক বা পত্রিকার পৃষ্ঠা উল্টাইলেন মাত্র। এদেশ ইংলণ্ড বা আমেরিকা নহে, যেখানে মুটে-মজুরের পর্য্যন্ত হাতে সংবাদ-পত্র বা সাময়িক-পত্র বা পুস্তক দেখিতে পাইবে। সকল দ্রব্যেরই অভাব অনুসারে যোগান হইয়া থাকে; সুতরাং অভাব নাই, অর্থাৎ লোকে পড়ে না বলিয়া ভাল সাহিত্য জন্মে না। যাঁহারা বাস্তবিকই পড়িতে চাহেন, তাঁহারা পড়িতে পান না; কারণ, তাঁহাদিগের সংখ্যা এত অল্প যে, কেবল তাঁহাদিগের উপর নির্ভর করিয়া কেহ সে অভাব মোচনের সাহস করিতে পারেন না। পাঠ করা অভ্যাসের কাজ এবং জ্ঞানোপার্জ্জন পরম আনন্দের মূল: কিন্তু আমরা স্বভাবতঃই চপলমতি, মনোনিবেশ করিয়া পাঠ করা আমাদিগের পক্ষে কষ্টকর, এবং উদরের ক্ষুধা-বশতঃ নিরানন্দ চাপিয়া রাখিয়া জ্ঞানোপার্জ্জনের আনন্দ আমাদিগের ভাগ্যে বিধাতা লেখেন নাই। এইজন্য পাঠ করিবার উপযোগী গ্রন্থ অতি অল্পই দেখা যায়; এত অল্প যে, এক মাসের মধ্যে সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করিয়া শেষ করা যাইতে পারে। আমাদিগের চপলমতির পরিচয় বাঙ্গালা-গ্রন্থ দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। যতক্ষণ সম্ভবতঃ ধৈর্য্যচ্যুতি না হয়, ততক্ষণ যত পৃষ্ঠা পাঠ করা যায়, বাঙ্গালা গ্রন্থে তাহার অধিক পৃষ্ঠা অতি বিরল—যে গ্রন্থকার এই সীমা অতিক্রম করেন, তাঁহার পুস্তক পড়িয়া পচিতে থাকে।

৩। উৎসাহ দিলে বাঙ্গালায় যে ভাল গ্রন্থের জন্ম অসম্ভব, আজও আমরা তাহা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি। যদিও ইংরাজী ছাঁচে ঢালা ও ইংরাজী প্রণালীতে সংগঠিত হইতে পারে; কিন্তু তাই বলিয়া যে সৎসাহিত্য অসম্ভব, তাহা নহে। একটা পারিতোষিকের প্রলোভন দিয়া দেখ, কত ভাল ভাল সামগ্রী উৎপন্ন হইবে; কিন্তু এবম্প্রকার পারিতোষিক দেয় কে? সাধারণের সাহিত্যের প্রতি তাদৃশ মনোযোগ নাই, এবং পারিতোষিক দিবার সাধ্যও নাই; যাঁহাদিগের সাহিত্যকে আশ্রয় দিবার ক্ষমতা আছে, তাঁহাদিগের প্রবণতা অন্যদিকে; সুতরাং অনাথ বঙ্গ-সাহিত্য শিক্ষিত-ভাবে অঙ্কুরেই শুষ্ক হইল।

৪। জাতীয় রুচি-অনুসারে সাহিত্য সংগঠিত হয়। কোন বিজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়াছেন যে,—কোন জাতির সাধারণের প্রিয় একটী গীত শুনিলেই সে জাতির স্বভাব-চরিত্র কি প্রকার তাহা বুঝিতে পারা যায়। বস্তুত যে জাতির যেমন রুচি, তাহার সাহিত্যও সেই প্রকার। আজকাল আমাদিগের রুচি চাট্‌নীতে—পলাণ্ডু কালিয়া সেইজন্য সাহিত্য ভাণ্ডারে নাই; কিন্তু নানা প্রকার চাট্‌নী দেখা যায়। সংবাদপত্রেও এইভাব প্রবেশ করিয়াছে—যে সংবাদপত্রে চাট্‌নীর আধিক্য, তাহার গ্রাহক ও পাঠক যত, যাহাতে সারবান সামগ্রী আছে, তাহার গ্রাহক অনুতাপে অনেক কম। বাহ্যাড়ম্বর, গলাবাজি প্রভৃতির যত আদর, আমাদিগের কাছে স্থির-গম্ভীর-সারবান সামগ্রীর তত আদর নাই। সংসারে কাচ-কাঞ্চন উভয়েরই আবশ্যক; কিন্তু আমরা এমনই রুচিধ্বজ যে, কাঞ্চন ফেলিয়া কাচেই কামড় দিতেছি।

৫। আমরা পড়ি না এবং পাঠ করা অভ্যাসও আমাদিগের মধ্যে অতি অল্প লোকেরই আছে। তদ্ভিন্ন, পুস্তকাদি সংগ্রহের সাধ্যও আমাদিগের নাই; কিন্তু তাই বলিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা লেখকসংখ্যা অল্প নহে—লেখক পালে পালে, চালে চালে, ডালে ডালে দেখা যায়। তাঁহাদিগের লেখাও তেমনই—না মিষ্ট, না ঝাল, না তিক্ত, না টক্

না কিছুই। আমরা পড়ি না, মূল্য দিই না, পুস্তক-সকল গুদামে পড়িয়া পচিতেছে, তথাপি লেখকদিগের বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই—কেহ যেন লিখিবার জন্য মাথার দিব্য দিয়াছে! পুস্তকের বাজারে এই কারণে যত প্রতারণা-প্রবঞ্চনা দেখা যাইতেছে, তত আর কোথায়? লেখা এখন বাতিকের কাজ হইয়াছে, সামগ্রীও তেমনই বায়ুগ্রস্থের মতই প্রস্তুত হইতেছে। অবশ্য সারবান সামগ্রী যে একেবারে নাই, তাহা আমরা বলি না; কিন্তু তাহা সমুদ্রের নিকট গোষ্পদ। সে রত্ন এতই মাটি-মিশ্রিত যে, মাটি ঝাড়িয়া ফেলিয়া তাহা বাহির করিবার মজুরী পোষায় না। আজকাল আগাছায় দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে—ফুলের ফলের গাছ কোন্‌টা তাহা বাছিয়া লওয়া বড়ই বিষম দায় হইয়া উঠিয়াছে। সাহিত্যের দেড় কাঁচ্চা ভূমির মালঞ্চটুকুতে কেবল পাতা গজাইতেছিল, এমন সময় রাজ্যের আগাছা উৎপন্ন হইয়া তাহার রুচি মাথা খাইয়া ফেলিল। আগাছার বংশ নির্ব্বংশ করে, এমন পরশুরাম রাঢ়ে-বঙ্গে দেখি না; বিশেষতঃ স্বাধীন ইংরাজের রাজ্যে স্বেচ্ছাচারের বাড়াবাড়ী কেবল সাহিত্যের ক্ষেত্রে; সুতরাং আমরা এখন দিশাহার—বাঁশ-বনের ডোম হইয়া বসিয়া আছি। একেই ত আমরা বাঙ্গালা পড়ি না, বাঙ্গালা-সাহিত্যের বাজারে ঢুকি না; তথাপি যদি কখন পথ ভুলিয়া গিয়া পড়ি, দালাল ও ফড়িয়া পেচকের পশ্চাতে কাকের ন্যায় এতই বিরক্ত করিয়া তুলে যে, হয় তথা হইতে শুধু হাতে ফিরিয়া আসি, না হয় ঘোড়ার দামে একটা খোঁড়া গাধা কিনিয়া আনি—ভালমন্দ বিচার করিবার সময় পাই না, গুণগ্রামের ব্যাপার চোটে, মাথা গরম হইয়া উঠে। এই আগাছার মস্তক মুণ্ডন করিয়া চাণক্যের ন্যায় প্রতি কুশের মূলে ঘোল ঢালিতে না পারিলে আর ফল-ফুলের গাছের রক্ষা নাই। কিন্তু এ মালঞ্চে বেড়া নাই, মালী নাই, মালিক নাই—বাঙ্গালার ব্রাহ্মস্ বাগান!

মণিপুর-যাত্রীর দিনলিপি।

(৬)

মৈয়াংখাং থানায় কতিপয় মণিপুরী ইতিপূর্ব্বে বিরাজ করিতেছিলেন; কিন্তু প্রবল-প্রতাপ ইংরাজ-সৈন্যের আগমন-মাত্রেই তাঁহারা পলায়ন করিলেন। সেনা-নায়ক Sir Henry Collett বাহাদুর তাঁহাদিগের সাক্ষাৎকার লাভ করিতে বিধিমতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কোনক্রমেই কৃতকার্য্য হইলেন না। এই থানার পূর্ব্বভাগে, অনতিদূরে, পার্ব্বত্যভূমে, মৈয়াংখাং নামধেয় মণিপুরী পল্লী অধিষ্ঠিত। অত্রত্য জনগণ কর্ত্তৃক ইতিপূর্ব্বে টেলিগ্রাফের কর্ত্তা মেলভিল সাহেব নৃশংসভাবে হত হইয়াছিলেন; শুনা গেল, মৃত মেলভিলের অপহৃত দ্রব্যাদি ও পূর্ব্বকর্ত্তিত টেলিগ্রাফের তার সকল উক্ত গ্রামের অধিবাসীগণের নিকট এখন পর্য্যন্ত বিরাজ করিতেছিল। এ সম্বাদে বাস্তবিক বড় মর্ম্মবেদনা হয়, এবং সেই নরপিশাচগণের রক্তপান-ব্যতীত জিঘাংসুর মর্ম্মজ্বালা প্রশমিত হয় না। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় সে মর্ম্মজ্বালা নিবারণ অপেক্ষা মূল পাপীর প্রায়শ্চিত্ত-বিধান করাই অধিক প্রয়োজন; সুতরাং সে পক্ষে বিশেষ মনোযোগ না করিয়া ঐ গ্রাম দগ্ধ করিবার আদেশ দেওয়া হইল—স্বহস্তে অপরাধীর শিরশ্ছেদ না করিয়া প্রকারান্তরে তাহার প্রাণবিনাশের উপায় করা হইল। হিন্দুর হৃদয়ে এ প্রকার বন্দোবস্ত অসমীচীন বোধ হইতে পারে, এক বা দশ জনের দোষে সমগ্র দেশ ছারখার করা মনুভেদীও হইতে পারে; কিন্তু, রাজনৈতিক সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ইহাপেক্ষা, বোধ হয়, সুশাসন সম্ভবপর নহে,—প্রকৃত পাপীর পরিচয়াভাবে প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রু সংক্ষুব্ধ করিবার ইহাপেক্ষা সহজ উপায়ও, বোধ হয়, আর নাই। যাহাহউক, এ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় করা আমাদিগের সীমার বহির্ভূত; ঘটনার পারম্পরিক অবস্থা যথাযথ লিপিবদ্ধ করাই

আমাদিগের কার্য্য—তাহার সমালোচনার ভার সুচতুর পাঠকের হস্তে। অতঃপর, মণিপুরাধীশ্বর কুলচন্দ্রের নিকট ঘোষণাপত্র প্রেরিত হইল যে,—মণিপুর-রাজ্য-মধ্যে তখন পর্য্যন্ত ইংরাজরাজের যে সমস্ত প্রজা বন্দী ছিল, তাহাদিগের জীবন-রক্ষণ-পক্ষে তিনিই স্বয়ং ইংরাজ-সমীপে বাধ্য; এবং তাহাদিগের নিরাপদের উপরেই ইংরাজ-হস্তে কুলচন্দ্রের নিষ্কৃতি নির্ভর করে। এ ঘোষণা, ইংরাজ-রাজের অকৃত্রিম প্রজাবাৎসল্যের পরিচয়; বাস্তবিক, এ আদেশ ঘোষিত না হইলে জিঘাংসা-পরায়ণ মণিপুরীর হস্তে তদানীন্তন বন্দী ইংরাজ-প্রজাগণের কি পরিণাম ঘটিত, অন্তর্য্যামী বিধাতাই বলিতে পারেন। কুলচন্দ্রের কি পরিমাণে নিষ্কৃতি ঘটিয়াছে, পাঠকবর্গ তাহা অবগত আছেন; তবে তিনি যে ইংরাজ-রাজের ঐ আদেশ প্রাণপণে প্রতিপালন করিয়াছিলেন—ইংরাজ-কর্ম্মচারীগণের কায়মনে যত্ন ও পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন—এ সত্য কাহারও অবিদিত নাই।

২৫ এ এপ্রিল, শনিবার, আমরা কৈতিমাবি শিবিরে পৌঁছিলাম। ইতিপূর্ব্বে ইংরাজ-রাজের সহিত যুদ্ধ-সাধে মণিপুর-সৈন্য, বোধ করি, যথাসাধ্য আয়োজন করিয়াছিলেন; ইংরাজের প্রবল প্রতাপ, সম্ভবতঃ, তখনও পর্য্যন্ত অসভ্য মণিপুরী হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই—শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায় কাষ্ঠবিড়ালীর সাহায্যে অপার জলধি পার হইবেন, ভাবিয়াছিলেন! কিন্তু, হায়! এখন কি আর হিন্দুর সে পবিত্র আত্মনিষ্ঠা আছে?—এখন কি আর সেই ক্ষত্রিয়ের অদম্য উৎসাহ, সত্য ও ন্যায়পরতা তাহার হৃদয়ে প্রতিভাত হয়? হিন্দুর পবিত্র মূলমন্ত্র "যতোধর্ম্মস্ততো জয়ঃ" কি আর এখন তাহার মুখ-বিবর হইতে নির্গত হয়? রামচন্দ্রের পবিত্রা প্রাতঃস্মরণীয়া পত্নী জানকী দুর্ব্বিনীত রাক্ষস কর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়াছিলেন; তাঁহার হিতসাধন, সতীর উদ্ধার এবং পাষণ্ডের দলন দেবতারও বাঞ্ছিত—সুতরাং রামচন্দ্রের প্রত্যেক কার্য্যে দৈবশক্তি অনুকূল, তাই তিনি অনায়াসে দুঃসাধ্য সাধন করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু, সেই হিন্দুনামধারী ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভব মণিপুরীর কার্য্য স্মরণ করুন; তাহারা আশ্রিত ইংরাজকে আপনার কক্ষ-মধ্যে বদ্ধ করিয়া নৃশংস-ভাবে প্রাণবধ করিল—হিন্দু যাহা স্বপ্নেও ভাবিতে পারেন না, সেই অমানুষী কার্য্য করিয়া চিরপবিত্র হিন্দুনামে ঘোর কলঙ্ক স্থাপন করিল—কাপুরুষতার পঙ্কিল চিত্রে চতুঃসীমা প্রতিফলিত করিয়া তুলিল। ফলও তাহার অচিরে ভোগ করিতে হইল—নিজের স্বাধীন রাজ্য ইংরাজ-রাজের হস্তে চিরদিনের জন্য বিসর্জ্জন দিতে হইল,* নিজে ধনেপ্রাণে নিধন পাইল, গৃহের গৃহিণী পথের কাঙালিনী হইয়া দাঁড়াইল!

একি! কি বলিতে বলিতে কোথায় আসিলাম? ইংরাজের সহিত যুদ্ধবাসনায় কৈতিমাবিতে মণিপুরী সৈন্য দুর্গরচনা করিয়া এতাবৎ রক্ষণ করিতেছিল। অদ্য প্রাতেও তাহারা দুর্গ-সংরক্ষণে তৎপর ছিল। কিন্তু প্রবল-প্রতাপ ইংরাজ-সৈন্যের অভ্যুদয়-বার্ত্তা অবগত হইবামাত্র তাহাদিগের আর সাহস কুলাইল না, প্রাণভয়ে মণিপুরাভিমুখে সকলে পলায়ন করিল। কৈতিমাবি শিবিরে কিয়ৎকাল অবস্থানের পরেই পরবর্ত্তী সেঙ্‌মাই গ্রামস্থ অধিবাসীগণের লিখিত এক পত্র পাওয়া গেল; তাহাতে প্রকাশ যে,—মণিপুরাধীশ্বর ইংরাজ-রাজের সহিত সখ্যতা-স্থাপনোদ্দেশে যুদ্ধ করিতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছেন, সেকারণ তৎপ্রদেশস্থ সৈন্যগণ আর যুদ্ধ করিবে না, বরং ইংরাজ-সেনা সেঙ্‌মাই পৌঁছিলে আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ করিয়া তাহারা যথাসাধ্য আনুকূল্য-সাধন করিবে। কেহিমার ডেপুটী কমিশনার শ্রীযুক্ত ডেভিস্ সাহেব রাজনৈতিক কর্ম্মচারী (Political Officer) রূপে আমাদিগের সহযাত্রী ছিলেন; প্রধান সেনাপতি এবং তদানীন্তন লাট বাহাদুর, Sir Henry Collett মহোদয়, কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া, তিনি উক্ত পত্রের উত্তরে জ্ঞাপন করিয়ে, সেঙ্‌মাই গ্রামের কোন প্রজার ইংরাজ-হস্তে কোন আশঙ্কা নাই, তাহাদিগের বিষয়-সম্পত্তির কোনরূপ "তস্রুফ" সাধিত হইবে না, এবং তাহাদিগের দেয় দ্রব্যাদি সাদরে গৃহীত হইবে। অনাগত বিপদের উগ্রমূর্ত্তি কল্পনা করিয়া পূর্ব্বে যেরূপ আশঙ্কিত হইয়াছিলাম, বিপদক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়া বিপদভয়হারী মধুসূদনের কৃপায় সে আশঙ্কা অনেকটা তিরোহিত হইল, আমরা নিঃশঙ্কচিত্তে সে রাত্রি শিবির-মধ্যে অবস্থান করিলাম।

২৬ এ এপ্রিল, রবিবার, প্রত্যূষে, ৬ ঘটিকার সময়, আমরা কৈতিমাবি পরিত্যাগ করিয়া সেঙ্‌মাই অভিমুখে অগ্রসর হইলাম। বিপদাশঙ্কা অনেক পরিমাণে মন হইতে উন্মূলিত হইলেও, যতই মণিপুরের নিকটস্থ হইতে লাগিলাম, ততই রণরঙ্গের প্রকট ছায়া অলক্ষ্যে অন্তরাকাশ আচ্ছন্ন করিয়া তুলিতে লাগিল। প্রখর নৈদাঘ তপন মস্তকে করিয়া ঠিক মধ্যাহ্ন কালে আমরা সেঙ্‌মাই পৌঁছিলাম; সৌভাগ্যের বিষয়, মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের খরতর তাপ ভিন্ন অপর কোন জ্বালা-যন্ত্রণা সেখানে পৌঁছিয়া সহ্য করিতে হইল না। পূর্ব্বোল্লিখিত পত্রানুযায়ী তত্রস্থ অধিবাসীবর্গ প্রকৃত প্রস্তাবেই শান্তভাব ধারণ করিয়াছিল, বৈরিতার কোন লক্ষণই তথায় লক্ষিত হইল না। না হইলেও, ইংরাজ-রাজের মন হইতে আশঙ্কা একেবারে উন্মূলিত হইল না; হইবার কথাও নহে,—যাহারা নৃশংস-ভাবে পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গকে বধ করিতে পারে, প্রকাশ্যে শান্তমূর্ত্তি দেখাইয়া প্রচ্ছন্নভাবে প্রাণ-সংহারে প্রবৃত্ত হওয়াও তাহাদিগের পক্ষে নিতান্ত বিচিত্র নহে। সুতরাং এইস্থান হইতেই মণিপুর প্রবেশের পূর্ব্বায়োজন মীমাংসিত হইল। কোহিমা, কাছাড় ও তম্মু—তিন পথ দিয়া তিনদল সেনা একসঙ্গে মণিপুরে প্রবেশ করিবার ব্যবস্থা ছিল; সেই ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত কাছাড় সৈন্যের অধিনায়ক কর্ণেল রেণিক এবং তম্মু-সৈন্যের অধিনায়ক জেনারেল গ্রেহামকে আমাদিগের গতিবিধি জ্ঞাপন করিয়া এইস্থান হইতে পত্র লিখিত হইল। দিবাভাগে অপর কোন কার্য্য করিতে হইল না।

ক্রমে সন্ধ্যা সমাগতা। আজ কৃষ্ণা দ্বিতীয়া, সন্ধ্যাগমেই চন্দ্রজ্যোতি দৃষ্টিগোচর হইল না, বরং সান্ধ্যগগনে কিঞ্চিৎ মেঘের সঞ্চার হওয়াতে প্রকৃতি অধিকতর অন্ধকারময় হইয়া উঠিল, অল্প অল্প বৃষ্টিপাতও হইল, প্রাণটাও কেমন একবার উদাস হইয়া পড়িল! তবে সে কষ্ট অধিকক্ষণ স্থায়ী হইল না, মেঘ কাটিল, চাঁদ উঠিল, মনের ময়লাও ঘুচিল। আহারান্তে নিদ্রাও গেলাম। রাত্রি আনুমানিক একটা-দুইটার সময় নিদ্রাভঙ্গ হইল, একটু কাণাকাণি শুনিলাম, হঠাৎ প্রাণটা শিহরিয়া উঠিল; ভাবিলাম, আবার কোন্ বিপদ সমুপস্থিত, হয় ত মণিপুরী-সৈন্য অলক্ষ্যে আমাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছে। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয়, সে আশঙ্কা অধিকক্ষণ অন্তরে পোষণ করিতে হইল না; অচিরেই জানিতে পারিলাম,—মণিপুর হইতে ক্রমান্বয়ে দুইখণ্ড পত্র আসিয়াছে, আর তাহাতে প্রকাশ যে,—'টীকেন্দ্রজিৎ ত্রিপথগামিনী বৃটিশ-বাহিনীর রণবাদ্য দূর হইতে শুনিয়াই অরণ্য-পথে পলায়ন করিয়াছেন।' ভাবিলাম, কাপুরুষের কার্য্যই এইরূপ—

"নষ্টস্য কান্যা গতিঃ?"

আজ ২৭ এ এপ্রিল, ১৫ ই বৈশাখ,

* ইংরাজ-রাজ অবশ্য এত অত্যাচার সহ্য করিয়াও প্রকাশ্যভাবে স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু ইংরাজ-রাজের কর্ত্তৃত্বাধীনে একটী নগণ্য শিশুর রাজত্বকে আর কোন্-প্রাণে স্বাধীন রাজ্য বলিব?—পরাধীনতার ইহাপেক্ষা সজীব মূর্ত্তি আমাদিগের নয়নদৃষ্টিতে প্রতিভাত হয় না।

সোমবার।-- মণিপুর-প্রবেশের দিন। দুর্দ্দান্ত মণিপুরীর হস্তে ইংরাজ-রাজপ্রতিনিধিবর্গের প্রাণনিধনের পর মণিপুর-রাজ্যকে সমুচিত শাস্তি দিবার জন্য এতদিন যে আয়োজন হইতেছিল, আজ তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার দিন; গোপনে, গৃহের কোণে, আশ্রিতের প্রতি মণিপুরী যে দারুণ অকার্য্য-সাধন করিয়াছিল, আজ প্রবল-প্রতাপ ইংরাজ-রাজের হস্তে প্রকাশ্য-ভাবে তাহার প্রতিবিধানের সময় সমুপস্থিত। রবিবারের রাত্রি কোনক্রমে অবসান হইল, নৈশ অন্ধকার কোনরূপে অপসৃত হইল, কাক-পক্ষী কোন দিকে দুই-দশটা ডাকিয়া উঠিল—আমরা সকলে সেঙ্‌মাই পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হইলাম; আর কোনক্রমে বিলম্ব নহে,—বাল-সূর্য্যের স্নিগ্ধ রশ্মি উঠিতে না উঠিতে, সকলের প্রাতঃক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে না হইতে, ছয়টা বাজিতে না বাজিতে, আমরা মণিপুরের পথে অগ্রসর হইলাম। মন এখনও সন্দেহ-দোলায় দোদুল্যমান —

"হয়, কি না হয়, কতই উদয়!"

মণিপুরীর অসাধ্য কিছুই নাই, প্রকাশ্য-ভাবে প্রাণ-ভয়ে দেখা দিল না, শেষে রাজ্য-মধ্যে পুরিয়া, কি জানি, গোপনে প্রাণবধ করিবে—এই চিন্তা পথের মধ্যেও মনে কখন কখন উদিত হইতে লাগিল। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে, নৈদাঘ সূর্য্যতাপ ভোগ করিতে করিতে, বেলা ১১ ঘটিকার সময়, আমরা মণিপুর পৌঁছিলাম। চিন্তিত বিপদের কোন চিহ্নই দেখিলাম না; দেখিলাম, সহর—

"নিবাত নিষ্কম্পমিব প্রদীপং!"

পথে জনমানব নাই, মণিপুরীর মূর্ত্তি একটীও নয়নপথে পতিত হয় না, চতুর্দ্দিক ভস্মস্তূপে আচ্ছন্ন—যেন নির্জ্জন শ্মশানে কে অনতিপূর্ব্বে রাশি রাশি প্রেতকার্য্য সম্পন্ন করিয়া গিয়াছে! রাজা, যুবরাজ, পারিষদবর্গ আপামর সাধারণ সকলেই পলাইয়া গিয়াছে—কেহ বনে-জঙ্গলে, কেহ কেবল লোকলোচনের অতীত অন্তরাল-প্রদেশে। কেন এমন হইল, কে এরূপ করিল, কিছুই তখন বুঝিতে পারিলাম না; ভাবিলাম—স্বকৃত দুষ্কৃতের ইহাই সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত।

পূর্ব্বের আয়োজন-মত তিন পথ হইতে তিন দল সেনাই সমাগত হইল। কাছাড়ী সৈনাই সর্ব্বপ্রথমে মণিপুর প্রবেশ করে; আমাদিগের ন্যায় কাছাড়ের পথেও ইংরাজ-সৈন্যকে মণিপুরীর হস্তে কোনরূপ কষ্ট ভোগ করিতে হয় নাই—ক্বচিৎ কোথাও দুই-দশটা মণিপুরী মাথা তুলিয়াছিল বটে, কিন্তু সুশিক্ষিত বৃটীশ-সৈন্যের ফুৎকার-মাত্রে তাহারা পরাভূত হইয়াছিল। তম্মুর পথেই ইংরাজ-সৈন্যকে কিঞ্চিৎ বেগ পাইতে হইয়াছিল, মণিপুরীর হস্তে অনেককে সম্মুখ-সমরে প্রাণ দিতেও হইয়াছিল; সে যুদ্ধের আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত পাঠকবর্গ পূর্ব্ব হইতেই সম্যক্ বিদিত আছেন, সুতরাং তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তিন দিকের তিন দল সমবেত হইল, দারুণ মধ্যাহ্ন-সময়ে রবিকর-প্রপীড়িতাবস্থায় সকলে কেন্দ্রীভূত হইল, সমগ্র সৈন্যের অধিপতি হইলেন— আমাদিগেরই কর্ত্তা, কলেট বাহাদুর; এই সমবেত সৈন্যদলের নাম হইল —

"Manipur, Field Force."

তিন দলের দলপতির মধ্যে কলেট বাহাদুর সর্ব্বোচ্চ বলিয়া তাঁহারই হস্তে কর্ত্তৃত্ব-ভার সমর্পিত হইল, এবং এই কর্ত্তৃত্বকালে তিনি Major General পদে অভিষিক্ত হইলেন। এই সৈন্য-সমাগম ও অভিষেক-কার্য্য বড়ই নয়নানন্দবর্দ্ধক—উৎসাহ উচ্ছ্বাসে মনও কি এক অত্যদ্ভুত বীররসে বিভোর হইয়া গেল; ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলিয়া, পথশ্রান্তি উপেক্ষা করিয়া, নিদারুণ সূর্য্যতাপও অনায়াসে সহ্য করিয়া, সেই সমারোহ কাণ্ড সন্দর্শন করিতে লাগিলাম।

এই সমস্ত ব্যাপার শেষ হওয়ার পর যখন

স্নানাহ্নিকে মতি হইল, তখন বেলা তৃতীয় প্রহর। যাহা হউক, নির্দ্দিষ্ট বাস-মণ্ডপে কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া—বিশ্রামের অন্য উপকরণ নাই—বঙ্কিমবাবুর প্রশংসিত দুশ্চিন্তা-হারিণী সজল ছঁকাবিহারিণী তাম্রকূট দেবীও নাই, মহাত্মা DeQuenceyর মর্ম্মপীড়াবিনাশক নিস্তেজ শরীরেও ক্ষণিক উৎসাহ-বর্দ্ধক অহিফেন-রসও নাই, ভক্ত-প্রধান রামপ্রসাদের কালীনামাত্মক ভক্তি-প্রণোদক সুধারসও নাই—সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্যবশে বলিতে পারি না, বিধাতা ঐ দেবতাবাঞ্ছিত মহামহোপাধ্যায়-প্রশংসিত তিন রসের কোন রসই এ অধমকে উপভোগ করিতে দেন নাই—কেবল উপাধানে মস্তক রাখিয়া, চৌদ্দপোয়া হইয়া চারিদণ্ড বিশ্রাম করিয়া, স্নানোদ্দেশে বহির্গত হইলাম। স্নানান্তে যখন গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করি, পথিমধ্যে— দরবার-হলের দ্বারদেশে—হরিদাস বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইল! পাঠকবর্গ, বোধ হয়, হরিদাস বাবুর পরিচয় ইতিপূর্ব্বেই পরিজ্ঞাত আছেন—ইনি স্বর্গীয় চীফ-কমিশনর কুইণ্টন বাহাদুরের সহযাত্রী কেরাণী, বিগত লোমহর্ষণ কাণ্ডের পর মণিপুর-দরবারে বন্দী। চারি চক্ষুর মিলন হইবামাত্র উভয়েই অবাক্। যে অবধি মণিপুরের হত্যাকাণ্ড রাজধানী শিলং-শৈলে সরকারী মহলের শ্রবণগোচর হইয়াছিল, হরিদাসের জীবন-সম্বন্ধে সেই অবধি সকলেই সন্দিহান;—এই হত্যাকাণ্ডের পর যাহারা প্রাণে বাঁচিয়াছিল, একে একে সকলেই শিলং পৌঁছিল—এমন কি হরিদাস বাবুর নিজ-ভৃত্য ও পাচকাদি বিবি গ্রিমউডের সহিত পলায়নপর হইয়া নিরাপদে স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিল—কিন্তু হরিদাসের কোন সম্বাদই নাই! ভৃত্যেরাও কোন সম্বাদ জানে না—বিপদের সময় তাহারা আপন প্রাণ লইয়াই ব্যতিব্যস্ত, অন্নদাতা প্রভুর কোন সম্বাদই রাখে নাই! হরিদাস বাবুর বৃদ্ধা জননী, প্রাণসমা প্রণয়িণী

সুবোধ শিশুগুলি, একপ্রাণ সহোদরগণ, সোদরাভিমানী সুহৃদ্বর্গ, পরিচিত পথের লোক পর্য্যন্ত —সকলেই তাঁহার জীবন-সম্বন্ধে নিরাশ; বাঁচিলে এতদিন ফিরিত, পলাইতে পারিলে কোন না কোন উপায়ে সম্বাদ পাঠাইত,—পথে-ঘাটে এইরূপ বিবাদ-বিতর্ক, চতুর্দ্দিকে তারের সম্বাদের ছড়াছড়ি, আর সম্বাদাভাবে সন্দেহের ক্রমশঃ বাড়াবাড়ী! রাজ-সরকারের সেক্রেটারি বাহাদুর পর্য্যন্ত সন্দিগ্ধ ও বিষাদিত—'অন্যে পরে কা কথা!' হরিদাস বাবু ইতিপূর্ব্বেই বঙ্গের ছোটলাট Sir Charles Elliot বাহাদুরের খাস-দরবারে দাওয়ানি পাইবার আশা পাইয়াছিলেন—ভগবানের কৃপায় যে পদে তিনি উপস্থিত যোগ্যতার সহিত কার্য্য করিতেছেন—কেবল কুইণ্টন বাহাদুরের বিশেষ অনুরোধে, তাঁহার পথকষ্ট লাঘব করিবার জন্য, তিনি এযাত্রা আসাম-রাজ্যে এই শেষ রাজ-সহচর হইয়া মণিপুর গিয়াছিলেন; সুতরাং—

"যচ্চিন্তিতং তদিহ দূরতরং প্রয়াতি
যচ্চেতসা ন তদিহাভ্যুপৈতি।
প্রাতর্ভবামি বসুধাধিপ চক্রবর্ত্তী
সোঽহং ব্রজামি বিপিনে জটিলস্তপস্বী॥"

এইরূপ কত চিন্তাই তখন হরিদাস বাবুর মনে উদয় হইয়াছিল, আর শিলঙেও সকল প্রাণী ঐ ভাবিয়া "হা হতোস্মি!" করিয়াছিল! জননী ও গৃহিণী কখনও নৈরাশ্যের উচ্ছ্বাসে আত্মবিস্মৃত হইয়া বিহ্বল-চিত্তে চীৎকার করিয়া রোদন করিয়াছেন, আবার কখনও বা "অকল্যাণ হইবে" ভাবিয়া আশায় বুক বাঁধিয়াছেন। এইরূপ অবস্থা দেখিয়া আমরা শিলং পরিত্যাগ করি। পরিদৃশ্যমান ঘটনাচক্রে হরিদাসের জীবন-সম্বন্ধে আমাদিগের কিঞ্চিন্মাত্র আশা ছিল না; যতদিন শিলঙে সংবাদ পরিচালনা করিতে পারিয়াছিলাম, ততদিন ধৈর্য্যচ্যুতও তাঁহার কোন সম্বাদই পাওয়া যায় নাই; আর যে অবধি সম্বাদ বন্ধ, সে অবধি নিজের প্রাণাশঙ্কাতেই

প্রতিক্ষণ বিকলচিত্ত: স্থতরাং হরিদাস বাবুর চিন্তা মনোমধ্যে স্থান পায় নাই। আজ অকস্মাৎ হরিদাস বাবুর সাক্ষাৎ-লাভে প্রাণের ভিতর যে কি হর্ষ সঞ্চারিত হইল, তাহা বর্ণনার বিষয়ীভূত নহে, অনুভূতির পদার্থ।

বাল্মীকি ও হোমার।

(রামায়ণ ও ইলিয়াড।)

(১)

প্রতিভা কখনও ধর্ম্মবীর, কখনও কবি-রূপী। প্রতিভা ভগবানের অবতার—যখন পাপের সহিত সম্মুখ যুদ্ধ করিতে হইবে, তখন প্রতিভা বুদ্ধ, বামন, কল্কী। যখন পুণ্যের অক্ষয় চিত্র-পট প্রতিভার হস্তে, তখন প্রতিভা ব্যাস—ব্যাস নারায়ণের অংশ।

কবি অতীতের সাক্ষী; সূর্য্যদেব অদ্যকার জগতের সাক্ষী, কল্যকার নহেন। কবি অতীতের চিত্রপট অক্ষয়রূপে উজ্জ্বল করেন—অবিনাশী বর্ণে প্রতিভান্বিত করেন; সেই সাক্ষী দ্বারা আমাদের উচ্চবংশ প্রমাণ করি। শত শত বৎসর পূর্ব্বে যে কুসুম-কুন্তলা মহী-মুক্তা-মালা-গলে এমনি হাসির ছটায় দিক উজ্জ্বল করিতেন, গঙ্গাবক্ষে পদ্ম-রেণুতে রক্তাঙ্গ চক্রবাক বিহার করিত, কুমুদ-কহ্লার-কুট্মলে যে এত শোভা ছিল, তাহা কে জানিত? কে জানিত—বালেন্দুবক্র পদ্ম-পলাস, কি রমণী-চরণ-সিঞ্চন-সাপেক্ষ প্রস্ফুট রক্তাশোক, শত শত বৎসর পূর্ব্বে এত সুন্দর ছিল! কেবল কালিদাস-ভ্রমর কবিত্ব-মধুচক্রের অক্ষয় ভাণ্ডারে সে অমৃত আহরণ করিয়া রাখিয়াছেন—তাই আমরা এখনও সে অমৃতপায়ী। আর আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ যে জ্ঞানের এভারেষ্ট-শৃঙ্গ, বুদ্ধির মেরু, ধর্ম্মের মাউন্ট-ব্ল্যাঙ্ক ছিলেন; তাহাই বা কিরূপে প্রমাণিত হইত? ডারউইনের মর্কট-শাস্ত্রের স্রোতে নিঃসহায় ভাসিয়া যাইতাম,—যদি কতকগুলি তালপত্র--নাদের সা, মামুদ গজনি আওরঙ্গজেব ও সিরাজোদ্দৌলা প্রভৃতির কঠোর শাসন সহ্য করিয়াও, যুগ-যুগান্তপরে আমাদিগের করায়ত্ত না হইত! সেই তালপত্রগুলিতে অক্ষয় জীবনি-শক্তি না থাকিলে, কি এত অত্যাচার সহ্য করিয়াও, সর্ব্বহর কাল-যুদ্ধে অক্ষত-দেহে তিষ্ঠিয়া, সেইগুলি আমাদের হস্তে পৌঁছিতে পারিত! পিরামিড-স্খলিত ইষ্টক বিলয়োন্মুখ; তাজমহলের মণি অপহৃত; কত শত কীর্ত্তির মঠ ছিল—তাহাও ভূশায়ী; অত্যাশ্চর্য্য মহী-রুহের ন্যায় যে শিল্পের গৌরব আকাশ চুম্বন করিয়াছিল, ভূরেণুতে তাহার ইতিহাস পাঠ কর। এই সব মনুষ্যকৃত, তাই কাল ধ্বংশ করিতেছে; কিন্তু, ভগবদ্-বাক্য সম্ভ্রম করিয়া, কাল স্বয়ং তালপত্রের বেদ কলিযুগে মাথায় করিয়া আনিয়াছে।

কবি জাতীয় সৌন্দর্য্যে ও মাহাত্ম্যে ডুব দিয়া আত্মহারা। জাতীয় গুণ-সুসমায় তাঁহার গ্রন্থ-পত্র অলঙ্কৃত। কিন্তু, তাঁহার জীবনের গন্ধ, তুমি গ্রন্থ খুঁজিয়া পাইতেছ না। জাতীয় গৌরব, জাতীয় জ্ঞান, জাতীয় জীবন্ত ইতিহাসময়ী সেই ফটোগ্রাফ্—কিন্তু কবির জীবনী লুপ্ত! যাহা ভগবান দ্বারা সৃষ্ট, তন্মধ্যে কৌশল, শক্তি সৌন্দর্য্য প্রতিবিম্বিত দেখিবে; কিন্তু রচক যবনিকার পশ্চাতে। মহাকবি বিষ্ণু-তেজে অধি-কৃত। জাতীয় জীবন ভিন্ন তাঁহার পৃথক স[illegible] নাই। তাই,—

> "Seven wealthy towns claim" for
> Homer dead,
> Through which the living Homer
> begged his bread."

তাই সেদিনকার সেক্ষপীয়র কসাইর পু[illegible] ছিলেন, কি তাঁতির পুত্র ছিলেন, তাহা লই[illegible] এখনও মতভেদ আছে—তাঁহার জীবন প্রায় সম্পূ[illegible] অপরিজ্ঞাত। ডান্টের জীবনের স্থূল স্থূল [illegible] একটি ঘটনা ভিন্ন কিছুই জ্ঞাত হওয়া যায় না[illegible] বাল্মিকী দস্যু ছিলেন—এই কিম্বদন্তী; কি[illegible] কোন্ বৃক্ষের তালপত্রে রামায়ণ প্রথম সূচিত হয়, তাহা, কত চেষ্টা করিয়াও, স্তাবকবৃন্দ জানিতে পারিতেছেন না।

ইঁহাদের পৃথক অস্তিত্ব নাই—জাতীয় জীবনেই ইঁহারা জীবন-ময়। এক রামায়ণ কি ইলিয়াডে কি দেখি? তাহাতে ইতিহাস, ভূগোল, দর্শন, জ্যামিতি, শিল্প, বাণিজ্য, পুরুষ, স্ত্রীলোক, সু, কু, সুন্দর, কুৎসিত, গুল্ম, লতা, পর্ব্বত—এক সঙ্ক্ষিপ্ত পৃথিবী, অতীতের চিত্র ধরিয়া, অক্ষয় রেখায় অঙ্কিত। বর্ত্তমান চিত্র-পট দর্শন করান—সূর্য্য; অতীত দর্শন করান—কবি। উভয়েই দৈব তেজে তেজস্বী—উভয়েই নমস্য।

"জয়দেব কুন্দবিল্ব-গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন কি না; বিদ্যাপতি মৈথিলবাসী, কি বঙ্গদেশীয়, এবং চৈতন্য-দেবের কত পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; কেইডমান ঘোড়া-শালার রক্ষক ছিলেন কি না; ব্যাসদেব কি সত্য সত্যই জারজ; সেক্ষপীয়রের মৃত্যুকালে শুধু তাঁহার বড়-গৃহখানা স্ত্রীকে দেওয়াতে কি দম্পতির অসদ্ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়; পিণ্ডারের অধরে দৈব বর-প্রাপ্তির রাত্রে কতটি ভ্রমর মধু-সঞ্চয়ে নিযুক্ত ছিল;—জানিলে, তুমি কি সত্য আবিষ্কৃত করিবে? বরং সাধারণ-মনুষ্য-জ্ঞানে কবির উপর বীতরাগ হইবে! তাই কবির চিত্রপট দেখ—কবি নিজের জন্য জীবন-ধারণ করেন নাই! তাঁহার বাহ্য জীবন খুঁজিও না—হিম-গিরির সর্ব্ব-উচ্চ শৃঙ্গ হিমে আচ্ছন্ন—জাতির তিলক-শ্রেষ্ঠ কবির জীবন মেঘাবৃত। তাঁহার আত্মা জাতি-ব্যাপক, কবি-অঙ্কিত চিত্রপটে এক জাতির ইতিহাস পাঠ কর। তিনি হিষ্টিরিয়ার রোগীর ন্যায় স্বীয় শক্তি-হীন নিশ্চেষ্ট দেহে সমস্ত প্রকৃতির অপরিসীম বল ধারণ করিয়াছিলেন; তাই প্রকৃতির চিত্রপট তাঁহা-দ্বারা অঙ্কিত। তাই বলি, তাঁহার পৃথক সত্বা কল্পনা করিয়া আঁধারে লোষ্ট্র-নিক্ষেপ করিও না। দিব্য পারিজাত পাইয়াছ; বৃন্ত না হয় নাই পাইলে!

শিলার শৈশবে "ওই আশ্চর্য্য বিদ্যুৎ কোথা হইতে আসিল" বলিয়া, তাহার আদি নির্ণয় করিতে, বৃক্ষারোহণ করিয়া, নভঃ সীমান্ত দর্শন করিতেন; আর আমরা, প্রতিভা কোথা হইতে আসিল নির্ণয় করিতে যাইয়া, প্রাচীন তালপত্র খুঁজি। উভয়ই বৃথা!

তবু যদি তাহার আদি নির্ণয় করিতে যাও, তবে দেখিবে—স্বর্গ! প্রস্ফুট ভ্রমর-গুঞ্জরিত পদ্মের আদি স্বর্গ—নিরাবলম্ব মুক্তামালার ন্যায় দৃশ্যমান; বিদ্যুদ্দামের আদি স্বর্গ; শঙ্করের জটাজুট-ভ্রষ্ট গঙ্গাধারার আদি স্বর্গ; আর প্রতিভার আদি স্বর্গ।

নিম্ন-শ্রেণীর কবিতে অহঙ্কার আছে; তাঁহাদের সাধনাও অপেক্ষাকৃত অল্প। তাই ব্যাস ও বাল্মীকিকে যেরূপ তপঃসিদ্ধ, আত্মবিস্মৃত দর্শন করি, অন্য অন্য কবিকে তদ্রূপ দেখি না। "উমাপতিধর বাক্-পল্লব-প্রিয়, কিন্তু ভাষার লালিত্য একমাত্র জয়দেবই জানেন।"—স্বয়ং জয়দেব লিখিতেছেন! "স্বরস্বতী অনুগতা স্ত্রীর মতন আমার পশ্চাৎ-গামিনী।"—'মালতীমাধব'—ভবভূতি। "আমার এই পুস্তকের মর্ম্মগ্রহণক্ষম লোক থাকিতে পারে, কিম্বা পরে জন্মিতে পারে; কারণ, কাল নিরবধি ও পৃথ্বী বিপুলা।"—'উত্তর চরিত'—ভবভূতি। "I am the grand Nepolian in the region of verse"—বাইরণের উক্তি। মিল্টন ও কাউপার, আমি 'প্যারাডাইস লষ্ট' বা আমি 'টাস্ক' রচনা করিয়াছি বলিয়া, দর্প করিয়াছেন। ভিক্টার হিউগো 'লা মিজারেবলের' প্রথমেই—"So long that misery exits in the earth, books like this cannot be useless."—বলিয়া গর্ব্ব করিয়াছেন। "রচিব মধুচক্র, গৌড়জন যাহে, আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।"—মাইকেল মধুসূদনের উক্তি

কিন্তু, যিনি বিশ্বের সহিত এক হইয়া গিয়াছেন, তাঁহার আমি নাই—তিনি বিশ্বের ন্যায় বিরাট। তাই ব্যাস-বাল্মীকি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

তারারত্ন-ভূষিত আকাশ—যেন প্রস্ফুট শত-দল, এই বল্লরী, ওই মাধবীলতা, ওই বিচিত্র-বর্ণ-খচিত রামধণু, নীল-তরঙ্গ-ক্ষেপ-চঞ্চলা গঙ্গা-ধারা, বিমানস্পর্শী বীরত্ব, প্রতিজ্ঞার ভীষ্ম, কর্ত্তব্যের জীবন্ত রাম-মূর্ত্তি, পাপের ভীষণ রাবণ-দস্যু, কুটচক্রী শকুনি, ইন্দ্রিয়-বিমূঢ় পারিস, ইলিয়াডের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা একিলিস্, বন্ধুত্বের উজ্জ্বল পেট্রোক্লাস-ছবি, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী, শত শত উজ্জ্বল কীর্ত্তি-মঠ,—প্রাচীন পৃথিবীর এই নিদর্শনগুলি, কাল-তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে, উনবিংশ শতাব্দির তীরে আসিয়া পৌছিয়াছে। এস, আমরা এই প্রাচীন বাক্স হইতে রত্নগুলি খুঁজিয়া লই। প্রাচীন পৃথিবীর ইহা ছাড়া কিছু থাকিত কি? প্রাচীন তপস্যার ফল ইহাই। ইহারা বর্ত্তমান-অতীতে সখ্য-স্থাপন করাইয়াছে; ইহারা মনুষ্য-জাতির গৌরব বুঝাইতেছে; ইহারা না থাকিলে বর্ত্তমান নিশ্চল হইত, পৃথিবী জড় হইত, ভবিষ্যৎ থাকিত না। মনুষ্যাত্মা অমর, ইহা পড়িয়া তাহার পরিচয় পাই। অতীতে ইহারা মনুষ্যা-ত্মার অস্তিত্বের সাক্ষী, বর্ত্তমানে ইহারা "মনুষ্যা-ত্মার শক্তি, ভবিষ্যতে ইহারা মনুষ্যাত্মার অস্তি-ত্বের উন্নতির আশাদায়ী। 'ইমার্সন বলিয়াছেন,—'ইহারা আন্তর্জাগতিক টেলিফোন; সময়ের অসীম দূরত্ব লুপ্ত করাইয়া, ইহাদের বলে সত্য-যুগের মনুষ্য কলিযুগের মানুষের সঙ্গে কথা কহিতেছে, ও ভ্রাতা বলিয়া আহ্বান করিতেছে।'

(২)

কালিদাস, ভবভূতি, মাঘ, জয়দেব ভারতীয় সাহিত্যাকাশের উজ্জ্বল রত্ন। কিন্তু ইহাঁদের সঙ্গে তুলনা দিবার যোগ্য কবি য়ুরোপক্ষেত্রে বিরল নহে। ইংলণ্ডে সেক্ষপীয়র, মিণ্টন; ফ্রান্সে মলিয়ার, ইয়ুজুন্সু, ভিক্টার হিউগো, এল্ফিয়ারি; জার্ম্মানিতে গেটে, শিলার, লেসিং; ইটালিতে ভার্জ্জিল, ট্যাসো, ডান্টে; গ্রীসে স্কাইলাস ও পিণ্ডার;—ইহাঁদিগকে কবিত্ব-যশের এক চাম্‌চার অংশীদার করিতে, বিক্রমা-দিত্যের নবরত্ন-গণও আপত্তি না করিতে পারেন। কিন্তু ব্যাস ও বাল্মীকি অতুল্য; ইহাঁরা ভারতবর্ষের উজ্জ্বলতম রত্ন—জগতে বুঝি তেমন আর নাই। অসংখ্য অসংখ্য নক্ষত্রবৃন্দ স্বর্গ-রাজ্যের ঘাটে-পথে, কিন্তু চন্দ্র-সূর্য্য বহু নহে। হেলেনার অন্ধ কবি হোমারকে, কি মন্‌টুয়াবাসী ভার্জ্জিলকে, ব্যাস-বাল্মীকির এক সিংহাসনে বসাইতে যাঁহারা ইচ্ছুক—তাঁহা-দিগের জন্য একবার রামায়ণকে ইলিয়াডের সঙ্গে তুলনা দিব। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে বহু নিম্নে অবতরণ করিয়া ইনিডের কবির সঙ্গে যোগ্য-তার পরীক্ষা দেওয়ার লাঞ্ছনা হইতে মাপ দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু অগত্যা হোমা-রের সঙ্গে তাঁহার পরীক্ষা দিতে হইবে। হোমার য়ুরোপীয় উন্নতির মূলে—অক্ষয় যশমাল্য-কণ্ঠে অন্ধ কবি য়ুরোপীয় উন্নতির মূলে। য়ুরোপের সমস্ত জাতি হোমারের নিকট দায়ী। য়ুরোপের সাহিত্যের ভিত্তি—ইলিয়াড; ইলি-য়াড কবিত্বের শিকড়। ইলিয়াড হইতে ইনিড—যেরূপ কাণ্ড হইতে শাখা; ইনিড হইতে ডিভাইনা কমেডিয়া—যেরূপ শাখা হইতে পুষ্প। বাল্মীকি হইতে কালিদাস, ভবভূতি; হোমার হইতে ভার্জ্জিল, ডান্টে, সেক্ষপীয়র। যদি বল সেক্ষপীয়র, ' Little of Latin and less of Greek" লইয়া, কিরূপে হোমারের নিকট দায়ী! তাহার উত্তর,—সেক্ষপীয়র ইংরেজ-জাতির নিকট দায়ী; ইংরেজ-জাতি রোমের নিকট দায়ী; রোম হোমারের নিকট দায়ী। পুষ্প শাখার নিকট দায়ী, শাখা কাণ্ডের নিকট, কাণ্ড শিকড়ের নিকট দায়ী। মূলে শিকড়—শিকড়ের রস পুষ্পে; পুষ্প স্বীকার না করিলে, পুষ্প পাপিষ্ঠ!

হোমারের ইলিয়াড ২৪ অধ্যায়ে শেষ। এই ২৪ অধ্যায়ের আদি হইতে অন্ত, এক যুদ্ধের ইতিহাস। হোমারের লিখিত ইতিহাসে য়ুরোপের তৎকালিক সভ্যতম জাতির ইতিহাস লিপিবদ্ধ। সে ইতিহাস জীবন্ত—শুধু বাহিরের বিবরণ-লেখকের ইতিহাস কে পড়িত? হোমার কবি, প্রকৃতির যথাযথ বর্ণ অমর অক্ষরে বাঁধা পড়ি-য়াছে। অন্ধ কবির বীণাধ্বনিতে তিন ভুবন মুগ্ধ; ইলিয়াড পকেটে করিয়া নেপোলিয়ান কৈশোরে শৈলশৃঙ্গে বিহার করিতেন, ও শ্রেষ্ঠ পদের মহিয়সী স্বপ্ন দেখিতেন; ভিক্টার হিউগো হোমার-স্তবে উন্মত্ত—হোমারের সৃষ্টি, ঈশ্ব-রের সৃষ্টি হইতে এক কাটি উচ্চে লিখিয়া ফেলিয়াছেন।

তাই প্রথমে হোমারকে দেখিব,—তৎপরে বাল্মিকীর সঙ্গে তুলনা করিব।

অভিমানী একিলিস—ইলিয়াডের শ্রেষ্ঠ বীর, এগামামননের উপর ক্রুদ্ধ। এই ক্রোধ-ভিত্তির উপর ইলিয়াড স্থিত। একিলিস, ইলিয়াডের শ্রেষ্ঠ বীর। আর রামচন্দ্র রামায়ণের শ্রেষ্ঠ বীর। একিলিস, দেব-পুত্র, দেবানুগৃহীত। রাম-চন্দ্র, ভগবৎ-অংশ, নারায়ণ-রূপী, দৈব-বলে বলী। কিন্তু একিলিসকে রামচন্দ্রের নিকট দাঁড় করিতে প্রবৃত্তি হয় না। কেন হয় না, দু'চারিটি কথা-তেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন। একিলিস গ্রীসের আদর্শ বীর: আর রামচন্দ্র ভারতের আদর্শ বীর। একিলিস অর্থ, তাৎকালিক গ্রীসের —য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ পুরুষ; আর রামচন্দ্র, হিন্দু-স্থানের শ্রেষ্ঠ পুরুষ। রামচন্দ্র, হিন্দুস্থানের কাঞ্চন-জঙ্ঘা; আর একিলিস আল্পের উচ্চতম শৈল—মাউণ্ট ব্ল্যাঙ্ক। তুলনা কি দিব?

রাম যুদ্ধ করিতেছেন—সীতা-কুসুমের জন্য। যে মত্ত বারণ দন্তে লগ্ন করিয়া তাঁহার পদ্মিনী উৎপাটন করিয়া লইয়াছে, সে মত্ত গজ রাবণের জন্য তাঁহার ব্রহ্মাস্ত্রের অঙ্কুশ। সতী-সাধ্বী মহালক্ষ্মীর জন্য, সতী-সাধ্বীর স্বামী—বিষ্ণু, যুদ্ধ করিতেছেন; সাধুদিগকে পরিত্রাণ করিবার জন্য, দুস্কৃত বিনাশ করিবার জন্য, যুদ্ধ করিতে-ছেন,—এই যুদ্ধই মহাকাব্যের উপযুক্ত বটে!

আর ইলিয়াডের ভিত্তি—একিলিসের ক্রোধ। একিলিসের ক্রোধ কেন? এগামেম-নন, যুদ্ধ জয় করিয়া ক্রেসিস নাম্নী সুন্দরীকে লইয়া মত্ত *, আর যুদ্ধ-লব্ধ ইন্দিবরেক্ষণা ব্রেসীসকে লইয়া একিলিস্ বীর সুখী। এগামেমনন, দৈব ক্রোধে বাধ্য হইয়া, ক্রেসি-সকে প্রত্যর্পণ করিলেন; কিন্তু, ব্রেসিস-সুন্দরীকে একিলিসের অঙ্ক হইতে কাড়িয়া লইলেন। একিলিসের এইহেতু ক্রোধ; আর এই ক্রোধই ইলিয়াডের ভিত্তি। এ অবস্থায় কি, নৈতিক তুলাদণ্ড হস্তে করিয়া, রামায়ণ আর ইলিয়াডের মূল্য-নির্ণয় করিতে ইচ্ছা হয়?

তারপর, যখন একিলিস না হইলে গ্রীক-যোদ্ধাগণ রসাতলে যায়; যখন হেক্টার, এজাক্সের হস্তে নিহত হইয়াও, দৈববলে পুন-জীবন লাভ করিল, ও মত্ত বারণের মত দন্ত-লগ্ন করিয়া গ্রীক-শিবির উৎপাটিত করিতে উদ্যত হইল; যখন "গ্রীক-দেশ আর নাই" বলিয়া, গ্রীক-যোদ্ধা হুতাশে ধুম্র দেখিতে লাগি-লেন; তখন এগামেমনন একিলিসকে সাধিতে প্রস্তত হইলেন। কিন্তু, শ্রেষ্ঠ বীরকে কি দিয়া সাধিলেন? "সপ্ত সুমনোহর রাজ্য দিব, সুন্দরী ব্রেসিসকে তোমার ভুজ-বন্ধনে ফিরাইয়া দিব, যুদ্ধ-লব্ধ অপ্সরাতুল্য লাবণ্যময়ী বিশটি রমণী দিব, দশ ট্যালেণ্ট (Talent) খাঁটি স্বর্ণ দিব, —এতেও যদি না মান, তবে লেডোছি, একি-জেনি, ক্রীসোথেমি নাম্নী আরও তিন জন বিখ্যাত পরীতুল্যা সুন্দরী রমণী দান করিব। এস, ফিরিয়া আসিয়া যুদ্ধ কর।" † ইউলেসিস মহাজ্ঞানী—'ডিভাইন ইউলেসিস'; কিন্তু, তিনিও সৈন্যদিগকে যুদ্ধের উৎসাহ' দেওয়ার সময়

---

* ইলিয়াড, ১ম অধ্যায়।

† ইলিয়াড, ৯ম অধ্যায়।

বলিতেছেন,—"যুদ্ধ কর, প্রত্যেকে একটী একটী সুন্দরী ক্রোড়ে পাইবে।" *

আর ট্রোজান-যুদ্ধ! যে পারিস, পবিত্র আতিথ্য-সম্মান দলন করিয়া, পরস্ত্রী লইয়া পলায়ন-পর, সেই পারিস, পরম সুন্দর হইলেও, তাহাকে শত ধিক! স্বীয় স্ত্রীর ব্যাভিচার সম্যক জানিয়াও, যে মানিলস্, পুনঃ তদাকাঙ্ক্ষা করিয়া যুদ্ধ করে, সেই মানিলস্‌কেও শত ধিক! যে শ্রেষ্ঠ বীরগণ, যুদ্ধ-লব্ধ রমণীর অংশ লইয়া কলহ করে, সেই বীরগণ—দেবানুগৃহীত হইলেও, তাহাদিগকে শত ধিক! যে প্রায়াম ও হিকুবা হেলেনকে গৃহ হইতে তাড়াইয়া না দিয়া তজ্জন্য স্বস্তুতবর্গকে যুদ্ধলিপ্ত করিতেছেন, সে প্রায়াম ও হিকুবাকে শত ধিক! ধার্ম্মিক হইয়াও যে হেক্‌টার, হেলেনকে স্বগৃহ-আঙ্গিনায় সহ্য করিতেছেন ও তাহাকে মিষ্টমুখে কথা বলিতেছেন † এবং তাহার জন্য অন্যায় সমরে লিপ্ত হইতেছেন, সেই হেক্‌টারকে শত ধিক! যে এগামেমনন এদিকে পরস্ত্রী লইয়া ক্রীড়া করিতেছেন, সেদিকে ক্লেটোমিনেষ্ট্রা স্বামীর অনুপস্থিতির সুবিধা পাইয়া উপস্বামী গত হইতেছে, সেই এগামেমনন ও ক্লেটোমিনেষ্ট্রাকে ধিক! পারিস-যুদ্ধে পলাতক হইলে যে ভেনাস দেবী, হেলেনকে তদঙ্কে আনিয়া, উভয়কে পাপে লিপ্ত করাইতেছেন, সে ভেনাস-দেবী—দেবী না পিশাচী?

রামচন্দ্রের নামের সঙ্গে একিলিসের নাম কি এককণ্ঠে উচ্চারণ করিতে ইচ্ছা হয়? রামচন্দ্র সংযতেন্দ্রিয়; রাজাদিগের বহু স্ত্রীর প্রথা, কিন্তু রামচন্দ্র একদার। রামচন্দ্র স্বামী, আর সীতা স্ত্রী—কিরূপ স্বামী, আর কিরূপ স্ত্রী, জগৎ তাহা জানে। অশ্বমেধ-যজ্ঞ স-দার হইয়া সম্পন্ন করিতে হয়—রাম সুবর্ণ সীতা নির্ম্মাণ করিলেন। রামের হীরণ্ময় বিগ্রহ, আর সুবর্ণময়ী সীতা—শ্রেষ্ঠতম দম্পতি—ভারতে চিরদিন পূজিত হউক।

তৎপরে ইলিয়াডে শত্রুর প্রতি দয়া। শুনিয়াছি, 'এপিক্‌টেটসে' নাকি দয়ার পাঠ গ্রীক-জাতিকে প্রথম শিক্ষা দেন,—"There is no difference between the Greeks and the barbarians." কিন্তু ইলিয়াডে দয়ার সঙ্গে বীরবর্গের কোন সম্বন্ধ নাই। ইউলেসিস্ এত জ্ঞানী—বুদ্ধির মেরু; কিন্তু, তিনি যখন শত্রুর শিবির প্রচ্ছন্নভাবে দেখিতে যান, তখন শত্রু-পক্ষীয় দূতের সঙ্গে তাঁহার দেখা হয়; এবং দূত সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে বলিল ও কৃপা-ভিক্ষা করিল—নতজানু-অশ্রুনেত্র হইয়া শরণাগত হইল! কিন্তু ইউলেসিস ও তৎসঙ্গী তন্মুহূর্ত্তে তাহাকে বধ করিলেন! ধিক ইউলেসিসের জ্ঞান! হউন—গ্রীক-দেশে তিনি মহাজ্ঞানী; কিন্তু ভারতে তিনি পশু!

আর সমর-ক্ষেত্রে রক্তাক্ত-দেহ একিলিসের বীর-মূর্ত্তি কি দেখিতে সাহস হয়? পাশব-শক্তি মনুষ্যে এত বেশী, আর জগতের কোন গ্রন্থে দৃষ্ট হয় না। পর্ব্বত-বিহারী উন্মত্ত বরাহ-মত, একিলিস শত্রু-দলন করিতেছেন; একিলিস-ঝড় যেদিকে প্রবাহিত, সেদিকে শত্রু-সৈন্য পুষ্পরাশীর ন্যায় ছিন্ন-ভিন্ন, লুণ্ঠিত, উলট-পালট হইয়া পড়িতেছে; শোনিত-প্রবাহে শত-জীবন ভাসিয়া যাইতেছে। ঐ, একিলিস-ঝড় আসিতেছে; অট্টালিকা ধ্বংশ হইয়া ভূশায়ী হইতেছে; বীর ভীরুর মতন পলাইতেছে; ওরিনটাইডস্, ডেমলিথান, ইলিশ, কোথায় ছিন্ন-ভিন্ন হইয়া ছুটিতেছে;—হোমারের জ্বলন্ত ভাষা, ইলিয়াডের এই অধ্যায়ে অগ্নি জ্বালিয়াছে! যুদ্ধের এমন ভীষণ বর্ণনা আর পড়ি নাই। কিন্তু একিলিসের দয়া!—ঐ দেখ, পশুর মুখে এলাষ্টার পড়িয়াছে; কাঁদিয়া, প্রাণ-ভিক্ষা করিতেছে; নেত্র-জলে, বারিসিঞ্চিত পদ্ম-কুসুমের মত, সুন্দর মুখ সিক্ত হইয়াছে; বারম্বার বলিতেছে,—"আমায় প্রাণভিক্ষা দেও; আমি তোমার চিরসেবক হইয়া থাকিব।" কিন্তু তবুও একিলিস্ তাহাকে হত্যা করিতে ছুটিল! একিলিসের হৃদয় বজ্রসম। এই দেখ, রাজপুত্র লেসিওন, প্রাণের জন্য কত কাঁদিয়া, একিলিস-পাষাণকে দ্রব করিতে চাহিল; কিন্তু সে পাষাণে কি বারি-সঞ্চয় আছে? কাজেই লেসিওনের শোনিতার্দ্র মৃত-দেহ পড়িয়া রহিল; একিলিস-ঝড় কার্য্য সমাধা করিয়া ছুটিল।

এই একিলিসের সঙ্গে কি রামের তুলনা সম্ভবে? চন্দনে-পঙ্কে বা পঙ্কে-পঙ্কজে উপমা চলে কি? বিষ্ণু-পদচ্যুতা পূজার কুসুম-গুচ্ছ-ধারিণী মন্দাকিনী-নীরে, আর হাহাকার-রব-সঙ্কুল বৈতরণী-জলে উপমা চলে কি? সত্য বটে, বিরাট ধনুষ্পানি, রাম-যুদ্ধে কালাগ্নি-সদৃশ; কিন্তু তবুও, রামচন্দ্র দয়ার অবতার—সে চিত্রে কালরূপী মহেশ্বর ও পালনরূপে বিষ্ণু উভয়েরই সামঞ্জস্য। একদিকে যেমন বিশাল ধনু তাঁহার স্কন্ধ-সংলগ্ন—তৎকার্ম্মুক জানু চুম্বন করিতেছে; অপরদিকে তেমনিই তাঁহার কৃপা-মধুর-মূর্ত্তি দেখিয়া দর্ভাঙ্কুর নির্ব্বিপেক্ষ মৃগযূথ সেই রূপ-সুধা পান করিয়া সুখী হইতেছে! তিনি, শরণাগত শত্রুকে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিয়া, জানকীকেও পুনর্লাভ-বাসনা কখনও ত্যাগ করিতেছেন! এহেন রামচন্দ্রের নিকট একিলিস্‌কে দাঁড় করাইব কি! পাপের নিকট পুণ্য, আঁধারের নিকট আলোক, শোভা পায় কি?

* ইলিয়াড, ২য় অধ্যায়।

† হেক্‌টার বধে হেলেনের বিলাপ দেখ।—ইলিয়াড ২৪শ অধ্যায়।

কবিতা ও গান।

নীতি-কবিতা।

১। পরপ্রতি ব্যবহার।

পরপ্রতি আচরণ যে করে যেমন।
করে পরে তার প্রতি ব্যাভার তেমন॥
পর-পত্নীপানে যেই চায় দুষ্ট-মনে।
দুষ্টভাবে কথালাপ করে তার সনে॥
শুচি পতি-প্রেমে তার বিকার জন্মায়।
কুলশশী কলঙ্কী করিতে যত্ন পায়॥
তাহার পত্নীর প্রতি এইরূপ পরে।
অবশ্যই বিগর্হিত ব্যবহার করে॥
এরূপ, যে পরপ্রতি করে সদাচার।
করে পরে তার প্রতি সাধু-ব্যবহার॥
পরের দুখেতে দুখী হয় যেই জন।
হয় তার দুখে দুখী অপরের মন॥
পরপ্রতি সাধু-ন্যায় ব্যাভার যে করে।
সকলেই ন্যায়বৃত্ত হয় তার পরে॥
পরে যেই ক্ষমা করে ক্ষমা সেই পায়।
পরে যে পড়িতে ধরে পরে ধরে তায়॥

২। নম্রত্বাদি অবিদ্যা-বিদ্যা-সূচক নহে।

একালে মানব-চিত্তে ভ্রম এক এই।
যেজন বিনম্র-ভীরু অবিদ্বান্ সেই॥
থাকিলেও নানা-জ্ঞান সঞ্চয় অন্তরে।
খড়ি পড়ে মূর্খ বলি তাহার উপরে॥
নম্রতা ভীরুতা বহু মূর্খে দৃষ্ট হয়।
তাই তার কখন মূর্খতা হেতু নয়॥
বটবৃক্ষে হয় অন্য বৃক্ষের অঙ্কুর।
তাই তার বীজ বট না কন বিদুর॥
অনম্রতা অভীরুতা নহে বিদ্যাফল।
বাড়বের নহে হেতু সাগরের জল॥

৩। অপরিণামজ্ঞ যুবক।

যে কার্য্যের বিনা শুধু পরিণাম-জ্ঞান।
বুঝিতে না পারা যায় অহিত-কল্যাণ॥
যুবকের সেই কার্য্যে ঘটে সদা ভ্রম।
অনারম্ভ ভাল তার নহে উপক্রম॥
প্রতিকূল হয় সে কার্য্যের যেই জন।
অনুকূল হতে তিনি আদর-ভাজন॥
হয় যদি ক্রোধের উদয় কার 'পরে।
ধৈরয়ে সংযম তার যে জন না করে॥
করে অনুতাপ-ভোগ পরে সে নিশ্চয়।
কিন্তু কি আশ্চর্য্য তাহা মনে নাহি রয়॥

৪। রূপ-গুণ।

মনোজ্ঞ কুসুমে শোভে অশোক-সকল।
কিন্তু তাহা কোন দিন নাহি ধরে ফল॥
শোভে না প্রসূনদামে পনস তেমন।

ফল ধরে ক্ষুধা হরে রসনা-রঞ্জন ॥
অশোকের ফলাভাব বটে শোককর।
তা বলি দ্বেষের নহে পনস-নিকর ॥
রূপের ছটায় দেহ সুন্দর যাহার।
শোকের কারণ বটে গুণাভাব তার ॥
তা বলি যা' গুণ ধরে শ্রী-বঞ্চিত জন।
বিদ্বেষের যোগ্য কার নহে কদাচন ॥

৫। ধনাদি গৌরব।

ধন যশ বিদ্যা বুদ্ধি কৃত-পুণ্য তরে।
বিশেষ গৌরব করে অলঙ্কৃত নরে ॥
অনেকের সে গৌরব-চ্ছটা নাহি সয়।
অতিক্রম করে তাহা সাবজ্ঞ হৃদয় ॥
নির্দ্দোষ মানস তাঁর বাক্য-বিষে জারে।
নিষ্পেষণ করে সদা তিক্ত-ব্যবহারে ॥
কমেনা ইহাতে তাঁর গৌরব কখন।
তাহাদের বাড়েনা অথবা মান-ধন ॥
সূর্য্য প্রতি ভস্মক্ষেপ যদি কেহ করে।
টুটে কি গৌরব তার, তারে কি আদরে ॥

৬। সমভাব।

বসন্তে নিদাঘে-শীতে সমভাব ধরে।
না দহে নিদাঘে শীতে জড় নাহি করে ॥
নানা-চ্ছবি পুষ্প হয় সুরভি সুন্দর।
নবকিশলয়ে শোভে পাদপ-নিকর ॥
এইরূপ সমভাব সদা যে আত্মায়।
দহেনা তা কাহাকেও, জড়ে না তাকায় ॥
ফুটে সে উদ্যানে নানা সদ্‌গুণ-প্রসূন।
সৌভাগ্যে না রয় ধরা নন্দনের ন্যূন ॥

* * *

বন্দনা-গীতি।

"জয় জয় যদুকুল জলনিধি চন্দ।
ব্রজকুল গোকুল আনন্দ কন্দ ॥
উজল জলধর শ্যামর অঙ্গ।
হেলন কলপতরু ললিত ত্রিভঙ্গ ॥
মূরতি মদন ধনু ভাঙ বিভঙ্গ।
বিষম কুসুম শর নয়ান তরঙ্গ ॥
চূড়ায়ে উড়য়ে মত্ত ময়ূর শিখণ্ড।
টলমল কুণ্ডল ঝলমল গণ্ড ॥
সুধই সুধাময় মূরলী বিলাস।
জগজন মোহন মধুরিম হাস ॥
অবনী বিলম্বিত বনে বনমাল।
মধুকর ঝঙ্করু ততই রসাল ॥
তরুণ অরুণ রুচি পদ অরবিন্দ।
নখমণি নিছনি দাস গোবিন্দ ॥"

অদৃষ্ট।

ঊনপঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ।

আমাদের বন্দোবস্ত।

প্রাতঃকালে উঠিবামাত্র হরিপদ দৌড়িয়া সুলোচনার নিকট গেল। রাত্রের কথা-মত আমি আর সে দিবস যাইব না বলিয়া তাহাতে কোন প্রতিবন্ধক দিলাম না। আমিও উঠিয়া প্রাতঃক্রিয়া সমাপনান্তে যেমন গৃহে প্রবেশ করিব, অমনি ডাক্তার বাবু আমাকে ডাকিয়া কহিলেন, —"যদু, এস দেখি, একটু বেড়িয়ে আসি।" আমি পিছন ফিরিয়া দেখি, ডাক্তার বাবু বেশ-ভূষা করিয়া আসিয়াছেন। আমিও তৎক্ষণাৎ কাপড়-চোপড় পড়িয়া তাঁহার সহিত বাহির হইলাম।

কিয়দ্দূর গমন করিয়া, ডাক্তার বাবু আমাকে একটী স্থান দেখাইয়া কহিলেন,—"এই জমী-খণ্ড আমি সুলোচনার নামে লেখা-পড়া করিয়া দিতেছি। তুমি যত সত্বর পার, নিজে যত্নবান হইয়া, আপাততঃ গুটী-দুই কুটুরী, একখানা রান্নাঘর ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিয়া লও। টাকা সমস্তই আমি দিব। ইট শুর্কী ইত্যাদি আমিই সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিতেছি। এক্ষণে, চল দেখি, একটী বাড়ী ভাড়া পাওয়া যায় কিনা দেখি? আমি আর ও বাড়ীতে থাকিব না। সুলোচনা, তুমি, আমি ও হরিপদ—চল, অপর একটী বাটী ভাড়া করিয়া তথায় থাকি-গে।"

অনেক ঘুরিয়া ঘুরিয়া, ডাক্তার বাবুর বাটীর অনতিদূরে, অথচ উত্তর-পল্লীতে, একটী বাটী পাওয়া গেল। তাহার উপরে দুইটী কুটুরী, এবং নীচের ও বাহিরের ঘর ধরিয়া চারি-পাঁচটী কুটুরী আছে। বাড়ীটীর ভাড়া বার টাকা সাব্যস্থ হইল। তথা হইতে প্রস্থান করিয়া ডাক্তার বাবু নিজ-বাটীতে আগমন করিলেন।

সকলের স্নানাহার হইয়া গেল। ডাক্তার বাবু নিজ-ঘরে আপন পুত্রদিগকে ও আমাকে ডাকাইয়া, নিজের মনোভাব ব্যক্ত করিলেন। তাঁহার পুত্রেরা নানা-প্রকার আপত্তি উত্থাপন করিলেন, এবং আমার বিরুদ্ধেও নানারূপ কথা কহিতে লাগিলেন। আমি যতক্ষণ তথায় ছিলাম, মস্তক অবনত করিয়া ছিলাম। ডাক্তার বাবু পুত্রদিগের আর কোনই আপত্তি শুনিলেন না; এবং পরিশেষে, তাঁহার সঞ্চিত অর্থের যেরূপ বিভাগ স্থির করিয়াছিলেন, তাহাও ব্যক্ত করিলেন। অর্থাৎ সুলোচনার জমীখণ্ড বাদে, সমস্ত বিষয়-আশয় পুত্রদিগকে দিয়া, সঞ্চিত অর্থের অর্দ্ধেক সুলোচনার নিমিত্ত রাখিয়া, বক্রী অর্দ্ধেক পুত্রদিগকে দিতে রাজি হইলেন। অনেক বাক-বিতণ্ডার পর পুত্রগণ অসন্তুষ্ট হইয়া তথা হইতে চলিয়া গেলেন। তখন, ডাক্তার বাবু আমাকে ডাকিয়া কহিলেন,—"যদু, আমার জিনিষ-পত্র লইয়া অদ্যই সে বাটীতে যাওয়া যাক।" আমি 'যে আজ্ঞা' বলিয়া তথা হইতে উঠিয়া আসিয়া সাত-পাঁচ ভাবিতেছি, এমন সময় শুনিলাম, ডাক্তার বাবু চাকরকে ডাকিয়া দশ-বার জন মুটে আনিবার কথা বলিয়া দিলেন। এই সময় হইতেই আমার প্রকৃত-পক্ষে সাহস উপস্থিত হইল। এদিকে দশ বার জন মুটে আসিয়া দ্রব্যাদি নামাইতে লাগিল; আমিও দ্বিগুণ সাহসে তাহাদিগের সহিত যোগ দিয়া যাহাতে দ্রব্যাদি ভালরূপে যায়, তাহার তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলাম।

ডাক্তার বাবুর দুইটী চাকর ছিল। একটী ডিস্পেন্সারির জন্য, আর একটী বাটীর জন্য। ডাক্তার বাবুর বন্দোবস্ত-অনুসারে একজন চাকর দ্রব্যাদি যথা-স্থানে সন্নিবেশিত করিবার জন্য সেই ভাড়াটিয়া বাটীতে উপস্থিত ছিল। লোক-জন নিযুক্ত হইলে তিন-চারি ঘণ্টার মধ্যে ডাক্তার বাবুর ডিস্পেন্সারি-সমেত সমস্ত আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সেই বাটীতে যথা-স্থানে সন্নিবেশিত হইল। এই বন্দোবস্ত করিতে করিতে সন্ধ্যা সমাগত হইল। সুলোচনা অদ্য দু'বেলাই রন্ধন করিয়াছেন। সন্ধ্যার পর সকলের আহারাদি হইলে, ডাক্তার বাবু, আমি, হরিপদ ও সুলোচনা, এবং সকলের পশ্চাৎ লণ্ঠন ধরিয়া ডিস্পেন্সারির সেই চাকর, সেই বাটীতে গমন করিলাম। অর্দ্ধরাত্রি আন্দাজ ডাক্তার বাবু, আমি ও সুলোচনা গল্প করিয়া কাটাইলাম। পরে যে যেখানে পাইলাম, সেদিনের মত নিদ্রিত হইলাম।

পর-দিবস প্রত্যূষে উঠিয়া ডাক্তার বাবু আমাকে কহিলেন,—"যদু, সমস্তই তো হইল! এক্ষণে, তুমি সুলোচনাকে বিবাহ না করিলে আর কোন কার্য্যই হইতে পারে না।" আমি কহিলাম,—"আমার মতামত কিছুই নাই, আপনিই সর্ব্বস্ব, আপনি যেরূপ আজ্ঞা করিবেন, আমি তাহাই করিব।" তখন ডাক্তার বাবু আর দ্বিরুক্তি না করিয়া স্থানীয় ব্রাহ্মগণের সাহায্য লইলেন।

ব্রাহ্মগণ কয়েক দিবস সমবেত হইয়া ডাক্তার বাবুর সহিত আলাপ-পরিচয় করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিলেন, এবং একটী দিন স্থির করিয়া আমার সহিত সুলোচনার ব্রাহ্মমতে বিবাহ দিলেন।

এবাটীতে আসা অবধি হরিপদ যে কিরূপ সুখে ছিল, তাহা বলিতেও, আমার আনন্দাশ্রু বহির্গত হয়। তাহার এরূপ যত্ন ও তাহার এরূপ সুখ দেখিয়া, আমি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম যে, মহামায়া জীবিত থাকিলেও তাহার

কখন এরূপ সুখ ও এরূপ যত্ন হইত না। বস্তুত মহামায়া না থাকার জন্য তাহার যে দুঃখ, তাহা সে ভুলিয়া গেল। তখন সে বালকমাত্র, মাতৃস্নেহ কাহাকে বলে, জানিত না। মাতৃ-স্তন্য-পানে বিবর্জ্জিত হইয়া, তাহার সুখের যতদূর সীমা, তাহা এক্ষণে হইয়াছে।

এই অবধি ডাক্তার বাবুকে যে কেহ চিকিৎসার জন্য ডাকিতে আইসে, ডাক্তার বাবু স্বয়ং না গিয়া আমাকেই পাঠাইয়া দেন। আমিও যাইয়া যথাবিধি ঔষধ দিলেই সে রোগী আরোগ্য হয়। অবশ্য সঙ্কট-স্থলে আমি ডাক্তার বাবুর পরামর্শ লইতাম; এবং ডাক্তার বাবুও, আমার সহিত যাইয়া, সেই রোগী দেখিয়া, আমার দ্বারাই তাহার চিকিৎসা করাইতেন। এইরূপে অল্পকাল মধ্যেই আমার বিলক্ষণ পশার হইল। এদিকে আমাদিগের বাটীও প্রস্তুতপ্রায় দেখিয়া, ডাক্তার বাবু একদিবস সন্ধ্যার পর আমাকে ও স্থলোচনাকে ডাকিয়া প্রস্তাব করিলেন—তিনি কাশীবাসী হইবেন। আমি শুনিয়া কিছুই উত্তর দিতে পারিলাম না। স্থলোচনা পিতার পদদ্বয় ধারণ করিয়া কহিল,—"আপনি ইতিমধ্যেই যাবেন কি? আমরা ও বাটীতে যাই; তাহা দেখিয়া-শুনিয়া, ও দাদাদের সকলকে সুস্থ দেখিয়া, তবে আপনি যাইবেন। ডাক্তার বাবু কন্যার এতাদৃশ অনুরোধে অগত্যা সম্মত হইলেন। আর কিছুকাল থাকিয়া, বাটী বসবাসের উপযোগী হইলে, ডাক্তার বাবু, আমাকে ও স্থলোচনাকে একত্রিত করিয়া কহিলেন,—"বাটী ত প্রস্তুত হইয়াছে; এদিক ওদিক যাহা কিছু বাকী আছে কতকগুলি মজুর খরচই দরকার। এক্ষণে সুবিধামত জেলখানায় মজুরের দাম আমানত করিলেই যত ইচ্ছা মজুর পাইবে। জেলখানা হইতে মজুর লইয়া আবশ্যক-মত কার্য্য করাইয়া লইবে। আমি আর অপেক্ষা করিতে পারিতেছি না; কল্যই পুত্রদিগকে ডাকাইয়া, সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া ও বৌমা-দিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, এস্থান হইতে প্রস্থান করিব। আমার এ উদ্দেশ্যে আর হন্তারক হইও না। আমি সকলেরই উপায় করিয়া গেলাম। এক্ষণে আমার উপায় তোমাদিগের দেখা সর্ব্বতোভাবে উচিত।"

স্থলোচনা, পিতার এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন,—"বাবা, আপনার মনের গতি যদি এইরূপ হইয়া থাকে, তবে আমরা বাধা দিতে চাই না। তবে আমি আপনার কন্যা; আমাকে যে ভাবে রাখিয়া গেলেন, ইহা যেন সর্ব্বদা মনে থাকে। সর্ব্বদাই যেন আপনার চিঠি-পত্র পাই; আপনার অসুখ-বিসুখ হইলে যেন যাইয়া আপনার পদসেবা করিতে পাই। আমার এ ভিক্ষাটি যেন মনে থাকে। আপনাকে ছাড়িয়া আমি যে এখানে থাকি, আমার এ ইচ্ছা নাই। আপনি যদি আমাকে সঙ্গে লইয়া যান, তাহা হইলে আমি সর্ব্বাপেক্ষা সুখী হই। আপনি যদি আমাকে সে সুখে বঞ্চিত করেন, তবে এইমাত্র করিবেন, যেন সর্ব্বদা আপনার পত্র পাই।"

পাঠকবর্গ, যদি আমাকে 'বেইমান' মনে না করেন, তাহা হইলে আমি এইখানে একটা অন্তরের কথা খুলিয়া বলি। ঐ কথাটী আমার পক্ষে কিন্তু বড় গুরুতর জ্ঞান হইল। এরূপ অবস্থায় অপরে পড়িলে তাহার কিরূপ জ্ঞান হয়, বলিতে পারি না; কিন্তু শুনিয়া অবধি আমার মনে আর শান্তি রহিল না। তখন স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম, আমার অদৃষ্টে সুখ নাই। ফল কথা, আমার অন্তঃকরণে কোন খল-কপট নাই, এবং তাহা অত্যন্ত নরম; একথা আমি পূর্ব্বেও বলিয়াছি। সুতরাং স্থলোচনা যখন পিতাকে কহিলেন,—"বাবা, আমাকে যে ভাবে রাখিয়া গেলেন, তাহা যেন সর্ব্বদা মনে থাকে," তখন বাস্তবিকই অন্তঃকরণটা ব্যথিত হইল। ভাবিলাম, আমার সহিত বিবাহ হওয়ায় স্থলোচনা অবশ্যই আপনাকে নীচ জ্ঞান করিয়াছেন; নতুবা পিতার নিকট কাঁদিয়া এমন কথা কহিবেন কেন?

স্থলোচনার মুখ হইতে এই কথাটী নির্গত হইবামাত্র, আমার কেমন একটা অপমান-জ্ঞান হইল। আর তাঁহাদের মুখের দিকে তাকাইতে পারিলাম না। যতক্ষণ তথায় ছিলাম, অবনত-মস্তকেই বসিয়া ছিলাম; এবং কেবল স্থলোচনার উক্ত কথাটীর উপর নানা-প্রকার যুক্তি খাটাইতে লাগিলাম। এই অন্দোলন করায় আমার মনে যে কষ্ট হইতেছিল, তজ্জন্য, বোধ হয়, দুই' এক ফোটা অশ্রুও আমার চক্ষু হইতে নির্গত হইয়াছিল। আমার চক্ষে জল দেখিয়া, ডাক্তার বাবু আমাকে বিস্তর সান্ত্বনা দিলেন। প্রকৃতপক্ষে যদিও আমি তাঁহার ন্যায় উপকারী বন্ধুকে হারাইব ভাবিয়া দুঃখিত হইয়াছিলাম; কিন্তু সে দুঃখ অপেক্ষা স্থলোচনার এই আত্ম-গ্লানিসূচক বাক্য শুনিয়া আমার বেশী দুঃখ ও কষ্ট হইয়াছিল, এবং এই কারণেই আমার চক্ষু হইতে অশ্রু নির্গত হয়। কিন্তু, ডাক্তার বাবু তাহাতে কি ভাবিয়াছিলেন না ভাবিয়াছিলেন, তাহা আমি বলিতে পারি না। ফলতঃ তিনি আমার অশ্রু দেখিয়াই আমাকে এত সান্ত্বনা দিয়াছিলেন ও বিস্তর বুঝাইয়াছিলেন। এইকথা স্বীকার করায় হয়ত পাঠকবর্গ আমাকে অকৃতজ্ঞ মনে করিবেন। কিন্তু বাস্তবিক আমি তাহা নই। ডাক্তার বাবুর জন্য আমার বিলক্ষণ কষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু কালভেদে আমার সে দুঃখ আর এক দুঃখে পরিণত হইয়াছিল।

সে দিবস তথায় অতিবাহিত করিয়া, পরদিবস প্রত্যূষে, ডাক্তার বাবু স্বীয় পুত্রগণকে ডাকাইলেন। তাঁহাদিগের সহিত বিষয়-আশয় সম্বন্ধীয় ও নানারূপ কথাবার্ত্তার পর, তিনি, আপনার বস্ত্রাদি ও আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি লইয়া, আহারান্তে, আমাদের সকলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া, নিজবাটী গমন করিলেন। তথায় পুত্রবধূগণের নিকট হইতেও বিদায় লইয়া, ইহ-জীবনের জন্য ৺কাশীধামে যাত্রা করিলেন।

পয়সা-কড়ি।

(নূতন নভেল।)

(১)

সেদিন তখনও পর্য্যন্ত কাহারও দুটো অন্ন জুটে নাই। চৈত্র-মাসের নিদারুণ রৌদ্রতাপ; তায় বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহর। দারুণ একাদশীর উপবাসের পর, এত বেলা পর্য্যন্তও, বৃদ্ধা জননীর উদরে একবিন্দু জল পড়ে নাই; পত্নী—সেও অনাহারে; কনিষ্ঠ ভ্রাতা—বালকমাত্র—সেও এখনও কিছু খাইতে পায় নাই। আর যে কোন আশাও নাই! গৃহের সামান্য ঘটি-বাটিটি পর্য্যন্তও বাঁধা পড়িয়াছে—আর তো কেউ বিশ্বাস করে কিছু ধারও দিল না! তবে এখন, উপায় কি?

জ্যেষ্ঠ হরিশ্চন্দ্র, মাথায় হাত দিয়া বসিয়া, এরূপই ভাবিতেছেন; আর, নীরবে অশ্রুজলে বক্ষ ভাসাইতেছেন। তায় আবার ক্ষুধায়-কাতর কনিষ্ঠ অখিলচন্দ্র সজল-নয়নে নিকটে আসিয়া বলিল,—"দাদা, বড় খিদে পেয়েছে—কি খাব তবে?" হরিশের সে যন্ত্রণা আর সহ্য হইল না; সে কথায় তাঁহার হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইতে লাগিল। তিনিও অমনি, কাঁদিতে কাঁদিতে, উঠিয়া দাঁড়াইলেন; মনে মনে আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন,—"ধিক আমি!—ধিক আমার জীবনে! আমি এখনও নিশ্চেষ্ট! আমার সম্মুখে, একটু জলাভাবে, আমার স্নেহময়ী জননী আসন্নশায়ী, আমার প্রাণাধিক সহোদর ক্ষুধায় অতি-কাতর; সহধর্ম্মিণী স্ত্রীও—অন্নাভাবে জীর্ণশীর্ণ; তবু আমি এখনও নিশ্চিন্ত? ধিক আমার জীবনে! আমি মানুষ, না পশু?" পরক্ষণেই অশ্রু-গদ্গদ-স্বরে বলিলেন,—"ভাই, কেঁদ না—কেঁদ না! এই আমি এখনই খাবার নিয়ে আস্‌ছি! যেখানে পাই, একটু অপেক্ষা কর, এখনই এনে দিচ্ছি।" এই বলিতে বলিতেই, তিনি গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। অন্নভাবে অবসন্ন-দেহ; পরিধানে সেই মলিন জীর্ণ-বস্ত্র; তৈলাভাবে গাত্রে ধূলা উড়িতেছে;—এমনই অবস্থায়, তিনি গৃহ হইতে বিদায় লইলেন। মনে মনে আবারও বলিলেন,—"ধিক—আমায় শত ধিক! আমি আমার মা-ভাই-পরিবারকে যখন একমুঠা অন্ন দিতে অক্ষম, তখন আমার এজীবন থাকা আর না থাকা দুই-ই সমান। পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গ—তারাও আপনাদের আহার সংগ্রহ করিতে পারে, আর আমি—কি কাপুরুষ, আমি মানুষ হইয়াও, সপরিবারে অনাহারী! ধিক আমায়? আমি কি ভিক্ষে করে এনে ভাইকে খাওয়াতে পারি-নে; আমি কি খুটে-মজুরের কাজ করেও দিন-গুজরান্ করতে পারি-নে! আমি কি এতই হেয়—এতই ঘৃণ্য?" সঙ্গে সঙ্গে অমনি প্রতিজ্ঞা করিলেন,—"সংসারের একটী যদি আমি দূর কর্‌তে পা

পারি, তবে আর আমার এজীবন রাখিব না—কাজ কি এ অকর্ম্মণ্য জীবনে! যদি কখনও মা-ভাই-পরিবারকে সুখী করতে পারি, তবেই আবার গৃহে ফিরিব; নহিলে—নহিলে, এই আমার শেষ—আর এই আমার আদি! যদি আমি তাঁদের না খাওয়াইতে পারি, তবে আর নিজেও কখনও খাইব না—এজীবনও আর রাখিব না।"

প্রতিজ্ঞার পরই অমনি, অচল অটল স্থির-ভাবে, পাগলের মত বাটীর বাহির হইলেন। "কি উপায়ে মা-ভাই-পরিবারকে একমুঠা অন্ন দিব"—মনে সদাই এই চিন্তা। একপদ অগ্রসর হয়েন, আর কেবলই তাঁহার মনে সেই আত্মগ্লানি উপস্থিত হয়,—"হায়! আমার মা এতক্ষণ কেমন আছেন? হায়! আমার প্রাণের অখিল—ক্ষিদেয় যে সে ছটফট কচ্ছে! হা প্রেয়সী!"—এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে, চলিয়াছেন, আর কেবলই চেষ্টা করিতেছেন—'কিরূপে অন্নের সংস্থান করি!'

এমন সময়, ভাগ্যক্রমে, তাঁহার নয়ন-গোচর হইল—একটী বাবু চেঁচাইতেছেন,—"মুটে—মুটে! কুলি—কুলি!" বাবুটী যেন রেলওয়ে বা ষ্টিমার-ষ্টেসনে যাইবেন; তাঁহার সঙ্গের দ্রব্যাদি বহন করিবার জন্য একটী বাহকের প্রয়োজন; তাই তিনি ডাকিতেছেন। সে ডাক শুনিয়া, তাঁহার মনে একটু আশা হইল; মনে মনে ঈশ্বরকে ডাকিলেন,—"ভগবান্! এখনও আমার উপায় কর।" তৎপরেই, তাড়াতাড়ি অমনি, সেই বাবুর নিকটে উপস্থিত হইয়া, করযোড়ে তাঁহাকে নিবেদন করিলেন,—"বাবু, কোথায় যেতে হ'বে, বলুন: আমি আপনার মোট নিয়ে যাব।"

ভদ্রলোকের ছেলে, আকার-অবয়ব কথা-বার্ত্তা—সেসব তাঁহার তদনুযায়ীই আছে; কিন্তু এক পরিধান-পরিচ্ছদের মহিমায়, বাবুও তাঁহাকে আর ভদ্রলোকের ছেলে বলিয়া চিনিতে পারিলেন না। বেশ-ভূষার গুণে, সামান্য মুটে-মজুর মনে করিয়াই, তিনি বলিলেন,—"দেখ্, এই শ্রীপুরের ষ্টীমার-ঘাটে যেতে হ'বে; মোটমাট চার আনা পাবি! যদি ইচ্ছে হয়, তবে আয়; নয় তো দোসরা মুটে ডাকি।" হারচন্দ্রও আর দ্বিরুক্তিটি না করিয়া, বলিলেন,—"বাবু, আচ্ছা, তাই-ই দিবেন। আমি যেতে রাজি আছি।" বাবু বুঝিলেন,—"বিশেষ সুবিধাই হইল! আট আনা দশ আনার যায়-গায় চার আনাতেই কাজ সারা হ'ল।" সুতরাং মোটের বোঝাটি তাঁহার মাথায় দিয়া, বাবু অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিলেন।

একে দারুণ অনাহার, তায় চৈত্র-মাসের প্রখর রৌদ্র-তাপ! সে শরীরে, এ কষ্ট কি আর সহ্য হয়? কিছু পথ চলিতে চলিতেই, গুরু-ভারে তাঁহার দেহ অবসন্ন হইয়া আসিল—মস্তকে দারুণ বেদনার অনুভূতি হইতে লাগিল। আর যেন তিনি পারেন না—আর যেন পা অগ্রসর হয় না! তাঁহার কষ্ট ক্রমে এতই অসহ্য হইয়া আসিল—স্কন্ধ ভাঙ্গিয়া পড়িবার উপক্রম হইল। তিনি, অশ্রুপূর্ণ-লোচনে, আবার ভগবানকে ডাকিলেন,—"ভগবান! আমার মা-ভাই যে এখনও খেতে পায়-নি!—এর মধ্যে এখনই কেন আমার এত কষ্টানুভব হইতেছে?"

সে ক্রন্দন, কিয়ৎ পরিমাণে, এতক্ষণে যেন, সেই দয়াল ভগবানের কর্ণ-কোণে পৌঁছিল। একবার পশ্চাতের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়াই, বাবু দেখিলেন,—তাঁহার বাহকের গণ্ডস্থল অশ্রুজলে ভাসিয়া যাইতেছে। কৌতূহল-পরবশ হইয়া, তাই তিনি জিজ্ঞাসিলেন,—"কেন, কাঁদছ কেন বাপু?"

দারুণ কষ্টের সময় একটু কিছু সহানুভূতি পাইলেই, দুঃখোচ্ছ্বাস যেন আরও উছলিয়া উঠে—হৃদয় ফাটিয়া তাহা যেন বেগে বাহিতে থাকে। বাবুর নিকট এরূপে কিঞ্চিৎ সহানুভূতি-সূচক প্রশ্ন-বাক্য শুনিয়া, তাঁহারও শোকোচ্ছ্বাস আরও যেন উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তিনি একেবারে কাঁদিয়া ফেলিলেন। তখন তাঁহার মুখপানে চাহিয়া, বাবুর মনে যেন আপনা-আপনিই একটু দয়ার-সঞ্চার হইল। কি জানি কেন, ক্ষণকাল একদৃষ্টে সেই মুখপানে চাহিয়া, তিনি আবার জিজ্ঞাসিলেন,—"কাঁদছ কেন? কি হয়েছে তোমার—কাঁদছ কেন?"

হরিশ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। দারুণ মনোকষ্টে—কঠোর কায়িক শ্রমে ক্লিষ্ট হওয়ায়, তাঁহার মস্তকের মোট মাথা হইতে পড়িয়া যায়-যায়! "বাবু! বাবু!" বাবু অমনি তাহা ধরিয়া, নামাইয়া লইলেন। বাবুর মন তখন, সন্দেহ-দোলায় আরও দোলায়মান হইতে লাগিল। তিনি আবারও জিজ্ঞাসিলেন,—"বল, বল বাপু, তুমি কাঁদছো কেন?" সেই সঙ্গে সঙ্গে, আরও বলিলেন,—"বাপু, তোমার

চেহারা-টেহারা দেখে, তোমায় তো মুটের মত বোধ হয় না! তুমি কে?"

হরিশ এবার আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার মুখ দিয়া আপনা-আপনিই যেন বাহির হইয়া পড়িল,—"হায়! মা যে কাল একাদশীর উপবাস করে আছেন—এখনও যে তাঁর মুখে জলটুকু-পর্য্যন্ত দেওয়া হয়-নি! অখিল!—ভাই অখিল!—তুমি যে খিদেয় ছট্‌ফট্ করছিলে, দেখে এয়েছি! পত্নী—পত্নী!—এতক্ষণে তোমারই বা কি হ'লো, তাওতো বল্‌তে পারি-নে!" এই বলিতে বলিতেই, হরিশ যেন অজ্ঞান-অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। বাবুও, আবার মুখপানে তাকাইয়া, দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, তাঁহাকে সুস্থ করিবার জন্য, আপন পরিধেয় বস্ত্র দ্বারা তাঁহার মুখে ব্যজন করিতে লাগিলেন। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে, হরিশের অবস্থা-বৃত্তান্তও যেন আপনা-আপনিই তাঁহার মনে আসিয়া উদিত হইতে লাগিল।

ক্ষণপরে, কিঞ্চিৎ সংজ্ঞালাভ হইলে, তিনি, সান্ত্বনা-বাক্যে প্রবোধ দিয়া, হরিশের আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত ক্রমে অবগত হইলেন। শুনিলেন—পাগলের প্রলাপের মত হরিশ বলিতে লাগিল,—"আমার মা-ভাই-পরিবার অনাহারী! তাঁদের সে কষ্ট আর সইতে না পেরে, আমি বাড়ীর বা'র হয়েছি"। পশু-পক্ষীরাও আপনাপন আহার সংগ্রহ করিতে পারে; মানুষ হইয়াও আমি কি তা' পারবো না! আমি চাকরী করতে বেরিয়েছি; মা ভাইকে খাওয়াব বলে, মুটেগিরিতেও রাজি হ'য়েছি—"

এই কথায় বাবুর মনে কি যেন কি একটি ভাবনার উদয় হইল। কিন্তু তিনি, সে ভাব গোপন রাখিয়া, কান্না-কান্না-স্বরে সহানুভূতি দেখাইয়া, জিজ্ঞাসিলেন,—"তুই তবে আমার সঙ্গে থাক্‌বি, চল-না! তুই যদি যাস, আমি তোকে চাকরি দিতে পারি।"

হরিশ কাঁদিতে কাঁদিতে উত্তর করিল,—"আমি যেতে পারি—অবশ্যই; কিন্তু, আজকের উপায় তাঁদের কি হ'বে? আমি নিজে উপোস করে দশ দিন কাটাতে পারি; কিন্তু তাঁদের কষ্ট যে আর সহিতে পারি-নে!"

বাবু বাধা দিয়া বলিলেন,—"তোমার এখন কি চাই, তুমি বল।"

"আমি আর কিছু চাই-নে!—দয়া করে যদি আমার মোটের পয়সাটা আগাম দেন, তা' হলে, আমি তা' এখনই বাড়ীতে পাঠিয়ে দিয়ে, আজ-কের মতও কতকটা নিশ্চিন্ত হয়ে, আপনার সঙ্গে মোট নিয়ে যেতে পারি!"

বাবু বলিলেন,—"আচ্ছা, তা' আমি দিতে পারি! কিন্তু, কাকে দিয়ে তুমি তা' পাঠিয়ে দেবে?"

"কেন—ঘাটে যাবার সময় রাস্তার ধারেই শ্রীপুরের হাট—হাটে আমাদের গাঁয়ের অনেক লোকই এসে থাকে। তাদের কারুকে দিয়ে, চাল-টাল কিছু কিনে, একেবারে বাড়ীতে পাঠিয়ে দেবো। তা'হলে বড়ই সুবিধা হয়। নইলে, হাট থেকে ঘাট প্রায় আরও আদ কোশ পথ। সেখান থেকে ফিরে আসতে আস্‌তে বেলাও পড়ে যাবে—হাটও ভেঙ্গে যাবে! তাই বলি, যদি আমার মজুরিটা আগাম দেন।"

"শুধু আজকের মজুরি কেন, তুমি যদি বাস্তবিকই আমার সঙ্গে যেতে রাজি থাক, আমি এই তোমায় আগাম দু'টো টাকা দিচ্ছি—নেও; তোমার বাড়ীতে কি কিনে পাঠাতে হবে পাঠাও-গে।" বাবু, এই বলিয়া, তাঁহার হস্তে দুইটি টাকা প্রদান করিলেন।

হরিশের হৃদয়ে কথঞ্চিৎ উৎসাহ হইল। শরীরে যেন দ্বিগুণ বল-সঞ্চার হইয়া আসিল। উৎসাহে, আবার সেই মোট মস্তকে উত্তোলন করিয়া, গন্তব্য-স্থানাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। অদূরেই শ্রীপুরের হাট; সুতরাং অবিলম্বেই তাঁহার আশানুরূপ কার্য্য করিবার অবসর পাইলেন। কোন বিশ্বস্ত স্বগ্রামবাসী বন্ধুকে দিয়া, যাহা কিছু কিনিবার দরকার—কিনিয়া, সকলই বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন। বলিয়া দিলেন,—"দেখ ভাই, দেরী ক'রো-না! তাঁরা এখনও পর্য্যন্ত উপবাসী আছেন। জিজ্ঞাসা করলে, বলো,—'আমি চাকরি পেয়েছি—সেখানে গিয়ে আবারও তাঁদের খরচ-পত্র পাঠিয়ে দেব।' তাঁদের আর ভাব্‌তে মানা ক'রো ভাই!" বলা বাহুল্য, এইরূপে, সেই দুই টাকা হইতে, একটি পয়সার জিনিসও হরিশের নিজের মুখে যাইল না; যাহা কিছু কিনিয়াছিলেন, সকলই—অধিকন্তু যাহা কিছু নগদ রহিল, তাহাও,—বাড়ীতে পাঠাইয়া দিলেন।

বাবু, এই সময়, তাঁহার সেই মোটের নিকট বসিয়া ছিলেন। সুতরাং হরিশ কিছু খাইলেন কি না, তাহা তিনি চাক্ষুস দেখিতে পাইলেন না;

কিন্তু, জিজ্ঞাসা করায়, হরিশ উত্তর করিলেন, —"খেয়েছি বই কি?"

"আচ্ছা, ঘাটে গিয়ে আবারও কিছু খাওয়াব।"—এই বলিয়া, আবার মোটটি তাঁহার মস্তকে তুলিয়া দিয়া, বাবু অগ্রসর হইলেন। হরিশও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিলেন।

(২)

"উহু-হু!—আর যে সইতে পারি-নে! ভগবান, এখনও আমায় নেও।"

"ভগবান যেন বেটার চাকর-রে! বেটা, টাকা নিয়েছ—কাজ করবে—তার আর ভগবান ভগবান কি?"

এই বলিয়া, আবারও সজোরে বেত্রাঘাত!

"আর মের-না!—আর মের না!—আমি কাজ করছি—কাজ করছি!—আমায় আর মের না!"—এই বলিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে, সর্দ্দারের পদ-ধারণ! কিন্তু কি ভয়ানক লোম-হর্ষক কাণ্ড!—সেই পাষণ্ড সর্দ্দার, পা ছুড়িয়া দূরে ফেলিয়া দিয়া, সজোরে এক পদাঘাত করিল। তাহাতে তাহার মুখ দিয়া ঝলকে ঝলকে রক্ত পড়িতে লাগিল। নির্জ্জীব, নিষ্পন্দ ও অজ্ঞান হইয়া, সে ভূতলে পড়িয়া রহিল; সর্দ্দার, অন্য কুলিদিগের কর্ম্মের তদারকে চলিয়া গেল।

সর্দ্দারের পদাঘাতে কাতর হইয়া, যুবক, প্রায় সমস্ত দিনই সেই চা-বাগানের মধ্যে পড়িয়া আছে। আহার নাই, বিশ্রাম নাই; সে প্রখর রৌদ্রতাপে শরীর কালী হইয়া আসিয়াছে; মুখমণ্ডল বিবর্ণ ও হস্তপদ অবসন্ন হইয়া গিয়াছে।

দিনমণি অস্তপ্রায়; বিধি-নির্দ্দিষ্ট দৈনিক-কর্ম্ম সমাপনান্তে গৃহাভিমুখে অগ্রসর। হিরন্ময় পশ্চিম-গগণ-গৃহে, তাঁহার সান্ধ্য-কিরণচ্ছটা, ধীরে ধীরে, সেই স্থবর্ণ-বর্ণে মিশিয়া যাইতেছে। এদিকে, সন্ধ্যাসতী, লজ্জায় বস্ত্রাঞ্চলে মুখাবরণ করিয়া, যেন প্রেমালিঙ্গন-জন্য, ধীরে ধীরে তৎপশ্চাৎ ধাবমান হইতেছেন! কিন্তু হায়! —তাঁহার আশা মিটিল কই? ঐ দেখ, নভোমণি ফেলিয়া পালায়!

অর্থোপার্জ্জন-আশায় আসিয়া, বৃদ্ধা জননীর সেবার সঙ্কুলান করিতে যাইয়া, অন্নক্লিষ্ট পরিবারের অন্নকষ্ট দূর করিবার মানসে এমন দূর-দেশে আসিয়া, হায়, ঐ দেখ যুবকের কি দুর্দ্দশা! এত আশা—এত চেষ্টা, হায়, তাঁহাকে কোথায় ফেলিয়া পলাইল! একি! এর চেয়ে যে তাঁর সে অজ্ঞান অচৈতন্য-ভাব ছিল ভাল! সান্ধ্য-সমীরণ-স্পর্শে যেই তাঁহার জ্ঞান-সঞ্চার হইল, অমনি তিনি কাঁদিয়া উঠিলেন,—"হায়, আমি কি করিতে কি, করিলাম! আমার বৃদ্ধা জননীর এতদিন কি যে হ'ল—অন্নাভাবে হয় তো তাঁহাকে অকালেই কাল-গ্রাসে পড়িতে হইয়াছে! ভ্রাতা অখিল!—ভাই তুমি কেমন আছ—তুমি যে খিদেয় ছট্‌ফট্ করছ দেখে, আমি বাড়ী থেকে বার হ'য়ে এসেছি! পত্নী—পত্নী!—এ অভাগার হস্তে পড়িয়া, হায়, এতদিন তোমারই বা কি হ'ল! শেষে আমার অদৃষ্টে এই ছিল—আমি কুলি-আপিসে চালান হয়ে এসে, অসহায়ে প্রাণে মলাম! মা—মা!—তোমাকে ত এক বার দেখ্‌তে পেলাম না! ভাই—ভাই ত —তোমাকেও কি একবার দেখ্‌তে পাব-না! পত্নী!—সেই হ'তেই কি তোমার সঙ্গের সম্বন্ধ গিয়েছে!"

জ্ঞানোদয়ে হরিশচন্দ্র এইরূপ আক্ষেপ করিতেছেন, আর অশ্রু-জলে তাঁহার বক্ষস্থল ভাসিয়া যাইতেছে।

এই চা-বাগানের কর্ত্তা হ্যাভ্‌লক সাহেব, হাওয়া খাইতে, এই সময় বাগানে বহির্গত হইয়াছেন। কুলীরা, যে যার আপন-আপন কর্ম্ম সারিয়া, কুটীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। বাগান এখন নীরব—নিস্তব্ধ। এমন সময়, সাহেবের কর্ণে যেন কাহার ক্রন্দন-ধ্বনি প্রবেশ করিল। তিনি, বিস্মিত হইয়া, তৎপ্রতি দৃষ্টি-পাত করিতেই দেখিতে পাইলেন,—একটি যুবক, তাঁহার বাগানের এক-প্রান্তে পড়িয়া, ঐরূপ কাঁদিতেছে। দেখিয়া, কৌতূহল-পরবশ হইয়া, তিনিও সেইদিকে অগ্রসর হইলেন। হিন্দুস্থানী-ভাষায় জিজ্ঞাসিলেন, —"কে তুমি, কাঁদিতেছ?"

যুবক এতক্ষণ অন্যমনস্কে সাহেবকে দেখিতে পান নাই। সাহেবের কথা শুনিয়াই অমনি, সসম্ভ্রমে উঠিবার চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু, উঠিতে শরীরে বল পাইলেন না। আস্তে আস্তে, মৃদুস্বরে, ইংরাজী ভাষায় উত্তর করিলেন, —"আমি একজন আপনারই অধীনস্থ কুলী।"

সাহেব এবার ইংরাজীতে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কাঁদিতেছ কেন? তোমার মুখে রক্ত লাগিয়া কেন? শরীর অবসন্ন কেন?"

যুবক কাঁদিতে কাঁদিতে যথাযথ উত্তর দিলেন। আপনার দুঃখের অবস্থা—কি অবস্থায়, কি কষ্টে পড়িয়া তিনি সংসার ছাড়িয়া আসিয়াছেন,—একে একে সাহেবকে তাহার সকল কথাই শুনাইলেন।

সে উত্তরে, সে অবস্থা দেখিয়া, সাহেবও বুঝিলেন,—বাস্তবিকই ভদ্রলোকের ছেলে বিপাকে পড়িয়া এইরূপ বিপদগ্রস্ত হইয়াছে। সে ভাবনায়, তাঁহার হৃদয়েও দারুণ কষ্টের সঞ্চার হইল; সহানুভূতি দেখাইয়া, তিনি বলিলেন,—"ভয় কি! আমার কামরায় নিয়ে যাচ্ছি—চল। একষ্ট আর পেতে হ'বে না।"

(৩)

গ্রামের মধ্যে অখিল বাবর আজকাল বড়ই নাম-ডাক। বাড়ী-ঘরের শ্রী-ছাঁদ ফিরিয়াছে—ক্ষুদ্র পর্ণকুটীর এখন বৃহৎ অট্টালিকায় পরিণত হইয়াছে; দাস-দাসী, লোক-জন, মান-সম্ভ্রম —সকল বিষয়েই গ্রামের মধ্যে অখিল বাবু এখন বড় হইয়াছেন। এখন তাঁহাদের সে সব কষ্ট ঘুচিয়া গিয়াছে—অন্নাভাবে এখন আর তাঁহারা ক্লিষ্ট নহেন! দিনের পরিবর্ত্তনে, তাঁহাদের সংসারে এমনই সুন্দর পরিবর্ত্তন আনয়ন করিয়াছে!

আজ দশ বৎসর হরিশচন্দ্র চাকরী করিতে গিয়াছেন। এখন তিনি রাশি রাশি টাকা বাড়ীতে পাঠাইতেছেন। অখিলচন্দ্র তাহাতে ঘর-বাড়ীর শ্রী-ছাঁদ ফিরাইতেছেন; জমিজিরাৎ খরিদ করিতেছেন। দাস-দাসী রাখিয়া মনের সাধে বাবুগিরি করিয়া লইতেছেন। এখন তাঁহার বিবাহ হইয়াছে; নিজ-স্ত্রীকে গহনা-পত্র দিয়াছেন, আপনার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃ-জায়াকেও অলঙ্কারে সুশোভিত করিয়া রাখিয়াছেন—মধ্যে মধ্যে ভয়ে-ভয়ে টাকা-কড়ি দিয়াও তাঁহাকে তুষ্ট রাখেন। বৃদ্ধা জননীরও এখন আর সে কষ্ট নাই: তবে কেবল এক-একবার হরিশকে দেখিবার জন্য তিনি বড়ই ব্যস্ত হন—মাঝে মাঝে তাই, তাঁহাকে আসিবার জন্য, অখিলকে পত্র দিতে বলেন। অখিলও সময়ে সময়ে দাদার নিকট টাকা চাহিয়া পাঠান, জমীদারী কেনার সুসংবাদ-প্রেরণ করেন; মধ্যে মধ্যে বা আপ্যায়িত করিয়া বাটী আসিতেও লেখেন। এক কথায়, বিদেশে চাকরী করিতে গিয়া, হরিশচন্দ্র অবচ্ছল টাকা পাঠাইতেছেন; আর তাহাতেই তাঁহাদের এই অভাবনীয় উন্নতি।

(৪)

দশ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। এখন আর চা-বাগানে সে সাহেব নাই। হরিশচন্দ্রকে একরূপ বড়-মানুষ করিয়া দিয়াই, তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন; তাঁহার পরিবর্ত্তে এখন একজন নূতন সাহেব সেই চা-বাগানে কর্ত্তা হইয়া আসিয়াছেন। অনেক দিন হইতেই হরিশ বাবুও বাড়ী যাইবেন, মনে করিতেছেন; কিন্তু, কার্য্যের ঝঞ্ঝাটে পড়িয়া, এতদিন আর তাঁহার বাড়ী যাওয়া ঘটিয়া উঠে নাই। অবশেষে, আজ দুই দিন হইল বাড়ী হইতে মার মৃত্যু সংবাদের এক পত্র পাইয়া, স্থির করিয়াছেন,—এইবার নিশ্চয়ই বাড়ী যাইবেন। তাই নূতন সাহেবের নিকট দরখাস্ত করা হইয়াছে; যাইবার সাজ-সরঞ্জামও প্রস্তুত হইতেছে। একবার সাহেবকে হিসাব-নিকাশটা বুঝিয়া দিতে পারিলেই, তিনি বাড়ী যান!

কিন্তু, অকস্মাৎ এক হিতে বিপরীত! বিদ্যুতের চমকে, কে জানিত, বজ্রাঙ্কুশ নিহিত আছে? কে ভাবিয়াছিল, পূর্ণিমার সুমোহন পূর্ণচন্দ্রে এত শীঘ্র রাহুগ্রাস ধরিবে? হায়! ক্ষণপ্রভার ক্ষণপ্রভার ন্যায় দেখা দিয়াই কে এ বিশ্ব আঁধারে ঢাকিল? ঐ দেখ, পাষণ্ডেরা, দুরন্ত সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া কি এক নিদারুণ ষড়যন্ত্র-জাল বিস্তার করিয়াছে! ঐ দেখ, হরিশচন্দ্র বন্দী!—ঐ দেখ, হরিশচন্দ্র আবার সেই পথের ভিখারী! কি একটা তহবিল-গড়মিলের অছিলা তুলিয়া, দুরন্তেরা তাঁহার সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়াছে, তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে, আরও হাজার টাকা না পাইলে তাঁহাকে জেলে পচাইবে—এমনই তাহাদের ষড়যন্ত্র!

হরিশচন্দ্র আর কি করেন? কিছুতেই সে ষড়যন্ত্র হইতে নিষ্কৃতি না পাওয়ায়, অগত্যা বলিলেন,—"আমায় তবে দেশে নিয়ে চলুন, আমি সেখানে গিয়ে, আপনাদের বাকী হাজার টাকাও প্রদান করিব।"

(৫)

ঐ দেখ!—অখিল বাবুর দ্বারদেশে হস্ত-পদ-শৃঙ্খলাবদ্ধ হরিশচন্দ্র, পুলিস-প্রহরী-পরিবেষ্টিত হইয়া, দণ্ডায়মান! দ্বারে দ্বারবান বসিয়া—তাহারা তাঁহাকে চিনে না, সুতরাং বাড়ীর ভিতর কিছুতেই প্রবেশ করিতে দিল না; অনাস্থা করিয়া, তাহারা, সম্বাদটা পর্য্যন্ত বাবুর

নিকট প্রদান করা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিল না। কিন্তু, ক্রমে সে গোলযোগে, আপনা-আপনিই অখিল বাবুর আসন টলিল; তিনি একবার বহির্ব্বাটির উপরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া, দ্বারবানকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দরোয়ান! গোলমাল কাহে!"

কিন্তু, দরোয়ান উত্তর দিবার অগ্রেই, হরিশ্চন্দ্র, অখিলকে দেখিয়া মনে যেন কিঞ্চিৎ বল-সঞ্চার হওয়ায়, উত্তর করিলেন—"ভাই অখিল, অদৃষ্ট-দোষে আবার আমি বড়ই বিপদে পড়েছি। তোমাকে তো আগেই লিখেছি, আমি যে সামান্য হাজার টাকার জন্য আজ এরূপ অপমানিত হচ্ছি! দেওতো ভাই, হাজার টাকা এনে—এদের আগে চুকিয়ে দিই; তার-পর, তোমায় সব বল্‌ছি!"

কিন্তু, কি অলৌকিক পরিবর্ত্তন, বারান্দা হইতে অখিল বাবু তাচ্ছিল্য-স্বরে উত্তর করিলেন,—"কে তুমি? পাগল নাকি!"

একথা হরিশ্চন্দ্রের হৃদয়ে শেলসম বিদ্ধ হইল। তিনি, দুঃখে—ক্রোধে, বলিলেন,—"কি ভাই, আমায় চিন্‌তে পার্‌ছো-না! আমি যে তোমার দাদা- হরিশ!"

অখিলের মুখ হইতে ব্যঙ্গস্বরে আবার বহির্গত হইল,—"দূর!—দূর! আরে, আমার দাদা-রে!" এই বলিয়াই, দরোয়ানকে ডাকিয়া বলিলেন, —"দরোয়ান, দরোয়ান, ঐ পাগলাকো হিঁয়াসে নিকাল দেও!" সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ-প্রহরীদিগকে বলিলেন,—"ও চেট্টা আদ্‌মি, হামারা ভাই নেহি হ্যায়; ওস্কো গারদ-মে পুরো, যা'কে!"

অখিলের এই নিদারুণ বাক্য-বাণে হরিশ্চন্দ্র কাঁদিয়া ফেলিলেন; বলিলেন,—"ভাই অখিল! এই কি তোমার কাজ? তোমায় যে প্রাণাধিক স্নেহ করি, এই কি তাহার প্রতিফল! ভাই—ভাই!—আমায় রক্ষা কর—আমায় বাঁচাও! আমি তোমার বিষয়ের ভাগ চাই-নে—আমি সবই তোমার নামে লিখে দিয়ে যাচ্ছি—তুমি আমাকে এ যাত্রা বাঁচাও। ভাই, আমি বাড়ী-থেকে কিছু নিয়েও যাই-নি, সঙ্গে ক'রে কিছু নিয়ে আস্‌তেও পারি নি—কিছু চাইও না। তুমি কেবল দয়া ক'রে এবার আমায় বাঁচাও—"

কিন্তু, অখিলের কর্ণে সে সব গোলমাল যেন অসহ্য হইল; তিনি, আরও রুক্ষ-স্বরে, দরোয়ানদিগকে কহিলেন,—"দরোয়ান!—দরোয়ান! তোম-লোক বাত্ শুন্‌তা নেই!"

আর যায় কোথায়? সকলেই অমনি হরিশ্চন্দ্রকে তথা হইতে তাড়াইয়া দিবার উদ্যোগ করিল; পুলিস-প্রহরীরাও, "চল, বেটা চল!" বলিয়া, রুলের গুঁতা দিতে দিতে তাঁহাকে লইয়া চলিল।—উপর হইতে অখিল বাবু তাহাদিগকে কিঞ্চিৎ পুরস্কার ফেলিয়া দিলেন।

* * *

অখিল!—অখিল! এই কি তোমার ধর্ম্ম! তোমার খিদে পেয়েছে শুনে, অস্থির হ'য়ে, যে ভাই তোমার জন্য এত কষ্ট সহ্য করিল তাহার প্রতি তোমার এই ব্যবহার! যার অত কষ্টের উপার্জ্জিত অর্থে তুমি আজ এই অট্টালিকার অধীশ্বর, সেই ভাইকে এখন দরোয়ান দিয়া দূর করিয়া দেও। তোমার জন্য যে মুটেগিরি ক'রেছে—মাথায় মোট ব'য়েছে, চা-বাগানে কুলীর কাজ করেছে—শেষে তার সর্ব্বস্ব তোমার করে সমর্পণ করেছে, সেই ভাইয়ের প্রতি তোমার আজ এই ব্যবহার!—তাহারই নিজের উপার্জ্জিত এত অর্থ থাকিতে, আজ এই সামান্য বিপদ হইতে তাহাকে উদ্ধার করিলে না! ধিক!—শত ধিক তোমার জীবনে! জানি না, এ পাপে কোন্ নরকে তোমার স্থান হ'বে?—জানি না, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কোথায়? এখনও প্রতিদিন যথাসময়ে সূর্য্যদেব উদিত হ'য়েন, এখনও দিনের পর রাত্রি হইতেছে, এখনও ঈশ্বরের পুরাতন নিয়ম বর্ত্তমান রহিয়াছে; সুতরাং এত অত্যাচারেও তুমি এখনও যে জীবিত রহিয়াছ, এই আশ্চর্য্য! তুমি, চিনেও, আপনার সহোদর ভাইকে চিন্‌তে পারলে না; তাঁহার বিপদের আনুপূর্ব্বিক অবস্থা পত্রযোগে জানিয়াও, তাঁহাকে পাগল বলিয়া উড়াইয়া দিলে! ও! বুঝিয়াছি, এখন চিনতে পারলে, পাছে তিনি তোমার একজন অংশীদার হন, তাই তুমি এই অভিসন্ধি খাটাইলে! কিন্তু, অখিল!—তুমি জানিও, তোমার ঐ অভাগা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এক বিন্দু অশ্রুজলে, তোমার এমন অট্টালিকা—এমন ঐশ্বর্য্য নিমেষ-মধ্যে কোথায় ভাসিয়া যাইবে! সঙ্গে সঙ্গে তুমিও কোন্ নরকে পচিতে থাকিবে! অখিল!—তুমি জানিও, পাপের রাজ্য চিরদিন কখনও প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে না—আর বেশী দিন চলিবে না।

অনুসন্ধান

অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র।

৫ম খণ্ড } ১৫ই আষাঢ়, ১২৯৯। { ২২শ সংখ্যা।

মতি রহু তুয়া পরসঙ্গে।

"তাতল সৈকতে, বারিবিন্দু সম
সুত-মিত-রমণী-সমাজে।
তোহে বিসরি মন, তাহে সমর্পিনু,
অব মঝু হোয়ব কোন কাজে॥১

মাধব! মঝু পরিণাম নিরাশা!
তুহু জগতারণ, দীনে দয়াময়,
অতয়ে তোহারি বিশোয়াসা॥২

আধ জনম হাম, নিঁদে গোঙায়নু,
শিশু জরা কত দিন গেলা।
মাঝহি সংসার রস রঙ্গে ভৈগেনু,
তোহে ভজব কোন বেলা॥৩

কত চতুরানন, মরি মরি যাওত,
ন-তুয়া—আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন, তোহে সমাওত,
সাগর-লহর সমানা॥৪

ভনয়ে বিদ্যাপতি, শেষ শমন-ভয়ে,
তুয়া বিনু গতি নাহি আরা।
আদি অনাদিক, নাথ কৃপায়সি,
ভবতারণ-ভার তোহারা॥৫

কিয়ে মানুষ, পশু, দেব বা কিন্নর,
অথবা কীট, পতঙ্গ।
করম বিপাকে, গতাগতি পুনঃপুনঃ
মতি রহু তুয়া পরসঙ্গ॥"৬

১। হে পতিতপাবন! আমি ভ্রমমুগ্ধ মৃগগণের মরীচিকায় তৃষ্ণানাশের আশার মত, তোমায় বিস্মৃত হইয়া এই পুত্র-মিত্র-কলত্র-জড়িত সংসারে আসিয়া আত্মহারা হইয়াছি। এখন, আমার আর উদ্ধারের উপায় কি, প্রভু!

২। হে পরমেশ! এখন আমার আর উদ্ধারের কোনই আশা নাই; কেবল এই আশা, —'তুহু জগতারণ, দীনে দয়াময়'—অর্থাৎ তুমিই একমাত্র জগৎত্রাতা দীনতারণ; অতএব, হে দয়াময়! তোমারই স্মরণ লইলাম—তোমাতেই বিশ্বাস করি!

৩। হে প্রভু! আমার জীবনের অর্দ্ধভাগ আমি নিদ্রায় হারাইয়াছি; শিশু-জরাতেও আমার কতদিনই গিয়াছে; মধ্যের কথঞ্চিৎ মাত্র সময়—তাহাও সংসার-রঙ্গে অতিবাহিত করিলাম; আর অবসর কই, কখন ভজনা করিব?

৪। হে পরমেশ! কত জন্মজন্মান্তর ধরিয়া আরাধনা করিয়াও, স্বয়ং বিধাতাও তোমার আদি-অন্ত নির্ণয় করিতে পারেন নাই; সমুদ্র-তরঙ্গে লহর-মালার ন্যায় সমগ্র প্রাণী-সংসার তোমা হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়া আবার তোমাতেই লয় প্রাপ্ত হইতেছে; তথাপি তোমার আদি-অন্ত নির্ণয় হইতেছে না।

৫। হে দয়াময়! অন্তিম-কালে তুমি ভিন্ন জীবের আর কোনই গতি নাই; তুমিই আদি, তুমিই অন্ত; দয়াময়, কৃপা করিয়া, তুমিই আমার মুক্তির ভার গ্রহণ কর।

৬। হে প্রভু! কর্ম্মবশে পড়িয়া, মনুষ্য-জন্মই হউক বা পশু-জন্মই হউক, দেবতা হই বা কিন্নর হই, কীট হই বা পতঙ্গ হই, এই একমাত্র প্রার্থনা—'মতি রহু তুয়া, পরসঙ্গ'—যেন সকল অবস্থাতেই তোমার পবিত্র প্রসঙ্গে মতি থাকে।

বাল্মীকি ও হোমার।

(রামায়ণ ও ইলিয়াড)

(৩)

ইলিয়াড-সম্বন্ধে আর একটী কথা প্রয়োজন। রামায়ণ আর ইলিয়াডে আর একটী প্রভেদ স্থূল চক্ষুতেও দৃষ্ট হইবে। ইলিয়াডে প্রকৃতি-বর্ণনা নাই। ইলিয়াড কাব্য,—যুদ্ধ-ধুমাচ্ছন্ন, যুদ্ধের উন্মত্ত কোলাহল, শোণিত-তৃষ্ণা, হত্যা, ষড়যন্ত্র, হুহুঙ্কার, মৃত্যুর চিৎকার, প্রতিভান্বিত কবি অসীম শক্তিতে রচনা করিয়াছেন। ইলিয়াড রামায়ণের মত প্রস্ফুট কুসুম-মাল্য নহে; ইলিয়াড,—নরমুণ্ড-মাল্য। ইলিয়াডে,—অসী আছে, বাঁশী নাই; রক্ত আছে, চন্দন নাই; ভাবের ভয়ঙ্করত্ব ও পৈশাচিকত্ব আছে, কিন্তু ভাবের পবিত্রতা-শুভ্র কুসুমগুচ্ছ নাই। য়ুরোপের যে পৈশাচিক তেজ, তাহা ইলিয়াডে প্রাক্‌ধ্বনিত। যুদ্ধের বর্ণনা,—প্রকৃতি-বর্ণনার অবসর দেয় নাই। প্রাতঃকাল হইতে সায়াহ্ণ পর্য্যন্ত, যুদ্ধ-ক্ষেত্রের ভীষণ কার্য্য। কখনও প্রাতঃকালের মধুর-চ্ছটায় দিগ্দেশ আনন্দিত হইল, কি রজনী নিঃশব্দ-পাদচারে আগত হইলেন, এইরূপ এক-আধটু প্রকৃতির প্রতি কটাক্ষ-মাত্র আছে। কিন্তু রামায়ণ যেরূপ কর্ম্মে মহান, কর্ম্মে ভয়ঙ্কর, কর্ম্মে সুন্দর, তেমনি তাহার পত্রে-পত্রে প্রকৃতির মোহন সুন্দর চিত্রপট অক্ষয় উজ্জ্বল রেখায় অঙ্কিত। কোথাও সরিৎ, সাগর; কোথাও উজ্জ্বল-নক্ষত্রময়ী আকাশ: কোথাও গহ্বর পূর্ণ, হিমানিপূর্ণ বসুধার ভিত্তি এক শৈল-চিত্রকূট; কোথাও রুধির-প্রবাহ-তুল্য গৈরিক নিশ্রবণ-বাহী স্রোতরাশি। ঐ নগোপকণ্ঠে পৃথিবীর কণ্ঠ-গত মুক্তা-মালার ন্যায় আবর্ত্ত-শোভী মন্দাকিনী, নদী—গুহা সমীরণ-গন্ধে আমোদিতা, তদ্গর্ভে পুষ্প-সঞ্চয় বায়ু দ্বারা ধাবিত। রামায়ণ এই সব শোভায় শোভাময়। কখনও বাল্মীকির বীণা-তন্ত্রী সুমধুর ভৈরব-রবে সমুদ্র-বর্ণনা করিতে যাইয়া ফেণময় হাস্যপূর্ণ সরিৎ-পতির জীবন্ত প্রতিকৃতি তুলিতেছেন; আশ্চর্য্য হইয়া, নক্ষত্ররত্ন-পূর্ণ আকাশকে রত্নাকরের সঙ্গে তুলনা দিয়া বলিতেছেন,—আকাশের উপমা সমুদ্র, আর সমুদ্রের উপমা আকাশ উভয়দের অন্য উপমা নাই! উভয়েরই দিগন্ত-বিশ্রুত স্বর, উভয়েই সুদূর বায়ুতে বিলীন আকাশে মেঘের বেণী, সমুদ্রের আবর্ত্তময়ী ঊর্ম্মিরাশি বেণীকৃত; নভশ্চর পক্ষী, সমুদ্রচর পক্ষী, অসীম-প্রসারে, অনন্তক্ষেত্রে উভয়েরই তুল্য আনন্দ। রামায়ণে এরূপ শোভা অসংখ্য আর ইলিয়াডে ইহার একটীও নাই। ইলিয়াড খুঁজিয়া একটীমাত্র পুষ্পের নাম পাইলাম, একটী অধ্যায়ে, জোভ আর জুনোর মিলন-উপলক্ষে, হাইকান্থ-পুষ্পের নাম ভিন্ন, বোধ হয় অন্য কোন পুষ্পের নাম ইলিয়াডে নাই। কিন্তু ধরিত্রীর যত পুষ্প বাল্মীকি সবটী সঞ্চয় করিয়াছেন; ঝড়-অবসানে, গিরি-সানুদেশে যেরূপ ক্রম-নিক্ষিপ্ত নানা পুষ্পরাশি ছড়াইয়া থাকে, রামায়ণ-রূপ মহাগিরির সানু-দেশে অসংখ্য পুষ্পরাশি, তদ্রূপই সঞ্চিত। কেতুকি, সিন্ধুবার, মনোরম বাসন্তি পুষ্প, নাগেশ্বর চম্পক, উদ্দালক, গন্ধপূর্ণা মাধবী, নীলাশোক, দ্রোণ-পুষ্প, কুন্দ, রঞ্জক, বকুল—কত নাম করিব? তিলচূত, পাটলিক, কোবিদার, মুচলিঙ্গা, অর্জ্জুন, সিংশপ, কুটজ কুসুম, অঙ্কোলা, হিণ্ডাল, চূর্ণক, নীপক—এইরূপ অসংখ্য পুষ্পের নাম। সৌগন্ধিক পদ্ম পুষ্প, ফুল্ল ভ্রমর-গুঞ্জিত কুমুদ উৎপলের ত কথাই নাই!

রামায়ণ পড়িয়া ঋষি-জীবন পাই; ঋষি যে কুঙ্কুম-চন্দন ত্যাগ করিয়া, অজিনাসনে বসিতেন কেন, তাহা বুঝিতে পারি; বুঝিতে পারি ঋষি নিজে হিন্দুস্থানে শ্রেষ্ঠ—তাঁহার কুশাসন করঙ্গ সম্বল—কিন্তু তিনি রাজ-রাজেশ্বর হইতেও শোভান্বিত। ঐ যে পদ্ম-কুসুম প্রস্ফুটিত, উহার অঙ্গে যত অলঙ্কার, রাজারে সুবর্ণালঙ্কৃত পরিচ্ছদে তাহা নাই। যিনি বিষ্ণু-তেজ প্রাপ্ত, ভগবৎ-প্রেমিক, তাঁহারই এই ব্রহ্মাণ্ড। তিনি নিজেও ইহা উপভোগ করেন; আমরাও উপভোগ করি। তাই ঋষির পবিত্রতায়, ঋষি-জীবনের সুগন্ধিতে, রামায়ণের পাঠক, প্রতিপত্রে মুগ্ধ। রাম বনে গিয়াছিলেন বলিয়া রাম কি অসুখী? সিংহাসনারূঢ় রাজ-রাজেশ্বর হইতেও জটাবল্কলধারী রামচন্দ্র সুখী! "There is nothing good or bad, but thinking makes it so."—সেক্ষপীয়র লিখিয়াছেন। ধর্ম্ম যাঁহার লক্ষ্য, তাঁহাকে কি অবস্থায় পীড়ন করিতে পারে? ধর্ম্ম অক্ষয় কবচ—যাঁহার বাহুতে সেই কবচ শোভা করে, তাঁহার শরীরে ব্রহ্মাস্ত্রও প্রবেশ করিতে পারে না। ভরত, বনে যাইয়া, রামচন্দ্রকে যেরূপ দেখিলেন, তাহাতে তাঁহাকে বিস্মিত হইতে হইল! বনবাসী রাম কি দুঃখী? সত্য-রক্ষা-হেতু তাঁহার তেজ দ্বিগুণিত;—কৃষ্ণাজিনধর, চির-বল্কল-বাস, কিন্তু তিনি পাবকের ন্যায় উজ্জ্বল, সিংহস্কন্ধ, মহাবাহু, পুণ্ডরীকের তুল্য রামের চক্ষু। তিনি সাগরান্ত পৃথিবীর ভর্ত্তা—ধর্ম্মাচারী সত্যব্রত রাম যেন শাশ্বত ব্রহ্মার ন্যায় উপবিষ্ট! সত্য যে রক্ষা করে, তাহার সৌন্দর্য্য এইরূপ! এই সংসার অস্থায়ী, সুখের ঘরের তুমি চির-বাসী নহ; যাহাকে বাড়ী বল, তাহা বাসা; যে গৃহে দারা-পুত্র-পরিবার লইয়া বাস কর, ফকির তাহাকে 'হোটেলখানা' বলিয়াছেন—তাহা 'গহেনার নৌকা'। কিন্তু একবার সত্য-ব্রত জিতেন্দ্রিয় হও, দেখিবে—এই ক্ষণস্থায়ী ধামেও কত সুখ আছে, কত শোভা আছে; দেখিবে—কোকিলের কুহুতে মিষ্টত্ব আছে, পদ্মের শত নবীন পত্রে কত শোভা-রাশি আছে, আকাশের প্রতি জ্যোতি-বিন্দুতে কত আনন্দ আছে। নতুবা, বৃথা সুখ-অন্বেষণ করিতে গেলে,—পদ্ম বিপন্ন হইয়া যাইবে, রামধনুর রং বৃথা, আশা লীন হইবে, 'তুমি কেপুষ্প আহরণ করিতে চাহিলে, পুষ্প বিপুষ্প হইয়া যাইবে।

রামচন্দ্র কি অসুখী?—সীতাকে, জলাভিঘাতে অট্টহাসিনী, নির্ম্মলোৎপলসঙ্কুলা, হংস-সারস-সংসৃষ্টা, গঙ্গা-নদী দেখাইতেছেন,—রাম কি অসুখী? মৃগয়া-নিবৃত্ত রাম তরঙ্গবাতে বিনিতক্লেদ হইয়া সীতার উৎসঙ্গে নিদ্রার উপক্রম করিতেছেন, গদ্গদনাদী গোদাবরীর অমৃত-ঝঙ্কার বেতস-কুঞ্জ-শায়ী রামচন্দ্রের শ্রুতি স্পর্শ করিতেছে; তখন কে বলিবে—রাম অসুখী? দম্পতি, পুষ্প-স্তবক-নম্র রক্তবর্ণ অশোক-তরু দেখিতেছেন, গুহা-পুষ্প-গন্ধবাহী সমীরণ রাম-সীতার শ্রম অপনয়ন করিতেছে,—রাম-সীতা কি অসুখী? সিংহাসনোপবিষ্ট হইলে কি সুখের চিত্রপট বেশী উজ্জ্বল হইত?

রামায়ণের এই শত শোভার একটীও ইলিয়াডে নাই। ইলিয়াডে কেবল ভয়ঙ্কর রসের উদ্রেক আছে; যেখানে যুদ্ধোন্মুখী বীর প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রুকে আক্রমণ করিল, সেইখানেই হোমারের একটী উপমা আছে। আর, সেরূপ উপমাই ইলিয়াডে শত শত। কোথাও দুই ভীষণ গণ্ডারের বনস্পতি-দলনকারী ঘোর দ্বন্দ্ব, কোথাও ব্যাঘ্র-মহিষের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, কোথাও বণ্য-বরাহ-শৃঙ্গে উৎখাত হইয়া গিরি-শিলা বিচূর্ণ হইতেছে,—এই উপমা। কোথাও মত্ত সিংহ মত্ত বারণকে ধরিয়াছে; মত্ত ব্যাঘ্র, মেষ-শাবকের হাড় ভাঙ্গিতেছে। এই উপমা যুদ্ধ-ক্ষেত্রের উপযোগী—ভয়াবহ। ইলিয়াড সমাপন করিয়া পাঠক দেখিবেন, যেন দারুণ পশু-যুদ্ধে বন কম্পিত হইল, একিলিস-পশু হেক্টারকে বধ করিল, সিংহ-বিক্রম কিন্তু নির্ম্মম বীরগণ, হৃদয় লৌহের কপাটে বদ্ধ করিয়া, পাষাণে দর্প দলন করিয়া, এক লজ্জাকর প্রসঙ্গে যুদ্ধ করিল! দেখুন দেখি, কোথায় রামায়ণের সেই ধারাহত পল্লবের গন্ধ—অর্দ্ধোদ্গম কদম্ব-পুষ্পে রোমোচ্ছ্বাস—জলদাগম-ফুল্ল ময়ূরের কেকাধ্বনি! রামায়ণেও

বীররস আছে;—যুদ্ধে বীরত্ব, কর্ম্মে বীরত্ব, ধর্ম্মে বীরত্ব, সত্বগুণে বীরত্ব, রামায়ণের মত কি ইলিয়াডে আছে? কিন্তু রামায়ণের প্রকৃত শোভা ইলিয়াডে কোথায়? রাজপুত্র পথের কাঙ্গাল—কর্ত্তব্যানুরোধে কোথায়? জটাজুট আর সুবর্ণমুকুটে তুল্যজ্ঞান, ইলিয়াডে কোথায়? ভ্রাতার বনবাস-ক্লিষ্ট পাদুকার উপরে ছত্রধর কনিষ্ঠ ভ্রাতার চির-হিরন্ময় দৃশ্য ইলিয়াডে কোথায়? অগ্নিতে যে সতীত্ব কষিত, সেইরূপ সতীত্ব ইলিয়াডে কোথায়? ভ্রাতার প্রাণাপেক্ষা প্রজানুরাগ, লক্ষ্মণবর্জ্জন, সীতা-নির্ব্বাসন তুল্য কর্ত্তব্য-অনুষ্ঠান কি তন্ন তন্ন করিয়া ইলিয়াডে পাইবে?

স্বদেশীয় শিবির মত্ত বারণ দ্বারা নপদ্ম বাপী-নীরের ন্যায় সম্পীড়িত, অথচ বীরশ্রেষ্ঠ একিলিস একজন বেশ্যার বিরহে অভিমানী হইয়া পাষাণ-বৎ কঠিন—স্বদেশের বিপদ দেখিয়াও সুখ-পালঙ্কে নিদ্রিত!

পেট্রোক্লাসের স্নেহ, একিলিসের চরিত্রে, একমাত্র উজ্জ্বলাংশ; কিন্তু যে স্থলে স্নেহ স্বর্গীয়, সে স্থলে স্নেহ ধর্ম্ম—স্নেহ মনের সুপ্রবৃত্তিরাশী জাগরণ করে। কিন্তু পেট্রোক্লাসের মৃত্যুতে একিলিস কি নির্ম্মম পাষাণ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, একিলিসের পাঠক, তাহা জানেন! হেক্টারের মৃতদেহ রথচক্রে নিবদ্ধ করিয়া একিলিস যুদ্ধ-ক্ষেত্রে বিহার করিতেছেন; প্রায়াম, হিকুবা সেই দৃশ্য দেখিয়া মূর্চ্ছিত। বৃদ্ধ প্রায়াম প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া হেক্টারের মৃতদেহ ভিক্ষা করিতে একিলিসের শিবিরে যাইয়া তাঁহার পদে ধরিয়া প্রার্থনা করিলেন; একিলিসও দৈবাদেশে বাধ্য হইয়া হেক্টারের মৃতদেহ দান করিলেন। কিন্তু প্রায়ামের প্রতি তাঁহার যে উক্তি, তাহা কখনই বীর-পুরুষের উচিত নহে। হেক্টারের পিতা ভুবনেশ্বর প্রায়াম তাঁহার পদানত; কিন্তু গ্রীক-আইনে পদানত শত্রুকে পদদলিত করিতে লিখে।

রামায়ণে লঙ্কা-কাণ্ডের পূর্ব্বে মদের উল্লেখ নাই। লঙ্কা অসুর-পুরী, অসুরগণ সুরা-সেবী, যুদ্ধ-কাণ্ডে তাই শর্করাসব, মধু, আব্ধিকা, ফুলাসব, পুষ্পাসব প্রভৃতি অনেক মদের উল্লেখ আছে। কিন্তু ইলিয়াডে, ইলিয়াস—যিনি জ্ঞান-বীর, তাঁহাকেও প্রায় অবস্থাতেই মদ খাইতে দেখা গিয়াছে—অন্য বীরবৃন্দের ত কথাই নাই! তবে হোমারের একটী চরিত্রে স্বর্গীয় মাধুর্য্যের কিঞ্চিৎ আভা আছে, সে চরিত্র—হেক্টার। আর, তাঁহার স্ত্রী এণ্ড্রামেকীর চরিত্রেও স্বর্গীয় ভাবের কিঞ্চিৎ চিহ্ন আছে। হেক্টার যখন গল-লগ্ন পারিজাত-হারতুল্য সেই সুন্দরীকে পরিহার করিয়া যুদ্ধে যান—ইলিয়াড মরুভূমে সব ধূ-ধূ—অগ্নিময়—কেবল সেই স্থানটুকু ওয়েসিস—হিন্দুর পবিত্র ভাবের একটু ছায়া সেই পত্রে পড়িয়াছে। এণ্ড্রামেকী কাঁদিয়া বলিতেছে, "প্রভো, আমার পিতা, মাতা, ভাই, সব মৃত; কিন্তু তোমাতে পিতা-মাতা-ভাই-বন্ধু সবই ফিরিয়া পাইয়াছি। তোমা-বিহনে তাঁহারা আমার নিকট পুনঃ-মৃত হইবেন।" হেক্টার, যুদ্ধ-যাত্রাকালে, পুত্রকে যে আশীষ করিয়াছিলেন, তাহা হিন্দুর মত—"হে, গন্ধর্ব্ব, দেব, রক্ষ, প্রাণ-প্রতিম এই শিশুকে রক্ষা ক'র। হে তপন, তোমার নবীনোজ্জ্বল প্রাতঃকরে যেরূপ পুষ্প-তরু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, এই শিশু যেন তেমনি বৰ্দ্ধিত হয়। আমি দৈবাদেশে দেশার্থ প্রাণ দিতে চলিলাম; কিন্তু এই ভবিষ্যতের হেক্টারকে রাখিয়া যাইতেছি। পুত্র, তুমি বীর-বংশের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে সক্ষম হইও; যশ-মাল্য-কণ্ঠে অক্ষতদেহে ফিরিয়া আসিয়া আমা হইতে অধিক কীর্ত্তিশালী হইও।"

পরিবারিক দৃশ্য, যাহা সাহিত্যে চিরস্থায়ী, যে অংশ রাজা-প্রজা, বীর-ভীরু সকলেরই চিত্ত আকৃষ্ট করে—সে দৃশ্য হোমারে এই একটী কিন্তু বাল্মীকিতে তাহার সংখ্যা নাই।

রাম-চরিত্র-সম্বন্ধে কি লিখিব? যা

নির্দ্দোষ-গঠন, সুচারু-চিত্রিত, নয়নোন্মাদকারী, সে চিত্রপট একবার দেখিলে কি কেহ ভুলিতে পারিবে? মহাকাব্য লিখিতে হইলে, এক যুদ্ধ-বর্ণনা করিয়া, পুঁথি শেষ করিলে হয় না। ইলিয়াড নির্দ্দোষ মহাকাব্য, য়ুরোপে এ সিদ্ধান্ত প্রমাণীকৃত। কিন্তু রামায়ণ, মহাভারত, তাঁহারা পূর্ব্বে দেখেন নাই—ইনিশ, ইলিয়াড, ওডেসি, এই তিন গ্রন্থই তাঁহাদের মহাকাব্যের নমুনা।

জাতীয় জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সর্ব্ব-বিবরণ অঙ্কিত করিতে যাইলে, লোক-উপাস্য চরিত্র গঠন করিতে হইলে, এক বীরকে যুদ্ধ ক্ষেত্রে আনিয়া—তাঁহার মুখে বৃষের হুহুঙ্কার শুনাইলে ও তাঁহাকে দিয়া পশুবৎ ব্যবহার করাইলে, যে মহাকাব্য হইল, এরূপ বলিতে পারি না। মহাকাব্য বিশ্বের বিশাল চিত্রপট—তাহাতে পুণ্য সুরের সহিত পাপ অসুরের দ্বন্দ্ব অঙ্কিত করিয়া দেখাইতে হইবে। সেই বিশাল পটের ভিত্তি ধরিত্রী, কিন্তু লক্ষ্য স্বর্গ। কবি রামায়ণ-রূপ যুগযুগ-স্থায়ী অক্ষয় ধর্ম্ম-মন্দির স্থাপন করিবেন, পবিত্রতা অমর অক্ষরে বাঁধিয়া রাখিবেন; তাঁহার সম্মুখে সমুদ্রবৎ মহাকার্য্য রত্নাকর অক্ষয় রত্ন সঞ্চয় করিবেন; তাই নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বল মুনি, সর্ব্বভূতে হিতে রত কে? বদান্য কে? বিষ্ণুর সদৃশ বীর্য্যশালী ও সোমবৎ প্রিয়দর্শন কে? মৃদুতায় মলয়-সমীরণ-নীত বল্লরীবৎ কে? জীত-ক্রোধ ও আত্মবান কে? চরিত্রযুক্ত ও দ্যুতিমান কোন বীর?" দেখিলে, কবির দৃষ্টি কোথায়? ঋষি আদর্শ-পুরুষ অঙ্কন করিয়া জগতের পূজনীয় করিবেন—এই পৃথিবী-ক্ষেত্র তাঁহার রঙ্গমঞ্চ, কিন্তু সুশস্যের বীজ তিনি স্বর্গ হইতে আহরণ করিতেছেন। 'রামায়ণের প্রাক্-ধ্বনি—মূলগ্রন্থ-জ্ঞাপক।' এরূপ উৎকৃষ্ট প্রারম্ভ আর পৃথিবীর কোন গ্রন্থে নাই।

যখন রাবণ ভ্রমর-কৃষ্ণ-কুঞ্চিত-কেশা, অপস-রস-তুল্য সমীরে মরাল-সম্পীড়িত সরুরুহ-তুল্য। সুরাঙ্গনা কর্ত্তৃক উপসেবিত হইতেছিলেন; সৌন্দর্য্যের উপাসক বাল্মীকি সেই চিত্রপট অঙ্কন করিতে যাইয়া নির্ম্মল দেব-ভাব-চ্যুত হন নাই। তিনি, হোরেস (Horace), বোকাসিও, কি ডন-জুয়ানের কবি নহেন! বাল্মীকি, রাবণকে তদবস্থ স্ত্রীগণ-অঙ্কশায়ী দেখিয়া, দেখুন দেখি কেমন খুঁজিয়া একটী উপমা বাহির করিলেন,—

"তেষাং মধ্যে মহাবাহু,
শুশুভে রাক্ষসেশ্বরঃ।
গোষ্ঠে মহতী মুখ্যানাং
গবাং মধ্যে যথা বৃষঃ॥"

মহাকাব্য মহীয়ান মহীরুহ। ইহাতে পরি-বেষ্টনকারী বল্লরীর শোভা আছে, ইহাতে যুগ-যুগ-অক্ষয় সংসার-কাণ্ডের বিস্তার আছে, লগ্ন স্থিরেকাঞ্জন পুষ্প-বিকাশ আছে, পুষ্পরজে বিস্মিত-দর্শন ভ্রমর আছে, এই সমস্ত শোভা-বহনকারী সারবান কাণ্ড আছে—সেই কাণ্ডের নাম ধর্ম্ম। এক যুদ্ধ-বর্ণনায় রামায়ণ কি মহাভারত শেষ করা হয় নাই। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত বীরচরিত আখ্যাত হইয়াছে; ইষ্টকের উপর ইষ্টক তদুপরে ইষ্টক সংস্থাপিত করিয়া অত্যাশ্চর্য্য মহীয়সী অট্টালিকা উত্থিত হইয়াছে। শৈশবের ধর্ম্ম, কৈশোরের ধর্ম্ম, যৌবনের ধর্ম্ম, বার্দ্ধক্যের ধর্ম্ম, ভ্রাতার ধর্ম্ম, স্ত্রীর ধর্ম্ম, সেবকের ধর্ম্ম, যুদ্ধক্ষেত্রে ধর্ম্ম, গৃহপ্রাঙ্গনে ধর্ম্ম, বিপদের ধর্ম্ম, সম্পদের ধর্ম্ম,—এই সেই বিশাল মহীরুহের এক একটী পত্র। একদিকে যুদ্ধ, পাশব-শক্তি রাবণ, তাহার সহিত শারীরিক শক্তিতে দ্বন্দ্ব, ফল—অসুর-বধ; অন্যদিকে রাজার কর্ত্তব্যরূপ শক্তির সহিত স্বীয় স্বার্থশক্তির সংঘর্ষ, ফল—সীতার বনবাস। এক দিকে সাম্রাজ্য-লিপ্সা, অতুল বৈভব, কুবেরের ধন, রাজ-প্রকোষ্ঠের বিলাস-লোভ; অন্যদিকে যে সত্য-হেতু সরিৎপতি, বেলা অতিক্রম করেন না, ও দিবাস্পতি আলো প্রদান করেন—সেই উল্লঙ্ঘ্য সত্য। মণির মুকুট নাই, হার-কেউর নাই, কুঙ্কুম-চন্দন নাই—আছে, জটাজুট, চির-

কৃষ্ণাজিন, বনের কঙ্কর। এই দ্বন্দ্ব, লঙ্কার দ্বন্দ্ব হইতেও, ভীষণতর! লঙ্কা-সমরে একিলিস থাকিলে কাজ হইত; কিন্তু, অযোধ্যা-কাণ্ডের যুদ্ধে ও উত্তরাকাণ্ডের যুদ্ধে, একলিস যোদ্ধা পরাজিত হইতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। মহাকাব্য ইহাকেই বলে। একদিকে ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ—শল্যপর্ব্বের ঘোর অশান্তি—পর্ব্বতে পাহাড়ে, বিদ্যুতে আকাশে, আগুণে বরুণে, সমুদ্রে আর প্রলয়কালীন মেঘে, সংঘর্ষ—ঐরাবতের অঙ্গে ঐরাবতের সম্পীড়ন—বীরের ভ্রূকুটী, অলম্বুষ, ঘটোৎকচ, সপ্তরথী, অভিমন্যু, একাঘ্নি অস্ত্র, অর্জ্জুনের গাণ্ডীব, ভীমের গদা; অন্যদিকে শান্তিপর্ব্বের শান্তি, চিত্তবৃত্তি-নিরোধ, যোগ। মহাশক্তির ঊর্দ্ধে যেন মহেশ্বর—ভগবতীর শিরোর্দ্ধে শিব। শক্তির দশ করে দশ আয়ুধ, পদতলে সিংহাসুরে বিকট দ্বন্দ্ব; ঊর্দ্ধে স্তিমিত-নেত্র যোগেশ্বর—পর্য্যঙ্ক-বন্ধ, কর্ণাবসম্বী দ্বিগুণিত অক্ষসূত্র, সংসারের বিষ ধারণ করিয়াছেন, তাই নীলকণ্ঠি মহেশের মূর্ত্তি। ভারতের এই দুই কাব্য অতুলনীয়। পৃথিবী যখন বর্ব্বর ছিল, তখন হোমারের মস্তকে "লরেল" দিয়াছে; কিন্তু আজ সুদিন বহিতেছে, গতি ফিরিয়াছে। প্রকৃত কাব্যের সৌন্দর্য্য ও পবিত্রতা, রামায়ণাদি দেখিয়া, পৃথিবী এখন শিক্ষা করিবে।

অদৃষ্ট।

পঞ্চাশত্তম পরিচ্ছেদ।

জয়গোপালের শেষ-বৃত্তান্ত

ডাক্তার বাবু চলিয়া গেলে অবধি, যাহাতে বাড়ির ভাড়া আর বেশী দিন না লাগে তৎপক্ষে যত্নবান হইয়া, যাহাতে শীঘ্র বাটীটী বসবাস-যোগ্য হয়, সে বিষয়ে আমি যত্ন পাইতে লাগিলাম। দেখিলাম, ডাক্তার বাবু যাহা বলিয়া গিয়াছিলেন, তাহাই ঠিক। এক্ষণে মজুরের বেশী প্রয়োজন; সুতরাং আমিও তাঁহার পরামর্শানুসারে জেলখানায় যাইয়া, প্রাত্যহিক ছয়টী মজুরের আবশ্যক বিবেচনায়, এক সপ্তাহের জন্য দাম জমা দিলাম। এই সময়ে মজুরের আবশ্যক হইলে, যে কেহ ইচ্ছা করিলে, জেল-খানা হইতে মূল্য দিয়া কয়েদী মজুর পাইতে পারিতেন। দেশীয় লোককে মজুর ধরা অপেক্ষা জেল-খানা হইতে লওয়ায় একরূপ লাভ ছিল। যদিও জেল-খানায় মজুর-প্রতি কিছু বেশী খরচা পড়ে, কিন্তু সুবিধা এই যে, তাহারা কয়েদী বলিয়া, তাহাদিগকে খাটাইবার জন্য একজন করিয়া জমাদার আইসে। এই সুবিধা-সত্ত্বেও, আমি স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া, যে সকল কার্য্য অত্যাবশ্যক, তাহাই করাইতে লাগিলাম। তৃতীয় দিবস লোকজনদিগকে খাটাইতে খাটাইতে দেখি,—একটী লোক বৃদ্ধ, অথচ আমার শ্বশুর-মহাশয়ের সহিত সৌসাদৃশ্য আছে। তাহার কাজ দেখিয়া আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম। যতবার তাহার দিকে দেখি, ততবারই তাহাকে একমনে কাজ করিতে দেখি, এবং তাহার চেহারা দেখিবামাত্র তাহাকে আমার শ্বশুর-মহাশয় বলিয়া ভ্রম জন্মাইতে লাগিল। এজন্য, আমার কৌতূহল-তৃপ্তির নিমিত্ত, তাহাকে ডাকিয়া ঘরের ভিতর আসিতে বলিলাম। দেখিলাম, সে ব্যক্তি কাজ ছাড়িয়া আসিতে রাজী নহে, সুতরাং পুনরায় ডাকিলাম। এবার জমাদার তাড়া দিয়া আমার হুকুম শুনিতে কহিল। তখন সে ব্যক্তি অগত্যা কার্য্য ছাড়িয়া আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিল। গৃহাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র দেখিলাম, তাহার দুই চক্ষু দিয়া অশ্রু-বর্ষণ হইতেছে। আমি ভাল করিয়া দেখিয়াই তাঁহাকে চিনিলাম; কিন্তু তথাপি, ভাল করিয়া, তাঁহার নাম-ধাম জিজ্ঞাসা করিলাম। শ্বশুর-মহাশয় অগ্রে হইতেই আমাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন; এবং সেইজন্যই, যাহাতে আমি না চিনিতে পারি—তজ্জন্য, অবনত মস্তকে একাগ্রচিত্তে কার্য্য করিতেছিলেন। তাঁহাকে ডাকিবামাত্র, তিনি, আমি জানিতে পারিয়াছি বুঝিয়াই, আমার সহিত আসিতে চান নাই। পরে যখন আসিতে বাধ্য হইলেন, তখন, আমার সহিত পরিচয় হইবে এই লজ্জায় ও কষ্টে, তাঁহার চক্ষু হইতে দরদর-ধারে অশ্রুপাত হইতে লাগিল। আমি পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবামাত্র, বৃদ্ধ কাঁদিয়া আমার নাম ধরিয়া ডাকিয়া কহিলেন,—"যদু, বাবা, আমার সর্ব্বনাশ হইয়াছে; আমার আর পরিচয় দিবার যো নাই, পরিচয় এই যাহা দেখিতেছ! জয়গোপালের বৃত্তান্ত সব শুনেছ; আমারও এই দশা!" এই বলিয়া তিনি হাপুষ-নয়নে কাঁদিতে লাগিলেন।

আমি তাঁহাকে অনেক সান্ত্বনা করিয়া, তথায় রাখিয়া, চাকর দ্বারা জলখাবার আনাইয়া খাইতে দিলাম, ও নানারূপ যত্নে একটু বিশ্রাম লাভ করিলে পর আমি তাঁহাকে জয়গোপালের বৃত্তান্ত সমস্ত জিজ্ঞাসা করিলাম। প্রথমতঃ আমি হরিপদকে লইয়া আসিয়া যেরূপ বিপদগ্রস্থ হই ও তৎপরে আমার অদৃষ্টের বিষয় সমুদয় বর্ণনা করিয়া, জয়গোপালের বৃত্তান্ত জানিবার নিমিত্ত অত্যন্ত উৎসুক হইয়া, তাঁহাকে সমুদয় বর্ণন করিতে কহিলাম।

তিনি শুনিয়া কহিলেন, —"বাবা, জয়গোপালের বৃত্তান্ত আর কি বল্‌বো? সকলি তুমি জান; তুমি যখন রাজ্যেশ্বর হয়েছ, তখন আর তোমার অবিদিত কিছুই নাই। তুমি ওকালত-নামা দিয়া এলেই আমিও যাইয়া জয়গোপালের পরামর্শ লইলাম। তোমার সেই উকীল ছাড়া আর উকীল পাওয়া যায় না। সুতরাং উকীল গিয়া ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করা হইয়াছিল। বিষয়-আশয় সমস্ত বিক্রয় করিয়া, দুই-তিন জন ব্যারিষ্টার আনিয়াছিলাম। তুমি ওখান হইতে চলিয়া আসার পর, আমিও আবার সেই মকর্দ্দমায় আসামীভুক্ত হই। জয়দুর্গা মাঝে পড়িয়া গহনাগুলি সব খোয়াইল। তাহার কারণ আমারই দুর্ব্বুদ্ধিতা। আমিই দুর্ব্বুদ্ধি-বশত মকর্দ্দমা সহজ বুঝিয়া জয়দুর্গার গহনাগুলি বিক্রয় করিয়া মকর্দ্দমা চালাইব ভাবিয়াছিলাম। জয়দুর্গা কিছু বেশী বুদ্ধিমতী, সে এঘর-ওঘর করিয়া আমাদিগের নিকট হইতে চুরী করিয়া গহনাগুলি পুঁতিয়া রাখিল। পরিশেষে, আমাদের পাড়ার এক যুগীর মেয়ে সেই সন্ধান পাইয়া গহনাগুলি চুরী করিল। আমারও তখন সমূহ বিপদ; সুতরাং তাহার আর খোঁজ-খবর হইল না।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়াই, শ্বশুর-মহাশয় আর কথা বলিতে পারিলেন না। চক্ষুর জল গণ্ডদ্বয় বহিয়া অবিশ্রান্ত পড়িতে লাগিল। কোঁচার কাপড় নাই যে, তদ্দ্বারা চক্ষু মুছিবেন। জেল-খানার কয়েদিদিগকে জাঙ্গিয়া পরাইয়া কার্য্য করাইতে পাঠায়। সুতরাং শ্বশুর-মহাশয়ের তাৎকালিক অবস্থা দেখিয়া আমার বড়ই কষ্ট হইল। যতই তাঁহার শোকজনিত অশ্রুবারি নয়নযুগল হইতে বহির্গত হইতে লাগিল, ততই তিনি দুই হস্ত দ্বারা তাহা নিবারণ করিবার চেষ্টা পাওয়ায় ও ততই তাঁহার অশ্রুবারি প্রবলবেগে বহির্গত হওয়ায়, তাঁহার মুখমণ্ডল অত্যন্ত পরিশ্রমের পর মুখপ্রক্ষালনের শোভা ধারণ করিল; কিন্তু তন্নিমিত্ত যে শান্তি হয়, তাহা না হইয়া তাঁহার হৃদয়বিকার-জনিত মুখভঙ্গি-সকল নিরীক্ষিত হইতে লাগিল। তাঁহার এতাদৃশ অবস্থা দেখিয়া আমি অত্যন্ত কষ্ট পাইলাম; কিন্তু, সে কষ্ট চাপা দিয়া, যাহাতে তাঁহার দুঃখের হ্রাস হয়, তজ্জন্যই চেষ্টা পাইতে লাগিলাম। অনেক সান্ত্বনার পর, বৃদ্ধ, একটী ভয়ানক দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, কহিলেন,—"এই মকর্দ্দমার পরে আমার যা কিছু ছিল, তাও গেল; আর জয়গোপালেরও সর্ব্বস্বান্ত হইল। কত ব্যারিষ্টার কত উকীল কিছুতেই কিছু হইল না। জয়গোপালের তিন বৎসর ও আমার এক বৎসরের জন্য কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাসের হুকুম হইল। আহা! বাবার

আমার কি কষ্ট! আফিং খেতেন, সেই আফিং না পেয়েই বা কি কষ্ট! কি ছটফটানি! কত লোককে একটু আফিং দেবার জন্য সাধ্‌লাম; কিন্তু তা কেউই দিলে না। অবশেষে বাবার আমার রক্ত-আমাশা রোগ হ'ল। একটু সেবা কর্‌লো, তাও কর্‌তে দিলে না। বাছা আমার বিনা-যত্নে ২১ দিনের দিন মারা গেলেন। আমার জীবন কঠিন; বুড় হাড়, কতদিন বাঁচিব, বলিতে পারি না; তাই এখনও জীবিত আছি। তোমাকে দেখিয়া আমার মন কিঞ্চিৎ ঠাণ্ডা হইল। কিন্তু মহামায়া আর এখন বর্ত্তমান নাই; থাকিলে, এ অবস্থায় তাহাকে দেখিতে পাইলে, মন আরও তৃপ্তিলাভ করিত। আহা! আমি পিতা হইয়া তাহার উপর কত অত্যাচারই করিয়াছি! তাহাকে পিতৃযোগ্য আদর না করায়, বাছা আমার মনোকষ্টে প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছে! সেই সকল পাপের প্রতিশোধ দিবার নিমিত্তই পরমেশ্বর এই দণ্ডবিধান করিয়াছেন। যাহাকে বড়-মানুষ ভাবিয়া এতদিন খোষামোদ করিয়া আসিলাম, তাহার যে দুর্দ্দশা ঘটিল, তাহাও স্বচক্ষে দেখিলাম; কিন্তু যাহাকে নির্ধন ভাবিয়া তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিয়া অবমাননা করিয়া আসিয়াছি, তাহাকে দেখিয়াই অদ্য আমার প্রাণ জুড়াইল। বাছা, যদু, পরমেশ্বরের লীলা আমি কেমন করিয়া বুঝিব? এক্ষণে আমার এই অনুরোধ যে, তুমি আর পূর্ব্ব-কথা কিছু স্মরণ না করিয়া, আমাকে মাপ কর; আমার বোধ হইতেছে যে, তুমি যদি আমাকে মাপ কর, তাহা হইলে আমার এই সমস্ত কষ্টের অনেক লাঘব হয়।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমার সহিত বসিয়া এই সকল কথাবার্ত্তা কহিতেছেন; এমন সময়, জেলের ঘড়িতে পাঁচটা বাজিল শুনিয়া, একজন কনষ্টেবল আসিয়া সমস্ত কয়েদীদিগকে সমবেত করিল; এবং ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে না দেখিতে পাইয়া, গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ-পূর্ব্বক, তাঁহাকে স্বদলাভিভুক্ত করিবার মানসে "চলরে চল" এই বাক্য নিঃসারণ-পূর্ব্বক, হাঁটুর গুতা মারিয়া উঠাইয়া লইয়া, সকলকে একত্রিত করিয়া, জেল-খানাভিমুখে গমন করিল।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে উঠাইয়া লইয়া গেলে, আমি জড়প্রায় কিয়ৎক্ষণ তথায় বসিয়া থাকিয়া, তৎপরে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলাম। মন যেরূপ বিকৃত হইয়াছিল, হরিপদ ও সুলোচনার সন্নিধানে যাইয়া তাহার আর কিছুমাত্র রহিল না। তৎপরেও তিন-চারি দিবস যে সকল মজুরদারেরা কার্য্য করিতে আসিত, তাহাদিগের প্রত্যেককে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিয়াছি;" কিন্তু কেহই তাঁহাকে চিনে-না কহিল। কি করি, কোম্পানীর নিয়ম, আমাদের কোন হাত নাই,"— এইরূপে মনকে প্রবোধ দিয়া, বাটীর আবশ্যকীয় কার্য্য সম্পন্ন হইলে, শুভদিন দেখিয়া, হরিপদ, আমি ও সুলোচনা নূতন বাটীতে আসিয়া বাস করিতে লাগিলাম। ডাক্তার-বাবুর প্রসাদাৎ আমার আর অর্থের কোনই ভাবনা রহিল না; কারণ, চিকিৎসা করিয়া যাহা পাইতে লাগিলাম, তাহাতেই আমার যথেষ্ট বোধ হইল। এতদ্ভিন্ন, ডিস্‌পেন্‌সারীর আয়, ও মাঝে মাঝে দুই চারি দিবসের জন্য যাইয়া আমার দেশ হইতে খাজনা-পত্র আদায় করিয়া আনিতাম। ফলতঃ এই অবধি আমরা এক প্রকার নির্ব্বিঘ্নে ও সুখে কাল কাটাইতে লাগিলাম। অতঃপর "অদৃষ্ট" অদৃষ্টাধীন। যদি বাঁচিয়া থাকি, আর যদি জ্ঞাপন-যোগ্য ঘটনা ঘটে, তবে পাঠকবর্গ জানিতে পারিবেন। নতুবা এই শেষ।

সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়।

মানব-সমাজে সাধারণতঃ দুই সম্প্রদায় লোক আছে। এক, গৃহী; দ্বিতীয়, আশ্রমহীন সন্ন্যাসী বা উদাসীন। স্ত্রী-পুত্র-ভাই-বন্ধু লইয়া যাঁহারা জগতে সুখ-দুঃখের অনুসন্ধানে জীবন-যাপন করেন, তাঁহারা গার্হস্থ্য-আশ্রমী বা গৃহী; আর,

যাঁহারা কানন-পর্ব্বত বা বৃক্ষচ্ছায়া আশ্রয় করিয়া একাকী সংসারে সুখদুঃখের বিষয়ীভূত, তাঁহারাই সন্ন্যাসী বা উদাসীন। পূর্ণ আসক্তি গৃহীদিগের লক্ষ্য; শুষ্ক বৈরাগ্যই সন্ন্যাসীগণের উদ্দেশ্য। কিন্তু এই বৈরাগ্য আবার কতকটা কর্ম্মানুযায়ী; কতকটা কর্ম্ম-জনিত। যে যতই কেন ঐশ্বরিক তত্ত্বে মনোনিবেশ করুক না, তাহার হৃদয়ের কোন না কোন অংশ পার্থিব সুখের দিকে আকৃষ্ট আছেই আছে। উদাসীন জগতের মঙ্গলের জন্য যতটা না কার্য্য করেন, নিজের হৃদয়ের দিকে চাহিয়া তাহার সাতগুণ বেশী করেন। সন্ন্যাসীগণ প্রথমতঃ আপন স্বভাব অথবা গৃহস্থাশ্রমের ঘোর বিভীষিকাময় যন্ত্রণায় গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস-আশ্রম অবলম্বন করেন। গৃহত্যাগ করিয়াও গার্হস্থ্য-আশ্রমের নিয়ম, চাল-চলন, ভাবভঙ্গি, আচার-ব্যবহার, দয়া-মায়া কিছুই ত্যাগ করিতে পারেন না। সমস্ত সন্ন্যাসীই যে এই প্রকার, একথা আমরা বলিতেছি না; তবে অধিকাংশই এতাদৃশ। সংসারীদিগের মধ্যে যেমন রাঢ়ী, বরেন্দ্র, বৈদিক, সীয়া, শুন্নি, মোগল, পাঠান, প্রটেষ্টান্ট, রোমান কাথলিক, শৈব, বৈষ্ণব, জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি সম্প্রদায়-বিভিন্ন আছে; সন্ন্যাসীদিগের মধ্যেও তাদৃশ সম্প্রদায়-বিভক্ত আছে। তবে মোটের উপর ইহাদিগের জাতিভেদ-জ্ঞান গৃহীদিগের অপেক্ষা কতকটা সঙ্কীর্ণ। কিন্তু কোন কোন সম্প্রদায়ে জাতি-ভেদ প্রথা আবার পূর্ণ-মাত্রায় স্ফুরিত আছে। বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষে চারি সম্প্রদায় সন্ন্যাসী আছে; এই সম্প্রদায়-চতুষ্টয় আবার সাত আকড়ায় অর্থাৎ সাত শ্রেণীতে বিভক্ত। ইহাদিগের প্রত্যেক আকড়ায় পৃথক পৃথক কার্য্য, পৃথক পৃথক সাধনার নিয়ম, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র উপাস্য দেবতা। সম্প্রদায়-চতুষ্টয়ের নাম,— রামাউৎ, নিমাউৎ, বিষ্ণুস্বামী এবং মধ্যাচার। ইহারা সাত আকড়ায় বিভক্ত; যথা,—নির্ব্বাণ, নিরমোহী, টাটামারী, দিগম্বরী, নৃশঙ্খী, নাগা ও অগ্রস্বামী। রামাউৎ সম্প্রদায় দুই ভাগে বিভক্ত; যথা,—নির্ব্বাণ এবং দিগম্বরী। কিন্তু এই দুই আকড়ায়ও সম্পূর্ণ পার্থক্য আছে। দিগম্বরী-শ্রেণী অতি নিরীহ, অতি শান্তিপ্রিয়, নিষ্কাম এবং নির্লিপ্ত। নির্ব্বাণ-শ্রেণী উদ্ধত, দর্পী, অস্ত্রধারী এবং অশান্তিপ্রিয়। ইহারা দুই শ্রেণীই রাম-উপাসক; তবে কাহারও কামনা নির্ব্বাণ, কাহারও কামনা সুখলাভ। অযোধ্যা প্রভৃতি প্রদেশ এই শ্রেণীদ্বয়ের আবাস-স্থল।

নিমাউৎ-সম্প্রদায় টাটামারী এবং নাগা-শ্রেণীভুক্ত। ইহাদিগের মধ্যে পরস্পরে অতি অল্প প্রভেদ বর্ত্তমান। টাটামারী-শ্রেণী প্রায় দিগম্বরী-দলের ন্যায়; তবে কার্য্য উপস্থিত হইলে ইহারাও নাগা-শ্রেণীর ন্যায় অস্ত্র চালাইতে নারাজ নহে। কিন্তু নির্ব্বাণ ও নাগা-দলের মত তত দুর্দ্দম নহে। ইহারা দুই দলেই শিবোপাসক; রামেশ্বর সেতুবন্ধ প্রভৃতি স্থলে ইহাদের বসতি-স্থান। বিষ্ণুস্বামী-সম্প্রদায় নৃশঙ্খী এবং নিরমোহী দলভুক্ত। নিরমোহীগণ নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক; শান্তিপ্রিয়, কর্ম্মশূন্য ও নিশ্চেষ্ট। নৃশঙ্খীদল ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া তাঁহার আকার হৃদয়পটে চিত্রিত করিয়া উপাসনা করে; কর্ম্ম-উদ্দেশ্যে ব্যস্ত থাকে, এবং কর্ম্মফলে মুক্তিকামনা করে। ইহারা আসক্তিশূন্য হইয়া কার্য্য করে। কিন্তু জগতের উদ্দেশ্যে তাহা সম্পাদিত হয়। দ্রাবিড়, তৈলঙ্গ প্রভৃতি স্থানে ইহাদের বাসভূমি। মধ্যাচার-সম্প্রদায় অগ্রস্বামী আকড়াভুক্ত। ইহারা কালী, কৃষ্ণ, দুর্গা প্রভৃতির উপাসক; বঙ্গদেশ ইহাদিগের বাসভূমি। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে অল্পাংশ নির্ব্বাণ-মুক্তি-কামনাকারী; অপরাংশ সংসারের দারুণ যন্ত্রণার প্রতিলোপকারী। ইহার মধ্যে শাক্ত, শৈব, গাণপত্য, বৈষ্ণব প্রভৃতি অনেক শ্রেণী আছে। বর্ত্তমান সময়ে ভারতের সমগ্র সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় মধ্যাচার বা অগ্রস্বামী সন্ন্যাসীদলকে কতকটা ঘৃণার চক্ষে

দেখিয়া থাকেন; কিন্তু সেটা সম্পূর্ণ ভুল। এই মধ্যাচার-সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন দুই-এক-জন সন্ন্যাসী আছেন, যাঁহারা দিগম্বরী বা নৃশঙ্খী-সম্প্রদায় অপেক্ষাও জ্ঞানী ও সাধনায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট। আমি কোন সময়ে পাঁচমাস কাল এক-জন সন্ন্যাসীর চেলা ছিলাম; তিনি গুজরাট-বাসী ও নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক। তাঁহারই মুখে শুনিয়াছি, বঙ্গদেশে গৃহীদিগের মধ্যে এমন অনেক সন্ন্যাসী আছেন, যাঁহারা সংসারের দারুণ যন্ত্রণামধ্যে থাকিয়াও সন্ন্যাস-ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছেন। জাগতিক কার্য্যের বিষম কূটজালে জড়িত হইয়া, গৃহী হউন আর সন্ন্যাসীই হউন, যিনি আসক্তিহীন হইয়া নিষ্কাম-ভাবে পার্থিব সুখে ঔদাসীন্য দেখাইতে পারেন, তিনিই জগতে ধার্ম্মিক—তিনিই মনুষ্য-মাত্রের আরাধ্য।

চীনদিগের আচার-ব্যবহার।

চীন-সাম্রাজ্য জগতের মধ্যে একটী প্রাচীন ও বিখ্যাত রাজ্য। ভারতবর্ষের ন্যায় চীনেও সভ্যতার আলোক বহুকাল পূর্ব্বে প্রবিষ্ট হইয়াছে। চীনের সভ্যতা ও সামাজিক-পদ্ধতি একরূপ স্থিতিশীল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। চীনদেশ জগতের ঠিক মধ্যস্থানে স্থাপিত—এই বিশ্বাসে, চীনেরা আপনাদের দেশকে মধ্যরাজ্য বলিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে ইহা আসিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব্ব অংশ, এবং ভারতবর্ষই প্রকৃত মধ্যস্থানে স্থাপিত। চীনেরা আপনাদের দেশকে চীন-দেশ নামে অভিহিত করে না। কথিত আছে, "চীন" এই নাম-করণ মালয়-জাতি দ্বারা হইয়াছে।

সমুদায় চীন-সাম্রাজ্যের সমষ্টি ভারতবর্ষের তিনগুণ হইবে। স্বাধীন চীন বা প্রকৃত চীন, তিব্বৎ ও তাতার-দেশের অধিকাংশ লইয়া চীন-সাম্রাজ্য গঠিত। প্রকৃত চীনের পরিমাণ ভারত-বর্ষের সমান। ইহার যথার্থ অধিবাসীর সংখ্যা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। অনেকে অনুমান করেন, ইহার লোক-সংখ্যা প্রায় বত্রিশ কোটী। সাম্রাজ্যের অবশিষ্টাংশের পরিমাণ ভারতবর্ষের দ্বিগুণ; কিন্তু লোকসংখ্যা ছয় কোটীর অধিক নহে বলিয়া অনুমিত হয়। উপরি-লিখিত লোকসংখ্যা হইতে এই স্থির হয় যে, জগতের প্রত্যেক চতুর্থ ব্যক্তি বা এক-চতুর্থাংশ লোক চীন জাতি। ইহা একটী জাতির বড় সামান্য গৌরবের পরিচয় নহে।

চীন-দেশে কয়েকটী বড় বড় নদী আছে। উহাদের অধিকাংশই তিব্বৎ-দেশীয় পর্ব্বত শ্রেণী হইতে উৎপন্ন হইয়া প্রশান্ত-মহাসাগরে পতিত হইয়াছে। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, চীনের ভূমির উচ্চতা তিব্বতের সন্নিকট হইতে আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ প্রশান্ত-মহাসাগরের অভিমুখে হ্রাস হইয়া পড়িয়াছে। এখানকার অধিকাংশ নদীতেই বৃহৎ বৃহৎ অর্ণবপোত সকল অনায়াসে গমনাগমন করিতে পারে।

চীনের জল-বায়ু অনেক পরিমাণে ভারত-বর্ষের ন্যায়। গ্রীষ্মকালে সময়ে সময়ে গ্রীষ্মের আতিশয্য সমধিক বোধ হয়, এবং সেই সময়ে প্রায় প্রবল ঝটিকা ইত্যাদি ঘটিয়া থাকে।

চীন-দেশে বসতি এত ঘন-সন্নিবিষ্ট যে, পশ্চিম-সীমার পর্ব্বত-শ্রেণী ব্যতীত অপর কোন স্থানে হিংস্র জন্তু নয়নগোচর হয় না। গো, অশ্ব প্রভৃতি গৃহপালিত জন্তু, অন্যান্য দেশের ন্যায় আকারে তত বৃহৎ হয় না, এবং তাহাদের সংখ্যাও তত অধিক নহে। দেশে বন্য ও পতিত ভূমিও নিতান্ত অল্প; কারণ সকল স্থানই প্রায় মনুষ্যের খাদ্যোৎপাদনের জন্য কর্ষিত হইয়া থাকে।

চীনেরা হংস বড় ভালবাসে। প্রত্যেক চীনই অনেকগুলি করিয়া হংস প্রতিপালন করিয়া থাকে। যে পর্য্যন্ত হংস-ডিম্ব হইতে শাবক বহির্গত না হয়, ততদিন তাহারা ডিম্বগুলি উত্তপ্ত বালুকাপূর্ণ বাক্সের মধ্যে রাখিয়া দেয়। শাবক-সকল ডিম্ব হইতে বহির্গত হইলে

প্রথম প্রথম তাহাদিগকে অন্ন খাইতে দেয়; পরে কিছু বড় হইলে তাহাদিগকে নৌকা-মধ্যে রক্ষা করে। এই সকল নৌকা হংসদিগের বাসোপযোগী করিয়া পৃথক-ভাবে প্রস্তুত করা হয়। এক-একখানি নৌকায় প্রায় চারি শত করিয়া হংস বাস করিতে পারে। দিবসে হংসগুলিকে বিচরণ করিবার জন্য নদী-তীরে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, এবং সন্ধ্যাকালে তাহারা তাহাদিগের প্রভুর বংশীধ্বনি অথবা কোনরূপ অপর সাঙ্কেতিক শব্দ শুনিয়া নৌকায় প্রত্যাগমন করে। সময়ে সময়ে চীনেরা হংসদিগকে বিদীর্ণ করিয়া দুইভাগে বিভাগ-পূর্ব্বক মৎস্যের ন্যায় রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া রাখে।

চীনেরা মৎস্যেরও বিলক্ষণ আদর করে। চীনের সকল-জলাশয়েই প্রায় প্রচুর পরিমাণে মৎস্য পালিত হয়; এবং সেই কারণে জলাশয়-গুলিও স্থলের ন্যায় যথেষ্ট পরিমাণে দেশের খাদ্যোৎপাদন করিয়া থাকে।

চীন-দেশে সাধারণতঃ তিন জাতীয় লোক বাস করে। চীন, মঞ্চুতাতার এবং আদিম অসভ্য জাতি। ইংরাজদিগের বিশ্বাস,—আমাদিগের ন্যায় চীনের আদিম-ইতিবৃত্তও অনেক কাল্পনিক ঘটনায় পরিপূর্ণ। তাঁহারা বলেন,—ভারতবর্ষে আর্য্য-জাতির ন্যায়, চীনেরাও তত্রস্থ আদিম অধিবাসীদিগকে যুদ্ধে পরাভূত ও পার্ব্বত্য-প্রদেশে বিদূরিত করিয়া চীনে আপনাদিগের বাস ও আধিপত্য স্থাপন করিয়াছে; এবং তাহাদিগের আগমনের পূর্ব্বে তথায় অনেক ভিন্ন ভিন্ন অসভ্য জাতির বাস ছিল।

পশ্চাত্য জাতির ধারণা,—চীনেরাও আর্য্য-দিগের ন্যায় কাস্পিয়ান-হ্রদের দক্ষিণবর্ত্তী স্থান হইতে আগমন করিয়া চীনে বাস করিয়াছে। অনেকের অনুমান, খৃঃ পূঃ ৭২১ শতাব্দীতে চীনগণ চীনে প্রথম আগমন করে। তাহারা সেই সময় সামান্যরূপ লিখিতে-পড়িতে ও গ্রহ-নক্ষত্রাদির গতিবিধি নির্ণয় করিতে জানিত।

প্রথমতঃ চীনে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা ছিল। উক্ত রাজগণ সর্ব্বদা আপনাদিগের মধ্যে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকিত। ইঁহাদিগের মধ্যে সময়ে সময়ে, এক-একজন অধিক পরাক্রান্ত হইয়া অপরাপর রাজাদিগের উপর কর্তৃত্ব করিত। চীনের প্রথম সম্রাটের নাম হোয়াংটী। খ্রীষ্ট-জন্মের ২৪৬ বৎসর পূর্ব্বে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তৎকৃত কয়েকটী পরিবর্ত্তন চীনদিগের মনোনীত না হওয়ায়, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া, ধর্ম্ম, কৃষি ও চিকিৎসা-বিষয়ক গ্রন্থগুলি ব্যতীত দেশের অন্যান্য সমুদায় সাহিত্য-গ্রন্থ দগ্ধ করিতে আদেশ প্রচার করেন। এই সম্রাটই তাতারদিগের দৌরাত্ম্য-নিবারণ-মানসে চীন-দেশের প্রসিদ্ধ সীমা-প্রাচীর নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন।

মঞ্চু-জাতিকে দেশ হইতে বহিষ্করণ-মানসে ১২০৯ খৃঃ অঃ চীনেরা মঙ্গোলীয়দিগের সাহায্য-প্রার্থনা করে। কিন্তু অবশেষে, মঙ্গোলীয়-গণই চীনের প্রভুত্ব-লাভ করে। ইহারাই চীনের প্রথম বৈদেশিক জাতি। এই মঙ্গোলীয়গণ ১৩৬৮ খৃঃ অঃ পুনরায় চীনদিগের কর্ত্তৃক বিদূরিত হয়, এবং মিং নামক একটী চীনবংশ সিংহাসন লাভ করে। এই বংশীয় সম্রাটগণ ২৭৬ বৎসর পর্য্যন্ত চীনের শাসনদণ্ড পরিচালিত করেন। অবশেষে এক ব্যক্তি বলপূর্ব্বক সিংহাসন অধিকার করিলে, তাহাকে বিদূরিত করিবার জন্য, চীনগণ পুনরায় মঞ্চুজাতির সাহায্য-প্রার্থনা করে। কিন্তু মঞ্চুগণ এই ব্যক্তিকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া শেষে আপনারাই সমগ্র দেশের প্রভুশক্তি লাভ করে, এবং পিকিন-নগরে তাহাদিগের রাজধানী স্থাপন করে। তদবধি মঞ্চুগণই চীনে রাজত্ব করিয়া আসিতেছে। চীনের বর্ত্তমান সম্রাটও এই মঞ্চু-বংশ-সম্ভূত।

চীনদিগের বর্ণ শুভ্র, ওষ্ঠাধর কিঞ্চিৎ স্থূল, চক্ষুদ্বয় অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র, মস্তকের কেশ কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘ-বেণী-পরিশোভিত; শ্মশ্রু তত ঘন নহে এবং

এদেশীয় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ন্যায় ইহারাও শ্মশ্রু-বিদ্বেষী। কথিত আছে, ১৬৪৪ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত চীনেরা মস্তকে দীর্ঘকেশ রাখিত; চুলগুলি মস্তকের উপরিভাগে গুচ্ছ করিয়া আবদ্ধ করিত। মঞ্চু-জাতীয় জনৈক সম্রাট প্রথমে আজ্ঞা প্রচার করেন যে, সামান্য শিখা-ব্যতীত শিরোদেশের সমুদায় কেশ মুণ্ডন করিতে হইবে। কিন্তু বহু-দিন পর্য্যন্ত চীনেরা এ আজ্ঞা প্রতিপালনে স্বীকৃত হয় নাই। অবশেষে সকলেই এই আদেশ মান্য করে। চীনেরা সেই অবধি মস্তকের চতুর্দ্দিক মুণ্ডন করিয়া কেবল শিখাদেশে সামান্য কেশ রক্ষা করে। উক্ত কেশগুলি স্ত্রীলোকের বেণীর ন্যায় বিনাইয়া পৃষ্ঠদেশে ঝুলাইয়া রাখে।

প্রত্যেক চীনের মস্তকেই উক্তরূপ একটী বেণী আছে। চুল ছোট থাকিলে রেশম অথবা কাল ফিতা ইত্যাদি দ্বারা বেণী দীর্ঘ করে। বেণীহীন মস্তক চীনদিগের নিকট বিশেষ নিন্দনীয়, এবং ঘৃণার্হ। চীনেরা, বেণী-বঞ্চিত হওয়া অপেক্ষা, শিরশ্ছেদ হওয়া শ্রেয়জ্ঞান করে। চীন-দেশীয় দুষ্ট বালকগণ, সময়ে সময়ে, তাহাদিগের সঙ্গীদের অজ্ঞাত-সারে, দুই জনের বেণী একত্রে বন্ধন করিয়া রঙ্গ দেখে।

চীন-দেশীয় কুলীগণ মস্তকোপরি কোন ভার-বহন-কালে তাহাদিগের দীর্ঘ বেণী কুণ্ডলা-কারে শিরোভাগে স্থাপন করিয়া বীড়ার কার্য্য করে।

চীনদিগের মধ্যে কতকগুলি ভয়ানক কুসংস্কার আছে। উক্ত কুসংস্কারের মধ্যে একটী এই যে, তাহাদিগের বিশ্বাস, ভূতে তাহাদিগের বেণী কর্ত্তন করিয়া লইতে পারে। এই কারণে, তাহারা সময়ে সময়ে দিবসে ঢাক-ঢোল বাজাইয়া ও নিশাকালে মশাল জ্বালিয়া দলে-দলে বহির্গত হয়। ইহার উদ্দেশ্য, ভূতদিগকে ভয় দেখান। চীনের পুরোহিতগণ একরূপ কাগজ বিক্রয় করে; লোকের বিশ্বাস, উক্ত কাগজ বেণীর মধ্যে রক্ষা করিলে ভূতে ভয় পায়।

চীনেরা স্ত্রীলোকের ক্ষুদ্র পদের এত পক্ষপাতী যে, বিবাহ-সম্বন্ধ উপস্থিত হইলে পাত্রীর অপরাপর সদ্‌গুণ বা সৌন্দর্য্য-সম্বন্ধে প্রশ্ন না করিয়া প্রথমেই চরণের পরিমাণ জিজ্ঞাসা করে। যে স্ত্রীলোকের চরণ তিন ইঞ্চি পরিমিত, তাহার সৌন্দর্য্য সুবর্ণ-পদ্মের সহিত তুলনা করা হয়। ধনবান ও সম্ভ্রান্ত-বংশীয় রমণীগণের চরণ-যুগল এত ক্ষুদ্র যে, তাহারা, যষ্টি অথবা নিজ-পুত্র-কন্যাগণের স্কন্ধে ভর প্রদান-ব্যতীত, স্বাধীন-ভাবে বিচরণ করিতে সমর্থা হয় না; গৃহ-সন্নিকটস্থ উদ্যান অথবা অপর কোনস্থানে গমনের আবশ্যক হইলেই বাহকের প্রয়োজন হয়। সামান্য গৃহস্থ-ঘরের স্ত্রীলোকদিগের চরণ-যুগল তত ক্ষুদ্র নহে, এবং তাহারা অনায়াসে ইচ্ছামত গমনাগমন করিতে পারে; কিন্তু বড় অধিক দূর চলিতে পারে না।

চীনেরা বালিকাদিগের শৈশব-কাল হই-তেই চরণের প্রতি দৃষ্টি রাখে। পঞ্চম বর্ষ বয়ঃ-ক্রম-কালে তাহাদিগের চরণ প্রথম আবদ্ধ করা হয়। চরণদ্বয়ের ছোট ছোট আটটি অঙ্গুলিই মোচড়াইয়া পদের নিম্নদিকে বাঁকাইয়া, একখণ্ড বস্ত্র দিয়া দৃঢ়রূপে বাঁধিয়া দেওয়া হয়। উক্ত বস্ত্র পায়ে বিলক্ষণরূপে জড়াইয়া তাহার অগ্র-ভাগ সেলাই করিয়া দেওয়া হয়। এইভাবে বালিকার পদদ্বয় দুই-এক সপ্তাহ কাল থাকে। সেই সময় বালিকাগণ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করে, এবং চীৎকার-ক্রন্দনে গৃহ বিদীর্ণ করিয়া ফেলে।

একবৎসর কাল বালিকা এইরূপ যন্ত্রণা ভোগ করে। গ্রীষ্মকালে দিবসে জ্বরের আক্র-মণে ও গ্রীষ্মের উত্তাপে বালিকা শয্যায় পড়িয়া যম-যন্ত্রণা ভোগ করে, এবং শীতকালে রাত্রির শীতে পদদ্বয় আবরণ করিতে না পারিয়াও অপরিসীম যন্ত্রণা পায়। চরণদ্বয় শীত-বস্ত্রে আবৃত করিলে

উত্তপ্ত হইয়া পাছে বেদনা-বৃদ্ধি হয়—এই ভয়ে, রাত্রিতে পদদ্বয় আচ্ছাদন করিতে পারে না। কখন কখন এইরূপ বন্ধন-নিবন্ধন পায়ের দু-একটী অঙ্গুলি একেবারে খসিয়া যায়; কিন্তু পদদ্বয় ক্ষুদ্র হইল ভাবিয়া সেই আনন্দে, বালিকা অথবা তাহার আত্মীয়-স্বজন সে ক্ষতিকে ক্ষতি বলিয়া গ্রাহ্য করে না। চরণ ক্ষুদ্র করিবার এই প্রকরণে বালিকা সহস্র যন্ত্রণা ভোগ করিলেও, তাহার জননী তাহা মোচন করিতে অগ্রসর হয় না। কারণ, চীন-দেশে যে বালিকার পদ যত ক্ষুদ্র হয়, সমাজে তাহার জননীর তত গৌরব ও আদর বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

চীন-দিগের পরিচ্ছদ আমাদিগের ন্যায় নহে। গ্রীষ্মকালে তাহারা দীর্ঘ ঢিলা পরিচ্ছদ পরিধান করে, এবং শীতকালে তুলা-ভরা অথবা মেষ-চর্ম্ম-বিনির্ম্মিত জামা ব্যবহার করিয়া থাকে। তাহাদিগের সকল পরিচ্ছদগুলিই দীর্ঘ, ঢিলা ও পদপর্য্যন্ত প্রশস্ত। কোমরে একটী করিয়া কোমর-বন্ধ থাকে। জামার হাতাগুলি খুব ঢিলা ও লম্বা।

অন্নই চীনদিগের প্রধান খাদ্য। দরিদ্র লোকেরা অন্নাভাবে শাক্-শবজী খাইয়াও প্রাণধারণ করে। গৃহস্থের অবস্থানুসারে, অন্ন, ব্যঞ্জন, মৎস্য ও মাংসের সহিত ভক্ষিত হয়। চীনদিগের ভিতর যাহারা আত্মার পুনর্জ্জন্মে বিশ্বাস করে, তাহারা, পাছে তাহাদিগের পর-লোক-গত কোন আত্মীয়কে অন্য জীবাকৃতিতে ভক্ষণ করে—এই ভয়ে, মাংস আহার করে না। কেহ কেহ অনুমান করেন, শাকাদি তরকারী মৎস্য-মাংসাপেক্ষা সুলভ বলিয়াই অনেকে নিরামিষ-ভোজনের এত পক্ষপাতী।

ইউরোপীয় জাতির ন্যায় চীনেরাও ভূমিতে বসিয়া আহার করে না। তাহাদিগের খাদ্য দ্রব্য, আহারের সময়, টেবিলের উপর সজ্জিত হয়। টেবিলের মধ্যস্থলে উত্তপ্ত অন্ন পূর্ণ একটী বড় বাটী থাকে ও তাহার চারিদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাটীতে মৎস্য, মাংস ও নানাবিধ ব্যঞ্জন দেওয়া হয়। প্রত্যেক ভোক্তাই একটী বাটী ও দুইটী কাটী লইয়া আহারে বসে। হস্তস্থিত বাটী টেবিল-মধ্যস্থ বৃহৎ বাটী হইতে অন্নে পূর্ণ করিয়া, বাম-হস্তে বদনের সন্নিকটে লইয়া, দক্ষিণ-হস্তের তিনটী প্রধান অঙ্গুলি দ্বারা কাটীদ্বয় ধারণ করত, তদ্দ্বারা এত লঘু-হস্তে বাটী হইতে অন্ন তুলিয়া মুখে প্রদান করে যে, দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। চীনেরা একার্য্যে বড় ক্ষিপ্রহস্ত। তাহা-দের এবিষয়ে অভ্যাস অপূর্ব্ব। শীতল জল-পানে ব্যাধির উৎপত্তি হয়, এই বিশ্বাসে, চীনেরা কখনও শীতল বারি পান করে না। গরম চা অথবা গরম জলই ইহাদের পানীয়। বাস্তবিক এই কারণেই, চীনদিগের ভিতর জ্বরের আক্রমণ অতি অল্পই দেখা যায়।

শূকর, কুক্কুট ও হংস-মাংস চীনদেশে সাধারণ-ভাবে প্রচলিত। সময় সময় কুকুর-বিড়ালের মাংসও চলিয়া থাকে। কৃষ্ণবর্ণ কুকুর ও বিড়াল-মাংস চীনদিগের বড় প্রিয়। ব্যাধির আক্রমণ নিবারণ মানসে, গ্রীষ্মের প্রারম্ভে, একটী নির্দ্দিষ্ট শুভদিনে, চীনের দক্ষিণাংশে কুকুর-মাংস ভক্ষিত হইয়া থাকে। নিরীহ ভেকজাতিরও চীনে পরিত্রাণ নাই। এক কথায় বলিতে গেলে, চীনদিগের নিকট কোন মাংসেরই অনাদর নাই। নিকৃষ্ট জীবসমূহের কাহারও চীনজাতির নিকট অসম্মান নাই।

গো-দুগ্ধ-পান চীন-দেশে অপ্রচলিত। কোন কোন পীড়ায় মনুষ্য দুগ্ধ প্রদানের ব্যবস্থা আছে।

চাতক-জাতীয় একপ্রকার ক্ষুদ্র পক্ষীর কুলায় চীন-দেশে বড় মহার্ঘ। ইহার ঝোল চীনদিগের অতি আদরের সামগ্রী। একটী একটী কুলায় এই কারণে টাকা তোলা ওজনে বিক্রীত হইয়া থাকে।

চীনেরা চা-পানের বিশেষ ভক্ত। বিনা দুগ্ধ ও শর্করায় ইহারা চা-পান করে। নগরের

প্রধান প্রধান বর্ত্মের ধারে প্রায় চা-পানের আশ্রম বা আড্ডা দেখিতে পাওয়া যায়।

অন্ন হইতে প্রস্তুত "সমুসু" নামক এক প্রকার মদিরা চীনেরা পান করে। আফিং, আমাদের দেশে তামাকের ন্যায়, চীনে সাধারণ-ভাবে প্রচলিত।

বুদ্ধদেবের মন্দিরগুলি ব্যতীত চীনে প্রাচীন প্রাসাদ বড় দৃষ্টি-গোচর হয় না। কোন চীন-সম্রাটই সেরূপ প্রকাণ্ড ও অত্যুচ্চ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়া নিজ নাম ও কীর্ত্তি চিরস্মরণীয় করিতে মনোনিবেশ করেন নাই।

চীনদিগের বাসগৃহের ভঙ্গী দেখিলে বোধ হয়, তাহারা পূর্ব্ব-কালে তাম্বুর মধ্যে বাস করিত। চীনে দ্বিতল-গৃহ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। গৃহের ছাদও দেওয়ালের উপর স্থাপিত নহে; কতকগুলি কাষ্ঠ-স্তম্ভ অবলম্বন করিয়া আছে। সম্ভ্রান্ত লোকদিগের বাটীর চতুর্দ্দিক প্রাচীরাবৃত ও বহির্দ্দিক গবাক্ষ-বিহীন। এই কারণে নগরাভ্যন্তরস্থ প্রধান প্রধান বর্ত্মগুলির দৃশ্য তত মনোহর নহে। পথের দুই পার্শ্ব কেবল দীর্ঘ প্রাচীরে বেষ্টিত। উক্ত প্রাচীরের গাত্রে এক একটী দ্বার ব্যতীত অপর কিছু নয়ন-গোচর হয় না। দ্বার সকলও সর্ব্বদা ভিতর হইতে আবদ্ধ থাকে।

চীনদিগের বৈঠকখানা-গৃহ নানাবিধ কাষ্ঠাসনে সুন্দররূপে সজ্জিত। গৃহের ভিতর দেওয়ালের গাত্রে পটের ন্যায় চিত্র-বিচিত্রভাবে লিখিত ধর্ম্মগ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত বচনগুলি চারিদিকে শোভা পাইতেছে। চীনদিগের শয়ন-খট্টা অনেকাংশে ইউরোপীয়দিগের ন্যায় হইলেও, শয্যার ভাব ভারতবর্ষীয়দিগের মত; কেবল বালিসগুলি বংশ-খণ্ডে বিনির্ম্মিত।

চীনেরা অতি সুন্দর সুন্দর লণ্ঠন প্রস্তুত করে। এই সকল লণ্ঠন, কাচ, রেশম, কাগজ, শৃঙ্গ প্রভৃতি নানা দ্রব্যে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এক-একটী চীন-দেশীয় লণ্ঠনের মূল্য ৭০০৲টাকা পর্য্যন্তও হইয়া থাকে। ইহাতে চীনদিগের শিল্প-নৈপুণ্যের প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়।

রাজা রামমোহন রায় বেদ জানিতেন কি না! *

রাজা রামমোহন রায়, ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৭এ সেপ্টেম্বর দেহত্যাগ করিয়াছেন। এত দিন পরে, একটা কথার মীমাংসা আবশ্যক হইয়াছে—রাজা রামমোহন রায় বেদ জানিতেন কি না?

তিনি, হিন্দু, খ্রীষ্টান ও মুসলমান এই তিন সম্প্রদায়ের সহিত বিচার করিয়াছিলেন। তিনি যখন যে ধর্ম্মাশ্রিত লোকের সহিত তর্ক-বিতর্কে প্রবৃত্ত থাকিতেন, তখন সেই ধর্ম্মাবলম্বী কর্ত্তৃক সম্মানিত গ্রন্থ হইতে প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া প্রতিপক্ষকে নিরুত্তর করিতেন। সুতরাং এই নিয়মে, তিনি, হিন্দুর সঙ্গে বিচার-কালে, হিন্দুর পরম পূজ্য বেদের দোহাই দিতেন। এই কথা, সকলেই না হউন, অনেকেই জ্ঞাত আছেন। তথাপি, উপযুক্ত সময় ও স্থান বুঝিয়া, প্রসঙ্গের অনুরোধে, এখানে তদ্বিষয়েরও একটি দৃষ্টান্ত দিলাম। তিনি 'তলবকার' উপনিষদের অনুবাদ-পুস্তকে লিখিয়াছেন,—

"সামবেদের 'তলবকার' উপনিষদের ভাষা-বিবরণ, ভগবান্ ভাষ্যকারের ব্যাখ্যানুসারে করা গেল। বেদেতে যে যে ব্যক্তির প্রামাণ্য জ্ঞান আছে, তাঁহারা ইহাকে মান্য এবং গ্রাহ্য অবশ্যই করিবেন; আর যাহার নিকট বেদ প্রমাণ নহেন, তাহার সহিত সুতরাং প্রয়োজন নাই।" (১)

পাঠক! লক্ষ্য করিয়া যাইবেন, বেদের প্রতি রামমোহন রায় মহোদয় কেমন নির্ভর করিতেন। আরও একটী কথা পাঠককে বুঝিয়া রাখিতে হইবে; রাজা 'উপনিষদ্'-শাস্ত্রকেই "বেদ" বলিয়া জানিতেন, সে কথাও এখানে দেখা গেল।

রাজা রামমোহন রায় স্বয়ং বেদে অজ্ঞ ছিলেন, কি তাহাতে প্রবীণ পণ্ডিত ছিলেন,—এ তত্ত্বের অনুসন্ধান, তাঁহার জীবদ্দশায়—এমন কি তাঁহার মরণের বহু পরেও, কেহই কিছুই লন নাই। তৎসম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ না হওয়াতেই, উহাতে কাহারও মনঃ-সংযোগ করিবার প্রয়োজন উপস্থিত হয় নাই। তবে বিদেশীয়ের মধ্যে কেবল ম্যাক্সমূলর্ সাহেব আভাষে বলিয়াছেন,—

"When Rammohan Roy was in London, he saw at the British Museum a young German scholar, Fredrich Rosen, busily engaged in copying Mss of the Rig-Veda. The Raja was surprised, but he told Rosen, that he ought not to waste his time on the Hymns, but that he should study the text of the Upanishads.

"Rosen, however, knew better. He published a specimen of the Hymns of the Rig-Veda in 1830." (2)

বাবু রামদাস সেন, সম্ভবতঃ নিজে কোন অনুসন্ধান না করিয়াই, উহার প্রতিধ্বনি-স্বরূপ প্রথমে 'বঙ্গদর্শনে' (৩) এবং তৎপরে তদীয় 'ঐতিহাসিক রহস্য' (৪) পুস্তকে লিখিয়াছেন,—

"মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ব্রিটিশ্ মিউসিয়মে অধ্যাপক রসেন্‌কে ঋগ্বেদ-সংহিতার প্রতিলিপি লইতে দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। তাহার পূর্ব্বে তিনি ঋগ্বেদ দর্শন করেন নাই।"

পাদরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্যও একবার রাজার বেদ-বিষয়িণী অনভিজ্ঞতার বিষয় উল্লেখ করিয়াছিলেন। (১)

এস্থলে আমরা সুস্পষ্টই বলিতেছি, উক্ত তিন ব্যক্তির কেহই কোন বিশ্বাস্য সুদৃঢ় প্রমাণ প্রয়োগ না করায়, আমরা তাঁহাদের উক্তির সত্যাসত্য-নির্ণয়ে ও সারবত্তা-প্রকাশে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। তখন, তাঁহাদের মধ্যে পাদরি কৃষ্ণমোহন বন্দ্য ও বাবু রামদাস সেনের মত খণ্ডিত করিয়া বলিয়াছিলাম, যিনি ভাষ্যের বিনা সাহায্যে বেদ-মন্ত্র ব্যাখ্যা করিতে পারিয়াছিলেন, তিনি কেন বেদজ্ঞ হইবেন না? আর, ইহার উত্তরে রামদাস বাবু বা বন্দ্য মহাশয় কোন কথাই বলিতে বা লিখিতে সাহসী হয়েন নাই। কাজেই, তাঁহারা তখন পরাজিত হয়েন; এবং রাজা রামমোহন রায় এক জন বেদজ্ঞ পণ্ডিত, ইহাই সাব্যস্থ হইয়া যায়। (৬)

এই অবস্থাতেই এত দিন কাটিয়া আসিয়াছে। তার পর, আর কাহারও মনে এমন কোন সন্দেহ স্থানই পায় নাই যে, রাজা রামমোহন রায় বেদ জানিতেন না। কিন্তু, এত কাল পরে, রাজার নিজের লিখিত এমন এক বিষয় দেখিতে পাইলাম যে, তাহাতে

* এই প্রবন্ধের যদি কেহ কোন প্রতিবাদ করিতে পারেন, তাহা সাদরে গৃহীত হইবে। কিন্তু প্রতিবাদ সংক্ষেপে, অথচ সার কথায় হওয়া আবশ্যক।

(১) রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী, ২য় সংস্করণ, ১৩১ পৃষ্ঠা।

(2) Biographical Essays, p. 39,

(৩) 'বঙ্গদর্শন', ১২৮০ সাল, অগ্রহায়ণ মাস, ৩৬০ পৃষ্ঠা, "বেদপ্রচার" প্রবন্ধ দেখ।

(৪) 'ঐতিহাসিক রহস্য', ১ম ভাগ, ১২২ পৃষ্ঠা, ১২৮৪ সাল।

(৫) 'জেনারেল এসেম্‌ব্লি' বিদ্যালয়ে, এক বক্তৃতায়।

(৬) বলা বাহুল্য, এই প্রবন্ধ-লেখকের সহিত তৎকালে ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বাবু রামদাস সেন মহাশয়-দ্বয়ের যে তর্ক-বিতর্ক চলিয়াছিল, এবং তৎকালে তাঁহারা যাহার কোনই প্রামাণ্য উত্তর দিতে পারেন নাই, সেই বিষয় অবলম্বন করিয়াই এই কয়েকটি ছত্র লেখা গেল।

নিঃসন্দেহ প্রমাণ হইল,—তিনি বেদ জানিতেন না।

তিনি যে সমগ্র বেদাধ্যয়ন করেন নাই, তাহার নিদর্শন তাঁহার পুস্তকেই জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। 'কবিতাকারের সহিত বিচার' পুস্তক হইতে তাহার প্রমাণ দেখান যাউক।

'কবিতাকার' আপত্তি করিয়া লিখিয়াছিলেন,—"বেদের প্রথম ভাগ না পড়িয়া বেদান্ত পড়িলে বিড়ম্বনা হয়।"

কিন্তু রামমোহন রায় উত্তরে জানাইলেন,—"বস্তুতঃ প্রথম ভাগ বেদের অধ্যয়ন কর্ত্তব্য, কিন্তু ইহাতে অসমর্থ ব্রাহ্মণদের গায়ত্রী ও রুদ্রোপস্থাপন এবং স্থর্য্যোপস্থাপন ও পুরুষসূক্ত ইহার অধ্যয়নকে প্রথম ভাগ বেদের অধ্যয়ন কহিয়াছেন। * * অতএব যাঁহারা গায়ত্র্যাদির অধ্যয়নবিশিষ্ট হয়েন, তাঁহাদের বেদান্ত-পাঠে বিড়ম্বনা কখনও হয় না।" (৭)

পাঠক! দেখুন, এখানকার পূর্ব্বোক্ত চেষ্টাতেই রাজার বেদজ্ঞত্বের একপ্রকার সন্ধান পাওয়া গেল।

রাজা রামমোহন রায় মহানুভবের সময়ে বঙ্গে বেদ-চর্চ্চা ছিল বলিয়াই, আমাদের প্রতীতি জন্মে না। তাঁহার সময়ে বঙ্গদেশে বেদ-সংহিতার বিশুদ্ধ প্রতিলিপিও যে অপ্রাপ্য ছিল, তাহা বলা বাহুল্য। তাহার এক অকাট্য প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই যে, সহমরণ-বিচার-কালে, তাঁহার প্রতিপক্ষেরা, ঋগ্বেদ-সংহিতা হইতে সহমরণের সপক্ষে যে ঋকটি বিচারার্থ গ্রহণ করেন, তাহা স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দনের 'শুদ্ধিতত্ত্বে' দৃষ্ট হয়। তাহাতে যে যে অশুদ্ধি রহিয়াছে, রাজা রামমোহন রায় মহোদয়ও সেই সেই অশুদ্ধি, বিনা শোধনে, গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার অর্থও স্থতরাং অশুদ্ধ রহিয়াছে, একথা নির্দ্দেশ করাই বাহুল্য। তদ্ভিন্ন, ঐ ঋক, সহমরণের অবিরুদ্ধ। উহা সহমরণের পোষক নয়। স্থতরাং উহাতে বিরুদ্ধ-মত পোষণ করিতেছে।

রাজা রামমোহন রায়-প্রণীত 'সহমরণ' পুস্তকের প্রথম খণ্ডে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে প্রবর্ত্তকের ও নিবর্ত্তকের কথোপকথন লিপিবদ্ধ আছে। 'প্রবর্ত্তক'—সহমরণ-রক্ষার পক্ষপাতী; আর 'নিবর্ত্তক'—তাহা উঠাইবার উদ্যোগী। নিম্নে রাজার পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়া আমাদের উক্তি সাব্যস্থ করিতেছি।

"প্রবর্ত্তক।—যে সকল মনু-স্মৃতি ও যাজ্ঞবল্ক্য ও শ্রুতি তুমি শাসন দিলে, তাহা প্রমাণ বটে; কিন্তু সহমরণ বিষয়ে যে এই ঋগ্বেদের শ্রুতি আছে, তাহা কি তুমি অপ্রমাণ করিতে পার? যথা,—

"ইমা নারীরবিধবা সুপত্নীরাঞ্জনেন
সর্পিষা সম্বিশন্ত্বনশ্রবা অনমীবা সুরত্না
আরোহন্তু যাময়ো যোনিমগ্নেঃ।" (৮)

রাজা রামমোহন রায়, নিবর্ত্তকের মুখ দিয়া, উহার প্রকৃত খণ্ডন না করাইয়া, কি বলিতেছেন, পাঠক দেখুন,—

"নিবর্ত্তক।—এই শ্রুতি এবং ঐ পূর্ব্বোক্ত হারীত প্রভৃতির স্মৃতি যাহা প্রমাণ দিতেছ, সে সকল সহমরণ ও অনুমরণের প্রশংসা এবং স্বর্গফল দ্বারা কামাবোধক হয়।" (৯)

রাজা রামমোহন রায়, নিষ্কাম ধর্ম্মের পক্ষপাতী বলিয়া আপনাকে পরিচিত করিতেন। সেইজন্যই তিনি নিষ্কাম ধর্ম্মের গুণ কীর্ত্তন করিয়া সহমরণকে সকাম ধর্ম্ম বলিয়া এখানে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন! ইহার আদ্যোপান্ত বৃত্তান্ত পাঠকগণ তাঁহার গ্রন্থে দেখিতে পাইবেন। পাঠক, আরও দেখিবেন, রাজা রামমোহন রায়, এই ঋকের বঙ্গানুবাদ দেন নাই। এই ঋকটি অশুদ্ধি-পূর্ণ। এই ভ্রান্তিসঙ্কুল ঋকই, রাজা বিনা শোধনে অবিকল উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে "যাময়ঃ" পদটি অসংলগ্ন, অর্থহীন। চলিত কথায় বলিতে গেলে, ঐ পদটি গোঁজামিল দেওয়া হইয়াছে। কেন না, ঐ পদ বজায় রাখিতে গেলে, অর্থ সঙ্গত হয় না। এইরূপ "অগ্নেঃ" প্রভৃতি অপর কয়েকটি পদও যে ভ্রমপূর্ণ, তাহার সবিশেষ বৃত্তান্তও যথাস্থানে লিখিত হইবে।

পাঠক, ঐ ঋকের বিশুদ্ধ পাঠ দেখুন,—

"ইমা নারীরবিধবাঃ সুপত্নীরাঞ্জনেন
সর্পিষা সম্পৃশন্তাম্। *
অনশ্রয়ো † অনমীবাঃ সুশেবাঃ ‡
আরোহন্তু জনয়ো যোনিমগ্রে॥" (১০)

ইহার প্রকৃত অর্থও এই,—

এই নারীগণ, বৈধব্য-যাতনা অনুভব না করিয়া, ঘৃত ও অঞ্জন-সহিত অনুরূপ পতি প্রাপ্ত হইয়া, উত্তম রত্ন ধারণ-পূর্ব্বক অগ্রে গৃহে সমাগত হউন।

পাঠক! দেখুন ইহা সহমরণের অনুকূল বিধি না হইয়া বরং প্রতিকূল বিধি হইতেছে। অর্থাৎ তখন সহমরণ প্রচলিত ছিল না, ঐ ঋকে ইহাই সিদ্ধান্ত হইতেছে।

তবে এখন একটা কথা উঠিতে পারে, আমরা যে বাঙ্গলা অনুবাদ দিলাম, তাহা প্রকৃত, কি আমাদের স্বকপোল-প্রসূত! স্থতরাং এক্ষণে, তাহাও দেখাইবার নিমিত্ত, আমরা হিন্দু অহিন্দু তাবৎ ব্যক্তির শ্রদ্ধেয় সায়ণাচার্য্য মহোদয়ের রচিত বেদ-ভাষ্য হইতেই উহার অর্থ কিরূপ, তাহা দেখাইতেছি। উক্ত ঋকের ভাষ্য এইরূপ,—

'ইমা নারীঃ' এতাঃ স্ত্রিয়ঃ, 'অবিধবাঃ' বৈধব্যরহিতাঃ, 'স্থপত্নীঃ' শোভনপতিযুক্তাঃ সত্যঃ, 'আঞ্জনেন' অঞ্জন-হেতুনা, 'সর্পিষা' 'সম্পৃশন্তাম্' চক্ষুষী সংস্পৃশন্ত। 'অনশ্রয়ঃ' অশ্রুরহিতাঃ, 'অনমীবাঃ' রোগরহিতাঃ, 'স্থশেবাঃ' সুষ্ঠু সেবিতুং যোগ্যাঃ, 'জনয়ঃ' জায়াঃ, 'অগ্রে' ইতঃপরং, 'যোনিম্' স্বস্থানম্, 'আরোহন্তু' প্রাপ্নুবন্তু।

[পাঠকগণের বুঝিবার জন্য মূলের পদগুলি উদ্ধৃতি-চিহ্ন দিয়াই লেখা হইল।]

উহার পরবর্ত্তী ঋক্ দেখ, তাহাতেও আমাদের কথা অলীক বোধ না হইয়া বরং তাহা দৃঢ়তর হইবে। অর্থাৎ বেদে সহমরণের প্রসঙ্গ থাকা দূরে থাকুক, তাহার বিপরীত ব্যবস্থা নির্দ্দেশিত রহিয়াছে।

"উদীর্ষ্ব নার্য্যভি জীবলোকম্গিতাসু-
মেতমুপশেষ এহি।
হস্তাগ্রাভস্য দিধিষোস্তবেদং পত্যু-
র্জনিত্বমভিসম্বভূব॥" (১১)

ইহার বঙ্গানুবাদ করিবার পূর্ব্বে পূজ্যপাদ সায়ণাচার্য্যের ভাষ্য উদ্ধৃত করা আবশ্যক। তৎপরে অনুবাদ পাঠ করিলেই পাঠকের হৃদ্গম্য হইবে যে, আমাদের কৃত ভাষান্তর, ভাষ্যানুযায়ী, কি আমাদের মনঃ-কল্পিত। এস্থলেও পাঠকবর্গের বুঝিবার স্থবিধার জন্য মূলের পাঠে উদ্ধৃতি-চিহ্ন দেওয়া হইল। যথা,—

হে 'নারি' ত্বং 'ইতাসুং' গতপ্রাণং 'এতং' পতিং, 'উপশেষে' উপেত্য শয়নং করোষি। 'উদীর্ষ্ব' অস্মাৎ পতিসমীপাৎ উত্তিষ্ঠ, 'জীবলোকমভি' জীবন্তং প্রাণিসমূহং অভিলক্ষ্য 'এহি' আগচ্ছ। 'ত্বং' 'হস্তাগ্রাভস্য' পাণিগ্রাহবতঃ 'দিধিষোঃ' পুনর্বিবাহেচ্ছোঃ 'পত্যুঃ' এতৎ 'জনিত্বং' জায়াত্বং 'অভিসংবভুব' * অভিমুখ্যেন সম্যক্ প্রাপ্নুহি।

(৭) গ্রন্থাবলী, ৬৫৭ পৃষ্ঠা দেখ।

(৮) রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী, ১৭১ পৃষ্ঠা।
(৯) ঐ ঐ, দেখ।

* "সম্পৃশন্তাম্" পদের পাঠান্তর 'সংবিশন্তু'।
† "অনশ্রবঃ" পাঠান্তর।
‡ "সুরত্নাঃ" পাঠান্তর।
(১০) কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় আরণ্যক, ৬ প্রপাঠক, ১ অনুবাক, ও ঋগ্বেদ-সংহিতা, ১০ মণ্ডল, ১৮ সূক্ত, ৭ ঋক দেখ।

(১১) ঋগ্বেদ, ১০ ম, ১৮ সূক্ত, ৮ ঋক।
* 'অভিসংবভূব' পরিবর্ত্তে 'অভিসংবভূথ' পাঠান্তর আছে।

এখন, পাঠক, অনুবাদ পাঠ করিয়া দেখুন।

হে নারী ! তুমি মৃতের সমীপে শয়ান রহিয়াছ, উঠ। জীবিত লোকের নিকট এস। বিবাহেচ্ছু ও গর্ভাধানকারী পতির পত্নী হও।

এই ঋক, কেবল ঋগ্বেদ-সংহিতায় নয়, যজুঃসংহিতায় ও অথর্ব্ব-সংহিতায়ও আছে।

এখন পাঠক, বুঝিলেন,—সহমরণ বেদের অনুমোদিত কি না ! তবে হিন্দু পাঠক, এইমাত্র বলিতে পারেন, যে বেদশাস্ত্র, যুগ যুগান্তর ব্যাপিয়া মহর্ষিগণ ও তাঁহাদের শিষ্য-প্রশিষ্য-পরম্পরার মুখেমুখেই ছিল, এবং ঐ কারণেই যে বেদের নাম শ্রুতি-শাস্ত্র হইয়াছে, সেই বেদশাস্ত্র যে যথাবৎ চলিয়া আসিয়াছে, তাহার প্রমাণ কি ? যে যে অংশ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে সহমরণ-বিধি ছিল। বাস্তবিকও ইহা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। তবে এক্ষেত্রে এইমাত্র বলিতে পারি, লুপ্তাবশিষ্ট যে বেদ এখন আমরা পাইতেছি, অন্ততঃ তাহাতে সহমরণের কথা নাই।

যাই হউক, এখন সে তর্কের সময় নহে। এক্ষণে যে বিষয়ের আলোচনা করিতেছি, পাঠক, তাহাই দেখুন। অতঃপর রাজা রামমোহন রায় মহোদয় যে বেদ জানিতেন না, তাহারই প্রমাণ একে একে আরও বিশদ করিয়া দেখাইতেছি। যথা ;—

১। তাঁহার উদ্ধৃত ঋকে যে সকল অবিশুদ্ধ শব্দ আছে, তাহার তলিকাও এই,—

অশুদ্ধ পদ।	শুদ্ধ পদ।
(ক) নারীরবিধবা	(ক) নারীরবিধবাঃ
(খ) অনশ্রবা	(খ) অনশ্রবঃ
(গ) যাময়ঃ	(গ) জনয়ঃ
(ঘ) অগ্নেঃ	(ঘ) অগ্রে

২। উদ্ধৃত ঋকটি, কোন্ অধ্যায়ের অন্তর্গত, কোন্ ঋক, তিনি তাহা জানিতেন না। জানিলে, সে স্থলে বলিয়া দিতেন।

৩। ঐ ঋকের অর্থ, বাঙ্গালায় করেন নাই। যদিও ইংরেজিতে কিছু পরে ভাষান্তরিত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তদ্দ্বারাই আবার তাঁহার অনভিজ্ঞতার পরিচয় করিয়া দিতেছে।

৪। তাঁহার অজ্ঞতা যথার্থ কি না, উপরি উক্ত ৪ চারিটি অশুদ্ধ শব্দ তাহা দ্বিগুণ দৃঢ় করিয়া দিতেছে।

৫। অভিজ্ঞতা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার জ্ঞান বাড়িয়াছিল বটে, তাহাও এখানে গোপন রাখিতে কামনা করি না। তিনি সহমরণের শেষ পুস্তকে কি বলিয়াছিলেন, পাঠকগণ তাহাও অনুধাবন করিয়া দেখুন।

১৭৫১ শকে (১২৩৬ সালে) তিনি সহমরণ-বিষয়ক তৃতীয় (বাঙ্গালা-রচিত শেষ) পুস্তক লিখিয়াছিলেন। তাহাতে আপত্তি-কারক, রাজা রামমোহনকে জানাইতেছেন,—"সহমরণ বিষয়ে ঋগ্বেদে মন্ত্র আছে।"

কিন্তু রাজা রামমোহন ইহার উত্তরে বলিতেছেন,—

" 'ইমা নারীরবিধবা' ইত্যাদি মন্ত্রে সহমরণের বিধি নাই ; সে কেবল পুরোবর্ত্তী নারীদের অগ্নিক্রিয়াবাদ মাত্র, কিন্তু কামনা-পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ নিষেধে উত্তর কাণ্ডীয় স্মৃতি আছে।" (১২)

পাঠক দেখিলেন, ঐ মন্ত্র "নারীদের অগ্নিক্রিয়া বাদ" বলিয়া ১২৩৬ সালেও তাঁহার সংস্কার ছিল।

১৮৩০ খৃষ্টাব্দেও তাঁহার ঐ ভ্রান্তিই বলবতী থাকার নিদর্শন এই,—

"Oh fire, let these women, with clarified butter, eyes coloured with collyrium and void of tears enter thee, the parent of water, that they may not be seperated from their husbands themselves sinless and jewels amongst women." (13)

(১২) রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী, ২১[illegible] পৃষ্ঠা।

(13) English works of Rammohan Roy, P. 351.

এইখানে রাজার এক কলঙ্ক অপনোদন করা যাউক। অনেকে বলেন, কোলব্রুকের উপর নির্ভর করাতেই তাঁহার উক্ত ভ্রম হইয়াছিল। উভয়ের ভাষার ও অনুবাদের কত অন্তর, পাঠক, পশ্চাৎ উদ্ধৃত অংশে দৃষ্টিপাত করিলেই জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

কোলব্রুকের অনুবাদ এই,—

"Om ! let those women not to be widowed good wives adorned with colly-riams holding clarified butter, consign themselves to the fire Immortal, not childless not husbandless will adorn in the gems let them pass into the fire whose original element is water." (14)

নিরপেক্ষ পাঠক মহোদয়গণ ! এখন, বোধ হয়, আর আপনাদের বুঝিতে বাকী রহিল না যে,—রাজা রামমোহন রায় মহোদয় বেদ জানিতেন না ; অথচ তিনি যে বেদের দোহাই দিতেও ছাড়িতেন না, তাহাও আপনারা দেখিয়াছেন। এখন, রাজা রামমোহন রায় মহোদয়ের মতাবলম্বী ব্যক্তিগণ এবং অপর সাধারণ যাঁহারা বড়াই করিয়া বেড়ান যে, রাজা রামমোহন রায় একজন অদ্বিতীয় বেদ-পারদর্শী ছিলেন, তাঁহারাও অবাক্ হইয়া থাকুন।

কবিতা ও গান।

নীতি-কবিতা।

১। অসূয়া।

অল্পমতি লোকে কোন হেতুবশে যাঁরে।
ঘৃণা করে, হেরে যদি গুণাধার তাঁরে॥
গুণের অস্তিতা তাঁর না করে স্বীকার।
নেত্র যদি জ্যোতি তাঁর হেরে অন্ধকার॥
কিন্তু তায় গুণ তাঁর অগুণ না হয়।
রবি কি অরবি হয় যদি কেহ কয়॥
যে কয়, অপরে জানে উন্মাদী তাহারে।
রোষে সে তারে, সে গুণে প্রশংসে যাহারে॥
রাখে যদি মনোভাব মনে সে গোপন।
এড়াতে না পারে চিত্ত-বিকারে কখন॥
অপাঙ্গ-প্রবিষ্ট রজঃ-কণিকায় যথা।
চক্ষুর বিকার ঘটে না হয় অন্যথা॥
তথা যদি মনে দুষ্ট ভাবাবেশ পশে।
অবশ্য জনমে তার বিকার মানসে॥
বিকার মনের হেথা অন্ধতার নাম।
অন্ধতায় অন্ধতার বৃদ্ধি অবিরাম॥
আগে দূর দৃশ্য স্পষ্ট নাহি হেরে যেই।
অস্পষ্ট নিকট দৃশ্য ক্রমে হেরে সেই॥
ভালবাসে যার গুণ কালে গুণ তার।
অগুণের সম হেরে নিষ্প্রভ অসার॥
স্বজন-বিচ্ছেদ ইথে অসম্ভব নয়॥
গুণের নিহ্নব কার হৃদে নাহি সয়॥

২। পর-গৌরব-নাশ।

পরের গৌরব লোপ করিয়া যে জন।
আপনার গৌরবের করে সংবর্দ্ধন॥
পরধন হরি যে বাড়ায় নিজ-ধন।
উপমার স্থল তার নিশ্চয় সে জন॥
পরধন হরণ অকার্য্য যদি হয়।
পরের গৌরব নাশ কার্য্য কভু নয়॥
সদোষ গৌরব যার তাহার গৌরব।
সদোষ বিনাশে যদি, বহে আদীনব॥
দোষের বিনাশে কোন দোষের আশ্রয়।
নহে কভু সুবুদ্ধির সম্মত নিশ্চয়॥
জগতের দোষ-মল নাহি ঘুচে তায়।
এক যায়, আর হয়, তরঙ্গের প্রায়॥

৩। উৎসাহ।

উৎসাহের বশে যে কার্য্যের উপক্রম।
বুদ্ধির প্রয়োগ তায় না হয় উত্তম॥
পদে পদে ঘটে ভ্রম প্রমাদ নিশ্চয়।
সুনিপুণরূপে কার্য্য নিষ্পত্তি না হয়॥
উপক্রমে যে কার্য্য-উৎকর্ষে মন সরে।
অসম্ভব নয় তায় ক্ষোভ তার পরে॥

(14) Vide Asiatic Researches, vol. IV. Pages 209, 219, Calcutta 1795.

উৎসাহ-বেগের কালে শুভ-বুদ্ধিজন।
ধৈর্য্য ধরেন মনে করিয়া যতন॥
অনন্তর সুবুদ্ধির প্রয়োগ করিয়া।
শুভাশুভ ভাল মতে দেখেন ভাবিয়া॥
শুভ হলে কার্য্য, হয়ে, সুবুদ্ধির বশ।
করেন নিষ্পন্ন তাহা হয় হিত যশ॥
উৎসাহ-প্রকৃতি ইথে নাহি পায় মাশ।
প্রিয়কার্য্যে হয় তার অবশ্য বিকাশ॥
উৎসাহেতে কার্য্যের প্রিয়তা নাহি হয়।
উৎসাহের বীজ কার্য্যপ্রিয়তা নিশ্চয়॥

৪। লোক-স্বভাব-বিশেষ।

যে কার্য্য দশের কিন্তু শক্ত একজন।
অনায়াসে করিতে তাহার সম্পাদন॥
যদ্যপি দশেই হয় বিনম্র উদার।
প্রত্যেকে করিতে তাহা হয় আগুসার।
অথবা দশেই যদি বিপরীত হয়।
প্রত্যেকেই করে পরে নিদেশ নিশ্চয়॥
হৃদয়ের প্রতিকার নাহি চায় কেহ।
অনাত্ম কলহ ঘটে লুপ্ত হয় স্নেহ॥
বিনম্র উদার যদি হয় একজনে।
নিরোজ্য তা ঘটে তার অসঙ্গ-বর্জনে॥

* * *

বিবেক-সঙ্গীত।

(রামপ্রসাদী সুর।)

মন! কারে বল-রে আপন?
(ওরে) সংসার সব নিশির স্বপন।
(ওরে) দিবানিশি মিশামিশি
বিষয়ে ভুলেছ আপন।
কাঞ্চন ফেলিয়ে এবে,
কাচ নিয়ে কাল কর্‌ছো যাপন।
(ওরে) সমন-বণিকে দেখ,
সাজায়েছে কেমন্ আপণ।
(ওরে,) প্রাণ নিয়ে বেচা-কেনা,
ধর্ম্মতুলে কর্‌ছে মাপন।
অহরহ ক্রয় করে,
মান্দা কিরে পড়ে কখন?
যেদিকে নয়ন পড়ে,
তাহাকেই ধরে তখন।
(ওরে) এক বৃক্ষে বহু পাখী
থাকি চ'লে যায়-রে যেমন।
বন্ধু-বান্ধবাদি ভবে,
সবে যাচ্ছে দেখ্‌না কেমন।
(ওরে) দেখে শুনে দিবানিশি,
তবু কেন কর এমন?
(ওরে) নয়ন থাকিতে অন্ধ,
অতি মন্দ হয়রে যেমন।
(এখন) ধর্ম্মরূপ রত্ন-ভারে,
আত্মভারে ভারত্ব এমন।
(যেন) ধর্ম্ম-রাজের ধর্ম্মতুলে
আর কেহ না হয় রে তেমন।
হেরিলে রত্ন-ভূষিত,
যত্ন করবে সেই মহাজন।
তাই বলি, রোহিণী!
সদা গুরুপদ কর ভজন।

গোলক-ধাঁধা।

(সত্যঘটনা-মূলক প্রশ্ন গল্প)

(১)

"আর কেন ভাই, চিনি-চি—চিনি-চি!"

কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রনাথ তখনও পিছন-দিক হইতে প্রমদার চক্ষু ধরিয়া রহিলেন। প্রমদা আবারও হাসিতে হাসিতে বলিল,—"আর কেন ভাই, চিনি-চি—চিনি-চি! কেন আর চোখ ধর—নগেন!"

জ্ঞানেন্দ্রনাথ তদ্দণ্ডেই অমনি চক্ষুর্দ্বয় ছাড়িয়া দিলেন; সঙ্গে সঙ্গে একটী দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়াই মনেমনে বলিলেন,—"ওঃ!" পরক্ষণেই অমনি ত্বরিত-পদে সে ঘর হইতে প্রস্থান করিলেন।

প্রমদা বলিতেছিল,—"তুমি!—" কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রনাথ তাহা আরনা শুনিয়াই চলিয়া গেলেন। প্রমদা তাঁহাকে ফিরাইবার জন্য

কতকদূর অগ্রসর হইয়াই দেখিল—তাহার সম্মুখেই এক বাধা—তাহার শ্বশুর-মহাশয় উপরে উঠিতেছিলেন; সুতরাং লজ্জায় নতমুখ হইয়া, অবগুণ্ঠন টানিয়া, তাহাকে ফিরিয়া আসিতে হইল। স্বামী সিড়ি দিয়া তর্‌তর্ করিয়া নীচেয় নামিয়া গেলেন।

(২)

"ঐ দেখ—ঐ দেখ, মই দিয়ে ছাদে উঠ্‌ছে!"—বিমলা, জ্ঞানেন্দ্রনাথের কোলের কাছে বসিয়া, তাহার ঘরের জানালার ফাক দিয়া, অঙ্গুলি নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক দেখাইতেছে,—"ঐ দেখ—ঐ দেখ—ঐ মই দিয়ে ছাদে উঠ্‌ছে!"

জ্ঞানেন্দ্রনাথও একদৃষ্টে অমনি তাকাইয়া দেখিতেছেন। বিমলা, সুযোগ বুঝিয়া, আবারও বলিতেছে,—"আমি কি আর মিথ্যে বলি? আমি প্রায়ই দেখে থাকি, তাই-ই বলি! তবে সম্পর্কটা খারাপ, তাইতে তুমি যা' মনে কর! কিন্তু এখন তো আর কিছু বল্‌বার যো নেই—এখন তো সব চাক্ষুষ দেখ্‌লে!"

জ্ঞানেন্দ্রনাথ কাজেই নিরুত্তর। এতদিন বিমলার সঙ্গে কতই তর্কবিতর্ক করিতেন—কথাটা বিদ্রূপ করিয়া উড়াইয়া দিতেন; কিন্তু আজ যে এ চাক্ষুষ ঘটনা! তিনি মনে মনে আপনাকে ধিক্কার দিয়া ভাবিতে লাগিলেন,—"হায়, এতদিন আমি পিশাচীর মায়ায় মুগ্ধ ছিলাম। ধিক—ধিক আমাকে!" পরক্ষণেই, মনের আবেগ আর সহ্য করিতে না পারিয়া, বলিলেন,—"বিমলা!—বিমলা!—ধিক আমাকে! এতদিন যদি আমি তোমার কথায় বিশ্বাস কর্‌তেম, তা'হলে আমাকে আর এ পাপ নরকের পথে এতদূর অগ্রসর হ'তে হ'ত না! হায়, এতদিন আমি দুধ-কলা দিয়ে কি কাল-নাগিনীকে পুষ্‌লেম! দেবী-জ্ঞানে পিশাচী-প্রেতিনীর সেবায় কাল কাটালেম! বিমলা!—বিমলা! এখন আর এর উপায় কি? আমার ইচ্ছে কর্‌ছে, আমি এখনি গিয়ে ওকে খুন করে ফেলে মনের এই নরক-যাতনা থেকে অব্যাহতি লাভ করি!" এই বলিতে বলিতে, জ্ঞানেন্দ্রনাথ সজোরে, উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

বিমলা, আর সে পাপময় দৃশ্য জ্ঞানেন্দ্রনাথের চক্ষে পতিত হইয়া তাঁহাকে অধিকতর অনুতাপিত না করে—যেন এইজন্যই, তৎক্ষণাৎ সেই জানালাটা বন্ধ করিয়া দিল; এবং ক্ষিপ্র-হস্তে অমনি তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিল। পরক্ষণেই মৃদুস্বরে, কম্পিতকণ্ঠে দুঃখের ভাব প্রকাশ করিয়া, বলিতে লাগিল,—"এখন উতলা হ'বার সময় নয়! এখনও আমার কথা শোন! আমি যা বলি, তা' শুন্‌লে, এখনও উপায় হ'তে পারে। এতদিন শোন-নি ব'লেই তো এতদূর হয়েছে!"

জ্ঞানেন্দ্রনাথ, দারুণ মর্ম্ম-বেদনায় অস্থির হইয়া, বলিলেন,—"বিমলা! আর যে শুন্‌বার সময় নেই!"

"সময় আছে—অস্থির হ'য়ো না। অস্থির হ'লে কোনই কাজ হ'বে না। এখনও আমার পরামর্শ শোন—অবশ্যই ফল পাওয়া যাবে।—"

এই বলিতে বলিতে, হস্ত ধরিয়া, বিমলা, আবার তাঁহাকে বসাইল। জ্ঞানেন্দ্রনাথ, রাগে গস্‌গস্ করিতে লাগিলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—"প্রমদা—পিশাচী!"

(৩)

স্বর্গীয় দ্বিজরাজ বসু-মহাশয়, অতুল সম্পত্তি রাখিয়া, পরলোক-গমন করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁহার সেই অতুল ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী—তাঁহার একমাত্র পুত্র নগেন্দ্রনাথ। বড়-লোকের ছেলে, কচি বয়সে, পিতার সম্পত্তি-রাশী প্রাপ্ত হইলে, সাধারণতঃই যেরূপ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়ে, নগেন্দ্রনাথের এক্ষণে সেই অবস্থা। নগেন্দ্রনাথ, রাত্রেতে বাড়ী আসেন না; বিষয়-কর্ম্মের প্রতি তাঁহার লক্ষ্য নাই; অষ্টপ্রহরই কেবল 'সেখানে' পড়িয়া আছেন। কেবল সময়ে সময়ে পয়সা-কড়ির আবশ্যক হইলে, এক-আধদিন বাড়ী আসেন মাত্র; নহিলে তাঁহাকে আর পায় কে?

আহা, তাঁহার স্ত্রী—বালিকা নগেন্দ্রবালা—তাঁহার বিহনে—তাহারই বা কি কষ্ট! বালিকা এখনও সংসার-রঙ্গ বুঝিবার অবসর পায় নাই—এ কোমল বয়সে সংসারের বিষম কূটজাল ভেদ করিবে, তাহার সাধ্য কি? পরিপক্ক বয়সেই মানুষ যখন সে রহস্য সম্যক উপলব্ধি করিতে পারে না, তখন কোরক-কোমল বালিকা তাহার কি বুঝিবে? তাই তার চোখে—সদাই বির হের অশ্রুজল; তাই সে সদাই হতাশে কাঁদিয়া আকুল। নগেন্দ্রনাথ তা'র দিকে একবার ফিরেও চাহেন না; সে কত বিনয় করিয়া—কাঁদিয়া বলে,—"তুমি যেওনা!" কিন্তু, হায়, তা শোনে কে?

নগেন্দ্রনাথের বাড়ীর পাশেই জ্ঞানেন্দ্রনাথের বাড়ী। দুই বাড়ীই গায়ে-গায়ে। দুইটি বাড়ীরই কতকাংশ ত্রিতল এবং কতকটা দ্বিতল। তার মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রনাথদের বাড়ীটা সেকেলে ধরণের—কতকটা নীচু-নীচু; আর, নগেন্দ্রনাথদের বাড়ীটা বেশ খোল্‌তা—উঁচু-তেও বড়। এমন কি, জ্ঞানেন্দ্রনাথদের বাড়ীর দোতালার ছাদের উপর দাঁড়াইলে, নগেন্দ্রনাথদের ছাদ আরও প্রায় তিন চারি হাত অধিক উঁচু বলিয়া বোধ হয়। যদিও দুইটি বাড়ীই পরস্পর সংলগ্ন, তথাপি এছাদ হইতে ওছাদে যাইবার যো নাই। বিশেষ, অনেক কালের কথা, সামান্য একটু জমি-জিরাৎ লইয়া, নগেন্দ্রনাথের পিতায় ও জ্ঞানেন্দ্রনাথের পিতায় কি একটা দ্বন্দ্ব-কলহ হওয়ায়, পরস্পর পরস্পরের বাড়ীতে যাওয়া-আসার পাট অনেক দিন হইতেই, উঠিয়া গিয়াছে।

কিন্তু, আজ বিমলা, জ্ঞানেন্দ্রনাথকে দেখাইল, রাত্রি দু'পুরের সময়, একখানি মই লাগাইয়া, একটি স্ত্রীলোক, তাঁহাদের ছাদ হইতে নগেন্দ্রনাথদের ছাদে উঠিতেছে। বলা বাহুল্য, তেতালার ঘরের জানালা দিয়া জ্ঞানেন্দ্রনাথ এই ব্যাপার দেখিতে পাইলেন।

চাক্ষুস এ ঘটনা দেখিয়া, জ্ঞানেন্দ্রনাথ আর বাস্তবিকই স্থির থাকেন কি করিয়া?

(৪)

পরদিন জ্ঞানেন্দ্রনাথের মনটা এতই খারাপ হইয়া রহিল যে, তিনি আর দিনমানের মধ্যে বিমলার ঘর হইতে বাহির হইলেন না। বিষাদে, মনোক্ষোভে, সমস্ত দিনই তাঁহার অতি কষ্টে কাটিয়া গেল। পিতা ডাকিলেন,—"জ্ঞানেন্দ্র, ভাত খাবে এস!" কিন্তু, জ্ঞানেন্দ্রনাথ উত্তর দিলেন,—"শরীরটা একমন কেমন কর্‌ছে; আজ আর খাবো-না।" যাইহোক, অনেক করিয়া, সন্ধ্যার সময়, বিমলা, জ্ঞানেন্দ্রনাথকে একটু জল খাওয়াইতে পারিয়াছিল।

তারপর—আবার রাত্রিতে। জ্ঞানেন্দ্রনাথ আজ প্রমদাকে হাতে-হাতে ধরিবেন—এমনই যোগাড়-যন্ত্র করিয়া রাখিয়াছেন। আর, ধরিতে পারিলে, প্রমদাকে যে তখনই টুক্‌রা-টুক্‌রা করিয়া ফেলিবেন, এমনই তাঁর মনের রাগ!

কিন্তু, হায়, ঘটনাও বুঝি তাই ঘটে! প্রমদা ছাদের একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিলেন—কি জানি কাহার প্রতীক্ষায় যেন পথপানে চাহিয়া ছিলেন। এমন সময়, পিছন হইতে, আর মনোবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া, জ্ঞানেন্দ্রনাথ নিদারুণ রোষভরে বলিয়া উঠিলেন,—"পাপিনী—পিশাচী!"

প্রমদা অমনি হঠাৎ চমকিয়া কাঁদিয়া ফেলিল; বলিল,—"স্বামী! আমায় ক্ষমা করুন—আমি আপনার চরণে কি অপরাধে——"

কিন্তু, জ্ঞানেন্দ্রনাথ আর শুনিতে পারিলেন না। অমনি দৌড়িতে দৌড়িতে আসিয়া—প্রমদার প্রতি লক্ষ্য করিয়া—তিনি সজোরে এক লাথি মারিলেন। "মা গো!"—বলিয়া হতভাগিনী প্রমদা সেইখানেই পড়িয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানেন্দ্রনাথ আবারও পদোত্তোলনের চেষ্টা করিতেছেন; এমন সময়, যেন উপর হইতে ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া, বিমলা তাঁহার হাত

চাপিয়া ধরিল। বলিল,—"ছি-ছি! কর কি? অত উতলা হ'লে চলে কি? এস—এস—উপরে এস! আমার কথা শোন!"

জ্ঞানেন্দ্রনাথকে ফিরিতে হইল। প্রমদাকে একেবারে খণ্ডবিখণ্ড করিবার ইচ্ছা থাকিলেও, বিমলার অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া, তাঁহাকে ফিরিতে হইল। জ্ঞানেন্দ্রনাথ রাগে গস্‌-গস্‌ করিতে করিতে বিমলার সঙ্গে চলিয়া আসিলেন। প্রমদা, সেইভাবে অনেকক্ষণই সেই ছাদের উপর পড়িয়া রহিল।

(৫)

দুই তিন দিন ধরিয়া বাড়ীতে বড়ই গণ্ডগোল। পিতা বলেন,—"আজই বেটীকে বাড়ী থেকে দূর ক'রে দেও—না হয় জ্ঞানেন্দ্রের আর একটা বিয়ে দেবো!"

কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রনাথের দয়াবতী জননী—কেবল তিনি তাহাতে বাধা দেন; বলেন,—"ছোট বউ যে সাক্ষাৎ মা-লক্ষ্মী! আমি ওকথা, নিজের চোখে দেখ্‌লেও, বিশ্বাস কর্‌তে পারি-নে!"

কিন্তু জ্ঞানেন্দ্র তাহাতে বলেন,—"বিশ্বাস না করেন, না করুন; আমি কিন্তু আর এ কালামুখ দেখাতে পারি-নে! আমি অবশেষে আত্মহত্যা হ'য়ে মর্‌বো!"

পিতা বলেন,—"আমি আগেই তো বলেছিলাম—বেটী ছোট-লোকের মেয়ে, ওকে নিয়ে ঘরকন্না করা কোন কালেই চল্‌বে না! নইলে, দেখ্‌লেই না, ওর বাপ-বেটা, পণের অবশিষ্ট সামান্য শতখানেক টাকার জন্য কিই না 'ফেরেব-বাজী' কর্‌লে! যাইহোক, ও বেটীকে আজই বাড়ী থেকে দূর ক'রে দেওয়া যাক। আমি আর কারু কথা শুন্‌চিনে। এমন সোনার-চাঁদ ছেলে আমার—বেটীর জন্যে ভেবে ভেবে হাড়-মাস-মাটি করে ফেলেছে—তবু তোমাদের সেদিকে চোখ নেই? যাইহোক, বাপু, তুমি ক্ষান্ত হও; আমি আজই বেটীকে এখনই বিনোর-মাকে দিয়ে চালান ক'রে দিচ্ছি। ভয় কি বাবা, আমি আবার তোমার বিয়ে দেব!"

জননী কাঁদিয়া বলেন,—"ছি-ছি, ও-কথা মুখে এন-না! অমন লক্ষ্মী মেয়ে—ওর প্রতি কি ওসব কথা ভাল দেখায়? আমি বল্‌ছি, ও নির্দ্দোষ; তোমরা ওর প্রতি অমন অত্যাচার ক'রো-না গো—ক'রো না!"

"আরে, রেখে-দে তোর তিট্‌কেল্‌মি! ওসব কিছুই শুন্‌চি-নে! অমন বউ কি আর ঘরে রাখতে আছে? তোদের জ্বালায় শেষে এক-ঘরে হ'তে হবে নাকি?"—কর্ত্তা, রুক্ষ-স্বরে এই বলিয়াই, গৃহিণীকে দু'-একটা গালিগালাজও দিয়া উঠিলেন।

পুত্র জ্ঞানেন্দ্রনাথেরও সেই ভাব—বাড়ীর অপরাপর সকলের মুখেও সেই একই কথা। সুতরাং একা গৃহিণীর কথায় আর কি হইবে?

এমন সময়, তায় আবার একি সোনায় সোহাগা! ডাকের পিওন বাড়ীতে একখানা চিঠি দিয়া গেল; আর, ঝি, সেই চিঠিখানা আনিয়া, জ্ঞানেন্দ্রনাথের হাতে প্রদান করিল। জ্ঞানেন্দ্রনাথ, শিরোনামা দেখিলেন—প্রমদার নামে; উপরে হস্তাক্ষরে লেখা আছে,—'বিষ্ণুপুর' অর্থাৎ প্রমদার বাপের বাড়ী হইতে। এমন সময়ই, তাঁহার পিতা বলিলেন,—"দেখই না, বেটীর বাপের বাড়ীর সংবাদই বা কি? কুল-মজানে বেটীকে তাহলে সেখানেই পাঠিয়ে দেওয়া যাক!"

জ্ঞানেন্দ্রনাথও অমনি, রোষভরে, পত্রখানি খুলিলেন। কিন্তু, খুলিয়াই, একি—কেন চমকিয়া উঠিলেন! "রাক্ষসী—রাক্ষসী! তুই আমাদের এমন পবিত্র কূলে কালি দিতে বসেছিস্‌!"—উদ্বেগ-ভরে, জ্ঞানেন্দ্রনাথ, হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিলেন; উন্মত্তের প্রায়, প্রমদাকে, পাপের সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিবার জন্য, উত্থিত হইলেন।

পিতা, বাধা দিয়া বলিলেন,—"বাছা, একটু

থাম—থাম! অত উতলা হ'য়ো-না! আমি যা হ'য় এর একটা প্রতিকার করছি।" এই বলিয়া, তিনি নিজে সেই পত্রখানি একবার হাতে লইলেন; কিন্তু, দেখিলেন—ওঃ! কি ভীষণ!—কি লোমহর্ষক! আস্তে আস্তে পড়িলেন,—

"প্রাণের প্রমদা

তোমার নির্য্যাতনের বিষয় শুনিয়া বড়ই মর্ম্মাহত হইলাম। কি করিব, উপায় নাই-—থাকিলে, এই দণ্ডেই তোমাকে মুক্ত করিতাম। কিন্তু, যাইহোক, আজ রাত্রে তুমি, যেরূপে হউক—হয় ছাদের মই দিয়া, নয় পাছ-দুয়ার দিয়া, নয় রান্নাঘরের ভাঙা জানালা দিয়া—বাহির হইয়া আসিবে। সর্ব্বত্রেই আমার লোক থাকিবে। একবার বাহির হইতে পারিলে আর ভাবনা———"

কর্ত্তা, আর পড়িতে পারিলেন না। ক্ষোভে, বিষাদে, ক্রোধে, তিনিও জ্ঞানেন্দ্রনাথের ন্যায় অস্থির হইয়া পড়িলেন। "বেটীকে বাড়ী থেকে দূর ক'রে দিয়ে, তবে জল-গ্রহণ করবো।"—সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের এমনই প্রতিজ্ঞা হইল।

গৃহিণী কাঁদিতে লাগিলেন। আর তাঁহার কোনই উত্তর নাই। হায়, তবে এখন উপায়?

(৬)

রমণী 'হাপুষ-নয়নে' কাঁদিতেছে। অপরিচিত দেশে, অপরিচিত বিকট দৃশ্যের মাঝখানে, অপরিচিত নূতন লোকের সহবাসে—হায়—আজ তাহার কি নিদারুণ যম-যন্ত্রণা! রুক্ষকেশ, ছিন্নবস্ত্র, জীর্ণদেহ—সে কাঁদিতে কাঁদিতে ধুলায় লুটাইতেছে। নয়নে স্পন্দন নাই, কর্ণ-শক্তি হ্রাস-প্রায়, মুখেও বাক্য সরে না! তবে যখন যন্ত্রণার একশেষ হইতেছে—আর সহ্য করিতে পারিতেছে না, তখন-মাত্র বলিতেছে,—"বিনোর-মা, ও-কথা আমায় আর ব'লো না! সব কষ্ট সইতে পারি, কিন্তু, বিনোর-মা, ও-কথায় প্রাণে বড়ই ব্যথা লাগে!" আহার নাই, নিদ্রা নাই, মুখ ফুটিয়া আর কোন কথাও নাই—কেবল বিনোর মা যেই 'সেই' কথা বলে, অমনি তাহার যন্ত্রণার বিদ্যুৎ-প্রবাহ ছুটিয়া যায়।

হতভাগিনীর দিন এরূপেই কাটিতেছে। মধ্যে মধ্যে কেবল, অন্তরাল হইতে শুনিলে, আর একটী কথা শুনা যায়—রমণী পাগলিনীর মত কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছে,—"নাথ! আমি কোন্ অপরাধে অপরাধিনী যে, আমায় এমন করিয়া এই প্রেতপুরে ফেলিয়া গেলেন!" রমণী এইরূপই আক্ষেপ করে, আর অবিরল-ধারায় কাঁদিতে থাকে।

বিনোর-মা মাঝে মাঝে বলে,—"কেন কাঁদ আর বাছা! তারা যখন তোমায় বাড়ী থেকে ভুলিয়ে এনে, বেশ্যার ঘরে ফেলে রেখে যেতে পারলে, তখন আর কেন তুমি তাদের নাম কর? ভাবনা কেন, তারা তোমার কেউ নেই-ই—"

"নেই ই" শুনে, রমণী আরও চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠে। বিনোর-মা, বাধা দিয়া বলিল,—"কেঁদে কেঁদে কেন শরীরটা পাত কর বাছা! আমরাও যখন এসেছিলেম, আমাদেরও তখন প্রথম প্রথম অমনিই কষ্ট হয়েছিল বটে; কিন্তু শেষ যখন বুঝলেম,—কেউই কিছু নয়—নিজের যাতে সুখ হয়, তারই তল্লাস করা ভাল; তখন হতেই সব ভুলেছি! আর, তাই-ই, দেখ দেখি, এখন কেমন সুখে আছি।"

প্রমদা আর সহিতে পারিল না; দারুণ [illegible]-স্বরে বলিল,—"বিনোর-মা, ওসব কথা শোনানর চেয়ে আমার গলায় কেন একটা পোঁচ বসিয়ে দেও-না! স্বামী অবশ্যই আমার কোন দোষ দেখেছিলেন—আর সে দোষের প্রায়শ্চিত্তই হয় তো এই-ই! তা' ব'লে, তুমি কেন আমায় অমনতর মর্ম্মজ্বালা দিচ্ছো! কেন বিনোর-মা, আমায় খেতে না দিলেও আমি বাঁচতে পারি, আমায় ধরে দু'-ঘা মারলেও তা' আমার সহ্য হয়; কিন্তু, বিনোর মা, ওসব পাপ কথা আমায় আর শুনিও-না! তাঁদের নিন্দার কথাও আমার কাছে আর বলোনা—ও নরকের পথেও আমায় আর টেন-না! বিনোর-মা, এর চেয়ে কষ্ট আর যে সইতে পারি-নে!"

প্রমদা ক্রমে অবসন্ন হইয়া পড়িল। বিনোর-মারও মনে তখন সন্দেহ জন্মিল,—"কেন তবে এমন হ'ল!"

এ যেন গোলক-ধাঁদা। ব্যাপার দেখিয়া, আমরাও চমকিত হইয়াছি—এখনও ভাবিয়া উঠিতে পারিতেছি না—"হায়! প্রমদার কেন এমন হ'লো!"

পাঠক! আপনারা যদি কেউ কিছু জেনে থাকেন—আমাদের বল্‌বেন কি,—কেন এমন হ'লো!

অনুসন্ধান

অনুসন্ধান-সমিতির পাক্ষিক পত্র।

৫ম খণ্ড } ৩১এ আষাঢ়, ১২৯৯। { ২৩শ সংখ্যা।

ভজনা-গীতি।

(মল্লার)

"ভজহুঁ রে মন, নন্দ-নন্দন,
অভয় চরণারবিন্দ রে।
দুলভ মানুষ-জনম, সৎসঙ্গে তরহ,
এ ভবসিন্ধু রে॥
শীত আতপ বাত, বরিখ, এদিন,
যামিনী জাগি রে।
বিফলে সেবিনু, কৃপণ দুরজন,
চপল সুখ সব লাগি রে॥
এ ধন যৌবন, পুত্র পরিজন,
ইথে কি আছে পরতীত রে।
কমল-দল-জল, জীবন টলমল,
ভজহুঁ হরিপদ নিত রে॥
শ্রবণ কীর্ত্তন, স্মরণ বন্দন,
পাদ সেবন দাস্য রে।
পূজন ধেয়ান, আত্মনিবেদন,
গোবিন্দদাস অভিলাষ রে॥"

* * *

তত্ত্ব-সঙ্গীত।

(রামপ্রসাদী সুর।)

মন! তুমি ধন চিন্‌লে নারে!
(বৃথা) ঘুরে গেলে ঝোপে-ঝারে!
(ওরে) যে ধন নয় চির-সম্বল,
সে ধনকে ধন বলে কেরে?
(তুমি) সদা তার সঞ্চয়ে রত,
পর হ'তেও আনছ কেড়ে।
(ওরে) যাহা বটে চিরস্থায়ী,
তার প্রতি ত চাওনা ফিরে।
(কথন) ক্ষণস্থায়ীর অস্থায়িত্ব,
তোর মনে জাগেনা কিরে?
(ওরে) আছে ধনরত্নরাজি,
সংসার-গিরিগহ্বরে।
হীরক-মণি-মাণিক্য,
বণিক বিনে চিন্তে নারে।
(ওরে) তাই বলি রত্ন-তত্ত্বজ্ঞ,
বণিক-জন সঙ্গ ধ'রে,—
কর ইতস্ততঃ অন্বেষণ,
অমূল্য ধন পাবে পরে।
(ওরে) সে'ধন তুলনে এ ধন,
তুচ্ছ ব'লে জ্ঞান হবে রে।
(পরে) নির্ম্মল পরমানন্দ-নীরে,
সদা ভাসিবে রে।
যত্ন কর মন! সে ধন চিন্তে,
এধন চিন্তে ছেড়ে দেরে।
(ওরে) যে ধন চিন্তে পারলে পরে,
নিধন চিন্তে থাকেনা রে।
(এ) জীবন চঞ্চল অতি,
দেখেও কি দেখনা রে।
(ওরে) থাকতে সময় হও সতর্ক,
কুতর্ক বিতর্ক ছেড়ে।
রোহিণী! সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ,
শ্রীগুরুর শ্রীপদ ধরে,—
(ওরে) মণি-রতন কর বাছনি,
সেই সে বণিক এ সংসারে।

পাপের অধিষ্ঠান কি ?

ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির এসম্বন্ধে মহাত্মা ভীষ্মদেবকে যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, এবং মহাত্মা ভীষ্মদেব তদুত্তরে যে সকল অমূল্য উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, আমরা নিম্নে তাহাই মহাভারতের শান্তিপর্ব্ব হইতে উদ্ধৃত করিলাম।

"যুধিষ্ঠির কহিলেন,—'হে ভরতশ্রেষ্ঠ! পাপের অধিষ্ঠান কি এবং যাহা হইতে পাপ প্রবর্ত্তিত হয়, আমি তাহাই প্রকৃতরূপে শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি।'

ভীষ্ম কহিলেন,—'হে নরনাথ! যাহা হইতে পাপ উৎপন্ন হয়, তাহা শ্রবণ কর। একমাত্র লোভ কেবল পুণ্যফল গ্রাস করিয়া থাকে; অতএব লোভ হইতেই পাপ প্রবর্ত্তিত হয়, এবং পাপের সহিত নিরতিশয় দুঃখ উৎপন্ন হইয়া থাকে। লোক লোভ-হেতু পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়, অতএব লোভই পাপের মূল কারণ। কাম, ক্রোধ, মোহ, মায়া, অভিমান, গর্ব্ব, পরাধীনতা, অক্ষমা, নির্লজ্জতা, শ্রীনাশ, ধর্ম্মহানি, চিন্তা ও অকীর্ত্তি প্রভৃতি সকলই লোভ হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। কৃপণতা, বৈষয়িক সুখে নিতান্ত তৃষ্ণা, কুকর্ম্মে প্রবৃত্তি, বংশ ও বিদ্যার অহঙ্কার, সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের অভিমান, সর্ব্বজীবের অনিষ্টাচরণ, সকলের প্রতি অসম্মান, অবিশ্বাস ও শঠতা প্রকাশ, পরস্ব-হরণ, পরনারী-গমন, বাচনিক ও মানসিক আবেগ, পরনিন্দা, ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্রতা, উদরম্ভরিতা, দারুণ নরক, বলবতী ঈর্ষা, দুর্জ্জয় মিথ্যা ব্যবহার, দুর্নিবার্য্য রসবেগ, দুঃসহ শ্রোত্রবেগ, কুৎসা, আত্মশ্লাঘা, মাৎসর্য্য, দুষ্করকারিতা এবং সমুদয় দুঃসাহসিক কার্য্য ও অকার্য্যের অনুষ্ঠান-জনিত পাপ, লোভ-বশতঃই প্রবর্ত্তিত হয়। মানবগণ, কি বাল্যে, কি কৌমারে, কি যৌবনে, সকল অবস্থাতেই লোভকে পরিত্যাগ করিতে পারে না; মনুষ্য জরাজীর্ণ হইলেও লোভ জীর্ণ হয় না। হে কুরুকুলধুরন্ধর নৃপবর! গভীর সলিল-সম্পন্ন স্রোতস্বতী-সমূহ দ্বারা সাগর যেমন পরিপূর্ণ হয় না, সেইরূপ নিয়ত ফলপ্রাপ্তি হইলেও লোভকে কখন পরিপূর্ণ করিতে পারা যায় না। যে লোভ, অর্থলাভ দ্বারা হৃষ্ট ও কামনা-সিদ্ধ হেতু পরিতৃপ্ত হয় না, দেব, গন্ধর্ব্ব, অসুর, উরগ ও সমস্ত জীবগণ যাহাকে প্রকৃতরূপে জানে না, সেই লোভকে মোহের সহিত জয় করা জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির উচিত। হে কৌরব! অবশেন্দ্রিয় লুব্ধ ব্যক্তিবর্গের দম্ভ, পরানিষ্ট, পরনিন্দা, পৈশুন্য ও মৎসরতা প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। যাঁহারা বহুল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বহুদর্শী ও সমস্ত সংশয়চ্ছেদে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারাও অল্পবুদ্ধি জনগণের ন্যায় লোভজালে জড়িত হইয়া ক্লেশ প্রাপ্ত হন। দ্বেষ ও ক্রোধে আসক্ত এবং শিষ্টাচার-বহিস্কৃত লুব্ধ ব্যক্তিগণ, তৃণাচ্ছন্ন কূপের ন্যায় অন্তরে ক্রূর ও বাক্যমাত্রে মধুর হইয়া থাকে। সেই ক্ষুদ্রাশয় জনগণ ধর্ম্মপ্রচারক হইয়া ধর্ম্মচ্ছলে অপরের অনিষ্ট করিয়া জগৎকে বঞ্চনা করিয়া থাকে—যে কোন উপায় অবলম্বন করিয়া বহুল পথ-প্রদর্শন এবং লোভাসক্ত হইয়া সৎপথ-সকল বিলুপ্ত করে। লোভগ্রস্ত দুরাত্মাদিগের অনুষ্ঠিত ধর্ম্মের যে যে অবস্থা অন্যথা হয়, তাহা তদ্রূপই প্রথিত হইয়া থাকে।

হে কুরুনন্দন! ক্রোধ, মদ, স্বপ্ন, হর্ষ, শোক ও অভিমান, লুব্ধবুদ্ধি ব্যক্তিবর্গকে আশ্রয় করিয়া থাকে। এই সমস্ত লোভ-সমন্বিত ব্যক্তিবর্গকে নিয়ত অশিষ্ট বলিয়া বিবেচনা কর। সম্প্রতি পবিত্রচরিত শিষ্টগণের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে ভারত! যাহাদিগের সংসারে পুনরাবৃত্তি ও নরক-ভয় নাই, প্রিয় ও অপ্রিয় বস্তুমাত্রে তুল্য-জ্ঞান, যাহারা বৈষয়িক সুখে আসক্ত নহে, শিষ্টাচার ও ইন্দ্রিয়দমন যাহাদিগকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে, সুখ ও দুঃখে যাহাদিগের সমভাব, সত্যই যাহাদের পরম

অবলম্বন, যাহারা দানশীল ও দয়াবান, অথচ অন্যের অর্থ গ্রহণে পরাঙ্মুখ, যাহারা পিতৃগণ, দেবগণ ও অতিথিগণের পরিতৃপ্তি-সাধনে সতত নিরত, সকলের উপকারক, ধীর ও সর্ব্ব ধর্ম্মপালক, যাহারা সর্ব্বভূত-হিতৈষী ও সাধারণের উপকার-সাধনে প্রাণদানে সমর্থ, সেই সমস্ত ধার্ম্মিক ব্যক্তিকে ধর্ম্ম পথ হইতে বিচলিত করিতে কাহারও সাধ্য নাই। পূর্ব্বে সাধুগণ যেরূপ আচরণ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের আচরণ, তাহা হইতে বিভিন্ন নহে। যাঁহারা সৎপথে অবস্থিতি করেন, তাঁহাদিগের ত্রাস নাই, তাঁহারা চপল ও উগ্রস্বভাব নহেন, কখন কাহারও হিংসা করেন না, সেই সকল ব্যক্তিকে সতত সেবা করা সাধুগণের কর্ত্তব্য। যাঁহারা নিষ্কাম, ক্রোধ-বিবর্জ্জিত, নির্ম্মম, নিরহঙ্কৃত, সুব্রত ও স্থির-মর্য্যাদা-সমন্বিত, তাঁহাদিগকে উপাসনা পূর্ব্বক তুমি ধর্ম্ম-জিজ্ঞাসা কর। হে যুধিষ্ঠির! ধন ও যশের জন্য তাঁহাদিগের ধর্ম্ম নহে। দেহধারণার্থ আহারাদির ন্যায় অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া তাঁহারা ধর্ম্মপালন করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের ভয় নাই, ক্রোধ নাই, চপলতা ও শোক নাই। তাঁহারা ধর্ম্মধ্বজী বা পাষণ্ড ধর্ম্মাবলম্বী নহেন। যাঁহাদিগের লোভ নাই, মোহ নাই, যাঁহারা সত্য ও সরলতা অবলম্বন করিয়া থাকেন, হে কুন্তীতনয়, তুমি তাঁহাদিগের প্রতি অনুরক্ত হও। যাঁহাদিগের সহিত আনুরক্তি হইলে পুনরায় তাহা স্খলিত হয় না, যাঁহারা লাভ হইলে হৃষ্ট এবং অলাভে অসন্তুষ্ট নহেন, সেই নির্ম্মম, নিরহঙ্কার, সত্ত্বগুণাবলম্বী, সমদর্শী, সৎপথাবস্থিত, স্থিরবিক্রম, বোধেচ্ছু ব্যক্তিগণের লাভালাভ, সুখদুঃখ, প্রিয়াপ্রিয় ও জীবন-মরণ, সকলই সমান। ভদ্র! তুমি ইন্দ্রিয়-নিগ্রহে নিরত ও অপ্রমত্ত হইয়া সেই ধর্ম্মপ্রিয় মহানুভবদিগকে সর্ব্বপ্রকারে সম্মান করিবে। লোকের বাক্য-সকল কখন দৈববশত গুণ-গৌরব-সমন্বিত হইয়া সম্পদের নিমিত্ত হয়, কখন বা তাহাই আবার বিপদের হেতু হইয়া উঠে।'

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—'হে পিতামহ! লোভই যে অনর্থের মূল, তাহা আপনি বলিলেন; এক্ষণে অজ্ঞান কাহাকে বলে, তাহা প্রকৃতরূপে শ্রবণ করিতে অভিলাষ করি।'

ভীষ্ম কহিলেন,—'যে ব্যক্তি অজ্ঞান-বশতঃ পাপাচরণ করে, সে যে, আপনার বিনাশ হইবে, তাহা জানিতে পারে না; সে সচ্চরিত্র ব্যক্তিবর্গকে দ্বেষ করিয়া লোকের নিকট নিন্দনীয় হয়। লোক অজ্ঞান-বশতঃ নরকগামী, দুর্গতি-ভাগী, ক্লেশবিশিষ্ট ও আপদাবিষ্ট হইয়া থাকে।'

যুধিষ্ঠির বলিলেন,'—এক্ষণে আমি অজ্ঞানের উৎপত্তি, স্থিতি, ক্ষয়, উদয়, মূল, যোগ, গতি-কারণ, কাল ও হেতু কি, তাহা প্রকৃতরূপে শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। লোক যে দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে, তাহা অজ্ঞান হইতেই প্রসূত হয়।'

ভীষ্ম কহিলেন,—'রাগ, দ্বেষ, মোহ, অসন্তোষ, শোক, অভিমান, কাম, ক্রোধ, দর্প, তন্দ্রা, আলস্য, বিষয়াভিলাষ, তাপ, পর-বৃদ্ধিতে পরিতাপ ও পাপক্রিয়া সকল অজ্ঞান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। মহারাজ! তুমি এই অজ্ঞানের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি প্রভৃতি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, তাহা বিশেষ ও বিস্তাররূপে কহিতেছি, শ্রবণ কর। হে ভারত! অজ্ঞান ও অতি লোভ, এই উভয়েরই ফলও দোষতুল্য; অতএব তুমি এই উভয়কে একই বিবেচনা কর। লোভের বৃদ্ধি, ক্ষয় ও উদয়-অনুসারে তদুৎপন্ন অজ্ঞান বর্দ্ধিত, ক্ষীণ ও উদিত হইয়া থাকে। বিচিত্ততাই লোভের মূল এবং লোভ হইতেই অজ্ঞান উৎপন্ন হয়। লোভ ছিন্ন ভিন্ন হইলে তাহার কারণও বিনষ্ট হইয়া যায়। অজ্ঞান হইতে লোভ ও লোভ হইতে অজ্ঞান এবং অন্যান্য সকল দোষই উৎপন্ন হইয়া থাকে। অতএব লোভকে পরিত্যাগ করিবে। জনক,

যুধনাশ্ব, বৃষাদর্ভি, প্রসেনজিৎ ও অন্যান্য অনেকানেক নরপতিগণ, লোভক্ষয়-নিবন্ধন স্বরলোকে গমন করিয়াছেন। হে কুরুবর! তুমি প্রত্যক্ষ দুঃখকর লোভকে পরিত্যাগ কর। ইহলোকে লোভ পরিত্যাগ করিলে পরলোকে পরম সুখ ভোগ করিবে।"

বাঙ্গালার বিবরণ।

বর্দ্ধমান-জেলা।

সপ্তম প্রস্তাব।

বর্দ্ধমান-বিভাগের আলোচনা-প্রসঙ্গে ইতি-পূর্ব্বে নিজ বর্দ্ধমান নগরের বিবরণই আলোচিত হইয়াছে। এক্ষণে, বর্দ্ধমান-জেলার অন্তর্গত প্রধান গ্রাম-সমূহের বিবরণ লিখিত হইতেছে।

তৎপূর্ব্বে পাঠকগণ, একবার বর্দ্ধমান-বিভাগের ভিন্ন ভিন্ন মহকুমা, থানা ও ফাঁড়ি-গুলির পরিচয় লউন। তাহাতে অবশ্যই গ্রাম-বিবরণ বুঝিবার সুবিধাই হইবে। এক্ষণে, এক এক মহকুমার অধীনস্থ থানা ও ফাঁড়িগুলি পর পর সাজাইয়া দিলাম, পাঠক দৃষ্টি করুন,—

১। বর্দ্ধমান।
২। সাতগেছে।*
৩। জামালপুর।*
৪। রায়না।*
৫। খণ্ডঘোষ।*
৬। সাহেবগঞ্জ।
৭। মুরাদপুর।†
৮। পারবিরহাট।†
৯। বড়বাজার।†
১০। নূতনগঞ্জ।†
১১। কেশবগঞ্জ।†
১২। কাঞ্চননগর।†
১৩। মেমারী।†

১৪। কালনা।
১৫। পূর্ব্বস্থলী।*
১৬। মন্তেশ্বর।*
১৭। ঝাপানতলা।†
১৮। পাকুড়িয়া।†

১৯। বুদবুদ।
২০। আউশগ্রাম।*

২১। কাটোয়া।
২২। বেড়ুগ্রাম।*
২৩। মঙ্গলকোট।*
২৪। দাঁইহাট।†

২৫। রাণীগঞ্জ।
২৬। আসানসোল।*
২৭। কাকসা।*
২৮। ফরিদপুর।†
২৯। বরাকর।†
৩০। সেনপাহাড়ী।†

* এই চিহ্নিত স্থানগুলি থানা।
† এই চিহ্নিত স্থানগুলি ফাঁড়ি।

বলা বাহুল্য, এই তালিকার অন্তর্গত বর্দ্ধমান, কালনা, বুদবুদ ও কাটোয়া এই চারিটি বিভাগ লইয়া বর্দ্ধমান জেলা। ইহার মধ্যে নিজ বর্দ্ধমান—সদর-ষ্টেসন, এবং অপর তিনটি উহার মহকুমা (Sub-Division)। আমরা ক্রমশঃ ঐ সকল মহকুমা ও থানার অন্তর্গত গ্রাম-সকলের পরিচয় প্রদান করিতেছি। *

বর্দ্ধমান-জেলার অন্তর্গত রায়না-থানার অধীনস্থ কয়েকটি প্রধান প্রধান গ্রাম এই,—

রায়না, কাইতি, শ্রীরামপুর, কেশবপুর, কামারহাটি, উচানল, গোতান, পলাসন, ধাড়ান, আকিনা, আলমপুর, লোহাই, ছোট বৈনান, বড় বৈনান, মোহনপুর, আতাপুর, পাশণ্ডা, নেত্রখণ্ড, নেউড়, আড়ুই, শাঁকনাড়া, বোগড়া, মুগরো, আহারবেলমা, সেহারা, ফকিরপুর, নাড়ুগ্রাম, তেয়াওল, মেড়াল, কৃষ্ণরামপুর প্রভৃতি বৃহৎ ও ক্ষুদ্র ৩৬০ তিন শত ষাট্ গ্রাম আছে। তন্মধ্যে যে গ্রামগুলির নাম উল্লিখিত হইল, তাহাই অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ও প্রসিদ্ধ। একটি একটি গ্রামের বিবরণ যতদূর জানা গিয়াছে, ক্রমশঃ তদ্বিবরণ প্রকাশিত হইবে। অদ্য কয়েকটী গ্রামের কথা বলা যাউক।

রায়না।—এ গ্রামে থানা, ডাকঘর, রেজেষ্টরি আপিস ও একটি এণ্ট্রান্স স্কুল আছে। ছয়টি প্রাচীন দেবমন্দির ও কয়েকটি বৃহৎ সরোবর

* আমাদের ইচ্ছা ছিল, প্রসিদ্ধি-অনুসারে গ্রাম-সকল ধারাবাহিকরূপে সাজাইয়া, ক্রমশঃ তদালোচনায় প্রবৃত্ত হইব। কিন্তু, এককালে সমস্ত সংগ্রহের অসুবিধা-নিবন্ধন, পর-পর যেরূপ বিবরণ সংগৃহীত হইবে, তাহারই প্রকাশারম্ভ করা যাইবে। যাঁহারা এ সকল বিবরণ সংগ্রহে আমাদের সহায়তা করিতেছেন, তাঁহারা অবশ্যই ধন্যবাদার্হ। যথাস্থলে তাঁহাদের নাম প্রকাশিত হইবে। ভবিষ্যতেও ঐরূপ করা যাইবে।

† পুলিশ-সব-ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু হিরণ্যারিচরণ রায় মহাশয়ের প্রেরিত বিবরণ হইতে সংগৃহীত।

বিরাজমান রহিয়াছে। রায়নায় প্রায় ২০০০ দুই হাজার লোকের বসতি। এখানকার কুলীন কায়স্থ ঘোষগণই সম্ভ্রান্ত জমীদার-গোষ্ঠী। তাঁহারা বিলক্ষণ খ্যাত। বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ এস্থলে আদৌ নাই। রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ প্রভৃতি ভদ্রলোকের সংখ্যাই অধিক। আপাততঃ শাঁকনাড়া-গ্রামবাসী শ্রীপতি বাবু এ গ্রামে আসিয়া বাস করায় গ্রামের শোভা অনেকাংশে বর্দ্ধিত হইয়াছে। আমাদের আত্মীয় শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র ঘোষ মহাশয় অত্রত্য শিক্ষিত ব্যক্তির অন্যতম। তিনি অনেক পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখিতেন।

কাইতি।—এক প্রাচীন সমৃদ্ধিশালী গ্রাম। প্রায় ১৮ অষ্টাদশ বৎসর পূর্ব্বে এখানে মুনসফি আদালত ছিল। এক্ষণে ঐ আদালত, বর্দ্ধমান-সদরে অন্তরিত হওয়ায় গ্রামের অবস্থা একেবারে হতশ্রী হইয়া গিয়াছে। এ গ্রামে স্বাধীন পোষ্টাপিস ছিল। গ্রামের দুর্ভাগ্যের সহিত তাহাও আবার আজ প্রায় দুই বৎসর হইতে অকিঞ্চিৎকর ভিলেজ পোষ্টাপিসে অর্থাৎ পল্লী-ডাকঘরে পরিণত হইয়াছে। একটি মাইনর-স্কুলই অত্রত্য শিক্ষালয়। কাইতিতে প্রসিদ্ধ শ্রীশ্রী৺সিদ্ধেশ্বরী মহাদেবীর মন্দির বিদ্যমান আছে। অতি প্রাচীন কাল হইতে এই মন্দিরের অস্তিত্ব রহিয়াছে। কাইতি নিবাসী মহামনা গোবিন্দচন্দ্র রায় মহাশয়ের যত্নে ও উৎসাহে পূর্ব্বে এই গ্রামের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। এক্ষণে তিনি জীবিত থাকিলে গ্রামের উন্নতি হইত। শ্রীরামপুর ও কেশবপুর, কাইতির সহিত সংসৃষ্ট দুই গ্রাম। এই গ্রামের লোক সংখ্যা প্রায় ২৯৫০। ব্রাহ্মণ ও কায়স্থই অত্রত্য গণনীয় অধিবাসী।

কামারহাটি।—কামারহাটি, বারাটী, যশাপুর, বাতাসপুর, চকপঞ্চানন, বৈদ্যপুর, কুমারপুর এই কয়েকখানি গ্রাম একত্র-সম্মিলিত এবং কামারহাটী নামেই বিখ্যাত। কামার-হাটীতে শ্রীশ্রী৺পঞ্চানন্দ মহাপ্রভু নামে বিগ্রহ বিরাজিত থাকিয়া গ্রামের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছেন। উক্ত দেবতা, কোন্ সময়ে স্থাপিত, তাহার কিছুই নির্ণয় করিতে পারা যায় নাই। পঞ্চানন্দ দেবের মন্দির, ভগ্নাবস্থা প্রাপ্ত হইলে, কলিকাতা—শ্যামবাজার-নিবাসী স্বর্গীয় শ্রীকৃষ্ণ-লাল মিত্র, স্বীয় ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে, উপস্থিত মন্দিরটি নিজ ব্যয়ে ও যত্নে প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। সেও প্রায় শতাধিক বৎসরের কথা। "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।" আজও এ গ্রামের কি যুবা, কি বৃদ্ধ, কি বালক, কি বনিতা সকলেরই মুখে মিত্রজ মহাশয়ের কীর্ত্তির কথা শুনিতে পাওয়া যায়। মিত্রজ মহাশয়ের নাম অদ্যাবধি কামারহাটীতে দেদীপ্যমান হইয়া রহিয়াছে। এক্ষণে এই মন্দিরের পুনরায় জীর্ণসংস্কারের প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে। স্বদেশহিতৈষী মহাত্মগণ সাধ্যানুসারে সাহায্য প্রদান করিলে মন্দিরের পুনঃসংস্করণের সম্ভাবনা। এ অঞ্চলে এই পঞ্চানন্দ ঠাকুর জাগ্রত বিগ্রহ। বহুদূরস্থিত নগর ও গ্রাম হইতে এখানে বহুল যাত্রীর আবির্ভাব হইয়া থাকে। পঞ্চানন্দ দেবের ঔষধ ধারণ করিয়া কত কত বন্ধ্যা স্ত্রী, সন্তান-মুখ-দর্শনে চরিতার্থতা লাভ করিয়াছে। এই দেবতার পুরোহিতদিগকে "পাণ্ডা" কহিয়া থাকে। ইহারা জাতিতে বাগ্‌দী; কিন্তু "পণ্ডিত" নামে খ্যাত। ইহারা স্বহস্তে লাঙ্গল ধরে না, শূদ্রের অন্ন ভক্ষণ করেনা, অধিক কি, অন্যান্য বাগ্‌দীর সহিতও ইহাদের আহার-বিহার চলে না। যাহারা পঞ্চানন্দের পূজা করে, তাহাদের হস্তে তাম্রনির্ম্মিত তাগা থাকে। লোকসংখ্যা ৪০০০ চারি সহস্র হইবে। জলবায়ু বেশ স্বাস্থ্যকর। ধান্যই এখানকার একমাত্র উৎপন্ন শস্য। গ্রামে পাঠশালা আছে। কামারহাটী গ্রামে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থেরই বাস অধিক। মুসলমান ও বাগ্‌দীর বাসও নিতান্ত কম নহে। নিকটবর্ত্তী বাঙ্গালপুর নামক পটীতে কেবল

বৈদিক-শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, একাদশ তেলী ও উগ্র-ক্ষত্রিয়ের অর্থাৎ আগুরির বাস। এই পটীতে কায়স্থের বাস আদৌ নাই। তদ্ভিন্ন, বৈদ্যপুর ও কুমারপুর গ্রামে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও অন্যান্য জাতি বাস করেন। বৈদ্যপুর নামক পটীতে মহাদেবের মন্দির আছে। এখানে সর্ব্বদা বহু-দেশ হইতে যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। হাঁপানী, কাশী প্রভৃতি উৎকট পীড়া হইতে অব্যাহতি পাইবার আশায় এখানে হত্যা দিয়া ঔষধ প্রাপ্ত হইয়া ভাল হয়। এই কামারহাটী গ্রামে স্বর্গীয় মহাত্মা দুর্গারাম ন্যায়পঞ্চাননের বাসস্থান ছিল। কামরহাটী গ্রামে 'কুবীর ঘোষ' নামে জলাশয়ের জল অতি নির্ম্মল। এরূপ পানীয় জল, এ অঞ্চলে পাওয়া দুর্ঘট। কামারহাটী গ্রামের রায়-বংশীয়েরাই প্রাচীন এবং বর্দ্ধিষ্ণু বংশ। এই রায়-বংশীয়েরা জাতিতে মৌলিক-শ্রেণীর কায়স্থ। ইঁহারা 'বালীর দত্ত'। পূর্ব্বে নবাব-সংসারে কার্য্য করায় "রায়" উপাধি প্রাপ্তি ঘটিয়াছিল। এরূপ প্রবাদ আছে, হাবড়ার সন্নিকটস্থ বালী-নিবাসী গৌরীচরণ দত্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীরামচন্দ্র দত্ত, এই গ্রামে আসিয়া বাস করেন। তাঁহারই বংশধরেরা এই "রায়" উপাধিধারী। আজকাল এই গ্রামের পাড়ায় পাড়ায় মধুর হরি-সঙ্কীর্ত্তনের দল হইয়াছে। তাহাতে মাতালের সংখ্যা কমিয়াছে বটে, কিন্তু এই হরি-সঙ্কীর্ত্তনের দল লইয়া গ্রামে দলাদলির অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব। গ্রামে অতি প্রাচীন কাল হইতে চির-প্রতিষ্ঠিত রক্ষাকালী দেবীর পূজা একত্র হইয়া আসিতেছিল; কিন্তু দলাদলির প্রভাবে এবৎসর একবারের স্থলে দুইবার ও একস্থানের পরিবর্ত্তে পৃথক পৃথক প্রতিমা করিয়া পূজা হইয়া গিয়াছে।

পূর্ব্বস্থলী থানার অধীনে নিম্নলিখিত গ্রাম-গুলি * আছে;—

পূর্ব্বস্থলী, চুপি, কাষ্ঠশালী, গোপীপুর, মেড়-তলা, আটপাড়া, পলাশপুলি, একডালা, বাঘা-ডাঙ্গা, পরাণপুর, মাথাপুর, শ্রীরামপুর, পারুলিয়া ভাণ্ডারটিক্‌রী, শুড়ুন্টু, বাজে শুড়ুন্টু, মাউ-গাছি, জাহান্নগর, সমুদ্রগড়, চণ্ডীপুর, নিমদে, সিপাড়া, চকব্রাহ্মণগড়িয়া, বগপুর, ভাতুড়িয়া, সোণারুদ্র, বেলগাছী, রাঘববাটী, শ্যামবাটী, ধীৎপুর, শরডাঙ্গা, কাইবাতি, কাইগ্রাম, শ্রীবাষ, সিমলা, নখপুর, কুতুবপুর, বড়্‌গাছী, দোগা-ছিয়া, মোয়াইল, রাণীপুর, বেলেরহাট, পলাশ-বাড়িয়া, জামালপুর, মধুপুর, ধরমপুর, বিশনড়ম্বা, হুষিফলেয়া, নাকাদহা, সাতনি, কুতুড়ে, সাঁহুড়ে, নোয়াচুর, ঘোড়ানাশ, ভাৎসলা।

পূর্ব্বস্থলী।—ইহার দক্ষিণে নবদ্বীপ; পূর্ব্বে ভাগীরথী; উত্তরে হুষি, ফলেয়া ও সাঁহুড়ে; পশ্চিমে পলাশপুলি। কেহ কেহ উত্তর-সীমায় 'পদ্মবিল' নামক বিলকেও নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বে নবাব-আমলে পূর্ব্বস্থলীতে 'ইষ্টগঞ্জ' নামে ব্যবসা-স্থান ছিল। পূর্ব্বে ইহার জল-বায়ুও উৎকৃষ্ট ছিল। কিন্তু ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ভীষণ মেলেরিয়া রূপ যমদূত প্রবেশ করিয়া গ্রামখানি বিধ্বস্ত করিয়াছে। এখনও প্রতি-বৎসরই মেলেরিয়ার প্রকোপ দেখা যায়। এখানকার ভূমি মধ্যম প্রকারের উর্ব্বরা।

এখানে 'ক্রোরীয়ান্' গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর বাসভূমি ছিল। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত অনেকগুলি মন্দিরও তৎকালে পূর্ব্বস্থলীর শোভা সংবর্দ্ধন করিত। বর্দ্ধমান-রাজবাটীর মহাভারতের মূলানু-বাদক পণ্ডিতগণের অন্যতম পণ্ডিত পদ্মলোচন ন্যায়রত্ন মহাশয়েরও এইস্থানে বাস ছিল। ৺ পদ্মলোচনের বংশ লোপ হইয়াছে। পদ্ম-লোচনের পৌত্র ৺ ভবানীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্যের স্ত্রী-মাত্র জীবিত আছেন। পদ্মলোচনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা দেবলোচনের বংশ আছে।

পূর্ব্বস্থলীতে গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রতি-

ষ্ঠিত দেব-মন্দির ব্যতীতও অন্যান্য লোকের অনেক দেবমন্দির ছিল। গঙ্গা ঐ সকল মন্দির উদরসাৎ করিয়াছেন। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত চারিটি মন্দিরের বিষয়ই উল্লেখ করা গেল। (১) ৺ ভগবতীচরণ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির ছিল। ইঁহার তিন পুত্রের মধ্যে দুই পুত্র জীবিত আছেন। (২) ৺ রামচরণ ভট্টা-চার্য্য কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত মহাদেবের পঞ্চরত্ন বা পাঁচচূড়া মন্দির ছিল। ইঁহার পুত্র পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গঙ্গানারায়ণ শিরোমণি। ইনি কলি-কাতার অপর পারে শালিখা নামক গ্রামে থাকেন। শালিখায় ইঁহার টোল ছিল, বৃদ্ধাবস্থা জন্য অধ্যাপনা-কার্য্যে অশক্ত হইয়া টোল বন্ধ করিয়াছেন। (৩) ৺ চণ্ডীপ্রসাদ রায়ের প্রতি-ষ্ঠিত শিবমন্দির ছিল। ইঁহার পুত্র শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ রায় বি, এ, জীবিত আছেন। (৪) সাধারণের প্রতিষ্ঠিত 'বুড়কালী' দেবীর মন্দির ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সকল দেব-মন্দিরই গঙ্গা গ্রাস করিয়াছেন; কিছুমাত্র চিহ্ন রাখেন নাই।

সংস্কৃত-চর্চ্চার জন্য পূর্ব্বস্থলী চিরপ্রসিদ্ধ। পূর্ব্বে পূর্ব্বস্থলীতে অনেকগুলি টোল ছিল। ইংরাজী-চর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে, ও তৎস্থাপয়িতাদের পরলোকের সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি ক্রমশঃ লোপ পাইয়াছে। (১) ৺ ঈশ্বরচন্দ্র তর্কালঙ্কার মহা-শয়ের টোল ছিল। ইঁহার দুই পুত্র; জ্যেষ্ঠ তারামোহন ভট্টাচার্য্য, কনিষ্ঠ কুমুদমোহন ভট্টা-চার্য্য। ইনি কলিকাতায় বেঙ্গল আফিসে চাকরী করেন। (২) ৺ রামচরণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের টোল ছিল। ইঁহারই পুত্র শ্রীযুক্ত গঙ্গানারায়ণ শিরোমণি মহাশয় এক্ষণে কলি-কাতার অপর পারে শালিখা নামক গ্রামে থাকেন। (৩) ৺ সূর্য্যকান্ত ভট্টাচার্য্য মহা-শয়েরও এক টোল ছিল। ইঁহার দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ—শ্রীযুক্ত যদুনাথ বিদ্যারত্ন; ইঁহার টোল আছে। কনিষ্ঠ—শ্রীদিননাথ ভট্টাচার্য্য। (৪) ৺ ঈনানচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের টোল ছিল। ইঁহার দুই পুত্র। জ্যেষ্ঠ—শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য; ইনি আলিপুর জেল-প্রেসের পণ্ডিত। কনিষ্ঠ—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য; ইনিও, কলিকাতায় চাকরী করেন। (৫) ৺ দুর্গাদাস ন্যায়রত্ন মহাশয়ের টোল ছিল। গত ১২৯৬ সালের ৬ ই অগ্রহায়ণ ইনি নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করিয়াছেন। ইনি অভিজ্ঞান-শকুন্তলা প্রভৃতি বহুগ্রন্থের টীকাকার, গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মহামহোপাধ্যায় উপাধি-প্রাপ্ত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ের অধ্যাপক। ইনি, বিষয়-বিভব-শূন্য হইয়াও, ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের কৃচ্ছ্র-সাধ্য বৃত্তি দ্বারা উপার্জ্জিত অর্থে, এই বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত, নিয়ত বহুসংখ্যক ছাত্র রাখিয়া সম্যক যত্ন-সহকারে অধ্যাপনা করিয়া গিয়াছেন। ইনি স্মৃতি ও জ্যোতিষ-শাস্ত্রে অসাধারণ বুৎপন্ন ছিলেন। মৃত্যুকালে ইঁহার বয়ঃক্রম ৭৫ বৎসর হইয়াছিল। (৬) শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্করত্ন মহা-শয়ের টোল ছিল। এখন ইঁহার টোল বন্ধ হইয়াছে।

পূর্ব্বস্থলীতে এখন দুইটিমাত্র টোল সুবন্দো-বস্তে চলিতেছে। একটি, মহামহোপাধ্যায় শ্রীকৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চাননের; আর একটি, শ্রীযুক্ত যদুনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয়ের। ইনি মহামহো-পাধ্যায় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চাননের ছাত্র। এস্থানে একটি এণ্ট্রান্স স্কুল আছে। পূর্ব্বে যে মাইনর স্কুল ছিল, তাহাই গত জুবিলী-উপলক্ষে এণ্ট্রান্স স্কুলে পরিণত হইয়াছে। এখানে ডাকঘর আছে।

চুপী।—সাহিত্য-সমাজে সুপরিচিত বাবু অক্ষয়কুমার দত্তের জন্মভূমি। বর্দ্ধমান-রাজবাটীর দেওয়ান, সঙ্গীত-রচক ৺ রঘুনাথ রায়ের ও সুবিখ্যাত সঙ্গীত-রচয়িতা ৺ অকিঞ্চন রায়ের বাটী। ইঁহার সমুদয় সঙ্গীতেই নিজ-নামের ভণিতা আছে। ইঁহাকে অত্রত্য লোকে "মধ্যম" মহাশয় বলিয়া থাকে।

---

* পূর্ব্বস্থলী-নিবাসী বাবু সত্যপ্রসাদ ভট্টা-চার্য্য যে সকল ঘটনা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাহার উপর নির্ভর করিয়াই ইহা লেখা গেল।

একডালা।—এখানে মুকুটরায় কর্ত্তৃক খনিত "যমনা" নামক পুষ্করিণী ছিল। এই পুষ্করিণী প্রস্তর দ্বারা বাঁধান ছিল। এখন এই পুষ্করিণী গঙ্গা দ্বারা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে; কেবল কিছু খাদ দৃষ্ট হয়। ঐ পুষ্করিণীর নিকট চারিটি দেবমন্দির এপর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল। গত আশ্বিন মাসে গঙ্গা উদরসাৎ করিয়াছেন। এই মন্দির চতুষ্টয়ের মৃত্তিকা-প্রোথিত ভিত্তি একজন মাঝি মাপিয়া বলিয়াছে,—'এরূপ ভিত্ আমি কখন দেখি নাই।' সে বলে,—'আমি এই মন্দিরের ভিত ২০ কুড়ি হাত মেপেছি।' ভিত্তি ছাড়া দৃশ্যমান মন্দিরের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত আরও ২০ হাত হইবে।

পারুলিয়া।—শুনা যায়, রাজা চন্দ্রকেতুর বাসস্থান এখানে ছিল। যেস্থানে তাঁহার বাস স্থান ছিল, ঐ স্থানকে লোকে "রাক্ষসী পোতা" বলিয়া থাকে। ঐ বাসস্থানের অদূরেই 'নাক কাটী' পুষ্করিণী।

জামালপুর।—এখানে বিখ্যাত ধর্ম্মরাজ-দেবমন্দির আছে। এ অঞ্চলের সমুদয় স্ত্রীলোক ইঁহাকে ভক্তি করিয়া রোগাদি উপশমের ও সন্তান-সন্ততির জন্য মানসা করিয়া পূজা করে। উক্ত ধর্ম্মরাজ দেবতার নামানুসারে লোকে ঐস্থানকে "ধর্ম্মতলা" বলে। বৈশাখী পুর্ণিমায় ধর্ম্মরাজের গাজন হইয়া থাকে।

ভাৎসলা।—এখনকার বিখ্যাত যাত্রাওয়ালা মতিলাল রায়ের বাটী।

চীনদিগের বিবাহ-পদ্ধতি।

চীনদিগের বিবাহ-পদ্ধতি অনেকাংশে ভারতবর্ষীয়দিগের ন্যায়। বিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম অতিক্রম করিবার পূর্ব্বে প্রায় চীন-যুবকগণ দার-পরিগ্রহ করিয়া থাকে। হিন্দুদিগের ন্যায় চীনদিগেরও বিশ্বাস যে, নিঃসন্তান হইয়া পরলোক-গমনাপেক্ষা মনুষ্যের অধিক দুর্ভাগ্য আর কি আছে! মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধাদি ও সমাধি সমীপে সাময়িক উপাসনা ও বলি ইত্যাদি প্রদান করিবার জন্য যে ব্যক্তি পুত্র রাখিয়া মরিতে না পারে, তাহার অপেক্ষা পাপী ও দুর্ভাগ্য জগতে অতি বিরল; এবং এই দুর্ঘটনা নিবারণের জন্যই চীনে বাল্য-বিবাহ প্রচলিত। হিন্দুদিগের মধ্যে যেরূপ মৃতের সৎকার বা গঙ্গা-প্রাপ্তি না হইলে পরলোকগত আত্মার সদ্গতি হয় না বলিয়া বিশ্বাস, চীনদিগেরও সেইরূপ সংস্কার আছে যে, মৃত ব্যক্তির কবর না হইলে তাহার আত্মা প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়া ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়।

চীনদিগের মধ্যে একের অধিক স্ত্রীগ্রহণ করিবার রীতি প্রচলিত না থাকায়, প্রথমা স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে তাহাকে পরিত্যাগ না করিয়া দ্বিতীয় বার পাণিগ্রহণ করিবার উপায় নাই। এ প্রথাটি নিতান্ত কদর্য্য; কারণ, সন্তান হইল না বলিয়া, বিনাদোষে স্ত্রী-পরিত্যাগ কোন সভ্য-সমাজেরই অনুমোদনীয় নহে। চীনদিগের মধ্যে পোষ্যপুত্র-গ্রহণের প্রথা প্রচলিত আছে।

দেশের পদ্ধতি-অনুসারে বর, বিবাহ-রাত্রির পূর্ব্বে পাত্রী দেখিতে পায় না। চীনেও আমাদের দেশের ন্যায় ঘটক দ্বারা সম্বন্ধ স্থির হইয়া থাকে। পাত্রীর পিতা প্রস্তাব স্বীকার করিলে, পাত্র কিছু উপঢৌকন পাঠায়। অবশেষে, বর-কন্যার জন্মকোষ্ঠী পরীক্ষা করিয়া, উভয়ের রাশিতে মিল হইলে, তবে সম্বন্ধ স্থির হয়। কিন্তু এ সম্বন্ধ ভাঙ্গিলেও ভাঙ্গিতে পারে। সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হওয়ার তিন দিনের মধ্যে যদি কাহারও গৃহের কোন মূল্যবান দ্রব্য ভাঙ্গে, অথবা চুরী যায়, তবে তাহা অশুভ লক্ষণ বলিয়া সম্বন্ধ তৎক্ষণাৎ ভঙ্গ হয়।

পাত্রী বয়স্থা হইলে সম্বন্ধের দিন হইতে বিবাহ না হওয়া পর্য্যন্ত আর গৃহ হইতে বহির্গত হয় না। বাটীতে পিতার কোন বন্ধু-বান্ধব আসিলে তাহাদের সম্মুখেও বাহির হয় না।

চীনদেশে কন্যাপক্ষে পণগ্রহণ-প্রথা প্রচলিত আছে। এই পণ পাত্রের অবস্থানুযায়ী তাহার নিকট হইতে গৃহীত হয়। তবে পণের নিরূপণ কন্যার বয়সের উপর নির্ভর করে; অর্থাৎ কন্যা যদি নিতান্ত বালিকা হয়, তবে পণের টাকাও সেইরূপ অল্প নির্দ্ধার্য্য হয়। যতদিন এ পণের টাকা আদায় না হয়, ততদিন বিবাহ স্থগিত থাকে। চীনে সময়ে সময়ে নিতান্ত শৈশবাবস্থাতেই কন্যার বিবাহ হইয়া থাকে। এক সময়ে একটী ভদ্রলোক একটী চীন বালকের স্কন্ধে একটী দুগ্ধপোষ্য বালিকা দর্শনে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারেন যে, বালিকা বালকের পরিণীতা স্ত্রী। আমাদের দেশের ন্যায় চীনেও সময়ে সময়ে বরকন্যার অভিভাবকগণ বিবাহোপলক্ষে সাধ্যাতীত মুদ্রা ব্যয় করিয়া ঋণজালে জড়িত হয়েন।

বিবাহের শুভদিন জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতগণ দ্বারা স্থির হয়। বিবাহ-দিনে বরপক্ষের নিমন্ত্রিত আত্মীয়-কুটুম্বগণ বরের গৃহে সমুপস্থিত হয়েন। আমাদের দেশে বর যেমন নানাবিধ বেশভূষায় ভূষিত হইয়া, বহু-বাদ্য-ভাণ্ড-সহ, বিবাহার্থে কন্যার বাটী গমন করে, চীনে ইহার বিপরীত। বরের বাটী হইতে লোকজন ও পাল্কী গিয়া কন্যা আনায়ন করে। পাল্কীর সঙ্গে বাজ্না ও অগ্রে অগ্রে নিশানধারী লোকজন গমন করে, এবং সমারোহের সহিত কন্যাকে বরালয়ে আনিয়া থাকে। কন্যা আনয়ন কালে, পাছে ভূত-প্রেতে কোন দৌরাত্ম্য করে—এই ভয়ে, কন্যাযাত্রী ও বাদ্যকারগণের একব্যক্তি একখণ্ড বৃহৎ শূকরমাংস লইয়া অগ্রসর হয়। ইহার অর্থ এই যে, মাংস পাইলে ভূত-প্রেতগণ, কন্যা অথবা কন্যাযাত্রীগণের উপর কোনরূপ দৌরাত্ম্য করিবে না—মাংসাহারেই ব্যস্ত থাকিবে।

বিবাহ-দিনে কন্যা নানাবিধ বহুমূল্য অলঙ্কার ও পরিচ্ছদে শোভিত হয়, এবং চারিজন বাহক-পরিচালিত রক্তবর্ণ চৌকিতে উপবেশন করিয়া বরগৃহে আগমন করে। কন্যা বরের বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া চৌকি হইতে অবতরণ করিলেই দুইজন পুত্রবতী সধবা স্ত্রীলোক অগ্রসর হইয়া কন্যাকে গৃহের ভিতর লইয়া আসে। বাড়ীর ভিতর আনিবার সময় প্রজ্জ্বলিত অঙ্গারপূর্ণ একটী পাত্রের উপর দিয়া লইয়া যায়।

যে ঘরে বরকন্যায় প্রথম সাক্ষাৎ হইবে, সেই ঘরে বর, পাত্রীর অপেক্ষায়, একটী উচ্চাসনে বসিয়া থাকে। পাত্রী গৃহে প্রবেশ করিয়াই উক্ত আসনের পাদদেশে বরকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করে। বর তখন আসন হইতে অবতরণ পূর্ব্বক কন্যার অবগুণ্ঠন মোচন করিয়া তাহার বদনমণ্ডল দর্শন করে। বরকন্যায় এই প্রথম সাক্ষাৎ। অবশেষে, উভয়ে কোন বাক্যালাপ না করিয়া, পরস্পর পরস্পরের পার্শ্বে উপবেশন-পূর্ব্বক, উভয়েই উভয়ের পরিচ্ছদের একপার্শ্বে উপবেশন করিতে চেষ্টা করে। চীনদিগের মধ্যে বিশ্বাস এই যে, বরকন্যার মধ্যে যে যাহার পরিচ্ছদের উপর অগ্রে উপবেশন করিতে সমর্থ হয়, সেই গৃহস্থালীর কর্ত্তৃত্ব-লাভ করে। ইহার পর বরকন্যা উভয়ে ধর্ম্মমন্দিরে প্রবেশ-পূর্ব্বক উপাসনা-বেদীর সম্মুখে আপনাদিগের পূর্ব্ব-পুরুষগণের ও স্বর্গ-মর্ত্ত্যের পূজা করে।

ভজনালয় হইতে বহির্গত হইয়া বরকন্যা ভোজনগৃহে প্রবেশ করিলে, সেই গৃহের মুক্ত দ্বার দিয়া বরের আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবগণ বরের সহিত কন্যার আচরণ ও ভাবভঙ্গী অবলোকন করিয়া, তদ্বিষয়ে আপন আপন মন্তব্য প্রকাশ করিতে থাকে। বর দিব্য করিয়া ভোজন করে; কিন্তু কন্যার ভোজন করা নিষিদ্ধ। ইহার পর উপস্থিত আত্মীয়-কুটুম্বগণ বরকন্যা উভয়ের হস্তেই এক এক পাত্র মদ্য দেয়, এবং ঐ পাত্র-দ্বয় বরকন্যা উভয়ে উভয়ের মধ্যে পরিবর্ত্তন করিয়া পান করিলেই বিবাহ সমাপ্ত হয়।

আমাদের দেশের ন্যায় চীনেও স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রচলিত নাই। স্ত্রী-স্বাধীনতা সমাজের পক্ষে যে শুভকরী নহে, চীন-বাসীগণ তাহা বিলক্ষণ বুঝে। এই কারণে 'কন্‌ফিউকস্' নামক জনৈক প্রসিদ্ধ চীন পণ্ডিত লিখিয়া গিয়াছেন যে, মনুষ্যদিগের মধ্যে নারীজাতির সহিত ব্যবহার বড় বিষম সমস্যা। তাহাদিগকে অধিক আদর করিলে প্রশ্রয় পাইয়া মাথায় চড়িবে, এবং কিঞ্চিৎ অনাদর দেখাইলেও অভিমানে গলিয়া যাইবে।

নিম্নলিখিত কয়েকটী কারণে চীনসমাজে স্ত্রী-পরিত্যাগ-প্রথা প্রচলিত আছে; যথা—স্ত্রী শ্বশুর-শাশুড়ীর অবাধ্যা, বন্ধ্যা, ভ্রষ্টা, কুষ্ঠ-রোগাক্রান্তা, স্বামীচরিত্রে সন্দেহ-যুক্তা, অতিরিক্ত বা অনর্থক বাক্যবাদিনী, এবং অপহারিকা। কিন্তু চীন-রমণীগণের কোন কারণেই পতি-পরিত্যাগে অধিকার নাই। চীন-রমণীগণ হিন্দু-নারীগণের ন্যায় স্বামীকে দেবতার তুল্য ভক্তি করে। স্বামীর কোন দোষ দেখিলে তাঁহাকে মিষ্ট-বাক্যে বুঝান-ব্যতীত যাহাতে তিনি বিরক্ত হয়েন, এরূপ কোন ভর্ৎসনা-বাক্য প্রয়োগ স্ত্রীর পক্ষে নিতান্ত গর্হিতাচরণ বলিয়া চীনদেশে বিবেচিত হয়। ইহাতেই বুঝা যায়, চীন-রমণীগণ পতি-ভক্তির মহিমা বুঝেন। পাশ্চাত্য সভ্যতালোক আজিও যে চীনে প্রবিষ্ট হইতে পারে নাই, ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

চীনদেশে বিধবা-বিবাহ নিন্দনীয়। সম্ভ্রান্ত ঘরে ইহা কদাচ দৃষ্টিগোচর হয় না। তবে সামান্য দরিদ্র-শ্রেণীর বিধবারা, ভরণ-পোষণ-নির্ব্বাহ করিতে অক্ষমা হইলে, কখন কখন দ্বিতীয়বার স্বামী-গ্রহণ করিয়া থাকে।

ভারতবর্ষের ন্যায় চীনেও সহমরণ-প্রথা প্রচলিত আছে। তবে ইহা কিছু বিভিন্ন প্রকারের। হিন্দুরমণীরা বিধবা হইলে পূর্ব্বে স্বীয় স্বামী-সহ চিতারোহণ করিয়া বিষম বৈধব্য-যন্ত্রণা নিবারণ করিত; কিন্তু চীন-দেশে দাহপ্রথা প্রচলিত না থাকায়, চীন-রমণীগণ, স্বামীর মৃত্যুর পর, পরলোকে স্বামী-সহবাস ও অনন্ত সুখকামনায় উদ্বন্ধনে জীবন পরিত্যাগ করে। বিধবাদিগের এইরূপে জীবন-বিসর্জ্জন চীনদেশে বিশেষ গৌরবের বিষয়। ইহা সাধারণের দৃষ্টিগোচরের নিমিত্ত প্রকাশ্য স্থানে সম্পন্ন হয়, এবং যে বিধবা এইরূপ উদ্বন্ধনে প্রাণ পরিত্যাগ করে, তাহার নাম ও কীর্ত্তি চিরস্মরণীয় করিবার জন্য কীর্ত্তিস্তম্ভ গঠিত হয়।

ধর্ম্ম-আহ্বান।

বিরাট পুরুষ, অন্তর্জ্জগৎ ও জড়জগৎ লইয়া, এই বিপুল ব্রহ্মাণ্ড। এই ব্রহ্মাণ্ড যে শরীরী পদার্থ, বোধ হয়, আর্য্যজাতির চক্ষে ইহা প্রথম উদ্ভাসিত হইয়াছিল। এই বিশাল শরীরী পদার্থের প্রতি অঙ্গে ভগবান বিরাজমান রহিয়াছেন, তথাপি এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তাঁহারই ব্যাহৃতি। আর্য্যজাতি ভিন্ন অন্য কোন জাতি এ সত্য গ্রহণ করিতে পারে নাই। এইজন্য, অন্তঃপ্রকৃতির সহিত বাহ্যপ্রকৃতির মিলন, ভারতবর্ষ ভিন্ন, অন্য কুত্রাপি কেহ দেখাইতে পারেন নাই।

এখানে একদিকে গগনস্পর্শী হিমগিরি, কল্লোলিনী গোমুখী, বিষ্ণুপাদোদ্ভূতা পুণ্যতোয়া মন্দাকিনী; অন্যদিকে আর্য্য-জাতির অনন্তস্পর্শী বেদশাস্ত্র, সর্ব্বতত্ত্ববিদ্ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, ব্রহ্মপাদোদ্ভূতা আর্য্য-পবিত্রতা, আর্য্য-শিক্ষা ও আর্য্য-রীতিনীতি। একসময়ে বিষ্ণুপাদোদ্ভূতা পবিত্র-সলিলা ভাগীরথী হিমালয়ের অভ্যন্তরে নাচিয়া নাচিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত; আর, লোকে দূর হইতে সেই উন্মাদকারী কুলুধ্বনি শ্রবণ করিয়া আনন্দে বিভোর হইত—যাহা শ্রবণে এত সুখ, না জানি তাহার স্পর্শে কতই আনন্দ, ইহা অনুভব করিয়া ব্যাকুল হইত। তখন গোমুখীমুখ হইতে সেই পূত বারিধারা মধুরধ্বনি করিতে করিতে শাখা বিস্তার করিয়া সমগ্র আর্য্যদেশ পরিপ্লাবিত করিয়াছিল; তখন সমস্ত আর্য্যজাতি সেই পবিত্র

গঙ্গোদকে অবগাহন করিয়া বহিঃপূততা, বহিঃশীতলতা ও বহিঃশান্তি লাভ করিয়াছিল। অন্যপক্ষে ব্রহ্মোদ্ভূত আর্য্য-ধর্ম্ম, আর্য্য-শিক্ষা, আর্য্য-পবিত্রতা, আর্য্য রীতিনীতি, আর্য্য-আচার-ব্যবহার, বেদচতুষ্টয়ে বিহার করিতেছিল; লোকে বাহির হইতে কেবল সেই সুন্দর গীতি শ্রবণ করিত, ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইত না—কোথায় এ ধর্ম্ম নিহিত, কোথায় এ পবিত্রতা বিরাজিত! লোকে ব্যাকুল হইয়া যখন সেই পবিত্রতা, সেই শিক্ষা, সেই ধর্ম্ম, লাভাশায় উদগ্রীব হইয়াছিল, তখন, গোমুখী-মুখ-বিনিঃসৃত গঙ্গাপ্রবাহবৎ সেই শিক্ষা, সেই ধর্ম্ম, ব্যাস-মুখ-প্লাবাহিত হইয়া, গীতা-ভাগবত-পুরাণাদি অসংখ্য শাখা বিস্তার করিয়া, সমগ্র আর্য্য-হৃদয় পরিপ্লাবিত করিয়াছিল। পবিত্র গঙ্গোদকের ন্যায় পবিত্র সাত্ত্বিকভাবে স্নাত হইয়া, সেই সাত্ত্বিক সুখ অনুভব করিতে করিতে, আর্য্য-হৃদয় তাহাতেই নিমগ্ন হইয়া থাকিত, এবং সর্ব্বপ্রকার শান্তিলাভ করিয়াছিল।

কালধর্ম্মে যে শিক্ষাস্রোত আর্য্য-হৃদয়ে শুষ্ক হইয়া আসিয়াছিল, যে শিক্ষাভাবে আর্য্যাবর্ত্ত অনার্য্যাবর্ত্ত হইতেছিল, দশবৎসর পূর্ব্বে যে ভারতবাসী এ পবিত্রতার অভাব অনুভবও করিত না, আজ সময় পাইয়া, সেই আর্য্যশিক্ষা, সেই পবিত্রতা, প্রতি-গৃহদ্বারে আঘাত করিতেছে। সাধারণের মধ্যে অপবিত্রতা ও বিকৃতি, পরিবার-মধ্যে নীচতা ও সঙ্কীর্ণতা, সমাজ-মধ্যে ক্ষুদ্রতা ও অশান্তি, আর বাহিরে এই পবিত্রতার আহ্বান! বালক, বৃদ্ধ, যুবক, স্ত্রীলোক, যাঁহার হৃদয়ে বিন্দুমাত্র আর্য্যশোনিত আজিও প্রবাহিত, তিনি আর এ অপবিত্রতায় ডুবিয়া থাকিতে চান না। যাঁহারা জীবিত, তাঁহারা শুনিতেছেন, প্রবল জলকল্লোলের ন্যায় আর্য্য-শিক্ষা, আর্য্য-পবিত্রতা, হৃদয়ের দ্বারদেশে গভীর ধ্বনি করিতেছে। আর্য্য-আদর্শ ভিতরে প্রবেশ করিতে চায়—দ্বারোন্মোচনের ইহাই প্রকৃত সময়।

বাহিরে আর্য্য-আদর্শের আহ্বান শ্রুত হইতেছে, একথা কাল্পনিক নহে। হিন্দু-রমণীতে পবিত্রতা, আহারে পবিত্রতা, সামাজিক-পবিত্রতা, আত্ম-পবিত্রতা, প্রতিমায় পবিত্রতা, শিক্ষায় পবিত্রতা—সর্ব্ববিষয়ে এই পবিত্রতার আহ্বান—আমরা বাঙ্গলার আধুনিক চিন্তাশীল ও ভাবুক-শ্রেণী হইতে দেখাইব।

১। বঙ্গের একজন সর্ব্বপ্রধান লেখক শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—একদিন যিনি 'আশমানি-দিগ্‌গজ'-প্রেম আঁকিতে লজ্জা বোধ করেন নাই, আজ তিনিই আবার শিখাইতেছেন—নিষ্কাম ধর্ম্ম; আঁকিয়াছেন—প্রফুল্ল। বলিতেছেন,—"কামনা অর্থে আপনার সুখ খোঁজা—কাজ অর্থে পরের সুখ খোঁজা। যিনি নিষ্কাম অথচ ধর্ম্মপরায়ণ, তিনিই যথার্থ হিন্দু-রমণী।"

আর তাই-ই তাঁহার অপূর্ব্ব-সৃষ্টি প্রফুল্ল বলিত,—"একা আমি তোমার স্ত্রী নহি। তুমি যেমন আমার, তেমনি সাগরের, তেমনি নয়ান বৌয়ের। আমায় যেমন ভাল-বাস, উহাদিগকেও তেমনি ভাল না বাসিলে, আমার উপর তোমার ভালবাসা সম্পূর্ণ হইল না। ওরাও আমি।"

হিন্দু-রমণীর কি উজ্জ্বল মধুর পবিত্র প্রতিকৃতি! সপত্নীর প্রতি যাঁহার এমন স্বর্গীয় সহানুভূতি, সংসারের অপরাপর আত্মীয় স্বজনের প্রতি তাঁহার যে কি অপরূপ মধুর স্নেহ-ভালবাসা, তাহা আপনা-আপনিই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু, হায়! আজ আমাদের গৃহে ঠিক ইহার বিপরীত দৃশ্য!

২। এইরূপ, লব্ধপ্রতিষ্ঠ সুলেখক শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু মহাশয় লিখিতেছেন,—"আর্য্যদিগের আহার-প্রথা।" সকলকে শিখাইতেছেন,—

'আহারস্ত্বপি সর্ব্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।"

প্রভৃতি গীতার ব্যবস্থা। বুঝাইতেছেন,—"হিন্দু-শাস্ত্রে খাদ্যাখাদ্যের বিচারের যেরূপ প্রণালী ও প্রকৃতি, তদ্রূপ আর কোনও শাস্ত্রে

দৃষ্ট হয় না। মনের ইষ্টানিষ্ট বিচার করিয়া, মনুষ্যের সাত্বিক প্রকৃতির ইষ্টানিষ্ট বিবেচনা করিয়া, আহারে বিচার করা, যথার্থই অলৌকিক মনুষ্যত্বের কাজ, অসাধারণ আধ্যাত্মিক শক্তির কাজ—জগতে সে কাজ হিন্দু ভিন্ন আর কেহই করিতে পারেন নাই। আহারে আধ্যাত্মিকতা, আহারে ধর্ম্ম,জগতে হিন্দু ভিন্ন আর কেহ এ কথা বলিতে পারে নাই। তাহার কারণ, প্রকৃত আধ্যাত্মিকতা কি, নিগূঢ় ধর্ম্মতত্ত্ব কি, জগতে হিন্দু ভিন্ন আর কেহ তাহা বুঝে নাই। আহারে সম্যক্ বিচার না করিলে সাত্বিকতা লাভ করা যায় না, প্রকৃত ধার্ম্মিক হইতে পারা যায় না—হিন্দুশাস্ত্রের এই শিক্ষা। এ শিক্ষা কুশিক্ষা নয়—এ শিক্ষা কুসংস্কার নয়। এ বড় গূঢ় শিক্ষা, এ বড় আশ্চর্য্য শিক্ষা, এ বড় মহৎ শিক্ষা। এ শিক্ষা ভুলিলে বা ছাড়িলে হিন্দুকে হাড়ী হইয়া যাইতে হইবে। আধ্যাত্মিক বড় উচ্চস্তর হইতে বড় নিম্নস্তরে পড়িতে হইবে।”

চন্দ্রনাথ বাবু আরও বলিতেছেন,—“ভক্ষ্যাভক্ষ্যের বিচার ধর্ম্মের জন্য। আহারে বিচার, হিন্দুধর্ম্মের একটি প্রধান লক্ষণ, এবং কেবলমাত্র হিন্দুধর্ম্মেরই লক্ষণ। পৃথিবীতে অন্য কোন ধর্ম্মের এ লক্ষণ নাই। এই লক্ষণটি হিন্দুধর্ম্মের গৌরব, এবং বিশেষত্বের একটি প্রধান কারণ। যদি হিন্দুধর্ম্মের এ লক্ষণটি পরিত্যাগ কর, তবে তোমার হিন্দুধর্ম্মও পরিত্যাগ করা হইবে—তোমার হিন্দু-নামেও কলঙ্ক পড়িবে—আহারে বিচার না রাখিলে তোমার হিন্দুনামও লুপ্ত হইবে। ইটি খাইলে প্রায়শ্চিত্ত আবশ্যক, ওটি খাইলে জাতি যায়, হিন্দুশাস্ত্রের এই যে শাসন আছে, ইহা কুসংস্কারের উক্তিও নয়—লোভপরবশ পুরোহিতের প্রতারণা-বাক্যও নয়।”

৩। শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র কবিরত্ন, ‘চিকিৎসা-সম্মিলনীর’ সম্পাদক, কুষ্ঠাশ্রম-প্রতিষ্ঠা ও ‘লেডী ডফরিণ ফণ্ড’ দ্বারা স্ত্রীরোগ-চিকিৎসা-সম্বন্ধে লক্ষ্যভ্রষ্ট আর্য্য-সন্তানের কার্য্যাদি বিচার করিয়া, লিখিতেছেন,—“কুষ্ঠরোগ নিবারণ করিতে হইলে ঐ রোগের মূল অনুসন্ধান কর। কুষ্ঠাশ্রম খুলিলে রোগ নিবারণ হইল না। কথনও কি কুষ্ঠরোগের কারণ অনুসন্ধিৎসু হইয়াছে? হিন্দু-ঋষি বুঝিয়াছিলেন যে, যাহা ‘কু’ কদর্য্য বিষয়ে ‘তিষ্ঠতি’ থাকে, তাহাই কুষ্ঠ; হঠাৎ যে ব্যক্তি প্রতিনিয়ত ‘কু’ কদর্য্য আহার-বিহারী হয়, তাহারই কুষ্ঠরোগ জন্মে; সুতরাং এই ‘কু’-শব্দ আহার-বিহার বা পানীয় প্রভৃতি যাহাতে সংযোগ করিবে, অধিক কি, যাহার মূল ‘কু’ হইবে, তাহাই কুষ্ঠরোগের কারণ। আয়ুর্ব্বেদ বলিতেছেন,—‘যাহারা অপক্ক ও বিরোধী অন্নাদি ভোজন করে, যাহারা বমন ও মল-মূত্রাদির বেগ রোধ করে, ভুক্তদ্রব্য পরিপাক হইতে না হইতেই যাহারা পুনর্ভোজন করে, নবান্ন, দধি, মৎস্য, লবণ ও অম্লদ্রব্য যাহারা অতিশয় ভোজন করে, মাশকলাই, মূলক, পিষ্টান্ন, তিল, ক্ষীর ও গুড় যাহারা অধিক পরিমাণে ভোজন করে, যাহারা অতিরিক্ত ব্যায়াম করে, অতি সন্তাপ সহ্য করে, ঘর্ম্মাক্ত ও ভয়ার্ত্ত হইয়া যাহারা অবিলম্বে শীতল জল পান করে, ভুক্তদ্রব্যের পরিপাক হইতে না হইতেই যাহারা স্ত্রীসহবাস করে, দিবাভাগে যাহারা অধিক নিদ্রা যায়, তাহারাই অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হয়।’

“আর যিনি,—

‘নিত্যং হিতাহারবিহারসেবী সমীক্ষকারী
বিষয়েষ্বসক্তঃ।
দাতা সমঃ সত্যপরঃ ক্ষমাবানাপ্তোপসেবী
ভবত্যরোগঃ॥
অর্থেষ্বলভ্যেষ্বকৃত প্রযত্নং কৃতাদরং
নিত্যমুপায়বৎসু।
জিতেন্দ্রিয়ং নানুপতন্তি রোগাস্তৎকালযুক্তং
যদি নাস্তি দৈবং॥’

অর্থাৎ,—যিনি প্রতিদিন হিতজনক আহার-বিহার করেন, যিনি বিবেচনা-পূর্ব্বক কার্য্যানুষ্ঠান করেন, বিষয়ে যাঁহার আসক্তি নাই, যিনি দাতা,

সমদর্শী, সত্যপর, ক্ষমাবান, এবং যিনি আপ্তব্যক্তির সেবা করেন, রোগ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। কেবল তাহাই নহে, যিনি অলভ্য অর্থাৎ লাভের অযোগ্য অর্থের জন্য যত্ন করেন না, অথচ লাভের যোগ্য অর্থের প্রতি যিনি হতাদর করেন না, যদি দৈব ব্যাঘাত না ঘটে, তবে তিনি রোগাক্রান্ত হন না।

“আর তুমি—তুমি সকাল নাই, সন্ধ্যা নাই, বারাঙ্গনাসহ প্রবৃত্তি-চরিতার্থ করিয়া, নিতান্তপক্ষে পুণ্যময়ী সহধর্ম্মিণীকে প্রবৃত্তি-চরিতার্থের উপায় কল্পনা করিয়া, অর্থবলে আপনাকে সৌভাগ্যশালী জ্ঞান করিবে; তুমি এ নিদারুণ গ্রীষ্মপ্রধান দেশে পদে পদে শাস্ত্রকে পদদলিত করিয়া, ঘৃত-দুগ্ধ বা আলু-পটোলাদি এমন সমস্ত স্বর্গীয় অমৃত-খাদ্য থাকিতেও পচা মুরগী বা গো-শূকর-মাংস, আর নিতান্ত না হয় পচা ইলিশ-মৎস্য দ্বারা অহরহঃ উদর পূর্ণ করিবে; সুতরাং, তোমার রক্তদোষ না হইয়া—তোমার কুষ্ঠ রোগ না জন্মিয়া, তবে কি ভট্টপল্লীর ভট্টমহাশয়দিগের এ রোগ জন্মিবে? না, নবদ্বীপের ন্যায় বা শিরোরত্ন মহাশয়দিগের এ রোগ জন্মিতে পারে?”

৪। এইরূপ, আর একজন চিন্তাশীল লেখক শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়েরও মনোগতি দেখুন। তিনিও যেন দিব্যচক্ষে দেখিতেছেন,—পবিত্র আর্য্য-ঋষি এ সমাজের পশ্চাৎ হইতে দূরে যাইতেছেন; কৃষ্ণ, ব্রহ্ম, ব্রাহ্মণ, আর্য্যাবর্ত্ত পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছেন; কতকগুলা পিশাচ ইহাকে অন্ধকারে টানিয়া লইয়া যাইতেছে; ঘৃণিত বিজাতি-চর্ব্বিত, দুর্গন্ধময়, কৃমিকীট-পরিব্যাপ্ত, গলিত মাংসরাশি আহার করিতে করিতে, ব্যভিচারী উলঙ্গ পিশাচেরা উদ্ধত তাণ্ডব করিতেছে, এবং ভীতিকর দংষ্ট্রা করাল নিষ্কাশিত করিয়া অট্টহাস্য করিতেছে; আর্য্যঋষির আদরের দুহিতা ওষ্ঠাগত-প্রাণে কাতরোক্তি করিতেছে। তাই তিনি, জননীর দারুণ যন্ত্রণা আর দেখিতে না পারিয়াই যেন, বলিতেছেন,—“না বুঝিয়াছি, ইহাই শব-সাধনের সময়!” লিখিতেছেন,—“অমা-নিশার ঘোর অন্ধকার। আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন। শ্মশান-ক্ষেত্রের উপর দিয়া পৈশাচিক অট্টহাস্য-সহকারে চপলা চমকিয়া যাইতেছে; ফেরুপাল বিকট চীৎকার করিয়া ইতঃস্ততঃ ধাবিত হইতেছে; বিভৎসের সহিত ভয়ানকের মিশ্রণ হইয়াছে। গুরুদেব, কে এমন সময়ে শব-সাধনে নিযুক্ত হইবে?”

৫। এইরূপ, শ্রীযুক্ত নীলকণ্ঠ মজুমদার মহাশয় “হিন্দুর প্রাত্যহিক কর্ম্মের” তালিকা দিয়া দেখাইতেছেন যে,—“প্রত্যহ হিন্দুর ধর্ম্মে-কর্ম্মে প্রায় ॥৵ সময় যায়, সাংসারিক কার্য্যে ।৴, এবং ভোজনে ৴০ আনা সময় যায়। বাস্তবিক হিন্দু-শাস্ত্রে এরূপ উপায় পরিকল্পিত আছে, যদ্দ্বারা, উত্থান অবধি শয়ন-পর্য্যন্ত, কি জীবিতোপায়, কি অন্য বিষয়ে, যে কোন কার্য্যই করুন না কেন, তৎসমস্তই ধর্ম্ম-কার্য্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে। তুমি বলিবে, যদি ॥৴০ সময় ধর্ম্মে ব্যয় কর, তবে ধনবান বা বলবান হওয়া অসম্ভব। এজন্য দারিদ্র্য-দুঃখ অনিবার্য্য। কিন্তু, আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা এরূপে জীবন-যাপন করিয়াও বহু সম্পত্তির অধিকারী হইতেন; এবং শত শত আশ্রিত-অভ্যাগতকে প্রতিপালন করিতেন। আর আমাদের মধ্যে পনের আনা লোকের ‘অদ্যান্নংমে ধনুর্গুণং’; অথচ আমরা বিষয়ের কীট। আমরা, দয়া ধর্ম্ম, লোক-লজ্জা, সমাজ-ভয় প্রভৃতি, এমন কি চক্ষুলজ্জা পর্য্যন্ত সমস্তই, বিসর্জ্জন দিয়া, সকল প্রকার ন্যূনতা, হীনতা, অমর্য্যাদা স্বীকার করিয়া, অহরহঃ কেবল ‘টাকা টাকা’ করিতেছি। তথাপি আমাদের এরূপ হইবার কারণ, বোধ হয় এই যে, যাঁহারা ধর্ম্মবলে বলীয়ান্, তাঁহারা অনায়াসেই অর্থোপার্জ্জনে ও অর্থসংরক্ষণে সক্ষম হন। কিন্তু, যাহারা শুদ্ধ অর্থপিশাচ, তাহারা ত ধর্ম্মহীন হয়ই, এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে অর্থহীনও

হইয়া থাকে। অধার্ম্মিক ধর্ম্ম ও অর্থ বিবর্জ্জিত হইয়া 'ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্ট' হয়। তুমি শিক্ষিত—তুমি বলিবে,—পূর্ব্বে লোকে যে সুখে-সচ্ছন্দে থাকিত, তাহার কারণ, তখন 'জীবিত-সংগ্রাম' এত ভীষণ ছিল না। ইহার উত্তরে আমি বলি, অধার্ম্মিকের পক্ষে জীবিত-সংগ্রাম চিরকালই প্রবল। হংসও পক্ষী, শকুনিও পক্ষী। কিন্তু হংসের মধ্যে কেহ কখন কি জীবিত-সংগ্রাম দেখিয়াছেন? অথচ শকুনিতে অহরহঃই জীবিত-সংগ্রাম। কপোতও পক্ষী, বায়সও পক্ষী; কিন্তু, ইহার মধ্যে কপোতই বা কেন সানন্দমনে আকাশ-পথে বিচরণ করে; আর, বায়সই বা কেন জগৎ-সংসারকে প্রতারিত করিয়াও হাহা-রবে দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত করে? আজ-কাল বিবাহে অনেক পিতাই সর্ব্বস্বান্ত হয়—তথাপি যে পত্নী পিতার সর্ব্বনাশক পতিকে প্রেম করিতে পারে, তাহার প্রেম, প্রেম নহে—কাম। এইরূপে, আমাদের মূর্খতা, আমাদের কাপুরুষতা, আমাদের বিলাসিতা, আমাদের অধার্ম্মিকতা, আমাদের সর্ব্বপ্রকার অনর্থের মূল। একবার ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের দিকে চাহিয়া দেখ! অহো কি দুর্দ্দৈব! যে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের স্ত্রী শুভ্র-বসন পরিহিতা হইয়া, লৌহকড়-শঙ্খাভরণে ভূষিতা হইয়া, অরুন্ধতি বা সতী-সাবিত্রীর ন্যায় শোভমানা ছিলেন, যাঁহাকে দেখিলে দেবী বলিয়া ভ্রম হইত, তিনি আজ নীচাশয় বিলাসী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত কর্ত্তৃক রঙ্গিণীর বেশ ধারণ করিতে লজ্জা-বোধ করেন না! হিন্দু-শিক্ষা এখন শাস্ত্রে ও কাগজে-কলমে। হিন্দু-শাস্ত্রানুসারে চিত্তশুদ্ধি সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়। চিত্তশুদ্ধিই হিন্দুশাস্ত্রের মূলমন্ত্র। চিত্তশুদ্ধি ও চরিত্রোৎকর্ষ-ব্যতীত মনুষ্যের কোন কার্য্য সফল হইতে পারে না। আমরা সর্ব্ববিষয়ের সমালোচনা-মধ্যে আন্দোলন দেখিতে পাই। রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি সকল বিষয়ই আমরা আন্দোলন করি; অথচ চিত্তশুদ্ধি অভাবে সকল বিষয়েই অকৃতকার্য্য হই। রাজনীতি-সমালোচনের ফলে আমাদের পক্ষে কপটতা, স্বার্থপরতা, অবাধ্যতা আসিয়াছে। সমাজনীতি-আন্দোলনের ফল, অবিবেকিতা ও হটকারিতা; ধর্ম্মনীতি-আন্দোলনের ফল, অশান্তি ও অসূয়া। এই সমস্ত অমঙ্গল পরিহারারার্থ আমাদের সকলেরই সর্ব্বাগ্রে চিত্তশুদ্ধি অর্জ্জন করিবার জন্য যত্ন করা উচিত।"

৬। এইরূপ, শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ও দেশের বিকৃত-ভাবে বড়ই ব্যথিত। তিনিও দেখিতেছেন, দেশমধ্যে সাত্ত্বিক-ব্রাহ্মণের অভাব হইয়াছে। সংসার-সন্ন্যাসী, আত্মসংযমী, স্বচ্ছান্তকরণ যে ব্রাহ্মণ, ঈশ্বরে তন্ময় হইয়া, তাঁহার অনন্ত শক্তি, অনন্ত পবিত্রতা উপলব্ধি করিয়া, সর্ব্বকার্য্যে সর্ব্ববিষয়ে তাঁহার প্রকাশ দেখাইয়া দিতে সমর্থ ছিলেন; সমাধিস্থ, সমদর্শী, সূক্ষ্মদর্শী যে ব্রাহ্মণ, অধিকার বুঝিয়া, লক্ষ লক্ষ মানবের হিতের জন্য লক্ষভাবে পরমপুরুষের আবির্ভাব দেখিতেন ও দেখাইতেন; ভাষা ভিন্ন যেমন ভাবে প্রবেশ করান যায় না, সেইরূপ, প্রতিমা দিয়া যাঁহারা সেই তেজোময়, অমৃতময়, সর্ব্বানভূ পুরুষকে, অনন্ত আকাশে—অনন্ত মানবাত্মায়, মণিমালার মধ্যে সূত্রবৎ এই বিপুল ব্রহ্মাণ্ডে বিরাজিত দেখাইতেন; যে সূক্ষ্মদর্শী ব্রাহ্মণ প্রতিমা দিয়া সাধারণকে ভগবানের নিকট পৌঁছাইয়া দিতে পারিতেন; আজ সেই ব্রাহ্মণের অভাব হইয়াছে। অক্ষয় বাবু তাই প্রাণের কাঁদুনি কাঁদিতেছেন; উপদেশ দিতেছেন,—"অগ্রে ব্রাহ্মণ আনয়ন কর, পরে প্রতিমা স্থাপন করিও।" বলিতেছেন,—

"যে দেশে ব্রাহ্মণ নাই, সে দেশে সাকার প্রতিমা গড়ার চেয়ে, ভাল নিরাকার;
চক্ষু মুদে বসে আছি, আহিক বালাই,
ভূতশুদ্ধি, মনঃশুদ্ধি, কোন শুদ্ধি নাই॥
না লাগে তন্ত্র, না লাগে মন্ত্র, যন্ত্র, জল,
দেহের দোলন-মাত্র সাধন কেবল।

তন্ত্র নাই, মন্ত্র নাই, পাই না ব্রাহ্মণ;
ক'রো না ক'রো না ভাই! প্রতিমা-গঠন।"

হিন্দুর পবিত্র প্রতিমা লইয়া তুমি সং সাজাইবে; বিনা ব্রাহ্মণে প্রতিমা গড়িয়া মৃত্তিকা-পুত্তলি করিবে; আর,—

"কাঠ বাঁশ খড় দড়ী তুষ মাটী রঙ,
জড় করি করিবে হে চমৎকার সঙ।
ফুরসী গহনা দিবে, আরসী বসাবে,
কলকায় শিখিপুচ্ছ অবশ্য লাগাবে,
ঢাক-ঢোল বাজাইবে, করতালি দিবে,
প্রাণপ্রতিষ্ঠা কিন্তু করিতে নারিবে;
না মিলিবে পুরোহিত, না মিলিবে মন্ত্র,
শুদ্ধ আড়ম্বর হবে—ফক্কিকার তন্ত্র।"

ইহা আর দেখিতে পারি না। এই যে প্রাণের ব্যাকুলতা, ইহার মূলে পবিত্রতার আহ্বান। পবিত্রতা দেখিয়া, সাত্ত্বিক-রাজসিকভাব অনুভব করিয়া, ঘোর তমসাচ্ছন্ন তামসিক-ভাবে থাকিতে চায় কে? পবিত্রতা দেখিতেছি, তাই তামসিক কার্য্যে প্রাণ অস্থির। যখন তামসিকের দোষ বিচার করিতেছ, তখন তুমি সাত্ত্বিকতা অনুভব করিয়াছ! পশু তাহার পশুত্ব জানিতে পারে না। কিন্তু, যখন পশু হইতে উন্নত অবস্থার বিষয় অনুভব করিতে পারি, যখন উন্নত অবস্থার যাইতে পারি, তখন ঊর্দ্ধ হইতে নিম্নে চাহিয়া দেখি—কি অধম ছিলাম!

৭। এইরূপ, সূক্ষ্ম ও স্থূল-তত্ত্বজ্ঞ শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্ন্যাল মহাশয়ের কথা কয়টিও উপেক্ষিত হইবার নহে। তিনি বলেন,—"স্থূলের হাড়ে হাড়ে সূক্ষ্মের বৈদ্যুতিক শক্তি পরিচালিত করিতে না পারিলে, দেহ-রক্ষা, সমাজ-রক্ষা, দুর্ব্বল-রক্ষা, জাতি-রক্ষা, মনুষ্য-নাম-রক্ষা হয় না।—হিন্দুসমাজে অধিকারী ভেদে স্থূল ও সূক্ষ্মের আয়োজন-অনুষ্ঠানও ছিল; আর একই সমাজে সূক্ষ্ম ও স্থূল দুই ছিল বলিয়া, সূক্ষ্ম ও স্থূলভেদে—অধিকারী ভেদে—ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রাদির ভেদাভেদের অনুষ্ঠান ছিল বলিয়া, বর্ণাশ্রম ও যোগাশ্রমের সংযোগ ছিল বলিয়া, পূর্ব্বের সঙ্গে তুলনায় আজ হিন্দুজাতি অধমাধম হইয়াও, তবু অন্যের পক্ষে পর্ব্বত; আজিও হিন্দুর সূক্ষ্মশক্তির ত্রিসীমায় ঘেঁসিতে পারে, এমন সূক্ষ্মশক্তি বাহিরে নাই; এজন্য আজ এত অত্যাচারেও হিন্দুজাতি টিকিয়া আছে।"

শ্রীযুক্ত দীননাথ বাবু আরও বলেন,—"যাঁহারা হিন্দুহিতৈষী, তাঁহারা শিক্ষিত হিন্দুদিগের মন লুপ্তপ্রায় সূক্ষ্মবিজ্ঞানের দিকে আকর্ষণ করিতে বিধিমত প্রকারে চেষ্টা করিতেছেন; সূক্ষ্ম শক্তির প্রভাব বুঝাইয়া ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে সেই শক্তি পুনরাহরণের জন্য উপদেশাদি দিতেছেন,—ইহা বাস্তবিকই এই অধঃপতিত হিন্দুজাতির উদ্ধারের পক্ষে একটি প্রকৃষ্ট পন্থা, সন্দেহ নাই। সূক্ষ্ম-শক্তি যে সমাজের মজ্জাগত, সূক্ষ্ম-বিজ্ঞান যে সমাজের 'জান', সে বিজ্ঞান, সে শক্তিকে তুচ্ছ করিয়া, বাদ দিয়া, হিন্দুর উদ্ধার কখনই হইবে না; তাহা করিতে গেলে বরং হিন্দুর বিনাশ সাধনেই বিলক্ষণ সুবিধা হইতে পারে। হিন্দুর সূক্ষ্মকে বাদ দেওয়া, আর হিন্দুর বিনাশ সাধন করা, একই কথা। সূক্ষ্ম-বর্জ্জন করিয়া, শুধু স্থূল অর্জ্জন করিতে গেলে, পরিণামে বিভ্রাট আছেই!"

৮। এইরূপ, 'উদ্ভ্রান্ত-প্রেম'-প্রণেতা শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের কাতরোক্তি, বোধ হয়, পাষাণ হৃদয়ও বিদ্ধ করিবে। চন্দ্রশেখর বাবু লিখিতেছেন,—"কি ছিল, আর কি হইল! চাহিয়া দেখি, ভাবিয়া দেখি, সে সকল মানুষ আর নাই—যাঁহারা সমাজ-সেবানিরত ছিলেন, যাঁহারা ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান করিতেন, তৃষ্ণার্ত্তকে পানীয় দিতেন, শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা করিতেন—সে সকল মানুষ আর নাই। যাঁহাদের ধর্ম্মে-নিষ্ঠা ছিল, কর্ত্তব্যে মতি ছিল, দেবতা-ব্রাহ্মণে ভক্তি ছিল, অতিথি-অভ্যাগতের সেবা ছিল, সংসার-ধর্ম্মে জ্ঞান ছিল, প্রাণে মনুষ্যত্ব ছিল—

তাঁহারা আর নাই। এক্ষণেও মানুষ আমরা আছি, কিন্তু কত প্রভেদ! আমরা এখন সেবক কেবল গৃহিণীর, আশ্রয় কেবল স্বর্ণকারের, বন্ধু কেবল নিজের। আমাদের স্বদেশানুরাগ, আমাদের ধর্ম্ম, আমাদের সমাজ-নীতি, আমাদের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, সবই বাক্যে পরিণত—সবই কেবল কথার মারপেঁচ। কিন্তু, কেবল কথায় কি হইবে ভাই? —তোমার বক্তৃতা রাখ, কার্য্যে মন দাও। পৃথিবী কার্য্যক্ষেত্র, বক্তৃতাক্ষেত্র নহে।

"মহিলাকুলের দিকে চাহিয়া দেখি, হায়, কি ছিল, কি হইয়াছে? আর্য্য-ঋষির সাধের বাগান শুখাইয়া গিয়াছে। যিনি স্নেহময়ী ছিলেন, তিনি আত্মময়ী হইয়াছেন; কল্যাণী রঙ্গিণী হইয়াছেন; ব্রতধারিণী বিলাসিনী হইয়াছেন; যিনি সহধর্ম্মিণী ছিলেন, বলিতে লজ্জা করে, তিনি এখন সহশায়িনী। সে লজ্জা নাই, গৃহধর্ম্মে সে অনুরাগ নাই, সে আত্ম-বিসর্জ্জন নাই। গৃহসেবা আত্ম-সেবায় পরিণত হইয়াছে। পতিভক্তির স্থান আলসা-ভক্তি, ধর্ম্মানুরাগের স্থানে আলস্যানুরাগ—এই সকল আত্মনিরতা, বিভ্রম-তৎপরা, রঙ্গপরায়ণা, বিলাসিনীদিগকে দেখিয়া সত্যই মনে হয়, পূর্ব্বের সেই আত্ম-বিসর্জ্জিতা, পরার্থপ্রাণা, ধর্ম্মৈকশরণা, জগদ্ধাত্রী-রূপিণীরা কোথায় গেলেন?"

৯। এক্ষণে আমরা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি শ্রীযুক্ত বাবু রমেশচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের বিচার দিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। রমেশ বাবু বলিতেছেন,—"অনেকের মুখেই আমরা শুনিতে পাই যে, আমাদের সমাজে আজকাল স্ত্রী-স্বাধীনতা নাই—স্ত্রী-স্বাধীনতা না থাকিলে সমাজের উন্নতি হয় না। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, সত্য সত্যই কি আমাদের স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা নাই—সত্য সত্যই কি স্ত্রীজাতি আমাদের সমাজে পরাধীন? পাশ্চাত্য-শিক্ষার গুণেই (বা দোষে?) আমাদের এরূপ বিশ্বাস দাঁড়াইয়াছে; পাশ্চত্য-শিক্ষার স্রোতে আমাদের প্রাচীন রীতিনীতি সমস্ত ভাসিয়া যাইতেছে; পাশ্চত্য-শিক্ষার বলে প্রাচীন সনাতন-ধর্ম্মের প্রতি আমাদের অনাস্থা জন্মিয়া আসিতেছে। কিন্তু আর্য্যধর্ম্ম আজও সেই স্রোতে ভাসিয়া যায় নাই। এ দুর্ব্বার তরঙ্গের স্রোতে সেই ধর্ম্মকে টানিয়া রাখিয়াছে কে? আমার বিশ্বাস, এবং অনেকেই এ কথায় আমার সহিত একমত হইবেন যে, হিন্দু-রমণীর ধর্ম্মশীলতা-গুণেই হিন্দু-ধর্ম্ম এখনও পাশ্চাত্য-শিক্ষার স্রোতে ভাসিয়া যায় নাই। যদি তাই হয়, তবে স্ত্রীজাতি কি স্বাধীন নয়? যাহাদের শক্তি পুরুষের শক্তিকে অতিক্রম করিয়া জয়লাভ করিয়াছে, তাহারা কি স্বাধীন না পরাধীন? জোর কার?—পুরুষের না স্ত্রীর? পরাধীন কে?—স্ত্রী না পুরুষ? আমার মতে স্ত্রীজাতি আমাদের সমাজে পরাধীন, এ কথা সত্য নয়। আবার পাশ্চাত্য-শিক্ষা-মতে আমরা জানিয়াছি, বাল্য-বিবাহ বড় মন্দ। আজকাল যাঁহারা শিক্ষিত বলিয়া আপনাকে মনে করেন, শিক্ষিত বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই বলিয়া বেড়ান, বাল্য-বিবাহ-প্রথা বড় দূষনীয়। বাল্য-বিবাহ যদি দূষ্য বলিয়াই তাঁহাদের মনে ধারণা থাকে, তবে 'শিক্ষিত' সমাজে বাল্য-বিবাহ রহিত হইল না কেন? তাহাও সেই স্ত্রীজাতির অনুরোধে। স্ত্রীজাতি এ প্রথা রহিত করিতে দেন নাই। আবার বলি, স্ত্রী স্বাধীন না পরাধীন! শক্তি কার?—পুরুষের না স্ত্রীর? শাস্ত্রে আমার জ্ঞান নাই, শাস্ত্রে আমার চর্চ্চা থাকিলে আমি আজ শাস্ত্র হইতে ভূরি ভূরি প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতে পারিতাম যে, শক্তি-রূপিণীর শক্তির কাছে সর্ব্বদা সকল শক্তিই অবনত হইয়া আসিয়াছে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, স্ত্রীদিগের স্বাধীনতা বিধেয় কি না? আমার মতে যদি স্ত্রী জাতি প্রকৃত পক্ষে শিক্ষিতা হয়, (পশম হাতে মুচির কাজ করাকে আমি শিক্ষা বলি না) যদি প্রকৃত জ্ঞানার্জ্জন, যদি প্রকৃতরূপে হৃদয় মার্জ্জিত হয়, তাহা হইলে স্ত্রী-স্বাধীনতা দোষের নয়। যে পরিমাণে শিক্ষা হইবে, সেই পরিমাণে স্বাধীনতা বিধেয়। অশিক্ষিত অসংযত চিত্তকে কি স্বাধীনতা দেওয়া যায়? বনের পশুকে কি স্বাধীনতা দিয়া বিশ্বাস হয়? এইভাবে মূর্খ স্বামীর পরিবর্ত্তে বরং পবিত্রা ভার্য্যাকে স্বাধীনতা দেওয়া ভাল।" ইত্যাদি।

এইরূপ বাঙ্গালার প্রায় অধিকাংশ শিক্ষিত ও ভাবুক-শ্রেণী হইতে দেখান যায় যে, সকলের অন্তরেই এক্ষণে এক অপূর্ব্ব ধর্ম্ম-প্রবাহ প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তদ্ভিন্ন, এই প্রবন্ধে আমরা সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত-মহাশয়দিগের নামোল্লেখ তো করিই নাই! যাঁহারা আর্য্য-ভাব ভিন্ন অন্যভাব হৃদয়ে পোষণ করিতেই জানেন না, তাঁহাদের নিকট আর্য্য-পবিত্রতা তো চিরকালই আদরের সামগ্রী! কিন্তু, যাঁহাদের নিকট ঐ পবিত্রতা এতকাল লুপ্ত ছিল—মোহময়ী প্রমাদ-মদিরা-পানে এতদিন যাঁহারা উন্মত্ত ছিলেন, তাঁহাদের হৃদয়েও যে সুপ্তভাব জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে, ইহাই শুভলক্ষণ বলিতে হইবে। আর সেপক্ষেও, আমরা প্রায় সকল শ্রেণীর ভাবুক ও চিন্তাশীল ব্যক্তি হইতেই দেখাইলাম যে, আর্য্য-ধর্ম্মের পুনরুত্থানের জন্য সকলেরই প্রাণ কাঁদিতেছে।

বাস্তবিকই যদি তাহাই হয়—আত্মসংযমী, শুদ্ধাচারী, নিষ্কামকর্ম্মী যে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত এক সময়ে সমাজের রক্ষক ছিলেন, একমাত্র যাঁহাদের অবহেলাতেই আর্য্য-জাতির এই ভীষণ দুরবস্থা ঘটিয়াছে—বাস্তবিকই তাঁহারা যদি স্বপথে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া, ভূতশুদ্ধি, চিত্তশুদ্ধি, আত্মজ্ঞান, আত্মদর্শন-রূপ হিন্দুশাস্ত্রোক্ত মহানিধিগুলি জগতের সমক্ষে ধরিয়া দেন; তবে জগতের সমগ্র জাতি, সমগ্র জগতের সমগ্র শিক্ষা, মহাশত্রুভাবে আর্য্য-শিক্ষাকে আক্রমণ করিলেও, এ শিক্ষা পরাস্ত হইবে না। লোকে পরাস্ত হইয়া, তখন আবার এই শিক্ষাই গ্রহণ করিবে—এ জাতির ছায়া-স্পর্শ করিতে পারে, জগতে এমন জাতি তখন আর কেহই থাকিবে না।

যাহা সত্য, অগ্রে তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের অন্তরেই স্থান পায়; ক্রমে ক্রমে তাহা সাধারণে আদৃত হয়;—এই নিয়ম। সুতরাং আমাদের সমাজে যখন এরূপ স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, তখন আর নীরবে থাকা কর্ত্তব্য নহে!

যে কারণেই হউক, যখন প্রবল জলকল্লোলের ন্যায় আর্য্য-পবিত্রতা, আর্য্য-সাত্ত্বিক-ভাবের আহ্বান শ্রুত হইতেছে—যখন আদর্শ হৃদয়ে প্রবেশ করিতে চায়, তখন, এই পবিত্রতা, এই সাত্ত্বিকভাব, এই সাত্ত্বিক আদর্শ, হৃদয়ে তুলিয়া লইবার ইহাই প্রকৃত সময়।

হইতে পারে,—হৃদয় আমাদের কলুষিত, বুদ্ধি আমাদের বিকারগ্রস্ত, দৃষ্টি লক্ষ্যহীন; হইতে পারে,—আমরা প্রকৃত মনুষ্যত্বহীন হইয়া পড়িয়াছি; কিন্তু, ইহাও যে হইয়াছে, তাহাও এই সাত্ত্বিকতার অভাবেই—এই আর্য্য-শিক্ষা ও আচার-ব্যবহারের অনবলম্বনে। যদি পবিত্রতা মানবজীবনের উদ্দেশ্য হয়, যদি আত্মজ্ঞান ও আত্মদর্শন জীবনের লক্ষ্য হয়, যদি ধর্ম্মজীবনই প্রকৃত মনুষ্যত্ব হয়, তবে এই কলুষিত চিত্ত পরিষ্কার করিতে হইবে—তবে এই কলঙ্কিত মুকুর স্বচ্ছ করিতে হইবে। যদি হৃদয় পবিত্র না হয়, যদি মনের ময়লা না কাটে, তবে যিনি পূর্ণ-পবিত্রতা, যিনি পূর্ণ-নির্ম্মলতা, তাঁহাকে বসাইবে কোথায়? যদি হৃদয়-দর্পণ স্বচ্ছ না করিতে পার, যদি বিষয়-সংস্কার-ধূমে মন অন্ধকার করিয়া রাখ, তবে কি দিয়া সেই পূর্ণ-জ্যোতি দেখিবে? তাই বলিতেছিলাম,—তামসিক ভাব—আসুরিক ভাব—পশুভাব ত্যাগ করিয়া, সাত্ত্বিক ভাব—প্রকৃত মনুষ্যত্ব গ্রহণ করিবার সময় আসিয়াছে।

লোকে বলিয়া থাকে, কিরূপে বুঝিব—চিত্ত কলুষিত কিনা? সংসারী হইতে কেহ নিষেধ

করে না; স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের প্রতি কর্ত্তব্য-অবহেলা করিতে কেহই পরামর্শ দেয় না। তবে এরূপভাবে সাংসারিক কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে হইবে, যাহাতে প্রকৃত মনুষ্যত্ব বিনষ্ট না হয়। সাংসারিক ব্যক্তির চিত্ত কলুষিত কিনা, ইহা সহজেই নির্ণয় করা যায়। সংসারী কে? যিনি বিষয়-চিন্তার সময় কেবল বিষয়-চিন্তাই করিয়া থাকেন—অন্য চিন্তা করেন না, তিনিই পূর্ণ বিষয়ী। সেইরূপ, প্রকৃত মনুষ্য কে?—ইহা বুঝিতে হইলে, দেখিতে হইবে,—ঈশ্বর-চিন্তার সময় যিনি কেবল ঈশ্বর-চিন্তাই করিয়া থাকেন, অন্য চিন্তা যাঁহার হৃদয়ে আসিতে পারে না, তিনিই প্রকৃত মনুষ্য। যিনি, যখন যে চিন্তা করেন, তখন কেবল সেই চিন্তাই করিতে পারেন, তিনিই ক্ষমতাবান্। কিন্তু, ভগবানের চিন্তার সময়ে তুমি কি কেবল সেই চিন্তাই করিয়া থাক? যত অল্প সময়ই হউক না কেন, ঈশ্বরে মনোনিবেশ করিবার সময় কি বিষয়-বাসনা হইতে মনকে সংযত করিয়া তুমি কেবল-মাত্র ঈশ্বরে চিত্ত-সমর্পণ করিতে পার? বিষয়-বাসনা হইতে মন গুটাইয়া যদি তুমি ইচ্ছা-মাত্র ঈশ্বরে একাগ্র হইতে পার, তবে তোমার চিত্ত নির্ম্মল—চিত্তের কলুষতা নাই। যদি তাহা না পার, তবে তোমার চিত্ত কলুষিত। আর, এজন্যই বলিতেছিলাম, বিষয়-কর্ম্ম এরূপভাবে করিতে হইবে, যাহাতে তোমার ঈশ্বরৈকাগ্রতা নষ্ট না হয়। অর্থাৎ সংসারী ব্যক্তির পক্ষে যেমন অগ্রে বিষয়, পরে ঈশ্বর, সেইরূপ প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিতে হইলে, অগ্রে ঈশ্বর, পরে বিষয়। বিষয়ী ব্যক্তি যেমন মনে করে,—বিষয়-চিন্তা হইলেই হয়—ঈশ্বর-চিন্তা হউক না হউক, ক্ষতি নাই; প্রকৃত মনুষ্যত্ব-লাভ করিতে হইলেও সেইরূপ ঈশ্বর-চিন্তাই সর্ব্বক্ষণ থাকিবে—বিষয় না হইলেও হইল, এ ভাব আসিবে। শুদ্ধ বিষয়াশক্তির নাম পশুত্ব; শুদ্ধ ঈশ্বরাশক্তির নাম মনুষ্যত্ব। তবে একটু প্রভেদ এই যে, শুদ্ধ পশু হইলে ঈশ্বরকে ডাকা হয় না; কিন্তু ঈশ্বরকে ডাকিলে, কখন উদরের জন্য অথবা পরিবারের জন্য বিব্রত হইতে হয় না। ফলে এখন আমরা যাহা হইয়াছি, ঠিক তাহার বিপরীত হইতে হইবে। তাহাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব। ঈশ্বর কেবল মুখে মানিয়া বিষয়াশক্ত হইলে, মনুষ্য-জন্ম লাভ করিবার কোন আবশ্যকতা নাই। আর, যখন মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াছ, তখন ঈশ্বরের নিয়ম-বহির্ভূত কার্য্য করিয়া পাপপঙ্কে নিমগ্ন হওয়া অপেক্ষা একেবারে পশু হওয়াই শ্রেয়স্কর।

আর, এইজন্যই বলিতেছিলাম, মনুষ্যত্ব লাভ করিবার সময় আসিয়াছে। প্রাকৃতিক যে ধর্ম্মভাব হৃদয়-মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছে, সেই ধর্ম্মভাব স্থায়ী করা সকলেরই কর্ত্তব্য। এক্ষণে সেইরূপ করায়ই আমাদের প্রকৃত উন্নতি এবং আমাদের ভাবী-বংশের মনুষ্যত্ব নির্ভর করিতেছে।

দাদাভাই নারোজী।

আশার একটি ক্ষীণালোক, এতদিনের চেষ্টার পর, একজন ভারতবাসী বিলাতের পার্লামেণ্ট মহাসভার সভ্যপদে প্রবেশ লাভ করিয়াছেন।

যদিও তিনি বাঙ্গালী নহেন, যদিও তিনি হিন্দু নহেন, যদিও তিনি বিধর্ম্মী ও বিরুদ্ধবাদী; তবুও মনের প্রবোধ এই যে, তিনি এই হত-ভাগিনী ভারতভূমিতে জন্ম-পরিগ্রহ করিয়াছেন—ভারত-ভূমিই তাঁহার জন্মভূমি। আর তাই তাঁহাতে এই দুরাশার ক্ষীণালোক দেখিতেছি—তাঁহারই দৃষ্টান্তে, হয় তো কালে, আমরা আমাদের কোন প্রকৃতই 'ভারত-বন্ধুকে' ঐ পদে প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখিব।

ইতিপূর্ব্বে বাগ্মিপ্রবর শ্রীযুক্ত বাবু লাল-মোহন ঘোষ মহাশয়, পার্লামেণ্টে প্রবেশ-লাভ করিবার জন্য দুইবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন

দাদাভাই নারোজী।

—দাদাভাই নারোজীও একবার অকৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। কিন্তু, এবারের নির্ব্বাচনে, অবশ্যই শুভাদৃষ্ট বলিতে হইবে, দাদাভাই নারোজী পার্লামেণ্টের সভ্য মনোনীত হইয়াছেন।

১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা সেপ্টেম্বরে দাদাভাই নারোজি বোম্বাই-সহরে ভূমিষ্ঠ হন। তাঁহার পিতা জাতিতে পার্শী ছিলেন; তিনি ধর্ম্ম-যাজকের কার্য্য করিতেন। বোম্বাই-নগরের এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ কলেজ, দাদাভাই নারোজির প্রথম শিক্ষালয়। ছাত্রাবস্থার পর তিনি ঐ বিদ্যালয়ের সহকারী প্রথম শিক্ষকের কার্য্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। ক্রমে অধ্যাপক-পদেও তিনি অধিরূঢ় হইতে পারিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি শিক্ষা-সংক্রান্ত ও সামাজিক নানা ব্যাপারে লিপ্ত থাকিতেন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে 'রাস্ত গোফ্তার' নামে এক সংবাদপত্রের সম্পাদকতা করেন। তিনি ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপকের কার্য্য ত্যাগ করিয়া কোন 'হৌসের' অংশ ক্রয় করেন। এই সময় হইতে তিনি বিলাতে থাকিতে আরম্ভ করেন। তথায় তাঁহাকে একাদিক্রমে থাকিতে হইত না—সময়ে সময়ে স্বদেশে প্রত্যাগত হইতে পারিতেন। "ঈষ্ট ইণ্ডিয়ান্ এসোসিয়েসন" নাম্নী সভা, তাঁহারাই প্রগাঢ় পরিশ্রমের ফল। এই সভা পর্য্যাপ্ত আন্দোলন করাতেই ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে পার্লেমেণ্ট মহাসভায় ভারতের রাজস্ব-সম্বন্ধে অনুসন্ধানার্থ একটি 'সিলেক্ট কমিটী' অর্থাৎ নির্ব্বাচিত সদস্য সভা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তিনি, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে, ইংলণ্ড হইতে স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া, বরদা-রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীর কর্ম্মে অধিষ্ঠিত হন। তাঁহার শাসন-প্রভাবে রাজ্যের সর্ব্বত্র সুশৃঙ্খলা বিরাজিত ছিল। পর বৎসরেই তিনি 'বোম্বাই-মিউনিসিপালিটীর' সভ্য হইয়াছিলেন। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি একবার পার্লেমেণ্টের সভ্য-শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইবার নিমিত্ত

সচেষ্ট হন। এই তাঁহার প্রথম উদ্যম। সেই উদ্যমে তিনি ব্যর্থ-মনোরথ হইয়াছিলেন। এই সময় অন্যতর প্রধান মন্ত্রী লর্ড সালিস্‌বরি, তাঁহাকে "কালা আদ্‌মি" বলিয়া অবজ্ঞা করায় তাঁহার নাম সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। ইহাতে তাঁহাকে 'লিবারেল্' অর্থাৎ উদার-মতাবলম্বীরা সম্মানিত করিতে লাগিলেন। কেন না, তিনি নিজেও উদার-দলেরই লোক। সেবার বিফল হইয়াও, এবার তিনি সফল হইলেন,—ইহাই ভারতবাসীর অল্প আনন্দের কথা নয়।

সর্ব্বনাশী!

("গোলোক-ধাঁদাই" বটে!)

(১)

"সত্যিই বল্‌চি!"

"না—না! তাও কি হ'তে পারে?"

"তুমি তো আমার কথা বিশ্বাস কর্‌বেই না! তুমি মনে কর, সতীন ব'লেই বুঝি বলি! কিন্তু তা নয়—তা নয়! আমি সত্যিই বল্‌চি!"

"দেখাতে পার?"

"কেন পার্‌বো-না? প্রায়ই তো রাত্তির দু'পুরের সময়, মই দিয়ে উঠে, নগেনদের বাড়ী যায়। এ আর কেন দেখাতে পার্‌বো-না!"

বিমলা, জ্ঞানেন্দ্রনাথের কানে, কেবলই এই মন্ত্র প্রদান করে। দিন নাই, রাত নাই, একটু সুবিধা পাইলেই, সে অমনি ফাঁদিয়া বসে,—"তুমি প্রমদা বল্‌তে অজ্ঞান বটে, কিন্তু প্রমদা তোমায় চায় না—প্রমদার টান সেই নগেনের উপর। প্রমদার ধ্যান-জ্ঞান সবই সেই নগেন্দ্রনাথ—তা' তুমি বিশ্বাস কর, আর নাই কর!" বিমলা, তার আবার প্রমাণ দেখাইতে যায়; দিব্য-পর্য্যন্ত করিয়া, তাহার সত্যতা-সম্বন্ধে স্বামীর সন্দেহ-ভঞ্জন-জন্য চেষ্টা করে।

কিন্তু প্রথম প্রথম, জ্ঞানেন্দ্রনাথ, সে সব বড় একটা যেন শুনেও শুন্‌তেন না! বিমলার কথায় যদিও সময় সময় তাঁর মনে কোন সন্দেহের উদয় হইত, কিন্তু যেই প্রমদার সুন্দর মধুমাখা মুখখানি দেখিতেন, অমনি সকলই যেন ভুলিয়া যাইতেন। প্রমদাকে দেখিলেই, সেই হাসি হাসি মুখে কথা কহা—সেই খুঁটিনাটি রঙ্-তামাসা করা—তা'র কিছুরই ব্যত্যয় ঘটিত না। তবে বিমলা, তাঁহাকে বড়-একটা প্রমদার ঘরে আসিতে দিত না, এতেই যে যা' মনে করিতে পারেন!

যাইহোক, 'সেদিন' যখন জ্ঞানেন্দ্রনাথ প্রমদার ঘরে আসিয়াছিলেন, তখনও তাঁর মনে কোন অন্য ভাবের স্থান পায় নাই। তাই তিনি, স্বভাব-সুলভ চপলতা বশতঃই হউক—আর যে কারণেই হউক, প্রমদাকে অন্যমনস্ক দেখিয়া, পিছন হইতে তাহার চোখ চাপিয়া ধরিয়াছিলেন।

কিন্তু প্রমদা যেই হাসিতে হাসিতে বলিল,—"আর কেন ভাই, চিনি-চি—চিনি-চি! আর কেন চোখ ধর—নগেন!" অমনিই তাঁহার মনে দারুণ সন্দেহের উদয় হইল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন,—"ওঃ! বিমলা যা' বলেছে, ঠিকই তাই! প্রমদার ধ্যান-জ্ঞান সবই সেই নগেন্দ্রনাথ!" সেই সঙ্গে সঙ্গে অমনি, তিনি মনে মনে স্থির করিয়া লইলেন,—"হয় তো বা নগেন্দ্রনাথও কোন কোন দিন রাত্রে এখানে চুপি চুপি এসে থাকে!" তাই, পরক্ষণেই অমনি, ত্বরিত-পদে সে ঘর হইতে প্রস্থান করিলেন।

প্রমদা, অহ্লাদ প্রকাশ করিয়া, বলিতেছিল,—"তুমি!—আজ আমার কি সুপ্রভাত!" কিন্তু জ্ঞানেন্দ্রনাথ, তাহা আর না শুনিয়াই, অমনি চলিয়া গেলেন। প্রমদা, তাঁহাকে ফিরাইবার জন্য, কতকদূর অগ্রসর হইয়াও—সম্মুখে তাহার শ্বশুর-মহাশয়কে দেখিয়াই, ফিরিয়া আসিল। জ্ঞানেন্দ্রনাথ সিঁড়ি দিয়া তর্‌তর্ করিয়া নীচে নামিয়া গেলেন।

এই অবধিই প্রমদার প্রতি জ্ঞানেন্দ্রনাথের

সন্দেহ-দৃষ্টি! এই অবধিই জ্ঞানেন্দ্রনাথ সদাই উদ্‌গ্রীব—ঐ—ঐ বুঝি প্রমদা নগেন্দ্রনাথদের বাড়ীতে যায়! তার উপর আবার বিমলার নিত্য-নূতন প্ররোচনা! সোণায় সোহাগা আর কি! এখন, পাতাটি নড়িলেই, কুটোটি পড়িলেই, যেন তাঁহার মনে সন্দেহ হয়,—ঐ—ঐ বুঝি কে আসিতেছে—ঐ—ঐ বুঝি কুল-কলঙ্কিনীর কলঙ্ক-কাহিনী লইয়া গ্রামের অবাল-বৃদ্ধ-বনিতা আন্দোলন করিতেছে!

(২)

দুই জনেই প্রায় সমদুঃখে দুঃখী; তাই দুই জনে এত ভাব। কবি কি সুন্দর বলিয়াছেন,—

"কি যাতনা বিষে ,বুঝিবে সে কিসে,—
কভু আশীবিষে, দংশেনি যারে।"

ব্যথার ব্যথী নহিলে ব্যথা বুঝিবে কে? নগেন্দ্রবালায় আর প্রমদায়, তাই এত ভাব—এত মেশামিশি। উভয়েই উভয়কে আপন সুখ-দুঃখের কথা জানায়; উভয়েই উভয়ের জন্য ব্যাকুল। প্রমদার কোন কথা নগেন্দ্রবালাকে না বলিলে যেন তাহার তৃপ্তি হয় না; আবার নগেন্দ্রবালাও, যে কোন কথাই হউক, প্রমদাকে না বলিয়া স্থির থাকিতে পারে না।

কখনও নগেন্দ্রবালা, দুঃখ করিয়া বলে,—"সবই অদৃষ্টের দোষ! আমার মা-বাপ তো আর মন্দ দেখে বিয়ে দেন-নি! অমন দশরথের মত শ্বশুর, কৌশল্যার মত শ্বাশুড়ী, রামের মত স্বামী, রাজা-রাজড়ার মত বিষয়-আশয়—আমার কিসের অভাব ছিল, ভাই! কিন্তু, আমারই অদৃষ্ট-দোষে দেখ,—অমন শ্বশুর-শ্বাশুড়ীও স্বর্গে চলে গেলেন—সঙ্গে সঙ্গে স্বামীও আমার প্রতি এমন বিরূপ হ'লেন! হায়! সবই আমার অদৃষ্ট!"

এইরূপ, প্রমদাও আবার, দুঃখপ্রকাশ করিয়া, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে,—"ভাই, স্বামী কেন আমার এমন হ'লেন? তিনি পূর্ব্বে আমায় যত ভাল-বাসতেন, এখন আর কেন তেমন ভালবাসা দেখ্‌তে পাই-নে?"

এই সঙ্গে সঙ্গে প্রমদার মনে, আরও কতই কি দুর্ভাবনার উদয় হয়। প্রমদা প্রশ্নচ্ছলে আবার বলে,—"ভাই, সেদিন থেকেই স্বামীকে কেন এমনতর দেখ্‌ছি! সেদিন যখন তিনি পিছন থেকে আমার চোখ টিপে ধরেন, আমি মনে করেছিলাম,—বুঝি তুমি চোখ ধরেছ, ভাই; আর, তাই-ই বলেছিলাম,—'চিনে-চি—চিনে-চি—কেন আর চোখ ধর, নগেন!' কিন্তু ভাই, এতে আর আমার কি অপরাধ হতে পারে যে, ঘর থেকে তিনি বেরিয়ে চলে গেলেন? আর, তারপর থেকেই ভাই, কেন তাঁর এমনতর ভাব?"

নগেন্দ্রবালা, যদিও আভাসে কতকটা বুঝিতে পারিয়াছিল যে, প্রমদার উপর জ্ঞানেন্দ্রনাথের অবিশ্বাস জন্মিয়াছে। কিন্তু, কি ক'রে এ কথা সে আর প্রকাশ ক'রে বলে? কাজেই, সে কোনই উত্তর দিতে পারিল না। কেবল আপন মনে-মনেই দুঃখ করিতে লাগিল,—"আমারই অদৃষ্ট-দোষে বুঝি প্রমদার এমন হ'লো! প্রমদার সঙ্গে এক সঙ্গে বসি-দাঁড়াই, প্রমদাকে পেয়ে মনের বেদনারও কতকটা উপশম পাই,—তাই বুঝি বিধাতার এই চক্র? হায় প্রমদা! কেন তুমি তখন এ অভাগিনীর নাম করেছিলে?" নগেন্দ্রবালার মনে ক্রমে এমনই অনুশোচনার উদয় হইতে লাগিল।

কিন্তু, নগেন্দ্রবালা, সেভাব আর কিছু প্রকাশ না করিয়া, এইমাত্র বলিল,—"আজ তবে চল্‌লেম ভাই!" সঙ্গে সঙ্গে কতকটা উপদেশ-স্বরূপ প্রমদাকে আরও বলিয়া গেল,—"তোমার ঘটনাটি বড়ই খারাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। যাইহোক, এখনও এর উপায় আছে—তুমি এখনও তাঁর মন নরম কর্‌তে চেষ্টা পাও। কাল আর আমি বরং আসবো-না। তুমি কাল এই ছাদের উপর সিঁড়ির কাছটিতে দাঁড়িয়ে

থেকো—তোমার স্বামী যখন উপরে উঠ্‌বেন, অমনি একেবারে তাঁর পায়ে জড়িয়ে প'ড়ো, বলো,—'আমি কোন্ অপরাধে অপরাধী যে, আমায় এত কষ্ট দেন? যদি না জেনে কোন অপরাধ করে থাকি, আমায় ক্ষমা করুন; আমি আর কখনও তা' কর্‌বো না!' এইরূপে, কথা-বার্ত্তায়, তাঁর মন কিছু নরম হ'লে, তাঁকে ঘরে নিয়ে যেও। আর, তারপর, তিনি যা' যা' জিজ্ঞাসা কর্‌বেন, তার উত্তর দিতে পার্‌লেই, তোমার কার্য্যসিদ্ধি হ'বে। কিন্তু দেখো—লজ্জা-মান-অভিমান সব ত্যাগ করে, এই কাজটি করা চাই—খবরদার, ভুলো-না!"

"একি! রাত বারটা বাজ্‌লো যে!"

নগেন্দ্রবালা, কাজেই আর থাকিতে পারিল না। তাড়াতাড়ি অমনি, প্রমদার নিকট হইতে বিদায় লইয়া, তাহাকে বাড়ী যাইতে হইল।

... ...

পাশাপাশি দুইটি বাড়ী। একটি নগেন্দ্রনাথদের, আর একটি জ্ঞানেন্দ্রনাথদের। কিন্তু, নগেন্দ্রনাথদের ছাদটি একটু উচ্চ; জ্ঞানেন্দ্রনাথদের বাড়ীর দ্বিতলের ছাদে দাঁড়াইলে, নগেন্দ্রনাথদের ছাদ আরও প্রায় তিন-চারি হাত উচ্চ বলিয়া বোধ হয়। তবে নগেন্দ্রবালা, এদানী একখানি ছোট মই কিনিয়া রাখিয়াছিল বলিয়াই, তাহার যাতায়াতের এমন সুবিধা হইয়াছিল। একটু সুযোগ পাইলেই, বিশেষতঃ সন্ধ্যার পর—কাজকর্ম্ম সারা হইলেই, অমনি সে, ছাদে মই লাগাইয়া, প্রমদার কাছে আসিত। আজ সেই মই দিয়াই সে বাড়ী চলিয়া গেল।

(৩)

ঘটনা-চক্রে সেইদিনই বিমলা দেখাইল,—"ঐ দেখ—ঐ দেখ—ঐ মই দিয়ে ছাদে উঠ্‌ছে!"

বয়সও উভয়েরি সমান! প্রমদা ও নগেন্দ্রবালা দু'জনে দেখিতেও প্রায় একই রকম। তায় বিশেষ রাত্রিকাল। কাজেই, জ্ঞানেন্দ্রনাথ, ত্রিতলের কক্ষে বসিয়া, অত-শত আর বুঝিতে পারিলেন না। কুহকিনীর কুহকে পড়িয়া, রাক্ষসীর মায়ায় মুগ্ধ হইয়া, প্রমদার উপর তাঁহার সন্দেহ আরও বদ্ধমূল হইল। তিনি আপনাকে ধিক্কার দিয়া কহিতে লাগিলেন,—"হায়! ধিক্—ধিক্ আমাকে! বিমলা! এতদিন যদি আমি তোমার কথা বিশ্বাস কর্‌তেম, তা' হ'লে আর এ পাপ নরকের পথে এতদূর অগ্রসর হ'তে হ'ত না!"

এই বলিতে বলিতে, জ্ঞানেন্দ্রনাথ সবেগে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। যেন প্রমদাকে তখনই খণ্ডখণ্ড করিয়া ফেলেন, তাঁহার এমনই মনোভাব!

বিমলা ভাবিল,—যদি স্বামী এখনই উঠিয়া যান, তাহা হইলেই, এত কৌশল—এত ষড়যন্ত্র, সকলই বৃথা হইবে। কারণ, তিনি দেখিবেন,—প্রমদার পরিবর্ত্তে, নগেন্দ্রবালা মই দিয়া ছাদে উঠিতেছে; আর, তাঁহার সেই সতীত্বের আধার গৃহলক্ষ্মী প্রমদা, তাহার নিজকক্ষে বসিয়া, বিষাদ-মনে একমাত্র তাঁহারই ভাবনা ভাবিতেছে। কাজেই বিমলা, সেই জানালাটি বন্ধ করিয়া দিয়া, অনেক বুঝাইয়া-সুঝাইয়া, জ্ঞানেন্দ্রনাথকে সেদিনের মত আপনার কক্ষে আবদ্ধ করিয়া রাখিল। জ্ঞানেন্দ্রনাথ, রাগে গস্‌গস্ করিতে লাগিলেন। মনে মনে ভাবিলেন,—"প্রমদা—পিশাচী!

বিমলা কহিল,—"তুমি ভাবিতেছ কেন? কালই ও কুলকলঙ্কিনীকে বাড়ী থেকে দূর ক'রে দেও। বিনোর মা বড়ই ফন্দীবাজ মেয়ে-মানুষ—তাকে কিছু টাকা দিলেই, সে এখনি ওকে দেশ-ছাড়া ক'রে রেখে আস্‌তে পার্‌বে! অবশ্য তোমায়ও তার কিছু সহায়তা কর্‌তে হবে!"

জ্ঞানেন্দ্রনাথ, রাগে থরথর কাঁপিতে লাগিলেন, তাঁহার মুখ দিয়া আর কোনই বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। ঘর হইতে তিনি আর বাহির হইতেও পারিলেন না।

(৪)

বিনোর মা নামক জনৈক 'বৃদ্ধা বেশ্যা তপস্বিনী' আজকাল সর্ব্বদাই প্রায় জ্ঞানেন্দ্রনাথদের বাড়ীতে আসিত। তাহারা মুখমিষ্টতা ও পরোপকারিতা দর্শনে লোকে তাহার পূর্ব্বার্জ্জিত পাপ ভুলিয়া গিয়াছিল। আজকাল বিমলার সহিত তাহার বড়ই প্রণয়!

বিনোর মার বয়স আন্দাজ চল্লিশ-বিয়াল্লিশ, কিন্তু রঙটা তার এখনও ফুটফুটে—ঠোঁট-দু'টি এখনও সদাই টুকটুকে। যাইহোক, পাড়ায় বাহির হইতে হইলে, সে আর এখন সে কালের মত' বাহার দিয়া বাহির হয় না—এখন তার ভোল অনেকটা ফিরিয়া আসিয়াছে। আজকাল প্রায়ই দেখা যায়, তার হাতে হরিনামের ঝুলি—কপালে রসকলি। কাজেই, লোকে

আর তাকে বিশ্বাস করিবে না কেন? অথচ, এই মোহেই এপর্য্যন্ত সে লোকের সর্ব্বনাশ করিয়া আসিতেছে। গ্রামের কাহারও কন্যা, স্নুষবধূ বা স্ত্রী প্রভৃতিকে স্কুলের বাহির করিতে হইলে, অর্থ-বিনিময়ে, লোকে আজকাল তাহারই সাহায্য গ্রহণ করে। বিনোর মার আজকাল এটাও একটা ব্যবসার মধ্যে।

বিনোর মা পরদিন দ্বিপ্রহরের সময়, বিমলার সহিত সাক্ষাৎ করিল। দু'জনে অনেকই কথা-বার্ত্তা হইল। শেষ বিমলা বলিয়া দিল,—"তুমি কেবল, এই কাজটি ক'রো—তা'হলেই আমার কার্য্যসিদ্ধ হ'বে। প্রথমতঃ এই চিঠি-খানা একটা কোন পুরুষ-মানুষের হাত দিয়ে কল করিয়ে নেবে; তার পর, এই খামখানার মধ্যে তাকে পরে খামের ওপরে প্রমদার নাম আর আমাদের বাড়ীর এই ঠিকানাটা লিখিয়ে নবে। দেখ যেন,—খামের ওপর একথাটা লিখ্‌তে ভুল না হয়—'বিষ্ণুপুর' অর্থাৎ প্রমদার বাপের বাড়ীর ঠিকানা থেকে যেন পত্রখানি আস্‌চে। এই কাজটি মাত্র তোমাকে কর্‌তে হ'বে; তারপর, আর যা' যা' করতে হয়, সে ভার—আমার ওপর। বামী দাসীকে আমি ঠিক তাকে-তাকে থাকতে বলেছি—যেই ডাক-পিওন এসে চিঠিখানি বাড়ীতে দিয়ে যাবে, অমনি সে এসে তা' 'ওঁর' হাতে দেবে! আর তা'হলেই কাজ ফরসা, জেন।"

বিনোর মাও সেই কথায় স্বীকৃত হইল। যাবার সময়, বলিয়া গেল,—"এ আর পারবো না? এ আমি ঠিকই পার্‌বো। আমার জন্য তোমার আর কোন ভাবনা নেই, জেন!"

এই বলিয়া, বিনোর মা, সে দিনের মত চলিয়া গেল। বিমলা, আরও সব ষড়যন্ত্র খুঁজিতে লাগিল।

(৫)

নগেন্দ্রবালার সহিত পরামর্শানুসারে, পরদিন, সরলা প্রমদা, দ্বিতলের ছাদে—সোপান-শ্রেণীর কাছাকাছি, স্বামীর প্রত্যাশায় দাঁড়াইয়া আছে। আহা! অবলা ঘুণাক্ষরেও জানে না, কি প্রকারে তাহার সর্ব্বনাশ-সাধনের জন্য ষড়যন্ত্র হইতেছে—কি প্রকারে ঘটনাচক্রের আবর্ত্তনে তাহাকে স্বামীর হৃদয় হইতে দূরে ফেলিতেছে।

এদিকে, বিমলার ষড়যন্ত্রে, জ্ঞানেন্দ্রনাথ আজ প্রমদাকে হাতে হাতে ধরিবেন—এমনই যোগাড়-যন্ত্র করিয়া রাখিয়াছেন। আর, ধরিতে পারিলে, প্রমদাকে যে তখনই টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিবেন, এমনই তাঁহার মনের রাগ! কিন্তু হায়! ঘটনাও বুঝি তাই ঘটে! প্রমদা ছাদের একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিল—স্বামীর প্রতিক্ষায় পথ-পানে চাহিয়া ছিল। এমন সময়, পিছন হইতে, আর মনোবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া, জ্ঞানেন্দ্রনাথ, নিদারুণ রোষভরে বলিয়া উঠিলেন,—"পাপিনী—পিশাচী!"

প্রমদা অমনি হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া বলিতে গেল—"স্বামী! আমায় ক্ষমা করুন—আমি আপনার চরণে কোন্ অপরাধী—" কিন্তু, জ্ঞানেন্দ্রনাথ, আর কিছু বলিতে দিলেন না—আর তাঁহার সহ্য হইল না। তিনি, যেন দারুণ মর্ম্মান্তিক যাতনায়—ভীষণ ক্রোধে অধীর হইয়া, দৌড়িয়া আসিয়া, প্রমদার প্রতি লক্ষ্য করিয়া, সজোরে এক লাথি মারিলেন। "মা গো"!—বলিয়া, হতভাগিনী প্রমদা সেইখানেই পড়িয়া গেল। জ্ঞানেন্দ্রনাথ, আবার লাথি মারিবার জন্য পদোত্তোলন করিতেছিলেন; কিন্তু বিমলা, দৌড়িয়া আসিয়া, পাছে বাড়ীতে একটা খুন হয় ও সকলকে বিপদে পড়িতে হয়—কতকটা এই ভয়েই, স্বামীকে ধরিয়া ফেলিল; বলিল,—"ছি—ছি!—কর কি!—কর কি!"

জ্ঞানেন্দ্রনাথ রাগে গস্-গস্ করিতে লাগিলেন; বিমলা, হাত ধরিয়া, তাঁহাকে ফিরাইয়া লইয়া গেল। আর প্রমদা!—সে সেইখানেই অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া রহিল!

(৬)

পরদিন কথাটা কিছু গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল। জ্ঞানেন্দ্রনাথের পিতা প্রতিজ্ঞা করিলেন,—কুল-কলঙ্কিনীকে গৃহ-বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া তবে জলগ্রহণ করিবেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথের মাতা, ছোট ছেলের পক্ষ লইয়া, যদিও বারবার বলিতে লাগিলেন,—"ছি—ছি! ওকথা মুখে এনো-না! অমন লক্ষ্মী মেয়ে—ওর প্রতি কি ওসব কথা ভাল দেখায়?" কিন্তু, সে কথা তখন আর শুনিবে কে? তখন সকলেই প্রমদার বিপক্ষে—এক গৃহিণীর কথায় আর কি হইবে?

এমন সময়ই, একি সর্ব্বনাশ! ডাকের পেয়াদা বাড়ীতে একখানা চিঠি দিয়া গেল; আর, ঝি, সেই চিঠিখানা আনিয়া জ্ঞানেন্দ্রনাথের হাতে প্রদান করিল। জ্ঞানেন্দ্রনাথ দেখিলেন—পত্রখানি প্রমদার নামে—তাহা 'বিষ্ণুপুর'

অর্থাৎ প্রমদার বাপের বাড়ী হইতে আসিয়াছে। কিন্তু, তাঁহার পিতা বলিলেন,—"দেখনাই কেন, বেহাই বাপের বাড়ীর খবরটাই বাকি?" জ্ঞানেন্দ্রনাথ তাই পত্রখানি খুলিলেন। কিন্তু, ওঃ! কি ভীষণ! কি লোমহর্ষক! দেখিলেন,—পত্রখানি তো প্রমদার বাপের বাড়ী হইতে আসে নাই! পত্রখানি যে নগেন্দ্রনাথ লিখিতেছে,—

"প্রাণের প্রমদা,

তোমার নির্য্যাতনের বিষয় শুনিয়া বড়ই মর্ম্মাহত হইলাম। কি করিব—উপায় নাই—থাকিলে, এই দণ্ডেই তোমাকে মুক্ত করিতাম। কিন্তু, যাইহোক, আজ রাত্রে তুমি, যেরূপ হউক—হয় ছাদের মই দিয়া, নয় পাছদুয়ার দিয়া—"

জ্ঞানেন্দ্রনাথ আর পড়িতে পারিলেন না।

কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, কর্ত্তাও তখন একবার পত্রখানি পড়িতে গেলেন। কিন্তু, তিনিও আর পড়িতে পারিলেন না। পত্রখানি খুলিয়াই, তাঁহার মন আরও ক্রোধে ও বিষাদে জ্বলিয়া উঠিল—প্রমদাকে গৃহ-বহিষ্কৃত করায় আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন।

... ...

চপি চপি স্থির হইল,—কালীঘাট যাওয়ার নাম ক'রে তা'কে বাড়ীর বার করা হবে। বিনোর মা, আর জ্ঞানেন্দ্রনাথ—প্রথমে দুইজনকেই তার সঙ্গে যেতে হবে। তারপর, জ্ঞানেন্দ্রনাথ, পাশ-কাটিয়ে চলে এলেই হবে! নইলে, শুধু বিনোর মার সঙ্গে যেতে হলে, সন্দেহ করতে পারে—যদি তাতে না যায়, তবেই তো গোল। তাই স্থির হইল,—ভুলাইয়া, কালীঘাট দেখান-ছলে, প্রমদাকে কোন এক বেশ্যালয়ে রেখে আসা হবে। আর, তা' হলেই যত ঝঞ্ঝাট চুকিয়া যায়।

যখন জ্ঞানেন্দ্রনাথ ছলে সতীকে ভুলাইয়া তাঁহার সহিত যাইবার কথা বলিলেন; তখন প্রমদা তাহাতে আর দ্বিরুক্তি করিল না—বরং যেন হাতে স্বর্গ পাইল। এতদিন পরে স্বামী আদর করিয়া ডাকিলেন—হাসিয়া কথা কহিলেন—প্রমদা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া তাঁহার সহিতই চলিল। কোথায় যাইতে হইবে বা কোথায় যাওয়া হইতেছে, তাহা জিজ্ঞাসাও করিল না।

বিমলার উদ্দেশ্য সুসিদ্ধ হইল। সন্দেহজনক পত্র জ্ঞানেন্দ্রনাথ ও কর্ত্তার হাতে আসিয়া পড়াতে প্রমদার সর্ব্বনাশ সাধিত হইল।

হায়! এই ষড়যন্ত্রেই আজ প্রমদার এই দুর্দ্দশা! স্বামী বাড়ী হইতে তাঁহাকে বাহির করিয়া আনিয়া, চলিয়া গিয়াছেন। আর অভাগী প্রমদা—সেই অপরিচিত বিকট দৃশ্যের মাঝখানে পড়িয়া কাঁদিতেছে।

বিনোর মা, পার্শ্বে বসিয়া, যন্ত্রণা দিতেছে—"কেন তুমি তাদের জন্যে আর ভেবে মর। তোমার স্বামী যখন তোমায় বেশ্যার ঘরে ফেলে রেখে যেতে পারলে, তখন কেন তুমি আর তাদের নাম কর? এখনও তাদের ভুলে যাও—মনে কর,—তারা তোমার কেউ নেই।"

এসব কথা প্রমদার গাত্রে যেন যেন বিষমাখান ছুরির ন্যায় বিদ্ধ হইতেছে; আর, প্রমদা, তাহাতে ছট্‌ফট্ করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে বিনোর মা আরও বলিতেছে—"আমরাও যখন প্রথমে এসেছিলেম, আমাদেরও এমনই কষ্ট হয়েছিল! বুঝে দেখ, সংসারে কেউ কারো নয়! নিজের সুখই সুখ।"

প্রমদা চীৎকার করিয়া বলিল—"তুই এমন পিশাচী তা' আমি জানতেম না—না-জানি, তুই এইরূপে কত অবলারই সর্ব্বনাশ করেছিস্!"

বিনোর মা "হাঃ হাঃ" করিয়া হাসিয়া উঠিল সে বিদ্রূপের হাসি—প্রমদার শিরায় শিরায়, ধমনীতে ধমনীতে আঘাত করিল।

প্রমদা দারুণ যন্ত্রণায়, কষ্ট-স্বরে কহিল,—"বিনোর মা! ওসব কথা শোনানর চেয়ে আমায় খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মেরে ফেল না কেন। স্বামী আমায় পরিত্যাগ করিলেন, তবে দাও আমায় বিষ এনে দাও—আমি আর কার জন্য এ দেহ-ভার বহন করিব? স্বামীর উপর সন্দেহ আমার নাই—নিশ্চয়ই পাপ ষড়যন্ত্রে আমার এ দুর্গতি হয়েছে। নিশ্চয়ই তিনি না বুঝে-সুঝে, সীতার ন্যায় আমায় বিসর্জ্জন দিয়েছেন। বিনোর মা! তোমায় আমি মিনতি করে বলছি, তুমি ওসব পাপ কথা আমায় আর শুনিও না। না খেয়ে যদি মৃত্যু ঘটে, বজ্রাঘাতে যদি ব্রহ্মস্থল ভেদ হয়, তথাপি সতী কখনও স্বামীর নিন্দা সহ্য করিবে না—সতী কখনও কুপথে গমন করিবে না।"

তারপর, ক্রমেই প্রমদা, অবসন্ন হইয়া পড়িল। হায়! সর্ব্বনাশীর ষড়যন্ত্রে সরলা সাধ্বী সতীর সর্ব্বনাশ হইল! কেহ যদি জিজ্ঞাসা করেন,—"প্রমদার কেন এমন হ'ল?" তাহার উত্তর,—"সর্ব্বনাশীর ষড়যন্ত্রে কলিতে এইরূপই হয়।"